প্রবাসী

বৈশাখ—১৩৭৯

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৭৯

সূচীপত্র

প্রবাসী

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৭৯

সূচীপত্র

প্রবাসী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৯

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯

আষাঢ়
১৩৭৯

প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৭৯

সূচীপত্র

শ্রাবণ

১৩৭৯

প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৭৯

সূচীপত্র

ভাদ্র
১৩৭৯

প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৭৯

সূচীপত্র

আশ্বিন

১৩৭৯

সূচীপত্র

বর্ষফলাফল কথন

শ্রীনন্দলাল বসু

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
প্রথম খণ্ড
বৈশাখ, ১৩৭৯
১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কম্যুনিষ্ট, ফ্যাশিষ্ট ও স্বাধীন-মানবীয় সংস্থা

একটা সময় ছিল যখন গরীব শ্রমজীবী অথবা কৃষকগণ যদি নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে আন্দোলন করিত তাহা হইলে তাহাদের উপরওয়ালা মালিকগণ তাহাদিগকে বিপ্লবী, বিদ্রোহী অথবা কম্যুনিষ্ট বলিয়া অপবাদ করিয়া তাহাদের অধিক পাওনার দাবি যে সকল দিক দিয়াই নিন্দনীয় ও গর্হিত এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি যে সময় গঠিত হয় নাই তখন তাহারা বিদ্রোহী বা বিপ্লবী বলিয়াই অখ্যাতির অধিকারী হইত। পরে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তাহারা শোষণ কার্য্য নিরত মালিক গোষ্ঠীর ভাষায় কম্যুনিষ্ট বলিয়া আখ্যায়িত হইতে আরম্ভ করিল। ইহার সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রভুত্ব-পীড়িত প্রজাদিগের "সিডিশন" তুলনীয়। লুণ্ঠন, অত্যাচার ও সর্ব্বপ্রকার বর্ব্বরতা নিষ্পেষিত প্রজাদিগের পক্ষে রাজা বা সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন পরিচালনাই চূড়ান্ত অপরাধ বলিয়া উৎপীড়কগণ ধরিয়া লইতেন ও সেই অযৌক্তিক ধারণা অনুসরণে তাহাদিগের উপর অত্যাচার আরও প্রবলভাবে চালাইতে থাকিতেন। অর্থনীতি ক্ষেত্রের শোষণও ঐ একইভাবে জোরাল হইয়া উঠিত এবং প্রাপ্য না দিয়া শুধু প্রার্থীর বদনাম করিয়াই নীতি-সংস্কারকার্য্য শেষ করা হইত। কোনও ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংঘকে বিদ্রোহী, বিপ্লবী অথবা কম্যুনিষ্ট বলিলেই প্রমাণ হয় না যে সেই ব্যক্তি অথবা সংঘবদ্ধ ব্যক্তিগণ কোনও রাজার প্রাণহানি করিয়াছে অথবা রাজকোষাগার লুণ্ঠন করিয়াছে। দাবি ন্যায্য কি না বিচার করিবার পূর্ব্বেই দাবিদারের চরিত্র খারাপ বলিয়া বিষয়টার নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া শুধু যে অন্যায় তাহা নহে, ঐরূপ কার্য্য সুতর্কের সকল নিয়মবিরুদ্ধ ও সুনীতি-নাশক।

আধুনিক কালে সকল দেশের সকল রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থাকেই মানব স্বাধীনতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। মুক্তি ও স্বাধীনতা যে বিশ্বের সকল মানুষের কাম্য এবং প্রাপ্য একথা বর্ত্তমান কালে মানুষমাত্রই একটা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতার আদর্শ খর্ব্ব করা হইতেছে তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠান মানবতার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিদর্শন নহে প্রমাণ করিতে কোনও

অসুবিধা হয় না। এই কারণে যেখানেই মানুষকে নিজের শুভ ইচ্ছা অনুসরণে জীবন নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া হয় না সেখানেই মিথ্যা প্রচারের দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয় যে, সেই স্থানে মানুষের সকল স্বাধীনতাই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ সকল রাষ্ট্রেই, তাহা কম্যুনিষ্ট হউক, ফ্যাশিষ্ট হউক অথবা সাধারণতন্ত্রই হউক, কোথাও কেহ স্বীকার করে না যে, মানব স্বাধীনতা কোথাও কিছু মাত্র খর্ব্ব করা হইয়াছে। কিন্তু পরস্পরের নিন্দাবাদের কোনও অভাব কোনও রাষ্ট্রেই লক্ষিত হয় না। সাধারণতন্ত্রের জনসাধারণ যে-সকল দেশে একনায়কত্ব অথবা একটিমাত্র রাষ্ট্রীয় দলের আধিপত্য আছে সে-সকল দেশে যে মানব স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইয়া থাকে তাহা প্রচার করিতে দ্বিধা করেন না। কম্যুনিষ্ট জনসাধারণ বলেন যে সাধারণতন্ত্রীদিগের স্বাধীনতা শুধু কাগজে লিখিত স্বাধীনতা। বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচন, প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি বাহিরের লোক দেখান মুক্ত ও স্বাধীন জীবন-যাত্রার মিথ্যা অভিনয় মাত্র। সাধারণতন্ত্রে প্রায় সর্ব্বত্রই জনসাধারণ পুঁজিবাদীদিগের দাস ও তাহাদিগের দ্বারা শোষিত ও উৎপীড়িত। সাধারণতন্ত্রীদিগের ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনও একটা বিরাট মিথ্যার অভিনয়। ভোট ক্রয় বিক্রয়, ভীতি প্রদর্শন করিয়া ভোট দিতে বাধ্য করা, যাহার ভোট তাহার ভোটিং বুথে আগমনের পূর্ব্বেই অন্য ব্যক্তির দ্বারা ভোট দেওয়ান, এবং মিথ্যা নাম তালিকাভুক্ত করাইয়া, যে মানুষের অস্তিত্ব নাই তাহার নামে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রীয় দলগুলি সাধারণতন্ত্রকে একটা প্রহসনে দাঁড় করাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় দলগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই সকল দুষ্কর্ম করিয়া থাকে এবং যাহারা অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করিয়া রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিতে সাহায্য করে তাহারা বিভিন্নভাবে নিজেদের নানা প্রকার অর্থকর সুবিধা করাইয়া লইয়া যাহা খরচ হয় তাহা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইয়া থাকে। কম্যুনিষ্টদিগের নিজেদের বিরুদ্ধ দলের আর একটা সমালোচনার উদাহরণ হইল, কোনও সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রীয় দল কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিয়া জয় লাভ করিলেই সেই দলকে ফ্যাশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করা। ফ্যাশিষ্ট নামধেয় রাষ্ট্রীয় সংগঠন কি তাহা বুঝিতে হইলে কিছুটা ইতিহাসের কথার আলোচনা অবশ্যক। প্রথমতঃ ফ্যাশিজম প্রবর্ত্তণ করেন ইতালীয় নেতা বেনিতো মুসোলিনি। ইনি রোমান যুগের যুদ্ধ-কুঠারের গুচ্ছবদ্ধ সরুসরু লাঠির হাতলকে একতার প্রতীক বলিয়া নিজ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় দলের জন্যে ব্যবহার করেন ও দলের নাম দেন fasci di combattimento। এই দলের লোকেরা একান্ত ভাবে জাতীয়তাবাদী ছিলেন ও এক নায়কের অনুসরণে প্রাণপণ করিয়া সকল ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহারা অতি সরলভাবে রক্ষণশীল ছিলেন এবং রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সকল পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। এই ভাবে ফ্যাশিষ্টগণ শ্রমজীবীদিগের আত্মোন্নতির চেষ্টা দমন করিতেন এবং বিদেশীদিগের বিরুদ্ধাচরণেও অগ্রসর হইতেন। যথা ইহুদি বা নিগ্রো বিরুদ্ধতা। ফ্যাশিষ্টগণ নারীজাতির অগ্রগমনে বিশ্বাস করিতেন না, ব্যক্তির সকল অধিকার জাতির উন্নতির জন্য বলিদান দিতে চাহিতেন, দেশের সকল সম্পদ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেন ও যাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিতেন তাঁহার একাধিপত্যের বিরুদ্ধতা কোন ভাবেই মানিতেন না। ইতালীতে ফ্যাশিজম্ ১৯১৯ খৃঃঅব্দে প্রবর্ত্তিত হয় ও ১৯৪৩ খৃঃঅব্দে মুসোলিনির পতন হইবার সঙ্গে শেষ হয়। ফ্যাশিজম জার্ম্মানীতে নাৎসি দলের নেতা হিটলারের নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ও পোলাণ্ডে পিলসুডস্কি, অষ্ট্রিয়ায় ডলফুস, স্পেনে ফ্রানকো, পর্টুগালে সালাজার ও আর্জেনটাইনে পেরণ-এর নেতৃত্বে জোরাল হইয়া উঠে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও বৃটেনেও ফ্যাশিজম কিছু কিছু বৰ্দ্ধিত হয় কিন্তু পূর্ণশক্তি আহরণ করিতে পারে নাই। ফ্যাশিষ্টদিগের শ্রমজীবী আন্দোলন দমন চেষ্টা ছিল একটা প্রধান রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য। সেই কারণে ভারতবর্ষে ফ্যাশিজম কখনও জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ইহা ব্যতীত এই দেশের

রাষ্ট্রক্ষেত্রে বামপন্থা দক্ষিণের আদর্শবাদেও ঘনভাবে ছায়া ফেলিয়াছে বলিয়া ফ্যাশিজমের মত উৎকট রক্ষণশীলতা কোনও মতেই রাষ্ট্রীয় মতবাদে শিকড় গজাইতে পারে নাই। সুতরাং যখন ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ কংগ্রেসীদিগকে ফ্যাশিষ্ট বলিয়া জনচক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করেন তখন তাঁহারা এই কথাই বলিবার চেষ্টা করেন যে, কংগ্রেস একনায়কত্বে বিশ্বাসী অথবা কংগ্রেস পুরাতনের বস্তাপচা মনোভাবের পুনর্জ্জাগরণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে ফ্যাশিজম ইতিহাসে কম্যুনিজমের চরম শত্রুরূপে একদা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার পুনরাবির্ভাব ভারতে কদাপি সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কম্যুনিষ্টগণ রাজ্যাধিকার আহরণ চেষ্টায় বিপ্লবের পথে চলিতে পারেন ও কোন কোন অবস্থা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ সকল সময়ে ন্যায় সুনীতি ও সুসভ্য-ব্যবহারের উচ্চাদর্শের শিখরচ্যুত হইয়া অধোগমনশীল হইতেও পারে। কংগ্রেসও সামাজিক প্রগতিশীলতার আদর্শ-রক্ষা করিতে পূর্ব্বেও অনেক সময় সক্ষম হন নাই, এখনও ভবিষ্যতের কোনও নূতন পরিস্থিতিতে আদর্শের পথভ্রষ্ট হইতে যে না পারেন তাহাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। তবে যাহাই ঘটিবে তাহা কোন পুরান নক্সা অনুসরণে ঘটিবে এরূপ ভাবিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্য, সুবুদ্ধি ও বুদ্ধিহীনতা, সকল কিছুই পুরাতন বাধা বিপত্তিকে উত্তমরূপে দেখিয়া বুঝিয়া পথ চলে। ধাক্কা খাইলে অজানা পথেই মানুষ ধাক্কা খায়। কূটবুদ্ধিও সর্ব্বদাই তাহাকে নূতন উপায়ে অভিপ্রায় সিদ্ধির চেষ্টা করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিন্দাবাদ চেষ্টা যাঁহারা করেন তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে ফ্যাশিষ্ট বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীমতী ইন্দিরার মধ্যে ফ্যাশিষ্টের কোনও লক্ষণই আমরা কখনো দেখিতে পাই নাই। নিন্দা করিতে হইলে সত্য মিথ্যা জ্ঞান হারাইয়া নিন্দা করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। শ্রীমতী ইন্দিরার মধ্যে প্রগতিশীলতাই দেখা যায়; উৎকট রক্ষণশীলতা কোথাও দেখা যায় না। তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য চির উৎসুক বলিয়াও কেহ মনে করেন না। এক কথায় তাঁহার মধ্যে ফ্যাশিষ্ট ভাব কোথাও দেখা যায় না। অপর পক্ষে যাঁহারা বিপ্লবে বিশ্বাস করেন তাঁহারাই সর্ব্বদা যুদ্ধ বাধাইতে ইচ্ছুক। পার্টির প্রাধান্যের নিকট ব্যক্তির অধিকার বলি দিতেও সর্ব্বদা তাঁহারাই প্রস্তুত। বিদেশীর নিকট আত্মসমর্পণেও তাঁহাদের লজ্জা নাই। জনসাধারণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া প্রবল হস্তে তাহাদের দমন ও শোষণ করিয়া তাহাদিগকে "মুক্তি ও স্বাধীনতা" দান করিতে যাহারা সদা সচেষ্ট তাঁহাদিগের সহিত ফ্যাশিষ্টদিগের সাদৃশ্য অধিকভাবে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। জনসাধারণের মুখ বন্ধ, পার্টির হুকুমে যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি পার্টির ইচ্ছানুসারে চালিত; এইরূপ যে অবস্থা তাহা যে-সকল দেশে দেখা যায় সে দেশগুলিতে সাধারণতন্ত্র কোনওভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে বলা যায় না। এ কথা সত্য যে, সাধারণতন্ত্রের মুখোস পরিয়া নেতাদিগের স্বৈরাচার জনগণের উপর অত্যাচার চালাইতে পারে; কিন্তু মুখোসটিকে যথাযথ ভাবে রচিত ও ব্যবহৃত করিতে হইলে সাধারণতন্ত্রের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেকাংশে রাষ্ট্রদেহে সংযুক্ত রাখিতে হয় ও তাহাতে নেতাদিগের আত্মপ্রতিষ্ঠা ততটা উৎকট রূপ ধারণে সক্ষম হয় না। ইহা ব্যতীত জনমনের উপর খোলাখুলিভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিরুদ্ধ রীতিনীতির মাহাত্ম্যে বিশ্বাস জাগরণের উদ্দেশ্যে মনোবৈজ্ঞানিক অস্ত্রোপচারও সহজ হয় না। অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রের মুখোস পরিহিত রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি পূর্ণ ও সহজ সরল ভাবে জনসাধারণের রাজত্ব না হইলেও তাহা নগ্নগাত্র কম্যুনিজম অপেক্ষা সাধারণের আত্মসম্মান-রক্ষক।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত মালিকানা

যে সকল কারবারের মূলধন রাষ্ট্রের তহবিল হইতে লওয়া হয় সেগুলির পরিচালনার ভারও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী-দিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে। যে সকল কারবারের মূলধন জনসাধারণের ভিতর হইতে অংশীদার ব্যক্তিগণ

দিয়া থাকেন সেগুলি ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতিষ্ঠান ও সেই কারবারগুলির পরিচালনাও থাকে অংশীদারদিগের হস্তে; অর্থাৎ সেগুলির পরিচালকগণ অংশীদারদিগের প্রতিনিধি হিসাবেই কারবারগুলির উপর প্রভুত্ব করেন। কখন কখন কার্য্যের সুবিধার জন্য অথবা সামাজিক পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রীয় কারবারে জনসাধারণের প্রতিনিধি লওয়া হয় এবং ঋণ গ্রহণ করার জন্য অনেক ব্যক্তিগত ভাবে চালিত কারবারে সরকারী কর্ম্মচারী বা প্রতিভূর উপস্থিতিও হইয়া থাকে। এইগুলি কিন্তু শুধু পরিচালনার সুবিধার ব্যবস্থা মাত্র, ইহার সহিত প্রভুত্ব, মালিকানা বা অংশীদারীর কথা জড়িত থাকে না। মূলধন একতরফা হইলেও পরিচালনা ক্ষেত্রে দুই তরফের লোক থাকিতে পারে।

রুশিয়ায় কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে সকল কাজ কারবার জাতীয় হইয়া যায় এবং পরিচালনার বিষয়েও সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু কেন্দ্রীভূত পরিচালনা পরে উঠাইয়া দেওয়া হয়, যেহেতু রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণ, বাস্তব অবস্থা যাহাই হউক, সকল সমস্যার সমাধান আইনের বিধান অনুসারে করিতে গিয়া বহু কাজকারবার অচল করিয়া দেন। রুশিয়ায় ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রগত ভাবে পরিচালনার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করাই নিয়ম হয়। বর্ত্তমানে রুশিয়ায় বহু কারবার ব্যক্তিগতভাবে চালিত হইতেছে। পরিচালকগণ শুধু রাষ্ট্রকে কারখানার মালিক বলিয়া স্বীকার করেন ও তজ্জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা দিতে বাধ্য থাকেন। ঐ টাকা দিবার পর যাহা লাভ হইতে পারে তাহা পরিচালকগণ নানাভাবে বণ্টন করেন।

ভারতবর্ষে এখনও রাষ্ট্রীয় কারবার রাষ্ট্রই চালাইয়া থাকেন এবং তাহাতে পরিচালনার কার্য্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য এখন চিন্তা করা হইতেছে যে কি ভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনার সহিত সরকারী প্রভুত্ব ও হুকুমদারীর সমন্বয় স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ মূলধনের বিষয়েও ব্যক্তির অংশীদারী মানিয়া লইবার কথা বিচার করা হইতেছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও পরিচালনার উৎস দুই ধারায় বহমান হইবে। রাষ্ট্র পরিচালনার রীতি-নীতির ন্যায়ধর্ম্মের দিক যাহাতে সুরক্ষিত থাকে তাহা দেখিবেন এবং ব্যক্তিগত পরিচালকগণ উপযুক্ত ভাবে উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া লাভের দিক সামলাইবেন। মূলধন দুই তরফ হইতেই আসিবে। কাজকারবার দুই চক্রের উপর চলিলে সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা এক চক্রে চলার তুলনায় উন্নততর হইবে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। রাষ্ট্র জনসাধারণের সহায়তা লাভ করিলে মূলধন সংগ্রহ কার্য্যও সহজ করিতে পারিবেন।

"হিপি"রা কি তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী?

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন সূত্রে "হিপি"রা কি মনোভাব প্রণোদিত হইয়া ভারতে আসিয়া আলুথালু বস্ত্র পরিহিত ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় সেই আলোচনা উচ্চস্তরের রাজনৈতিক আসরে উপাপিত হইয়াছিল। তাহাতে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলেন যে অনেক "হিপি" ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান আহরণ ইচ্ছায় এই দেশে আগমন করেন ও তাঁহাদিগের কেহ কেহ তত্ত্ব জ্ঞান লাভে সক্ষমও হইয়া থাকেন। কথাটা সত্য হইতে পারে অর্থাৎ এক হাজার "হিপি"-র মধ্যে হয়ত তিনজন সাংখ্য বেদান্ত চর্চ্চা করিয়া নিজেদের মনের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছেন, অথবা অপর একজন "হিপি" সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইবার পথে পদস্থাপনক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও বাকি ৯৯৬ জন সকল ভ্রমণ নিরত "হিপি" যে গঞ্জিকা সেবন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহেন এবং সুবিধা অনুসারে বিদেশী রাষ্ট্রের দিক হইতে ভারতের নানান খবর সংগ্রহ করিয়া বেড়ান না সে কথা প্রমাণ হয় না। বিদেশী গুপ্তচরগণ নানান ছদ্মবেশ ও ভেক ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও তাহার মধ্যে সন্ন্যাসী, শিক্ষক, ধর্ম্মপ্রচারক, সঙ্গীতবাদ্যের ওস্তাদ প্রভৃতি নানা প্রকার মানুষই দেখা যায়। কোথাও কোথাও "হিপি" অপেক্ষা বহুগুণ শান্তিভঙ্গকারী কৃষ্ণভক্ত বিদেশী বৈষ্ণবদিগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ইহারা

নিজেদের উৎকট-শব্দ-বহুল ধর্ম্মাচার লইয়াই থাকে অথবা অন্য কিছু ভারত-বিরুদ্ধ কার্য্যও করে কি না, কে বলিতে পারে? প্রাচীনকালে যে সকল জ্ঞানী গুণী বিদেশীগণ ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার আস্বাদ লাভেচ্ছায় এদেশে আসিতেন "হিপি" অথবা "হরেকৃষ্ণ" দলের বিদেশীগণ সেইরূপ উচ্চস্তরের মানুষ নহে। ইহাদিগের কোন গভীর আধ্যাত্মিক আগ্রহ আছে অথবা ইহারা জ্ঞান মার্গের পথিক বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। যে শুচিতা ও মার্জ্জিত রুচি মানুষকে কৃষ্টি ও সভ্যতার উচ্চস্তরে স্থাপন করে সে মানসিক আভিজাত্য "হিপি" বা "হরেকৃষ্ণ" দলের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ইহারা যে জাতীয় মানুষ বলিয়া সকলের মনে হয় তাহাতে ইহাদিগের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি থাকিতে পারে যাহাদের দ্বারা আমাদিগের সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং ইহাদিগের কোন কোন ব্যক্তি যথার্থ পাণ্ডিত্য ও অপর গুণের আকর হইলেও ইহাদিগের ভারত পর্য্যটন সীমাবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। যাহারা ভারতে আসিয়া ভারতীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে এবং উৎকট ভঙ্গী ও সিংহনাদ সহকারে বৈষ্ণব বা অপরকিছু সাজিয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ করে; তাহাদের ভারতে উপস্থিতি আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ মধুর করিয়া তুলিতেও সাহায্য করে না।

মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা

অপর দেশের মতই ভারতবর্ষেও মধ্যবিত্ত জনগণকে একটা বিশেষ শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এই শ্রেণীর মানুষের নাম যদিও মধ্যবিত্ত কিন্তু তাহাদিগের বিশেষত্ব তাহাদের উপার্জ্জনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। উপার্জ্জনের পরিমাণ অধিকও নহে এবং অত্যল্পও নহে; তাহার পরিমান মাঝারি; অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ধনীও নহেন, দরিদ্রও নহেন, আর্থিক অবস্থায় তাঁহারা একটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। যাঁহাদের আয় বার্ষিক ২০০০০্ টাকা বা ততোধিক তাঁহারা যদি ধনী বলিয়া পরিচিত হন এবং যাঁহাদের আয় বাৎসরিক ৩০০০্ টাকা বা তাহা হইতেও অল্প তাঁহারা যদি দরিদ্র বলিয়া অভিহিত হ'ন; তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণের বাৎসরিক আয় ৩০০০্ টাকা হইতে অধিক এবং ২০০০০্ টাকা হইতে কম ধরা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুত বহু কারিগর বা দোকানদার আছেন যাঁহাদের উপার্জ্জন ঐ দুই সীমার মধ্যেই পড়ে কিন্তু তাঁহারা ঠিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বলিয়া গণ্য হ'ন না। ইহার কারণ এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বলিতে আমরা বহুকাল হইতেই কেরাণী, নিম্নস্তরের রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষক, সাধারণ স্তরের ডাক্তার কবিরাজ উকিল যন্ত্রবিদ, সামরিক কর্ম্মচারী, লেখক, পত্রিকা সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, হিসাব লেখক, খাজাঞ্চি, দালাল, জীবনবীমার এজেন্ট প্রভৃতি ব্যক্তি-দিগকেই বুঝিয়া থাকি। এই সকল ব্যক্তির বিশেষত্ব তাহাদের উপার্জ্জনের পরিমাণের মাঝারি আকারের ভিতর নিহিত নহে। বিশেষত তাহাদের মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতরেই নিবিষ্ট। এই কারণে অনেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শিক্ষিত সমাজ বলিতে একই সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝিয়া থাকেন। জাতির শিক্ষা ও মানসিক ঐশ্বর্য্য এই সম্প্রদায়ের ভিতরেই রক্ষিত থাকে এবং এই সম্প্রদায়ের মানুষ যদি অভাবে নিষ্পিষ্ট অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকে তাহা হইলে জাতির অবস্থাও ক্রমশঃ নিস্তেজ ও প্রতিভাহীন হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভার নিষ্প্রভ অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বৃটিশ যুগের শেষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজকে বৃটিশ যে ভাবে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল ও পরে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেও যে পেষণ রীতির কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ করা যায় নাই; সেই মধ্যবিত্ত তথা শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নিষ্পেষণের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অর্থনৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক অবনতির কারণ পূর্ণরূপে নিহিত আছে।

স্বাধীনতা লাভের পরে যে সকল পরিকল্পনা অনুসারে ভারত গঠন কার্য্য চালিত হইয়াছে সেই সকল পরিকল্পনায় শিক্ষিত সমাজের উন্নতি হয় নাই। কিছু কিছু যান্ত্রিক কৌশল শিক্ষা হইয়াছে; হয় নাই বুদ্ধির

পূর্ণবিকাশ ও জ্ঞানের উন্মেষ। যে প্রেরণা ও যে প্রতিভা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের ভিতর জাগ্রতভাবে দেখা দিয়াছিল; বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা উপযুক্ত রসের খোরাক না পাইয়া জীর্ণশীর্ণ শুষ্ক অবস্থায় মরণোন্মুখ হইল। যাহারা ধনবান্ ছিল তাহারা নানা ভাবে সাহায্য পাইয়া আরও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিল। যাহারা কারিগর ও নানা-ক্ষেত্রের পেশাদার ছিল তাহারাও কিছু কিছু উন্নতি করিল। শুধু কষ্টক্লেশ অভাব জর্জ্জরিত হইয়া রহিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে দল পাকাইয়া যদিও কেহ কেহ সুবিধা করিয়া লইল, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এখন কথা হইতেছে, দেশের ভবিষ্যৎ যেখানে এই সম্প্রদায়ের উন্নতির উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে সে ক্ষেত্রে এ সম্প্রদায়কে সবল ও প্রাণবান্ করিবার ব্যবস্থা না করিলে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ইহার কি ব্যবস্থা হইবে? শিক্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আদর্শবাদ প্রভৃতি যে সকল গুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের কিছুকাল অবধি দেখা যাইত ও যে গুণাবলী বৃটিশের মধ্যবিত্ত-বিনাশ নীতি ও স্বাধীন ভারতের শিক্ষিত সমাজকে অবহেলা করিয়া চলিবার কারণে প্রায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল, সেই চারিত্রগত সবল সতেজ প্রাণবন্ততার এখন অবধি পুনরাবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে জাতি গঠন একটা মিথ্যা কল্পনার কথাই রহিয়া যাইবে। মধ্যবিত্ত তথা শিক্ষিত সমাজকে শক্তিশালী ও অগ্রগমন সক্ষম করিতে হইলে শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পারিস্থিতির সুচিন্তিত ও কার্য্যকর পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে আবশ্যক। এই দিকে দৃষ্টি না দিয়া শুধু সোসিয়ালিজম বা সমাজবাদের নামকীর্ত্তন করিলেই সমাজ সুগঠিত ও উন্নতরূপ ধারণ করিবে না।

পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্গভূমি না বঙ্গপ্রদেশ?

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক ও নূতন নাম বঙ্গভূমি হইলে উত্তম হয়, একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। বঙ্গপ্রদেশ নামটি কোন কোন ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু উহা যে শ্রুতিকটু এবং বাংলা ও বাঙালীর বিশেষত্ব জ্ঞাপক না হইয়া বাংলার প্রাদেশিকতাই জোর করিয়া জ্ঞাপন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গভূমি বলিলে বুঝা যায় যে এই ভূমিতে বঙ্গীয় মানবদিগের বাস। বঙ্গপ্রদেশ বলিলে প্রথমেই বঙ্গ যে (ভারতের) একটা প্রদেশ মাত্র অর্থাৎ একটা বৃহত্তর দেহের অঙ্গ মাত্র, সেই কথাই শ্রোতাকে মনে করাইয়া দেয়। এই কারণে বঙ্গপ্রদেশ নামটি বাঙ্গালীর মনে কোন সত্তাই সৃজন করে না।

ঐশ্বর্য্য উৎপাদন ও বণ্টন

অর্থনীতিতে ঐশ্বর্য্য উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ একই বিষয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া আলোচিত হয়। অর্থাৎ বস্তু বা অবাস্তব মূল্যবান্ সেবা বা সহায়তা প্রথমত উৎপন্ন হয় ও তৎপরে তাহা নিয়ন্ত্রিত ভাবে বিভিন্ন ভোক্তার অংশে পৌঁছায় এবং শেষে তাহা মানুষের ভোগে লাগে। অবাস্তব সেবার যে মূল্য আছে তাহা সহজেই বোধগম্য। যথা চিকিৎসা, শিক্ষা অথবা আদালতে উকিলের সহায়তা। এইগুলি মূল্যবান্ সেবা অথবা সাহায্যের, কথা কিন্তু বাস্তবরূপ ধারণ করে না। বাস্তব উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, কেহ কিছুর নির্মাণ, গঠন, বহন অথবা পরিবর্ত্তিতরূপ দান করিল কি না; কিন্তু অবাস্তব সেবা, সহায়তা বা সাহায্যের সম্বন্ধে কোনও মাপ, ওজন অথবা প্রকৃষ্টভাবে উপস্থিতি বিচার করিতে পারা সহজ নহে। সুতরাং যাহারা অবাস্তব কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে যাহা করিবার তাহা না করিয়াও বেতন আহরণ করিয়া চলিতে পারেন। কিম্বা যে পরিমাণ কার্য্য করা উচিত তাহা না করিয়া পূর্ণ কাজ করিলে যাহা পাওয়া উচিত তাহা গ্রহণ করিয়া সমাজকে প্রবঞ্চিত করিতে পারেন। সুতরাং যখন বেকার সমস্যা সমাধানার্থে কার্য্যের সৃজন করা হয় তখন উচিত যথাসম্ভব বাস্তব দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য মানুষকে নিযুক্ত করা। তাহা না হইলে বহুলোক কর্ম্মে নিযুক্ত

হইয়া কোনও কার্য্য না করিয়া বেতন পাইতে থাকার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে ও ফলে সেই বেতন সমাজের উৎপাদন কর্ম্মে নিযুক্ত উৎপাদনকারী কর্ম্মীদিগের ভাগ হইতে কাটিয়া লইয়া নিকর্ম্মাদিগকে দেওয়া হইবে। এই কাটিয়া লওয়া কি ভাবে সম্পন্ন হইবে তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যদি সরকারী চাকুরী সৃষ্টি করিয়া বহু লোককে বেতনভোগী করা হয় এবং যদি সেই সকল ব্যক্তির কোন মূল্যপ্রসূ কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে ঐ বেতন দিবার টাকা রাজকর বৃদ্ধি করিয়া সংগৃহীত হইবে ও সেই বর্দ্ধিত হারে রাজকর যাহারা দিবে তাহাদের ভোগে অথবা সঞ্চয়ে আঘাত লাগিবে। সুতরাং অবাস্তব কার্য্য করিবার ওজুহাত দেখাইয়া চাকুরী সৃষ্টি সরকারীভাবে করা উচিত নহে। তাহা অপেক্ষা অর্থনৈতিক দিক হইতে অনেক নিরাপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনা মুক্ত উপায় হইল বাস্তব উৎপাদনের দিকে সচেষ্ট হওয়া। অবাস্তব সেবার জন্যই যদি অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে নূতন নূতন পাঠশালা খুলিয়া দেশের সকল বালকবালিকার যাহাতে অক্ষরজ্ঞান হয় ও যাহাতে তাহারা অধিক করিয়া কর্ম্মক্ষম হইতে পারে সেই চেষ্টা করিলে দেশের মঙ্গল হইবে। ইহার জন্য যদি রাজকর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহা দেওয়া ন্যায্য হইবে। কিন্তু অকারণে চাকুরী সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রীয় দলের পাণ্ডাদিগের পেটোয়া লোকের সংস্থান করিবার ব্যবস্থা জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে প্রথমতঃ বাঞ্ছনীয় নহে এবং তাহা জনসাধারণের প্রতি ন্যায়পথানুগতও নহে।

সন ১৩৭৯

বঙ্গাব্দ ১৩৭৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া ১৩৭৯ বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রবাসীও এই সঙ্গে নিজ জীবনের ৭১ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা মাসিক পত্রিকা জগতে সুদীর্ঘকাল নিয়মিত ও অচ্ছেদ্য প্রকাশনের একটা নূতন অনতিক্রান্ত বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিল। বাঙালী পাঠক ও লেখক সমাজের সহায়তা ব্যতীত এই কঠিন কার্য্য কখনও সাধিত হইতে পারিত না ও প্রবাসী এইজন্য পাঠক ও লেখকদিগের নিকট সবিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রবাসীর জীবনে দুইটি বিশ্ব মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে ও সেই কারণে নানা বিপত্তির আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রকাশ কার্য্য অব্যাহত থাকিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ৪২ বৎসর কালের মধ্যে বহুবার সাম্রাজ্য-বাদী বৃটিশ শাসকদিগের ক্রোধাগ্নি প্রবাসীর দিকে জ্বলন্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু প্রবাসী অত্যাচারী শোষকদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজ স্বাধীন মতামতের আদর্শ সকল সময়েই পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই যুগের সাহিত্যক্ষেত্রের প্রায় সকল মহারথীই প্রবাসীর সহায়তা করিতেন ও অনেক সুলেখকের রচনা প্রবাসীর পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রবাসীর প্রগতিশীলতার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল এবং অদ্যাবধি প্রবাসী নূতন লেখক-দিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতে দ্বিধা করে না। আমরা এই সংখ্যাতে পুরাতন প্রবাসী হইতে কিছু কিছু লেখা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। আজকার পাঠকগণ এই সকল রচনা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। পূর্ব্বকালের লেখকদিগের রচনা পাঠ করিলে আজকালকার লেখক-দিগেরও লেখার রীতি পদ্ধতি ও আদর্শ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য হইতে পারে। সে যুগের চিত্রকলারও একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত করা হইল।

অন্যায় ও অধর্ম্মের দুই তরফা স্বরূপ

প্রাচীনকালে বৃটেনে রাষ্ট্র সংক্রান্ত অন্যায়ের ন্যায্যতা প্রমাণ করিবার জন্য একটা কথার প্রচলন করা হইয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে, রাজা যাহাই করেন তাহাই ন্যায়। The king can do no wrong, কথাটার এখন আর বৃটেনে অথবা অপরাপর দেশে কোনও মূল্য নাই; কারণ, রাজার রাষ্ট্রক্ষেত্রে কিছু করা না-করার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে ও রাজা এখন রাষ্ট্রশক্তিহীন একটি ঐতিহ্য রক্ষার প্রতীক মাত্র। এখন সাধারণতন্ত্র অথবা অপরাপর প্রচলিত রাষ্ট্রনীতি অনুসারে রাজশক্তি

জনসাধারণ অথবা রাষ্ট্রীয়দলের হস্তেই পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে এবং কোনও ন্যায় অন্যায় করার দায়িত্বও আজকাল প্রতিনিধি নির্ব্বাচক জনসাধারণ অথবা রাজশক্তিধারী রাষ্ট্রীয়দলের সভ্যবৃন্দের উপরেই ন্যস্ত হয়। এখন এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদিগের স্বভাবতই মনে হয় যে, জনসাধারণ, রাষ্ট্রীয়দল অথবা রাষ্ট্র-পরিচালক পার্লামেন্ট বা বিধানসভাগুলি সকল অন্যায়ের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। রাজশক্তি যেখানে যেভাবেই রক্ষিত বা প্রকাশিত হয় তাহার সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায়ের কথা উঠিতে পারে না, এইরূপ নীতি প্রবর্ত্তন করিলে সেই নীতি মানিয়া চলিতে সকলকে বাধ্য করা হইলেও তাহার সত্যতাতে কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। ব্যক্তি যেরূপ অন্যায় করিতে পারে, পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে, ব্যক্তিসংঘ, রাষ্ট্রীয়দল অথবা সমগ্র-জাতিও সেইভাবেই অধর্ম্মের কবলে পড়িয়া অন্যায় এমন কি অমানুষিকতাতেও নিযুক্ত হইতে পারে। ইতিহাসে বহু বিরাট বিরাট রাষ্ট্র, দল অথবা আইনসভা বারবার প্রকটভাবে অন্যায় করিয়াছে দেখা গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, দলবদ্ধ ভাবে অন্যায় করিলে সে অন্যায় মানব সমাজ কখনও সমর্থনের চক্ষে দেখিতে পারে না। সুতরাং "আইনে আছে", "সরকারবাহাদুরের হুকুম" অথবা "ইহাই প্রচলিত রীতি" ইত্যাদি কথার উপর নির্ভর করিয়া কোনও কিছুর যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা চলিতে পারে না। ইহার ভিতর আর একটি কথাও আছে। জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিয়া কাজ হইতেছে বলিলেই যে সে অভিমত লওয়া হইতেছে একথা প্রমাণ হয় না। বহুক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের আমলাগণ ঐরূপ ভুল ধারণার আড়ালে নিজেদের যথেচ্ছাচারের অলঙ্ঘনীয় প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া জনসাধারণকে নিজেদের মানবীয় অধিকার উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। সাধারণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয়দলের শক্তি বলিয়া যাহা গ্রাহ্য হয়, বহুক্ষেত্রেই তাহা এক বা অল্প সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছু নহে।

আমাদিগের দেশে যেরূপ দেখা যায় যে, জনসাধারণ রাজকর দিবার সময় মিথ্যা ও অন্যায় আশ্রয় করিয়া রাজকর না দিবার চেষ্টা করে, সেই সঙ্গেই দেখা যায় যে, যাহারা রাজকর আদায় করে তাহারাও অন্যায় ও মিথ্যা ওজুহাত দেখাইয়া যাহার নিকট যাহা প্রাপ্য নহে তাহার নিকট হইতে জুলুম করিয়া তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ক্ষেত্রে অন্যায় ও অধর্ম্মের দ্বিবিধ স্বরূপ। একটি ব্যক্তির অন্যায়ের ছবি ও অপরটিতে দেখা যায় রাষ্ট্রের দ্বারা নিযুক্ত আমলাদিগের মিথ্যা জনউৎপীড়ন নীতির প্রকট অভিব্যক্তি। উপার্জ্জনের প্রকৃত পরিমাণ, ধনসম্পদের মূল্য বিচার, ব্যয় ও ক্ষতির প্রকৃত আকার প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমলাগণ যথেচ্ছাচার করিতে সদা উদ্যত থাকে। সুবিধামত পরিস্থিতি সৃষ্ট হইলে আবার তাহারাই উল্টা সুর গাহিয়া মিথ্যাটাকে বিপরীত পথে চালিত করিতে দ্বিধা করে না। রীতি নীতি ও আইন অনুসারে যাহা হয় তাহার বিপরীত সর্ব্বত্রই সর্ব্ব সময়ে হইয়া থাকে এবং তাহাতে যাহারা আহত অথবা উপকৃত হয় তাহারা প্রায় সকল সময়েই রাষ্ট্র বা জাতির অন্যায় ও অধর্ম্মের পথগামী নেতা ও আমলাদিগের বিকৃত কর্ম্ম পদ্ধতির জন্য ঐরূপ ভাবে লাভবান্ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতি ও শাসনরীতির পূর্ণ বিচার ও মূল্যায়ন আবশ্যক। ইহা না করিলে শুধু কথার আড়ালে নূতন নূতন অন্যায়, মিথ্যা, পক্ষপাতিত্ব ও শোষণের আয়োজন অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া সকল ন্যায় প্রচেষ্টা বিফল করিয়া দিবে। যে অন্যায় ও পাপ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সর্ব্ব প্রথমে তাহার সংস্কার প্রয়োজন। নূতন ন্যায়ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া পুরাতন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা হয় না। সে চিকিৎসা কঠিন হস্তে না করিলে চলিবে না।

একোত্তর-সপ্ততিবর্ষোত্তীর্ণ প্রবাসী

বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০১, এপ্রিল), এলাহাবাদের ২।১ সাউথ রোডের বাসাবাড়ী থেকে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন থেকে এই সত্তর বৎসরের বেশী প্রতি মাসে এর নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত আছে।

প্রবাসী প্রসঙ্গে

প্রথম সংখ্যাতেই লেখকরূপে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রভৃতি। প্রথম সংখ্যা এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে প্রকাশিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়া গেল, সেই সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে হইল।

শ্রীমতী শান্তা দেবী, রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের সমকালীন একটি পত্রিকা এলাহাবাদ থেকে 'প্রবাসী' নামে বের হয়; 'কায়স্থ পাঠশালা' নামক কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে এই পত্রিকাটি বের করেন। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন পত্রিকার জন্য লিখে পাঠান—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মির খুঁজিয়া' কবিতাটি। এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'প্রবাসী'র প্রথম সম্বন্ধ। ১৩১৩ সাল পর্যন্ত গভীর যোগ স্থাপিত হয়নি—কবি 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে তখন ব্যস্ত; তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছেন।

১৩১৪ সাল, ভাদ্র মাস থেকে 'প্রবাসী'তে কবির 'গোরা' উপন্যাস সুরু হ'ল (১৯০৭, আগষ্ট); তার পূর্বে বের হয় ছোট গল্প 'মাষ্টার মশায়'। রামানন্দবাবু কবিকে এক সময়ে তিন শ' টাকা দিয়ে বলেন, তাঁর সুবিধা হলে যেন একটা গল্প লিখে দেন। কবির মনে হ'ল যে, তিন শ' টাকার মত বড় একটা কিছু দেওয়া উচিত। তাই সুরু করলেন 'গোরা'। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত বত্রিশ মাস চলেছিল ধারাবাহিক এই উপন্যাস। ইতিপূর্বে এতবড় উপন্যাস কোন বাংলা পত্রিকায় বোধহয় বের হয় নি। 'জীবনস্মৃতি'র খসড়া নতুন ক'রে লিখে দিলেন প্রবাসীর জন্য; এ বইখানি ১৩১৮, ভাদ্র থেকে ১৩১৯, শ্রাবণ পর্যন্ত এক বৎসর চলে। 'অচলায়তন' পুরো নাটকটি ১৩১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়।

এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা—কবিতা, গান, ধর্মদেশনা, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হতে থাকল। 'প্রবাসী'র মধ্যে ১৩১৪ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনাবাজি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা, তাঁর পত্রাবলী, সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে অজস্র আলোচনা আছে—তার তালিকা যদি প্রস্তুত হয় তবে দেখা যাবে সাময়িক পত্রিকা কি পরিমাণে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের কাছে পরিচয় ক'রে দেবার সহায়তা করেছিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ
৩১ চৈত্র, ১৩৬৭

বর্তমান শতাব্দীর ভালো গল্প-লিখিয়েরা অধিকাংশই প্রবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। সেইজন্যে যদি কোনো একখানি পত্রিকাকে আধুনক বাংলা গল্পের বাহক বলতে হয় ত সে প্রবাসী।

শ্রীসুকুমার সেন
প্রবাসী ষষ্টবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

রামানন্দ প্রসঙ্গে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯৬ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে রামানন্দ দাসী পত্রিকার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। তার আগে রবীন্দ্রনাথের সাধনা উঠে গেছে। ১৮৯৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে (১৩০৪ পৌষ) রামানন্দের সম্পাদনায় 'প্রদীপ' প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "প্রথম যখন রামানন্দ-বাবু 'প্রদীপ' ও পরে 'প্রবাসী' বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র এমন দামী জিনিস যে বাংলা দেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয় নি।"

প্রদীপের প্রথম বৎসরে শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। তা পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদককে জানান: "আমি ইতিপূর্বেই প্রদীপের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা লইয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। উহার প্রত্যেক গল্প প্রবন্ধই সুপাঠ্য হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) প্রবন্ধটি সুগভীর চিন্তাপূর্ণ —পাঠ করিয়া যথার্থ উপকার পাইলাম বলিয়া ধারণা হয়। নগেন্দ্র (গুপ্ত) বাবুর গল্পটি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার অসামান্য ভাষা-নৈপুণ্য এবং প্রতিভা স্ফূর্তি পাইয়াছে। সর্বশুদ্ধ বলিতে পারি ...প্রদীপের মত এমন একখণ্ড বংলা সাময়িকপত্র ইতিপূর্বে আমার হস্তগত হয় নাই।"

প্রবাসীর সম্পর্কে অন্যত্র লিখেছেন:

"পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবি করলে বিনামূল্যেই পেতেন। সেকথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যানিকেতনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার-পাঁচটি বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয়নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না। উপার্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিক পত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।

"...অর্থই তো একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখা দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, সমস্তের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্ব-ভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভার-পীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময় বেশী মূল্যবান্। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়সঙ্গীহীন ছিলেন ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী-সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।"

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে ১৯২৭ খ্রীঃ ২ জুলাই একটি চিঠিতে লেখেন:

"জানি না কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুদের

সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস সেই অভাবটা হচ্ছে আমার হৃদ্যতা প্রকাশের প্রাচুর্যের অভাব। শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একলা ছিলুম, লোকসঙ্গ না পাওয়াতে লোকব্যবহারের শক্তি সম্ভবত আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে।......

"যখন বয়স হয়েছে, পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারি নি। এদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই চারজনের নাম মনে পড়চে।...

"প্রবাসীতে অগ্রগামী হয়ে আপনি যে পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন অন্য সকল কাগজ যখন তারই অনুবর্তন করে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন আমি সেজন্য অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছি।"

জগদীশচন্দ্র বসু

...তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।......

যে-শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্ত্বের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মনুষ্য ভয়ের অতীত হইত, যে-বীরধর্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা যেন তোমার লেখা দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেদের জন্যে বই লিখি, কিন্তু সে বই ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেবার ভারও নিজে নিতে হয়। শুধু এই নয়, ব্লক তৈরি করতে ছুটতে হয় ফিরিঙ্গীর কাছে। হাফ্‌টোন এবং থ্রী-কলার ব'লে, দুটো জিনিসই তখন ছাপাখানা থেকে অনেক দূরে অজ্ঞাতবাস করছে। সেই সময়ে রামানন্দবাবুর মাথায় খেয়াল উঠল সচিত্র প্রবাসী প্রকাশ করার। আমি তখন আছি এলাহাবাদ চার্চ রোডে জজসাহেবের বাংলায়, আর রামানন্দবাবু থাকেন ভরদ্বাজ আশ্রমের কাছাকাছি আর-একটা বাসায়—দুজনেই প্রবাসী আমরা। ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণিবাবু তখন নতুন ছাপাখানা শুরু করেছেন। একজন হিন্দুস্থানী চিত্রকর, সে ছবি আঁকে বই সাজাতে। বাংলার চিত্রকর সবাই ভবিষ্যৎ অবস্থায় তখন, কেবল সকাল হচ্ছে মাত্র। রামানন্দবাবুর দুঃসাহসে ভর করে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় লেখা দেবার আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা বার করার স্বপ্ন অনেকদিন এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশের বিষয়ে সন্দেহ নিয়েই আসত ভাবনাটা। তাই রামানন্দবাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলেম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষে না বিপদে পড়েন। সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমানভাবে চলে এল, নতুন নতুন আর্টিস্ট এল ছবি দিতে প্রবাসীতে। এ যে হল তার জন্যে দায়ী আমি নয়, রামানন্দবাবু। নতুন বাংলার আর্টিষ্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আলবমে, তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে পরে পরে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে; আর আমরা আর্টিষ্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপ্‌ত ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দবাবু।...তাদের সবার হয়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর আমার নিজের দিক থেকে বলছি শোভন কীর্তি তোমার হউক।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০। প্রবাসীর ২৫ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে।

নন্দলাল বসু

শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ কবে হ'ল আমার ঠিক স্মরণ নেই, তবে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। আমার ছাত্রাবস্থায় গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করি। সেই সময় থেকেই তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন। বাংলা ১৩২৭ সালে কিছুদিনের জন্যে তাঁর কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবীর চিত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন: সেই বোধহয় আমি প্রথম শিক্ষকতা আরম্ভ করি। তারপর তাঁর সম্পাদিত রামায়ণের জন্যে প্রায় ২০।২২খানি ছবি আমাকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন, যা করে আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছিলাম।

আমাদের বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের মূলে তাঁর উৎসাহ ও সাহায্য যে কতখানি শক্তিসঞ্চার করেছিল, তা আজকে বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পারি। মডার্ণ রিভিউ, প্রবাসী ও চ্যাটার্জির পিক্‌চার এ্যাল্‌বাম্‌স্‌-এর মাধ্যমে সেই যুগে আমাদের চিত্রকলার সর্বাপেক্ষা প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

আজকের এই ভারতীয় চিত্রকলার উচ্চমান ও প্রতিষ্ঠার মূলে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু একজন প্রধান দরদী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

প্রবাসী ষাট্‌বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।

মনীষী রামানন্দ ও প্রবাসী প্রসঙ্গে

...আমার মতো অনেকেরই স্কুল-কলেজের শিক্ষার অনুপূরকতা করেছে তাঁর প্রবাসী। প্রবাসীর পাঠশালাতেই কবিগুরুর অজস্র রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই পাঠশালাতেই আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মহেশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজদাস দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিহর শেঠ, জগদানন্দ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, জগদীশচন্দ্র ইত্যাদি বহু জ্ঞানগুরুগণের বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা পাঠ করে উপকৃত হয়েছি। সর্বোপরি প্রতিমাসে রামানন্দবাবুর লিখিত বিবিধ প্রসঙ্গগুলি পাঠ করে প্রবন্ধ রচনার অনুশীলনে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেছি।

আজকালকার অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির রচিত প্রবন্ধাদি পড়তে গেলে উদ্‌ঘাতী পথে অনায়াসে আগাতে পারি না—তখন রামানন্দবাবুর গদ্যভাষাশৈলীর কথা মনে পড়ে। সেরূপ সুখপাঠ্য গদ্যভাষা এ যুগে বিরল।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধসাহিত্য রচনা করেছেন—তাঁর অননুকরণীয় ভাষাসাহিত্যেরই নিজস্ব ভাষা। সাহিত্যেতর বিষয়ের জন্য যে গদ্যভাষা লিখতেন রামানন্দবাবু, তাই ছিল আমাদের অনুকরণীয়। এ ভাষা ছিল নিরাবেগ, অনলংকৃত, বক্রোক্তিবর্জিত, যুক্তিপরম্পরায় প্রবাহিত স্বচ্ছ সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। নিরাভরণ সত্যকে সুস্পষ্ট করে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ঘোষণা করবার জন্য প্রয়োজন ছিল এ ভাষার। এ ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য সাহিত্যেতর বিষয়ের আলোচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' কেবল ভাষার দিক থেকে নয়, চিন্তাশীলতা ও তথ্যবিশেষের বিচার বিশ্লেষণের দিক হতেও স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। প্রবাসী তাই বহুদিন ধরে দেশের গতানুগতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা-পরিবেশনে পরিপূরকতার কাজ করেছে।...

প্রবাসী দেশসেবা ও জনগণের সেবা করেছে,—পাঠকদের চিত্তে দেশাত্মবোধের উদ্দীপন ক'রে, জনমত গঠন ক'রে অবিচার, অত্যাচার ও অসত্যের সহিত সংগ্রাম ক'রে, সরকারী দরবারে লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগণের ন্যায্য দাবি ও অভাব অভিযোগ পেশ ক'রে।

দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব প্রচার ক'রে প্রবাসী স্বদেশের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার উদ্বোধন করেছে।

কেবল বিবিধ জ্ঞান শাখার দিকে নয়, স্বদেশের প্রাচীন ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি শিল্পসৃষ্টির গৌরবের দিকে প্রবাসী দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

দেশের শিক্ষা-বিস্তারে, সাহিত্য-সেবায়, সমাজ-সংস্কারে, কুসংস্কার-দমনে, রুচি-সংস্কারে প্রবাসীর অবদান অসামান্য।

প্রায় ৪০ বৎসর ধরে জনগণের পরিচয় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনার সঙ্গে প্রবাসীর মারফৎ। রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোরা আড়াই বছর ধরে প্রবাসীর পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে। ষাট বছর ধরে শত শত সাহিত্যব্রতী প্রবাসীকে আশ্রয় করে সারস্বত সাধনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবাসীর দান অসাধারণ।

প্রবাসী কখনও আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য জনসাধারণের রুচির দাসত্ব করেনি, তাদের রুচিকে মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও শুচিতায় সমুন্নত করবারই চেষ্টা করেছে। স্বার্থের প্রয়োজনে কখনও তার স্বকীয় মর্যাদা ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেনি। মনস্বী রামানন্দ ছিলেন আদর্শ সম্পাদক। লেখকদের প্রেরিত রচনাবলীর স্তূপ থেকে কয়েকটি নির্বাচন করে ছাপতে দেওয়ার নাম সম্পাদনা নয়, সম্পাদনাও একটা আর্ট, সম্পাদনাও একটা নতুন সৃষ্টি। সম্পাদকের কর্তব্য ও দায়িত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ, শ্রমসাপেক্ষ, জ্ঞাননির্ভর তা আদর্শ সম্পাদনায় রামানন্দবাবু দেখিয়ে গিয়েছেন। পুরাতন প্রবাসী থেকে তরুণ সম্পাদকদের অনেক কিছু শেখবার আছে।...

রামানন্দবাবু ছিলেন সত্যের নির্ভীক পূজারী, অসত্যের সঙ্গে তিনি সন্ধি করে চলতে পারতেন না। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ, সর্ব সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন পথ প্রদর্শক, তিনি ছিলেন গতানুগতিকতার বিরোধী, স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তক, তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা। শৃঙ্খলানিষ্ঠতা ও নিয়মানুবর্তিতায় তিনি ছিলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র ও রাজশেখর বসুর সগোত্র।

অধ্যাপকদের চেয়ে তাঁর কাছেই আমার ঢের বেশি শিক্ষা লাভ হয়েছে। তাঁর নাম উচ্চারিত হলে আজও তাঁর উদ্দেশে মস্তক স্বতই অবনত হয়ে পড়ে।...

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর
(কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২)

...শুধু লেখক নয়, পাঠকও সৃষ্টি করেছেন রামানন্দ। —আজকাল যেমন শুনি পাঠকরা নাকি সিনেমা স্টারদের ছবিছাড়া পত্রিকা কেনে না,—উদ্ভট ও অশ্লীল গল্প পড়তে চায় তবেই বই বেশী প্রচার হয়। তাই সেগুলির চাষের ফলাও কারবার ছাড়া পত্রিকার উপায় নেই। নিজের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি এমন অবজ্ঞা ও এমন দায়িত্বহীনতা সে যুগে কোনো সম্পাদকই হয়ত করতেন না। বিশেষকরে 'প্রবাসী'র পাঠকগোষ্ঠী যাঁরা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পড়বার জন্যে তেমনি আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন যেমন আগ্রহে হয়ত আজকের পাঠক ইট্‌মার্কা উপন্যাসের জন্য বসে থাকেন। সত্য বলতে কি প্রবাসীর পাঠকদের নিয়ে একটি সংবেদনশীল, উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন, সুরুচি ও রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের জীবনে এত দীর্ঘদিন ধরে সুসংস্কৃত পাঠক মন গড়ে তোলার কাজ আর কোনো সম্পাদক করেছেন কি না সন্দেহ।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
জাতীয় জাগরণে রামানন্দর দান।

পুরাতন বিবিধ প্রসঙ্গ সঙ্কলন

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শ

নানা জনের রাষ্ট্রীয় আদর্শ নানাবিধ। স্বাধীনতার অর্থও সকলে এক রকম বুঝেন না। আমরা যখন বালক ছিলাম তখন আমাদের একজন সঙ্গী বলিয়াছিল, "দেশটা স্বাধীন হইলে বেশ হয়, তাহা হইলে আমার যাহা দরকার সবই পাই, কাহাকেও টেক্স দিতে হয় না।" স্বাধীন দেশের লোককে ট্যাক্স দিতে হয় না, এরূপ ধারণা কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের আছে কি না, জানি না; কিন্তু স্বাধীনতার মানে যে অনেকে নিজের ইচ্ছামত ও সুবিধা মত আচরণ বুঝে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যাহারা স্বাধীন তাহাদিগকেও নানা রকমের নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করিতে হয়। অনেক সময় পরাধীন লোকদের চেয়ে স্বাধীন লোকদের অর্থব্যয় এবং যুদ্ধে প্রাণসংশয় ও প্রাণহানি বেশী হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র দেড় কোটি টাকা দিতে হইয়াছে। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ সুইসের মতে ইংলণ্ডকে প্রত্যহ দেড় কোটি, জার্ম্মানী ও রুশিয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ ৪৷৷০ কোটি, ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ তিন কোটি টাকা করিয়া খরচ করিতে হইতেছে। অষ্ট্রীয়া, রুশিয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে যত সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছে, ভারতবর্ষকে তত পাঠাইতে হয় নাই। অবশ্য যাহারা স্বাধীনতার সুখ ও অধিকার ভোগ করে, যুদ্ধের সময় তাহারা উৎসাহের সহিত তাহার মূল্য দিতেও প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় অবস্থা কিরূপ হইবে, উহার মধ্যে স্বাধীনতা কতটুকু থাকিবে, কেহ বলিতে পারে না। স্বদেশী রাজার অধীন হইলেই যে দেশের লোক বাস্তবিক স্বাধীনতা ভোগ করিবেই, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী রাজা খুব প্রজাপীড়ক হইতে পারে। আবার এমনও হয় যে, বিদেশী রাজার অধীন কোন কোন দেশের লোকের এরূপ কিছু অধিকার থাকিতে পারে যাহা স্বদেশী রাজার অধীন, কোন কোন দেশের লোকদের নাই। অতএব "স্বাধীন" বা "পরাধীন" কথা-দুটির দ্বারা বিচার না করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তজ্জন্য আমরা "স্বাধীন" বা "পরাধীন" কোন কথাই ব্যবহার না করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা খুব সংক্ষেপে বলিতে চাই।

মানুষের প্রত্যেকের শক্তির বিকাশ, আনন্দ, সুবিধা ও উন্নতির জন্য যেরূপ সুযোগ পাওয়া দরকার এবং যাহা কিছু করা দরকার, তৎসম্বন্ধে কোন কোন দেশের লোকের নিজেদের যতটা হাত আছে অন্য কোন কোন দেশের লোকদের ততটা নাই। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে, ভারতের ভবিষ্যৎ অধিবাসীরা যে কোন দেশের লোকের সমান সুস্থ এবং দৈহিক ও আত্মিক শক্তিশালী হইবে, তাহাদের জীবন যে কোন দেশের লোকের জীবনের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইবে, তাহাদের নিজের উন্নতির জন্য তাহারা যাহা আবশ্যক মনে করিবে তাহা করিবার অধিকার ও যোগ্যতা তাহাদের থাকিবে, এবং মানুষের পক্ষে নিজের ভাগ্যবিধাতা যতটা হওয়া সম্ভব তাহা তাহারা হইবে। ভারতের অধিবাসী বলিতে আমরা জাতি, বংশ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতজাত

ও ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা সমুদয় নারী ও পুরুষকে বুঝি। ভবিষ্যৎ ভারতে আমরা কোন একটি শ্রেণীর পুরুষ বা নারীর প্রভুত্ব দেখিতে চাই না, কিম্বা নারীর উপর পুরুষের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব দেখিতে চাই না।

ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ। ইহা অপেক্ষা খাট কোন অবস্থাকে আমরা আদর্শ বলিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা খাট কোন জিনিষের চিন্তায় আমাদের আত্মা আনন্দ পায় না।

ইহা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে আসে। এবং আমরা এই যে মুহূর্তে লিখিতেছি, তাহার পর মুহূর্তই ভবিষ্যৎ, এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহাও আবার অতীতে মিলাইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবে কি না, এবং কখন হইবে, তাহা কেবল ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের উপর নির্ভর করিতেছে না। এখন যাহারা বাঁচিয়া আছেন, বিশেষ করিয়া এখনও যাঁহাদের সম্মুখে দীর্ঘ জীবনপথ পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের উপরও ইহা নির্ভর করে এবং তাঁহারাও ইহার জন্য দায়ী। স্বপ্ন দেখার নিন্দা আমরা করি না। স্বপ্ন দেখার আবশ্যক আছে। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবমূর্তি দিতে হইলে প্রজ্ঞা, একাগ্রতা, ত্যাগ ও কঠোর শ্রমের প্রয়োজন। ভাগ্যবান্ তাহারা যাহারা এই প্রয়োজন স্বীকার করে, এবং তদনুরূপ আচরণ করে।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩২১।

শিক্ষার একটি প্রধান কথা

আমাদের দেশে পুস্তক পাঠ ও মুখস্থ করা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু তাহা উচিত নয়। পুস্তকে যে পূর্বলব্ধ জ্ঞান সঞ্চিত আছে তাহা অল্প আয়াসে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া লইলেই শিক্ষা হয় না। তাহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ পুস্তকে যাহা লেখা আছে, তাহা নির্ভুল নহে। বিদ্যার প্রত্যেক শাখায় নূতন সত্যের ও তথ্যের আবিষ্কারে দেখা যাইতেছে, পুস্তকে লিখিত অনেক কথার মধ্যে ভ্রম আছে। অতএব পুস্তকে যাহা আছে, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। পরীক্ষা যে উপায়ে করিতে হইবে, তাহার দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

জ্ঞান দুরকমের, বহির্জগতের জ্ঞান এবং মানুষের অন্তর্জগতের জ্ঞান। বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে বহির্জগতের সমুদয় ঘটনা ও ব্যাপারের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষণ (experiment) দ্বারা ইহা করিতে হইবে। যদি পুস্তকে লেখা থাকে, যে, এই এই যন্ত্রের সাহায্যে এই এই কাজ করিলে বিনা তারে সংবাদ পাঠান যায়, তাহা হইলে উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে না। যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, অন্ততঃ পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া, এবং সমস্ত প্রক্রিয়া পুস্তক লিখিত বর্ণনার অনুযায়ী করিয়া, দেখিতে হইবে যে, সত্য-সত্যই বিনা তারে সংবাদ পাঠান গেল কি না। যদি এইরূপ পরীক্ষণ (experiment) সফল হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, পুস্তকে যাহা লেখা আছে তাহা ঠিক। যদি সংবাদ না যায়, তাহা হইলে পরীক্ষণ সফল হইল না কেন, তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। পুস্তকে যদি লেখা থাকে যে, ৩রা শ্রাবণ মধ্যাহ্ন ১টা ১২ মিনিটের সময় সূর্য্যগ্রহণ হইবে, তাহা হইলে তাহা মানিয়া লইয়া মুখস্থ করিয়া রাখিলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে না। নির্ভুল ঘড়ির সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে পুস্তকে উল্লিখিত সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইল কি না। হইলে পুস্তক নির্ভুল বুঝিতে হইবে। না হইলে ভ্রম কোথায়, এবং কিরূপে হইল খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইতিহাসে যদি লেখা থাকে যে, কোন এক স্থানের প্রস্তরস্তম্ভে সম্রাট্ অশোক কতকগুলি অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে সেইগুলি মুখস্থ করিলেই ঠিক ঐতিহাসিক জ্ঞান হইবে না। কতকটা জ্ঞান হইবে যদি সেই অনুশাসন-গুলির প্রতিলিপি সম্মুখে রাখিয়া যে প্রাচীন লিপিতে উহা লিখিত তাহা পড়িতে পারি। এবং যে প্রাচীন ভাষায় উহা রচিত তাহা বুঝিতে পারি। সম্পূর্ণ জ্ঞান

হইবে যদি বরং সেই তত্ত্বের নিকট গিয়া অনুশাসনের প্রতিলিপি লইয়া তাহা পড়িতে ও বুঝিতে পারি। সকল বিষয়েই জ্ঞানের মূল উপাদান ও উৎসের নিকট পৌঁছিলে তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। মানুষের অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে নানা দর্শনশাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যাদি হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায় না। যিনি নিজের আত্মার মধ্যে, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে পুস্তকনিবদ্ধ জ্ঞানের সাক্ষ্য পান, পুস্তকে যাহা আছে, নিজের মনে তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পান, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। যদি কেহ দেখেন যে, পুস্তকের কথায় তাঁহার আত্মা সায় দিতেছে না, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধান্তকরণে চিন্তা দ্বারা, অপরের সহিত আলোচনা দ্বারা প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, উভয় সম্বন্ধেই জ্ঞান যথাসম্ভব সাক্ষাৎভাবে পরীক্ষিত ও লব্ধ হইলে তবে তাহা প্রকৃত জ্ঞান হয়।

পুস্তকস্থ পুরাতন সঞ্চিত জ্ঞান পরীক্ষা করিবার উপায় যাহা, নূতন জ্ঞান লাভের পথও তাহাই। বহির্জগৎ সম্বন্ধে নিত্য নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে; অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও দার্শনিক, ধর্মাচার্য্য ও কবিরা নূতন কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক উভয় জগৎ সম্বন্ধে যাহা জানা যাইতে পারে তাহার অতি অল্প অংশই এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। জ্ঞানের প্রস্রবণ অফুরন্ত। পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনা আদি দ্বারা নূতন জ্ঞান লাভের শক্তি জন্মান, শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যে শিক্ষাপ্রণালী মানুষকে চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনা করিতে, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করিতে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সমর্থ না করিয়া বরং অসমর্থই করিয়া ফেলে তাহা শিক্ষা নামের অযোগ্য।

যে ব্যক্তি কার্য্যতঃ মানিয়া লইয়াছে যে, যাহা কিছু জানিবার তাহা জানা হইয়া গিয়াছে এবং তাহা পুস্তকে লেখা আছে, তাহার কোনপ্রকার প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না; সে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট তোতাপাখী হইতে পারে। যে অন্তর্জগৎকে ও বহির্জগৎকে বিস্ময় ও কৌতূহলের চক্ষে দেখে, তাহারই শিক্ষা হইতে পারে।

শিশু অফুরন্ত কৌতূহল লইয়া জন্মগ্রহণ করে; জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে তাহার বিস্ময় ও কৌতূহলের আর অবধি থাকে না। এইজন্যই ত সে সব জিনিসই ছুঁইতে, ভাঙ্গিতে, চাখিতে, নাড়িতে চায়। এইজন্যই ত সে কথা বলিতে শিখিবার পর বাপমাকে ও অপর সকলকে প্রশ্ন করিয়া হায়রান করিয়া তুলে। শিশুর এই কৌতূহল যে-মানুষের আমরণ থাকে, সে-ই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি। যে তথাকথিত শিক্ষা কৌতূহল বিনষ্ট করিয়া দেয়, তাহা শিক্ষা নামের অযোগ্য। তাহা অতি অনিষ্টকর।

বিস্ময় ও কৌতূহল শিক্ষার গোড়া। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষকে চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বার প্রয়োগ করিতে হয়। হাত নিপুণভাবে চালাইতে হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যস্থ বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হয়।

কিন্তু শুধু হাতের নৈপুণ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সুপ্রয়োগ, বুদ্ধির চালনা, ইহা হইলেই শিক্ষা হয় না। কারণ, মানুষকে অন্যে শিক্ষা দেয় এবং সে নিজে নিজেই শিক্ষিত হয় এইজন্য, যে, সে অন্য মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এরূপভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে, যাহাতে তাহার নিজের মঙ্গল ও আনন্দ হয় এবং অন্য সব মানুষেরও মঙ্গল ও আনন্দ হয়। এরূপ জীবন যাপন শুধু জ্ঞান, বুদ্ধির উৎকর্ষ, এবং কর্মেন্দ্রিয় ও পর্য্যবেক্ষণেন্দ্রিয়ের দক্ষতা ও কার্য্যকারিতার উপর নির্ভর করে না। মানুষ যদি সংযত, প্রেমিক, অন্যের হিতৈষী, সহিষ্ণু, স্বার্থত্যাগী ও বিবেচক না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নিজের এবং অপরের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। জগতের আনন্দ বর্দ্ধনও তাহার দ্বারা হয় না। এইজন্য বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনও

অবশ্য-প্রয়োজনীয়। যেমন জ্ঞান চাই, নৈপুণ্য চাই, তেমনি অথবা তার চেয়েও বেশী চাই চরিত্র। বাস্তবিক, জ্ঞান ও নৈপুণ্য লাভ চরিত্রের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ জ্ঞান ও দক্ষতালাভ শ্রমসাপেক্ষ ও তপস্যাসাপেক্ষ; কিন্তু সংযত, একাগ্র, অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রম ও তপস্যা সম্ভব নহে; এবং সংযম, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, ও নিষ্ঠা সাধু চরিত্রের অঙ্গ।

এইসব কারণে আগে যখন ইংরেজীতে বলা হইত যে তিনটি "আর" (The three Rs) হইলেই প্রাথমিক শিক্ষা হয়, যথা রীডিং, রাইটিং, ও রিথম্যাটিক (reading, writing, aud [A] rithmetic) তেমনি কেহ কেহ বলিতেছেন, যে, তিনটি "এইচে" (The three H's) শিক্ষা হয়,—যথা, হ্যাণ্ড, হেড্ ও হার্ট (Hand Head and Heart), অর্থাৎ হাতের সুপ্রয়োগ, বুদ্ধির সুপরিচালনা, এবং হৃদয়ের উৎকর্ষ, এই তিনে মানুষের সুশিক্ষা হয়। তিনটি "আরে" শিক্ষা হয়, বলা অপেক্ষা, "এইচে" শিক্ষা হয়, বলা অধিকতর সত্য, — যদিও ইহাতেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য পূর্ণতর ভাবে বলিতে উপরে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের দেশে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার নানা দোষ ও ত্রুটি আছে। আগের আলোচনা হইতে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। হাতের নৈপুণ্য আমাদের খুব কমই হয়। নানা রকম জিনিস গড়িতে, নানা রকমের প্রতিকৃতি নক্সা ও ছবি আঁকিতে এবং সুন্দররূপে লিখিতে আমাদের শিখা উচিত। কিন্তু পূর্বোক্ত দু'রকম শিক্ষাও অল্প লোকেরই হয়। অধিকন্তু আগে বালকবালিকাদের হাতের লেখা যেরূপ ভাল করিবার জন্য চেষ্টা করা হইত, এখন তাহা হয় না বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধির ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাও হয় না। কেবল মাত্র স্মৃতিশক্তির চালনা যথেষ্ট অপেক্ষা বেশী পরিমাণে হয়।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৬।

জাতীয় উন্নতি ও ব্যক্তিগত চরিত্র

জাতির মানে যখন ব্যক্তির সমষ্টি, তখন জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও উন্নত না হইলে যে জাতীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও উন্নত হইতে পারে না, সুতরাং জাতীয় উন্নতিও হইতে পারে না,—ইহা এত সহজ কথা যে, বেশী যুক্তিতর্ক দ্বারা ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন বোধ হয় না। অথচ এই কথাটা আমরা অনেকে অনেক সময় ভুলিয়া থাকি। এইজন্য চরিত্রবান্ গান্ধী যে বারম্বার বলিতেছেন,যে,আমাদের আত্মশুদ্ধি (self purification) দরকার, এই উক্তির গুরুত্ব ও পূর্ণ অর্থ অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয় না। মানুষকে অহামকা ছাড়িয়া নম্র হইতে হইবে, বাক্যে আচরণে চিন্তায় অসংযম ত্যাগ করিয়া সংযত হইতে হইবে, ক্রোধের পরিবর্তে অক্রোধ ও মৈত্রীকে, প্রতিহিংসার পরিবর্তে প্রীতিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, প্রবৃত্তিনিচয়কে বশে রাখিয়া তৎসমুদয়কে নিরোধ বা বিধাতানির্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। মিথ্যার পরিবর্তে সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং নিজের স্বার্থ ও প্রেয়ের পরিবর্তে নিজের ও অন্যসকলের কল্যাণের জন্য শ্রেয়কেই লভ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে—নানা দেশের জাতির ও যুগের ধর্মোপদেষ্টারা ইহা বলিয়াছেন। আত্মশুদ্ধির ইহাই পথ।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন লিখিয়াছিলেন, "ইন্দ্রিয়ের দাস যে-বা বারমাস, স্বদেশ-উদ্ধার তার কার্য নয়," তখন তিনি যুবাপুরুষ, আমরা তখন শিশু। অতীত যুগের সাধুদের মত আধুনিক সময়ের অন্য ধর্মাত্মারাও চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। আয়ারল্যাণ্ডের দেশভক্ত ম্যাকসুইনী কারারুদ্ধ হইয়া প্রায়োপবেশন করেন, হয় মুক্তি নয় উপবাস এই প্রতিজ্ঞা করেন। চুয়াত্তর দিন উপবাসের পর তাঁহার নির্মল আত্মা দেহ কারাগার ও ইংরেজের কারাগার উভয়ই ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করে। এই পুণ্যাত্মার 'স্বাধীনতার মূলমন্ত্র' (Principles of Freedom) নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে :—

One cannot be an honest man in one—sphere and a rascal in another and since a citizen to fulfil his duty to his country must be honourable and zealous he must develop the underlying virtues in private life. He must strengthen the individual character, and to do this he must deal with many things seemingly remote and inconrsequential from a national point of yiew.

অর্থাৎ, কেহ এক ক্ষেত্রে সাধু ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত হইতে পারে না ; এবং দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য দেশবাসীকে যখন সাধু ও আগ্রহী হইতে হয়, তখন তার আনুষঙ্গিক সমস্ত গুণ ও ধর্ম তার ব্যক্তিগত জীবনেও অর্জন করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়। তাকে তার ব্যক্তিগত চরিত্র বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে, এবং এর জন্য দেশের কাজের দিক্ হইতে দূরগত ও অসংলগ্ন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অনেক জিনিসের সাধনা তাহাকে করিতে হইবে।

জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে, কার্যো, প্রচেষ্টায় যাঁহারা প্রধান বা অপ্রধান নেতৃত্ব করেন বা অন্যকে কোন কার্য্য করিবার জন্য মনোনীত করেন, তাঁহাদের এইসব কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, আমাদের দেশেও, আজকাল নারীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সার্ব্বজনিক কার্য্যক্ষেত্রে (in the fild of public activities) অবতীর্ণ হইতেছেন। সার্ব্বজনিক কর্মীদের (public workerদের) চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ইহা একটি অতিরিক্ত কারণ ;—বিশেষতঃ সেই সকল অনুষ্ঠানে যাহা নারীর কল্যাণের জন্য অভিপ্রেত।

পার্নেলের মত, ডিল্কের, মত আদালতে দোষ প্রমাণ হইয়া গেলে তবে দোষটা ধর্ত্তব্য, নতুবা নয়, ইহা মনে করা উচিত নয়। কাহারো নিন্দা কুৎসা প্রচার করা অকর্ত্তব্য কিন্তু যেখানেই মনোনয়ন বা নির্ব্বাচন প্রয়োজন হইবে, সেখানেই প্রত্যেক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিলেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। চরিত্রদোষ এক রকম নয়। পানদোষ বা অন্যবিধ নেশার অধীনতাও চরিত্রদোষ। আর্থিক দায়িত্ব সম্বন্ধে যাহাদের কর্ত্তব্যবোধ কম বলিয়া আদালতে প্রমাণ হইয়াছে সার্ব্বজনিক অনুষ্ঠানে এরূপ কর্মীরও কোনপ্রকার প্রাধান্য অবাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

আমেরিকায় প্রাচ্যের অপমান

কানাডা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত। ঐ দেশের ভ্যাঙ্কুবর শহর ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ও কানাডার সীমান্তে অবস্থিত। কানাডা হইতে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌সে প্রবেশ করিতে হইলে ভ্যাঙ্কুবর একটি প্রবেশ দ্বার। সেখানে সব প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা হয়। এশিয়ার কোন জাতির লোককে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে পৌরঅধিকার-বিশিষ্ট স্থায়ী বাসিন্দা হইবার জন্য ঢুকিতে দেওয়া হয় না। ইউরোপীয় জাতি সকলের লোকদের ঢুকিবার ও পৌর অধিকার পাইবার বাধা নাই। কিন্তু কোন্ ইউরোপীয় দেশের কত জন মানুষকে প্রতি বৎসর ঢুকিতে দেওয়া হইবে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমেরিকায় ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ আমেরিকা মহাদেশের সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও ধনী দেশ বলিয়া তাহাকেই সংক্ষেপে আমেরিকা বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ কানাডায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানেও এশিয়াবাসীদের প্রবেশের ও পৌর অধিকার লাভের বাধা আছে। কিন্তু কবি সেখানে কোন রূঢ় ব্যবহার পান নাই। কানাডার কাজ সারিয়া ভ্যাঙ্কুবরের পথে তিনি যখন আমেরিকা প্রবেশ করিতে যান, তখন সেই শহরের যাত্রী পরীক্ষা-গৃহে-ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ও রূঢ় ব্যবহার করে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।

কবি ইহাকে প্রাচ্যের প্রতি আমেরিকার দুর্ব্ব্যবহার মনে করিয়াছেন। ইহা যে এশিয়ার অপমান তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উপলক্ষ্যে কোন কোন খবরের কাগজ কবিকে নানা উপদেশ দিয়াছেন। কোন কোন উপদেশ হইতে মনে হয়, কাহারও এইরূপ ধারণা আছে, যে, ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়াই ভারতবর্ষের লোককে এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হয়। এই ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। সম্পূর্ণ সত্য নহে বলিতেছি এইজন্য, যে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের লোকদিগকেও স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পৌর অধিকার লাভের জন্য আমেরিকায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না। স্বাধীন, পরাধীন, এশিয়ার সব দেশের লোকের সম্বন্ধেই এক নিয়ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে যে-প্রকার অপমান করা হইয়াছে, জাপানের কোন বিখ্যাত লোককে ত সেরূপ অপমান করা হয় না? কখনও হইয়াছে কি না মনে পড়িতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষেরও সব বিখ্যাত লোক আমেরিকান যাত্রী পরীক্ষক কর্ম্মচারীর দ্বারা অপমানিত হন নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পূর্ব্বে যখন যখন আমেরিকা গিয়াছিলেন তখন অপমানিত হন নাই; সম্প্রতি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমেরিকা প্রবেশের সময় অপমানিত হন নাই।

প্রকৃত কথা এই, যে, এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যে আইনটা আছে, তাহাই চূড়ান্ত অপমানকর; ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার হইলে তাহাতে অপমান বিশেষ কিছু বাড়ে না। শিষ্ট ব্যবহার হইলেও বিশেষ কিছু কমে না। এই অপমান সমুদয় এশিয়ার, শুধু ভারতবর্ষের নহে।

অনেকে বলিতেছেন, আমেরিকা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, আমেরিকানদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার আমাদের আছে এবং তাহা করা উচিত। অপমানের প্রতিশোধ-স্বরূপ অপমান করা ক্রুদ্ধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য কি না এবং সুবিবেচনার কাজ হইবে কি না, ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে কিছু পৌরুষের অভিনয় না করা ভাল। কারণ কর্ত্তব্য যাহাই হউক, তাহা করিবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই, স্বরাজ লব্ধ হইলে ক্ষমতা জন্মিবে। তখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কেন প্রাচ্যের সম্বন্ধে আমেরিকার অপমানকর ব্যবস্থার প্রতিশোধ স্বরূপ আমেরিকার সম্বন্ধে নিজের দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা করে নাই। এখন স্বরাজ লাভের চেষ্টাই রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত। স্বরাজ পাইবার পরেও প্রতিশোধ নীতি অবলম্বন অপেক্ষা চরিত্রে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে সুমহৎ হওয়া দ্বারা প্রাচ্য অধিক ফল পাইবেন।

রাগের মাথায় সমগ্র আমেরিকান জাতিকে গালাগালি দেওয়াও ত ঠিক নহে। স্বাধীন দেশেও তথাকার গবর্ণমেণ্ট ও তথাকার অধিবাসীবর্গ সমার্থক নহে। অনেক স্থলেই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক দেশে সকলের চেয়ে স্বার্থপর, এবং দুর্ব্বল বিদেশী জাতিদিগকে সকলের চেয়ে শোষণেচ্ছু ও লুণ্ঠনেচ্ছু লোকেরাই রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী ও পরিচালক হয়। আমেরিকার লোকদের মধ্যে যাহারা প্রাচ্যের অপমানের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারা সংখ্যায় বেশী হইতে পারে; কিন্তু তাহারা আমেরিকার সব অধিবাসী নয়, শ্রেষ্ঠ অধিবাসীও নহে। আমেরিকার এমন লোক বিস্তর আছেন, যাঁহারা সকল দেশের সকল জাতির প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানকর আইন রদ করিতে চেষ্টিত আছেন।

আমেরিকার লোকদের এই শ্রেষ্ঠ অংশের অনেকে রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোন কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন, খ্যাতি বা সম্মানের জন্য নহে। তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান ইউরোপের নানা দেশে এবং চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি স্বাধীন প্রাচ্য দেশে যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে।

যে-দেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাচ্য অপমানিত সে দেশেরও কতক লোক প্রাচ্য কোন কোন মনীষীর কথা

শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা অকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যে সব আমেরিকান প্রাচ্যের উপদেষ্টাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের আগে হইতে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে উপদেষ্টাদিগের কোন প্রকার অসুবিধা ও অপমান না হয়। রবীন্দ্রনাথকে এবার যাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ বন্দোবস্ত না করায় অপরাধী হইয়াছেন।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৬।

হিজলী জেলের খবর

হিজলী জেলে রাজনৈতিক কয়েদীরা কিরূপ ব্যবহার পায় সম্প্রতি সে-বিষয়ে খবরের কাগজে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। সেদিনকার অ্যালবার্ট হলের সভাতেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। এগুলি সমস্ত ভুক্তভোগী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা। তাই বলিয়া আমরা গবর্ণমেণ্টকে এগুলি বিনা তদন্তে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বলিতেছি না। কয়েদীদের থাকিবার সাধারণ ঘর, নির্জন কারাকক্ষ, পরিধেয়, স্নানের ব্যবস্থা, খাদ্য, রোগে চিকিৎসা ও ঔষধ, হাসপাতালগৃহ প্রভৃতি সকল বন্দবস্তেরই দোষ দেখান হইয়াছে ও বলা হইয়াছে, যে, বন্দবস্তগুলি জেল-বিধির বিপরীত—জেল-বিধি অনেক ভাল। গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন, যাহা লেখা ও বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাহা বলিবেন, তাহা তো স্থানীয় কর্ম্মচারীদের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে বলিবেন। তাহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে না। কেননা আগে এই হিজলীতেই রাজনৈতিক বন্দীদের উপর গুলি চালান উপলক্ষ্যে যে সরকারী তদন্ত হয় তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল, যে, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে অপ্রকৃত কথা বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা বলি, নিজের সুখ্যাতি ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্তই প্রকাশ্য তদন্ত করান গবর্ণমেণ্টের উচিত। এরূপ প্রকাশ্য তদন্তে যদি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত এবং উক্ত সভায় বিবৃত সব বৃত্তান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়, ভালই।

তবে এমনও হইতে পারে যে, এই সব বৃত্তান্ত সত্য, এবং কয়েদীদের জন্য জেল-বিধিতে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তার চেয়ে কষ্টকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ইহা আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি না, কেবল আলোচনার জন্যে অনুমান করিতেছি। কারণ, গবর্ণমেণ্ট কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অবস্থা বুঝিয়া কঠোরতর বা মৃদুতর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, যে, গবর্ণমেণ্ট যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জেল কোডের ব্যবস্থানুযায়ী আরামে কয়েদীদিগকে না রাখিয়া অধিকতর কঠোর ব্যবস্থায় রাখা দরকার তাহা হইলে সরকার প্রকাশ্যভাবে কোডের পরিবর্ত্তন করুন, সংশোধিত নূতন কোড প্রকাশিত হউক, দেশে ও বিদেশে লোকে জানুক ভারতবর্ষের কারাগারে বন্দীদিগকে কিরূপ অবস্থায় রাখা হয়। নতুবা যদি ইহা সত্য হয় যে, কোডে আছে অপেক্ষাকৃত মানবিক ও আরামদায়ক ব্যবস্থা কিন্তু হিজলীর জেল-কর্ম্মচারীরা রাজনৈতিক বন্দীদিগকে রাখে অন্যবিধ ব্যবস্থায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে এই বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্যের জন্য দায়ী হইতে হয়। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

হিজলী জেল সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ এই, যে, তথায় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বলপূর্ব্বক হাত তুলাইয়া ও মাথায় ঠেকাইয়া "সরকার সেলাম" বলান হয় এবং তাহাতে আপত্তি করিলেই আপত্তিকারীকে ডাণ্ডাবেড়ী সাজা দেওয়া হয়। এবিষয়েও যথাযোগ্য প্রকাশ্য অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের ধারণা মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন রাজনৈতিক বন্দীই জেল কর্ম্মচারীদিগকে ভদ্রসমাজে প্রচলিত সম্মান দেখাইতে অনিচ্ছুক নহেন। মহাত্মা গান্ধী এরূপ সম্মান দেখাইয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, তিনি বন্দী হইলেও মানুষের মত ব্যবহার, ভদ্রলোকের মত ব্যবহার, জেলে পান। সব রাজনৈতিক বন্দী মহাত্মা গান্ধী নহেন কিন্তু মানুষ তাঁহারা সকলেই এবং ভদ্র শ্রেণীর মানুষও বটে। সুতরাং তাঁহারাও ভদ্র মানবিক ব্যবহার পাইবার যোগ্য।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "The law is no respecter of persons," আইন মানুষে মানুষে প্রভেদ করে না, সকলের ওপর সমান ভাবে খাটে। আমরাও তাহাই চাই। মহাত্মা গান্ধী ও বড় বড় নেতারা জেলে ভাল ব্যবহার পান, এবং ইহা যদি সত্য হয় যে অন্যেরা পান না, তাহা হইলে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। সরকার বলিতে বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ গভর্ণমেন্ট এবং কচিৎ প্রভু বা মালিক বুঝায়। জেলের উচ্চতম কর্মচারীও গভর্ণমেন্ট নহেন, বা কয়েদীদের মালিক, ও প্রভু নহেন। সুতরাং তাঁহাকে সরকার বলিলে গভর্ণমেন্টের অসম্মান করা হয়। ইংলণ্ডে কোন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে কয়েদীরা "গুড মর্ণিং, গভর্ণমেন্ট" বা "গুড মর্ণিং, মাই লর্ড এণ্ড মাষ্টার" বলে বলিয়া আমরা কখনও শুনি নাই। বাংলাদেশে কেহ কাহাকেও "সরকার সেলাম" বলিয়া অভিনন্দন করে না। সেলাম শব্দটি আরবী। বাংলাদেশে মুসলমানেরা যখন উহা অভিবাদনার্থ ব্যবহার করেন, তখন তাঁহারাও "সরকার সেলাম" বলেন না। উহা বাংলাদেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই অভিবাদন নহে। "সেলাম আলেকুম" বা "আলেকুম সেলাম"-এর মানে "আপনি শান্তিতে থাকুন।" যদি ইহা সত্য হয় যে, হিজলী জেলের কয়েদীদিগকে জোর করিয়া "সরকার, সেলাম" বলান হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ তাহার মানে দাঁড়ায় "হে প্রভু, বা, হে গভর্ণমেন্ট, আপনি শান্তিতে থাকুন এবং আমরা অশান্তিতে থাকি।" রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারই গম্ভীর। তাহাতে হাস্যরসের আবির্ভাব অবাঞ্ছনীয়—অনভিপ্রেত আবির্ভাবও অবাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

"বুর্ঝোআ"

আমরা উত্তম, অন্যেরা অধম—এই ভাবটা সর্বত্র প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যমান আছে। অন্যদের অধমতা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা দেশে নানা ভাষায় নানা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গ্রীক ভাষায় যাহারা কথা বলিত না, গ্রীকরা তাহাদিগকে বার্বেরিয়ান বলিত, ইহুদীরা অন্য জাতির লোকদিগকে জেন্টাইল বলিত, বৈদিক আর্য্যেরা অনার্য্যদের প্রতি দাস, দস্যু, ম্লেচ্ছ আদি শব্দ প্রয়োগ করিত, আচারনিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে অহিন্দুরা ম্লেচ্ছ, খ্রীষ্টিয়ানরা হিন্দুদিগকে হীদেন বা পেগ্যান বলে, মুসলমানেরা হিন্দুকে কাফের বলে। অন্যের প্রতি এইরূপ কোন-না-কোন শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞাও সূচিত হয়।

পুরাকাল হইতে আগত এইসব অবজ্ঞামিশ্রিত শব্দ প্রায়ই কোন-না-কোন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক ব্যবহার করে। তাহাড়া রাজনৈতিক দলাদলি প্রসূত এই রকম শব্দও আছে। যেমন ইংরেজদের মধ্যে প্রগতিশীল, উদারনৈতিক বা মৌলিসংস্কারপ্রিয় দলের লোকেরা রক্ষণশীল দলের লোকদিগকে টোরী বলে। আমাদের দেশে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে চরমপন্থী, মডারেট ইত্যাদি অভিধা দিয়া থাকে। আজকাল ইউরোপ হইতে আমদানী "বুর্ঝোআ (Bourgeois)" কথাটা ভারতীয় একদল লোক প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে তাহারা রুশীয় কম্যুনিষ্টদের মতাবলম্বী এবং নিজেরা বুর্ঝোআ নহে। ইহা একটি ফ্রেঞ্চ কথা, মানে দোকানদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক অর্থাৎ অভিজাতও নন, দৈহিক শ্রমজীবী, কারিগর, চাষী ইত্যাদিও নয়। আমাদের দেশে কিন্তু যাহারা অপরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশার্থ এই শব্দটি ব্যবহার করে তাহারা অনেকে বা অধিকাংশ নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করে না, নিজের কাপড় নিজে বোনে না, দৈহিক শ্রমের কোন কাজ করে না। পরগাছার মত পরাবলম্বী পরশ্রমজীবী হওয়াটা যদি বুর্ঝোআর লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ইহাদের অনেকেই বুর্ঝোআ, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ত বটেই। অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত, শুধু বুর্ঝোআ নহে, বুর্ঝোআদের কর্মচারী বলে। ছাত্ররা পর্য্যন্ত অন্যের প্রতি বুর্ঝোআ শব্দ প্রয়োগ করিতেছে। ধর্মভেদ, বৃত্তি

ভেদ, ভাষাভেদ, সামাজিক শ্রেণীভেদ প্রভৃতি কোন কারণেই অবজ্ঞাসূচক কোন শব্দ অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা কাহারও উচিত নয়। নিখুঁত মানুষ কেহ নাই, কোন নিখুঁত মানবসমষ্টিও নাই। যেমন কোন মানুষই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অন্য কোন মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে না, তেমনি কোন শ্রেণীর মানুষও অন্যশ্রেণীনিরপেক্ষ অথচ সভ্য উন্নত কৃষ্টিশীল জীবন ধারণ করিতে পারে না। রুশিয়াতে কারখানার শ্রমিক এবং চাষীদের প্রাধান্য নামতঃ স্থাপিত হইয়াছে। অভিজাতদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। রুশীয় মধ্যবিত্ত বুর্জোআদিগকে নিশ্চিহ্ন বা বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের চাষীরা প্রভু হইয়াছে? তাহা হয় নাই। তাহারা কতকগুলি নেতার বা একজন নেতার অধীন হইয়াছে—অর্থাৎ একপ্রকার মুখ্যতন্ত্র (oligarchy) বা একনায়কত্ব (dictatorship) স্থাপিত হইয়াছে। তা ছাড়া, রুশিয়ার কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের কৃষকেরা অন্যশ্রেণীনিরপেক্ষ হইতে পারে নাই। সেই দেশের নেতারা আমেরিকা হইতে অনেক হাজার শিল্পী এবং জার্মানী হইতে অনেক ইঞ্জিনিয়র ও বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে বাধ্য হন। জার্মান ইঞ্জিনিয়র ও বিশেষজ্ঞদিগকে তাড়াইয়া দিবার পর ঐ ঐ শ্রেণীর ফরাসী লইতে হইয়াছে।

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪০।

মিঃ জিন্নার আস্পর্দ্ধা

নানা অজুহাতে মিঃ জিন্না তাঁহার দলের কমিটি হইতে বঙ্গের মুসলমানদের অন্যতম নেতা মৌলবী ফজলুল হকের নাম কাটিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানেরা অন্য যে কোন প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোকও অনেক আছেন। অথচ তাঁহারা অন্য প্রদেশের মুসলমানদের মুরুব্বিয়ানা চান ও সহ্য করেন। তাহাতেই শেষোক্তদের ঔদ্ধত্য ও আস্পর্দ্ধা বাড়ে।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩।

বিপ্লব

"বেঁচে থাক বিপ্লব" "ইনকিলাব জিন্দাবাদ—" শুনিতে বেশ, খুব হুজুক হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে কত নরহত্যা, কত রক্তপাত, কত অন্য দুষ্কার্য্য জড়িত থাকে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আজকাল ধর্ম্মের দোহাই বেশী লোকে মানিতে চায় না। কিন্তু ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয় নাই। যাহা ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবেই। নরহত্যা ও রক্তপাত এক পক্ষ করিলে অন্য পক্ষও সুযোগ পাইলে তাহা করিবে।

বিপ্লবও দু-রকমের হয়। ফ্রান্সে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, বর্ত্তমান শতাব্দীতে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হইয়াছে, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ লোকদের বিপ্লব। অনেক নরহত্যা করিয়া তাহা ঘটাইতে হইয়াছে। রাশিয়ায় হত্যার জের এখনও মিটে নাই। যে বিপ্লব রক্তপাত করিয়া ঘটান হইয়াছিল তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আরও রক্তপাত চলিতেছে।

অন্যবিধ বিপ্লব সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বিপ্লব নহে, সংখ্যালঘু কতকগুলি লোকের প্রভুত্ব স্থাপন ও রক্ষার জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে বা ঘটান হইয়া থাকে; যেমন ইটালীতে ফাসিষ্ট বিপ্লব, জার্ম্মেনীতে নাৎসী বিপ্লব। স্পেনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধ চলিতেছে ইটালীর ফাসিষ্ট ও জার্ম্মেনীর নাৎসী প্রভুত্বের মত সংখ্যালঘু এক শ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং সেইজন্য স্পেনের বিদ্রোহীরা ইটালীর ও জার্ম্মেনীর সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

শুধু কারখানার শ্রমিকেরা ও তাহাদের মত লোকেরা রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হইবে, কিংবা কারখানার শ্রমিক ও মাঠের চাষীরাই রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, আর কোন শ্রেণীর লোক থাকিবে না, এ রকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা রাশিয়াতে বা অন্য কোন দেশে এখনও কায়েম হয় নাই, আবার ইটালীর ফাসিষ্ট প্রভুত্ব বা জার্ম্মেনীর

নাৎসী প্রভৃতিও নিরাপদ্ হইয়াছে মনে হয় না। রাশিয়ার বিপ্লবীদের ও কার্ল মার্ক্স্ প্রভৃতি যাহাদের মতের অনুসরণ তাহারা করিয়াছে, তাহাদের আদর্শ শ্রেণী-বিহীন সমাজ (classless society)। সে আদর্শ রাশিয়াতেও বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

বস্তুতঃ কোন শ্রেণীর লোককে বিনষ্ট বা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা বা এক শ্রেণীর লোককে প্রভু করিয়া অন্য সকলকে শক্তিহীন ও পদানত করা ও রাখা, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের মত ও কাজকেই বিনা বিচারে ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লওয়া—এবম্বিধ কোন পন্থা, আদর্শ বা মত গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় নহে। কেমন করিয়া যে সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজকে সুস্থ, জীবন্ত ও প্রগতিশীল রাখা যায়, তাহা বলা বড় কঠিন। যাহার প্রাণ আছে তাহা বরাবর ঠিক এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। জীবন্ত সমাজে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জীবন্ত রাষ্ট্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। রক্তাপ্লুত বিপ্লবের পথে না গিয়া কেমন করিয়া এরূপ পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দেশ করা কঠিন—যদিও আদর্শ তাহাই হওয়া উচিত। ইউরোপে, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী, জার্মেনী...সশস্ত্র বলপ্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরিবর্তন করিয়াছেও। কিন্তু কোথাও এখনও রক্তপাতের জের মিটে নাই। অন্য কয়েকটি দেশ প্রধানতঃ রক্তপাত ব্যতিরেকেই আধুনিক যুগে পরিবর্তন করিয়াছে—যেমন ডেন্‌মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড...—যদিও এমন কোন দেশ নাই যাহার ইতিহাসে কোন-না-কোন যুগে রক্তপাত সহকারে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে আদর্শ মনে করা যাইতে পারে না। মানুষের ক্রমোন্নতি বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাসের অনেক ভীষণ বিপ্লবের সহিত জড়রাজ্যে ঝড় ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবনের সাদৃশ্য আছে। জড়রাজ্যে এই সকল উৎপাত বিনাশ করে অনেক কিছু। কিন্তু তাহারা যাহা বিনাশ করে তাহার মধ্যে আবর্জনা ক্লেদ রোগবীজ...অনেক থাকে। এবং বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সৃষ্টিও কিছু কিছু হয়। বহু বিপ্লব সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়।

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৪।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

সম্প্রতি মেদিনীপুরে তথাকার সাহিত্য-পরিষদের উৎসব উপলক্ষ্যে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু 'ঐতিহাসিক' আলোচনা হইয়াছিল, দৈনিক কাগজে এইরূপ দেখিয়াছি। বঙ্গে এই আধুনিক চিত্র-কলার সূত্রপাত সম্বন্ধে লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে গিয়া কেহই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বাদ দিতে পারেন না। অতএব, তিনি ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা আধুনিক ইণ্ডিয়ান আর্টের কোন তথ্যপ্রিয় ঐতিহাসিক কিংবা অ-বিশেষজ্ঞ বক্তা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি সন ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'শান্তিনিকেতন পত্রে' লিখিয়াছিলেন, "বাংলার কবি (রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত করেন, বাংলার আর্টিস্ট (অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধ'রে একলা একলা কাজ ক'রে চল্লো কতদিন—"। অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'গোল্ডেন বুক অব টাগোর' নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত হইয়া আছে।

'প্রবাসী' আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কিঞ্চিৎ সেবা করিয়াছে। নূতন কিছু কেহ করিলে কাহাকেও না কাহাকেও তজ্জন্য কটু উক্তি সহ্য করিতে হয়। 'প্রবাসী'র সেবা অন্ততঃ এইটুকু, যে, সে তাহা সহ্য করিয়া অপর সকলকে সেই অপ্রিয় কর্তব্য পালনের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই ব্যাপারটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জবানি বর্ণিত হওয়া ভাল।

(এই সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠায় রামানন্দ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্রষ্টব্য)

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার উৎসাহদাত্রী বলিয়া যাঁহারা ভগিনী নিবেদিতার নাম করেন তাঁহারা ঠিকই করেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের নহে, অন্যান্য দেশেরও

ললিতকলার মর্মজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলার নূতন পর্য্যায়ের উৎকর্ষ বুঝিতে ও মর্মজ্ঞ হইতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুমূর্ষু শাহজাহান" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্রের ব্যাখ্যা তিনি 'মডার্ণ রিভিয়ু'তেই করিতেন। কারণ, ঐ সকল চিত্রের বহুবর্ণ প্রতিলিপি ইংরেজী মাসিক কাগজের মধ্যে একমাত্র উহাতেই ছাপা হইত (এবং এখনও উহাতেই হয়)। অতএব ভারতীয় চিত্রকলার সেবক বলিয়া ঐ ইংরেজী মাসিকেরও নাম করিলে সত্যের অপলাপ হয় না। ভগিনী নিবেদিতা মডার্ণ রিভিয়ুতে অজন্টা গুহাবলীর স্থাপত্য ও সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৭।

দেশভক্তি

দেশভক্তি। যিনি যে স্থানটিকে পবিত্র মনে করেন বা যেখানে ভগবানের পূজা করেন, সেই স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত রাখিতে চেষ্টা করেন। হিন্দুর দেবমন্দির ও তপোবন, বৌদ্ধের চৈত্য ও বিহার; খৃষ্টিয়ানদের গির্জ্জা ও সমাধিস্থান, মুসলমানদের মসজিদ ও কবর, প্রভৃতি স্থান পরিষ্কার রাখা হয় অধিকন্তু জগতের সুন্দরতম নিকেতন-সমূহের মধ্যে অনেকগুলি এই জাতীয়।

আমরা আপনাদিগকে দেশভক্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু বঙ্গের খানা, ডোবা, রাস্তা ঘাট, পচা পুকুর, পূতিগন্ধময় নর্দ্দমা, আগাছা ও জঙ্গলপূর্ণ পতিত ভূমি দেখিলে কি মনে হয় যে আমরা দেশকে পবিত্র স্থান মনে করি? অরণ্যের গম্ভীরতা ও সৌন্দর্য্য বিধান করিবার জন্ম মানুষকে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। পর্ব্বতের ভীমকান্ত শোভা মানুষের চেষ্টার কোনও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষের বাস ও মানুষের হাত যেখানে আছে, সেখানকার চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় যে, মানুষ নিজের জীবনকে ভগবানের লীলাক্ষেত্র মনে করিতেছে কি না।

দেশকে আমরা যে ভক্তি করি, পবিত্র মনে করি, তাহা এইজন্ম যে, উহার ভিতর দিয়া ভগবানের স্নেহ, দয়া আমাদিগকে পুষ্ট করে উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে তিনি বিরাজিত। তবে উহাকে এমন হতশ্রী করিয়া কেন রাখি?

ফুলবাগানটির মতন সুন্দর সাজান পল্লী, নগর, দেশ যে পৃথিবীতে নাই, তাহা ত নয়।

দারিদ্র্য অনেক লোককে অপরিষ্কার অশুচি থাকিতে এবং নিজ গৃহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহকে ঐরূপ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য করে, দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু অনেকের সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও ঐরূপ দশা দেখা যায়, আবার অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও অপরিচ্ছন্নতা ও অশুচিতা সহ্য করিতে পারে না। ইহা কিন্তু সত্য যে, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর পক্ষে নিজ দেহের ও বাসভূমির পরিচ্ছন্নতা সাধন সহজসাধ্য।

আমরা গরীব কেন? ভারতবর্ষ বিদেশীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কারণ, অথচ ভারতবাসী গরীব। ইহা কাহার দোষ?

আমরা দেশকে "জনকজননী-জননী", "দেশমাতা" প্রভৃতি নামে অভিহিত করি; "বন্দেমাতরম্" গান গাই; দেশবাসীকে ভাই বলিয়া রাখীবন্ধন করি; "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই," প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করি। তাহা হইলে কার্য্যতঃ দেখান কর্ত্তব্য যে যাহারা চিরজীবন অর্দ্ধাশনে কাটায়, যাহারা অর্দ্ধনগ্ন ও চীর-পরিহিত, যাহাদের চালে খড় নাই, যাহাদের কুঁড়েঘরও নাই, যাহারা নিরক্ষর, যাহারা পাইক গোমস্তা পিয়াদা কনষ্টেবল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতরপদস্থ নানা জনের উৎপীড়ন সহ্য করে, যাহারা পীড়িত হইলে বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে মারা পড়ে, যাহারা দুর্নীতি-গ্রস্ত হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করে, তাহারাও আমাদেরই দেশমাতার সন্তান।

কিন্তু সে ভাই কেমন ভাই যে কেবল আপনার সুখ লইয়াই ব্যস্ত, মাতার অন্য সন্তানদের কোন খবর রাখে না।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২১।

চটির পাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি পশ্চিমে চাকরি করি। বড়দিনের ছুটির আগে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া আমি বাড়ী আসিতেছিলাম। ট্রেনে দেখিলাম বিষম ভিড়। দিল্লীর দরবার তখন সম্ভ সমাপ্ত হইয়াছে, এবং কলিকাতায় রাজসমাগম, কংগ্রেস, কনফারেন্স প্রভৃতি আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; শীতকালে কলিকাতায় আমোদ আহ্লাদ রঙ্গ তামাসারও আয়োজন থাকে প্রচুর—এবারে বিশেষভাবে গণ্ডা দেড়েক সার্কাস, হুদল সেক্সপীয়র অভিনেতা, চার-চারটে বায়োস্কোপ প্রভৃতি, দীপ্তদীপের ধারে পতঙ্গের মতো, দর্শক আকর্ষণ করিতেছিল বিস্তর। অধিকন্তু এই সময়ে রেল কোম্পানী একবারের পারাণি কড়ি লইয়া ডবল খেয়া পার করে বলিয়া দরকার না থাকিলেও অনেকে এক পাক ঘুরিয়া আসার প্রলোভন সামলাইতে পারে না। সুতরাং ভিড়েরও অবধি থাকে না। ট্রেনে বগি গাড়ী দিয়া কুলাইতে না পারিয়া রেল কোম্পানীর সেকেলে বকেয়া সম্পত্তি সরু সরু কামরা ভাগ-করা গাড়ী জুড়িয়াও লোকের স্থান করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি অনেক কষ্টে একখানি শিক ঘেরা সরু কামরার মধ্যে উঠিয়া কোনো মতে একটু স্থান করিয়া লইয়াছিলাম। সে কামরায় একজন পাঞ্জাবী বড় বড় বিছানার মোট ও বাক্স তোরঙ্গ ঝুড়ি প্রভৃতিতে উপরের বাঙ্ক-দুটি বোঝাই করিয়া বসিয়া ছিল—তাহার যেমন দেহ, তেমন দাড়ি এবং তেমনি কি পাহাড়ীর আয়তন। নীচের বেঞ্চিতে পাঁচজন পেশোয়ারী তাহাদের বিপুলায়তন শরীর, ঢিলেঢালা পোষাক ও শীতবস্ত্রের মোট লইয়া বিরাজমান। অপর সাতজনের মধ্যে তিনজন বাঙালী, চারজন হিন্দুস্থানী। এই তেরজনের উপর আমি হইলাম চতুর্দ্দশ। সুতরাং আমি যখন এই কামরায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিলাম তখন পাঞ্জাবীর গর্জন, পেশোয়ারীর আস্ফালন, হিন্দুস্থানীর বকবকানি ও বাঙালীর দাঁতখিঁচুনি যে কিরূপ ভীষণ প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত।

আমি কাহাকেও কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া যখন গাড়ীতে চড়িতে আসিলাম তখন দুইজন পেশোয়ারী দুই দিক হইতে গাড়ীর কপাট টানিয়া ধরিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। আমি তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিবার ভান করিয়া সেখান হইতে একটু সরিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, লক্ষ্যটা যেন আশেপাশের কামরার প্রতিই। তখন আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পেশোয়ারীরা সরিয়া বসিল। আর আমিও দরজার হাতল ঘুরাইয়া একেবারে গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

আমার আকস্মিক আবির্ভাবে আরোহীরা একবার কোলাহল করিয়া উঠিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। সুতরাং শীঘ্রই সন্ধি হইয়া গেল। আমি গাড়ীর দরজার কাছেই এক পেশোয়ারীর পাশে স্থান পাইলাম।

এতক্ষণ যে গাড়ীর দরজা ধরিয়া উভয়পক্ষে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছিল তাহা যেন মিথ্যা, স্বপ্ন মাত্র—বাস্তবিক পক্ষে আমরা পরম মিত্র, এমনি ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়া উঠিল। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই কলিকাতায় যাইবে; কেবল হিন্দুস্থানীরা নামিবে পাটনায় এবং পাঞ্জাবী নামিবে আসানসোলে।

গাড়ী নির্বিবাদে মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধরণের লোক চাদরের উপর একখানি লাল বনাত গায়ে দিয়া, একটি ভারি পুঁটলি বগলে লইয়া প্লাটফর্মে ছুটাছুটি করিতেছিল। ব্রাহ্মণ যেখানে যায় সেখান হইতেই বিতাড়িত হইয়া ফিরিয়া আসে। সময় যতই যায় ব্রাহ্মণও ততই ব্যস্ত

হইয়া কলের তাঁতের মাকুর মতন, দক্ষ খেলোয়াড়ের ব্যাটের মুখে লন্ টেনিসের বলের মতন কেবলই এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে, কোথাও বেচারা একটু স্থিতি পাইতেছে না। অবশেষে ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের কামরার সম্মুখে আসিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—বাবা, একটু দরজাটা খুলে দাও বাবা।

আমি বলিলাম—ঠাকুরমশায়, দেখছেন আমরা চোদ্দ জন আছি; আর দেখছেন ত চোদ্দ জন নয়, চোদ্দ জোয়ান। আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

ব্রাহ্মণ নেড়া মাথায় টিকি নাড়িয়া বলিল—সব শালার খোসামোদ করে এসেছি বাবা, কোনো বেটার যদি ব্রাহ্মণ বলে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা হল। ঘোর কলি! ঘোর কলি! খুলে দাও বাবা!

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুর মশায়, এ কামরার আরোহীদেরও যে ব্রাহ্মণের প্রতি খুব বেশী রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে এরূপ সন্দেহ আপনি কেন করছেন? এই যে পেশোয়ারী ক'টি, এরা গোব্রাহ্মণহিতায় চ মোটেই নয়।

—তোমরা ত বাবা বাঙালী হিঁদু, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপকারটি কর বাবা।

একজন পেশোয়ারী ব্রাহ্মণের বোচকায় ধাক্কা দিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল—ভাগো ভাগো, ইঁহা পর জাগা কাঁহা?

ব্রাহ্মণ বোচকার ভারে টলিয়া পড়িয়া গেল। এবং ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া নামিয়া একহাতে ব্রাহ্মণের বোচকা ও অপর হাতে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া টানিয়া গাড়ীতে তুলিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পেশোয়ারীরা রুষ্ট হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ আমার মাথার টেড়িটিকে নাস্তানাবুদ করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। আমি হাসিমুখে উভয় পক্ষেরই অত্যাচার গ্রহণ করিলাম।

আমার জায়গাটিতে আমি ব্রাহ্মণকে বসাইয়া নিজে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পেশোয়ারীরা কি জানি কেন আমার উপর ভারি খুসি হইয়া গিয়াছিল—তাহারা আমাকে তাহাদের কাপড়ের মোটের উপর বসিতে বলিল।

ইহার পর হইতে আমাদের কাহাকেও আর লোক তাড়াইবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। সে ভার লইয়াছিল সেই ঠাকুর মশায়। পশ্চিমে তীর্থ করিতে আসিয়া তাহার মেজাজটা এমনি রোখালো হইয়া গিয়াছিল যে হিন্দি ছাড়া সে আরকিছু বলিতে পারিতেছিল না; তাহার হিন্দি নাগরী প্রচারিণী সভাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নির্ভীক নিরঙ্কুশভাবেই নির্গত হইতেছিল। কেহ গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলেই ঠাকুর চিৎকার করিতেছিল, জায়গা নেই হায়! জায়গা নেই হায়! দেখতা নেই পনর আদমী হ্যায়? আর কাঁহা বৈঠেগা? গা পর বৈঠেগা না মাথা পর বৈঠেগা?

আমি হাসিয়া বলিলাম, ঠাকুর মশায়, আপনি ত এই মাত্র গাড়ীতে ওঠবার জন্যে আকুলি বিকুলি করছিলেন। এখন গাড়ীতে উঠে সে কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন যে সকল যাত্রীরই গরজ সমান।

ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া নাকে খুব বড় এক টিপ্ নস্য ভরিয়া বলিল—গরজ সমান হলে কি হয়। বসবে কোথা, জায়গা কৈ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—আপনি যখন উঠছিলেন তখনও ত জায়গা ছিল না।

—আরে তার চেয়ে ত এখন আরো কমে গেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে বিচার আপনার আমার করা শোভা পায় না, কারণ আমরা ভরা গাড়ীতে উঠেছি। বিচারের ভার থাকা উচিত আগন্তুক আরোহীর ওপর। তারা যদি এত লোক দেখেও ওঠেন তবে বুঝতে হবে অন্যত্রও এই রকম অবস্থা।

ঠাকুর টিকি নাড়িয়া বলিল—হাঃ। তুমি ত বললে এই রকম অবস্থা। কিন্তু এর ওপর লোক বৃদ্ধি হলে আমাদের অবস্থাটা কি রকম হবে?

আমি নীরব হইয়া হাসিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ খুব

ঘন ঘন নস্য লইতে লাগিল। শেষে বলিল—কাশীর নস্য অতি উত্তম। নেবে?

—আজ্ঞে না।—বলিয়া আমি ব্রাহ্মণের রকম দেখিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাড়ীশুদ্ধ সকলেই স্মিত-মুখে কৌতুক অনুভব করিতেছিল।

গাড়ী বক্সারে পৌঁছিলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক একটা তোরঙ্গ ও একমোট বিছানা লইয়া আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ত টিকি নাড়িয়া একেবারে মারমুখো! আমি আগন্তুককে বলিলাম—আমরা এখানে পনেরজন আছি। অন্য গাড়ীতে আপনি চেষ্টা দেখলে ভালো হত।

—সব গাড়ীতেই এই রকম মশায়। আমি বেশী দূর যাব না, আমি মোকামাতে নেমে যাব।

—আচ্ছা আসুন।—বলিয়া আমি দরজা খুলিয়া ধরিলাম।

ব্রাহ্মণ দরজা ধরিয়া বন্ধ করিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি জোর করিয়া খুলিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণকে বলিলাম—ঠাকুর মশায়, মোগলসরাইয়ে নিজের অবস্থাটা স্মরণ করুন।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত বড় পাজি লোক হে! আমার গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়েছ ত একেবারে মাথা কিনেছ আর কি? এ গাড়ী কি তোমার কেনা? কোম্পানীর গাড়ী। আমি পয়সা দিয়ে চড়েছি। তবে অত কথা কও কেন হ্যা?

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ ভদ্রলোকও কোম্পানীকে পয়সা দিয়ে এসেছেন, অমনি আসেননি আপনার দয়া ভিক্ষে করতে।

ব্রাহ্মণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তুমি ত বড় বেল্লিক হে। যত লোক পয়সা দিয়েছে সব লোক এক গাড়ীতে আসবে নাকি?

আমি পূর্ব্ববৎ হাসিয়াই বলিলাম—আজ্ঞে, সেটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। এক গাড়ীতে যে সকলের ঠাঁই হয় না সে বোধটা মোগলসরাইয়ে হলেই ঠিক হত।

ব্রাহ্মণ পরাস্ত হইয়া রাগিয়া গনগন করিতে লাগিল। আমার উপর ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া আর কেহই আমাকে কিছু বলিল না। কেবল একজন পেশোয়ারী হাসিয়া বলিল—বাবু, তুমি সবাইকেই যে নিমন্ত্রণ করে এই কামরাতে ভরছ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—কি করি বল মিঞা সাহেব, সকলের যেতে হবে ত? আর পাটনায় এই ক'জন নেবে যাবে; এ ভদ্রলোকও মোকামায় নাববেন; তখন খুব জায়গা হয়ে যাবে। তখন আমাদেরই রাজত্ব হবে।

ব্রাহ্মণ বলিল—হাঃ, তুমি সেই ধাতের লোক কিনা; বিশ্ব বাংলার সকল লোককে ডেকে এই গাড়ীতে তুলবে তখন।

চরম লোক বোঝাই হওয়াতে আর কোনো ষ্টেশনে কেহ আমাদের কামরার প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না। এখন নামিবার পালা।

পাটনাতে হিন্দুস্থানীরা নামিবার জন্য উঠিল। ব্রাহ্মণ হুকার করিয়া বলিল—এই, আভি নামতা কাহে, আভি কেও‍া লোক উঠেগা। বৈঠো বৈঠো।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনার অনুরোধে কি ওরা গন্তব্যস্থান ছেড়ে আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে পৌঁছে দেবার জন্যে স্থির হয়ে বসে থাকবে?

ব্রাহ্মণ বলিল—তুমি ত বড় ব্যস্তবাগীশ হে। লোককে তোলবার জন্যেও যেমন তাড়াতাড়ি নামাবার জন্যেও তেমনি।

আমি হাসিয়া বলিলাম—একটু ব্যস্তবাগীশ না হলে যে ঠাকুরমশায়কে এখনো মোগলসরাই ষ্টেশনের কাঁকরের ওপর গড়াগড়ি দিতে হত।

হিন্দুস্থানীরা তাহাদের পোঁটলা পুঁটলি, লেপ, লোটা, লাঠি সোঁটা, নাগরা জুতা প্রভৃতি ঘাড়ে পিঠে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া একে একে নামিতে লাগিল; কাহারো লোটা ভট্টাচার্য্যের নেড়া মাথায় ঠক ঠক করিয়া ঠুকিয়া গেল, কাহারো নাগরা জুতার নাল ব্রাহ্মণের দীর্ঘ নাসিকায় ঘসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বসিয়া বসিয়া—উজবুক! হাতুখোর কাহাকা! এই, সামালকে নামো।—ইত্যাদি বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

মোকামায় শেষাগত বাঙ্গালীটি তাঁহার বাক্স বিছানা লইয়া নামিয়া গেলেন। বাক্সর কোণ লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের পুঁটুলিটি বেঞ্চি হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িল এবং বোচকা বাঁধা কাপড়খানা একটু ছিঁড়িয়া গেল। আর যায় কোথায়! ব্রাহ্মণ সপ্তমে চড়িয়া গালাগালি আরম্ভ করিল। রাগের শেষ তালটা আসিয়া পড়িল আমার ঘাড়ে।—তোমার জন্তেই ত আমার এই কাপড় ছিঁড়ল। এর ভেতরে বাবা বিশ্বেশ্বরের ফুল বেলপাত আছে, এতে যে পা ঠেকল তাতে কি তোমার ভাল হবে? উচ্ছন্ন যাবে, উচ্ছন্ন যাবে। —বলিয়া ব্রাহ্মণ ঘন ঘন হাত ও টিকি আন্দোলন করিতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, কোন্‌টা ফলবে, গাড়ীতে ওঠার আশীর্বাদটা না এই অভিসম্পাতটা?

একজন বাঙালী সহযাত্রী দূরের কোণ হইতে বলিল—কোনটাই ফলবে না; দুটোতে কাটাকাটি হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণ আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল—ফলবে না? ফলবে না? সাক্ষাৎ বাবা বিশ্বেশ্বরের টাটকা ফুল বেল-পাতের অপমান! উচ্ছন্ন যাবে! উচ্ছন্ন যাবে!

আমি গম্ভীরভাবে জোড়হাত করিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন; আমি উচ্ছন্ন গেলে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণটা আপনার কেন ফস্কাবে; আপনি অনুগ্রহ করে আমার শ্রাদ্ধের দিন পায়ের ধুলো দিলে আমি পরলোকে গিয়ে কৃতার্থ হব।

গাড়ীর সকল বাঙালী আরোহীরা উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া পাঞ্জাবী পেশোয়ারী সকলেই হাসিল। হাসির সংক্রামতা ক্রমশ শিকের ফাঁকে ফাঁকে কামরা হইতে কামরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। তখন সকল কামরার আরোহীর নজর পড়িল সেই ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের দিকে।

ব্রাহ্মণ আমাকে রাগাইতে না পারিয়া এবং সকলের কৌতুকপাত্র হইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া নস্য লইতে মনঃ-সংযোগ করিল।

এখন হইতে যেই গাড়ী ষ্টেশনে থামে আর তখনি ব্রাহ্মণ মুখ বিকৃত করিয়া আমার বলে, ডাক ডাক, সবাইকে ডাক, অনেক জায়গা রয়েছে, ডাক।

অন্যান্য কামরাও প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছিল সুতরাং আমাদের কামরায় মধ্যে মধ্যে অল্পদূরের যাত্রী দু-একজন ছাড়া আর বড় বেশী কেহ উঠিল না।

এইবার পাঞ্জাবীপ্রবরের নামিবার পালা। তাহার সেই বিপুলায়তন দেহ ও পাগড়ী লইয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার অতিকায় বাক্স পেঁটরা মোটমাটরি নামাইতে লাগিল। মোটা মোটা বাক্সগুলি কি সহজে দরজা দিয়া গলে? অনেক টানাটানি, অনেক ঠেলা-ঠেলি করিয়া এক-একটি পার হইতে লাগিল। আমি দরজার মুখের কাছে ছিলাম সুতরাং আমিই ধরিয়া ধরিয়া মোটগুলি বাহির করিয়া দিতেছিলাম। ব্রাহ্মণও দরজার কাছেই ছিল। কিন্তু সে হাত-পা গুটাইয়া বেঞ্চির উপর জগন্নাথের মতন বসিয়া অনবরত বকিয়া যাইতেছিল—যত সব লক্ষ্মীছাড়া এসে জুটেছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার জো নেই। আর এই এক ফকরদালাল জুটেছে, সকল তাতেই আছে। কার মোট নামল না-নামল তোর অত মাথা ব্যথা কেন রে বাপু।

পাঞ্জাবীর সমস্ত মোট নামাইবার পূর্বেই গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা দিল। তাড়াহুড়া করিয়া সব মোট নামাইয়া পাঞ্জাবী যখন গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

এতক্ষণে ব্রাহ্মণ পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিল। পা নামাইয়া বেঞ্চির তলে পা চালাইয়া কিছুক্ষণ সে ইতস্ততঃ পদচালনা করিল। তারপর ঝুঁকিয়া সে কি খুঁজিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুর মশায় কি খুঁজছেন?

ব্রাহ্মণ এক পায়ে চটি পরিয়া অপর নগ্নপদ উর্দ্ধে উঠাইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—আমার আর একপাটি চটি?

বেঞ্চির তল, মোটের নীচে, আশ পাশ সর্বত্র খুঁজিলাম, কোথাও চটির পাটি মিলিল না। বুঝিলাম, পাঞ্জাবীর মাল টানাটানি করিবার সময় চটির পাটি পাঞ্জাবীর সঙ্গে চম্পট দিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুর মশায়, আপনার চটির দুপাটিই ছিল ত?

ব্রাহ্মণ ত তেলে বেগুনে জ্বলিয়া আমার উপরে খাপ্পা হইয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল—না, দুপাটি থাকবে কেন? আমি এক পায়ে চটি পরে বেড়াই। আমি কি একানড়ে ভূত? বৌদ্ধিক আহাম্মক কোথাকার!

আমি হাসিয়া বলিলাম—না না, আমি সে কথা বলছিনে যে আপনি এক পায়ে চটি দিয়ে বেড়ান। তবে এমনও ত হতে পারে যে তীর্থে লোকে এক-একটা বস্তু ত্যাগ করে আসে; আপনি একপাটি চটি ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় পাণ্ডা গুণ্ডার পীড়াপীড়িতে ত্যাগ করে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ টিকি উৎক্ষিপ্ত করিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল—কী! খৃষ্টান, অধার্ম্মিক, বৌদ্ধিক! তীর্থের অপমান!...আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, যদি আমি ত্রিসন্ধ্যা করি...

আমি তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—তবে তুমি গোল্লায় যাও। কিন্তু ঠাকুরমশায়, গোল্লায় যাওয়াটা কেমন তা জানা নেই। গোল্লা খেতে কিন্তু ভারি মুখরোচক। আর কলিকালে ব্রাহ্মণের শাপে কেউ মরে না, ব্রাহ্মণের লাঠিতে সাপ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত মরে বটে।

ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে না পারিয়া গন গন করিতে করিতে পা হইতে চটির পাটি খুলিয়া লইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ক্রোধ তিরোহিত হইয়া দৃষ্টি হইতে বাৎসল্য ক্ষরিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দুই হাতে চটির পাটিটিকে মুখের সামনে উঁচু করিয়া ধরিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—আমার নতুন চটি। এই সবে কাশী আসবার আগে ঠনঠনে থেকে দেড় টাকায় কিনেছি। আমার নতুন চটি!—

ব্রাহ্মণের স্বরে বেদনা মেশানো।

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার যেমন হাসি পাইতেছিল তেমনি দুঃখও হইতেছিল। আমি চারিদিকের হাসির হররার মধ্যে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখভাব যথাসম্ভব গম্ভীর ও বিমর্ষ করিয়া বলিলাম—তাই ও ঠাকুর মশায়, আপনার নতুন চটির এক পাটি পড়ে গেল...

—পড়ে গেল! বলতে লজ্জা করে না, মিথ্যাবাদী পাষণ্ড। তুই-ই ত ইচ্ছে করে, বদমায়েসী করে আমার চটির পাটি ফেলে দিয়েছিস। নইলে আমার পয়সা দিয়ে কেনা, হকের ধন, অমনি খামখা পড়ে গেলেই হল।...আমার একেবারে আনকোরা নতুন চটি।—

ব্রাহ্মণের স্বর তিরস্কারের তীব্রতা হইতে চটির স্নেহে করুণার্দ্র হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি তাহার জ্বালা ভুলিয়া শীতল হইয়া গেল। সে দুই হাতে অবশিষ্ট পাটিটিকে তুলিয়া ধরিয়া একবার আস্ফালন করিয়া আমাকে বলে—তুই ইচ্ছে করে বদমায়েসী করে ফেলে দিয়েছিস। আবার চটির শোকে করুণার্দ্র হইয়া বারংবার বলিতে থাকে—আমার নতুন চটি! আমার নতুন চটি।

আমি অতি বিনীতস্বরে বলিলাম—ঠাকুর মশায়, আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত আমি দাম দিচ্ছি, আপনি কলকাতা গিয়ে আর এক জোড়া নতুন চটি কিনে নেবেন। আপনার মত ব্রাহ্মণকে জুতো দান করলে আমার অক্ষয় পুণ্য হবে।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া নাসারন্ধ্র ফুলাইয়া টিকি নাড়িয়া বলিল—অ্যাঁ, বেটা পাজি নচ্ছার হতভাগা বৌদ্ধিক অকালকুষ্মাণ্ড! আমি তীর্থ করে ফিরে যাবার পথে তোর দান প্রতিগ্রহ করে পতিত হই আর কি! তেমনি তোর মতলব বটে। নইলে আর ইচ্ছে করে আমার নতুন চটির পাটটে ফেলে দিস। আমার নতুন চটি!

ব্রাহ্মণকে আর অধিক ঘাঁটানো নির্দয়ের কার্য্য হইবে বলিয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিল না। সে একবার এক পায়ে চটি পরিয়া বসে; আর একবার বা চটিপরা পা তুলিয়া দেখে; এক একবার বা পরম আগ্রহে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চটির পাটি চোখের

সামনে তুলিয়া করুণ নেত্রে দেখে; দেখিয়া দেখিয়া আবার নামাইয়া রাখে। থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার আমার দিকে সক্রোধ দৃষ্টিতে চাহে। কলিকাল বলিয়া রক্ষা। নতুবা ব্রাহ্মণের রোষানলে আমি ভস্ম হইয়া যাইতাম; এক-একবার ব্রাহ্মণ অস্ফুট ক্রোধমিশ্র করুণ স্বরে বলে—আমার নতুন চটি। আমার আনকোরা চটি।

খানিকক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ চটির পাটিটি চোখের সমুখে করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল—যাক, এ একপাটি থেকেই বা কি হবে, এ পাটিও যাক।—

এই বলিয়াই গাড়ীর জানালা দিয়া চটির পাটিটি টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু ফেলিয়া দিয়াই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই চটির পাটিটিকে দেখিতে লাগিল। যখন আর দেখা গেল না তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ দুঃখ ও ক্রোধমিশ্র বিকৃত স্বরে আমাকে বলিল—কেমন? মনস্কামনা পূর্ণ হল ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম-এ পাটি ফেলে দিয়ে আপনি আর এমন বেশি কি করলেন। সঙ্গীহারা হয়েই ত বেচারা একেবারে নিকর্মা হয়ে পড়েছিল; কারণ আপনি ত বলেইছেন এই একটু আগে যে, আপনি একানড়ে নন যে একপায়ে জুতো পরবেন।

ব্রাহ্মণ মুখ খিঁচাইয়া বলিল—হাঁ হাঁ, তার আনন্দ হয়েছে! বাক্যবাগীশ! কথার ধুকুড়ি! বদমায়েস! পাজি! হতভাগা!—

ব্রাহ্মণের গালির 'ট্রেন' শেষ হইবার পূর্ব্বে ট্রেন আসিয়া রাণীগঞ্জে থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতে করিতে দেখিলাম, ভট্টাচার্য্যের প্রথম পাটি চটি পাঞ্জাবীর মোটের টানে সরিয়া পড়িয়া গাড়ীর পাদানের নীচেরধাপে আটকাইয়া আছে। আমি ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম—ঠাকুর মশায়, এই যে আপনার চটি এখানে আটকে আছে।—

এবং তারপর সেই চটির পাটিটিকে উদ্ধার করিয়া ভট্টাচার্য্যের হাতে দিলাম।

ভট্টাচার্য্য হারানো পুত্র ফিরিয়া পাওয়ার মতো ব্যগ্র আগ্রহে সেই চটির পাটিটিকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—দেখেছ একবার নষ্টামিটে। চটির পাটিটে লুকিয়ে রেখে এতক্ষণ আমার সঙ্গে তামাসা করা। আমি তোর বাপের বয়সী, আমার সঙ্গে তামাসা? ওরে হতভাগা পাজি। তামাসাই যদি করছিলি তবে যখন আমি ও পাটিটে ফেলে দিলাম, তখন আমার বারণ করলিনে কেন? আমি ফেলে টেলে দিলাম, এখন এসে বলছেন, ঠাকুর মশায়, আপনার চটি। আমায় একেবারে নেহাল করে দিলেন আর কি!

ভট্টাচার্য্যের চোখ ছলছল করিতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছিল, লোকলজ্জা অন্তরায় না হইলে ব্রাহ্মণ হয়ত হারাধন চটির পাটিটিকে চুম্বন করিয়া অশ্রুজলে স্নান করাইত।

ব্রাহ্মণ চটির পাটিটিকে দেখিয়া দেখিয়া আপনার পাশে বেঞ্চির উপর রাখিল। তারপর পোঁটলাটি কোলের উপর তুলিয়া আস্তে আস্তে খুলিয়া চটির পাটিটিকে পোঁটলায় বাঁধিয়া রাখিল। হয়ত তাহার মনের মধ্যে একটু আশা জাগিতেছিল যে, ফেলিয়া-দেওয়া পাটিটিও হয়ত এমনি করিয়া কোনো আশ্চর্য্য উপায়ে আমি ফিরাইয়া দিতে পারিব। কিংবা পণ্ডিত লোকে এক রকম ভুল দুবার করে না বলিয়াই হয়ত এ পাটিটিকে ব্রাহ্মণ আর ফেলিয়া দিতে পারিল না।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮।

———

বাংলা ভাষার সংস্কার

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

সময়টা যখন আমাদের ইংরেজীনবিসদের হাতের উপর ভারি হইয়া বোল (১) অর্থাৎ ভাষা কথায় যখন কোন কাজকর্ম না থাকে, তখনই ইঁহারা কেহ কেহ বাঙ্গলা ভাষায় একটু সখের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। অবসর বড় বালাই। অবসরের ছিদ্র পথেই যত শয়তান মানুষের ঘাড়ে চাপে। কাজ না থাকিলে উপযুক্ত ভাইপো খুড়ার গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করেন; এবং কাজ নাই বলিয়াই অনেক সখের সাহিত্যিক ভাষার সংস্কারক সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কেহ বা বলিতেছেন বাংলা অক্ষরগুলির চেহারা বড় খারাপ; হয় উহাদিগকে রোমান ছাঁচে ঢাল, নাহয় নাগরাই পেটা কর। কেহ বা বলিতেছেন হে অক্ষরের ঘাড়ে অক্ষর চড়িলে ছেলে-খেলার মত দেখায়; উহারা গম্ভীর ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকুক। কেহ বা বানান সংস্কার করিতে গিয়া অ-গুলির গাল টিপিয়া ও করিয়া দিতেছেন এবং বর্গীয় অনুনাসিককে আস্ত একটি বর্ণরূপে খাড়া করিতেছেন। ইহাতে ভাষা শিখিবার বা লিখিবার কোন প্রকার সাহায্য হইতেছে কি না সেকথা ভাবিবার ইঁহাদের অবকাশ নাই। যে ধাতুর গুণে সংস্কারকেরা আপনার ছাড়া পরের কথা বিচার করিতে পারেন না এবং যে পথে দেবতারাও যাইতে সাহস করেন না, সে পথে অগ্রসর হয়েন, সেই ধাতুর ইংরেজি নাম brass। ১। রাশিয়া বাদ দিলে বাদ বাকি ইউরোপটা যতখানি, আমাদের ভারতবর্ষটা প্রায় তত বড়। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কোন কোন সংস্কারক মনে করেন যে যদি আমরা সকলে মিলিয়া একরকম অক্ষর লিখি, তবে হয় ভাষাগুলি এক হইয়া যাইবে, না হয় ত নিদান পক্ষে আমরা পরস্পরে পরস্পরের ভাষা শিখিয়া ফেলিব। বাঙ্গলা এবং আসাম দেশের অক্ষর একইরূপ অথচ বাঙ্গালীরা আসামের ভাষা শিখিয়া ফেলে না কেন? ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ইটালিতে এবং আরও অন্য অন্য দেশে একই রকমের অক্ষর প্রচলিত আছে বলিয়া কি ইংরেজেরা ফরাসী বা ইটালিয়ান শিখিয়া থাকে? দায়ে পড়িয়া না শিখিলে কিম্বা প্রাণের টানে না শিখিলে কেহই পরের ভাষা শিখিতে পারে না; তাই ইংলণ্ডে অল্পসংখ্যক কয়েকজন শিক্ষিত লোক ভিন্ন ফরাসীভাষাবিৎ লোক পাওয়া যায় না। ফরাসীদেশে অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া ইংরেজী জানা লোক বাহির করিতে হয়। অক্ষরের সাদৃশ্য ছাড়াও স্পেন পর্ত্তুগালের ভাষা ইটালিয়ানের বড় কাছাকাছি; তবুও ত উহারা পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করে না। যাহারা প্রত্নতত্ত্বের জন্য বা অধিক বিদ্যালাভের জন্য অন্য দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে চান, অক্ষরের বাধা তাঁহাদের কাছে অতি তুচ্ছ। ভারতে যত শ্রেণীর অক্ষর প্রচলিত আছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সেগুলি চিনিয়া ফেলিতে পারেন। স্বইজারল্যাণ্ডে জার্মান ভাষা চলে, ফরাসী ভাষা চলে,

(১) এইরূপ অপূর্ব্ব বাঙ্গলা লিখিয়া আমিও ভাষা-সংস্কারক হইতে ইচ্ছা করি।

তবুও কিন্তু একতায় বাধা নাই। মিলনের যাহা যথার্থ বাধা, আমরা তাহা দূর করিতে শিখি নাই; কেবল অবান্তর কথা লইয়া সময় নষ্ট করিতে শিখিয়াছি।

যাঁহারা অক্ষরের একতা সাধন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক বিদ্যা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। নাগরী নাকি আমাদের পূর্বকালের অক্ষর ছিল এবং সংস্কৃত ভাষার নাকি ঐগুলি লিখিবার অক্ষর ছিল। এই সকল কথা কহিতে যাঁহারা লজ্জাবোধ করেন না তাঁহাদের ধৃষ্টতা অসীম। একদিকে দীনেশচন্দ্র সেনের মত পণ্ডিতেরা বুদ্ধদেবকে বাঙ্গলা অক্ষর শিখাইয়া দিতেছেন, অন্যদিকে আবার অপূর্ব্ব ঐতিহাসিকেরা বাঙ্গলা অক্ষরকে নাগরীর বাচ্ছা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই গেল এক শ্রেণীর সংস্কারকের কথা।

২। বর্ণপরিচয় করিয়া ফেলিতে পারিলেই যে একটি ভাষার সকল শব্দ উচ্চারণ করা যাইতে পারিবে একথা কোন তাজা ভাষার সম্বন্ধে কদাচ খাটিতে পারে না। যেমন অক্ষর, তেমনি বানান আর তেমনি উচ্চারণ, এ ত্র্যহস্পর্শগুণ ঘটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য। সংস্কৃত নামে পরিচিত ভাষায় বর্ণগুলির বাঁধা উচ্চারণ দেখিতে পাই। এ-কার ও-কারের হ্রস্ব উচ্চারণ নাই, কুত্রাপি accent নাই, এ অসাড়তা কোন কথা কহিবার ভাষায় থাকিতে পারে না। ছান্দস বা বেদের ভাষায় ঐগুলি ছিল না; accent যোগে এ-কার ও-কারও অনেক স্থানে হ্রস্ব উচ্চারিত হইত। এবং ভাব অনুসারে কথায় accent পড়িত। আন্ধ্র এবং তামিল ভাষায় প্রাচীনকালের স্বরবর্ণগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য অধিক হইয়া পড়িয়াছে। হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও উচ্চারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে ছান্দস ভাষাজাত প্রাকৃত ভাষাকে ঘসিয়া মাজিয়া 'সংস্কৃত' নাম দেওয়া হইয়াছিল সে প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত উচ্চারণই ছিল। লোকের সাধারণ ব্যবহারের ভাষা ছিল না বলিয়া অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কৃতে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কোন জীবন্ত ভাষায় চলিতে পারে না।

ঠিক উচ্চারণের মত করিয়া বানান করিব, এ কাজ কেবল দুরূহ তাই নয়। উহার ক্ষণস্থায়ী সুবিধা অল্প দিনেই ফুরাইয়া যায়। শব্দ যত ছোট হউক, যত সোজা হউক, সাধারণে উচ্চারণে সর্ব্বদাই উহার বিকৃতি হইতেই থাকিবে। এরূপ স্থলে যদি উচ্চারণের কোন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম ধরিতে পারা যায়, তবে সেই নিয়মটি বলিয়া দিয়া শব্দ উচ্চারণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শব্দ-তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তখন আশা করিয়াছিলাম যে বিস্তৃত ভাবে বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণের নিয়মগুলি কেহ লিখিয়া ফেলিবেন। প্রবাসী পত্রে যখন ঐ গ্রন্থখানির সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন ঐ বিষয়ে দু-চারটি কথা লিখিয়াছিলাম। ক-এ ও-কার দিয়া না লিখিলেও যখন প্রায় ও-কারান্ত করিয়া কলু পড়ি, বিশেষ্য হইলে মত কথাটি হসন্ত করিয়া উচ্চারণ করি এবং সদৃশ অর্থে ব্যবহার করিলে অক্ষর দুইটিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রথম অক্ষরে অর্দ্ধ ও-কার এবং শেষ অক্ষরে পূর্ণ ও-কার যোগ করি, ভিক্ষা লিখিলেও ভিক্কে পড়ি, চূলা লিখিলেও চূলো পড়ি, তখন উচ্চারণের নিয়ম নির্দ্দেশ করাই প্রয়োজন। উচ্চারণের মত করিয়া বানান করিলে কিছু ফল হইবে না। আমাদের এক্যারের যে উচ্চারণ ইংরেজী at শব্দে আছে, ঐ উচ্চারণটি বাঙ্গলা দেশের বিশেষ উচ্চারণ। উচ্চারণের নিয়ম নির্দ্দেশ না করিলে এক এবং একুশ শব্দের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর চাই। "কাল একটি কাল ছেলে বলিল—পাত পাত ভাত খাইব" এ স্থলে একটি অক্ষরকে হসন্ত দিয়া এবং অন্য অক্ষরটিতে ও-কার যোগ করিয়া না লিখিলেও এক বানান দেখিয়া শব্দ উচ্চারণ করিতে গোলে পড়িতে হয় না; এবং যে নিয়মে উচ্চারণ স্বতন্ত্র হইয়া যায় তাহাও ধরিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে বাঙ্গলা বর্ণমালার উচ্চারণ সম্বন্ধে দু-চারিটি কথা বলিতেছি।—

অ—বাঙ্গলায় এই অক্ষরটির উচ্চারণ কতকটা ও ঘেঁসা। প্রাচীন পালিতে এবং মগধ দেশের প্রাকৃতে অনেকস্থলে ঠিক এবরূপ উচ্চারণ ছিল। আমরাই কেবল এখন সেই উচ্চারণের উত্তরাধিকারী আছি। সংস্কৃত ভাষা পড়িবার সময়ে উহাকে যে ভাবে উচ্চারণ

করিতে হয়, সে উচ্চারণ আ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ মাত্র। মহারাষ্ট্রে এবং দ্রাবিড় ভাষায় যে ভাবে উচ্চারিত হয় তাহাতে উহাকে আমাদের আ বলিলেই চলে। কেননা আমাদের আ দীর্ঘ না হইয়া বরং হ্রস্ব উচ্চারিত হইয়া থাকে। বৈদিক বা ছান্দস ভাষায় অনেকস্থলে অ-কারটির কিঞ্চিৎ ও-ঘেঁসা উচ্চারণ হইত, এবং সেই ঐতিহ্যেই পালিতে উহার উচ্চারণ সংক্রমিত হইয়াছে। বৈদিক প্রাতিশাখ্যে (অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য, ১—৩৬; বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য, ১—৭২) এবং পাণিনির শেষ সূত্রে অ-কারের ঐরূপ উচ্চারণের কথা আছে। উহার নাম "সংবৃত" বা চাপা উচ্চারণ।

আমরা দেখিতে পাই যে যেগুলি খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ অথবা যেগুলি বহুকাল থেকে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সে-সকল শব্দে অ-কারের সর্ব্বত্রই সংবৃত উচ্চারণ। সংস্কৃত কথা হইলেও লক্ষ্য, কল্য, অতি, গণ্য, হয় প্রভৃতি শব্দে সংবৃত বা বাঙ্গলা অ উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু যেখানে কথাগুলি খাঁটি সংস্কৃত, কেবল কদাচিৎ মানুষের নামকরণে বা অন্যরকম পোষাকি ব্যবহারে কথাগুলি ব্যবহার করি সেখানে পূর্ণ অ-কার উচ্চারণ করি। যথা—কমল, অক্ষয়, অপূর্ব্ব প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন যে, র-ফলা-বিশিষ্ট বর্ণের সহিত "অ" লিপ্ত থাকিলে তাহা "ও" হইয়া যায়। যথা ব্রজ, ভ্রম প্রতাপ ইত্যাদি। কিন্তু "য়" পরে থাকিলে হয় না। যথা—ক্রয়, ত্রয় ইত্যাদি। পাঠকেরা দেখিতে পাইতেছেন যে, এখানেও আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মই খাটিতেছে, নূতন সূত্রের প্রয়োজন হইতেছে না। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যতিক্রম সূত্রটিও গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলি আমার সাধারণ সূত্রের মধ্যেই পড়িতেছে। কোন ব্যতিক্রম সূত্র না করিয়াই বুঝিতে পারি যে অকিঞ্চন, অকুতোভয়, অধ্যাপক, অনৃত, প্রভৃতির অ-কার বাঙ্গলার মত উচ্চারিত হইবে না।

অনেকগুলি শব্দ আছে সেগুলি বিশেষ্য হইলে হসন্ত উচ্চারিত হয়। কিন্তু ক্রিয়াপদ বা বিশেষণ হইলে স্বরান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে, এবং কাজেই বাঙ্গলা অকারের উচ্চারণ প্রবল হইয়া উঠে। প্রায়শঃই এইগুলি দুই অক্ষরের শব্দ। যেমন বল (শক্তি) এবং বল (কথা কও), মত (অভিপ্রায়) এবং মত (সদৃশ)। দুই অক্ষরের নিম্নলিখিত বিশেষণ শব্দগুলিতে অক্ষর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়। যথা—ভাল, কাল ইত্যাদি। আলো শব্দটি লএ ও-কার দিয়া লিখিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ভাল বলিতেও ও-কার দিতে চান। আলো কথাটি আলোক শব্দ হইতে। কাজেই উহাতে ও-কার আছে। কিন্তু অন্যগুলিতে ও-কার না দিলেও বাঙ্গলা নিয়মে ও-কার যোগ করিবার মত উচ্চারণ করিতে হইবে।

আ—আ-কার উচ্চারণ যে যে স্থলে এ-কার এবং যে যে স্থলে ও-কার হইয়া আসে রবীন্দ্র ঠাকুর শব্দতত্ত্বে তাহার সুন্দর দুইটি নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা লিখি পিঠা, চিড়া, কন্যা, ভিক্ষা; কিন্তু উচ্চারণ করি পিঠে, চিঁড়ে, কন্নে এবং ভিক্ষে। এবং লিখি কুলা, চুলা, চুমা, মুঠা, কিন্তু উচ্চারণ করি কুলো, চুলো, চুমো ও মুঠো। এরূপ স্থলে নিয়মটি ধরাই উচিত। উচ্চারণের মতন করিয়া বানান পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়।

বাঙ্গলার যুক্ত অক্ষরগুলি যদি কৈবল্যলাভ করিয়া মুক্ত হয়, হউক। কিন্তু কি প্রয়োজনে উহাদিগকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে একবার জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এখনও যুক্ত অক্ষরগুলি তাহাদের প্রাচীনরূপে একটা ইতিহাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লিখিতে পড়িতে কেহ কোন ক্লেশ অনুভব করিতেছে না। তবে কি জন্য উহারা সঙ্গহীনতা সুখ অনুভব করিবে? কেহ বলিতে পারেন যে, ছাপাখানায় কোন অসুবিধা ঘটে নাই বটে, কিন্তু যখন বাঙ্গলার জন্য টাইপ লেখা কলের সৃষ্টি হইবে, তখন এই জটিল বানান রাখিলে কল গড়ার সুবিধা হইবে না। কল গড়ার যখন দরকার জন্মিবে, তখন যে কলটি গড়িবে সে ব্যবসায়ীদিগের জন্য নূতন চেহারার অক্ষর সৃষ্টি করিতে পারে। প্রয়োজনের তাড়ায় অনেক পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন হয়। তখন যদি দ্রুত লিখিবার নিয়মের অনুরূপ বানান গ্রহণ

করিবার পক্ষে দশজনের প্রয়োজন হয়, তবে ধীরে ধীরে অক্ষরের চেহারা বদলাইয়া যাইবেই। ইচ্ছা করি যে এমন দিন আসুক যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বহু পরিমাণে বাঙলা ভাষায় অনেক কথা লিখিতে হইবে। সে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কাহাকেও কোন প্রস্তাব করিতে হইবে না। আপনা আপনি সুবিধার খাতিরে অক্ষরগুলির চেহারা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যাহা চলিবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বাড়িলে তাহা আপনিই আদৃত হইবে। তখন কল গড়িবার সময় দেখিয়া লইবে যে,উ-কার ঋ-কার প্রভৃতিও অক্ষরের নীচে না দিয়া পাশে দিলে অধিক সুবিধা হইবে কি না? আমরা যখন কল গড়িতেছি না, তখন একটা বৃথা নূতনত্ব খাড়া করিয়া ফল কি? যাঁহারা নূতনত্বের প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া যদি টাইপ লিখিবার কল সৃষ্টি করিয়া ফেলেন এবং সেই কলে যে অক্ষরের যে চেহারা দিলে লিখিবার সুবিধা হয় এবং খরচ সস্তা পড়ে, অক্ষরগুলির সেই চেহারা দিয়া দেন, তাহা হইলে যাহাদের কল কিনিয়া লিখিবার প্রয়োজন, তাহারা নিশ্চয়ই সে কল কিনিবে এবং নূতন চেহারার অক্ষরে কথা লিখিবে। পরিবর্ত্তনের যে সময়ে প্রয়োজন নাই, তখন অযথা কথা লইয়া সময়ক্ষেপ করিবার কিছু সুবিধা দেখিতে পাইতেছি না। মিছাই একটা নূতন কিছু কর বলিয়া সংস্কারক সাজিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৮।

পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। কোন সময়ে পিতৃদেব সাহেবগঞ্জে গঙ্গাবক্ষে বজরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে সেই সময় তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বজরার মধ্যে গিয়া দেখি, টেবিলের উপর দুই চারিখানা বাঁধান ফরাসী গ্রন্থ, আর একখানি ফরাসী-ইংরাজি অভিধান রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থগুলি Victor Cousin-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Le Vrai, le beav, le bien"—অর্থাৎ "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।" উহার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে ফরাসী মূল-গ্রন্থ পড়িবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয়েক কপি বিলাত হইতে আনাইয়াছিলেন। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি ইংরাজি অনুবাদের সহিত মিলাইয়া অভিধানের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে যে অংশ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আমাকে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, আমি অল্পস্বল্প ফরাসী জানি। তাঁহার বার্দ্ধক্যে এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য হইলেও সে সময়ে আমি পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, ঐ কীটদষ্ট গ্রন্থ বোলপুরের লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া পাঠ করি ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই।...

২। একদিন আমাদের বাড়ীর পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া তালপাতায় ক, খ প্রভৃতি অক্ষরে দাগ বুলাইতেছিলাম। বোধ হয় আমার বয়স তখন ৫ বৎসর—সেই সময় পিতৃদেব আমাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। গুরুমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দাঁড়াইলাম না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া, আমাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। আদব-কায়দার প্রতি এমনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

৩। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

আমার প্রণীত পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী নাটক প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন, সেই পত্রগুলি সযত্নে রক্ষা করি নাই বলিয়া এখন দুঃখ হয়।

৪। তিনি প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। যখনই বাড়ী আসিতেন, তিনি আমাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। তাঁহার তেতালার বসিবার ঘরে, দিন কতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিকরূপে মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার দুই-একজন বাহিরের শিষ্যও উপস্থিত থাকিতেন। আমার সেজদাদা গণেশ ঠাকুরের কাজ করিতেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার সমস্ত কথা টুকিয়া লইতেন। তিনি এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেজদাদা কাগজ পেন্সিল লইয়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। কি ব্রাহ্মসমাজে, কি পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে, যেখানেই পিতৃদেব বক্তৃতা করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তিনি যতদূর সম্ভব তাহা অবিকল টুকিয়া লইতেন। পরে পরিষ্কার করিয়া লিখিতেন। এমন কি, পিতৃদেব ঘরে বসিয়া সহজ ভাবে বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহাও তিনি টুকিতে ছাড়িতেন না। আমরা এখন পিতৃদেবের যে-সকল ব্যাখ্যান দেখিতে পাই, উহার অধিকাংশ তাঁহারই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। সেজদাদার পূর্ব্বে মেজদাদাও(১) এইরূপ পিতৃদেবের বক্তৃতা সকল টুকিয়া লইতেন। পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি কোন কোন অংশ সংশোধন করিয়া দিতেন।

৫। আমাদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক উন্নতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কুস্তি শিখাইবার জন্য হীরা সিং নামক একজন শিখ পালোয়ানকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই হীরা সিংহের নিকট প্রসিদ্ধ পালোয়ান অম্বু গুহও শিক্ষা করিতেন। আমাদের বাড়ীতে কুস্তির একটা আখড়া ছিল। আমি তখন শিশু ছিলাম। আমি ইহাতে যোগ দিই নাই। ভাইদের মধ্যে আমার সেজদাদা (৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ব্যায়াম চর্চ্চায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রীতিমত পালোয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। হীরা সিংহের নিকট তলোয়ার, গৎকা, লাঠি সব রকমই শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে আমার সেজদাদা ও অম্বু গুহ সেই সময়ে এই বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব যখন বাড়ী আসিতেন, তিনি আমাদের সকলকে লইয়া আহারে বসিতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, অন্ন ব্যঞ্জনের পর, শেষে চাপাটি ও সন্দেশ আসিত। বোধহয় পিতৃদেব মনে করিতেন, ভাতে যথেষ্ট দৈহিক পুষ্টি হয় না। আবার দিনকতক, কাশী হইতে একজন হালুইকর আনাইয়াছিলেন, সেই হালুইকর রাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট নিম্কি ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত।

৬। পিতৃদেব যখন দেরাদূনে ছিলেন, আমি কোন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি ৺সীতানাথ ঘোষের পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "বেচারা বড় কষ্টে পড়েছে।" এই বলিয়া, সীতানাথকে ১০০০৲ টাকা দিতে আমাকে অনুমতি করিলেন। শুনিলাম সীতানাথবাবু এত টাকা পাইবেন বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই। এইরূপ আরও দুই-একটি দৃষ্টান্ত আছে। পিতৃদেব যখন দান করিতেন, এইরূপেই মুক্তহস্তে দান করিতেন। এই প্রসঙ্গে ৺সীতানাথবাবুর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি তাড়িৎ চিকিৎসার

১। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্য এক প্রকার নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। হিন্দুর তাড়িৎজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৭। কলিকাতায় আমার বড়দিদিমার একখানা বাড়ী ছিল। দিদিমার এক পালিত কন্যামাত্র ছিল। পিতৃদেব ছাড়া তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর কেহই ছিল না। দিদিমার মৃত্যু হইলে সেই বাড়ীর স্বত্ব আমার পিতৃদেবে আসিয়া বর্ত্তিল। সেই বাড়ী দখল করিবার কথা উঠিল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই বাড়ীর উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। বাড়ীটি বেশ বড়। মূল্য ২০।৩০ হাজারের কম হইবে না। কিন্তু পিতৃদেব ঐ বাড়ী দিদিমার পালিত কন্যাকেই দান করিলেন। এইরূপ তাঁহার দয়া ও উদারতা ছিল।

৮। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ৺বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী আমাদের বাড়ীর বেতনভুক্ গায়ক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর তিনি বিষ্ণুর গান শুনিতেন। মাসিক বেতন পাইলেও, গান শুনিবার পর প্রত্যেক বারে ২৲ টাকা করিয়া বিষ্ণুকে পারিতোষিক দিতেন। তিনি ভাল ভাল গায়ককে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন। তন্মধ্যে শ্রীরমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার মতি বাবুর ভ্রাতা রাজচন্দ্র বাবু—ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া আমরা অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে মেজদাদা বড়দাদা বিষ্ণুর গান ভাঙিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। কিছুকাল পরে বড়দাদা মেজদাদা ও আমি—আমরা নানা ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহার যেদিন রচনা হইত, পিতৃদেব সেই রচিত গান সন্ধ্যার পর শুনিতেন। তাঁহার ভাল লাগিলে আমরা উৎসাহিত হইতাম। যখন আমি সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চ্চা হইবে শুনিয়া তিনি ১০০০৲ টাকা খরচ করিতে আমাকে অনুমতি করেন।

৯। প্রায়ই দুই-একজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন। তন্মধ্যে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র...এখন ডাক্তার—আমাদের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুই-একজন বন্ধুর পুত্রকেও, কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য উত্তম ঘর ও উত্তম আহারাদি ব্যবস্থা করিতেন।

১০। তিনি অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি যেখানে বসিতেন তাঁহার সম্মুখস্থ টিপায়ে একটা জেবঘড়ি খোলা থাকিত। তিনি ঘড়ি দেখিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান আহারাদি করিতেন। কখন তাহার ব্যতিক্রম হইত না। কেবল যখন কাহারও সঙ্গে ঈশ্বর প্রসঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইত, তখন সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার জীবনের ঘটনায় ঈশ্বরের করুণার কত নিদর্শন পাইয়াছেন এক-একদিন আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন; বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যেন একেবারে মাতিয়া উঠিতেন—তাঁহার মুখে উৎসাহ ও আনন্দের একটা স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া উঠিত। তখন আর কিছুই হুঁস থাকিত না। যখন হুঁস হইত, তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিতেন।

১১। তাঁহার 'রাশ-ভারী' ছিল। তিনি যখন বাড়ী থাকিতেন, তখন যেন বাড়ী 'গমগম' করিত। পাছে কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়, চাকর-বাকর সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। সব কাজ ঠিক নিয়মে চলিত। তিনি কাহাকেও শাসন করিতেন না, অথচ সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ হইত। তিনি যখন বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেন তখন চাকর-বাকরদিগের মন হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নামিয়া যাইত। ইণ্ডিয়ান মিরারের লেখক কাপ্তেন পামার কখন কখন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। পিতৃদেব বিদেশে চলিয়া গেলে, পামার সাহেব বাড়ীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন :—"When the cat is away the mice will play !"

১২। আমাদের কাহারও কোন দোষত্রুটি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি পারিবারিক উপাসনার সময় উপাসনা মণ্ডপে সাধারণ উপদেশচ্ছলে এমন ভাবে বলিতেন যে দোষী ব্যক্তি তাঁহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইত।

১৩। আমি যখন শিশু ছিলাম, পিতৃদেব তাঁহার এক বন্ধু বেণী বাবুর সহিত কখন কখন দাবা খেলিতেন। কিন্তু তাস খেলিতে কখন তাঁহাকে দেখি নাই।

১৪। পিতৃদেব স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার শৈশবকালে দেখিতাম, একজন তিলক কাটা বৈষ্ণবী ঠাকরুণ আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আসিতেন। তারপর মিস্ গোমিস্ প্রভৃতি খৃষ্টান মেয়েরা বাঙ্গালা শিখাইতে আসিতেন। "এইরূপে আমরা মুখ ধুই মুখ ধুই, তা দেখাইবার পূর্ব্বে" (অর্থাৎ মুখ দেখাইবার পূর্ব্বে)—"একবার নাহি পার পুনর্ব্বার লাগো, সাধ্যমত চেষ্টা কর পুনর্ব্বার লাগো"—এই সকল বাক্য অভ্যাস করান হইত আমার মনে পড়ে। তার পর পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আমাদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতেন। ইহাই বিশুদ্ধ শিক্ষা। যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয়, তখন পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

১৫। পিতৃদেব আমাদের সকলকেই একে একে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্লোক পাঠ করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন। হ্রস্ব দীর্ঘ রক্ষা করিয়া, বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে টানা-সুরে আমাদিগকে শ্লোক পাঠ করাইতেন। এত অল্প বয়সে উপনিষদের গভীর তত্ত্ব-সকল বুঝিতে পারিব না বলিয়াই বোধ হয় তিনি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেন না। তবে তখন হইতে ঐ সকল শ্লোক আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া থাকিলে, ভবিষ্যতে আমরা উহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিব, ইহাই বোধ হয় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। আমাদের সময় আমি ও আমার খুড়তুত ভ্রাতা ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমরা দুইজনে প্রতিদিন প্রাতে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করিতাম। কিছুকাল পরে, ৺রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রদ্বয় তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ শিক্ষা করিতে আসিতেন। পরে, ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আমাদের বাড়ীর পূজার দালানে একটি ছোটখাট পাঠশালাও খোলা হয়। এই পাঠশালায় বাহিরের চারি-পাঁচজন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করাইতেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু, ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের অ্যাটর্ণী, "ভারতী"র সাহিত্য-সমালোচক, সুলেখক, সুকবি) পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখানা বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ তাঁহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন। আমার দীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য পিতৃদেব প্রতিদিন তাঁহার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। আমার উপনয়নের সময় পিতৃদেব বাড়ী ছিলেন না। আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অনুসারেই হইয়াছিল। আমার দীক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোধ হয়, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান।

১৬। একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয়, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধহয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮।

অপমান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
যাদের সম্মুখে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে
ধূলায় সে যায় বয়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,—
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান;
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

২০শে আষাঢ়, ১৩১৭। প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩১৭

স্বপ্ন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সে গেছে আমার মর্ম্মপটে
ছায়ার মত ভেসে।
সে গেছে আমার হৃদয়তটে
ঢেউয়ের মত এসে;
তারে নয়নভরে দেখেছিলাম,
বুকের ভিতর রেখেছিলাম,
রক্ত দিয়ে ঘিরে;
সুখের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম
সোনার মুকুটিরে।

সে প্রথম যৌবন এসেছিল
আমার দৃষ্টিপথে,
সে সুখের মত ভেসেছিল

আমার মনোরথে ;
তাকে মহারাজার মতন করে
আদর করে যতন করে,
নিয়েছিলাম তবে ;
সেদিন ভরেছিল জীবন আমার
মহামহোৎসবে ।
সেদিন পুষ্পে পুষ্পে কুঞ্জভবন
উঠল আমার সেজে ;
সেদিন রোমাঞ্চিত করে পবন
উঠল বীণা বেজে ;
সুখে হৃদয় আমার ভরে গেল
ডুবে গেল, মরে গেল
সন্ধ্যাসম মেঘে :
যেন উঠলাম আমি জন্ম হতে
জন্মান্তরে জেগে ।
যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে
স্বপ্ন গেল টুটে ;
হঠাৎ বীণার তারটি গেল ছিঁড়ে
আর্তনাদে উঠে ;
এখন বহি সন্ধ্যার গভীর তানে
বীণার সবে কবির পানে
চেয়ে নিরবধি ;
সেই স্বপ্ন আমার যুগের ঘুমে
একবার আসে যদি ।

'প্রবাসী'—বৈশাখ, ১৩১৫ ।

মণি

(একটি শিশুর প্রতি)

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

হে সুন্দর ! বল্ বল্, কোন্ স্বপ্ন-লোকে,
নাগিনী-অলকে,
হাসিয়া উজ্জ্বল হাসি, ছড়ায়ে চন্দ্রিকারাশি,
ছিলি তোর নিজেরি ঝলকে ?
কোন্ নীল অম্বরেতে, নীহারিকা-আলয়েতে,
ছিলি তুই লগ্ন ?
উজলিয়া বিভাবরী, সারা বিশ্ব আলো করি',
আপন আনন্দে আহা আপনি নিমগ্ন ।
কোন্ নব অলকাতে বাসন্তী উষাতে,
ফুটেছিলি তারারত্ন ! ভুবন ভুলাতে ?

২

তোরে হেরি', এ কি হেরি ? রঙ্গিনী পার্ব্বতী,
বসন্তভূষণা !
অঙ্গে অঙ্গে ফুল ফোটে, অলি ঝঙ্কারিয়া ছোটে,
লীলাময়ী, ললিতগমনা ।
জিনি রক্ত পদ্মরাগ, তনুতে অশোক-রাগ,
যায় গিরিকন্যা,—
সুন্দরীর পাদস্পর্শে, কাঁপিয়া রাঙিয়া হর্ষে,
গিরি-অশোকের শাখা হইল সুধন্যা !
জিনি সেই পদ্মরাগ, জিনি সে অশোক,
হে সুন্দর ! তোর ঐ রঙীন আলোক ।

৩

হেরি ও চিক্কণ হাসি, অনিন্দ্য বদন
ও যে মনোহর !
ভেদি এ পাষাণ প্রাণ ঝঙ্কারি ললিত তান,
ছুটে মোর কবিতা-নির্ঝর ।
দিব্য নেত্রে হেরি আমি মোহিতে দিল্লীর স্বামী,
সাজিছে সুন্দরী !
মুকুরে হেরিয়া মুখ, পাইল অপূর্ব্ব সুখ ;
ঝল মল কোহিনূরে ভূষিল কবরী
নূরজাহানের সেই কোহিনূর মণি
জিনি তুই, ওরে মণি ! লাবণ্যের খনি !

৪

তোরে হেরি হে সুন্দর ! আমার এ প্রাণে
বহিল মলয় !
হিম ঋতু অবসান, কোকিল ধরিল গান ;
আকালিক বসন্ত উদয় !
হেরিতেছি দুঃখী যক্ষ, পেয়েছে প্রিয়ার বক্ষ,
ফিরিয়া হরষে

জারাপতি কুতুহলে, হের দেখ গলে গলে।
চন্দ্রকান্তমণি গলে চন্দ্রিকা-পরশে।
অলকায় জলজল চন্দ্রকান্তমণি
জিনি তুই, ওরে মণি, লাবণ্যের খনি।

৫

কি যাদু জানিস জাদু! যে পরশমণি,
ও তোর পরশে,
হীনকান্তি লৌহনিভা, ধরিল কাঞ্চন-বিভা,
ভাবপদ্ম মানস-সরসে।
কোন্ অজানিত টানে টানিলি আমার প্রাণে,
অয়স্কান্ত মণি?
ঘুচিল কলুষজ্বর, ব্যাধিহীন এ অন্তর,
স্পর্শে তোর, ওরে মোর চারু চিন্তামণি।
মুমূর্ষু কবিতা ছিল নয়ন মুদিয়া;
স্পর্শে তোর হর্ষে ধনী উঠিল বসিয়া।

৬

কোন্ সে বৈকুণ্ঠে ছিলি, বিষ্ণুর উরসে
কৌস্তভ রতন?
তোরে পেয়ে, ওরে মণি পাইল নয়নমণি
আমার এ আঁধার নয়ন।
এ কি আলোকের বন্যা! চারিধারে চুনি, পান্না
হীরক মোহন।
ঘুচিল ঘুচিল ত্রাস, টুটিল মায়ার ফাঁস,
এ কি! এ কি! এ কি হেরি অপূর্ব্ব দর্শন!

প্রাণ মুগ্ধায়নে আহা হাসিছে দুলাল,
নীলকান্ত মণি মোর!—ননীচোরা লাল।
হসঙ্গাবাদ। প্রবাসী—মাঘ, ১৩০৭।

মেথর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি;
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে,—
হে বন্ধু! তুমিই একা মেনেছ সে বাণী।
নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশি,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩১৬।

সাগর পারে

সীতা দেবী

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমার বিবাহ হয় ২০শে সেপ্টেম্বর। আমার স্বামী তখন ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে বইয়ের ব্যবসা করতেন। ঐ দূরদেশে গিয়ে ঘর করতে হবে। সেইভাবেই সব জিনিষপত্র গোছগাছ করা হতে লাগল। কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার, বাসনপত্র এসব দেওয়া হল, আসবাব কিছু দেওয়া হল না কারণ রেঙ্গুন তখন কাঠের জিনিষের জন্য বিখ্যাত, সেখানে গিয়েই ওসব কেনা হবে ঠিক হল।

আমার মা তখন অত্যন্তই অসুস্থ। কাজেই ধুমধাম করবার উপায় ছিল না। নিজেদের বাড়ীতেই বিয়ে হল, লোকজন যাঁদের না ডাকলে নয় তাঁদেরই ডাকা হল। বরের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, কলকাতায় তাঁর আত্মীয়-স্বজন তখন বেশী ছিলেন না, কাজেই বরযাত্রীও তেমন কেউ আসবেন না মনে হয়েছিল। তবে আমার শ্বশুর মশায় বিয়ের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। বরের বন্ধুবান্ধব দু-চারজন এসেছিলেন।

বিবাহের আসরে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। তখন বিশেষ কোনো কাজে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও বিয়ে এবং বউভাত দুদিনই এসেছিলেন তিনি। বিয়েতে গান করেছিলেন আমার পরলোকগতা ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী অরুন্ধতী। রবীন্দ্রনাথ গানের প্রশংসা করেছিলেন।

বিবাহের পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাবার কথা। কলকাতায় তখন শ্বশুরবাড়ী বলতে কিছু ছিল না। এক কুটুম্বের বাড়ীতেই গিয়ে উঠেছিলাম, ল্যান্সডাউন রোডে। এই বাড়ীতেই বউভাত হয় এবং এখান থেকেই আবার বাপের বাড়ী ফিরে যাই। সেখান থেকে রেঙ্গুন যাত্রা।

অত দূর দেশে মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে আমার বাবা মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। সেখানে কেউ আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না আমাদের। আমাদের মা অতি অসুস্থ হয়ে পড়ায়, বাবাই এতকাল একাধারে মা আর বাবার কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত সন্তানবৎসল ছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় আমরা দুই বোন যখন স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন আমাদের স্কুলে রেখে এসে বাবা সারা দিন মন খারাপ করে ছিলেন। এবার ত মেয়েকে কত দূরে পাঠিয়ে দিতে হল, কখন আবার দেখতে পাবেন তার কোনো স্থিরতাও রইল না। আমি চলে যাবার পর বাবা একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েন। অনেকদিন ভুগে ছিলেন heart-এর অসুখে।

B. I. S. N.-এর জাহাজে করে বর্মা যাওয়া হত তখন। প্রথম যে জাহাজটা করে যাই, সেটার নাম Aronda বোধহয়। সে ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের কথা। এখনও ঐ জাহাজের লাইনটাই চালু আছে কি না জানি না। জিনিষপত্র নিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও কিছু বন্ধু-বান্ধব সহকারে সকাল সকাল ত Outram Ghat-এ এসে উপস্থিত হলাম। তখনও জাহাজ ছাড়তে কিছু দেরি ছিল। ঘাটের উপর-তলার বারান্দায় বসে গল্পসল্প করতে লাগলাম। আমার খুড়তুতো ভাই হেমন্ত কয়েকখানা ছবিও তুলল। যাত্রী প্রচুর, সমস্ত জায়গাটা একে-বারে ছেয়ে গেছে স্ত্রী, পুরুষ, কাচ্চা বাচ্চায়। গোলমালে কান পাতা যায় না। অধিকাংশই থার্ড ক্লাসে ডেকের যাত্রী। তাদের সব দায়সারা গোছ স্বাস্থ্যপরীক্ষাও হচ্ছে মনে হল।

ষ্টীমারের শিঙা হঠাৎ ঘোররবে বেজে উঠল। থার্ড ক্লাসের যাত্রীর দলে মহা তাড়াহুড়ো বেধে গেল। পুলিশের গুঁতো, খালাসীদের বাধা সব অগ্রাহ্য করে তারা জাহাজের সিঁড়ির দিকে ছুটল। যা ধাক্কাধাক্কি,

পড়ে গিয়ে যে কেউ সলিল-সমাধি লাভ করল না সেই ঢের। পোঁটলা-পুঁটলি দুচারজনের খোওয়া গেল, কিন্তু সেদিকে কারো নজর আছে বলে মনে হল না।

ধাকাধাকিটা খানিকটা কমলে আমরা জিনিষপত্র নিয়ে উঠলাম। সিঁড়িটা মোটেই সুবিধার নয়, উঠতে একটু কষ্ট হল। এর আগে কখনও বড় ষ্টীমারে করে দূরে কোথাও যাইনি, তাই ভয় না করলেও একটু অসোয়াস্তি লাগছিল। সবাই মিলে sea sickness সম্বন্ধে এত সাবধান করেছিল, যে, সে আশঙ্কাটাও একেবারে যে ছিল না তা নয়। উপরের ডেক তখন একেবারে যাত্রীতে ঠাশা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে দিয়েই এগোতে হল। যাত্রীরা সকলে ঠেলাঠেলি মারামারি করে নিজেদের জন্যে একটু ভাল জায়গা দখল করতে ব্যস্ত। একটা মাদুর বা শতরঞ্চি ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। যে পারবে তার সেখানে অখণ্ড রাজত্ব। হিন্দুস্থানী মহিলারা এ বিষয়ে খুব মজবুত। ঠেলাঠেলি এবং মারামারি করে তারা মোটা মোটা ভোজপুরী ও পাঞ্জাবীকে হটিয়ে দিয়ে ভাল জায়গা দখল করে বসছে। "ইয়ে হামারা এলাকা" বলে তারা যেরকম জোরের সঙ্গে চেপে বসছে, ততখানি জোর ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইও প্রকাশ করেছিলেন কি না সন্দেহ।

শামলা মাথায়, চোগা চাপকান পরা জাহাজের 'বয়'-গুলি প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনের নম্বর দেখে নিয়ে তারা যাত্রীদের নিজের নিজের কোটরে পৌঁছে দিচ্ছে।

কেবিন দেখে তা আমার প্রায় চক্ষুস্থির। এগুলি যে এত ছোট তা আমার ধারণা ছিল না। এর মধ্যে এত জিনিষপত্র নিয়ে তিন-চার দিন দুটো মানুষ থাকব কি করে? যেমন করেই হোক থাকতে ত হবে। তবে কেবিনটি ছোট হলেও বেশ তকতকে পরিষ্কার। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে সবই ধোপার বাড়ীতে কাচা পাট-ভাঙা। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে, bunk-এর তলায় গুঁজে দিয়ে ঘরটাকে একটু ফাঁকা করা গেল, মনে হল এখন নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে। একটা port hole দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখলাম। জাহাজের শিঙা তখনও ভৈরব নিনাদে বেজে চলেছে, এখনি ছাড়বে বোধ হয়। ডেকের উপর মহা ভিড়, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তীরের মানুষদের সঙ্গে চীৎকার করে কথা বলছে। বেশীর ভাগেরই চোখ ছলছল করছে। আবার কেউ বা হাসি-তামাসা দিয়ে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাকে চাপা দিচ্ছে। খালাসীরা চীৎকার করে সিঁড়ি তুলতে আরম্ভ করল। তাদের চীৎকার শোনবামাত্র যাত্রী ছাড়া আর যারা জাহাজে উঠেছিল, সবাই নেমে গেল। ষ্টীমারের লোহার দেহ দুলে উঠল, বিরাট্ হৃৎস্পন্দনের মত তার ভিতরে স্পন্দন হতে লাগল। ষ্টীমার ধীরে ধীরে তীর থেকে সরে যেতে লাগল। জেটির দোতলা থেকে আত্মীয়-বন্ধুরা আর ডেকের উপর থেকে যাত্রীরা রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিতে লাগলেন। বাচ্চাকাচ্চারা অনেকে কান্না জুড়ে দিল। জাহাজের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল, দেখতে দেখতে ষ্টীমার বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। তীরের লোকজন আর দেখা গেল না।

আমার স্বামী এর আগে কয়েক বার রেঙ্গুন থেকে যাওয়া আসা করেছেন, কাজেই এখানকার নিয়ম কানুন তাঁর খানিক জানা ছিল। এখানে কেবিনের যাত্রীরা অনেকে জাহাজের খানা খান, তবে তাতে গরু ও শুয়োরের মাংসও থাকে বলে যাঁরা জাত রাখতে বেশী ব্যস্ত, তাঁরা এক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সঙ্গে করে চাল ডাল ঘি তেল তরি তরকারি সব নিয়ে যান, রান্নার বাসনও নিয়ে যান। জাহাজে ভাণ্ডারী নামক এক হিন্দু দোকানী থাকে। সে হিন্দু খালাসীদের জন্যও রাঁধে বোধহয়। তার হাতে যদি মেপে জুখে এই-সব চাল ডাল তরকারি প্রভৃতি ডেকচিতে করে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে খানিক বাদে রান্না করে এনে দেয়। ভালই রাঁধে তবে দারুণ ঝাল। আমরা সেই ব্যবস্থাই করলাম। এই রকম জাহাজের কেবিনে বসে আমার প্রথম সংসার আরম্ভ হল।

জলযাত্রা আমার এই প্রথম। স্নান করা প্রভৃতি ব্যাপারে খানিকটা সুবিধা পাবার জন্য জাহাজের মেথরকে (তার নাম "টোপাজ") ডেকে আনা হল। তাকে যথাশিশ কবুল করে ব্যবস্থা করা হল যে, অন্য যাত্রিণীরা গিয়ে বাথরুম নোংরা করার আগে সে আমার স্নানের ব্যবস্থা করে দেবে। কাপড়চোপড় কাচার দরকার হলে সে-ই চালিয়ে দেবে।

স্নান সেরে এসে আবার port hole দিয়ে উঁকি মারলাম। প্রচণ্ড ঢেউ উঠছে, যেন লাফ দিয়ে কেবিনের মধ্যে এসে ঢুকতে চায়। জলের রংও অনেক গাঢ়তর নীল, প্রায় কালির মত। দূরে অতিদূরে তীরের অস্পষ্ট আভাস, তরুশ্রেণীর নীলাভ ছায়ামূর্তি। জাহাজের 'প্রপেলর'-এর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

রান্না হয়ে এল খানিক পরে। চেহারা আর গন্ধ ভালই তবে মুখে নিয়ে প্রায় চোখের জল বেরিয়ে এল। একটা গোটা পাতিলেবু খরচ করে কিছুটা খাওয়া গেল। জাহাজ-বাসের সময় আর যে সুখই হোক খাওয়ার সুখ হবে না, সেটা বুঝতেই পারলাম। চায়ের সঙ্গে রুটি মাখন প্রভৃতি যা এল, তাতেও বেশ স্নাপখালীনের গন্ধ।

চা খাবার পর কেবিনের 'বয়' বাসন নিয়ে যেতে এল। বাসন তুলে নিয়ে সে কেবিন ঝাঁট দেওয়া, বিছানা ঠিক করা প্রভৃতি কাজ সারতে লাগল। আমি বসে বসে তার কাজ দেখতে লাগলাম। লোকটি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবু আপনার বাড়ী কোথায়?"

আমি ত অবাক্। বাবু আবার কোথা থেকে কে এল? ঘরে ত একমাত্র আমিই রয়েছি? আমারই দিকে সে হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে, কোনোক্রমে হাসি চেপে বললাম, "কলকাতায়।"

'বয়' বলল, "আমি ছ'মাস কলকাতায় ছিলাম। খাসা মুলুক। এ জাহাজে কাজ করে দেশের কথা ত এক রকম ভুলেই গেছি। কথা কইবার লোকই মেলে না।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "তোমার দেশ কোথায়?"

সে বলল, "চাটগাঁয়ে। কিন্তু বিশ বছর দেশে যাইনি।"

কাজকর্ম সেরে ত সে চলে গেল। কেবিনের সহযাত্রী ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি বলত? লোকটা আমাকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করল কেন?"

উত্তরে শুনলাম যে, কেবিনে যে-সব বঙ্গ ললনা সচরাচর যান, আমি ঠিক সে রকম নয়। তাই বেশী সম্মান দেখাবার জন্যেই হয়ত 'বাবু' বলেছে। অথবা মহিলাদের কি ভাবে সম্বোধন করা যায় সেটা বোধ হয় ভেবে পায় নি।

সারাটা দিন ঐ কয়েক ফিট লম্বা খুপরীর মধ্যে বসে থাকা যায় না। বিকালের দিকে কাপড়চোপড় বদ্‌লে ডেক্-এ বেড়াতে চললাম। কিন্তু ডেক্-এ যা ভিড়, তার মধ্যে ঘুরে বেড়ান সহজ নয়। রেলিংএর ধারটা খানিকটা ফাঁকা, কারণ ওখানে জলের ঝাপটা এসে ল্যাগে, কাজেই যাত্রীরা ভিজে যাবার ভয়ে যতটা পারে সরে বসে। সেই খানটাতেই খানিকটা ঘোরা ফেরা করা গেল। যাত্রীগুলিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, তারা ও আমাকে দেখতে কসুর করল না। পাঞ্জাবী কাবুলী, মারাঠী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, সব প্রদেশের মানুষ আছে। বাঙালী যাত্রীও অনেক রয়েছে। স্ত্রী পুরুষ আণ্ডাবাচ্চা সব গাদাগাদি করে কি রকম ভাবে যে রয়েছে, তা দেখলে দ্রষ্টারই অস্বস্তি লাগে, কিন্তু ওরা নিজেরা যে কিছু সেরকম অনুভব করছে তা মনে হল না। মেয়েরাও দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে, গল্প করছে এবং ঐ সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে শুয়ে পড়ে দিব্যি ঘুম লাগাচ্ছে। নিজেদের সব রকম জিনিষপত্র তাদের সঙ্গেই। মাদুর বা শতরঞ্চি বিছিয়ে তার চারদিকে সব প্যাঁটরা, বোঁচকা প্রভৃতি দিয়ে দেওয়াল বানিয়ে যে যার নিজের দুর্গের মধ্যে অচল হয়ে বসে আছে। হিন্দুস্থানীদের ভিতর কেউ বা সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে; কয়েকজন জাত ভাই বসে বসে তা শুনছে। কোথাও বা উড়িষ্যাবাসী প্রকাণ্ড চিত্র বিচিত্র 'বটুয়া' খুলে পান সাজতে ব্যস্ত। পান খাবার

উমেদারও আশে পাশে অনেক হাজির। মেয়েরা বেশীর ভাগই ছেলেপিলে সামলাচ্ছে, সাময়িক সংসারের তদারক করছে। অন্য প্রদেশের মেয়েদের চেয়ে বাঙালীর মেয়েগুলি একটু বেশী জড়সড়, তবে সবাই নয়। এক বঙ্গমহিলা মশারি খাটিয়ে নিজের এলাকা সুচিহ্নিত ও সুরক্ষিত করেছেন, তবে তারই মধ্যে বসে বক্স হারমোনিয়ম্ বাজিয়ে গান ধরেছেন, এতে অন্য যাত্রীরা খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

ডেকের এক কোণে ভাণ্ডারীর দোকান। এখানে পুরী ডাল, তরকারি, আটার হালুয়া খুব চড়া দরে বিক্রী হচ্ছে, ফলটলও কিছু আছে। হিন্দুস্থানী প্যাঁড়া ও বুটের মিঠাইও বর্ত্তমান। তবে ওদের কৌলীন্য অবিসংবাদী হলেও তাদের বয়স সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বেশীর ভাগ যাত্রীই তাদের দিকে ঘেঁষছে না। কাবুলীরা সঙ্গে করে বিরাট্ ফলের ও মেওয়ার ঝাঁকা নিয়ে এসেছে, বসে বসে সেগুলি সাজাচ্ছে। তামিল ক্রোরপতি চেট্টি হাঁটু অবধি ময়লা কাপড় এবং কাঁধে পাড় ওয়ালা গামছা নিয়ে নিজের দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ করছে হাত মুখ নেড়ে। ইচ্ছা করলে এমন একখানা জাহাজ, হয়ত সে স্বচ্ছন্দেই কিনতে পারে, কিন্তু চলেছে পনেরো টাকা ভাড়ায় ডেক্ প্যাসেঞ্জার হয়ে।

চট্ করেই যেন সন্ধ্যা হয়ে গেল, সূর্য্য অস্ত যাবার উপক্রম। মসীকৃষ্ণ জলের উপর যেন হোলিখেলা আরম্ভ হল। রংএ রংএ জলধির কালো বুক রঙীন করে দিয়ে সূর্য্য অল্পক্ষণের মধ্যেই টপ্ করে ডুবে গেল। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল, তার প্রবলতা আর গর্জ্জনও কিছু বাড়াল। দিক্ চক্রবালের এক দিকে সোনার খড়্গের মত চাঁদের দীপ্তি দেখা গেল। জাহাজের সব ক'টা আলো এক সঙ্গে জ্বলে উঠল।

যাত্রীরা সব যথাসাধ্য ঠেলাঠেলি করে ডেকের মাঝখানটায় তাল পাকাচ্ছে, রেলিংএর ধারে বড় বেশী হাওয়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে কেউ কেউ শুয়েও পড়ছে। এই সময় ঢং ঢং করে ডিনারের ঘণ্টা পড়ায় আমরা ডেক থেকে নেমে নিজেদের কেবিনে চলে গেলাম। আটটার মধ্যে জাহাজের সব কাজকর্ম্ম চুকিয়ে ফেলা নিয়ম, কাজেই খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ফেলার দিকে মন দিলাম। দেখতে দেখতে জাহাজের সব কর্ম্মব্যস্ততা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চারদিক্ একেবারে চুপচাপ।

আমি চিরদিনই খুব ভোরে উঠি। ষ্টীমারেও তার ব্যতিক্রম হল না। মুখ হাত ধুয়ে আর খুপরীর মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগল না। আবার ডেকের উপরেই বেড়াতে চললাম। সেখানকার জগৎ তখন সুপ্তিমগ্ন। দু-একটি খালাসী এধার ওধার ঘোরাফেরা করছে, দু-একটি হিন্দুস্থানী যাত্রী উঠে বসে হাই তুলছে। ডেকের একটা কোণে যাত্রীর ভিড় কিছু কম, সেই-খান দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ডেকে যাবার রাস্তা। সেখানটাতেই বেড়াবার সুবিধা।

যাত্রীরা ক্রমে ক্রমে জেগে উঠতে শুরু করল। বেসুরা ভজন গাওয়া ও 'লোটা' মাজার ধুম পড়ে গেল। সকালেই আবার খালাসীরা একবার ডেক্ ধুয়ে দিয়ে যায়, কাজেই মেয়ে যাত্রীর দল বাচ্চাকাচ্চা সামলাচ্ছিল এবং যেসব জিনিষপত্র জল লেগে ভিজে যেতে পারে সেসব গুটিয়ে নিয়ে বাক্স প্যাটরার উপরে রাখছিল। খালাসীর হাতের ঝাঁটার জল খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি ডেকের উপর থেকে সরে পড়া গেল।

এ দিনটাও ঠিক আগের দিনের মত একই ভাবে একই তালে কেটে গেল। মাঝে একবার একটু diversion ঘটল। একটা ঘণ্টা বিকট রবে বাজতে লাগল। খালাসী, 'বয়' ও অফিসাররাও দৌড়াদৌড়ি করতে আরম্ভ করল। যাত্রীরা ত হতবুদ্ধি। তাদের সবাইকে যে যেমন অবস্থায় ছিল, কেবিন থেকে বার করে দিয়ে কেবিনে তালা দিয়ে দেওয়া হল। আবার অল্প ক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে গেল। অফিসাররা life belt খুলে ফেলে নিজের নিজের কাজে চলে গেল। 'বয়'রা এসে কেবিনের তালা খুলে দিল, যাত্রীরা যার যার ঘরে ঢুকে বাঁচল। শুনলাম এই রকম alarm bell বাজিয়ে শুধু শুধু rehearsal অনেক সময়ই দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিনটাও ঐ ভাবেই কাটল। এর পরদিন সকালে জাহাজ ব্রহ্মদেশের তীরে ভিড়বে। যাত্রীদের মধ্যে আজ একটু উৎসাহ দেখা গেল। তিনদিন খালি জল দেখে দেখে তারা হয়রান হয়ে পড়েছিল। তীর অবশ্য এখনও অনেক দূরে, তবু ডাঙায় পা রাখার আশাতেই তারা খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সব দিকেই জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেলার ব্যস্ততা দেখা যেতে লাগল।

জলের রং ক্রমে বদলাতে লাগল। ঝক্‌ঝকে গাঢ় নীল কেমন শ্যাওলাগোলা সবুজ হয়ে এল। শুনলাম আমরা এখন Gulf of Martaban দিয়ে যাচ্ছি। এ নামটি ছোটবেলায় ভূগোল পড়ার সময় প্রাণপণে মুখস্থ করেছি বটে, তবে সেটা সাপ কি ব্যাঙ তা তখন ভেবে দেখিনি।

আজ খাওয়া দাওয়া সকলেই তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বসল। পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে যাত্রীরাও তৈরি, এখন জাহাজটা তীরে ভিড়লেই হয়। সমুদ্র ছেড়ে সে এখন ইরাবতী নদীর ভিতর ঢুকে পড়েছে। 'বয়' 'টোপাজ' প্রভৃতি সবাই ধারে কাছে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করল, প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে তারা বখশিশ নেবে। সে এক মহাপর্ব্ব! যাই দাও, কিছুতেই তাদের খুশী করতে পারবে না। অনেক কষ্টে ত তাদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

ক্রমে ব্রহ্ম দেশের রাজধানী চোখের সীমানায় ধরা দিল। আমি নূতন বৌ, প্রথম যাচ্ছি স্বামীর চাকরির স্থানে, কাজেই বেশ সেজেগুজে নামতে হল, কারণ নিশ্চয়ই জাহাজ ঘাটে আত্মীয়-বন্ধুরা আসবেন স্বাগত জানাতে। অতএব দামী রঙীন বেনারসী, ও গহনাগাঁটি পরেই জাহাজ থেকে নামতে হল।

জাহাজ ঘাটা থেকেই রেঙ্গুনের বিখ্যাত শোয়েডাগন প্যাগোডা দেখা যায়। চেয়ে দেখলাম গাছের সারের উপর দিয়ে সোনালী চূড়াটা ঝকঝক করে জলছে, ঠিক যেন শ্যামাঙ্গ নৃপতির মাথায় সোনার মুকুট। রেঙ্গুন বন্দর দেখে কিন্তু বড়ই নিরাশ হতে হল। অতি কদর্য্য আর পঙ্কিল চেহারা। এই নাকি বিলাসের লীলাভূমি, নবীন ব্রহ্মদেশের প্রবেশদ্বার? ভাঙা কাঠের ঘর, টিনের ছাউনির সার, সরু লম্বা মুখো 'শাম্পান' নৌকা, আর তার ময়লা কাপড় পরা চট্টগ্রামবাসী মাঝি, এই ত শুধু চোখে পড়ে। আশপাশের ঘরগুলির স্থাপত্য অভিনব, এইটুকুই যা। ইরাবতী নামটি যতই সুন্দর হোক জল ত কাদামাখা ঘোলা।

জাহাজ তীরে ভিড়তেই তুমুল শব্দে সিঁড়ি নেমে পড়ল। এক দল কুলি জেটির থেকে এক দৌড়ে জাহাজে উঠে এল। তারপর সে যেন ডাকাত পড়ল কেবিনগুলির উপর। যাত্রীদের মোটঘাট নিয়ে সে কি কাড়াকাড়ি মারামারি। কুলিগুলি সবই মাদ্রাজী, তাদের ভাষার এক অক্ষরও বোঝা গেল না। আধঘণ্টা যেন ঝড় বয়ে গেল, তারপর নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে কোনোমতে নেমে পড়া গেল।

ষ্টীমারঘাটে অনেকগুলি মানুষই এসেছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে, কেউ আত্মীয়, কেউ কুটুম্ব, কেউ বা বন্ধু।

ঠিকাগাড়ী ডেকে, জিনিষপত্র নিয়ে আমি ত আমার নূতন সংসারে পদার্পণ করলাম। রেঙ্গুনের বাড়ী ঘর ঠিক আমাদের ভারতীয় ধরণের নয়। এরা কাঠ এবং কাঁচ খুব বেশী ব্যবহার করে, ইঁটপাথর ততটা নয়। জমি কিনেই একটা বড় চৌকোণা ঘর বানিয়ে ফেলে, তারপর ভিতরে কাঠের পার্টিশন দিয়ে দিয়ে কামরা তৈরি করে। সামনে একটা বড় ঘর তারপরের জায়গাটা দুভাগে বিভক্ত, তাকে দুটো বেডরুম বলতে পার, বা একটা বেডরুম, একটা পিছনের রান্নাঘর ও বাথরুমে যাবার প্যাসেজ বলতে পারা যায়। সব পিছনের অংশ-টুকুও দুইভাগে বিভক্ত, একটি রান্নাঘর ও অন্যটি বাথরুম। সব আধা পার্টিশন, একমাত্র বাথরুমটার পুরো পার্টিশন। আমাদের ভারতবর্ষীয় সংস্কারে এ হেন গৃহ-ব্যবস্থা খানিকটা বেআব্রু ও নোংরা মনে হয়, এখানে কিন্তু ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে অনেকেই এই রকম বাড়ীতে থাকে। এক সার করে বাড়ীর পিছনে একটি করে 'কাঁচড়া গলি' (নোংরা ফেলার গলি) এই রকম ব্যবস্থাই

সাধারণ; তবে অন্য প্যাটার্নের বাড়ীও কিছু কিছু আছে, সেগুলির জন্যে হয়ত বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

সম্প্রতি দেখলাম যে, বাড়ীতে আমরা দুজনই শুধু এবং এক তাগে ও একজন ভৃত্য। ভৃত্যটির নাম শুনলাম 'ঐশ্বর্য্য'। অত বড় নাম ধরে ডাকা সুবিধার নয়, কাজেই আমরা ঠিক করলাম তাকে 'সূর্য্য' বলে ডাকা হবে। এই বাড়ীতেই আমার ভাশুর এবং জা তাঁদের নবজাত পুত্রকে নিয়ে এসে থাকবেন শুনলাম, তবে তাঁদের আসতে তখনও কিছু দেরি ছিল। পাড়াটা চুপচাপ, বেশী গোলমাল নেই, তবে পাশেই একটা সিনেমা হাউস, তাতে বাজনা বাদ্যের শব্দ কিছু আছে। অল্প দূরেই একটা বিশাল সরকারী বাড়ী আর তার চারদিকে বহু বিস্তৃত বাগান আর 'লন্'। ওটা বোধহয় Burma Secretariat-এর অফিস বাড়ী ছিল। এখানের রাস্তাগুলির অনেক নামই দেখলাম ইংরেজী, যেমন Spark Street, Merchant Phayre Street, ইত্যাদি। পথঘাট দিয়ে যারা চলেছে, তার ভিতর ভারতবর্ষীয় এত বেশী যে স্বচ্ছন্দে এটিকে ভারতীয় শহর বলে ভুল করা যায়। ব্রহ্মদেশীয় মানুষ আছে অবশ্য খানিক খানিক। বাড়ীঘরগুলির স্থাপত্য ও ঠিক ভারতবর্ষের মত নয়। একটা জিনিষ চোখে খুব সুন্দর লাগল, সেটা এখানকার মেয়েদের রঙীন সাজ। রেশম ছাড়া সুতি যেন তারা পরতেই জানে না, আর কি সুন্দর সব রং। রাস্তায় যেন ইন্দ্রধনু খেলে যাচ্ছে। গহনাও সকলে দুচারটে পরেছে। নূতন ধাঁচের সব খোঁপা, মেয়েগুলি সব যেন পাগ্‌ড়ী টুপী পরেছে। তাতে অনেকে আবার ফুলের ঝাপ্টা লাগিয়েছে। মুখে কি একটা শাদা পাউডারের মত মাখান, সেটার নাম শুনলাম 'তানাখা'। কি একটা কাঠ ঘসে চন্দন পঙ্কের মত করে মাখতে হয়। দেখে খালি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছিল। তিনি মেয়েদের রঙীন সাজের বড় পক্ষপাতী। শান্তিনিকেতনে থাকতে আমাদের প্রায়ই বকতেন, শাদা কাপড় পরার জন্য। ব্রহ্মদেশের এই মেয়েগুলিকে দেখে তিনি নিশ্চয় খুব খুশী হয়েছিলেন।

সেদিন খাওয়া দাওয়া ও ঘুমনো ছাড়া আর কিছু করা গেল না। চারদিন জাহাজের খুপরীতে কাটিয়ে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন থেকে নূতন দেশ দেখা শোনার ব্যাপার শুরু করব ঠিক করলাম।

সকালে উঠে সামনের সরু কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ফুলওয়ালী চ্যাপ্টা ফুলের ডালায় করে নানা-রকম ফুল বেচতে বেরিয়েছে। নিজেও সেজেছে প্রায় ফুলের মত। ডেকে চলেছে "পাঁ, পাঁ।" ফেরিওয়ালার কাজ সব প্রায় মেয়েরাই করে। দোকান বাজার টাজার অনেকটাই এদের হাতে। গ্রামাঞ্চলে চাষবাসের কাজেও এরা খুব খাটে। এদের সাধারণ শ্রেণীর পুরুষের দল কিছু শ্রমবিমুখ। অনেকে বসে শুয়ে, আমোদ প্রমোদ করে দিন কাটাতেই বেশী ভালবাসে। কথায় কথায় মারামারি করতে, ছোরা ছুরি মারতে খুব ওস্তাদ। এটাকে তারা খুব একটা গর্ব্বের বিষয় মনে করে। এই শ্রেণীর একজন ব্রহ্মদেশীয় যুবককে গর্ব্ব করে করে বলতে শোনা গেল, "হাম্ চাটগাঁওওয়ালা নহি হ্যয়। তিন দফে জেলমে গিয়া।" বাস্তবিক এখানে শ্রমসাধ্য কাজকর্ম্ম করতে যেসব পুরুষমানুষকে দেখতাম তারা প্রায় সবাই হয় ভারতীয়, নয় চীনা। রাস্তায় ঘাটে যানবাহনের মধ্যে সব চেয়ে চোখে বেশী পড়ে রিক্শ, রেঙ্গুনে তাকে বলে 'লাঞ্চা।' বাহক সবই ভারতীয়। অত্যন্ত সস্তায় এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায় বলে সবাই সারাক্ষণ লাঞ্চায় চড়ছে, পায়ে হাঁটতেই চায় না। চীনারা বাঁকে করে দুধারে কাঠের বাক্স ঝুলিয়ে খাবার বিক্রী করে বেড়াচ্ছে। কাঠের বাক্সের ভিতর উনুন বসান, তার উপর গরম গরম খাবার। চীনা মুখে কিছুই বলছে না, দু টুকরো বাঁশ নিয়ে খালি খট্ খট্ শব্দ করছে। এতেই সবাই বুঝবে কি খাবার। খাবারের বর্ণনা শুনে, আর তার ঘ্রাণ পেয়ে ত আমাদের দেশের লোকের নাক কান চম্‌কে যাবে, কিন্তু ওখানের লোকদের কাছে এসব খাবারের বেশ আদর। অতি সুসজ্জিত সব মেয়ে পুরুষ রাস্তায় এই সব খাবার কিনছে, এবং সেখানে বসেই খেয়ে নিচ্ছে। নোংরা ফেলার কাঁচড়া গলিতেও দিব্যি

বসে স্টোভ বা তোলা উনুন নিয়ে রান্না করে দেখতাম। এদিকে পরণে হয়ত সিল্ক বা সাটিনের লুঙি, হাতে গলায় কানে সোনা ও রুবীর গহনা। আমাদের দেশের পাচিকারা পরবেন হয়ত ময়লা দাগধরা ছেঁড়া শাড়ী, তবে রান্নার জায়গায় গোবরজল ছড়াবেন বার দশেক। কোন্‌টা করা উচিত সে বিষয়ে ত দারুণ মতভেদ।

রেঙ্গুনের বাড়ীতে ত প্রথম সওদা করলাম এক গোছা নীল ফুল। কয়েক পয়সা দাম, দেখতে অতি সুন্দর, তবে গন্ধ কিছুই নেই। অনেকদিন টিকে থাকে, সহজে শুকোয় না। এখানে আর-এক জাতের ফুলও দেখতাম, তাকে সবাই বলত "মেমিও ফ্লাউয়ার।" একেবারে অমর পুষ্প, কিছুতেই শুকোয় না। দেখতে কাগজের ফুলের মত, কিছু গন্ধও নেই, কিন্তু পরমায়ু একেবারে অফুরন্ত। ব্রহ্মদেশে ফুলের ত খুবই আদর, কিন্তু ভাল জাতের অভিজাত ফুল যেগুলি, তা বিশেষ দেখতে পেতাম না। সবই বুনো ধরণের ফুল, রংএর ঘটা বেশ আছে।

পাশেই একটি সিনেমা হল। গাড়ীভাড়া করে যেতে হবে না, অতএব বিকালে চা টা খেয়ে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়া গেল। কি ছবি যে দেখেছিলাম তা কিছু মনে নেই, তবে আট আনায় বেশ ভদ্র গোছের 'সীট' পাওয়া গিয়েছিল সেটা বেশ মনে আছে। এরপর থেকে যখনই আর কিছু করবার থাকত না, তখনই গিয়ে সিনেমা হলে হাজির হতাম। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল তখন।

এরপর রেঙ্গুনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার পালা। সর্বশ্রেষ্ঠ তার মধ্যে 'শোয়ে ডাগোন প্যাগোডা।' এর চুড়া দেখা গিয়েছিল জাহাজে থাকতে থাকতেই। ব্রহ্মদেশ প্যাগোডারই দেশ, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে বিখ্যাত এই প্যাগোডাটিই। এটা রেঙ্গুন শহর থেকে একটু দূরে অবস্থিত। বিরাট্‌ ব্যাপার, দেখতে বেশ খানিক সময় লাগবে। সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়ে বেরোন গেল। দু-চারজন সঙ্গে চললেন।

গাড়ীও চলল। শুনেছিলাম বড় প্যাগোডা শহর থেকে খানিকটা দূরে, তবে কতদূরে তখন তা বুঝিনি। চলেছি ত চলেইছি। ক্রমে শহর ছাড়িয়ে গেল, নানা রকম বস্তি ছাড়িয়ে গেল, এখন শুধু খোলা মাঠ আর মধ্যে মধ্যে দুচারটে ঘর। শেষে ভয় হতে লাগল যে গাড়োয়ান পথ ভুল করেছে কি না। তার কাছে সে কথাটা প্রকাশ করাতে সে এমন ভাবে ঠোঁট বাঁকাল যেন এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনেও শোনেনি।

গাড়ীটা এবার একটু উপর দিকে উঠছে বলে মনে হল। কাছে কোথাও গোরা পল্টনের ছাউনি আছে বোঝা গেল, কারণ খাকি রংএর পোশাক পরা দুচারটি মূর্ত্তি দেখলাম এদিক্‌ ওদিকে। চারিদিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের সার, তাদের শ্যামলতা অতিক্রম করে এতক্ষণে প্যাগোডার চূড়াটা আমাদের দৃষ্টিপথে ফুটে উঠল। প্রকাণ্ড এক সিঁড়ির শ্রেণীর নীচে এসে আমাদের গাড়ী থামল। চারিদিকে গাড়ী ঘোড়া আর মানুষের মহাভিড়। নীচে সিঁড়িগুলির উপরে গৈরিক পোশাক পরা কয়েক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দাঁড়িয়ে আছেন। জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরের ভিতর কারো যাওয়া নিষেধ। চামড়ার কোনো জিনিষই নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। যাতে কোনো যাত্রী এই নিয়ম ভঙ্গ না করে, সেদিকে এঁরা দৃষ্টি রেখেছেন।

আমরা জুতো ইত্যাদি খুলে গাড়ীর ভিতর রেখে উপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। প্রথম বড় বড় কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করে একটা ছোট চত্বরের মত। তারপর আবার সিঁড়ি। এ সিঁড়ির যেন আর শেষ নেই, উঠতে উঠতে পা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। আমার দিল্লীর কুতব মিনারের সিঁড়ির কথা মনে পড়ে গেল। এই সিঁড়িগুলির উপরে ছাদ, দু পাশে ছোট ছোট খুপরি ঘর, সেখানে হরেক রকমের দোকান সাজিয়ে বসেছে ব্রহ্মদেশীয়া রমণীর দল। জায়গাটা কিছু অন্ধকার, তবে দোকানগুলিতে বাতি আছে, স্তম্ভগাত্রে বিভিন্ন রঙের পাথরের কাজ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। বিকটদংষ্ট্রা বাঘ, সিংহ, মকর সব এদিক্‌ ওদিক্‌ থাবা পেতে বসে আছে। কত যুগ ধরেই এখানে তাদের বাস তবু এখনও রং জলে নষ্ট হয়নি, বা হাত পা কি লেজ খসে যায়নি।

নানারকম জিনিষই এখানে বিক্রী হচ্ছে। মনিহারীর দোকান অনেক, তার চেয়ে বেশী ফুল আর বাতির দোকান। বেচছেন যাঁরা তাঁরা বেশীর ভাগই তরুণী, এবং খুবই সুসজ্জিতা। যত রকম ভাষা তারা জানে সবের সাহায্যেই তারা যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে, "এস ফুল, বাতি, কেনো, জুতো রেখে দাও, বসে বিশ্রাম কর।" যারা বৌদ্ধ তারা সকলেই ফুল ও মোমবাতি কিনছে, যারা বৌদ্ধ নয়, তারাও অনেকে কিনছে।

কত দেশের কত রকম পোশাক পরা মানুষ সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি উঠছে, কত ভাষায় ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে, এর ভিতর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছে, যুবক-যুবতী আছে, বালক বালিকা আছে। কিন্তু গোলমাল নেই, বাক্‌বিতণ্ডা নেই। তীর্থের মর্য্যাদা রাখতে এরা জানে। হয়ত হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্যে তারা দীন, কিন্তু বাইরের ব্যবহারে শ্রদ্ধার দৈন্য নেই; ক্ষুদ্র শিশু, প্রগল্‌ভ বালক-বালিকা পর্য্যন্ত নীরবে চলেছে। সচল রামধনুর মত উজ্জ্বল নয়নাভিরাম রঙের স্রোত সিঁড়ি বেয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে সংসারত্যাগীর গৈরিকও তার সঙ্গে মিশছে। কোথাও অপরিচ্ছন্নতা নেই। আমাদের তীর্থগুলি ত নোংরামীতে, চীৎকারে, কুৎসিত রোগগ্রস্ত ভিখারীর উৎপাতে প্রায় নরকের চেহারা ধরে। প্যাগোডাতে এসে চোখ কান দুইই যেন জুড়িয়ে গেল।

সিঁড়িগুলি অবশেষে শেষ হল। আমরা প্রকাণ্ড একটা বাঁধান আঙিনার মত জায়গায় এসে হাজির হলাম। তার মাঝখানে প্রধান প্যাগোডাটি উন্নত স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া নিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। তার চার দিক্ ঘিরে ছোট ছোট মন্দির। এই মন্দিরগুলির ভিতর সবই প্রায় বুদ্ধমূর্ত্তি। শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভরণ, অধরোষ্ঠ তাম্বুলরঞ্জিত, মাথায় স্বর্ণমুকুট। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের মূর্ত্তি এ নয়, এ রাজপুত্রেরই মূর্ত্তি। চারিদিকের চাকচিক্য চোখকে তৃপ্ত করে বটে, তবে শ্রদ্ধাভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয় না, মাথা লুটিয়ে পড়ে না। কেবল রূপের ছটা, রংএর ঘটা। যাত্রীদল নীরবে চলেছে, ফুল ও বাতির অর্ঘ্য রেখে নিজের নিজের পূজা শেষ করছে তারপর উঠে গিয়ে অন্য এক মূর্ত্তির সামনে অবনত হচ্ছে। সব চেয়ে বড় মূর্ত্তিটির সামনে মানুষের ভিড় লেগেই আছে, ফুলে ফুলে ভিত্তি-তল ঢেকে গিয়েছে। নানা রং বেরংএর কয়েক সার ছোট ছোট মোমবাতি মূর্ত্তিটির সামনে নিরন্তর জলছে। অল্প বয়স যাত্রীরা দুতিন মিনিট দাঁড়িয়েই চলে যাচ্ছে, বৃদ্ধবৃদ্ধারা ঘন্টার পর ঘন্টা স্তব্ধ হয়ে বসেই আছে। একদিকে প্রকাণ্ড একটা ঘন্টা, কোনও কোনও যাত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে সেটাকে দু-একবার বাজিয়েও যাচ্ছে। এদের ধারণা, যে মানুষ যতবার এ ঘন্টা বাজাবে তাকে ততবার এই মন্দিরে আসতে হবে।

আঙ্গিনাটি ঘিরেও হয় বৌদ্ধ মন্দির, নয় চিত্রশালা, নয় প্রাচীন ব্রহ্মদেশীয় মণিরত্ন তৈজস প্রভৃতির সংগ্রহ-শালা। ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত বহুমূল্য সব উপহার এক জায়গায় রক্ষিত।

এত ঘোরাঘুরি করে বড়ই ক্লান্ত লাগছিল। ঠিক করলাম আজকের মত ফেরা যাক, আর-এক দিন এসে ভাল করে দেখা যাবে। বেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি গাড়ীর এক বিরাট্ ভিড়ের মধ্যে পড়লাম। সেগুলি সরে না গেলে ঘোড়ার গাড়ীর কাছ অবধি যাওয়াই যাবে না। কাজেই খানিক অপেক্ষা করতে হল, তারপর বাড়ী ফিরলাম।

এরপর ঘরদোর গোছান এবং দরকারি আসবাব ও জিনিষপত্র কেনাকাটায় দুচারদিন গেল। কলকাতা থেকে আসার সময় কাঠের আসবাব কিছু আনিনি, শুনেছিলাম এখানে সস্তার খুব ভাল জিনিষ পাওয়া যায়। কিছু কেনা গেল। জিনিষগুলো ভালই ছিল, বেশ সুশ্রী দেখতে, তবে যখন ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে দেশে ফিরলাম তখন আর এগুলির কিছু সঙ্গে করে আনতে পারি নি, সবই ওখানে ফেলে রেখে এসেছিলাম। আর একদিন একটি tea set কিনেছিলাম মনে আছে, Whiteway Laidlaw-র দোকানে গিয়ে। সে ত প্রায় ৫০ বৎসর আগের কথা, এখনও সেটার দু-

চায়টে প্লেট পড়ে আছে। ঠিক ঐ ধরণের জিনিষ আজকাল আর পাওয়া যায় না।

জায়গা খুবই সীমাবদ্ধ, তবু পার্টিশনগুলি নেড়েচেড়ে সেগুলোকেই যথাসাধ্য সুবিভক্ত করা গেল। কারণ এই বাড়ীতেই আমার ভাশুরও থাকবেন শুনলাম, তাঁর স্ত্রী শিশুপুত্রকে নিয়ে। বাচ্চার দেখাশোনা করার জন্য আর-একজন চাকরও থাকবে।

দুচারজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপও হল। আমার আগের পরিচিত মানুষও এখানে কয়েকজন ছিলেন। সমাজ পাড়ায় আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকতেন পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। তাঁর মেজ মেয়ে জ্যোতির্ময়ী বিয়ে করেছিলেন মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়কে। ইনি তখন ছিলেন রেঙ্গুনের Bengal Academy-র অধ্যক্ষ। জ্যোতিদিও ঐ স্কুলের মেয়েদের বিভাগের অধ্যক্ষা ছিলেন। তাঁদের নিমন্ত্রণে একদিন তাঁদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। এতদিনে চেনা লোকের মুখ দেখে খুব ভাল লাগল। জ্যোতিদির সাজান ঘরদোর,তাঁর ফুলের মত সুন্দর ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখেও খুব ভাল লাগল। অনেকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে, খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলাম। ওঁরা তখন ঐ স্কুল বাড়ীটির উপর তলাতেই থাকতেন। আর-একজন কলকাতার চেনা মানুষও এখানে সংসার পেতেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও কিছুদিন পরে দেখা হয়েছিল। তিনিও সমাজপাড়ার মেয়ে প্রীতিলতা বসাক। এঁর বাবা কাশীচন্দ্র ঘোষাল ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক। এঁরাও সমাজপাড়ার সাধন আশ্রমের বাড়ীতে থাকতেন। প্রীতিলতা আমার চেয়ে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন, এঁকে আমরা ডলিদি বলে ডাকতাম। এর স্বামী বিজয়কুমার বসাক তখন রেঙ্গুনে এক কলেজে প্রফেসরের কাজ নিয়ে এসেছিলেন। এঁরও তখন ছেলেমেয়ে হয়েছে। এঁর বিভিন্ন বাড়ীতে অনেকবারই গিয়েছি, নানা উপলক্ষে।

আর-একজন চেনা মানুষ ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী পারুল, আমাদের হেম মাসীমার মেয়ে। এঁর স্বামী ছিলেন সুরেশ মোহন বসু, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয়। ইনি একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন। ওঁর স্বামী যদিও রেঙ্গুন কোর্টেই practice করতেন(তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন) কিন্তু তাঁরা থাকতেন 'ইন্‌সিন্‌' নামক রেঙ্গুনের নিকবর্ত্তী একটি ছোট শহরে। আমিও একদিন গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ী 'ইন্‌সিন্‌'-এ। ব্রহ্মদেশে আমি যে সাত বছর ছিলাম, তার ভিতর ঐ একদিনই আমি ট্রেণে চড়ে বেরিয়েছিলাম। কয়েক বছর থাকার পর সুরেশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁরা ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলে যান।

আগে যাঁদের চিনতাম না, তাঁদের দুচারজনের সঙ্গেও তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তবে রেঙ্গুন থাকাকালীন আমার সামাজিক জীবন বলে বেশী কিছু ছিল না। নিজে রোগ ভোগ করতাম এবং ছেলেমেয়েরা রোগ ভোগ করত, এই নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হত যে মেলামেশা করা বা যাওয়া-আসা করা কারু বাড়ীতে হয়েই উঠত না। আমার স্বামী একটা বইয়ের ব্যবসা চালাতেন, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুচারজন ভদ্রলোক ও তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এঁদের নাম সরোজকুমার সেন, আশুতোষ মিত্র প্রভৃতি। শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় কুটুম্ব কয়েকজনের সঙ্গে এখানে এসে আলাপ হয়েছিল। এর মধ্যে আমার বড় নন্দাই জিতেন্দ্রকুমার নাগ ও আমার স্বামীর মাসতুতো ভাই নীহাররঞ্জন পাল ছিলেন। আর একজন ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীকে আমি এখনও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এঁর নাম জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী। আমার গভীর দুঃখের দিনে এঁরা যেরকম আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন, এমন অল্প লোকেই করে। ইনি পরলোক গমন করেছেন শুনেছি। তাঁর পরিবারবর্গ আছেন। একবার এক সভাতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তবে তখন কথাবার্তা বেশী বলতে পারিনি। তারপর সংযোগ হারিয়ে ফেলি। যোগসূত্র রাখতে পারলে খুবই সুখী হতাম।

এছাড়া স্বামীর বন্ধুবান্ধব কিছু কিছু ছিল। তারা নানাপ্রদেশের, নানা ভাষাভাষী, নানা ধর্ম্মাবলম্বী।

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এদিকে জয়তী ফাঁকতালে অবিনাশের জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছে। তার হাতে বইখানা তুলে বলল—

'একটা বই দিই তোমায়? আজকের দিনের জন্য আমার বিশেষ শুভেচ্ছা—এই লিখে দিলাম।

'কিন্তু তুমি এখনই যেতে পারবে না' অবিনাশ জোর করতে লাগল।

'মুকুট আজ খুবই ক্লান্ত, সাড়ে নটায় গাড়ী আসলে চলে যাবো।' কথা শেষ করতে না করতেই টেলিফোন বেজে উঠল। অবিনাশ উঠে গিয়ে ধরল। জয়তীকে ডেকে বলল, মুকুট একটু অসুস্থ বোধ করছে বলে 'বসন্ত' থেকে টেলিফোন এসেছে—তাকে শীঘ্র ফিরে যেতে হবে।

জয়তী এক মুহূর্ত না বসে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নেমে গাড়ীতে গিয়ে উঠল—অবিনাশ বাধা দিল না। গাড়ী খুব জোরে চালাতে আদেশ দিল।

বাড়ী এসে পৌঁছেই সে গাড়ী থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে গেল, ভেতরে ঢুকে দেখে মুকুটের ঘরে খিল দেওয়া। খুব ধাক্কা দিল বেশ কয়েকবার। দরজা খুলতেই জয়তী দেখল মুকুট একেবারে মাতাল অবস্থায় চলছে—প্রায় উন্মাদের মত চেহারা। জয়তীর বুকের ভেতর প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। মুকুটের ঘরে ঢুকেই স দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মুকুটকে বুঝিয়ে একটি ওষুধ খাইয়ে দিল আর বলল—

'ঘুমিয়ে পড়, তোমার শরীর অসুস্থ।'

মুকুট অবিনাশের বাড়ীর বিষয় কি একটা বলতে চেষ্টা করছিল, কথা তার জড়িয়ে গেল, বোঝা গেল না কিছু।

জয়তী বলল—'অবিনাশের বাড়ী বন্ধুদের নেমন্তন্ন আছে, তাই চলে এলাম।' মুকুটের কাছে বসে জয়তী ধীরে ধীরে বলল—

'এখন ভাল লাগছে তো?' মুকুট ঘুমিয়ে পড়ল।

জয়তী বার বার বলা সত্ত্বেও মুকুট একেবারেই তাকে অগ্রাহ্য করেছে, নিয়মিত মদ্যপান শুরু করেছে আবার। অতিথিকে মদ খেতে দেওয়া ওজর মাত্র, সে নিজেই তার পুরাতন বদ্‌অভ্যাস ডেকে আনছিল, কিন্তু জয়তীর মানা সে শুনতে রাজী নয়। জয়তীর মনে আই একই প্রশ্ন ফিরে আসছিল—

'আবার কেন মুকুট মদ ধরল?'

আজ আবার এই পুরাতন সমস্যা জয়তীর মন উতলা করে তুলেছে। এক অজানা ভয় তার মনকে পিষে পিষে ফেলছিল। জয়তী মুকুটের এই দুর্বলতার কথা ভাল করেই জানত, পূর্বে বহুবার তাকে মাতাল অবস্থায় দেখেছে—কিন্তু তার স্বামী মাতাল বলে নিন্দিত হবে? জয়তী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। অসহায় লাগল আজ তার। মুকুটকে সুখী করতেই চেয়েছিল—তাকে যথাসাধ্য সর্বদিক্ দিয়ে সাহায্য করেছে, তবু কেন মুকুট মদ ছাড়তে পারে না?

মনে মনে বলতে লাগল—

'আজ যেন পশুর মত দেখাচ্ছে মুকুটকে—আমি তো তাকে শ্রদ্ধা করেছি, আপন করতেই চেয়েছি'—চিন্তার স্রোত জয়তীকে উত্তেজিত করে তুলল, এক পলক ঘুম

এল না চোখে, রাত চারটে, তবু ঘুম নেই। মুকুট সজ্ঞাহীন পশুর মত পাশে পড়ে আছে—দুঃখে কষ্টে জর্জরিত হয়ে জয়ন্তী নিস্তেজ হয়ে পড়ল, আর জেগে থাকতে পারল না।

ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই উষার কিরণ চারিদিক আলোকিত করে তুলল—ছটা বাজাতেই পাখীর ডাক, গরুর ঘণ্টা ও ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড়ানি শোনা গেল, মৃদু সমীরণ বইতে লাগল, প্রভাতের সৌন্দর্য চারিদিকে যেন আনন্দ এনে দিল—জয়ন্তীর দুঃস্বপ্ন ভরা রাত কোন রকমে কেটে গেল। কে তার হাত ধরল? জয়ন্তী চীৎকার করে উঠল—কিসের বিভীষিকা?

'কেমন আছো তুমি?' মুকুট প্রশ্ন করল।

জয়ন্তী চম্‌কে উঠে বসল—মুকুটের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলল 'তুমি কেমন আছ?' এ বিভীষিকা যে মিথ্যা নয় তাও জয়ন্তী বুঝতে পারল, মুকুটের নেশার ঘোর তখনও কাটেনি, অসহ্য পরীক্ষার মধ্যে পড়ল জয়ন্তী। মুকুটের উন্মাদ মূর্তি জয়ন্তীর মনে যে ছাপ রেখেছে সে কি ভোলা এতই সহজ? আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে জয়ন্তী বুঝিয়ে দিল।

'এখন ভোর হয়েছে—সকাল হয়েছে, চল বারান্দায় বসে চা খাই।' মুকুট জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার চেয়ারে বসল। টেলিফোন তীক্ষ্ণস্বরে বেজে উঠল।

টেলিফোন শুনে মুকুটের মাথা যেন মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল—জয়ন্তীকে সে বলল—'বলে দাও দুপুরে খেতে আসতে—ওদের সঙ্গে কথা আছে। পাতিয়ালার লোক ওরা—আসতে চায় দেখা করতে।'

'একদিন ছেড়ে দাও না ওদের, বিশ্রাম কর মুকুট। আজ একটিও লোককে আসতে দেব না,—জয়ন্তী জোর করতে লাগল।

মুকুট প্রায় চীৎকার করে উঠল, দৌড়ে এসে টেলিফোন কেড়ে নিয়ে বলল—'আমার সঙ্গে দুপুরে খাবেন আপনি' বলেই টেলিফোন রেখে দিল।

'কিছু বোঝ না তুমি জয়ন্তী।' বলে মুকুট আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

'কাল রাতে উন্মাদ মাতাল হয়ে পড়েছিলে—এসে দেখি কি ভীষণ মূর্তি, কি দুরবস্থা—আত্মসম্মান জ্ঞান কি কিছু আছে তোমার? আমারও মাথা নীচু।' জয়ন্তী স্পষ্ট করে রাগ প্রকাশ করল। মুকুট উত্তর দিল—

'মদ খাচ্ছি আবার, সত্যি, কিন্তু ভাল তো লাগে না—বিশ্রাম করতেও ভুলে গেছি।'

'কতদিন কাজ করতে পারবে এভাবে? রোজ মাতাল হলে আর কাজে মন দিতে পারবে না—বুঝতে চেষ্টা কর।'—জয়ন্তী যতই বোঝাবার চেষ্টা করছিল ততই নিজে বুঝতে পারছিল মুকুটের স্বভাব ক্রমশ বদলিয়ে যাচ্ছে, আর স্থিরতা নেই তার কিছুতেই। ছবি আঁকার মোহ কেটে গেছে, কিসের পিছনে সে ছুটছে?

'কাল সাড়ে সাতটা থেকে কাজ শুরু করেছি ন'টার সময় অসুস্থ লাগল তাই গাড়ী পাঠালাম তোমায় নিয়ে আসতে। শরীর মোটেই ভাল লাগছে না জয়ন্তী।' মুকুট স্বীকার করল।

'শরীরের দোষ কি? আজ খুলে তোমায় কতগুলি কথা বলব—অপ্রিয় সত্য হলেও তোমায় শুনতে হবে। তোমার চেহারা দেখে বোঝা যায় যশের মোহ তোমায় তিলে তিলে খেয়ে ফেলছে—তার সঙ্গে আমার জীবনের...'

মুকুট গলা চড়িয়ে বলল—'তোমার জীবন একটা বিশেষ নাট্যে পরিণত হয়েছে? একেবারেই নয়। তোমার জীবন অতি সত্য—এইভাবেই পৃষ্ঠপোষকদের শরণাপন্ন হতে হবে, তাদের সাহায্য ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। যে অতিথিদের আমি বাড়ীতে আদর করে নিয়ে আসি, বন্ধুভাবে ব্যবহার করি, তাদের ওপরই আমায় নির্ভর করতে হয়—শিল্পজগতের পরীক্ষা বা বল খেলা—এর মধ্যে তুমিও জড়িয়ে পড়েছ—নিস্তার নেই তোমারও। তোমার জীবনই বা কিভাবে গড়ে উঠছে বল তো? শিল্পী বলে পরিচয় দিতে বেশ গর্ব বোধ কর তুমি। কাদের সহায়তায় যারা আজ

তুমি এইটুকু নাম করেছ ভেবে দেখো। শিল্পীর জীবনে নানা শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হয়, সকলের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখতে পারলেই মঙ্গল। আমার তাই এতটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে কাউকে তাচ্ছিল্য করলে চলে না। আমি বিশ্বাস রাখি এদের ওপর। শিল্পের প্রগতির জন্য কাদের ওপর নির্ভর করতে হয়? যারা ছবি ভালবাসে, সূক্ষ্ম কাজের সমঝদার। মূল্যবান্ ছবি ক্রয় করে অনেকে তা আবার বিদেশে বিক্রী করে দেয়, তাতেও খানিক নাম হয়। প্রদর্শনী দেখতে যায় এরাই।—এরাই তো আমার শিল্প হিতৈষী। এরা আলোচনা করে,সমালোচনা করে, প্রশংসা করে, নিন্দা করে কিন্তু, এরা উদাসীন নয় —এদের দরদ আছে শিল্পীদের প্রতি। তাদের সঙ্গে শত্রুতা করার চাইতে বন্ধুত্ব রাখাই শ্রেয়। যদিও তারা বলে যে, আমার কাজে তারা মুগ্ধ, তবু আমিই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সর্বদা উৎসাহী। তারা আমার চিত্রের উপাসক হতে পারে কিন্তু আমার উপাসক নাও হতে পারে। তোমার প্রদর্শনী এত সফল হয়েছিল কি করে? এই মুষ্টিমেয় শিল্পভক্ত হিতকর দর্শক তোমায় প্রেরণা দিয়েছিল, আজ তুমি তাদের ভুলতে চাও, তাদের কাছ থেকে পালাতে চাও, আমি একা আর কতদিক রক্ষা করব? তোমার সুনাম হওয়া মাত্র তুমি এদের ত্যাগ করেছ, আমিই বন্ধুত্ব রক্ষা করছি। তাদের মঙ্গলকামনা ও শুভেচ্ছাকে অগ্রাহ্য করতে চাই না। তুমি কর্তব্য করছ স্বীকার করি কিন্তু তোমার আন্তরিকতার কোন পরিচয় পাই না। তোমার মন সাড়া দেয় না বুঝতে পারি।'

জয়ন্তী মুকুটের স্পষ্ট কথাগুলি নীরবেই শুনে গেল যতবার সে কথা বলবার চেষ্টা করেছে ততবার মুকুট তাকে বাধা দিয়েছে—আজ মুকুট অনেক সত্য কথা খুলে বলল—কিন্তু জয়ন্তী সব মেনে নিতে রাজী নয়। মুকুট থামল না—

'এদের তোমার আর ভাল লাগে না—এই ভিড় তোমার অসহ্য। তুমি এদের সঙ্গে পারবে না তাই আমি একাই যুদ্ধ করি—অতি কঠিন মন এদের তবু প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রাখি।'

'আমায় যদি তোমার সুখদুঃখের ভাগী করতে তাহলে সবই পারতাম—দিলে কোথায় সে অধিকার, সে দায়িত্ব? আমার শক্তিকে শুধু দমন করে রেখেছ। তোমার আত্ম প্রসাদ বেড়ে চলেছে—এই ভেবে যে তুমি আমায় গড়ে তুলছ।' জয়ন্তী আর চুপ থাকতে পারল না।

'পারতে না তুমি এদের সঙ্গে জয়ন্তী। এরা কেউ সরল মানুষ নয় —কুটিল জটিল প্রবঞ্চকও আছে এদের মধ্যে, তুমি চিনবে না তাদের।'

'আমি ঠিক পারতাম এদের সঙ্গে লড়তে। তুমি যদি উন্মত্ত মাতাল হয়ে এদের সামলাতে পার, আমি পারব না কেন? আমি তো নেশাখোর নই।'

'তুমি ভাবো তাই, তোমার নেশা নেই? তোমার ঐ রসিক উচ্ছৃঙ্খল দলটির সঙ্গে দেখা না হলে দিন কাটে না—ওরাই তোমার সঙ্গী—তোমার মনের খোরাক জোগায়। আমি গেলাসের আশায় থাকি আর তুমি ঐ নবীন দলের মুখ চেয়ে থাকো। শিল্পী নেশা খোঁজে —সে তার জীবনের বাস্তব সংগ্রাম থেকে প্রায়ই মুক্তি পেতে চায়—ক্ষণকালের জন্য সে সত্যকে ভুলে যেতে চায় জয়ন্তী। আমি যাদের মধ্যে থাকি তুমি তাদের ভাল করে জান না, আমি তোমায় আমার ডানার আড়ালে রেখেছি—ঐ সমালোচক-সমাজের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি, রক্ষা করেছি, তাই তুমি অনেক কিছু জানতে পারনি। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর পশ্চাতে, সুনাম সুখ্যাতির অন্তরালে, প্রতিযোগিতা ও সাফল্যের মাঝখানে কত যে ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, পৈশাচিক প্রলোভন মিথ্যা মানুষের মনকে দংশন করছে সে কি দেখেছ? তুমি এই দলের মন্দ যা কিছু, তার ঊর্ধ্বে রয়ে গেলে, আমি সব বোঝা বহন করে যাচ্ছি—তোমায় সব কিছু জানতে দেব না তাই। ঘৃণার তীব্রতা, শত্রুতার নির্দয়তা কিছু তোমায় যেন স্পর্শ না করে তাই চেয়েছি। কিন্তু তুমি চিরকালই অবুঝ রয়ে গেলে।

এই বিশাল শিল্পজগতের সোজা পথ যেদিকে সেই দিকে তোমায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি, আমি ভাল মন্দ দুই গ্রহণ করেছি, সন্দেহ নেই কিন্তু অবিনাশের ঐ যে দলটি দায়িত্বহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনদোলায় দুলছে, সেই দলই তোমায় আকর্ষণ করে। তুমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছ সত্যের কঠোরতা থেকে, তাই যুবক-যুবতীদের দলে ভিড়ে গিয়েই আনন্দ খুঁজে নিয়েছ। ওরা তোমায় উন্নতির পথে অগ্রসর করে নিতে পারবে না কোনদিন। আমি তোমার রক্ষাকর্তা হয়ে আছি, তাই বেঁচে গেছ। আমি যেদিন পঙ্গু হব, ক্লান্ত হব, একা যুদ্ধ করতে পারব না তখন হয়ত বুঝবে কতটা তুমি লাভ করেছ। আমার শক্তি এখনও অনেক আছে, আমিই তোমায় ঝঞ্ঝাট থেকে সরিয়ে রাখতে পারি।' মুকুটকে আজ প্রকৃত শক্তিশালী কর্মী বলে মনে হল। জয়তী মৃদু কণ্ঠে বলল—

'তাই যদি হয়, এতই যদি তোমার শক্তি থাকে তবে ঐ নেশাটুকু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছ না কেন? এভাবে তোমার সুনাম বেশীদিন থাকবে না।'

'শিল্পীর সুনাম কিভাবে প্রকাশ পায় সেকথাও আশ্চর্য। তার চরিত্র বা স্বভাবের ওপর কিছুই নির্ভর করে না। দক্ষতা তার সম্বল। শিল্পীর সারাদিনে এক মুঠো ভাত জুটেছে কি না তাও কেউ জানতে চায় না—সে বিশ্ববিখ্যাত হলেও তার সুখদুঃখের জন্য কারুর প্রাণ কাঁদে না। তার সমস্ত জীবনটাই চিরন্তন রণভূমি—খ্যাতি থাক্ বা না থাক্। তাকে লোকের মতামত শুনতেই হবে। সে গ্রহণ করুক আর না করুক।'

মুকুটের কথাগুলি জয়তীর মনে বিঁধল কিন্তু এই একতরফা তত্ত্ব সে শুনতে রাজী নয়—সে জানে সে শিশুর মত অবুঝ নয়।

সে বলল, 'তুমি নিজের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার জন্যই বোধ হয় সব অতিরঞ্জিত করে তোল, আমায় তুমি নিরাশ করতে পারবে না।' জয়তীর কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত মনোভাব, মুকুটের কথা সে বিশ্বাস করতে চায় না—তাই স্পষ্ট কথা না বলেও পারল না—

যেদিন তোমায় ঐ ভীষণ মূর্তিতে দেখি সেদিন আর বিশ্বাস হয় না এই সংসারের প্রতি বা আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রতি তোমার একতিল শ্রদ্ধা বা একটুও আকর্ষণ আছে। ভাগ্য নিতান্তই আমার বিরুদ্ধে। কাল বাবার চিঠি পেয়েছি—লিখেছেন মা বিশেষ অসুস্থ। হার্টের দুর্বলতার জন্য তিনি শয্যাশায়ী। যেতে আমার খুবই ইচ্ছা করছে কিন্তু তোমার এই কুৎসিত রোগ দেখলে তোমার ওপর ভরসা আর থাকে না—ছেড়ে যেতে সাহসও হয় না। যদি যশোলাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্তরের অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হতে হয়। সে প্রস্তুতি আমার হয়নি তা স্বীকার করছি, কিন্তু এই বিষয়ে মতামত আমার ভিন্ন তাও বলি। এখন আর সে-সব কথা থাক।' জয়তী গালে হাত দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটা চিঠি লিখতে গেল।

বাইরের জীবনের সঙ্গে তার অন্তরের জগতের যে দ্বন্দ্ব চলছিল মুকুট যদিও তা গ্রহণ করে নিয়েছিল তবু স্বাভাবিকভাবে তা মানিয়ে নিতে পারেনি তাই নেশার সাহায্য নিয়েছিল। ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে সে জয়তীর সঙ্গে ব্যবহারে সামঞ্জস্য রাখতে পারছিল না—কখনও উদাসীনতাও প্রকাশ পাচ্ছিল। মুকুটের প্রতি তাই জয়তীর সমানুভূতি খানিক কমে গিয়েছিল। চিত্রকরের জীবনে যে এমন হতে পারে জয়তী তা বুঝতে পেরেও মুকুটকে সহজে ক্ষমা করতে পারছিল না—জয়তীকে সে খুলে কোন কথা বলেনি এতদিন তাই সে নিতান্তই মর্মাহত। তাকে এইভাবে দূরে সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না জয়তী বুদ্ধিমতী ও স্পষ্ট বক্তা, তাকে এতটা তুচ্ছ করে অবুঝ বলে দোষারোপ করা নিতান্তই অন্যায় অবিচার। মুকুট জয়তীকে চিত্রকররূপে গড়ে তুলেছে বলে কেমন যেন একটা অর্থহীন অহংকার তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। জয়তীকে তাই সহকর্মী-

রূপে গ্রহণ করতে পারেনি সে। জয়তীকে সে অসংখ্য সুযোগ করে দিয়েছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত নিজের সমস্যা ক্ষেত্রে কোনদিনই ডেকে নেয়নি। জয়তীর জীবন তাই দিনে দিনে বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। তর্কাতর্কির পর মুকুট ও জয়তী—ক্ষুণ্ণমনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রায় রাত্তেই এইভাবে কথা কাটিকাটি করে দুজনে উঠে যায়—কারুরই মনে শান্তি নেই। কতবার ঘুম ভেঙে যায় জয়তীর তার অন্ত নেই।

ভোরের আলো তখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না—সূর্য উঠবার অনেক আগেই জয়তী উঠেছে—বাগানের দিকে সে এগিয়ে গেল। এই নিস্তব্ধতা তার মনে ক্ষণিকের জন্য শান্তি এনেছিল। সুকোমল ঘাসের ওপর পা-দুটি রেখে শীতল শিশিরবিন্দুর স্পর্শ পেল। কিন্তু মন তার অশান্ত। দুচারবার হাঁটাহাঁটি করতে করতে দেখতে পেল সাইকেলে করে কে যেন আসছে। লোকটি গেট খুলে ঢুকল। ডাক পিওন দেখে জয়তী ছুটে গিয়ে গেট্ ভাল করে খুলে দিল। হাত থেকে খামখানা নিয়ে বুঝল 'তার' এসেছে।

'শান্তা কাল রাতে দেহত্যাগ করেছেন। বাবা'

ছুরি দিয়ে কে যেন জয়তীর বুকখানা ক্ষত করে দিল।

'নেই, নেই...মা কি সত্যিই নেই?' সিঁড়ির এক কোণায় গিয়ে জয়তী বসে পড়ল—

'শেষ নাহি যে, শেষ নাহি যে' একথাই বারবার মনে আসতে লাগল। কৈশোরে বাবা তাকে কত তত্ত্বের কথা সহজ ভাষায় গল্পের ছলে বোঝাতেন, আজ সেই শাস্ত্রের কথাগুলি স্পষ্ট বাজতে লাগল।

'মৃত্যু মানুষকে বিনাশ করে না'—আহা, সত্যিই তো তার মা ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেলেন কিন্তু সারা জীবন কত করুণা, স্নেহ-মমতার কোমল স্পর্শ দিয়ে নিত্য নিয়ত জীবনকে ভরে দিয়েছিলেন আজ তিনি অতি নিকটেই আছেন মনে হল। মায়ের স্নেহভরা মুখমণ্ডল চোখের সামনে যেভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এমন কোনদিন হয়নি। মনে হ'ল বহুদূর থেকে মৃদু হেসে ভরসা দিচ্ছেন, তিনি কাছেই আছেন। মৃত্যুর মত সত্যও যেমন আর কিছু নেই, মাতৃপ্রেমের মত চিরস্থায়ী আর কি আছে? বিশ্বজননীরই যে প্রকাশ। নানান কথা ভাবতে ভাবতে জয়তী নিজেকেই শান্ত করছিল। 'তার' খানা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল—মুকুট তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। মুকুটের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জয়তীর মায়া হল, সে যেন বলতে চাইল সে মুকুটের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এমন মুহূর্ত আসে তার জীবনে যখন সে মুকুটকে আর শ্রদ্ধা করতে পারে না। বাইরের জগতের কাছেই সে একমাত্র প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, তাদের জীবনে একতার অভাব নেই। মুকুট অনেক বেলাতেও উঠল না দেখে জয়তী তার কাছে গিয়ে একটু ধাক্কা দিল—মুকুট তখনি জেগে তাকাল। বিছানায় শোওয়া অবস্থায় সে বলতে লাগল—

'কাল একটা ভারী সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি—জয়তী। তোমার মা লালপেড়ে গরদখানা পরে বেরিয়ে আসছেন ঘর থেকে—তোমার বাবা একখানা বেল ফুলের মালা তার হাতে জড়িয়ে দিচ্ছেন।'

জয়তীর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে গেল—'তার'টি মুকুটের হাতে দিল। মুকুট চমকে উঠে বসল—

'আশ্চর্য, এত পরিষ্কারভাবে দেখলাম তাঁকে, কি হ'ল?' একেবারে নির্বাক্ হয়ে রইল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল—ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নিল। জয়তীর দেহমনে আজ শুধু অবসাদ—সে একাই যেন দুঃখ বহন করতে পারে এই মনে মনে প্রার্থনা করল। মুকুট জয়তীর কাছে এসে বসল কিন্তু জয়তী তার কাছে প্রাণের কথা বলতে সঙ্কোচ করে, আর সহানুভূতি তো কিছুতেই চাইতে পারবে না।

'তুমি বাবার কাছে যেতে চাও?' মুকুট প্রশ্ন করল।

'এখনই না—তাঁর চিঠির অপেক্ষা করব'—সে উত্তর দিল। মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জয়তী নিতান্ত একাকী বোধ করল, মুকুটের সঙ্গে সে আর নিজের মনের কথা

বলতে পারল না। প্রচণ্ড শোকেরও দুঃখজ্বালা অন্তরে জমাট বেঁধে গেল।

সংযত হয়ে প্রত্যহ যেমন সংসারের কর্তব্য করে সেইভাবে জয়ন্তী কাজ করতে লাগল। মুকুট তাকে বলল, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে একটি আর্ট ডিলার তার কাছে আসবে। জয়ন্তী টেলিফোন করে অবিনাশকে খবর দিল, সে কয়েকদিন আর বেরুতে চায় না—মনের অবস্থা তার নিতান্তই মন্দ। অবিনাশ কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা দিল এবং সে দিগন্তে পৌঁছতেই মুকুট তাকে গেটের কাছ থেকে ভিতরে ডেকে নিয়ে বসাল। মুকুট আর অবিনাশ বেশ খানিকটা গল্প করল। অল্প সময়ের মধ্যে আর্ট ডিলারের দল এসে পৌঁছতে অবিনাশ বাড়ী ফিরে গেল। পরের দিন সকালে অবিনাশ আবার মুকুট ও জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এল। মুকুট অবিনাশকে নিয়ে তক্তপোশের ওপর আরাম করে বসেছে। আজ মুকুট অবিনাশকে পুরাতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত কাছে ডেকে নানান সমস্যা আলোচনা করতে চায়। যে শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে এতদিন মুকুট অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে সেবিষয় অবিনাশকে বিস্তৃতভাবে সবই বলল। অবিনাশের পরামর্শ মুকুট আগ্রহভরে শুনল এবং অধিকাংশই গ্রহণ করল। জয়ন্তীর সঙ্গে কোনদিন মুকুট কোন কিছুই খুলে আলোচনা করেনি, শিল্পজগতের জটিল কার্যসূচী ও বিভিন্ন সভাসমিতির উল্লেখমাত্র শুনেছে সে—সব-কিছু থেকে সে বাদ পড়ে যেতো। ক্রমশঃ তাই তার মন বিরূপ হয়ে উঠছিল। মুকুট তাকে জানায়নি কিছুই, মতামতও চায়নি কোনদিন। যে জনতা প্রতিদিন মুকুটকে ডেকে নিয়ে যায় জয়ন্তী যেন তাদের প্রতি বিরুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, বন্ধুদের ভালমন্দ সে কিছুই লক্ষ্য করে না। মুকুটের সান্নিধ্য পায়নি বলে তাদের বিষয় জয়ন্তী উদাসীন হয়েছিল সন্দেহ নেই। অবিনাশও মুকুটের দল বলের কাছ থেকে সর্বদাই দূরে থাকতো, সে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে এদের সঙ্গে মিশতে পারবে না জানত। মুকুটকেও তাই সে খুলে বলল যে, তার মতামত একেবারেই অন্যরকম। বেশী কিছু সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'বড় কিছু প্ল্যান করলেই তুমি সরে যেতে চাও অবিনাশ, তোমার স্বভাবই তাই।' মুকুট অভিযোগ করল।

'আমি সত্যিই বড় কিছুর মধ্যে থাকতে ভালবাসি না—যে সব গণ্যমান্য বন্ধুরা ও পদস্থ ব্যক্তিরা এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে আমার উৎসাহ হয় না। শিল্পী যখন আর্ট ডিলারদের সঙ্গে অতিরিক্ত মিশে যায় তখন তার অনেকখানি স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়, তাছাড়া তার জীবনে উচ্চ আদর্শ আর বিশেষ থাকে না। অবশ্য ছবির মূল্য হয়ত বাড়তে পারে।'

'ছেলেমানুষ তুমি, কোন আকাঙ্ক্ষা কি নেই তোমার?'

'তা হয়ত সত্য'—অবিনাশ স্পষ্ট উত্তর দিল।

'শিল্পজগতে সফল হবে, সুখ্যাতি লাভ করবে এ আকাঙ্ক্ষা জয়ন্তীর মনে অতি প্রবলভাবেই জেগেছিল, আপনি তাকে সে সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন, তার সৌভাগ্য। আপনারা দুজনেই শিল্পের উন্নতির জন্য অনেক করতে পেয়েছেন—আপনাদের প্রশংসা সকল স্থানেই শোনা যায়।'

মুকুট অবিনাশের কথাগুলি সন্তুষ্ট মনে শুনে গেল তারপর বলল—অবিনাশ তুমি বিয়ে করনি কেন? স্বামীস্ত্রী দুজনে একত্রে কাজ করবার উৎসাহ পাবে, ছড়িয়ে বসবার প্রেরণা পাবে—স্ত্রীকেও কত সাহায্য করতে পারবে।'

'আমি যে শিল্পীই বিয়ে করব—চিত্রকর যে তাকে হতেই হবে এ আপনাকে তা কে বলল? আমি একটি সাধারণ মেয়েকে গৃহলক্ষ্মী করে নিয়ে আসব, সে আমাকেই শিল্পী বলে মানবে—আমার দেখাশোনা করবে কিন্তু ছবি আঁকবে না। আমি আপনার মত এত সব তাকে দিতে পারব না—স্বপ্নকে সত্য করবার শক্তি আমার নেই। বাস্তব যা কিছু, সহজভাবে তাই গ্রহণ করবে সে। গৃহের মধ্যে শিল্প-প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে নানান অসুবিধা।'

মুকুট অবিনাশের কথাগুলি শুনছিল আর হাসছিল সে খানিক আনন্দ পাচ্ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সব অর্থটুকু বোঝবার সে চেষ্টা করল না।

'যাই হোক, তুমি আমাদের সাহায্য করবে অবিনাশ' মুকুট স্নেহভরে অবিনাশকে অনুরোধ করল।

'একদিন তোমার বন্ধুদের এখানে নিয়ে এস, তাদের সঙ্গে আলাপ করব। কবে আনবে বল?'

অবিনাশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল—'যেদিন বলবেন সেদিনই ওদের নিয়ে আসব। আপত্তি কি?'

অবিনাশ তার ফ্ল্যাটে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিল, কয়েকটি বন্ধু দুপুরে তার সঙ্গে একত্রে খাবে কথা ছিল। অবিনাশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। জয়তী এতক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, এসে বসে গল্প করতে পারেনি—অবিনাশকে যেতে দেখে এগিয়ে এল—

'গৃহলক্ষ্মী আসছে কবে?' বলতেই অবিনাশ উত্তর দিল—

'লক্ষ্মী মাত্রই চঞ্চলা—ঘরে নিয়ে আসা ও বসানো কি এতই সহজ?' তাড়াতাড়ি রওনা দিল।

জয়তীর মন বিষাদে পরিপূর্ণ, সে অবিনাশকে সহজেই ছেড়ে দিল। ঘুরে ফিরে মার কথা মনে পড়ে। কত বাল্যস্মৃতি তার মনকে উতলা করেছে—সে যেন আর স্থির থাকতে পারছে না। একাই দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করছে। বাবাকে দেখবার জন্য মন তার ব্যাকুল। তার মা বাবার গভীর প্রেমের বন্ধন কখনও শিথিল হয়নি। দেবাশিস যখনই বিদেশে গেছে, ছোট ছোট সূক্ষ্ম কাজ করা আসবাবপত্র, খেলনা, সাড়ী, বই, লেস, ছবি নানান স্থান থেকে নিয়ে এসেছে, কোন বিশেষ দিন উপলক্ষ্য করে সেগুলি বাক্স থেকে বার করে শান্তাকে উপহার দিয়েছে। শান্তা জিনিসগুলি পেয়ে আনন্দ করে বলেছে—

'এ তো মেয়েদের অভ্যাস—তুমি আবার এসব সুন্দর জিনিসগুলি কোথায় পেলে?'

'কেন?' দেবাশিস আপত্তি করে উঠেছে—

'পুরুষ যখন সত্যিই ভালবাসে তখনই সে দিতে চায়। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন স্ত্রীঅন্তপ্রাণ ক'জনের বল তো? তাদের এসব কথা মনে হবে কি করে?'

দেবাশিস ও শান্তা। দুজনেই সন্তানদের প্রতি স্নেহান্ধ ছিল, ছেলেমেয়ে পুত্রবধূ নাতনী সকলকেই গভীর প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ছেলেরা অতটা চায়নি, তারা স্বাধীন হবার পর একটু দূরেই সরে গিয়েছিল। জয়তী যেদিন বাড়ী ছেড়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের জন্য বিদেশে চলে গেল, সেদিনের দুঃখ শান্তার কোনদিন ঘোচেনি, সে গভীর মনঃকষ্ট সহ্য করেছিল, এক দেবাশিসই তাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দিতে পারত। মুকুটকে বিয়ে করে জয়তী সুখী হোক এই কামনাই করেছিল দুজনে—জয়তীর চিঠি পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়। 'দিগন্ত' দেখে শান্তা বড়ই তৃপ্তি পেয়েছিল। জয়তীর স্বপ্ন সফল হয়েছে, সে জেনে গেছে। কিন্তু দেবাশিস মন্তব্য কিছুই প্রকাশ করেনি তখন। জয়তীর বিবাহিত জীবনের সমস্যা কেই বা জানত? মুকুট কোনদিন চায়নি জয়তী মাতৃত্বের কর্তব্যভারে জড়িয়ে পড়ে, তাই উভয়েই এ বিষয় উদাসীন হয়ে পড়েছিল। জয়তীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাসনা ছিল চিত্রকর হয়ে সুখ্যাতি লাভ করবে, স্বাধীন হবে। বিখ্যাত শিল্পীর সহধর্মিণী হয়েছিল বলে তার তাই গর্বও ছিল। মানব জীবন ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবেই মুকুট বিশ্বাস করত; কিন্তু শিল্প তার চেয়েও বেশী কিছু প্রকাশ করবে যাতে জীবনের সঙ্গে সর্বদা মিল না থাকতেও পারে। সকলেরই ধারণা মুকুটের ও জয়তীর জীবন একই সূত্রেই বাঁধা। বন্ধুদের কাছে জয়তী বলেছে—

'আমাদের একই আদর্শ, একই উদ্দেশ্য, একই প্রেরণা।' বাইরের জগৎ জয়তীর অন্তরের দ্বন্দ্বের কথা কোনদিন অবগত হয়নি।

শিল্পক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব মুকুটকে কেমন যেন একটা স্বার্থপর জীবনের দিকে নিয়ে চলেছিল। শিক্ষায়তনের জটিল সমস্যাগুলির ক্রমশ সমাধান হ'ল। অভিজ্ঞ শিল্পীদের জন্য বিশেষ করে এই শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হ'ল। সকল রকম ললিতকলায় সুদক্ষ ছাত্রছাত্রী সুবর্ণ সুযোগ

লাভ করল। বিদেশ থেকে বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে এসে কিছুদিন রাখা হবে তাছাড়া ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ শিল্প-গুরুরাও ভার নেবেন। মুকুট নিশ্চিন্ত বোধ করছিল—এতদিনের স্বপ্ন বুঝি সত্যি হল—রীতিমত আশান্বিত হয়ে উঠল। কিন্তু জয়ন্তীকে সে কিছুই বলে না—এই শিক্ষায়তনের সঙ্গে জয়ন্তীর যেন কিছুই সম্পর্ক নেই, জয়ন্তীর অসহ্য অভিমান, সে বিরূপ হয়ে উঠল। তার মনে শুধু নৈরাশ্য, গভীর দুঃখ। সে এই ভিড়কে আর এক দণ্ডও সহ্য করতে পারছিল না। সকলেই যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। ক্রমাগত যারা মুকুটের সঙ্গে নির্জনে কথা বলে, নিভৃতে আলোচনা করে সে তাদের পরিচয়ও জানে না। মুকুটের শিল্প রাজ্য তার কাছে কি সম্পূর্ণ অচেনা, অপরিচিত রয়ে গেল? সকলের সঙ্গে জয়ন্তী হাসিমুখে কথা বলে, আপ্যায়িত করে, কিন্তু মুকুট নিষ্ঠুরের মত তাকে অবজ্ঞা করে চলেছে। সে কি কিছুতেই বোঝে না জয়ন্তীকে সে কতখানি আঘাত করছে? চিত্রকরের জীবন যে শুধু কল্পনার স্বপ্নরাজ্য নয়, তা কি জয়ন্তী বোঝেনি? তার অপরাধ কোথায় সে জানতে চায়, এ ক্ষেত্রে তার যে ত্রুটি কিছুই নেই জয়ন্তী এ বিষয় দ্বিধাশূন্য। মুকুটকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে সে কিন্তু পেয়েছে শুধু অবহেলা, উদাসীনতা ও তিরস্কার। কোথায় চলেছে সে কতদূর? আর কতদিন এভাবে চলবে তাই ভাবতে লাগল। মুকুটের ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই, বিবেচনা নেই, প্রীতি নেই, কেবল নেশা—আকাঙ্ক্ষার মত্ততা। জয়ন্তী ধৈর্য মানল— সে নীরবে সব দিক বজায় রাখবে পণ করল। বিপুল অভিমানের যে কুৎসিত ক্ষত তিলে তিলে তাকে গ্রাস করছিল, একটি বিশাল কর্মজাল দিয়ে সে তা ঢেকে দিল। কাজের নেশায় ও উচ্ছ্বাসে অকস্মাৎ সে যেন মেতে উঠেছে। মুকুট অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেল না। জয়ন্তী যে মুখোশ পরল বলেই এই জীবননাট্যে দক্ষতার সহিত অভিনয় করে যেতে পারল, মুকুটের স্থূল চোখে তা ধরা পড়ল না। এই অলীক রঙ্গমঞ্চের আলোছায়ার নৃত্য, যবনিকার অন্তরালের বীণার অসঙ্গতিপূর্ণ ঝংকার কিছুই জয়ন্তীকে টলাতে পারছিল না—নিজের ইচ্ছাকে বাসনাকে সে অলৌকিকভাবে জয় করে নিতে পারবে আশা করল। একমাত্র এইভাবেই সে মুকুটের নির্মম শিল্পতত্ত্ব মেনে নিতে পারল। হার মানবে না এই তার সংকল্প।

ক্রমশঃ

নীলাচলে

কানাইলাল দত্ত

কাশীভাই প্রসাদের দুর্দশা শুনে একদিন মালপোয়া প্রসাদ এনে হাজির করলেন। এটি খুবই উপাদেয় ছিল। বাড়ীতে আসার দিন এই কাশীভাইই—গজা ও অন্যান্য প্রসাদ, ফুল বেলপাতা খুবই সুদৃশ্য আধারে প্যাক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেজন্য কোন পৃথক্ মূল্য দেবার প্রয়োজন হয়নি। ওটা নাকি ভোগের জন্য প্রদত্ত অর্থমূল্যের মধ্যেই আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। আমরা যখন শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে গিয়েছিলাম, তখন কি একটা বিশেষ যোগ চলছিল। বিধবা স্ত্রীলোক বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের নারী ভক্তের সমাগম ছিল প্রচুর। আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরের একাদশী থেকে কার্তিক মাসের উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত একমাস কাল জগন্নাথ দেবের রাধা-দামোদর বেশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে রাধা-দামোদর মন্দির আছে। পূজা নিবেদনের ধরণ-ধারণ খুবই অনাড়ম্বর। সকলেই ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন দেখা গেল। রাধা-দামোদর মন্দির সম্মুখে বিধবাগণকে নৃত্যগীত সহযোগে ভক্তি নিবেদন করতেও দেখেছি। এই সকল ভক্তের অনেককেই সমুদ্রতীরেও একপ্রকার পূজা করতে দেখা যায়। বালির মধ্যে একটি তুলসী গাছ বসিয়ে তারই সামনে মন্ত্র পাঠ করেন। পুরোহিত সাহায্য করেন। নারকেল এবং চালতা অবশ্য অর্ঘ্য বলে বিবেচিত। পূজা শেষে পঞ্চরত্ন সহ উক্ত ফলদ্বয় সাগরে বিসর্জিত হয়।

কালীপূজার রাত্রে এখানে একটি মনোরম পিতৃ-পুরুষ স্মরণোৎসব হয়। একে পিতৃলোক-পূজাও বলা হয়। লৌকিক ব্যাপারটা খুবই সাদাসিধা। লম্বা লম্বা পাট কাঠি জ্বালিয়ে আকাশে তুলে ধরে পিতৃ-পুরুষের পথ দেখতে সাহায্য করা হয়। আহ্বান মন্ত্র স্থানীয় ভাষায় ছড়ার আকারে রচিত। কে বা কারা রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না; যদিও যায় তবে তা সহজলভ্য নয়। আমাদের কাশীভাই কয়েকটি ছড়া শুনিয়েছিলেন। ছড়াগুলি যে অর্থবহ ও মাধুর্য্যমণ্ডিত তা স্বীকার করতেই হবে। একটি ছড়া যেমন শুনেছি এখানে তুলে দিলাম।

বড়বাড়িয়ে সড়সড়িয়ে
আঁধার আসে বাইশ সিঁড়িতে
প্রসাদ পেয়ে
শেত গঙ্গায় হাত পা ধুয়ে
আলোয় যাও
পিতৃলোকে অমৃত দৃষ্টিতে তাকাও।

আমাদের আকাশপ্রদীপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সামান্য হলেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। দীপান্বিতার দীপ জ্বলতে দেখলাম প্রায় সব বাড়িতেই।

ঐ দিন শ্রীমন্দিরের সামনে অরুণ স্তম্ভের পাদদেশে ব্রাহ্মণেরা বেশ কয়েকটি হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করে বসে থাকেন। সাধারণ মানুষ যে যেমন দক্ষিণা দেন তেমন আকারে তার জন্য হোম করে দেন।

শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেমন প্রচুর দেবদেবী ও পৌরাণিক মূর্তি আছেন তেমনি এ স্থানটি নিত্য নানা উৎসবে মুখরিত থাকে। মানুষ নিজ নিজ রুচি ও অভীপ্সা অনুসারে এই সব উৎসব থেকে আনন্দ আহরণ করে থাকেন। সকলের সব প্রার্থনা পূর্ণ হবার উপাদান এর মধ্যে সহজেই মিলে যায়। প্রতারক যেমন প্রতারণার সহজ সুযোগ পায়, তেমনি ভক্ত দেখা পান ভগবানের। কথাটা নিয়ে তর্ক তোলা যায়। কিন্তু সব কিছুকে তর্ক দিয়ে বা যুক্তি দিয়ে যে ব্যাখা করা যায় না, বোঝানও যায় না এই সহজ সত্যটি সুধীরা

বুঝিয়ে দিয়েছিলেন একটি ছোট্ট সুন্দর উপমায়। জানি উপমা যুক্তি নয়। তথাপি এ স্থলে উপমাই হলো একমাত্র অবলম্বন যা সম্বল করে আমরা মনের ভাব কতকটা বোধ্যরূপে ব্যক্ত করতে পারি। তিনি বলেছিলেন এই যে, আমরা পিতামাতাকে ভক্তি করি, স্ত্রীকে ভালবাসি অথবা পুত্রকন্যাকে স্নেহ করি; এর কোনটারই কি মাপজোক করা যায়, না ছবি এঁকে দেখানো যায়? এই সামান্য পার্থিব জিনিস যখন একমাত্র অনুভূতিলব্ধ তখন অপার্থিব ঐশ্বরিক আশীর্বাদকে আমরা কেউ কেউ ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যদি না-ই পাই তবে মিথ্যা বলব কোন্ যুক্তিতে? বিনোবাজির একটা লেখায় পড়েছিলাম:

মা যখন সস্নেহে আমাদের পিঠে তাঁর হাতটা রাখেন তখন আমাদের মনে অপূর্ব আনন্দ ও আবেগের সঞ্চার হয়। অনুরূপ ওজনের আর একখানা হাত রাখলে নিশ্চয়ই এমন আনন্দ আমরা অনুভব করব না। মায়ের হাত আর আমার পিঠের মধ্যে একটা অদৃশ্য বস্তু থাকে—তা হলো মায়ের স্নেহ। সব সন্তানই মাতৃস্নেহের অধিকারী। কিন্তু তাই বলে সকলে কি সমান মর্যাদায় এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সেই স্নেহে নির্ভর করে? করে না। তেমনি সকল মানুষই ভগবদ্-প্রেমের অধিকারী হলেও নিজ নিজ কর্মকৃতির দোষগুণে কেউ আমরা সেই অপার প্রেম আস্বাদন করতে পারি, কেউ নিজেকে বঞ্চিত করি। আরও সহজ করে বল্লে দাঁড়ায়, বুদ্ধি ও ভালবাসা ইত্যাদি যেমন দেখানো যায় না কিন্তু কর্মে প্রকটিত হয়, ভগবান্ তদ্রূপ আমাদের চৈতন্যে উদ্ভাসিত হন, আচার আচরণে প্রকটিত হন।

পাঠক দয়া করে মনে রাখবেন, শ্রীক্ষেত্র তো বটেই শ্রীমন্দির সম্পর্কেও আমি পূর্ণ কোন আলোচনা করছি না। অল্প সময়ের মধ্যে দুচার বার এক-আধ ঘন্টা করে দর্শনের ফলে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাই মাত্র এখানে বলবার চেষ্টা করছি। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণের একটি পাথরের কাক মূর্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার তীর্থগুরুর তেমন কোন লেখাপড়া নেই। লোকমুখে তিনি যা শোনেন, তাই গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেন। তিনি বল্লেন, এটি হলো ভুষণ্ডি কাক। কাক অমর। স্বাভাবিকভাবে কাকের মৃত্যু নেই। কাকের স্বাভাবিক মৃত্যু আমার চোখে পড়ে নি যদিও প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওরা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। অপর দিকে কোন কারণে একটি কাক যদি মারা পড়ে দুনিয়ার কাক জড়ো হয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয় ভুষণ্ডি। কাক যুগযুগান্তর ধরে নাকি রামনাম কীর্তন করেন। এই ভুষণ্ডি কাকের মূর্তি শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে রক্ষিত আছে। জনশ্রুতি হলো—শ্রীমন্দির নির্মাণ করে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজা ব্রহ্মার নিকট গেলেন তাঁকে দিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করানো যায় কি না তার তদারক করতে। ব্রহ্মার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বহু বর্ষ কেটে গেল ইতিমধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দির জবর-দখল হয়ে যায়। রাজা ফিরে এসে মন্দির দাবি করলে প্রতিপক্ষ গালমাধব তা ছেড়ে দিতে অস্বীকার তো করলেনই পরন্তু সে মন্দির নিজের বলে দাবি করে বসলেন। এই ভুষণ্ডি কাক মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত কল্পবট গাছে থেকে সব দেখেছেন। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার দাবি সত্য বলে সমর্থন করেন।

শ্রীমন্দির সম্পর্কে আরও একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। মন্দিরচূড়ায় যে চক্র স্থাপিত রয়েছে সেটি বিষ্ণু চক্র বলে অভিহিত। আর ঐ যে ধ্বজা দেখা যায় সেটা ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং বেঁধে দিয়েছিলেন। ধ্বজা চড়ানো বিশেষ সুফলদায়ক বলে ভক্তেরা বিশ্বাস করেন। এই কার্যে পারদর্শী এক শ্রেণীর লোক শ্রীক্ষেত্রে আছেন। তাঁরা অবলীলাক্রমে ১৯২ ফুট উঁচু মন্দিরশীর্ষে আরোহণ করে থাকেন। ধ্বজার কথাটা বিশেষ করে মনে হবার কারণ হচ্ছে আমার শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে একদিন (১৫-১০-৭১) ঘূর্ণি ঝড়ে শ্রীমন্দিরের ধ্বজা খসে পড়ে। এটা লৌকিক বিচারে অতিশয় দুর্লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। সেবকেরা যথাবিধি শাস্ত্রীয় প্রতিকারে ব্রতী হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও অচিরেই ওড়িশায় এক দারুণ দুর্যোগ ঘটে। বস্তুতঃ এক পক্ষকালের মধ্যে ওড়িশায়

বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঝড় ও জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত হয়ে ৪০ লক্ষাধিক লোক বিপন্ন হয়ে পড়েন এবং কোন কোন হিসাবে ২৫ হাজার লোক নিহত হন। ব্যাপারটা কাকতালীয় কি না জানি না। তবে যারা শ্রীমন্দিরের ধ্বজা খসে পড়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী তাদের সঙ্গে তর্ক করিনি। জনশ্রুতি হলো, ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং এই ধ্বজা বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—দূর থেকে এই ধ্বজা দর্শন করে প্রণাম করলেই মানুষ মুক্তি লাভ করবে।

জগন্নাথের রথ তো প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে—জগন্নাথের রথ আপনিই চলে। রথযাত্রায় দিন নবনির্মিত তিনটি পৃথক্ রথে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেবী শ্রীমন্দির থেকে গুণ্ডিচা গমন করেন।

এই রথে দীর্ঘ রজ্জু যোজিত থাকে। সেটা ধরে শত শত সহস্র সহস্র ভক্ত রথ টেনে নিয়ে চলেন। রথের এই রজ্জু ধরে টানার সুযোগ পাওয়া এক মহা সৌভাগ্য বলে ভক্তগণ মনে করেন। ভক্তেরা এই ভাবে টানতে টানতে রথত্রয়কে এক মাইল উত্তরে গুণ্ডিচা বাড়ি বা প্রভুর বাগান বাড়ি নিয়ে যায়। এইটুকু পথ যেতে প্রায় ২৪ ঘন্টা সময় লাগে।

গুণ্ডিচা বাড়ি সম্পর্কে নানাপ্রকার কথা প্রচলিতআছে। আমার কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যেটি মনে হয়েছে সেটাই এখানে যেমন শুনেছি বিবৃত করছি। সত্যাসত্য বিচার এখানে অপ্রয়োজনীয়। কিংবদন্তী মাত্রেই মানুষ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করে থাকে। গল্পটা বলেছিলেন আমার কাশীভাই।

গুণ্ডিচা মহারাণী ছিলেন জগন্নাথদেবের মেথরাণী। ওড়িশায় মেথরাণীকে মহারাণী বলে। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার লোপ পায়। তখন গুণ্ডিচা মহারাণী অনুযোগ করেন: আমি তোমার মলমূত্র সাফ করে এতদিন যাবৎ এত সেবা করলাম, তা ঠাকুর তুমি রাজভোগের লোভে একদম ভুলে গেলে? তুমি কেমন প্রভু? গুণ্ডিচা মহারাণীর আকুলতা মিশ্রিত অভিমান প্রভুর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনিই নিয়ম প্রচার করে দিলেন—রথযাত্রায় সাত দিন তাঁকে সকলেই স্পর্শ করতে পারবে এবং বৎসরে ঐ সময়টা তিনি গুণ্ডিচা মহারাণীর বাড়িতে অবস্থান করবেন। এটিকে মাসীর বাড়িও বলা হয়। আমরাও তো অনেক সেবিকাকে মা মাসী প্রভৃতি সম্বোধন করে থাকি। প্রেমের ঠাকুরের আচার ব্যবহার মানুষ থেকে ভিন্নতর হয় না—সত্য হোক মিথ্যা হোক আখ্যানটি আমার ভাল লেগেছে। লোকবিশ্বাস রথের দিন কম বেশি বর্ষা হবেই এবং তা নাকি হয়েও থাকে।

জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বেশ কয়েকজন ছড়িদার সেবক থাকেন। এঁরা ছুটো বেত এমন কায়দায় আন্দোলিত করেন যে বেশ জোরে ফটাফট শব্দ হয়। এই কাজের দ্বারাই তাঁরা যাত্রীদের কাছ থেকে বেশ দুপয়সা উপার্জনও করতে সমর্থ হন। যাত্রীদের মাথায় ওটা ঠেকিয়েই পয়সার জন্য হাত বাড়ান। পেয়েও যান। জগন্নাথের ছড়ির স্পর্শে যে ধন্য করল তাকে কোন্ ভক্তজন দশটা বিশটা পয়সা দিতে কার্পণ্য করবেন? কাশীভাই বলেছিলেন, দশহরার দিন এই ছড়ির বিশেষ পূজা হয়। আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ দিনে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বই দোয়াত কলম ইত্যাদি পূজা করা হয়ে থাকে। ছড়ি পূজার অন্য কোন তাৎপর্য আছে কি না জানাতে পারিনি।

চৈত্র মাসে গাজনের সময়ে বাংলা দেশের ছড়ি পূজার সঙ্গে এর সাদৃশ্য অনুমান করা যায়।

মন্দিরের শত শত কাহিনী ছড়িয়ে আছে নানা বই পত্রে আর এখানকার মানুষের মুখে মুখে। সে কাহিনীর আদি বা অন্ত কোনটাই স্পর্শ করা যায় না। তাই শ্রীমন্দিরের সকল দেবদেবী এবং মূল বিগ্রহত্রয়কে প্রণাম করে আমরা উঠে পড়লাম। কাশীভাই বল্লেন, বাঙলা থেকে এসেছেন, চৈতন্য গম্ভীরা দেখবেন না? দেখবেন না সিদ্ধ বকুল? ফেরার পথেই পড়বে। চলুন একবার দেখে যাবেন। কাশীভাই বুঝতে পারেনি যে, বাংলার মানুষ, সে শাক্ত হোক আর শৈব হোক কিম্বা হোক বৈষ্ণব—চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে গর্ব ও গৌরব করে

সবাই। সুতরাং তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাবার কথা উঠতেই পারে না।

গম্ভীরা শব্দের অর্থ হলো মন্দির মধ্যকার ক্ষুদ্র কক্ষ। শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে চৈতন্য গম্ভীরা। একটি সাধারণ বাড়ি। ভিতরে নিত্য কীর্তন ও চৈতন্যচরিতামৃত ভাগবতাদি গ্রন্থ নিত্য পাঠের ব্যবস্থা আছে। অপরাহ্নে আমরা যখন গেলাম তখন এক স্থলে কনাকয়েক ভক্ত নিয়ে জনৈক কথক ওড়িয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। পাঠক ওড়িয়া কি বাঙালী বুঝা গেল না। অপর একটি দালানে তিনজন বাঙালী মৃদঙ্গ ও করতাল সহ নাম সংকীর্তন করছেন খুবই মৃদু স্বরে। দেখে মনে হলো নিয়ম রক্ষা হচ্ছে। আরও ভেতরে অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর খড়ম কমণ্ডলু কাচের আধারে রক্ষিত দেখলাম। সেই আধারের মধ্যেই আর একটি ছোট্ট পেটিকায় মহাপ্রভু ব্যবহৃত একখানি কাঁথা ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। তার পেছনে মুণ্ডিত মস্তক ও হাঁটু মুড়ে বসা গৌরাঙ্গ সুন্দরের একটি ভারি সুন্দর ছবি রয়েছে। বাড়িটি পুরাতন কিন্তু যত্নে রক্ষিত। কাশীভাই জানালেন, রথযাত্রার সময় প্রচুর চৈতন্য-ভক্ত এখানে সমবেত হন।

চৈতন্য গম্ভীরার অদূরে সিদ্ধ বকুল। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন মহাপ্রভুর মুসলমান ভক্ত-শিরোমণি। তিনিও মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে আসেন। এখন যেখানে সিদ্ধ বকুল সেখানেই হরিদাস অবস্থান করতেন। জগন্নাথ দেবের দন্তধাবন কাঠি পাণ্ডারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করেন। মহাপ্রভু একদিন এইরূপ একটি কাঠি প্রসাদী পান। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ কাঠিটি হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানে প্রোথিত করে দেন। সেই কাঠি থেকে গাছ। পুরাতন গাছের জীর্ণ কাণ্ড বেদী করে ঘিরে রাখা হয়েছে,তারই একটা ডাল অলৌকিক উপায়ে এখনো জীবন্ত দেখা যায়। সে তো প্রায় ৫০০ বছর হলো হরিদাস ঠাকুর শ্রীক্ষেত্র ধামে বিরাজ করেছিলেন।

এইখানে একটি মন্দিরে হরিদাস ঠাকুরের ছবি আছে। মনে হয় ঠাকুর ছোট খাট কৃশ মানুষ ছিলেন। ধর্মে মুসলমান বলে মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের একত্রে থাকা বোধহয় হয়নি।

মহাপ্রভুর ওড়িশা লীলার সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত হলেন টোটা গোপীনাথ। হরিচণ্ডীসাহিতে একটি সুদৃশ্য মন্দিরে টোটা গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত। এটা আমাদের দেখা হয়নি। তেমনি দেখা হয়নি সোনার গৌরাঙ্গ। মাহপ্রভুর নাকি বার হাজার ভক্ত ছিল ওড়িশায়। বাঙলার এক দুর্যোগের দিনে তাঁর আবির্ভাব কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটান এখানে এবং এইখানেই তাঁর মানব দেহ ভগবতী তনুতে লীন হয়ে যায়।

আমার পুরী অবস্থানকাল শেষ হয়ে এসেছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। বাড়িতে আপনজনের জন্য স্নেহ-প্রীতির কিছু উপহার কিনতে বেরিয়েছি। খুব সামান্য সব খুচরো খাচরা সৌখীন জিনিস। যেমন, শঙ্খের মালা, শিংএর শিল্পকর্ম, চন্দন কাঠের কৌটা—এই সব। খোঁজ খবর করতে করতে মনে হলো শ্রীমন্দিরের জন্যই তো অধিকাংশ মানুষ আসেন আর তাঁরাই এই সব কেনা-কাটা করে ওড়িশার অর্থনীতিকে সজীব রাখতে বিপুল সাহায্য করেন। এটা পরোক্ষ প্রভাব। জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদে প্রত্যক্ষভাবে কয়েক সহস্র ব্যক্তির রুজি রোজগার হয়। দুই হাজারের মত পাণ্ডাঠাকুর আছেন। রন্ধনশালার একটু বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মোট কর্মচারী এক হাজারের মত হবেন। কথিত হয়, জগন্নাথদেবের ৬ প্রকার সেবক আছেন। দিনরাতের পূজা, ভোগরাগ, বেশবাস পরিবর্তন করানো, ফুল চন্দন মালার যোগান দেওয়া ইত্যাদি কাজে বহু ব্যক্তির প্রয়োজন। প্রসাদ রান্নার হাঁড়ি, সেজন্য প্রয়োজনীয় চাল, তরিতরকারী, মসলাপাতি যোগানোর কাজেও বহুমানুষ লিপ্ত থাকেন।

মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঝাড়ুদার, জমাদার, পাইক বরকন্দাজ যেমন দরকার তেমনি প্রয়োজন রাজমিস্ত্রী, বিজলি মিস্ত্রী প্রভৃতি। এত বিশাল ও

বিপুলসংখ্যক মন্দিরের কাজকর্ম ঠিকমত করা এক-আধজনের কর্ম নয়। হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের ও অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কেরানী, হিসাব রক্ষক, তহবিলদার। পরিদর্শক ও কর্তা বা ম্যানেজার জাতীয় কর্মীর সংখ্যাও নেহাৎ কম হবার কথা নয়। এমন কি নৃত্যশিল্পী, গায়ক পাঠক ও কথকদের জন্য নিত্য কর্ম নির্দিষ্ট আছে। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। সেসব দেখা শুনার জন্য নায়েব গোমস্তা পাইক বরকন্দাজ দরকার। মন্দির কমিটির বাস্ আছে, অন্য কোন কোন ব্যবসায় আছে কি না জানি না। এ জন্যও তো লোকজনের দরকার। জগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় চার-পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশি বলে শুনেছি। পূর্বোক্ত শ্রীক্ষেত্র পুস্তকে উল্লেখ আছে, "১১২৫সাল হইতে ১১২৮ সাল পর্যন্ত গড়-পড়তা বাৎসরিক আয় ও ব্যয় মোট ২৬০, ০০ টাকা হইয়াছিল।" ইহা এখন বহুগুণে বেড়েছে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিটি মন্দির সেই অঞ্চলের অর্থনীতিও বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি রাখে। জগন্নাথ মন্দিরের এই দিকটি নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে।—এ সব ভাবনা চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে অনুভব করেছি, মন্দির-কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে, টলস্টয় যাকে বলেছেন economics of justice তার অভিব্যক্তি ঘটে।

বাড়ি ফেরার তাগিদ এসেছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, একটু ঘনিষ্ঠতাও ইতিমধ্যে জমেছে যাবার আগে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে। সাত সাতটা দিন পুরীতে আনন্দে কেটেছে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্র, অবিস্মরণীয় পুরাকীর্তি, মুখর স্থাপত্য, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সবই দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকার পেয়েও পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাচ্ছি না। আমি একলা এসেছি। স্বার্থবুদ্ধির শিকার হলাম না তো? সকলে মিলে যা ভোগ করা যায় না তা তো গ্রহণীয় হতে পারে না। জগন্নাথ ক্ষেত্রের শিক্ষাও বোধ করি এই: এখানে মিলিত ভোগের ব্যবস্থার দ্বারা এই কথাই ঘোষণা করা হচ্ছে না কি? আবার যেন সকলে মিলে আসতে পারি জগন্নাথদেবের নিকট এই আকুল প্রার্থনা জানিয়ে গৃহাভিমুখে রওনা হলাম।

পুরী থেকে কলকাতা মাত্র ৩১০ মাইল—এক রাত্রের রেল ভ্রমণ। রেল কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সামান্য অতিরিক্ত মাশুলে ঘুমোবার জায়গা সংরক্ষণ করতে পারেন। ঘুমোতে যাবেন এবং ঘুম ভাঙলে দেখবেন আপনি কলকাতা পৌঁছে গেছেন। কলকাতায় ঘুম ভাঙলেও আপনার চোখের সামনে ভাসতে থাকে শ্রীক্ষেত্র, শ্রীমন্দির আর সমুদ্রের সীমাহীন অনন্ত বিস্তৃত উত্তাল ফেনিল জলরাশি—দিক্‌চক্রবালের শেষে কি আছে তা আপনি অনুমান করতে পারেন—কিন্তু নিশ্চয় করে কিছুই বোধ করি জানেন না। সেই জানা জানা চেনা চেনা অথচ অজানা অচেনা বা আধো জানা আধো চেনা বস্তুর অনির্বচনীয় ও অব্যক্ত অস্ফুট আনন্দের দ্বারাই সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে মানুষ সঞ্জীবিত হয়ে আসছে। আমরাও কোন ব্যতিক্রম নই। আমার অনুভূত আনন্দের আর এক অভিব্যক্তিই তো এই রচনা। আশা করব অনাদিকালে সেই আনন্দ পাঠক মনেও পরিব্যাপ্ত হবে। জগন্নাথের রথ আপনিই চলে, চলবার জ্ঞান থাক আর নাই থাক, কোথায় চলেছে তা জানুক আর নাই জানুক, কোনমতে যদি একবার মহাকালের সেই রথে চড়ে বসতে পারি তবেই আনন্দলোকে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব আমরা।

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

শ্রীবিমল সিংহ

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতার সূত্র স্বরূপ একটু পূর্বানুবৃত্তি প্রয়োজন।

সাধারণ পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকা এবং কোন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারণে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকা, এই দুই-এর তুলনা প্রসঙ্গে সাধারণ পণ্যদ্রব্যাদির অবাধ প্রতিযোগিতা মূলক বাজার (Free Competition) এবং বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার অবাধ বিনিময়ের বাজার (Free Foreign Exchange Market) এই দুই-এর সাদৃশ্যের আলোচনা চলিতেছিল। বৈষয়িক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (Economic Individualism) এবং অবাধ উদ্যোগ (Freedom of Enterprise) নীতি স্বীকৃত হইলে কোন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির (service) মূল্য নির্দ্ধারিত হয় "বাজারে" অর্থাৎ একদিকে ক্রেতা অথবা ব্যবহর্তা (consumer) এবং অপরদিকে বিক্রেতা অথবা উৎপাদক (producer), এই দুই পক্ষের অবাধ যোগা-যোগে এবং পারস্পরিক সম্মতিতে। এইরূপে কোন একটা পণ্যদ্রব্যের অথবা উপকৃতির (service) বাজারের, অর্থাৎ ক্রেতা এবং বিক্রেতার অবাধ যোগাযোগের, একটা আদর্শ অবস্থাকে অর্থশাস্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা অথবা পূর্ণ-প্রতিযোগিতা (Free Competition অথবা Perfect Competition) আখ্যা দেওয়া হয়। কোন পণ্যদ্রব্যের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহার অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকিবেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ থাকিবে অথচ কোন পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না, ক্রেতা অথবা বিক্রেতাদের মধ্যে কোন জোট অথবা মূল্যাদি সম্পর্কে কোন বুঝাপড়া থাকিবে না, বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় দ্রব্যের মধ্যে বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক কোনও পার্থক্য থাকিবে না, এবং নৈকট্য, আচরণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে প্রভাবিত হইয়া কোন বিশেষ ক্রেতা কোন বিশেষ বিক্রেতা অথবা তাঁহার পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট অথবা আসক্ত হইবেন না।

এইরূপ একটা 'আদর্শ অবাধ-প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে কোন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির একটা মাত্র মূল্য থাকা সম্ভব। সেই মূল্য স্থির হইবে বাজারে ইহার মোট চাহিদা এবং মোট যোগানের ভিত্তিতে। কোন বিশেষ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার পক্ষে তাহা কমাইবার অথবা বাড়াইবার শক্তি নাই। প্রত্যেক ক্রেতা অথবা বিক্রেতা চলিত বাজার-দরটাকে মানিয়া লইয়া নিজের চাহিদা (ক্রয়) অথবা যোগান (বিক্রয়) কমাইতে বাড়াইতে পারেন, এই মাত্র। অর্থাৎ ক্রেতা অথবা বিক্রেতারা কেহই মূল্য-নির্দ্ধারক (price maker) নহেন তাঁহারা মূল্যানুসারক (price taker) মাত্র।

বাস্তব জগতে এইরূপ আদর্শপূর্ণ প্রতিযোগিতা বড় একটা দেখা যায় না। বরং ইহার ব্যতিক্রমই সচরাচর চোখে পড়ে। তবে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বের খাতিরে বাস্তবের কতকগুলি মৌল চারিত্রিক বিশেষত্বকে বাস্তব হইতে বিশ্লিষ্ট অথবা বিমূর্ত্ত (abstract) করিয়া একটা কাল্পনিক আদর্শ অথবা "মডেল" (model) তৈরী করা হয়। অবাধ অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থশাস্ত্রীয় মডেলটা জানা থাকিলে বাস্তবে কোথায়, কখন, কি কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং ইহার ফল কি দাঁড়ায় তাহা অনুধাবন করা সহজ হয়।

কোন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির বাজারে আদর্শ অবাধ প্রতিযোগিতার যে কোন একটা শর্তের ব্যতিক্রম ঘটিলেই অর্থশাস্ত্রে ইহাকে আখ্যা দেওয়া হয় "অপূর্ণ" অথবা "অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা" (Imperfect Compe-

tition)। ইহাকে "ব্যাহত" প্রতিযোগিতাও বলা যায়। যেমন ধরা যাক পণ্যদ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা আছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ আছে অথচ কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় পণ্য সম্পূর্ণ অভিন্ন অথবা পরিবর্ত সামগ্রী (perfect substitute); এ অবস্থায়ও যদি ক্রেতারা অথবা বিক্রেতারা অথবা উভয় পক্ষ একজোট হন কিংবা ক্রেতাদের অথবা বিক্রেতাদের পরস্পরের মধ্যে মূল্য সম্পর্কে কোন বুঝাপড়া থাকে তবে একচেটিয়া অথবা একায়ত্ত বাজারের (Monopoly) উদ্ভব হইল (অবশ্য এ অবস্থায় ক্রেতাদের সঙ্গে বিক্রেতাদের সমষ্টিগত ভাবে "অবাধ যোগাযোগ" থাকিলেও স্বতন্ত্র-ভাবে তাহা থাকিতে পারে না)। ক্রেতারা একজোট হইলে হয় "এ‌কক্রেতায়ত্ত বাজার" Monopsony); বিক্রেতারা একজোট হইলে হয় "একবিক্রেতায়ত্ত বাজার (Monopoly); এবং উভয় পক্ষ একজোট হইলে তাহা হয় "উভয়পাক্ষিক অথবা দ্বিপাক্ষিক অথবা দুই তরফা একায়ত্ত বাজার" (Bilateral Monopoly)। বাস্তব জগতে শ্রমের বাজারে একদিকে শ্রমের নিযোক্তা অর্থাৎ ক্রেতা তথা শিল্পপতি, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে কোন সরকারী সংস্থা, এবং অপর দিকে শ্রমের বিক্রেতা সংঘ-বদ্ধ শ্রমিক (Tradel Union), এই দুই পক্ষ প্রায়শ: এইরূপ উভয়মুখী একায়ত্ত বাজারের সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে "সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক" বলিতে শুধু সাধারণ শ্রমজীবী অথবা "মজদুর"দের শ্রমিকসংঘই (Trade Union) বুঝায় না। করণিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধিকারিক (Officer), বৈমানিক (pilot) চাকুরীরত চিকিৎসক ইত্যাদি যাঁহারাই নিজেদের শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মাহিনা অথবা মাসোহারা নির্দিষ্ট করনের জন্য একজোট হন তাঁহারা সকলেই এই শ্রেণীতে পড়েন, কারণ অর্থশাস্ত্রে "শ্রম"(Labour) বলিতে শুধু কায়িক শ্রমই বুঝায় না, মূল্য অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিক্রেয় অথবা বিক্রীত মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা মস্তিষ্কের শ্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে "ধন-তান্ত্রিক" অর্থবিজ্ঞানী এবং "সমাজবাদী" অর্থবিজ্ঞানী উভয়েই একমত বলিয়া মনে হয়। যেমন কার্ল মার্ক্স-এর ভাষায়, "বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন সাধক শ্রম অথবা উৎপাদন মূলক কার্য্যাবলীর মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, ইহা একটী শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত সত্য (Physio-logical fact) যে এই সবই মানুষের দেহযন্ত্রের ক্রিয়া (functions of human organism) এবং ইহাদের প্রকৃতি অথবা বহিঃপ্রকাশ (nature and form) যেরূপই হোক না কেন, এরূপ প্রত্যেকটি ক্রিয়াই মানুষের মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মাংসপেশী ইত্যাদির প্রয়োগ (expenditure of human brain, nerves, muscles etc.)"। যাহাই হউক, আমাদের আলোচ্য এবং বিবেচ্য এই যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহার অসংখ্য ক্রেতা (অর্থাৎ শ্রমের নিযোক্তা তথা "মালিক") এবং অসংখ্য বিক্রেতা (অর্থাৎ "শ্রমিক") থাকিবেন এবং শ্রমের মূল্যের (অর্থাৎ "মজুরী"র) উপর বিশেষ ক্রেতার (মালিকের) অথবা বিশেষ বিক্রেতার (শ্রমিকের) কোন হাত থাকিবে না। সেই মজুরীর হার নির্দ্ধারিত হইবে বাজারে সেই শ্রমের মোট যোগান এবং মোট চাহিদার ভিত্তিতে। আবার কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের চাহিদা আসিবে বাজারে সেই বিশেষ শ্রম হইতে জাত পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা হইতে, তবে পূর্ণ প্রতিযো-গিতার বাজারে কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপরও কোন উৎপাদকের হাত নাই। অতএব শ্রমের ক্রেতা অথবা "মালিক" শ্রমের বাজার দরের সহিত অর্থাৎ চলতি মজুরীর হারের সহিত (অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎপাদন ব্যয় মিলাইয়া) সেই শ্রমজাত দ্রব্যের চলতি বাজার দরের তুলনা করিবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রমিকের মজুরী (এবং দ্রব্যটীর অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎপাদন ব্যয়) সেই শ্রমজাত দ্রব্যের চলতি বাজার দরের নীচে থাকিবে ততক্ষণ তাঁহার মুনাফা হইবে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সেই মুনাফাও বেশী দিন থাকে না। হয় দ্রব্যটীর উৎপাদন শিল্প (অর্থাৎ সমষ্টিগত ভাবে উৎপাদক গোষ্ঠী) প্রসারিত হইয়া বাজারে দ্রব্যটীর মোট যোগান বাড়িবে এবং মূল্য নামিবে, আর না হয় মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার

ধ্যে দিয়া শ্রমিকদের নিয়োগ প্রসারিত হইয়া (শ্রমের চাহিদা বাড়িয়া) মজুরী তথা উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে। ফলে শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফা অন্তর্হিত হইয়া উৎপাদকেরা মোটামুটি ভাবে একটা "স্বাভাবিক মুনাফা" (normal profit) মাত্র পাইবেন, যাহা না পাইলে ব্যবসায় গুটাইয়া ফেলিতে হয় এবং যাহাকে উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

কিন্তু বাস্তব জগতে মালিকেরা নিজেদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতাও করেন তেমনি আবার জোটও বাঁধেন। শ্রমিকেরাও তদ্রূপই। এই বিষয়ে আজ হইতে ঠিক দুই শতাব্দী আগে, এবং কার্ল মার্কস-এরও প্রায় এক শতাব্দী আগে, আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আদি জনক বলিয়া স্বীকৃত অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িতে আজও মন্দ লাগে না। "শ্রমিকেরা চাহেন যথাসাধ্য আদায় করিতে, মালিকেরা চাহেন যথাসাধ্য কম দিতে। এক পক্ষ মজুরী বৃদ্ধির জন্য, অন্য পক্ষ মজুরী হ্রাসের জন্য, জোট বাঁধিতে প্রবণ (The workmen desire to get as much, the masters to give as little as possible. The former are disposed to combine in order to raise, the latter in order to lower the wages of labour)"। তার পর তিনি বলেন যে মালিকেরা সংখ্যায় অল্প বলিয়া অনেক সহজে জোট বাঁধিতে পারেন এবং তাহা ছাড়া (অ্যাডাম স্মিথ-এর আমলে যেরূপ ছিল) আইন মালিকদের এইরূপ জোট বাঁধার স্বীকৃতি দেয়, অন্ততঃ বাধা দেয় না, কিন্তু শ্রমিকদের বেলায় বাধা দেয় (The masters, being fewer in number, can combine much more easily;and the law besides,authorises, or at least does not prohibit their combinations, while it prohibits those of the workmen)"। অ্যাডাম স্মিথ-এর অভিযোগ এই যে (তাঁহার সময়ে যেরূপ ছিল) "মজুরী হ্রাসের উদ্দেশ্যে মালিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন বিধান নাই, অথচ ইহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে একাধিক আইন আছে (We have no acts of parliament against combining to lower the price of work ; but many against combining to raise it)"। অ্যাডাম স্মিথ আরও বলেন যে, মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে যদি মজুরী সংক্রান্ত বিসংবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে কোন্ পক্ষ যে অপর পক্ষকে সহজে কাবু করিতে পারিবেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ "এইরূপ বিবাদে মালিকেরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল চালাইয়া যাইতে পারেন। একজন শ্রমিকও নিয়োগ না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সঞ্চিত পুঁজি দ্বারা দু'এক বৎসর চালাইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কাজ না থাকিলে অনেক শ্রমিকের এক সপ্তাহও চলে না, এক মাস অথবা এক বৎসর ত দূরের কথা"।

তারপর অ্যাডাম স্মিথ বলেন যে, শ্রমিকদের জোট বাঁধার কথা খুব ফলাও করিয়া বলা হয় কিন্তু মালিকদের জোটবাঁধার বিষয়ে কেহ বড় একটা উচ্চবাচ্য করেন না। কারণ ইহা এত স্বাভাবিক অথবা নৈমিত্তিক ব্যাপার যে এ বিষয়ে কেহ আলোচনা করে না (because it is the usual, and one may say the natural state of things which nobody ever hears of)।" মালিকেরা সর্বদা এবং সর্বথা শ্রমিককে তাঁহার মজুরীর "প্রকৃত হার" অপেক্ষা বেশী না দিবার একটা চিরকালীন অঘোষিত অথবা অপ্রকাশিত শর্তে তলে-তলে জোটবদ্ধ থাকেন (Masters are always and every-where in a sort of tacit but constant and uniform combination not to raise the wages of labour above their actual rate)। ইহার লঙ্ঘন প্রতিবেশী এবং সমশ্রেণীয়দের নিকট অতিশয় নিন্দনীয়। এমন কি সময় সময় মালিকেরা মজুরীর "প্রকৃত হার" অপেক্ষা তাহা আরও নীচে নামাইয়া দিতেও বিশেষ সর্তে জোটবদ্ধ হন। এবং তাহা অতিশয় গোপনে। তবে এই ধরণের জোটের বিরুদ্ধে প্রায়ই শ্রমিকেরাও আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা জোট বাঁধেন (Such combinations,

however, are frequently resisted by a contrary defensive combination of the workmen)। আবার অনেক সময় মালিকেরা তাঁহাদিগকে এভাবে (মজুরী হ্রাসের চক্রান্ত দ্বারা না) চটাইলেও শ্রমিকেরা নিজে হইতেই তাঁহাদের মজুরী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জোট বাঁধেন (who sometimes too, without any provoca tion of this kind, combine of their own accord to raise the price of their labour)। সাধারণতঃ তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে যুক্তি থাকে কখনও বা খাদ্য দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য, আবার কখনও বা তাঁহাদিগকে খাটাইয়া মালিকের উচ্চ মুনাফাপ্রাপ্তি (their usual pretences are sometimes the high price of provisions, sometimes the great profit which their masters make by their work)। কিন্তু তাঁহাদের জোট আত্মরক্ষামূলকই হোক আর আক্রমণাত্মকই হোক ইহার কথা খুবই শোনা যায়। এবং তাঁহাদের দাবীর আশু নিষ্পত্তির জন্য তাঁহারা সর্বদাই অতিশয় সোরগোল (loudest clamour) করেন এবং সময় সময় মর্মন্তুদ হিংসারও আশ্রয় নেন (most shocking violence and outrage)। তাঁহারা এরূপ মরিয়ার মত নির্বোধ এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করেন, যেন অবিলম্বে সন্ত্রাসের মুখে মালিককে তাঁহাদের দাবী না মানাইতে পারিলে তাঁহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় মালিকেরাও অপরদিকে তেমনি সোরগোল তুলেন, তারস্বরে শাসকদের সাহায্যের দাবী করেন, আর দাবী করেন কঠিনভাবে সেই সব আইনের প্রয়োগের যে সব আইন পরিচর (servants), শ্রমিক এবং দিন-মজুর কারিগরদের (journeymen) জোট বাঁধার বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোরতার সহিত বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরিণামে শ্রমিকেরা তাঁহাদের হিংসাত্মক উচ্ছৃঙ্খলসঙ্ঘবদ্ধতা হইতে বিশেষ সুফল লাভ করেন না। একদিকে বিচারকের হস্তক্ষেপ, এবং মালিকদের অধিকতর টিকিয়া থাকার শক্তি, আর অপরদিকে অধিকাংশ শ্রমিকের পেটের দায়ে আত্মসমর্পণ করার তাগিদ, এইসব মিলিয়া শ্রমিকদের জোট হইতে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই ফল হয় না, পালের গোদাদের (ringleaders) শাস্তি এবং নিপাত ছাড়া।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অ্যাডাম স্মিথ যখন তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ "বিভিন্ন দেশের জাতীয় সম্পদের স্বরূপ এবং তাহার উৎসানুসন্ধান"এ (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) এইসব লিখিতেছিলেন তখনও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হয় নাই। তখন ইংলণ্ডে আমাদের দেশে যাহাকে বলা হয় কুটির-শিল্প (Cottage Industry) সেইরূপ গৃহস্থ শিল্প ব্যবস্থার (domestic system) যুগ চলিতেছিল। অর্থাৎ আধুনিক কালে যেমন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শতাধিক অথবা সহস্রাধিক শ্রমিক নিয়োজক কর্মশালা দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও ইংলণ্ডে অথবা পৃথিবীর অন্য কোথায়ও সেরূপ কর্মশালার আবির্ভাব ঘটে নাই। পরবর্তী কালে অর্থাৎ অ্যাডাম স্মিথের পচাত্তর অথবা একশত বৎসর পরে যখন কার্ল মার্কস শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মানব সমাজে ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-সংঘাত-জনিত বিপ্লব-এর অনিবার্যতা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পটভূমিকায়। কারণ অ্যাডাম স্মিথ-এর সময় হইতেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে শিল্পের ক্ষেত্রে কতকগুলি যুগান্তকর আবিষ্কার এবং তাহার প্রয়োগের ফলে শিল্প জগতে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে প্রথমে ইংলণ্ডে, এবং তারপর ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানী, রুশীয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশে, এবং সুদূর প্রাচ্যের জাপানে সংঘটিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও সংঘটমান শিল্পজগতের এই আমূল পরিবর্তনকে অর্থনৈতিক ইতিহাসে "শিল্প-বিপ্লব" (Industrial Revolution) আখ্যা দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রথম

দরবুমে, স্বীয় জন্মভূমি জার্মানী হইতে নির্বাসিত, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ফরাসী হইতে আশ্রয়চ্যুত, অক্লান্তকর্মা মহামনীষী কার্ল মার্কস ইংলণ্ডের মাটিতে আশ্রয় লইয়া, চরম অনটনের মধ্যে চির সহকর্মী অকৃত্রিম বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (Frederick Engels)-এর আনুকূল্য মাত্র সম্বল করিয়া, একদিকে তথাকার নবোদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান রক্তমোক্ষণ ও দুঃখদুর্দ্দশা, অপরদিকে নবোদ্ভূত মালিক শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান স্ফীতি এবং সমৃদ্ধির নিদান বিশ্লেষণে বৃটিশ মিউজিয়াম (British Museum)-এর গ্রন্থাগারে আজীবন উদয়াস্ত অধ্যয়ন এবং গবেষণা পূর্ব্বক অ্যাডাম স্মিথের ঠিক এক শতাব্দী পর আরেকখানি যুগান্তকারী অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ (ক্যাপিটেল) প্রণয়ন করেন। তারপর আর একশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে শিল্পবিপ্লবের গতি অব্যাহত রহিয়াছে অথবা দ্রুততর হইয়াছে। কার্ল মার্কসের তত্ত্বকে হাতিয়ার করিয়া, এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীকে অংশতঃ ব্যর্থ এবং অংশতঃ সার্থক করিয়া অপেক্ষাকৃত কৃষিপ্রধান সমাজগুলিতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং তথায় অত্যল্পকালের মধ্যে এমন সব বিস্ময়কর শিল্প-বিপ্লব ঘটিতেছে যাহা সম্ভবতঃ কার্ল মার্কস-এরও কল্পনাতীত ছিল। অপরদিকে এই মার্কস-বাদেরই ক্রমবর্দ্ধমান এবং সর্ব্বগ্রাসী প্রভাবে বিচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজগুলিতেও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে শ্রমিক শ্রেণীর বৈষয়িক ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে, সেই মার্কসবাদকেই বানচাল করিতে। তবে শিল্পবিপ্লবের প্রথমযুগে কার্ল মার্কস শ্রমিক মালিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যে শ্রেণী-সংঘাতের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, এবং আধুনিককালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চরম শিল্পোন্নতির যুগে "সমৃদ্ধিশীল সমাজ"-এর (Affluent Society) শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের পর্য্যালোচনা করিয়া তথাকার অর্থনীতিবিদ্ জন গলব্রেথ (John Gallbraith) মালিক-শ্রমিক জোটের (monopoly) বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী জোটকে যে একটা "প্রতিরোধ শক্তি" ("countervailing power") আখ্যা দিয়ে একটা নূতন তত্ত্ব (Theory of Countervailing Power") দিয়াছেন, এই উভয়ের মধ্যেই আমরা "বুর্জ্জোয়া" অর্থশাস্ত্রের আদি জনক অ্যাডাম স্মিথ-এর উপরি উদ্ধৃত উক্তিগুলির হুবহু প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। অতএব দেখা যায় যে শ্রমিক এবং মালিকের, তথা শ্রম এবং মূলধনের পারস্পরিক সম্পর্ক—ইহাদের সহযোগিতা অথবা সংঘাত, মিলন অথবা বিচ্ছেদ, সন্ধি অথবা বিগ্রহ—অর্থশাস্ত্রকারদের নিকট নেহাতই একটা আধুনিক যুগের অভিনব সমস্যা নয়; বেশী না হৌক অন্ততঃ দুইশত বছরের সমস্যা (মার্কসএর মতে শ্রেণী সংঘাতই মানব ইতিহাসের সনাতন এবং চিরন্তন সত্য)। তবে আধুনিক জগতে এই সমস্যাটা হয়ত একটু বেশী প্রকট হইয়াছে মার্কস-বাদেরই প্রভাবে। যাহাই হউক, এই সমস্যাটি সম্যক্ না বুঝিতে পারিলে বৈষয়িক সমাজ সংগঠনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না; "ধনতান্ত্রিক" "সমাজতান্ত্রিক" অথবা "সঙ্কর" অর্থাৎ "মিশ্র" (mixed) কোন "অর্থনীতি" (economic policy) সম্পর্কেই কোন মন্তব্য করা যায় না। ফলে অর্থশাস্ত্রও অর্থহীন, বন্ধ্য এবং নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। অথচ ইহা বুঝিতে যাওয়ার পথও খুব সুগম নয়। কারণ আমরা স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করি তাহা মূলতঃ ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের "ধনতান্ত্রিক" সমাজ ভিত্তিক অর্থশাস্ত্র, এবং তথাকার স্কুল-কলেজেরই পাঠ্য। আবার আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে "সমাজতান্ত্রিক" নীতি অনুসরণ করিতে চাই সেই "সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রও" আমাদের বিদ্যালয়াদিতে পড়িবার সুযোগ নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমরা নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছি, আবার প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রসব বেদনাও আমরা সহ্য করিতে নারাজ। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ কবির লেখা হইতে একটা উদ্ধৃতি মনে পড়ে। কোন্ প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য-রসিকেরাই বলিতে পারিবেন। তবে আক্ষরিক অর্থে আমাদের অবস্থার সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। আমরা যেন দুইটা জগতের মাঝখানে বিচরণ করিতেছি, একটা বিগত,

আরেকটি অনাগত এবং হয়ত বা অসম্ভাব্য ("Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born.")।

যাহাই হোক, আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে অন্ততঃ অর্থশাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলিকে মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে যথাসাধ্য দেখিতে চেষ্টা করিব। একথা মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্ত্য "ধনতান্ত্রিক" সমাজে অনুসৃত অর্থশাস্ত্রকে মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্ত্তিত "বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী" অর্থশাস্ত্রে "বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র" আখ্যা দেওয়া হইলেও এবং শেষোক্ত অর্থ-শাস্ত্রটী প্রথমোক্ত অর্থশাস্ত্রের নিষ্ঠুর কশাঘাত মূলক সমালোচনা হইতে উদ্ভূত হইলেও মূলতঃ উহারা উভয়েই একই "সনাতন" অথবা "আদি" অর্থশাস্ত্রের (Classical Economics) ঐতিহ্যবাহী। এবং অ্যাডাম স্মিথই ইহার আদি প্রবক্তা। তবে মার্কস-এর দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব এই যে, তিনি মানুষের বৈষয়িক এবং যাবতীয় সামাজিক সমস্যাকে ঐতিহাসিক সমাজ বিবর্তন-এর (historical evolution) পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াসী। আমাদের পক্ষেও "শ্রম" "মূলধন" ইত্যাদি শব্দের প্রকৃত অর্থশাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ইহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার পর্য্যালোচনা অপরিহার্য্য।

অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) এর আমলে চার্লস ডারুইন (১৮০৯-১৮৮২)-এর জৈববিবর্ত্তন বাদ (Theory of Organic Evolution) তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে নাই। কারণ ডারুইন আসিয়াছিলেন অ্যাডাম স্মিথ-এর পরে। কিন্তু তিনি ছিলেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর সমসাময়িক। মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন তাঁহাদের রচিত বিশ্ববিখ্যাত এবং যুগান্তকারী "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে" (১৮৪৮) ঐতিহাসিক সমাজবিবর্ত্তনে শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকার কথা প্রচার করিতেছিলেন, ঠিক ঐ সময়েই (১৮৫৯) চার্লস ডারুইন (Charles Darwin) জীবজগতের ক্রমবিবর্ত্তন সম্পর্কে তাঁহার তথ্যবহুল প্রামাণ্য গ্রন্থ "প্রকৃতির নির্ব্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব" (The Origin of Species by means of Natural Selection) অথবা "জীবন সংগ্রামে নির্ব্বাচিতের অথবা যোগ্যতরের উদ্বর্তন" (Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) প্রকাশিত করেন। উক্ত গ্রন্থে মানব সমাজের উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের অলৌকিক কাহিনীর স্থলে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত একটা যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রচারিত হওয়ায় মার্কস এবং এঙ্গেলস্ তাঁহাদের কল্পনা-ভিত্তিক ভাববাদ (Idealism)-বিরোধী এবং বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তববাদ (materialism)-এর একটা চমৎকার সমর্থন পাইয়া তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। এবং স্বভাবতঃই মার্কস-এঙ্গেলস প্রমুখ "বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী"রা ডারুইনের জৈব বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে আরও আগাইয়া লইয়া মানুষের সমাজবিবর্ত্তন-এর সহিত যুক্ত করিয়া একটা ধারাবাহিক বিবর্ত্তনের চিত্র আঁকিতে সমর্থ হন। আমরাও যদি এই দৃষ্টিকোণ হইতেই দেখিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে "শ্রম" (labour) "মূলধন" (capital), "প্রাকৃতিক সম্পদ" (যাহাকে অর্থশাস্ত্রে "land" আখ্যা দেওয়া হয়) ইত্যাদি মৌলিক অর্থশাস্ত্রীয় শব্দ-গুলির প্রকৃত সংজ্ঞা এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং বৈষয়িক সমাজ সংগঠনে ইহাদের প্রকৃত ভূমিকা, ইত্যাদি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারি।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুমান অনুসারে পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটে দুই শত কোটি বৎসর আগে অথচ প্রমাণ অনুসারে দুই লক্ষ বৎসর আগেও "মানুষ"-এর আবির্ভাব ঘটে নাই। প্রথমে আবির্ভূত অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক অথবা অণুবীক্ষণাতীত প্রাণীগুলি শতাধিক কোটি বৎসরে পৃথিবীর আবহাওয়ার বিচিত্র পরিবর্ত্তন এবং স্ব স্ব প্রারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া বাঁচিয়া থাকার স্বাভাবিক জৈব প্রবণতাজাত সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিভিন্ন শাখায় রূপান্তরিত তথা বিবর্ত্তিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র উদ্ভিদ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ জলচর উভচর ভূ-চর খে-চর ইত্যাদি

বিচিত্র প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে এবং হইতেছে। আবার অনেকে বিলুপ্তও হইয়াছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর চতুষ্পদ প্রাণী হয় সাত কোটি বৎসর আগে বৃক্ষোপরি আশ্রয় লাভ করেন এবং ক্রমে শাখামৃগে পরিণত হন। বৃক্ষশাখা অবলম্বনে চলাফেরা এবং গাছের ডালপালাদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভারসাম্য রক্ষা, অথবা সময় সময় লম্বমান ভাবে ঝুলা, ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়ায় সম্মুখস্থ পদযুগল বাহুতে পরিণত হয়, মণিবন্ধ সবল হয়, থাবার অঙ্গুলীগুলি সুদীর্ঘ এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে তাঁহারা হস্তদ্বারা আহার্য্যাদি আহরণ করিয়া মুখে দিতে, গাছের ডাল অথবা প্রস্তরাদি ধরিতে, তুলিতে, সঞ্চালন করিতে, এমন কি দূরে নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হন। এইরূপ শাখামৃগের একটি বিলাঙ্গুল শাখা (apes) সম্ভবতঃ দুই কোটি বৎসর আগে বৃক্ষাশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতে অবতরণ করেন, অথবা বৃক্ষাশ্রয়ে থাকিয়াও প্রায়শঃ ভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। যেমন, মনে করা যাক যে, জলবায়ুর পরিবর্তনে অরণ্য বিরল হইয়া আসায় বৃক্ষোপরি থাকিয়াই বৃক্ষশাখা অবলম্বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনাগমন অসম্ভব হইল। এই অবস্থায় আহার্য্যাদির সন্ধানে বাধ্য হইয়াই ভূমিতে অবতরণ করিতে হয়। এই সব শাখামৃগেরা স্বভাবতঃই ভূপৃষ্ঠের উপরও সম্মুখের দুইটি-বাহু এবং পেছনের দুইটী পা এই চারটী অঙ্গের সাহায্যেই গমনাগমন করিতে থাকেন। তাঁহাদের উত্তর-পুরুষেরা অনেকে আজও সেরূপ ভাবেই চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রায় বিশ লক্ষ বৎসর আগে ইঁহাদেরই একটী শাখা সম্মুখস্থ দুইটি বাহুকে প্রধানতঃ আহার্য্য আহরণ, শত্রু হনন, আত্মরক্ষা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রাখেন আর পেছনের দুই পাকে প্রধানতঃ দেহভার বহনের কাজেনিয়োজিত রাখেন। চারিটী অঙ্গের স্থলে দুইটী অঙ্গের উপর দেহভার ধারণের দায়িত্ব পড়ায়, অর্থাৎ ইহাদের দায়িত্ব দ্বিগুণিত হওয়ায় স্বভাবতঃই ইহাদের আকৃতিও তদনুরূপ বাড়িতে থাকে। পক্ষান্তরে দেহভার বহনের দায়িত্ব মুক্ত হইয়া বাহুদ্বয়ের দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রতা বাড়িয়া ইহারা জীবন সংগ্রামে বিশেষ সহায়ক হইল। কাষ্ঠখণ্ড অথবা প্রস্তরাদি তুলিয়া লইয়া তাহার আঘাতে একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণী শিকার সহজ হইল, অপরদিকে তেমনি নিরাপদ দূরত্ব হইতে নিক্ষিপ্ত আঘাতে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ জীবেরও হনন সম্ভব হইল। তা ছাড়া বিপদে বৃক্ষাশ্রয় ত আছেই। ক্রমে তাঁহারা লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভ্যাসের ফলে ভূপৃষ্ঠের উপর শুধুমাত্র পশ্চাতের দুইটী পায়ের উপর ভর করিয়া ঋজু ভাবে দাঁড়াইতে, হাঁটিতে এবং দৌড়াইতেও সমর্থ হইলেন।

এইরূপে দ্বিপদে পরিণত চতুষ্পদ জীবেরা সম্ভবতঃ বেশ কয়েক লক্ষ বৎসর কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদি সবলম্ব দেহাতিরিক্ত প্রত্যঙ্গের (extracorporeal limbs) সাহায্যে আত্মরক্ষা এবং আহার্য্যাহরণের সংগ্রামে লিপ্ত রহিলেন। জীবন সংগ্রামে সচেতন ভাবে হস্তের এবং অস্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই মস্তিষ্কের তথা বুদ্ধিবৃত্তিরও প্রসার ঘটিতে লাগিল। প্রকৃতিজাত ফল মূলের সহিত মৎস্য মাংস সরীসৃপাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের সমাবেশও মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধনে বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকিবে। বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত অস্ত্রাদি নির্ব্বাচন, এমন কি প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদির স্থলে সচেতন ভাবে প্রস্তরাদি ভাঙ্গিয়া প্রয়োজনানুরূপ আকৃতি দিয়া উপযুক্ত অস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। স্বভাবতঃই ফলমূলাহারী শাখামৃগের তীক্ষ্ণ নখদন্ত থাকে না। অতএব তাঁহাদেরও ছিল না। কিন্তু এই অভাবের পরিপূরক স্বরূপ খণ্ডিত প্রস্তরের তীক্ষ্ণ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহারা সিংহ-ব্যাঘ্রাদি তীক্ষ্ণ-দন্ত-নখরায়ুধ জীবের সহিতও সংগ্রাম করিয়া উত্তরোত্তর অন্যান্য প্রাণীর উপর প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন।

শিকার অথবা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে হয়। এ অবস্থায় একের অন্যের সহিত ভাবের বিনিময় অপরিহার্য্য। অন্যান্য পশুপক্ষীও স্বজাতীয়ের সহিত একত্র থাকিলে ভীতি হুঁসিয়ারী রাগ অনুরাগ বেদনা ক্ষোভাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ ধ্বনি অথবা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তাহা ব্যক্ত করে। তবে

তাহাদের কণ্ঠস্বরে খুব বেশী একটা বৈচিত্র্য থাকে না। অতএব তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি সীমাবদ্ধ এবং তাহাদের প্রয়োজনও সীমিত। কিন্তু সচেতন ভাবে অস্ত্র ব্যবহারকারী দ্বিপদ প্রাণীদের বাঁচিয়া থাকার কলাকৌশল যতই বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ হইতে লাগিল, ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনও ততই বাড়িতে লাগিল। বিভিন্ন পরিচিত বস্তুর নামকরণ করিতে হইবে, নাম শুনিলেই নামীয় বস্তুটার একটা চিত্র মনশ্চক্ষে উদিত হইবে; ইহাতে চক্ষু, কর্ণ এবং মন অর্থাৎ মস্তিষ্ক অথবা স্মৃতিশক্তি, এই তিনের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কোন অস্ত্র প্রস্তুত করিবার অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি অপরকে শিখাইতে হইবে, অপরের নিকট শিখিতে হইবে, এবং পুরুষপরম্পরায় সেই শিক্ষা সঞ্চালিত করিতে হইবে; এই সব অপরিহার্য্য প্রয়োজনে ভাব-বিনিময়ার্থে ক্রমে অর্থাৎ সহস্র সহস্র বৎসরের অভ্যাস-এর ফলে কণ্ঠস্থ স-তার স্বরযন্ত্র (larynx), জিহ্বা, মুখ-গহ্বরাদির প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া ভাব প্রকাশের চেষ্টা অন্যান্য প্রাণীর মত একটানা অথবা বৈচিত্র্যহীন ধ্বনিমাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, প্রশস্ত মুখগহ্বরে সঞ্চরক্ষম জিহ্বা, অধরোষ্ঠ, দন্ত, মূর্দ্ধা, তালু ইহাদের পারস্পরিক সংস্পর্শে বিচিত্র খণ্ডিত ধ্বনিময় ভাষার (articulate speech) উদ্ভব হইল।

যে কোন প্রত্যঙ্গ (limb) ক্রমাগত একই কাজে সার্থক-ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে পুরুষপরম্পরায় ইহার প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পক্ষান্তরে কোন প্রত্যঙ্গের সার্থক ব্যবহার না থাকিলে ইহা ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইয়া একেবারে বেমালুম বিলুপ্তও হইয়া যাইতে পারে। বৃক্ষাশ্রয়ী শাখামৃগদের গাছের ডালপালা আঁকড়াইয়া ধরিতে, হাত এবং পা এই উভয় প্রত্যঙ্গই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া এই উভয়েরই অঙ্গুলীগুলি দীর্ঘ হয় কিন্তু ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল দ্বিপদ প্রাণীদের সেরূপ প্রয়োজন না থাকায় পদদ্বয়ের অঙ্গুলীগুলি ক্রমে ক্ষুদ্র অর্থাৎ হ্রস্ব হইয়া গেল। পক্ষান্তরে অস্ত্রাদি ব্যবহার অথবা নির্মাণ-এ হাত দুইটি ক্রমে সূক্ষ্মতর এবং জটিলতর কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় হস্তাঙ্গুলীগুলি উত্তরোত্তর অধিকতর সঞ্চালনক্ষম হইল। আর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হইল এই যে অঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ বৃদ্ধা-ঙ্গুলীটা অন্যান্য অঙ্গুলী হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের বিপরীত দিকে অপসারিত হইল। ফলে একদিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং অপরদিকে অন্যান্য অঙ্গুলী বিশেষতঃ তর্জনী এই দু-এর সাহায্যে কোন সূক্ষ্ম বস্তুকে চিমটায় ন্যায় ধরা যায়। শোনা যায় যে ইংরেজ বণিকরা এদেশের তাঁতশিল্প নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তন্তুবায়দের অঙ্গুষ্ঠটা কাটিয়া দিতেন। জৈব (অথবা "মানবীয়") বিবর্ত্তনে বুড়ো আঙুলটার এই গুরুত্ব যে-জাতির বণিক সম্প্রদায় এমন চমৎকার ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই জাতির বৈষয়িক সমৃদ্ধি কে রুখিতে পারে?

---

* এখানে স্মরণীয় যে শ্রমের বাজারে মালিক শ্রেণীর জোটকে "monopsony" (এক ক্রেতায়ত্ত বাজার) এবং শ্রমিক শ্রেণীর জোটকে "monopoly" (এক বিক্রেতায়ত্ত বাজার) বলাই, ঠিক এবং এই দুই-এর যুগপৎ অবস্থান অথবা "সহাবস্থান"কে বলিতে হয় bilateral monopoly (উভয় তরফা একায়ত্ত বাজার)।

সহজ শোভন এবং কষ্টকল্পিত জাতীয় ভাব

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হায়! "জাতীয় ভাব" আমাদের দেশে মস্ত একটা সাধনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ হইবার জন্য কোনো ইংরাজকে সাধ্যসাধনা করিতে হয় না; ফরাসীস্ হইবার জন্য কোনো ফরাসীস্‌কে সাধ্যসাধনা করিতে হয় না; জর্ম্মান্ হইবার জন্য কোনো জর্ম্মান্‌কে সাধ্যসাধনা করিতে হয় না; অথচ ইংরাজ না হওয়া ইংরাজের পক্ষে মৃত্যুতুল্য; ফরাসীস্ না হওয়া ফরাসীসের পক্ষে ঔষধ। ইংরাজ যেমন জানে "আমি আমি" তেমি জানি "আমি ইংরাজ"; ফরাসীস্ যেমন জানে "আমি আমি" তেমি জানে "আমি ফরাসীস্"; জর্ম্মান্ যেমন জানে "আমি আমি" তেমনি জানে "আমি জর্ম্মান্"। গর্ব্বের সহিত জানে—লজ্জার সহিত নহে। ইহাদের জাতীয় ভাব সাধনার কোনো অপেক্ষা রাখে না। সভ্য জাতি মাত্রেরই প্রধানতম সাধনার বিষয়—সত্য, জ্ঞান, ধর্ম, এই সকল উচ্চ সামগ্রী। স্বজাতিত্ব সভ্যজাতি মাত্রেরই অযত্নসুলভ ঘরাও সামগ্রী। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না, বুঝিবার মধ্যে আমরা বুঝি অকেজো তর্কবিতর্ক।

তর্কের নমুনা

ইংরাজেরা চীনদেশীয় চিক্কণ মৃৎপাত্র ব্যবহার করে, ইহা কাহারো অবিদিত নাই; অতএব প্রমাণ হইল যে, তাহাদের জাতীয় ভাব কেবল একটা কথার কথা।

রামমোহন রায় চেয়ারে বসিতেন, টেবিলে লিখন-পঠনাদি করিতেন;—আবার জাহাজে চড়িয়া বিলাত গিয়াছিলেন; অতএব প্রমাণ হইল যে, তাঁহার জাতীয় ভাবের গোড়ায় গলদ।

এইরূপ ধাঁচার ন্যায়শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক নবদ্বীপের তর্কালঙ্কারদিগকেই শোভা পায়। বলিতে কি—উহার বেসুরো এবং বেতালা চীৎকার-ধ্বনিতে আমার গায়ে জ্বর আসে। জাতীয় ভাব ভাল জিনিস খুবই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—যে জাতীয়ভাব চীন-দেশীয় মৃৎপাত্র ব্যবহার করিলেই চীনত্বে আক্রান্ত হইয়া পড়ে; এবং চেয়ারে বসিলেই বা টেবিলে ভোজন করিলেই ইংরাজিত্বে আক্রান্ত হইয়া পড়ে সেরূপ ফুল-কুমার জাতীয় ভাব যাত্রার সঙ্ বই আর কিছুই নয়। ইংরাজেরা চীন পাত্রই ব্যবহার করুন, আর ইংরাজ মহিলারা কাশ্মীর শালই পরিধান করুন—যাহাই করুন না কেন—ইংরাজ ইংরাজই। ইংরাজেরা চীন দেশীয় চিক্কণ মৃৎপাত্র ব্যবহার করে সত্য; কিন্তু কি ভাবে ব্যবহার করে? আমাদের এই গরম দেশে নব্য ঢঙের স্রোতে গা ঢালিয়া আমরা যেভাবে আঁটাসাঁটা ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিয়া ইংরাজ সাজি সেই ভাবে কি? অথবা, যে দেশেরই ভাল জিনিস হউক না, স্বদেশে তাহার উচিত মত ব্যবহার চালানো ভাল বই মন্দ নহে—এই ভাবে? মনের ভাবই আসল জিনিস। রামমোহন রায় তো বাইবেল না পড়িয়াছিলেন এমন নহে: কোরাণ তো তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তবে কেন তিনি বেদোপনিষদ্‌কে দেশের সর্ব্বোচ্চ প্রধান আসনে বসাইবার জন্য পরিশ্রম যতদূর করিতে হয় করিয়াছিলেন?

ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জাতীয় ভাব তাঁহার প্রাণের সামিল ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চেয়ারে বসিতেন। টেবিলের উপরে ভর স্থাপন করিয়া চিঠিপত্র লিখিতেন এবং ইংরাজি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া কিছু আর তাঁহার জাত যায় নাই; অবশ্য, টোলীয় ন্যায়শাস্ত্রের বিধান মতে তাঁর ঐরূপ কার্য্য বিজাতীয় বিজাতীয় ভাবের পরিচায়ক। কিন্তু তর্কপঞ্চাননেরা যিনি যাহা বলুন না কেন, তেজস্বী ব্রাহ্মণ মহাত্মাটির ভট্টাচার্য্যধরণের বেশ দেখিলে—এবং নির্ভীক সোজা ভাবের কথাবার্ত্তা শুনিলে—স্বজাতীয় ভাব যে কিরূপ তাঁহার প্রাণগত অন্তরের সামগ্রী ছিল তাহা কাহারো জানিতে বিলম্ব হইত না। প্রকৃত কথা এই যে, জাতীয় ভাব অলীক বাক্যাড়ম্বরের সামগ্রীও নহে—কঠোর সাধনার সামগ্রীও নহে; তাহা সহৃদয় অন্তঃকরণের একটি সহজ শোভন ভাব। তাহা যাঁহার আছে তাঁহার আছে; যাঁহার নাই তাঁহার অন্তঃকরণের মরুভূমি হইতে তাহা জোর করিয়া ফলাইয়া তোলা অসম্ভব। আমি তাই বলি যে, "জাতীয় ভাব" কথাটা বড্ড একটা গোলমেলে কথা—ও কথাটা তুলিয়া যাওয়াই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য জাতীয় ভাবের ধ্বজা ওড়ানো কার্য্য স্থগিত রাখা হউক, তাহার পরিবর্তে আমাদের স্বজাতির যাহা প্রকৃত গৌরবের বিষয় তাহার যতদূর পারা যায় নষ্টোদ্ধার করিয়া তাহার সারাংশ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা হউক—কেন না তাহার মধ্যে সত্য আছে, জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে, মনুষ্যত্ব আছে—আর এই সকল পরম ধনই সাধনার বিষয়; এইগুলিকে জাগাইয়া তুলিলেই সেই সঙ্গে জাতীয় ভাব আপনা আপনিই জাগিয়া উঠিবে—বৃহৎ বৃহৎ অকেজো বাক্যাড়ম্বরে পুঁথি পুরাইতে হইবে না।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৬।

হুকার জন্ম

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মর্ত্ত্য হইতে পঞ্চাশকোটি যোজন ঊর্ধ্বে ধূম্রলোক ;—সেখানকার সবই বাষ্পময়, —বায়ু, বাষ্পপূর্ণ, সাগর সরিৎ সরোবর বাষ্পে ভরা, পর্ব্বত কেবল বাষ্পস্তূপ মাত্র, পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ সকলে বাষ্পাকারে বিরাজ করিতেছে। সেই ধূম্রলোকে একদিন মহা কোলাহল শোনা গেল।

তখন স্বর্গের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন এক রকম শেষ হইয়াছে—মাথার ভিতর যা' যা' প্লান ছিল, জল, মাটি, ইট, কাঠ, চূণ, সুর্কী, পাথর প্রভৃতির সমষ্টিতে তা সবই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। এইবার ব্রহ্মা নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া বহু অনিদ্র রজনীর শোধ তুলিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

ধূম্রলোকবাসী ধূমপায়ীগণ সেদিন ধূমধামের সহিত এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন ;—সর্ব্বত্র তাম্রকূটপত্রে ছাপা বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া ধূমপায়ীর দল একত্র করা হইয়াছে ;—নানা তাম্রকূটাগার সমন্বিত, ধূমকেতু-ধ্বজমণ্ডিত সভাস্থল জনসমাগমে গম্‌গম্ করিতেছে, গঞ্জিকা-ধূপে ও চরস-রসে সভাগৃহ আমোদিত। সেদিন সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"ধূমপায়ীর কষ্ট নিবারণ।"

যথানিয়মে হাততালির চটপট পটাপট শব্দে মনোনীত হইয়া সভাপতি আসন গ্রহণ করিলেন। সভার সম্পাদক শ্রোতাদিগের হাতে হাতে তাম্রকূটপত্রে ছাপা রেজোল্যুশনের অনুলিপি বাঁটিয়া দিলেন,—হাততালির শব্দ মিলাইতে না মিলাইতে চতুর্দ্দিকে তাম্রকূটপত্র নাড়ার একটা খস্‌খস্ শব্দ উঠিল।

প্রথম বক্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুখের সম্মুখে রেজোল্যুশন পত্রখানি ধরিয়া ছাপার হরফে লেখা সভার প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন :—"ধূমপানের নিমিত্ত কোন যন্ত্র সৃষ্টি না হওয়ায় সমস্ত ধূমসেবীগণ বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, এবং এই অসুবিধা দূরীভূত না হইলে ধূমপায়ীর সংখ্যা স্বল্পতর হইয়া শীঘ্রই একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। তজ্জন্য আমরা সমস্ত ধূমগ্রাহী একত্র হইয়া এককণ্ঠে ব্রহ্মার সদনে আবেদন করিতেছি যে, তিনি ইহার কোন উপায় বিধান করুন ; এই সঙ্গে তাঁহাকে জানান হউক যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে ইতিমধ্যে ১৯৯ জন ধূম্রলোক ত্যাগ করিয়াছেন।"

প্রস্তাবপাঠ শেষ হইলে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"ধূম্রলোচন সভাপতি মহাশয় ও ধূম্রলোকবাসী ভাইসকল। কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন যে ইন্দ্রাদি দেব যেমন জ্যোতিতে পরিপুষ্ট, মানবজাতি যেমন অন্নে পরিবর্দ্ধিত, তেমনি ধূম্রলোকবাসী যে আমরা, আমাদের এই বাষ্পদেহ প্রচুর ধূম-ধূমায়িত না হইলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। হবিষানল যেমন দেবতাদিগের, শাকান্ন যেমন মানবদিগের, তেমনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী ধূম্রলোকবাসী আমাদিগের এই যে না-মানব-না-দেব দেহ, ইহার সংগঠনে ধূম যে নিতান্ত আবশ্যক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, ধূমজ্যোতি সংমিশ্রণে আমাদের এই বিপুল দেহ গঠিত হইয়াছে ; এই বাষ্পময় দেহ লইয়া একদিন আমরা রামগিরি হইতে অলকা, অলকা হইতে রামগিরি, চক্ষের নিমেষে গতায়াত করিয়াছি, সে কিসের বলে ? একমাত্র ধূমপানই কি তাহার কারণ নয় ?"

"ভাই সব। ধূমপানের কষ্টের কথা আপনারা সকলেই জানেন। প্রথমত ধূমপত্র যে পরিমাণে খরচ করা হয় সে পরিমাণে নেশা হয় না। স্তূপীকৃত পত্রে

অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া বসিয়া ধূম গ্রহণ করিতে হইলে, ধূমের অধিকাংশ কেন, সবই প্রায় নষ্ট হইয়া যায়,—অতি অল্প পরিমাণ নাক ও মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ভরপুর নেশায় পরিপূর্ণ ধূমকুণ্ডলী মেঘাকারে, আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক হেলিতে দুলিতে বাতাসে ভর দিয়া স্বর্গলোকে চম্পট প্রদান করে, আর আমরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকি, না পারি ধরিয়া মুখে পুরিতে, না পারি আর কিছু করিতে। হায় হায়, এ কি কম আপশোষ, কম ক্ষতির কথা? (করতালির ধ্বনি।) শুধু কি তাই? হাঁ করিয়া ধূমগ্রহণ করিতে করিতে মুখের চোয়াল ধরিয়া আসে, কবিরাজ ডাকিয়া ঔষধ মালিশ করিতে হয়, তবে সে বেদনা যায়। (হাস্যধ্বনি।) তাহাতেএকে শারীরিক কষ্ট আবার অর্থব্যয়। আবার শুনুন, একেলা বসিয়া আরামে যখন খুসী তখন ধূমপান করিতে পাই না; একেলারজন্য এত করিয়া ধূমপত্র কখন পোড়ান যায়?—যে ধূমে পাঁচশজন ধূম্রলোচন হইতে পারেন, তাহা কি একটি প্রাণীর জন্য খরচ করা যায়? ধোঁয়ার আড্ডার সকলকে একত্র করিবার জন্য প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। তাহাতে যে কত সময় নষ্ট হয় তাহা কহতব্য নয়। অনেকে হয়ত যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন না, বেচারাদের আর সেদিন ধূম্রগ্রহণ করা হয় না; তাহাদের সে কষ্ট দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে,—মনে প্রফুল্লতা নাই, শরীরে বল নাই, কাজে মন নাই, আহারে অরুচি, কেবল অবসাদ, জড়তা, অসুস্থতা—সেদিনটা তাহাদের কাছে যেন বিধাতার অভিসম্পাত। (করতালি।) হায় হায়! ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রীতিমত নেশা জমে কই। ইহার উপায় বিধান করিতে না পারিলে আর চলে না। ভ্রাতৃগণ, আপনারা একত্র হউন, উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, শীঘ্রই যদি কোন ধূমপান যন্ত্র আবিষ্কৃত না হয় তবে জানিবেন ধূমপানের ব্যাপার ধূমেই শেষ হইবে।"

বক্তা তাম্রকূট পত্র দ্বারা মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িলেন। প্রস্তাবটি যথাক্রমে অন্যান্য সভ্যের দ্বারা সমর্থিত ও পরিপোষিত হইয়া শেষে সমগ্র সভার অনুমোদিত হইল।

ঠায় বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে শ্রোতৃগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, সকলেরই শরীরে অবসাদ পরিলক্ষিত হইতেছিল। কেহ কেহ গাত্র প্রসারণ, হস্তোত্তলন ও মুখব্যাদান পূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে অবসাদ ঘুচাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে তাহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সভাস্থল হাই-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—সেই হাইয়ের অস্ফুট শব্দ ও তৎসংলগ্ন তুড়ির তুড়্ তুড়্ ধ্বনি মিলিয়া এক অপরূপ কলরবের সৃষ্টি হইল।

কক্ষান্তরে ধূমপত্র সজ্জিত ছিল, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল, বর্ষার মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া উদ্গীর্ণ হইয়া গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার মধ্যে আসন পাতিয়া সভ্যমণ্ডলী উপবেশন করিলেন। তৎক্ষণাৎ মুখের হাই মুখে মিলাইয়া গেল, হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; শরীরের অবসাদ ঘুচিয়া গেল, উৎসাহ আসিল, মন প্রফুল্ল হইল। ধূম্রগ্রহণ শেষ করিয়া যে যেখানকার সেখানে চলিয়া গেলেন।

২

ধূমপায়িসভার রেজোল্যুশন সকল সভ্যের স্বাক্ষরিত হইয়া যথাসময়ে ব্রহ্মার নিকট প্রেরিত হইল। ব্রহ্মা তাহা পাঠ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এতদিনে তাঁহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই যে, ধূমসেবন যন্ত্রের কোন আবশ্যকতা আছে। সৃজন কার্য্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া এবং অনেকটা খরচ বাঁচাইবার জন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেন্টটা তুলিয়া দিবার সংকল্প করিতেছিলেন; এই মর্ম্মে একটা খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছিল। দেবসভার আগামী অধিবেশনে তাহা পেশ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; এমন সময় এই কাণ্ড। ব্রহ্মার ভাবনার আরো একটু কারণ ছিল। এবারকার বাজেটে তিনি বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেন্টের খরচা ধরেন নাই; মনে করিয়াছিলেন সেটা ত উঠিয়াই যাইবে। এখন তাহা

বজায় রাখিতে গেলে অর্থ যোগাইবেন কেমন করিয়া? এইরূপ নানা চিন্তায় ব্রহ্মা মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

স্থপতিকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য ও যন্ত্রনির্ম্মাণ সংক্রান্ত দরখাস্ত সমূহের সর্ব্বপ্রথম বিবেচনা করিবার ভার বিশ্বকর্ম্মার দপ্তরে চালান করিয়া দিয়া ব্রহ্মা তখনকার মত কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

অনেকদিন হইতে বিশ্বকর্ম্মার হাতে কোন কাজকর্ম নাই; কি করেন, কি করেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে সেই দরখাস্তখানা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি রকম একটা যন্ত্র আবশ্যক তাহা চট করিয়া তাঁহার মাথায় আসিল না। তিনি নিজে ধূমপান করিতেন না, কাযেই একটা পরিষ্কার ধারণা তাঁহার কিছুতেই হইতেছিল না। তখন তিনি স্থির করিলেন যে ধূমপায়িসভার সম্পাদকের সহিত এ বিষয়ে বাচনিক পরামর্শ করিয়া ব্যাপারটা খোলসা করিয়া লইবেন।

যথাসময়ে বিশ্বকর্ম্মার আপিসের শিলমোহরাঙ্কিত একখানা সরকারি চিঠি সম্পাদকের নিকট পৌঁছিল। সম্পাদক আপিসে উপস্থিত হইলে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী তর্ক বিতর্ক করিলেন। তর্কে তাঁহার কথাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল;—সহসা তাঁহার কথায় একটা 'আইডিয়া' প্রবেশ করিল। তিনি সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া খুব দম্ভের সহিত কহিলেন,—"যন্ত্র আমি সৃজন করিবই। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের একটু সাহায্য চাই।"

সম্পাদক আগ্রহসহকারে কানটা খাড়া করিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়ই; আমরা আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী আছি; কি করিতে হইবে বলুন।"

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন—"আর কিছু না, কেবল স্বর্গের তিন প্রধান দেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট হইতে যন্ত্র নির্ম্মাণের উপকরণ আপনাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে, উপকরণ আমার সন্ধানে নাই।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্পাদক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং চাদরখানা স্কন্ধে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

৩

ধূমপায়িসভার জনকতক বাছা বাছা লোক মিলিয়া একটা প্রতিনিধিদল গঠিত হইল। তাঁহারা এক শুভদিনে বাষ্পযানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন। সহস্র যোজন দূর হইতে এক বহুবিস্তীর্ণ সমুজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র একত্রে সমুদিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল প্রভায় ব্রহ্মলোক মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অর্‌ ও ণ্য নামক দুইটি সুধা-হ্রদ ব্রহ্মলোককে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার তীরে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মলোকবাসিগণ আকণ্ঠ সুধাপান করিতেছেন। সেখানকার ভূমি বিচিত্র রত্নময়ী; স্থানে স্থানে হেম অট্টালিকা ও অপূর্ব্ব রত্নময় দিব্য মন্দির শোভা পাইতেছে; সেই শঙ্খঘণ্টা-কাংস্য-নিনাদিত মন্দির মধ্য হইতে ব্রহ্মর্ষিদিগের সমকণ্ঠে গীত নাম-গান উত্থিত হইয়া জলস্থল আকাশ মুখরিত করিতেছে, সেই গানের সহিত একতানে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া গান গাহিতেছে; ধূপ ধুনা চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম ও পুষ্পের সৌরভে দিক্‌ আমোদিত। বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী মহানুভব ব্রাহ্মণগণ যথাপদ ও যথাক্ষর ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। বিস্তীর্ণ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে হোমানল প্রজ্বলিত, তাহাতে বারম্বার আহুতি প্রদত্ত হইতেছে—আজ্যধূমে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ। ব্রহ্মর্ষিদিগের সুরলয় সংযোগে বেদাধ্যয়ন শব্দে ব্রহ্মলোক শব্দায়মান। ধূমপায়িগণ সেই সকল সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শরীর পবিত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একস্থানে মহা জনতা—দেবাঙ্গনাগণ অমৃতবর্ষী অশ্বত্থতলে দাঁড়াইয়া কলসে কলসে অমৃত আহরণ করিতেছেন; অন্নময় ও মদকর সরোবর তীরে দক্ষ প্রমুখ প্রজাপতিগণ দ্বারা অতিথিগণ সৎকৃত হইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সদনে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রকাণ্ড রত্নময় হেম অট্টালিকা। পদ্মরাগ, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, বৈদূর্য্যমণি ও হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি

নানা রত্নখচিত অট্টালিকা-প্রাচীরের ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিল, দ্বারে অসংখ্য চতুর্ভুজ প্রহরী পাহারা দিতেছে, তাহাদের চারি হস্তে চারি প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে।

ব্রহ্মা তখন পূজায় বসিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল;—একজন প্রহরী তাঁহাদিগকে বিশ্রামঘর দেখাইয়া দিয়া গেল।

নামাবলী গায় কমণ্ডলু হাতে চার কপালে চারিটি ফোঁটা কাটিয়া ব্রহ্মা বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ নীরবে তুলিয়া সকলকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার সদাপ্রশান্ত চতুর্মুখ আজ কেমন বিষাদ-ভারাক্রান্ত, বিরক্তির চিহ্নবিজড়িত। তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর সকলে উপবেশন করিলেন।

তখন ব্রহ্মার বাক্যস্ফুরণ হইল, তাঁহার চারি কণ্ঠের গম্ভীর স্বর একত্রে বাহির হইয়া সকলকার ভীতি উৎপাদন করিল। দলের মধ্যে একজন ছোকরা ছিল, ব্রহ্মার চার জোড়া ওষ্ঠ এক সঙ্গে কম্পিত হইয়া যে একটা হাস্যোদ্দীপক শব্দ করিতেছিল তাহাতে সে হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, তাহার আকর্ণ গণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছিল।

ব্রহ্মা বিরক্তিবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার সময় বড় অল্প, হাতে বিস্তর কাজ, যাহা বলিবার আছে চট্‌পট্‌ সারিয়া লও।"

প্রতিনিধিদলের প্রধান ব্যক্তি তখন তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আমরা আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না; কেবল ধূমপানযন্ত্র সংক্রান্ত দুই-চারিটী কথা বলিব। আপনি আমাদের দরখাস্ত—"

ব্রহ্মা বাধা দিয়া বলিলেন—"অত বিশদ বর্ণনার আবশ্যক নাই, মোট কথাটা বল।"

যিনি কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাধা পাইয়া তিনি থতমত খাইয়া গেলেন, কি বলিবেন গোলমাল হইয়া গেল, কিন্তু তাহা সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিলেন,—"একদিন বিশ্বকর্ম্মা আমাদের সভার সম্পাদক—"

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"সমস্ত কথা শুনিবার আমার সময় নাই, এখুনি স্নানাহার শেষ করিয়া আমাকে দেবসভায় যাইতে হইবে, সেখানে অনেক কাজ আছে। তোমাদের আসল কথাটা কি শীঘ্র বল, নয়ত সময়ান্তরে আসিও।"

প্রধান ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, না, আমি এখুনি সারিয়া লইতেছি। শুনুন না, এ—ই বিশ্বকর্ম্মা অ-শ্বা-স দিয়াছেন ধূমপানযন্ত্র তিনি নির্ম্মাণ করিবেন, কিন্তু—"

ব্রহ্মা আরো চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বিশ্বকর্ম্মা আশ্বাস দিয়াছেন তা আমার কি?"

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন "না, না, তা নয় কিন্তু—"

"কিন্তু কিন্তু করিয়াই তুমি আমাকে বিরক্ত করিলে, এত চেষ্টা করিয়াও আসল কথাটা এখনও শুনিতে পাইলাম না, আমি এমন করিয়া আর সময় নষ্ট করিতে পারি না।" এই বলিয়া ব্রহ্মা গাত্রোত্থান করিলেন।

সেই প্রধান ব্যক্তি অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জোড় করে ব্রহ্মার স্তবগান করিয়া কহিলেন—"হে দেবশ্রেষ্ঠ! হে সৃষ্টিকর্ত্তা! হে পদ্মযোনি! আপনার অনুগ্রহে আমরা দেহে প্রাণ, নয়নে আলোক, নাসিকায় বাতাস পাইতেছি, আপনারই প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছি, আপনার কৃপায় সর্ব্ববিষয়ে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছি, আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, সর্ব্বেসর্ব্বা, আমরা আপনার শ্রীচরণের দাস মাত্র; আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। হে দেব! অধমদিগের প্রতি করুণা কটাক্ষ করুন।"

ব্রহ্মা স্তবে গলিয়া গেলেন, নিজের উপর একটু গর্ব্ব বোধ করিয়া কহিলেন—"অবশ্য অবশ্য, তোমাদের দুঃখ আমার কাছে নয় ত আর কাহার কাছে জানাইবে? আমি তোমাদের সমস্ত অভাব দূর করিব।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় উপবেশন করিলেন।

তখন ধূমপানযন্ত্রের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার সম্মুখে বিবৃত করা হইল; কথায় মত্ত হইয়া তিনি দেব-সভায়

কথা ভুলিয়া গেলেন। বক্তা মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রশংসা গান করিয়া তাঁহার শ্রবণের আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সমস্ত শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—"আমার বাপু যা সম্বল ছিল, তা ব্রহ্মাণ্ড সৃজনে সব গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এই কমণ্ডলুটি। তাহা তোমাদিগকে দিতে পারি, যদি কোনো কাজে লাগে,—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মাকে বলিও, যদি উহা ব্যবহারে না লাগে ত আমায় যেন ফিরাইয়া দেন; ওটা আমার বড় সখের, বড় দরকারের।"

৩

ধূমপায়িসভার বাষ্পযান একদিন কৈলাস অভিমুখে উড়িয়া চলিল। অসংখ্য জনপদ, নদ-নদী, অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধিগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন এক রজতশুভ্র পর্ব্বত, দূর হইতে তাহাকে মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়; মন্দোদ নামক স্বচ্ছতোয় শীতলবারিপূর্ণ সরোবর তাহার পদচুম্বন করিতেছে, তাহারই তীরে নানা বিচিত্র সুগন্ধ পুষ্প-ভারাবনত বৃক্ষাবলি শোভিত এক পবিত্র মনোরম নন্দন-কানন, তাহার মধ্যে যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নৃত্যগীতবাদ্যে ও ক্রীড়াকলাপে মত্ত রহিয়াছে।

কৈলাস মধ্যে পরম শান্তি মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন,—কোথাও চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার লেশমাত্র নাই; বিশ্বেশ্বর-সিদ্ধগণ সংযতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন, সকলেই যেন ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর, সংযত। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হিংসাদ্বেষাদি ভুলিয়া মৃগযূথের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। ধলাকামালায় নভস্থল যেমন সুশোভিত হয়, অতিসুন্দর কামধেনু সকল শ্রেণী-নিবদ্ধ থাকায় ঐস্থান সেইরূপ সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঘন্টাকর্ণ, বিরূপাক্ষ, দীর্ঘরোমা, শতগ্রীব, উরুবক্ত্র প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতগণ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ত্রাসের উদয় হয়।

রুদ্রাক্ষমালাশোভিতকণ্ঠ জটাভারাক্রান্ত দেবাদিদেব মহাদেব বসিয়া বসিয়া স্তিমিতনেত্রে নতমস্তকে ঝিমাইতেছেন, সতীদেবী সম্মুখে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ঘরের চারিদিকে অনেক জিনিস ছড়ান; গোটাকতক শুষ্ক বিল্বপত্র ও ধুতুরাফুল বাতাসে ইতস্তত উড়িতেছে, একদিকে একছড়া ছেঁড়া মালা ও একখানা বাঘছাল পড়িয়া আছে; তাহারই পাশে মহাদেবের ডমরুটী বর্ত্তমান। এককোণে স্তূপীকৃত ছাই, মধ্যে মধ্যে পবনতাড়িত হইয়া সতী ও মহাদেবের অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে। অদূরে ভৃঙ্গী একটা প্রকাণ্ড নিমকাঠি লইয়া সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে এবং গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতেছে। মহাদেবের বাহন বলদটা গোয়ালে শুইয়া রোমন্থ করিতেছে, সাপগুলা একটা গর্ত্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছে। নন্দী লগুড় হস্তে বহির্দ্বার রক্ষা করিতেছে, গঞ্জিকাসেবনে তাহার চক্ষুদুটা জবাফুলের মত রক্তবর্ণ।

প্রত্যহ বৈকালে সিদ্ধিসেবন করা মহাদেবের অভ্যাস। এখনও সিদ্ধি না পাইয়া তাঁহার ক্রমাগত হাই উঠিতেছে, মনটা কেমন ফস্ ফস্ করিতেছে,—তিনি একবার ভৃঙ্গীকে হাঁক দিলেন। এমন সময় নন্দী বহির্দ্বার ছাড়িয়া মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল যে, দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ভক্তবৃন্দ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিবার হুকুম দিলেন। সতীদেবী স্বামীর পা ছাড়িয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে ধূমসেবিসভার প্রতিনিধিদল সেখানে দেখা দিলেন। ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘোঁটা ফেলিয়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ক্ষিপ্রহস্তে বাঘছালখানা পাতিয়া দিল। মহাদেব ভক্তগণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন, কুশলাদি প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ধূম্রলোকবাসিগণ! ধূমসেবনে তোমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না ত, মর্ত্তের যজ্ঞধূম তোমাদের দিকে নিয়ত পৌঁছিতেছে ত, কেহ কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটায় না ত?"

দলের প্রধান ব্যক্তি উত্তর করিলেন—"হে দেবাদিদেব! কলিকালে জম্বুদ্বীপে যজ্ঞকার্য্য বন্ধ বটে কিন্তু কল-কারখানা, কলের গাড়ী প্রভৃতি হইতে যে ধূমোদ্গিরণ হয় তাহা বড় কম নয়। উক্ত দ্বীপে বৈদ্যুতিক

ব্যাপারের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে মনোমধ্যে আশঙ্কার উদয় হইতেছে বটে, কিন্তু আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে আজ পর্য্যন্ত ধূমসেবনে কেহ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে উন্নতি-বিধায়িনী পত্রিকাখানা আমাদের প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করে। আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি না, প্রতিবাদ করি না; আমরা বাক্যের দ্বারা নয়, কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাই যে, ধূমসেবন ও ধূমপায়ী সভা হইতে ত্রিলোকের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।"

মহাদেব সাধু সাধু শব্দে এই উক্তির সমর্থন করিলেন।

তখন সেই দলের প্রধান ব্যক্তি কহিলেন—"কিন্তু ধূমসেবনের জন্য কোন যন্ত্র না থাকায় আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাদেব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন—"তোমাদের চেষ্টায় যদি একটা যন্ত্র সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমিও বাঁচি, গঞ্জিকা সেবনে আমারও তেমন সুবিধা হইতেছে না,- ইচ্ছা হয় সমস্ত ধূমটাই গলাধঃকরণ করি, কিন্তু তাহা পারি না।"

দলের প্রধান, ব্যক্তি তখন বলিলেন—"হে দেবোত্তম! যন্ত্র-নির্মাণ অসাধ্য বলিয়া অনুমান হইতেছে না, বিশ্বকর্মা আমাদিগকে ভরসা দিয়াছেন। ব্রহ্মার কাছ হইতে কমণ্ডলুটা পাইয়াছি। এখন আপনি কোন উপকরণ দিলেই হয়।"

মহাদেব উত্তর করিলেন—"দেখ ভক্তগণ, প্রায়ই আমার মনে হয় যে, আমার ডমরুটার দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে; যখন বাজাই তখন তাহার গম্ভীর রব হইতে যেন অস্ফুট আভাস পাই—যেন সে আপনি গুমরি গুমরি বলে—'হে দেব, আমার কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দাও, শুধু শব্দ সৃজন আমার চরম লক্ষ্য নয়; আমার অন্য যা গুণ আছে তাহা প্রকাশিত হইতে দাও,কেবল তালমানলয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিও না। তাই বলিতেছি, হে ধূমপায়িগণ! দেখ দেখি পরীক্ষা করিয়া আমার অনুমান সত্য কি না। আমার বিশ্বাস ডমরুটা ধূমসেবন যন্ত্রের একটা অত্যাবশ্যক উপাদান হইতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি ভৃঙ্গীকে ডমরু আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃঙ্গী তাহা উঠাইয়া আনিল। কাঁধ হইতে গামছাখানা লইয়া তাহার ধুলা ঝাড়িয়া মহাদেবের হাতে দিল। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের পাশে রাখিয়া দিলেন।

তারপর অন্য কথাবার্তা আরম্ভ হইল; ইতিমধ্যে ভৃঙ্গী সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল, মহাদেব খানিকটা পান করিয়া ভক্তদিগকে প্রসাদ দিলেন। ধূমপান যন্ত্রের কথাটা আর উঠিল না। ধূমপায়ীর দল প্রস্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ডমরুটা হস্তগত না হইলে যাইতে পারেন না, মহাদেবের কোলের কাছে সেটা পড়িয়া আছে, তিনি তাহা দিবার নামও করেন না। সকলে প্রমাদ গণিলেন। অনেকক্ষণের পর একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"হে দেব! তাহা হইলে ডমরুটা লইবার জন্য কবে আসিব?"

মহাদেব একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"না, না, ওটা আজই নিয়ে যাও। আমি ওটার কথা একদম ভুলেই গিয়াছিলাম।" তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন —"এইজন্যেই ত নূতন উপাধি পেয়েছি—ভোলানাথ।"

৫

বিষ্ণু ধূমপায়ীদের উপর বড় চটা ছিলেন। ধূমপায়ী সভা উঠাইয়া দিবার জন্য স্বর্গের কৌশলী সভায় অনেকবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবা-দিদেব মহাদেবের জন্য তাহা পারেন নাই, তিনি বরাবর বিষ্ণুর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণু তথাপি ছাড়েন নাই; উন্নতিবিধায়িনী পত্রিকায় ধূমপানের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া বিষয়টাকে সজীব রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল হয় নাই; এ সমস্ত বাধা সত্বেও ধূমপায়ী সভা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিল।

সেদিন প্রতিনিধিদল উপকরণ আহরণের চেষ্টায় তাঁহার প্রাসাদে আসিল, তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন—"যা, বল্গে, আমার সঙ্গে দেখা হইবে না।"

প্রহরীর মুখে এ কথা শুনিয়া ধূমপায়ীর দল পশ্চাৎ-পদ হইল না, "তোমার মনিবকে বলগে যে, আমরা অতি অল্প সময়ের জন্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

প্রহরী প্রভুর অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিল। সে অবস্থায় তাঁহার কাছে আর যাইতে সাহস করিল না, বলিল—"বৃথা চেষ্টা, দেখা হবে না।"

অমনি করিয়া তিন তিন দিন ধূমপায়ী সভার প্রতিনিধিদল বিষ্ণুর বহির্দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহারা এক মতলব আঁটিলেন।

মর্ত্ত্য সৃজন হইবার পর হইতে সেখানে লীলা খেলা করিবার জন্য স্বর্গের অনেক দেবতা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর উপর ভার পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে মর্ত্ত্যধামে বংশীবাদন করিয়া গোপিনীকুলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। বাঁশী বাজান তাঁহার কখন অভ্যাস ছিল না। সেইজন্য আজকাল প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা একটা কন্সার্টের আড্ডায় বাঁশী বাজান শিখিতে যান। ধূমপায়ীরা সে সন্ধান পাইয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধূমপায়ীদলের একটা ছোকরা ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া বিষ্ণুর বাড়ীর সম্মুখে পায়চারি করিতেছিল। সেদিন বিষ্ণু বাঁশীটা হাতে করিয়া যেমনি বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই ছোকরা চিলের মত ছোঁ মারিয়া বিষ্ণুর হাত হইতে বাঁশীটা কাড়িয়া লইয়া ছুট দিল। তাহার বাষ্পময় সূক্ষ্মদেহ নিমেষের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা বিষ্ণু দেখিতে পাইলেন না; বিরস বদনে বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহার কন্সার্টের আড্ডায় যাওয়া বন্ধ হইল।

বিষ্ণু অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলেন যে, ধূমপায়ীদিগের চাতুরীতে তাঁহার বাঁশীটা গিয়াছে। বাঁশীটা যে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে সেকথা লজ্জায় দেব সভায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না; ধূমপায়ীরাও কি উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন অপ্রকাশ রাখিলেন। আসল ব্যাপারটা কেহ জানিল না; সকলে বুঝিল, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের ন্যায় তিনিও দান করিয়াছেন। কিন্তু বাঁশীটা হস্তান্তর হওয়ার বিষ্ণুর মর্ত্ত্যে আসিবার দিন পিছাইয়া গেল।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু, বিষ্ণুর বাঁশী ও মহেশ্বরের ডমরু পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্র নির্ম্মাণে লাগিয়া গেলেন। এই তিনটি সামগ্রী দর্শন মাত্রেই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্কে ধূমপান যন্ত্রের একটি ছায়া পড়িল। তাহারই অনুকরণ করিয়া তিনি একটি কায়া রচনা করিলেন। কমণ্ডলুর মুখের ফাঁদ কমাইয়া ফেলিলেন। বাঁশীর ছিদ্রগুলি বুজাইয়া দিলেন। ডমরুর দুই মুখের চর্ম্ম ফাঁসিয়া গেল। তখন কমণ্ডলুর উপর বাঁশী, বাঁশীর উপর চর্ম্মবিহীন ডমরুটি স্থাপন করিয়া দেখিলেন, ঠিক হইয়াছে।

স-কলিকা হুকার সৃষ্টি হইল। বিষ্ণু ক্ষুব্ধ হইলেন, ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত হইলেন। মহেশ্বর মহা খুসী। তাঁহার ডমরুটাকে তিনি যে বাজজন্ম হইতে মুক্তি দিতে পারিয়াছেন সেইজন্য তাঁহার বেশী আনন্দ। প্রিয় ডমরুটীকে তিনি এক ভাবে দান করিয়া আর-এক ভাবে গ্রহণ করিলেন। গঞ্জিকা সেবনের জন্য কেবলমাত্র কলিকাটি লইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব দান করিলেন। সেই অবধি গঞ্জিকা সেবনে কলিকাই প্রশস্ত।

হুকা সৃষ্টি হওয়ার কথা ইন্দ্রের কানে পৌঁছিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—"করিয়াছেন কি দেব? সৃষ্টি রক্ষা হইবে কি করিয়া?"

ব্রহ্মা ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কেন, কেন?"

ইন্দ্র—"মর্ত্ত্যলোকবাসীরা ত যজ্ঞকার্য্য বন্ধ করিয়াছে। তাহার উপর আমার বজ্রটা চুরি করিয়া লওয়া অবধি তাহাকে তাহারা সকল কার্যে লাগাইতেছে। অগ্নিদেবকে আর বড় কেয়ার করে না; ধূম অভাবে বরুণ কোথাও রীতিমত জল বর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। তামাকু ব্যবহারের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার হওয়ায় একটু আশার উদয় হইতেছিল। তাহার ধূমও যদি যন্ত্র সাহায্যে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন তবে আর উপায় কি? বারি অভাবে পৃথিবী প্রাণীশূন্য হইয়া পড়িবে—আপনার সৃষ্টি রসাতলে যাইবে।"

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া ব্রহ্মার চতুর্মুখ ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"তাই ত, তাই ত, ধূম্রলোকবাসীরা ত আমায় একথা বলে নাই, তাহারা আমাকে ভয়ঙ্কর ঠকাইয়াছে।"

ইন্দ্র বলিলেন,—"ইহার উপায় বিধান করুন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"নিশ্চয়ই, ধূমপায়ীরা আমার সঙ্গে যেমন জুয়াচুরি করিয়াছে, আমি তাহাদের তেমনি অভিসম্পাত দিব। ইন্দ্র, তুমি জল আন।"

জলগণ্ডূষ লইয়া ব্রহ্মা তখন শাপ দিলেন—"কোন ধূমসেবী আজ হইতে ধূমপানযন্ত্রনিঃসৃত সমস্ত ধূম গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না,—ধূমের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে ফুঁ দিয়া মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে সে ধূমপানে কোন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। তাহাকে যক্ষ্মাকাশে অকালে দেহত্যাগ করিতে হইবে।"১

তাহার পর একদিন ধূমপায়িসভায় হুকার প্রতিষ্ঠা হইল। চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া হুকার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া হুকা-শাস্ত্র খুলিয়া সকল সভ্য হুকা-স্তোত্র পাঠ করিলেন,—"হে হুক্কে। হে ধূমপায়িসভাসভ্যজনদুঃখহারিণী। হে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশিসমুদ্গারিণি। তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি, তুমি আমাদিগের প্রতি সদা প্রসন্ন থাক। হে বিশ্বরমে। তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী অলসজন-প্রতিপালিনী, ভার্য্যাভৎর্সিত-চিত্তবিকার-বিনাশিনী। মূঢ় আমরা তোমার মহিমা কেমনে বর্ণিব? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে। হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী। তুমি আমাদের ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার যশঃসৌরভ সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ুক। তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক, তোমার মুখছিদ্রের সহিত আমাদের অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

ইতি হুকার জন্মকথা সমাপ্ত। ২

ফল-কথা

এই হুকার জন্মকথা যিনি নিত্য আগ্রহে ও অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করেন তাঁহার অক্ষয় ধূম্রলোকবাস হয়। যিনি একবার মাত্র শ্রবণ করেন তাঁহার পুণ্যের ইয়ত্তা থাকে না।

যিনি ধূমপান করেন দেবী ধূমাবতী ও অসুরশ্রেষ্ঠ ধূম্রলোচন সকল বিপদে তাঁহার সহায় হন; তাঁহার বুদ্ধির জড়তা থাকে না, মাথা বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠে। কল্পনা অতীব প্রতিভাশালী হয়, তিনি সম্ভব অসম্ভব গুলিখোরোচিত নানা গল্পগুজবের সৃষ্টি করিতে পারেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকেন, দেহান্তে তাঁহার কৈলাসবাস হয়। যিনি হুকার নিন্দা করেন তাঁহাকে জন্মান্তরে শৃগালদেহধারণ করিয়া কেবল 'হুকা হুয়া' রব করিতে হয়।

১। যাঁহারা তামাকু সেবন করেন তাঁহারা জানেন যে, ধোঁয়া টানিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলে তামাকু খাইয়া কোন তৃপ্তি হয় না। তাহার কারণ আমার মনে হয় ব্রহ্মার এই অভিশাপ।

—লেখক

২। হুকার সৃষ্টি হওয়ায় ধূম্রলোকে ধূমপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তামাক সাজিবার নিমিত্ত একদল ভৃত্যের প্রয়োজন হওয়ায় ধূম্রলোকবাসীরা মর্ত্তলোকে সিগারেট ও বিড়ি পাঠাইয়াছেন;—বালকেরা সিগারেট ও বিড়ি খাইয়া অকালে মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া ধূম্রলোকে গিয়া তামাক সাজিবে, এই উদ্দেশ্য।

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৫।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অভয় অবাক্ হয়ে যায়। কখন যে পাটুলি এল আর কখন যে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল, সে কিছুই লক্ষ্য করেনি। কি অন্যমনস্ক হয়েই ছিল। ভাবল এমনি করেই লোক নিজের স্টেশন ছেড়ে অন্য স্টেশনে নেমে পড়ে। কপালের দুর্গতি আর কি। অভয় তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নেয়। বাক্সটা বেঞ্চির তলা থেকে টেনে আনে—বিছানা নামিয়ে বাক্সের ওপর রাখে। খাবারের হাঁড়িটা সযত্নে বাক্সের পাশে রাখে। গাড়ী থামতেই নেমে পড়ে অভয়। বিছানা নামিয়ে হাঁড়িটা নামিয়ে আনে। বাক্সটা টেনে ধারের কাছে আনে। হারানই এসেছে। সে ছুটতে ছুটতে আসে। দুজনে ধরাধরি করে বাক্সটা নামায়। কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে অভয় বলে—হারান, সব ভাল তো? বাবা আসেব নি? না?

—না, বাড়ীতেই—আছেন।

—কেন? বাবার শরীর ভাল তো?

—হাঁ, ভাল।

—মা, গীতা খোকন—।—

হাঁ, সবাই ভাল। হারাধন বলে, খুব রদ্দুর। এবার হাঁট।

অভয় ছাতাটা হাতে নিল। হারাধনের মাথায় বাক্স আর বিছানা চাপিয়ে হাঁটতে লাগল। যেতে হ'বে দু মাইলের কিছু ওপর। রেল লাইনের ধার দিয়ে রাস্তা। গাড়ীটা হু হু করে চলে গেল। ষ্টেশন আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। অভয় চারদিকে চায়। দূরে দেখা যাচ্ছে থানা, আর ঐ দেখা যাচ্ছে, শেওলা তলায় মাঠ আর মন্দির। তার পাশে জমিদারদের কাছারী বাড়ী। লাইনের কিছু দূরে গঙ্গা। গঙ্গা এখন খুব শীর্ণকায়। ওপারে, বালুচর, ধু-ধু করছে। নিঃসঙ্গ বাবলা গাছগুলো এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাইনের দু পাশে আম বাগান। আম, কাঁঠাল আর বাঁশ গাছের ঝাড়। বাবলা, শিমুল, তাল, খেজুর গাছও অনেক। দুপুরের নিস্তব্ধতার মাঝে, দু একটা গরু চরে বেড়াচ্ছে। একটানা ভাবে ঘুঘু পাখী ডেকে যাচ্ছে। এখন রোদটা বড় বেশী। কোঁচার খুঁটে মুখ মুছল অভয়। লাইনের পাশের পাথর, গুলো রোদে পুড়ে যেন আগুন হয়েছে। একটা গরম বাতাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পথ চলতে চলতে, দু-একটা কথা বলছে অভয়। হারাধন মাঝে মাঝে জবাব দিচ্ছে শুধু।

এবার এসে গেছে তাদের গাঁ। দূরে দেখা যাচ্ছে রেলের গুমটী ঘর। তার পাশ দিয়ে রাস্তা। ধুলোভরা রাস্তা, রোদের তেজে, তেতে উঠেছে। রাস্তার দুপাশে

আম বাগান আর বাবলা বন। রাস্তায় লোকজন নেই, সব নিঃশব্দ আর নিস্তব্ধ।

একটা বাঁক নিল রাস্তাটা। এরপর কুমোরপাড়া। দু-চার ঘর কুমোর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। ওদের বাড়ীর উঠানে কাঁচা হাঁড়ী, মাটির নাদা, দরা, মুচি সব শুকোচ্ছে। মাথায় গামছা বেঁধে ছিরু পাল কাঠ কুড়িয়ে আনছিল। মাথা থেকে বোঝাটা ঈষৎ তুলে বলল, কি রভয় নাকি?—তা—তা—বাড়ী যাও—। অভয়ের মনটা ছলাৎ করে উঠল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল ছিরু পাল। বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। দূরে দেখা যাচ্ছে সেই ষষ্ঠিতলা, মস্ত বড় অশথ গাছটা নিবিড় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে, কিছুটা গেলেই অভয়দের বাড়ী। সেই সরু রাস্তায় এসে অভয় উৎফুল্ল হয়ে তাকিয়ে থাকে ঐ তো তাদের বাড়ীতে ঢুকবার রাস্তা দেখা যাচ্ছে। সেই বাঁশের গেট, পাশে পেয়ারা গাছ আর বাঁশের বেড়া দেওয়া বাগান। কিন্তু দরজার পাশে, মায়ের সেই প্রতীক্ষাময় উৎফুল্ল মুখ কোথায়? অভয় হন্ হন্ করে এগিয়ে যায়—

দরজা ঠেলে ডাকে—মা—মা—। কিন্তু আসেন গোপেশ্বর, কিন্তু এ কি চেহারা? মাথার চুল এলোমেলো রুক্ষ, এক মুখ দাড়ি গোঁপ। অভয় প্রণাম করে, তার বাবার দিকে তাকিয়ে হতচকিত হয়। বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

অভয় ডাকে—মা—মা—। অভয়ের গলায় শব্দ পেয়ে, ছুটে আসে গীতা, খোকন। একসঙ্গে ওরা কেঁদে ওঠে।

—দাদা গো—মা আমাদের নেই—

—মা নেই—মা নেই? শব্দ করে কেঁদে ওঠে অভয়। একটা দারুণ ব্যথা হঠাৎ কোমর থেকে ওপরে ওঠে আর নামে। অভয় সেই জায়গায় বসে পড়ে। মনে হয়, পৃথিবীতে আলো নেই, বাতাস নেই, সমস্ত পৃথিবী আজ শূন্য। মা নেই—মা নেই—পৃথিবীর সমস্ত বাতাস যেন কেঁদে বলতে থাকে—না—নেই—নেই—নেই—

হারাধন মোট নামিয়ে বলে, এ কি, ছিঃ—ছিঃ ছোটবাবু। ছেলেটা এই খাড়া রোদে হেঁটে এল। আগে বসুক, জিরুক, তারপর না হয় খবরটা দিতে হয়। হারান মাথায় গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, আর কি করবে দাদা? সবই ভগবানের হাত। কপালের লিখন। এখন ওঠ ঘরে যাও, একটু ঠাণ্ডা হও গে। কাঁদবার তো অনেক সময় রয়েছে দাদা—

অভয় আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল—এসে দাঁড়াল উঠোনে। মার হাতের চিহ্ন যে সবখানে। তুলসী মন্দিরে সেই প্রদীপ রয়েছে। উঠানে এখনও মার হাতের গোবর দেওয়া নিকানোর দাগ। সমস্ত ঘর বাড়ীতে যে তাঁরই হাতের চিহ্ন, সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। অভয় ঘরের রোয়াকে উঠে সামনের দাওয়ায় বসল। দিনের আলো যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। উপরের আকাশে তীব্র সূর্য্য—ঐ আকাশ ঘর বাড়ী গাছপালা আজ যেন যেন সবই নিরর্থক। অভয়ের মনে হতে লাগল, এই জগৎ সংসার, যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু, সবই ক্ষণভঙ্গুর, সব মায়া, সব মিথ্যা, সকলই মরীচিকার মত মায়া আর স্বপ্ন। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা—মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা—

অভয়ের মনে পড়তে লাগল, তার মালদহ যাবার দিনটা। তার মা যে কত ভোরে উঠে,—কত রান্না করেছিলেন। তারপর তাকে ডেকেছেন—বাবা অভয়, আয় বাবা—

মায়ের সেই শীর্ণ মুখখানি—দারিদ্র্যমাখা চেহারাখানা, ছেঁড়া শাড়ী, হাতে শুধু একটি লোহা আর শাঁখা পরা মূর্ত্তিখানা—চোখের ওপর ভাসতে থাকে। মার যে কত আশা ছিল। কিন্তু হায়, এই এক মাসের মধ্যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত আশা চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ফিরে এসে সে আর দেখতে পেল না তার মাকে। সে যে কত আশা করে মায়ের জন্য শাড়ী এনেছে, মা তা পরতে পেলেন না। নূতন কাপড় দেবার আনন্দ আজ সব শেষ। অভয় বলে—মা, মাগো,

আমি এসেছি মা। যদি তুমি থাক, তবে দেখ, তোমার অভয় এসেছে। তোমার জন্যে যে নতুন শাড়ী এনেছি মাগো—

গোপেশ্বর ডাকলেন—বাবা অভয়, এবার ওঠ্ বাবা। স্নান করে এখন যে কাচা পরতে হবে। ভগবান্, কি যে হ'ল। রাতে একটু সামান্য জ্বর হ'ল। সারারাত বার বার শুধু তোকেই ডেকেছে। ভাবলাম, সকাল হ'ক, ঔষধ আনব। কিন্তু রাত পোয়াল না, সকাল হবার আগেই, শুধু তোকে ডাকতে ডাকতে চোখ বুজলেন সতীলক্ষ্মী। শুধু ডেকেছে—খোকা যাই, খোকা—

অভয় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। গীতা, খোকন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। অভয় ওদের কাছে টেনে নেয়। দুজনকে বুকে চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

একমাসে শ্রাদ্ধ হবে। গোপেশ্বর দাদাকে একখানা পত্র লিখে এই দুঃসংবাদ জানালেন। অভয়ের আর ইচ্ছা হ'ল না। কাউকে এই খবর দিতে। অপরকে এই খবর দিয়ে কী হবে। তার মা যে কতখানি তার ছিল—এ কথা কাকে বলবে। এ দুঃখ তার একান্ত নিজের। তার মায়ের যে কত সাধ ছিল। তাঁর খোকা—বিদেশে যাবে পড়তে, পাশ করবে—চাকরী করবে, ঘরে আসবে বউ। ছেলের বিয়ে দিয়ে, ছেলের বউ নিয়ে ঘর সংসার করবেন।

সেদিন দুপুর বেলায়, গীতা দেখাল, দাদা, তুমি তেঁতুলের আচার খেতে ভালবাস, তাই মা করেছিলেন। মা, বলতেন—তোর দাদা এলে, বোশেখী গাছের পাকা আম দিয়ে আমসত্ত্ব আর পাকা আমের চাটনি করে দেব। এই দেখ, আচারের হাঁড়ী পর্যন্ত কুমোর বউয়ের কাছ থেকে আনিয়ে রেখেছেন। সেই-তুমি এলে, কিন্তু মা আমার—গীতা আর কথা বলতে পারল না। হু-হু করে কেঁদে ওঠে। অভয়ও কাঁদে। সমস্ত সংসারে যে তার মায়ের হাতের চিহ্ন। সেই ছেঁড়া শাড়ীখানা রয়েছে। কত যত্ন করে, ছেঁড়া শাড়ী ধুতি দিয়ে আসন্ন শীতের জন্য কাঁথা তৈরী করেছেন, এখনও একটা কাঁথা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, আর শেষ হয়নি।

ধামায় আধ ধামা তেঁতুল—কিছু কাটা হয়েছে আর কিছু কাটা হয়নি। মায়ের চুল বাঁধা জীর্ণ ফিতে, কবেকার মেলায় কেনা আলতার শিশি, খানকয় মাথার কাঁটা, খালি আলতার শিশি আর সিঁদুরের কৌটা সব সাজান রয়েছে ঘরের কুলুঙ্গিতে।

উঠানের একপাশে মার হাতে পোঁতা বেলফুলের গাছ। মা কত যত্ন করতেন গাছগুলোকে। এখন গাছে ফুল ফুটছে, কত কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। রজনীগন্ধা আর গোলাপ ওদেরও ফুল হচ্ছে। তুলসীতলায় মার হাতে সাজান প্রদীপটি, কুলুঙ্গিতে তাঁর হাতের পাকান সলতেগুলি একপাশে রয়েছে। আছে আজ সবাই, শুধু নেই একজন। এই সংসার—আজন্মকালের ঘর-দুয়ার, এই পৃথিবী, সমস্ত আজ মিলিয়ে গেল।

অভয় শুষ্কমুখে শুধু তাকিয়ে থাকে। একপাশে খোকন ঘুমুচ্ছে—কিন্তু গীতার চোখে ঘুম নেই। অভয় আনমনে এ-ঘর সে-ঘর একবার উঠানে ঘুরে বেড়ায়। মনে মনে বলে, মা, আমি এসেছি। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? একবার, শুধু একবার তুমি ডাক খোকা বলে—

গোপেশ্বর পরামর্শ করেন অভয়ের সঙ্গে। রান্নাঘরে আলো টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। মেঝের ওপর বসে, গোপেশ্বর আর অভয়। গীতা খোকনের জন্য খানকয় রুটী তৈরী করেছে। রাত্রে অভয় তো খাবে ফলমূল। গোপেশ্বর নিজেও রাতে ভাত খান না।

অভয় বলল, গীতা কি রুটী বেলতে পারবে—

গোপেশ্বর বলেন, ওর মায়ের কাছে সব শিখেছে। খালি ভাতের হাঁড়ী নামাতে দিই নে। পাছে গরম ভাত বা ফ্যান পড়ে হাত পা পুড়ে যায়। তা নইলে ওই তো সংসারের সব কাজ করে। ওর মা বলত, মা গীতা, গরীবের মেয়ে তুমি। ঘরসংসারের সব কাজ শিখে নাও। পরের ঘরের তো একদিন যেতে হবে। যেন তারা

বলতে না পারে, মা বাবা কিছুই শেখায়নি। বাবা, এখন শ্রাদ্ধ শান্তি তো করতে হবে। দাদাকে লিখেছি যদি কিছু টাকা পাঠান, তবেই সব রক্ষে। নইলে খুব মুশকিলে পড়তে হবে। পুরুত মশাই ফর্দ দিয়েছেন। তার ওপর কেঁদো কজন, আর দুচারজন আছে। দাদা যদি গোটা পঞ্চাশ টাকা পাঠান, তবে আর দুপাঁচ টাকা-চেষ্টা চরিত্তির করে কোন রকমে যোগাড় করব।

চোখ মুছে গোপেশ্বর বললেন, রাত যখন দুটো হবে, হঠাৎ উনি বললেন, শরীরটা খুব খারাপ করছে। তার পর ভোরের দিকে জ্ঞান হারাবার সময় বললেন, আমি আর বাঁচব না, ওদের দেখো। শুধু খোকাকে দেখতে পেলাম না এই আক্ষেপ থাকল। মরার আগেও ডেকেছেন—অভয়, খোকা আমার। গোপেশ্বর আর কথা বলতে পারেন না। দুই চোখ ভরে যায় জলে গলা ভেঙ্গে যায়।

অভয় বলল, এখন চুপ করুন বাবা। এখন ওরা শুদ্ধ কাঁদতে শুরু করবে। খোকন খেলা করছে, এখনি তবে মা মা বলে কেঁদে উঠবে। যাই হোক, কাল পরশু দেখুন কোন চিঠিপত্র আসে কিনা। অভয় চারদিকে চায়। তার মায়ের চিহ্ন সব জায়গায়। একা মা যে, সমস্ত সংসার ভরে ছিলেন। তাঁর কল্যাণ হাতের ছাপ, আজ সব জায়গাতেই রয়েছে। যেখানে যা রেখে গেছেন, সব যে তেমনি সাজান রয়েছে। সরষের তেল, একটা আলাদা শিশিতে একটু একটু করে জমিয়ে রেখেছেন। রান্নার চাল থেকে এক মুঠো চাল উঠিয়ে আলাদা হাঁড়ীতে জমাতেন, তাও রয়েছে। এমনি সব খুঁটিনাটি কত জিনিষ। একটুকরো কাগজ, দড়ি, কাগজের ঠোঙ্গা, ভাঙ্গা হাঁড়ী কিছুই তিনি ফেলে ফেলতেন না। বলতেন, যাকে রাখো সেই রাখে, ছাইটুকু রাখলে এক সময় ছাইটুকুও কাজ দেবে।

মৃদু স্তিমিত আলোয় অভয় দেখল, বাবার চেহারার কত পরিবর্তন হয়েছে এই কয় দিনে। একে তো তিনি চিরকাল রোগা আর দুর্বল, গায়ে মাংসের ভাগ খুব কম। এখন যেন আরও বুড়ো হয়ে গেছেন। মাথার চুলগুলো এই কদিনেই সাদা হয়ে গেছে। মুখে পাকা গোঁপ দাড়িতে আরও বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। মনে হয়, চোখে আর ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। তারপর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অভয় একটা নিঃশ্বাস ফেলে। অভয় ভাবে কি করে এই সব ফেলে সে মালদহ যাবে। কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। কোন রকমে ম্যাট্রিকটা তাকে যে পাস করতে হবে। তাকে মানুষ হতে হবে—গীতা খোকনের সব দায়িত্ব যে তার ওপর।

রাত বাড়তে থাকে। বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। চারদিক এখন অন্ধকার। জমাট অন্ধকার রাজ্যে অন্ধকারের বুকে অজস্র জ্যোৎস্না পোকার ঝাঁক উড়ে উড়ে গাছে বসছে। আঁধারের মাঝে যেন শত সহস্র রত্নখণ্ড ঝক্ ঝক্ করছে। যেন কোন এক রূপবতীর ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর আঁচল ধরায় নেমে এসেছে আর সেই অন্ধকারের মাঝে, সহস্র সহস্র মণি ঝকমক করছে। বহুদূর আকাশে অগণিত তারকা, নৌবিউলী, গ্রহের দল বিরামহীনভাবে ঘুরে ঘুরে চলছে। কক্ষের বন্ধনীতে তারকারা যেন কাঁদছে—তাদের বেদনা-নিঃশ্বাসে মহা ব্যোম নিরন্তর চঞ্চল। অভয় ভাবে, এই সীমাহীন অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রের পারে কি আছে? এই অজস্র কোটী কোটী গ্রহের মাঝে নক্ষত্রের মাঝে না আরও ওপারে সেই স্বর্গরাজ্য? তার দুখিনী মা এখন কোথায়? অভয় নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

—বাবা—অভয় সচকিত হয়ে ওঠে।

গোপেশ্বর বলেন, চুপ করে থাকিস্‌নে বাবা। তোর মুখ দেখে যে আমার বুক কেটে যাচ্ছে। কি করবি বল্? এই নিয়তি। নে, মুখ চোখ ধুয়ে, যা হয় দুটো ফল মূল মুখে দে। গরুটা দুধ কম দিচ্ছে। গরু, ছাগলের যত্ন সবই তিনি নিজের হাতে করতেন। এই কদিন আর ওদের দিকে মন দিতে পারিনি। দেখছি খোল, ভুষি সব ফুরিয়ে গেছে। এসব কোনদিনই আমি দেখিনি, সব তিনি দেখতেন। মা গীতা, দাদার জায়গাটা করে দে। আমি গোয়ালঘরটা দেখে আসি।

ঘুম আসে না।...রাত বেড়ে ওঠে। পাশে গীতা খোকন ঘুমুচ্ছে। যোগেশ্বরের শোবার ঘরে, এক আধবার পাশ ফেরার শব্দ আসে। কখনও বা ধীরে ধীরে, কখনও বা টেনে টেনে, বলেন, ঠাকুর, ঠাকুর, নারায়ণ! আবার নিস্তব্ধ, আবার নিঃশব্দ। ঘরের একপাশে লণ্ঠনটা শুধু টিপ্ টিপ্ করে জ্বলতে থাকে। দেয়ালে পড়ে তার ছায়া—। অভয় চুপচাপ শুয়ে থাকে। চোখে আর ঘুম আসে না। একসঙ্গে শত সহস্র চিন্তা ভিড় করে আসে। একটা হাত খোকনের গায়ে দিয়ে, অভয় শুধু মায়ের কথাই ভাবতে থাকে। ভাবে—কী আশ্চর্য্য এই মানুষের জীবন। কত ক্ষণস্থায়ী আর কত ভঙ্গুর। তার তরুণ মনে প্রশ্ন জাগে সেই চিরন্তন পুরাতন প্রশ্ন মানুষ মরে কোথায় যায়? না—এই শেষ। তাদের মাটির টবে গোলাপ ফুল ফুটতে দেখেছে অভয়। কী মনোলোভা রং, কী অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ। কিন্তু হায়—ঐ রূপ, সৌন্দর্য্য কত ক্ষণস্থায়ী। রূপ সৌন্দর্য্য ও গন্ধের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার কেন এত আয়োজন। এই কথা অনেকবার ভেবেছে অভয়। এর সার্থকতাই বা কোথায়? সেই ফুলের রং বিবর্ণ হয়ে যাবে—শুকিয়ে যাবে—গন্ধ উবে যাবে, শেষে ফুল ঝরে পড়বে মাটিতে। কিন্তু কেন? কেন, চিরকালের মত ঐ রূপ, ঐ সৌন্দর্য্য, অমন সুন্দর সুগন্ধ নিয়ে ঐ গোলাপ কি বেঁচে থাকতে পারে না? মানুষের জীবনও তো ঐ। এই জীবনের পেছনে কত আয়োজন, এই দেহবিন্যাসে কত খুঁটিনাটি কৌশল। কিন্তু এই মানুষ তো চিরকাল বাঁচে না। কেন বাঁচে না? জানালা দিয়ে, বাইরে তাকায় অভয়। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। অভয় ভাবে, মানুষ কি মরে ঐ তারকাদের কাছে যায়? ঐ অনেক দূরে? কিন্তু তার মা কোথায়? কোন্ তারকার মধ্যে আছেন তার মা। ওখান থেকে কি তিনি আমায় দেখতে পাচ্ছেন? এই ঘরসংসার, গীতা খোকন, এদের কি দেখছেন তার মা? আর ভাবতে পারে না—দুই চোখে জল আসে, একটা অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত বুক টন্‌টন্ করতে থাকে। অভয় ভাবে, না, তাদের মা আর আসবেন না। সেই চেহারা নিয়ে, আর মাকে দেখা যাবে না। না—কোনদিনই—,কোনও সময়েই দেখা যাবে না।

যোগেশ্বরের কাছ থেকে চিঠি এল। আর এল পঞ্চাশটি টাকা। দুঃখ করে, অনেক কথা লিখেছেন। অভয়কে লিখেছেন—সংসার এই রকমই। প্রত্যেকেই ঠিক এমনি অবস্থায় পড়বে। কিন্তু সংসারে সমস্ত দুঃখ-শোককে আমাদের যে ভুলে থাকতেই হবে। আর সময়ই যাবতীয় শোকদুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। এ সংসারে জন্মগ্রহণ অর্থই দুঃখ ভোগ। এখন এই দুঃখের মাঝে আমাদের বড় হতে হবে, দুঃখকে সাথী করেই সব সময়ে সংগ্রাম করে চলতে হবে। মাথা নত করলে চলবে না। এমন অনেক কথা। জেঠাবাবুর পত্রখানা খুব ভাল লাগল অভয়ের। মিনতি লিখেছে চিঠি। এত দুঃখের মধ্যেও অভয়ের বুকটা একটা অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। আশ্চর্য্য এই অনুভূতি। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে, বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা, সচরাচর অন্যান্য স্ত্রীপুরুষ বন্ধুকে পায় না। চিত্তের এই এক অদ্ভুত অনুভূতি, তাই অতি নিকটতম আত্মীয়ের ভেতরই তা সঞ্চারিত হতে থাকে। এটা ভাল না মন্দ, এই অনুভূতির মধ্যে, কামনা বাসনার কোন গন্ধ আছে কি নাই, তা বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু এই বিচিত্র আনন্দ-মধুর অনুভূতি প্রত্যেক কিশোর কিশোরীর বয়ঃ-সন্ধি কালেই দেখা যায়। মাদকতাভরা এই বিচিত্র মধুর অনুভূতিতে দুটি অতি নবীন ফুলের মত পবিত্র হৃদয়, শুধু মাত্র ভাল লাগার টানে নিকটে আসে। একে অপরকে ভালবাসে, সঙ্গ কামনা করে, শুধু চোখে দেখে, শুধু মাত্র দুটি কথা শুনেই আনন্দিত হয়, জীবন ধন্য মনে করে।

সেই বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ, মিনতি আর অভয়ের জীবনে এসে লেগেছে। তাই শত দুঃখের মধ্যে, মিনতির কয় ছত্র লেখা পত্রখানি, যেন তার আর্ত হৃদয়কে চন্দন প্রলেপে শান্ত ও স্নিগ্ধ করে দিল। মাতৃশ্রাদ্ধের আর

বেশী দেরী নেই। শ্রাদ্ধের জিনিষপত্র যোগাড় একরূপ শেষ। দু-চারজনকে নিমন্ত্রণ করে এল অভয়। তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে দেখবেন যাতে মাতৃদায় উদ্ধার হয় তারই অনুরোধ বার বার করল অভয়।

যুগলকাকার বাড়ীর দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল অভয়। ঠিক সেই রকমই সব। বাড়ীর সদর দরজায় একপাশে রাশীকৃত ছাই। সেই নেড়ী কুকুরটা—ছাইগাদায় শুয়ে। দরজার এক পাট ভেঙ্গে গেছে। মাত্র আর একটি কপাট কোন রকমে লেগে আছে। বাড়ী যেন আরো শ্রীহীন হয়েছে। উঠানে একগলা জঙ্গল। একপাশে পড়ে রয়েছে শূন্য গোলা। গোলার চালে খড় নেই—গোলাও কাৎ হয়ে কোনরকমে খাড়া হয়ে আছে। গোয়াল ঘরও তাই। চালে খড় নেই। গোয়াল শূন্য—গরু নেই। চারদিক্ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অভয়। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। উঠানের একপাশে একটা ডালিম গাছ—তার পাশে পঞ্চমুখী জবা গাছ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জবাগাছটায় ফুল ফুটে আলো হয়ে রয়েছে। একধারে কুয়ো, কুয়োর পাশে সরু সরু দুটো পেঁপে গাছ। ওদেরও চেহারা শীর্ণজীর্ণ। গাছে ছোট ছোট দু-একটি পেঁপে ঝুলছে। সমস্ত বাড়ীটা যেন বিষাদ মাখা—জীবনের লেশ মাত্র নেই। অভয় ভয়ে ভয়েই ডাকল যুগলকাকা—ও যুগলকাকা—। ঘরের ভেতর থেকে সাড়া এল—কে? কে ডাকছে—

—আমি অভয়। একবার বাইরে আসুন—

—ওঃ। অভয়, মানে গোপেশের ছেলে—তা বেশ—আচ্ছা আচ্ছা। লাঠির শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এলেন যুগলকাকা। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে যুগলকাকার?

অভয় আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে রইল। যুগলবাবুর মাথার চুল সব সাদা। আরও বুড়ো হয়ে গেছেন—যেন আরও অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন। লাঠির ওপর ভর দিয়ে, চোখের ওপর হাত দিয়ে, যুগলবাবু বললেন, ওঃ, তুমি অভয়। আর বাবা ভাল দেখতে পাইনে, শরীর ভেঙ্গে গেছে। চিন্তা, শুধু চিন্তা, আর দুশ্চিন্তা। দিনরাত রাবণের চিতার মত ধিকি ধিকি জ্বলছে। এখন বাতে সর্ব্ব শরীর অকর্ম্মণ্য—

অভয় বলল, আমি এসেছি—আমার মাতৃদায় উদ্ধারের জন্য। কাল ঘাট, পরশু শ্রাদ্ধ। তাই দাঁড়িয়ে থেকে যাতে মাতৃ-দায় হতে উদ্ধার হই, সেই ব্যবস্থা করবেন। দুপুরে যৎসামান্য আয়োজন, দুপুরে নিমন্ত্রণ—তা কাকীমা কোথায়?

—কাকীমা? আর বলিসনে বাবা। কেউ নেই, কেউ নেই। মনাটা তো স্বদেশী করে জেলে পচছে। তোর কাকীমা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, আজ ছমাস হ'ল ভাইয়ের বাড়ীতে চলে গিয়েছে। ছেলেমেয়ে দুটো, তারাও গেছে ওদের মায়ের সঙ্গে। ভাখ্ দেখি কী কাণ্ড। আমি বুড়ো মানুষ, বাতে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছি। এক গেলাস জল ঢেলে খাওয়ার শক্তি নেই। কি করে যে দিনরাত যাচ্ছে তা ভগবান্ই একমাত্র জানেন, আমার কেউ নেই বাবা—যুগলবাবু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

অভয় অবাক্ হয়ে গেল। যুগলকাকার কী পরিবর্ত্তন। মনে মনে ভাবল অভয়, বোধকরি যুগলকাকার কপালে রোজ ভাতও জোটে না। হয়ত, কোনদিন হোঁচট খেয়ে ঘরের মধ্যেই মরে থাকবেন। কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যুগলকাকার সেই মূর্ত্তি আর আজকের চেহারায় কত না বিরাট্ পরিবর্ত্তন। অভয়ের মনে খুব দুঃখ হ'ল। এ কি করুণ চেহারা, আর স্বভাবের কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

মন্মথর খবর জেনেছে অভয়। আলিপুর জেলে নাকি আছে। ওর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ। মনাদা, কোন চিঠিপত্র দেয় না। মন্মথর সেই দোকানঘরটার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ঘরের জানালা দরজা সব গেছে। মাত্র মাটির দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর চালে খড় পর্য্যন্ত নেই। এখন বেওয়ারিশ কুকুর গরু ছাগলের এটা আস্তানা। ঘরের চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ, পায়ে চলা রাস্তাটুকু পর্য্যন্ত ঘাসে আর জঙ্গলে ঢেকে গেছে। অভয় চুপ করে দাঁড়াল।

একবার রথের মেলায় সময়, মনাদা—সখ করে, ফুলগাছ কিনে ফুলের বাগান করেছিল। হাঁ—সেই বাগান তো এইখানেই ছিল। জঙ্গলের জন্য আর কিছু দেখা যায় না। গোলাপ গাছ ছিল, আর ছিল রজনীগন্ধা আর বেলফুলের গাছ। না—এখন আর কিছুই নেই। হয় কেউ তুলে নিয়ে গেছে,নতুবা অযত্নে সব মরে গেছে। এই ফুলবাগানটার ওপর মনাদার কী অসম্ভব মমতাই না ছিল। কত ফুল ফুটত—একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল অভয়ের বুক থেকে। কতদিন কেটে গেল, আশ্চর্য্য, এই পৃথিবী কত দ্রুত সরে যাচ্ছে আর কত তাড়াতাড়ি না এর পরিবর্ত্তন হচ্ছে। অভয় চুপ করে ভাবতে থাকে। এই কিছুদিন আগেও তার মা ছিল। যেখানেই সে থাক না, তার মনপ্রাণ পড়ে থাকত বাড়ীর দিকে আর মায়ের কাছে। সে বুঝত, তার মার মনও পড়ে থাকত, তার দিকে। একসূত্রে বাঁধা ছিল মা আর ছেলের প্রাণ। কিন্তু সেই সুতোগাছটি ছিঁড়ে গেছে। এখন মায়ের মত আর কে তার পথ চেয়ে থাকবে, তেমন করে কে আর ডাকবে। খোকা—খোকা—। বাবা অভয় এলি—। সে গরীবের ছেলে, আর তার মা গরীবের স্ত্রী; গরীবের মা। দারিদ্র্য যে কি জিনিষ; সব সে দেখেছে। অভয় নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করে।

নিস্তব্ধ ঘর। চারদিকে শ্রাদ্ধের উপকরণ। সরোজিনীর শ্রাদ্ধ, যিনি এখন সমস্ত মায়া মমতা, বন্ধন ত্যাগ করেছেন, চিতার অগ্নিতে যাঁর নশ্বরদেহ ভস্মীভূত—আর যাঁর আত্মা আজ মহাকাশে বিলীন। সেই দেহহীন কায়াহীন সরোজিনীর স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে পুত্রের অশ্রুসজল প্রার্থনা তাঁর আত্মা শান্তি পাক,—তাঁর অমর আত্মা যেন ঈশ্বরের দয়া লাভ করে। পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠের মন্ত্র সারা গৃহকে যেন প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, অলক্ষিতে সরোজিনী এসে দাঁড়িয়ে, যেন স্বহস্তে পুত্রের দেওয়া পিণ্ড গ্রহণ করছেন। যেন তিনি তৃপ্ত, যেন আনন্দিত। গোপেশ্বরের পাশে, গীতা খোকন চুপ করে বসে আছে। মাতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে করতে বার বার কাঁদছে অভয়।

প্রতিবেশিনীরা বলল, কেঁদ না বাবা। এখন চোখের জল ফেললে এতে তোমার মায়েরই কষ্ট হবে—

তিনি ঠিক এসেছেন। তিনি সব দেখছেন—সব শুনছেন। তিনি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছেন—

পুরোহিতের কাজ শেষ হ'ল। নিজের পাওনাগণ্ডা গোছাতে গোছাতে বললেন, বাবা, ভগবানের এই লীলা। জগৎ সংসার চিরকাল এমনি ভাবেই চলছে। নদীর জল ছুটে চলেছে, কোথায় যে যাচ্ছে কে জানে। এই দৃশ্যময় জগতের ওপর সেই সূক্ষ্ম জগৎ। ওঁরা আছেন বৈ কি বাবা। সবই সত্যি, সবই সত্যি। অভয়ের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল তার মা যেন ঠিক তেমনি ভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথায় ঘোমটা—হাতে লোহা আর শাঁখা। মাথায় সিঁদুর। কিন্তু মুখ যেন বড় বিষণ্ণ—তিনি অপলকনেত্রে শুধু তাকিয়ে আছেন।

—মা—মা—। অভয় কেঁদে উঠতেই, গোপেশ্বর বললেন, বাবা, অত উতলা হ'লে চলবে না। তুমি বড় হয়েছ, তুমি যদি উতলা হও, তবে এই ছোট ভাইবোন, ওরা যে কেঁদে হাট বসাবে। এখনও যে অনেক কাজ বাকী। পুরোহিত মশাই উঠে দাঁড়ালেন। নিজের পোঁটলা পুঁটলী দুহাতে নিয়ে বললেন, হাঁ উতলা হলে চলবে না। এই তো সংসার—আর এই নিয়ম। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও আমরা মৃত্যুকে ভুলে থাকি। অবশ্য তিনিই ভুলিয়ে রেখেছেন। সংসারে নিজেকে অমর ভেবে, কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে যেতে হবে। ফলাফল কি তা তাঁর ওপর নির্ভর করতে হবে। আচ্ছা, এখন আসি বাবা—হাঁ, এখন অভয়কে জলটল খেতে দাও। তারপর —হাঁ কাল যথাসময়েই আসব আমি। কোন প্রকারে দায় উদ্ধার করতে হবে, বুঝলে গোপেশ। ভাল কথা তোমার দাদা বোধ হয় আসছেন না—

গোপেশ্বর বললেন, দাদা টাকা পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, এখন যাওয়া অসম্ভব—খুব কাজের চাপ—

— তাই ত গোপেশ। তোমার অন্তরেরও তো ছুটি ফুরিয়ে এল। এখন এই দুটীর তুমি একাধারে মা-বাবা। কি আর করবে বল। নারায়ণ—নারায়ণ—সবই বিধাতা পুরুষের খেলা—

তাঁর খেলাই বটে। কিন্তু এই খেলার ধকল যে কত কঠিন, কত দুঃসহ কাজ, তা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। সংসারের প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণার মাঝে, নূতন করে আর একটা বিপদ্ দাঁড়াল গোপেশ্বরের সম্মুখে। এতদিন সংসারের, সব কিছু দেখাশোনার মালিক ছিল। সরোজিনী। এখন একজন লোকের অবর্তমানে আজ গোপেশ্বর চারদিক্ অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

রান্না করা, বাটনা বাটা, জল তোলা, গরুবাছুরের যত্ন এ সমস্তই করতেন সরোজিনী। গোপেশ্বর বাইরে বাইরে ঘুরতেন সামান্য জমিজমা, আওলাতি গাছ, বাঁশ প্রভৃতির দেখাশোনা এসব করতেন। নিজের একখানি ছোট্ট দোকান আছে, তার কেনাবেচা, হিসাবপত্র রাখা, শহর থেকে মালপত্র আনা এসব নিজেই করতেন। কিন্তু এখন উপায় কি? গীতাকেই এখন সংসারের ভার নিতে হবে। শুধু ভয় রান্না করার ব্যাপারে। ঐ অতটুকু মেয়ে, হয়ত উনুন ধরাতে গিয়ে, বা রান্না করতে গিয়ে কোন দুর্ঘটনা না করে বসে। দীনদুঃখীর কপাল এমনিই খারাপ। কথায় আছে না, তুমি যাও বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে। অদৃষ্ট যদি ভাল হ'ত, তবে এমন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হত না। কিন্তু এখন আর হা-হুতাশ করে কোনও লাভ নেই। মানুষ অবস্থার দাস, সেই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারলেই বিপদ্।

পায়ে পায়ে সময় চলে যায়। সময় তো কারুর জন্যে বসে থাকবে না। মহাকালের কালো বুকে এমনি কত শত সহস্র মৃত্যু কোথায় হারিয়ে গেছে কে তার সন্ধান জানে? চোখের জল, বুকের জ্বালা, সবই একদিন শুকিয়ে যাবে। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ আবার হাসবে, আবার সব ভুলে যাবে। ক্রমশঃ

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ৭ ॥

২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল।

কংগ্রেসে বিবেচনা করে গ্রহণ করার জন্য বার্লিন থেকে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করতে হবে। এই দাবি কার্য্যে পরিণত করার জন্য একটি কর্মসূচীর খসড়াও তিনি পাঠিয়েছিলেন। কেউ তাঁর প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব দিলেন না।

অন্যান্যবারের মত এবারও কোন সংবাদিককে বিষয়-নির্বাচনীর অধিবেশনে প্রবেশপত্র দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র ১২০ জন দর্শককে ঐ সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

স্বরাজ্যপুরীর সম্মুখে বিষয়-নির্বাচনী সভার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্যাণ্ডেল নির্মিত হয়েছিল।

বিষয়-নির্বাচনী সভার কার্য্য আরম্ভ হলে—প্রথমেই কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্নে উভয় দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা বিভিন্ন নেতা করতে লাগলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না।

এদিন কোন বিতর্কমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করা হল না। কেবলমাত্র গাজী কামাল পাশা ও তুর্কীর জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন, দেশের জন্য যাঁরা স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করেছেন তাঁদের এবং অহিংসা ও নির্ভীকতার জন্য আকালীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন সম্বন্ধে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে কংগ্রেসে উপস্থিত করার জন্য গৃহীত হল।

সেদিনকার মত বিষয়-নির্বাচনী সভা শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন নেতারা উভয় দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। উভয় দলের নেতারাও পৃথক্ পৃথক্ স্থানে মিলিত হয়ে এসম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। দেশবন্ধুর বাসগৃহে কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতীরা এক বৈঠক মিলিত হয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনা করেন। কংগ্রেসে তাঁরা যদি হেরে যান তাহলে তাঁদের কর্মপদ্ধতি কি হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে স্থির করা হল যে সে-ক্ষেত্রে তাঁরা সংখ্যাধিক দলের অনুকূলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকর পদ ত্যাগ করবেন।

কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী দলও পৃথক্ ভাবে মিলিত হয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করতে লাগলেন।

২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ পুনরায় বিষয়-নির্বাচনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হল। রাজাগোপালাচারী মশায় প্রস্তাব করলেন যে—কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্নটি প্রথমে আলোচনা করা হোক। সভাপতি এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেন যে, গুরুতর প্রশ্নগুলির আলোচনার পূর্বে তাঁকে প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করার জন্য সৌজন্য প্রকাশ করা কর্তব্য। সুতরাং আর কোন গুরুতর প্রস্তাব এদিন আলোচনা

হল না। মাত্র ব্রিটিশ পণ্য বয়কট সম্বন্ধে প্রস্তাবের উপর আলোচনা হল। রাত্রি অধিক হওয়ায় সেদিনের মত সভা বন্ধ করে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হল।

পরদিন প্রাতঃকাল ৯টা নাগাদ পুনরায় বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল। পূর্বদিনের ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আলোচনা আরম্ভ হল। আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হল। তার পর সেদিনের মত সভা কার্য্য শেষ হল। স্থির হল ২৬শে তারিখ প্রথম দিনের কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের পর পুনরায় বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সভা হবে।

॥ ৮ ॥

কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছিল ২৬শে ডিসেম্বর। নির্দিষ্ট সময় দুটোর বহু পূর্ব থেকেই প্রতিনিধি ও দর্শক দ্বারা প্যাণ্ডেল পরিপূর্ণ হয়েছিল। আমরা যখন প্রায় ১টার সময় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করি তখন দেখলাম যে, দর্শকের স্থান সম্পূর্ণ ভরে গিয়েছে, গ্যালারির মধ্যবর্তী খালি জায়গাগুলিও দর্শক দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল।

কংগ্রেসে মহিলাদের উপস্থিতির সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিল। এবার প্রায় ১০০ পর্দানশীন মহিলা সহ ৫০০ মহিলা কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

খদ্দরের সামিয়ানা যুক্ত সুবৃহৎ প্যাণ্ডেল নির্মিত হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের প্রবেশদ্বার বৌদ্ধ স্থাপত্য-রীতি অনুসারে নির্মিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। তোরণ দ্বারে মহাত্মা গান্ধীর সুবৃহৎ আলেখ্য চিত্র রাখা হয়েছিল।

প্রবেশদ্বার থেকে প্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে পুষ্পোদ্যান শোভিত স্থানে চারটি ফোয়ারা সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে "দেশের জন্যই সুনাগরিকের জীবন", "হিন্দু-মুসলমান ঐক্য মহাত্মার মানস সন্তান", "জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মরণ কর", "গভর্ণমেন্টের প্রদত্ত উপাধি দাসত্বের প্রতীক চিহ্ন"। "ওঠে, জাগো এবং উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্য্যন্ত গতিরোধ করো না", "দেশের ভবিষ্যৎ মহিলাদের হাতে", "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার" প্রভৃতি শ্লোগান বড় বড় বোর্ডে লিখে প্যাণ্ডেলের ভিতর টাঙ্গানো হয়েছিল।

বেলা ২টার অনেকটা আগেই পুরোভাগে আমেদাবাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও বয় স্কাউটদের ব্যাণ্ড পার্টি এবং পশ্চাতে সি রাজাগোপালাচারী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, সি বিজয়রাঘবাচারিয়ার, এন সি কেলকার ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সহ শোভাযাত্রা সহকারে বিপুল অভ্যর্থনা ও "দেশবন্ধু দাশ কি জয়" ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে তাঁর জন্য রক্ষিত আসনে উপবেশন করলেন।

ক্রমে অন্যান্য নেতারা এসে ডায়াসে আসন গ্রহণ করলেন। যখন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী (পরবর্তী কালে তিনি কস্তুরবা গান্ধী নামে উল্লিখিত হতেন) প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হল।

ডায়াসে যাঁরা আসন গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ, সি বিজয় রাঘবচারিয়ার, ডাক্তার এম্ এ আনসারী, ডঃ মামুদ, এন্ সি কেলকার, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, সি রাজা-গোপালাচারী, মজহর উল হক্, শেঠ, যমনালাল বাজাজ, লালা দুনী-চাঁদ, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, অখিল চন্দ্র দত্ত, এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, অভয়ঙ্কর, এস্ সত্য-মূর্তি, এফ্ আব্বাস তায়েবজী, কে শান্তনম, সি এস্ রঙ্গ আয়ার, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, এম্, আর জয়াকর, প্রফেসর তেজা সিং, কে, নটরাজন্। এস শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বেগম হসরত মোহানী, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহেরু, চন্দ্র বংশী সহায়, অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, সর্দার গুরুবক্স সিং, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি। ডারবান হ'তে আগত

কয়েকজন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ২টার সময় স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ গায়ক ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে কয়েক জন বাঙালী, মহিলা বন্দে মাতরম্ গাইলেন। বন্দেমাতরম্ গাওয়ার সময় সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের বিখ্যাত গায়ক বিষ্ণু দিগম্বর উদাত্ত কণ্ঠে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। তার পর শ্রীমতী তায়েবজী দ্বারা মর্মস্পর্শী সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কার্য্যে আরম্ভ হল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাবু ব্রিজ কিশোর প্রসাদ হিন্দীতে তাঁর অভিভষণ পাঠ করলেন।

সভাপতি মশায়কে যথারীতি অভ্যর্থনা করার পরে তিনি বললেন যে অভিজ্ঞতার অভাবে কংগ্রেসের অয়োজনে তাঁদের অনেক ত্রুটী হয়েছে। তজ্জন্য তিনি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

তারপর তিনি পবিত্র গয়া নগরের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, এই নগরেই বুদ্ধদেব তাঁর পরম আত্মোপলব্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি জানালেন যে, এই বিহার প্রদেশেই দক্ষিণ আফ্রিকা হতে প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধী তাঁর নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসারে কাজ শুরু করেছিলেন।

তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের কাজ প্রস্তাব পাশ, গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন নিবেদন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে আলোচনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কংগ্রেসের এই কার্যক্রমকেই স্যর আশুতোষ চৌধুরী রাজনৈতিক ভিক্ষা আখ্যা দিয়েছিলেন। মহাত্মাই নূতন পথ দেখিয়ে আমাদের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সফল করার উপায় স্বরূপ অসহযোগ নীতি গ্রহণ করতে কংগ্রেসকে সম্মত করেছিলেন। তারপর তিনি বিস্তারিত ভাবে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে বললেন।

তারপর তিনি গ্রামগুলিকে সংঘবদ্ধ করার কথা বলে জানালেন, এই কাজ বিশেষ ভাবে আবশ্যক, কারণ, দেশের জনসাধারণকে সঙ্গে না পেলে স্বরাজ অর্জন করা যাবে না।

ব্যক্তিগত আইন অমান্যের তিনি বিরূপ সমালোচনা করে বললেন, স্বরাজ পিকেটিং বা আইন অমান্য দ্বারা অর্জন করা যাবে না। কাজটি এত সোজা নয়। স্বরাজ অর্জনের জন্য চাই ভীষ্মের মত অনমনীয় প্রতিজ্ঞা এবং ভগীরথের মত অদম্য মনোবল।

তারপর তিনি কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করছেন, যে অসহযোগ আন্দোলনের পবিত্রকারী প্রভাব আমাদের কতক বন্ধুকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁরা মহাত্মার বাণী গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছেন। জয়াকর মশায়ের মত যারা মনে করেন যে জনগণের প্রতিভূ স্বরূপ দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মত নেতারা কাউন্সিলে প্রবেশ করলে তাঁরা গভর্ণমেন্টকে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন তাঁদের এই ভ্রান্ত মত তিনি অনেকগুলি যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করলেন।

তিনি দৃঢ়তার সহিত বললেন, যদি তাঁরা সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সকলকে নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন বা জনসাধারণকে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তা হলে কাউন্সিল প্রবেশের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

অবশেষে তিনি জানালেন যে, কংগ্রেসের রায় যাই হোক না কেন, তাতে যেন তাঁদের উল্লাসিত বা ভগ্নমনোরথ না করে। যদি কংগ্রেস কাউন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে ভোট দেয় তা হলে তাঁদের মধ্যে যারা গঠনমূলক কর্মসূচীর সাফল্যে বিশ্বাসী, এবং তাই স্বরাজের প্রকৃত পন্থা মনে করেন, তাঁরা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে তাঁদের কাজ ভাগ করে নেবেন এবং সেই কর্মসূচী কার্য্যে পরিণত করতে তাঁরা মনোনিবেশ করবেন এবং যারা কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে তাঁরা নির্বাচনপ্রার্থী হবেন এবং কাউন্সিলের ভিতরে তাঁদের কর্মসূচীর পরীক্ষা দেবেন।

উপসংহারে তিনি আবেদন করলেন, যাতে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত কংগ্রেসের কাজ হিন্দীতে পরিচালিত হয়। অতঃপর তিনি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন।

অভিভাষণের পর ব্রিজ কিশোর বাবু সভাপতি মশায়ের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন এবং তাঁর জামার বুকে সভাপতির ব্যাজ, একটি সুন্দর কারুকার্য্য, শোভিত তারকা এঁটে দিলেন। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, সভাপতি মশায় তাঁর ভাষণ এখন দেবেন।

মুহুর্মুহু কর্ণবিদারক 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ও 'দেশবন্ধু কি জয়' ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায় বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন।

তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখিত তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন।

প্রথমেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের কথার উল্লেখ করলেন। তিনি জানালেন যে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় সংগ্রামের পর মহাত্মা ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এই বৎসর কংগ্রেসের কার্য্য চালনার সময় তাঁরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন।

এই রকম মর্মস্পর্শী, উচ্চমনা, মহিমাময় অনুরূপ কাহিনীর জন্য তাঁদের দু হাজার বৎসরের পূর্বে যেতে হবে, যখন নাজারেথের যিশু জনগণকে বিপথগামী করার অভিযোগে বিদেশী আদালতে বিচারের জন্য আনীত হয়েছিলেন। যখন যিশু গভর্ণরের সম্মুখে দাঁড়ালেন তখন গভর্ণর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ইহুদীদের রাজা?" যিশু উত্তর দিলেন, "তুমি বলছ।" যখন প্রধান প্রধান পুরোহিত ও মাতব্বরেরা তাঁর উপর দোষারোপ করল তখন গভর্ণর পন্টিয়াস পাইলট বললেন, "তুমি কি শোন নি তোমার বিরুদ্ধে কত কথা সাক্ষীরা বলল?" তখন তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এতে গভর্ণর বিস্ময়ে অবাক্ হয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর দোষ স্বীকার করেছিলেন কিন্তু বলেছিলেন যে যদি তিনি ব্যুরোক্রেসির আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন তাহলে সেই বিরুদ্ধাচরণ করাতে তিনি ঈশ্বরের আইনই মেনে নিয়েছেন। সভাপতি দেশবন্ধুর অনুমান যে, যে-জজ তাঁর (মহাত্মার) বিচার করেছেন এবং কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন তিনিও পাইলটের মতই বিস্মিত হয়েছিলেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহান্ এবং তা কার্য্যকর করতে মহান্ মহাত্মা গান্ধী দেশের জন্য যে শেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তাতে তাঁর অতুলনীয় মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীতে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাঁদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অবিসম্বাদিত ভাবে তিনি তাঁদের অন্যতম পৃথিবীতে তাঁর দরকার আছে। যে জাতিকে তিনি জয়ের পর জয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব করেছেন সে জাতি তাঁকে বর্তমানে এবং সর্বকালে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে।

তারপর তিনি বিস্তারিত ভাবে আইন ও শৃঙ্খলার কথা আলোচনা করে এই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যুরোক্রেসিকে সমর্থনের জন্য মডারেটদের সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, যেখানে স্বাধীনতা এসেছে সেখানে, সে সকল আইন আইন ও শৃঙ্খলার জন্য তৈরি হয়েছিল সেই সকল আইন ভেঙেই এসেছে। যখন গভর্ণমেন্ট স্বেচ্ছাচারী ও অনাচারী এবং যখন জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে না তখন আইন ও শৃঙ্খলার কথা বলা বৃথা। তাঁর এই মতের পোষকতার জন্য বহু দেশের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিলেন। তিনি বললেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক জাতির বে-আইনী আইন প্রবর্তনে বাধা দেওয়ার অধিকার আছে। আসল কথা হচ্ছে মানুষের জন্যই আইন ও শৃঙ্খলা—আইন ও শৃঙ্খলার জন্য মানুষ নয়।

তার পর তিনি জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, পূর্বাপর ভারতের ইতিহাসে তিনি একটি উদ্দেশ্যই প্রকাশিত হতে দেখেছেন। দেশের উপর দিয়ে ঝড়ের পর ঝড় বয়ে গিয়েছে। আপাততঃ মনে হয়েছে যে, এতে পরস্পর-

বিরোধী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়ে জনগনকে একটি বৃহৎ জাতিতে পরিণত করেছে। আর্য্য ও অনার্য্যের সংঘর্ষের ফলও তাদের এক জাতিতে পরিণত করা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার সুমহৎ কৃষ্টি দ্বারা সমস্ত ভারতকে এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাই একটি বড় রকমের জাতীয়করণের শক্তি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ ধর্মও সেই ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সফল করেছে। বৌদ্ধধর্মের ফলে মগধ থেকে তক্ষশীলা পর্য্যন্ত একটি বৌদ্ধ সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এতে কেবল মাত্র ভারতের ঐক্য দৃঢ় করেনি। হিমালয় লঙ্ঘন করে এশিয়ায় এবং সমুদ্রের পরপারে বৃহত্তর ভারত সৃষ্টি করেছে। এর ফলে আমরা যে পুণ্য নগরে মিলিত হয়েছি সেই নগর এশিয়ার বিভিন্ন জাতির লক্ষ লক্ষ মানবের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। তার পর একই কৃষ্টি সম্পন্ন বিভিন্ন জাতির মুসলমানরা ভারতবর্ষে এসে এখানকারই বাসিন্দা হলেন। তাঁরা ভারতের জনজীবনে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, আশ্চর্য্য সজীবতা এনে দিলেন। কিন্তু যেখানে আসল ভারতবর্ষ, সেই গ্রামগুলির জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়নি। তারপর এল ইংরেজ। তারা তাদের বৈদেশিক সভ্যতা ও প্রথা প্রচলন করে দেশের জাতীয়তার মূলে রূঢ় আঘাত করল, কিন্তু সেই আঘাতের ফলে—ভারতের ঐক্যকরণ সম্পূর্ণ হল। ইতিহাসের উদ্দেশ্য প্রায় সিদ্ধ হয়েছে। মহান্ ভারতীয় জাতীয়তা—আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই জাতীয়তার প্রশ্নও যা, স্বরাজলাভের প্রশ্নও তাই।

তারপর তিনি অহিংস অসহযোগের পন্থা সমর্থন করে বললেন যে, স্বরাজলাভের পক্ষে এই হল পথ।

তারপর তিনি ফরাসী দেশ, ইংলণ্ড, ইটালী ও রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করে বললেন যে, তিনি বিপ্লবে বিশ্বাস করেন কিন্তু হিংসামূলক কাজ স্বাধীনতা নষ্ট করে। অহিংসার পথে বিপ্লবের গতি মন্থর কিন্তু সুনিশ্চিত।

পিতামাতা গুরুজনদের বাক্য অমান্য করার জন্য যুবকদের যে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেন। এই কার্য্যের অনুকূলে প্রত্যেক ধর্মান্দোলনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে তিনি বললেন, স্বরাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে তাদের সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা কাজ আরম্ভ করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট (চুক্তি) আরও স্পষ্ট ও জোরের সঙ্গে পুনঃ স্বীকার করা প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমানকে তাদের পরস্পরের অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। এর জন্য তাদের যদি কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাও করতে হবে। হিন্দু ও মুসলমান ভারতের জনগণের সুবৃহৎ অংশ সুতরাং তাদের সংখ্যা-লঘু শিখ, খৃষ্টান পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়কে স্বরাজ গভর্ণমেন্টের আমলে তাদের সংখ্যার অনুপাতিক প্রাপ্য অংশ থেকে বেশী দিতে হবে। তিনি খৃষ্টান সম্প্রদায় বলতে যে খাঁটি ভারতীয় খৃষ্টান মনে করেন তা নয়। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ইঙ্গ-ভারতীয় এবং যাঁরা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ মেনে নিয়েছেন তাঁরাও অন্তর্গত।

তারপর তিনি বিদেশগুলিতে প্রচার কার্য্য চালানোর আবশ্যকতার কথা বললেন এবং নির্মীয়মাণ গ্রেট এশিয়ান ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার জন্য জোর দিলেন।

তিনি পাঞ্জাবে ও খিলাফতের অন্যায়ের প্রতিকার দাবি করলেন।

তিনি ভবিষ্যৎ ভারত গভর্ণমেন্টের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত করলেন।

সভাপতি মশায় তারপর এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় কাউনসিলে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, এই প্রশ্ন উপলক্ষে কংগ্রেসের ভিতর 'প্রো-চেঞ্জার' ও 'নো-চেঞ্জার' নামে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। দেশময় তর্ক-বিতর্ক চলছে যে কাউনসিলে প্রবেশ অহিংস

অসহযোগ নীতির অন্তর্গত কি না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে' এ অসহযোগ নীতির পরিপন্থী নয়। এ সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত ভাবে বললেন। সংশোধিত বিধানসভাগুলিতে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা না দেওয়ার নীতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করলেন। ট্যাক্সের গুরুভার আরও বাড়বে। তিনি আশঙ্কা করেন যে, এর ফলে যে জনগণ এখন তাঁদের সঙ্গে আছে তাদের সমর্থন তাঁরা হারাবেন।

তিনি কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানালেন যে, যদি ব্যুরোক্রেসী দেশের দাবি না মানে তাহলে কাউনসিল-প্রবেশ-পন্থীদের কাউনসিলে প্রবেশ করে সেগুলি ধ্বংস করার অনুমতি দিন।

তারপর তিনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে বললেন।

স্কুল ও কলেজের বয়কট ও আইনজীবীদের আদালত বয়কট চালিয়ে যাওয়ার তিনি পক্ষপাতী। তিনি খদ্দর সম্বন্ধে বললেন, যেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খদ্দর উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা হয়।

উপসংহারে তিনি বললেন যে, যদিও বর্তমান আন্দোলনের বিশেষ সুস্পষ্ট সাফল্য দেখানো যাবে না তাহলেও এর সফলতা নিশ্চিত।

তার পর তিনি সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে সম্বোধন করে বললেন যে, সত্য ও ন্যায়ের জন্য আপনারা নিজকে বলিরূপে উৎসর্গ করুন যাতে আপনাদের সন্তান-সন্ততিগণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিগণ আপনাদের দুঃখভোগের ফল লাভ করতে পারে। আপনারা ন্যায়ধর্মানুসারে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করুন, যাতে যখন জয়লাভ হবে তখন যেন তা আপনাদের কলুষিত না করে অথবা গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নিজ হাতে রাখার জন্য প্রলুব্ধ না করে। আপনাদের সংগ্রাম যদি আধ্যাত্মিক হয় তাহলে আপনাদের অস্ত্রও হবে আধ্যাত্মিক সৈন্যদের উপযোগী। আপনাদের জন্য ক্রোধ নয়, ঘৃণা নয়, ক্ষুদ্রতা নয়- নীচতা নয় অথবা মিথ্যাচরণ নয়। আপনাদের জন্য উষা-সমাগমের আশা ও রাত্রি-অবসানের বিশ্বাস।

তিনি 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণে করে তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন।

একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সেদিনের মত সভা শেষ হল। ক্রমশঃ

পুণা আশ্রমে

দিলীপকুমার রায়

এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার ফলে কালীদাকে আমরা বরণ ক'রে নিলাম নিটোল আনন্দে। আমার সর্বপ্রথম —অনেকের মতে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ—রমন্যাস 'অঘটন আজো ঘটে' কালীদাকে উৎসর্গ করেছি এই বরমাল্যে :

সাধনায় কেউ পায় জ্ঞান, কেউ প্রতিভা, কেউ ভক্তি,
আরো কত কি—যা অপরে পারে না জানতে।
আমরা কিন্তু জেনেছি যে, তুমি পেয়েছ প্রেমের শক্তি—
পরকে আপন ক'রে নিয়ে কাছে টানতে।
দিয়েছ শান্তি হে গুপ্তযোগী, কত অশান্ত পান্থে
মুক্তির দিশা দেখায়ে তোমার জীবনের দৃষ্টান্তে!

সমাজে সভায় মেলামেশায় আড্ডায় কালীদা সত্যিই গুপ্তযোগীর মতন আচরণ করতেন—মানে, সাধারণের সামনে। তবে যাঁদের ভালোবেসে কাছে টানতেন তাঁদের অনেকেই অনুভব করেছেন তাঁর অসামান্য প্রেমের টান। 'আমাদের কালীদা' ব'লে তাঁকে ডাকত সবাই। নানা দেশ থেকে নানা যোগী তপস্বী তথা জ্ঞানার্থী তাঁর কাছে আসত। এসে যে অনেক কিছু পেত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সব আগে পেত তাঁর স্নেহ স্পর্শ। স্নেহ দানে কালীদার বাছবিচার ছিল না। তাঁর ব্যক্তিরূপে সত্যিই জ্বলত প্রেমের অমলিন রংমশাল। তিনি এক বিদেহী মহাযোগীর সংস্পর্শে এসে যোগী ব'নে গিয়েছিলেন শুনেছি। তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর এক প্রিয় শিষ্য কবি বিভূপদ তাঁর কীর্তি যোগীজীবনের ঈষৎ আভাষ দেন। এ ছাড়া তাঁর অন্তর সাধনার কোনো ইতিহাসই কেউ লেখেনি—জানত না লিখবে কোত্থেকে? মনে হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ কিঞ্চিৎ জানেন, কারণ এঁদের সঙ্গে কালীদার নিরালায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা হ'ত। কিন্তু তাঁরা কেউই আজ পর্যন্ত কিছু লেখেননি। এজন্যে আমি দুঃখবোধ করেছি—তবে মনে হয়—কালীদা ধরা দিতে চাইতেন না ব'লেই তাঁর 'বন্ধু'-র কথা নিজেও লেখেননি বা (বিভূপদবাবু ছাড়া) কাউকে দিয়ে লেখান নি শেষ পর্যন্ত। তিনি সম্ভবতঃ চেয়েছিলেন যে, তাঁর দেহান্তের পর 'বন্ধু'-কাহিনীর রোমান্স প্রকাশ হবে কেবলমাত্র বিভূপদবাবুর মাধ্যমে। কিন্তু এসব জল্পনাকল্পনা অবান্তর না, হলেও নীরস। আনন্দের কথা এই যে, ৺বিভূপদবাবুর "আমাদের কালীদা" আত্মপ্রকাশ করেছে ১৯৬৯ সালে, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, সুব্রত কীর্তি, ১৯ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য ৫ টাকা। এবং এতে অনেক মূল্যবান্ তথ্য আছে—কালীদার সাধনা সম্বন্ধে—বিশেষ ক'রে তাঁর কাছে আবির্ভূত হতেন যে-মহাযোগী তাঁর বাণী, যার নামকরণ করেছেন কালীদা —'বন্ধু'। কে এ-বন্ধু কেউ জানে না, কিন্তু বইটিতে বিভূপদবাবু কিছু সংবাদ দিয়েছেন যা পড়লে মন ভরসা পায় ভাবতে যে, এরকম দৈবী আবির্ভাব সম্ভব—এ-কালযুগেও যার উপাস্য নাস্তিক বস্তুতান্ত্রিকতা। ইন্দিরার কাছে যেমন আসেন শ্রীমীরা, কালীদার কাছে তেমনি আসতেন শ্রী'বন্ধু'—যাঁর দীক্ষায় কালীদা যোগব্রতী হয়েছিলেন। এ সংবাদটিও আমরা প্রথম পাই বিভূপদবাবুকে স্বাক্ষরিত, ওঁর কালীদার ভাষণের অনুলিপিতে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এ বিদেহী 'বন্ধু' কালীদার কাছে এসেছিলেন ভাগবতী করুণায় তাঁকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে দিতে। একদা বিভূপদবাবু কালীদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "বন্ধুর সঙ্গে আপনার রাত্রিদিনের অনেকখানি সময় কাটে। তখন আপনারা কি করেন কি বলেন জানতে ইচ্ছা করে।" কালীদা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন (২২ পৃষ্ঠা.): "এর্বকথা

বা তত্ত্বকথা বলতে যা বোঝায় সে-সবের কিছুই হয় না। বন্ধু বলেন আকাশের কথা, আলোর কথা, রৌদ্র-মেঘের লুকোচুরি খেলার কথা, মাঠ ঘাট নদী ঝর্ণা পাহাড় পর্বতের কথা, দিবারাত্রির অভিসারের কথা—আরই তারই ফাঁকে ফাঁকে বলেন মানুষের আনন্দ-বেদনার অফুরন্ত কাহিনী, জীবনের আদি-অন্তহীন কাব্যকথা। গানের পর গান গেয়ে যান [মনে করিয়ে দেয় ইন্দিরার কাছে মীরার গানের পর গান গাওয়ার কথা] ‘আর আমি তন্ময় হয়ে শুনি। আশ্চর্য্য, তাঁর ভাষার ইন্দ্রজালে আমি প্রহরের পর প্রহর ধ'রে নিজেকে ভুলে থাকি। অনুপম সেই কণ্ঠের ঝঙ্কারে আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত সম্মোহিত হয়ে যাই। আমার সাধনার ধন যে বাংলাভাষা, তাকে যেন নতুন ক'রে পলে পলে আবিষ্কার করছি তাঁর মুখের কথায়, তাঁর অপরূপ শব্দবিন্যাসে। সন্দেহ জাগে, এ কি সেই পরিচিত বাংলা ভাষা না দেবভাষা? আমার মাতৃভাষার যে এত ঐশ্বর্য, এত মাধুর্য থাকতে পারে, বন্ধুর মুখে না শুনলে তা কোনোদিন আমি অনুভব করতে পারতাম না। সহজ সরল ছোট ছোট কথাগুলি যেন প্রাণের গভীর থেকে এসে সারা প্রাণকে মাতিয়ে দিয়ে যায়: সত্যের আলোকে ঝলমল ক'রে ওঠে। ইচ্ছা করে তাঁর সেই অনুপম কথাগুলি সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাই। কিন্তু তা তো আর হবার নয়।”

আমি বললাম, “কালীদা, যদি বাধা না থাকে আপনি আমাদের সেই সব কথার কিছু শোনাতে পারেন”। [২৩ পৃষ্ঠা।]

কালীদা বললেন, “তা কি আর বলা যায়? কার ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে? আমারই কথা ভেবে দেখুন। আমি সাধু সন্ন্যাসী কিছুই তো নই। কোনো ধর্মশাস্ত্রের পাতা উল্টে দেখি নি। স্বদেশী করেছি, রীতিমত সংসার করেছি, সাহিত্য করেছি, আসর জমিয়ে আড্ডা দিয়েছি, কোনো রকম ধর্মকর্মের ধার দিয়েও কখনো যাইনি, ঠাকুর দেবতাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিনি। তবু তো আমার ভাগ্যে বন্ধুর আবির্ভাবের বাধা হয় নি। বন্ধু তো সেই কথাই বলেন: ‘আমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে কেন? আমিই তো সবাইকে খুঁজে খুঁজে বেড়াই। যখন তখন দ্বারে দ্বারে করাঘাত করি আর হতাশ হ'য়ে ফিরে আসি। যে যার দরজা আগলে ব'সে থাকে ব'লে কোনোখানে প্রবেশের পথ পাই না, তবুও তো আশা ছাড়তে পারি না। দুঃখের দিনে সমবেদনায় পাশে গিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু সাড়া পাই না। আনন্দের দিনে আবার তার কাছে ছুটে যাই, তখনো দেখি আমার দিকে ফিরে তাকাবার তার অবসর নেই। আসে জন্ম, আসে মৃত্যু—প্রভাতের পর আসে রাত্রি। আলোক-স্নাত ধরণীর বুকে আনন্দ-সমারোহে যারা মেতে থাকে, তারাও আমার দিকে তাকায় না; তমসাবৃত রজনীর দুঃখ-পারাবারে যারা হাবুডুবু খায়, তারাও আমার দিকে ফিরে চায় না।” [২৩ পৃষ্ঠা।]

পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয়: এ তো জীবন-দেবতার কথা, যিনি নিরন্তরই চান আমাদের হৃদয়ে ঠাঁই পেতে কিন্তু দ্বার খোলা না পেয়ে ফিরে যান। জীবনদেবতা বা তাঁর প্রতিনিধি—একই কথা, কেননা “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম হন” এ সাক্ষাৎ উপনিষদের ঘোষণা। যেমন I and my Father are one—খৃষ্টদেবের আত্ম-পরিচিতি। যে ঠাকুরকে পায় সে তাঁর সিন্ধু চেতনায় নিজের বিন্দু অহংতা বিসর্জন দিয়ে তাঁর হাতের যন্ত্র হয় জীবন্মুক্ত পদবী পেয়ে। রবীন্দ্রনাথ এই জীবনদেবতার কথা বলেছেন তাঁর কত গানে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কত কবিতায়—বিশেষ ক'রে সাবিত্রীতে। গীতায়ও পাই ঋষিরা নিষ্পাপ হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ ক'রে ফিরে এসে “সর্বভূতহিতে রত” হন—যে-শ্লোকটি একটু আগে উদ্ধৃত করেছি। এই ব্রহ্মনির্বাণের আভাষ দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বহু্ত তাঁর ভাষায় সাবিত্রী-তে:

> The landmarks of the little person fell :
> The island ego joined the continent.

অর্থাৎ কি না, আমাদের বিভূবিচ্ছিন্ন আমি জীবনে দুঃখ পায় ভূমার অসীমার সুধাস্বাদ না পেয়ে। সাধনায় যেমনি এ-আমি-র আড়াল লুপ্ত হয় অমনি আমি-র দ্বীপাবদ্ধ বদ্ধ দুঃখী জীবাত্মা অনন্ত পরমাত্মায় সাযুজ্য

লাভ ক'রে (ভগবানের ভাষায়) "শ্রাতি আনন্দ-সমুদ্রমগ্নাঃ"। কালীদার 'বন্ধু' এই বিভুসাযুজ্য পাবার পর বিভুর প্রতিভূ হয়ে বদ্ধজীবের কাছে ফিরে আসতেন তাদেরকে অসীমার, ভূমার অমৃতস্বাদ দিয়ে ধন্য করতে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে :

সে যে কাছে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি!

তিনি কাছে এসে বসেন তো বারবারই, কিন্তু আমরা যে মোহঘুমে আচ্ছন্ন তাই জানতে পারি না তাঁর সান্নিধ্য। দাদুর একটি গানে আছে, জাগ্রত প্রেমিকের সঙ্গে ঘুমন্ত প্রেমিকার প্রেমলীলা হবে কেমন ক'রে? ইন্দিরার একটি প্রাণস্পর্শী মীরাভজনে আছে (উষাঞ্জলি):

হৈ কৌন য়হ পরদেসি আয়া মেরে দ্বার কে?
'তু খোল দে, তু খোল দে',—গায়ে পুকারকে?
য়হ কৌন সুনে ঘরমে ফির দীপক জলায়ে হৈ?
য়হ কৌন আয়ে হৈ সখী, য়হ কৌন আয়ে হৈ?
আসে) পরদেশী কে অতিথ যে আজ দুয়ারে আমার?
"খোল) খোল দ্বার ওরে"—তারস্বরে ডাকে আনিবার।
আমার) শূন্য ঘরে এলো কে দীপ জ্বালতে অচঞ্চল?
বল্) কে এলো ঐ, বল্ না না সখী আজ এলো কে বল?

কালীদাও বলছেন—'বন্ধু' তাঁর অন্তর-মন্দিরে দীপ জ্বালতেই এসেছিলেন তাঁর ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুলে। যেমন ইন্দিরার মনও মীরাকে অঙ্গীকার করেছিল ব'লেই মীরা ইন্দিরার কাছে এসে তাঁর গানের ডালি উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বন্ধুর তাকেও কালীদা অসীমার (ভূমার) ডাক শুনেছিলেন ব'লেই ঘরে থেকেও হয়েছিলেন ঘরছাড়া, অনিকেত—শুনতে পেয়েছিলেন 'বন্ধু'-র বাণী তাঁর বুকের তারে—যে মহাপ্রেমিক সুহৃৎ হয়েই কালীদার কাছে এসে যেচে ধরা দিয়েছিলেন প্রেমের ঠাকুরকে চাইতে শেখাতে, ভালোবেসেছিলেন ভালোবাসাতে। বলছেন বন্ধু : "তুমি আমার দিকে মুখ না ফেরালে আমি যে নিজেই ব্যর্থ হয়ে যাই, তাই তোমার কাছে আসার পথ নিরন্তর আমাকেই খুঁজে বেড়াতে হয়েছে......তোমার কাছে ধরা দিতে হয়েছে।" (২৫ ও ২৬ পৃঃ।)

এর ফল কী হ'ল? কালীদা সব বন্ধ থেকে চিরমুক্তি পেয়ে হলেন 'নিশ্চিন্ত' (২৬ পৃঃ)—বলছেন বিভুপদ কীর্তিকে যে, বন্ধুর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরে তাঁর "আর করণীয় কী থাকতে পারে? অতএব এবার আমার কথা বাদ দিয়ে বন্ধুর মুখের কথাই বলি :

'তিনি [বন্ধু] সবাইকার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; সবাইকার পিছনে পিছনে ছায়ার মত জড়িয়ে আছেন। যে, যেখানে, যে-অবস্থায় আছে তাঁর সঙ্গেই আছেন।'" (২৭ পৃঃ)।

এই বাণীই তো সদ্গুরুর—যিনি জীবনদেবতার প্রতিনিধি ওরফে ইষ্টেরই একটি বাহ্য রূপ। তাই শ্রীগুরুর মধ্যে যে-ধন্যসাধক ইষ্টকে সত্যি চাক্ষুষ করেছে তার বুকে শ্রীগুরুর দীক্ষায় বেজে উঠবেই গুরুর-গুরু দেবাত্মার ধরা-দেওয়ার সুর। এ-সুরের হাজারো ব্যঞ্জনা বিচার মূর্ছনা, কিন্তু বাদী সুর—প্রেমের খরজ। কালীদা এই বাণীটি বড় সুন্দর ক'রে ফুটিয়েছেন—বন্ধুর আদেশে বলেছেন কালীদা :

"বৃক্ষের যা ধর্ম, মানুষেরও তো ঠিক তাই। ধরিত্রীর কোলে ভূমিষ্ঠ হ'ল যে-শিশুটি, তার পাওয়ার হিসাব সে আর কতটুকু জানে? তবু তো একথা মিথ্যা নয় যে সে তার পারিপার্শ্বিক জগতের কাছে অজস্রভাবে ঋণী। দিনে দিনে সে পরিপুষ্ট হয়েছে স্নেহমমতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে, সবাইকার কাছ থেকে সব কিছু আহরণ ক'রে সে তিলে তিলে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। অনেক পাওয়ার পরিশেষে তারও তো দেওয়ার পালা আসা চাই, নৈলে যে প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ চক্রে ছেদ প'ড়ে যায়। এই অতি সহজ স্বাভাবিক কথাটাই তো বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র মর্মকথা। এইটুকু বুঝলেই তো তত্ত্বজ্ঞানের কিছু বাকি থাকে না, এইটুকু আচরণ করলেই তো সব হয়।"

"তাই তিনি [বন্ধু] বলেন—'দাও, যা কিছু তোমার আছে সবকিছু দাও। সবাইকার যা প্রাপ্য, নিছক

দেওয়ার প্রয়োজন, মুক্তহস্তে দিয়ে তুমি সার্থক হও। পরিপূর্ণভাবে দাও যা কিছু তোমার আছে। দিতেও কার্পণ্য কোরো না প্রাণ, নিতেও কার্পণ্য কোরো না। ভ'রে দাও, নাও; নিজেকে ভুলে গিয়ে ভালোবাসো, সবাইকার ভালোবাসায় অবগাহন করো। রসসমৃদ্ধ পৃথিবীতে উপবাসী অতৃপ্ত থেকো না। চোখ মেলে চেয়ে দেখ—চারদিকে কত আনন্দের পসরা আমি সাজিয়ে রেখেছি। এত আয়োজন, এত সমারোহ সৃষ্টি ক'রে রেখেছি কেবল তোমারি জন্যে। তুমি নেবে না, ভোগ করবে না তো যুগ যুগ ধ'রে এত সুন্দর ক'রে আমার সৃষ্টির অর্ঘ্য আমি সাজিয়ে রেখেছি কেন? সবাইকার কাছ থেকে যেমন নিয়েছ, তেমনি আবার সবাইকে সব দাও; সব স্নেহে, প্রেমে, মমতায়, ভালোবাসায় পরিপূর্ণভাবে সাড়া দাও।" (২৭ পৃঃ।)

কিন্তু ভালোবাসব বললেই কি ভালোবাসা যায়, না, দিতে চাইলেই দেওয়া যায়? প্রেমের দীক্ষা না পেয়ে কে কবে প্রেমসিদ্ধি লাভ করেছে? "প্রেমের ঠাকুর' উপাধিটি বড় সুন্দর। ইন্দিরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে একটি গান বেঁধেছিল গত বৎসর দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে:

ফির প্রেমকে ঠাকুর, আও।
হে রামকৃষ্ণ সিরি রামকৃষ্ণ! ফির মা মা মা মা গাও।...
দেখো দুখিয়াঁ হৈ জগবাসী,
কালী মন্দির ছাই উদাসী,
পাপী তাপী দীনকে ঠাকুর ফির আ শরণ লগাও।

এসো প্রেমের ঠাকুর, এসো গো ফিরে আবার।
এসো, শ্রীরামকৃষ্ণ! এসো গেয়ে গান মা মা মা বন্দনার।
দেখ, কাঁদে এ জগৎ দুঃখে ব্যথায়,
কালীমন্দিরে সে-বেদনা ছায়,
পাপী তাপীদের হে দীনদয়াল, সাধাও শরণ মা-র।

সবাই জানে—সাধনার তিনটি প্রধান মার্গ আছে: কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি। ভক্তিমার্গের যাত্রীরাই প্রেমকে আবাহন করেন। ভগবানের সঙ্গে মিলনানন্দ লাভ ক'রে তার পরে সে-প্রেম সবাইকে বিলিয়ে প্রেমের দেওয়া-নেওয়া বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে। কালীদা ইন্দিরার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সে ভগবৎ প্রেমের মূর্ত প্রতিমা হয়ে বহু আর্ত ও অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসুকে কাছে টানতে পারত ব'লে, তাকে a being of love and light উপাধি দিয়েছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরার স্বভাব তথা দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর মিল ছিল ব'লে। মনে পড়ে—প্রায়ই তিনি ইন্দিরার মীরাভজনের একটি লাইন উদ্ধৃত করতেন:

"জাকে কমল নয়ন মধুর বয়ন চপল চরণ আওয়ে"

ইন্দিরার আর একটি সুন্দর ভজন তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন যেটি সুধাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে:

"কৈসী লগন লগী রী মাঈ কৈসী লগন লগাঈ।"

গানটি আমি একবার কালীদার কিমাটি ফ্ল্যাটে গেয়েছিলাম—তাঁর শিষ্যদের শোনাতে। কালীদা ছিলেন সভাপতি তথা গুরু। গানটির শেষে তিনি জলভরা চোখে আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাই গানটির দুটি স্তবকের অনুবাদ দিই—বিচিত্র গান, মীরা ও ঠাকুরের উত্তর প্রত্যুত্তর:—

মীরা:

এ কেমন প্রেমে বাঁধিলে আমারে—বাঁধিলে প্রেমে আমারে?
নই রাণী আর—হয়ে প্রেমদাসী এসেছি তব দুয়ারে!
বাজায়ে কেমন মুরলী মোহন
মজালে মীরার তনু প্রাণ মন,
তব তরে হিয়া অধীর এখন—দাও দরশন তারে।
নই রাণী আর—হয়ে প্রেমদাসী এসেছি তব দুয়ারে।

কৃষ্ণ:

এ কেমন প্রেমে সাধিলে আমারে—সাধিলে প্রেমে আমারে?
প্রেমে তব করি' অধীর বাঁধিয়া আনিলে তব দুয়ারে!
গেয়ে মধু হরিনাম ঝঙ্কার
আনিলে টানিয়া আঙনে তোমার,
গোলোকে রহিতে না পারিয়া আর এল শ্যাম অভিসারে—
যারে করি' প্রেমে অধীর বাঁধিয়া আনিলে তব দুয়ারে!

কালীদার দেহরক্ষার পরে বিভূবাবুর 'আমাদের কালীদা' পড়তে পড়তে চমকে উঠেছিলাম 'বন্ধু'-র ভাষণে—এই-ই যে ছিল তাঁর পরমা বাণী—মেসেজ : অর্থাৎ, ভক্তই যে শুধু ভগবান্‌কে চান তাই নয়, ভগবান্‌ও ভক্তকে চান। না, এ-বাণী পূর্ণ বাণী নয়, সত্যের সত্য হ'ল ভক্তের-ভগবান্‌কে-চাওয়া ভগবানের-ভক্তকে-চাওয়ারই প্রতিফলন—রিফ্লেকশন। রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও এই মহাবাণীর আভাষ আছে, ভক্ত বলছেন প্রেমের অভিমানে :

"একলা তুমি একলা আমি হ'লে।"

'বন্ধু' ভগবত করুণার মূর্ত বিগ্রহ হ'য়ে কালীদাকে এই কথাই বলেছিলেন অপরূপ ঢঙে :

"জীবনে ভুলভ্রান্তি সবাই করে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ধুলোকাদা সবাই মাখে।......সেজন্যে আমার কাছে আসার বাধা হবে কেন?......বৃথা সঙ্কোচে যদি আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলো আর পদে পদে অস্বীকার করো, তাতে আমি যে ব্যথা পাই।......আমার মত গরজ আমার মত দরদ আর কার? ...জন্মজন্মান্তর ধ'রে আমি-তোমাদের পিছনে আকুল হ'য়ে ফিরছি... আমাকে ছাড়া তোমাদের যদি বা চলে, তোমাদের ছাড়া আমার যে চলে না।......তাই তো আমি ছায়ার মত তোমাদের অনুসরণ করি।" (২৮ ও ২৯ পৃঃ)

একথা বলতে পারে এমন সুরে একমাত্র বিশ্বপ্রেমিক জগদ্বন্ধু—যে কালীদাকে বরণ করেছিল নিজেরই "গরজে", অনুসরণ করেছিল "ছায়ার মত"। কালীদা সংসারী থেকেও যে অসংসারী ছিলেন তার জন্যে দায়িক এই করুণাময় 'বন্ধু'—যে এসেছিল প্রেমের ঠাকুরের মূর্ত মন্ত্রী হয়ে তাঁকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে প্রেমিক মহাসাধকের স্তরে উত্তীর্ণ করতে। তাই তো প্রেমসুন্দর কালীদা বস্তুলাভ করার পর শুধু প্রেমের হরিরলুট বিলিয়েই ধন্য হয়েছিলেন, নিজে প্রেমের ঠাকুরের চরণে চিরাশ্রয় পেয়ে।

আমরা যখন আমাদের পুণা আশ্রমে অতি সন্তর্পণে সাধনা করছি 'কাউন্টিং এভ্রি পেনি' যাকে বলে, আমি বই লিখছি আর কিছু বাড়াচ্ছে (অন্ন যেড়েও ছিল—নৈলে পুণা থেকে কলকাতা মান্দ্রাজ কাশী প্রয়াগ প্রয়াণ করতাম কী ক'রে?) তখন কালীদার অনাবিল অকুণ্ঠ স্নেহ আমাদের কাছে খানিকটা পথের পাথেয় মতন হয়েই এসেছিল। তাঁর সঙ্গে আমার একটি ছবি—কালীদা-দিলীপ আলিঙ্গনবদ্ধ হাসিভরা ফটো, আমার কাছে এখন মহার্ঘ ও পুণ্য স্মারক হয়ে আছে।

১৯৫৯ সালে হরিকৃষ্ণ মন্দির গড়ে ওঠার পরে কালীদার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—যখন তিনি কাশীবাসী। তাঁকে অনেকবার বলেছিলাম তাঁর সাধনার কথা বলতে, কিন্তু প্রতিবারই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। একবার বলেছিলেন আমাকে যে, বলবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেননি। তাঁর স্নেহাশ্রিত মহাপ্রাণ ডোরাস্বামীরও হয়েছিল অনুরূপ অভিজ্ঞতা—কালীদা তাঁকেও নিজের সাধনার কথা বলবেন ব'লে ডেকে শেষ পর্যন্ত ফাঁক দিয়েছিলেন, বলেছিলেন মাথা নেড়ে : "উঁহুঁ you must find out for yourself"। আত্মগুপ্তি ও মন্ত্রগুপ্তি ছিল তাঁর সাধনার কবচকুণ্ডল। তাঁর কাছে এলে কারুর মনেই সন্দেহ থাকত না যে, তিনি শক্তিমান্ পুরুষ তথা প্রেমিক যোগী। যা-ই বলতেন সজোরেই বলতেন—কে কী মনে করবে এ-দুর্ভাবনা তাঁর কোনোদিনই ছিল না 'বন্ধু'-র কাছে প্রেমদীক্ষা নিয়ে তিনি যেন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। কেবল আমাকে একদিন টুকেছিলেন : "আপনি চান সবাইকেই খোলাখুলি আপনাদের নানা অলৌকিক অনুভূতি-উপলব্ধির কথা বলতে। এ-ও আমি জানি : এসব আপনি প্রকাশ করতে চান শুধু এইজন্যেই যে, আপনি চান—অধিকারী হবার সাধনা না ক'রেও সবাই আনন্দী হোক্—সকলে এমনি এমনি জানুক যে, ভগবানের করুণা এখনো একান্তী সাধকদের বল ও আলো দিয়ে পথের পাথেয় জোগায়। কিন্তু দিলীপদা, কেউ দিতে চাইলেই কি অপরে নিতে পারে? অকুণ্ঠে দেওয়া যেমন কঠিন অকুণ্ঠে নেওয়াও কি ঠিক তেমনি কঠিন নয়?"

আমার অনেকবারই মনে হয়েছে—কালীদা আমাকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন আমাকে নানা বেদবাদী যুক্তিবাদীর ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীরন্দাজি থেকে বাঁচাতেই। কিন্তু আমি বারবার পণ নিয়েও পারতাম না, যা দেখেছি তা না ব'লে গম্ভীর মেঘলা মুখে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে। মহাভারতে বলেছে "স্বভাবো দুরতিক্রমঃ"—স্বভাব যায় না ম'লে। নিরুপায়।

কিন্তু এ-মতানৈক্য অবান্তর। আসলে অন্তরে কালীদার সঙ্গে আমাদের গভীর মিল ছিল—প্রেমের শ্রীক্ষেত্রে তথা পৃথ্বীবাদে যার গোড়াকার কথা—এ-জগৎ মায়া নয়। সাবিত্রী ভগবানকে বলেছিল যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা যদি সত্য হয় তবে জগৎও সত্য—

If thou and I are true, the world is true

মুক্তির-মুক্তি নির্বাণেও নয় পরিনির্বাণেও নয়, তার একমাত্র পথ এ-পৃথিবীতে এসে ভগবানের হাতের যন্ত্র হয়ে তাঁর ইচ্ছাকে বরণ ক'রে স্বেচ্ছাচারকে বিদায় দিয়ে কৃতকৃত্য হওয়া :

A huge extinction is not God's last word···

Here to fulfil himself was God's desire.

বিরাট্ নির্বাণ নয় মহত্তম মন্ত্র ঈশ্বরের......

এ-ধরার প্রাণ লীলালোকে চান পূর্ণ সিদ্ধি তিনি।

'আমাদের কালীদা' স্মৃতিচারণে দুটি ভাগ আছে। প্রথমার্ধে "বন্ধু"-র কথা ; শেষার্ধে বিভূপদ কীর্তি এক মহর্ষির জবানিতে কালীদার সুন্দর বাণী পরিবেশন করেছেন—যা তিনি কালীদার মুখেই শুনেছিলেন। এরই নাম পৃথ্বীবাদ) :

—গুরুদেব, আমরা জানি আমরা তাঁকে চাই। কিন্তু তিনি কী চান তা তো আমরা জানি না।

—এখনো জানো না, কিন্তু একদিন তো জানতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুতি তো এখন থেকেই থাকা চাই। তিনি কি চান সেটা যদি জানতেই না চাও, তবে তোমরা তাঁকে ভালোবাসবে কি করে ? যার মধ্যে ভালো ক'রে বাসা বাঁধা যায় তাকেই তো বলে ভালোবাসা।

—কি তিনি চান, গুরুদেব ?

—তিনি চান - পৃথিবীর মত কঠিন হও, পৃথিবীর মত সহজ সরল সর্বংসহা হও। পৃথিবীকে বর্জন কোরো না, অর্জন করো।

—পৃথিবীর মত কঠিন—সে কেমন গুরুদেব ?

—বুঝলে না ? পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখ। তারে বুক জুড়ে চলেছে ধ্বংস সৃষ্টির খেলা অনন্ত কাল ধ'রে। কত মানুষ, কত পশুপক্ষী, কত বৃক্ষলতা, কত কীট পতঙ্গ নিরত জন্মাচ্ছে, নিরত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যে-বুকে জাগছে জীবন, সেই বুকেই তার সমাপ্তি হচ্ছে মরণে। এমনি ক'রে জীবন-মরণকে সহন করছে যে, বহন করছে যে, তার চেয়ে কঠিন আর কি আছে বৎস ? তিনি চান—এম্নি ক'রে তোমরাও কঠিন হও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মত সহজ সরলও থাকো। লক্ষ্য ক'রে দেখ—ক্লান্তি নেই, কুণ্ঠা নেই তার তার সহজ সরলতায়। বীজটুকু হাওয়ায় ভেসে এসে উড়ে পড়ল, আর অমনি জাগল জীবন। সবুজে সবুজে মাঠ ভ'রে গেল।......কার্পণ্য তার কোনোখানে নেই। তিনি চান তোমরা এই পৃথিবীকে ধ'রে পৃথিবীর ম'তই সর্বংসহ হয়ে থাকো। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আপনাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে সৃষ্টি সংসার ভুলে থাকো—এ তিনি কখনোই চান না, বৎস !

বলাই বেশি—এই পৃথ্বীবাদ রবীন্দ্রনাথেরও একটি বাণী। তাঁর 'উৎসর্গ'তে বড় সুন্দর ক'রে কবি বলেছেন এই কথাটিই :

"ধন্য রে আমি অনন্তকাল, ধন্য আমার ধরণী,

ধন্য এ-মাটি, ধন্য সুদূর তারকা হিরণবরণী,

যা রয়েছি আমি ধন্য হয়েছি ধন্য এ মোর ধরণী।"

কিন্তু কালীদা নানা সুরে ছন্দে এই পৃথ্বীবাদের গান গাইলেও তাঁর নিজের স্বরূপ কাউকে জানতে দেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এক জায়গায় আছে ঠাকুর বলছেন মণিকে : "অচিনে গাছ শুনেছ ?—সে একরকম গাছ আছে, তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।"

বিভূপদ কীর্তি তাই ঠিকই লিখেছেন কালীদার উদ্দেশে (১২১ পৃঃ) :

"সেদিনো তোমাকে কেহ চেনে নাই, আজিও কি
চেনে কেহ ?
প্রাণের নাগাল কেহ পায় নাই, ছুঁয়েছে কেবল দেহ।"

কিন্তু দুঃখ কেন ? প্রেমিকের আত্মা তো অমর (ঐ):

'কোথায় কী তব পথের নিশানা—কী হবে সেকথা
ভেবে ?
যেখানেই থাকো সেখান হইতে আবার টানিয়া
নেবে......

এখানে যেমন পেয়েছি তোমারে,
তেমনি করিয়া পাইব ওপারে,
তোমার হইয়া তোমারে লইয়া বাঁধিব নূতন বাসা।
মরণের ঘরে, মরণের পরে মরে না তো ভালোবাসা।"

কালীদা এই প্রার্থনারই উত্তর দিয়েছেন তাঁর একটি প্রাণস্পর্শী কবিতায় (১৫৫ পৃঃ—২৪।১১।১১৯০):

আমায় ঘেরি' এই-যে এদের এত আনাগোনা,
এতদিনের এতক্ষণের এই-যে জানাশোনা,
কী বা পেল কী পেল না—কিছুই নাহি জানি,
তবু ওদের ভালোবাসায় অবাক্ আমি মানি।
দেহ যখন শেষ হয়ে যায়, থাকে শুধু নাম,
মহাকালের মহাস্রোতে কী-ই বা তাহার দাম ?
কামনা সব শেষ করেছি, কী বা আমার চাওয়া ?—
ওপার হতে গায়ে লাগে বিদায় বেলার হাওয়া।
কামনা কি শেষ করেছি ? হয়তো কিছু বাকি :
তাই তো ওদের ভালোবাসা দেহমনে মাখি।
একটি তৃষ্ণা থাকুক আমার, ছাড়তে নাহি চাই—
যুগে যুগে ফিরে ফিরে ওদের যেন পাই।
আমায় ঘেরি' আমায় ধরি' পেল যারা সুখ
পরম ক্ষণে পরম ধনে ভরবে তাদের বুক।

জগতে আমরা কেবল তারই কাছে ছুটে যাই যে দিতে পারে একটুখানি স্নেহের পরশ। জ্ঞানীর কাছেও যাই, কিন্তু যে-জ্ঞানের বাণী পাই তাতে মন খুশী হলেও প্রাণ ভরে কই ? প্রাণ চায় সব আগে প্রাণের পরশ। কালীদার কাছে মানুষ পেত এই স্পর্শ। এ-স্পর্শ দেওয়া সহজ কথা নয়, এ একটা প্রতিভা—যে পারে সে আপনি পারে। একটি গানে আমি লিখেছিলাম :

"ভালোবাসি" বলা সহজ কঠিন শুধু ভালোবাসা :
একটু রঙিন উচ্ছ্বাসে হায় কার মেটে গভীর পিপাসা ?

কালীদার কাছে থেকে আতুরদের দল কেবল অপলকা রঙিন উচ্ছ্বাসের সান্ত্বনা নিয়ে ফিরত না—ফিরত হৃদয়ে পেয়ে প্রেমের স্পর্শ—তাঁর এক টুকরো হাসিতে, এক টুকরো সম্ভাষণে, এক টুকরো চাহনিতে ঝরিয়ে দিতেন তিনি তাঁর হৃদয়ের স্নেহমধুর তাপ—যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত তাঁর সহজ প্রেমের নরম আলো মৃদুল হাসি। তাই অচিন থেকেও তিনি আত্মপরিচয় ফাঁশ করতেন তাঁর প্রেমের বাণীতে, স্নেহের হাওয়ায় জুড়িয়ে দিতেন কত দুঃখীর সঞ্চিত ক্ষোভ ব্যথা। ইন্দিরা ও আমি তাই তো তাঁর সান্নিধ্যে এত গভীর তৃপ্তি পেতাম। তাঁর এই কবিতায় (মনে হয়) তিনি এঁকেছেন নিজেরই এই গূঢ় ছবিটি (১৫৪ পৃঃ) :

"জ্ঞানী গুণী অনেক আছেন, থাকুন তাঁরা ভালো :
তোমার কাছে যাচে সবাই একটু প্রেমের আলো।
এইটি পারো, তুমিই পারো, তুমিই পারো দিতে :
সারাজীবন দিয়েছ তো কতজনার চিতে।
টানো সবায় বুকের কাছে, হাসো অভয় হাসি,
বিনা দ্বিধায় বলো বলো : 'ভালোবাসি, বাসি।'
তুমি বিরাট্, তুমি প্রেমিক, তুমি মহৎ প্রাণ :
মর্মরিত তোমার বুকে বিরাট্ আহ্বান।"

ক্রমশঃ

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৪

জর্জ কার্ভার টাস্কেগি শিক্ষায়তনের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসার পরে ক্রমাগত কয়েক বছর পর্যন্ত অ্যালবামা প্রদেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল, এমন অপর্যাপ্ত ফলন এর আগে আর কখনো উৎপন্ন হয়নি। সেইজন্যে এই বছরগুলোকে সেরা ফলনের বছর বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

জর্জ কার্ভার এখন সারাক্ষণই ব্যস্ত, তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান, অপচয় করার মতো একটি মুহূর্তও তাঁর হাতে নেই। যেসব কাজ অন্যান্য বিভাগের করণীয় বলে স্পষ্টতঃ নির্দিষ্ট করে রাখা না হলেও জর্জ কার্ভারের কর্মতালিকার তা অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তথাপি ধীরে ধীরে এক-একটা করে সেই সবগুলি কাজই করতে দেওয়া হল জর্জ কার্ভারকে, সেইসব কাজের দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়ল। তিনি বাড়ী তৈরি করার জন্য প্ল্যান আঁকেন, যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরি করেন, কূপের জল নিয়ে গবেষণা করেন, আবহাওয়ার হিসেব রাখেন, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ স্থির করেন এবং নিয়মিতভাবে সেগুলি সরকারী আবহাওয়া দপ্তরে সরবরাহ করেন।

এগুলি ছাড়াও তাঁর আরো অনেক কাজ। নবনির্মিত কৃষিভবনের পশ্চাৎপটের দৃশ্য অঙ্কন করা, তার সোপান-শ্রেণী ও প্রাঙ্গণ নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, উদ্যান রচনা ও নব নব তৃণগুল্মের রূপসজ্জায় তা সজ্জিত করা, উদ্যান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও ঘাসের চাপড়া ইত্যাদি লাগানো ইত্যাদি সব রকম কাজই তাঁকে করতে হয় এবং একটা কাজও তিনি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার সঙ্গে করেন না। সব কাজে জর্জ কার্ভারের সমান আন্তরিক আগ্রহ, সমান যত্ন। এক সময়ের সর্বরিক্ত বন্ধ্যা এই কংকরময় কঠিন মৃত্তিকা কার্ভারের যাদু-দণ্ডের স্পর্শে আজ এক অপরূপ শস্যশ্যামলা প্রাকৃতিক উদ্যানে পরিণত হয়েছে—জর্জ কার্ভার ব্যতীত এ কাজ আর কারুর দ্বারাই বোধহয় সম্ভবপর ছিল না।

এত অফুরন্ত কাজ জর্জ কার্ভারের কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে নেবার সময় ঠিক বের করে নেন ওরই মধ্য দিয়ে এবং উৎসাহের সঙ্গে গবেষণার কাজ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী উদ্যোগে কৃষি বিভাগের মাধ্যমে উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে রাখার জন্য যে সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে জর্জ কার্ভারও সেখানে তাঁর নিজের সংগৃহীত গাছগাছালির কিছু নমুনা পাঠিয়ে দিলেন।

টাস্কেগি শিক্ষায়তনের নতুন কৃষিভবন নির্মাণের

কাজ ১৮৯৮ সালে সমাপ্ত হল। অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর পুরোন দিনের বন্ধু এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সচিব অধ্যাপক উইলসনকে কৃষিভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে তা জাতির সেবায় উৎসর্গ করার জন্য কৃষিভবনের উদ্বোধন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। অধ্যাপক উইলসন সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জর্জ কার্ভারকে চিঠি লিখে তা জানিয়ে দিলেন।

১৫

জর্জ কার্ভার জন্মসূত্রেই একজন শিক্ষাদাতা শিক্ষক যাকে এককথায় বলতে পারি একজন লোকশিক্ষক। শিক্ষাদানই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদান শুধু তাঁর ক্লাশঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার ব্যাপ্তি বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি টাস্কেগিতে চলে গিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, যে মহৎ ও বিরাট আদর্শ তাঁকে টাস্কেগিতে চলে যাবার প্রেরণা দিয়েছিল তা হল জনগণকে, বিশেষত অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা নিগ্রো জনগণকে, জ্ঞানের আলো দেখিয়ে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করা এবং শুধু নিজেকে সেই মহৎ ব্রতে উৎসর্গ করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তাঁর ছাত্রদেরও উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলেন, "তোমরা যেমন বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করো অথবা ব্যাংকে যে টাকার পাহাড় জমিয়ে তোলো সংসারিক জীবনে তার গুরুত্ব যে খুব বেশী তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও আমি জোর দিয়েই বলব, মহৎ জীবনে অধিকার অর্জন করার জন্য মহৎ ত্যাগ প্রয়োজন। সেবার আদর্শে—দেশের সেবা, জাতির সেবা, মানবের সেবার আদর্শে যদি নিজেদের চিত্তকে উদ্বোধিত করতে না পারো তবে বৃহৎ জীবনে উত্তরণ করতে তোমরা ব্যর্থ হবে, মনুষ্যত্বের অধিকার লাভ করার গৌরব থেকে তোমরা চিরকাল বঞ্চিত থাকবে।" তিনি বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে ছাত্রদের ডাক দিয়ে বলেন "যে জিনিষ অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য, অতিশয় সাধারণ তাকে তুমি যদি অসাধারণত্বের রঙ মাখিয়ে দেখতে শেখো, দেখবে, সব জিনিষ তোমার ভালো লাগবে, সব জিনিষ তোমার কাছে সুন্দর মনে হবে, তখন আর কোন জিনিষকে তুচ্ছ বলে অবহেলা করার প্রবৃত্তি তোমার মধ্যে জন্মাবে না।"

জর্জ কার্ভার তাঁর ছন্নছাড়া যাযাবর জীবনে এক সময়ে পিয়ানো বাজনা অভ্যাস করেছিলেন। শুধু অভ্যাস নয়, পিয়ানো বাজানোয় তিনি দস্তুরমতো দক্ষতা লাভ করেছিলেন। এখন প্রতি রবিবার অ্যালবামা হলে রাত্রে সংগীতের আসরে তিনি তাঁর পুরানো পিয়ানো নিয়ে বাজাতে বসেন এবং শিক্ষক ও ছাত্ররা সবাই উন্মুখ আগ্রহে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে বসে তাঁর পিয়ানো বাজনা শোনেন। জর্জ কার্ভার তন্ময় হয়ে বসে বাজান নিগ্রোদের ভক্তিমূলক গান—"দুলে দুলে ওগো নীচু মধুর রথ", হ্যাণ্ডেলের "লার্গো" সংগীত এবং বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে রচিত বিভিন্ন গান।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই গানের আসরে বসে টাস্কেগি শিক্ষায়তনের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ওয়ারেন লোগান একটা প্রস্তাব করে বসলেন। প্রস্তাবে অধ্যাপক জর্জ কার্ভারকে একদল সংগীত-শিল্পী নিয়ে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে আসার অনুরোধ জানানো হল এবং সেই আসরে যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই একবাক্যে আনন্দের সঙ্গে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। কিন্তু জর্জ কার্ভার হেসে ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে জবাব দিলেন, "আমি অতি নগণ্য একজন পিয়ানো-বাদক মাত্র, সঙ্গীত-শিল্পী আমি কোনক্রমেই নই। তা ছাড়াও, আমি সাধারণ একজন অধ্যাপক।"

মিঃ লোগানও সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, "ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটনও একজন কলেজ অধ্যক্ষ, বক্তা নন কিন্তু তথাপি টাস্কেগি শিক্ষায়তন গড়া ও তার উন্নতি বিধানের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি দেশে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি এইভাবে পরিভ্রমণ করেছেন।"

জর্জ কার্ভারের আপত্তি আর খাটলো না। বরং মিঃ লোগানের প্রস্তাব ভিতর থেকে তাঁর মনটাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। বহুদিন আগে থেকে অর্থসংগ্রহের উপায় নিয়ে চিন্তা করে আসছিলেন, কিভাবে আরো কিছু বেশী অর্থ সংগ্রহ করে আরো ১৫ একর জমি কিনে টাস্কেগি শিক্ষায়তনের খামারের সঙ্গে যুক্ত করে সেটাকে বাড়ানো যায়,—কিন্তু অনেক চিন্তা করেও কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মিঃ লোগানের প্রস্তাব হঠাৎ জর্জ কার্ভারের মাথার সেই চিন্তার জট খুলে দিল। তিনি উপায় খুঁজে পেলেন।

জর্জ কার্ভার সংগীত-শিল্পীর দল গঠন করে দেশভ্রমণে বেরোনোই ঠিক করলেন। চারদিকে প্রচারপত্র ছড়ানো হল, তাতে লেখা হল, 'জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর পিয়ানো-বাদক ও যন্ত্রশিল্পীর দল নিয়ে অ্যালবামা, জর্জিয়া, লুসিয়ানা এবং টেক্সাস প্রভৃতি শহর ও পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ করবেন।' কিন্তু দেশভ্রমণে বের হতে হলে ভালো একটা পোশাক অন্তত চাই, জর্জ কার্ভারের একটাও ভালো পোশাক নেই। তাঁর জন্য একটা স্যুট ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বন্ধুরা সবাই মিলে টাকার জোগাড় করল।

১৮৯৯ সালের ৬ই জুলাই জর্জ কার্ভার তাঁর পিয়ানো-বাদকদল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে পরিক্রমা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

সুরের অলৌকিক ইন্দ্রজাল রচনা করে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি যে এত বড়ো একজন সংগীত-শিল্পী, পিয়ানো বাদনে তাঁর যে এমন অদ্ভুত দক্ষতা রয়েছে, তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাবার আগে পর্যন্ত সে কথা কেউ চিন্তাই করতে পারেনি। তাঁর অপূর্ব পিয়ানো বাজনা দেশের লোককে মুগ্ধ বিস্মিত করল। জর্জ কার্ভার তাঁর দলবল নিয়ে যেখানে যান সেখানেই শত শত লোক ভিড় করে তাঁর বাজনা শুনতে আসে। যতক্ষণ জর্জ কার্ভার পিয়ানো বাজান ততক্ষণ শ্রোতারা বিস্ময়াহত চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে বসে শোনে। অনেকে তাঁকে বহু সমাদর করে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় আরো ভালোভাবে তাঁর বাজনা শুনবার আগ্রহে।

জর্জ কার্ভার তাঁর পরিভ্রমণকালে সদয় ব্যবহার ও সাদর অভ্যর্থনা যেমন লাভ করেছেন, তেমনি লাঞ্ছনা এবং অপমানও তাঁকে বহু সহ্য করতে হয়েছে। একবার পুর্গ টেক্সাসে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল। জর্জ কার্ভার কৃষ্ণকায় নিগ্রো—এই অপরাধে সেখানকার নাগরিকরা তাঁকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে নামিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, সেই মুলুক থেকে পর্যন্ত তারা তাঁকে বের করে দিল।

আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। জর্জিয়া শহরের এক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জর্জ কার্ভারের গানের আসর বসেছে। এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছিলেন তাঁর বাজনা শুনতে। জর্জ কার্ভারের পিয়ানো বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা অশ্রুসজল কণ্ঠে বলেছিলেন, "সংগীতের সুরের মধ্যে যে এতখানি মধু, এত সৌন্দর্য লুকায়িত থাকতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না এবং জর্জ কার্ভারের বাজনা না শুনলে কোনো দিনই তা আমাদের জানবার সুযোগ হত না। আজই প্রথম আমরা এই আশ্চর্য খবর জানতে পারলাম।"

সংগীতের আসর সমাপ্ত হবার পরে লোকজন সব চলে গেলে হোটেলে ফিরে গিয়ে যে কাজটা জর্জ কার্ভার অন্যসব কাজ ফেলে রেখে সবার আগে করেন সেটা হল তাঁর সেদিনের উপার্জিত অর্থের পরিমাণ কত হল তা গুনে হিসাব কষে মিলিয়ে রাখা। একটুও দেরীতে তাঁর এ কাজ করলে চলে না। পাঁচ সপ্তাহ পরে পরিভ্রমণ শেষ করে তিনি যখন টস্কেগিতে ফিরে এলেন সেদিন তাঁর কাছে জমা হয়েছিল কয়েক শত ডলার।

জর্জ কার্ভার দেশভ্রমণে বের হবার সময়ে তাঁর বন্ধুরা যে পোশাক তাঁর জন্য কিনে দিয়েছিলেন পরে আর কোনদিন কেউ তাঁকে তাকে তা পরিধান করতে দেখেনি। ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসে সেই যে তিনি পোশাক গা থেকে খুলে আলমারিতে টাঙিয়ে রেখে-

ছিলেন, বছরের পর বছর তা সেখানেই ঝুলানো অবস্থায় ছিল। দিনের পর দিন ধুলো জমে তা ময়লা এবং শতছিন্ন হয়ে অবশেষে একদিন কোথায় যে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে গেল কেউ তা জানতেও পারল না। পরে কেউ কখনো কোনো কথা প্রসঙ্গে পোশাকটার কথা জিজ্ঞাসা করলে জর্জ কার্ভার হেসে বলতেন, "ওহো, তোমরা সেই পোশাকটার কথা বলছ ?" এর বেশী আর কিছু তাঁর মুখ থেকে কেউ কোনোদিন শোনেনি।

১৬

জর্জ কার্ভার যখন তাঁর সঙ্গীত শিল্পীর দল নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন একটা অতিশয় করুণ ও মর্মভেদ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি দেখেছেন মানুষের ঘৃণা, দ্বেষ, অবহেলা এবং নিপীড়ন কত জঘন্য রূপ নিতে পারে ; দেখেছেন, শ্বেতকায় মালিকশ্রেণীর লোকেরা কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের কিভাবে নরকের অন্ধকারে ফেলে রেখেছে। মনুষ্য-বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য নোংরা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঝুপরি ঝুপরি কতগুলি ঘর আর সেই অন্ধকার ঘরের অধিবাসী দারিদ্র্যপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষগুলোকে দেখে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেদিন— কী দুঃসহ অপমানকর জীবন নিগ্রো ক্রীতদাসদের। এক-একখানা আলোবাতাসহীন জীর্ণ কুঁড়েঘরে একসঙ্গে অনেকগুলি লোক বাস করে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে। দরজার সামনে শুয়োরের খোঁয়াড় আর আবর্জনা ও জঞ্জালের স্তূপ, তার দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

দক্ষিণাঞ্চলের রিক্ত দীন রুক্ষ, পাথরের মতো কঠিন জমি, যার মধ্য দিয়ে লাঙল চালনা করা দুঃসাধ্য, সেই জমি জর্জ কার্ভার নিজের চোখে দেখা অবধি তা নিয়ে অনেক ভেবেছেন। নিঃস্ব রিক্ত বন্ধ্যা বসুন্ধরা— মাটি যার রোদে ফেটে চৌচির হয়ে আছে, সেই মাটিকে কি করে উর্বর শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধ করে তোলা যায় সেইটেই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। এখানকার সবগুলি ক্ষেতে শুধু তুলোরই চাষ হয়। অন্য কোন ফসল ফলাবার এখানে কেউ কখনো চেষ্টাও করে না, হয়ও না। কিন্তু এই মাটিকেও রসসিক্ত উর্বর এবং শস্যশ্যামল করে তোলা সম্ভব হতে পারে যদি তুলো উৎপাদনের একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করে এই জমিতে অন্য কোন ফসল ফলানো হয়। তাতে শুধু জমির উর্বরা শক্তিই বৃদ্ধি পাবে না, এখানকার নিঃস্ব সর্বরিক্ত দরিদ্র মানুষগুলির মুখেও অন্ন জোগানো যাবে, তাদের নৈরাশ্যভরা জীবনে আলো নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তাদের রুগ্ন ক্ষীণ সন্তানগুলিকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে, তাদের জন্য জীবনধারণের নতুন সুযোগ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। হাঁ, নিশ্চয়ই তা সম্ভব হবে। কার্ভার কথাগুলি নিজের মনে মনে আওড়ান আর একা একা পথ চলেন।

যদি তাদের কানে আমি নতুন মন্ত্র দিতে পারি, জীবনের নবতর ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের কাছে আমি উপস্থিত হতে পারি, যদি তাদের বোঝাতে পারি তারাও শ্বেতাঙ্গদের মতোই মানুষ, মনুষ্যত্বে এবং মানবজীবনে তাদেরও পরিপূর্ণ অধিকার আছে। তারাও স্বাধীন, সুস্থ, আনন্দময় জীবনের অধিকারী হতে পারে, তবে আমি তাদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে পারবো। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ, জর্জ কার্ভার তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করলেন যে, তিনি তাদের সুহৃদ্ এবং একান্ত শুভানুধ্যায়ী। তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। অসীম ধৈর্য, প্রগাঢ় সহানুভূতি ও প্রাণভরা দরদ নিয়ে তিনি তাদের মধ্যখানে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাদের নিয়ে "কৃষক পরিষদ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন। প্রতি মঙ্গলবারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে দলে দলে কৃষক এসে কৃষক পরিষদের বৈঠকে মিলিত হয়। গোড়ার দিকে অবশ্য তাদের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না, কিন্তু লোকের মুখে মুখে যখন জর্জ কার্ভার এবং পরিষদের খ্যাতি অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তখন ক্রমাগত সভায় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাও বাড়তে লাগল এবং

বহুদূরবর্তী গ্রাম থেকেও কৃষকরা আসতে শুরু করল। কৃষক পরিষদের ক্ষুদ্র অপরিসর কিন্তু ছবির মতো সুন্দর করে সাজানো ঘরের মধ্যে গায়ে গা লাগিয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা জর্জ কার্ভারের সব কথা শুনত। সব কথার অর্থ স্পষ্টভাবে না বুঝলেও কথাগুলি তাদের খুবই ভালো লাগত। দুঘণ্টা তিনঘণ্টা, এমনকি তার চেয়েও বেশী সময়, অর্থাৎ কার্ভার যতক্ষণ তাদের মন আকর্ষণ করে রাখতে পারতেন ততক্ষণ তারা একটুও না নড়াচড়া করে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে স্থির হয়ে বসে তাঁর কথা শুনত। তিনি তাদের বুঝিয়ে বলতেন কৃষিকাজের উন্নতির সঙ্গে তাদের নিজেদের জীবনের উন্নতির কেমন করে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঐকান্তিক উদ্যম ও আগ্রহ থাকলে তবেই তা হওয়া সম্ভব, তাদের তিনি সেকথা বলতেও ভুলতেন না। ডাঃ কার্ভার সেইসব গ্রাম্য কৃষকদের সঙ্গে জমির উর্বরাশক্তি এবং অন্যসব জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন, তাদের ঘরের চতুর্দিকের সংলগ্ন জমিতে শাক-সব্জি উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পরামর্শ দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মতো শাকসব্জি উৎপাদন করতে পারলে তাদের বেশী দাম দিয়ে মাছ মাংস ইত্যাদি না কিনলেও খুব বেশী অসুবিধা হবে না। গুড়ের দাম রোজই যে রকম বেড়ে যাচ্ছে তাতে দরিদ্র সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তা আর কিনে খাওয়া সম্ভব হবে না। সাধারণ লোকদের বিশেষত নিগ্রোদের, মনে তখন একটা কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল টম্যাটো সম্বন্ধে, তারা মনে করত টম্যাটো হচ্ছে একজাতীয় বিষফল, খাওয়া তো দূরের কথা, কেউ তা ছুঁত না পর্যন্ত, কিন্তু জর্জ কার্ভার যখন তাদের সামনেই মস্ত বড় একটা লাল রঙের টম্যাটো হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে তা টুকরো টুকরো করে কেটে মুখের মধ্যে ফেলে অনায়াসে বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন লোকগুলি তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে তো তখন বিস্ময়ে অবাক্। জর্জ কার্ভার করছেন কী? বিষফল খাচ্ছেন? তাদের সকলের মুখ ভয়ে আতঙ্কে শুকিয়ে গেল, তারা নির্বাক্ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু, কই, বিষফল খেয়ে জর্জ কার্ভারের তো কোন ক্ষতিই হল না।

"দেখলে তো তোমরা, টম্যাটো খেয়ে আমি কেমন বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছি," ডাঃ কার্ভার বললেন তাদের। তারপর তিনি টম্যাটোর উপকারিতা তাদের বুঝিয়ে দিলেন, স্কার্ভি রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্য টম্যাটো খাওয়া একান্ত দরকার, বাঁচতে হলে টম্যাটো না খেলে উদ্ধার নেই। কারণ টম্যাটোর মতো এত বড় প্রতিষেধক সে রোগের আর কিছু নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই এমন একটা সময় দেখা দিল যখন জর্জ কার্ভারের সঙ্গে দেখা করার জন্য কৃষি পরিষদ ভবনে বহু লোক এসে ভিড় জমাতে শুরু করল।

টাস্কেগি শিক্ষায়তন থেকে বের হয়ে যে বড় রাস্তাটা সোজা অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেই রাস্তার শেষ প্রান্তে জঙ্গল ও জলাভূমির ধার ঘেঁষে সারি সারি ঘর বেঁধে যে হাজার হাজার নিগ্রো ক্রীতদাসদের বাস তারা কিন্তু জর্জ কার্ভারের নামও শোনেনি। ডাঃ কার্ভার তাদের কাছে যাবেন স্থির করলেন, গিয়ে বন্ধুর মতো, আত্মীয়ের মতো তাদের জীবনের সব সুখদুঃখের অংশীদার হবেন।

১১

জর্জ কার্ভার যে কোন লতাগুল্ম, ফুল অথবা গাছের চারা একবার মাত্র দেখেই বলে দিতে পারেন তা কোন্ জাতের, কোন্ দেশে তার প্রথম জন্ম এবং গাছপালা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই তিনি জানেন। একবার হয়েছে কি, ডাঃ কার্ভারের জনকয়েক ছাত্র তাঁকে নিয়ে একটু তামাসা করার উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে একটা ছারপোকা (Bug) হাজির করে বলল, সেটা তারা বনের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে এনেছে। আসলে সেটা ছারপোকা ছিল না, অদ্ভুত আকৃতির একটা পোকা ছিল সেটা, তার দেহ ছিল বিছার, ডানা ছিল প্রজাপতির, পা দুটো ছিল ফড়িং-

এর আর মাথাটা ছিল গুব্‌রে পোকার ;—সবগুলিকে সুতো দিয়ে গেঁথে একটা কিম্ভূত-কিমাকার পোকার রূপ দেওয়া হয়েছিল। একখানা কার্ডবোর্ডের গায়ে সেটাকে আঠা। দিয়ে লাগিয়ে এমন চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিল যে, সেটা যে কৃত্রিম, একজন আনাড়ি লোক তা বুঝতেই পারবে না, অভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও সহজে ধরা মুশ্‌কিল। টেবিলের উপর সেই পদার্থটাকে রেখে, যারা জর্জ কার্ভারের সঙ্গে নিষ্ঠুর কৌতুক করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল সেই ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল, "স্যার, আমরা বুঝতে পারছি না এটা কি পোকা, আপনি দয়া করে বলে দেবেন এটা কোন্ জাতীয় কীট সেই উদ্দেশ্যে আমরা আপনার কাছে এটা নিয়ে এসেছি।"

ডাঃ কার্ভার এক নজরে পোকাটা দেখে নিয়ে ছাত্রদের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি গুঞ্জন (Hum) করে ?"

ছাত্ররা জবাব দিল, "হ্যাঁ, তা করে স্যার।"

জর্জ কার্ভার বললেন "তাই যদি হয় তবে এটা হচ্ছে Humbug."

অধ্যাপকের কাছ থেকে এ রকম মুখের মতো জবাব পেয়ে ছাত্ররা আর একটি কথাও বলতে পারল না কিন্তু তারা জর্জ কার্ভারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পেয়ে একটা জিনিষ নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল, আত্মভোলা এই বৈজ্ঞানিককে জ্ঞানের রাজ্যে পরাজিত করা একেবারেই অসম্ভব।

জর্জ কার্ভার বিদ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞানের অহংকার করেন না। তিনি বলেন, "যদি তুমি সত্যই কিছু জান তবে বিনীতভাবে তা স্বীকার কর। আর যদি কিছুই না জান তবে সে কথাও কবুল করার সাহস রাখ।"

আর একটা কথাও তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত : "আমি জানি না, কিন্তু আমি জানবার চেষ্টা করি এবং আমৃত্যু আমি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাব।" বস্তুত জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার জীবনভোর নিজেকে যেমন শুধু একজন জ্ঞানপিপাসু ছাত্র ব্যতীত আর কিছুই ভাবেননি এবং জ্ঞানতপস্যার চেয়ে অন্য কোন বড় তপস্যা তাঁর জীবনে ছিল না, ছাত্রদের কাছ থেকেও তিনি তাই আশা করতেন, তেমনি জ্ঞানলাভের জন্য মহৎ প্রয়াস ও উদগ্র আকাঙ্খা। তাদের অন্তরে জ্ঞানের দীপ জ্বালাবার উদ্দেশ্যে এবং জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য তিনি সর্বদা বলতেন, "জান, জান, নিজেকে জান বিশ্বকে জান।"

টাস্কেগি শিক্ষায়তনে জর্জ কার্ভারের কাছে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে যেসব ছাত্ররা এসেছে তাদের অধিকাংশই এসেছে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের পরিবেশের মধ্যে বাস করার অভ্যস্ত জীবনধারা নিয়ে এবং তাদের মেধাশক্তিও সাধারণ অনেক ছাত্রের তুলনায় খুবই কম, কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে বড় হবার যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সম্ভাবনা অঙ্কুরের মতো লুক্কায়িত ছিল অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার অপরিসীম অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা সেই সামান্য সম্ভাবনাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিতরূপে বাস্তবে রূপায়িত করলেন। উত্তরকালে তাঁর ছাত্ররা অনেকেই জীবনে কৃতী এবং গণ্যমান্য হতে পেরেছিলেন, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত বিশ্বকে জানতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এসব সত্বেও জর্জ কার্ভার তাঁর ছাত্রদের নিরহংকার হবার সর্বদা উপদেশ দিতেন, জ্ঞানের অহংকার, বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার কিংবা ঐশ্বর্যের অহংকার করতে নিষেধ করতেন। অহংকার ভালো নয়, অহংকার পতনের মূল। তা ছাড়া অন্যের কাছ থেকে শেখা বা ধার করা জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে বড়াই করা তো কোন মতেই উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ময়ূরপুচ্ছ ও চড়াই পাখীর একটা গল্প তাদের কাছে বলতেন।

অধ্যাপক কার্ভার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলতেন, "তা হলেও আমরা জানি ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে নিজের দেহ সজ্জিত করার চেষ্টা করা চড়ুই পাখীর উচিত হয়নি কারণ তার আসল রূপ তাতে ঢাকা পড়েনি, ময়ূরপুচ্ছের তলায় তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদামী রঙের পালক আর তার নিজের ক্ষুদ্র শরীরটা তো রয়েই গেল।"

একজন ছাত্র বলল, "কিন্তু স্যার, চড়ুই পাখী তো গান গাইতে পারে।"

অধ্যাপক কার্ভার উত্তর দিলেন, "আমিও তো সেই কথাই বলতে চাই। ভগবান্ চড়ুই পাখীকে সৃষ্টি করার সময়ে তার শরীরে সুন্দর পালকের জামা পরিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তার চাইতে আরো একটা বড় জিনিষ তিনি তাকে দান করেছেন, তার গান গাইবার ক্ষমতা। কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, ভগবান্ আমাদের যাকে যা নিজস্ব জিনিষ দিয়েছেন সর্বপ্রযত্নে তার অনুশীলন এবং যত্ন করা। অন্যের অনুকরণ করে তার মতো হবার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

এমনিভাবে অধ্যাপক কার্ভার তাঁর ছাত্রদের স্বনির্ভরতা ও স্বাধীন মনোভাব অবলম্বন করতে শিক্ষা দিতেন, নিজেদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিতেন। তিনি তাদের কাছ থেকে উচ্চাদর্শ ও মহৎ আকাঙ্খা আশা করতেন। "প্রায় মহৎ আকাঙ্খা" নয়, কারণ তাঁর মতে 'প্রায়' কথাটা অর্থহীন। "একটা জিনিষ হয় ঠিক হবে, নচেৎ ভুল হবে —এই দুয়ের মাঝামাঝি কিছু হতে পারে না।"

মানবজীবন দুঃখের নয়, তা আনন্দের, জর্জ কার্ভার এই শিক্ষাই সর্বদা তাঁর ছাত্রদের দিয়ে এসেছেন। তিনি বলতেন, দিলখোলা হাসিখুশি মেজাজ নিয়ে জীবনটা আনন্দে ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা কর, দেখবে তার মূল্য অনেক। দুঃখে আছি মনে করে সব সময়ে যদি তোমার কান্না পায়, মুখভার করে থাক তুমি, তবে তোমার দুঃখ কোনকালে ঘুচবে না দুঃখ দুঃখ করে কাঁদলে কিছু হবে না, দুঃখকে জয় করার জন্য আপন পুরুষকারের সাধনা কর, আর তা যদি না পার অন্ততঃ দুঃখকে ভুলে থাকার চেষ্টা কর।

শুধু কেবল টাস্কেগিতে কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ না রেখে জর্জ কার্ভার তার বাইরেও তা ছড়িয়ে দিলেন এবং শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে সব কৃষকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন, হাসিমুখে কিভাবে কাজ করতে হয় এবং হাসিমুখে কাজ করলে কেমন করে তা পরিশ্রমের না হয়ে আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে। এমনিভাবে তাদের চিন্তার দৈন্য দূর করে তিনি তাদের মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন।

১৮

হাজার কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও জর্জ কার্ভার তাঁর দক্ষিণাঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় নিগ্রো ভাইবোনদের কথা ভুলে থাকতে পারেন না। তাদের সেই পশুর মতো জীবনধারণের ছবি চোখ বুজেও স্পষ্ট দেখতে পান তিনি। একটা বড় কাঠের বাক্সের মতো খুপরি একখানা ঘরে, যার দরজা নেই জানালা নেই আলো হাওয়া প্রবেশ করার কোন পথ নেই, সেই স্যাঁৎসেতে অন্ধকার ঘরে ছেলে-মেয়ে-বৌ সব মিলিয়ে দশ-বারো জনের এক-একটা পরিবার খালি মেঝের 'পরে শুয়ে ঘুমোয়। চারিদিকে জঞ্জাল আবর্জনার স্তূপ জমে পাহাড় হয়ে আছে। দুর্গন্ধে হাওয়া বিষাক্ত। রোগ আর মহামারীর সঙ্গে আপোষ করে তারা বাস করে এবং এইভাবে বাস করার নামই তাদের বেঁচে থাকা।

এই শোচনীয় দুঃখময় জীবন থেকে তাদের কিভাবে উদ্ধার করবেন জর্জ কার্ভার ভেবে পান না। কিছুদিন থেকে একটা চিন্তা তাঁর মন অধিকার করে আছে। দক্ষিণ অঞ্চলের এই অসহায় লোকগুলিকে যখন টাস্কেগিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তখন টাস্কেগিকে কেন না ওদের কাছে নিয়ে যাই!

অধ্যাপক জর্জ কার্ভার ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটনের কাছে নিজের পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন, বললেন, সেই দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট লোকগুলি যখন এখানে আসতেই পারবে না তখন আমরাই কেন নিয়ে যাই না তাদের কাছে ভালো বাসগৃহ তৈরি করার সাজসরঞ্জাম, আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং সুন্দর সুখী জীবন যাপনের আদর্শ ও প্রেরণা?

ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন শুধু যে তাঁর আন্তরিক সমর্থন জানালেন জর্জ কার্ভারের প্রস্তাবে তাই নয়, তিনি

প্রেরণা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে কার্ভারকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুললেন

জর্জ কার্ভার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু ক'রে দিলেন। হাতুড়ি বাটালি নিয়ে নিজেই একটা কাঠের গাড়ি তৈরি করলেন, তাতে চারটে চাকা লাগালেন, বসবার আসন এবং জিনিষপত্র রাখবার জন্য জায়গা বানালেন। সবশেষে সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যাবার জন্য তার সঙ্গে একটা খচ্চর জুড়ে দিলেন।

এইভাবে সৃষ্টি হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ভ্রাম্যমান্ কৃষি-বিদ্যালয়।

জর্জ কার্ভার নিজের তৈরি গাড়িতে উঠে বসলেন; তিনিই তার প্রথম সওয়ারী। সঙ্গে নিলেন কয়েকটা জরুরী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যথা, ননী-মাখন তৈরি করার যন্ত্র, পনির পরীক্ষার যন্ত্র, মাখন তোলার মন্থন দণ্ড, কয়েক খানা বই, একটা ইস্পাতের তৈরি লাঙল, উদ্যান পরিচর্যার জন্য বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি ছাড়াও একটা গাভীও সঙ্গে নিলেন। গাভী সঙ্গে নেবার উদ্দেশ্য হ'ল কেমন ক'রে দুধ দুইতে হয় তা গ্রামের কৃষকদের শেখানো। এ ছাড়া কার্ভার তাঁর দু'পকেট ভর্তি ক'রে নিলেন মার্কিন কৃষি বিভাগের সচিব মিঃ উইলসনের পাঠানো কয়েক জাতীয় শস্যবীজের প্যাকেট এবং প্যাকিং বাক্সে জমানো কয়েক রকম ফলের কলমের চারা।

জর্জ কার্ভার প্রত্যহ টাস্কেগি কলেজে ক্লাসের পড়ানো শেষ ক'রেই তাঁর খচ্চরে টানা ভ্রাম্যমান্ কৃষি বিদ্যালয় নিয়ে ঘুরতে যেত্র হন। এ ছাড়াও প্রত্যেক সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনে তো বটেই, অন্যান্য ছুটির দিন-গুলিও তাঁর বাদ যায় না। অবসর পেলেই তিনি কৃষকদের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার উদ্দেশ্যে বের হন।

তিনি কেবল খুঁজে বেড়ান কোথায় কে নিঃস্ব ও অসহায় নিগ্রো কৃষক আছে, হাটে বাজারে গঞ্জে যেখানেই তাদের কয়েকজনকে একসঙ্গে জটলা করতে দেখেন সেখানেই গিয়ে তিনি হাজির হন। কোন গাছের তলায় বা কুড়ে ঘরে ব'সে তাদের সঙ্গে আপনজনের মতো আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি একা একা পল্লীগ্রামে ঘুরে বেড়ান, অজ্ঞাত অখ্যাত অপরিচিত যারা তিনি বিশেষ ক'রে তাদের কাছে যান, তাদের সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের সমস্যার সমাধান বাৎলে দেন। তাদের বিপদ্-আপদের খবর নেন। এমনি ভাবে জর্জ কার্ভার অগণিত দীন-দুঃখী ও অধঃপতিত মানুষের বন্ধু হলেন, তাদের মধ্যে নিজেকে উদার সূর্যালোকের মতো অবাধে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের দুঃখ-বেদনার অংশীদার হয়ে, তাদের চোখের জল মোছাবার ভার নিলেন, তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

যাদের সেবায় তিনি নিজেকে এমন ভাবে সঁপে দিলেন তাদের সকলেই যে এক রকম স্বভাবের লোক ছিল অথবা সকলেই যে তাঁকে খুব পছন্দ করত তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল দাম্ভিক ও অহংকারী, অনেকের মন ছিল সন্দেহের বিষে কালো, পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ! তারা কার্ভারকে সহজচিত্তে গ্রহণ করতে পারল না। এমনি ঈর্ষ্যাপরায়ণ নিগ্রোদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলত, 'তুমি আমাদের চাইতে বড় হ'লে কিসে? তুমিও তো আমাদেরই মতো একজন কালো নিগ্রো, আমাদেরই মতো জন্ম-ক্রীতদাস।' কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। অধিকাংশ লোকই কার্ভারকে পছন্দ ক'রত। তাঁর সব কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনত এবং যে কথাগুলি বুঝতে পারত না তারা তাঁর কাছে প্রশ্ন ক'রে ভালোভাবে জেনে নিত।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে জর্জ কার্ভার অন্তরে অন্তরে বিশেষ ব্যথিত হলেন। নিগ্রো কৃষিজীবীরা উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম ক'রেও পেট ভ'রে খেতে পায় না দুবেলা, যারাও বা একটু সচ্ছল অবস্থার গ্রাসাচ্ছদনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করার দরুণ উপার্জিত অর্থের বেশীর ভাগই ব্যয় হয়ে যায়। তারা কিছুই সঞ্চয়

করতে পারে না। রোগ বা অন্য কোন দুর্বিপাক দেখা দিলে তারা অকূল পাথারে পড়ে।

জর্জ কার্ভার দরিদ্র নিগ্রোদের কাছে অর্থ সঞ্চয়ের পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হলেন, অর্থ সঞ্চয়ের উপকারিতা তাদের বুঝিয়ে দিতে প্রয়াসী হলেন। তারা প্রত্যহ যাতে অন্তত পাঁচ সেন্ট ক'রে জমাবার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারে তার উপরে তিনি বিশেষ জোর দিলেন। তিনি বললেন, "দেখবে, বছরের শেষে তোমাদের এক একজনের তহবিলে অনেক সেন্ট জমা হয়ে টাকার অঙ্ক বেশ বেড়ে যাবে এবং তখন তোমরা ধার দেনা থেকে মুক্ত হ'তে তো পারবেই, দেনার দায়ে আর কখনো তোমাদের জড়িয়ে পড়তে হবে না। দরকার হলে তখন তোমরা অন্যদেরও বিপদে আপদে সাহায্য করতে পারবে। এসব ছাড়াও তোমরা আরও অনেক জমি কিনে, লাঙ্গল কিনে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে পারবে এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিতে ও আরামে দিন কাটাতে পারবে। এছাড়া জোতদারদের কেবল থেকে রেহাই পাবার তোমাদের আর কোন উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

কার্ভারের এসব উপদেশ ও পরামর্শ নিষ্ফল হল না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই লোকে কার্ভারের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারল এবং অনেকের কাছে স্বল্পসঞ্চয় রীতিমত একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল।

যে যেমন করে পারে যেখানে পারে কেবল পয়সা জমায়—হাঁড়ি-কলসী, টিনের কৌটো, এমন কি ঘরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পর্যন্ত লুকিয়ে রেখে পয়সা জমায়। অনেকে ঘরের বাইরে বাগানের কোন বড় গাছের ফাঁপা কোটরে সকলের অজ্ঞাতে পয়সা লুকিয়ে রেখে দেয়। অর্থ সঞ্চয় করার উৎসাহ দেখা দিল সকলের মধ্যে।

ক্রমশঃ

করুণার আধার মাদার টেরেজা

কমলা দাশগুপ্ত

শিশু ভবনের দোতলার বিরাট হল ঘরখানাতে ছোট্ট ছোট্ট খাটে শুয়ে আছে শিশুর দল। ঠিক যেন এক বিখ্যাত প্রকাণ্ড হাসপাতালে ঢুকলাম। পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, আজে বাজে জিনিস নেই, পরিচ্ছন্ন এবং আলোবাতাস পরিপূর্ণ। একটি নান্ তার নিয়ে রয়েছেন। কয়েকটি সিস্টার এবং সেবিকাও নীরবে সস্নেহে কাজ করে চলেছেন। স্নিগ্ধ পরিবেশ, মোহময় মাধুর্য। এটি মাদার টেরেজার শিশুভবন। ১৯৫৫ সালে ৭৮ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে তিনি এটি স্থাপন করেন।

হল ঘরটিতে একটা কাচের ইনকিউবেটার (Incubator)-এর মধ্যে ৬টা খোপ। তার কাঁচের বড় ঢাকনাটা হেলান দিয়ে খুলে রাখা হয়েছে। আরো ২টা ইনকিউবেটার-এর খোপ পাশেই রয়েছে। ১১টা খোপে ১১টি শিশু অকাতরে ঘুমাচ্ছে। —কেউ সেদিনই ভূমিষ্ঠ, কেউ তার আগের দিনে, কেউ বা ২।৩ দিন আগে। শীতের দিন। সবাইকে চমৎকার নরম পুরু বিছানায় শুইয়ে গরম রাখা হয়েছে। তাদের গায়ে স্পর্শ করে আছে ছোট ছোট গরমজলের বোতল—তাও গরম কাপড়ে ঢাকা। শুধু উষ্ণতা ঘিরে রয়েছে শিশুর নরম ঘুমন্ত দেহকে। মায়ের দেহের স্পর্শের মতো উষ্ণ নরম বিছানা। সিস্টার ও কর্মীদের হাতের ও হৃদয়ের স্পর্শ পাচ্ছে শিশুরা। তারা কি জানে তাদের মা নেই?

তারা কেউ জন্মেছে অসময়ে, কেউ বা অতিশয় রুগ্ন, কেউ অন্ধ, কেউ পঙ্গু। কেউ এসেছে ডাস্টবিন থেকে, কেউ পুলিসের কাছ থেকে, কেউ সমাজসেবীর হাত থেকে, কেউবা ছিল রাস্তায় অবাঞ্ছিত, কেউ বা পরিত্যক্ত।

হল ঘরটিতে আছে আরো ৩০টা ছোট্ট ছোট্ট খাটে ৩০টি শিশু। ৭।৮ মাস বয়স পর্যন্ত তারা থাকে এই সব খাটে। সিস্টার এবং কর্মীরা অবিরাম তাদের দেখাশুনা করে চলেছেন। নরম শিশুগুলিকে স্নেহভরে দুহাতে তুলে নিয়ে তাঁরা আদর করছেন, খাওয়াচ্ছেন, পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, প্লাস্টিকের পাজামার নীচের ভেজা ময়লা কাপড় বদলে দিচ্ছেন। কোথাও একটু ধুলো ময়লাও নেই। সুন্দর সুন্দর কম্বলের টুকরো দিয়ে ঢাকা কিন্তু ছট্ফট্ করে চলেছে শিশুরা। কেউ বা উপুড় হয়ে শুয়ে জ্বলজ্বল্ চোখে তাকিয়ে জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ করছে, কেউ আবার হাতে তুলে নিজেই হাঁ হাঁ করে খেতে চাইছে। চাইলে কি হবে, তাদের কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ধরে খাওয়ানো হবে ফিডিং বোতল দিয়ে। পাঁচ মিনিট বাকী থাকলেও খেতে পাবে না।

একটু আগে ইনকিউবেটার-এর একটি শিশুকে দেখেছি, তারের মতো খুব সরু একটি প্লাস্টিকের তৈরী নল দিয়ে তাকে খাওয়ানো হচ্ছে। অসময়ে জন্মেছে বলে নিজে খেতে পারে না। ৫।৬ মাসের বাচ্চাদের খাটের ওপরে প্লাস্টিকের-রঙ্ বেরঙের তার লাগিয়ে চমৎকার সব পুতুল ঝুলিয়ে রেখেছেন—বাচ্চারা অবাক্ হয়ে দেখছে আর হাত পা ছুঁড়ছে।

যে সব বাচ্চা হলঘরে স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে ৭।৮ মাস পর্যন্ত বড় হয় তাদের তারপর সেখান থেকে সরিয়ে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন তারা হাঁটতে শিখবে এবং পাঁচ বছরের হবে তখন এই দ্বিতীয় ঘর থেকে নীচের ঘরে যাবে। দ্বিতীয় ঘরে আছে চোদ্দটি শিশু।

এখানে এসে দেখি কাঠিতে তুলো জড়িয়ে কার নাক পরিষ্কার করা হচ্ছে, কারও মুখ পরিষ্কার করা হচ্ছে, কাউকে ইনজেক্শন্ দেওয়া হচ্ছে। একটি

বাচ্চার পেটটা মস্ত বড় এবং চামড়ার উপর ঘা। সে অপেক্ষা করছে সিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে। কারো বা শরীরে ঘা ও একজিমা। তাকে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো হচ্ছে। সিস্টার ও সেবিকাদের এত স্নেহময় সেবা, যে, দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। তাঁরা যেন ঘৃণা জিনিসটাকে মনের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

এই ঘরে দুটি বাচ্চার পা পঙ্গু কিন্তু শরীরের উপরের ভাগ অতি সুন্দর। হয়তো ভবিষ্যতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানো হবে—হাঁটা স্বাভাবিক করবার জন্য।

যখন সমস্ত ভবনটি শিশুতে ভর্তি হয়ে যায় তখন নতুন বাচ্চা এলে দমদম, বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ, কানপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে মাদার টেরেজার যে সব শিশুভবন আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বেশী হলেও এখানে যাদের না রাখলেই নয় তাদের জন্য এখানেই অন্য ঘরে নতুন ব্যবস্থা করে রেখে দেওয়া হয়। কাউকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

পাঁচ বছর বয়স হলে অনেক ছেলেদের দমদমের "বয়েজ টাউন স্কুলে" পাঠানো হয়—তারা বোর্ডিংএ থাকে। সেখানে বাইরের ছেলেরা পড়তে আসে।

মেয়েরা পাঁচ বছরের হলে অনেকে এন্টালীতে স্কুলে অথবা ক্যাথলিক স্কুলে অথবা কনভেন্টে পড়তে যায়। তারাও বোর্ডিংএ থাকে। ছুটিতে এখানে শিশুভবনে আসে।

দেখলাম ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী দুদিনের প্রজাতন্ত্র দিবস ও ইদ-এর ছুটিতে প্রায় ১৮টি মেয়ে বোর্ডিং থেকে এসেছিল, আবার চলে যাবে। শিশুভবনে এসে আনন্দে দিন কাটিয়ে গেল—এটাই তো তাদের বাড়ী।

তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজে। ছাদে উঠে দেখি, সেখানেও চার থেকে ছয় বছরের বাচ্চারা ভাবী সিস্টারদের সঙ্গে খেলা করছে। তাঁরা এদের চুলে তেল মাখিয়ে জল দিয়ে মুছে নিয়ে চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন—অথবা কার বেণী বেঁধে দিচ্ছেন। মুখ মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। বাচ্চারা দৌড়চ্ছে, খেলছে, হাসছে। দেখলাম, রাঁচী ও কেরালা থেকে দশজন শিক্ষার্থী মেয়ে এসেছেন। তাঁরা সিস্টার হবার ট্রেনিং নিচ্ছেন। একেবারে ছেলেমানুষ, বয়স মাত্র ১৪—১৬। এখানকার ছয় মাস ট্রেনিং-এর পরে আরো তিন বছর সিষ্টার্স ট্রেনিং নিয়ে সিস্টার হবেন।

এদের ট্রেনিং-এর মোটামুটি নিয়ম এই ধরণের—(১) প্রথম অবস্থায় postulent, ছয় মাসের প্রাথমিক ট্রেনিং। (২)দ্বিতীয় অবস্থাকে বলে novice, তখন তিন বছরের, জন্য সিস্টার্স ট্রেনিং নেবেন। শাদা শাড়ী, পাড়বিহীন এবং কাঁধে ছোট ক্রশ। (৩) তিন বছর ট্রেনিং-এর পরে নীলপাড় শাড়ী তাঁদের পোশাক এবং কোমরে বড় ক্রশ। তখন এঁরা professed sisters। কেউ যদি এখানকার অসম্ভব পরিশ্রম সহ্য করতে না পারেন তবে তাঁরা ফিরে চলে যান।

গেলাম একতলার নীচের ঘরগুলি দেখতে। ওপরে যেসব মেয়েরা বড় হয়েছে এবং বোর্ডিংএ না গিয়ে এখানেই রয়েছে, তারা থাকে। আঠারোটি মেয়ে এঘরে আছে। তাদের ১৮টা টিনের সুটকেস ও বিছানা কাছেই গোছানো রয়েছে। সবাই স্কুলে পড়ে এবং ফ্রি। দুটি মেয়ে ক্লাস টুতে পড়ছে।

একতলার দ্বিতীয় ঘরে থাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মেয়েরা, বয়স বার, চোদ্দ, সংখ্যায় আট জন। কিন্তু সুস্থ-মস্তিষ্ক একটি জন্মান্ধ মেয়ে এদের সঙ্গে গল্প করছিল। জন্মান্ধ মেয়েটি অজ্ঞাত জন্মের পর থেকে এখানেই আছে। মানুষের সমান মর্যাদায় আনন্দের সঙ্গেই বড় হয়ে উঠছে সে, বয়স বোধ হয় ১৫।১৬।

দুগ্ধপোষ্য শিশুরা এবং রোগীরা ছাড়া এখানে অন্যদের সাধারণতঃ খেতে দেওয়া হয়—দিনে ডাল, ভাত, তরকারী এবং রাতে ডাল, রুটি,তরকারী। মাঝে মাঝে মাছ মাংসও হয়। টিফিন দেওয়া হয় রুটি, চা, এবং কখনো কখনো কলা।

গেটের কাছে এসে দেখি, সন্ট লেকের জয়বাংলার রেফিউজিদের রান্নার জন্য মশলা বাটা হচ্ছে। ভোর

৩টায় উনুন ধরিয়ে রান্না শুরু হবে, সকাল সাড়ে সাতটায় খাবার নিয়ে গাড়ী চলে যাবে। গাড়ী ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আগে যেত প্রত্যহ পাঁচ মন চালের ভাত ও সেই পরিমাণে তরকারী। এখন যায় আড়াই মণ চালের ভাত ও তরকারী। বৃহস্পতি বারে মাছ এবং রবিবারে মাংস যায়। মাঝে মাঝে ডিমও।

আবার আসি শিশুদের কথায়। অনেক শিশু এখান থেকে দত্তক রূপে চলে যায়। নতুন গৃহে গিয়ে নতুন পিতা-মাতার আদর ভালবাসার মধ্যে তারা আশৈশব মানুষ হয়। দত্তক সন্তান সংসারে গিয়ে একেবারে মিশে যায়। আমরা জানি, পোষ্য নেন যে পিতামাতা তাঁরা নিজেদের তৃষিত পিতৃমাতৃস্নেহই ঢেলে দেন অজস্র ধারায়। অনেকে হয়তো জানেও না তাদের অতীত কি। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সঙ্গে এবিষয়ে এঁদের যোগাযোগ আছে।

অনেক শিশু দত্তক নয়, এখানেই প্রতিপালিত হয়। কিন্তু দূর থেকে প্রতিপালক পিতামাতারূপে (foster parents) এক একটি শিশুর ভার গ্রহণ করেন অর্থ ও জিনিস দিয়ে। মানবদরদী প্রতিপালক পিতামাতা তাঁরা।

শিশুরা যখন একটু বড় হয়, তাদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। যারা লেখাপড়ায় তেমন সুবিধা করতে পারে না তাদের হাতের কাজ বা সেলাই শেখানো হয়। তখন প্রতিপালক পিতামাতার টাকা কাজে লাগে। এই সব ছেলেমেয়েরা বড় হলে মাদার টেরেজা বিয়ের ব্যবস্থাও করেন। প্রতিপালক পিতামাতার দেওয়া অর্থ যা বাঁচে তা বিয়ের সময় তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিপালক পিতামাতারা ইয়োরোপ আমেরিকার মতো দূর দেশ-দেশান্তরেও থাকেন, আবার এ দেশেও আছেন।

যদিও অনেক শিশু এখানে বস্তির দুঃস্থ মা-বাবার কাছ থেকে আসে, কিন্তু অনেকেই তারা আর কোনো দিন বস্তিতে ফিরে যায় না।

কোনো কুমারী মা অসহায় ভাবে মাদার টেরেজার কাছে এলে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় হাসপাতালে সসম্মানে। এখানে মাদারের কাছে সন্তানটিকে চিরদিনের জন্য রেখে সে চলে যায় শিশুর বাকী জীবনের ভার নেন মাদার।

কোনো দরিদ্র স্বামীর ঘরের বৌ দারিদ্র্যের পেষণে সন্তান প্রতিপালনে অপারগ হলে সেও তার বাচ্চাকে মাদারের কাছে ভার দিয়ে রেখে চলে যেতে পারে। মাদার সর্বদায়িত্ব নিয়ে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন। পরে ইচ্ছে করলে মা এসে নিয়েও যেতে পারে। অসহায় পঙ্গু, অন্ধ সন্তানরাও এখানে স্থান পায়।

একটি আঠারো বছরের মেয়েকে দেখলাম অন্তঃসত্ত্বা। কোনো বাড়ীতে রান্না করে ও বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। এখানে এসে রয়েছে। বাচ্চা হয়ে গেলে কয়েকদিন পরে আবার কাজে যোগ দিতে চলে যাবে। স্বামী পাগল হয়ে হারিয়ে গেছে। এই মেয়েটিও কিন্তু এখানকার শিশুদের সেবাকাজে সাহায্য করছে।

আর একটি সতেরো বছরের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে। এখানে বাচ্চা হয়ে গেলে পরে আবার সে মা-বাবার কাছে চলে যাবে।

ত্রিপুরা থেকে একটি বৌদ্ধ মহিলা প্লেনে এসে এখানে রয়েছেন, হাসপাতালে চোখের অপারেশন করিয়েছেন, চিকিৎসা হচ্ছে।

জয়বাংলার বর্ডার থেকে যারা এসেছেন তাঁদেরও বিপন্ন শিশুকে এখানে, রাখা ও লালন পালন করা হচ্ছে। ইচ্ছে করলে মা এখানে থেকে নিজেও দেখাশোনা করতে পারেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে জয়বাংলার যুদ্ধের কাহিনী করুণ। জয়বাংলা থেকে ক্রীশ্চান ও হিন্দু মেয়েরা অনেকে চলে এসেছেন—তাঁদেরও বাচ্চা হবে। পনেরো বছরের মেয়েটির স্বামী মুক্তি বাহিনীর সেনা ছিলেন—তিনি যখন পলাতক ছিলেন মেয়েটি পালিয়ে আসে।

সতেরো বছরের মেয়েটি নদীয়া থেকে এসেছে—

স্বামী পাকিস্তানী মিলিটারীর আতঙ্কে টিকতে না পেরে স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে ফাদারের সাহায্যে।

চব্বিশ বছরের মেয়েটির স্বামীকে পাক-মিলিটারীরা কেটে ফেলেছে। দমদমে এসেছে হেঁটে। সেখান থেকে সিস্টাররা নিয়ে এসেছেন—বাচ্চা হতে বেশী দেরী নেই।

শিশু ভবনে এবং বাইরেও মাদার টেরেজা অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। কতগুলি বস্তিস্কুলও আছে। সেগুলি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নয়।

সেখানে বস্তির বাচ্চারাও পড়তে আসে, এখানকার বাচ্চারাও যায়। কোথাও বস্তির গাছের তলায়, কোথাও ছোট চত্বরে, কোথাও মাসিক কয়েক টাকা ভাড়ায় মাটির ঘরে স্কুলগুলি চলে। কোথাও তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বাচ্চাদের জন্য নার্সারি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

মাদার টেরেজার সেবাসংঘের কর্মীরা এদের পড়ান। অনেক সময় রাস্তার ফুটপাথ এদের ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ করে, আবার ধনী স্কুলের পরিত্যক্ত জিনিসও এঁরা ব্যবহার করেন। স্কুলে বাচ্চারা দুপুরে খাবার এবং দুধ পায়।

শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়, ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে অর্থ, দুধ, ওষুধ, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসের অকাতর দান ও সাহায্য। অর্থের অনটন তাঁর হয় না। অকৃপণ দানের অফুরন্ত ধারায় উৎসাহিত মাদার টেরেজা খুলেছেন বহু খাদ্য বিতরণ ও কোঅপারেটিভ কেন্দ্র। শত সহস্র মানুষ এখানে এসব জিনিস পেয়ে বেঁচে যায়।

এককালীন অর্থ দিয়েও তিনি গরীবকে সাহায্য করেন জরুরী প্রয়োজনে। দুঃস্থরা হয়তো কখনো পেলেন বাড়ীভাড়া, কখনো স্কুলের বেতন, বই, বিয়ের সাহায্য, ওষুধ ও রক্ত পাবার অর্থ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য। বান্ধব কাকে বলে? ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শ্মশানে সর্বত্রই, মাদার দুঃখীর বন্ধু। পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে রয়েছেন।

বস্তি এলাকায় তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, কুমারী মায়েদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর সহকর্মীসংঘের ডাক্তার ও নার্সরা অকাতর সেবা করে চলেছেন।

বর্তমানে মাদার কয়েকজন ডাক্তার সিস্টারদের নিয়ে ঢাকা গেছেন একই আদর্শ মাথায় নিয়ে। সেখানেও তাঁর পরিকল্পনা আছে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী ফৌজদের জঘন্য বর্বরতায় প্রায় দুই তিন হাজার মেয়ে, যাদের বাচ্চা হবে, সেই মেয়ে ও শিশুদের জন্য আশ্রয়স্থল খুলবেন। মরণাপন্ন দুঃস্থদের জন্য শেষ আরামের স্থান খুলবেন, অসহায়দের জন্য সাহায্যকেন্দ্র, ওষুধ ও চিকিৎসাকেন্দ্র খুলবেন। তিনি বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ও পুনর্বাসনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

নির্মল হৃদয়
অথবা
অন্তিম সেবাঘর

প্রতি মানুষ জন্মমুহূর্ত থেকে ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন গগন পার হয়ে এগিয়ে চলেছে দিনান্তের যাত্রাপথে। জন্মের সময়ও যেমন অনেক শিশু অবাঞ্ছিত ও হতভাগ্য থাকতে পারে, মৃত্যুর দ্বারে এসেও তেমনি অনেক মানুষ পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত, নিরুপায় হয়ে ফুটপাথে পড়ে থাকতে পারে। মাদার টেরেজা তাদেরও মনে রেখেছেন।

কলকাতার কালীঘাটের বিখ্যাত কালীমন্দিরের কাছে ছিল একটি ধর্মশালা। আগে সেখানে দরিদ্র তীর্থযাত্রীরা আশ্রয় নিতেন। মাদার এই ধর্মশালার বাড়ীটিকে পরিণত করেছেন দরিদ্র মৃত্যুপথযাত্রীদের অন্তিম সেবাঘরে। নাম দিয়েছেন নির্মল হৃদয়। ২৫১ নং কালীঘাট রোডে এটি অবস্থিত। বাড়ীটি কর্পোরেশন থেকে পাওয়া।

কলকাতায় রাস্তার ও অলিগলির নিরাশ্রয় মুমূর্ষু রোগীরা এখানে আশ্রয় পায়। ডাক্তার সিস্টার গার্ট্রুড (Dr. Sister Gertrude) এদের চিকিৎসা করেন।

আরো একটি ডাক্তার রবিবারে আসেন। সিস্টাররা এবং সেবিকারা মনে করেন যেন ভগবান্ রোগীর রূপ ধারণ করে আর্ত হয়ে সেবা চাইছেন। এমনই নিষ্ঠায় এঁরা সেবা করে চলেছেন।

এখানে অন্তিমকালের রোগযন্ত্রণায় কাতর মানুষ কতরকমের ভেদ বাস ক্লেদ ঢেলে চলেছেন। তবু কিন্তু অকাতরে দরদের সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে সিস্টার ও সেবিকারা তাদের সেবা করে চলেছেন। পরিষ্কার রাখবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

খাবার রয়েছে। চার বারই খেতে দেওয়া হয়। লোহার ফ্রেমের উপর বিছানাগুলিও নরম, কিন্তু মাটি থেকে বোধহয় এক বিঘৎ উঁচু পাছে অচৈতন্য থাকলে মাটিতে পড়ে যায়, এই আশঙ্কা।

সকলেই যে মারা যায় তা নয়। অনেক যন্ত্রণাকাতর মানুষ কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও খাদ্য পেয়ে ভালও হয়ে ওঠে, অবশ্য যদি তাদের জীবনীশক্তি থাকে। একটি মুমূর্ষু বালককে আনা হয়েছিল রাস্তা থেকে। সে তো দেখলাম সুন্দর স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে সেরে উঠেছে এবং এখানকার কাজই করছে। আনন্দে ভরে আছে মুখখানা।

আবার অনেকে স্নেহ যত্ন সেবা পেয়েও মানুষের যোগ্যভাবেই মৃত্যু বরণ করে।

কাছেই অবস্থিত কেওড়াতলা শ্মশান। মৃত্যু হলে হিন্দুদের হিন্দু সৎকার সমিতি, মুসলমান হলে অঞ্জুমান এবং ক্রীশ্চান হলে লরেন্স কোম্পানী থেকে গাড়ী এসে শবদেহ নিয়ে যায়।

কুষ্ঠরোগী

পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগীদের বোধহয় সীমাসংখ্যা নেই। এ দেশেও হাজার হাজার কুষ্ঠরোগী গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে আশ্রয় এবং খাদ্যের জন্য। তাদের চিকিৎসাও হয় না। এরা অনেক সময় বস্তিতে আশ্রয় নেয়। মাদার টেরেজা দুঃখীর দুঃখ আপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। তাঁর ডাক্তার নার্স ও সেবক-সেবিকাদল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র নিয়ে এই সকল বস্তি এলাকায় প্রতিদিন যান। কুষ্ঠরোগীরা রাস্তায় অথবা গলিতে তাঁদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। তাদের যেমন চিকিৎসা করা হয় তেমনি ব্যবস্থা করা হয় বিনা মূল্যে ওষুধ ও খাদ্যের। যদি তারা সম্পূর্ণ সুস্থ নাও হয় তবু তাদের পরিবারে অথবা সমাজে এই রোগের সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়।

অসংখ্য রোগীর পরিচর্যার জন্য অনেক চিকিৎসা কেন্দ্রই মাদার খুলেছেন। এইসব ছিন্নমূলদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্তরঞ্জনের কাছে শান্তিনগর নামে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। ২০০/০০ রোগী হাসপাতালে আছে। সংক্রমণমুক্ত হলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে কলোনী আছে তাদের। কেউ কেউ কলোনীতে সপরিবারে থাকে।

এই কলোনীতে স্কুলও আছে। বিভিন্ন কাজের কিছুকিছু শিক্ষাও দেওয়া হয়, যাতে তারা ভিক্ষা করতেই বাধ্য না হয়। যাতে তারা শান্তিতে থাকতে পারে এবং জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুঁজে পায়।

ভারতবর্ষে অন্ততঃ ৩৪টি শহরে মাদারের এরূপ কেন্দ্র আছে।

পৃথিবীতে চরম দুঃখ যা কিছু আছে তা বোধহয় সবই মাদার টেরেজার হৃদয় ছেয়ে আছে। তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন মাতৃহৃদয়ের আকুলতা দিয়ে। বিশ্বমানবতা ও দরদবোধ তাঁকে এদের একেবারে কাছে নিয়ে গেছে। তিনি যেন করুণার আধার।

তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কোন প্রেরণায় আপনি এ কাজে নামলেন? নম্র হৃদয়ে তিনি বাংলায় উত্তর দেন—"ভগবান্ আমাকে আহ্বান করেছেন, আমি তাই এ কাজ না ক'রে পারি নাই।" তারপর বাইবেলের ভাষায় ইংরাজিতে বলেন -

"I was hungry and you gave me to eat
I was sick and you visited me
I was naked and you clothed me
I was thirsty and you gave me to drink
I was homeless and you took me in."

এই কথাগুলি যেমন মাদার টেরেজাকে প্রেরণা দেয় তেমনি মাদার টেরেজাও এই কথা দিয়েই অন্তরের প্রেরণা দেন। তাঁর Missionaries of Charity নামক সংঘে স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সব রকমের ঘর থেকেই সেবাব্রতীরা এসে যোগ দেন, তাঁদের নিঃস্বার্থ কাজ করবার প্রেরণা আসে। তাঁদের যেমন কাজের শিক্ষাও দেওয়া হয় তেমনি স্পিরিচুয়াল ট্রেনিংও দেওয়া হয়। মাদার তাঁর Missionaries of Charity পরিপূর্ণভাবে সংগঠন করেন ১৯৫০ সালে।

১৯১০ সালে আলবানিয়াতে মাদার টেরেজা জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি লরেটোর সিস্টার রূপে কলকাতায় আসেন। কুড়ি বছর সেখানে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ১৯৫০ সালে চার্চের অনুমতি নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Missionaries of Charity নামে সেবাসংঘ।

তাঁর কাজ আজ পৃথিবীর বহু জায়গায় বিস্তৃত। ভেনজুয়েলা, সিংহল, টানজেনিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, ইটালী, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁর বিশ্বমানবতার কাজ ছড়িয়ে আছে।

করুণাময়ী মাদার টেরেজাকে দেখে সেদিন যখন ফিরে এলাম, প্রাণটা আমার তৃপ্তিতে ভরে গেল।

৪. ২. ৭২.

ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার অমৃতলোকে গিয়েছে যে পথ—
সে পথে দুস্তরাসিন্ধু, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত,
অরণ্য দুরতিক্রম্য, সঙ্কট চরম।
ওঠো, জাগো ; সেই পথ করো অতিক্রম
কুণ্ঠাশূন্য পদক্ষেপে। তুমি অনন্তের।
ভূমার চরণপ্রান্তে চির বসন্তের
পুষ্পিত আনন্দলোকে তব ভদ্রাসন।
অল্পে কবে কে পেয়েছে তৃপ্তি চিরন্তন ?
জনতার করতালি যশ যে আধুল
মধ্যাহ্নের গর্ব যত গোধূলিতে ধূলি।
কামনার মৃত্যুজালে বদ্ধ শিশুদল
মর্মে হায় নৈরাশ্যের শিলা জগদ্দল
ওষ্ঠে হাসি, ছলনায় কখনো ভুলো না
অধ্রুবে ধ্রুবেরে কভু করো না প্রার্থনা।

ছায়াময়ী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কোন্ স্বাতীনক্ষত্রের সলিল-সম্পাতে
উঠেছিলে ফুটে তুমি এবক্ষ-সম্পুটে
দুগ্ধশ্বেত মুক্তাসম অলখে কখন
নাহি জানি। কবে এলো যৌবন-জোয়ার
তব দেহ-যমুনায় জাগাইয়া তুলি'
ক্ষণিকের উতরোল আকুল হিল্লোল
তটপ্লাবী। শুধু একখানি ক্ষীণ রেখা
রেখেছে সে এ জীবন বেলা-বালুকায়
লীয়মান। মুহূর্তের আনন্দ-কূজন ,—
তারপর কোথা পিক— কোথা উপবন—
কোথা মত্ত ফাল্গুনের প্রগল্‌ভ প্রলাপ।
কবে দিয়ে নিমেষের অঞ্চল-আভাস
মিশে গেলে কোন্ শূন্যে হায় ছায়াময়ী,
বর্ষিয়া আঁখি-কোণে নিশিত কার্মুক।

পশ্চিমবঙ্গের নাম রাখা হোক "বঙ্গভূমি"

(দ্বিতীয় পর্যায়[১])

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন আবশ্যক। "পশ্চিম" পরিত্যাগ করলে থাকে—"বঙ্গ"। "বঙ্গ" নামটি ঐতিহ্য পরিপূর্ণ। আড়াই হাজার বছর যাবৎ এই নামটি আমাদের সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের নানা গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে "বঙ্গ" নামই আছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে—কেবল "বঙ্গ" নাম রাখা যাবে, না ওর সঙ্গে আর কিছু যোগ করা হবে? আর কিছু যোগ করার প্রস্তাবে "বঙ্গভূমি" ও "বঙ্গ প্রদেশ"—এর কথাই মনে আসে।

"বঙ্গ প্রদেশ" নাম শ্রুতিকটু। তার চেয়ে "বঙ্গভূমি" অনেক শ্রুতিমধুর। জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথও একাধিকবার তাঁর কাব্যে বঙ্গভূমি নাম ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে তাঁর দুটি প্রসিদ্ধ কবিতার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"নমোনম নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল—নিশীথ শীতল স্নেহ।

'দুই বিঘা জমি" রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম, পৃ-৬৭৯।

এই কবিতায় পশ্চিমবঙ্গের রূপ ফুটে উঠেছে।

বঙ্গমাতা

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।"

ঐ প্রথম খণ্ড, ৫৬১ পৃষ্ঠা।

আমাদের ভাষায় "ভূমি" শব্দের একটি সুমধুর, অন্তরঙ্গ ব্যবহার-জাত অর্থ আছে—যা দেশ (বা প্রদেশ) শব্দের মধ্যে পাই না। তাই আমরা বলি—জন্মভূমি, মাতৃভূমি।

মানভূম, ধলভূম, সিংভূম, বীরভূম মল্লভূম, (মল্লভূমি) প্রভৃতি, স্থান, দেশ রাষ্ট্রবাচক ভূমি শব্দের ব্যবহার আমাদের ভাষায় যথেষ্ট আছে।

পৃথিবীর অন্য ভাষাতেও দেশ শব্দের বদলে অনেক জায়গায় "ভূমি" শব্দের প্রয়োগ দেখি।

যথা—ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে, যথা অথর্ব বেদে (১২।১।১২) ভূমিকে মা (মাতা ভূমিঃ) বলা হয়েছে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকও ভূমিকে মা বলেন। গ্রামে গ্রামে একটা কথা ছেলেবেলা হতে শুনে আসছি—" মাটি—মা'টি।" অর্থাৎ মাটি (বা ভূমি) আমাদের "মা"।

"ভূমি" যে মাতা, এবং মাতারও মাতা—তাও রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়।

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।"
"ও গো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ
তোমার বুকে।"
"তুমি যে সকল সহা, সকলবহা, মাতার মাতা॥"
"ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি
মা—"

রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ম, ১৮৯-৯০ পৃষ্ঠা।

১। প্রথম পর্যায়, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৭৮।

২। প্রাচীনতম গ্রন্থ—ঐতরেয় আরণ্যক, ২।১।১; বৌধয়ন ধর্মসূত্র, ১।১।১৪; অথর্ববেদ পরিশিষ্ট, ১।৭।৭।

৩। পশ্চিমবঙ্গের "বাংলা" নাম রাখার প্রস্তাবও উঠেছে। "বাংলা" ও "বাংলাদেশ"—দুই নামের এমন মিল যে ভবিষ্যতে নানা অসুবিধায় পড়তে হবে।

"বঙ্গদেশ" নাম রাখা সঙ্গত নয়—কারণ এক দেশের এক রাষ্ট্রের (ভারতের) অন্তর্গত ভূখণ্ডকে "দেশ" বলা যায় না।

"বাংলাদেশ" একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সুতরাং সেখানে "দেশ" শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত।

ঐতিহাসিক দৌড়

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

মেলবোর্ণ অলিম্পিকের এক ঐতিহ্যময় দৌড়। ইতিহাসের পাতায় এ দৌড় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ দৌড় কখনও বিস্মৃত হবার নয়।

লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ষ্টেডিয়াম তখন গমগম করছে। এবার আটশত মিটার দৌড়ের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত পর্য্যায়ের মনোনীত আটজন প্রতিযোগীর মধ্যে পাঁচজন ইতিমধ্যেই জগদ্বিখ্যাত। এদের মধ্যে কেউ করেছেন বিশ্ব-রেকর্ড, কেউ বিশ্ব রেকর্ডের সমান সময় আর কেউ বা করেছেন বিশ্ব-রেকর্ডের অতি নিকটবর্ত্তী সময়।

আটজন প্রতিযোগীকে তাদের নিজ নিজ ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। যথাসাধ্য নিয়োজিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আটজন দৌড়বীর।

পিস্তল গর্জ্জনে দৌড় শুরু হল। ঝড়ের গতিতে সমান তালে ছুটে চলেছেন আটটি দুর্নিবারগতি দৃঢ়চিত্ত যুবক।

পঞ্চাশ গজ দৌড়ের পর Annie Sowellকে একটু এগিয়ে থাকতে দেখা গেল। দুর্দাম গতিতে ছুটে চলেছে Pittsburgএর এই দৌড়বীর। হারাতেই হবে সকলকে। দৌড়চক্রের বাঁকের মুখে বিরুদ্ধ বায়ু দেখা দেয় প্রতিবন্ধকে রূপে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার গতি সীমিত হয় না। সাধ্য-শক্তির শেষ কণাটুকু পর্য্যন্তও নিয়োজিত করে গতির সমতা বজায় রাখে।

লক্ষ কণ্ঠে Sowellএর নামে জয়-ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু উত্তেজনার এই মুহূর্ত্তে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে সে বোধহয় একটু ভুল করে। কিন্তু পরাজিত হওয়ার জন্য এই একটু ভুলই যথেষ্ট।

Annie Sowellএর ঠিক পেছনেই দেখা গেল Fontana Universityর Tom Courtneyকে, আর তাকে অনুসরণরত তখন এক হাজার মিটারের বিশ্ব-রেকর্ড অধিকারী নরওয়ের Boysen।

এদের পেছনেই ছুটে আসছেন তখন ব্রিটেনের তড়িৎ গতি সম্পন্ন Johnson, আর তার পেছনে Californiaর Louie Surrierকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তীব্রগতিতে তেড়ে আসতে দেখা গেল। চলল পাঁচজন বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীরের এই অমানুষিক প্রতিযোগিতা।

এক অভাবনীয় অসম্ভব দৃশ্য। দর্শকগণ বাক্‌শক্তিহীন। উত্তেজনামুখর ষ্টেডিয়াম, কিন্তু স্তম্ভিত ও নিস্তব্ধ।

উত্তেজিত হতবাক্ জনতাকে পরবর্তী বিস্ময়ের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষারত দেখা যায়।

বাঁকের মুখ এলো, Sowellএর পা-দুটি যেন কাঁপছে। দুপায়ের দূরত্বের ব্যবধান যেন একটু কমে গেছে। হ্যাঁ এইটুকুই যথেষ্ট। Tom Courtneyকে দেখা গেল দৌড় চক্রের ঠিক মধ্যেখানে Sowellকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এর ঠিক পর মুহুর্তেই অপর তিন দৌড়বীর ঝবাবের মতন পেছন থেকে বেরিয়ে এসে Sowellকে ঘিরে ফেলে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলল।

চক্রপথের শেষ বাঁকের নিকট তাদের দৌড়তে দেখা গেল এবার। শ্রান্ত ক্লান্ত Courtney সম্পূর্ণ হতশ্বাস অবস্থায় ছুটে চলেছেন। মাথায় যন্ত্রণা এবং অবশ দুটি পায়ের সঙ্গে অনুভব করছেন এক অতীব পীড়াদায়ক ক্লান্তি। কানের মধ্যে ভেসে আসছে দর্শকগণের উল্লাস-ধ্বনির একটা ক্ষীণ রেশ।

Tom Courtney চিন্তা করতে করতে ছুটে চলেছেন—সকলেই তো এখন সমান পরিশ্রান্ত, অতএব এই ভাবেই চলুক।'

সহসা দেখা গেল Johnson বেরিয়ে আসছেন। তিনি Courtneyকে ফেলে প্রায় দু'গজ এগিয়ে গেলেন। এইবার আরম্ভ হয় শেষ পর্য্যায়ের চরম দৌড়। পরিশ্রান্ত Courtney Johnsonকে এগিয়ে যেতে দেখলেন। হঠাৎ এই সময় আলোড়িত হয়ে উঠল তার মন—"জিততে তাকে হবেই।" সমস্ত চিন্তা ক্লেশ সরিয়ে দিয়ে ঐ একটি কথাই তখন তার মনে জেগে রইল "জিততে তাকে হবেই।"

দৌড়ের শেষ দশ গজ থাকতে দেখা গেল দু'জনেই সমান যাচ্ছেন। অতঃপর দৌড়ের পরিসমাপ্তি। শোনা গেল দৌড় শেষ করে Tom Courtney অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মাইকে শোনা গেল "বিজয়ী Tom Courtney ফিতা স্পর্শ করেই মাঠের মধ্যে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। সুতরাং পুরস্কার বিতরণ উৎসব একটু দেরীতে হবে।

তারপর সেই বিজয়োৎসব পালিত হয়েছিল সেই সময়ের আরও একঘণ্টা পরে—যখন Courtney একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

এ এক স্মরণীয় কীর্তি যা দেখে ষ্টেডিয়ামের একলক্ষ লোক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নির্বাক্ ও নিস্পন্দ হয়ে উঠেছিল। তাই বলছিলাম সাত্যিই এ এক 'ঐতিহাসিক দৌড়।'

এটম্ বম্

যোগানন্দ দাস

এলো বুঝি ঐ এটম্ বম্।
তাথৈ তাথৈ নাচে ভৈরব
গগনে গগনে বাজে ঐ রব—
ববম্ বম্।
ঐ এলো বুঝি এটম্ বম্।

আন্ ঘড়া ঘটি কল্সী আন্।
ভূত প্রেত দানো পিশাচ কুল
নাচে উল্লাসে হ'য়ে আকুল,
বহিবে এবার ছাপি' দুকূল
রক্ত-বান।
পূরিবে যে আশা
মিটিবে পিপাসা
মুক্তরক্ত করিয়া পান,
দুই কশ বেয়ে সে শোণিতধারা ব'বে উজান।
আন্ ঘড়া ঘটি কল্সী আন্।

লালে লাল হ'ল আকাশ-কোল।
ঘরে ঘরে জ্বলে বহ্নি চিতায়,
কিবা দুখ শোক ভাবনা কি তায়,
আজি লেগে গেছে শত্রু-মিতায়
গণ্ডগোল।
সবি যে আহবে
পুড়ে ছাই হবে,
কেটে কুটি-কুটি চিতায় তোল্।
বাজা রে কাঁসর বাজা রে ঘন্টা ঢক্কা ঢোল্
লালে লাল হ'ল আকাশ-কোল।
ঐ শোনা যায় অট্টহাসির হট্টরোল্।
আসিছে মড়ক, আসে মহামারী।
কঙ্কাল দল হাসে সারি সারি।
কাতারে কাতারে ভিখারী ভুখারী
তোলে পটোল্।
লাখে লাখে টাকা,—
ফের ঘোরে চাকা,
বাজার যেন না বে-কন্ট্রোল্,
মরিবে মরুক্ বগল বাজায়ে দে হরিবোল।
ঐ শোনা যায় অট্টহাসির হট্টরোল্।

নাচ্ সবে মিলে নাচ্ দেদার।
দুনিয়াটা পুড়ে হ'বে ছারখার,
মাংস-পোড়া বাস পাই যে তাহার।
শ্মশানে শ্মশানে শিবা-চিৎকার
চমৎকার!
এবার জুটিবি,
ছুটিবি লুটিবি
যত ধন আছে যত মড়ার।
পাবি না এমন জোর মরশুম পাবি না আর।
নাচ্ সবে মিলে নাচ্ দেদার।

আকাশের পাশে ঐ বুঝি আসে
ও কে উঁকি মারে, মৃদু মৃদু হাসে,—
হিসাবের মাঝে লাগিল গোল?
দে দোল্ দোল্।

———

(২৭ জুন, ১৯৫০ কোরিয়ার যুদ্ধে জেনারেল ম্যাক্‌আর্থার যখন এটম্ বোমা প্রয়োগের আশ্বাস দেন, সেই সময়ে লেখা। ম্যাক্‌আর্থারের দিন কি আজ গত হয়েছে?)

মিতে

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামপুরের জমিদারপুত্র সুবোধকুমার ভৈরব নদের জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেছিল। নৌকা যখন খানিক দূর ভাসিয়া যাইতেছিল তখন সে একটি কঞ্চি দিয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরের কাছে আনিতেছিল। এমন করিয়া সে ও তাহার নৌকা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেল।

গ্রামের বাহিরে আসিয়া বালকের চমক ভাঙ্গিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, পাখীরা কলরব করিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতেছে, কৃষকেরা মাঠের কাজ সারিয়া লাঙ্গল কাঁধে বাড়ির দিকে চলিয়াছে। অপরিচিত স্থানে রাত্রি আসিল দেখিয়া সুবোধকুমারের প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মা তাহার কাছে নাই,–সে মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সুবোধকুমারের সমবয়স্ক একটি বালক একগোছা ছোলার শাক হাতে করিয়া সেইদিকে আসিতেছিল। সে সুবোধকুমারকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোত্থেকে এসেচ ভাই? কোথায় যাবে?"

সুবোধ বলিল, "আমি পথ ভুলে গেছি—আমি বাড়ি যাব।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

সুবোধ বলিল "ইসলামপুর জমীদারদের বাড়ি।"

বালক বলিল, "তুমি ভয় কোরোনা, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব। এখন আমাদের বাড়ি আমার মা'র কাছে চল"

অপরিচিত স্থানে বন্ধু লাভ করিয়া সুবোধ চক্ষের জল মুছিল। বালক সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সুবোধকুমার।"

বালক বলিল, "আমারও ভাই তাই নাম। ভারি মজা, না? আজ থেকে তুমি আমার মিতে। সুবোধকুমারের মুখে হাসি ফুটিল।

সুবোধ তাহার মিতের হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়িতে আসিল। ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির বাহিরে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া বেগুনের ক্ষেত করা হইয়াছে, বাড়ির দেয়াল বাহিয়া কুমড়োর গাছ উঠিয়াছে। বাড়ির ভিতর উঠানের এক পাশে তুলসী মঞ্চে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আর এক পাশে মাচার উপর শসা ঝুলিতেছে। ভিতরে দুইটি মাত্র ঘর—একটি ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে আর একটি ঘর অন্ধকার।

বালকদের গৃহপ্রবেশ-শব্দে একটি স্ত্রীলোক ত্রস্তপদে যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আরে হাবলা এসেছিস্। আমি সন্ধ্যে থেকে ঘর আর বার করছি। দেরী করলি কেন। আমি ভেবে ভেবে মরছিলাম। সঙ্গে এ কে?"

হাবলা বলিল, "মা, সেই কথাটাই আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়। বল দেখি কে?"

মা বলিল, "আমি যদি তাই জানব তবে জিজ্ঞাসা করব কেন।"

হাব্‌লা বলিল, "একটা আন্দাজ করে' বল না।"

হাব্‌লার মা বলিল, "ক্ষ্যাপা ছেলে, এতে কি আন্দাজ করব—তুই বল্‌না কে?"

"বলব, তবে বলব, এ আমার মিতে" এই বলিয়া হাব্‌লা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাব্‌লার মা হাব্‌লার মুখে সব শুনিয়া সুবোধকে আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কোন ভয় নেই বাছা আমরা তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসব।"

হাব্‌লা বলিল, "মা, মিতে মা মা বলে কাঁদছিল।" "বাছা আমার, বাবা আমার বলিয়া হাব্‌লার মা সুবোধকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল এবং স্বহস্তে তাহাকে খাওয়াইল—খানকতক শসা, একটু ছানা, একটু মোহনভোগ—বিধবার ঘরে আর কিছু ছিল না। খাওয়া হইলে হাব্‌লার মা পুত্রের হাত ধরিয়া এবং সুবোধকুমারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে কোলে করিয়া জমীদার-বাড়ি চলিল।

জমীদার বাড়িতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। দরওয়ান, চাকর-বাকর হাঁকডাকে গ্রামখানি সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। গালপাট্টাধারী আকালী সিং দীর্ঘ যষ্টি হস্তে "খোকাবাবু কিধার গিয়া", "খোকাবাবু কিধার গিয়া" বলিতে বলিতে একদিক দিয়া চলিয়াছে। চাকর-বাকর লণ্ঠন হাতে আর একদিক দিয়া ছুটিয়াছে।

এমন সময় হাবলার মা সুবোধকে কোলে করিয়া বাড়ির ভিতর হাজির। গৃহিণী এতক্ষণ সপ্তমে সুর চড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন, সুবোধকে দেখিয়া সুর নামাইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে হাব্‌লার মাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী উঠিলেন। চাবির গোছা ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে উপরে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাব্‌লার মা'র হাতে দুইটি টাকা দিতে গিয়া বলিলেন—"ওগো ভালমানুষের মেয়ে, এই দু'টাকা দিয়ে তোমার ছেলেকে নতুন কাপড় কিনে দিও।"

হাব্‌লার মা অপমানিত বোধ করিয়া "আমরা ভিখিরি নই গো আমরা গেরস্ত ঘরের মেয়ে"—এই বলিয়া হাব্‌লার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুবোধ ছুটিয়া আসিয়া হাব্‌লার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, এ আমার মিতে। একে আজ আমাদের বাড়ি থাকতে বল।"

গৃহিণী হাব্‌লার মার উত্তর শুনিয়া রাগে গস্ গস্ করিতেছিলেন, ঠাস করিয়া সুবোধের গালে চড় মারিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মিতে পাতবার আর লোক পাওনি? চল্ ওপরে চল্।" সুবোধ হাব্‌লার গলা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাব্‌লার চোখ্ ছল্ ছল্ করিতেছিল। সে আস্তে আস্তে মার সঙ্গে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

তারপর হাব্‌লার সঙ্গে সুবোধকুমারের অনেকবার দেখা হইয়াছে। মাঠে, ঘাটে সুবোধ হাব্‌লার হাত ধরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা, সমস্ত সকাল বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে। চাষাদের ক্ষেতে চাষাদের সঙ্গে আলু তুলিয়াছে, বাগানে ফুল তুলিয়াছে, নদীতে নৌকা ভাসাইয়াছে, পুকুরে মাছ ধরিয়াছে,—সুবোধের মা অনেক মারিয়া ধরিয়াও সুবোধকে পারিয়া ওঠেন নাই। সুবোধ জলখাবারের যাহা পয়সা পাইত খাবার কিনিয়া মিতেকে খাওয়াইত—তাহার মিতেও তাহাকে বাড়ি লইয়া গিয়া মাকে দিয়া লুচি ভাজাইয়া মোহনভোগ তৈয়ারি করাইয়া খাওয়াইত। বিধবার এই হাব্‌লা ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। তাহার কিছু ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা ছিল, তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত।

এইরূপে যখন সুবোধের সঙ্গে হাব্‌লার বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে চলিয়াছে, তখন একদিন সুবোধ সন্ধ্যার সময় হাব্‌লাদের বাড়ি আসিয়া বৃষ্টির জন্য সকাল সকাল বাড়ি ফিরিতে পারিল না। সেদিন হাব্‌লা জেদ ধরিল, "মা, আজ মিতে আমাদের বাড়ি থাক্। তুমি আজ খিচুড়ি কর।" মা কিন্তু জমীদারগৃহিণীর স্বভাব জানিত, সেই জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হাব্‌লাও কিছুতে ছাড়িতে না। তার মা বলিল, "আমরা

গরীব লোক, সুবোধ যদি আজ রাত্রিতে আমাদের বাড়ি থাকে, তাহলে সুবোধকে ওর বাপমা দু'জনেই খুব বক্‌বেন। সেটা কি ভাল ?"

হাব্‌লা তাই শুনিয়া সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। সুবোধ মায়ের ভয় করিলেও মিতের বাড়ি একদিন থাকিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

দুপুর রাতে হাব্‌লাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ার মত গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ দরজা ভাঙে, কেহ পাঁচিল টপকাইয়া ওঠে। হাব্‌লার মা বাহির হইয়া দেখিল, সকলেই জমিদার-বাড়ির লোক। তাহারা হাব্‌লার মাকে দেখিয়া গালি দিয়া বলিল, "খোকাবাবু কোথায় আছেন শীগগীর বল্।" সুবোধ বাহির হইয়া তাহাদিগকে অনেক বকিল, কিন্তু তাহারা সুবোধের কথা মোটেই গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "মাঠাকৃরুণ হুকুম দিয়েছেন মাগীর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যেতে।" হাব্‌লার মা তাই শুনিয়া বলিল, "চল, আমি যাচ্ছি।"

সেই রাত্রে সুবোধ তাহার পিতার নিকট এমন মার খাইল যাহা তাহার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। সে মার খাইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিনী হাব্‌লার মাকে বলিলেন, "ছোটলোক মাগী, তুই আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকিস্—তোর এত বড় আস্পদ্দা তুই জমীদারের ছেলেকে বাড়িতে রাখিস।"

হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরা ছোটলোক নই; আমরা গেরস্ত।"

জমিদারগৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিলেন, "ও মা, কি হবে। ছোটলোক নচ্ছার মাগী আমাকে বলে দিদি। আস্পদ্দা কম নয়। তুই নাকি আমার ছেলেকে খিচুড়ি খাইয়েচিস। ওমা কি ঘেন্নার কথা।"

হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরাও ভাল জাতের মেয়ে—আমাদের বাড়ি খেতে দোষ কি।"

কথা শুনিয়া গিন্নি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ফের যদি আমার ছেলেকে তোরা ডেকে নিয়ে যাস্ ত তোদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করব।"

সুবোধ চোরের মত তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে তাহার ঘুম হইল না—সমস্ত রাত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাব্‌লা আর সুবোধের দেখা পায় না। সে সুবোধদের বাড়ির আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, নদীর ধারে গিয়া বসে, বাগানে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—কিন্তু সুবোধ আর আসে না সে তাহার মিতের জন্য চারিখানি ঘুড়ি তৈয়ারি করিয়াছে, দুইখানি ভেলা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কঞ্চি কাটিয়া ভাল ছিপ্ তৈয়ারি করিয়াছে। নদীতে ছিপ্ ফেলিয়া ভাবে, সুবোধ এখনি পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিবে;—সে কিন্তু প্রথমেই বলিবে না যে, মিতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে। সে প্রথমে হরিদাস, গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ, আরও কত কি নাম করিবে। তাহার পর বলিবে মিতে। তখন উভয়ের মধ্যে মস্ত হাসাহাসি পড়িয়া যাইবে। ছিপে বড় মাছ উঠিলে হাব্‌লা ভাবে, এ মাছটা মিতেকে দেখাইতে হইবে। তিন-চার দিন বাড়িতে রাখিয়া মাছটা যখন পচিয়া যায়, দুর্গন্ধ ছোটে, তখন সে মাছটাকে ফেলিয়া দিয়া আসে। বাগানে গিয়া রাশি রাশি ফুল তোলে, টগর, বেলা, মল্লিকা, জুঁই—বড় একটা মালা গাঁথে, ভাবে মিতের গলায় দেব। যখন ফুলগুলি শুকাইয়া যায় তখন হতাশ হইয়া মালাটি ফেলিয়া দেয়। আবার সন্ধ্যার সময় সুবোধের বাড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যদি একবার দেখা পায় তবে ডাকিবে।

একদিন যখন হাব্‌লা লুকাইয়া সুবোধদের বাড়ির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিল, সুবোধদের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিয়াছে, কেহ ঔষধ আনিতে চলিয়াছে, কেহ "বরফ আন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে—লোকজন ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। হাব্‌লা শুনিল, সুবোধের কলেরা হইয়াছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল,—সে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার মার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, "মা মিতের কলেরা হয়েছে। চল মা দেখে আসি চল।"

সেদিন মা ও ছেলের কাহারও খাওয়া হইল না। দুজনে জমীদার-বাড়ি গিয়া জমীদার-গৃহিণীর পায়ে ধরিল। বলিল, "আমরা সুবোধের শুশ্রূষা করব।" জমীদার-গৃহিণী আজ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। হাব্‌লা ও তাহার মা সুবোধের কাছে বসিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের শুশ্রূষার গুণেই সুবোধ যে এ যাত্রায় রক্ষা পাইল, সকলেই তাহা একবাক্যে বলিতে লাগিল। হাব্‌লা এক মুহূর্তের জন্যও সুবোধে কাছছাড়া হয় নাই।

সুবোধ যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন ডাক্তারকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল, এক শত টাকা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হইল, এবং প্রায় চারিশত টাকা খরচ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার পূজা দেওয়া হইল। তখন গৃহিণী ভাবিলেন, হাব্‌লার মাকে কিছু দেওয়া হইল না। এই মনে করিয়া পাঁচটি টাকা হাব্‌লার মাকে দিতে গেলেন। হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরা ওজন্যে আসি নি।"

আবার সেই দিদি! গৃহিণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমরা বাছা, ওর বেশী দিতে পারব না।" হাব্‌লা ও হাব্‌লার মা কোন কথা না কহিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এবার হাব্‌লার পালা। সে এই সাত-আট দিন নিজের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে নাই। সে স্নান করে নাই, পেট ভরিয়া খায় নাই, রাত্রে ঘুমায় নাই। কলেরা সুবোধকে অব্যাহতি দিল কিন্তু তাহাকে চাপিয়া ধরিল। হাব্‌লার মা হাব্‌লার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

হাব্‌লা ঔষধ খাইতে চাহিত না, কেবল বলিত "আমার মিতেকে একবার এনে দাও, আমি তাকে দেখব।"

হাব্‌লার মা তিন-চার বার জমীদার বাড়ি গিয়া সুবোধের মার নিকট অনুনয় বিনয় করিল, তাঁহার পায়ে ধরিল, কিন্তু কোন কিছুই খাটিল না। সুবোধের মা বলিলেন, "আমার সুবোধ তোমাদের বাড়ি যেতে পারবে না বাছা, কেন বিরক্ত করছ, আমি বলছি? সে যেতে পারবে না।" হাব্‌লার মা কর্ত্তাকে গিয়া ধরিল, বলিল, "আমার ছেলে একটিবার সুবোধকে দেখতে চায়। সে একবার আমার সঙ্গে আসুক।"

কর্ত্তা বলিলেন, সুবোধের শরীর খারাপ, যেতে পারবে না।" হাব্‌লার মা হতাশ মনে ফিরিয়া চলিল।

সুবোধ ঘরে বসিয়া হাব্‌লার মার সকল কথা শুনিয়াছিল। সে খিড়কির দরজা দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে হাব্‌লার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। হাব্‌লার মা তখন অর্দ্ধেক পথে।

হাব্‌লা সুবোধকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিছানায় উঠিয়া বসিল। সুবোধ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল "মিতে।" হাব্‌লা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল "মিতে।"

হাব্‌লার মা যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সুবোধ হাব্‌লার মৃতদেহ বুকে করিয়া বসিয়া আছে।

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩১৮

প্রবাসীর সত্তর বৎসর

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

মানুষের ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতির স্থান কাল পাত্র আছে নিশ্চয় কিন্তু সব সময়ে তার 'ভাব' বা রূপ বোঝাও যায় না বোঝানোও যায় না।

সে ভালবাসে মানুষকে স্বজন বন্ধুকে। জীবজন্তুকে-গাছপালাকে, আবার মৃণ্ময়ী দেশকে।—সবচেয়ে আশ্চর্য্য সে তার অতীত বর্ত্তমানকালকেও ভালবাসে। যার না আছে আকার না আছে রূপ, শুধু এক ভাবময় শ্রদ্ধা প্রীতি ভরা মোহময়ী সে ভালবাসা।

আরো নানা রকম ভালবাসা প্রীতি আছে সে ভালবাসা হল অবস্তু কিছুকে প্রীতি। কোনো আদর্শকে ভালবাসা—সামাজিক সংস্কারকে, ধর্মীয় আদর্শ ও সংস্কারকে—সত্য সততা নীতিকে ভালবাসা—যার জন্য যুগে যুগে মানুষ সর্ব ত্যাগ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে।

কিন্তু এত বড় বড় কিছু নয়—ছোট্ট ছোট্ট প্রীতিও কম গভীর হয় না, বড় কম মধুর হয় না; তেমনও অবাস্তব অর্থাৎ বস্তুহীন বিষয় আছে, কিংবা বস্তুদেহী বস্তুময়ও; যেমন বই।

অর্থাৎ আমরা প্রবাসী বাঙালীর সন্তানরা ভালবেসেছিলাম 'প্রবাসী'কে। 'প্রবাসী' নামের একটি মাসিক পত্রকে। যার প্রকাশভবন জন্মভূমি বা 'বাসগৃহ' কোথায় তার সম্পাদকের "মনো-ভূমিতে" অথবা ইঁট কাঠ মাটির ঘরে; আমাদের বোঝবার বয়স নয়। কে সম্পাদক তাও জানা নেই। লেখকরা বা কারা কিবা লেখেন তাও সেই ৭।৮ বছরের বয়সের বোঝবার বয়স নয়। ছবি অবশ্য ছিল সে প্রবাসীতে এবং গল্পও।, কিন্তু সে ছবি বা গল্প তো রূপকথা বা 'হাসিখুসী' বইয়ের ছবি নয়; তবু কিন্তু প্রবাসী আমাদের মনোহরণ করেছিল। নিতান্ত দ্বিতীয় ভাগ আর কথামালা পড়া বিদ্যাতে কি পড়েছিলাম বা ছবিতে কি দেখেছিলাম আমার নিজেরই জানা নেই।

তবে মনে হয় সেকালের শিশুরা—অনেক, মানুষের মধ্যে গুরুজনের মধ্যে থাকত। তাঁদের কথাবার্ত্তা আলোচনা শুনতে পেত বুঝুক বা না বুঝুক। তাই থেকেই এই শ্রদ্ধা সংক্রমণ হয়েছিল। বোধ হয় বাইরের পড়ার ঘরে বসে গুরুজনরা কেউ প্রথম সংখ্যা প্রবাসীতে জয়পুর মহারাজার যে বাঘ শিকারের ছবি বেরোয় সেটা নিয়ে কথাবার্ত্তা বলেছিলেন। ছবিটা দেখিয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে। আমরাও দেখেছিলাম। কৌতূহলও হয়েছিল, আমাদেরই জয়পুরের রাজার ছবি। দ্বিতীয় কৌতূহলেরও কারণ ছিল, আমাদেরই সেখানকার তখন প্রধানমন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনকথা বেরিয়েছে সেই প্রবাসীতে। ছবি বা গল্প নয়, পরিচিতের পরিচয়ই হল মূল কৌতূহল। তারপর কবে কে জানে পিতা বই-এর আলমারীর তাক ঝাড়তে গোছাতে বাছতে দিলেন। —এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন শিখিয়েও দিলেন মাসিক পত্রিকার, 'প্রবাসী' 'উদ্বোধন' 'ভারতী' 'জন্মভূমি' 'বালকবন্ধু', আরো অন্য বইয়েরও বিজ্ঞাপনের পাতা ছেঁড়া, সূচীপত্র সাজানো; —মাস মত সাজিয়ে বাঁধাতে দেবার জন্য। তখনকার পত্রিকার বর্ষ মাস আরম্ভ যে-কোনো মাসে হত না। সোজাসুজি—বৈশাখ থেকেই প্রায় হওয়ার প্রথা ছিল। অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল (উদ্বোধন)।

যাই হোক, বই ঘাঁটা মানেই বইয়ের পরিচয় পাওয়া।

কি পেলাম কি শিখেছিলাম বই বাঁধাতে দিতে বসে তা বোঝার বয়স নয়। তবে পেলাম যে কিছু তাতে সন্দেহ নেই।

তার নাম হল বইয়ের সাহিত্যের স্বাদ। একটা অন্যরকম আনন্দের আস্বাদ। কিন্তু কখানিই বা বই

সেই সেকালে। এখনকার মত বাইরের রূপশোভাও তার ছিল না। ভিতরের ছবি কথাও ঠিক শিশু-মনোহর ছিল না।

তবু সেই মাত্র কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, শিশুবোধক পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে ওযুগে তারাই এনে দিয়েছিল অমৃত রসের স্বাদ। যা কখনো ফুরোয় না।

রবীন্দ্রনাথ "বঙ্গদর্শনের" কথায় বলেছিলেন, যেন "রাজার মত আবির্ভাব।" ("রাজবচ্ছন্ত ধ্বনিম্") বঙ্গদর্শনের আয়ু দীর্ঘ হয়নি। তার সম্পাদক ও লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও দীর্ঘ পরমায়ু পাননি।

কিন্তু 'বঙ্গদর্শনের' ঐতিহ্য থেকেই বাংলা সাহিত্য 'ভারতী' পেয়েছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে 'প্রবাসীর' আবির্ভাব ১৩০৮ সালে।

আবির্ভাবই নিশ্চয়। বুঝতে শিখি বা পড়তে পারি বা না পারি আমাদের বয়সের পাঠ্যও তখন তাতে ছিল না; কিন্তু অতি সুনিয়মিত তার প্রকাশ। মাসের ২।৩ তারিখের মধ্যেই 'প্রবাসী' সুদৃশ্য মলাটে সুন্দর ছবি আর বড়দের পাঠ্য গল্প নিয়ে বাড়ীতে ও হাতে এসে পৌঁছত। যদিও সেকালে আবার বই পড়ার বিধি-নিষেধও ছিল। প্রবাসী সে বিধির বাইরে ছিল। সে থাক 'প্রবাসীতে' রবীন্দ্রনাথের কবিতা "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে" প্রথম সংখ্যাতেই ছিল। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"ও (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত) ছিল। গল্পও ছিল, মনে নেই কি।

কিন্তু তখনও তাতে মেয়েদের লেখা ছিল না। কত কাল? তা আমার মনে পড়ে না। হাতের কাছে নেই সবগুলো। আর মেয়ে লেখিকারাও তখন জন্মান নি অনেকে।

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ছাড়ার পরে ১৩১৪ সালের পরে রবীন্দ্রনাথকে 'প্রবাসী' পুরো করে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় তখন থেকেই 'মাষ্টারমশাই', পরে 'গোরা' 'জীবনস্মৃতি', প্রবন্ধ কবিতা গানে বরাবর প্রবাসী সমৃদ্ধ ছিল ১৩৪৮ অবধি। এক কথায় 'প্রবাসী' যেমন রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথও তেমনি করেই 'প্রবাসী' ও তার সম্পাদককে পেয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ ১৩১৬ সালের পর 'প্রবাসী' সেই ৩।৵ অর্থাৎ ।০ চার আনাতে তার আকার আর উপাদান বড় ও সমৃদ্ধও করল। শিশু বিভাগ, পঞ্চশস্য, সঙ্কলন ও সমালোচন, বেতালের বৈঠক, দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান, চিত্রকলা বিবিধ প্রসঙ্গ দেশের কথা ছিলই তো আগে থেকেই,—সব নিয়ে 'প্রবাসী' বাংলা পত্রিকা জগতে অতুলনীয় মাসিক পত্র হয়ে উঠল—প্রবাসে-বিদেশে-স্বদেশে।

এখন বলি শুধু প্রবাসী ও প্রবাসিনী জগতে বিশেষ-ভাবে প্রবাসীর কত সমাদর ও প্রভাব ছিল, তা আমার মত বর্ষীয়সী পাঠিকা যারা বেঁচে আছেন তাঁরা জানেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশী এবং সরস গল্প, প্রিয়ম্বদা দেবীর ছোট বড় কবিতা, নানা দেশের নানা প্রসঙ্গ ও তথ্যও তো তাদের আয়েক জগতে নিয়ে যেত সেটা সেকালের অন্তঃপুরে একেবারে নূতন।

এক জয়পুর শহরেই ৭।৮ খানি প্রবাসী যেত। অধ্যাপক সমাজের ঘরে ঘরে। এবং পুরোনো অধিবাসী হরিমোহন সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংসারচন্দ্র সেনের বাড়ীতে। পরে দেখেছি দিল্লী ও পাটনায় (বাঁকিপুর) চেনা জানা আত্মীয় সমাজেও প্রবাসী সকলের ঘরের সমাদরের ধন। এরপর সহসা দেখা গেল 'প্রবাসী'র পাতায় নিরুপমা দেবীর 'দিদি'কে, শৈলবালা ঘোষের লেখা 'শেখ আন্দু'। উল্লেখ্য হল, এই সব সেকালের লেখিকারা সবাই ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সেকেলে হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরিকা মেয়ে।

এরপর পেলাম আমরা সংযুক্তা দেবীকে। সীতা ও শান্তা দেবীর সংযুক্ত রচনা "উদ্যানলতা"। এই উপন্যাসের উপাদান আর আমাদের সেকালের মেয়েদের মত ঘরোয়া বিয়ে প্রেম শাশুড়ী বা সপত্নী নিয়ে নয়। এ এক স্কুল কলেজের ছাত্রী বোর্ডিং জীবন জগৎ। আবার ঘরোয়া সংস্কার নিয়েও নতুন জিনিষ এনেছিল। আগে যা ছিল না।

নারী লেখিকা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের চিঠিতে পাই, প্রবাসী সম্পাদকের নির্দেশ ছিল নারী সাহিত্যিকের ছোট বড় কাঁচা ভালো কোনো রচনাই যেন সহসা ফিরিয়ে দেওয়া না হয়।

সম্পাদক নিজে নিরুপমা দেবীর লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন কয়েকবার। ("পরিচয়" ১৩৭২।৩)

নারী সাহিত্যিক সম্পর্কেও তাঁর উক্তি আর বিশ্লেষণ যেমন স্পষ্ট তেমনি নূতন। বলেছেন, "কেবল পুরুষরা লিখিলে যাহা হইত নারীরা লেখনী ধারণ করার পর নূতন কিছু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আত্মশক্তি স্বাধীনভাবে বাড়িতে থাকিলে—সাহিত্যে নূতন শক্তি ও সম্পদ সঞ্চিত হইবে।"

সাহিত্যের প্রসঙ্গে। "সাহিত্যে বাঙালী আপনাকে প্রকাশ করেছে বলেই সে আর নিজের কাছে আপনি অগোচর নাই। যেখানে যাক্ তার আত্মানুভূতির গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা সম্মেলনীতে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।" (১৩৪২ প্রবাসী ফাল্গুন)

রামানন্দ-সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র তখন ভিয়েনাতে। মাঝে মাঝে মডার্ণ রিভিউতে লেখেন। রামানন্দবাবু কিছু বেশী টাকার চেক তাঁর জন্য খামে ভরলেন। বলেছিলাম, আপনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী টাকা ওঁকে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, উনি বিদেশে। অনেক খরচ। আরো বেশী দেওয়া উচিত।"

(যম দত্ত ষষ্ঠিবার্ষিকী) ১৩৬৮

বিদ্যার্থী প্রসঙ্গ। "বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে আমরা সকলে মত পোষণ করি, তার প্রধান কথা, যিনি ছাত্র নামে পরিচিত হবেন তাঁর প্রথম কাজ হইবে বিদ্যার্জন, জ্ঞানলাভ, ভবিষ্যতের কর্মসাধনার চিন্তা।......তাঁদের কোনো বিষয়ে নেতৃত্বের ইচ্ছা হইতে দূরে থাকিতে হইবে......। বিদ্যার্থী বা ছাত্র নামটি রাখিব। অভিভাবকের অর্থে প্রতিপালিত হইব কিন্তু অভিভাবক ও শিক্ষকদের বদলে জননায়কের নির্দেশে ও উপদেশে চলিব—ইহা আমরা অসঙ্গত মনে করি।"......

(প্রবাসী ১৩৩৮)

লেখা ও লেখক। এটি খুব মজা ও কৌতুকজনক মনে হয়েছিল। কোনো সময়ে একবার লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গয়া থেকে এসে প্রবাসী অফিসে দেখা করতে আসেন। সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কে। তাতে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাম ও পরিচয় দেন।

বুঝি সম্পাদক মহাশয় তখন হেসে বলেন, 'আমি লেখা চিনি। লেখক চিনি না'। (প্রবাসী ফুটনোট কোনো সংখ্যায়)

অর্থাৎ আগে লেখকের নাম দেখে পরে লেখার গুণাগুণ দেখা হত না। এবং লেখা নির্বাচনে 'প্রবাসী' মনে হয় আজও সেই রকমই নির্দলীয় নিরপেক্ষ হয়ে আছে।

কোন্ সুদূর প্রবাস থেকে ১৩৩৫।৩৬ সালে আমিও দু-একটি লেখা পাঠিয়েছি। সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে প্রাপ্তি স্বীকার ও মনোনীত হওয়া না হওয়ার চিঠি এসেছে। এমনি তাঁর লক্ষ্য ছিল সব স্তরের নতুন কোনো লেখক ও লেখিকার লেখার ওপর।

ছোট থেকেই আমাদের কাছে 'প্রবাসী' ও প্রবাসী সম্পাদক ছিলেন এক আদর্শ শ্রদ্ধেয় বিষয় ও মানুষ।

আমি তাঁকে একবার মাত্র দেখেছি। ১৩১৪ সাল সেবারে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হচ্ছে। টাউন হলে সভায় তিনি কর্মব্যস্ত থাকতেন। এক সময়ে তিনি বেরিয়েছেন অফিস থেকে। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। ১৩০৮ থেকে, আমারও আট বছর বয়স থেকে জমা শ্রদ্ধা-ভক্তিময় সে প্রণাম। স্বল্পভাষী সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে চাইলেন। আমি কেমন সঙ্কোচ বসে কিন্তু নিজের পরিচয় নিজের নাম বলতে পারলাম না। কেন—তা আজো ভাবি। নাম বললে তিনি চিনতেন বোধ হয় প্রবাসী বাঙালীর কন্যা হিসাবে। এবং প্রবাসীতে লেখাও তো বেরিয়েছিল।

এই হল আমার আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ ও শ্রদ্ধাময় প্রণাম—সেকেলে পাঠিকা সমাজের প্রবাসীর স্বর্গীয় সম্পাদক মহাশয়কে। এবং শ্রদ্ধা নিবেদন সত্তর বছরের প্রবাসীকে।

ছেলেদের পাততাড়ি

ইন্দ্রজাল

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা—তুরস্ক দেশের কোন একটি গ্রামে এক বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করত। সে অতি গরিব ছিল। একদিন তাদের এমন অবস্থা হলো যে বাড়িতে একটি পয়সা বাকি রইল না আর তাদের দু'জনেরই শেষে অনাহারে দিন কাটল। রাত্রে এক মুঠো জংলি ফল ও জল খেয়ে তারা ঠিক করল যে পরদিন ছেলের কিছু একটা কাজের ব্যবস্থা করতেই হবে।

মা আগুনের ধারে বসে ছেলে আবু হোসেনকে খুব দুঃখ করে বল্ল—"বাবা, এখানে তোমার কোন উন্নতি হবার আশা নেই। চল, আমরা কাল সকালে ওই বড় শহরে যাই; সেখানে তোমাকে কোন কারিগরের কাছে রেখে আসব যাতে কিছুদিন কাজ শেখবার পর নিজে কিছু করে খেতে পারবে।"

আবু তাতেই রাজি হলো।

পরদিন সকালে তারা পাহাড়ের ওপাশের বড় রাজধানীর দিকে রওনা হলো।—চারিদিকে ফড়িং ডাকার আওয়াজে, আর ফুলের সুমিষ্ট ও সুন্দর গন্ধে রাস্তা ভরা।—মাথার উপরে বড় বড় গাছগুলির ছায়ায় ছায়ায় দু'জনে চলেছে কিন্তু বেচারি মায়ের এই সব জিনিস দেখবার সময় নেই; তার মন দুঃখে ভরা, আর সে কেবলই ভাবছে যে তার একমাত্র সন্তানকে সে আর হয়ত দেখতে পাবে না। কিছু দূর গিয়ে তারা নদীর ধার দিয়ে যেতে লাগল ও পরে ঠাণ্ডায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

"হায়-রে হায়," মা বিলাপ করতে শুরু করল, "আমার কি কপাল যে আমার একমাত্র সন্তানকে আর দেখতে পাব কি না জানি না—হায়-রে হায়!"

হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ নদীর ভিতর থেকে উঠে এসে আবু ও তার মায়ের কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তারা দু'জনে ভয়ের চোটে নদীতীরের বড় বড় পাথরের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিছুক্ষণ পর কে গম্ভীর স্বরে বল্ল।—"আমাকে ডাকলে কেন? কি চাও তোমরা? আমার নাম হায়-রে-হায় ও আমি নদীর প্রধান যাদুকর। আমার নাম ধরে কেন ডাকলে?"

আবুর মা কিছুপরে সাহস করে উত্তর দিল—"হুজুর, আমি কান্নাকাটি করছি কারণ আমার একমাত্র সন্তানকে শহরে কাজ করতে হবে আর আমি হয়ত তাকে আর দেখতে পাব না।"

যাদুকর হায়-রে-হায় দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আবুকে দেখতে লাগল। অল্পক্ষণ পর সে গরিব বিধবাকে বল্ল—"তোমার ছেলেকে শহরে নিয়ে যেও না—তাকে আমার সঙ্গে নদীর তলায় জলের রাজ্যে আসতে দাও, সেখানে আমি তাকে বহুরকমের যাদুবিদ্যা

শেখাব। তিন বছর পর এই জায়গায় তুমি আবার এসো, আর আমার নাম ধরে ডাকলেই তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

এই সব কথা শুনে আবু হোসেন খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কাজেই তার মা কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেকে যাদুকরের কাছে রেখে যেতে রাজি হলো।—নিমেষের মধ্যে একটা নীল চাদরে আবুকে জড়িয়ে নিয়ে যাদুকর নদীর জলে ডুব দিল।

জলরাজ্যে পৌঁছে আবু হোসেন আশ্চর্য্য হয়ে সব দেখতে লাগল।—চারিদিকে নানারকমের মাছ, অদ্ভুত ফুলে ও ফলে পরিপূর্ণ। যাদুকরের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, ও সেখানে যেতেই তার অতি সুন্দরী কন্যাকে দেখে আবু মোহিত। নানা প্রকার দামি পাথর বসান আসবাবে প্রাসাদ ভরা ও মাছগুলি আর্দালির পোশাক পরে কুর্নিশ করছে সব সময়। আবু এই সব দেখে শুনে তন্ময় হয়ে গেল।

কিছুদিন পর যাদুকর-কন্যা আবুকে ডেকে বল্ল—"তুমি আমার বাপকে বিশ্বাস করো না।—সে তোমাকে কোন যাদুবিদ্যা শেখাবে না, এখানে চাকরের মত রাখবে আর তার যদি কোন প্রকারে সন্দেহ হয় যে তুমি কিছু যাদু শিখেছ তো সে তক্ষুণি তোমাকে পাথর বানিয়ে দেবে। ওই যে দেখছ বড় বড় পাথরগুলি, ওই সব তোমারই মত মানুষ ছিল। কাজেই সাবধান। সব সময় বোকার মত ঘুরবে, যেন কিছুই বোঝ না এই ভান করবে।

আবু হোসেন তার কথা মত তিন বছর জলরাজ্যে বাস করল। আসলে সে অতি বুদ্ধিমান্ ছিল ও চুপি চুপি নানারকম যাদুবিদ্যা সে শিখে নিল, যদিও যাদুকর কিছুই টের পেল না। "সত্যি, এই ছেলেটা একেবারেই বোকা," সে বার বার তার মেয়েকে বলত, "ওকে তিন বছর পর ওর মায়ের কাছে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।" মেয়েটি চুপ করে সব শুনত।

এইভাবে বছরের পর বছর ঘুরে গিয়ে তিন বছর শেষ হলো। আবুর মা কথামত নদীর ধারে এসে একদিন যাদুকরের নাম ধরে ডাকতে লাগল—"ওগো যাদুকর, হায়-রে-হায়। আমার আবুকে দিয়ে যাও; তিন বছর হয়ে গেছে। আমি তাকে বাড়ি নিয়ে যাব।"

অল্পক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এগিয়ে এলো ও তারই মধ্যে থেকে যাদুকর ও আবুহোসেন নীল চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে বেরিয়ে এলো। দুঃখিনী মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

কিছুদূর যাবার পর আবু তার মাকে বলতে শুরু করল, "জান মা, আমি অনেক যাদুবিদ্যা শিখেছি। আমরা শহরে পৌঁছলেই সেগুলি দেখিয়ে পয়সা রোজগার করা যাবে। কেবল তোমাকে যা বলব তাই কর, তাহলেই যাদুটা পুরোপুরি সফল হবে।"

যেতে যেতে তারা একটি অতি সুন্দর বাগানে পৌঁছল। এটি ঠিক শহরের বাইরে। আবু তার মাকে বল্ল,—"এই বাগানের ভিতর আমি খুব সুন্দর প্রাসাদের রূপ ধরে দাঁড়াব। তুমি এই প্রাসাদটি যত দামে পার বিক্রি করে দেবে। কিন্তু সাবধান—সদর দরজার চাবিটি কিছুতেই যেন বেহাত না হয়, তা হলে আমি আর কোনদিন মানুষের রূপ ফিরে পাব না।"

তার মা এতে সহজেই রাজি হলো।

কয়েক ঘন্টা পর আবু হঠাৎ উধাও হয়ে গেল আর সেই বাগানে একটি অপূর্ব্ব প্রাসাদ দেখা গেল; তার দরজা জানালা সব খোলা ও সামনের দরজায় একটি সোনার চাবি তালায় ঝুলছে। আবুর মা তক্ষুণি সেই চাবিটি কোঁচড়ে পুরল।

কিছুক্ষণ পরেই এক ধনী বণিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে প্রাসাদটি দেখেই বল্ল—"বাঃ, কি চমৎকার প্রাসাদ। এটি কি বিক্রি হবে?"

আবুর মা উত্তর দিল যে—"হ্যাঁ বাড়ি বিক্রি হবে; এর দাম হচ্ছে কুড়ি হাজার টাকা।"

বণিক এই দাম দিতে রাজি হলো ও বিধবার হাতে কুড়িটি টাকার থলে ধরিয়ে দিল।

"দরজার চাবি কই?" বণিক জিজ্ঞেস করল।

"আবুর মা বল্ল—"চাবি হারিয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে, আমি আর-একটি চাবি কাটিয়ে নেব" বলে বণিক খুসি মনে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল আর সব চেয়ে ভাল বিছানাটি বেছে নিয়ে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।—

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হতে লাগল।—শেষে মাঝরাতে আবু হোসেন নিজমূর্ত্তি ধরল ও মাকে সঙ্গে করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

পরদিন সকালে বণিকের ঘুম ভাঙ্গাতে সে উঠে বসে দেখল যে, রেশমের চাদরে মোড়া নরম বিছানাটি কোথায় উধাও হয়ে গেছে ও তার বদলে বাগানের শক্ত মাটির উপরে সে শুয়ে আছে। কোথায় সেই মনোরম প্রাসাদ অদৃশ্য হয়েছে। হতভম্ব হয়ে বণিক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে শুরু করেছে এমন সময় তার দেখা হলো নদীর যাদুকরের সঙ্গে।

"হায়-রে হায়", বণিক বিলাপ করতে করতে চলেছে, "হায় রে হায়। আমার কি ভাগ্য!"

"কেন হে? ভাগ্য কি দোষ করল, আর আমাকেই বা ডাকছ কেন?" যাদুকর জিজ্ঞেস করল।

বণিক বল্ল—"কালকে আমি কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ কিনলাম। তার কত চমৎকার জানালা ও চারিদিক শ্বেত পাথরে মোড়া। কেবল দরজার চাবিটি হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ দেখ কোথাও কিছুই নেই। প্রাসাদটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

বণিকের বিলাপ শুনেই যাদুকর সব ব্যাপার বুঝতে পারল। "ওহো আবু হোসেন!" সে রেগে চিৎকার করে উঠল, "তুমি তো খুব চতুর দেখছি। তিন বছর ধরে তুমি আমার সব যাদুবিদ্যা শিখে ফেলেছ! কিন্তু আমি তোমাকে দেখে নেব, দাঁড়াও"—বলে সে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল আবুর খোঁজে।

ইতিমধ্যে আবু তার মাকে একটি অন্য যাদু শেখাচ্ছিল —"দেখ, এবার আমি একটা কালো ঘোড়ার রূপ ধরছি আর তুমি আমাকে খুব লাভে বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাবধান, ঘোড়ার সোনার লাগামটি যেন বিক্রি না হয়, তা হলে আমি আর কোনদিন মানুষরূপে ফিরতে পারব না।"

পর মুহূর্ত্তে সে কাল ঘোড়ার রূপ ধরে ফেল্ল। মাথায় তার ধবধবে সাদা ঝুঁটি, আর গলায় সোনার লাগাম, গায়ের রং ঠিক আবলুস কাঠের মত চকচকে কালো। কিছুক্ষণ পরেই নদীর যাদুকর পাশের রাস্তা দিয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু তাকে চেনা মুশকিল, কারণ সে ছদ্মবেশে মেষপালকের মত হাতে ছড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল। আবুর মাকে বল্ল যাদুকর—"বাঃ, বেশ, সুন্দর ঘোড়া তোমার। কত দামে বিক্রি করবে?"

বুড়ি বল্ল—"তিন হাজার টাকার এক পয়সা কম নয়।"

"বেশ তাই দেব, কিন্তু এই সোনার লাগামটিও আমি চাই"—বলেই যাদুকর লাফিয়ে গিয়ে সেটা ধরতে গেল।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবু হোসেন বুঝতে পারল যে এই লোকটি আসলে যাদুকর। হঠাৎ কালো ঘোড়াটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল আর তার পিছন পিছন যাদুকর দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই যাদুকর ঘোড়ার ঝুঁটি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে আর কি, এমন সময় আবু হোসেন ঘোড়ার রূপ ত্যাগ করে পাখি হয়ে আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল।

"ওহো, তোমার বড় সাহস বেড়েছে দেখছি," বলে যাদুকর ঈগলের বেশ ধরে আবুকে তাড়া করল। কিন্তু সেও তখুনি একটি ছোট্ট ফুলের রূপে পাহাড়ের বড় বড় পাথরের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যাদুকর আবার মেষ পালকের বেশে ফুলটি তুলে নিল, কিন্তু আবু এবার গমের শিসের আকারে তার আঙুলের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গলে পড়ে গেল।

ভীষণ রেগে যাদুকর মোরগের বেশ ধরে শিসটি যেই ঠোঁটে ধরেছে অমনি আবু শেয়ালের বেশে মোরগকে ধরে গিলে খেয়ে ফেল্ল।

তারপর আবু হোসেনকে আর পায় কে।—সে যাদুকরের মেয়েকে বিয়ে করে ফেল্ল। তাদের বিয়ের ভোজ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি ধরে চল্ল।—ইহার পরে নিত্য নতুন যাদুবিদ্যা দেখিয়ে আবু হোসেন সকলকে অবাক্ করতে লাগল।

রসময়ীর রসিকতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রমোহন বাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিনী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।

ক্ষেত্রমোহনের বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। স্ত্রী রসময়ীর বয়স ত্রিশ। 'রসময়ী'!—এ নাম যে রাখিয়াছিল বলিহারি তাহার প্রতিভা, তবে রসও ত অনেকগুলি আছে কিনা—এ ক্ষেত্রে রৌদ্ররস।

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবীশ মোক্তার—হুগলীতে থাকিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন। বাড়ী তাঁহার হুগলীতে নহে—জেলার মধ্যে কোনও এক পল্লী গ্রামে। তবে কয়েক বৎসর হইল হুগলীতে নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমোহনের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই—স্ত্রীর যেরূপ বয়স, আর হইবার ভরসাও নাই। অনেকদিন হইতে তাঁহার মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনের আন্তরিক বাসনাও তাহাই কিন্তু রসময়ীর ভয়ে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা-চরিত্র করিতে সাহস করেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রসময়ী ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া ক্ষেত্রমোহনকে দুই দিন গৃহছাড়া করিল। অবশেষে নিজে তাহার পিত্রালয় হালিসহরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভর করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন রসময়ীর আর মুখদর্শন করিবেন না—অন্যত্র বিবাহ করিবেন। এ বাড়ীতে রসময়ীকে আর ঢুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিসহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিত। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেক দিন হইল তাহার পিতামাতার কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়ীতে রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় কর্ম্ম করে—সুবোধ ইস্কুল ছাড়িয়া এখন বাড়ীতেই বসিয়া আছে—কর্ম্মকাজ এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ স্থলে দন্তে তৃণ করিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

পাড়ার একজন বালক প্রত্যহ নৌকা যোগে গঙ্গা পার হইয়া হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতে যাইত। সে ছেলেটি গ্রামে প্রচার করিয়া দিল, ক্ষেত্রমোহন বাবুর বিবাহ—দিন স্থির হইয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রসময়ীর দিদি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন—"বাবা, শুনলাম নাকি আমাদের ক্ষেত্তর আবার বিয়ে করছে? এ কথা কি সত্যি?"

বালক বলিল—"হ্যাঁ সত্যি বৈ কি। আমাদের ক্লাসে সুরেশ বলে একজন ছেলে পড়ে। চুঁচড়োয় তার মামার বাড়ী। তারই মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।"

"ঠিক জান?"

"জানি বৈ কি। সুরেশই ত আমাকে বলেছে। দিন স্থির পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।"

"তার মামার নাম কি?"

"নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কর্ম্ম করেন।"

"তাঁদের বাড়ীটি তুমি চেন বাবা?"

"হ্যাঁ, চিনি বৈ কি। সুরেশের সঙ্গে কতবার গিয়েছি।"

"কত বড় মেয়ে?"

"এই—আমাদের বয়সীই হবে।"—বালকটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।

"কেমন দেখতে?"

"তা—বেশ সুন্দর।"

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা, কাল একবার আমাদের দু বোনকে সে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পার বাবা?

"কেন?"

"তাদের একবার মিনতি করে বলে কয়ে দেখি—বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না—তাদের মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।"

"কখন?"

"এই—খাওয়া দাওয়ার পরে।"

"আমার ইস্কুল কামাই হবে যে?"

"একদিনের জন্যে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিও এখন। আমি বরং তোমায় একটি টাকা দেব—ঘুড়ী নাটাই এই সব কিনো।"

বালকটি ব্যগ্রভাবে নিজ সম্মতি জানাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটায় সময় দুই ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া বালকটি চুঁচুড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইয়া, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া মাধবীতলায় হরিশবাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কী দরজার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল।

রসময়ী বলিল—"এই বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তুমি গাড়ীর ভিতর বসে থাক। আমরা চট করে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।" বলিয়া দুইজনে অবতরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বাড়ীর মেয়েরা কেহ তখন স্নান করিতেছে, কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহারান্তে উঠানে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘরের অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে বলিল—"তোমরা কারা গা?"

বিনোদিনী বলিল—"আমরা হালিসহর থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধভাবে বলিল—"এস—বস।"

দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—"বাড়ীর গিন্নী কোনটি?"

একজন প্রৌঢ়াকে দেখাইয়া সকলে বলিল—"ইনি গিন্নী।"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমারা কি মনে করে এসেছ বাছা?"

বিনোদিনী বলিল—"তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে?"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির বিয়ে।"

"কবে?"

"এই বিশে মাঘ দিন স্থির হয়েছে।"

"পাত্রটি কে?"

"ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—হুগলীতে মোক্তারি করেন।"

"সতীনের ওপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা?"

গৃহিণীর বিস্ময় প্রতি কথায় বাড়িয়া বলিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা চেন নাকি?"

বিনোদিনী বলিল—"চিনিনে আবার—খুব চিনি। আমাদের গ্রামেই ত বিয়ে করেছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।"

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল; তাহার মনের রাগ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পরিত্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা?"

"শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দজ্জাল।"

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিণীর উপর সপাসপ্ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন?—কেন?—আর কি মরবার জায়গা পেলে না?—জায়গা পেলে না?—আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না?—জুটলো না?"

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীর লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার পর মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা কাঁদিয়া ছুটিয়া কেহ খাটের নীচে, কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ীর ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল। সে বাসন ফেলিয়া—"ও রে খুন কল্লে রে—খুন কল্লে রে—সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালা"—বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীর অপর মেয়েরা আসিয়া রসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠীবন বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল, কাহারও চুল ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল, কাহাকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল—"কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের কর না। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে যাই।"

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ক্রমে সদর দরজায় লোক জমিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল—"রসময়ী—থাম্ থাম্—ক্ষ্যামা দে বোন্—খুব হয়েছে। চল্ বাড়ী চল্।"

ঝি ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ওগো, যেতে দিওনি—যেতে দিওনি——থানায় খবর দিয়ে এসেছি, দারোগা আসছে।"

পুলিসের নাম শুনিয়া রসময়ী বলিল—"চল দিদি, চল।"

"যাবে কোথা—দারোগা আসুক তবে যেও।" বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

রসময়ী একলম্ফে উঠানের কোণ হইতে আঁবঁটি খানা সংগ্রহ করিয়া মাথার উপর সবেগে ঘুরাইয়া বলিল—"খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাকে খুন করে ফাঁস যাব।"

ইহা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক "মা গো:" বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। "পাহারাওয়ালা—এ পাহারাওয়ালা—আসামী পালায়"—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

রসময়ী তখন দিদির সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"পারঘাটে চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য হরিশ্চন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্যাদান করলেন না। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন—"সে খুনে মেয়েমানুষ, বিয়ে দিলে আমার মেয়েকে খুন করে ফেলবে। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

পরদিন কাছারিতে গিয়া হরিশবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

কাছারি হইতে বাড়ী ফিরিয়া হাতমুখ ধুইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে

দৃষ্টিপাত করিল—সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিতে পূর্ব্বে মুনিঋষিরা লোককে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কি মনে করে ?"

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিল—"একটা শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে।"—তাহার ওষ্ঠযুগল ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহনবাবু বলিলেন—"শ্রাদ্ধটা কার ?"

"হরিশ চাটুয্যের মেয়ের—আর মেয়ের মার।"

"তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না ?"

"সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ না কি শুনলাম ?"

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিত ভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"করছিই ত। করব না কেন ? তোমার ভয়ে না কি ?"

রসময়ী চীৎকার করিয়া, হাত নাড়িয়া বলিল—"কর না, করে একবার মজাটাই দেখ না।"

"কি করবে তুমি ?"

"এই এমন কিছু না। আঁষবটি দিয়ে সে মেয়ের নাকটা কেটে দেব—আর বুকে একখানা দশমুনে পাথর চাপিয়ে দেব।"

"আর তোমার নাকটা কানটা কেউ যদি কেটে দেয় ?"

"এসমা। কাটনা। তুমি কাট না হয়।"—বলিয়া রসময়ী নিজ কোমরে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহন আবার হুঁকা উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিয়া থাকিয়া যখন ক্লান্তিবোধ হইল, রসময়ী তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তা হলে আঁষবঁটিতে শান দিয়ে রাখিগে। সম্বন্ধ পাকা হলে খবরটা দিও—চুপি চুপি যেন শুভকর্ম্মটা সেরে ফেলো না।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে ?"

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিকৃতস্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ ? রাস বামনি এমনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে,—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে—যখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজী হবে না—তখন আমি মরব।"

দাম্পত্য রসালাপ এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে বাহিরে একখানি গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। রসময়ী বলিল—"তবে সেই কথাই রইল। এখন তবে আসি। দিদি ওপাড়ায় তার মায়ের বাড়ী গিয়েছিল—ভাবলাম তার সঙ্গে এসে তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা করে যাই।" বলিয়া রসময়ী প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত কথোপকথনের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। রসময়ীর পণ সফল হইল না। সে এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত।

সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবু হাসিসহরে গেলেন। চিকিৎসাদির কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু রসময়ী বাঁচিল না।

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য্য সংসারের মায়া—এত যে কষ্ট দিয়াছে, তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আরও মাস ছয় কাটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্শ্বচর বন্ধুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে হুগলীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিলেন। মেয়েটি ডাগর—দেখিতেও ভাল। বিশেষ মেয়ের পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব—ওদিককার মামলা-মোকর্দ্দমাগুলিও এই সূত্রে ক্ষেত্রমোহনবাবুর করায়ত্ত হইবে। কন্যার পিতা রজনীকান্ত ঘোষাল ইংরাজি লেখাপড়া জানা ব্যক্তি।

বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইল। বরের খুড়া মহাশয় গ্রাম হইতে আসিয়াছেন—কন্যা আশীর্ব্বাদ। প্রভাতে আফিসকক্ষে বসিয়া দুই চারিজন মক্কেলের সঙ্গে মোক্তারবাবু কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—খুড়া মহাশয় একখানি "বঙ্গবাসী" হস্তে ঘরের কোণে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় ডাকপিওন আসিল। ক্ষেত্রমোহনবাবুর হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল।

খামের উপর হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষেত্রমোহনের মাথা ঘুরিয়া গেল। দুই-চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া বারম্বার খামখানির শিরোনামা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাছে আনিয়া, দূরে সরাইয়া নানাপ্রকারে দেখিলেন।

অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পড়িয়া, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলগণকে বলিলেন —"আচ্ছা, এখন তোমরা যাও—আজ সকালে সকালেই কাছারি যাব—সেইখানেই বাকী কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

মক্কেলগণ চলিয়া গেলে খুড়া মহাশয় বলিলেন— "চিঠি এল ক্ষেত্তর?"

জড়িতস্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোথাকার চিঠি?"

"তাই ত ভাবছি।"

ক্ষেত্রমোহনের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া খুড়া মহাশয় উঠিয়া নিকটে আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

খুড়া মহাশয় দ্রুতভাবে বলিলেন—"কি? ব্যাপার কি? কোনও দুঃসংবাদ নয় ত?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু নীরবে পত্রখানি খুড়া মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইয়া, চশমা অনুসন্ধান করিয়া চক্ষে পরিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খুড়া মহাশয় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। সাধারণ পাতলা চিঠির কাগজে বেগুনী রঙের ম্যাজেণ্টা কালী দিয়া লেখা— উপরে স্থানের নাম নাই, তারিখ নাই—নিম্ন প্রকার মত লিখিত :—

শ্রীশ্রী দুর্গা

মহাস

প্রনাম পূর্ব্বক নীবেদনক বিসেস

তোমার মোতিভ্রম্ন ধরিআছে। মোনে করি-আছ রসময়ী মরিআছে আপোদ গিয়াছে এইবার বিবাহ করি। আমি মরিয় আছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিস্কিতি পাইয়াছ তাহা মোনেও করিওনা। বাড়ির সমমুখে জে বড় বটগাচ আছে তাইতে আমি আজকাল বাস করিতেছি। তুমি কি কর কোতায় যাও সমস্তই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। রাত্তিরে গাচ হইতে নামিয়া মাজে মাজে তোমার সয়ন ঘরে যাই। তোমার খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। এক একবার ইচ্ছা করে গলাটা টীপিয়া দিআ তোমাকেও আমার সঙ্গি করি। আমার একানে বড়ডো একলা বোদ হয়। আমার চেহারা একন ওতিশয় খারাপ হইা গিআছে। আমার গাএর মাংসো চামড়া আর কিছুই নাই। খালি হাড় আছে তাও সাদা নয়। গংগাতিরে আমাকে জে পোড়াইআছিলে তাতেই হাড়গুলো কালো কালো হইয়া গিআছে। যাহা হউক নিজের রুপ বর্ন্না নিজের মুখে শোভা পায় না। বিবাহ করিও না করিলে তোমার ললাটে অসেস দুগগতি লেকা আছে।

রসময়ী।

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার চিনতে পারছ?"

"খুব চিনি। তারই হাতের লেখা।"

"অন্য কেউ জাল করেনি ত?"

"ভগবান জানেন।"

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাঠের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জয়রাম—সীতারাম—রাম রাঘব—রাবণারি —রাম—রাম—রাম।"

খুড়ামহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহনের

আরও ভয় হইল। বলিলেন—"আচ্ছা খুড়ো মহাশয়—ভূতে কখনও চিঠি লেখে?"

খুড়ো মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"ভূত বলতে নেই—ভূত বলতে নেই—উপবেদতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র!"

দুইজনেই নির্ব্বাক। অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"দেখ—কারুর বদমাইসি নয়ত? এমনটাই কি হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবের কথা শুনেছি বটে—কিন্তু—এরকমটা—কখনও ত শোনা যায় নি। আচ্ছা—বউমার হাতের লেখা আগেকার চিঠিপত্র কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"পুরণো চিঠি আছে বৈ কি।"—বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি-পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশয় চশমার কাঁচ দুইখানি কোঁচার কাপড়ে ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"একই হাতের লেখা ত দেখচি।"—খামখানা উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক পয়সার ছয়খানাওয়ালা সাধারণ সাদা খাম। তাহাতে একখানি দুই পয়সার টিকিট আঁটা আছে। ক্ষেত্রমোহনের হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন—"কোথাকার ছাপ আছে দেখ ত?"

ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গলানবীশ মোক্তার হইলেও ইংরাজি ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিতেন। ছাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"হুগলীর ছাপ। কালকের তারিখ।"

খুড়ামহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—"জয় রাম—শ্রীরাম—সীতারাম।"

আহারের বেলা হয় দেখিয়া মোক্তারবাবু স্নান করিয়া আহারে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। রান্নাঘরের বারান্দায় যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটার অগ্রভাগ দেখা যায়। খান আর মাঝে মাঝে সেই গাছটার পানে চাহেন। একসময় গাছের একটা ডাল খড় খড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। কাহার যেন হাসিরও শব্দ শুনা গেল। ক্ষেত্রমোহনবাবুর আর খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িলেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া বটগাছটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। দুই-তিনটি কাঠবিড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। গোটাকতক কাক উচ্চ শাখায় বসিয়া জাতীয়সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া ভাইপো বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দিবসে খুড়া মহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে দেওয়ালময় রামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্য দুইজনেই এক শয্যায় শয়ন করিবেন। বালিসের তলায় একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ রক্ষিত হইবে এবং ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তা হলে খুড়ো মহাশয়, কি করা যায়? বিবাহটা বন্ধই করে দেওয়া যাবে?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন—"আমি ত তার দরকার দেখছিনে।"

"যদি কোনও উপদ্রব অত্যাচার হয়?"

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"ভয়ের কোন কারণ দেখি না।"

"ঐ যে বলেছে ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে দিই?"

"নাঃ—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত বটে।"

"আর যে বলেছে বিয়ে কোরো না, করলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে?"

"অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মানে বোধহয় এই যে অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত

সাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হয় তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।"

ক্ষেত্রমোহন বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করিবার লোভটিও সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্বাদ হইয়া গেল কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র লইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনী বাবুরও কানে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি তিনি ইংরাজি জানা ব্যক্তি,—শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন —"ভূত! এই বিংশ শতাব্দীতেও ভূত বিশ্বাস করতে হবে?"

বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে ৮ই ফাল্গুন। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বৈকালে বৈঠকখানায় ক্ষেত্র বাবু জনকয়েক বন্ধুবান্ধব সহ বসিয়াছিলেন।- ইঁহাদের মধ্যে একজন সরকারী উকীল—নাম মনোহর বাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোনার চশমা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায় —লোকটি থিয়জফিষ্ট। ক্ষেত্র বাবুর ভৌতিক পত্র প্রাপ্তির সমাচার অবগত হইয়া অবধি মনোহর বাবু ইঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।—অপর একজন নব্য যুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। ইনি এল. এ. ফেল করা শিক্ষিত মোক্তার বিস্তর ইংরাজি উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ক্ষেত্রবাবু—একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল, অনেক উপন্যাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন বা নৌকাডুবি বা আর কিছু—সকলেই মনে করেছে অমুক লোকটা মরে গেছে—মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই কিন্তু বইয়ের শেষ দিকটায় দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয়, হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তাঁরই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে,—ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

থিয়জফিষ্ট উকিল বাবুটি ইহা শুনিয়া বলিলেন—"কেন মশায়—বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না কেন?"

নবীন মোক্তারবাবু বলিলেন—"কারণ, আমি কখনও দেখিনি।"

শুনিয়া মনোহর বাবু বিজ্ঞভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন—"সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন?"

"না, দেখিনি।"

"তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন?"

"করি। তার কারণ, আমি না দেখলেও হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁর দশ-বিশখানা ছবিও দেখেছি। কিন্তু ভূত আমি নিজে দেখেছি, এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সবাই বলে খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তারা স্বয়ং ভূত দেখেছে।"

মনোহর বাবু তাঁহার সুঘন দাড়ির মধ্যে দীর্ঘনখ অঙ্গুলীগুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন—"আপনি বল্লেন, হাজার হাজার লোক সম্রাটকে দেখেছে। তেমনি হাজার হাজার লোক অশরীরী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনি বল্লেন যে সম্রাটের দশবিশ খানা ছবি দেখেছেন। তেমনি দশ-বিশখানা ভূতেরও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পারি। যদি দেখতে যান, একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন। আমার একখানা বইয়ে কেটি কিং-এর ছবি আছে। প্রথম চার্লসের সময় কেটি কিং নামে একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের নানাস্থানে অনেক সেয়াঁসে, কেটি কিং স্থূলশরীর ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করা

হয়েছে। তাঁর শরীরে ছুরি ফুটিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক মানুষের মত রক্তপাত হয়। তাঁর ফোটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে। ফোটোগ্রাফ থেকে তৈরি ছবি আমার বইতে আছে—আসবেন দেখাব।"

সুরেন্দ্র বাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনারাও যেমন ভালমানুষ। ঐ সব বিশ্বাস করেন! ভূতবাদীদের কত জোচ্চুরি ধরা পড়েছে তার সংখ্যা নেই। কেটি কি-এর দেহে ছুরি ফুটিয়ে দিয়ে রক্তপাত হয়েছে ঐটে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ বলে উল্লেখ করলেন। আমার ত ঠিক উল্টো মনে হয়। ছুরি ফুটালে রক্ত না পড়ত--অথচ শরীরী মানুষ একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছি—তাহলে বরং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয়। এ ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বড়ীর সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পারেন, তখন অনায়াসেই মূর্ত্তিগ্রহণ করে নিজের বক্তব্য বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে খাম, কাগজ, কালী, কলম সংগ্রহ করবার কষ্ট স্বীকার করলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু--চিঠি খান টেবিলের উপর রেখে গেলেই হত, তা না করে এক মাইল দূরে পোষ্টআপিসে গেলেন তাকে পোষ্ট করতে আবার দুটো পয়সা খরচ করে টিকিট কিনতে হল। মশায়, ভৌতিক জগতে পয়সা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয় তা হলে না হয় সেইখানে গিয়েই প্র্যাকটিস্ শুরু করি।"

মনোহর বাবু একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"মশায় জিনিষটা হাসি তামাসার নয়। এসব গভীর বিষয়। অনেক চেষ্টা, অনেক আলোচনা না করে এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা এই প্রথম নয়। হিমালয় থেকে মহাত্মারাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। কুথুমীলাল নামক এক মহাত্মা এরকম অনেক চিঠি আমাদের মাদাম ব্লাভাটস্কিকে লিখেছিলেন। তাঁরাও মনে করলে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়ে বক্তব্য বলে যেতে পারতেন—কিম্বা চিঠি উড়িয়ে টেবিলের ওপর ফেলে যেতে পারতেন—কিন্তু ডাকেই তাঁরা চিঠিপত্র পাঠাতেন।"

ইহা শুনিয়া শিক্ষিত মোক্তারবাবু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কুথুমীলালের চিঠি ত কোন্ কালে জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ডাক্তার হজসন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভারতবর্ষে এসে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মাদাম ব্লাভাটস্কি আর দামোদর বলে এক ব্যক্তি মিলে ঐসব জাল করেছিলেন।"

একথা শুনিয়া থিয়জফিষ্ট বাবুটি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"ও সব ঈর্ষ্যাপরায়ণ লেখকের বই পড়বেন না। আমার কাছে আসবেন, ভাল ভাল সব বই আপনাকে পড়তে দেব। তা পড়লে আপনার সমস্ত অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে। মাদাম ব্লাভাটস্কি যে কতবড় লোক তা তাঁর আইসিস্ আনভেল্ড বইটে পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

সুরেন্দ্রবাবু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে বইটে পড়িনি বটে তবে এডমণ্ড গ্যারেট প্রণীত 'আইসিস্ ভেরি মচ আনভেল্ড—অর দি ষ্টোরি অব দি গ্রেট মহাত্মা হোক্স' বইটে পড়েছি। লাইব্রেরিতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পারি।

এ কথায় মনোহরবাবু রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঐ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন। গাল দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিষই নেই। যত সব কুচক্রী বদমায়েস লোক মিছামিছি মাদামের অপবাদ রটনা করেছে।"

এমন সময় বাহিরে শব্দ উত্থিত হইল--"বাবু চিঠি আছে।" পরমুহূর্ত্তে ডাকপিওন প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্র বাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি হাতে লইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বলিলেন--"মশাই আবার সেই।"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সেখানে সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। থিয়জফিষ্ট বাবুটি অতি আগ্রহের সহিত সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। শেষে নবীন মোক্তারবাবুর হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রী দুর্গা

স্বহায়

প্রণাম পূর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস

এত সাহস তোমার। আসিব্বাদ পজন্ত হইয়া গিআছে। তুমি মোনে কারআছ আমি তোমাকে জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাঁকা আওয়াজ। রসি বামিন তেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সত্তেও বিবাহ কারবে। একনও সাবধান হও। এ দুরমোত্ত পারিত্যাগ কর। নইলে একদিন গভির রাত্তিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাচ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখানা জসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না। রসময়ী।

একে একে সকলে পত্রখানি পাড়লেন। পাড়য়া স্তম্ভিত হইয়া বাসয়া রহিলেন। শিক্ষিত মোক্তার বাবুরও মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি তিনি মন হইতে সংশয় দুরে নিক্ষেপ কারয়া বালিলেন—"আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু —আর একবার বেশ করে লেখাটা পরীক্ষা করে দেখুন দেখি। আপনার স্ত্রীর হাতের লেখাই বটে ত? না কোন জায়গায় কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কোন সন্দেহ নেই। শুধু নয়। শুধু হাতের লেখার মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার যেখানে যেখানে যে যে বানান ভুল চিরকাল হত এ চিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রীশ্রী এজায়গায় দুর্গা একটু তফাৎ-এ লিখত—এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া চিঠিতে এমন সব কথাবার্ত্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্ব্বদা ব্যবহার করত।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বাসয়া রহিলেন। কিয়ৎপরে সুরেন্দ্রবাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"ছিলাম বৈ কি।"

"সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম।"

"চিতার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মুখ আপনি আর দেখেছিলেন?"

"দেখিনি আবার? আমি নিজেই ত মুখাগ্নি করেছি। ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও ভুল হয়নি।"

নব্য মোক্তারবাবু তখন ঘাড় হেঁট কারয়া বাসয়া রহিলেন।

একজন বলিল—

"There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy" হে হোরেশিও—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার বিষয় তোমার দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে)।"

অপর একজন বালিলেন—"তা ত বটেই। তা ত বটেই। ধরুন আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশেই বা বলি কেন—সকল দেশেই আদিকাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে তার কি কিছুই ভিত্তি নেই?"

সরকারী উকীল বাবুটি বালিলেন—শুধু অন্ধবিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে ও আমেরিকায় ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। একসময় হক্সলি পর্য্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। বিখ্যাত লেখক ষ্টেড সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Of all the vulgar superstitions of the half-educated, none dies harder than the absurd delusion that there are no such things as ghosts (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে 'ভূত নাই' এই অদ্ভুত ভ্রমটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল —বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে যাইতে সুরেন্দ্রবাবুরও গা-টা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা

শুনিয়া বলিলেন—"দেখ ক্ষেত্তর, ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক্। আমার মতে, বৎসর পূর্ণ হলেই, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম শেষ করা যাবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তা বেশ—সেই ভাল কথা।"

কন্যার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। গয়া-শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবু বিবাহ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রবাবুর হস্তে একটা বড় জালিয়াতির মোকদ্দমার তদ্বিরের ভার রহিয়াছে। মোকর্দ্দমাটা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রবাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষীদিগকে সমস্ত দিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারী হইতে ফিরিবার সময় "রসময়ী"র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রবাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা আছে—

"শুনিলাম নাকি গয়ায় আমার পিণ্ড দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ড দিলে আমি উদ্ধার হইয়া যাইব ত কন সচ্ছন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেস করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

ক্ষেত্রবাবুর আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কাছারীর পোষাকেই মনোহর বাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহর বাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন—"এ যে বড়ই বিপদ দেখছি। বিবাহ করবার কল্পনা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হল।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মহাশয়, অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে? আপনাদের থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে?"

মনোহরবাবু একখানি মোটা বহি আলমারি হইতে পাড়িয়া একস্থান খুলিয়া বলিলেন—"এ সম্বন্ধে থিয়জফি শাস্ত্রের মত এই। মুক্তাত্মাগণ সাধারণতঃ অশরীরী। কিন্তু কখন কখনও তাঁরা নিজেকে মেটিরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহ-সম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে,—এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে, আবশ্যকীয় পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজদেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে অবস্থায় বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম, সে হস্ত ছুরি ধরতে পারবে না কেন?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কি না সেটা একবার ভাল করে তদন্ত করতে হচ্চে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দায়রার মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠিগুলো একবার পরীক্ষা করালে হয় না?"

থিয়জফিষ্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনের এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা—যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করাতে পারেন।"

পরদিন দায়রায় জালের মোকদ্দমাটির বিচার আরম্ভ হইল। হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক সক্‌টমোর সাহেব সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। দিন শেষে কাছারির পর, ক্ষেত্রমোহন ডাকবাঙ্গলায় গিয়া সক্‌টমোর সাহেবকে ভৌতিক পত্র তিনখানি দিলেন। তুলনার জন্য রসময়ীর কয়েকখানি পুরাতন আসল পত্রও দিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন—"কল্য প্রাতে পরীক্ষার ফলাফল জানাইব।"

পরদিন প্রাতঃকালে সরকারী উকীল মনোহরবাবুকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবার ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন—"পরীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তের লেখা।"

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল।

মনোহরবাবু বলিলেন—"সাহেব অনুগ্রহ করিয়া একখানি সার্টিফিকেট্ লিখিয়া দিতে পারেন?"

সাহেব মনে করিলেন—নিশ্চয়ই এ পত্র লইয়া একটা মামলা-মোকর্দ্দমা হইবে। আবার সাক্ষী দিতে আসিয়া ফী পাওয়া যাইবে সুতরাং আহ্লাদের সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—"এই চিঠিগুলির নকল আর সাহেবের সার্টিফিকেট যদি আমাদের থিয়জফিক্যাল রিভিউ নামক মাসিকপত্রে ছাপতে পাঠাই, তাতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি? আমরা যাকে স্পিরিট-রাইটিং বলি তার সুন্দর অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তাতে আমার আপত্তি নেই।"

পরবর্ত্তী সংখ্যা থিয়জফিক্যাল রিভিউ পত্রে সার্টিফিকেট সহ চিঠিগুলি ছাপা হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে বড় বড় থিওজফিষ্টগণ ক্ষেত্রমোহনবাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া পত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

থিয়জফিষ্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুর পসারের আর সীমা নাই—কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র সান্ত্বনালাভ করিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। ভয়ে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিতেও পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আর নাই।

চৈত্রমাস আসিল—বসন্তের বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষ্যে কাছারী বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়ীতে বসিয়া নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল, হালিসহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে মহাবিপদ্ উপস্থিত। দোল উপলক্ষ্যে বাজি পোড়াইতে গিয়া, একটা বোম্ ফুটিয়া তাঁহার ছোট সম্বন্ধী সুবোধ বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে হুগলীর হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

শুনিয়া ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পারিলেন না—গাড়ী ভাড়া করিয়া হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বিছানার নীচে মেঝের উপর বসিয়া বিধবা বিনোদিনী রোদন করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আরও রোদন করিতে লাগিলেন।

সমস্তদিন ঔষধ-প্রয়োগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যার দিকে ডাক্তারেরা বলিল আর প্রাণের আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্যালিকাকে বলিলেন—"ঠাকুরঝি, সন্ধ্যা হল—এইবার বাড়ী চল।"

বিনোদিনী বলিলেন—"আমি সুবোধকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারব না।"

"সমস্ত দিন অনাহারে আছ—স্নানাহার পর্য্যন্ত হল না।"

"তা না হোক! আমি যেতে পারব না।"

অবস্থা বুঝিয়া হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলিলেন—"আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাত্রে থাকতে পাবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন। আর কোনও ভয় নেই। বিপদ যা তা কেটে গেছে। আমরা সেবা শুশ্রূষা করব—আপনার কোনও চিন্তা নেই—আপনি বাড়ী যান।"

অনেক বুঝাইতে; বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন—"তুমি তবে আমায় হালিসহরে নিয়ে চল। রাত্রে সেখানে থাকবে। কাল ভোরে আবার এখানে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।"

ক্ষেত্রমোহন তাহাই করিলেন। হালিসহরে রাত্রি কাটিল।

ভোরে উঠিয়া স্বহস্তে একছিলিম তামাক সাজিয়া ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় বাড়ীর বাহিরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহিরে গিয়া দেখিলেন, লালপাগড়ীতে বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। স্বয়ং পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে দুয়ারে দাঁড়াইয়া। সঙ্গে কয়েকজন দারোগা ও হেডকনেষ্টবলও আছে।

পুলিশ ও সাহেবের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পরিচয় ছিল। নত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিলেন।

—"হেলো মুখটিয়ার, টুমি হেখানে কি খাড়িটেছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন "হুজুর, এই আমার শ্বশুর বাড়ী।"

"ইহা টোমার শ্বশুরবাড়ী আছে? উটম্, হামি টোমাড় শ্বশুরবাড়ী সার্চ্চ খাড়িবে।"

"কেন হুজুর?"

"হেখানে বোমা টৈয়াড় হয় কিনা ডেখিবে। ইহা সার্চ্চওয়ারেন্ট আছে।"—বলিয়া সাহেব সার্চ্চওয়ারেন্ট-খানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু সেখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিয়া সাহেবের হাতে ফিরাইয়া দিলেন। বললেন,—"হুজুর মালেক—যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

সাহেব বলিলেন—"স্ত্রীলোকদিগকে লুকাইয়া রাখ।"

পুলিশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে বিনোদিনী। তিনি পুলিশের ভয়ে কোথাও লুকাইবার প্রয়োজন দেখিলেন না। হরিনামের মালাটি হাতে করিয়া উঠানে তুলসীতলায় বসিয়া রহিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। বন্দুক, বারুদ, ডিনামাইট, বোমা, বর্ত্তমান রণনীতি, যুগান্তর, গীতা, দেশের কথা, রিভিউ অব্ রিভিউজ্ প্রভৃতি কিছুই বাহির হইল না। বাহির হইল হিন্দু সৎকর্ম্মমালা, গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভারত এবং একখানি বটতলায় ছেঁড়া উপন্যাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশ-নায়কের কোনও ছবি বাহির হইল না,—বাহির হইল কেবল খানকতক কালীঘাটের পট এবং একখানা আর্ট ষ্টুডিওর গণেশ মূর্ত্তি। জমিদারের খানকতক পুরাতন দাখিলা এবং একটা ধূলিমলিন চিঠির ফাইল বাহিরে হইল। বিনোদিনীর বাক্স হইতে বাহির হইল একবাণ্ডিল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।

সমস্ত জিনিষ উঠানে আনিয়া জমা করা হইল। একজন দারোগা কাগজপত্রগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন, শাদা খামগুলির প্রত্যেক খানিতে তাঁহারই শিরোনামা লেখা, এবং রসময়ীর হস্তাক্ষর। পুলিশ সাহেবের অনুমতি লইয়া খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্রবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খান-কুড়ি চিঠি রহিয়াছে—সমস্তই বেগুনী রঙের ম্যাজেন্টা কালীতে, রসময়ীর হস্তাক্ষরে লিখিত। কয়েকখানি চিঠি খুলিয়া ক্ষেত্রবাবু পাঠও করিলেন। নানা অবস্থা কল্পনা করিয়া অনুমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন কোনটাতে বটগাছের বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। একখানাতে আছে—"গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিও না আমি আর তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না। এখনও রাস বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে।" একখানাতে রহিয়াছে—"শুনিলাম বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এখনও সাবধান।"—একখানাতে আছে—"কল্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসরঘরে আগুন লাগাইয়া তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইয়া মারিব।" ইত্যাদি।

সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত ক্ষেত্রমোহনের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্তই দেখিতে-ছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"ঠাকুরঝি, এসব কি?"

ঠাকুরঝি আপনমনে মালাজপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রবাসী—পৌষ, ১৩১৬।

বাঙালীত্ব ধ্বংসের নানা আয়োজন

পরিমল গোস্বামী

অন্যান্য মাসিক ও প্রবাসীর উদ্ভাবন ও দীর্ঘকালীন সম্পাদন কাজের ভিতর দিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দেশসেবা করেছেন, যে-প্রকার নির্ভীকতার সঙ্গে সত্যকে আমৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সবার উপরে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, বাঙ্গালীর স্বার্থরক্ষায় তিনি যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই ধারা তাঁর পুত্র, বর্ত্তমান সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় আশ্চর্য্য সার্থকতার সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছেন।—প্রবাসীর প্রতি আমার বিগত প্রায় ষাট বৎসরের অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ এই কারণেই।

অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদকীয়তে এবং বিবিধ রচনায় যে বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার জন্য আমি আনন্দিত।

সম্প্রতি বাঙালীর বাঙালীত্ব ঘুচিয়ে দেবার যে সযত্ন আয়োজন আরম্ভ হয়েছে, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন কর্তব্য বোধ হওয়াতে এবং তা সম্পাদকের দেশের বৃহত্তর স্বার্থচিন্তার সঙ্গে কিছু মিলবে এই আশায়, প্রবাসীর বিশেষ সংখ্যার জন্যে এই প্রবন্ধটি পাঠাচ্ছি।

যখন এ রচনাটি লিখতে শুরু করেছি তখন কাগজে পড়লাম, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল করে শুধু বাংলা করার প্রস্তাব উঠেছে। এ-লেখা যখন ছাপা হবে তখন হয়-তো আর-একটা নাম হবে; কিন্তু সে প্রসঙ্গ আমার বক্তব্যের পক্ষে খুব জরুরি নয়। আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গ আছে এবং সেই নামকে স্মরণে রেখেই পরবর্ত্তী প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশ দুই পৃথক রাজ্য এবং আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ এবং সবাই বাঙালী। কিন্তু শুধু বাঙালী পরিচয় যদি পূর্ববঙ্গের (বা বাংলাদেশের) লোকের পরিচয় হয় তবে আমাদের পৃথক পরিচয় কি হবে? আমরা পশ্চিমা বাঙালী? অথবা শুধু পশ্চিমা?

পশ্চিমা বলতে আমরা ছেলেবেলায় হিন্দিভাষীদের বুঝতাম, তা সে মানুষ বিহারের হোক বা উত্তর প্রদেশের হোক। কিন্তু সেই 'পশ্চিমা' আমরা এখন নিজেরাই হতে চলেছি, এ-রাজ্যের নাম যাই হোক। কারণ আমাদের ভাষা যদি বদলে যায়, এবং তাকে ধ্বংস করি, তাহলে আমাদের বাঙালী পরিচয় আর দরকার হবে না। পরিচয়ে বা জাতিতে পশ্চিমা এবং ভাষায় হিন্দি। অথবা পরিচয়ে হিংলা (হিন্দি-বাংলার মিশ্রণ), কারণ আমরা হিংলাভাষী। বোধ হয় ভালই হবে। অবশ্য ভাল হওয়া না-হওয়া আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না। ব্যাপারটা অনিবার্য্যরূপেই ঘটবে মনে হচ্ছে; কারণ বাংলা ভাষাকে আমরা ক্রমে ব্যাবেল টাওয়ারের ভাষায় পরিণত করতে চলেছি, অর্থাৎ দুর্বোধ্য ভাষায়। এতে বাঙালীত্ব (অবশ্য যদি বাঙালীত্ব একটি গৌরবজনক গুণ হয়) অনেকখানি ধ্বংস হবে, বাকি রইবে যেটুকু, তার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

বাংলাভাষা ধ্বংসের জন্য আমাদের আকাশবাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তারপরে আছে খবরের কাগজ। তবে প্রধান ভূমিকা প্রথমোক্তের। কারণ আকাশবাণীর ভাষা ধ্বনিত বাণী, সর্বত্রগামী, এবং দ্রুত-সঞ্চারী। এই আকাশবাণীকেই প্রথমে উল্লেখ করতে হ'ল কারণ এটি আমাদের টাকায় চলে, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এবং এর সমালোচনায় আমাদের অধিকার আছে, যদিও তাতে কোনো কাজ হয় না, অন্তত অদ্যাবধি হয়নি। আকাশবাণীর বাংলাভাষা বিকৃত করার আয়োজন নানা দিক থেকে। উচ্চারণ,

ব্যাকরণ এবং বিদেশী শব্দের স্বীকৃত লিপ্যন্তর (ধ্বনির দিক থেকে) বিকৃত রূপে প্রচার।

আকাশবাণীর ভূমিকা

যেমন এঁরা কোনো গানের আগে ঘোষণা করেন এবারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনুন, গেয়েছেন শ্রীঅমুক। এই 'গেয়েছেন' কথাটা গোড়ায়, মাঝখানে অথবা শেষকালে একবার উচ্চারণ করা হয়। 'শুনুন' অথচ 'গেয়েছেন'—ব্যাকরণের কালের পরিচয় কি? বর্তমান কাল, অনুজ্ঞা ও পুরাঘটিত বর্তমান একই সঙ্গে। ভেলকিবাজী! কাল সম্পর্কে শ্রোতা-বিভ্রান্তকারী। 'গানটি শুনুন' বলেই 'গেয়েছেন'! শোনার আগেই গেয়েছেন! আবার ঠিক ঠিক ঘোষণাও শোনা যায় কদাচিৎ। যেমন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনুন, শিল্পী অমুক। বা অমুকের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনুন। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভাষায় ঘোষণা শুনিনি। একবার নাকি এ-রকম হয়েছিল; অর্থাৎ গোড়ায়, মাঝখানে এবং শেষে—এই তিনবারই বলা হয়েছিল "শিল্পী অমুক"। শোনা যায় তাতে আকাশবাণীর বাড়িটা সেই মুহূর্তে কাত হয়ে পড়েছিল কিন্তু পরবর্তী ঘোষণায় অন্যের গানের আগে যখন ঘোষণা করা হ'ল "আধুনিক গান শুনুন, গেয়েছেন অমুক"—তখনই বাড়িটি আবার খাড়া হয়ে উঠেছিল।

ঘোষণা আরো মজার আছে। তিনখানা ডিস্ক্ রেকর্ড বাজানো হবে; ঘোষণা শোনা গেল, "রেকর্ডে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনুন, প্রথমে গেয়েছেন অমুক শিল্পী।" গান শেষ হলে পরবর্তী ঘোষণা "পরে গেয়েছেন অমুক শিল্পী"। এ-ক্ষেত্রে আগে-পরে গাওয়ার দায়িত্ব গায়কের উপর ছাড়া হ'ল। কিন্তু ঘোষক বা ঘোষিকা জানলেন কি করে কে আগে গেয়েছেন এবং কে পরে গেয়েছেন? এই অপূর্ব সব ঘোষণা কেউ যদি টেপে ধরে রাখেন তবে বাংলা ভাষার ভঙ্গিটা কিভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে, তার ইতিহাস খেকোখাবে, মিসিং লিংক্ কিছু আর থাকবে না। ব্যাপারটা আরো বিস্তারিতভাবে বলা যাক্।

গানের শিল্পী রেকর্ডের আড়ালে থাকেন, ডিস্ক্ অথবা টেপ রেকর্ডের আড়ালে। তার জন্যই কি 'গেয়েছেন' বলা হয়? কোনো সভায় কোনো গায়ক বা গায়িকা যদি পর্দার আড়াল থেকে গা'ন, তাহলেও কি ঘোষণা করা চলে অমুকের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনুন, ইনি প্রথমে গেয়েছেন অমুক গান? গাইবার আগেই গেয়েছেন? আর যদি রেকর্ডের জন্যই এমন বলা হয়, তবে জিজ্ঞাস্য দরকার কি? শিল্পীর কণ্ঠে অমুক গান শুনুন অথবা শুধু বলা হোক যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনুন, শিল্পী অমুক। এ-রকম যখন মাঝে মাঝে বলাও হয় এবং তাতে ক্ষতি হয় না, তবে ব্যাকরণ বিকৃত করার দরকার কি? তা ছাড়া কথিকা বা আলোচনাও তো রেকর্ড করা হয় আগে এবং পরে তাই বাজানো হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কোনোদিনও বলা হয় না কেন: "এখন এঁদের আলোচনা শুনুন, এঁরা আলোচনা 'করেছেন' অমুক বিষয়"? বাঙালীর ধ্বংসে ব্যাকরণ ধ্বংস একটা বড় অঙ্গ—আসল কথা এটাই।

ফলশ্রুতি মানে কি?

আকাশবাণীর অনেকেই ফল অর্থে ফলশ্রুতি বলে থাকেন। খবরের কাগজেও চলেছে। সাহিত্যিকরাও অনেকে লিখছেন, এবং ফলশ্রুতি বাংলাদেশেও অধিকার বিস্তার করছে। কৈফিয়ৎ হয়তো এই যে, ফল কথাটা নেড়া-নেড়া শোনায়, কিন্তু ফলশ্রুতি শুনতে বেশ লাগে। তা যদি হয় তবে শ্রুতিমধুর করার জন্য কুকুরশ্রুতি, শেয়ালশ্রুতি, ব্যাঘ্রশ্রুতি চলবে না কেন? জন ও জনশ্রুতি যদি এক হত তা হলে "জনশ্রুতি অধিনায়ক জয় হে" লিখলে বাধা ছিল কি? কিংবা জন-জাগরণের স্থলে জনশ্রুতি জাগরণ? শ্রুতি শব্দটি কি সংস্কৃত চবৈতুহির মতো? কিংবা তরকারীর আলুর মতো? তাহলে কি এমন চিঠি লেখা চলবে:

"তোমার চিঠিশ্রুতি পেলাম। গৃহিণীশ্রুতি ও পুত্রাদিশ্রুতিসহ আমি কলকাতাশ্রুতির বাইরে যাচ্ছি কয়েকদিনের জন্য। দাদাশ্রুতি ও বৌদিশ্রুতি বাড়িতেই থাকবেন। আমাদের ভৃত্যশ্রুতি ঠ্যাংশ্রুতি মচকে একমাস বিছানাশ্রুতিতে শুয়েছিল, এখন ভাল আছে।

চিকিৎসার ফলশ্রুতি হতে কয়েক সপ্তাহ দেরি হল। তবে বেদনাশ্রুতি এখনো সামান্য একটু আছে। দাদাশ্রুতির পুত্রশ্রুতি অসুস্থ বলেই তাঁদের যাওয়া হল না। এখন অনেকটা সুস্থ। ফলশ্রুতির রস খাচ্ছে এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী মৎস্যশ্রুতি ও মাংসশ্রুতি সম্পূর্ণ নিষেধ হয়েছে। তবে দুগ্ধশ্রুতি ও বার্লিশ্রুতি খেতে বাধা নেই।"

এই তো গত ২৩।৩।৭২ তারিখে 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' নামক অতি প্রয়োজনীয় আলোচনা, বেতার জগতে ঐ কথাটি ছাড়া যার আর কোনো পরিচয় ছিল না, সেটি শেষ হবার পরে নিউক্লিয়ার পাওয়ার বিষয়ে অন্য একজন একটি কথিকা আরম্ভ করলেন, কিন্তু বলতে বলতে যখনই বললেন "এটি তারই ফলশ্রুতি" (বা ঐ রকম কোনো বাক্য যাতে ফল অর্থে ফলশ্রুতি ব্যবহৃত হল) শোনামাত্র রেডিও বন্ধ করে দিলাম।

বাঙালীত্ব হননে বাংলা উচ্চারণ বর্জন

উদ্যোগ শব্দের বাংলা উচ্চারণ উদ্জোগ। সং উদ্যোগ, প্রাকৃত উজ্জোগ, বাংলাও তাই। উদ্‌যোগও বলা হয় কিন্তু বলতে গেলে উজ্জোগই শোনাবে। (কিন্তু উদ্যম-এর ক্ষেত্রে উদ্‌যম হয় না। উজ্জমও না।) তাই বাংলা উচ্চারণে উদ্যোগ, উদ্‌যোগ অথবা উজ্জোগ। উদ্যান উজ্জান নয়, শুধু উদ্যোগ উজ্জোগ। যোগ করা বা যুজ্‌ ধাতুর সঙ্গে সম্পর্ক বলে উৎ+যোগ। কিন্তু বাংলায় কেউ কেউ উদ্দোগ উচ্চারণ করছেন এবং আকাশবাণীতেই বেশী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উদ্‌যোগ' ব্যবহার করেছেন 'উদ্‌দোগ' করেননি। যথা—

"দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে প্রথম হইতেই আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়।......এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ড হয় তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্‌যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে।" (শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা।)

বাংলা উচ্চারণ বর্জনের আর কোনো কারণ দেখা যায় না, একমাত্র তার স্থলে হিন্দি উচ্চারণ বসানো ছাড়া। যেমন যুগ্ম—বাংলা উচ্চারণ যুগ্‌গ। কিন্তু আকাশবাণীতে আরম্ভ হয়েছে যুগ্‌ম। পদ্মার বাংলা উচ্চারণ পদ্দা অথবা পদ্দাঁ। পদ্মের বাংলা উচ্চারণ পদ্দ বা পদ্দঁ। কিন্তু এখন শুনছি পদ্‌মা, পদ্‌ম। আত্মার বাংলা উচ্চারণ আৎতাঁ। কিন্তু অনেকেই, বিশেষ করে আকাশবাণী বলছেন আৎমা। এবং এতদিন পরে হঠাৎ আৎমীয় এবং আধ্যাৎমিক শুনে স্তম্ভিত। গত ১৪।২।৭২ তারিখে মহিলামহলে 'আধ্যাৎমিক' শুনে মনে হল এবারে যাঁরা আধ্যাৎমিক বা আৎমিক জগতে বাস করেন, এখন তা বর্জন করার সময় এসে গেছে। স্মিত-কে সিঁত উচ্চারণ করা হয় বাংলায়। কিন্তু রেডিওর এক ঘোষকের মুখে শ্‌মিত শুনে আর সন্দেহ রইল না যে আমাদের পশ্চিমা হতে আর খুব দেরী নেই। সুস্মিতাও সুশ্‌মিতা হয়েছেন শুনেছি কয়েকবার। জরমান Schmi-এর উচ্চারণ কি করে বাংলা উচ্চারণকে উৎখাত করল বোঝা যায় না। ইংরেজী smi হলেও বোঝা যেত। কিন্তু আকাশবাণীতে স্মি জরমান Schmi হয়েছে। এই উচ্চারণ সংস্কৃতের দিকে ঝোঁকার ব্যাপার নয়। কারণ সুস্মিতাকে যদি Shush-mita উচ্চারণ করি তাহলে তা সংস্কৃতও হল না, বাংলাও হল না। একটা স্টাইল হল মাত্র, এবং তা যে অজ্ঞতাপ্রসূত তাতে সন্দেহ কি? দিল্লীর একজন ইংরেজী সংবাদ পাঠিকা নিজের নাম বলেন সুষ্‌মা, আগেই বলেছি। আর একজন নিজের নাম বলেন হারিশ, আর একজন বলেন নালিনী। হরীন্দ্রকে বলেন হারীন্দ্র। বাংলাতেও তার অনুকরণ হচ্ছে একটু একটু করে। যেমন মলটা (দ্বীপ) মালটা হয়েছে, পঞ্জাব পাঞ্জাব হয়েছে কলকাতার আকাশবাণীতে, জিব্রলটার জিব্রালটার হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দের উচ্চারণে অ একটুখানি আ-এর দিকে ঝুঁকেছে। একদিন শুনেছি (গায়িকার নাম মনে নেই) "প্রভু, বালো বালো কবে/তোমার পথের ধূলার রঙে রঙে আঁচল রঙীন হবে।"

হরি এখনো বাংলায় হারি হয় নি, তবে হিন্দীর দিকে আর একটু বেশি ঝুঁকলেই হরি হারি হবে। বল হারি হারিবোল। কি মজাই না হবে তখন।

লিপ্যন্তর জনিত বানান ও উচ্চারণবিধি অমান্য

প্রধানতঃ ইংরেজী শব্দই আমাদের লিপ্যন্তর করে বাংলায় লিখতে হয়। যে-সব ইংরেজী বা অন্যান্য বিদেশী শব্দ বহুদিনের ব্যবহারে বাংলা হয়ে গেছে সে-সব শব্দের কথা বাদ দিয়ে বলাই আবশ্যক।

ইংরেজী Ess উচ্চারণ কলকাতার অধিবাসীরা অনেকেই করতে পারেন না। স্কুল থেকে Ess উচ্চারণ শেখানো হয়নি তাঁদের। তাঁরা S অক্ষরের Sh উচ্চারণ করেন। যেমন Soviet তাঁদের জিভের জড়তার জন্য Shoviet হয়ে পড়ে। যাঁরা আকাশবাণীর বাংলা সংবাদ শুনেছেন তাঁরা জানেন অনেকের মুখে S অক্ষরটি Sh হয়। কিংবা Ess-এর তুল্য উচ্চারণ। যেমন Officer, তাঁরা বলেন Offisher। Greeceকে বলেন Grish। এই শেষ উচ্চারণটি স্তম্ভিত হয়ে শুনেছি গত ৬।৩।৭২ তারিখে সকাল ৭।১০টার প্রোগ্রাম ঘোষণায়। বলা হল "২।০০টায় বিদ্যার্থীদের জন্য Grish দেশ সম্বন্ধে বলবেন ডক্টর অমুক"। কৌতূহল হল। শুনলাম প্রোগ্রাম। সেই ডক্টর উপাধিধারী পরিষ্কার বলতে লাগলেন Grish, এবং বার বার। বুদ্ধির জড়ত্ব যেমন জন্মগত, জিহ্বার জড়ত্বও তেমনি জন্মগত। বুদ্ধির জড়ত্ব নিয়ে শিক্ষক হওয়া যায় না, কিন্তু জিহ্বার জড়ত্বনিয়ে শিক্ষক হওয়ায় বাধা হয় না। বিজ্ঞান আলোচনাতেও কোনো কোনো ডক্টরের মুখে ishotope শুনেছি। তারপর গত ১৬।৩।৭২ তারিখে বিদ্যার্থীদের জন্য একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল Shar রমেশচন্দ্র মিত্র গার্লস্ স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ ইত্যাদি। আমি অবশ্য এ-প্রোগ্রাম শুনিনি। কিন্তু বিদ্যার্থীরা কি শিক্ষাই পাচ্ছে উচ্চারণের! শ্রোতারা কি বলেন?

বাংলা উচ্চারণে আমরা স ও শ উচ্চারণে অধিকাংশ স্থলেই পার্থক্য রাখিনি, যেমন গেলাস, পাস করা—উচ্চারণ করি গেলাশ, পাশ করা। পুলিসকেও পুলিশ বলি। কিন্তু লেখার সময় মূল Ess উচ্চারণের লিপ্যন্তরে স লেখা উচিত, শ নয়। তাতে বোঝা যায় আমরা যাই বলি, মূলে Ess উচ্চারণ ছিল। কিন্তু যে-সব বিদেশী শব্দ বাংলা হয়ে গেছে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই s-এর sh উচ্চারণ। বিদেশী শব্দ বা নামের ক্ষেত্রে নয়। সেখানে মূল উচ্চারণ Ess থাকলে বাংলায় স এবং উচ্চারণেও তাই। যেমন Alice in Wonderlandকে যদি কেউ Alish in... বলে তবে এমন উচ্চারণে হাসির উদ্রেক করবে। বাংলায় লিখতে হবে অ্যালিস, অ্যালিশ নয়। তেমনি নোটিস, নোটিশ নয়। গেলাস, গেলাশ নয়। নোটিস গেলাস্ ক্লাস ইত্যাদি লিখলে চোখে দেখে বোঝা যায় মূল উচ্চারণ ও বানানে Ess অক্ষর বা অনুরূপ ধ্বনি ছিল। পাস করা কথাটি যেমন। পাশ করা লিখলে বুঝতে হবে মূল ইংরেজী pash ছিল। কিন্তু পাস লিখলে এই ভুল হবে না। ইংরেজরা মাতাল হলে s-কে sh বলে। এক মাতাল ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে গিয়েই অন্য দরজা খুলে বেরিয়ে (তার ধারণা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে) চালককে জিজ্ঞাসা করেছিল How mush? অর্থাৎ কত ভাড়া দিতে হবে। স্টেট্‌স্‌ম্যানে বহু বৎসর আগে issue শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ নিয়ে চিঠিতে তর্ক হচ্ছিল। একজন পত্রলেখক মীমাংসা করেছিলেন এইভাবে—ডিনারের আগে issue, কিন্তু ডিনারের পরে ishu, অতএব তর্ক মিটিয়ে ফেলাই ভাল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা, আজও ভুলিনি। তাই যাঁরা প্রকৃত উচ্চারণ জানেন এবং লিপ্যন্তরের নিয়ম জানেন, তাঁরা গেলাস, ক্লাস, পুলিস, নোটিস প্রভৃতি স দিয়ে লেখেন, শ দিয়ে লেখেন না।

ইংরেজী বানানের সঙ্গে উচ্চারণ সব জায়গায় মেলে না। সেজন্য সহজেই ভুল হয়। উচ্চারণে কৌতূহল থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম। Bronze-এর উচ্চারণ ব্রোন্‌জ নয়। ওটা ব্রনz, Cantonment দেখেই ওটাকে আকাশবাণীর সংবাদ পাঠকেরা ক্যান্টন্‌মেন্ট্ বলেন। সৈন্যদের ছাউনিকে ইংরেজরা ক্যান্টুন্‌মেন্ট্ বলে। অভিধানেও তাই আছে। আবার বাংলা নামে যেখানে বি দিয়ে আরম্ভ, সেখানে প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক্ অভ্ রীডিং' নামক পুস্তকে ছাপা বি-ই (Be বি) এই সূত্র

অনুযায়ী বাঙালীরা নিজের নাম ইংরেজীতে লেখেন Bejoy, Benoy। Bejoya Greetingsও দেখেছি। বিদেশীরা এগুলিকে বেজয়, বেনয়-রূপে পড়বে। নানাভাবে অবাঙালীরূপে নিজেদের প্রচার করার উগ্র ইচ্ছা ইংরেজদের আমল থেকে। ইংরেজরা বাঙালীকে ইংরেজ ভাবুক এমন ইচ্ছাও বানানের মধ্যে দেখা যায়। এখন ঝোঁকটা হিন্দির দিকে। যেমন পৈতৃক পদবী অনেকে বাদ দিচ্ছেন। উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, তিমিরবরণ, প্রভৃতি মিস্টার শঙ্কর- মিস্টার বরণ হয়েছেন। মূল উদ্দেশ্য যাই হোক্, বর্তমানে হিন্দিওয়ালারা এ-নাম দেখে এঁরা বাঙালী নন বলে বুঝতে পারলে বাঙালীর লোপের আনন্দটা পাওয়া যায়। চৌধুরী, অধিকারী, গোস্বামী প্রভৃতি ইংরেজীতে লেখার সময় শেষে y-অক্ষর ব্যবহার করা লিপ্যন্তরের বিধিতে সমর্থিত নয়। শেষে i ব্যবহার্য। এবং অন্য শব্দে হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই দুইয়েতেই i ব্যবহার্য। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর নাম বা পদবী নিজেরা ইংরেজীতে যে বানানেই লিখুক, ছাপা হত কিন্তু শুদ্ধ আকারে, লিপ্যন্তরের বিধি মান্য করে। এখন ওসব উঠে গেছে। লিপ্যন্তর বা বানান্ অমান্য উচ্ছৃঙ্খলতার একটি ধাপ। হিন্দিতে আকার বোঝাতে একসঙ্গে দুটি A (যেমন RAAT) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এর অনুকরণ দেখেছি।

বাংলা উচ্চারণে প্রাদেশিকতার অন্যান্য নমুনা

ইংরেজী Ess উচ্চারণে sh উচ্চারণের কথা বলেছি। উল্‌টোটাও আছে। অনেকে দীনেশকে Diness, সুরেশকে Suress বলেন। একদিন আকাশবাণীর বিজ্ঞান আলোচনাতেও ঠিক এই রকম উচ্চারণ শুনেছি একজন আলোচনাকারীর মুখে। অনেকে শালা উচ্চারণ করে sla। কলকাতার প্রাদেশিকতা, অন্য কথায় যাকে বলা যেতে পারে cockney বা আসলে slang, সেই উচ্চারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও প্রবেশ করেছে।

"প্রাণ চায় চক্ষু না চায় মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা
সুন্দর এসে ফিরে যায় তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা"

এই গানের 'সজ্জা' শব্দটি রেকর্ডের গানে শুনেছি সজ্যা বা সইজ্যা রূপে। মহিলা-মহলে ফুল-সজ্জাকে 'ফুল-শয্যা' উচ্চারণে বলা হল শুনেছি। ২।৩।৭২ তারিখে বিদ্যার্থীদের জন্য প্রোগ্রামে একটি কথিকায় বলা হল রূপসজ্যা। সজ্জা প্রাদেশিক উচ্চারণে 'সইজ্যা'।

রবীন্দ্রনাথের গানের যে দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছি, এই গান যারা রেকর্ডে নতুন শুনেছেন তাঁরা বুঝেছেন গানের উদ্দিষ্টা তার দয়িতের জন্য বৃথাই বিছানা পেতে রেখেছে। অথচ ওটা বিছানা নয়, সজ্জা—আভরণ। অর্থাৎ সাজসজ্জা তার বৃথা হল। (রবীন্দ্রনাথের লেখাও বৃথা হল।) আবার যাঁরা 'সইজ্যা' মানে সাজ বুঝলেন, তাঁরা ঐ গানের আর একটি কথায় ('শয্যা যে কণ্টক শয্যা') বুঝবেন জামা বা শাড়ীতে কাঁটা বিঁধছে। কণ্টকশয্যাকে কণ্টক-সজ্জা বুঝবেন। সজ্জার সইজ্যা উচ্চারণ রেকর্ডে ছাড়া পেল কি করে? এ-বিষয়ে যদি কোনো বাছবিচার না থাকে তবে ভবিষ্যতে আরো কি হবে ভেবে ভয় পাচ্ছি। কেউ রেকর্ড করবে "ম্যাঘের কোলে রোদ হেসেছে", কেউ রেকর্ড করবে "ছ্যালো যে পরাণের অন্ধকারে" অথবা "তার হাতে ছ্যালো হাসির ফুলের হার"। কোন্ ছলে এমন উচ্চারণ বন্ধ করা যাবে যখন সজ্জার সইজ্যা উচ্চারণ পাস হল? দিল্লীর একজন আকাশবাণীর সংবাদ-পাঠক ঊনিশকে উন্নিশ বলেন, তাই বা আদর্শ হবে না কেন?

শিক্ষা ধ্বংস একেবারে মূল থেকে শুরু

যাতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই বাঙালীকে মূর্খ বানানো যায় সে ব্যবস্থা পাকা আমাদের দেশে। বইতে ছোটরা যখন পড়ে চাঁদ বরফে ঢাকা, কুইনিন সিংকোনা গাছের পাতা থেকে তৈরী, সাপ জিভ দিয়ে নিশ্বাস নেয়, মাছ চোখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়, জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, ঊর্ধ্বাকাশে বাতাস অত্যন্ত ঘন, সেজন্য পাখীরা ডানা না নেড়েও ভেসে থাকতে পারে, মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কার করেছিলেন তেনজিং ও হিলারি, রুশ বিপ্লব নেতা 'লেলিন', আর্কিমিডিসের ইউরেকা তত্ত্ব আবিষ্কারেই বিজ্ঞানের প্রথম যাত্রা আরম্ভ

হয়, আণবিক ও পারমাণবিক শক্তি একই জিনিস, একসের লোহা একসের তুলো থেকে ভারী ইত্যাদি।

সবই ছাপা পাঠ্য-পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা হল। তালিকা এত দীর্ঘ করা যায় যে শুধু তাইতেই 'প্রবাসী'র একটি বিশেষ সংখ্যা তৈরী হতে পারে। এই শিক্ষা অনেকদিন ধরে চলছে। ২১ বা ২২-টি সংস্করণ পর্যন্ত হয়েছে এ-রকম বইয়ের। শিক্ষাকে 'সাবোটাজ' করার সুপরিকল্পিত একটি অঙ্গ এটি বলেই সন্দেহ হয়। বাঙালী যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে অক্ষম হয় এরই জন্য, গোড়া থেকেই। কিন্তু যেখানে উদ্দেশ্যই তাই সেখানে প্রতিবাদ বৃথা।

যুক্তিহীন চিন্তার দৈন্য অপরিমেয়

আকাশবাণীর কণ্ঠ সর্বত্রগামী, এবং এই প্রতিষ্ঠান আমাদের সবার টাকায় চলে। সেজন্য এর দায়িত্ব অনেক বেশি। কিন্তু কার্যতঃ কি হচ্ছে? যদি কেউ নিয়মিত বি-বি-সি ওভারসীজ সার্ভিস শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন, আকাশবাণীর স্থান কোথায়। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়, কিন্তু ভুল দেখিয়ে দিলে তা গ্রাহ্যই করা হয় না, এমন ঘটনা শুধু এখানেই ঘটে। "গান শুনুন, গেয়েছেন অমুক"—এই অপভাষার বিরুদ্ধে অনেকবার কাগজে বলা হয়েছে, কিন্তু যারা নিজেদের ডিক্টেটর মনে করেন, তাঁরা তা শুনতে গরজ করবেন কেন? মার্কিনী মানে অ্যামেরিকানী একথা বহুবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে খবরের কাগজের মারফৎ। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ২৪।৩।৭২ তারিখে সকাল ৯টার বাংলা সংবাদেও অ্যামেরিকান বা মার্কিন না বলে তার স্থলে মার্কিনী বলা হল। যুক্তিহীন চিন্তার নমুনা। যুক্তিহীন কেন, বলছি। এশিয়ার বিশেষণ এশিয়ান, অ্যামেরিকার বিশেষণ অ্যামেরিকান (মেরিকান কর্কান উচ্চারণ, তা থেকে মার্কিন, মানে অ্যামেরিকান্), আফ্রিকার বিশেষণ আফ্রিকান্, অস্ট্রেলিয়ার বিশেষণ অস্ট্রেলিয়ান; ইউরোপের বিশেষণ ইউরোপীয়ান, তেমনি ইরানিয়ান, ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি। কিন্তু এই সব বিশেষণ ব্যবহার না করে কেউ কি বলবেন এশিয়ানী, অ্যাফ্রিকানী, অস্ট্রেলিয়ানী, ইউরোপীয়ানী, বা অ্যামেরিকানী, বা ইণ্ডিয়ানী, ইরানিয়ানী? তিনজন অ্যাফ্রিকানী ভদ্রলোক এসেছিলেন কেউ বলে? কিন্তু আকাশবাণীতে মার্কিনকে মার্কিনী বলা হয়। মার্কিনী মানে অ্যামেরিকানী এ বোধের অভাব। কেন বলা হচ্ছে সে প্রশ্ন জাগে না মনে। (খবরের কাগজেও 'মার্কিনী' আরম্ভ হয়েছে।)

আকাশবাণীতে নানা কথিকা শুনেছি, কিন্তু কারো মুখে দু ফুট বা তিন ফুট শুনিনি। শুনেছি দু ফীট বা তিন ফীট, যারা পর্বতারোহণ করেছেন, তাঁরাও ১৫ হাজার ফীট বা কুড়ি হাজার ফীট বলেছেন। এটা শুধুই স্কুল জীবনে ফুটের বহুবচন ফীট এই নতুন ধরণের প্লুর্যাল শেখার কৃতিত্ব জাহির করার প্রবৃত্তি থেকে জাত। ম্যান থেকে মেনও তাই, কিন্তু ফীট-এর ব্যবহার জীবনে বার বার দরকার হচ্ছে। মাপ-জোক নিয়ে যাদের কারবার তারা ৩ ফুট ৪ ফুট বলে। তারা কি অজ্ঞ? বাংলায় যে ইংরেজী শব্দের বহুবচন ব্যবহার হয় না, এটা কি অভ্যাসবশত যারা জানে, কিন্তু কিছু বেশি লেখাপড়া শিখলে আর জানা যায় না। তাঁরা ঐ কিছু বেশি লেখাপড়া শিখেও ইঞ্চ বা মাইলের বেলায় বা অন্যত্র ইংরেজী শব্দের বহুবচন ব্যবহার করেন না, তাঁরাও সেই স্কুল জীবনের আশ্চর্য আবিষ্কার ফুট বহুবচনে ফুটস না হয়ে ফীট হয়, এই জ্ঞান জাহির করতে ভোলেন না। তাঁরা দু'খানা চেয়ার্স বা দু মাইলস বলেন না। ৫০০ মাইলস ঘুরে এলাম, বা দু'খানা ট্রেনস স্টেশনে এসে থেমেছে বলেন না। কিন্তু তিন ফীট কেন বলেন, কেন ফুটের বেলায় অম্লানবদনে প্লুর্যাল বলেন তা কেন ভাববার মতো মনের শিক্ষার অভাব।

দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) বিভক্তিতে বহুবচনে 'কে' ভুল নয়; কিন্তু অচল

আমাদেরকে, তাদেরকে এককালে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু চলেনি। "এ কথা তাদেরকে বলব" অচল। "এ কথা তাদের বলব" এটাই প্রচলিত। তোমাদেরকে দেব অচল, তোমাদের দেব প্রচলিত।

পূর্ববঙ্গে এই "কে" বড় বেশি ব্যবহৃত হতে শুনেছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারের পর থেকে। "কে" যদি চলত তা হলে চলতি ভাষার ভগীরথ প্রমথ চৌধুরীর ভাষাতেও তা থাকত। তাঁর একটি বাক্য উদ্ধৃত করছি :

"পরের দুঃখ যখন তাদের নিজের দোষে, তখন তাদের শুধু ভাল হতে শেখাও..." "নিখিলেশ ও সন্দীপ যদি বিমলাকে নিজের নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা না ক'রে নিজেদের বিমলার কাজে লাগাতে......"

তাদেরকে ভাল হতে শেখাও অথবা নিজেদেরকে বিমলার কাজে বলা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : "এমন জগতে হতভাগাদের হাতকড়া দিয়ে বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে চাবুকের ব্যবস্থা করে স্রষ্টিকর্তার এ কি নিষ্ঠুর খেলা।"

অথবা "ডাকব তাদের কী দিয়ে, খোরাক দেব কোথা থেকে ?"

দুটি স্থানই "হতভাগাদেরকে" অথবা "তাদেরকে" বলা হয়নি। অথবা—

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটে শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

"ইহাদেরকে করো আশীর্বাদ" বলা হয়নি।

ধ্বনিতত্ত্বের পরেই 'আওয়াজতত্ত্ব'

বাঙালীকে অশিক্ষিত করে তুলতে নানা আয়োজনের কথা বলা হল, এবার ছাত্রকুলের সর্বনাশের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ব্যবস্থা আছে লাউড স্পীকারের। কোনো-না-কোনো উপলক্ষে লেগেই আছে। কঠিন ইট-পাথরের বাড়ি-ঘেরা বদ্ধ স্থানে অশ্লীল অসভ্য এবং অশালীন-ভাবে এই লাউড স্পীকারের বিকট আওয়াজ সৃষ্টিতে এক রকম আমোদ অবশ্যই পাওয়া যায়। সবাইকে জব্দ করে আমোদ উপভোগ আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। মাঝখানে ব্রাহ্ম আন্দোলনে ও বিরাট প্রতিভাধর হিন্দুদের সংস্কারমূলক মনোভাবের ফলে গত শতকে বেশ একটা বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই। একটা ভদ্র পরিবেশ গড়ে উঠতে না উঠতে ইতর আবহাওয়ায় বাঙালীর জীবন কলুষিত হয়ে উঠেছে। কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন হয়ে গেছে, নইলে অপাঠ্য বইয়ের সাহায্যে যেমন শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে তেমনি লাউড স্পীকারের সাহায্যে স্কুলের ছেলেমেয়েদের মনে যেটুকু ছন্দ ও সৌন্দর্য বোধ সহজে গড়ে উঠতে পারত তা একেবারে চূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। অশ্লীল গান, কান ফাটানো উচ্চ গ্রামের অতি অস্বাভাবিক আওয়াজের সাহায্যে তাদের মর্মভেদ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ জিনিসের ছাড়পত্র কি করে দেওয়া হয় তা বুদ্ধির অগম্য : অশ্লীল গান লাউড স্পীকারে বাজানো আমাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এমন কথা কেউ বলবেন না। পূজার চাঁদা আদায় এবং সে সময় নানা জুলুম ও প্রয়োজন হলে ছুরির ব্যবহার অবশ্যই ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। অথচ এ দুটি জিনিসই এ দেশে অনায়াসে চলছে। সভ্য দেশ সমূহে নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানা আয়োজন, তার মধ্যে বিমানের আওয়াজ, কল-কারখানার আওয়াজ, মোটরের আওয়াজ প্রভৃতি কি করে কমানো যায় তার জন্য নানা আলোচনা চলছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষগুলো সভ্য মানুষের কোঠায় পড়ে না বলে তাদের জন্য শাসকদেরও দায়িত্ব বা ভাবনা নেই। আশ্চর্য্য কাণ্ড। চোখের সামনে দেশটাকে নানা দিক দিয়ে অসভ্য বানানো হচ্ছে, অথচ প্রতিকার চিন্তা দূরের কথা, উদাসীনতার দ্বারা তার সমর্থনই আছে।

আকাশবাণীর কলকাতার ঘোষণাকারীরা বলেন "সংবাদ আজকের মতো," বা "এখনকার মতো এইখানেই শেষ হল"। এরমধ্যে কুসংস্কার-আচ্ছন্ন বাঙালী চরিত্রের এমন একটা ভীরুতার পরিচয় আছে যা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। "এখনকার মতো" বা "আজকের মতো" না বলে যদি শুধু বলা যায় "এখানেই শেষ হল" ? সর্বনাশ! তা যদি ঋষিবাক্য হয়ে পড়ে, অর্থাৎ সত্যিই

যদি শেষ হয়, অর্থাৎ ঘোষণাকারীকে আর যদি সংবাদ পাঠ না করতে হয়, সেই ভয় লুকিয়ে আছে ঐ ঘোষণার মধ্যে। অধমতম ভীরুতার দৃষ্টান্ত, কারণ ওটা যদি শ্রোতার সুবিধার জন্যই বলা হত তা হলে ওর পরে, আবার কখন বলা হবে সে সময়টারও উল্লেখ থাকত। নইলে "এখনকার মতো শেষ হল" শুধু শোনা গেল, কিন্তু আবার কখন বা কবে আরম্ভ হবে তা জানা গেল না। তা ছাড়া যাঁর রেডিও আছে, তিনিই জানেন, সংবাদ যখন শেষ হল সেটা চিরদিনের জন্য শেষ নয়। তিনি নিশ্চয় জানেন আবার বলা হবে। এবং কখন বলা হবে তাও জানেন। বেতার জগৎ আছে, খবরের কাগজ আছে, প্রোগ্রাম ঘোষণা আছে। রেডিও শ্রোতা এসব কিছুই জানেন না বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া "এখনকার মতো' কথাটা এমন প্রবল গর্বের সঙ্গে : এমন জোরের সঙ্গে; বলা হয় যেন রেডিওর যাবতীয় প্রোগ্রামের মধ্যে ওটাই একমাত্র মূল্যবান্ কথা। অন্য কোন দেশে অথবা এ দেশের অন্য কোনো রাজ্যে এমন বলা হয় না। হিন্দিতে "সমাচার 'এইখানেই' সমাপ্ত হয়ে বলা বলা হয় না। উর্দুতেও খবরে 'এইখানেই' খতম বলা হয় না, ইংরেজীতে এখনকার মতো that is the end of the news বলা হয় না।

বাঙালীর চরিত্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের চারিদিকের বিপুল আয়োজনের কথা সামান্য বলা গেল। এ ছাড়া সৌন্দর্যবোধ নষ্ট করার আয়োজন, যথা : শহরকে স্লোগান আর ইলেকশনের পোস্টার অথবা নির্বাচনপ্রার্থীর নাম অন্য বাড়িতে পেন্ট করে অল্প বয়সের ছাত্রছাত্রীদের যাতে একটা কুৎসিত ভাব চোখ খুললেই মনে প্রবেশ করতে পারে তারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইলেকশনের পরে তা যে মুছে দেওয়াও দরকার এ গরজ নেই নির্বাচন প্রার্থীর। অর্থাৎ তাঁদের ভাল ভাল বাড়ির অথবা যে-কোনো বাড়ি বা প্রাচীরের সৌন্দর্য পাইকারীভাবে নষ্ট করতে অধিকার আছে সৌন্দর্য বাড়াবার এমন কি যা আছে তা রক্ষা করাও যে দরকার,এ শিক্ষা তাঁদের আছে মনে হয় না। অন্য বাড়ির সৌন্দর্য এভাবে নষ্ট করা কি আইনসঙ্গত? জয়লাভের পরে কোনো কোনো নির্বাচনপ্রার্থী লাউড স্পীকারের সাহায্যে ভোটদাতাদের জব্দ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে। সভ্য দেশের সঙ্গে এইখানেই এদেশের পার্থক্য। এমনি অবস্থা চলতে থাকলে যাঁরা বাঙালী ধ্বংসে খুশি হবেন, তাঁরা এর বিপরীতটা হতে দেবেন কি? নতুন সরকার গঠিত হবার পর থেকেই দেখছি যেখানে সাত দিনেও আবর্জনা সরানো হত না, সেখানে প্রতিদিন সরানো হচ্ছে। কিন্তু অন্যের বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট, পথের সৌন্দর্য নষ্ট, এবং লাউড স্পীকার রূপ আবর্জনাও কি এই সঙ্গে সরানো হবে? সাধারণ মানুষ একটু ভদ্র পরিবেশে বাস করতে চায়, সেটুকু যদি কোনো শাসক নতুন করে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে বাঙালীর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা বেঁচে যেতেও পারে।

প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

রাহুমুক্ত রবি

পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান তেজোদ্দীপ্ত রবি অকস্মাৎ রাহুগ্রাসে পতিত-হ'য়ে সুদীর্ঘ ন'মাস কাল অস্তমিত থাকার পর, পুনর্বার উদিত হয়েছে সদ্য-মুক্ত পূর্বাঞ্চলে! রাহু-মুক্ত রবির অলোকোজ্জল স্নিগ্ধ কিরণে সমুদ্ভাসিত হয়েছে সমগ্র মুক্তাঞ্চল। জন-মনে জেগেছে আজ নব জাগরণের অভূতপূর্ব সাড়া। অন্তর্হিত হ'য়েছে সব পুঞ্জীভূত ভীতি, সন্ত্রাস, বিষাদের ঘন-কৃষ্ণ-ছায়া। জাতীয় জীবনে এসেছে আজ স্বাদনের বাস্তব নিশানা। মুক্ত মানুষের কণ্ঠে শুধু:—জয় বাংলা, জয় হিন্দ; জয় ইন্দিরা, জয় মুজিব।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার অবিসম্বাদী সুমহান্ নেতা। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা ভরসা ভবিষ্যের অদ্বিতীয় প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। প্রাক্তন্ পাক প্রেসিডেন্ট কুখ্যাত ইয়াহিয়া খাঁর পূর্ববঙ্গ ও বাঙ্গালী ধ্বংসের প্রকল্প রূপায়ণের নৃশংস কার্য্যক্রম শুরু হয় ২৫শে মার্চ, ১৯৭১। উক্ত দিবস গভীর রাত্রে ঢাকার ধানমণ্ডির বাড়ী থেকে সকলের অজ্ঞাতসারে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের এক নির্জন কারাগারে। মুজিবের গ্রেপ্তার ও গণহত্যার কঠোর নির্দেশ জারি করে এই রাত্রেই ইয়াহিয়া পালিয়ে যায় পিণ্ডিতে। তদবধি শুরু হয় পাক-দানবগণ কর্তৃক পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালী নিধন পাপযজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠান আড়ম্বরে এবং উহার সমাপ্তি ঘটে সুদীর্ঘ ন'মাস পরে। বলা বাহুল্য পাক ভারত যুদ্ধ না হ'লে কিম্বা ভারতীয় জওয়ানদের সক্রিয় সাহায্য না পেলে, একক নিরস্ত্র মুক্তি-বাহিনীর পক্ষে কখনও সম্ভব হত না পূর্ববঙ্গে গণহত্যাকারী সশস্ত্র পাক দস্যুদের পর্যুদস্ত করে সম্পূর্ণ ধ্বংসের কবল থেকে বাংলা ও বাঙালী জাতিকে উদ্ধার করা। বাংলা দেশের ইতিহাস হ'ত অন্যরূপ।

২৫শে মার্চ রাত্রি থেকে পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মুকুট-মণি শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন নিখোঁজ। স্বভাবতই সেখানে সৃষ্টি হ'ল এক অভূতপূর্ব গণচাঞ্চল্য, সঠিক সন্ধান কেউ জানে না বা বলতে পারে না। দেশ বিদেশে দারুণ উৎকণ্ঠা। সর্বত্র নানা জল্পনা কল্পনা। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা। কেউ বলে তিনি আত্মগোপন করেছেন, আবার কেউ বলে সম্ভবত তিনি পাক কারাগারে বন্দী হ'য়ে আছেন। তবে অধিকাংশ লোকেরই ধারণা হ'য়েছিল, পাক দানবদের হস্তে শেখ নিহত। জুলাই মাসে হঠাৎ একদিন জনৈক পাকিস্তানী মুখপাত্র সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিচারাধীন কারাবন্দীর খবর ব্যক্ত করেন। কিন্তু কোথায়? কোন জেলে? কেউ বলেন লায়ালপুরে, আবার কেউ বা বলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। তাই নিয়ে আবার শুরু হ'ল তখন নানা জল্পনা কল্পনা।

অতঃপর বি বি সি থেকে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারের খবরে বলা হয়, সামরিক আদালতে গোপনে শেখ মুজিবের বিচার হবে। শেখ একজন উকিলের সাহায্য নিতে পারেন, কিন্তু কোন বিদেশী উকিলের সাহায্য নেওয়া চলবে না।

এর পরেই এল মুজিবকে হত্যার হুমকি। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যখন বসবে সে সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত না থাকতে পারেন, এই মর্মে সংবাদপত্রের প্রকাশিত পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর উক্তিতে ভারতের লোকসভা ও বিশ্বের বুদ্ধিজীবীমহলে বিশেষ আলোড়ন দেখা দিল।

মুজিবের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ এম পি-রা আবেদন জানান। ১১ই আগষ্ট সামরিক আদালতে মুজিবের বিচার শুরু হলো। লায়ালপুর জেলে। মিঃ এ কে ব্রোহী মুজিবের পক্ষ সমর্থন করেন। কয়েকদিন বিরতির পর আবার বিচার শুরু হলো ২১শে আগষ্ট। ওই দিনই আইরিশ বারের সদস্য ও আন্তর্জাতিক অ্যামনেস্টি (ক্ষমা) বিষয়ক চেয়ারম্যান সিন ম্যাক্‌ব্রাইড সামরিক আদালত ভেঙে দিয়ে অসামরিক আদালতে বিচারের আদেশ দেওয়ার জন্য জেঃ ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান।

ইয়াহিয়া খানের ৮ই আগষ্টের বিবৃতির পর বিশ্বজনমত মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটেছে, বা কি ঘটতে পারে তাই নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়ে, প্রশ্ন উঠল শেখ মুজিব কার ভাগ্য বরণ করেছেন—লুমুম্বা না বেন্ বেল্লার ?

২২শে সেপ্টেম্বর এ পির সংবাদে জানা গেল বঙ্গবন্ধুর বিচার শেষ হ'য়ে গেছে। ১লা অক্টোবর রুশ শান্তি কমিটি বঙ্গবন্ধু ও অপরাপর নেতাদের প্রতি পাকিস্তানী উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়নও শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ করবার দাবী জানান। ২৩শে নভেম্বর তারিখে আন্তর্জাতিক জুরিষ্ট কমিশন শেখ মুজিবর রহমানের বিচার সম্পর্কে পাক সরকার সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

২রা ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, মুজিব জীবিত এবং সুস্থ। ১৮ই ডিসেম্বর এক সরকারী মুখপাত্র জানান যে, দেশদ্রোহের অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিচার চলছিল তা শেষ হ'য়েছে, তবে রায় এখনও দেওয়া হয়নি। ওই দিনই লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

২১শে ডিসেম্বর রাত্রে নব পাক-প্রেসিডেন্ট মিঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো জানান যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং গৃহবন্দী করে রাখা হবে। ২৩শে ডিসেম্বর তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে জানা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে গতকল্য কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে এনে গৃহবন্দী করে রাখা হ'য়েছে। ২৭শে ডিসেম্বর পাকিস্তান বেতারে বলা হয় যে, প্রেঃ ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ওই সাক্ষাৎকারটি ছিল দ্বিতীয়বারের।

২রা জানুয়ারী ১৯৭২ সালের সংবাদে প্রকাশ যে, পাক প্রেসিডেন্ট মিঃ ভুট্টো মার্কিন সাময়িক পত্র টাইম-এর প্রতিনিধির কাছে বলেছেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। ৩রা জানুয়ারী এক জনসভায় ভুট্টোর ঘোষণা :—বিশ্বজনমতের সম্মান রাখতে তিনি মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দেবেন।

৮ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু মুজিবের বন্দীপর্ব হল শেষ। ওই দিন লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, পাক প্রেসিডেন্ট মিঃ ভুট্টো বিনা শর্তে মুজিবকে মুক্ত দিয়ে লণ্ডনে প্রেরণ করেছেন। সেখানে ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ব্যক্তিগতভাবে বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতিকে সাদর স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ক'রে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন।

৯ই জানুয়ারী ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বিশেষ কমেট বিমানে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৫০ মিঃএ লণ্ডন থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন রাহু-মুক্ত রবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১০ই জানুয়ারী দিল্লির পালাম বিমান-বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভূতপূর্ব স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এক সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কোন বিদেশী রাষ্ট্রনায়ককে স্বাগত জানাতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়কে একসঙ্গে বিমান-বন্দরে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। মুজিব-বাহী উক্ত ব্রিটিশ বিমানটি সকাল ৮টা ২মিঃ-এ পালাম বিমান-বন্দরের মাটি স্পর্শ

করা মাত্র একুশ বার তোপধ্বনি করে স্বাগত জানান হয়। বিমান থেকে অবতরণ ক'রে শেখ মুজিবুর রহমান একটি মঞ্চে এসে দাঁড়াবার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীত্রয়ের গার্ড অব অনারের অধিনায়ক তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি উক্ত অধিনায়কের সঙ্গে গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন। শেখ সাহেব এই প্রথম কোনও দেশের গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলেন।

পরিদর্শন-মঞ্চ থেকে নেমে তিনি ভারতীয় মন্ত্রীবর্গ, রাজনীতিক ও এম পিদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতের প্রটোকোল-প্রধান। বিমান-বন্দরের অনুষ্ঠানের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি প্যারেড গ্রাউণ্ডে যান। সেখানে আয়োজিত বিরাট জন-সভায় ভাষণ দান করেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। প্রথমে তিনি ইংরেজীতেই তাঁর ভাষণ দান শুরু করেছিলেন, যাতে অবাঙ্গালী শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে তাঁর বক্তৃতা সহজে বোধগম্য হয়। কিন্তু জনতা তাঁকে বাংলায় বক্তৃতা করবার দাবি জানান। সঙ্গে সঙ্গে শেখ তখন সানন্দে বাংলায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারমর্ম :- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অতুলনীয় অবদানের কথা উল্লেখ করে সর্বান্তঃ-করণে ভারতকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধন অটুট রাখবার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রদান। অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বঙ্গবন্ধু ভারতীয় জওয়ান ও জনগণকে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিব উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দেন—জয় বাংলা। জয় হিন্দ। জয় ইন্দিরা গান্ধী। সবুজ বর্ণের শাড়ি পরিহিতা শ্রীমতী গান্ধী তখন মাইকের সামনে এসে বলেন, "আমার সঙ্গে আপনারাও বলে উঠুন:—শেখ মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ।" আকাশ বাতাস মুখরিত হ'য়ে ওঠে তখন বিরাট জনতার গগনভেদী জয়ধ্বনিতে :- "শেখ মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ।"

সভাশেষে প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবার সময় রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার হর্ষোৎফুল্ল নাগরিক তাঁদের উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের জন্য ভারত সরকার নতুন যে মার্সিডিজ বেনজ মোটর গাড়িটি ক্রয় করেছেন, নয়া দিল্লিতে শেখ সাহেবই তা সর্ব্ব প্রথম ব্যবহার করলেন।

দিল্লির গ্যারিসন গ্রাউণ্ডে আহূত বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন :—"আমার মুক্তি ও বাংলাদেশের বিপন্ন জনসমাজের দুর্গতি নিরসনের জন্য শ্রীমতী গান্ধী পৃথিবীর প্রতি রাষ্ট্রের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন— আমাদের সরকার তাঁর প্রতি ও ভারতের জনগণের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। এ ঋণ আমরা কোনদিন ভুলব না।"

রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল উদ্যানে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নিরালায় আলাপ আলোচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। অতঃপর তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পালাম বিমান বন্দর থেকে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান-বহরের বিশেষ জেট বিমানে রওনা হন স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকা শহরের উদ্দেশে। বেলা ১ টা ৩৩ মিঃ-এ উক্ত বিমানটি ঢাকা তেজগাঁও বিমান-বন্দরের আকাশে দৃষ্ট হওয়া মাত্র, বিমান-বন্দরে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ জনতার কণ্ঠে উত্থিত হলো : জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী জিন্দাবাদ। অফুরন্ত হর্ষধ্বনি। কিন্তু বিমান নামবে কোথায়? লোকে লোকারণ্য রানওয়ের উপরেও। অগণিত জনতার মাথার উপরে ঘুরছে তখন বিমানটি। বহুকষ্টে লোক সরান হলো। বিমান নামলো। থামলো। খোলা হলো দরজা। বেরিয়ে এলেন স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ভালোবাসার সোনার বাংলায় আবার ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘ সাড়ে ন'মাস পরে। বেলা তখন একটা আটচল্লিশ মিনিট। তৎপূর্ব্বে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে তোপধ্বনি করা হয় একত্রিশবার, একটা আটারো মিনিটে। একটা বাহান্ন মিঃ-এ কর্ণেল ওসমানি নিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধুকে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে। তিন

বাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। অতঃপর শ্রীতাজুদ্দিন পরিচয় করিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে। এবার বিমান-বন্দর ঘুরে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করতে একটি খোলা ট্রাকে গিয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু। সঙ্গে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ও আওয়ামী-লীগনেতৃবৃন্দ। উপরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপটার পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে খোলা ট্র্যাকটিকে।

অতঃপর ট্র্যাকটি ক্রমশঃ রমনা ময়দানের পথে অগ্রসর হয়। জনস্রোত পেরিয়ে ট্রাকটি যখন রমনার রেসকোর্স ময়দানে পৌছল তখন বিকেল ৪-৩৫ মিঃ। ট্রাক থেকে বঙ্গবন্ধু নামলেন, কিন্তু চার-পাশে জনতার প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য মঞ্চের দিকে আর এগোতে পারছেন না। প্রধান সেনাপতি ওসমানি তাঁর আগে আগে পথ করে দেবার চেষ্টা করছেন। জনসমুদ্র পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন মঞ্চে গিয়ে বসলেন তখন বিকেল ৪-৪১ মিঃ। জনতা তখন শান্ত। ময়দানের সব দিক থেকেই তাঁরা তাঁদের প্রিয় নেতাকে দেখতে পাচ্ছেন। শেখ সাহেব ৪-৫১ মিঃ-এ মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এক মিনিট জনতার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোন কথাই বলতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন। অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন এবং মাত্র ২০ মিঃ-এ তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধু অনেক কথাই বলছেন, যা সম্ভবত পূর্ব্বে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায়ও কখনও বলেন নি, তাঁর বক্তৃতার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করছি :—

"আমি প্রথমে স্মরণ করি বাংলাদেশের যে অগণিত হিন্দু-মুসলমানের উপর অত্যাচার হয়েছে তাঁদের। তাঁদের স্মৃতির জন্য প্রার্থনা করি, তাঁদের আত্মার মঙ্গল কামনা করি। আজ আমার বাংলা স্বাধীন। আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারব না। বাংলার মেয়েরা, মায়েরা, ছাত্র, কৃষক সবাই আমরা দেশের মুক্তির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছি ও করেছে, তার তুলনা নাই। আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। আপনারা দেশকে মুক্ত করেছেন। আমি জানতাম বাংলাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। কত লোক শহীদ হ'য়েছেন, জান দিয়েছেন তবু পিছু হটেন নাই। ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত লোক, এত নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন নাই, শহীদ হন নাই।

"আমি জানতাম না আবার আপনাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারব। আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মারতে চাও, মেরে ফেল। শুধু আমার লাশটা বাংলাদেশে আমার বাঙালীদের ফিরিয়ে দিও। আমি আজ মোবারকবাদ জানাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের জনগণকে। মোবারকবাদ জানাই ভারতের সেনাবাহিনীকে। মোবারকবাদ জানাই রাশিয়া, ব্রিটেন, পশ্চিম জারমানি এবং আমেরিকার জনসাধারণকে। এক কোটি লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর ভারত তাঁদের খাবার দাবার দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল। এত বড় মানবতা ভোলা যায় না। আজ বাংলাদেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবেই।

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় বড় ভালবাসি। দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন, আমার বাংলায় রাস্তা নাই, ঘাট নাই, খাবার নাই, আমার মানুষ গৃহহারা, পথের ভিখারী—তোমাদের সাহায্য চাই। আবার বলি, বাংলাদেশকে মেনে নাও। রেকগনাইজ কর। এ স্বীকৃতি দিতেই হবে। না দিয়ে উপায় নাই। আমরা হারব না।

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন "সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ কর নি।' কিন্তু বাঙালী দেখিয়ে দিল কবিগুরুর সে বাণী ভুল, স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি দিয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে, এমন নজির বাংলা ছাড়া দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথায়? এত লোক আর

কোথাও প্রাণ দেয় নাই। তাই আমি বলি, দাবায়ে রাখতে পারবা না।

"আজ থেকে আমার হুকুম—প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, ভাই হিসাবে। তোমরা আমার ভাই, আমি তোমাদের ভাই। আমাদের এ স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, যুবকরা কাজ না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ তোমাদের সকলকে আমার মুবারকবাদ। তোমরা লড়েছো। গেরিলা হ'য়েছো। রক্ত দিয়েছো, রক্তদান বৃথা যায় না। দেশকে স্বাধীন করেছো। আজ থেকে বাংলায় যেন চুরি ডাকাতি আর না হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বাংলায় কথা বলে না। আমি বলি তোমরা বাঙালী হ'য়ে যাও। কেউ তোমাদের গায়ে হাত তুলবে না। কিন্তু যারা দালালী করেছে, লোকের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে। এক-জনকেও ক্ষমা করা হবে না। আমি চাই স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মত বিচার হয়ে শাস্তি হোক।

"আপনারা আমাকে চেয়েছেন, আমি এসেছি। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কবর খোঁড়া হ'য়েছিল। জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বলেছিলাম আমি মানুষ, আমি বাঙালী, আমি মুসলমান, মানুষ একবারই মরে, দুবার নয়। হাসতে হাসতে মরব, তবু ওদের কাছে ক্ষমা চাইব না। মরার আগেও বলে যাব আমি বাঙালী, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা। বলব বাংলার মাটি আমার মা। আমি মাথা নত করব না। গ্রেফতারের পর তিন মাস ওরা আমাকে ডঃ কামাল হোসেনকে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু মাথা নামাই নাই। ধরা পড়ার আগে তাজউদ্দিনকে বলেছিলাম, আমি চললাম, কাজ করে যেও। তখন জানতাম আর ফিরে আসব না। তাজউদ্দিন এবং অন্য সব সহকর্মীকে আশীর্বাদ করি। তোমরা ঠিকমত কাজ করেছো।

"আজ আমি বক্তৃতা করতে পারছিনা, নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি। সেই জন্মভূমির মাটিতে পা দিয়ে আমি চোখের পানি রাখতে পারিনাই। জানতাম না এই মাটিকে, এই জাতিকে এত ভালবাসি। ভাবতেই পারছিলাম না আবার আমি বাংলার মাটিতে ফিরে এসেছি, বাংলার মানুষ আজ স্বাধীন। সামনে আমাদের অনেক কাজ বাকী। যেখানে রাস্তা ভেঙেছে, নিজেরাই তা তৈরী কর। একজনও ঘুষ খাবা না, মনে রেখো, আমি ক্ষমা করব না। পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বলি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা নেই। তোমরা আমাদের মা বোনদের 'রেপ' করেছো, ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরেছ। তবু বলি তোমরা সুখে থাকো। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সব শেষ তোমাদের সঙ্গে আর না। তোমরা স্বাধীন থাকো, আমরাও স্বাধীন থাকি। দুই স্বাধীন দেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে তাই থাকবে। তবে যারা অন্যায় করেছে—তাদের ক্ষমা নাই। তোমরা গ্রামের পর গ্রাম পোড়ায়ে দিয়েছ। এমন কোন গ্রাম নাই, এমন কোন ফ্যামিলি নাই, আমার লোককে হত্যা কর নাই। সেই মুজিবর রহমান আর নাই। আমি অসুস্থ। কিছুদিন পরে আবার বক্তৃতা দেব। কাপুরুষ, তোমরা বল মুসলমান। মনে রেখো ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র। ভারত তৃতীয়। পশ্চিম পাকিস্তান মুসলমানের সংখ্যায় চতুর্থ। (ব্যঙ্গের সঙ্গে) তোমরা মুসলমান, মুসলমান মা-বোনদের 'রেপ' করে? জেনে রাখ বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ। গনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রই আমাদের আদর্শ।

"দিল্লিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমার কথা হ'য়েছে। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। যেদিন আমি বলব সেদিনই তিনি বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতের সৈন্য সরিয়ে নেবেন। কিছু কিছু সরিয়েও নিতে আরম্ভ করেছেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এবং তাঁর সরকারকে মুবারকবাদ জানাই। পৃথিবীর এমন কোন রাষ্ট্রপ্রধান নাই যাঁর কাছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে বলেন নি, 'আপনারা ইয়াহিয়াকে বলুন মুজিবকে ছেড়ে

দিতে।' এক কোটি লোক মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে স্থান নিয়েছিল। কত অমূল্য শরণার্থী মারা গিয়েছে। ক্ষমা কর, আমার ভাইয়েরা ক্ষমা কর। পৃথিবীর বহুদেশ আছে যার মোট জনসংখ্যাই দশ বা পনেরো লক্ষ। আর এক কোটি মানুষ এই বাংলা থেকে শুধু গৃহহারা হ'য়েছিলেন। তবু বলি ভাইয়েরা, আইন শৃঙ্খলা তোমাদের হাতে নিও না। মুক্তি বাহিনীর যুবকেরা, তোমরা আমার প্রণাম নাও।

"ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয় জওয়ান তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। যে সব পুলিশ, ই পী আর, যারা মা বোন গৃহ সব ত্যাগ করে সংগ্রামে সামিল হ'য়েছিলেন, যাদের অনেকের মা বোনকে ওরা ধরে নিয়ে ক্যানটনমেনটে বন্দী করে রেখেছিল, তাদের সকলকে ধন্যবাদ। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, ভাত খাবে, সুখে থাকবে এই আমার জীবনের সাধ। এই আশীর্বাদ আমাকে করবেন। আপনারা প্রাণ দিয়েছেন। বলেছেন, মুজিব ভাই ব'লে গিয়েছে দেশকে স্বাধীন কর, জান দাও। আপনারা জান দিয়েছেন। আল্লা আছেন তাই আমি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি। আমি জানি, আমার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কী কষ্ট আপনারা করেছেন। নয় মাস কোন কাগজ পাই নাই। কারাগারে আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি—এখানে কী কষ্ট, কত লাঞ্ছনা। আসার আগে ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, দেখুন দুই অংশে কোন বাঁধন রাখা যদি সম্ভব হয়। আমি বললাম, ভুট্টো সাহেব, তোমরা সুখে থাকো, কিন্তু বাঁধন টুটে গ্যাছে। আর না। তোমাদের সঙ্গে সব শেষ।

"ভায়েরা আমার, চার লক্ষ বাঙালী এখনও পশ্চিম পাকিস্তানে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে একটি দাবি আমি রাখতে চাই—রাষ্ট্রসংঘ অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা থেকে 'ইনকোয়ারী' করতে হবে কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের হত্যা করেছে। আমি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে এই দাবি রাখতে চাই। ভায়েরা আমার, জানি ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। সাবধান করে দিচ্ছি কেউ সে চেষ্টা ক'রো না। সেদিন এই ময়দানের সভায় বলেছিলাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বলি নাই? বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরী কর। আজ বলি—ঠিক থাকো। এক থাকো। স্বাধীন স্বাধীন হ'য়েছি স্বাধীনই থাকব, ইনশা আল্লা।

"আজ আমি আর বক্তৃতা করতে পারছি না। আপনারা আমাকে দোয়া করুন। সবাই মিলে মোনাহাত করুন।

"ভারত বাংলাদেশ ভাই ভাই। শহীদের স্মৃতি অমর হোক। জয় বাংলা।"

রমনা ময়দানের সভায় উক্ত ভাষণদান কালে অধিকাংশ সময়ই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। জনগণের ভালোবাসা দেখে তিনি শিশুর মতো কেঁদেছেন। মাঝে মাঝেই তাঁর বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে বিশাল জনতা সমুদ্রের মত গর্জে উঠেছে—তাঁকেও তখন থেমে যেতে হয়েছিল, রমনা ময়দানের সভায় বঙ্গবন্ধু ৪টা ৫২ থেকে ৫টা ১২ মিনিট বক্তৃতা করেন। অতঃপর তিনি স্বগৃহে গমন করেন।

স্বগৃহে মুজিব

তখন প্রায় সন্ধ্যা। শেখ মুজিবুর রহমান এসে পৌছলেন তাঁর ধানমণ্ডীর বাড়ীতে। এলেন অনেক দুঃখ আর বেদনার স্মৃতির বোঝা বুকে নিয়ে। বিরাট খোলা মোটর গাড়িটি বাড়ির দরজার গোড়ায় এসে থামতেই সেখানে দেখা গেল এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক বাড়ি পৌছনোর অনেক আগেই সেখানে লোকে লোকারণ্য। মানুষের মেলা। অধীর আগ্রহে তাঁরা প্রিয় নেতার আগমনের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছিলেন। আর সেই সঙ্গে ঢাকের তালে তালে তাঁরা নাচছিলেন, গাইছিলেন, রেস্ কোরস ময়দান থেকে শেখের গাড়ি ধানমণ্ডীর বাড়িতে পৌছতেই চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—জয় বাংলা।

গাড়ি থেকে মুজিব নামা মাত্র ছেলে শেখ কামাল এগিয়ে গিয়ে আব্বাকে জড়িয়ে ধরলেন। বেশ কয়েক মিনিট কাটল এইভাবে। দুজনের চোখ দিয়েই তখন

বাঁধভাঙা বন্যার মত জল গড়িয়ে পড়ছে। তারপর মেয়ে এসে হাজির। সেও কাঁদছে। তিন জনের কারুর মুখে কথা নেই। তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন বাড়ির বসবার ঘরের দিকে। ডানদিকে একটি দরজা। সোজা চলে গিয়েছে বেগম মুজিবের শোবার ঘরের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন বেগম মুজিব এবং বঙ্গবন্ধুর মা ও বাবা। শোবার ঘরের দরজার পাশে পাহারা দিচ্ছেলেন ভারতীয় সান্ত্রীরা, যাতে সেখানে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঢুকে না পড়ে।

বেগম মুজিব গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে বেতারের ধারাবিবরণী শুনেছেন সারাক্ষণ। শুনেছেন তাঁর স্বামীর আগমন বার্তা, রেস কোরস ময়দানে তাঁর ভাষণ। মুজিব ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সবাই আবার কেঁদে উঠলেন। মুজিব প্রথমে বাবাকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর জড়িয়ে ধরলেন মাকে। এর পর এসে দাঁড়ালেন স্ত্রীর সামনে। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে গভীর পরিতৃপ্তিতে মাথা রাখলেন স্বামীর বুকে। কেঁদে উঠলেন চীৎকার করে, তারপর নিজেকে খানিকটা সামলিয়ে নিয়ে বলতে গেলেন, তাঁর এই নয় মাসের দুঃখদুর্দশার কথা। কিন্তু বলতে শুরু করেই জ্ঞান হারালেন, খানিক বাদেই অবশ্য তাঁর জ্ঞান ফিরল। তারপর আত্মীয়স্বজন একে একে মুজিবকে স্বাগত জানালেন।

প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর মুজিব কিছু খেতে চাইলেন। তাঁকে দেওয়া হল এক কাপ হর্লিকস্। তিনি খেলেন। বাইরে তখনও লোকের ভিড়। তাঁদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে তিনি চলে গেলেন নিজের বসার ঘরে। তখন তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। অপেক্ষমান ব্যক্তিদের সঙ্গে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কথাবার্তা শেষ করে তিনি আবার ফিরে এলেন ভিতরের ঘরে। জনতার ভিড়ও কমে গেল।

"খোকা, তুই আমাকে একবার আম্মা বলে ডাক। কতদিন তোর ডাক শুনি নি।" —ছেলেকে কোলে টেনে ওই কথা বলেন বঙ্গবন্ধুর মা। মায়ের কোলে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন শেখ সাহেব। ৯৫ বছরের বৃদ্ধ পিতা শেখ লুৎফর রহমান সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "তুই আজ কাঁদবি না। তুই চেয়েছিলি দেশ স্বাধীন করবি। তোর দেশ আজ স্বাধীন।" পাশে দাঁড়িয়ে বড় মেয়ে হাসিনা ও জামাই ডাঃ ওয়াজেদ। হাসিনার মন্তব্য,— "আব্বা, তুমি কত শুকিয়ে গেছ।"

অতঃপর শেখ মুজিব স্ত্রীর সঙ্গেএক সঙ্গে বসে ডাল, ভাত ও মাছের ঝোল খান। খেতে দেয় দুই মেয়ে— হাসিনা আর রেহানা। খাওয়া দাওয়া শেষ করে মুজিব কুর্তা ও লুঙ্গি পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন অনেক রাত। ইউ এন আই-এর একজন সংবাদদাতা তখন এসেছেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে, বঙ্গবন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার রেস কোরসের বক্তৃতা কি আপনি শুনেছেন—যেখানে আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি?" জবাবে সংবাদদাতাটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। মুজিব তখন বলেন; "সত্যিই তিনি ওই শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।" বেগম মুজিবকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু হেঁটে রাস্তার ওপারে একটি বাড়িতে যান এবং সেখানেই তাঁরা রাত্রিবাস করেন।

নতুন কর্মজীবন শুরু

পরদিন ১১ই জানুয়ারী প্রাতে গোটা বাড়ীতেই জনতার ভিড়। সকলেই চান শেখ সাহেবকে দেখতে, তাঁর কাছে যেতে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব? ন'টা নাগাদ বাড়ীতে লোকেরা অনুরোধ জানাতে বাধ্য হ'লেন, বললেন: "আপনারা ওঁকে একটু সময় দিন। দাড়ি কামিয়ে গোসল সেরে নাস্তা করে নিন। তারপর নিচেই যাবেন। সকলের সঙ্গেই কথা বলবেন।" কিন্তু ক'জনে সেকথা শুনতে রাজী? ইতিমধ্যে গোসল সেরে দরজা খুলে শেখ সাহেব বেরুতেই ওপর তলায় যারা ছিল সবাই হুড়মুড় ক'রে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল। শেখ সাহেব তখন দুহাত তুলে বললেন :—"প্লিজ প্লিজ। আমাকে একটু তৈরী হ'য়ে নিতে দিন। তার পরেই

আমি নিচে আসছি।" ভিড় একটু হালকা হলো। এগারটা নাগাদ তিনি তৈরী হলেন। ক্যাবিনেট মিটিং-এ যাবেন। জনাব তাজউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে শেখ সাহেব নিচে নামলেন। প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের চাপ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। শেখ সাহেব তখন নিজেই বললেন, "আপনারা সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ান। আমাকে এক্ষুণি ক্যাবিনেট মিটিংএ যেতে হবে। আমাকে এখনই কাজ শুরু করতে হবে।" গেটের মধ্যেই একখানা গাড়ী ছিল। শেখ সাহেব স্লোগান দিলেন, "জয় বাংলা।" সমবেত জনতাও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি দিল "জয় বাংলা।" শেখ সাহেব তখন গাড়ীতে উঠে বসলেন। ডাকলেন "তাজউদ্দিন এসো।" এলেন, গাড়ীতে উঠলেন, গাড়ী ছেড়ে দিল। জনতা ধ্বনি দিল "জয় মুজিব।" শুরু হ'ল স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি মুজিবুর রহমানের নতুন কর্মজীবন।

প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ

বঙ্গবন্ধু অসাধারণ কর্মবীর। তাই তিনি প্রথমেই ক্যাবিনেট মিটিংএ অস্বীকার করলেন স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি কিম্বা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে। তিনি চেয়েছিলেন সাংগঠনিক কার্যে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করতে। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব? বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে সরকার চ'লবে কি করে? স্বাধীন রাষ্ট্র চালাবে কে? সুতরাং শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের বিশেষ অনুরোধে শেখ সাহেব প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হ'লেন আবু সয়ীদ চৌধুরী।

মুজিব মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক ও সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশের অস্থায়ী মন্ত্রীসভার প্রয়োজনীয় রদ বদলের পর, মুজিব মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক বসে ১৩ই জানুয়ারী ১৯৭২। উক্ত বৈঠকে আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমেই ছিল জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত বিষয়টি। একবাক্যে সকলেই মত দিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' হবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। সিদ্ধান্ত হল : গানটির প্রথম দশ লাইন অর্থাৎ 'মা তোর বদনখানি মলিন হ'লে, আমি নয়ন জলে ভাসি' পর্যন্ত গাওয়া হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একজন কবির রচনা দু'টি গান দু'টি স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত।

রণসঙ্গীত হিসাবে নির্বাচন করা হ'য়েছে কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্‌ চল্‌ চল্‌' গানটি।

পূর্বে জাতীয় পতাকার যে রূপ ছিল আজ তার সামান্য সংশোধনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। আগে পতাকা ছিল সবুজ রঙের। মাঝখানে রক্তবর্ণ বৃত্ত। বৃত্তের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র সোনালী রঙের। এখন মানচিত্রটি তুলে দেওয়া হবে। এর প্রধান কারণ পতাকায় মানচিত্র ব্যবহার করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসুবিধাজনক। ব্যবহার করলেও তা প্রায়ই সঠিক হয় না।

আজকের বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে। আগামী ১৬ই জানুয়ারী রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে। ওই দিন সরকারী, বেসরকারী অফিসভবনে, বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হবে, জনগণ শোকচিহ্ন কালো ব্যাজ পরবেন। বিশেষ প্রার্থনা করা হবে মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, সর্বত্র।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
(মরি হায়, হায় রে)—
ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে,
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
(মরি হায়, হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে, আমি নয়নজলে ভাসি॥

এই গান প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে।

বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্।
উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহা-শ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নও-জোয়ান, শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে, জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল, চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্।

বাংলাদেশের মুজিব মন্ত্রী-সভার সদস্যবৃন্দ

১) প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান : দফ্তর :— মন্ত্রীসভা বিষয়ক, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও বেতার।

২) সৈয়দ নজ্রুল ইস্লাম (প্রাক্তন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)—শিল্প ও বাণিজ্য।

৩) তাজউদ্দিন আমেদ (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)—অর্থ, ভূমিরাজস্ব ও পরিকল্পনা।

৪) ক্যাপ্টেন মনসুর আলি—যোগাযোগ।

৫) খোন্দকার মুস্তাক্ আমেদ—সেচ, বিদ্যুৎ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

৬) আবদুস সামাদ আজাদ—পররাষ্ট্র।

৭) আবদুল হেনা কামারুজ্জমান—ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

৮) শেখ আবদুল আজিজ – কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায়।

৯) প্রফেসর ইউসুফ আলি শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

১০) জহর আহেমদ চৌধুরী—স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার-পরিকল্পনা।

১১) ফণী মজুমদার—খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ।

১২) ডাঃ কামাল হোসেন—আইন ও সংবাদ বিষয়ক, সংবিধান প্রণয়ন, পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ।

যে-সমস্ত দফতর বণ্টন হয়নি, সে গুলির দায়িত্ব আপাতত প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থাকবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই মুজিব মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত হবে। মন্ত্রীসভায় আরও তিনজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী ও কয়েকজন উপমন্ত্রী নেওয়া হবে। প্রায় ঠিক হয়েই আছে যে, টাঙ্গাইলের শ্রী আবদুল মানান, যশোহরের শ্রী সোরাব হোসেন ও শ্রী সিদ্দিকীকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা হবে। শ্রীসিদ্দিকী বর্ত্তমানে জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য।

স্বাধীন বাংলাদেশ : কয়েকটি তথ্য

নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে এর স্থান অষ্টম। কেবলমাত্র, চীন, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রেজিলের জনসংখ্যা এই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চেয়ে বেশি।

সীমা : উত্তরে ভারত পশ্চিমে ভারত, পূর্ব্বে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

জনসংখ্যা : সাড়ে সাত কোটি।

আয়তন : ৫৫১২৬ বর্গমাইল।

জেলার সংখ্যা : ১৯।

মহকুমা : ৫৭।

থানা : ৪১১।

গ্রাম : ৬০ হাজার।

প্রধান নদী : পদ্মা. মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ইছামতী ইত্যাদি।

নদীপথ : শীতকালে—৩৫০০ মাইল ; বর্ষাকালে—৪৫০০ মাইল।

ব্যবহারোপযোগী সড়ক : ২৫০০ মাইল।

রেল লাইন : ১৪০০ মাইল।

নৌবন্দর : চট্টগ্রাম, চালনা।

নগর : ঢাকা চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ইত্যাদি।

ছোট শহর : ৮০টি।

শহরবাসী : শতকরা ১২-৫, গ্রামে বসবাসকারীর সংখ্যা শতকরা ৮৭·৫ ভাগ।

রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদি : কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্যাদ এবং চামড়া।

পাটকলের সংখ্যা : ৪২, এছাড়া ২০টি নতুন পাটকল নির্মিত হচ্ছে।

সাক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা : শতকরা ২০ ভাগ।

মাতৃভাষা বাংলা। স্বাধীনবাংলাকে এ যাবৎ বিয়াল্লিশটি দেশ স্বীকৃত দান করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাস্তব সত্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোন দেশী অথবা বিদেশী শাসকের অনুকম্পার দান কিম্বা ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু নয়, বহু লক্ষ বাঙালীর অমূল্য জীবনের বিনিময়ে অর্পিত বাস্তব স্বাধীনতা। বিপ্লবী বাংলার মূলমন্ত্র : "রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ পুষ্পাবিকীরিত নয়, রুধির কর্দমিত।" তাই উক্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত অসংখ্য মুক্তিকামী বাঙালীর শোণিত সিক্ত মৃতদেহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলার যে পবিত্র সিংহাসন তা কখনও অবাস্তব বা অস্থায়ী হ'তে পারে না। নিঃসন্দেহে উহা হবে দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্কণ্টক, এবং তদুদ্দেশ্যেই আজ সমগ্র বাঙালী জাতিকে অতীতের সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত ও একাত্ম হ'য়ে দেশ এবং জাতি পুনর্গঠনের নিমিত্ত সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, স্বাধীন বাংলার সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রকল্প রূপায়ণে। পাক দানবগোষ্ঠীর নৃশংস অত্যাচারের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত বাংলাকে পুনরায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা গড়ে তুলতে হবে অতীতের ঐতিহ্যবাহী সেই সোনার বাংলা রূপে। অধিকার করতে হবে পুনরায় সকল দেশের শীর্ষস্থান বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করতে হবে বাঙ্গালী জাতি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয় নি। জাতীয় ঐক্য ও সুসংহতির আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তবেই হবে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর অমূল্য জীবনের বিনিময়ে অর্জিত বাস্তব স্বাধীনতার পূর্ণ ও প্রকৃত সার্থকতা।

বঙ্গবন্ধুর কলিকাতা সফর ঐতিহাসিক

ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা সফরে এসেছিলেন। দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে সাদর স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইতিপূর্বে কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে এরূপ সাড়ম্বর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় নি। বঙ্গবন্ধুর সম্বর্দ্ধনা সম্পূর্ণ ঐতিহাসক এবং রাজসিক বা রাজকীয়। ওই দিন সকাল সোয়া দশটায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ঢাকা থেকে দম দম বিমান বন্দরে এসে পৌছুলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে সুস্বাগতম্ জানান। শ্রীমতী গান্ধী দিল্লী থেকে যে বিমানে এসেছিলেন, সে বিমানটি শেখের বিমান পৌছবার পনের মিনিট পূর্বে অর্থাৎ দশটায় দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করে সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী যথাসময়ে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের পর বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রদর্শিত হ'ল সামরিক অভিবাদন। গীত হ'ল বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রথমে এবং পরে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। পরিচিত হ'লেন বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে উপস্থিত সরকারী

বেসরকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে এবং বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রতিনিধি বর্গের সঙ্গে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে গিয়ে মোহন-বাগান মাঠে অবতরণ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। সেখান থেকে মোটর গাড়ীতে রাজভবনে যাবার পথে দুই প্রধানমন্ত্রী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তখন বেলা ঠিক এগারোটা। অগণিত লোকের জয়ধ্বনি: বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ, ইন্দিরাজী জিন্দাবাদ। তারপর দুই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মিছিল গিয়ে ঢুকল রাজভবনে দক্ষিণ ফটক দিয়ে। বাইরে জনতার বিপুল জয়ধ্বনি।

রাজভবনে পৌছেই দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে শুরু হল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। দুপুরে আহার ও বিশ্রামের পর প্রধানমন্ত্রীদ্বয় রাজভবন থেকে মোটরে গিয়ে বিকাল ৩—১০ মিঃএ পৌছুলেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের জনসভায়। উদ্বেলিত জনতার প্রচণ্ড ভিড়। কত লক্ষ মানুষ সেখানে সমবেত হ'য়েছিল, তার সংখ্যা নিরুপণ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। ৩—১৫ মিঃএ প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা শুরু করেন এবং বিশ মিনিটে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধুও বিশ মিনিটে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। দুই প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার সারাংশ, সম্বর্দ্ধনা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন এবং ভারত-বাংলাদেশ চির-মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রদান ইত্যাদী।

সভা শেষে তাঁরা রাজভবনে ফিরে যান। সন্ধ্যায় কর্মসূচি শেষ ক'রে, রাতের ভোজসভায়ও উভয় প্রধান মন্ত্রী যথাযথ ভাষণ দান করেন, ময়দানের সভায় এবং রাজভবনে যে সমস্ত সঙ্গীত পরিবেশিত হ'য়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাত এগারোটায় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

পরদিন প্রাতেও দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের ব্যাপারে ভারত বাংলাদেশকে ঢালাও সাহায্য দেবে বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন: ভারতের ঋণ বাংলাদেশ কোনদিন শোধ করতে পারবে না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উক্তদিবস কয়েক কোটি টাকার জীপ, ট্রাক, এম্বুলেন্স প্রভৃতি বাংলাদেশকে দান করেন এবং তিনি দুপুরেই কলিকাতা ত্যাগ করে দিল্লি ফিরে যান। বঙ্গবন্ধু বিকাল ৩টার পর পৌরসভা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। পরদিন সকালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ ক'রে দমদম বিমান-বন্দর থেকে ভারতীয় বিমানে ঢাকা চ'লে যান।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রিন্স অভ ওয়েলস, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাগরিকতাগুণে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ব্রিটেনের লোকেরা যেন প্রদর্শনীতে আগত বিবিধ উপনিবেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের একটি স্নেহপূর্ণ স্মৃতি বহন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন। এই প্রস্তাবটি প্রাজ্ঞজনোচিত এবং সহানুভূতিজাত। কিন্তু ইহার নিজস্ব মূল্য যাহাই হউক, যে স্থান হইতে প্রস্তাবটি আসিল তাহার জন্যই বিশেষ করিয়া সকলে ইহাকে সহর্ষ অভ্যর্থনা জানাইল, কারণ প্রিন্স অভ ওয়েলস—আমাদের ভাবী সম্রাট—ইংল্যাণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকেরই খুব প্রিয়। তিনি খুব উদার এবং সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। তাঁহাকে সবাই মনে মনে পূজা করে। আমাদের কাছে ইংল্যাণ্ডের সকল দিক হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে লাগিল। সকল শ্রেণীর নিকট হইতে। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়ার নিকট হইতেও আসিল। নিমন্ত্রণের সংখ্যা এত হইল যে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র রিসেপশন কমিটি গঠন করিতে হইল। পরে জানিতে পারিলাম এই নিমন্ত্রণের জন্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যেও কিছু কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল ব্রিটিশ-জাত ঔপনিবেশিক লোকদের মধ্যে, এবং যাহাদের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে প্রদর্শনী অথবা উপনিবেশের লেশমাত্র সংস্রব আছে তাহাদের মধ্যে। আমাদের অপেক্ষা ইহারা এই নিমন্ত্রণের মূল্য বেশি বুঝিতে পারিয়াছিল। লিলিপুট দ্বীপপুঞ্জের প্রিন্স ল'বুর মত আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, এই সামান্য ব্যাপার লইয়া এত উত্তেজনা কেন। ক্রমশঃ আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল।

দেখিলাম আমাদের দেশের অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের লোকদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর। আসলে ইহা শ্রেণীভেদ।

ইংরেজ জাতিকে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। উচ্চ শ্রেণীতে জনসংখ্যা দশ হাজার, এবং এই দশ হাজার ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত শ্রেণীকে বলা হয় "সোসাইটি", ইহাদের নিম্নস্থ আর সবাই যাহারা সোসাইটিভুক্ত নহে, অথবা অন্য কথায় যাহারা জেনটলম্যান নহে, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর। কিন্তু এই মূল বিভাগের মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর আছে, এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু উচ্চ পর্যায়ের তাহারা তাহাদের নিম্ন পর্যায়ের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখে। এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা চেষ্টা করিতেছে তাহাদের অব্যবহিত উপরের শ্রেণীতে স্থান পাইতে। এ বিষয়ে কিছু যোগ্যতা লাভ করিবামাত্র সে সোসাইটি-ভুক্ত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহারা ঐ সর্বোচ্চ দশ হাজারের মধ্যে নিমন্ত্রিত অতিথি হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে। যদি নেহাৎ দীন হীন হয় তবে সে তাহার ঠিক উপরের স্তরে উঠিতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করে বলিয়া ইহারা কেহই নিজেদের উপার্জনের পরিমাণ কাহাকেও জানায় না, এবং সে যাহা নহে, তাহাই দেখাইতে সব সময় চেষ্টা করে। অনেক দোকানদার ও দরিদ্র ব্যক্তি রাজনৈতিক মতবাদে রক্ষণশীল ; উদ্দেশ্য এই যে, কেহ তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে ভাবিবে ইহারা সম্মাননীয় এবং ধনী লোক। কারণ অভিজাত শ্রেণী সকলেই রক্ষণশীল ও ধনী, এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অপরিচ্ছন্ন লোকেরা উদার এবং সংস্কারপন্থী।

ইংরেজদের এই জাতিভেদ এই ভাবে প্রকাশ করা যায়—(১) রাজপরিবার ও প্রাচীন উচ্চ অভিজাতদের সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ, (২) প্রাচীন অভিজাতদের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ, (৩) অভিজাত বর্গের উপাধিহীন আত্মনির্ভর আত্মীয় স্বজন, এবং যাহারা অধুনা উপাধি লাভ করিয়াছে এবং ধনী বণিকগণ যাহারা অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে, (৪) অভিজাত শ্রেণীর নিকট-আত্মীয়গণ যাহাদের নিজস্ব কোনও উপার্জন নাই, এবং যাহারা উত্তরাধিকার লাভ করিবার আশা রাখে অথবা যাহারা লাভজনক বিবাহের অপেক্ষা করিতেছে। ইহারাই সর্বোচ্চ দশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। যে সব ব্যক্তি রাজপরিবারে জন্মায় নাই, যাহারা রেস কোর্সে, থিয়েটারে, চিত্রশিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, অথবা সরকারি চাকরিতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে তাহাদিগকে ইহারা প্রশংসা দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা, আপ্যায়ন করিয়া থাকে। সোসাইটি বহির্ভূত লোকেরা অগণিত জাতিতে বিভক্ত, প্রধানতঃ অর্থের পরিমাণ বিচারে। জন্মসূত্রেও কিছু পরিমাণ বিচার হইয়া থাকে। হিন্দুদের মতই ইংরেজরা নিম্ন জাতির সঙ্গে একত্র পানাহার করে না, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। এবং আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মণরা যেমন করে, তেমনি নিষ্ঠাবান্ অভিজাত ইংরেজরাও কোনও উপলক্ষে নিম্ন শ্রেণীর ইংরেজের সংস্পর্শে আসিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। অপবিত্রতা দূর করিবার জন্য অনেক সময় তাহারা সুগন্ধ মিশ্রিত জলেও স্নান করে। একবার এক ভদ্র লোককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ত্রিবাঙ্কুরের ব্রাহ্মণ যে কারণে একজন অস্পৃশ্য পুলিয়াকে ছোঁয় না, তিনিও সেই একই কারণের কথা উল্লেখ করিলেন। পানাহার বিষয়ে অবশ্য উঁহাদের আমাদের মত ছুঁৎমার্গ নাই, কারণ ও দেশে ধর্ম এ রকম বিধান দেয় নাই। হোটেলে ইংরেজ ব্রাহ্মণ ইংরেজ ব্রাহ্মণেতরের সঙ্গে খাইতে পারে, জাহাজে অথবা অন্যত্র পারে—মোট কথা যেখানে না পারিয়া উপায় নাই। তবু এ সব স্থলেও সে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে। যাত্রী জাহাজে সে অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের দলের লোক খুঁজিয়া লয় এবং তাহারা পৃথক দল গঠন করে। নিম্ন শ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গে এরূপ ক্ষেত্রে মিশিলে ইংরেজ ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহাদের দলে খুব স্বাধীনভাবে মেশে না। মিশিলে তাহার স্তরের লোকেরা তাহাকে নিচু নজরে দেখিবে। দাতব্য উদ্দেশ্যে উচ্চস্তরের মহিলা অথবা ধর্মজীবীদের নিঃসম্বল লোকদের বাড়িতে যাওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ নহে।

আন্তঃশ্রেণিক বিবাহ অচিন্তনীয়, কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। যদি কোনও নূতন ধনী হওয়া বণিক সোসাইটিতে উত্তীর্ণ হইতে চাহে, এবং কোন দরিদ্র ইংরেজব্রাহ্মণ বিবাহসূত্রে অর্থ লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে আন্তঃশ্রেণিক বিবাহ ঘটিয়া থাকে। কন্যা ও তাহার আত্মীয়গণ তখন সোসাইটিতে গৃহীত হয়, যদিও সম্পূর্ণ বিনা আপত্তিতে নহে। অবশ্য পরবর্তী বংশের লোকেরা স্বতঃই সোসাইটি-ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ করিল, অথচ তাহার টাকা নাই, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহিতের বড়ই দুর্ভাগ্য। তাহার ঘাড়ে জাতিচ্যুতির খড়্গটি নামিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রতিকূলতা আছে খাওয়া ও বিবাহের ক্ষেত্রে, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব বোধে নাই। এ ক্ষেত্রে উচ্চ নীচ ভেদ নাই। ইংল্যাণ্ডে সেরূপ নহে। সেখানে দুই জাতির মধ্যে ভালবাসাও নাই, ঘৃণাও নাই। উচ্চ সেখানে নীচকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করিয়া চলে। সে তাহার কথা চিন্তাও করে না, তাহার অস্তিত্বকে স্বীকারও করে না, শুধু ভোট ভিক্ষার সময় তাহাকে স্মরণ করিতে হয়। যাহাদের পূর্বপুরুষ উইলিয়াম দি কংকরার-এর সঙ্গে ব্রিটেনে আসিয়াছিল, এবং সে সময় সেখানকার জমির পূর্ব মালিকের নিকট হইতে জমির স্বত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহারাই ইংরেজ সোসাইটিতে প্রথম শ্রেণীর লোক। পরে যে সব লোক নানা দিক হইতে বড় হইয়াছে, তাহারাও ক্রমে সোসাইটিভুক্ত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। শিক্ষার প্রসার, সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের ভিতর অর্থ ছড়াইয়া পড়া, উদার আইনের

দরুণ সকলের পক্ষে অধিক ধনলাভ সহজ হওয়ায় অভিজাতদের ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাদের স্বাতন্ত্রও ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

তদুপরি নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে সম্প্রতি অভিজাতদের রক্তের মিশ্রণ পুনঃ পুনঃ ঘটাতে এখন এমন হইয়াছে যে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এখন লর্ড সভার সভ্য হওয়ার ব্যাপারটা খুব সম্মানজনক কি না এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেছে। পুরাতন জাতিভেদ প্রথা ভারতেও যেমন ইংল্যাণ্ডেও তেমনি ভাঙিয়া পড়িতেছে—কারণ উভয়ত্রই এক, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার। অবশ্য দুটি দেশেই উচ্চ জাতিকে সম্মান করার রীতিটি এখনও প্রবল আছে। অতএব প্রাসাদ হইতে যে নিমন্ত্রণ আসিল তাহাতে ঔপনিবেশিকগণ ও ভারতীয়গণ রাজপরিবারের এই অবনমনে তাঁহাদের আতিথেয়তা লাভে ব্যগ্র হইয়াছিল স্বভাবতঃই। আমরা অন্ততঃ এই আতিথেয়তা না পাইলে ইংরেজ জীবনের সঙ্গে এতটা পরিচিত হইতে পারিতাম না।

১৮৮৬ সনের জুলাইয়ের প্রথম দিকে আমাদিগকে উইণ্ডসর কাস্‌লে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ হইল। পত্রটি এই ভাবে লিখিত ছিল—

"The Lord Steward has received Her Majesty's command to invite,—' to luncheon at Windsor Castle on Monday,the 5th of July at 2 o'clock."

কার্ডের বিপরীত দিকে কি পোষাকে আসিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া ছিল। যথা, মহিলাগণ মর্নিং ড্রেস পরিবেন, ভদ্রমহোদয়গণ ঈভনিং কোট, মর্নিং ট্রাউজার্স, তৎসহ শ্রেণী-পরিচায়ক চিহ্ন ও সম্মান-চিহ্নাদি। আরও ছিল "the Court will be in mourning." (রাজপরিবার ও পদস্থ কর্মীগণের শোক-চিহ্ন ধারণ করা থাকিবে।)

৫ই জুলাই সকাল দুইটা ত্রিশ মিনিটের সময় ঊষার আলো ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আরও পরে পূর্বাকাশে সোনার রং দেখা দিল। সুপ্ত লণ্ডন শহরের উচ্চ চিমনিগুলি প্রথম রং গ্রহণ করিল। জানালা দরজা বন্ধ, রাজপথ জনশূন্য, শুধু জাগ্রত পুলিসের লোক বীটে ফিরিতেছে,কিংবা কোনও গৃহহীন কাহারও দরজার ধাপ হইতে জাগিয়া হাই তুলিতেছে ও হাত টান করিয়া আড়মোড়া ভাঙিতেছে। ক্রমে সেই স্বর্ণাভা সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করিয়া সমস্ত অন্ধকার দূর করিল। শুধু পাখীর ডাক শোনা যাইতেছে,লণ্ডন তখনও সুপ্ত। লণ্ডনে তখনও রাত্রি। সাড়ে চারিটা বাজিল। ক্রমে পথে খুটের আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল, একটি দুইটি করিয়া পরে রাজপথ পদশব্দে মুখরিত হইল। মধুর সন্ধানে এই সব মৌমাছিদের যাইতে হইবে ত। ফুলের পাপড়ি খুলিয়াছে, হাওয়ায় সুগন্ধ, অতএব কাজ আরম্ভ কর।

মধু মক্ষিকার সঙ্গে তুলনা (যদি আদৌ তুলনা চলে) ওদেশে করিয়া থাকে, ওদেশের পক্ষে যোগ্য তুলনা সন্দেহ নাই। সব ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে সময়ের একটি মুহূর্ত উহারা বাজে নষ্ট করে না। প্রয়োজনের চাপে বিশ্রামেরও অনেকখানি অংশ উহাদের কাজের হাতে সমর্পণ করিতে হয়। ওখানকার প্রত্যেকটি নরনারী মক্ষিকার মতই কর্মব্যস্ত। কয়েকটি ড্রোন (অলস পুরুষমক্ষিকা, অন্যের শ্রমের ফলভোগী) কর্মহীন অলস প্রকৃতির লোকদের ক্ষতি অন্যদের পরিশ্রমের ফলে পূরণ হইয়া যায়। কিছু সংখ্যক লেডি ও জেনটলম্যান ব্যতীত প্রত্যেকই কাজ করে, এবং কাজ করে সাধারণতঃ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এবং আমরা যেভাবে কাজ করি তাহা হইতে ইহা পৃথক। এখানে আমরা ধীরে সুস্থে মন্থর গতিতে কাজ করি, উহারা ওদেশে সময়ের পিঠে যেন চাবুক মারিয়া চালায়। সেখানে বহুলক্ষ যন্ত্রের হাতের সঙ্গে চারি কোটি মানুষের হাত যুক্ত হইয়া জমি চাষ করে, হাতুড়ি চালায়, শেলাই করে, বয়নের কাজ করে—দিনে রাত্রে অবিরাম। যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যে জমিটুকুর উপর ঘনীভূত করা হইয়াছে, সেই জমিটুকুর নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রিটেন। আর আমাদের দেশে, আবহাওয়া এবং দৈহিক সামর্থ্যগত অসুবিধার কথা ধরিলেও শুধু

কি করিয়া শ্রমকে লাভবান্ করা যায় সে জ্ঞানের অভাব এবং বয়স্কদের কর্মবিমুখতায় খুব কমিয়া হিসাব করিলেও প্রতিদিন ১৬ কোটি শ্রম-ঘণ্টা নষ্ট হয়। ঘণ্টায় এক পয়সার শ্রম নষ্ট হইলেও প্রতিদিন পঁচিশ লাখ টাকা আয় কম হইতেছে। অন্য কথায় এই অলস হাতগুলিকে যদি কর্মতৎপর হইতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা আশি দিনের কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের মত একটি রেলপথ গড়িয়া তুলিতে পারে। স্বর্গমর্তের ভাগ্যগণনাকারী ভবিষ্যদ্বক্তারা এখন কোথায় গিয়াছেন? বর্তমানে তাঁহাদের কেহ কি আমাদের ভিতর আবির্ভূত হইয়া সভ্য মানুষের মত জীবন কাটাইবার উপায় বলিয়া দিতে পারেন না? আমাদের কি শিখাইতে পারেন না যে, অলসতা পাপ, এবং কাজ করা পুণ্য এবং ইহাই পার্থিব বহু দুঃখ ভুলাইয়া দিতে পারে এবং স্বর্গে যাইবার অনুমতি-পত্র দিতে পারে? অথবা বিত্তহীন লোকদের নিকট হইতে অর্থ উপায়ের নূতন নূতন বুদ্ধি না খাটাইয়া ইহাদের নিকট তাহার বিনিময়ে শ্রম লইলে ত হয়? এই শ্রম ত তাহারা অব্যবহারে নষ্ট করে। ইহা দ্বারা শড়ক, রেলপথ, কূপ, পুষ্করিণী, খাল করাইয়া লওয়া যায়, এমন সমাজে, যেখানে জনসাধারণ ঠিক পথে চিন্তা করিতে জানে না, সেখানে পিটার দি গ্রেটের মত একজন শাসক দরকার, যাঁহার হুকুম আইনের কাজ করিবে এবং যাহাতে পার্লামেন্টের নিকট হইতে কোনও বাধা আসিবে না, খবরের কাগজের অর্থহীন চিৎকার থাকিবে না। তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক সরকার যাহা করিতে একশত বৎসর লাগায় তাহা করিতে দশ বৎসর লাগিবে। জাপানের কথা ভাবিয়া দেখুন না?

একটি এঞ্জিন ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনের শেড হইতে খুব যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল, এবং শানটিং করিয়া শ্রমিকদের জন্য গাড়ি জুড়িয়া ফেলিল। প্ল্যাটফরমের উপর বুকস্টলের লোকেরা আসিয়া হাজির হইল, শ্রমিকেরা পেনি খরচ করিয়া সকালের সংবাদপত্র কিনিতে লাগিল। বাহিরে চাকায় ঠেলা কফি-স্টল আসিল। তাহাতে পাশাপাশি দুইটি বড় পাত্রে জল ফুটিতেছে। একটি কাঠের বোর্ডে শস্তা দামের অনেক কাপ ও সসারের ঠুন ঠুন শব্দ হইতেছে। ব্যস্ত-সমস্ত লোকেরা স্টল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কফি গিলিতে লাগিল, এবং শেষ হইলে একটি করিয়া পেনি রাখিয়া যে যাহার মত চলিয়া গেল। ছেলেরা খবরের কাগজ হাঁকিয়া যাইতেছে পথে পথে, দুধওয়ালা কড়া সুরে চিৎকার করিতেছে, ভৃত্যেরা দরজা পরিষ্কার করিতেছে, পিতলের কবজাগুলি ঘষিয়া ঝকঝকে করিতেছে, ধাপগুলি সাবান জলে ধুইয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতেছে। দোকানীরা দোকান খুলিয়া ধুলা ঝাড়িয়া বিক্রেয় দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিতেছে। সাতটার মধ্যে শ্রমিক লণ্ডন জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা গত রাত্রির ডিনার এবং বলনাচের ক্লান্তিবশত এখনও ঘুমাইয়া আছে। তাহারা দশটার আগে বড় একটা বিছানা ছাড়ে না। ঔপনিবেশিক আগন্তুকেরাও নিমন্ত্রণে যোগ দিয়া ক্লান্ত, তাহারাও শুইয়া আছে।

সম্রাজ্ঞী কর্তৃক ব্যবস্থিত স্পেশাল ট্রেন আমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই ট্রেন প্যাডিংটন স্টেশন হইতে অপরাহ্ণ একটার সময় যাত্রা করিল। উইণ্ডসরে রাজকীয় বাহন প্রস্তুত ছিল, আমাদিগকে লইয়া সেগুলি ক্যাসল-এর দিকে রওনা হইল। সার বার্ডউড তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তা বশতঃ ইণ্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে আমাদিগকে মিষ্টার ফিটজেরাল্ড নামক এক পলিটিক্যাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। ইনি সার সেমুর ফিটজেরালডের ভাই। আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। উইণ্ডসরের পথগুলিতে নানাদেশের অতিথিদিগকে দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হইয়াছিল খুব, কিন্তু তাহারা সুসংযত ছিল। ক্যাসলের দিকে যত অগ্রসর হইতেছি, ততই একের পর এক হর্ষধ্বনিতে আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানান হইতেছে। আমরা ভারতীয়রা সর্বাপেক্ষা অধিক হর্ষধ্বনি লাভ করিয়াছিলাম। প্রদর্শনীর সংশ্রবের বাইরে যাঁহারা রাজনিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা—নরসিংগড়ের রাজা, গণ্ডালের ঠাকুর সাহিব, গাইকোয়াড়-

রাজের ভ্রাতা সম্পত রাও এবং সুরাট অঞ্চলের এক মুসলমান নরপতি। আমাদের গাড়ি হাই স্ট্রীট হইয়া, সপ্তম হেনরির গেট দিয়া স্টেট অ্যাপার্টমেন্টে উপস্থিত হইল। উপস্থিত অভ্যাগতগণকে "জন্মদিন বহি" বা বার্থ ডে বুক-এ স্বাক্ষর করিতে বলা হইল। বইখানি সুন্দর ভাবে বাঁধাই করা, প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ছাপা। প্রত্যেকে যিনি যে তারিখে জন্মিয়াছেন সেই তারিখের পাতায় নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্বাক্ষর গ্রহণের 'হবি' হইতেই ইহার জন্ম, এবং এ রকম বই অনেক গৃহেই আছে। জানি, কারণ অনেকের বাড়িতেই এ-রকম স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে। এবং শুধু ইংরেজীতে নহে, স্বদেশী ভাষাতেও করিতে হইয়াছে। ইহার পর লোভনীয় সব খাদ্য পরিবেশন করা হইল। লানচের পরে পরিচয়, অভ্যর্থনা ইত্যাদির পালা আরম্ভ হইল। প্রিন্স অভ ওয়েলস সবাইকে একে একে সম্রাজ্ঞীর কাছে পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রিন্স অভ ওয়েলস দণ্ডায়মানা সম্রাজ্ঞীর দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইলেন, প্রিনসেস অভ ওয়েলস বাম দিকে দাঁড়াইলেন, পরিবারের অন্যান্য সকলে পিছন দিকে দাঁড়াইলেন। ঘোষক এক-একটি নাম উচ্চারণ করে, সে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়। যুবরাজ তখন ঐ অতিথির পরিচয় সম্রাজ্ঞীকে শুনাইয়া দেন। তৎক্ষণাৎ অতিথি মাথা নত করিয়া অভিবাদন জানায়। এবং ইহার পরেই রীতি অনুযায়ী সেখান হইতে সরিয়া যায়, তখন সেখানে আর একজন আসিয়া দাঁড়ায়। ভারতীয়দের প্রতি সম্রাজ্ঞীর সদয়ভাব লক্ষ্য করিলাম। ইহার পরে অন্য সময়েও ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমরা ক্যাসল-এর সমস্ত অংশ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সেদিন তথাকার সমস্ত কক্ষ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

স্টেট অ্যাপার্টমেন্টগুলি সম্রাজ্ঞী উইণ্ডসর ক্যাসল-এ না থাকিলে সপ্তাহে চারিদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে তিনি স্কটল্যাণ্ডের ব্যালমোরাল ক্যাসল অথবা (ওয়াইট দ্বীপের) অসবোর্ন হাউসে বাস করেন। উইণ্ডসর ক্যাসল-এর অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে কক্ষ আছে দশটি। ইহাদের নাম কুইনস অডিয়েন্স চেম্বার, কুইনস প্রেজেন্স চেম্বার, গার্ড চেম্বার, সেন্ট জর্জেস হল্, গ্র্যাণ্ড রিসেপশন রুম, ওয়াটারলু চেম্বার, গ্র্যাণ্ড ভেস্টিবিউল, স্টেট অ্যান্টি রুম, জুকারেলি রুম, এবং ভ্যানডাইক রুম। কক্ষগুলির সিলিং-এ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা কাহিনী-চিত্র, প্রাচীর-সমূহে মূল্যবান্ পর্দা ও ঐতিহাসিক-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চিত্র রহিয়াছে। অডিয়েন্স চেম্বারের সিলিং-এ ক্যাথারিন অভ ব্রাগানজা, দ্বিতীয় চার্লস-এর রাণী (ব্রিটানিয়া রূপে চিত্রিত); তিনি একটি শকটে বসিয়া আছেন, রাজহাঁসেরা সেটিকে ভার্চুর মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে চলিতেছেন প্রাচীন দেবতাগণ—সিরিস, ফ্লোরা, পোমোনা ইত্যাদি। প্রাচীরে তিনটি গোবেলিন (বা গোবল্যাঁ) পরদা, তাহাতে ওলড টেস্টামেন্ট বর্ণিত এসথারের ইতিহাস চিত্রিত রহিয়াছে। দরজার উপরে মেরি, কুইন অভ স্কটস-এর পূর্ণাবয়ব চিত্র টাঙানো আছে, চিত্রের পটভূমিতে মেরির হত্যা দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। এই হত্যা দৃশ্যের নিচে যে ল্যাটিন লিখনটি আছে তাহার অর্থ—"রাজ্ঞী—যিনি নৃপতিদের কন্যা, সহধর্মিণী এবং মাতা, তাঁহাকে জল্লাদের কুঠারাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। প্রথমে দুটি আঘাতে তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে আহত করা হয়, তৃতীয় আঘাতে তাঁহার শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই হত্যা দৃশ্যে কুইন এলিজাবেথের কমিশনার ও অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।" চিত্রের উপরের কোণে আরও একটি লিখনে বলা হইয়াছে—"মেরি কুইন অভ স্কটল্যাণ্ড—স্বায়ত্তঃ ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী, গ্রেট ব্রিটেনের নৃপতি জেমস্-এর মাতা, নিজের লোকেদের ধর্মবিশ্বাস-বিরোধিতার ফলে উত্যক্ত এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা পরাভূত হইয়া ১৫৬৮ সনে ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছিলেন আশ্রয় লাভের আশায়। তাঁহার আত্মীয়া কুইন এলিজাবেথের কথায় বিশ্বাস করার ফলে,

তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বারা ১১ বৎসর কারাগারে কাটাইতে হয়, হাজার অপবাদে তাঁহার নাম কলঙ্কিত করা হয়, তাহার পর ধর্মমত-বিরোধিতার অজুহাতে ও বিরোধীদের উস্কানিতে ইংলিশ পার্লামেন্টের নির্মম বিচারে তাঁহার চরম দণ্ড বিধান হয়, এবং তিনি হত্যাকারীদের নিকট প্রেরিত হন। ১৫৮৭ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি একটি সাধারণ জল্লাদের হাতে ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার শির ছিন্ন করা হয়।" ইঁহার ইতিহাস পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

কুইন'স প্রেজেন্স চেম্বারের সিলিং-এও রূপক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। আঁকিয়াছেন নেপল্‌স-এর চিত্রকর আন্টোনিও ভেরিও। দ্বিতীয় চার্লস তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। এ চিত্রেও ক্যাথারিন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। একটি চন্দ্রাতপ তাঁহার মাথার উপরে, জেফির বা পশ্চিমবাহিত মধুর বাতাস তাহা শূন্যে ধরিয়া রাখিয়াছে, মহাকাল সেটিকে ওখানে বিছাইয়া দিয়াছে। ইহার নিচের চিত্রে ন্যায়-বিচার রাজদ্রোহিতা ও অন্যান্য অশুভ প্রেতদেহকে বিতাড়িত করিতেছে। প্রাচীরের গোবলঁ্যা পর্দায় এসথারের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অঙ্কিত হইয়াছে। গার্ড চেম্বারে যুদ্ধের স্মারকরূপে বহু চিত্তাকর্ষক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ট্রাফালগার নৌ-যুদ্ধে ভিকটোরি নামক যে জাহাজটি গোলাবিদ্ধ হইয়াছিল তাহার মাস্তুলের (ফোরমাস্টের) একটি অংশ এখানে রহিয়াছে। ঐ নৌ-যুদ্ধের আর একটি স্মৃতি একটি 'বারশট', ইহা ঐ জাহাজেরই আটজন লোককে নিহত করিয়াছিল। শিখদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি কামানও সেখানে রহিয়াছে। সেন্ট জর্জের হলটি বেশ বড়, ২০ ফুট দীর্ঘ এবং ৭৪ ফুট প্রস্থ। ইহার সিলিং প্রথম অর্ডার অভ দি গার্টার প্রচলনের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ শিভালরির সময় হইতে যত রকম অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে তাহা চিত্রিত রহিয়াছে। এই 'অর্ডার' ভুক্ত যাবতীয় 'নাইট'দের নামও জানালাগুলির প্যানেলে লিখিত আছে। তৃতীয় এডওয়ার্ড ও ব্ল্যাক প্রিন্স (তৃতীয় এডওয়ার্ডের এক পুত্র) হইতে আরম্ভ করিয়া আর্ল অভ বিকনসফিল্ড ও মার্কুইস অভ স্যালিসবেরি পর্যন্ত সবার নাম। প্রাচীরগুলিতে রাজাদের নাম—প্রথম জেম্‌স হইতে চতুর্থ জর্জ পর্যন্ত। গ্র্যাণ্ড রিসেপশন রুমটি বিশেষ ভাবে অলঙ্কৃত। প্রাচীরগুলিতে যে গোবলঁ্যা পর্দা আছে, তাহাতে জেসন ও মিডিয়ার কাহিনী চিত্রিত রহিয়াছে। ওয়াটারলু চেম্বারে রহিয়াছে ওয়াটারলু যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় রাজা যোদ্ধা ও রাজনীতিক যাঁহাদের কর্মফলে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের সকলের প্রতিকৃতি। নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি এখানে নাই, কিংবা তাঁহার অধীন যে সব ফরাসী জেনারেল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিকৃতিও অনুপস্থিত। গ্র্যাণ্ড ভেস্টিবিউলে সামরিক বিজয় গৌরবের বহু চিহ্ন, বর্ম প্রভৃতি রহিয়াছে। একদিকে বোয়েহ্‌ম নামক ভাস্করের নির্মিত সম্রাজ্ঞীর 'শার্প' নামক কুকুরসহ প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। স্টেট অ্যাণ্টি রুমের সিলিং-এ পূর্বে উল্লেখিত ভেরিও নামক নেপল্‌সের শিল্পী অঙ্কিত খুব স্ফূর্তিযুক্ত দেবতাদের চিত্র রহিয়াছে। দেবতাদের এটি রাজকীয় ডিনার, খুব জাঁকপূর্ণ। সিলিং ও প্রাচীরের সংযোগস্থলের খিলানে মাছ ও মুরগীর চিত্র। ফ্লোরেন্সের শিল্পী জুকারেলির নামে যে কক্ষটি, তাহাতে এই শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য দুই-খানি ছবি—"দি মীটিং অভ আইজাক অ্যাণ্ড রেবেকা" ও "দি ফাইনডিং অভ মোজেস"। আর এক বিখ্যাত শিল্পীর নামের কক্ষে ২২ খানি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। এটি শেষ কক্ষ—শিল্পী ভ্যানডাইক।

ক্রমশঃ

পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত

"ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে প্রকাশ :

স্বাধীনতা লাভের সময় যে ত্রিপুরা রাজ্য ছিল একটি ছোট সামন্ত রাজ্য, কালক্রমে প্রগতির পথে পদযাত্রা করিয়া বিবর্তনের মাধ্যমে হইল "গ" শ্রেণীর রাজ্য ; পরে টেরীটরী, আজ উন্নীত হইয়াছে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে। পূর্ণ ক্ষমতাবান্ তার বিধান সভা ও মন্ত্রিপরিষদ। সেই মন্ত্রিপরিষদের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন ত্রিপুরা রাজ্যের খ্যাতিমান্ অকৃতদার রাজনৈতিক ধুরন্ধর শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত। বর্ত্তমান বয়স তাঁহার ৫০ বৎসর। রাজনৈতিক জীবনের সুরু হয় ছাত্র জীবনে ১৯৩৮ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে। প্রথমে ছিলেন বিপ্লবী দলে, পরে গান্ধীবাদী অহিংস কংগ্রেসী। আজ নব কংগ্রেসী তথা ইন্দিরা পন্থী কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া ত্রিপুরার—পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত।

গত ২০শে মার্চ অপরাহ্ণ বেলা সাড়ে চার ঘটিকায় ত্রিপুরার সুরম্য রাজভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীসেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ্য করান রাজ্যপাল শ্রীবি কে নেহেরু। ত্রিপুরার সরকারী ভাষা যেহেতু বাংলা, উহা সরকারীভাবে চালু না হইলেও শ্রীসেনগুপ্ত এই দিন শপথবাক্য বাংলাতেই পাঠ করেন। এই দিন আর একজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন, তিনি হইলেন আদিবাসী সদস্য শ্রীহরিচরণ চৌধুরী। বিধান সভার সদস্য হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রাক্তন বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক।

ইতিহাসের বিকৃতি

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কোন ইতিহাসবিদের সাম্প্রতিক অপপ্রচার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :

রামমোহন জন্মদ্বিশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে রামমোহনের সর্বতোমুখী মানবমুক্তির আদর্শের অনুরাগীগণকে যে একটি নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। রামমোহন তাঁহার দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন বলিষ্ঠ আদর্শবাদ দ্বারা সমাজের সকল প্রকার জড়তা ও কায়েমী স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রখর মনীষা ও বিশাল কর্মকাণ্ডকে সমগ্রভাবে দেখিবার প্রচেষ্টা না করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে—তাঁহাকে কখনও সমাজ-সংস্কারক, কখনও উদার ধর্মপ্রবক্তা, কখনও প্রতিভাশালী সুপণ্ডিত গবেষক, আবার কখনও বা কূটবুদ্ধি রাজনীতি-বিদ্ মনে হওয়া বিচিত্র নহে। ইহাকে দৃষ্টিবিভ্রম না বলিয়া দৃষ্টির সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা বলা যাইতে পারে। বহু-কোণ-বিশিষ্ট হীরকখণ্ডের ন্যায় তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী ছিল এবং ইহার সকল দিক হইতেই বিভিন্ন সময়ে আলোক বিচ্ছুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই রশ্মিগুলি একটি মূল জ্যোতিঃকেন্দ্র হইতে জাত। তাঁহার সকল চিন্তা ও কর্মের মূলে একটিই প্রেরণা ছিল, —তাহা তাঁহার অবিচল ব্রহ্মানুভূতি। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাক্তন ব্রহ্মবিদ্‌গণের তুলনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাকে লৌকিক জগতের প্রতি বিমুখ করে নাই। সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামে ইহা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার চিন্তা নিছক বাহ্য সমাজসংস্কারকে অতিক্রম করিয়া নানা সমস্যার মূলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল এবং তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন : "The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and oppression throughout the world; between justice and injustice; between right and wrong." এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীই রামমোহনের প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তাঁহার সমসাময়িকগণের সহিত তাঁহার

প্রভেদ। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির তুলনা তাঁহার সহিত হইতেই পারে না। তাঁহার অনুরাগীমণ্ডলীতেও অথবা ডিরোজিওর শিষ্যদলে প্রতিভায় ও কল্যাণবুদ্ধিতে তাঁহার সমকক্ষ দূরে থাকুক তাঁহার নিকটবর্ত্তীও কেহ ছিলেন না। এমন কি তদানীন্তন পাশ্চাত্য জগতও তাঁহার প্রতিভায় বিস্মিত হইয়াছিল—এবং ইংলণ্ডে তাঁহার উপস্থিতিকে সমসাময়িক ইংরেজী বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ সোক্রাটিস প্লেটো বা আরিসটটলের উপস্থিতির ন্যায় অতুলনীয় ঘটনা মনে করিয়াছিলেন।

যাঁহার মূল আদর্শ ব্রহ্মানুভূতির ভিত্তিতে সর্বজীবে ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব-পূর্বক মানব-কল্যাণের নিমিত্ত অবিরত সংগ্রাম—প্রতিক্রিয়া ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিগণ যে তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় অজ্ঞতা ও ভণ্ডামী, অর্থনৈতিক শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ প্রাচীনপন্থী সমাজের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিবেকানন্দের ভাষায় যাঁহারা 'অতীতের কঙ্কালনিচয়' তাঁহারা যে হিংস্র আক্রোশে প্রত্যাঘাত হানিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? রামমোহনের জীবদ্দশায় একাধিক বার তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা হইয়াছিল; অজ্ঞাত আততায়ীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত; তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিবার প্রয়াসও কম হয় নাই। আজ কালস্রোতে রামমোহনের সেই প্রতিপক্ষগণ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সময়ের সহিত ক্রমশঃ দীপ্ততর রূপে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তথাপি রক্ষণশীলগণের পক্ষ হইতে আক্রমণের বিরাম নাই। আমরা জানি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকী মহাসমারোহে সমগ্র বিশ্বে অনুষ্ঠিত হয়—সেই সময়ের কিছু বিরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গিয়াছিল। তখন রামমোহনকে প্রত্যক্ষ আঘাত করিবার উপায় ছিল না—তাই আরম্ভ হইয়াছিল-ঐতিহাসিক গবেষণার নামে তথ্যবিকৃতি এবং মিথ্যা ও অর্ধসত্যের প্রচার। কিন্তু মিথ্যা ও অর্দ্ধ সত্যের অসুবিধা এই তাহা সাময়িকভাবে চটক সৃষ্টি করিলেও স্থায়ী হয় না। ঐ সমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইল নূতন, তথ্য আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল—এবং ক্রমশঃ উহার প্রভাব প্রশমিত হইল।

বর্তমান দ্বিশতবার্ষিকী বৎসরেও ইহার ব্যতিক্রম প্রত্যাশা করিলে ভুল হইবে। ঐতিহাসিক গবেষণার নামে আবার রামমোহন-দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টির অপপ্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে। নানা তর্কবিতর্কের পর উভয় পক্ষের মতামত শুনিয়া ভারত-সরকার যখন অবশেষে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত একবৎসর কালকে রামমোহন জন্মদ্বিশতবার্ষিকী-বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন—তখনই আরম্ভ হইল আবার ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দকে রামমোহনের জন্মবৎসর বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার নূতন প্রচেষ্টা ইহার পূর্বেই—একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক রামমোহনের প্রতিভা ও কীর্তির বিশ্লেষণ কার্যে অবতীর্ণ হইলেন। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ইনি এসিয়াটিক সোসাইটি ভবনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন—তাহার মধ্যে রামমোহন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহার শোচনীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মূলে পৌঁছিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি রামমোহনের কীর্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন—এবং দেখা যাইতেছে—সেখানেও সকল তথ্য তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। প্রকৃত কথা, তিনি এখানে ঐতিহাসিক রূপে আলোচনা করেন নাই—যাঁহাকে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম বলিয়া মনে করেন তাহারই পক্ষাবলম্বন করিয়া সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। রামমোহনের তীব্র আঘাতে তাঁহার সমকালীন বিরোধীপক্ষের মর্মচ্ছেদ হইয়াছিল। দুই শতাব্দী পার হইয়া তাহাদের আর্তনাদের ক্ষীণ রেশ যদি আজিও ভাসিয়া আসে তাহা হইলে বর্তমানে রামমোহনের প্রতিভার বিপ্লবী চরিত্রকে উপলব্ধি করিবার সুবিধা বই অসুবিধা হইবে না।

সাময়িকী

ওয়াঞ্চু অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীওয়াঞ্চুর অধিনায়কত্বে যে অনুসন্ধান কমিটি বসিয়াছিল তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই কমিটি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তাঁহারা গভর্ণমেন্টকে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন তাহা সকল ভারতবাসীরই প্রণিধানের বিষয়। তাঁহারা যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন সে সকল কথা পূর্ব্ব হইতেই ভারতের বহুলোকেই বলিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ভারত সরকার জন-সাধারণের কথায় কখনও টলেন না ও এই ক্ষেত্রেও তাঁহারা কাহারও কোনও কথায় কখনও কর্ণপাত করেন নাই। তজ্জন্য দেশের বহু ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু সে কারণে কোনও আমলা অথবা মন্ত্রীর কোনও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। কমিটি বলিয়াছেন যে, ভারতের মানুষ যে রাজকর দিতে চাহেন না তাহার কারণ ভারতের রাজকরের হার অন্যায়ভাবে অতি বর্দ্ধিত। যে ক্ষেত্রে অপর দেশে কেহ কোন রাজকর দেয় না, ভারতে সেইক্ষেত্রে উচ্চ হারে ট্যাক্স্ আদায় করা হয়। যাহাদের আয় অধিক তাহাদিগের আয়ের পরিমাণ একটা সীমার উর্দ্ধে'র যে আয় তাহা প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই আয়কর হিসাবে সরকারের কবলিত হয়। (আমেরিকায় বাৎসরিক ২২৫০০ টাকা আয় না হইলে কাহাকেও আয়কর দিতে হয় না। য়ুরোপের বহু ধনবান্ দেশে কোনও ব্যক্তির কোনও আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগের অধিক কখনও রাজকর হিসাবে আদায় করা হয় না।) ভারতবর্ষে সকলপ্রকার রাজস্ব একত্র করিয়া দেখিলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ৩ লক্ষ টাকা তাহাকে আড়াই লক্ষ টাকা ট্যাক্স্ দিতে হয়। ঐ আয় কোন ইংরেজ বা আমেরিকানের হইলে তাহাকে হয়ত এক লক্ষ টাকার কিছু অধিক ট্যাক্স্ দিতে হইত। যাহাদের আরও অধিক আয় ভারতবর্ষে তাহাদিগকে তিন লক্ষের অধিক আয়ের শতকরা প্রায় একশত টাকাই কর হিসাবে দিতে হয়। যদি তিন লক্ষের অধিক আয় করা বে-আইনী হইত তাহা হইলে কেহ কিছু বলিত না; কিন্তু আয় করা আইনে সমর্থিত অথচ আয়ের উচ্চতম অংশ প্রায় সবটাই রাজকর হিসাবে দিয়া দিতে হইবে এ-নিয়ম আইনত অর্জ্জিত রোজগারের টাকা কাড়িয়া লওয়ার মতই। ওয়াঞ্চু কমিটি বলিয়াছেন যে, আয়করের হার পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ করা হউক যাহাতে ৭০০০০ টাকা বার্ষিক আয় হইলে তাহার আয়কর হইবে ২৮২৫০ টাকা এবং তাহার অধিক যাহা আয় হইবে তাহার উপর শতকরা ৮৫ টাকা আয়কর ধার্য্য হইবে। এ নিয়মে যাহার ৩০০০০০ টাকা আয় হইবে তাহাকে ২৮২৫০+১৪৯৫০০ =১৭৫৭৫০ আয়কর দিতে হইবেই। এরূপ নিয়ম হইলে আপাতদৃষ্টিতে রাজস্ব কমিয়া যাইবে মনে হইলেও ট্যাক্স্ ফাঁকি দিবার চেষ্টা হ্রাস পাওয়ার ফলে মোট আদায় বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে করা হয়। বাৎসরিক ৭০০০০ টাকা আয় হইলে বর্ত্তমানে তাহার উপর ৩০০০০ টাকা আয়কর দিতে হয়। ওয়াঞ্চু কমিটির দ্বারা স্থিরীকৃত হারে তাহা হইবে ২৮২৫০ টাকা। কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মতে ট্যাক্স্ ফাঁকির পরিমাণ বাৎসরিক ৪৫০ কোটি টাকার অধিক। এই টাকার যদি অর্দ্ধেকও নূতন নিয়ম হইলে আদায় হয় তাহা হইলে মোটের উপর রাজকর বৃদ্ধিই হইবে।

কালোবাজারের কারবার সম্বন্ধে কমিটি বলিয়াছেন যে ১৯৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে ৭০০০ কোটি কালোটাকার কারবার হইয়াছিল। এই সকল কারবার যে ভাবে হয়

তাহার সহিত উৎকোচ দান, বেয়াইনী ভাবে স্বর্ণ ও বিদেশী দ্রব্যাদি দেশে আনিবার ব্যবস্থা ইত্যাদির ঘনিষ্ট সংযোগ আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কালোবাজার যাহাতে আরও প্রসারিত না হয় সেই চেষ্টা অত্যাবশ্যক বলা যাইতে পারে। রাজকর ফাঁকি দিবার সহিত কালো বাজারের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং রাজকর ফাঁকি দিবার আগ্রহের মূলে যদি আঘাত করা যায় তাহা হইলে তাহা দ্বারা কালো বাজারও আহত হইবে। ভারতের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বিশেষ করিয়া বেকারী ও অল্প উপার্জ্জন দোষদুষ্ট হওয়াতে যে অল্প সংখ্যক ভারতীয় অধিক উপার্জ্জন করেন; আমলাদিগের রাজস্ব আহরণ চেষ্টা শুধু তাহাদিগের উপরই অধিক করিয়া নিযুক্ত হয়। সর্ব্বসাধারণের আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলে ভারতীয় অর্থনীতি ব্যাধিমুক্ত ভাবে অগ্রগমণে সক্ষম হইতে পারে।

উত্তর ভিয়েৎনামের দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অভিযান

উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যবাহিনী সম্প্রতি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উপর একটা প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই আক্রমণের ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অনেক সামরিক কেন্দ্র উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই আক্রমণ কি কারণে অকস্মাৎ আরম্ভ হইল তাহার গূঢ় অর্থ সহজবোধ্য নহে; তবে ইহার সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রপতি নিক্‌সনের চীন গমন ও চীনের রাষ্ট্রনেতাদিগের সহিত আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া নীতির প্রকৃষ্ট আলোচনার সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। চীন সম্ভবতঃ যে নীতি অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, রুশিয়া তাহার বিপরীত কোন পথে চলিতে চায় এবং চীনকে নিজ পথে না চলিতে দিবার জন্য রুশিয়া হয়ত হানয়কে প্রভাবান্বিত করিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতি সৃজন করিয়াছে। ইহাও হইতে পারে যে, চীন আমেরিকাকে যাহা বুঝিতে দিয়াছে গোপনে তাহার বিপরীত পন্থা অনুসরণ করিয়া আমেরিকাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ভিতরের কথা জানা সম্ভব নহে এবং যে ক্ষেত্রে আমেরিকা, চীন ও রুশিয়া আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্রীড়াঙ্গনে পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিতে নিরত সেখানে সেই ক্রীড়ার কোন কায়দা-কৌশলই অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনশীল ফন্দিবাজির আসরে খেলোয়াড়দিগের আত্মপ্রতিষ্ঠাই একমাত্র স্থির নিশ্চয় সংকল্পের কথা। অতঃপর আমেরিকান সৈন্যবাহিনীও নূতন করিয়া ব্যাপকভাবে যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হইবে। সে যুদ্ধ কিভাবে চালিত হইবে অথবা তাহার ফলে উত্তর ভিয়েৎনামের কতটা ক্ষতি হইবে তাহা এখনও অনুমানের বিষয়। উত্তর ভিয়েৎনাম তাহার অভিযানে বহু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামেরও বহু সৈন্য আছে ও সে সকল সৈন্য এখনও যুদ্ধে নামে নাই। কাহারও কাহারও মতে উত্তর ভিয়েৎনাম শীঘ্রই সাইগন দখল করিয়া লইবে। অপরদিকে একথাও সত্য যে আমেরিকা তাহার বিমানশক্তি ব্যবহারে হানয়কে বিধ্বস্ত করিবে এবং তাহাতে উত্তর ভিয়েৎনামের যুদ্ধ পরিচালনা কঠিন হইবে।
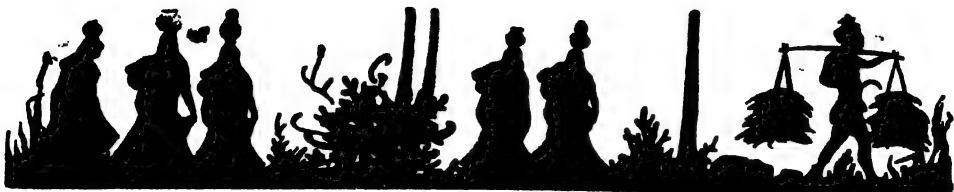
দেশ-বিদেশের কথা

সমুদ্র পরিষ্কার রাখা

সম্প্রতি নরওয়েতে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে সমুদ্রের জল পরিষ্কার রাখার জন্য উত্তর সাগরের উপকূলস্থ দেশগুলি একটি নিয়ন্ত্রণ নীতি স্বাক্ষর করিয়া তাহা সকল জাহাজ ও বিমানের উপর জারি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাহাজ ও বিমান হইতে যে সকল বস্তু সমুদ্রের জলে ফেলা হয় তাহার মধ্যে অনেক কিছুই জল বিষাক্ত করিয়া নানাপথে মনুষ্যজাতির খাদ্যবস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া মানবজীবন বিপন্ন করিবার কারণ হয়। বীজাণু ও কীট-কীটাণু নাশক রাসায়নিক বস্তু, পারদ, ক্যাডমিয়াম ও নানা প্রকারের প্লাষ্টিক দ্রব্য, সমুদ্রের জলে যাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইতে পারে, মানব জাতির ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য সেই ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। স্থলক্ষেত্রে সকলেই আবর্জ্জনা ফেলা বন্ধ করিবার চেষ্টা করে বলিয়া জনসাধারণ জলে আবর্জ্জনা ফেলিবার অভ্যাস করিয়াছে। এখন নূতন নীতি অনুসরণে মানুষ প্রথমে সকল অপকারী বস্তু ভস্মীভূত করিয়া তৎপরে সেই ভস্ম স্থলে বা জলে আবর্জ্জনা হিসাবে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবে। অনেক প্রকারের আবর্জ্জনা আছে যাহা ক্ষতিকর নহে। সেইসকল বস্তু ফেলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে কোন নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইবে না। বহু বিষাক্ত বস্তু আছে যাহা কিছুকাল জলে বা স্থলে পড়িয়া থাকিলে নিজ বিষাক্তভাব হারাইয়া অন্য রূপ ধারণ করে। এই সকল বস্তুও বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। বর্ত্তমানে বহু বিজ্ঞানাগারে আবর্জ্জনা কি ভাবে ক্ষতিকর না হইয়া দূর করিয়া দেওয়া যায় তাহা লইয়া গবেষণা হইতেছে। এই গবেষণার ফলে অদূর ভবিষ্যতে মানবসমাজে আবর্জ্জনা দূর করিবার সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া জ্ঞানীজনে বিশ্বাস করেন।

রুশিয়া ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ লাগিলে কি হইবে

একথা রুশিয়ার ও চীনের সর্ব্বত্র পূর্ণ প্রচলিত যে ঐ দুই দেশের ভিতর একটা যুদ্ধ লাগিবেই, এবং শীঘ্রই লাগিবে। এই যুদ্ধ লাগিলে রুশিয়ার পক্ষে তাহার পূর্ব্ব এশিয়ার এলাকায় স্থিত সহর বন্দর রেলকেন্দ্র প্রভৃতি রক্ষা করা বিশেষ কঠিন হইবে, কেননা রুশিয়ার সামরিক শক্তি ও তাহার অস্ত্রশস্ত্রাদি উৎপাদন কেন্দ্র য়ুরোপেই প্রতিষ্ঠিত এবং য়ুরোপ হইতে সৈন্যসামন্ত ও রসদ মাল-মশলা সাইবেরিয়ার অপর প্রান্তে লইয়া যাইতে হইলে তাহার জন্য হয় সমুদ্রপথে বহু সহস্র মাইল যাইতে হয়, নয়ত সাইবেরিয়ার রেল ধরিয়া কয়েক সহস্র মাইল যাইতে হয়। সুয়েজ খাল যদি খোলা থাকে তাহা হইলে সমুদ্রপথ কিছুটা কমিয়া যাইতে পারে, নতুবা আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া যাইতে আরও কয়েক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। এই যুদ্ধ সম্ভাবনা হইবার পূর্ব্বে সাইবেরিয়ার রেলপথ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি পাঠাইবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়া ধার্য্য হইত। কিন্তু ঐ রেলপথ বহুস্থলে চীন দেশের এলাকার গা ঘেঁষিয়া স্থাপিত আছে বলিয়া বর্ত্তমানে সমরকৌশলীগণ উহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন। কোন কোন স্থলে চীনাদিগের তোপের গোলা সহজেই সাইবেরিয়ার রেলপথ ধ্বংস করিতে পারে এবং প্রায়

সর্ব্বত্রই ঐ রেলপথ রকেট দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাশিয়ান দিগের চেষ্টা আরও ৫০০ শত মাইল উত্তরে সরাইয়া ঐ রেলপথ বসাইয়া তাহাকে চীন আক্রমণের সম্ভাবনা মুক্ত করায় ব্যবস্থা করিবার এবং তাহারা ঐরূপ আয়োজন চালাইতেছে বলিয়া শুনা যায়। বল্টিক ও কৃষ্ণসাগর হইতে সুয়েজ খাল দিয়া ভারত মহাসাগরে আসিতে পারিলে রুশিয়ার খুবই সুবিধা হয় এবং রুশিয়া সেই চেষ্টা সফল করিবার জন্য আরবদিগের সহিত ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদাই তৎপরতা দেখাইয়া থাকে। ভারত মহাসাগরে যাহাতে জাহাজ লইয়া যাইতে অসুবিধা না হয় সেইজন্যও রুশিয়া ভারতের সহিত ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক বলিয়া মনে হয়। সে ব্যবস্থা ঠিক কি ভাবে করা হইবে তাহা প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করা যায় না। লেনিনগ্রাড, মারমান্স্ক ও ওডেশা হইতে মাল ও মানুষ জাহাজে পাঠাইতে হইলে পথ খোলা থাকা আবশ্যক এবং পথে স্থানে স্থানে জাহাজের আশ্রয়ক্ষেত্র ও তেল কয়লা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থারও প্রয়োজন। রুশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপন রীতিনীতি এই প্রয়োজন বুঝিয়া চালিত হয় সন্দেহ নাই। চীনের সহিত সংঘর্ষ হইতেছেও ঐ একই কারণে, যদিও এক্ষেত্রে কথাটা স্থলপথ খোলা ও নিরাপদ রাখার। সাইবেরিয়ার রেলপথ রক্ষা করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। তবে চীনা কমাণ্ডোগণ যত্রতত্র ঐ রেলপথ নষ্ট করিবার জন্য লাগিয়া পড়িলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার কার্য্য কষ্টকর কঠিন ও বহুব্যয়সাধ্য হইবে মনে হয়। সুতরাং যুদ্ধ লাগাইয়া চীনাদিগকে ঐ রেলপথ হইতে বহুদূরে সরাইয়া দেওয়ার কথাটাও কার্য্যসিদ্ধির সহজ পন্থা বলিয়া রুশিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা যে চিন্তা করিতেছেন না তাহা নহে। রুশ-চীন যুদ্ধের সম্ভাবনা এই সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সোভিয়েট কনসাল জেনেরাল কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংবাদে আচার্য্য ফিওডর ভি কনস্টান্টিনভ লিখিত একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারাংশ প্রচার করা হইয়াছে। উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

জাতিসংঘ ১৯৭১ সালকে জাতিবৈরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বৎসর বলে ঘোষণা করেছিলেন। সমস্ত মুক্তিকামী জাতির কাছে বর্ণবিদ্বেষ একটা বিরাট সমস্যা। ১৯৬০ সালের ২১শে মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকায় শার্পেভিলেতে জাতিবৈরীরা আফ্রিকানদের এক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। নিরস্ত্র বান্টু শ্রমিকদের মিছিলে বর্ণবৈরীদের এই গুলিবর্ষণের ফলে ৬৯ জন নিহত ও ১৮০ জন আহত হয়। আফ্রিকানদের মালিকের ক্রীতদাসে পরিণত করে যে বৈষম্যমূলক ছাড়পত্র-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ-মিছিল বেরিয়েছিল। এই ঘটনার ফলেই জাতিসংঘে এই সমস্যাটি উত্থাপিত হয়।

কিন্তু শার্পেভিলের হত্যাকাণ্ড মানুষের বিরুদ্ধে জাতিবৈরীদের অপরাধের রক্তাক্ত ইতিহাসে একটি ঘটনামাত্র এবং কোনক্রমেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা নয়। বর্ণবিদ্বেষ, বিশেষ বর্ণ বা জাতির মানুষদের একঘরে করে রাখা এবং বৈষম্য—এগুলি হল পুঁজিবাদের কয়েকটি ভয়াবহ পাপ। এই সব পাপ এখনও আমাদের পৃথিবীতে বর্তমান। কোন কোন দেশে এগুলি আবার প্রধান মতাদর্শ ও কর্মনীতিরূপে পর্যন্ত বর্তমান।

সকলেরই জানা আছে যে, জাতিবৈরের তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন যে, মানবজাতি "শ্রেষ্ঠ" ও "হীন" এই দুইভাগে বিভক্ত। "শ্রেষ্ঠ" জাতিগুলি সংস্কৃতি ও সভ্যতার তুঙ্গে উঠতে সক্ষম এবং "হীন" জাতিগুলি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে অক্ষম। জাতিবৈর ঔপনিবেশিক বিজয় অভিযানের তত্ত্বগত ভিত্তি যুগিয়েছে এবং যোগাচ্ছে। জাতিবৈরের কৃষ্ণ পতাকার তলে জাতিসমূহের বিরুদ্ধে, মানবজাতির বিরুদ্ধে অতি ভয়াবহ অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র জাতির নির্মূলীকরণ, দাস ব্যবসায় এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় দেশীয় অধিবাসীদের উপর নির্মম

ঔপনিবেশিক শোষণ—এ-সব এবং অন্যান্য বহু নিষ্ঠুর অত্যাচারকে (যা বুর্জোয়াদের বিবেক অস্বীকার করতে পারে না) নানা রকম জাতিদ্বেষী তত্ত্বের দ্বারা শুদ্ধ করা হয়েছে, সমর্থন করা হয়েছে।

অধুনাকালের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, আমাদের কালের প্রতিক্রিয়াশীল ও যুদ্ধবাদী শক্তিগুলির হাতিয়াররূপেই জাতিদ্বেষ বর্তমান রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল তাত্ত্বিকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "ঐশ্বর্যশালী সমাজ" বলে বর্ণনা করেন। সে দেশে যে "স্বাধীনতা ও ন্যায়ের" আধিপত্য বর্তমান তার প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ।

দাসত্ব লোপের পর একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এর ফলে আড়াই কোটি মার্কিন নিগ্রো না পেয়েছেন সমানাধিকার, না পেয়েছেন সত্যিকারের স্বাধীনতা। আজ পর্যন্ত জাতিদ্বেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র সামাজিক কাঠামোর অচ্ছেদ্য অঙ্গ। গাত্রচর্মের বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মার্কিন নাগরিকের জন্য মার্কিন সংবিধানে বুর্জোয়া স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়া সত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রতি বৎসর সমগ্র জগৎ নিগ্রো জনগণের বিরুদ্ধে পুলিশ সন্ত্রাসের নতুন নতুন নিদর্শন, নিগ্রো রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা, নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রত্যক্ষ করছে।

বর্তমানে এক সাজানো অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যালিফরনিয়ার একটি জাতিদ্বেষী আদালত নিগ্রো স্বাধীনতার সাহসী যোদ্ধা, নির্ভীক দেশপ্রেমিক ও কমিউনিষ্ট এনজেলা ডেভিসকে শাস্তি দেওয়ার মতলব আঁটছে। অনেক দিন থেকেই এই রকম সব ঘটনা "মার্কিন জীবনযাত্রা"র একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাত্যাভিমান শুধু স্বরাষ্ট্র নীতি নির্ধারকদের নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকদেরও প্রধান মতাদর্শগত মতবাদ। এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করছে, অন্যান্য জাতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, অন্যান্য জাতির জন্মগত অধিকার ও সার্বভৌমত্ব খুসীমত লঙ্ঘন করছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও পৃথিবীর সমগ্র এক একটি অঞ্চলের উপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বলপ্রয়োগ করছে, ঘুষ দিচ্ছে ও অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসে তার নির্লজ্জ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

হিটলারী নাৎসীদের পদাঙ্কানুসরণ করে মার্কিন ফৌজ ভিয়েতনামের সংমাই গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ বহু অ-সামরিক মানুষকে হত্যা করেছে। বিমান, ট্যাঙ্ক, নাপাম, বিষবাষ্প-যুদ্ধের আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সব কিছুই ইন্দোচীনের ছোট ছোট জাতিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপকারী ও তার দালালরা যা করছে মানবতাবাদী কোন মানুষের বিবেক কখনও তা' মেনে নিতে পারবে না।

আগের মতই দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে জাতিদ্বেষী সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে সবচেয়ে বল্গাহীন আকারে। সেখানে জাতি বৈষম্যকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মূল অধিবাসীদের ঔপনিবেশিক বন্ধনে বেঁধে রাখার জন্য এবং ৩৭ লক্ষ সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ যাতে ১ কোটি ৬০ লক্ষ অ-শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে নির্মমভাবে শোষণ করতে পারে তার উপযোগী অবস্থা বজায় রাখার জন্য জাতিবিদ্বেষ হল দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকশ্রেণীর একটি হাতিয়ার।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিদ্বেষীদের অনুসৃত কর্মনীতির ভিত্তি হল জাতি ও বর্ণ স্বাতন্ত্রের মতবাদ। এই মতবাদে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারি বিভিন্ন জাতি ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র জীবন যাপনের বিধান দেওয়া হয়েছে। ও মতবাদের সাহায্যে জাতিদ্বেষীরা নিয়মিতভাবে দেশের ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের মগজ ধোলাই করছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবেষীদের অনুসরণ করছে দক্ষিণ রোডেশিয়ায় তাদের "সমমনোভাবাপন্ন" ছোট অংশীদারেরা। কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবেশী এই দেশের ঘটনাবলী বিশ্বজনমতের উদ্বেগ ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ রোডেশিয়ার ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকারের একটি লজ্জাজনক কারবার হয়েছে। আয়ান স্মিথের জাতিবেষী সরকারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই কারবার করা হয়েছে।

ফ্যাসিস্ট পর্তুগালের আংগোলা ও অন্যান্য উপনিবেশে জাতিবিদ্বেষ বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। পর্তুগাল তার এই সব উপনিবেশকে তার "সাগর পারের ভূখণ্ড" বলে ঘোষণা করেছে।

পৃথিবী ভারতীয় উপমহাদেশের শোচনীয় ঘটনাবলী এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে। এই দুঃখজনক ঘটনাবলীর মূল কারণগুলি কি? সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের মধ্যেই মূল কারণগুলি নিহিত। "বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা"র জঘন্য কর্মনীতি অনুসরণ করে ব্রিটেন ধর্মীয় সংস্কারকে কাজে লাগায় এবং হিন্দু ও মুসলমানদের বিরোধ বাধানোর চেষ্টা করে।

সামরিক সংঘর্ষের আশু কারণ হল পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কর্মনীতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী অধিবাসীদের উপর নির্মম হামলা। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক কর্তৃপক্ষের জাত্যাভিমানী হিস্টিরিয়ার ফলস্বরূপ প্রায় দশলক্ষ বাঙ্গালী নিহত হয় এবং এককোটি মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আজকের দিনের অবস্থায় জাতিবিদ্বেষ ও জাত্যভিমান শুধু জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে না, অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা ও জঙ্গীবাদের প্রসারের মতাদর্শগত ভিত্তিও যোগায় এবং পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি করে।

জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য হল আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসের মতাদর্শগত ভিত্তি। বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের একটি ধাপ হিসাবে পরমাণু-অস্ত্র ও অন্যান্য বিধ্বংসী অস্ত্র নিষিদ্ধ ও নির্মূল করার বাস্তব অবস্থা সুনিশ্চয় করার শান্তিনীতির আত্মিক ভিত্তিও হল এই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য।

শোক-সংবাদ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ বৃহস্পতিবার ভোররাত্রে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গণিতজ্ঞ মোহিত মোহন দাশগুপ্ত সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। তিনি সাহিত্যজগতে "জুলফিকার" ছদ্মনামেই সুপরিচিত ছিলেন। গত কয়েক মাস তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীদাশগুপ্ত বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। বাংলাদেশের যশোহর জেলার নড়াইলে তাঁহার জন্ম। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কলিকাতায় শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ও দেরাদুনস্থ 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'য় যোগ দেন। কয়েক বৎসর পর তিনি FORWARD ইংরাজী দৈনিকের সহসম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অবশেষে সরকারী কাজে যোগ দেন। 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'য় অবস্থান কালীন ভূ-গণিতের উপর কিছু মূল্যবান্ মৌলিক গবেষণা করেন।

কলেজ জীবনেই তিনি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তদানীন্তন 'প্রবাসী গল্প প্রতিযোগিতায়' পুরস্কার লাভ করেন। তখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবাসীর সহিত আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং 'Modern Review' ও প্রবাসীতে তাঁহার বহু রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হইত। গল্প, রম্যরচনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন ইংরাজী ও বাংলা পত্রিকায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদির নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি রচনা ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় অনূদিত হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সরল, নিরহংকারী ও সদালাপী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৪ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিনপুত্র, তিনকন্যা ও গুণমুগ্ধ বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

নেতৃত্ববাদ

বিধুভূষণ জানা

বর্তমান কালে যে শ্রেণীর নেতৃত্ববাদ দেখা দিয়াছে, ইহাতে সুশাসন প্রায় অবলুপ্ত হইয়াছে, সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এই চারিটি বহু পরীক্ষিত ও চিরন্তনী মূল নীতি হইতে বর্তমান কালের রাজনীতি আজ নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। এখন রাজধর্ম ও রাজনীতির নামে এবং শাসনতন্ত্রের নামে কেবলমাত্র একটা ঠাট ও একটা পতাকা থাকিলেই চলে। আধুনিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ্য ও অযোগ্য, দুষ্ট-শিষ্ট নির্বিশেষে "স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার এবং দল গঠন" এই দুইটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দল সমর্থন ও ভোটের প্রতিযোগিতায় (গণতন্ত্র) জয়ী হওয়ার জন্য সরকারের অর্থনৈতিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ না রাখিয়া অসংখ্য সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু কর্মচারীদের কাহার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহা সম্ভবত তাঁহাদের অজ্ঞাত। কে কি কাজ করিতেছে, অথবা কিছুই না করিয়া সর্বসাধারণের অর্থ শোষণ করিতেছে; কিংবা তাঁহাদের কাজের উপযুক্ত মান কিসে ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে কি না তাহার কোন উপযুক্ত তদারক নাই। কিন্তু ইহাদের পরিপোষণের জন্য সাধারণ ব্যক্তিও নানাভাবে ট্যাক্স দিয়া দারিদ্র্যপীড়িত হইতেছে, স্বভাবতই ইহারা ক্ষমতাবান দলের নেতাদের পোষ্য, সমর্থক ও অনুগত এবং ইহাদের পোষ্য ও অনুগতজনের সংখ্যাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই সকল নেতার নিকট অর্থগ্রহণ করিয়া থাকে—এমন কি সম্পূর্ণ বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত কোন কোন ক্ষুদ্র ও বড় দলের পরিচালকেরাও এই প্রকারে অর্থ পাইয়া থাকে। শিক্ষা ও শিল্প সম্প্রসারণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য যে সহস্র সহস্র নবীন শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের যোগ্যতার বিচার প্রধানতঃ দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে এবং এই সকল যোগ্য অযোগ্য শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা যথার্থভাবে কর্তব্য কিছু করেন কিনা, তাহার তদারকের কোন ব্যবস্থা নাই; থাকিলেও তাহা দলের সমর্থনে চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক প্রতিপালনের ব্যয় নির্বাহ করিতেই সরকারের নিজস্ব আয়ে আর সঙ্কুলান হইতেছে না। গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি অন্যের সাহায্য অথবা ঋণের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে।

একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে কোন দ্বিধা নাই যে, বিগত ২৫ বৎসরে সরকার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা নিছক ব্যক্তিগত ও দলগত মনস্তুষ্টির পর্য্যায়ে ব্যয় বরাদ্দ ও বরদাস্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে কাহারও হাতে পর্বত প্রমাণ অর্থ জমা হইয়াছে, কেহ কেহ ভোগ বিলাসে ও পানাহারে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের ৪০ কোটি সাধারণ মানুষের গড় দৈনিক আয় মাত্র ৩৫ নয়া পয়সায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে পুষ্টির অভাবে মৃত্যুর পথের পথিক। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নিজস্ব সম্পত্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাহারা কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত। ইহারা যেহেতু স্বাবলম্বী সেজন্য ইহারা বর্তমানকালের ভারতীয় নেতাদের চক্ষুশূল এবং অবাঞ্ছিত। তাঁহারা দারিদ্র্য সমভাবে বন্টন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেবলমাত্র তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহযোগী ব্যতীত আর সকলকে দারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে এজন্য সংবিধানের যে সকল ধারা ও উপধারা পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক তাহাও করিতে ইঁহারা নির্লজ্জভাবে প্রস্তুত এবং তাহার প্রণালীও স্থির হইয়া প্রয়োগ করা হইতেছে।

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্যক্তিগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নিঃসঙ্কোচে সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ব্যয় করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু যদি সংযম ও সততার সহিত এই সমুদয় অর্থ যথাযথভাবে দেশের উৎপাদন ও সাধারণের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামে

গ্রামে কর্ম্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কুটির শিল্পে ও কৃষিকার্যে বিনিয়োগ করা হইত, অথবা আইন অনুযায়ী ভাবে যথা সময়ে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়া প্রাপকদের দ্বারা এই সকল কার্য্য করান হইত, তাহা হইলে যথার্থই দারিদ্রের অবসান হইত এবং এই নেতৃত্ববাদ শ্রদ্ধার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। অধিকন্তু ভারতের এই প্রকার অপরিসীম ঋণ বৃদ্ধি হইত না এবং তাহার সমাধানের জন্য এক শ্রেণীর সকল সম্পদ ছিনতাই করিয়া আর এক শ্রেণীকে দেওয়ার আবশ্যক হইত না। কিন্তু দারিদ্র মোচনের এই নিকৃষ্টতম পদ্ধতিতে "গরিবী" চিরস্থায়ী হইবে মাত্র। ইহা যথার্থ অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান বলিয়া স্বীকৃত নয়। ইহা নিছক দল গঠন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বস্তুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিকল্পনা প্রণয়নে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব, মার্জ্জিত চরিত্রের ও যথার্থ দেশপ্রেমের অভাব হইতেই এইসকল অনর্থের উৎপত্তি ঘটিতেছে। সুতরাং ইহাকে আদৌ সুশাসন বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

বর্ত্তমান যুগের এই শ্রেণীর "রাজনীতি" রাজধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়াছে। ইহার ভয়াবহ পরিণতিও দেখা দিয়াছে। ব্যক্তির এই নেতৃত্বের বনিয়াদ রচনায় ব্যয়ভার (ঋণ) দেশবাসীকেই পরিশোধ করিতে হইতেছে। নূতন কর ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ হয়ত ভবিষ্যতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিদেশীর শাসনাধীন হইবে। "গরীবী হটাও" ধ্বনিটি বিকৃত পথে চরম পর্য্যায়ে দারিদ্র বৃদ্ধি করিবে এবং তথাকথিত "আর্থিক স্বরাজ" চরম অর্থনৈতিক সৃষ্টি সঙ্কট করিবে।

সহস্র বৎসরের পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরাট দায়িত্ব ও সম্মান লাভ করিয়া নেহেরুজী আপন রাজনৈতিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য সুদীর্ঘ ২০ বৎসর যে অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন এবং যে অমূল্য সময়, সুযোগ, সম্পদ এবং বহিঃরাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ও ও কারিগরি সাহায্য ব্যবহার করিবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দায়িত্ব অনুযায়ী রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে নিয়োজিত হইলে ভারতবর্ষ আজ অনায়াসে পশ্চিম জার্ম্মানীর ন্যায় দারিদ্রশূন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এক মহাশক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে বিশ্বে খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইত এবং ঐ সঙ্গে নেহেরুজীও যথার্থ গৌরবের অধিকারী হইতেন।

এখন শুধু একটা প্রশ্ন—আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন প্রকারে তথাকথিত সোসিয়ালিষ্টিক প্যাটার্ণে ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হইলে এবং শ্রীমতী গান্ধী সমগ্র এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বিরাট নেতৃ বলিয়া রাশিয়ার একান্ত শ্রদ্ধার পাত্রী হইলে তাহাতে ভারতবাসীর অথবা ভারতবর্ষের কোন্ দুঃখের লাঘব হইবে? ভারতবর্ষের কেবল "মানচিত্র" ব্যতীত তাহার অপর বৈশিষ্ট্যের কতটা অবশিষ্ট থাকিবে? এই অপূর্ব্ব "প্যাটার্ণ" সৃষ্টি করিতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দেশবাসীকে যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং আগামীদিনের জন্য আরও যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা পরিপূরণ করিতেও ইহার চতুর্গুণ সময়ের প্রয়োজন হইবে; অথবা এই প্রকারের ভারতবর্ষে তথাকথিত নেহেরুজীর "প্যাটার্ণ" রূপায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হইবে অনাহার ক্লিষ্ট অন্তিম হাহাকার। এই হাহাকারময় ভারতবাসীর রাজ্য তখন কে রক্ষা করিবে? স্বাভাবিক ভাবেই তাহার একান্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন-রাশিয়া অনায়াসেই ইহার উপর আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে।

স্কুলের ছাত্রদিগকে অতীত ভারতের যে ইতিহাস ও জীবনী পড়ান হইতেছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি জীবনীতে মহান্ আদর্শের বহু বর্ণনা আছে, কিন্তু সেই ছাত্রেরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহাদের বর্ত্তমান নেতাদের বিপরীত জীবনচিত্র ও চরিত্র। পুরান ও নূতন জগতের প্রখ্যাত নেতৃবর্গের এক-একটা আদর্শগত ভাবমূর্ত্তি ছিল। তাঁহারা এক-একটি ভাবমূর্ত্তি লইয়াই আবির্ভূত ও বিগত হইয়াছেন, কিন্তু জনমানসে সেই ভাবমূর্ত্তি মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই উজ্জ্বল মানসিকতার উপর আজ নেতৃবর্গের এক একজনে অসংখ্য চিত্র চরিত্র, ভাব-ভঙ্গিমা সাজ সজ্জা ভোগবিলাসের যে দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইতেছে, তাহার কোন ভাবময় আদর্শকে তরুণেরা অনুসরণ করিবে তাহা নিশ্চয়ই বিভ্রান্তিকর। এই বিভ্রান্তিকর পরিবেশ সামাজিক জীবনকে—জাতীয়তাবোধকেও কলঙ্কিত করিয়াছে। জনজীবনে চরিত্রগত ও আদর্শগত বিভ্রান্তি ও বিপর্য্যয়ের ইহা একটি বিশেষ কারণ। ভারতের ভাবি নাগরিক এই ছাত্রসমাজের নিকট রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ আদর্শের আজ এমনই অভাব যে, তাহারা ভবিষ্যতে উন্নত-চরিত্র ও কর্মী ব্যক্তি হইবার প্রয়াস পাইবে না এবং পাইতেছে না।

ভারতের এমন দুর্দ্দিন ও দুর্লক্ষণ সহস্র বৎসরের ইতিহাসে আর কখনও এমনভাবে দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বাংলার শিক্ষিত সমাজের ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের এবিষয়ে এখনই চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

চিত্রশিল্পে প্রবাসীর অবদান

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বহু বৎসরের সম্বন্ধ নিয়ে স্মৃতিকথা বলার জন্য আজ প্রবাসীর পৃষ্ঠায় একটু স্থান পাবার আশা থাকায় পুরাতন কয়েকটি কথা বলার সুযোগ নিই।

প্রবাসীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে। ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম প্রবাসীতে ছাপাবার জন্য, কিন্তু সাহসের অভাবে অফিস ঘরে ঢুকতে পারিনি। দরজার সামনেই দেখি, এক দিব্যকান্তি কিশোর,—কিশোর বলছি, কিন্তু যৌবনকে আহ্বানের জন্য বয়স তখন প্রস্তুত হয়ে আছে। শুনলাম এঁর নাম অশোক চ্যাটার্জি। ইনি তখন বাইসাইকেল দাঁড় করিয়ে কি একটা সার্কাসী প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করছিলেন। আমি এদিক দিয়ে একেবারে অপটু ছিলাম না। মিঃ চ্যাটার্জির সমভার রক্ষার চেষ্টায় ধরা পড়ল, গাড়ীটাকে খাড়া থাকতে বারবার হুকুম করা সত্ত্বেও হুকুম মানার দিক্ দিয়ে চাকা দুটো তেমন সায় দিচ্ছিল না। আমিও প্রায় তাঁর সমবয়সী, বয়সোচিত দম্ভ যেন আমাকে ঠেলা মেরে এগিয়ে দিল নিজের গুণ জাহির করবার জন্যে। ছবির বাণ্ডিল দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে এগিয়ে গেলাম মিঃ চ্যাটার্জির কাছে এবং বললাম, "আপনার কোথায় অসুবিধা হচ্ছে তা আমি বুঝেছি। আমাকে যদি গাড়ীটা একটু দেন তাহলে দেখিয়ে দিই কি করে বেসামাল চাকাকে শায়েস্তা করতে হয়।" একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে এইরূপ অশোভনীয় অনুরোধ শুনলে নিজের অপারগতা স্বীকৃতির জন্য সচরাচর মানুষ এগিয়ে আসে না। এক্ষেত্রে ঘটল ভিন্নরূপ। ভদ্রলোক সহাস্য বদনে সাইকেলটা এগিয়ে ত দিলেনই, তারপর আমাকে সাইকেল চড়তে দেখেই গুণগ্রাহী নিঃসঙ্কোচে বললেন, "বাঃ, আপনিত বেশ সাইকেল চালান।" কিন্তু প্রতিযোগিতার উপলক্ষ্য চালানো ছিল না, ছিল থামানো। আমার উচিত ছিল একটু নম্রভাবে বলা, "এ আর কি এমন শক্ত কাজ?" কিন্তু বললাম উল্টো। বেশ বিজ্ঞের মতই বুঝিয়ে দিলাম, এটা সাধনা-সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি ভেবে দেখতাম তাহলে বুঝতাম, আমি তখন সার্কাসে যে সাইকেল চালানো দেখাতাম সেটা ছিল সার্কাসের serious একটা খেলা, আর মিঃ চ্যাটার্জি যা নিয়ে কসরৎ করছিলেন, তা ছিল আসলে ওস্তাদ ক্লাউনের খেলা, যাকে বলে, সব জানি তবু বোকা সাজা।

সাধনার কথায় ফিরে আসি। যে সাধনার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রবাসী অফিসের দ্বারে ধরনা দিয়েছিলাম, সেই বিষয়ে কোন কথা সাহসের অভাবে বলার অবকাশ পেলাম না। ইতিমধ্যে কখন যে মিঃ চ্যাটার্জির নজর ছবির বাণ্ডিলটার দিকে চলে গিয়েছিল জানতে পারিনি। সাইকেলের খেলা দেখিয়ে দিগ্বিজয়ীর মতন যখন সীট থেকে নামলাম, তখন তিনি বললেন, "ওর ভিতর বুঝি ছবি আছে?" এতবড় প্যাকিং-এর ভিতর যে লেখার খসড়া থাকতে পারে না তা বোঝা তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না, কারণ তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনেকগুলি ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন, এ খবর পরে জানলাম, আরো জানলাম, তিনি প্রবাসী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

মিঃ চ্যাটার্জি ছবি দেখলেন। বেশ খুঁটিয়ে দেখলেন। আমার ছবিকে ত অমন করে সচরাচর কেউ দেখে না। মনে হল, উনি ছবি বোঝেন। দাম্ভিক আর কাকে বলে? আমি যেন এমনই ছবি আঁকি যে

একজন বোদ্ধার দরকার সে ছবির গুণাগুণ বিচারের জন্য। ভিতরের ঝোঁক যেভাবেই তেড়ে উঠুক, প্রতিকূল মতামত যে শুনতে হবে না এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম না। মিঃ চ্যাটার্জ্জি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ছবি ছাপানো উচিত।" উৎসাহবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা কোন প্রকারে কোথাও ঠেস দিয়ে রেখে ছবির বাণ্ডিল তুলে নিলাম কাঁধে, তারপর বেপরোয়ার মত ঢুকে গেলাম অফিস ঘরে। তখন প্রবাসী অফিসের বাহ্যিক আকৃতিতে জাঁদরেল ভাব কিছু ছিল না, সাহেবী ভাষায় বলতে হলে বিবরণ দাঁড়ায় modest office accommodation। কপালগুণে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এমনই একটা শক্তি ছিল, যে আমার মত একজন সাধারণকে মাথা নত করিয়ে কাছে টেনে নেয়। এই টানের ভাগিদেই তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে ধন্য হলাম। ভক্তি নিবেদনের পিছনে স্বার্থ যেটুকু ছিল তা হল মহানের কাছে নিজেকে নত করতে পারার মধ্যেই যে আনন্দ তা লাভ করা। রামানন্দ বাবু আমার ছবি দেখলেন, তাঁর মুখভঙ্গিতে এমন কোন ভাবের প্রকাশ হল না, যার মধ্যে হতাশ করার কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। সম্পাদক মহাশয় বললেন, " আপনি আঁকেন ভাল, কিন্তু এই ছবিগুলি ছাপার অসুবিধা আছে।" দারুণ একটা আঘাত পেলাম। সোজা কথায় যদি বলতেন, "তুমি ছবি আঁকতে জান না," কিংবা কোন্ রকমের ছবি হলে প্রবাসীতে ছাপা চলে তার আভাস দিতেন, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম। দমে গিয়েছিলাম, ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাড়ী ফিরলাম।

কোন্ ধরণের উল্লেখে যে কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষপাতিত্ব ছিল তা জানতে সময় লাগল না। এইখানেই বলতে হয় যে, পক্ষপাতিত্ব যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, প্রবাসী তার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

ছবিকে সূত্র করেই প্রবাসী, প্রবাসীর সম্পাদক এবং শ্রীঅশোক চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে যে পরিচয় ঘটেছিল, সেই পরিচয়ের সঙ্গে আমার সারাজীবনের যোগ আছে। সে যোগ শুধু ছবি প্রকাশের স্বার্থে জড়িয়ে ছিল না, ক্রমে তা ঘরোয়া সম্বন্ধও গড়ে তুলেছিল। শ্রীঅশোক চ্যাটার্জ্জিকে তখন ক্ষুদু বলে সম্বোধন করি, ডাকের গোড়ায় সমীহের পাহারা উঠে গিয়েছে। ঘরোয়া সম্পর্কের দাবী এই কারণেই পেশ করলাম।

ছবি উপলক্ষেই যখন প্রবাসীর সঙ্গে আমার যোগ ঘটেছিল, তখন ছবি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা, তখন ছবি যে কৃষ্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে তা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেই জানতেন না। শিক্ষিত লোক বলতে আমাদের সেরা বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শে যাঁরা জ্ঞানীর ছাড়পত্র পেয়েছিলেন তাঁদেরকেও এদিক্ দিয়ে অশিক্ষিতদের দলের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে ফেলা যায়। এই বিশেষ অশিক্ষিত দলে এমন অনেকে ছিলেন, কিংবা হয়ত এখনও আছেন যাঁরা ছবি বুঝি না বলতে বেশ একটা গর্ব্ব বোধ করেন। অর্থাৎ তাঁরা বোধহয় জানাতে চান, ছবি আঁকা যেখানে সময়ের অপব্যয় এবং দুষ্কর্মও বটে, সেখানে ছবি বোঝাকে দুষ্কৃতির উৎসাহ দান বলে মানতে হয়। এটি ছিল তখন পরম সত্য। মিথ্যার আবরণে অবুঝদের মেনে নেওয়ার সঙ্গে যখন আমাদের সমাজে, শিক্ষাকেন্দ্রে নানাভাবে অর্থহীন বিশ্বাসের প্রচার শুরু হয়েছিল, সেই সময় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউয়ের মাধ্যমে আমাদের দেশী শিল্পীদের কাজ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্য্যকে তিনি যে কৃষ্টির একটি বৃহৎ এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ধরেছিলেন তার কারণ, ছবি বা মূর্ত্তির মাধ্যমে শিল্পী তাঁর মানসিক উচ্ছ্বাসকে যেভাবে রূপপরিকল্পনায় প্রকাশ করেন তাকে কোনো সাহিত্যিক বা কবির সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে নগণ্য করা যায় না। সঙ্গীতকেও এই উচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গে আমা

যায়, কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা উপস্থিত ক্ষেত্রে সমীচীন হবে না, কারণ, সঙ্গীত যে উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করুক সে আনে রূপের পরিকল্পনা অরূপের কেন্দ্র থেকে। সংক্ষেপে যাকে abstract form of interpretation of expression বলা যেতে পারে।

দুর্দান্ত সাহস এবং নিজের বিচারে একান্ত বিশ্বাস থাকায় রামানন্দবাবু বেরসিকদের চতুর্দ্দিক থেকে আক্রমণকে সহনীয় করে আনলেন। 'দেশী শিল্পী' কথাটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম, কারণ তখনকার দিনে যাঁরা ছবি আঁকতেন তাঁরা বিদেশী প্রথায় আঁকা বর্ণশঙ্কর ছবির অনুকরণ করতেন। তাঁদের ছবির mythological বিষয়বস্তুতে দেবদেবীরা যে রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতেন তাতে তাঁদের প্যাৎলুন ও স্কার্ট বর্জ্জিত মানুষই বলা যেতে পারে। শিবঠাকুরকে দেখেছি, গঙ্গাদেবীকে ধারণ করার জন্যে যেন কুস্তি পরোয়া নেই বলে মল্লযোদ্ধার মত কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। এ ক্ষেত্রে যেমন তিনি মল্লযোদ্ধার রূপ নিলেন অন্যত্র যেখানে তিনি বিরাট ধ্যানী, যেরকম ধ্যানযুক্ত হতে হলে পদ্মাসনে বসতে হয়, যে আসনে শিরদাঁড়া সোজা রাখা নিয়ম, তাঁরই দেখেছি স্ফীত উদর, তিনি একদিকে জটাধারী, অপরদিকে বেগুন-মসৃণ তাঁর গাল। হিমালয় পাহাড়ে নিশ্চয় মাইনে করা পরামানিক ছিল এবং হাল ফ্যাশানেই বোধ হয় সে ক্ষুর চালাত। এইখানেই কি দেবদেবীর রূপ-পরিকল্পনার শেষ? কার্ত্তিকেয়, যিনি দেবসেনাপতি, তাঁর বাহন ময়ূরই হোক বা উটপাখীই হোক যায় আসে না, তাঁর যোদ্ধৃবেশে বনিয়াদী চালের চওড়া কালাপেড়ে কোঁচানো কাপড়, আর তাঁর শ্রীচরণ সেবায় লাগত অতীত যুগের পাম্পশু জুতো, 'বল্' নৃত্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেরূপ পাদুকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই ধারার বাহক হয়েই আরও আধুনিক কালে এসেছেন মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতী ডাকশাইটে চলচ্চিত্র তারকাদের রূপ নিয়ে। এইরূপ নির্ভুল প্রতিকৃতি মাঠেঘাটে স্মরণীয় লোকদের মূর্ত্তিতেও দেখা যায় না। সাধারণের সমর্থন না থাকলে এই ধরণের রুচি গড়ে উঠতে পারে না। শ্রদ্ধের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় দাঁড়ালেন কৃষ্টির বার্ত্তাবাহক হিসাবে রুচির পরিবর্ত্তন ঘটাবার জন্যে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও দৃঢ় বিশ্বাস যদি তাঁর সহায় না হত তবে আজকের দিনে ছবিকে ভদ্রসমাজ, শিক্ষিত সমাজ কৃষ্টির অঙ্গ বলে স্বীকার করত না। তখন যেসব শিল্পীর কাজ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্থান পেত, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন মজুমদার, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন কর, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, চুঘতাই, বেঙ্কটাপ্পা, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ উকীল, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি। আমাদের কাজ ছাপা হতে শুরু হল অনেক পরে। আমাদের বলতে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন, বীরেশ্বর সেন, চারু রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তামণি কর, মনীষী দে প্রভৃতি। আমাকেও এই শেষোক্ত দলের মধ্যে নিতে হয়।

আমরা যে-ধরণের ছবি আঁকতাম সেই অঙ্কন পদ্ধতিকে ওরিয়েন্টাল আর্ট বলা হত। ওরিয়েন্টাল আর্ট কথাটাকে ব্যাপক অর্থে ধরতে হলে সেটা সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এশিয়াতেই বিভিন্ন দেশে এত বিভিন্ন প্রথায় অঙ্কনপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল এবং tradition হিসাবে চলছে যাতে তাদের কোনোটির বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন পারসীক, চৈনিক, জাপানী, যবদ্বীপীয় অঙ্কন-রীতি। আমার বিবেচনায়, আমরা যে-ধরণের ছবি আঁকতাম, তাতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভাব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হয় যে, অবনীন্দ্রনাথের কাজও বাইরের প্রভাবকে এড়িয়ে চলতে পারেনি। তাঁর কাজে যেমন দেশী মোগল, রাজপুত, পাহাড়ী স্কুল ইত্যাদির ছাপ পড়েছিল, তেমনি ছবির পরিবেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্যে ইউরোপীয় composition-এর রীতি কম আধিপত্য স্থাপন করেনি। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের ছবিকে কেবল ওরিয়েন্টাল আর্ট বললে তার সব গুণের পূর্ণ বিশ্লেষণ হয় না। তাছাড়া তাঁর

শিল্পকর্মে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অবদানকেও মানতে হয়। শেষোক্ত কারণে আমার মতে তাঁর এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের অনুসৃত অঙ্কনরীতিকে অবনীন্দ্রনাথ স্কুল অব পেন্টিং বললেই অধিক সমীচীন হয়।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকেই যখন এতটা প্রাধান্য দিচ্ছি, তখন তাঁর ছবিতে ঘরোয়া মাটির সাড়া কিভাবে ধরা পড়ল তাও বলা উচিত।

এই বিশেষ ধরণের সাড়ার পিছনে ছিল, অঙ্কন-পদ্ধতিতে রঙ, রেখা ও রূপের সমাবেশ। যে সমাবেশের সংস্পর্শে এসে বিনা দ্বিধায় অনুভব করা যেত যে, তাঁর ছবিতে যেসব উচ্ছ্বাস রূপায়িত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঘরোয়া মাটির টানে তার সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ। এই যোগসূত্রেই তাঁর ছবিকে বিদেশীর অশোভনীয় আকর্ষণ থেকে ছিনিয়ে এনে আমাদের স্বাভাবিক ভাব-প্রবণতার সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশের স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাস ও তার প্রকাশভঙ্গীকে অন্য দেশের সঙ্গে প্রভেদ করে বললাম এই কারণে যে, প্রত্যেক দেশেই উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে তার স্বকীয় প্রথায়, প্রচলিত অভ্যাস থেকে।

ছবির গুণাগুণ ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণের আড়ম্বর আর বাড়িয়ে তুললে আমার বক্তব্য আর্টের প্রবন্ধের স্তরে উঠে যেতে পারে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত 'চিত্রশিল্পে প্রবাসীর অবদান' সম্পর্কে লিখতে বসিনি। অতএব ছবির ব্যাখ্যা ছেড়ে মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

ছবিকে কৃষ্টির অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দেবার অক্লান্ত চেষ্টার জন্যে রামানন্দবাবুর নাম এদেশের যে-কোনো শিল্পীর কাছে শুধু স্মরণীয় হয়ে থাকবে না, শিল্পী-সমাজে তার একটি স্থান হওয়ায় কৃতজ্ঞ থাকারও কথা। কৃতজ্ঞতার কথা বলতে কেবল যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের অনুসরণ করেছেন তাঁদের কথাই বলিনি, যাঁরা ইউরোপীয় প্রথায় ছবি আঁকতেন তাঁদেরও মনে রেখে কথাটা বলেছি। কারণ, যে প্রথাতেই ছবি আঁকা হোক, ছবি সব সময়েই তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে নকশার সাহায্যে। নকশা যেভাবেই প্রকাশ করা হোক, আসলে সে ছবির কথাই বলে। ভাষা আলাদা হলেও তাবের অন্তর্নিহিত সত্যের পরিবর্তন হয় না। রামানন্দবাবুর পক্ষপাতিত্বের চাপ দেশী ধরণে আঁকা ছবির ব্যাপক প্রচার সম্বন্ধে তাঁকে সদা জাগ্রত রাখলেও, যেসব শিল্পী বিদেশী প্রথায় ছবি আঁকবেন তাঁরা যদি তাঁদের কাজকে ছবির কোঠায় তুলতে পারতেন, তাঁদের কাজও প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউয়ে সমাদরে স্থান পেয়েছে। দেশীয় ধরণে আঁকা ছবির প্রচারে আরও যাঁরা সহায়তা করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ই বি হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী, ও সি গাঙ্গুলী, ষ্টেলা ক্রামরিশ ও সিস্টার নিবেদিতারও নাম না করলে শিল্পীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার পূর্ণ প্রকাশ হবে না।

বক্তব্যের শেষে ঋণ পরিশোধের কথা ওঠে। শিল্পী হিসাবে আমি যে স্বীকৃতি পেয়েছি তার মূলে অনেক-খানিই প্রবাসীর কাছ থেকে পাওয়া উৎসাহবাণী, যা দ্বন্দ্বের মধ্যে এগিয়ে চলার পথ খোঁজায় সুবিধা ও সাহস দিয়েছিল। অত বড় সহায় নাগালে না থাকলে হয়ত পথ খুঁজতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে যেতাম।

প্রসঙ্গক্রমে কেদারদার (৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষুদুর বড় ভাই) কথা মনে পড়ছে। দিনের পর দিন আমার ষ্টুডিওতে ক্ষুদুর মতই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে-ছেন। প্রবাসীর জন্য আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নেবার প্রয়োজন হলে তিনি বসে থেকে কাজ করিয়ে নিতেন, পাছে শিল্পীর temperament কাজের দাবিকে ফাঁকি দিয়ে বসে।

ষষ্টিপূর্তিতে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

...প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া আমাদের দেশের উন্নতি, প্রগতি এবং কচিৎ অবনতি, আমাদের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জয়-পরাজয়, আমাদের হর্ষবিষাদ, এ সমস্তর সাক্ষী হইয়া প্রবাসী মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। এই ষাট বৎসরের সাতশো কুড়িখানি প্রবাসী পত্রিকার মধ্যে বাঙ্গালীর এযুগের ইতিহাস ও সাহিত্য নিহিত আছে। —খালি বাঙ্গালা দেশের কেন, ভারতবর্ষের এবং সমগ্র বিশ্বেরও ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি দিগ্‌দর্শন এই ষাট বৎসর ধরিয়া প্রবাসীর মধ্যে পাওয়া যাইবে।...

...প্রকাশনের পারিপাট্যে, প্রবন্ধ-গৌরবে, চিত্রসম্ভারে প্রবাসী প্রথম হইতে বাংলাভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকার আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়। প্রবাসীতে প্রবন্ধ বাহির হওয়া বহুবৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে একটি সম্মান ও গৌরবের কথা বলিয়া বিবেচিত হইবে।......

...প্রবাসী পত্রিকার এই একটি প্রথম সার্থকতা ইহাই হইয়াছিল যে, বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মনে ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্ঞান, মর্য্যাদাবোধ এবং রসানুভূতি প্রতিষ্ঠা করা। প্রবাসীর এই আগ্রহ চেষ্টার ফলে অন্ততঃ আংশিক ভাবে বাঙ্গালী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, যামিনী রায় প্রমুখ শিল্পীকে নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা একটি কম কথা নয়। ......

...বাঙ্গালীর সাহিত্য-চেতনার উদ্বোধনে এবং তাহাকে পুষ্ট ও রসসিক্ত করিবার কার্যে এইভাবে অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসীর কৃতিত্ব অতুলনীয় হইয়া আছে।

...প্রবাসীর দেশসেবা এই পত্রিকাকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার জন্য সাধনা, প্রবাসীতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত তাঁহার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক অংশে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সব শ্রেণীর পাঠককেই বিশেষভাবে জাগরিত করিয়া রাখিতে সহায়তা করিয়াছিল।......

...মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এইভাবে প্রবাসী বাঙ্গালীর জনগণের মধ্যে উচ্চভাব, আদর্শ শিক্ষা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণ বর্ধনে সার্থকতা অর্জন করিয়াছে। প্রবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত শুদ্ধ ও শুভ্র জ্যোতির্ময় দৃষ্টিভঙ্গি। ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম্‌ অর্থাৎ অধিমানবিকতা, ও ইউনিভার্সাল হিউম্যানিজম্‌ অর্থাৎ বিশ্বমানবিকতার অন্যতম প্রচারক রূপে প্রবাসী কার্য করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর চিত্তে এখন যে একটি যুক্তি ও জ্ঞানের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, প্রবাসী পত্রিকা তাহার অভিবর্ধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।......

...ষষ্টিপূর্তির এই শুভ অবসরে আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রবাসী পত্রিকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি— এবং প্রার্থনা করি যেন বাঙ্গালীর জীবনে বহু বৎসর ধরিয়া, এমন কি পূর্ণ শতাব্দী ও তাহার অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসী সত্য শিব সুন্দর এবং জ্ঞান ও রসানুভূতির ধারা অব্যাহত রাখিয়া যাইতে পারে।

হুমায়ুন কবির

...কলেজে ভর্তি হবার পরে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনা আরো নিবিড়ভাবে ভালবাসতে এবং

বুঝতে শিখলাম, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী এবং বিদেশী সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে পরিচয়ও বাড়তে লাগল। সেই সময় থেকেই প্রবাসীর অন্যান্য রচনাও হৃদয় এবং মনকে নাড়া দিতে সুরু করে। পরে যাঁরা নানাভাবে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করেছেন, বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই প্রথম প্রবাসীর পাতায় পরিচয় হয়। নতুন নতুন লেখক আবিষ্কার এবং বাঙালার জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের রচনা ছড়িয়ে দেবার কাজে সে যুগে প্রবাসীর যে দান, বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগী কোনদিনই তা ভুলবে না।

আমরা তখন ভাবতাম যে প্রবাসীতে রচনা প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্যিক হিসাবে পুরোপুরি স্বীকৃতি-লাভ হয় নি। প্রথম যেবার প্রবাসীতে আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, সেদিনকার আনন্দের কথা আজো স্মরণ আছে।...

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

...প্রবাসী মানুষদের কাছে 'প্রবাসী'র সমাদরের অবধি রইল না। প্রবাসের শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালীদের কাছে 'প্রবাসী' যেন গৃহপঞ্জিকার মত অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল—অবশ্যপাঠ্য ত বটেই। তাঁদের মনে ও জীবনে সাহিত্যের একটি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন আনন্দময় পরিবেশ 'প্রবাসী' সৃষ্টি করেছিল।

১৩০৮ সাল থেকে পরের কয়েক বছর প্রবাসী সাহিত্য ও সমাজচিন্তার আদর্শ নিয়েই যেন একমন ছিল। হেনকালে সহসা ১৩১১ সালে প্রথম বঙ্গব্যবচ্ছেদ হ'ল। এর পরে 'প্রবাসী' আর শুধু সাহিত্য-সমাজ-শিল্পকলার ভাবনা নিয়ে ব্যাপৃত রইল না। 'প্রবাসী' যেন দেশের বেদনা-ভাবনা, অপমান-লাঞ্ছনার গ্লানির কথা নিয়ে আকুল হয়ে উঠল। সাহিত্য, সমাজচিন্তা, চিত্র, শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয় রাজনীতিকে সমান ক'রে—এক ক'রে নিলেন প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে—প্রবাসীর বিখ্যাত লেখকদের নানা রচনায় ও প্রবন্ধে। দেশকে যেন এই চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে 'প্রবাসী' চালনা করতে লাগল।......

কাত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

...তাঁর প্রকৃতির জন্য প্রবাসীর লেখার বিচার হ'ত লেখককে দেখে নয়, লেখার গুণ দেখে। একবার এক ভদ্রলোক প্রবাসীর অফিসে গিয়ে বললেন,—'চিনুন দেখি মশাই, আমি কে?' রামানন্দবাবু অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, কোন জবাব দিতে পারলেন না। ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিলেন—তাঁর নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই নাম ছিল প্রভাতবাবুর। 'বলবান্ জামাতা,' 'আত্মতত্ত্ব,' 'শরীলে আর পদথ নাই'—তাঁর রচনায় এই রকম বাক্যগুলি তখনকার দিনে রহস্যালাপে লোকের মুখে শোনা যেত। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বাংলা দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁর রচনার মধ্যে হাস্যকৌতুকের প্রাধান্য ছিল। তাঁর গল্প, উপন্যাস উভয়ই প্রবাসীতে বেরুত। অথচ সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি কখনও। রামানন্দবাবু প্রভাতবাবুর পরিচয় পেয়ে বললেন—'মনে মনে আমিও আন্দাজ করেছিলুম আপনারই নাম।' প্রভাতবাবু হেসে জবাব দিলেন—'মনের আন্দাজী কথাটা মুখ ফুটে বলতে না পারাতেই ত আমার সঙ্গে বাজীতে হেরে গেলেন।'...

রাজা রামমোহন রায়

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দারিদ্র্য দূর কর

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই কয়টি কথায় একটি বিরাট সর্ব্বগ্রাসী সমস্যার আলোচনা ও প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়া দেশবাসীকে ঐ মহাসমস্যার সমাধান সম্বন্ধে সজাগ করিয়াছেন। দারিদ্র্য দূর হয় নাই এবং কিভাবে কখন কতটা সেই দারিদ্র্য-ভারের লাঘব হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু দেশবাসী সকলেরই মনে একটা বিশ্বাস জাগ্রত হইয়াছে যে দেশশাসকদিগের সকল চেষ্টা এখন বিশেষ করিয়া দারিদ্র্য দূর করার কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে। এবং তাহা হইলে সেই চেষ্টা অন্ততঃ কিছুটা সফল হইবে। অর্থাৎ নানা ক্ষেত্রে দেশের মানুষ নূতন নূতন অর্থকর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে; ভোগের বস্তু সামগ্রী ও অবাস্তব ব্যবস্থা (যথা শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি) বর্দ্ধিত হারে উৎপন্ন ও সৃজিত হইতে আরম্ভ করিবে এবং ফলে দেশের মানুষ পূর্ব্বের ন্যায় আর অসহায়, বেকার ও নিঃসম্বল অবস্থায় অনাহারে অর্দ্ধাহারে অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে না। এ কথা ঠিক যে চেষ্টা থাকিলে যে দেশে ভোগ সামগ্রী যথেষ্ট পাওয়া যায় না সে দেশের মানুষের কাজের অভাব থাকা উচিত হয় না। বহুসংখ্যক বেকার মানুষ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে এবং শিক্ষা চিকিৎসা ও অপর অবাস্তব সেবাকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলে সেই সকল বস্তু ও সেবা উৎপাদকদিগেরই ভোগে ও উপকারে লাগিয়া উৎপাদন কার্য্য সফল করিতে পারে। ঐ সকলের মূল্য অর্থে ধার্য্য করিয়া কর্ম্মীদিগের উপার্জ্জন অর্থে মিটাইবার ব্যবস্থা করিলে সেইরূপ ব্যবস্থাই যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং প্রচলিত অর্থনীতির কাঠামোর ভিতরে এই সকল নূতন উৎপাদন কার্য্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ও প্রস্তুতকারকদিগের বেতনাদির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া লেন দেন হইয়া যাওয়া সহজ হইবে। অর্থাৎ যদি কয়েক কোটি বেকার মানুষ কর্ম্মীরূপে নিযুক্ত হইয়া যে সকল

বস্ত্র ক্রয় করিতেন অথবা শিক্ষা বা চিকিৎসার মূল্য দান করিতেন, তাঁহারা নিজেরাই যদি সেই সকল প্রস্তুত ও শিক্ষা চিকিৎসার কার্য্য করিতেন তাহা হইলে ডানহাতের কার্য্যের মূল্য বাম হস্তে প্রাপ্ত হইয়া এবং বাম হস্তের অর্থ দিয়া ডান হস্তস্থিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দিয়া অর্থনৈতিক কার্য্যব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়া যাইত। ইহা যদি না করিয়া অসংলগ্ন ভাবে নানাক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ব্যবস্থা করিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের সকল বেকারকে কার্য্যে নিযুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে বিষয়টা খাপছাড়া ভাবে করা হইবে এবং তাহার ফল সর্ব্বক্ষেত্রে উত্তম হইবে না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খাপছাড়া ভাবে করার ফলে বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক উৎপাদন হইয়া যাইবে এবং অনেক স্থলে প্রয়োজন থাকিলেও উৎপাদন যথেষ্ট হইবে না। যদি সারা দেশের মানুষের সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া সকল কিছুর মোট পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং যে সকল বস্তুর বা অবাস্তব সেবার উৎপাদন যথেষ্ট না থাকায় লোকের চাহিদা অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে দেখা যাইবে, সেই সকলের উৎপাদন ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে নূতন কর্ম্মীদিগের নূতন উৎপাদন কার্য্য সঙ্গে সঙ্গে জাতির জনগণের জীবন-যাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া যাইতে পারে, উদ্বৃত্ত কিছুই অব্যবহৃতভাবে পড়িয়া থাকিবে না। অর্থাৎ যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রস্তুত তালিকা ও শহরের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের তালিকা দেখিয়া বেকার জনগণের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং ফুড ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন বিভাগের সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ অনায়াসেই কোথায় কোথায় কার্য্য ও কার্য্যোৎপন্ন বস্তু প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব সে কথা ঠিক করিতে পারিবেন।

উপরে বর্ণিত ভাবে বেকার ও ভোগ্য বস্তু প্রভৃতির অভাব এই দ্বিবিধ সমস্যার সমাধান চেষ্টা না করিয়া যদি শুধু সরকারী চাকুরী সৃষ্টি করিয়া কিছু কিছু বেকার মানুষকে চাকুরে হিসাবে নানা দপ্তরে বসাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সেই সকল চাকুরী শুধু উৎপাদন-কার্য্য-বর্জ্জিতভাবে মাহিনা দিয়া পেটোয়া মানুষজনকে টাকা পাওয়াইবার ব্যবস্থা মাত্র হইবে। এই সকল চাকুরেদিগের কোনও মূল্য ধার্য্য করা যায় এরূপ কার্য্য থাকিবে না এবং তাহারা শুধু বেতনই পাইবে। জনসাধারণের উপর ইহা একটা রাজকর বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে এবং অল্প কিছু মানুষেরই ইহাতে উপার্জ্জন হইতে পারিবে। একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে এই চাকুরী সৃষ্টির পন্থা সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য পন্থা ও ইহা দ্বারা দলের লোকেদের সংস্থান করা শীঘ্র শীঘ্র সম্ভব হয়। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনও স্থায়ী উন্নতি ইহাতে হয় না। যাহাকে বলে দায়সারা লোক-দেখান পন্থা অনুসরণ—ইহা তাহাই।

রামমোহনের-সমাজ সংস্কার-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাও জাতি গঠন পরিকল্পনা

রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যকলাপ, চিন্তার ধারা, তর্ক-বিতর্ক, শাসক গোষ্ঠীর সহিত পত্রাদি বিনিময় প্রভৃতির চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, তিনি যেসকল সংস্কার ও গঠনমূলক পরিবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা ভারতের সভ্যতা কৃষ্টি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অঙ্গের সকল অবয়বেই উপলব্ধির ক্ষেত্র সন্ধান করিয়াছিল। আজ হইতে প্রায় দুইশত বর্ষের পূর্ব্বের সেই আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রাচীন জ্ঞানচর্চ্চা ক্ষেত্রের জাগরণের কথায় পর্য্যালোচনা করিলে রামমোহন রায়ের সর্বমুখী প্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য বিরাটত্বও ব্যাপ্তি সকলের মনেই মহাবিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকারের কথা তিনি প্রায় একশত আশি বৎসর হইল বলিয়া গিয়াছেন: কিন্তু তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হইয়াছে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে। কার্য্যতঃ কতটা কি হইয়াছে তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারে না। শিক্ষার পথ প্রদর্শক রমেমোহন রায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা সকল ভারত

বাসীর জন্য আজিও করা হয় নাই এবং কখন করা হইবে তাহা কে জানে? নারীজাতির সম্মান রক্ষার আদর্শ এখনও বিশ্ববাসী কার্য্যতঃ মানিয়া লয় নাই। ইহার প্রমাণ, সম্প্রতি বাংলাদেশে যাহা ঘটিয়াছে ও যে ঘৃণ্য কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে আমেরিকা ও চীন মুখ বন্ধ করিয়া অপরাধীদিগের শাস্তির কথার উল্লেখ মাত্র করে নাই, তাহাতেই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। অথচ ভারতের বহু "আধুনিক"-মতবাদ-প্রচারক ও সমর্থক নরনারী ঐ চীন অথবা আমেরিকার সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সকল মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৃজন ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, যাহার জন্য রাজা রামমোহন রায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, সে আদর্শ আজও বিশ্বের বহুক্ষেত্রে অনুপলব্ধ থাকিয়া গিয়াছে। ইহার সহিত ছিল সকলের নিজ নিজ মত প্রকাশের অধিকার কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সাম্যের অধিকার বহু দেশে শুধু শ্বেতকায় নাগরিক-দিগের জন্যই বিশেষভাবে সংরক্ষিত আছে। কৃষ্ণকায়-গণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেশিয়ায় সাম্য উপভোগে সক্ষম নহেন। অন্য অনেক শ্বেতকায়-প্রধান দেশেও কৃষ্ণকায়গণ সমান অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না।

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করাতেও নানাভাবে বাধা দিবার চেষ্টা নানাক্ষেত্রে করা হইয়া থাকে। মতদ্বৈধ-জাত কলহ ও রক্তপাত বহু দেশেই একটা রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার দ্বারা সর্ব্বমানবের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি সাধন চেষ্টা বর্ত্তমানে বিশেষ হইতেছে কি না তাহা পণ্ডিতজনের অনুসন্ধানের বিষয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভক্তিরসের আসরে কোন কোন মহাপুরুষ কখন কখন রামমোহনের পরে ভারতের সমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও তাহাতে জনমানসে পরমেশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ বিচার চেষ্টা বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করে করা যায় কি না তাহাও বিচার্য্য। পাশ্চাত্যে বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান ও দর্শনের যে সমন্বয় সাধন চেষ্টা বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক করিতেছেন ও যাহার ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা ও চর্চ্চা উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পুনঃ প্রচলিত হইতেছে; সেই মনোভাব ভারতবর্ষে বিশেষ দেখা যায় না। পরন্তু আধুনিকতার সহিত ভারতবর্ষে নিরীশ্বরবাদ যেন একটা বিশেষ সম্বন্ধের বন্ধনে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইহার কারণ ভারতবাসী শিক্ষিতসমাজ কোনও অন্তর্নিহিত শক্তি যে সৃষ্টির মূলে থাকিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে এইরূপ বিশ্বাস সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকে। সৃষ্টি কিভাবে কেন হইল, সৃষ্টিতে মানবজাতির স্থান, সৃষ্টির ভিতরে কোনও প্রাণশক্তি আছে কি না এবং থাকিলে তাহার সহিত মানবের কোন বিশেষ সম্বন্ধের সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি বহু কথার কোনও আলোচনা বর্ত্তমান যুগের আধুনিক বিদ্যাবাগীশদিগের মধ্যে আর প্রচলিত থাকিতেছে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বিজ্ঞানের ও বিদ্যার নিকট বলিদান দিবার কোনও চেষ্টার সমর্থন ত করিতে পারিতেনই না; তাঁহার নিকট বিদ্যা ও বিজ্ঞান ঈশ্বর উপলব্ধিরই প্রশস্ততর পথ বলিয়া স্বীকৃত হইত। আজিও তাঁহার প্রদর্শিত পথে যাঁহারা চলেন তাঁহারা আধ্যা-ত্মিকতা বর্জ্জিত বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া কখনও জীবন পথে অগ্রগমন চেষ্টা করেন না। আধ্যাত্মিকতা উদ্বুদ্ধ বিদ্যা মানুষকে জ্ঞানের পথে যে ঈশ্বর উপলব্ধিতে লইয়া যায় তাহার সহিত ভক্তির পথে পরমাত্মার সহিত যে সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টা হইতে পারে না; কিন্তু কোন পথে চলিলে ফল প্রাপ্তিতে কি পার্থক্য দেখা যাইতে পারে তাহার বিচার সহজ নহে। রাজা রামমোহন রায় জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথেই চলিতে সক্ষম ছিলেন। জ্ঞান উপলব্ধি ভক্তিকে দুর্বল করে না; পরন্তু আরও জোরাল করিয়া দেয় বলিয়াই তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করিতেন। অপর সাধকদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস দেখা গিয়াছে।

ব্রহ্মসমাজ প্রচারের দ্বারা সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে না তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে ব্রাহ্মসমাজের

অধিকাংশ সভ্যই উচ্চশিক্ষিত এবং আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। প্রচারের ফলে যাঁহারা কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ে যোগদান করেন তাঁহারা নিজ হইতে মত পরিবর্তন না করিলে প্রচারকগণ তাঁহাদের মত পরিবর্তনার্থে যে আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি করেন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই আপত্তিজনক তুলনার উত্থাপন করে। রাজা রামমোহন রায় কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ করা অমার্জনীয় মনে করিতেন এবং সেই চিন্তা ধারা অনুকরণ করিয়াই অদ্যাবধি ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। অপর কোনও ধর্মমত বা ধর্মসংক্রান্ত রীতিনীতির সমালোচনা করা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সমীচীন মনে করা হয় না। সুতরাং উচ্চাঙ্গের দার্শনিক আলোচনা ব্যতীত অপর ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। প্রচার কার্য্য এই কারণেই বিশেষ করা হয় না। রাজা রামমোহন রায় লিখিত ব্রাহ্মসমাজ ভবনের দানপত্র পাঠ করিলে অপর ধর্মের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত পরিস্কারভাবে বোধগম্য হইবে।

একথা ঠিকই যে কেরালা, মহারাষ্ট্র, বঙ্গভূমি প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকদিগের মানবীয় অধিকার লইয়া আর পুরাকালের ন্যায় অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় না। কিন্তু যে সকল অঞ্চলে অজ্ঞানতার অন্ধকার প্রগাঢ়রূপে বিরাজমান সেই সকল স্থলে এখনও শতকরা নব্বইজন স্ত্রীলোক নিরক্ষর। আইনে মানা থাকিলেও এখনও বাল্যবিবাহ কোন কোন দেশে প্রবলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গভূমিতেও পণপ্রথা এখনও সচল ও ইহা নারীজাতির অবমাননার কথা স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের মানবীয় রাষ্ট্রীয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সকল আদর্শই বর্ত্তমানে উপলব্ধ হইয়া গিয়াছে ও ভারতে এখন আর কাহাকেও রামমোহন রায়ের নিকট কিছু শিখিতে হইবে না; সকলেই প্রগতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে আধুনিক সুসভ্য মানুষ হইয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি কথার কতটা মূল্য আছে তাহা সেই মহা-পুরুষের এই দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান বৎসরে চিন্তাশীল ভারতীয় মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। দেখা যাইবে যে, তিনি ভারতীয় মানুষকে যাহা হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন ভারতীয়েরা সর্বক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিতে এখনও সক্ষম হয়েন নাই। রাজা রামমোহন রায় যে সকল ব্যক্তিগত, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানবীয় আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই সকল আদর্শ ভারতে তথা বিশ্বে এখনও প্রচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া ভারতবাসী যদি সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিশীল হইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলেই জাতির ও ব্যক্তির উন্নতির সম্ভাবনা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারিবে।

বঙ্গপ্রদেশ, বঙ্গভূমি, বঙ্গদেশ না শুধু বঙ্গ ?

পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলাইয়া নাম রাখা হইবে বঙ্গ প্রদেশ বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল। ইহাতে অনেকে আপত্তি করেন ও বলেন যে নামটা বঙ্গভূমি হওয়া উচিত। আমরাও এই বঙ্গভূমি নামেরই সমর্থক। অপর যে সকল নাম দেওয়ার কথা উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বঙ্গ দেশ অথবা শুধু বঙ্গ নাম দিবার কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যখন দেশের নাম হিসাবে প্রচলিত ছিল তখন শুধু বঙ্গ বলিলেই বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জাতির দেশ বুঝাইত। কেহ কেহ বঙ্গদেশ কথাটিও ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সহিত বাংলাদেশ নামটির সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটি নাম এক নহে; কিছু পার্থক্য আছে। যাহাই হউক, বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গ, বঙ্গদেশ বা বঙ্গভূমি নামই অধিক শ্রুতি মধুর। এবং অর্থের দিক দিয়াও দেশত্ব জ্ঞাপক। আমাদের দেশটি যে শুধু মাত্র ভারতের একটি প্রদেশ এই কথাটা প্রকটভাবে বলিবার কোনও অর্থ হয় না। বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালী জাতির ও বাংলার সভ্যতা ও কৃষ্টির নাম রক্ষা করিবার জন্য প্রদেশ কথাটা ব্যবহার না করাই সমীচীন। ভারতের যে সকল রাষ্ট্রীয় অঙ্গের নামের সহিত প্রদেশ শব্দটি সংযুক্ত আছে সেই সকল দেশের সৃজন হইয়াছিল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে; তাহাদের

কোনও বিশেষ কৃষ্টি বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। যথা উত্তর প্রদেশে ভোজপুরী, কানোজী, জৌনপুরী, মথুরাবাসী, উর্দ্দু ভাষাভাষী প্রভৃতি বহু জাতির মানুষের বাস। পূর্ব্বে যখন ইহার নাম ছিল আগ্রা ও আউধ সংযুক্ত প্রদেশ তখন হইতেই এই প্রদেশের জাতি ধর্ম ভাষা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও ঐক্যবদ্ধভাব ছিল না। অন্ধ্র প্রদেশেও ঐরূপ তেলেঙ্গানা, তেলেগুভাষী, পুরাতন অন্ধ্রদেশবাসী প্রভৃতি, মিশ্রিত জাতির বাস। সভ্যতা ভাষা বা ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য থাকাতে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিল নাড়ু, কেরালা, মহীশূর প্রভৃতির নামের সহিত প্রদেশ কথাটি সংযুক্ত হয় নাই। বঙ্গভূমিরও কৃত্রিম উপায়ে জোড়াতাড়া দেওয়া কোন বৈশিষ্ট্য রচিত হয় নাই। বরঞ্চ বলা যায় যে বঙ্গভূমির অনেকাংশ কাটিয়া লইয়া বিহারে সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং সেই সকল অংশ পুনরায় বঙ্গের অঙ্গে সংযুক্ত করা ন্যায়তঃ উচিত। তাহা করিলে বিহারের অঙ্গহানি হইবে বলিয়া অনেক বিহারবাসী হিন্দীভাষাভাষী ব্যক্তি আলোড়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা গায়ের জোরে বঙ্গভূমির অঙ্গহানি করিয়া বিহারের শোভা বা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি না করিয়া উত্তর প্রদেশের ভোজপুরী অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া লইলেই কাজটা উচিত ও বিবাদ নিবৃত্তিকর হইতে পারে। ধানবাদকে ধনবদ বলিয়া চিৎকার করিলেই মানভূম জেলাটি বিহারের স্বাভাবিক অঙ্গ হইয়া যায় না। কালিমাটি, ঘাটশিলা, ধলভূম প্রভৃতিও বাংলার ইতিহাসের সহিত সহস্র বৎসর ধরিয়া জড়িত আছে। উৎপাত করিয়া বাঙ্গালীকে হিন্দী বলাইবার চেষ্টাও কখনও সুসাধ্য হইবে না। উত্তর প্রদেশ বিরাট আকার ও তাহার বিহারী অঙ্গ সকল বিহারে যাইলেই উত্তম হয়। এ সকল কথা অন্য প্রসঙ্গ; শুধু বঙ্গভূমির গঠন লইয়া উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়াই এই স্থলে কথাটার উত্থাপনা হইল।

বঙ্গে জল কষ্ট

বঙ্গদেশে জলের প্রাচুর্য্য থাকায় বঙ্গবাসী সাধারণ যথেষ্ট জল ব্যবহার করায় অভ্যস্ত। অল্প জল ব্যবহারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ বাঙালীর পক্ষে কষ্টকর। এই বৎসর বহুকাল ধরিয়া ঝড় ঝাপটা বৃষ্টিপাত না হওয়ায় অনেক স্থলে জল কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। অগভীর নলকূপগুলিও শুখাইয়া যাইতেছে। যে সকল স্থানে কূপ হইতে বাল্টি করিয়া জল তুলিয়া ব্যবহার করা হইত সেই সকল স্থানে বহু কূপ শুখাইয়া গিয়াছে অথবা অতি অল্প জল উঠাইলেই আর জল পাওয়া যাইতেছে না। কলিকাতার গঙ্গাতেও ফরাক্কা হইতে জল বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবার যে কথা ছিল তাহা এখনও করা হয় নাই। মন্ত্রী হনুমন্তাইয়া সম্ভবত ফরাক্কার উদ্দেশ্যের কথাটা ইচ্ছাপূর্ব্বকই ভুলিয়া বসিয়া আছেন; কারণ তিনি ফরাক্কাতে লোকজন ডাকিয়া মহাসমারোহে একটা উন্মোচন বা উদ্ঘাটন কার্য্য করিয়া নাম কিনিবার চেষ্টা করিয়াছেন; যদিও আসল কাজটা এখনও করা হয় নাই। একটা প্রবাদের মতই কথা আছে—অব্যবস্থার বর্ণনা করিয়া—যাহাতে ভোজন আয়োজন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, লেবু, নুন, তেল সবই সংগ্রহ করা হইয়াছে, শুধু চালটাসংগ্রহ হইলেই হয়। শ্রীহনুমন্তাইয়া ফরাক্কা বাঁধা বাঁধিয়া তাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী মোটর গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, শুধু বাঁধবাঁধিবার মূল উদ্দেশ্য যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সেইটাই এখনও হইয়া উঠে নাই। তিনি নানা বিচিত্র কার্য্য করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু দেশের উন্নতি ও মঙ্গলকর কার্য্যগুলি করিতে পারিতেছেন না। এ অবস্থায় তাঁহাকে দিয়া কিছু করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের জলকষ্ট নিবারণ অবশ্য কেন্দ্রীয় শাসকদিগের কার্য্য নহে। ইহার ব্যবস্থা কি হইবে তাহা এই দেশের মুখ্য মন্ত্রী বলিতে পারিবেন। কিন্তু তিনিও বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া ব্যাকুল; জল-কষ্ট লইয়া অতি শীঘ্র কিছু করিতে পারিবেন কি?

ভিয়েতনামের যুদ্ধ

ভিয়েতনামের উত্তর অঞ্চলের উপর আমেরিকার বোমা বর্ষণ প্রবল ভাবে চলিতেছে এবং আমেরিকা সমুদ্রপথে উত্তর ভিয়েতনাম গমন সকল দেশের

জাহাজাদির পক্ষে বিপদ্জনক বা অসম্ভব করিয়া দিবার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরগুলির আশেপাশে জলমগ্ন "মাইন" ছাড়িয়া দিয়া ঐ দেশের অবরোধ আরও সম্পূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। রুশিয়া বলিয়াছে যে তাহার জাহাজ উত্তর ভিয়েতনামে যাইবে এবং তজ্জন্য "মাইন" তুলিয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক হইলে তাহা করা হইবে। "মাইন" ছাড়িয়া অপর দেশের জাহাজ চলাচল যদি আমেরিকা বন্ধ করিতে পারে তাহা হইলে রুশিয়া তাহার জবাব দিবার ব্যবস্থা করিতে সহজেই পারিবে। ইহার অর্থ দক্ষিণ ভিয়েতনামের বন্দরগুলি অবরোধ করিয়া "মাইন" স্থাপন অথবা আরও ব্যাপক কোন ব্যবস্থা তাহা বলা যায় না। তবে এ কথা বুঝায় যে রুশিয়াকে যদি উত্তর ভিয়েতনামে অস্ত্র সরবরাহে বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে রুশিয়া প্রত্যুত্তরে আমেরিকাকেও ভিয়েতনামে অস্ত্র সৈন্যাদি প্রেরণে বাধা দিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে রুশিয়ার সহিত আমেরিকার সংঘর্ষণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয় এবং সেই সংঘর্ষণ যে শুধু ভিয়েতনাম অঞ্চলেই হইবে; আরও দূরে, জলে স্থলে আকাশে হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমেরিকার সৈন্য বাহিনী বহুকাল হইতেই ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। চীনা অথবা রুশ দেশীয় সৈন্য ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাবধি সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে নামে নাই। কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্তন হইতে কোনও বাধা আছে কি? যদি রুশিয়া ও চীন সৈন্য পাঠাইয়া উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করে তাহা হইলে আমেরিকা অথবা বিশ্ববাসী তাহা ততটাই অন্যায় বলিতে পারেন যতটা অন্যায় আমেরিকা বহুকালাবধি করিয়া আসিতেছে। ন্যায়ের বিচারে আমেরিকার জন্য কোন নূতন বিধান নির্দিষ্ট হইতে পারে না। অর্থাৎ আমেরিকা যাহা করিতে পারিবে রুশিয়া ও চীনও তাহাই করিবার অধিকার ন্যায়তঃ দাবি করিতে পারে।

দিল্লীতে বর্ণবিদ্বেষ

দিল্লীতে কোন কোন বিদেশী রাজ্যের রাজদূতনিবাসের বা দফতরের ভারতবাসী কর্মীদিগের সম্বন্ধে রাজদূত দফতরের নিয়মকানুন বর্ণবিদ্বেষদোষদুষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। যথা কোনও একটি বিদেশী রাজদূত আস্তানায় একটি কৃত্রিম সরোবর নির্মাণ করিয়া স্নানের অধিকার শুধু ঐ বিদেশবাসীদিগের জন্যই বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ রাষ্ট্রদূত দফতরের যে সকল ভারতীয় কর্মচারী আছেন তাঁহারা ঐ সরোবরে অবগাহন করিতে পারেন না। ইহার কারণ শুনা যায় এইরূপ দেখান হইয়াছে যে, ভারতবাসীদিগের সহিত একত্র এক সরোবরে স্নান করিলে বিদেশীদিগের স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা হয়। বস্তুত কথাটা ঠিক ইহার বিপরীত। বিদেশীদিগেরই নানা প্রকার ব্যাধি থাকে যথা পোলিওমাইয়েলাইটিস প্রভৃতি রোগ, যাহা ভারতীয়গণ বিদেশীদিগের সহিত এক স্নানকুণ্ডে অবগাহন করিলে ভারতীয়দিগেরই হইতে পারে। এই কথাটা উল্টা করিয়া বলিয়া ভারতীয়দিগের প্রতি অসম্মান দেখান হইয়াছে এবং তাহা লইয়া দিল্লির দরবারে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে বিদেশী-দিগের সংক্রামক ব্যাধিভীতি অধিক থাকিলে তাহাদিগের পক্ষে ভারতে না আসাই উচিত। কারণ বহু ব্যাধি এক হাওয়ায় নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ নিষ্কাশন হইতে সংক্রামিত হইতে পারে এবং বিদেশীদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বায়ুমণ্ডল রচনা অতি কঠিন কার্য্য; সুতরাং ঐ জাতীয় সংক্রামক ব্যাধিভয় হইতে বিদেশীদিগকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে এ দেশে না আসিতে দেওয়া। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে বহু বিদেশী "হিপি" "হরেকৃষ্ণ" প্রভৃতি এদেশে আসিয়া যত্রতত্র যেমন তেমন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা আমাদিগকে নানা ভাবে নানা ব্যাধিতে সংক্রামিত করিতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে এদেশে না আসিতে দেওয়াই উচিত। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা কেহ কেন করিতেছেন না? এই সকল ব্যক্তিকে দেখিলে মনে হয় না যে ইহারা পূর্ণরূপে সকল ব্যাধি মুক্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। আমাদিগের দেশে অবশ্য ব্যাধি সম্বন্ধে অজ্ঞানতা ও ঔদাসীন্য প্রযুক্ত

সর্বত্রই বিভিন্ন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিসকলের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সেই দিক দিয়া দেখিলে আমাদের বিদেশীদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু বিদেশীগণ যদি আমাদের সম্বন্ধে অসম্মান সূচক নিয়মাদি প্রবর্তন করে, তাহা আমাদের কখনও সহ্য করা উচিত হইবে না।

কার্য্যে অবহেলা

ভারতবর্ষের মানুষ অতি দরিদ্র। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ভারতের যে সকল মানুষ কোন কর্ম্মভার পাইয়াছে তাহারা কর্ম্মে অবহেলা ও বিলম্ব করিতে সতত সচেষ্ট বলিয়া প্রথমতঃ তাহাদের সকল কার্য্যেই অপর দেশের তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক লাগিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ সকল কার্য্যেই এক ঘন্টার স্থলে তিন ঘন্টা সময় লাগিয়া যায়। ভারতীয় মানুষ যে কর্ম্মশক্তিহীন একথা কেহ বলে না। যথা সামরিক ক্ষেত্রে অপর দেশের তুলনায় ভারতীয়গণের একই সংখ্যক ব্যক্তি একই প্রকার কার্য্য একই সময়ে করিয়া থাকে, এবং অপর জাতি অপেক্ষা উত্তমরূপেই করে। সামরিক কার্য্য কারখানা অথবা দফতরের কার্য্য অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম সাধ্য, কষ্টকর ও বিপদজনক। সেই কার্য্য যে জাতির মানুষ শীঘ্র ও যথার্থভাবে করিতে পারে সেই জাতি সকল কার্য্যই উত্তমরূপে করিতে সক্ষম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অথচ কারখানায়, দফতরে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রের সকল শ্রমসাধ্য কার্য্যেই ভারতীয়েরা অপারগ বলিয়া মনে হয় কেন? ইহার কারণ অবহেলা করিয়া গা ঢিলা দিয়া বেগার-ঠেলাভাবে কাজ করার অভ্যাস। যদি ভারতের সকল মানুষ নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ভাবে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিত তাহা হইলে ভারতের ঐশ্বর্য্য অনায়াসে দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইতে পারিত। ইহা যে হয় নাই তাহার কারণ অবহেলা ও পূর্ণ কর্ম্মশক্তি নিয়োগ না করা। এই গা ঢিলা দিয়া কাজ করার আর একটা ক্ষতির দিক আছে। যে যন্ত্র বহু মূলধন লাগাইয়া ক্রয় করা হয় সেই যন্ত্রকে পূর্ণ গতিতে না চালাইয়া ঢিমা তালে চালাইলে মূলধনের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। অর্থাৎ ভারতে যদি ৬০০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা হইলে উৎপাদন যথাযথ না হইলে সেই মূলধন অংশতঃ পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ অর্দ্ধগতিতে চলিলে ঐ মূলধনের অর্দ্ধেক বা ৩০০০ কোটি টাকা জমান মূলধন জলে পড়িয়াছে বলা যাইতে পারে।

সুতরাং যদি এই জাতি পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে লাগিয়া যায় তাহা হইলে জাতির কার্য্যকর মূলধন বিনা খরচে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে বলিয়া ধরা যাইবে। সেই অনুপাতে জাতির মোট বার্ষিক আয়ও দ্বিগুণ হইয়া যাইবে এবং দারিদ্র্য দূর করার কার্য্য বিনা ব্যয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়া যাইবে। "গরিবী হটাও" বলিয়া যে একটা আওয়াজ তোলা হইয়াছে তাহা কার্য্যতঃ ফলপ্রসূ করিতে হইলে, গরিবীর বিভিন্ন কারণগুলিকে সর্ব্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। এই সকল কারণের মধ্যে দেখা যায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল কারণ হইল কার্য্যস্থলে হাত গুটাইয়া নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ কোন কাজ না করিয়া অথবা অতি অল্প সময় কাজ করিয়া বসিয়া থাকে। এই সকল মানুষ যদি পুরা কাজ করে তাহা হইলে জাতির যে পরিমাণ অধিক ঐশ্বর্য্য উৎপাদিত হইতে পারে তাহাতে জাতীয় দারিদ্র্য প্রায় দূর হইয়া যাইতে পারে। যাহারা কর্ম্মে পূর্ণকালের জন্য বেতন ভোগী কর্ম্মীরূপে নিযুক্ত আছে তাহারাও যে সকলে পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা নহে। অনেকেই কাজে ফাঁকি দিয়া বসিয়া বেতন গ্রহণ করে। অনেকে যে স্থলে একজনের কাজ আছে সেই স্থলে তিনজন কাজ করিবার অভিনয় করিয়া দিন গুজরান করে। বেকায়দা ফাঁকিবাজি ইত্যাদি দূর না করিলে গরিবী হটান কখনও সফল হইতে পারে না। আর একটা দোষ আছে তাহা হইল ঢিমা তালে বিলম্ব করিয়া কাজ করা। যে কাজ এক ঘন্টায় করা যায় তাহা যদি তিন ঘন্টায় করা হয় তাহাও গরিবী বৃদ্ধির একটা জোরাল উপায়। আমাদের দেশে ধীর মন্থর গতিতে কাজ করা একটা চির বর্ত্তমান দারিদ্র্য-বর্দ্ধক ব্যাধি। সকল কর্মী যদি যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র নিজ

নিজ কার্য্য শেষ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি আপনা হইতেই সাধিত হইতে পারে।

পাকিস্থানের সমর আগ্রহ

বাংলাদেশে ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল পাকিস্থান বাহিনী কর্ত্তৃক লক্ষ লক্ষ নরনারীশিশুকে ভারতে তাড়াইয়া প্রবেশ করিতে বাধ্য করা এবং বহুস্থলে পাক সেনাদিগের দ্বারা ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদিগের উপর আক্রমণ। পশ্চিম সমরাঙ্গনে যে যুদ্ধ হয় তাহাও পাকিস্থানই আরম্ভ করে। পাক বিমানবাহিনী অকস্মাৎ অনেকগুলি ভারতীয় বিমান কেন্দ্রের উপর বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে ও ভারতও আত্ম রক্ষার্থে পাক বিমানগুলির উপর প্রত্যাক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। পাক সৈন্যগণও ভারতের এলাকায় অনুপ্রবেশ চেষ্টা করে ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও প্রত্যুত্তরে তাহার পালটা জবাব দিয়া পাকিস্থানের উপর আক্রমণ করে। পাকফৌজ যখন বাংলাদেশে আত্ম-সমর্পণ করে ও পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকেই গুলি চালনা বন্ধ হয় তখন যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা হয়। যে রেখার উপরে দুই দলের সৈন্যগণ শান্তিরক্ষা করিয়া অবস্থিত তাহাকে যুদ্ধবিরতি রেখা বলা হইয়া থাকে। সম্প্রতি কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি রেখার উপরে দুই স্থলে পাক সৈন্যগণ প্রবল আক্রমণ করিয়া ঐ দুইটি স্থলের ঘাঁটি দুইটি দখল করিয়া লয়। এই কার্য্যে তাহাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। ভারতীয় সেনাপতিগণ ঐ দুইটি ঘাঁটি নিজেদের করায়ত্ত রাখিবার জন্য বহু সৈন্যের প্রাণহানি হইতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ ঐ ঘাঁটি দুইটি সামরিক ভাবে তত কিছু মূল্যবান্ ছিল না। পাকিস্থান লোক দেখাইবার জন্য ঐ কার্য্যে অনেক সৈন্য বিনাশ সহ্য করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে লোকক্ষয় অনুপাতে তেমন কোনও লাভ হয় নাই। অবস্থা যাহা ছিল প্রায় তাহাই আছে। উপরন্তু যুদ্ধবিরতি মানিয়া লইয়া হঠাৎ সেই যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করায় অখ্যাতিও পাকিস্থানের কপালে লাগিয়াছে।

আসাম প্রদেশের সংবিধান-বিরুদ্ধতা

আসামের অহমিয়া জাতির লোকেরা বহুকাল হইতেই ভারতের সংবিধান-বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছেন ও তাহার ফলে ঐ প্রদেশ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। এই সংবিধান-বিরুদ্ধতার প্রকটতম লক্ষণ হইল, ঐ প্রদেশের যাহারা আসামী ভাষাভাষী নহেন তাঁহাদিগের উপর জোরজুলুম করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষা অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা। যথা বাঙ্গালী জাতির মানুষ আসামে বহু সংখ্যায় বাস করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা আসামী জাতির মানুষের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু আসামের প্রাদেশিক ভাষা আসামী বলিয়া বাঙ্গালীদিগের শিক্ষা ক্ষেত্রে ও অপরাপর কাজে কর্ম্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার আসাম সরকার স্বীকার করেন না। কোন কোন আসামী শিক্ষাকেন্দ্রে বাংলা জোর করিয়া অচল করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আসামের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানগণ নিজেদের মাতৃভাষা আসামী বলিয়া লিখাইতেন। এখন সম্ভবতঃ তাঁহারা নিজেদের যথার্থ মাতৃভাষা যাহা তাহাই লিখাইবেন মনে হয়। তাহা হইলে সম্ভবত আসামের অধিকাংশ নাগরিকের মাতৃভাষা হইবে বাংলা। তখন কি ভারত সরকার তাহা মানিয়া লইয়া আসামের ভাষা বাংলাকেই স্থির করিবেন? অথবা আসাম পুনর্ব্বার দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ডের ভাষা বাংলা ও অপর খণ্ডের ভাষা আসামী ঘোষণা করিবেন?

রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চারদিকে জড়দানব তার প্রকাণ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে নানাদিক্ থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারদিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলি সঙ্কীর্ণ করে আনতে চায়। বারম্বার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত ছুটি নিতে পারে না, গুরুভার বস্তুপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেষ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চারদিকে সত্যের রহস্য মূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হলেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। যেমন জীবনীশক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্য-মিথ্যা ভালমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের মন যখনই তার সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মনমরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আওড়িয়েছে। যখন কোন উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে, তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসার-সমস্যার সমাধান করা তার অধিকার-বহির্ভূত বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সঙ্কোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এদেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলেনি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে—চিন্তাশক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেই।

সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিবাদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই, বাইরের দিক্ থেকে সে কখনই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব-কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও না-মানবার শক্তি তার থাকে না,—যে-বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে—নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল, ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেই সঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিষ। এই যে তার বাইরের দুর্দশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, এ তার অন্তরের অবুদ্ধির বোঝারই সামিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি অপুষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার

মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্ব্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ্ স্বাধীন বুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই, সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিষটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাহিরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন, আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক্ থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চির পুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাস্থ্যকে আত্মার শক্তিতে প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে ভারতের একান্ত আপন যে সাধন-সম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন। সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি? যাঁর গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে, এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে? দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যে আশা করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী যাকে সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয় স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদণ্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত বা বিশেষ দেশকালের, তা সর্ব্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্ব্বদেশকালের সর্ব্বলোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্ত্বকে নিম্নভূমিবর্ত্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্ত্তমানকালের সাম্প্রতিক রুচিবিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড় আঘাত চিরন্তন আদর্শের আঘাত। দিঙ্‌নাগাচার্যের স্থূলহস্তের আঘাত উপস্থিতের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূর্ত্ত নিজেই সদ্য ধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু ভারতীয় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণতম স্পন্দনও রাখেনি।

ক্ষণিক আনন্দের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্ব্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্ত্তি। নবযুগের উদ্বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন, "অপাবৃণু", হে সত্য, তোমার আবরণ অনাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্য নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্য। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁর প্রকাশের ক্ষেত্র সর্ব্বজনীন। রামমোহন সেই সর্ব্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়লোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা "পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" তাঁদের মহিমা পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ব্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারত

পথিক। ভারতকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন মহাপথ রূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্য্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীন দেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থ কামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসের অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়,—সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব একমেবাদ্বিতীয়ং। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন ক'রে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্ধৃত ক'রে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি :—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

* * * *

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনায় সে আরাধনায়
যজ্ঞশালায় খোলো আজি দ্বার।
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥*

* রামমোহন-শতবার্ষিকীর শেষ বক্তৃতা।

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪০।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে সামান্য দু-একটি কথা

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

এই আশ্বিনমাসে প্রবাসীদিগের গুরু রামমোহন বৃষ্টল নগরে তনু রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুদিনে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সর্ব্বত্র সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে; ইহা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু রাজার মহত্ত্বের সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা সুস্পষ্ট নহে। এসম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে, যে, সকল মহাপুরুষের ন্যায় রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্বও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ত্যাগ লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত ছিল না, লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে সাধিত হইত। উহা সাধারণ ত্যাগ নহে—আত্মত্যাগ। সংসারের কোন বস্তুর ত্যাগ অতি সহজ কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কার্য্যে যে আত্মত্যাগ, যে মানসিক কর্ত্তৃত্বত্যাগ তাহা সহজ নহে—জীবনব্যাপী সাধনার বস্তু। রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রযত্নে এই সাধনাতেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সকলেই অবগত আছেন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য রাজা কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শিক্ষাকমিটি গঠিত হইল, তখন তিনি কমিটি হইতে আপনার নাম প্রত্যাহার করিলেন। কেননা, তাঁহার নাম কমিটিতে থাকিলে আত্মকলহে কার্য্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনা ছিল। আমরা কত সামান্য কার্য্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়াই কিন্তু রাজা বলিলেন, কাজ হইলেই হইল। পশ্চাৎ হইতে যতদূর সাধ্য আমি করিব, কমিটিতে নাম থাকিবে কি না তাহাতে কি আসিয়া যায়। যিনি লোকশ্রেয়ের জন্য মানবজাতির সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কলহ করিবার অবসর কোথায়? সকল বিবাদের মূলীভূত কারণ যে "আমি" তাহা তিনি মানব প্রেমসাগরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কাজ হইলেই হইল, দেশের সেবা হইলেই হইল, মানব জাতির কল্যাণ হইলেই হইল, আর কিছু চাহিবার নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রে বা শকটারোহণে চলিতে চলিতে রাজা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে শকটারোহণে যাইবার সময় এইরূপ মুদ্রিতনেত্র রাজাকে একজন ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রাজা, আপনি থাকিয়া থাকিয়া এরূপে চক্ষু মুদ্রিত করেন কেন?" তখন রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, "পাপ চিন্তা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভগবানে মনোনিবেশ করি।" মহিলাটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"রাজা, অপনার মনেও কি পাপ চিন্তার উদয় হয়?" তখন রাজা অতি বিনয়ের সঙ্গে বলিলেন, "আমি সামান্য মানুষ, মানুষ মাত্রেরই পাপচিন্তা আসিতে পারে।" রাজা এখানে যে পাপচিন্তার কথা বলিয়াছেন তাহা কি? এ সম্বন্ধে সর্ব্ব-সাধারণের ধারণা অতি ভ্রান্ত। রাজা আপনার সম্বন্ধে যে পাপচিন্তার কথা বলিয়াছিলেন তাহা সাধারণ পাপ নহে—তাহা কার্য্যগত বা অভিপ্রায়গত পাপ নহে। রাজা যে পাপের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানমার্গাবলম্বীর পক্ষে ব্রহ্মবিচ্যুতিই পাপ। কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করাই পাপচিন্তা। রাজা আপনাকে জ্ঞানপন্থী বলিয়া মনে করিতেন, যদিও জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম তাঁহাতে সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার মত কর্ম্মী কে? এই বিশ্বে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাই যখন কর্ম্মের স্রোতে তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতির ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত অমনি তিনি কালাকাল স্থানাস্থানের বিচার না করিয়া নেত্র মুদ্রিত করতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে যত্নবান্

হইতেন। কর্মক্ষেত্রে প্ররোচনায় "আমি কর্তা" এই পাপচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেই তিনি জ্ঞানপন্থীর এই মহাপাতক হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ম ধ্যানস্থ হইয়া আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করিতেন। সেইজন্যই ক্ষণে ক্ষণে মুদ্রিতনেত্র হইয়া তাঁহাকে ধ্যানস্থ হইতে দেখা যাইত। রাজার ধ্যান গিরিগহ্বরবাসী কর্মত্যাগীর সমাধি নহে। কিন্তু মহা কর্মযোগীর জীবাত্মা ওপরমাত্মার যোগসাধন। যিনি বাহিরের কর্মক্ষেত্রে মহা কর্তারূপে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত, তিনি অন্তরে কিন্তু সকল কর্তৃত্বজ্ঞান পরিহার করিয়া আত্মত্যাগসাধনে নিযুক্ত। এই ত্যাগের দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন বলিয়াই বাহিরে সকল প্রকার বিক্ষেপের কারণ বর্তমান সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার চিত্তে স্বীয় কর্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কখন ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই যে আমিত্বের ত্যাগ ইহাই রামমোহনকে প্রাচীন ব্রহ্মধ্যাননিরত ঋষিদিগের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় যদি কেবল একজন আত্মত্যাগী ঋষি হইতেন তাহা হইলেও তিনি আমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখীন ছিল। তাঁহার কর্মক্ষেত্র মানবজাতির কর্মক্ষেত্র ছিল। তিনি যে নব ভারতের পিতা ও গুরু, প্রতিষ্ঠাতা ও ভবিষ্যদ্বক্তা তাহা কেবল এজন্য নহে যে, তিনি নানা বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় জীবনের যে যে বিভাগে আজ আমরা কার্য্য করিতেছি, যে-সকল কার্য্যের পূর্ণতা ছাড়া আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব না, সে-সকলের দ্বার তিনিই উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ, ব্যবস্থাপক ও আইনজ্ঞ, সেবক ও শিক্ষক ছিলেন। মানবজাতি তাঁহার মতন সেবক আর কয়জন লাভ করিয়াছে? তিনি একাধারে ধর্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষার সংস্কারক ছিলেন। ইহার এক এক বিষয়েই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও নবীন, যে কোন সংস্কারকের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন। এই বহুত্বই আবার রাজার একমাত্র বিশেষত্ব নহে। যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন সে-সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি তাঁহার সমসাময়িকগণের বহু পূর্ববর্তী ছিলেন। শিক্ষার বিষয় যখন ভাবি তখন দেখিতে পাই যে, রাজা তাঁহার সময়ের কত অগ্রবর্তী ছিলেন। রাজা বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। তাই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে দেশের লোক তাঁহার উপর এমন খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল, যেন তিনি সমস্ত দেশটাকে তুলিয়া ভারত মহাসাগরে ফেলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দেশের লোকের চিন্তা তাঁহার চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চাদ্বর্তী ছিল। আজ একশত বৎসর পরে তাঁহার কথা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এখন যদি কেহ শিক্ষার সঙ্কোচের প্রস্তাব করে তবে আমরা তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠি। এই তো সেদিন কৃষ্ণনগর কলেজ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইলে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ সমবেত সভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই নবদ্বীপ কিন্তু গোঁড়া হিন্দুয়ানীর এক প্রধান কেল্লা। এবং পণ্ডিতগণ হিন্দু গোঁড়ামির প্রধান রক্ষক। একথা ঠিক, পুরাতন নবীনকে রাস্তা দিয়া সরিয়া পড়ে কিন্তু তিনিই বাস্তবিক prophet যিনি পূর্ব্ব হইতে এই পরিবর্তন দেখিতে পাইয়া তাহার মত ব্যবস্থা করেন। এখন অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে কিছু কিছু কুফল উৎপন্ন করিয়াছে তাহা দেখিয়া ইহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা রামমোহন এই কুফলের প্রতিষেধ পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা—এই পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানের অপরা বিদ্যা এবং অপর হস্তে আর্য্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনসম্পদ্‌ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরাবিদ্যা এ দেশকে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—একটি যেন অপরটির অপূর্ণতা দূর করিতে পারে। কিন্তু রাজার সাহায্য ও দেশের লোকের সহানুভূতি পাইয়া শিক্ষা দ্রুতপদে অগ্রসর

হইয়াছে কিন্তু এতদুভয়ের অভাবে ব্রহ্মজ্ঞান পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে তবে তাহার জন্য আমরা নিজেদের অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দিতে পারি, রামমোহনকে দোষী করিতে পারি না। তাঁহার দূরদৃষ্টি কিছুই অপূর্ণ রাখিয়া যায় নাই।

ধর্মের ইতিহাস হইতে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। রাজা তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি খৃষ্টধর্ম মানবের জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তবে যীশুর মনোহর নৈতিক উপদেশের দ্বারাই করিতে পারিবে, ত্রিত্ববাদ, নির্দ্দোষীর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য মতের দ্বারা নহে; কেননা, এই-সব কোন কোন মত বিজ্ঞান-মার্জ্জিত বুদ্ধির নিকটে পরিত্যাজ্য। নির্দ্দোষীর রক্তে পরিত্রাণ পাওয়া অপেক্ষা অনন্তকাল নরকে বাস করা বিশুদ্ধ নৈতিক বুদ্ধির নিকট অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই যীশুর উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া রাজা রামমোহন রায় Precepts of Jesus প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? খৃষ্টান মিশনারীরা এ কার্য্যে শয়তানের প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা রাজাকে গালাগালির চূড়ান্ত করিলেন। পরিশেষে খৃষ্টশিষ্যগণের ক্ষমাশীলতা এতদূর অগ্রসর হইল যে, খৃষ্টের উপদেশাবলী লোকের হস্তে তুলিয়া দেওয়ার মহা অপরাধে রাজাকে antichrist বা শয়তান নামে অভিহিত হইতে হইল। কিন্তু কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! কিছুদিন পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মের দুর্বোধ্য মতগুলি লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে একজন খৃষ্টীয় মিশনারী রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এদেশে খৃষ্টের উপদেশ প্রচার করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অথচ এই মিশনারীরই একজন পূর্ববর্ত্তী ঐ কার্য্যের জন্যই রামমোহন রায়কে শয়তানের অবতার বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কেবল ইহাই নহে। আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, এখন খৃষ্টান মিশনারীরা লর্ড নর্থব্রুক্ প্রকাশিত Teachings of Jesus in His own Words নামক এক পুস্তিকা বিতরণ করিতেছেন। ইহার সঙ্গে রাজার Precepts of Jesus-এর মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই। লর্ড নর্থব্রুক্ ভূমিকায় একথা স্বীকার করিয়াছেন। রাজা এক শতাব্দী পূর্ব হইতে খৃষ্টীয় ধর্মের এই পরিবর্ত্তন হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী সর্বাপেক্ষা উন্নতি-শীল। সে উন্নতি আবার খৃষ্টীয়জগতেই প্রধানতঃ আবদ্ধ। সেই খৃষ্টীয়জগতের একটা পরিবর্ত্তন ভবিষ্যৎদৃষ্টিবলে এক শতাব্দী পূর্ব হইতে ধরিয়া লওয়া কি অমানুষিক প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন এখন বিশেষভাবে চলিতেছে। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি তাহা ভাবিয়া সকলেই শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, পঁচিশ বৎসরের কংগ্রেসের আন্দোলনের পরও সমস্ত দেশের রাজনীতিজ্ঞগণ একত্রিত হইয়া রাজার কথার উপরে একটাও নূতন কথা বসাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর নথী খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রাজা রামমোহন রায় পার্লামেন্টের নিকট আপনার সাক্ষ্যে ভারতের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরা এক শতাব্দী পরে তাহা অপেক্ষা কোনওরূপ উচ্চতর উপদেশ দিতে সমর্থ হইতেছি না। এমন কি, লর্ড মর্লীর নব-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে ভারত-শাসন সম্বন্ধে যে নূতন প্রণালী ঘোষিত হইয়াছে, তাহাও রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে নূতন নহে। রাজা অতি দৃঢ়তার সহিত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "মনে কর আজ হইতে একশত বৎসরের মধ্যে দেশীয়দিগের চিত্ত যখন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে আলোকিত হইয়া উঠিবে, তখন কি তাহারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইবে না? তোমরা যদি আইরিশ প্রণালীতে ভারত শাসন কর তবে আয়র্লণ্ড অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ শিক্ষা লাভ করিয়াও ভারতবাসী তাহাদিগের দূরবর্ত্তিতায় সুযোগ ও অভ্যন্তরীণ ধনবল ও জনবলের সাহায্যে ভারত-শাসন

অসম্ভব করিয়া তুলিবে।* সুতরাং ভারতবাসীকে শিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করিয়া তোল। তাহা হইলে যদি কোন দূরবর্তী সময়ে কোন দুর্বাক্য সূত্রে ইংলণ্ড হইতে ভারত বিচ্ছিন্নও হয়, তবুও উভয় দেশের বন্ধুতা বিনষ্ট হইবে না।" কেননা —ইংলণ্ড ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনে শিক্ষিত করিয়া তুলিলে ভারতের যে উপকার হইবে সে উপকার ভারত কখনও ভুলিতে পারিবে না। মর্লীর শাসনসংস্কারের কি ইহাই উদ্দেশ্য নহে? কিন্তু হায়! রাজার মৃত্যুর পঁচাত্তর বৎসর পরে আমাদের শাসন-কর্তাগণ উহা বুঝিলেন। যদি তাঁহারা ইতিপূর্বে রাজার উপদেশ গ্রহণ করিতেন তবে আর বিগত তিন বৎসরের জঞ্জাল ইংরাজরাজত্বের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিতে পারিত না। একদিকে পরীক্ষিত হইয়াছে বমা (bomb), দেখা গেল তাহা নিষ্ফল। অন্যদিকে পরীক্ষিত হইল নিষ্পেষণ (repression), দেখিয়াছি তাহাও নিষ্ফল। বাকী আছে রাজা রামমোহন রায়ের পন্থা,—রাজায় প্রজায় মিলিয়া দেশের কল্যাণ সাধন। লর্ড মর্লীর শাসনসংস্কার প্রস্তাব সেই উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা আরম্ভ মাত্র। উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে বিগত কয় বৎসরের ইতিহাস স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার ন্যায় মনে বিলীন হইয়া যাইবে। শাস্ত্র বলে প্রকৃত জ্ঞান হইলে বাহ্য জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। রাজা রামমোহন রায়ের পন্থা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার পক্ষে সেই প্রকৃত জ্ঞান। সেই পথে চলিলেই কেবল আমরা লক্ষ্য স্থানে যাইয়া পৌঁছিতে পারিব। এবং রাজা রামমোহন রায়ের স্বপ্ন সফল হইবে। সে স্বপ্ন কি? ভবিষ্যৎ ভারত স্বাধীন এশিয়ার আলোকস্তম্ভ, ইংলণ্ডের বন্ধু। ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকার কেবল রাজা রামমোহন রায়েরই। ভবিষ্যৎ ভারত একা হিন্দুর হইবে না, মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যতাও সেখানে থাকিবে। এই তিন সভ্যতাকে যিনি স্ব স্ব মার্গে এক বিশ্বজনীন আদর্শে উপনীত হইবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ভারতের নেতৃত্ব কেবল তাঁহারই। এ নেতা কেবল হিন্দু পণ্ডিত নহেন, মুসলমান মৌলবী নহেন বা খৃষ্টান পাদ্রী নহেন। একাধারে যিনি হিন্দু পণ্ডিত, জবরদস্ত মৌলবী এবং খৃষ্টীয়ান পাদ্রী তিনিই ভবিষ্যৎ ভারতের পিতা, নেতা ও গুরু। যেদিন ভবিষ্যৎ ভারত সগর্বে মস্তক তুলিয়া বিশ্বমানবের মহাসভায় আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিবে সেদিন তাহার মস্তকমুকুটে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে "শ্রীরামমোহন"। সেদিন জগতের লোক বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে এই হিন্দু পণ্ডিত, এই জবরদস্ত মৌলবী, এই খৃষ্টীয়ান পাদ্রী, ভবিষ্যৎ ভারতের এই পিতা নেতা ও গুরুর দিকে তাকাইবে—আমরা সেদিন গৌরবোন্নত বক্ষে উচ্চকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিব, "এই নব ভারতের আমাদের রামমোহন! আমাদেরই বাঙ্গালী রামমোহন!"

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৬]

* যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা এই উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে রাজা একজন প্রকৃত ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায়—বিগত তিন-চার বৎসরের ঘটনাবলী যেন মানস-চক্ষে দর্শন করিয়া এইরূপ বলিতেছেন।

১১ই মাঘ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিকূল মতামত প্রায়ই অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়—ব্যক্তিগত কটু-ভাষণের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে সেই তীব্রতার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মত প্রকাশ করা সংকোচের বিষয় হয়ে ওঠে। আজ আমার পক্ষে সেই সংকোচের দিনের অবসান হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি মৃত্যুর গহনে অবতরণ করেছিলুম, এখনও তার বন্ধুর তটভাগে স্খলিত পদে চলেছি। আজ আমার পক্ষে লোকমতের প্রভাব আর প্রবল নয়—এখন নিরবধি কাল আমার সম্মুখে বর্তমান।

১১ই মাঘের উৎসব যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করেনি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে তারা কলঙ্কিত করে। যিনি পরম শ্রদ্ধেয়, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায়, তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয়নি। এটা স্বাভাবিক সুতরাং অনিবার্য, অতএব তাই নিয়ে পরস্পরকে লাঞ্ছিত করা নিরর্থক। এ-সকল দ্বন্দ্ব কোলাহল ভুলে গিয়ে অন্তকার উৎসবের মূলে যাঁর মহান্ চারিত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত, শান্তমনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে আমাদের ভক্তি নিবেদন করব। মতভেদ সত্ত্বেও এই শ্রদ্ধার কারণকে সত্য বলে স্বীকার করবেন একথা আমাদের দেশের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ এই সম্মানে স্বদেশেরই প্রতিই সম্মান।

পরজাতীয়কে যখন আমরা আচার ধর্ম নিয়ে বিচার করি তখন স্বভাবত অত্যুক্তি করে থাকি। বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যা দুঃখ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের আবিলতায় আমরা তাঁদের ক্ষুদ্র করেছি, তাঁদের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারিনি। জাতীয় চিত্তদৈন্যের এই বিকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যহ আমাদের ইতিহাসে।

খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে কেননা তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খ্রীষ্টান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিম ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঊর্ধ্বে একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশে ধর্ম মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহন না হয়ে আধুনিক ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠান দেশব্যাপী ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেছে।

আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে মানুষের তাই নিয়ে পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। যেমন চীনদেশে। চীন সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই এই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। আচারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সমাজকে তারা নিপীড়িত করেনি। যখন একসময়ে খ্রীষ্টধর্ম ঈশ্বরের ক্রোধের দোহাই দিয়ে বাহুবলে নিজের প্রভুত্ব বিস্তারের

চেষ্টা করেছিল তখনই সে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন করেছে, কেননা তখনও তাদের ধর্ম শুভবুদ্ধিকে অমান্য করে সংস্কারকেই স্বীকার করেছিল। জনসাধারণের বিশ্বাসের কোনো বুদ্ধিসম্মত ভূমিকা তাতে দেখা দেয়নি শাস্ত্র-অনুশাসন ছাড়া। আজকের দিনে য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজে ধর্মের অন্ধ আক্রমণ নেই, তাদের মধ্যে কেউ বৌদ্ধ বা মুসলমান হলে তাকে ধর্মের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হয় না। আচার এবং ধর্মের মিশ্রণে তাদের সমাজ কলুষিত হয়নি,—তাদের শক্তির একটি কারণ সেইখানে। আমাদের দেশে শক্তিক্ষয়ের প্রধান একটি হেতু, ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নিরর্থক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং আচারের অত্যাচারপরায়ণ অন্যায় রূপ প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দক্ষিণ মালাবারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ডাক্তারকে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ আপন বাড়িতে নিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পুষ্করিণীর তীরস্থ। তাতে মকদ্দমা উঠেছিল আদালত পর্যন্ত, যে, সমস্ত পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়েছে, অতএব তাকে শোধন করবার আইন জারি হোক, অপরাধী গৃহস্থের উপর। এখানে দেখি দণ্ডদাতা আইন এবং আচারের সমবেত মূঢ় আক্রমণ, এর মধ্যে শাশ্বত ধর্মের পরিচয় নেই। অথচ ধর্মের নামে এই রকম অমানবিকতা আমাদের দেশে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। মহাপুরুষ দৈবে আমাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ ক'রে এই অধার্মিক ধর্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধি-বিরোধী আচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিরর্থক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তিই ধর্মের মর্যাদা নিয়েছে এবং আজও ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ মানুষকে অপমানিত করছে।

এই প্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শতখণ্ডে ভেঙে পড়ল। তার নাম নিয়ে বেশীর ভাগ দেশবাসীকে অবজ্ঞাভাজন করা হ'ল, বলা হ'ল অশুচি এবং অপাংক্তেয়। আচারের বেড়া গেঁথে যে বহুসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা, তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। অথচ আমাদের যা বিশুদ্ধ, আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ্ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরি পরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি—এত বড়ো কথা বোধহয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতিপদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্য তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনো শান্ত হয়নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। বিশ্ববিধাতার একটা রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং—সে কেবল মাত্র হওয়া নয়, সত্য বোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের বড়ো পদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুক্ত বহধা শক্তিকে প্রয়োগ না করে মানবকে যেখানে অস্বীকার করেছি সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমাত্মায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কথিত বাণীতে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার করে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছতে হবে।

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। অনুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হতে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্ত্র যাতে চরম মানব-সত্যের উপলব্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। ধর্মের বিকার ভয়াবহ, বৈষয়িক ঈর্ষা-বিরোধে যে ক্ষতি করে তারও চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে ধার্মিকতা। আশ্চর্য ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দাঁড়ালেন জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কুহেলিকার প্রতীতে; সত্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশে নিয়োগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্র-শক্তি। এই অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন একক, তিনি ছিলেন নিন্দিত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অন্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধন্য করি।

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৭।

শাশ্বত প্রতিষ্ঠা

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

জগৎ জুড়ে চারিদিকে আজ চলেছে ভীষণ মারামারি, হানাহানি। দুঃখ-দুর্গতির আর অন্ত নেই। এখানে বসে সেইসব দুঃখ-দুর্গতির কথা কল্পনায়ও আনতে পারি না। এমন সময়ে জগতে ধর্মের কথা কে শুনবে?

তবু সেইজন্যই আজ ধর্মকে বেশী করে আঁকড়ে ধরতে হবে, ধর্ম ছাড়া এই দুর্গতির জন্য মানুষের আশ্রয় আর কি হতে পারে?

প্রশ্ন হতে পারে বটে ধর্মই বা বাঁচাবে কেমন করে? তবে য়ুরোপের আজ এমন দশা কেন? সেখানে কি তবে এতদিন ধর্ম ছিল না? বড় বড় মন্দির, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ঠাসা ছিল সেই দেশ সেখানে কত কত মনীষী ও মহামনা লোকের বাস, সেই দেশের তবে কেন এমন দুর্গতি?

তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগতভাবে সেই দেশে জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ ধার্মিক মহৎ মানুষ থাকলেও সারাদেশে ধর্মের নামে যে বিরাট ঐশ্বর্য্যময় আয়োজন ছিল তার মধ্যে ধর্মের চেয়ে সংস্কার, অনুশাসন ও সম্প্রদায়টাই ছিল বেশী। তাই সেখানে ধর্মের নেতার দল যুদ্ধে জয়ের জন্য, বিপক্ষকে পরাজিত করবার জন্য, যুদ্ধোত্তমকে আশীর্বাদ করেছেন, যুদ্ধাস্ত্রকে আশিস বর্ষণ করেছেন।

সংস্কার ও সম্প্রদায় যেখানে ধর্মকে অতিক্রম করে সেখানেই ধর্মের নানা দুর্গতি ও বিকার দেখা দেয়। তখন সংস্কার, অনুশাসন ও আচারের বাছ-বিচারই সত্য ও ধর্মজীবনের স্থানটি জুড়ে বসে। ধর্ম যেখানে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেখানে এরূপ ঘটা অসম্ভব নয়। অথচ ধর্ম ও জীবনকে পরস্পরে বিযুক্ত করে রাখলেও কিছুতেই চলতে পারে না।

তবে দেখতে হবে যে, ধর্মই যেন জীবনকে চালিত করে, ধর্ম যেন সাংসারিক লাভক্ষতি প্রভৃতি হিসাবের দ্বারা চালিত না হয়। আমাদের লাভলোকসানের হিসাব বা সাম্প্রদায়িক সংস্কার যদি ধর্মকে চালিত করে তবে তার চেয়ে দুর্গতি কি হতে পারে?

কেউ কেউ বলেন, আমাদের যেসব মনোভাব নীচ ধরণের তার সঙ্গেও যদি ধর্ম যুক্ত থাকে তবে তাতেও কতক পরিমাণে সংযম আসে। তাই তাঁরা বলেন, জীবহিংসা যদি করতেই হয়, তবে নাহয় তা কর ধর্মের নামে। কিন্তু তাতে কি জীবহিংসা কখনও কমেছে? না যারা সাধারণত হিংসা-বিমুখ তারাও বাধ্য হয়ে ধর্মের নামে করেছে হিংসা? ডাকাতরা যে কালী পূজা করত তাতে তাদের ডাকাতি কি আরও ভীষণ হয়নি? ঠগীরা ধর্মের নামে মানুষের প্রাণহরণ করত। সেই জন্যই মানুষের এই প্রাণ-হননের প্রবৃত্তি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটুও কমল না, বরং ধর্মের নামে এই জিঘাংসা আরও উগ্র হয়ে সারা ভারতকে এমন করে পেয়ে বসল যে, কর্ণেল স্লীম্যানকে অতি কঠোর হস্তে তা দমন করতে হয়েছিল।

য়ুরোপে Inquisition-এ যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সেরূপ নিষ্ঠুরতা তাদের সাধারণ সামাজিক জীবনে কখনও দেখা যায়নি। ধর্মের জোরেই অনেক রকমের অমানুষিকতা ভীষণ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। চরিত্রগত স্বেচ্ছাচার যখন ধর্মের সায় পায় তখন যে তা আরও কত ব্যাপক ও বীভৎস হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তার প্রমাণ Bacchanalia, Saturnalia প্রভৃতি উৎসব। দেখা গেছে হোলি প্রভৃতি উৎসবে সহজ মানুষও এমন কুৎসিত গালাগালিতে মেতে ওঠে যে ভারতের অনেক স্থানে তখন মেয়েরা রাস্তায় বের হতে পারেন না।

কাজেই ধর্মকেই জীবনের চালক করতে হবে। দিনগত প্রয়োজনময় জীবনকে ধর্মের চালক করলেই বিপদ্। অথচ সব দেশেই দেখা গিয়েছে যে, একদল লোক স্বাভাবে ধর্মের নামে নিজেদের স্বার্থই সিদ্ধ করে নিয়েছেন। লোকে তাঁদের সেই সব আচরণকেই ধর্ম বলে ভুল করেছে। তাই এক-এক সময় ধর্মের এই রকম দুর্গতি দেখে মানুষ রাগ করে ধর্মকেই বর্জন করেছে। কিন্তু বৃথা রাগ করলে চলবে কেন? সেই দোষ কি ধর্মের? ধর্মকে নিজেরাই বিকৃত করে তার সেই বিকৃত রূপ দেখে যদি নিজেরাই রাগ করি তবে কি সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে? মানুষের দেহও ত পচলে দুর্গন্ধ হয়, তা বলে কে কবে জ্যান্ত মানুষের সঙ্গ বর্জন করার কথা বলতে পেরেছে?

ধর্ম হল জীবনের জীবন, এই রকম মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ছাড়ব এও কি কখনো হয়? আমাদের দেশে একটি কথা আছে,

ভূমিতে পড়িলে লোক ভূমিই আশ্রয়।

ধর্মের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার থেকে যদি পতন ঘটেই থাকে, তবে উঠতে হলেও ধর্মকে আশ্রয় করেই উঠতে হবে, তাছাড়া আর ত গতি নেই।

স্বার্থকামনা ও বাসনা দ্বারা মানুষ বদ্ধ। সেই বন্ধনের মধ্যে ধর্মই দেয় মুক্তি। যখন দেখি ধর্মই মানুষকে বাঁধছে তখন বুঝতে হবে ধর্মের নাম করে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতাই এই বাঁধনের হেতু। চতুর বিষয়ী লোকের দল ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করে লোকের সর্বনাশ করছে। এমন অবস্থায়ও যথার্থ ধর্ম ছাড়া আর কেউ সেই দুর্গতি হতে মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। এই দুর্গতি হতে মানবসমাজকে যাঁরা রক্ষা করেছেন তাঁরাই সব মহাপুরুষ।

মহাপুরুষদের এজন্য এই জগতে কম দুঃখ সইতে হয়নি। মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট এইজন্য কণ্টকের মুকুট মাথায় ধারণ করে দুই চোরের মাঝখানে বধ্যভূমিতে প্রাণ দিলেন।

চতুর পাণ্ডা ও পুরোহিতের দল চিরকাল ঈশ্বরকে মন্দিরের মধ্যে বদ্ধ করে সরল সাধারণ লোকের কাছে দিব্যি ব্যবসা জমিয়ে বসেছিল। খ্রীষ্ট যেই বললেন, "তাঁকে দেবতা করে মন্দিরে বদ্ধ করে রাখা কেন? তিনি আমাদের পিতা, আমাদের ঘরের লোক।"

পিতা"—এই কথা বলতেই মন্দিরের সব বাঁধন গেল খুচে, ভগবান্ বের হয়ে এলেন মানবের গৃহে-পরিবারে। তাঁকে নিয়ে যাঁরা ব্যবসা চালাতেন তাঁরাই বা মহাত্মা খ্রীষ্টকে ছাড়বেন কেন? তাই খ্রীষ্টকে প্রাণ দিতে হল।

শাস্ত্রে আচারে যাগে যজ্ঞে যখন এই দেশের মানুষের চিত্ত প্রপীড়িত, তখন বুদ্ধদেব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, —ঐসব জাল জঞ্জাল ছাড়,—প্রত্যেকে আপন আপন চিত্তকে দীপ্ত করে সেই আলোতে নিজের নিজের পথ দেখ—"আত্মদীপো ভব," তখন তাঁকেও যে কি পরিমাণ দুঃখ সইতে হয়েছিল তা সহজেই বুঝি।

যখনই মহাপুরুষের বড় বড় বাণীতে এই দেশ সাড়া দিয়েছে তখনই তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও আনন্দের সবগুলি দ্বার খুলে গেছে। আর যখন তার দৃষ্টি ক্ষুদ্র আচারে সংস্কারে কলুষিত হয়েছে তখন ভারতের দুঃখদুর্গতির আর সীমা নেই।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বিরাট্ আদর্শ যখন সত্য ও সাধনা হতে পরিভ্রষ্ট, যখন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আচার-বিচার-মাত্র-সম্বল সম্প্রদায়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, তখন মনীষী রামমোহনের মহান্ হৃদয় সেই দুর্গতি দেখে ব্যথিত হ'ল। রামমোহন দেখলেন, ভারতকে এক বিরাট্ আদর্শে একপ্রাণ করতে না পারলে আর তার কল্যাণ নেই। কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে, দেবতায় বা আচার-অনুষ্ঠানে এই ঐক্যের সম্ভাবনা কোনো মতেই সম্ভব নয়। কারণ, এক সম্প্রদায়ের দেবতাকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা দারুণ বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখেন। একের লিঙ্গ, দেবতা, প্রতিমা, শাস্ত্র ও আচার অন্যের পক্ষে অপূজ্য, অগ্রাহ্য ও অশ্রদ্ধেয়। আজও ভারতের সকল হিন্দুকে এক করতে গেলে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দেবতা শাস্ত্র বা আচার আশ্রয় করলে চলে না। অথচ দেবতা বা শাস্ত্র-আচার মাত্রই যেমন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাদেয়, তেমনি অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের অপাদেয়। এই বিপদ্ হতে মুক্ত হবার কোনো উপায়ই দেখা যায় না। অথচ তাই বলে ভারতের বাইরের শাস্ত্র বা আচারকে আনাও ত চলবে না। তখনকার সেই যুগে অসাধারণ মনীষী রামমোহন বুঝলেন যে, এই বিপদে একমাত্র গতি ভারতের অতি পুরাতন ধর্মের মূল উপনিষদকে আশ্রয় করে শাশ্বত ধর্ম-ভিত্তির উপর দাঁড়ানো। তা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগ মুসলমানদের জন্য ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করে হিন্দুদেরও বলেন, তাঁরা যেন তাঁদের সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষার উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও তদুপযোগী কিছু সাধনেরও ব্যবস্থা করেন। হিন্দু ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে যে কমিটি হল তাতে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, প্রাচীনপন্থী ও বর্ত্তমান কালের উদার ভাবের লোকও ছিলেন। কমিটির পর কমিটি বসল কিন্তু সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় কোন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হল না। এক সম্প্রদায়ের স্তবস্তুতি পূজা-পদ্ধতি আনলেই অন্য সম্প্রদায় তৎক্ষণাৎ ছেড়ে চলে যাবেন, কিছুতেই এই বিপদের সমাধান করা গেল না। তখনই বোঝা গেল কি কারণে রামমোহন একেবারে এইসব সাম্প্রদায়িক শাখাগুলোকে পরিহার করে একেবারে এই দেশের ধর্ম্মের নিত্য ভিত্তিতে ও শাশ্বত সত্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তারপর থেকেই দেখা গেল যে, হিন্দুর সর্ব্ব সম্প্রদায়ের জন্য কোনো ব্যবস্থা খাড়া করতে গেলেই রামমোহনের ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্কলিত সব বাণীর বাইরে আর যাবার যো নেই।

পশ্চিম জগৎ যখন তার শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম রাজনীতি নিয়ে এই দেশে এসে উপস্থিত হল, তখন সুদূরদর্শী রামমোহন বুঝেছিলেন, এখন ভারতের ধর্মকে আর নানা শাখায় বহুধা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। ভারতের নানা সাধনা একটি মহান্ ঐক্যের মধ্যে সংহত না হলে আর উপায় নেই। কত বড় মনীষা থাকলে তখনকার দিনে এই কথাটা বোঝা যায় তা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়। অথচ তার জন্য রামমোহন ক্রমাগতই পেয়ে গেছেন নিন্দা লাঞ্ছনা ও অপমান। সেই দুর্গতির এখনও কি শেষ হয়েছে?

হয়ত প্রাচীন কালেও এই দেশে যুগে যুগে সকল ধর্মগুরুরাই এই সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই এমন অবস্থায় উপনিষৎ গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকেই আশ্রয় স্বরূপ বলে ধরেছেন, এবং এই তিনটি আশ্রয়কে নাম দিয়েছেন প্রস্থানত্রয়। তাই দেখতে পাই, ভারতের প্রত্যেকটি ধর্মগুরু আপন সম্প্রদায় স্থাপনের জন্য প্রস্থানত্রয়কে আশ্রয় না করে পারেননি। রামমোহনও ভারতকে শাশ্বত ধর্ম-ভিত্তির উপরে স্থাপন করতে গিয়ে এই প্রস্থানত্রয়েরই আশ্রয় নিলেন। রামমোহনকে যাঁরা অ-হিন্দু বলে গাল দিতে চান, তাঁরা মনে রাখবেন, রামমোহন যে পথে গিয়েছেন, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সব ধর্মগুরুরাও সেই পথেই গিয়েছেন।

তবে রামমোহনের বিশেষত্ব কোথায়? তাঁর বিশেষত্ব তাঁর শাশ্বত ধর্ম্মকে তিনি বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে একান্ত সঙ্গত করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর সময় সমস্ত প্রতীচ্য তার সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য নিয়ে এদেশে হাজির হল, তিনি তার সঙ্গে ভারতের সাধনাকে অপূর্ব্ব ভাবে মিলিয়ে দিলেন। ভারতের ধর্ম্মসাধনা অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মজ্ঞান, প্রধানত ছিল সন্ন্যাসীদের। তিনি সেই সাধনা প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতের গৃহস্থ জীবনে। তা ছাড়া সমাজ রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের যে-সব অতুলনীয় দান আছে তার কথা আমরা এখন উল্লেখ না-ই করলাম।

কেউ যদি বলেন, ভারতের প্রাচীন সাধনাতে আমরা যদি এখন ফিরে যাই তবে আমরা কি করে উদ্যমী কর্ম্মশীল প্রতীচ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারব? ভারত তো চিরদিন কর্ম্মবিমুখ। তার উত্তরে বলতে হবে এই, যে, আজকের দিনে কর্ম্মবিমুখ অলসতাকেই আমরা ভারতের আধ্যাত্মিকতা বলে মনে করছি, আসলে তা হল ভারতের পরবর্ত্তী তামসিক যুগের কথা। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগে পদে পদে দেখা যায় জীবনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও কর্ম্ম ও সাধনায় উদ্যমের সহিত গভীর যোগ। তামসিকতার অবসাদে যদি আপনাকে আমরা ছেড়ে দিই তবে তাতে আমাদের পৌরুষের যে অপমান তার মত অধর্ম আর আমাদের কিছু নেই। এইখানে ভারতের মনীষীদের ছবিতে কর্ম্মময় উদ্যমময় মানবের যে মাহাত্ম্য আমরা কীর্ত্তিত দেখি, প্রতীচ্য দেশের পৌরুষ-সাধনার কাছে তার কুণ্ঠিত হবার কোনো হেতু নেই।

আমাদের দেশের ঋষিদের অমর বাণীর মধ্যে সেই বীর্য্যময় সাধনার মন্ত্র ছিল বলেই রামমোহন বেদ উপনিষদের দিকে ঝুঁকলেন। মানবাত্মার জয় ঘোষণা, নিত্য এগিয়ে চলবার জন্যে মহতী আকাঙ্ক্ষা, উদ্যমের মধ্যে মহা সার্থকতা, সবই দেখতে পাই সেই সব অমৃত মন্ত্রের মধ্যে। উপনিষৎ বাণীগুলির মধ্যে দেখা যায় আচার-অনুষ্ঠান সম্প্রদায় বিধিনিষেধ—সকলের উপরে মানুষ ও তার মাহাত্ম্য।

উপনিষৎ বলেন, ইন্দ্রিয় হ'তে মন বড়, মন হ'তে আত্মা বড়, আত্মা হ'তেও পুরুষ বড়, পুরুষ হ'তে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তাহাই চরম ও পরম।

> মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥
> কঠোপনিষৎ, ১. ৩. ১১.

এই পুরুষ আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্ত, বুদ্ধের ভাষায় বলা যায়, সে আত্মদীপ।

তাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বললেন,

> অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি।
> বৃহদারণ্যক. ৪. ৩. ৯.

বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি, উদ্যম, সঙ্কল্প, কর্ম্মসাধনা, সব কিছু নিয়ে প্রাচীন শব্দ "ক্রতু"। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন, এই মানবই ক্রতুময়।

> এব খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। ৩. ১৪. ১.

ছান্দোগ্য আরও বলেন, এই মানুষই হল যজ্ঞ। মানুষকে বাদ দিয়ে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কোনই অর্থ নেই।

> পুরুষো বাব যজ্ঞঃ। ছান্দোগ্য. ৩. ১৬. ১.

মুণ্ডক উপনিষৎ বলেন, কর্ম্ম, তপস্যা, ব্রহ্ম, পরমামৃত সবই এই পুরুষ। নানাবিধ মিথ্যার আবরণে

মানুষ আছে চাপা পড়ে। যে সেই-সমস্ত মিথ্যার রাশিতে আচ্ছন্ন অন্তরনিহিত রহস্যাবৃত পুরুষকে চিনতে পারে সে-ই অবিদ্যার সকল বন্ধনকে পারে মুক্ত করতে।

> পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
> এতৎ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
> সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য ॥

মুণ্ডক. ২. ১. ১০.

প্রশ্নোপনিষৎ বলেন, সর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ সেই পুরুষের স্বরূপ বুঝতে হবে।

> ষোড়শকলং পুরুষং বেদ। প্রশ্ন উপ ৬. ১.

এই পরিপূর্ণ পুরুষকে না জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত লাভের আর কোনো উপায় নেই। তাই প্রশ্নোপনিষৎ বলেন, সেই বেদ্য পুরুষকে জান, যেন মৃত্যু তোমাদের আর না ব্যথিত করতে পারে।

> তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা।
> প্রশ্ন উপ ৬. ৬.

আর প্রাচীন সব বেদসংহিতাতে দেখি, ধর্ম্মের নামে যে উত্তমহীনতা তাকে ঋষিরা কঠোর ভাবে আঘাত করেছেন। তখনকার দিনেও আচার-পরায়ণ পুরোহিতের দল যে কর্ম্মোত্তম হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তা বুঝতে পারি সেই আঘাতের ভাষায়—"নিরুত্তম পুরোহিতের মত নিদ্রালু হোয়ো না—"

> মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রযুর্ভব।—সামবেদ সংহিতা, ২.১.১৮.

তাই সব বেদে ঋষিদের প্রার্থনা—হে দেবতা, পিতা যেমন পুত্রগণকে কর্ম্মোত্তম শেখান তেমনি আমাদিগকে কর্ম্মোত্তমে ক্রতুতে তুমি শিক্ষিত কর।

> ইন্দ্র ক্রতুন্নাভর পিতাপুত্রেভ্যো যথা
> শিক্ষাণো অস্মিন্॥ সামবেদ. ৬. ৩. ৬.

সামবেদ আরও বলেন,—কর্মপরায়ণেরাই দেবতার প্রিয়, নিদ্রালু অবসাদগ্রস্তরা নয়। অতন্দ্র উদ্যমীরাই আনন্দলোক অধিকার করতে পারেন।

> ইচ্ছন্তি দেবা সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
> যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ॥ ১. ১. ৬.

মানব-মাহাত্ম্যের ও মানবীয় দৃষ্টি ও কল্যাণ-উদ্যমের এই যে জয়-ঘোষণা তাতেই বুঝা যায় ভারতের প্রাচীন মহর্ষিদের মনীষার মহত্ত্ব। সেইসব মহা সত্য যখন আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম তখন এই যুগের যে মহর্ষি আমাদের কাছে আবার নূতন করে তা এনে উপস্থিত করলেন, সেই যুগগুরু রামমোহনকে যদি আমরা যোগ্য সম্মান না দিতে পারি তবে আমাদের চেয়ে আর অভাজন কে?

হয়ত কেউ বলতে পারেন, আমাদের শাস্ত্রশাসিত বিনীত দেশে রামমোহন বৃথা একটা বিদ্রোহ এনে হাজির করলেন। কেউ বা আবার বলবেন, স্বাধীন যে নবযুগ আসছে তার প্রারম্ভে তিনি বেদ-উপনিষদের দোহাই দিয়ে আমাদের চিত্তকে বেঁধে ফেলে পুরাতন অর্থহীন ঋষিবাণীর অনুশাসনের কাছে দাসখৎ লিখে দিলেন। আসল কথা রামমোহনই দেখালেন, সেই পরম সত্যে, নিত্য সত্যে স্বাধীন ও পরাধীন বলে কোনো বিরোধ নেই। শাশ্বত সত্যময় ঋষিবাক্যের সঙ্গে স্বাধীন বিচারের কোনো বিরোধ নেই। বরং সেই সব সাধকবাণী ভিতরের বাইরের সব বৃথা দাসত্ব হ'তে আমাদের চিত্তকে মুক্ত করে দেয়। ঋষিরাই বললেন, "যদি ঋগ্বেদ জেনে থাক তবে বড় জোর দেবতাদের রহস্য জেনেছ, যদি যজুর্ব্বেদ জেনে থাক তবে নাহয় জোর যজ্ঞের রহস্যটাই আয়ত্ত করেছ, যদি সামবেদ জেনে থাক তবে নাহয় আর সব কথাই জেনেছ, কিন্তু তোমার অন্তরের মধ্যে যে বেদ আছে সেই অনন্ত জীবনবেদকে যদি জেনে থাক তবেই তুমি জানতে পেরেছ ব্রহ্মকে; এই বেদ না জানলে আর কোনো বেদের সাহায্যেই তুমি ব্রহ্মবিৎ হতে পার না।"

> ঋচোহ যো বেদ স বেদ বেদান্
> যজূংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্।
> সামানি যো বেদ স বেদ সর্ব্বং
> যো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম॥
> ইতিহাসোপনিষৎ,

(Unpublished Upanishads, Adyar Library, p 11)

কাজেই রামমোহনই আমাদের দেশে নূতন ও পুরাতনের বিরোধ দিলেন ঘুচিয়ে, শাস্ত্র ও বিচারবুদ্ধির বিরোধ দিলেন দূর করে। আজ জগতের এই দুর্গতির দিনে বারবার সেই যুগগুরুর কাছেই শ্রদ্ধানত হয়ে বলি, হে আচার্য্য, সময় এসেছে, জগতে যত ভাই ভাই আজ পরস্পরকে না জেনেই কর্ণার্জ্জুনের মত বৃথা হানাহানি মারামারি করে মরছে, তোমার উচ্চারিত ভারতের অতি প্রাচীন ঐক্যমন্ত্র "পিতা নোঽসি" আজ আবার আমাদের কাছে দীপমান হোক।

হে পরম দেবতা, তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, সবাই আমরা তোমার সন্তান। "পিতা নোঽসি" এই কথা আমরা মুখে প্রতিদিন আওড়ালে বা ভজন করলেও সমস্ত জীবন দিয়ে জানিনে। "পিতা নো বোধি"— তুমি সমস্ত জীবনকে এই সত্য দিয়ে বোধিত কর। তবেই তোমার প্রতি আমাদের সব নমস্কার সত্য হবে। নইলে আমাদের এত পূজা অর্চনা ক্রিয়াকর্ম সবই ব্যর্থ। "নমস্তেঽস্তু"—পৃথিবীতে যে যেখানে যেভাবে তোমাকে নমস্কার করছে, মৈত্রী ও প্রেমে সব আজ সত্য হোক। নইলে পৃথিবীতে হিংসাদ্বেষ হানাহানির মারামারির অন্ত কিছুতেই হবে না। "তুমিই আমাদের সকলের অন্তরাহিত পরম বর্ম, তোমার প্রেরিত কল্যাণ-বুদ্ধি ও উদ্যমই আমাদের অন্তরাহিত পরম রক্ষাকবচ।"

ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্
শর্ম বর্ম মমান্তরম্।

সামবেদ সংহিতা।
উত্তরার্চিক, ৯. ৩. ৮.

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৭।

ভারতবর্ষের ধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাচীন ধর্ম দেখা যায় না যার মূলে দেবতার ভয়ের স্থান নেই। শাসনেই তাদের সকলের মূল প্রেরণা। প্রায় সকল রকম ধর্মই জোর করে মানুষকে কতকগুলি আচার ও নিয়ম পালনের তাড়া দিয়েছে—পাপের ভয়, নরকের ভয়, উৎকট শাস্তির ভয়, শত সহস্র ভয়ের শাসনে কঠোর গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা হয়েছে ধর্মজীবনকে। এই সমস্ত ধর্মের মূলে ছিল আদিম মানুষের অন্ধশক্তিকে পূজা। একজন সর্বশক্তিমান্ দেবতা সৃষ্টিকে বাইরে থেকে চালনা করছেন। তাঁর অনুশাসন তিলমাত্র অমান্য করলে গুরুতর শাস্তি অপেক্ষা করে আছে—সকল ধর্মেরই এই হ'ল মূল কথা।

এর বিশেষ একটি কারণ আছে। প্রথম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল নিতান্তই অনিশ্চিত। আহার-বিহার প্রভৃতি সকল প্রয়োজনের ব্যবস্থাই ছিল একান্ত দুর্লভ, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অত্যন্ত ক্রূর, নিষ্ঠুর। পশুচারণ থেকে কূট বণিক্‌বৃত্তি পর্যন্ত মানব ইতিহাসের সকল অবস্থাতেই দেখি, কাড়াকাড়ির চেষ্টা ছিল প্রবল। এই দস্যুবৃত্তি নির্মম হয়েছিল মানব-সমাজে। এরই তাড়নায় সেদিন মানুষ শক্তিকে শ্রদ্ধা করেছে, শক্তির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতাকে দূর করে, শান্ত করে প্রাণপণে তাকে আপনার পক্ষে টানবার চেষ্টা করেছে। জীবনকে এই ভাবে দেখার ফলে তাদের ধর্মে শাসন-নীতি হয়েছে প্রবল; এরই ফলে সে-যুগে যার হাতে ছিল শাসনদণ্ড সে জোর করে সকলকে এনেছে নিজের মতে। নিজের বাহুবলের দ্বারা এবং দেবতাকে স্বপক্ষে টেনে সে নির্লজ্জের মত পীড়িত করেছে অন্যকে।

একমাত্র উপনিষদের ধর্মেই দেখতে পাই, ঋষিরা দূর করতে পেরেছেন শক্তির ভয়ংকর এই ভয়কে। তাঁরা বলেছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এমন দৃঢ়স্বরে এত বড়ো কথা কোনো ধর্মে কোথাও বলা হয়নি। এই আনন্দের দিকেই চলেছে সৃষ্টি, ভয়ের দিকে নয়। এ-কথা যাঁরা বলেছেন তাঁদেরও জীবন তখন ছিল বিভীষিকার দ্বারা হিংস্রতার দ্বারা ঘেরা। এই আদিম যুগের মানুষই অস্ত্র পূজা করেছে অন্ধ শক্তিকে, সেই যুগেরই আর-এক মানুষের অন্তরে প্রথম এল উপনিষদের মন্ত্রে আনন্দের অমোঘ বাণী, সে-বাণী এল আমাদেরই এই ভারতবর্ষে।

আনন্দের এ বাণী সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিত হবার বাণী। মূঢ়তা বা ভয়ের চিহ্ন লেশমাত্র এর মধ্যে নেই। এই সাধনায় সদাজাগ্রত চেষ্টার সুনিশ্চিত নির্দেশ আছে। আপনাকে নির্মল, শুচি করতে হবে, সৃষ্টির মূলে নিহিত রয়েছে যে ঐক্য তাকে মৈত্রী ভাবের চর্চায় বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, পরমদেবতার সঙ্গে নিগূঢ়তম আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। ইহজীবনের সকল প্রিয়সম্পর্কের অপেক্ষা তিনি প্রিয়তর এই কথাই তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন দ্বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা", তিনিই অন্তরের অন্তরতর আত্মা যিনি এই বিশ্বের অন্তরে নিরন্তর বাস করছেন। তিনি সকল প্রিয়ের প্রিয়। সকলের চেয়ে ভয়ংকর তিনি নন। এই উপলব্ধির মধ্যে মূঢ়তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই, মন্ত্রতন্ত্রের নিষ্ঠুর বাক্যজালে কোথাও তাঁকে শান্ত করার ভীরু চেষ্টা নেই, বিকৃতির কণামাত্র স্থান নেই।

ঋষিরা বলেছেন, সকলকে সমান দেখতে হবে, সাধনাকে সকলের মধ্যে সার্থক করে তুলতে হবে। সকলের মধ্যে আপনাকে যে দেখেছে অবিকৃত বিমল

দৃষ্টিতে, তারই সাধনা সার্থক। এই যে সাম্য-বোধ, অন্তদেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে একেই বলা হয়েছে ডেমক্র্যাসি। এ-দেশের সাধনায় একে যে মানা হয়নি তা তো নয়। উচ্চ নীচে ভেদ দূর করবার চেষ্টা এদেশেও হয়েছে। সাম্যের সাধনা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই যে দূর হয়ে যাচ্ছে এর কারণ, কেন্দ্রগত বিশ্বাসে কোথাও এর সংকল্পের অভাব রয়েছে। আজ তাই সে এমন নিঃশেষে উন্মূল হয়ে অমানুষিক বিপ্লবের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল।

ডেমক্র্যাসির ইতিহাসের আরম্ভে দাস-ব্যবসা যখন দেশে দেশে মানবতাকে কলুষিত করেছিল, সে-যুগে দস্যুবৃত্তির নিপীড়ন ছিল বিস্তৃত। ধর্মপ্রচারের উন্নত ধ্বজার সঙ্গে ডেমক্র্যাসির ভক্তেরাই একদিন সর্বত্র নিষ্ঠুর অসাম্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্, ধর্মের যা মূল কথা তা প্রবেশ করেনি তাদের অন্তরে। বিশ্বের রাজার শক্তিকে মেনে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থেরই সিদ্ধি করব—এই ছিল একমাত্র বোধ।

তাই বলি, নির্মল মূঢ়তাবর্জিত উপনিষদের যে ধর্ম তা শুধু আদিম কালেই নয়, পরবর্তী কালেও অন্য কোথাও দেখা যায়নি,—ভয়ংকরকে ভয়ংকর আচারের দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা কোথাও নেই প্রাচীন এই ঋষিদের ধর্মে।

পরবর্তী যুগে দুঃখকে একদিন মানা হয়েছে এই ভারতবর্ষেই। বৌদ্ধযুগের সূচনায় একটা অবসাদ এল; এই বোধ এল যে, জীবনযাত্রা সুখের নয় শান্তির নয়, যাকে পাই তাকে একদিন অকস্মাৎ হারাই—মৃত্যু জীবনকে আক্রমণ করে, জরা পীড়িত করে দেহকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে অসম্ভব নয় এ-ধরণের চিন্তা এবং অনুভূতি। বেদে কিন্তু কোথাও দেখি না এ-ধরণের অবসাদ। তাঁরা বারংবার চেয়েছেন সৃষ্টির এই আনন্দ-যজ্ঞে মুক্ত আলোকে। বাতাসে স্থান পেতে।

অস্তিত্বের সম্বন্ধে দুঃসহতাবোধ এবং জীবনকে এড়াবার দুর্বলতা সেই দেশেই একদিন এল, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই এল একটি মহান্ বাণী। দুঃখকে স্বীকারের সঙ্গে বুদ্ধ তার নিবৃত্তির কথাই বলেছেন। সেও কিছু কম বড়ো কথা নয়। মানব-জীবনের যে দুঃখ তা ব্যক্তিগত দুঃখ, বুদ্ধ এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আপন প্রবৃত্তি, আপন কামনার চরিতার্থতা থেকে বঞ্চিত হওয়াতেই মানুষের দুঃখের মূল আছে নিহিত। এই তত্ত্বের সঙ্গেই তিনি তাই বললেন মৈত্রীর বাণী। সকলকে সমান করে, এক করে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখলে তবেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি। মাতা যেমন করে আপন একমাত্র পুত্রকে ভালোবাসেন, সর্বমানবকে সেই ভাবে ভালোবাসলে তবেই দুঃখের নির্মমতার হাত থেকে মুক্তি, তবেই সীমাবদ্ধ এই সংসারে অসীমের উপলব্ধি হবে সম্পূর্ণ। প্রেমের এই উদার উপলব্ধিতেই জীবনের মুক্তি। এখানেও কোনো দণ্ডধারী ভয়ংকরের কল্পনা দেখি না। অকৃতার্থতার দুঃখ জীবনে আছে সে-কথা অস্বীকার করা হয়নি কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এ-কথাও বলা হয়েছে যে অকৃতার্থতার এই দুঃখ আত্মপরাভবের লজ্জায়, কোনো অদৃশ্য শাসকের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মপালনের ত্রুটি এর কারণ নয়।

অতএব দেখতে পাই, উপনিষদের মন্ত্রে "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং" সর্বব্যাপী সত্তার কথা কল্পনা করা হয়েছে, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয়ের মন্ত্রে বৌদ্ধযুগেও সেই একই সত্তার কল্পনা করা হয়েছে। এই মন্ত্রের কোথাও কোনো অংশে তিলমাত্র নালিশ নেই। উপনিষদের ঋষি বলেছেন শান্তির দিক থেকে, বলেছেন পূর্ণতার দিক থেকে; বুদ্ধ বলেছেন আপনাকে ভোলবার দ্বারা, পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের দ্বারা জীবনসাধনার বাণী। লোভ-ক্রোধ জয়ের তাঁর যে বাণী সে-ও সেই "তেন ত্যক্তেন" এই বাণী। মূলত দুইই সম্পূর্ণ একই বাণী।

জগতের বীভৎস ব্যভিচারের মধ্যে আজ এই সত্যটি বিশেষ করে স্মরণ করবার দিন এসেছে। লোভ কোরো না—এ বাণী আজ সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ আবর্তে মানুষ মনে রাখতে পারছে না। এর স্থান বুঝি আজ রাষ্ট্রনীতি থেকে একেবারেই মুছে গেল; সমাজ-

নীতির ক্ষেত্রে তো বহু পূর্বেই মানুষ এ-বাণী বিস্মৃত হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা। উপনিষদের মন্ত্রের এই দেশেও মানুষকে অপমানিত আমরা কম করিনি। লোভের তাড়নায় মানুষ আজ মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে দিকে দিকে বলহীন করছে, মারছে। যুগান্তরের সাধনায় পাওয়া সকল বিশ্বাসকে সে আজ নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে, দুর্বল করছে। এতে যে প্রতিনিয়ত সে নিজেকেই আঘাত করছে তা নিজেও জানে না।

এই ভেদবুদ্ধি যে আমাদের দেশের অন্তরের জিনিস নয় তা আমরা ভুলতে বসেছি। এর পীড়নে কী পরিমাণে পঙ্গু আমরা হয়েছি এবং আজও হচ্ছি, জীবনের ক্ষেত্রে ক্রমশই কি ভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি তা আমরা এতদিন বুঝিনি, আজও বুঝতে পারলুম না। আমার মনে হয়, এই মনোবৃত্তির জন্যে দায়ী আমাদের অনার্য রক্ত যা পরবর্তী যুগে অলক্ষিতে আমাদের দেহের মধ্যে এসে মিশেছে। ইতিহাস ভাল করে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, এই কারণেই হয়ত মানবতার বা সাম্যের যে ধর্ম তা মুছে গিয়েছে। অনার্যরক্তের সংমিশ্রণের বিকৃতিকে অস্বীকার কেমন করে করি যখন চারিদিকে দেখি এই বিকৃত মনোবৃত্তি শক্তির নামে, বলের নামে সমগ্র মানবসমাজকে জীর্ণ করছে। দৃষ্টি তাদের এতদূর অন্ধ যে তারা দেখতেও পায় না এতে নিজেরই নৌকায় ছিদ্র করা হচ্ছে।

আমাদের দেশেও আজ তাই ভাববার সময় এসেছে। ভাবনা জাগছে, ভারত আজ তার এই চরম বিপদের সময় আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? এর মূল কারণ নির্দেশ করা একেবারেই কঠিন নয়। ধীরে ধীরে অতি সুনিশ্চিত এবং সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এ-দেশে মানুষের কেন্দ্রগত শক্তির মূল ছেদ করা হয়েছে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কূট রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে। আজ সাহায্য করবার ডাক এসেছে কিন্তু সে শক্তি এখন কোথায়? ভারত সহায়তা করতে পারবে না বিশ্বমানবকে কোনো ক্ষেত্রেই। আমরা দাসবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়েছি মনুষ্যত্ব হারিয়ে; আজ কাদের সাহায্যে এই যুগান্তরগত পরাভবের গ্লানি দূর করব? মানুষকেই যে আমরা তিলে তিলে নিঃশেষে হারিয়েছি। যে ধর্ম একদিন মানুষকে কাছে টেনেছিল সাম্যের আকর্ষণে, প্রেমের আকর্ষণে, তাতে এত বড়ো কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেবতাকে যারা ভয়ের তাড়নায় পূজা করে তারা দেবতার পশু, তারা নিজেদের তুচ্ছ আচার বিচারের যূপে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূজারীর গৌরব তাদের জন্য নয়, সৃষ্টির যজ্ঞশালায় কোনো শুভকার্যে তাদের অধিকার নেই। দেখতে পাচ্ছি সেই হিংস্র পশুরাই আজ দলে দলে খরনখরদন্ত বিস্তার করে দিকে দিকে উদ্দাম হয়ে জেগে উঠেছে। কে আজ তাদের শান্ত করবে, নিবৃত্ত করবে জানি নে।

এই নিদারুণ বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তবু গৌরবের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করবার দিন এসেছে যে, আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেই ভারতবর্ষে যে-দেশে পরম আনন্দরূপের চরমতম উপলব্ধি একদিন সার্থক হয়েছিল, এই দেশেই একদিন মানুষকে ভয়ের কঠোর বন্ধন থেকে উদ্ধার করে আনন্দের উদার লোকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন সেই ঋষিদের আজ প্রণাম নিবেদন করি।

(শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ। ১১ শ্রাবণ, ১৩৪৭। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।)

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৭।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ

...শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের লিচু ছিঁড়িয়া, কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, "বেরাদর![1] রৌদ্রে হুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত লিচু খেতে পার, এইখানে বসিয়া খাও।" মালীকে বলিলেন, "যা, গাছ থেকে লিচু পেড়ে নিয়ে আয়।" সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া লিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, "যত ইচ্ছা লিচু খাও।"

তাঁহার মূর্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, "বেরাদর! এখন তুমি টান।"

...আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া বলিলাম, "রামমণি ঠাকুরের[2] নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ।" শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "বেরাদর। আমাকে কেন, রাধাপ্রসাদকে[3] বল।"

...এই অবধি আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যে, রামমোহন রায় যেমন কোনো প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না।... (বিশ্বভারতীর গ্রন্থালয় প্রকাশিত মহর্ষির আত্মজীবনী।)

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ নিজ বাল্যজীবনে তাঁহার উপরে যে রামমোহন রায়ের নিগূঢ় প্রভাব পতিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই লিখেন নাই। একসময়ে তিনি কয়েকজন কুতূহলী জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে এবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে বিবৃত আছে।

(সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট, মহর্ষির আত্মজীবনী।)

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেইরূপ আকৃষ্ট হই নাই।...

"আমি প্রায়ই রাজার বাড়ীতে রাজার সহিত যাইতাম। তখন রাজার সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি আমি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। রাজার সহিত গাড়ীতে বেড়াইবার সময় আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির

হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় একপ্রকার গম্ভীর ও অবর্ণনীয়ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল।...যে কার্য্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি।...

"ইংলণ্ডে গমন করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন, সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দ্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দ্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

...যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন, কিন্তু পূজা অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার পিতার নিকট সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন। রাজার বন্ধুদিগের উপর তাঁহার এই প্রকার প্রভাব ছিল।

"যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহা দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।"

(১) পরে মহর্ষি বলিয়াছিলেন, "তখন আমার বয়স আট কিম্বা নয় বৎসর হইবে।"

(২) দ্বারকানাথ রামলোচন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ও রামমণি ঠাকুরের ঔরসপুত্র ছিলেন। রাম লোচন তখন পরলোকগত।

(৩) রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র।
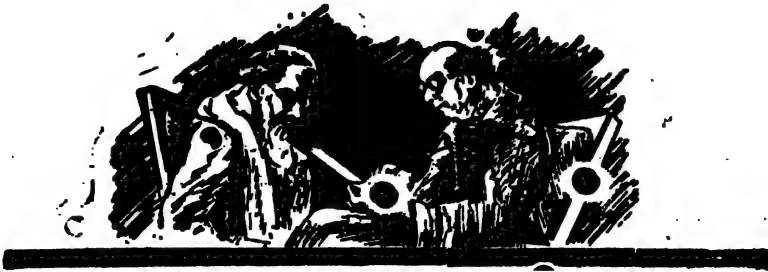
ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি গান যখনই ধরা যায় তখনই তার রূপ প্রকাশ হয় না—তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কি এবং তার অন্তরাটা কোন্‌দিকে গতি নেবে সেকথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা সমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল—ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই যে আঘাত দেবার কাজ, এ একটা সমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানান ঘাত-প্রতিঘাত ও সত্য-মিথ্যার ভিতর দিয়ে দিয়ে ঘুরে নানা শাখা-প্রশাখার পথ খুঁজতে-খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে সত্যের মূর্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে,—হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে। এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর ত অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে পারে না—তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চলতেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে, ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বলছিলুম ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা সমে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে-কিম্বা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না? এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবে না?

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই খননকরা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি—কিন্তু যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে, তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝরণাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিষ—তার উপরে আমারই শিলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে—তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এইরকম দুই অধ্যায় আছে। যতদিন বাধা দূর করবার পালা, ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারিদিক্ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন কি, চারিদিকের বিরুদ্ধ, ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছন যায় যেখানে বিশ্বের মর্ম্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিষ সকলেরই জিনিষ—সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে নিজেকে তারই অনুবর্ত্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাহিরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষ্য-পরিবর্ত্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে, পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক্ থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্ব্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল, তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়। সেই সঙ্কটের সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয়নি।

সাম্প্রদায়িক দিক্ থেকেও দেখা যেতে পারে ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষ ভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে, আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্ছি এবং সামাজিক কর্তব্য সাধন করে উপকার পাচ্ছি, এইটুকু মাত্র স্বীকার করেই থামতে পারিনে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড় করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে, ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় সাধনের বর্ত্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্ম্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনি প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনি আপনার সকলের চেয়ে সত্য সাধনাকেই, ব্রহ্মসাধনাকেই, নূতন করে উন্মুখ করে দিয়েছে। তা যদি না করত তাহলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম্ম প্রবল ধর্ম্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম্ম নয়। এই ধর্ম্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহুশতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাইনে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই

মুসলমান অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায়, ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্ম্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয়, আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক, রবিদাস, কবীর, দাদূ প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করচেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব, ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ্ সম্বন্ধে কি রকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান ধর্ম্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক, তার মর্ম্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে, না শত্রুর আঘাত হবে? প্রথম যেদিন সে শৃঙ্গধ্বনি করে এসেছিল সেদিন ত মনে করেছিলুম সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল, ভারতবর্ষের সত্যসম্বল নেই অতএব এইবার তাকে তার হীন আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি।

কিন্তু তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহুদিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধন ভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে—ভয় নেই, কোনো অভাব নেই—এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব্ব পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার উদ্‌ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মরচে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাক্কা দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মত বোধ হয়েছিল।

কিন্তু বিরোধ নয়। বর্ত্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনো এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার সকল জটিলতার যথার্থ সমাধান করে দেবে, এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠচে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে মহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কি বোঝায়, উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,—
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়—এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি, জল, তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে—আমাদের চৈতন্য সেখানে পরম চৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করছে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়, সর্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকেই ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা, জীবনের এমন পরিপূর্ণতা, জগদ্বাসের এমন সার্থকতা আর কি হতে পারে।

কালের বহুতর আবর্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে জিনিষ ত একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা এই ব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মনুষ্যত্বের কোনো একটা চরম তাৎপর্য্য থাকে না—সে একটা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মত প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ্ পেয়েছিল, মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ, পুনর্ব্বার তাকে বৃহত্তর করে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল—সেইটিকে শোধন করে পূর্ণতর করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার তার কাছ থেকে দূরে না গেলে তাকে বিশুদ্ধ করে সত্য করে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন? আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক্ ও বিষয়ের দিক্ সমান ওজন রেখে চলতে পারেনি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম—তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম—তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্য্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্য্যাপ্ত করে তুলতে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল, ভক্তি তখন বিচিত্র কর্ম্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিষ জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে টিকতে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজতে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্ব্বি ও শরীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জ্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না—আপনাকে পোষণ করবার জন্যে, রক্ষা করবার জন্যে আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল—এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিকে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চলছিল। সে বিষয়রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলেছিল—তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্যরাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায়নি বটে, তবু তার সর্ব্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে, সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা, কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা—এই সমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্য্যবসিত য়ুরোপ তা দেখেনি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে,জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র ধ্যানের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেননি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্বইতিহাসে বিশ্বধর্ম্মে বিশ্বকর্ম্মে সর্ব্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল, এই বাণী তখন উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাইরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীরা অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারিদিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার—বাহ্য অনুষ্ঠান এবং ভক্তি-রস-মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনাকে পুঁথির অন্ধকার সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, এ আমাদের আপন নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়, বলে উঠল এ খৃষ্টানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়,জীবন যখন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে,জ্ঞান যখন গ্রাম্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিকল করতে চায়, তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন কি, সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এদিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করচে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্চে, আপনার চেয়ে বড়কে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্ম্মের ক্ষেত্র পৃথিবী জোড়া, এবং সেই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল "আমি", তার মন্ত্র ছিল জোর যার মুলুক তার। সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তি দেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা, কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসচে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলচে—কিন্তু একথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না;—প্রয়োজন বোধকে যত বড় নাম দাও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড় সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্য্যন্ত কিছুই টিঁকতে এবং টেঁকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর,

আত্ম-সমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাত-বেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্ব্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করচে, এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনও দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু কখনই শুষ্ক হয়নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্ম্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি কিন্তু তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোট করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি; যেন বুঝতে পারি, নিষ্কলঙ্ক তুষার-স্রুত এই পুণ্য স্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়চে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদ-মন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করচে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা, অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা, এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্ম্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্য্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্দ্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৮।

ভক্তিধর্ম্ম ও জাতিভেদ

শিবনাথ শাস্ত্রী

ইহা একটা গভীর রূপে চিন্তা করিবার উপযুক্ত বিষয় যে, এই জাতিভেদ-প্রপীড়িত এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আলয়-স্বরূপ দেশে যে-কোনও স্থানে ভক্তিধর্ম্মের প্রসার দৃষ্ট হইয়াছে, সেইখানেই তৎসঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের প্রকোপের হ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে—যেন ভক্তিধর্ম ও জাতি-ভেদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে।

এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে শূদ্র প্রভৃতি হীন জাতীয়গণ ধর্ম্মের যজন যাজন প্রভৃতি উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত। এদেশের একটা বহুকাল-প্রসিদ্ধ প্রচলিত বচন এই :—

স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

অর্থ—স্ত্রী শূদ্র ও দৈবজ্ঞ ভাট প্রভৃতি অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণের ত্রিবেদ শ্রবণীয় নহে।

আমাদের লৌকিক প্রথাও চিরদিন ইহার অনুরূপ হইয়া আসিয়াছে। এখনও শূদ্রাদির সমক্ষে গায়ত্রী মন্ত্র বা অপর কোনও বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ নিষিদ্ধ। এমন কি রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা করিলেন; তখন দেশ-প্রচলিত লৌকিক সংস্কারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজাকে এই নিয়ম করিতে হইল যে, একটী পার্শ্বের ঘরে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ যখন উপনিষদাদি বেদমন্ত্র পাঠ করিবেন, তখন শূদ্রেরা সেখানে যাইতে পারিবেন না। কয়েক বৎসরের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা ঐ নিয়ম রহিত হয়।

কেবল যে শূদ্রগণ বেদমন্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করিতে পারিবেন না, এরূপ কঠিন শাসন ছিল তাহা নহে। মনু একস্থলে অতি পরিষ্কাররূপেই বলিয়াছেন :—

নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেহস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং।

অর্থাৎ—ইহার (শূদ্রের) ধর্ম্মে অধিকার নাই সুতরাং ধর্ম হইতে বর্জ্জনও নাই।

অভিপ্রায় এই যে, যে কার্য্যে ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মে ও ধর্ম্মের অধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহাতে শূদ্রের পাতিত্য নাই।

যে দেশে চিরদিন শূদ্রাদি হীন জাতীয়দিগের প্রতি এরূপ কঠিন শাসন রহিয়াছে, সে দেশে ভক্তিধর্ম কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তিধর্ম যে কেবল শূদ্রাদি হীন জাতীয়দিগকে ধর্ম্মসাধনে অধিকার দিয়াছে তাহা নহে, অনেক স্থলে তাহাদিগকে গুরু ও আচার্য্যের পদেও অভিষিক্ত করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে যদি কেহ পদার্পণ করেন এবং কোন প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির দেখিতে যান তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাইবেন যে, মন্দির মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুমূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইবার দ্বারে অপরাপর অনেক মূর্ত্তি রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, সেগুলি আলোয়াড়-শ্রেণীগণ্য সাধুদিগের মূর্ত্তি। অর্থাৎ ভক্তদিগের মূর্ত্তির চরণে প্রণত হইয়া তবে ভগবানের নিকটস্থ হইতে হয়। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, এই আলোয়াড় বা ভক্তদিগের অনেকে পরেয়া প্রভৃতি হীনজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহা কি অতীব বিস্ময়জনক

ব্যাপার নহে যে,যে-দেশে এখনও একজন পরেয়া ব্রাহ্মণের দশহাতের মধ্যে আসিতে পারে না, যে-দেশে হীন জাতীয়গণ সর্ব্ববিধ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার হইতে আজিও বঞ্চিত, সে-দেশে পরেয়া শ্রেণী হইতে সমুৎপন্ন ভক্তগণ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টান্ত অগ্রে দিতেছি, কারণ, সেখানে জাতিভেদের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। আর্য্যাবর্ত্তে মহম্মদীয় শাসনপ্রণালী বহু শতাব্দী প্রচলিত থাকাতে জাতিভেদের প্রভাব বহুল পরিমাণে শিথিল হইয়াছে,—সুতরাং এখানে শূদ্রাদি হীনজাতীয়দিগের প্রাচুর্ভাব সম্ভবপর।

আর্য্যাবর্ত্তেও জাতিভেদের উপরে ভক্তিধর্মের প্রভাব আশ্চর্য্যরূপে স্থাপিত দেখা যায়। সবিস্তর উল্লেখে প্রবৃত্ত না হইয়া এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রামানন্দী বা রামাৎ নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানন্দের দ্বাদশ জন শিষ্য—আশানন্দ, কবীর, রয়দাস বা রুইদাস, পীপা, সুরসুরানন্দ, শুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও প্রিয়ানন্দ। ইঁহাদের অনেকেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়কর্ত্তা গুরুরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই দ্বাদশ জনের মধ্যে কবীর জোলা-তাঁতি, রয়দাস চামার, পীপা রাজপুত, ধন্না জাট এবং সেন নাপিত। ভক্তিধর্ম কি আশ্চর্য্য রূপেই জাতিভেদকে দলন করিয়াছে। অপর দুই ভারত-প্রসিদ্ধ ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাজনের উল্লেখও এই সঙ্গে করা ভাল। প্রথম বাবা নানক, দ্বিতীয় তুকারাম। ইঁহারা উভয়েই বণিক্-কুল-সমুৎপন্ন অথচ উভয়েই চিরদিন উচ্চজাতীয়দিগের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বাবা নানক যে জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, তাহার ঘোষণা স্বরূপ বালা ও মর্দ্দানা নামক দুইজন শিষ্যসহ সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন; তাহারা তাঁহার সংগীতের দোয়ার ছিল। তাহাদের একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। বাবা নানকের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে পরবর্ত্তী গুরুগণ সকল বর্ণের লোককে শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। তুকারামও অবিশেষে ব্রাহ্মণ ও নিকৃষ্ট জাতীয় দোয়ার লইয়া কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

হীনজাতীয়দিগকে ধর্ম্মাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে ও আর্য্যাবর্ত্তে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান প্রচারক রামানুজ। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগকে দীক্ষাদানের অধিকার দেন নাই, কিন্তু শূদ্রাদি হীন জাতীয়দিগকে বিষ্ণুর ভজন পূজন ও ভক্তির সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। বলিতে গেলে তাঁহার প্রচারিত উদার মতই ভক্তিধর্ম হইতে জাতিভেদকে নিরস্ত করিয়াছে।

বঙ্গদেশে আসিয়া চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রভুত্রয় চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ যদিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা যে ধর্ম প্রচার করিলেন তাহা হইতে জাতিভেদ ত্বরায় নিরস্ত হইল। হরিদাস একজন যবন। উক্ত গুরুত্রয় অবাধে তাঁহাকে কোল দিয়াছিলেন। ইঁহাদের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই যে গোস্বামিগণের অর্থাৎ চৈতন্যের পারিষদগণের শিষ্য প্রশিষ্যদিগের অনেকে নীচজাতীয় ছিলেন, অথচ তাঁহারা গুরু-পরম্পরাক্রমে শিষ্যবর্গের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। যবন-সংসর্গী রূপ সনাতন, রঘুনাথ দাস, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনের পূজিত অনেক গুরু জাত্যংশে হীন ছিলেন। এ দেশীয় বৈষ্ণবগণের মুখে একটি প্রাচীন সংস্কৃতবচন সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়:—

চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ॥

অর্থ—চণ্ডালও যদি হরিভক্তি-পরায়ণ হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আর ব্রাহ্মণ যদি হরিভক্তি-বিহীন হয় তবে সে চণ্ডালের অধম। আর একটী চলিত বাক্য এই:—

"নিতাই আচণ্ডালে দেয় কোল,
কোল দিয়ে বলে হরিবোল"

এই সকল উক্তিতে ভক্তিধর্মের চক্ষে জাতিভেদের হীনতাই প্রকাশ করিতেছে। কেবল যে বৈষ্ণব গুরু-বৃন্দের উপদেশবাক্যেই জাতিভেদের হীনতা লক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, নেড়া, বাউল, বিরক্ত, দরবেশ প্রভৃতি চৈতন্য সম্প্রদায়ের যত শাখা দেখা গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কার্য্যতঃ জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়াছে। চৈতন্যের পারিষদগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ যেমন 'গোস্বামী' নামে উক্ত হইয়াছেন তেমনি সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা যে কর্তাভজা সম্প্রদায় তাহার গুরুগণ "মহাশয়" নামে উক্ত হইয়াছেন। এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, মহাশয়দিগের মধ্যে মুসলমানও আছেন, এবং হিন্দু শিষ্যেরা তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এদেশের সাধারণ লোকে নেড়া, বাউল প্রভৃতি চৈতন্য সম্প্রদায়কে "অনন্ত কুল" বলিয়া থাকে। কেহ ইহার কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে লোকে বলে যে "অনন্ত কুলে দাঁড়িয়েছে" অর্থাৎ জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া নেড়া-নেড়ীর দলে প্রবেশ করিয়াছে। সর্ব বর্ণের লোক এই অনন্ত কুলে প্রবেশ করিয়াছে ও প্রতিদিন করিতেছে। বঙ্গদেশের কোন কোনও বিভাগে হিন্দু গৃহস্থগণ, বিশেষতঃ যাহাদের ভবনে অল্পবয়স্ক বিধবা আছে, এরূপ গৃহস্থগণ এই নেড়া বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়-সকলের ভয়ে বিব্রত। ইহারা ভিক্ষা করিবার ছলে গৃহস্থের গৃহে আসে ও বালবিধবাদিগকে ভুলাইয়া কুলের বাহির করিয়া লইয়া যায় এবং অনন্ত কুলে দণ্ডায়মান করে। তৎপরে তাহারা নেড়াদের সঙ্গে নেড়ী হইয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন আরম্ভ করে ও 'প্রকৃতি সাধনে' সহায়তা করিতে থাকে।

অধিক কি, যেখানেই ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয় সেইখানেই জাতিভেদের দলন—একথা এমনি সত্য যে, আসামে প্রচলিত মহাপুরুষীয় ধর্ম্মেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসাম প্রদেশে মহাপুরুষীয় ধর্ম নামে এক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। "শঙ্কর দেউ" বা শঙ্করদেব তাহার প্রতিষ্ঠাকর্তা। ১৩৭০ শকে, আলিপুখুরি নামক গ্রামে এক কায়স্থকুলে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, শঙ্করদেব দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপে পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, শঙ্করদেব যে চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্মের অনেক ভাব আসামে প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এক বিষয়ে চৈতন্যের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইতেন কিন্তু শঙ্করদেব মূর্ত্তিপূজার অতিশয় বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার উপদেশে একস্থানে বলিয়াছেন :—

"অন্য দেবীদেব না করিবা সেবা,
না খাইবা প্রসাদ তার।
গৃহে না পশিবা মূর্ত্তিকো না চাহিবা,
ভক্তি হবে ব্যভিচার॥"

দেবমূর্ত্তি দেখিবে না, দেব-প্রসাদ খাইবে না, দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিবে না, তাহা হইলে ভক্তির ব্যভিচার হইবে, এরূপ উপদেশ এদেশীয় আর কোনও ভক্তিপথাবলম্বী সাধুর মুখে শ্রুত হয় নাই একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাতিভেদ সম্বন্ধেও শঙ্করদেবের উপদেশ ঐ প্রকার কঠোর ছিল। ব্রাহ্মণেরাও শূদ্র মহান্তের নিকট উপদেশ লইবে, তিনি এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এরূপ শোনা যায়, তিনি নিজে একজন মুসলমানকে শিষ্য করিয়া তাহাকে "হরিনাম" মন্ত্র দিয়াছিলেন। মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে চৈতন্যের সহিত কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও এক বিষয়ে তাঁহার সহিত সৌসাদৃশ্য ছিল। চৈতন্যের ধর্ম-প্রচারের প্রধান লক্ষণ ছিল, নাম সংকীর্ত্তন। জপ তপঃ ক্রিয়াকাণ্ডের পরিবর্ত্তে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন নাম-সংকীর্ত্তন। তাঁহার উক্তি বলিয়া নিম্নলিখিত উক্তিটী প্রচলিত আছে :—

হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অর্থ—হরিনাম, হরিনাম, কেবল হরিনাম, তদ্ভিন্ন কলিতে অন্য গতি নাই, নাই, নাই।

আসাম দেশে শঙ্করদেবের উক্তি বলিয়া ইহার অনুরূপ একটী উক্তি প্রচলিত আছে :—

তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনং
যদ্দিনং হরি-সংলাপ-কথা-পীযুষ-বর্জ্জিতং॥

অর্থ—যেদিন আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন সেদিন দুর্দ্দিন নয়, কিন্তু সেই দিনকেই প্রকৃত দুর্দ্দিন মনে করি, যেদিন হরিকথা-পীযুষ-বিবর্জ্জিত হইয়া গত হয়।

শঙ্করদেবের শিষ্যগণের মধ্যে ইষ্টদেবতার নাম করিবার জন্য এক প্রকার সাধনগৃহ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে "নাম-ঘর" বলে। সেই সকল ঘরে এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ মধ্যে মধ্যে সমবেত হইয়া নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে নাম-কীর্ত্তনকে চৈতন্য ও শঙ্করদেব উভয়েই ধর্মসাধনের প্রধান উপায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই নাম-কীর্ত্তনে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই অধিকার দিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, যে-কোনও স্থানে ভক্তিধর্ম প্রচারিত হইয়াছে সেইখানেই ইহা জাতিভেদকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, জাতিভেদের সহিত ভক্তিধর্মের এই বিরোধের কারণ কি? প্রথম উত্তর, জ্ঞান-প্রধান ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদ করিয়াই ভক্তিধর্মের অভ্যুদয়; জাতিভেদ প্রথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি স্বরূপ, সুতরাং ভক্তিধর্ম জাতিভেদের প্রতিবাদ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছে। এ দেশে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মেই ভক্তিধর্ম প্রধান রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইদানীন্তনকালে রামানুজের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রী' সম্প্রদায় হইতেই বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় গণনা করা হয়। তৎপরে দাক্ষিণাত্যে ও আর্য্যাবর্তে বৈষ্ণবধর্মের অনেক শাখা প্রশাখা দেখা দিয়াছে এবং বৈষ্ণব ধর্ম দেশভেদে নানারূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিতে হইবে না যে, রামানুজ হইতেই ভক্তি ধর্মের প্রকৃত অভ্যুদয়। ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১১২৭ অব্দে রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য তাহার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অভ্যুদিত হন। "আর্য্য-বিদ্যাসুধাকর" নামক গ্রন্থের নির্দ্দেশানুসারে তিনি ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮২০ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, শঙ্করের সমকালেও কোন কোনও ভক্তি-সম্প্রদায় দেশে বিদ্যমান ছিল। আর তাহা থাকিবারই কথা। কারণ শাণ্ডিল্য সূত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থসকল আজিও রহিয়াছে, তাহাতে ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক কি, গীতাতেই 'যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ' ইত্যাদি বচনদ্বারা ভক্তিমার্গের বহু প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিতেছে। তবে রামানুজ হইতে যে বৈষ্ণব বা ভক্তিধর্মের অভ্যুদয় গণনা করা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, শঙ্করের দিগ্বিজয়ের পর কি আর্য্যাবর্ত্ত কি দাক্ষিণাত্য সর্ব্বত্রই শৈব ধর্মের মহাপ্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবং ভক্তিধর্ম প্রায় এক প্রকার নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি সেই সময় হইতে অনেক বৈষ্ণবতীর্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান বৃন্দাবনে যেসকল তীর্থস্থান দেখা যাইতেছে তাহার অনেক চৈতন্যের শিষ্যগণের দ্বারা ও অপরাপর বৈষ্ণব সাধুদিগের দ্বারা পুনরুদ্ধৃত লুপ্ত তীর্থ মাত্র।

বলিতে কি, রামানুজের অভ্যুত্থান শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ও শৈব ধর্মের আতিশয্য ও অনিষ্ট ফল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য। লুথার জার্মানিতে যে কথা ঘোষণা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, রামানুজ তৎসদৃশ কথা বলিবার জন্যই ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রোমান কাথলিক ধর্মসমাজ শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন যে, ধর্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ-সকলের অনুসরণের দ্বারাই এবং তন্নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারাই মুক্তি হয় (salvation is by works)। লুথার সেন্টপলের অনুসরণ করিয়া বলিলেন: "না, ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয় (salvation is by faith)।" রামানুজ এবং তাঁহার শিষ্যগণও বৈধী মুক্তির উপরে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মুক্তি অর্থাৎ বৈধী মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রচলিত ভক্তি-পন্থাবলম্বীদিগের প্রগাঢ় সংস্কার ও সর্ব্বপ্রধান উপদেশ। চৈতন্যের শিষ্যগণের একটী প্রসিদ্ধ উক্তি এই :—

জগতের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।

চৈতন্য সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তেও দেখিতে পাই যে, চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অদ্বৈত বঙ্গদেশে আবার মুক্তি প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। চৈতন্য এই সংবাদে দুঃখিত হইয়া, নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে ভক্তি প্রচারের ভার দিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। সংক্ষেপে বলি. বিধির ধর্ম ও ভক্তির ধর্ম এই উভয়ের বিরোধ এদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। বিধির ধর্ম বলিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বুঝিতে হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির আদেশ উপদেশের উপরে সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত এবং জাতিভেদ ইহার দুর্গস্বরূপ। সুতরাং বিধির ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া যখন ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, তখন ইহার আক্রমণ অনিবার্য্যরূপে জাতিভেদের উপরেও গিয়া পড়িল।

এস্থলে ইহাও উল্লেখের যোগ্য যে, কেবল ভক্তি ধর্ম্ম নহে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করিয়া যখনি যে সম্প্রদায় অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহারা অল্পাধিক পরিমাণে জাতিভেদের দলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের আচরিত বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া জন্মগ্রহণ করে! সুতরাং ইহা জাতিভেদকেও দলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ইহার শ্রমণ-শ্রমণাদিগের মধ্যে অনেক হীন জাতীয় লোক প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অধিক কি, অধুনাতন সময়েও বেদবাহ্য যে-কোনও ধর্ম্মমত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই জাতিভেদকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। যথা তান্ত্রিক সম্প্রদায়। তন্ত্র শাস্ত্র বেদবাহ্য বলিয়া পরিগণিত। তান্ত্রিকগণ স্বীয় সাধকদলের মধ্যে জাতিভেদকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের একটী সুপ্রসিদ্ধ বচন এই :—

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ।

অর্থ—ভৈরবীচক্র আরম্ভ হইলে সকল বর্ণকে দ্বিজোত্তম বলিয়া গণনা করিতে হইবে। অর্থাৎ তখন আর জাতিবিচার থাকিবে না! অতএব প্রথম কথা এই, ভক্তিধর্ম্ম যে জাতিভেদকে দলনকরিতেচাহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ইহা বেদবাহ্য এবং ইহা বৈধীধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছে।

ভক্তিধর্ম্ম বৈদিক ও বৈধীধর্ম্মের বিরোধী তাহা প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ। ভাগবতের রচনা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ আছে যে, ব্যাসদেব মহাভারতাদি রচনান্তে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া সরস্বতীতীরে নির্জ্জনস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, তিনি নিজে সর্ব্ব ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন তবু কেন তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। এ সকল কেন তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিতেছে না। তাঁহার চিত্তের এতদবস্থাতে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্যাসকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভক্তিতত্ত্বের প্রতি, হরিগুণানুকীর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ব্যাস যে বৈধীধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তদনন্তর ব্যাস আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং ক্রিয়াবহুল বৈধীধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া যে ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয় তাহা ভাগবতেও দৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, ইহার ভিতরে আরও কিছু গূঢ় কারণ আছে কি না? বোধ হয় কিছু গূঢ় কারণও আছে। ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ প্রেম। ভক্তির প্রাচীন লক্ষণ এই :—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

অর্থ—ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ তাহাই ভক্তি।

এখন মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেম বা অনুরাগের স্বভাব এই যে ইহা কোনও বন্ধন জানে না। যে মুহূর্ত্তে

মানুষ প্রেমিক হয় সেই মুহূর্তেই সে সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত, তাহার আত্মা স্বাধীন। যাহার আত্মা স্বাধীন, বাহিরের বন্ধনে তাহার কি করে? বাহিরের বন্ধন তাহার পক্ষে থাকিয়াও নাই। এই জন্যই সেণ্ট পল আদিম খৃষ্টীয় মণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যীশুর প্রতি একবার প্রীতি স্থাপিত হইলে, তৎপরে সে ব্যক্তি দাসত্ব-পাশে বদ্ধই থাকুক, আর স্বাধীন থাকুক, সে সমান কথা। —কারণ যীশুর প্রেমপাশে যে বদ্ধ সে তাহার যীশু-প্রেম-বিহীন প্রভু অপেক্ষাও স্বাধীন। এই জন্য দেখিতে পাই আদিম খৃষ্টীয়ধর্ম্ম দাসত্ব প্রথার সহিত বিরোধ উৎপন্ন করে নাই। মানবকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ প্রেমের স্বাধীনতা দিয়া নিরস্ত হইয়াছে। ভারতের ভক্তি ধর্ম্মের প্রচারকগণও প্রকারান্তরে সেই সত্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা হীন জাতীয়দিগকে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকুক, সে ত তুচ্ছ, তুমি যখন হরিতে প্রেম স্থাপন করিয়াছ, তখন তুমি ব্রাহ্মণের উপরে উঠিয়াছ। তোমার আত্মার সকল বন্ধন খসিয়া গিয়াছে। তুমি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। এইরূপে প্রেম মানবাত্মাকে সকল বন্ধন ঘুচাইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়াছে।

স্বাধীনতা যেমন প্রেমের মূলমন্ত্র, সাম্যও তেমনি প্রেমের মূলমন্ত্র। প্রেমে উচ্চ নীচ নাই, ধনী দরিদ্র নাই। সকলেই প্রেমের অধিকারী। মানবীয় প্রেমেরও অদ্ভুত সাম্যবিধানশক্তি। এ প্রেমও বাধা বিঘ্ন মানে না, উচ্চ নীচ গণনা করে না। এই কারণে ভক্তিধর্ম্মাবলম্বিগণ যখন ভগবৎ-প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে উচ্চজাতি হীনজাতির প্রভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহারা আর মনে করিতে পারেন নাই যে, ব্রাহ্মণ শ্রীবাস যে-প্রেমের অধিকারী, যবন হরিদাস সে-প্রেমের অধিকারী নহেন। সুতরাং জাতিভেদ তাঁহাদের চিত্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের উপদেশ সহজেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে গিয়াছে।

তবে অধিকাংশ ভক্তি-সম্প্রদায় জাতিভেদের বিরুদ্ধে অনুধাবণ করেন নাই। যেমন তাঁহারা অনেক সামাজিক প্রথা, বা লৌকিক সংস্কারের উপরে হস্তার্পণ করেন নাই, তেমনি জাতিভেদরূপ সামাজিক প্রথার উপরেও হাত দেন নাই। অনেক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ গোপনে আপনাদের মধ্যে জাতিভেদের শাসন লঙ্ঘন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে সামাজিক ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের কার্য্যনীতি তাঁহাদের একটি উক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে :—

"লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার।" অর্থ—বাহিরে লৌকিক আচার রাখ, গুরু-সন্নিধানে সাধকগণ যখন বসেন তখন তাঁহাদের অবলম্বিত আচার অবলম্বন কর।

এইরূপে অনেক সম্প্রদায়ের সাধন-প্রক্রিয়া একটা গুপ্ত সাধনপ্রণালীতে দাঁড়াইয়াছে। লোকচক্ষের অন্তরালে তাঁহারা এমন অনেক কাজ করেন, যাহা লোকে স্বপ্নেও জানে না। সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, এরূপ গুপ্তসাধন চলিতে আরম্ভ হইলে, তাহার পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন হয়। এই কারণে এরূপ গুপ্ত সাধকদলে অনেক কদাচার প্রবেশ করিয়াছে, পরে জানিতে পারা গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ শিষ্যবর্গের নারীগণকে লইয়া যাহা করিতেন, তাহা অকথ্য, অশ্রাব্য, অনালোচ্য। ভাগ্যে স্বর্গীয় কর্ষনদাস মূলজী ইহার কোন কোনও কথা লোকালয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে লোকনিন্দার স্রোত এই সম্প্রদায়ের গুরুগণের আচরণের প্রতি প্রবাহিত হইয়া সে অত্যাচারকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করিয়াছে। এ বিষয়ে অধিক যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মিঃ ম্যালাবারির লিখিত "Gujrat, and the Gujratis" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে এবং বোম্বাই হাইকোর্টের Maharajah Libel Case-এর বিবরণ পাঠ করিলে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

তবে একথাও সত্য যে, এই সকল গুপ্ত সাধকদলের যে লোকনিন্দা তাহার কারণ তাঁহাদের গুপ্ত সাধন ও

বাহিরের লোকের নানা প্রকার কল্পনা। লোকে যখন দেখে, একদল লোক আপনাদের কাজকর্ম্ম লোকচক্ষের অন্তরালে রাখিবার জন্য ব্যগ্র, তখন স্বভাবতঃ মনে করে. ইহারা কোনও প্রকার অপকর্ম্ম নিশ্চয় করে যাহা লোকচক্ষে ধরিতে প্রস্তুত নয়। এই কারণে আদিম খৃষ্টীয়মণ্ডলীর নামে লোকে নানা কথা কহিত। আদিম খৃষ্টীয়গণ নির্য্যাতনের ও রাজঅত্যাচারের ভয়ে অতি গোপনে মিলিত হইতেন। অনেক সময় রাত্রিকালে সমাধিস্থানের ভূমিমধ্যস্থ প্রেতগৃহে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিতেন ; রাজকর্ম্মচারীরা জানিতেও পারিত না। এই কারণে লোকে বলিত, তাহারা নরমাংস খায় ও অপরাপর বহু প্রকার বীভৎস কাণ্ড করে। এমন কি তাঁহাদের প্রতি সমকালীন মানুষের এত কুসংস্কার ছিল যে, সে-সময়কার যে কোনও রোমীয় গ্রন্থকার তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই লিখিয়াছেন, "সেই ঘৃণিত সম্প্রদায় যাহারা যীশুর আশ্রিত" ইত্যাদি। সেইরূপ ভারতবর্ষের গুপ্ত সাধকদিগের যে অখ্যাতি তাহারও মূলে অনেক পরিমাণে লোকের ভ্রান্ত সংস্কার আছে। তাহা হইলেও "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্গুরুর কাছে সদাচার"—এই মত,ভারতীয় নীতির দুর্ব্বলতাকেই প্রকাশ করিতেছে। অপরদিকে এই দূষিত নীতি অবলম্বন করাতে অধিকাংশ ভাবুকধর্ম্ম জাতীয় চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে কিছুই সাহায্য করিতে পারে নাই। তাহাদের সাধন-প্রণালী কেবল ভাবুকতাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভাবুকের স্বর্গ তন্ময়তা-নিমগ্ন কাপুরুষের স্বর্গ ; তাহাতে না ব্যক্তিগত চরিত্রকে দৃঢ় করে, না জাতীয় চরিত্রকে উন্নত করে। ইহার অকৃতকার্য্যতার প্রমাণ ভারতের সামাজিক ইতিবৃত্ত। অধিক আর বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের ফলস্বরূপ এইটুকু মনে থাকিলেই যথেষ্ট যে, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে থাকিলেই জাতিভেদ আর মনে থাকে না। ভক্তিধর্ম্ম স্বাভাবিক জাতিভেদের বিরোধী।

প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১১।
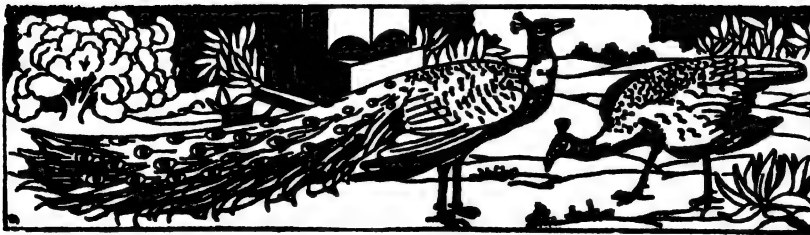
প্রবাসী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিজ ভূমে যবে প্রবাসী ভারতবাসী,
সে নামেই তুমি দেখা দিলে হেথা আসি'।
দেবতার তেজ করিয়া সঙ্গোপন
এলে যেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
মধ্য আকাশে তখন যদিও রবি,
ম্লান ও মলিন দেশ, দীনতার ছবি।
শব-সাধনার তখনো হয়নি শেষ—
ফেরে দুর্গতি, দুর্নীতি, দুঃখ ক্লেশ।
কচিৎ কোথাও গোপনে জ্বলিছে ধুনী,
মুক্তির লাগি' আহুতি দিতেছে গুণী।
তুমি গ'ড়ে দিলে অভিনব পটভূমি,
জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ফিরালে তুমি।
স্থূল পঙ্কিল ছিল যা জাতির রুচি,
তুমি ক'রে দিলে সূক্ষ্ম এবং শুচি।
ধ্বংস করিতে যাহা কিছু শিবেতর,
এলে দীন বেশে বিপুল শক্তিধর।
লেখনী করিলে তীক্ষ্ণ ও সংযত,—
সব্যসাচীর নিশিত শরের মত।
তারাই তোমার পাশুপত অস্ত্র,
পশুবল তাতে ভয়ে হ'ল ত্রস্ত।
রবির বীণার মহাসঙ্গীত সুর—
নিকট করিল যা ছিল দূর সুদূর।
দেখিলে, দেখালে, পুলকে বিস্ময়েতে,—
বঙ্গের রবি—বিশ্বের রবি হতে।
অভিনন্দিত করিলে বারংবার,
পুণ্যোদয় সে গান্ধী মহাত্মার।
ঘটালো ভারতে যাঁহার আবির্ভাব,
গোটা দেশ আর জাতির মুক্তিলাভ।
কেশর লুটায়ে যাঁহার চরণ-তলে
পশুরাজ হ'ল মানুষ ভূমণ্ডলে।

লোকোত্তর যে প্রতিভায় ধনী দেশ,
দেখাইলে তার নব নব উন্মেষ!
রঙে ও রেখায় যে ভাব লুকানো আছে,
তুমিই প্রকাশ করিলে সবার কাছে।
বন্ধুর মত আনন্দে হাত ধরি'
দেখাইয়া দিলে সে মাধুরী—মরি! মরি!
রসিক শিল্পী কত কবি মহাজন,
সুশোভিত তব করিয়াছে অঙ্গন।
কতই ভ্রমর এল গেল গুঞ্জরি'—
সজল নয়নে আজিকে তাদিকে স্মরি।
তোমার সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত পরিচয়,
আজ ভেবে দেখি—অল্প দিনের নয়।
রবি-পারিজাত পরিমণ্ডলে সবে,
পাত পাতিয়াছি অমৃতের উৎসবে।
রবিরে দেখেছি কত আপনার করি',
এখনো যে মোরা সেই গৌরবে মরি।
আজিও তোমাকে দে'খে আনন্দ পাই
কৈশোরের সে উষ্ণতা কমে নাই।
তব জয়রথে কুসুম চড়াই ফের,
হে প্রবাসী তুমি আত্মীয় আমাদের।
বিরাট সাধনা একটি তপস্বীর
তোমাকে করেছে সেবাব্রতী পৃথিবীর।
জন্মদিন যে আজিকে ষষ্টিতম,
সুস্থ সবল রহিয়াছ মনোরম।
ধন্য হয়েছ সাধকের কৃপা লাভে।
কত শতাব্দী তোমারে প্রণমি' যাবে।
সহায় হউন স্বয়ং যোগেশ্বর,
সঙ্গে রহুন পার্থ ধনুর্দ্ধর,
যেন অখণ্ড জীবন কর্মময়
চির-দিবসের কীর্তি হইয়া রয়।

প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।

পিতৃস্মৃতি

সৌদামিনী দেবী

পিতা শিলাইদহ জমিদারীতে পদ্মানদীতে তাঁহার তিন-চারটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। সেখানে থাকিতেই তিনি সংকল্প করিলেন, দূরে কোথাও নির্জ্জনে গিয়া ঈশ্বর সাধনা করিবেন। সেখান হইতেই ছেলেদের বাড়ি পাঠাইয়া তিনি সিমলায় চলিয়া গেলেন। ইহাদিগকে বাড়ি পাঠাইবার সময় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখনো সোম, রবি ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই। পিতা মনে করিয়াছিলেন, হয়ত তাঁহার বাড়ি ফেরা আর ঘটিয়া উঠিবে না।

তিনি সিমলায় যাইবার দিনকয়েক পরেই সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অনেকদিন তাঁহার চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। একটি গুজব উঠিল, সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব,—বাড়ীর সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল। মা ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। সে এক ভয়ানক দিন গিয়াছে।

কিছুদিন পরে তাঁহার চিঠি পাওয়া গেল; তখন সকলে সুস্থ হইলেন। এদিকে, তাঁহার সিমলা থাকিবার সময়েই পুণ্যেন্দ্র বলিয়া আমার একটি ভাইয়ের মৃত্যু হইল। পিতার কাছে শুনিয়াছি, পুণ্যেন্দ্র মারা যাইবার সংবাদ তিনি পান নাই কিন্তু একদিন সেই প্রবাসেই তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন পুণ্যেন্দ্র কোনো কথা না কহিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা রাত্রির স্বপ্ন নহে, দিনের বেলা জাগ্রৎ অবস্থায় তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সেই সিমলায় থাকিতেই ছোট কাকার মৃত্যু হইয়াছিল—তখনো তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেকথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

রবির জন্মের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল ভট্টাচার্য্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, রবির জাতকর্ম্ম উপলক্ষ্যে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ত্ত করানো হয়। সেই গর্ত্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল। রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্ব্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।

মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্ব্বদাই বিদেশে কাটাইতেন, এই কারণে সর্ব্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনোমতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না—এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জ্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্য্যেরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্ব্বপ্রকার আপদ্ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্ব্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।

যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ী

ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে মা ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, "বস্‌তে চৌকি দাও।" পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, "আমি তবে চল্লেম।" আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্ত এপর্য্যন্ত তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন "ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।"

আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে যে পূজার উৎসব ছিল তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকভাব কিছুই দেখা যাইত না। এই পূজা-অনুষ্ঠান আমোদে উন্মত্ত হইবার একটা উপলক্ষ্যমাত্র ছিল। আমরা ছোট বেলায় শিবপূজা ইতুপূজা প্রভৃতি যাহা দেখিতাম তাহারই অনুকরণ করিতাম। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার নিকট অঞ্জলি দিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে পাইতাম। আমার ঘরে কৃষ্ণের ছবি ছিল, আমি গোপনে ফুল জল লইয়া ভক্তির সহিত সেই ছবির পূজা করিতাম।

একবার পিতা যখন সিমলা পাহাড় হইতে হঠাৎ বাড়ি ফিরিলেন, তখন বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা। সেদিন বিসর্জ্জন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বসিয়া রহিলেন—বাড়ির সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কোন প্রকারে ঠাকুর বিসর্জ্জন দেওয়া হইলে তিনি ঘরে আসিলেন। তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা পূজা উঠিয়া যাইতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে সত্যকে কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া আছি; এমন সময় সেজদাদা একখানি ছোট ছাপানো কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই কবিতাটি মুখস্থ করিয়া লইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। সে কবিতাটি বোধকরি সকলেই জানেন—

একে একে দিবারাত করিতেছে গতায়াত,
তাঁহার শাসনে চলে সকল সংসার হে।

সেজদাদা, মেজকাকীমা ও তাঁর মেয়েদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিতেন। মেজকাকীমা খুব শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন কিন্তু তাঁহার মেয়েরা তাহাতে কান দিতেন না। অবশেষে তাঁহারা শালগ্রাম শিলাটিকে লইয়া আমাদের সম্মুখের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন—আমরা একলা পড়িলাম। আমার মা বহু-সন্তানবতী ছিলেন, এই জন্ত তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না—মেজকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার'পরেই আমাদের যত আবদার ছিল। তিনি যেদিন ভোরের বেলা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইতেন। তিনি অল্পকালের জন্তও দূরে গেলে আমাদের বড় কষ্ট বোধ হইত।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ি আত্মীয়স্বজনে পূর্ণ ছিল। অবশেষে একদিন দেখিলাম প্রায় সকল আত্মীয়ই আমাদিগকে একে একে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পিতামহ তাঁহার উইলে যাহাদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া গিয়াছিলেন, দেখিলাম তাঁহারা আদালতে মকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল করাতে আমাদের বৈষয়িক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল—তথাপি উইল অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়া পিতৃদেব নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার উপর যে অত্যাচার গিয়াছে তিনি ধীরভাবে সমস্ত বহন করিয়াছেন, কখনও ন্যায় পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। যাহারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনাত্মীয় ব্যবহার করিয়াছে, দৈন্যদশায় পড়িয়া যখনি তাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে তখনি তিনি তাহাদের চির-জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা বড় একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা, এমন কি সংস্কৃত শিক্ষা করিত—তাহাদেরই নিকট অল্প একটু শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং

সেকেলে দুই-একখানা গল্পের বই পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করা হইত। আমাদের মা কাকীমারাও সেইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন।

আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইত। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময় পিতৃদেব সিমলাপাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনারি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবল্ পড়াইয়া যাইতেন। মাস কয়েক এই ভাবে চলিয়াছিল। অবশেষে একবার পিতৃদেব আমাদের পড়াশুনা কেমন-তর চলিতেছে দেখিতে আসিলেন। একখানা স্লেটে শিক্ষয়িত্রী আমাদের পাঠ লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন—তাহারই অনুসরণ করিয়া কপি করিবার জন্য আমাদের প্রতি ভার ছিল। স্লেটে লিখিত সেই পাঠের বানান ও ভাষা দেখিয়া পিতা আমাদের এই নিয়মের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তুত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুয্যে মশায় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি মেয়েকে বেথুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে অতি অল্প কয়টি মাত্র ছাত্রী লইয়া বেথুন স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।

মেয়েদের কেবল লেখপড়া শেখানো নয়, শিল্প শেখানোর প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমাদের পরিবারে যখন বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতে পৌত্তলিক অংশ উঠিয়া গেল তখনো জামাইবরণ স্ত্রীআচার প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক প্রথাগুলিকে পিতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই-সকল উপলক্ষ্যে পিঁড়াতে আল্পনা দিবার ভার আমাদের উপর ছিল। ভাল করিয়া ফুল কাটিয়া আল্পনা দিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে আমার ছোট বোনদের চুল বাঁধার ভার আমার উপর ছিল। কেমন চুল বাঁধা হইল এক-একদিন তিনি তাহা নিজে দেখিতেন। তাঁহার পছন্দ মত না হইলে পুনর্ব্বার খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে হইত।

মানসিক বিষয়ে পিতৃদেবের যেমন একটি সূক্ষ্মতা ছিল, ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা যাইত। কোনো প্রকার শ্রীহীনতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সঙ্গীত বিশেষরূপ ভাল না হইলে তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন না। প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান শুনিতে তিনি ভালবাসিতেন। বলিতেন, রবি আমাদের বাঙ্গালা দেশের বুল্‌বুল্। মন্দ গন্ধ তাঁহার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল—সুগন্ধ দ্রব্য সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। ফুল তিনি বড় ভালবাসিতেন। পার্ক স্ট্রীটে যখন তাঁহার কাছে ছিলাম তখন প্রত্যহ তাঁহাকে একটি করিয়া তোড়া বাঁধিয়া দিতাম। মাঝে মাঝে তাহাই ঘ্রাণ করিতে করিতে তিনি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, বলিতেন, ফুলের গন্ধে আমি তাঁহারই গন্ধ পাই। একদিন এইরূপে যখন হাফেজের কাব্যরসে তিনি মগ্ন ছিলেন আমাকে বলিলেন, পেন্সিল লইয়া এস। তাহা লইয়া গেলে তিনি হাফেজের কবিতা তর্জমা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি তাহা লিখিয়া লইলাম। সেগুলি তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হইয়াছিল। সুন্দর পরিপাটী করিয়া কোনো কাজ নিষ্পন্ন না হইলে তিনি কোনোদিন খুসি হইতেন না। আমাদের রন্ধন শিক্ষার জন্য তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন প্রতিদিন একটা করিয়া তরকারী রাঁধিতে

হইবে। রোজ একটা করিয়া টাকা পাইতাম। সেই টাকায় মাছ তরকারী কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত। আমাদের কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা ভাল রাঁধিতে পারিতেন, তিনিই আমাদের শিক্ষক ছিলেন।

বাড়ির মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনার একটি ঘর ছিল। পিতার আদেশ অনুসারে আমরা সাফ কাপড় পরিয়া সেই ঘর প্রতিদিন ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতাম। মহোৎসবের দিনে সেই ঘর ফুল পাতা দিয়া সাজাইতে হইত। আমরা পরমানন্দে সমস্ত রাত জাগিয়া ঘর সাজাইতাম। পিতা সকালে আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে লইয়া সেই ঘরে উপাসনা করিয়া পরে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। সেই উপাসনার ঘরে তিনি প্রতিদিন উপাসনা করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়াইতেন;—কোনো কোনো দিন আমাদিগকে লইয়া গ্রহনক্ষত্রের বিষয় আলোচনা করিতেন। এইরূপে যে-সকল উপদেশ দিতেন, আমাদিগকে তাহা লিখিতে হইত। লেখা ভাল হইলে তাহার পাশে তিনি উৎসাহ-বাক্য লিখিয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে বলপ্রয়োগের কোনো স্থান ছিল না; তিনি যাহা আদেশ করিতেন তাহাই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিতাম—তাঁহার আদেশ আমাদের পক্ষে দেববাক্য ছিল।

বাহিরের দালানে যেদিন লোকসমাগম হইত, উপাসনা-সভা বসিত; মেজদাদা নিজে গান রচনা করিয়া একটি ছোট হার্ম্মোনিয়ম লইয়া মনের সঙ্গে যখন সেই গান গাহিতেন তখন সকলেই মুগ্ধ হইত, এবং আমাদের যে কি ভাল লাগিত তাহা বলিতে পারি না। ধর্ম্মের উৎসাহে মেজদাদা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া একখানি চটি বই তাঁহার অল্প বয়সেই তিনি লিখিয়াছিলেন। তখন মেয়েদের বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে ঢাকা দেওয়া পাল্কীতে যাওয়াই রীতি ছিল—মেয়েদের পক্ষে গাড়ি চড়া বিষম লজ্জার কথা বলিয়া গণ্য হইত। একখানি পাতলা সাড়ি মাত্রই তখন মেয়েদের পরিধেয় ছিল। আমাদের বাড়িতে মেজদাদাই এ-সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারিদিক্ হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নয়। পিতৃদেব নিষেধ করিলে তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের অসাধ্য হইত কিন্তু তিনি ইহাতে কোনো বাধা দেন নাই। তিনি যখন দেখিতেন ছেলেমেয়েরা কোনো মন্দের দিকে যাইতেছে না, তখন কোনো আচারের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি নিষেধ করিতেন না।

আমার পিতার পিসতুতভাই চন্দ্রবাবু আমাদের সম্মুখের বাড়িতেই বাস করিতেন। একদিন তিনি আসিয়া পিতাকে বলিলেন—"দেখ, দেবেন্দ্র। তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাতে বেড়ায়, আমরা দেখিতে পাই; আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?" পিতা বলিলেন, "কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নবাবের আমলে যে নিয়ম খাটিত এখন আর সে নিয়ম খাটিবে না। আমি আর কিসের বাধা দিব, যাঁহার রাজ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।" ছোট মেয়েরা ভাল করিয়া কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই তাহাদের সাড়ি পরা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দর্জ্জি ছিল—পিতা নিজের কল্পনা হইতে নানা প্রকার পোষাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে আমাদের পোষাক অনেকটা পেশোয়াজের ধরণের হইয়া উঠিয়াছিল। আমার সেজ এবং ন বোন অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিল বলিয়া আত্মীয়েরা চারিদিক্ হইতেই মাকে এবং পিতাকে তাড়না করিতেন। মা বিচলিত হইয়া উঠিতেন কিন্তু পিতা কাহারও কোনো কথা কানেই লইতেন না। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে একত্রে আহারের প্রথা পিতার সম্মতিতে আমাদের বাড়িতেই আরম্ভ হয় কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্তই তাঁহার আপত্তি দূর হয় নাই। ব্রাহ্মণদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে তাঁহার উৎসাহ ছিল।

একদিকে প্রাচীন প্রথার সংস্কার আর একদিকে

তাহার রক্ষণ এই দুইই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ় ছিল। এইজন্য সমাজের আচার সম্বন্ধে তিনি যে-কোনো পরিবর্তন তাঁহার পরিবারে প্রবর্তিত করিয়াছেন, সমাজের প্রতি নির্মমতা বশতঃ তাহা করেন নাই। দেশের সমাজকে তিনি আপনার জিনিষ বলিয়াই জানিতেন। সামাজিক প্রথার মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য্য আছে তাহার প্রতি তাঁহার মমতা ছিল। এইজন্য জামাই-ষষ্ঠী ভাই-ফোঁটা প্রভৃতি লৌকিক প্রথা আমাদের বাড়িতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। অনেকে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিল,, তিনি শোনেন নাই। আমি যখন তাঁহাকে খবর দিতাম, আজ ভাই-ফোঁটা, তিনি শুনিয়া হাসিতেন, বলিতেন, "তুমি ফোঁটা দিয়াছ—আমরা যম রাজার দুয়ারে কাঁটা দিতে যাই না, যিনি যমরাজের রাজা তাঁহার কাছে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করি।"

একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে;—এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল লোকও যে পথে অনায়াসে চলিতে পারে তখনকার কালের বিশেষ শক্তিমান্ লোকের পক্ষেও তাহা দুর্গম ছিল। তাছাড়া একথাও মনে রাখা চাই, একবার পথে বাহির হইলে সেপথে চলা তেমন কঠিন নহে, কিন্তু পথ দেখানই শক্ত। সামাজিক উন্নতির পথে এখনকার কালের দ্রুতগামীরা পিতৃদেবের মৃদুগতিকে মনে মনে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, তখন যে রাস্তা ছিল তাহা পায়ে হাঁটিবার মত; প্রত্যেক পদক্ষেপেই নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত; এখন সেখানেই অবাধে গাড়ি চলিতেছে, তাই বলিয়া রথারোহীরা যে পদাতিকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এমন কথা যেন তাঁহারা কল্পনা না করেন—এবং একথাও বোধহয় চিন্তা করিবার যোগ্য যে তখনকার রাস্তায় অন্ধবেগে গাড়ি হাঁকাইলে আরোহীদের পক্ষে তাহা কল্যাণকর না হইতে পারিত।

একদিন কেশববাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার সঙ্গে যোগদান করিলেন তখন চারিদিকে ধর্মোৎসাহ যে কিরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে পড়ে। পিতা তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দজি বলিয়া ডাকিতেন ও পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। বুধবারে সমাজে উপাসনার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির দালানে যখন সকলে মিলিয়া গান ধরিতেন—

"সবে মিলে মিলে গাও রে,—
তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল,
কেহ থেকো না নীরব"——

তখন কি উৎসাহের আনন্দে আমাদের মন উদ্বোধিত হইয়া উঠিত! সমাজবাড়ি মেরামত হওয়ার উপলক্ষ্যে আমাদের বাড়ির দালানে রাত্রিতে উপাসনাসভা বসিত—তখন আমরা ছেলেমানুষ—কিন্তু উপদেশে, গানে, বক্তৃতায় ঈশ্বরের প্রেমরসে মানুষের মন যে কেমন করিয়া অভিষিক্ত হইত তাহা আজও ভুলিতে পারি না।

একবার মাঘোৎসবের আগের দিনে মামা আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন—"কর্ত্তা বলিয়া দিলেন, কাল কেশববাবুর স্ত্রী ও আর দুইজন মেয়ে আসিবেন—তোমরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়ানো ও দেখাশোনা করিবে—কোনো ত্রুটি না হয়।" তাহার পরদিন কেশববাবু প্রতাপবাবু ও অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসিলেন।

কেশববাবুর স্ত্রী তিনচার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন আত্মীয়স্বজনেরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন না। সেই সময়ে কেশববাবুর স্ত্রীকে আমাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমরা বড় আনন্দে ছিলাম। প্রথমটা তাঁহার মন বিমর্ষ ছিল—বিশেষত তাঁর একটি ছোট ভাইয়ের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হইত। সেই সময় সোম রবি ও সত্য শিশু ছিল—তাহাদিগকে তিনি সর্বদা কোলে করিয়া থাকিতেন—বলিতেন, রবিকে তাঁহার সেই ছোট ভাইটির মত মনে হয়। সত্য তাঁহাকে মাসী বলিতে পারিত না, "মাকি" বলিত, তাহাতে তিনি আমোদ বোধ করিতেন। তাঁহাকে আমাদের ভগিনীর মতই মনে হইত।—তিনি যাইবার সময় আমরা বড় বেদনা পাইয়াছিলাম।

আমরা যখন কিছুদিন নৈনানের বাগানে ছিলাম তখন সেখানে কেশববাবুর বড় ছেলে করুণার অন্নপ্রাশন হইয়াছিল। তখনকার সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সমারোহে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দশ-পনোরো দিন আগে হইতে আমরা পিঁড়িতে আল্পনা দিতে নিযুক্ত ছিলাম। এই কাজে আমরা প্রশংসা পাইয়াছিলাম।

চুঁচুড়ার বাড়িতে পিতার যখন কঠিন পীড়া হয় তখন আমি আর আমার ন বোন স্বর্ণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আমাদের কোন অসুবিধা হয় সেজন্য তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই অবস্থাতেই আমার শোবার থাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া কেহ কোনো বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না;—এমন কি ভৃত্যদেরও কোনো অসুবিধা তাঁহার ভাল লাগিত না।

চুঁচুড়ায় থাকিতে তাঁহার একদিন জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল, বিকাল হইতে জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন। ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া বলিল, এই জ্বর ত্যাগের সময় বিপদের আশঙ্কা আছে, সেই সময়েই নাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে—অতএব সাবধান থাকা আবশ্যক। রাজনারায়ণ বাবু সেই রাত্রে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার বেদানার রসে আর্সেনিক মিশাইয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহাই কাপড়ে ভিজাইয়া তাঁহার জিভে দিতেছিলাম এবং ডাক্তার কেবলি নাড়ি পরীক্ষা করিতেছিলেন। নাড়ি দুর্ব্বল; ভোরের বেলাটাতে ভয়ের কথা। কিন্তু সকালবেলায় জ্ঞান হইবামাত্রই তিনি উঠিয়া বসিয়া শাস্ত্রীকে বলিলেন, রাজনারায়ণবাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাক। শাস্ত্রী ভয় পাইলেন, পাছে এই অবস্থায় কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া দুর্ব্বলতা বাড়িয়া যায়। রাজনারায়ণবাবু কাছে আসিয়া বসিলেন। পিতা বলিলেন, "দেখ, আমি ঈশ্বরের আদেশ পাইলাম, যে এ যাত্রায় তুমি রক্ষা পাইলে। তোমার এখনো কাজ বাকি আছে; আমার দিকে আরো তুমি অগ্রসর হও।"

সকল কর্ম্মই তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ও ন্যায়পথে থাকিয়া নির্বাহ করিয়াছেন। যখন পার্ক ষ্ট্রীটে তাঁহার কাছে ছিলাম, দেখিতাম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি একই চৌকিতে সমানভাবে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তায় দিন কাটাইয়াছেন—স্নানাহার ছাড়া আর সমস্ত ক্ষণই তাঁহার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকিত। কোনো দিন যখন কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলিতে যাইতাম, তিনি বলিতেন, আমি কোথায় ছিলাম, আমাকে কোথায় আনিলে,—তখন মনে অনুতাপ হইত।

বয়সের শেষভাগে যখন পিতৃদেব পার্ক ষ্ট্রীটে ও জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া ছিলেন তখনি তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার পূর্বে প্রায়ই তিনি বিদেশে নির্জ্জনবাসে দিনযাপন করিয়াছেন। যখন চিঠিতে তাঁহার বাড়ি আসিবার খবর আসিত, তখন আমাদের এত আনন্দ হইত যে, যে লোক সংবাদ দিত তাহাকে পুরস্কার দিতাম। সকালে তিনি আমাদের সকলকে একত্র করিয়া দালানে উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তিনি একবার আমাদের দেখিয়া লইতেন। বাহিরে গিয়া মামাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, অমুককে আজ ভাল দেখিলাম না কেন, অমুককে যেন বিমর্ষ বোধ হইল। ক্ষণকালের দৃষ্টিতে তিনি আমাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া লইতেন। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কত কাজ করিয়াছি কিন্তু কখনো তিনি আমাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন নাই। তিনি যখন মিষ্টস্বরে মা বলিয়া ডাকিতেন তখন সে যে কি মধুর লাগিত তাহা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। তেমন মধুর বাণী আর কাহারো মুখে ত শুনিতে পাই না। এত বড় বৃহৎ পরিবারকে তিনি তাঁহার স্নেহপূর্ণ মঙ্গলকামনায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সর্বপ্রকার সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া নীরবে নিয়ত সকলের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

২

পিতৃদেবের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। একবার

তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম, শিশু অবস্থায় মার কোলে শুইয়া তিনি ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইতেছেন সেকথাও তাঁর অল্প অল্প মনে পড়ে। তাঁহার বালককালের একটি ঘটনা তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর হইবে। ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, ঘরে কেহই নাই, সিংহাসনের উপর শালগ্রাম ঠাকুর। আমি সেই শিলাটিকে আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া মাটিতে গড়াইয়া মনের আনন্দে খেলা করিতেছি—ওদিকে পূজারি ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখে যে সিংহাসনে ঠাকুর নাই। ঠাকুর কে লইল বলিয়া মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেছে; চারিদিকে খোঁজ খোঁজ করিতে করিতে একজন আসিয়া দেখে যে আমি তাহা লইয়া নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি। বাড়ির মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, দেবেন্দ্র, এ কি সর্বনাশ—ঠাকুরকে লইয়া খেলা! কি মহা বিপদই না জানি ঘটিবে! পুনর্বার অভিষেক করিয়া ঠাকুরকে সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল। তাহার পরে যাহাতে আমার কোনো অনিষ্ট না হয় সেজন্য শান্তি স্বস্ত্যয়নের ধুম পড়িয়া গেল।"

পিতামহের আমলে দুর্গোৎসব যেমন আমাদের বাড়ির সামাজিক আনন্দোৎসব ছিল এবং এই উৎসব যেমন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, পিতার ইচ্ছা ছিল মাঘোৎসবকে তিনি সেইরূপ আমাদের বাড়ির আনন্দ সম্মিলনের মত করিয়া তুলিবেন। যখন তাঁহার হাতে এই উৎসবের ভার ছিল তখন মাঘমাসের প্রথমদিন হইতেই কাজকর্ম আরম্ভ হইত; ভৃত্যেরা কাপড় পাইত, পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনদিগকে কাপড় দেওয়া হইত; কাঙ্গালী বিদায়েরও বিশেষ আয়োজন হইত। পূর্ব্বে পূজার সময়ে যেরূপ বৃহদাকারের মেঠাই তৈরী হইত, এগারই মাঘেও সেইরূপ মেঠাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেই বড় বড় মেঠাইয়ের স্তূপ সকালবেলা হতে বাইরের ঘরে টেবিলের উপর সাজানো থাকিত; যাহার যখন ইচ্ছা খাইতেন—কোনো বাধা ছিল না। একবার উৎসবের দিন ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আসিয়া তাঁহার এক জামাতা এই মিষ্টান্নরাশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া "বাঃ, কেয়া বাৎ হ্যায়" বলিয়া মনের উচ্ছ্বাস যেমন প্রবল কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন অমনি দেখিলেন, সম্মুখে পিতা আসিয়া তাঁহার সেই আনন্দ আবেগে হাস্য করিতেছেন। তিনি ত লজ্জায় মাটি হইয়া গেলেন। উৎসবের রাত্রিতেও আহারের আয়োজন অবারিত ছিল—যে যখনই আসিত আহার করিতে বসিয়া যাইত।

পয়লা বৈশাখে বর্ষারম্ভের উপাসনার পর আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া গিনি দিয়া আশীর্বাদ করিতেন। সেদিন দুপুর বেলায় বাদামের কুলপির বরফ তৈরি করাইয়া আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। আমরা তাহা সকলে আনন্দে ভাগ করিয়া খাইতাম। ১লা বৈশাখে প্রথম অরুণোদয়ে প্রত্যূষের নির্মল স্নিগ্ধতার মধ্যে মধুর গানে ও পিতৃদেবের হৃদয়গ্রাহী উপদেশে আমাদের সকলের মন আরাধনার ভক্তিরসে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। আজ মনে হয় যেন সেই এক পবিত্র সত্যযুগ চলিয়া গিয়াছে।

যখন পিতা বক্রোটায় ছিলেন, তখন মনে আছে তিনি মাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—দেখ, ছোটকাকা আমাকে পত্র দিয়াছেন, তুমি আর দেশ ছাড়িয়া কতদিন পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইবে—বাড়িতে আসিয়া বড়লোকের ছেলেদের মত দশ-পাঁচটি মোসাহেব রাখিয়া পাঁচজনকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে দিনযাপন কর—আত্মীয়বন্ধু ছাড়িয়া তুমি একলাটি কি করিয়া জীবন কাটাইতেছ।—তাঁহার ছোটকাকা মনেও করিতে পারিতেন না, নিজের মন ভোলাইবার ও দিন কাটাইবার জন্য তাঁহাকে একমুহূর্তকালও পাঁচজনের মুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

পীড়ার সময় যখন তাঁহাকে ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছিল তখন একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "এ ডাক্তার আমার কি করিবে, আমার যিনি ডাক্তার তিনি সর্ব্বদা আমার কাছে কাছেই

থাকেন। আমি যখন একবার কাশ্মীরে পাহাড়-ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম তখন আমার শরীর ভাল ছিল না। আমাদের প্রবাসের বন্ধুরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিয়া গেলেন, এখন আপনার বাহির হওয়া উচিত হইবে না—আগে শরীর সুস্থ হউক, তাহার পরে যেমন ইচ্ছা করিবেন। আমি তাঁহাদের কাহারও বারণ শুনিলাম না। ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছি। কোথায় যাইব এবং কোথায় থাকিব তাহার কোনো ঠিকানা নাই। চাকরদের বলিয়া দিলাম তোরা যেখানে পাস একটা কোনো আশ্রয় ঠিক করিয়া রাখ। তাহারা একটা ভাঙ্গাবাড়ী খালি পাইয়াছিল। সেখানে একটা খাটিয়া পড়িয়াছিল তাহারই উপরে তাহারা আমার বিছানা করিয়া রাখিয়াছিল। সেইখানে গিয়া আমি ত শুইয়া পড়িলাম। একে শরীর অসুস্থ, পথে কিছুই আহার করি নাই। তাহার পরে ঝাঁকানি, ক্লান্তি ও দুর্বলতায় আমাকে যেন একেবারে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি খাটিয়ায় শুইয়া চোখ বুজিলাম, আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কাহার কোলের উপর শুইয়া আছি—আমার বড়ই আরাম। সকালে উঠিয়া চাকরদের বলিলাম, চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি কোথাও দুধ পাওয়া যায়। তাহারা দুইজনে ঘটী লইয়া দুধের সন্ধানে বাহির হইল। কিছুদূর যাইতেই দেখে একটা গাভী আসিতেছে। সেই গাভীটাকে একজন ধরিল ও আর-একজন তাহার দুধ দুইয়া লইল। সেই দুধটুকু খাইয়া মনে হইল যেন আমার জীবন ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আমি সারিয়া উঠিলাম এবং শরীরে বল পাইলাম। নিজের ঘরে গোরু পুষিলাম—সেই গোরু রোজ দশসের দুধ দিত। সেই দুধ ও তাহার ঘি মাখন খাইয়া এবং খুব করিয়া বেড়াইয়া আমি একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। সেখানে আমার ডাক্তার কবিরাজ কে ছিল, কে বা আমার এই দুধের পথ্য জোগাইয়াছিল?"

পার্ক স্ট্রীটে যেদিন আমরা সকল ভাইবোনে মিলিয়া পিতার জন্মোৎসব করিতাম সেদিন আমাদের বড়ই আনন্দের দিন ছিল। সেদিন পরিবারের সকলেই একত্র হইতেন। তিনি মাঝখানে চৌকিতে বসিতেন, আমরা সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম।—বড়দাদা' সময়োচিত কিছু একটা লিখিয়া পাঠ করিতেন। রবি গান করিত। তিনি ফুল বড় ভালবাসিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ফুলের তোড়া, ফুলের সাজি আনিয়া উপহার দিত।—আমরা ফুল দিয়া তাঁহার সমস্ত ঘরটি সাজাইয়া দিতাম। ছেলেমেয়ে জামাতা বধূ দৌহিত্র পৌত্র সকলে মিলিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেছে, এত বড় মঙ্গলের সাজিভরা আনন্দ-উপহার সুদীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যাকালে কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে? আমাদের সেই আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না, সেই পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাকন্যা কর্ত্তৃক লিখিত।)

প্রবাসী, চৈত্র, ১৩১৮।

রাজা রামমোহন রায়

অশোক চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটি বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল যুগের সকল অঙ্গের যে নির্ভুল পরিচয় পাঠকদিগকে দিয়াছে তাহা শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক সমাজে সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এই কারণেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যেহেতু ডাঃ সুকুমার সেন জ্ঞানানুসন্ধানে একান্ত ভাবে সত্য পথের পথিক এবং বিদ্যার ক্ষেত্রে সত্যের প্রতিষ্ঠার যে মহান্ দায়িত্ব সে সম্বন্ধে সদা জাগ্রত। বাংলা ভাষার উন্নত ও সুগঠিত রূপ ধারণের মূলে যে-সকল মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টা ও হৃদয়াবেগ-উদ্বুদ্ধ কর্মশক্তি প্রায় দেড়শতাধিক বৎসরেরও পূর্ব্বে নিযুক্ত থাকিতে লক্ষ্য করা গিয়াছে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি যদিও সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ কর্মধারার বিভিন্ন স্রোতের গতি নানা ভাষায় গদ্য রচনার উপরেই বিশেষ করিয়া নির্ভর করিত। তিনি ফারসী, আরবী, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, বাংলা ও অপরাপর ভাষা ব্যবহারে বহু পুস্তিকা, বিচার-বিতর্কাদি লিখিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত হইতে ভাষান্তর করিয়া ইংরেজীও বাংলাতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা তৎকালে খৃষ্টান ধর্মযাজক সমাজে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন: "রামমোহন রায়ই প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি খৃষ্টধর্মের প্রসার ও প্রচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বধর্মনিষ্ঠ অন্য ব্যক্তিরা খৃষ্টধর্মকে হেয় জ্ঞান করিলেও শাসকদের ধর্মকে প্রকাশ্যে নিন্দা করিতে নামেন নাই। তাঁহারা জাত বাঁচাইয়া খৃষ্টীয় যাজকদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচরণ শক্তিশালী ও সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরোধ বলিয়া পাদরিরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই পণ্ডিত বিরোধ যাহা মৃত্যুঞ্জয়(বিদ্যালঙ্কার)শুরু করিলেন তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। রামমোহনের মৃত্যুর বিশ-পঁচিশ বছর পরেও এমন অনেক নক্শা নাটক ও গান লেখা হইয়াছিল যাহাতে রামমোহন কলি অবতার বলিয়া মসীলেপিত।" মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরি সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান সহকারী পণ্ডিত। তিনি যে পাদরিদিগের শত্রু রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিয়া লেখনী চালনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। রামমোহন বিরোধ যাঁহারা করিতেন তাঁহারা অনেকেই পাদরিদিগের প্ররোচনাতেই ঐ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য অনেক পণ্ডিত ছিলেন যাঁহারা রামমোহনের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা ধর্ম-বিরুদ্ধ মনে করিতেন বলিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধেযুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে হয় যে, সনাতন-

পন্থী বহু ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের নিন্দাবাদে যে নামিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল পাদরীদিগের রামমোহন-বিদ্বেষজাত প্ররোচনা। বহু বৃটিশ জাতির কর্মচারী ব্যবসাদারও যে রামমোহনের সমাজ-সংস্কারে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেন তাহার মূলেও ছিল পাদরি-মস্তিষ্ক উদ্ভূত প্রেরণা।

সেই যুগের যে রামমোহন-বিদ্বেষের ধারা তাহা অদ্যাবধি বাংলার কোন কোন আত্মনিয়োজিত পণ্ডিতের মনের গভীরে অন্তঃসলিল প্রবাহে গতিমান্ থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের অকারণ-আগ্রহ-প্রসূত মসীলেপন চেষ্টা সর্বভাবেই নিষ্ফল হইলেও তাঁহারা নিজেদের স্বভাবজাত রাহুধর্ম ত্যাগ করিতে অক্ষম। সূর্য্য-কিরণের মতই যাঁহার মাহাত্ম্য ও দীপ্যমান প্রতিভা মানব মনের অন্ধকার বিনাশ করিয়া জ্যোতির্ময় রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া প্রগতির পথ আলোকিত করিয়া গিয়াছে; সেই মহামানবের পুরুষকার খর্ব করিয়া লোকমানসে বিভ্রান্তি সৃজন চেষ্টা কখন সক্ষম হইতে পারে না। যে মহাপুরুষকে স্পেন দেশের সংবিধান প্রাপ্ত হইলে পরে তদ্দেশের রাষ্ট্রনেতাগণ ১৮১২ খৃঃ অব্দে তাহার প্রথম সংস্করণ উৎসর্গ করিয়া সেই সংবিধান মুদ্রিত করিয়াছিলেন; যাঁহাকে ইয়োরোপের খ্যাতিমান্ ব্যক্তি-গণ, (যথা রবার্ট ওয়েন, জেরেমি বেনথাম প্রভৃতি) ইরাসমাস, এমন কি সোক্রাটিস, প্লেটো ও অ্যারিসটট্‌ল-এর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ নিজ প্রাসাদে ভোজন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাসী অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের প্রথম ইংরেজীনবিশ, বহু ভাষা ভাষী, বিশিষ্ট জ্ঞান ও গুণাবলীর আধার, দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি, হিন্দু শাস্ত্রসকলের পুনরুদ্ধারকর্তা রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞান গুণ ও কর্মশক্তি অর্জিত উচ্চাসন হইতে যাঁহারা তাঁহাকে নিম্নস্তরে নামাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিকৃত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া জাতির বা কোন ব্যক্তির কোনও অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং সে কথার উল্লেখ মাত্র করিয়াই এই প্রসঙ্গের বিচার শেষ করা যাইতেছে।

রাজা রামমোহন রায় নানা ক্ষেত্রে নিজ কর্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বহু বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বাংলা গদ্যকে অনেক স্থলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধিত্র করিয়াছিলেন। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন:

"গীর্জা ও পাঠশালার বাহিরে আনিয়া বিচার বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া, বাঙ্গালা গদ্যকে জাতে তুলিলেন আধুনিক কালের পুরোভূমিকায় সবচেয়ে শক্তিশালী ও মনস্বী ব্যক্তি রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), যাঁহার কর্ম ও চিন্তা, উদ্যম ও মনীষা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের মত রামমোহন সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথবা ফারসীনবীশ ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত জানিতেন, ফারসী (এবং আরবী সম্ভবত) আরও ভালো করিয়া জানিতেন, তিনি ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিতদের অগ্রণী। বহুভাষী রামমোহন ষ্টাইলের দিকে নজর না দিয়া বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার হাতে বাঙ্গালা গদ্যের যে রূপ গঠিত হইল তাহাতে মাধুর্য না থাক স্পষ্টতা ছিল, কার্যোপযোগিতা ছিল। এখনকার দিনে, ছেদচিহ্নবিরল রামমোহনের বাক্যাবলী উদ্ভট ঠেকিতে পারে কিন্তু সে সময়ের কলেজি রচনার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে বোঝা যাইবে কেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত প্রাচীনতার ভক্তও বলিয়াছিলেন, 'দেওয়ানজী জলের মত বাঙ্গালা লিখিতেন।' এ সত্য রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ লেখক মৃত্যুঞ্জয়ও তাঁহাকে গালি দিতে গিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে রামমোহন সংস্কৃত ছাড়িয়া এবং 'সাধু ভাষার' কাছ না ঘেঁষিয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তার করিয়া অসৎ আচরণ করিয়াছেন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মতে তাঁহার স্থায় "সাধুভাষার হৃদয়ার্থ-

বোদ্ধা সৎপুরুষের" পক্ষে "নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ" করাও মহা কষ্টকর বিবেচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং রামমোহন লৌকিক ভাষা ব্যবহার করিয়া মহা অন্যায় করিয়াছিলেন। ডাঃ সেন তৎপরে রামমোহনের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য ভাষার পূর্ণতর গঠনের বর্ণনা করিয়া বলেন :

"শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের ও খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধতা করিয়া রামমোহন উপনিষদ-বেদান্ত-আশ্রিত একেশ্বর ব্রহ্ম উপাসনার প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিলেন। তিনি ঈশা কেন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ করিলেন, কয়েকটি পরমার্থতত্ত্ব গান লিখিলেন, গীতার পদ্য অনুবাদ করিলেন (বা করাইলেন) এবং সর্বপ্রথম বাহির করিলেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫)। এই গ্রন্থ দুইটিও অনুবাদাত্মক। রামমোহনের বিরুদ্ধে পাদরিরা খাড়া করিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে। রামমোহনের বেদান্তব্যাখ্যা ও বেদান্তব্যাখ্যার প্রচেষ্টা দুইয়েরই নিন্দা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় লিখিলেন 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রথম খণ্ড (১৮১৭)। তাহার উত্তরে রামমোহন একটি ৬৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা লিখিলেন। ইহাতে কোন নাম দেওয়া ছিল না। পরে ইহা 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নাম পাইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের অভিযোগ দুর্বাক্যপূর্ণ, কিন্তু প্রত্যুত্তরে রামমোহন দুর্ভাষণ হইতে সন্তর্পণে দূরে রহিয়াছিলেন। ভূমিকায় ভট্টাচার্যের বেদান্ত আলোচনাকে স্বাগত করিয়া রামমোহন বলিতেছেন যে তিনি বেদান্তচন্দ্রিকার প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় আছেন।

'কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাকে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছা পূর্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়।...অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এ গ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্য লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত যে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে ২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য দুষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠা এবং পংক্তির নির্দেশ পূর্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য কৃপা পূর্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্বের ন্যায় দুর্বাক্য পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি।'

"এই প্রার্থনা করিয়া রামমোহন পুস্তিকা শেষ করিয়াছেন।

'হে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসা মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত করাইবে না ওঁ তৎ সৎ।'

"বলা বাহুল্য ভট্টাচার্য আর লেখনী ছুটান নাই।

"রামমোহনের বিচার-বিশ্লেষণের সরল রীতির পরিচয় হিসাবে পুস্তিকাটি হইতে আরও একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'ঐ ৬৩ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, "হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা আমরা তোমাদিগ্যে জিজ্ঞাসি তোমরা কি" ইত্যাদি। উত্তর। আমাদিগে

সোপাধি জীব কহিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না এ কারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব রাখি না এবং ভট্টাচার্যের উপকৃতি স্বীকার করি যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয় এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষসকল দেখিতে পাইতেছিলাম না ভট্টাচার্য তাহা জ্ঞাত করাইতেছেন উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয়।...'

"'ভট্টাচার্য' নিবৃত্ত হইলেন। তাহার পর আসিলেন 'গোস্বামী'। তাঁহার আপত্তির জবাবে রামমোহন দ্বিতীয় পুস্তিকাখানি লিখিলেন, যাহা 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নামে প্রসিদ্ধ। বিষয় ঈশ্বরের সাকারত্ব-নিরাকারত্ব। পুস্তিকাটির আরম্ভ এইরূপ।

'অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্ত ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন।'

"ভট্টাচার্যের অভিযোগ দুর্বাক্যপূর্ণ ছিল, গোস্বামীর অভিযোগে কোন দুর্বাক্য ছিল না। 'গোস্বামী'র পরে যিনি প্রতিবাদ তুলিলেন তিনি কটূক্তির পথ ধরিলেন। ইঁহাকে জবাব দিতে গিয়া রামমোহন যে পুস্তিকা লিখিলেন তাহা 'কবিতাকারের সহিত বিচার' নামে প্রসিদ্ধ। ভূমিকার গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 'ওঁ তৎ সৎ। ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানা প্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্ট লোকসকল হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে ২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন যদ্যপিও আমাদের কোন ২ আত্মীয়ের আপাতত বাসনা ছিল যে ঐ সকল বাক্যের অনুরূপ উত্তর দেন কিন্তু অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তাহার কথন লোকত ও ধর্মত বিরুদ্ধ জানিয়া মহাভারতীয় এই শ্লোকের স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন...'

"রামমোহনের পঞ্চম প্রতিবাদ-পুস্তিকা 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩) কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর প্রত্যুত্তর।

"রামমোহন সংবাদপত্র পরিচালনাতেও অগ্রণী ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক ও সংবাদ পত্র 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহার পর রামমোহন Brahmunical Magazine ও 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় (১৮২১) এবং 'মীরতুল আখবার' নামে ফারসীতে (১৮২২) পত্রিকা বাহির করেন।

"রামমোহন ইংরাজীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন (১৮২৬)। এই বইটি লেখক কর্তৃক 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হয় এবং রামমোহনের মৃত্যু হইবার পরেই (১৮৩৩) ইহা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বইটির আকার ছোট কিন্তু ইহার আগে প্রকাশিত কেরি প্রভৃতির ব্যাকরণের তুলনায় অনেক ভালো। ব্যাকরণখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু কলেজে নীচের শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। এখনকার বাঙ্গালা ব্যাকরণের পরিভাষা অনেক পরিমাণে রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ হইতে নেওয়া। (তবে রামমোহন আমাদের অপেক্ষাও 'প্রগতিশীল' ছিলেন, কেননা তিনি সম্প্রদান কারক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সম্বন্ধ পদকে কারক

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।) ব্যাকরণের মধ্যে রামমোহন সিনট্যাকসও ধরিয়াছিলেন। রামমোহনের ব্যাকরণ সূত্র যে কেমন সহজ ছিল তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

'কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ এই ষট্ কারক, ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, সম্প্রদানের উদ্বোধক কোন শব্দ বা বিশেষ রূপ না থাকাতে তাহার ব্যবহার নাই। সংস্কৃত ভাষায় সম্বন্ধ, কারক না হইলেও ভাষাতে কারক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।.........

'কর্ম দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ। যাহাতে সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপ্তি হয় তাহার নাম মুখ্য, এবং যাহাতে পরম্পরায় ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয় তাহার নাম গৌণ।'

"রামমোহন রায়ের এই ভালো ব্যাকরণখানি ছিল বলিয়াই বোধ করি বিদ্যাসাগর শিশুপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লিখেন নাই।"

রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গদ্য ভাষা ব্যবহারের গোড়ার কারণ ছিল শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদে আগ্রহ; সমাজ-সংস্কার-বিরোধী পণ্ডিতদিগের সমালোচনার প্রত্যুত্তর দানের প্রয়োজনে পুস্তিকা রচনা; নিজ আদর্শ প্রচার ও বিস্তার চেষ্টা এবং ইংরেজী ধরণের সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা। তাঁহার সৃষ্ট গদ্য রচনা প্রণালী অনুসরণে পরে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ গদ্য প্রণয়ন কার্য্য আরও অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষির সন্তানগণ বিশেষ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই কার্য্যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। মহর্ষির সমসাময়িকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির কার্য্যে মহাক্ষমতাবান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রহিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আরও যাঁহারা মহাকর্মী বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা হইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও পদ্যে-নাটকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রাজা রামমোহন রায় যে প্রগতি প্রবাহের ধারা বহমান করিয়া দিয়া বাঙ্গলা গদ্যের নূতন রূপের সৃষ্টি করিয়া দিলেন; তাহারই অনুসরণে একের পর এক করিয়া বহু লেখক সেই ভাষা প্রবাহকে আকারে প্রকারে বহুধা বিস্তৃত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। পাদ্রিদেগের অনুচর, সমাজসংস্কার নিবর্তক, রামমোহন বিরুদ্ধতা নিবিষ্ট, প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিতগোষ্ঠী কিছুকাল বেতনভোগী যোদ্ধার বেশে জাতির সংস্কার রণাঙ্গনে লম্ফ ঝম্প করিয়া ও পাঠ্য পুস্তকাদি রচনায় কিছু কিছু শক্তি প্রদর্শন করিয়া ভাষা গঠন ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সংবাদপত্র প্রকাশেও নূতন প্রতিভার সমাবেশ হইতে লাগিল এবং জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তিও নানাভাবে নানারূপে আকৃতি লাভ করিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভাষা গঠন কার্য্যে ক্রমবিকশিতভাবে শেষাবধি আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার আবির্ভাব হইল। এই পরিণতির মূলে আছেন রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার আগ্রহের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে তাঁহার বাল্যে ও যৌবনে সমাজের অবস্থা যেরূপ কুরীতি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল তাহাতে উন্নতচরিত্র মানুষ মাত্রেরই আত্মসম্মানবোধ আহত হইতে পারিত। যে সকল বর্বর রীতি নীতি ও সামাজিক প্রথা সে যুগে ভারতীয় মানবকে অজ্ঞানতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া জাতিকে পর-দাসত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়া ভারতের প্রাচীন উচ্চ সভ্যতা ও জ্ঞানের ঐতিহ্যকে একটা অবিশ্বাস্য উপকথার আকার দিয়াছিল; সেই সকল সামাজিক ব্যাধির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল সতীদাহ প্রথা, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ (কৌলীন্য প্রথা জাত), স্ত্রীশিক্ষার অভাব, স্ত্রীলোকদিগের উত্তরাধিকারে বাধা, জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহে বাধা, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব,

সদ্যজাত শিশুদিগকে জল গর্ভে নিক্ষেপ করা, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকলের সহিত দেখা যাইত, হিন্দু-মুসলমানদিগের তুলনায় খ্রীষ্টানদিগের (শ্বেত-কৃষ্ণ উভয় জাতীয়) শ্রেষ্ঠতার অধিকার (আদালতে জুরি ইত্যাদিতে), হিন্দু-মুসলমানদিগের নানা প্রকার অধিকারের অভাব; ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থার অভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামমোহন রায় অতি অল্প বয়সেই পাটনায় ফারসী ও আরবী শিক্ষার্থে গমন করেন ও তৎপরে বেনারসে সংস্কৃত পাঠ করিতে যান। তিনি যে এই সকল ভাষা ১৬ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ আছে। তিনি ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পৌত্তলিকতা-বিরুদ্ধ একটি পুস্তিকা রচনা করিয়া পিতার সহিত মনান্তরে লিপ্ত হইয়া পড়েন ও পরে ঐরূপ অপর একটি পুস্তিকা রচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতে ভ্রমণে চলিয়া যান। ১৭৮৯-৯০ বৎসরে তিনি তিব্বত গমন করেন ও সেই দেশের রাজধানী লাসায় থাকিয়া প্রায় দুইবৎসর মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এইখানে লামাদিগের সহিত তর্কবিতর্কের ফলে তাঁহার প্রাণনাশ সম্ভাবনা হয়; কিন্তু তিব্বতী মহিলাদিগের সাহায্যে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। নারীদিগের সাহায্যে প্রাণরক্ষা হওয়াতে তিনি আজীবন নারী জাতির প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করেন ও তাঁহাদিগের সুখ সুবিধা স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্মমত লইয়া ভ্রাতা ও পিতার সহিত কলহের ফলে তিনি ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে গৃহত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। নিজের ব্যবসা পৃথকভাবে আরম্ভ করিয়া রামমোহন ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে দুইটি তালুক (রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর) ক্রয় করিয়া নিজ বন্ধু রাজীবলোচনের হস্তে তাহার পরিচালনা ও খাজনা আদায় প্রভৃতির ভারার্পণ করেন। রাজীবলোচন আদায়ের টাকা তাঁহাকে নিয়মিত পাঠাইতে থাকেন।

১৮০১ খৃঃ অব্দে রামমোহন জন ডিগবির সহিত পরিচিত হ'ন। এই সময় তিনি অল্প অল্প ইংরেজী বলিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার ইংরেজীর জ্ঞান অধিক ছিল না। তিনি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে তুফাতুল-মুয়াহিদ্দিন পুস্তিকা ফারসী ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন। ইহা একেশ্বরবাদের সমর্থনে লিখিত হয় ও ইহার ভূমিকা লিখিত হয় আরবী ভাষায়।

রামমোহন রায় অতঃপর জন ডিগবি ও টমাস উডফোর্ড এই দুই রাজকর্ম্মচারীর সহিত নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রায় ১৩।১৪ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ডিগবি তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করায় বোর্ড অফ রেভিনিউ তাঁহার সে নিয়োগ খারিজ করেন। ডিগবি তাঁহাদের এই কার্যের বিরুদ্ধে সতেজ প্রতিবাদ করেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ডিগবি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। রামমোহন অতঃপর পাকাপাকি কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে তিনি "আত্মীয় সভার" প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার পরে যে সকল রচনা প্রকাশ করেন তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নীচে দেওয়া হইল।

১৮১৫ বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার, বাংলা অনুবাদ। ১৮১৬ ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (বাংলা)। ১৮১৬ কেনোপনিষদ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ। ১৮১৬ ঈশোপনিষদ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ। বেদান্তের সারাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ। ১৮১৬ সংস্কৃতে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার। ১৮১৭ বাংলায় বর্ত্তমান যুগের হিন্দু পূজা পদ্ধতির দোষ ত্রুটির আলোচনা। ১৮১৭ বদরায়ণের বেদান্তসূত্রের বাংলা অনুবাদ। বাংলায় বেদান্তসার। ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত বেদান্ত। ১৮১৭ কঠোপনিষদের বাংলা অনুবাদ। ১৮১৭ মণ্ডুক্যোপনিষদের বাংলা অনুবাদ। ১৮১৭ ইংরেজীতে কেনোপনিষদ। ইংরেজীতে হিন্দুদিগের আস্তিক্যবাদ। বেদে একেশ্বরবাদ লইয়া ইংরেজীতে আলোচনা।

১৮১৭-২৩ ছয় বৎসর ধরিয়া বহু পণ্ডিতদিগের সহিত রামমোহনের পৌত্তলিকতা লইয়া সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৮১৮তে বাংলায় গায়ত্রীর অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়। গোস্বামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (দ্বিতীয় সম্বাদ) ও ইংরেজীতে কঠোপনিষদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত তর্কবিতর্ক। ১৮১৯ সতীদাহ বিষয়ে পুস্তিকা। সপক্ষে বিপক্ষে মতামত বিচার। আত্মানাত্মবিবেক প্রকাশ। বাংলায় মুণ্ডকোপনিষদ অনুবাদ। উহার ইংরেজী অনুবাদ। ১৮২০ বাংলায় কবিতাকারের সহিত বিচার। ১৮২০ সতীদাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত বিষয়ে দ্বিতীয় আলোচনার বর্ণনা। ১৮২০ যিশুর নীতিবাদ, সুখ ও শান্তির পথপ্রদর্শন (ইংরেজীতে) ও তাহার বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ। এই পুস্তিকা লইয়া খ্রীষ্টান পাদ্রিদিগের সহিত বহু বাদানুবাদ হয়। ডাঃ মার্শম্যান ও মিঃ স্মিট রামমোহনের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেন। রামমোহন তাঁহাদের প্রত্যুত্তরে অপরাপর পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। ১৮২১ শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রকাশিত সমাচার দর্পণ সাপ্তাহিকে হিন্দুশাস্ত্রসকলের মূল্যহীনতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়। রামমোহন রায় ঐ সকল সমালোচনার বিরুদ্ধে শিবপ্রসাদ শর্ম্মা নামে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। ১৮২১ ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ। ১৮২২ খৃঃ অব্দে রাজা রামমোহন রায় একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ডেভিড হেয়ার ও ডাঃ ডাফকে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য দান। ১৮২২ হিন্দু নারীদিগের উত্তরাধিকার বিষয়ে বর্ত্তমান রীতির শাস্ত্র-বিরুদ্ধতা লইয়া ইংরেজীতে আলোচনা প্রকাশ। ডাঃ মার্শম্যানের বন্ধুগণ লণ্ডনে রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করেন। ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস রামমোহনের চিঠিপত্রাদি প্রকাশ না করায় রামমোহন ধর্ম্মতলায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহার নাম হইল ইউনিটেরিয়ান প্রেস। ১৮২৩ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নিকট আবেদন—বহু হিব্রু ও গ্রীক উদ্ধৃতি সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বড়লাট জন অ্যাডাম কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নীতি নির্দ্ধারণ (প্রেস অ্যাক্ট)। রামমোহন রায় এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম পরিচালনা করেন। কিন্তু ভারত হইতে ইংলণ্ড অবধি সংগ্রাম চালাইয়া কোনও ফল হয় নাই। ১৮২৩ শিক্ষা বিষয়ে লর্ড অ্যামহার্ষ্টকে লিখিত পত্র প্রকাশ। ১৮২৬ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (বাংলায়)। ইংরেজীতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৮২৭ গায়ত্রীর ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্ (সংস্কৃতে)। বজ্রসূচী (বাংলা ও সংস্কৃতে)। ১৮২৮ ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত। ১৮২৯ সতীদাহ প্রথা আইন-বিরুদ্ধ করা হইল। ১৮৩০ ব্রাহ্মসমাজের দানপত্রের নিয়মাবলী প্রকাশ। ১৮৩০ তিন মাসে আটখানি পত্রে হিন্দু উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোচনা প্রকাশ। ১৮৩৩ ইংল্যাণ্ডে অবস্থান কালে গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশ করা হয়।

শুধু ভাষাজ্ঞান দিয়াই যদি মানুষের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিচার করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ বহুগুণ-বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। কারণ তিনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফারসী, পালি, তিব্বতী, বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, তিনি উত্তমরূপেই জানিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি আর কয়েকটি ভারতীয় ভাষাও অল্পবিস্তর জানিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে তিনি ১৪।১৫টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সে যাহা হউক, শুধু ভাষাজ্ঞান দিয়া রাজা রামমোহনকে বিচার করিবার কোনও আবশ্যকতা দেখা যায় না, কারণ তিনি প্রথমত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ও তদুপরি তাঁহার অত্যুন্নত আধ্যাত্মিকতা, জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ, নারীজাতির জীবন সম্পদ্ ও সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা প্রভৃতি তাঁহাকে মানব সমাজের মহত্তম মানুষের একজন বলিয়া প্রমাণ করে। তিনি যে

বৎসর বয়সে একাকী হিমালয়ের দুর্গম প্রাকার ও বিপদাকীর্ণ ও তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া লাসা গমন করিয়াছিলেন, শুধু সেই অসাধ্য সাধনের জন্যই তিনি দুঃসাহসিক মানুষদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মিয়া তিনিই প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা করিয়া সমুদ্রপারে বিদেশী সম্রাটের নিকট নিজ দেশের বিভিন্ন অভিযোগ শুনাইতে গিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যাঁহাকে দেখিয়া বিদেশী গুণীজন তাঁহাকে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ মানবদিগের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মানব স্বাধীনতা, সাম্য ও মানবতার সকল অধিকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন রায় জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ চেষ্টার জন্য তাঁহার জীবন একাধিকবার বিপন্ন হইয়াছে। পৌত্তলিকতা দূর করিয়া একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা চেষ্টার জন্যও তিনি সকল বিপদ্‌ অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে দ্বিধা করেন নাই। রাজশক্তি সমর্থিত শ্বেতকায় ধর্ম্মযাজকদিগের হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দাবাদ অপ্রমাণ করিবার চেষ্টায় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচলিত আচার ব্যবহারের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াও রামমোহন রায় নিজের নির্ভীকতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এক দেশ কর্ত্তৃক অপর দেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন অথবা এক ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির উপর অন্যায় শাসন অধিকার দেখিলে রামমোহন রায়ের মনে নিদারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হইত। তিনি সেই কারণে কোন জাতি বা ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিলে মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। স্পেনের জনসাধারণের সংবিধানিক অধিকার লাভ, দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ কিম্বা বৃটেনের রাষ্ট্রীয় সংস্কার (Reform Bill) আইন বলবৎ হওয়া, সকল কিছুই রাজা রামমোহন রায়কে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছিল। এশিয়ার মানুষও যে একদিন অদূর ভবিষ্যতে নিজ মানবীয় অধিকার পূর্ণ উপভোগে সক্ষম হইবে সেকথাও তিনি বলিয়াছিলেন। এক জাতি অপর জাতির অধিকার স্বীকার করিয়া যদি প্রভুত্ব চেষ্টা সংযত করিয়া সাম্যের আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে দুই জাতির মধ্যে বিবাদ না হইয়া বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়; শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের বিদ্রোহের আবশ্যকতা আর থাকে না, শত্রুতা বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে বন্ধুত্ব ও একতা বোধ জাগ্রত হয়। বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী পরদেশ-শাসকদিগকে এই সত্য উপলব্ধি করাইতে রাজা রামমোহন রায় নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। ভারতের মানুষ যে ইংরেজী ভাষা শিখিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া একদিন সর্বক্ষেত্রে ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, একথাও তিনি বলিতেন। ভবিষ্যতের সেই পরিস্থিতিতে ইংরেজ যাহাতে ভারতের সহিত মৈত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চলিতে পারে তাহার জন্য ইংরেজের পূর্ব হইতেই ভারতীয় মানবকে আত্মোন্নতির কার্য্যে সাহায্য করা উচিত, এ কথাও রামমোহনের।

সমাজ সংস্কার, রাষ্ট্রীয় বিলিব্যবস্থার ভিতরে ন্যায় ও প্রগতিশীলতার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার বিস্তার, নানা বিষয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন, সংবাদপত্র প্রকাশ, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় সাধন করিয়া বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বের ও এক ধর্ম্ম অবলম্বনের আদর্শকে কার্য্যকর রূপ গ্রহণ করাইবার চেষ্টা, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতিকে নিজ নিজ ধর্ম্মের সত্যরূপ উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দান, রাজকার্য্য ও শাসন ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুনীতির প্রসার, প্রভৃতি বহু বিষয় রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরে চিরজাগ্রত থাকিত। যে-খানে যাহা উচিত ও উত্তম সেইখানেই তাহাকে গঠন করিয়া উন্নততর রূপ দান করিবার চেষ্টা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। একাধারে বহু গুণ তাঁহার মধ্যে সক্রিয় হইয়াছিল, সে যুগের নানাক্ষেত্রের অভাব, রিক্ততা ও বিকৃত রীতিনীতির উপস্থিতির কারণে। ধর্ম সংস্কার, রাষ্ট্রনীতি গঠন, সামাজিক রীতিনীতির যথাযথ পরিবর্ত্তিত আকার প্রবর্ত্তন, ভাষার উন্নয়ন, শিক্ষা ও অপরাপর জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া তোলা ইত্যাদি বহু কার্য্য ও আদর্শ এই একই মহামানবের

মস্তিষ্ক-প্রসূত হইয়া সেই যুগে আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্টি, সভ্যতা, জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তবরূপ গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভা ভারতীয় মানবকে প্রাচীনতার আড়ষ্ট মনোভাবের অর্দ্ধমৃত অবস্থা হইতে টানিয়া তুলিয়া প্রগতির পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল, এবং কুরীতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীজনকে উন্নত আদর্শে সত্য জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে সকল মহান্-চেতা নেতাগণ ভারতকে নূতন আদর্শে অগ্রগমনে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা কদাপি সে কার্য্যে সক্ষম হইতেন না যদি না রাজা রামমোহন নানাভাবে জাতিকে রীতিনীতি ও জীবন নির্বাহ পন্থায় উন্নত আদর্শ অনুসরণ করিতে শিক্ষাদান করিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, রাজা রামমোহন, ভারতে যুগে যুগে যে সকল মহামানব জাতিকে উন্নতির সোপানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবির্ভূত হন, তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনি না আসিলে ভারতে আধুনিক কাল কখনও যথার্থ রূপ ধারণ করিয়া প্রবহমান হইত না। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহনের নিকট হইতে তিনি দেশভক্তি, বেদান্ত ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এই তিন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের জাতি-গঠনকারী মহাজন সকলেই রাজা রামমোহন রায়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনিই ছিলেন নব জাগরণের দীপ্ত আলোকবাহী পথপ্রদর্শক।

নেতা রামমোহন[*]

কাজী আবদুল ওদুদ

বাংলার পুরুষকারের মূর্ত-বিগ্রহ মুক্তিমন্ত্রের মহা উদ্গাতা রামমোহনের প্রতি আমি হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা বহন করি কথায় তা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারব কি না বলতে পারি না; কিন্তু রামমোহনকে ও তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করি।

বৃক্ষ ফলেন পরিচীয়তে; রামমোহনের মনুষ্যত্বের ও মুক্তিসাধনার মাহাত্ম্য কত তাও চীৎকার করে বলবার দরকার করে না। তাঁর প্রচারের পর শতবৎসর গত হয়েছে, এই একশত বৎসরের বাংলার ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে গেলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আপনি সে মাহাত্ম্যের পরিমাপ হয়। এই শত বৎসরে বাংলার হৃদয় সর্বস্বপণে সত্যের সাধনা করেছে, জীবনের প্রকৃত আস্বাদ লাভের জন্য; প্রকৃত রূপ দেখে নয়ন সার্থক করবার জন্য, অতি নির্মম হয়ে প্রাচীন সংস্কারকে আক্রমণ করেছে; মানবাত্মার সেই সংগ্রামের সামনে মস্তক আপনি নত হয়ে আসে। সত্য-সাধনার এই কি স্বরূপ নয়? কোনো এক যুগে মানুষ সত্য-সাধনা করেছে; তারপর সেই অতীত সাধনার রোমন্থন করেই মানুষের চলে বা চলতে পারে, মানুষের স্বাপিত অধঃপতন ও শোচনীয় আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার পক্ষে বার বার কি একথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই? পণ্যদ্রব্যের মতো সত্য কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না —না শাস্ত্রের কাছ থেকে, না গুরুর কাছ থেকে,—বৃক্ষে পুষ্পোদ্গমের মতো পরম বেদনায় মানবজীবনের ভিতর থেকে তার জন্ম হয়, মানুষের জীবনে এই মহাসৃষ্টিতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে আমাদের ঘটেছে। আর কে না আজ জানে সেই সৌভাগ্যের জন্য কোন্ পরম ভাগ্যবানের কাছে আমরা ঋণী।

কিন্তু রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কালের পটে মানবতার যে নব চিত্রাঙ্কন প্রয়াস, এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসেও তার আংশিক পরিচয়ই আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে, পূর্ণ পরিচয়ের উদ্ঘাটনের ভার ন্যস্ত রয়েছে ভবিষ্যতের উপর। প্রধানতঃ দুটি কথা ভেবে এ কথা বলছি। প্রথমতঃ, রামমোহনের যে মুক্তিমন্ত্র, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-অভিমানী বাঙালীর কণ্ঠে আজ তা আর উদাত্ত সুরে বিঘোষিত হচ্ছে না, দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের আত্মীয়-গোষ্ঠীর এক বড়ো শাখা, অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়, তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজও সচেতন হয়ে ওঠে নাই। রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রবল ভাবধারার সঙ্গমস্থল ছিল। হিন্দু সেই মহাতীর্থে স্নান ক'রে কিছু শক্তি ও শ্রী অর্জন করেছে। এতীর্থ যে মুসলমানেরও শক্তি ও শ্রী লাভের জন্য অমোঘ, শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক মুসলমানকেও একথা স্বীকার করতে হবে।

কেন একথা বল্‌ছি তা একটু বিস্তৃতভাবে বল্‌লে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিবর্তন জগতের নিয়ম। সে পরিবর্তন যে মানুষের কথায়-বার্তায়, সাজসজ্জায় ও জীবনযাত্রার প্রণালীতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, মানুষের

---

[*] ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬, রামমোহন স্মৃতিবাসরে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত।

মত-বিশ্বাস, সাহিত্য-ধর্ম এ সমস্তেও তা বর্তে। কিন্তু জীবনে পরিবর্তনের শাসন স্বীকার করলেও মুখে তা স্বীকার করতে মানুষের দেরি হয়; এ স্বাভাবিক; মানুষের জীবন তার কথার আগে চলে। কিন্তু দেরি হলেও যে-সমাজ সভ্যতার দাবি করে, অন্যান্য সভ্য সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেঁচে থাকতে চায়, তার পূর্ণভাবেই পরিবর্তনের শাসন স্বীকার করে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাই আধুনিককালের সঙ্গে মুসলমানের যখন সম্যক্ পরিচয় হবে এবং সেই পরিচয়ের প্রভাবে এক নূতন দৃষ্টিতে সে তার প্রাচীন শাস্ত্র ও সভ্যতার প্রতি চাইতে বাধ্য হবে, তখন বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে দেখবে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের এই মহাপুরুষ ইসলাম ও মুসলমানের অনেক কিছু উপাদানরূপে ব্যবহার করে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে কি এক গৌরবময় নবসৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করেছেন—এবং সেই দিক দিয়ে আধুনিক মুসলমানদের তিনি কিরূপ একজন অগ্রবর্তী নেতা। ভিন্ন সমাজের লোক হয়েও রামমোহন যে এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন তার আংশিক কারণ আত্মপ্রকৃতির ধর্মে হজরত মোহম্মদের চরিত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন; আর ইসলামের ইতিহাসে যা কিছু মূল্যবান্, যা কিছু স্মরণীয়, যেমন কোরআন, হজরত মোহম্মদের জীবনী ও বাণী, মোতাজেলা দর্শন, সুফি সাহিত্য, এ সমস্তের সঙ্গে তাঁর অতি গভীর পরিচয় ছিল—এমন গভীর যে তার সাহায্যে যে কোনো কিছুকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নেওয়া যায়। তাই হিন্দু যেমন রামমোহনকে ব্রহ্মবাদী ঋষির উত্তরপুরুষ বলে গণ্য করেছেন, মুসলমানও তেমনি একদিন তাঁকে 'তৌহাদ'-মন্ত্রী সাম্যবাদী হজরত মোহম্মদের একালের একজন শক্তিধর শিষ্যরূপে জানবেন এবং তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে তাঁর মুক্তিমন্ত্রে নিজেদের হারিয়ে-ফেলা-মুক্তি ও মনুষ্যত্ববোধের অমৃতস্বাদ পুনরায় লাভ করবেন।

বাস্তবিক, হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উভয়ের শাস্ত্রকে আত্মসাৎ করে, হিন্দু ও মুসলমান সমস্যার জটিলতম অংশের সমাধান রামমোহন নিজের জীবনে ও সৃষ্টিতে করেছেন। আজ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই চিত্তে শুভবুদ্ধি শোচনীয় ভাবে আচ্ছন্ন। এই আত্মঘাতী মোহের অবসানে, আধুনিক ভারতের সত্যকার নেতা রামমোহনের উপর উভয়ের দৃষ্টি পড়লে, হয়তো সুফল ফলবে।

আর শুধু হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কেন, প্রাচীন শাস্ত্রকে একেবারে বাদ না দিয়ে, কিন্তু সেই শাস্ত্রের উপর বিচারবুদ্ধি ও লোক-শ্রেয়ের আদর্শের প্রাধান্য দিয়ে নব্য ভারতের এগিয়ে চলার জন্য যে পথ নির্দেশ তিনি করেছেন, মনে হয়, ভারতের জন্য আজও সেই-ই শ্রেষ্ঠতম পথনির্দেশ। রামমোহনের পরে অন্যান্য সাধকের আবির্ভাব ভারতভূমিতে ঘটেছে; তাঁদের প্রচারের ফলে গুরু ও শাস্ত্রের নব প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধিও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে ভেবে দেখবার কথা এই, ভারতের কোন্ সমস্যা বড়ো, "হৃদয়ারণ্যের গহনে" ঘুরপাক খাওয়ার সমস্যা, না, বৃহৎ জগতের সঙ্গে কি ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায় সেই সমস্যা। মনে হয়, বৃহৎ জগতের সঙ্গে কি ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায় সে-বিষয়ে ভারত বহুকাল ধরে অনেক পরিমাণে উদাসীন রয়েছে বলে' 'সোঽহং' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'নরনারায়ণের পূজা' ইত্যাদি মহাসত্য বাণীর সঙ্গে কোন্ অতীত কাল থেকে তার বুকের উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে চলে আসছে হীনতম অস্পৃশ্যতা, উৎকট বর্ণবিভাগ সমস্যা। এই সংকটে হয়তো রামমোহনের 'শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধি'র আদর্শেরই এই ক্ষমতা আছে যাতে ভারতের জড়তাগ্রস্ত সাধারণ জীবনে বীর্য সঞ্চারিত হতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে, লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধিকে যখন শাস্ত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়া হল, তখন শাস্ত্রের কথা একেবারে না তোলাই হয়তো সমীচীন ছিল। এর সাধারণ উত্তর—লোকস্থিতির জন্য এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়।

শাস্ত্র যাঁদের চিত্ত থেকে উৎসারিত হয়েছিল তাঁরাও গভীরভাবে সত্য ও শ্রেয়ঃ অন্বেষী ছিলেন, সত্যের অপরূপ পুলক-বেদনা নিজেদের চিত্ত দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই চিররহস্যমণ্ডিত সত্যের অন্বেষণ যখন কারো ভিতরে প্রবল হয়ে জাগে তখন কোনো কোনো শাস্ত্র তাঁর পক্ষে অমূল্য অবলম্বনেরই কার্য করতে পারে। রামমোহনের অতি গভীর প্রকৃতি মানুষের এ প্রয়োজনকে উপেক্ষার চক্ষে দেখতে পারে নাই। কিন্তু কারো কারো পক্ষে কোনো বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রের এবংবিধ প্রয়োজন অনুভূত হলেও সর্বসাধারণের স্বাভাবিক অবস্থায় লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধির আদর্শই যে মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান অতি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই তিনি সে সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাস্তবিক যত গভীর করে আমরা ভাবতে যাব ততই সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব, রামমোহনের এই যে আদর্শ, প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা কিন্তু তারও উপর লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য, মানুষের সমাজকে সবল ও সুন্দর রাখবার জন্যে এ কত অমোঘ।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা আমাদের মনে পড়ছে—পরে পরে উদ্ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির প্রতি কতকটা উপেক্ষা প্রদর্শন করে রামমোহন মানুষকে চোখ দিতে বলেছেন সব ধর্মের মূল শাস্ত্রের উপর। পৌরাণিক যুগকে উপেক্ষা করে হিন্দুকে তিনি অবলম্বন করতে বলেছেন বেদ ও উপনিষৎ; 'মোহাম্মেদন'দের ইসলাম ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানকে অবলম্বন করতে বলেছেন মূল কোরআন, আর পরে পরে উদ্ভাবিত ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি উপেক্ষা করে খ্রীষ্টানকে গ্রহণ করতে বলেছেন মূল বাইবেল।। অথচ তিনি নিজে প্রাচীন বৈদিক ঋষির মতো জটা বল্কলও পরিধান করেন নাই, ফলমূল খেয়ে জীবন অতিবাহিত করবার প্রয়োজন তেমন অনুভব করেন নাই, আর শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষ করে অনুশীলন করতে বলেছেন আধুনিকতম বিজ্ঞান। তাঁর এই মনোভাবের অর্থ মিলবে তাঁর এই উক্তির ভিতরে, "ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের?"

অথবা সে অর্থ আরও ভালো করে মিলবে গুরু কামালের এই বাণীতে :—"বিশ্বজগৎ চলেছে ভগবানের উৎসব যাত্রায়, নিত্যই চলেছে তাঁর 'বারিয়াত' (বরযাত্রা)। প্রতি মানব নিজ নিজ মশাল জ্বালিয়ে চলেছে। গ্রহ চন্দ্র তারার মশালশ্রেণী চলেছে অসীম আকাশে, মানব সাধনার দীপাবলী চলেছে কালের আকাশে। সাধক মাঝে মাঝে ভুলে যায়, ধ্যান নির্জীব হয়ে আসে, নিত্যকালের উৎসব-পথে মুহ্যমান মশাল নিয়ে মানব ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময়ে মহাপুরুষ আসেন বজ্রগম্ভীর উদ্‌বোধন মন্ত্রে তাদের জাগিয়ে দিতে। সাধন যখন যেখানে প্রাণহীন স্থগিত হয়ে আসে, অগ্নিময়ী দীক্ষা নিয়ে সেখানেই মানবের মহাগুরুরা আসেন। তাঁরা চলে গেলে বিষয়ী কৃপণ সাম্প্রদায়িক ভাণ্ডারীরা সেই মশালগুলিও চায় সঞ্চয় করে রেখে বৈষয়িকতা চালাতে। জ্বলন্ত মশাল ভাণ্ডারে জমানো অসম্ভব, তাই তারা নির্জীব আগুনটুকুও নিবিয়ে সংগ্রহ করে কেবল মশালের মৃত দণ্ড এ দগ্ধাবশেষ নেকড়া।"* বাস্তবিক সমস্ত রকমের সত্য অনুসন্ধান, সমস্ত শুভ চেষ্টা (রাজনীতিও) যে আমাদের জীবনে ভগবানের উৎসব—ঈশ্বরে সমর্পিত-প্রাণ মহাকর্মী রামমোহন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যেখানে মানুষ অন্তহীন প্রয়াসে নিজেদের ভগবানের উৎসব আয়োজন করেছে, যেমন প্রত্যেক ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলির ভিতরে অথবা আধুনিক বিজ্ঞানে, সেখানে তিনি সপ্রেম নেত্রপাত করেছেন। কিন্তু যেখানে সেই উৎসবে রচনার চাইতে হীন অনুকরণের আয়োজন, উঞ্ছবৃত্তির আয়োজন বেশি হয়েছে, মানুষের অনন্ত শুভ চেষ্টার নিয়ামক চিরজাগ্রত ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ায় যে মুক্তির অপরিসীম আনন্দ, তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যেমন পরে পরে উদ্ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির ভিতরে, সেখান থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। রামমোহনের এই যে চিরজাগ্রত ভগবান্‌কে

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত সংগ্রহ থেকে গৃহীত।—লেখক।

মানুষের অন্তহীন শুভ প্রয়াসের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করবার সাধনা, সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের সাহিত্যে তা অনেকখানি রূপ লাভ করেছে। তাই আশা হয়, হয় তো বাঙালী তার গৌরব-সামগ্রী রামমোহনের মাহাত্ম্য একদিন পূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, এবং তাতে করে ইতিহাসে তার জন্য এক বড়ো জাতির আসন রচিত হবে।

জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, রামমোহনের এই মত সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলে আমার এই সামান্য আলোচনার উপসংহার করব। মুক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি কি সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা হয়তো কেউই কাউকে বলে দিতে পারেন না। যিনি সে মুক্তি পান, তিনি নিজেই তা অনুভব করেন, কিন্তু কেমন করে তাঁর সেই অনুভূতির অধিকারী অন্যেও হতে পারে, সে সম্বন্ধে যে সব উপদেশ আদেশ তিনি অপরকে দেন তা তার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, পর্যাপ্ত হলে মানুষের ধর্ম কি,পথ কি,তার মীমাংসা জগতে সহজ হয়ে আসত। তার উপর, মুক্তিপ্রাপ্ত বলে মানুষের নিকট যারা পরিচিত সেই সকল অবতার, পয়গম্বর, ঋষি, সাধক, কবি প্রভৃতির যে সমস্ত জীবনকাহিনী ও বাণী আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি তা মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলে মনে হয়, হয়তো এঁদের সকলের কাছে মুক্তির একই রূপ, একই আস্বাদ ছিল না। কিন্তু এ বিচারের চাইতে এই সম্পর্কে অন্য একটি কথা আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান্, সেটি এই যে, এই মুক্তিপ্রাপ্তের ভিতরে যাঁরা জ্ঞানের উপর বেশি জোর দিয়েছেন তাঁরাই মানুষের বেশি নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন— তাঁদের নেতৃত্বে মানুষের আত্মপ্রকাশের অবসর বেশি ঘটেছে। তাই, জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কি না সে বিচারের ভার মুক্তির অধিকারীদের উপর ন্যস্ত রেখে একথা আমরা সহজভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, জ্ঞান-সাধনার ভিতরে মানুষের অনন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এর উপর আধুনিক ভারতবাসীদের জন্যে তাদের নেতার এই কথার অন্য অর্থও আছে? ভারতে শান্তি ও মৈত্রীর সমস্যা প্রায় তুল্য রূপে কৃচ্ছ্রসাধ্য। এ অবস্থায় জ্ঞানের অনির্বাণ সাধনাকে উপেক্ষা করে কোনো সম্প্রদায়বিশেষের বা শাস্ত্রবিশেষের বিশ্বাস-রুচিকে প্রাধান্য দিলে সত্যকার কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বাস্তবিকই, জ্ঞানের সাধনাকে দৃঢ়মুষ্টিতে অবলম্বন করা ভিন্ন ভারতের যে প্রকৃত কল্যাণ নাই, যে কোনো চক্ষুমান্ ব্যক্তি তা স্বীকার করবেন।

ভারত এক নব সমন্বয়ই কামনা করছে। নব মানবতার উদ্‌বোধন মানবজীবনের সব সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস, ভারতের সত্যকার মঙ্গলের জন্য চাই। রামমোহনের মুক্তিমন্ত্রে বিরাট জ্ঞান-সমন্বয়, সেই নব সমন্বয়ের ভিত্তি হয়েছে, পত্তন আজ তাঁর স্মৃতিবাসরে এই কথাটি সসম্মানে স্মরণ করছি।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩।

রাজা রামমোহন রায়

জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাজার জন্মসন নিয়ে মতভেদ আছে। আলোচনাও চলছে দেখছি পত্র-পত্রিকায়। (আমরা তাঁকে রাজাই বলব। পূর্বেও অনেকে তাঁকে রাজাই বলেছেন। বিপিন পাল-মহর্ষি প্রমুখ।)

জন্ম বর্ষ মতভেদে সাধারণের কিছু যায় আসে না। সেটা ঐতিহাসিকের এলাকা। তিনি ইতিহাসকে নিখুঁত করতে পারেন করুন।

মেয়েরা আমরা সন্তানদের জন্মতিথি পালন করি। কিন্তু এখনকার ছেলেরা তারা জন্মদিন পালন করে। অনেক সময়ে দুটোর ব্যবধান ২০।২৫ দিন মাস খানেক হয়ে যায় "ম'লমাস" হলে।

দেখা যাবে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রামনবমী, বুদ্ধপূর্ণিমা গৌরপূর্ণিমা নানক পূর্ণিমা (এটি জন্মদিন বা তিথি নয়, শিখদের নিজেদের মতে জন্মদিন করা) ইত্যাদি সব আবির্ভাব-তিথিগুলি তারিখের সঙ্গে মেলে না। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী শ্রাবণ ভাদ্র দু'মাসেই পড়ে। রামনবমীও তাই, ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখেও পড়ে। এবং তাঁদের জন্ম সালের কথাই বা কে জানে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেবের। চৈতন্যদেবেরও তাই। তবু আবির্ভাবের আনন্দ, তিরোধানের বেদনা মানুষের হৃদয়ে বহন করতে বাধা হয় না।

ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসেরই বা জন্মতিথি সাল মাস বছরের সন্ধান কার জানা আছে, কিন্তু তাঁদের অমরত্ব লাভে কিছু বাধা হয়েছে বলে জানা নেই। দেশকালাতীত হয়ে সারা ভারতের হৃদয়ে তাঁরা বেঁচে আছেন।

আমরা আমাদের মেয়েলী প্রথায় ১৭৭২।১৭৭৪ যেটিই তাঁর জন্ম সাল হোক না—১৯৭২।১৯৭৪কেও দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণ উৎসব মনে করে সমান আনন্দ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাব। দু-এক বৎসর এগিয়ে বা পিছিয়ে গেলেও তাঁর কর্মের জীবনের মহত্ত্ব ও মহিমার কম বেশী হবে না।

এখন আমরা রাজার সম্বন্ধে কতকগুলি উক্তি পাঠকের কাছে তুলে দিচ্ছি। রাজার কীর্তির আলো, কর্মের প্রভাব, আদর্শের ভাবদীপ কতভাবে সমসাময়িক ও পরবর্তীদের ওপর পড়েছিল দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু তার আগে বলি ঐ লোকোত্তর পুরুষটির নিজের মুখে বলা নিজের জীবনের একটুখানি কথা। তাঁর কলিকাতার বন্ধু গর্ডন সাহেবকে লেখা।—'ষোলো বছর বয়সে আমি দেবদেবী-বাদী ধর্মের বিরুদ্ধে একখানি বই লিখিয়া আত্মীয়স্বজনদের একান্ত বিরূপ ভাজন হই। তখনই আমি গৃহত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা প্রদেশে ভ্রমণ করি। পরিশেষে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত বিরাগবশতঃ ভারতের বহির্ভূত কয়েকটি দেশও ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তারপর আমার বিংশতি বৎসর বয়স হইলে আমার পিতা আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন। এবং তাঁর স্নেহ লাভ করি।

'ইহার পর হইতেই আমি য়ুরোপীয়গণের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করি। তাঁহাদের সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান্, দৃঢ়চরিত্র, ও মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি যে আমার কুসংস্কার ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।

'কিন্তু পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য বিষয়ে বিরোধ থাকায় ব্রাহ্মণদের সহিত সহমরণ ও অন্যান্য নানা অনিষ্টকর প্রথা নিবারণের জন্য হস্তক্ষেপ করা ও ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে আমার প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত হইল। এবং পরিবারে তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব থাকাতে পিতা পুনরায় বিমুখ হইলেন। কিন্তু কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হইত।

'এই তর্ক বিতর্কে আমি কখনো হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত ধর্মের নামে যে বিকৃত ধর্ম প্রচলিত তাহাই আমার বিতর্কের বিষয় ছিল। কিন্তু দেশবাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কতিপয় স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী বন্ধু ছাড়া আর সকলেই আমাকে ত্যাগ করিল। তাঁহাদের ও তাঁহাদের জাতির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

'কিন্তু কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিরোধ সত্ত্বেও আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

'এই সময়ে আমার য়ুরোপ যাওয়ার ইচ্ছা হইল। পরিশেষে সে আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতের ভাবী রাজ্য শাসন নূতন সনন্দ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। এবং সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনানি হইবে বলিয়া আমি ১৮৩৩ নবেম্বরে বিলাত যাত্রা করিলাম' ......
(নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজা রামমোহনের জীবনী থেকে।)

যত সংক্ষেপে রাজা তাঁর জীবনকথা বলেছেন, তত সংক্ষেপে ও সহজে তাঁর জীবনের মহৎ কর্মগুলি সম্পন্ন হয়নি, সকলেই সেকথা জানেন। এবং সেইখানেই দু'শো বছরের নানা মানুষের দৃষ্টির প্রদীপে তাঁকে আজো সমান উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দেখতে পাওয়া যাবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—"সকল মহাপুরুষের মতই রাজা অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন। অসংখ্য লোক তাঁর নিকট আসতেন। তর্কও করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করার মত উপযুক্ত কেহ আসতেন না। প্রায়ই অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল কথা বলতেন। রাজা কিন্তু সকলের কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কাউকে চলে যেতে বলতেও পারতেন না। যখন প্রতিপক্ষ অত্যন্ত নির্বোধের মত কথা বলতেন, তখন তিনি বলতেন, 'এখন একটু বাগানে গেলে কেমন হয়'। আমি প্রায়ই রাজার বাড়ী যেতাম। কিন্তু কোন কথাবার্ত্তাই হত না। আমি বসে তাঁর সুন্দর মুখ দেখতাম। তাঁর প্রতি আমার অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল। আমার পিতার তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। পিতা সকালে ফুল আদি নিয়ে প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে পূজা করতেন। এমন সময়ে রাজা এলেই তিনি উঠে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করতেন.........।

"ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হবার পর আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে সেখানে যেতাম। তখনও বিষ্ণু গান করতেন। রাজার সমাজেও তিনি ও তাঁর ভাই কৃষ্ণ একত্রে গান করতেন। গোলাম আব্বাস নামে একজন পাখোয়াজ বাজাতেন। 'বিগত বিশেষ' গানটি রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।"

(নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন চরিত থেকে।)

বঙ্কিমচন্দ্র।—"মহাত্মা রামমোহনের পূর্বে বহু পণ্ডিতাগ্রগণ্য মানুষ থাকিলেও বাংলা ভাষা বদ্ধ জলাশয়ের মত স্রোতহীন প্রবাহহীন ছিল। তাঁহার হাতেই তাহা সহজ স্রোত পায়। রামমোহন রায় এখনকার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়দের পূর্বগামী,—তাঁহাকে দেশবাৎসল্যের পূর্বগামী প্রধান নেতা বলা যায়।" (প্রবন্ধাবলী থেকে।)

বিপিনচন্দ্র পাল।—"রাজা রামমোহন ধর্ম ব্যাখ্যাতা। ধর্ম প্রবর্ত্তক নহেন। ঈশ্বর তত্ত্ব ও ধর্ম তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেই তাঁর শাস্ত্র প্রচার বেদান্ত সূত্র এক—পাঁচটি উপনিষদ ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য আদি উপনিষদের প্রচার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাঁহার কাছে মনে হইয়াছিল।...

"রাজা জীবনকে সতেজ, কর্মকে সার্থক এবং ধর্মও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সহিত যুক্ত সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই একদিকে বেদান্তের প্রচার অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার বিস্তারের জন্য যুগপৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন।.........এইজন্যই তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন......।"

(চরিত্র চিত্র থেকে।)

রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ রাজাকে "ভারত পথিক" বলেছেন। বলেছেন, "আমরা ভুলিয়া যাই রামমোহন রায় আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণ কর্তা।—

"কি রাজনীতি, কি সমাজ, কি বক্তাশিক্ষা, কি ভাষা, এমন কি প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায় যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহারও তিনিই পথ প্রদর্শক। তিনি বঙ্গদেশকে গ্র্যানিট্ স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন......"

('বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ থেকে।)

বিবেকানন্দ।—"এই নৈনিতালেই স্বামীজী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাহাতে তিনি তিনটি প্রধান বিষয় এই আচার্য্যের শিক্ষার মূলমন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার বেদান্ত গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে প্রীতি—এই সকল বিষয়ে রাজার উদারতা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কার্য্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজেও তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন, বলিতেন ...." (নিবেদিতা। "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" ৫ পৃঃ।)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।......"তিনি বাঙালীর, ভারতীয়দের, সকল মানবজাতির যে সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ মনে রাখিয়া চিন্তা অর্থব্যয় স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং লোকনিন্দা উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের প্রতিভা ও চিন্তা প্রসূত। তাঁহার সকল চেষ্টার মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল, কল্যাণের আদর্শ অখণ্ড। মানবপ্রীতি ও মানবজাতির মঙ্গলসাধনের চেষ্টাই ভগবৎ ভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এবং শ্রেষ্ঠ সেবার উপায়"......। (প্রবাসী থেকে।)

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব।—"তিনি ছিলেন সহজভাবে সত্যজিজ্ঞাসু। জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হয়ত এই সহজ পরিচয়েই পরিচিত। এই সহজ সত্য জিজ্ঞাসার প্রেরণায় মানুষ ধর্ম-সমাজ-সংস্কারক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বহুবিধ হতে পারেন। বলা বাহুল্য জীবন একটা অখণ্ড ব্যাপার। রামমোহনের ঈশ্বরানুরাগ ব্রহ্মজ্ঞান লোকশ্রেয়ের সহিত নিত্যযুক্ত। তাঁর সাধনা অতন্দ্রিত কল্যাণ সাধনা"......।

("শাশ্বত বঙ্গ" রামমোহন রায়।)

কিন্তু এই দুশো বছরের মানুষের নানা উক্তি ও ভাষণের মধ্যে আমরা মেয়েদের লেখায় বা বলায় রাজার প্রশস্তি বা কর্মকাজের ভালোমন্দ নিয়ে কোনো একটি কথাও কোনোখানে খুঁজে পাইনি। ধর্ম কর্ম জ্ঞান দর্শন সাহিত্য ও সমাজ বিচার গুরুগম্ভীর আলোচনা বিষয়ে তাঁদের বিদ্যা জ্ঞান সেকালে না থাকাই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু মানুষের জীবন ,মরণের যে স্বাভাবিক অধিকার তাঁদের সে সময়ে ছিল না এবং তখন এল,—সে কথা তাঁদের লেখায় বা কথায় কোথাও পাওয়া যায় না।

এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সহমৃত্যু বা সহমরণ প্রথা-সম্পর্কে তার সপক্ষে বা বিপক্ষে ভারতের কোটি কোটি নারীর কোনো কথাই পাওয়া যায় না। তখনো নয়, এখনো নয়। কোনো প্রদেশেই নয়।

যদিও মর্ম্মান্তিক শোকে বিয়োগবেদনায় মানুষের মৃত্যু ইচ্ছা চিরকালই ছিল, এখনো আছে, কিন্তু শোকে অস্বাভাবিক মৃত্যু তো বিরলই চিরকাল।

প্রথম সমাজভয়, সতীধর্মচ্যুতি নিন্দার ইঙ্গিতের ভয়, লোকলজ্জার আতঙ্ক, শিক্ষা-হীনতা,—সত্য অসত্য বিচারের সাহসের অভাব, সামাজিক ধিক্কারের ভয় অথবা কি মনোভাব সেকালের তাঁদের ছিল, সেই সময়ের মনের কথা আমরা একালের নারী বলতে পারব না। হয়ত মেয়েদের মনের কথার ইতিহাসই নেই। তাই তাঁরা নীরব।

রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য

মনোমোহন ঘোষ

খুব বেশী দিন হয়নি যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তেমন সুস্পষ্ট নয় এবং এহেন অস্পষ্টতার ফলে এই সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব আরোপিত হয়েছে একাধিক ব্যক্তির উপর। কেউ কেউ বলেন যে উইলিয়ম কেরীই এই সাহিত্যের জনক। আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের নামও কেউ কেউ এই সঙ্গে জুড়ে দেন; কেউ বা বলেন, রামমোহন রায়ই এই সাহিত্যের শৈশবে পিতার কাজ করেছেন; আর অন্যদের মত হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সাত্ত্বিকারের স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে যারা টেকচাঁদ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই সকল দাবীর প্রাতদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিতান্ত অসহায়ভাবে আত্মগোপন করে আছে। উপস্থিত প্রবন্ধে তাকে আবিষ্কার করবার আংশিক চেষ্টা করা যাবে। বাংলা গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে রামমোহন রায়ের প্রভাব কতখানি তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াবার জন্যে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ চোদ্দখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ-সকলকে 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা' নামে উল্লেখ করা হবে। এদেশের আধুনিক সাহিত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থমালার প্রভাব সম্বন্ধে যে, ধারণা চলে আসছে তা সর্ব্বৈব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। বর্ত্তমান যুগে, এ-সকল বইতেই সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্য রচনার কাজে গদ্যের ব্যবহার হয়েছে সত্য বটে; কিন্তু এদের সম্বন্ধে এ কথাই একমাত্র কথা নয়। এই বইগুলি পাঠকসমাজে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এবং তাদের সমাদর হয়েছিল কি পরিমাণে, তা না জেনে বাংলা সাহিত্যের ওপর কেরী ও তাঁর ফোর্ট উইলিয়মী দলের প্রভাব আন্দাজ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম হবে।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার প্রচার ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে এই পুস্তকসমূহের বিষয়-বস্তুর দিকে আগে তাকাতে হবে। এদের মধ্যে পাঁচখানি সংস্কৃত ('হিতোপদেশ' ১ 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' ও 'পুরুষ পরীক্ষা'), একখানি পারশী ('তোতানামা ২) আর একখানি ইংরেজী গল্প-গ্রন্থের ('ঈসপ্‌স্ ফেবলস') অনুবাদ; অবশিষ্ট সাতখানির মধ্যে একখানি ('ইতিহাসমালা',) গল্পের সংকলন, দুইখানি ('লিপিমালা ও প্রবোধচন্দ্রিকা') প্রবন্ধ পুস্তক, একখানি ('কথোপকথন') কথাবার্ত্তার নমুনা এবং তিনখানি ('প্রতাপাদিত্যের চরিত্র', 'রাজাবলী' ও 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র') ইতিহাসমূলক রচনা। এই শেষোক্ত সাতখানি পুস্তকের মধ্যে 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'য় কিছু কিছু গল্প আছে, আর তিনখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থকেও গল্প-পুস্তক বলে গণ্য করা যায়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অধিকাংশই ছিল গল্প-পুস্তক। দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের গল্পপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত, কাজেই মনে হতে পারে যে ঐ গ্রন্থমালা তখনকার দিনে বেশ প্রচলিত

ও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তার ফলে বাংলার নূতন গদ্য-সাহিত্য ত্বরিত গতিবেগ লাভ করেছিল। কিন্তু ফলত ব্যাপারটা যে এরূপ হয়নি তা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে হয়।

গল্প শুনতে যে লোকে আকৃষ্ট হয় তার প্রধান কারণ আখ্যানের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব; আর পুরানো গল্প এবং অনেক বার শোনা গল্পও যে লোকে শোনে তার কারণ অন্তর্নিহিত আদর্শের মহিমা। যেমন এ-দেশের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির গল্প; হাজারবার শুনেও সেগুলি সম্বন্ধে শ্রোতাদের আকর্ষণ শিথিল হয় না। কিন্তু কোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার গল্পে এই দুইয়ের কোন গুণই বড় একটা ছিল না। সংস্কৃত গ্রন্থের আখ্যানসমূহ লোকমুখে খুবই প্রচলিত ছিল। তাই যে-ভাষায় অপরিচিত বা অল্পপরিচিত আরবী, পারশী ও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য এবং পদবিন্যাস-প্রণালী (syntax) গোলমেলে, সে-ভাষায় ঐ পরিচিত গল্প শুনতে লোকের তেমন আগ্রহ হয়ত দেখা যায়নি। প্রতাপাদিত্য বা কৃষ্ণচন্দ্রাদির চরিত্র সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলতে পারা যায়।

গল্প ও গল্পমূলক পুস্তকগুলি ছেড়ে দিলে কোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার যে বই বাকী থাকে তা হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। এই বইখানিকে গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা বলে ধরা হলেও এর বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব খুবই অল্প। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও পুরাণাদি থেকে সংকলন করে এই পুস্তক তৈরি হয়েছিল। এজন্যে এখানে পাঠকদের আকৃষ্ট করবার মত বই হয়নি। রচনারীতির দিক দিয়েও এই বই বরং কিয়দংশে তাঁদের বিমুখ করবার মত। এর আরম্ভে দুর্বোধ্য সমাসের বাহুল্য পাঠকবর্গের মনে রীতিমত ভয় জন্মায়। যার বিষয়বস্তু বা রচনারীতির আকর্ষণ কম, এমন বইও শুধু গদ্যের অভিনবত্বের জন্য জনসাধারণের কৌতূহলের বস্তু হতে পারত কিন্তু কোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার দুর্মূল্যতার জন্যে তা হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ঐ পুস্তকসকলের প্রতি খণ্ডের দাম কখনও কখনও আট টাকা পর্য্যন্ত ছিল। যে সময়ে লোকে আট-দশ টাকা মাসিক বেতনে ছোটখাট সংসার চালাত সেই সময়ের পক্ষে এই দাম সংগ্রহ করা যে কষ্টসাধ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য।

এই সব কারণে মনে হয় যে, কোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক হলেও উক্ত কলেজের গ্রন্থমালা তৎকালীন জনসাধারণের খুব অল্পাংশের হাতেই পৌঁছতে পেরেছিল। ঐ বইগুলি হয়ত কেবল কোম্পানীর কর্ম্মপ্রার্থী বিলাতী সাহেব ও মুষ্টিমেয় কৌতূহলী ধনী ব্যক্তিরাই ক্রয় করতে পারতেন। এরূপ স্বল্পপ্রচারিত পুস্তকের প্রভাব খুব সীমাবদ্ধ থাকবারই কথা। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে অন্যরূপ ব্যাপার ঘটেছিল তা ভাববার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের এই অশোভনীয় অবস্থা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই সাহিত্যের কৃতী প্রবর্ত্তক রামমোহন রায় যখন ৮১৫ সালে বাংলা গদ্যে রচিত তাঁর দুখানি একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক পুস্তক, ('বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার') প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন তখন থেকে বাংলা গদ্য-সাহিত্য এগিয়ে চলার মত গতিবেগ সংগ্রহ করল।

রামমোহনের পুস্তক ছিল লোকসাধারণের অনুষ্ঠিত মূর্ত্তিপূজামূলক ঈশ্বরোপাসনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনায় পূর্ণ। কাজেই এই বই প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় তুমুল আন্দোলন শুরু হ'ল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যে অল্পসংখ্যক লোকের মনঃপূত হল তাঁরা রামমোহনের মতানুবর্ত্তী হলেন, আর যাঁরা একেশ্বরবাদ প্রচারের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবের বিভীষিকা দেখলেন তাঁরা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। রামমোহনের বাংলা গদ্য সমসাময়িক লোকদের মধ্যে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এই ব্যাপার তার বেশ সুস্পষ্ট সাক্ষী। এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব কেরী প্রমুখ কোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকগণের কৃতিত্বের বহু ঊর্দ্ধে।

রামমোহনের গদ্য-রচনার বহুল প্রচার যে কেবল

ধর্ম বিষয়ক বাদানুবাদের আশ্রয়েই ঘটেছিল তা মনে করবার কারণ নেই। ধর্মতত্ত্বের আন্দোলন তাঁর লেখা প্রচারের সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু তাঁর গদ্য-রচনার প্রাঞ্জলতাও তাঁকে এ-বিষয়ে কম সাহায্য করেনি। তাঁর প্রচারিত গ্রন্থগুলিতে তিনি যদি বেদান্তের মত দুরূহ বিষয়কে নিতান্ত সহজরূপে পাঠকের বোধগম্য করতে না পারতেন তবে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের তেমন বিচলিত হবার কথা ছিল না। কারণ, যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজের পুস্তকমধ্যে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি যত দিন দুর্বোধ্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল তত দিন গোঁড়া সমাজ-নায়কদের মানসিক শান্তি নষ্ট হয়নি। কিন্তু প্রাঞ্জল বাংলা-গদ্যে সে-সকলের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে তিনি যখন সংখ্যাবহুল সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করলেন তখন গোঁড়ার দল বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। একেশ্বরবাদের ব্যর্থ প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদিগণ বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করাকেও অপরাধজনক বলে প্রচার করলেন (গ্র ৯-১০)।৩ রামমোহনের বাংলা গদ্যের প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে এ হ'ল পরোক্ষ প্রমাণ। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণপ্রার্থীকে রামমোহনের রচনার সহিত ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের ও অন্যান্য সমসাময়িক লেখকের রচনার তুলনা করতে হবে। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ৪ নামক গ্রন্থের আরম্ভে লিখছেন :—

"ব্রহ্ম সর্ব্বে বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥ ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্তস্থলাভিষিক্ত তত্ত্বজ্ঞানিমানিবদের স্বকপোল-কল্পিত স্বপ্রয়োজনসিদ্ধিতাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে করিও না। যেহেতুক বিশিষ্টানুশিষ্ট শিষ্টেরদের সে কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিত্তজনতাপিতৃক অবিগীত শিষ্টেরদের যদ্যপি স্ব স্ব জাতি ও কুল ও আশ্রমবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের কারণ-শতেতেও অন্যথা কখন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে তথাপি এতদ্দেশে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনরীতি কুমুদভ্রান্তিং ধূর্ত্তবকো হি বালমৎস্যানাং এতৎশাস্ত্রার্থ ন্যায় বকধূর্ত্তেরদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রে অনাস্থা না হয় কেবল এই তাৎপর্য্যেতে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে॥"

আর ১৮২৩ সালে প্রকাশিত 'পাষণ্ডপীড়ন' ৫ গ্রন্থের আরম্ভে আছে :—

"অবিরত মনস্তাপতাপিত ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভি-মানী ব্যক্তিবিশেষদিগের এবং প্রতারক-প্রতারণাস্বরূপ মহাধূমান্ধকারে জন্মান্ধের ন্যায় অন্ধ তৎসংসর্গী জীব-বিশেষদিগের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে প্রেরিত, চির্বচর্বিত, স্বকপোলকল্পিত নানা বাগাড়ম্বরিত, মন্বাদিবচনতাৎপর্য্যার্থবহিষ্কৃত, স্বানুচরজীবসমাজ-সন্তোষার্থ রচিত অন্তঃসাররহিত অল্পবুদ্ধিজনগণের আপাততঃ শ্রবণমধুর নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ উত্তরাভাস প্রাপ্ত হইবামাত্র হৃষ্টচিত্ত কৃতকৃত্য হইলাম॥"

উদ্ধৃত রচনাংশ দুটির সঙ্গে তুলনার জন্য রামমোহনের রচনা থেকেও দুটি অংশ নীচে দেওয়া যাচ্ছে। 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র উত্তরে রামমোহন যে বই ('ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার') লিখেছিলেন তার গোড়াতে আছে :—

"ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লিখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক ব্যাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্ত-চন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে কোনো ব্যক্তি বেদান্ত-শাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তেঁহ বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন

সর্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংসভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততঃ লোকনিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া খায় না কিম্বা আচমনে অধিক কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধ নিম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি॥ (গ্র ২৩১)

চারি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে প্রশ্নকর্ত্তা যে খুব খুশী হন নি তা বলাই বাহুল্য। অচিরাৎ তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে তার এক প্রত্যুত্তর প্রকাশ করলেন। এ বইয়ের ভাষার নমুনা আমরা দেখেছি। রামমোহন নিজের প্রতি নিন্দা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তিতে পূর্ণ এই বইয়ের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' নামে যে বৃহৎ পুস্তক রচনা করেছিলেন তার ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কেন যে তিনি কটূক্তির উত্তর কটূক্তি দ্বারা দেন নি। তাঁর দেওয়া একটি কারণ তাঁরই ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে।

বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ঐ অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষণার বিনিময়ে ধর্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ঐ প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। (গ্র ২৪৭)

'বেদান্তচন্দ্রিকা'র লেখক মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে রামমোহনের উদ্দেশে যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন। তার উত্তরে রামমোহন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামে পুস্তক রচনা করেন। এই বইয়ের গোড়ায়ও তিনি পাল্টা দুর্ব্বাক্য ব্যবহার না করার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :—

"আমাদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আছে এই যে পরমার্থ বিষয়ক বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই। অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম। (গ্র ৬৮৬)

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত তিনটি থেকে রামমোহনের যে বচন-চাতুর্য ও সূক্ষ্ম হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা কেবল উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টার রচনাতেই সুলভ। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকবর্গের বা রামমোহনের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের রচনায় এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখা যায় বলে মনে হয় না। আর তা হয়ত দেখাও যেতে পারে না; কারণ রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের এক বিষয়ে বিষম প্রভেদ ছিল। এই প্রভেদ হচ্ছে প্রেরণা সম্পর্কিত। মৃত্যুঞ্জয় বা পাষণ্ডপীড়নাদির লেখকরা লিখেছিলেন অর্থপ্রাপ্তির আশায়। তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ তাঁদের রচনায় দেখা দেয় নি, মুখ্যত সংস্কৃত পারশী বা ইংরেজী পুস্তক বা সে সকলের বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে তাঁরা যে সব রচনা করেছিলেন সেগুলো কোনও রকমে কাজ চালাবার মতো ছিল। এই তাঁদের সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা।

রামমোহন রায় যে গদ্য রচনা করেছিলেন তার পশ্চাতে ছিল মননশক্তি এবং হৃদয়বৃত্তির সেই প্রবল প্রেরণা যার তাড়নায় মানুষ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের ও ভবিষ্যৎ পুরুষদের মঙ্গল চিন্তা করে। এই আন্তরিক প্রেরণার ফলেই তাঁর প্রকাশভঙ্গী যথাসম্ভব সরল, সরস ও কৃত্রিমতাবর্জ্জিত হ'তে পেরেছিল। কিন্তু উক্ত প্রেরণাই কেবল তাঁকে এ কাজে সিদ্ধি দান করে নি। রামমোহনের বহুভাষাজ্ঞান এবং ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তাঁকে বাংলা গদ্যের কৃতী প্রবর্ত্তক করে তোলবার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' পড়লেই বোঝা যায়, বাংলা ভাষার অনন্য-

শেষাংশ ৩০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সাগর পারে

সীতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এরপর বাড়ীতে লোক কিছু বেড়ে গেল। আমার ভাসুর তাঁর স্ত্রী এবং নবজাত পুত্রকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন। বাচ্চাকে বহন করবার একটি অল্পবয়স্ক চাকরও জুটে গেল। বাড়ীও ছোটই, তবু ওরই মধ্যে গুছিয়ে গাছিয়ে স্থান-সঙ্কুলান করে নিতে হল।

আমার জা সম্পর্কে বড় হলেও বয়সে অনেক ছোট। এঁকে আগেই কলকাতায় একবার দেখেছিলাম। ময়মনসিংহের এক গ্রামের মেয়ে, এখনও শহরের ধরন ধারণে খুব অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। বেশ হাসিখুশি মিশুক মানুষ। তবে প্রথম সন্তানটিকে নিয়ে সারাক্ষণই ব্যতিব্যস্ত। আমার বড় ননদও এই সময় এসে পৌঁছলেন। তিনি এতদিন দেশে ছিলেন। রেঙ্গুনে এঁরা নিজের বাড়ী করেছিলেন কালাবাস্তিতে। এটি রেঙ্গুনের একটি শহরতলী। প্রধানতঃ ভারতীয়দের বাস এখানে। ব্রহ্মদেশবাসীরা ভারতীয়দের বলে "কালা"। এঁর স্বামী জিতেন্দ্রকুমার নাগ এখানে বাঙালীদের মধ্যে সুপরিচিত লোক ছিলেন। দান ধ্যান ও পরোপকারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন বেশ। বাড়ী তাঁর ভর্তি ছিল পরিবার-পরিজনে। দু-তিন ভাই একসঙ্গে থাকতেন। সকলেরই সন্তানসন্ততির সংখ্যা বেশ ভালই ছিল। জিতেনবাবুর মা ও বোনও মধ্যেমধ্যে এখানে আসতেন। সেকালের একান্নবর্ত্তী পরিবারের চিত্র একেবারে। এঁদের বাড়ী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ প্রায়ই লেগে থাকত। বাড়ী এমনিতেই ভর্ত্তি, অতিথি-অভ্যাগত এলে আর তিলধারণের জায়গা থাকত না। খাওয়া হত একেবারে ষোড়শোপচারে। বৌদের রান্নার হাতের খুব সুনাম ছিল। চাকর-বাকরকে বেশ শিখিয়েও নিয়েছিলেন।

যা হোক, আমাদেরও যৌথ সংসারযাত্রা চলতে আরম্ভ করল একরকম করে। খুব যে সুশৃঙ্খল ভাবে চলল তা বলা যায় না, কারণ সংসারের মানুষগুলি বড়ই বিভিন্ন স্বভাবের এবং বিভিন্ন ধরণের ছিল। তবে যতটা গোলমাল হতে পারত তা হল না। ঠিক করলাম যে সংসারের ভার যেটুকু আমার উপরে পড়েছে সেগুলো সেরেও প্রচুর সময় যখন আমার বেঁচে থাকবে, তখন আমার লেখা পড়ার কাজগুলো আবার আরম্ভ করা উচিত। লেখার কাজে আবার মন দিলাম। ব্রহ্মদেশে যতদিন ছিলাম লেখা কখনও বন্ধ করিনি। অনেক ছোট গল্প লিখেছি, "পরভৃতিকা" উপন্যাসটি লিখেছি। ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় আরো দুটি উপন্যাস লিখেছিলাম, "মহামায়া" আর "ক্ষণিকের অতিথি"। কিন্তু এ দুটিই কলকাতায় ফিরে আসবার পর লেখা।

শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়-স্বজনদের চেনা পরিচিত লোক এখানে অনেক ছিলেন, তবে বেশীর ভাগই বাঙালী। ভারতীয় অন্য প্রদেশের লোক ও Anglo-Indian ও Anglo-Burmanও কিছু কিছু ছিলেন তবে ব্রহ্মদেশীয় বন্ধুবান্ধব কারুর ত দেখলাম না। সামাজিকভাবে তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের কোনো মেলামেশা আছে বলে মনে হত না। ওরা ভারতীয়দের বিশেষ পছন্দ করে না মনে হয়। ভারতীয়রাও কাজকর্ম্মের খাতিরে এদের সঙ্গে যতটুকু না মিশলে নয়, তার বেশী আর কেউ এগোতেন না। আমি নিজে ওখানে সাত বৎসর ছিলাম, তার মধ্যে কথা বলেছি গোটা তিনেক ব্রহ্মদেশীয়া নার্স ও একজন বিলাত ফেরৎ মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে। ওদের ভাষা এক অক্ষরও বুঝতাম না, শিখবার কোনো চেষ্টাও করিনি। ওদের সাহিত্য বলে কিছু আছে কি না তার খোঁজও কখনও করিনি। শিল্প

কার্য্যে এদের হাত বেশ খেলে তার নিদর্শন অবশ্য চারিদিকেই দেখতাম। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করতাম যে, এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খুব আদর। বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেই সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভিক্ষা দেয়, তাঁদের চাইতেও হয় না। শুনতাম, এর পরিবর্ত্তে এঁরা জাতির প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটা সবটাই চালিয়ে দেন। ব্যবস্থাটা আমার খুবই ভাল লাগত। এতে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে যে হীনতা আছে সেটা একেবারেই থাকে না। ভারতীয়দের মধ্যে এখানে সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ত মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশের লোকদের। বাড়ীর চাকরবাকরের কাজ এরাই বেশীকরত। এদের ভিতর খ্রীষ্টান সংখ্যায় অনেক। দিব্য ইংরেজী বলতে পারে অথচ অক্ষর-পরিচয় নেই। বাঙালীও অনেক দেখতাম পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের লোক বেশী। এদের ভাষা এমন যে অন্য জায়গার বাঙালীদের পক্ষে বোঝা প্রায় অসম্ভব। আমার একটি নোয়াখালীবাসী চাকর জুটে ছিল, আমি বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে শেষে হিন্দিতে কথা বলতাম। একজন বাঙালী আর-একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারে না নিজের ভাষায়, এ বিষয়ে একদিন বিস্ময় প্রকাশ করাতে আমার মাদ্রাজী আয়া বলল; "ও লোগ বাঙালী নেহি আম্মা ও লোগ চাট্‌গাঁওওয়ালা হ্যয়।" তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে চট্টগ্রামবাসীও বাঙালীই, আর কিছু নয়।

ওখানে থাকা কালে ভারতীয় বলতে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে ভদ্রলোক যাঁরা তাঁরা সবই প্রায় বাঙালী। ওখানে তখন একটি ব্রাহ্মসমাজও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বেশ কয়েকজন ব্রাহ্ম ওখানে বাস করতেন। রবিবারের নিয়মিত উপাসনা হত, মাঘোৎসব হত। কলকাতায় যাঁদের আগে থেকে চিনতাম, তা ছাড়াও ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার, কুলদাপ্রসাদ নিয়োগী ও তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। রেঙ্গুনে নানা ব্যবসাসূত্রে অনেক বাঙালী বেশ কিছুকাল ধরে বসবাস করছিলেন, এঁদের মধ্যে খুব নামজাদা ও কেউ কেউ ছিলেন। তাদের কাছ থেকে সাদর আমন্ত্রণও দু-একবার পেয়েছিলাম তবে সে-সব নিমন্ত্রণ রক্ষা আর কোনদিন হয়ে ওঠেনি।

কাজকর্ম্মের মধ্যে দিয়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তারা বেশীর ভাগই মাদ্রাজী, তামিলভাষী, ও তেলেগুভাষী বেশীর ভাগই রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। তামিলভাষীরা, তেলেগুভাষীদের কেমন যেন একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত, এর কারণটা আমি কোনদিনই বুঝতে পারিনি। সাহেব-মেমদের এরা মহা ভক্ত ছিল। মেমসাহেবের বাড়ী কাজ করতে পেলে তারা আর কিছু চাইত না। ভারতীয় মনিবদের তারা একটু অপকৃষ্ট জীবই মনে করত মেমদের তুলনায়। তাদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শুনতাম, "একজন শাড়ী পরা মানুষ, আর একজন শাড়ী পরা মানুষের জুতো কেন বইবে?" গাউন পরা মহিলার জুতো বহন করাটা এরা গর্ব্বের বিষয়ই মনে করত। মেমদের বাড়ী কাজ করে অবশ্য এদের কিছু কিছু উপকার হয়েছিল। এরা পোশাক-আশাকে অভব্য বা নোংরা ছিল না, বাচ্চাকাচ্চার কাজ খানিকটা জানত, সকলেই প্রায় হিন্দি এবং ইংরেজি চলনসই রকম বলতে পারত। গির্জ্জায় যাওয়া ও নিজেদের ধর্ম্মীয় আচার আদি পালনে বেশ নিষ্ঠা দেখাত। ধূমপান ও মদ্যপান এদের মধ্যে বেশ চলতি ছিল, সেগুলোও মেমদের কাছে শেখা কি না জানি না। আর একটা ভাল জিনিষ এদের মধ্যে দেখতাম, ধনী-দরিদ্রের ভেদটা এদের তত ছিল না। একই পরিবারে কেউ বা আয়া বাবুর্চির কাজ করছে, আবার তারই মাসতুতো ভাই হয়ত বড় ব্যারিষ্টার বা রেলওয়ের বড় কর্ম্মচারী। তাদের মধ্যে মেলামেশা, যাওয়া-আসা বেশ আছে। ব্রহ্মদেশের ভাষা কিছু না শিখলেও, শুনে শুনে তামিল ভাষাটা মাথার মধ্যে বেশ ঢুকে গিয়েছিল। ওদের ভাষা বুঝতে প্রায় সবই পারতাম, বলবার চেষ্টা করলে হয়ত তাও পারতাম তবে সে চেষ্টা কোনদিন করিনি। আমার দ্বিতীয়া কন্যা সুস্মিতা রেঙ্গুনেই হয়েছিল, এখানেই তার প্রথম কথা বলতে শেখা। সে প্রথম যে ভাষায় কথা বলতে শিখল,

সেটা তার নিজেরই তৈরি, হিন্দি তামিল এবং বাংলার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বেশ বছর দুই-তিন অবধি সে এই ভাষায় কথা বলত। বেচারীর দোষ নেই, কানের কাছে তার নিরন্তর বাজতে থাকত, কলকাতার বাংলা ভাষা, পূর্ব্ববঙ্গের বাংলা ভাষা, হিন্দি ও তামিল। কোন্‌টা সে বলে তা হলে? তার আয়া ও তার তিন-চারটে ছেলেমেয়ে সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকত। তাদের ভাষাটাই অগত্যা সে সর্ব্বাগ্রে আয়ত্ত করে নিল।

চাকর আয়াদের বাদ দিলে সমশ্রেণীর মাদ্রাজীদের সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় হয়নি। একজন তামিল খ্রীষ্টান হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। অসুখে বিসুখে আমাদের দেখা-শোনা করতেন। তিনি তাঁর বড়দিদির সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের বাড়ীতে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তাঁর দিদিটি অতি উচ্চশিক্ষিত এবং খুব অমায়িক। এঁরই ছোট বোনের বিয়েতে আর-একবার গিয়েছিলাম। আর এক Anglo-Indian পরিবারে একবার পথ ভুলেই প্রায় গিয়ে পড়েছিলাম, তাঁদের বাড়ীর এইটুকুই মাত্র মনে আছে যে, গৃহিণীকে দেখে আমি কর্ত্তার স্ত্রী বলে মনেই করতে পারিনি। তিনি একেবারে বৃদ্ধা, কর্ত্তাটি বেশ যুবাপুরুষ। ওখানে সাত বৎসর বাসের মধ্যে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল। নানা কারণে সর্ব্বক্ষণই প্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হত, এর ওর বাড়ী যাবার সময়ই পেতাম না।

এখন পূর্ব্ব কথায় ফিরে আসা যাক। গোছগাছ করে সংসার একরকম আরম্ভ করা গিয়েছিল, চলেও যাচ্ছিল মোটামুটি ভাল ভাবে। কলকাতা থেকে দিদি ও বাবার চিঠিপত্র প্রায়ই পেতাম। এমন সময় নিজে বেশ বেশী রকম অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ছেলেবেলার পর এত বেশী ভোগা এই প্রথম। নিজেকে বড় বেশী বিপন্ন মনে হত। কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে আমার স্বামীকে বেশীর ভাগ সময় আমার সেবা করেই কাটাতে হত।

কলকাতায় খবর দেওয়া হল। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল যে এখন কিছুদিন আমি কলকাতায় গিয়ে থাকব। দাদা আসবেন এখানে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে, কারণ আমার স্বামীর পক্ষে এখন কাজকর্ম্ম ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়।

দাদা এলেন। এই ছোট বাড়ীর মধ্যেই কোনমতে তাঁর জায়গা করে দেওয়া হল। রেঙ্গুন ঘুরে ফিরে দেখলেন। বিভিন্ন দেশের চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য,এসব বিষয়ে তাঁর দারুণ ঝোঁক, সমস্ত বাজার ঘেঁটিয়ে অনেক জিনিষ কিনে ফেললেন। বড় বড় দুটি নর্ত্তকের মূর্ত্তি এখনও তাঁদের বাড়ীর দরজার দুধারে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। যিনি তাদের আদর করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি আজ কোথায়?

একদিন কালাবস্তিতে আমার বড় ননদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলেন। ভুল করে সোনার একটা হাত ঘড়ি পকেটে রেখেছিলেন, সেই শুদ্ধ সেটা এক ধোপাকে দিয়ে দেওয়া হল। তারপর সেটা উদ্ধার করতে কি হাঙ্গাম। মাঝরাত্রে কালাবস্তিতে সেই ধোপার বাড়ী চড়াও হয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তবে সে ঘড়ি উদ্ধার হল।

যাহোক এরপর অল্পস্বল্প জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে ত আবার দাদার সঙ্গে ফিরে চললাম কলকাতায়। তখনও শরীর ভাল করে সারেনি, কেবিনে শুয়ে পড়ে থেকেই প্রায় তিনটা দিন কেটে গেল।

কলকাতায় ত ফিরে এলাম। বাড়ী প্রায় তেমনই আছে। দাদার মেয়ে রমা একটু বড় হয়েছে। আমার খুড়তুতো ভাই হেমন্ত এতদিন আমাদের বাড়ীতে ছিল। বিয়ে করবার পরেও কিছুদিন ছিল। এখন শুনলাম, সে অন্য জায়গায় উঠে গেছে। তার ঘর আমাকে দেওয়া হল থাকবার জন্য।

আত্মীয়-পরিজন চেনা পরিচিত সকলের সঙ্গে আবার দেখা-সাক্ষাৎ হল। বাবা বেশ ভুগেছিলেন আমার বিয়ের পর, একটু রোগা হয়ে গিয়েছেন দেখলাম। অন্যরা যে যেমন ছিলেন, সেই রকমই আছেন।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। শান্তিনিকেতন থেকে এই সময় সন্তোষ

মজুমদার এসেছিলেন কলকাতায়। একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এর কিছুদিন পরেই শুনলাম যে তিনি মারা গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এ সময় চীন যাত্রার জোগাড় করছিলেন। এরই সব ব্যবস্থা করতে তখন কলকাতায় এসেছিলেন। জোড়াসাঁকোয় একদিন গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তখন দারুণ ভিড়। তবু তারই মধ্যে এসে দুচারটে কথা বলে গেলেন। আমার ভ্রাতৃজায়া আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সীতাকে কি রেঙ্গুনে ডুরিয়ান (একরকম দুর্গন্ধ ফল) আর নাপ্পি (মাছের তৈরী একরকম ব্রহ্মদেশীয় দুর্গন্ধ খাদ্য) ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হত না? ওর চেহারা এরকম হয়ে গেল কেন?" সত্যিই চেহারাটা তখন খুবই খারাপ হয়েছিল। এর কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ কিছু অনুচর পার্ষদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চীন ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ভ্রমণে চলে গেলেন। দলের মধ্যে ক্ষিতিমোহন বাবু, নন্দলাল বাবু, কালিদাস নাগ প্রভৃতি ছিলেন বলে মনে পড়ে। রেঙ্গুনে এঁদের বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন ওখানের প্রবাসী বাঙালীরা। আমি কলকাতায় বসে বসেই তার গল্প শুনলাম চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের বাড়ী গিয়ে খেয়েও এসেছিলেন। আমার শ্বশুরবাড়ীর সবাই তখন এক পাঁচতলা বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ flatএ গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। সেখানে উঠতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "এ যে সত্যিই পঞ্চত্ব পাবার জোগাড়।" অনেক রকম মাছের ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেওয়াতে ক্ষিতিমোহনবাবু বলেছিলেন, "এ কি রে? কিছু খারাপ খবর দিবি নাকি?" আমার স্বামীর এক মাসতুতো ভাই নীহাররঞ্জন পাল, বাল্যকালে শান্তিনিকেতনে পড়তেন, তাঁকেই একথা বলেছিলেন।

এইসময় কলকাতায় আমার প্রথমা কন্যাটি জন্মগ্রহণ করে। ডাক্তার, নার্স, ঔষধ পথ্য, সেবা শুশ্রূষা কিছুরই ত্রুটি হয়নি। মেয়েটি দেখতেও বেশ বড় সড় আর সুন্দর হয়েছিল। সাধ করে তার নাম রেখেছিলাম মুক্তাকণা। কিন্তু তার যন্ত্রায় জীবন খালি রোগযন্ত্রণা ভোগ করেই শেষ হয়ে গেল। মাত্র এগারো বৎসর সে বেঁচে ছিল। এর ভিতর নিজেও শান্তি পায়নি, আমাকেও শান্তি দেয়নি। আমি চেষ্টা করেও তার যথাযথ সেবা করতে পারিনি, অন্যায় ব্যবহার করেছি অনেক সময়, এটা আমার জীবনের একটা মস্ত বড় অপরাধ। প্রথম মাস তিনেক সে ভালই ছিল।

এই সময় চীন ভ্রমণ সেরে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। একদিন আমাকে দেখতে এসে খুকীকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। কি নাম রেখেছি জিজ্ঞাসা করলেন। নাম শুনে প্রশংসাও করলেন। তারপর ঘুমন্ত শিশুর দিকে চেয়ে বললেন, "এর উপর আমার হিংসা হচ্ছে। কেমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছে, একে ত বিশ্বভারতীর ভাবনা ভাবতে হয় না?" খুকীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে এরপর তিনি চলে গেলেন।

এবারে মাস তিনেক পরে আবার রেঙ্গুন ফিরে গেলাম। Weatherটা খুব ভাল ছিল না। জাহাজ বেশ দুলছিল, মস্ত বড় বড় ঢেউ। দুচারটে ঝপ্ ঝপ্ করে port hole-এর গায়ে আঘাত করছিল। জল ও ঢুকে পড়ল এক-আধবার। মেয়ে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে sea sick হবার অবসরও পাইনি। ঝাড়া হাত-পা য়ে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু একটা হত। এবারে যে জাহাজটায় গিয়েছিলাম, সেটার নাম Arankola। এখানে আমাদের একজন বন্ধু লাভ হল। তিনি জাহাজেরই একজন কর্ম্মচারী, নাম Mr. Bose। ভদ্রলোক সত্যই ভদ্রলোক ছিলেন, এত সৌজন্য বাঙ্গালীর মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায় নিজেই আলাপ করেছিলেন, একদিন আমাদের তাঁর cabin-এ নিয়ে গিয়ে খুব ষোড়শোপচারে নিমন্ত্রণও খাইয়ে দিয়েছিলেন। B.I.S.N. কোম্পানীর জাহাজ তখন নানাদেশে ঘুরত, এবং যাত্রাপথে বারবার রেঙ্গুনে থামত। তিনি সর্ব্বদাই এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং খুব দামী দামী উপহার নিয়ে আসতেন। একবার বোধহয় Australia থেকেই এমন প্রকাণ্ড এক বোতল ভর্ত্তি সুগন্ধী নিয়ে

এসেছিলেন, যে আমি ত দেখে থ। সেটা শেষ করতে আমার অনেক বৎসর লেগেছিল। আর একবার নিয়ে এলেন gram fed muttonএর বিরাট এক ঠ্যাং। সেও খেয়ে শেষ করা দুষ্কর। রেঙ্গুন থেকে চলে আসার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

যাক, এবারে রেঙ্গুনে গিয়ে Phayre Streetএ যে বাড়ীটাতে উঠলাম, সেটা একটা বেশ বড় পাঁচতলা বাড়ী। পাঁচতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তার একটায় আমরা থাকতাম, আর একটায় এক মুসলমান পরিবার থাকতেন। সে ভদ্রলোকের নামটা ঠিক কি ছিল মনে নেই, চাকর-বাকররা তাঁর উল্লেখ করত সালাম সাহেব বলে। তাঁরা গোঁড়া মুসলমানই, মেয়েদের মধ্যে যাঁরা অল্পবয়স্কা তাঁদের কোনোদিনই চোখে দেখিনি, তবে কর্ত্তার বৃদ্ধা শাশুড়ী মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের ফ্ল্যাটে হাজির হতেন। তিনি বুড়ীমানুষ বলেই বোধহয় পর্দার বিশেষ ধার ধারতেননা। ভাঙা ভাঙা বাংলায় গল্প করতেন। আমার মেয়ে এবং আমার জায়ের ছেলে দেখে মহা খুশী হয়ে বললেন, "এ বেশ ভাল, ঘরে ঘরেই থাকবে।" আমরা তাঁকে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে আমাদের বাঙালী হিন্দুদের ঘরে ওরকম ঘরে ঘরে বিবাহের ব্যবস্থা হয় না।

বাড়ীটা আগের বাড়ীর চেয়ে কিছু বড়ও ছিল। উপরের ছাদটাও আমরা ব্যবহার করতে পারতাম। ওখানেই গোড়ার দিকে একটা বড় পার্টি দিয়েছিলাম। অনেক লোককে বলেছিলাম। ঐ বোধহয় আমার ওখানের একমাত্র বড় social অনুষ্ঠান। সবাই এসেছিলেন, আনন্দও করা গিয়েছিল। তারপর অবশ্য ক্রমে রোগে শোকে সাংসারিক উৎপাতে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে উৎসব অনুষ্ঠান করার কোনো অবসরই আর রইল না। বড় জায়ের আর একটি পুত্র হল এখানে। পরিবারটি এখন বড়ই দাঁড়াল বেশ। দাসী-চাকরের সংখ্যাও বাড়ল, তাদের ঝগড়াঝাঁটিও বাড়ল। ঐ বাড়ীরই সর্ব্বনিম্ন তলায় আমার স্বামীর কর্মস্থল বইয়ের দোকান ও ছাপাখানা ছিল। এইটা একটা সুবিধা ছিল যে তাঁকে বেশী ছোটাছুটি করতে হত না।

এই সময় আমার মেয়েটির দারুণ অসুখ আরম্ভ হল। ঘন ঘন fit হতে লাগল। সে দিনগুলোর কথা মনে করলে এখনও মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখছি। ওখানের ডাক্তাররা ত প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলেন না। ইংরেজ সিভিল সার্জ্জেনকেও ডেকে দেখান হল। কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারলেন না। ওখানেও বন্ধুবান্ধবরা তখন খুব সাহায্য করেছিলেন। রোগ কিন্তু একভাবেই চলতে লাগল। শেষে ওখানের একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি পাশ করা ডাক্তার নন, কিন্তু নিজের বন্ধুবান্ধবদের ওষুধ দেন এবং সকলেই উপকৃত হন। নাম ছিল তাঁর বিভূতি, দাস বা গুপ্ত, এত দিন পরে ঠিক মনে নেই। তিনি কারো কাছেই পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু নিতেন না। পোস্টমাস্টারের কাজ করতেন বোধহয়। তাঁকেই ডেকে আনা হল। শ্যামবর্ণ রোগামানুষ, চশমাপরা। অনেকক্ষণ বসে বসে একদৃষ্টে শিশু রোগিনীকে দেখলেন। তারপর ওষুধ দিয়ে গেলেন।

এরপর থেকেই রোগের প্রকোপ কমতে আরম্ভ হল, এবং কয়েকদিন পরে fit হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তবে শুনলাম, যে শিশু যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা সম্ভবতঃ কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে সারবে না, মধ্যে মধ্যে রোগের আক্রমণ হবেই। শিশুর মানসিক বিকাশও এতে বিশেষ ভাবে ব্যাহত হতে পারে। বুঝলাম, সামনে এখন বিষম সংগ্রামের দিন। নূতন দেশে নূতন সংসার। এই পীড়িত শিশুর আংশিক ভারও নিতে পারে সেরকম কেউই তখন সে পরিবারে ছিল না। ঝি-চাকর সবাই নূতন, বিশ্বাসের উপযোগী কেউ নয়। আমাকে এখন অনেকাংশে গৃহবন্দীর জীবন যাপন করতে হবে, তা বুঝতেই পারলাম। আমি সাত বছর ছিলাম ব্রহ্মদেশে, তার ভিতর অর্দ্ধেক দিন সত্যি সত্যিই প্রায় বন্দী ছিলাম। দু-এক ঘণ্টার জন্য কখনও কখনও বেরোতাম, তাও শিশুটিকে সঙ্গে নিয়েই বেশীর ভাগ। শেষের দিকে অতি একটি কাৰ্য্যঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আয়া জোটাতে কিছু

ছুটি আমার মাঝে মাঝে মিলত। যতদিন রেঙ্গুনে ছিলাম ততদিন এই মেয়েটি fitএর অসুখ এবং অন্য নানা রোগে ভুগেছিল। বিভূতিবাবুই তার দেখাশোনা করতেন, তাতেই সে বারে বারে সামলে উঠত। বিভূতিবাবু হয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বা তার কিছুদিন আগেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশে চলে আসেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ আমার অসীম। কলকাতায় এসে তাঁর খোঁজ পেয়েছিলাম কিন্তু যোগসূত্র আর কোনদিনই জোড়া লাগেনি।

এদিকে দিন একভাবেই কাটতে লাগল। লেখা-পড়ার কাজে বেশী করে ডুবে থাকার চেষ্টা করতাম, তাও সব সময় হয়ে উঠত না। বন্ধুভাবে মিশতে পারি এমন কোনো লোক সেখানে পাইনি, একলা একলাই দিন কাটত। মেয়ে কখনও ভাল থাকত, কখনও থাকত না। কলকাতার থেকে নিয়মমত চিঠিপত্র আসত, দিদি লিখতেন, বাবাও লিখতেন। দিদির বিবাহ আসন্ন এরকম একটা আভাস মাঝে মাঝে পাচ্ছিলাম, তবে একেবারে সঠিক করে জানতাম না। এবারে জানলাম যে, কালিদাস নাগ মহাশয়ের সঙ্গে বিয়ে তাঁর ঠিক হয়ে গিয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই তাঁর বিয়ে হবে। শুনে খুব আনন্দিত হলাম। কালিদাসবাবুর সঙ্গে আমাদের বহুদিনের আলাপ ছিল। বোধহয় ১৯১১-তে যখন আমরা শান্তিনিকেতন যাওয়া শুরু করি, তখন থেকেই তিনিও এই নব তীর্থযাত্রীদের দলে জুটে যান। অতি সুদর্শন, সুকণ্ঠ, সদালাপী লোক ছিলেন, কাজেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি পরিচিত ব্রাহ্মবাড়ীর ছেলে, কাজেকাজেই তাঁকে আমরা অনেক জায়গায়ই দেখতাম। শান্তিনিকেতনে যখনই গানের আড্ডা বসত, কালিদাসবাবু সেখানে অগ্রণীরূপে উপস্থিত হতেন। নিজে গাইতেনও বেশ ভাল, এবং গান শিখতেনও খুব চট্ করে। গাইতে বললে কিন্তু সহজে রাজী হতেন না কিছুতেই। অল্পবয়সেই অধ্যাপক হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু গুরুগম্ভীর কোনোদিনও হতে পারেননি। সুকুমার রায়দের বাড়ীর সব কৌতুক অনুষ্ঠানে তিনি সব সময়ে অতি উৎসাহে যোগ দিতেন। মাঝে কিছুদিন নানাদেশে ঘুরেছিলেন। প্যারিসে গিয়ে পড়াশোনাও করেছিলেন। সিংহলে একটি কলেজের ভার নিয়েও কিছুদিন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সর্ব্বদাই কৌতুক করে "ঐতিহাসিক" বলে সম্বোধন করতেন। আলিপুর চিড়িয়াখানার তদানীন্তন অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ বসু ছিলেন তাঁর বড়মামা। এইখানেই বাস করতেন কালিদাসবাবুর মেজভাই গোকুলচন্দ্র নাগ। ইনি ভবানীপুরের Four Arts Club এর সংগঠক সভ্যদের মধ্যে প্রধান একজন ছিলেন। চারটে Arts-এর সব কটাতেই তাঁর অধিকার ছিল প্রশস্ত। বিজয়বাবুর বাড়ী আর বাগান এই সভাটির খুবই কাজে লাগত, এবং প্রায়ই এখানে সভার অধিবেশন বসত। কলকাতায় থাকলে কালিদাসবাবু এসব উৎসবে নিয়মিত হাজির হতেন। তবে ভবঘুরে রোগ তাঁর চিরদিনই ছিল, থেকে থেকে কিছুদিনের জন্য কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যেতেন তার ঠিক নেই। এবারে শুনলাম, তিনি পাকাপাকি কলকাতায় এসে বসেছেন, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নিয়েছেন। এতদিনে বোধহয় গৃহী হওয়ার দিকে মন গিয়েছে এবং বিবাহও স্থির করে ফেলেছেন। এত দিনের বন্ধু আমাদের ঘরের জামাই হবেন শুনে খুবই খুশী হলাম।

বৈশাখ মাসে বিয়ের তারিখ পড়েছিল, ঠিক করলাম একটু আগে আগেই যাব। গোছগাছ করে নিয়ে ত যাত্রা করা গেল। বাড়ীতে পৌঁছেই একটা জিনিষ প্রথম নজরে পড়ল। মা যেন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই চলছেন, কথাবার্ত্তা বলছেন। মুলু মারা যাবার পর থেকেই তিনি যেন সংসারের সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, জগৎ সংসারের কিছুর সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ ছিল না। এখন তিনি হঠাৎ আগেকার দিনের মধ্যে ফিরে গেছেন যেন। বোধহয় বড়মেয়ের বিয়েতে খুশী হয়েছেন খুব, তাতেই এই পরিবর্ত্তন আপার সার্কুলার রোডে প্রবাসী কার্য্যালয়ের বাড়ীটি

তখন ছিল বিরাট, চারদিকে জমিও ছিল অনেক। সেই বাড়ীতে বিয়ে হবে ঠিক হয়েছিল। আমি যখন পৌঁছলাম, তখনও বিয়েতে কে আচার্য্য হবেন ঠিক হয়নি। আমার বিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত প্রথায় Act III অনুযায়ী রেজিষ্ট্রি করে হয়েছিল, এই বিয়েতে শুনলাম বরের অসম্মতি থাকায় রেজিষ্ট্রি হবে না। আচার্য্য হলেন শেষ অবধি ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার।

রবীন্দ্রনাথ তখন পর্য্যন্ত কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু শুনলাম তিনি কয়েক দিন পরে কলকাতা থেকে চলে যাবেন, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত থাকবেন না। উনি তখন আলিপুরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়ীতে ছিলেন। সেইখানে একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ হল। রবীন্দ্রনাথ বর-কনেকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং উপদেশ দিলেন। খাওয়া দাওয়া গান প্রভৃতিও হল। বিয়েতে যে রইলেন না, আমাদের সেই অভাবটা যেন খানিকটা পূর্ণ করে দিয়ে গেলেন।

বাড়ীতে তখন বেশ পুরোদমে হৈ চৈ চলছে, স্যাকরা আসছে, বেনারসী-ওয়ালা আসছে। কার্য্যতঃ বাড়ীর গিন্নী যে, সে-ই কনে, বেশ মজার ব্যাপার হচ্ছিল। মা ত বহুকাল গৃহিনীর পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন, রোগে পড়বার সময় থেকে। দিদিই গৃহকর্ত্রীর পদে ছিলেন। দাদার নববিবাহিতা স্ত্রী তখনও গৃহিণীর স্থান নেননি, বেশীর ভাগই বাপের বাড়ী থাকতেন। প্রায় বিয়ের দিন অবধি দিদি গিন্নীপনা করলেন। বিয়ের আগের দিন বাবা চাবিটা চেয়ে নিলেন। বললেন, "দেখি মা, ওটা এখন আমায় দাও।"

দিদির বিয়ে খুব ঘটা করেই হয়েছিল। বরকে নিয়ে তার বন্ধুর দল খুব হল্লোড় করেছিলেন। একটা দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। বর এগিয়ে আসছেন, বন্ধুগণ তাঁর চারদিক্ ঘিরে, তাঁদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপণে বরকে একটা টোপর পরাবার চেষ্টা করছেন, এবং বর প্রাণপণে তাতে বাধা দিচ্ছেন।

বিয়ে ত হয়ে গেল, তার পরদিন বেশ বৃষ্টির মধ্যে বর-কনে বিদায় হয়ে গেল। তার পরদিন গেল ফুলশয্যার তত্ত্ব। আমরাও বরের মামার বাড়ী আলিপুরে গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম।

বিয়ের পরেই রামমোহন রায় রোডের ঐ পুরনো বাড়ী ছেড়ে, ঐ রাস্তার উপরেই নূতন একটা বাড়ীতে উঠে গেলাম। সেইখানে দুতিন দিন থেকে আমি আবার সমুদ্রপথে পাড়ি দিলাম।

আমাদের দুই বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বাবা বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। স্ত্রী ত তাঁর থেকেও ছিলেন না, মেয়েরাও দুজনেই ঘর ছাড়ল।

এর পর থেকে অনেক সময় তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকতেন। বিশ্বভারতীর কাজে মধ্যে মধ্যে যোগও দিতেন। আমার ছোট ভাই অশোকও এই সময় ওখানে কিছুদিন অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। তাঁর বিয়ের কথাও এ সময় কিছু কিছু শুনে এসেছিলাম। ডাঃ নীলরতন সরকারের সব-ছোট মেয়ে কমলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির হয়েছিল, তবে কখন বিয়ে হবে সেটা পাকাপাকি স্থির হয়নি।

কলকাতার থেকে চলে আসবার আগে একবার আমার মেজ ননদের স্বামী অশ্বিনীকুমার রায় মশায়ের সঙ্গে দেখা হল। এঁকে আগে আমি কখনও দেখিনি। তাঁর তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীর জন্মের সংবাদও তখনই পাওয়া গেল। এঁর সঙ্গে পরে বোধহয় আর একবার মাত্র দেখা হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র রেখে যান, সব ক'টিই তখন অতি অল্পবয়স্ক। আমার মেজ ননদ সুপ্রভা এই ক'টি অপোগণ্ড সন্তান নিয়ে বহুবৎসর কঠোর সংগ্রাম করেন। অশ্বিনীবাবুর ইচ্ছা ছিল মেয়েদেরও উচ্চ শিক্ষা দেন। সুপ্রভা অনেক কষ্ট সহ্য করে মেয়ে তিনটিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত কলেজে পড়িয়েছিলেন, এবং সব ক'টিরই বেশ সুপাত্রে বিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলে এম-এ পাশ করে কিছুদিন মৌলিক গবেষণার কাজও করেছিলেন। সুপ্রভার অতি অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, কাজেই পড়াশুনা তাঁর কিছুই হয়নি বললেই হয়, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার মূল্য তিনি অনেক উচ্চ শিক্ষিতের চেয়ে বেশী বুঝতেন। তাঁর স্বামী ময়মনসিংহের আঠার-

বাড়ী স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। এই জমিদার বংশ তাঁদের আত্মীয়ও ছিলেন। সুপ্রভা বিধবা হবার পর এঁদের কাছ থেকে একটি মাসিক পেন্‌শন পেতেন এবং অক্লান্ত ভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন। সাধারণ স্বাস্থ্য তাঁর ভালই ছিল গোড়ার দিকে। কিন্তু সংসারের সমস্ত কাজ প্রায় নিজে করে এবং চারটি ছেলেমেয়েকে লালন পালন করে তাঁর বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। নিজের কোনো যত্ন তিনি করতেন না, করবার উপায়ও ছিল না। তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান ছিল। যাতে নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কাজ তিনি কিছুতেই করতে চাইতেন না। এ জন্য একটু আলাদা আলাদা থাকা পছন্দ করতেন। হাস্যমুখী ও প্রফুল্লচিত্ত মানুষ ছিলেন, সুরুচি-বোধও বেশ জাগ্রত ছিল। অকাল বৈধব্যে, অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি কিছুই মুষড়ে পড়েননি, যেখানে যেতেন হাসি গল্পে বেশ জমিয়ে রাখতেন। তাঁর সব কাজকর্ম, রান্না-বান্না, সেলাই, সবই অতি পরিপাটি ছিল, এলোথেলো কাজকর্ম তিনি দেখতে পারতেন না। প্রখর হিসাব জ্ঞান ছিল, একটি পয়সা তিনি অপব্যয় করতেন না। দরকার পড়লে নিজের সীমিত আয়ের মধ্য থেকেও আত্মীয়-স্বজনকে অর্থসাহায্য করতেন। স্বামী অল্প কিছু যা রেখে গিয়েছিলেন, এবং পেন্‌শন্ হিসাবে যা পেতেন, তারই মধ্যে গুছিয়ে গাছিয়ে মেয়েদের বেশ ভাল ভাবেই বিয়ে দিয়েছিলেন। যতদিন ময়মনসিংহ শহরে নিজের সংসার নিয়ে আলাদা বাড়ীতে ছিলেন, তাঁর বেশ সুশৃঙ্খল সংসারই ছিল। তবে দেশ-বিভাগের সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য তাঁকে বাড়ীঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হল। এতে তিনি বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন কিন্তু তখন আর কিই বা করবার ছিল? মেয়ে তিনটিরই তখন বিয়ে হয়ে গেছে তবে ছেলের পড়াশুনা তখনও শেষ হয়নি। কাজেই কলকাতায় আত্মীয় বাড়ীতে তাঁকে থেকে যেতে হয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি খানিক দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করে গেলেন, এতে বড় অবাক্ লাগে। তাঁর মত কর্তব্যনিষ্ঠ, অক্লান্তকর্মী মানুষ এ শাস্তি ভোগ করলেন কেন? ইহজীবনের কর্মফলের মধ্যে তাঁর এ-সব কিছু পাওনা ছিল না, তা প্রায় নিশ্চয় করে বলা যায়। কোনোদিন কারো ভালো ছাড়া মন্দ করতে তাঁকে দেখা যায়নি। এই জন্যেই হয়ত পূর্বজন্মের কর্মফল এ জন্মেও ফলে বলে মানুষের একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। এটা নিজের জীবনেও যেন দেখতে পাই। যা পেয়েছি এ জগতে এসে, আনন্দের দিক্ দিয়ে, সৌভাগ্যের দিক্ দিয়ে, তা পাবার যেমন কোন যোগ্যতা আমার ছিল না, তেমনি শাস্তিও যা পেয়েছি, তা পাবার মত দুষ্কর্মই বা আমি কিছু কি করেছিলাম?

দিদির বিয়ের পর আবার যখন ব্রহ্মদেশে ফিরে গেলাম, তখন পরিবারের উপর হঠাৎ যেন শনির দৃষ্টি পড়ল। বাড়ীতে তিনটি শিশু সন্তান ছিল, আমার বড় জায়ের দুটি ছেলে ও আমার একটি মেয়ে, তিনটিই এক সঙ্গে দারুণ রক্ত আমাশা রোগে আক্রান্ত হল। সে এক নিদারুণ কাল। মনে করলে এখনও অবিশ্বাস্য লাগে। রেঙ্গুন একটা বড় শহর, মোটামুটি সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থাই সেখানে ছিল। ছেলেদুটির এলোপ্যাথী চিকিৎসা চলতে লাগল, সেবা যাতে ভাল মতে হয় তার জন্য নার্সও রাখা হল। আমি মেয়ের চিকিৎসা বিভূতি বাবুর উপরেই ফেলে রাখলাম, কারণ আগের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম যে, এ মেয়ের ডাক্তারী চিকিৎসায় কোনো ফল হবে না। সে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগল।

ছেলেদুটিকে বাঁচান গেল না। কয়েক দিনের ব্যবধানে তারা দুজনেই মারা গেল। তার পিতামাতার যা অবস্থা হল, তা একেবারে অবর্ণনীয়। এরই মধ্যে আবার কি কারণে জানি না, Phayre Street-এর পাঁচতলা বাড়ী ছেড়ে, কালাবস্তির একটা বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে দুর্গতি বাড়ল বই কমল না। এখানেই আমার জায়ের বড় ছেলেটি মারা গেল। আবার ফিরে এলাম Phayre Street-এর বাড়ীতে। দ্বিতীয় ছেলেটি এই বাড়ীতে গেল।

সে সময়টা পরিষ্কার করে যেন এখন মনে পড়ে না অথচ সে সময়ের অন্যান্য কথা তবু অনেকটা মনে আছে।

আবার বাড়ী খোঁজা আরম্ভ হল, এবাড়ীতে আর কেউ থাকতে চাইল না। খুঁজে পেতে আর-একটি বাড়ীতে উঠে গেলাম। এটা এক মহারাষ্ট্রীয় উকীলের বাড়ী, নাম তাঁর হালকার। ভারতীয় লোক, কাজেই বাড়ীটা একটু ভারতীয় ভাবে তৈরি, ঘরের সংখ্যাও বেশী। সেটার দরকারও ছিল, কারণ এই সময়ে আমার শ্বশুর এখানে এলেন, এবং অবিবাহিতা ছোট ননদটিও এসে এখানে মাঝে মাঝে থাকতে লাগলেন। বাড়ীর সামনে একটা ফাঁকা মাঠের মত ছিল, বাড়ীতে আলো বাতাস খুব। অন্যান্য ব্রহ্মদেশীয় বাড়ীর চেয়ে এটাতে ব্যবস্থাও একটু ভাল ছিল।

ক্রমশঃ

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জর্জ কার্ভার আস্তে আস্তে খুব সতর্কতার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের দিকে মন দিয়ে তা কার্যকর করে তুলতে লাগলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অগ্নিক্ষরা রুক্ষ দিনগুলিতে শুয়োরের মাংসে যাতে পচন ধরতে না পারে তার জন্য শুধু কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কি উপায়ে তা সংরক্ষিত করে রাখা যায় জর্জ কার্ভার তাও গ্রামবাসীদের শিখিয়ে দিলেন।

পুষ্টিহীনতা রোগের প্রকৃত কারণ সেযুগের অনেক বড় বড় ডাক্তারেরও জানা ছিল না, তারা শুধু আন্দাজের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করত। পুষ্টিহীনতা রোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক হলো কাঁচা ফল। খেয়ে সহজে এই রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বিজ্ঞ অভিজ্ঞতালব্ধ বহু বিখ্যাত চিকিৎসক এই রহস্য জানতে পারার আগেইডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু শুধু আবিষ্কার করলে অথবা নিজে জানলেই তো হবে না, সকলের কাছে, বিশেষ করে তাঁর নিগ্রো ভাইবোনদের কাছে এই খবরটি পৌঁছে দিতে হবেই এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডাঃ কার্ভার তাঁর আবিষ্কারের কথা জনে জনে বলে বেড়াতে লাগলেন। নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য নয়, লোকেদের মধ্যে কাঁচা ফল খাবার অভ্যাস গড়ে তুলবার সংকল্প নিয়ে। তিনি যাকে কাছে পান তাকেই বলেন, "ভাই, রোজকার খাদ্যের সঙ্গে একটুখানি ফল খেয়ো, যতটুকু পারো, যা তোমার সাধ্যে কুলোয়, সামান্য হলেও ক্ষতি নেই। দামী ফল খেতে না পারো সাধারণ ফল, এই যেমন ধরো—বুনো খেজুর, ডাঁসা পেয়ারা, শশা, আপেল যে ঋতুতে যে ফল পাওয়া যায়, তাই খেয়ো।" সব্বাইকে তিনি বলতেন, "ফল খাও, ফল খাওয়া ভালো, ফল খাওয়া দরকার।"

জর্জ কার্ভার প্যাকেট ভরে ভরে নানা রকমের ফসলের বীজ নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে তা সাধারণ লোকেদের মধ্যে বিতরণ করে বেড়াতে লাগলেন। শাকসব্জি উৎপাদনের পদ্ধতি পুরুষ কৃষকদের শেখাতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হল না, কিন্তু মুশকিল হল মহিলাদের নিয়ে, তারা ক্ষেত থেকে ফসল তুলে ঘরে আনতে পারে, তা দিয়ে খাবার তৈরি করতেও যে পারা যায়, কি করে সেটা সম্ভব তা তাদের বুদ্ধিতে কিছুতেই কুলিয়ে ওঠে না। তাই জর্জ কার্ভারকেই এগিয়ে যেতে হল তাদের হাতে কলমে খাবার তৈরি করার নিয়ম শিখিয়ে দেবার জন্য। জামার হাতা কনুই অবধি গুটিয়ে নিয়ে তিনি নিজেই গিয়ে রান্না করার সাজসরঞ্জাম নিয়ে উনুনের কাছে বসলেন এবং শাকসব্জি বিট, পালং গাজর কড়াইশুঁটি এবং আলু দিয়ে কিভাবে চমৎকার ও মুখরোচক খাদ্য তৈরি করতে হয় তা তাদের শিখিয়ে দিলেন। এমনি এক বাড়ীতে শুধু নয়, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তিনি মেয়েদের রান্না শেখাতে লাগলেন।

বাগানে এবং বাড়ীর চারধারের পড়ো জমিতে অনেকদিন ধরে জমা হয়ে জঞ্জাল ও কত আবর্জনার যে পাহাড় গড়ে ওঠে এবং এক সময়ে তা পচতে আরম্ভ করে কিন্তু মানুষের কোন কাজেই লাগে না, অধ্যাপক জর্জ

ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর বিস্ময়কর উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে সেই জঞ্জালের স্তূপ থেকে মানুষের উপকারে লাগবার মতো কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করে এনে তা দিয়ে অনেক রকম আশ্চর্য বস্তু তৈরি করলেন। প্রচুর পরিমাণ শূয়োরের চর্বি আগে লোকে ফেলে দিত, তা যে কোনকালে মানুষের কোন কাজে আসতে পারে সে ধারণাই তাদের ছিল না। ডাঃ কার্ভার সেই আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া চর্বি এনে তা থেকে চমৎকার কাপড় কাচার সাবান তৈরি করে গৃহস্থদের ব্যবহার করতে দিলেন। সারা বছরে তাদের আর সাবান কেনার দরকারই হল না। আঁশযুক্ত মিষ্টি আলু খেতে লোক তেমন পছন্দ করত না, তিনি তা থেকে তৈরি করলেন উৎকৃষ্ট শ্বেতসার। এমনি আরো অনেকগুলি জিনিষ তিনি তৈরি করলেন।

নিগ্রো রমণীদের হাতে কয়েক রকমের ফুলের চারা ও বীজ দিয়ে জর্জ কার্ভার বললেন, "ঘরের আশেপাশে দরজার কাছে আঙিনায় এইসব ফুলের চারা ও বীজগুলি লাগিয়ে দিলে যখন গাছ হবে ও ফুল হবে, দেখবে কী চমৎকার লাগবে। ফুলের গন্ধে সারা বাড়ী ভরে যাবে। জানো তো ফুল হচ্ছে ভগবানের নীরব দূত।" এই কথা বলে তিনি গাড়ীতে উঠে বসে গাড়ী চালিয়ে দিলেন।

জর্জ কার্ভারের তৈরি গাড়ীর খবর সব লোকে জানল, তারা তার নাম রাখল টাস্কেগি গাড়ী। দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো অধ্যাপক কার্ভারের কাছে। যারা আগে বৃথা কাজে ও গল্পগুজবে সময় নষ্ট করত, শনিবারের বিকেলবেলাটা আলস্যে কাটিয়ে দিত, তারা এখন সবাই দল বেঁধে শহরে আসতে লাগল কার্ভারের তৈরি মনোরম ফুল ও ফলের বাগান দেখবার জন্য, কিন্তু এতে শ্বেতাঙ্গরা মোটেই খুশি হতে পারে না। তারা জর্জ কার্ভারের জনপ্রিয়তা এভাবে বর্দ্ধিত হতে দেখে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে এবং কার্ভারের এইসব সভাসমিতি কিভাবে পণ্ড করে দেওয়া যায় তার সুযোগ খোঁজে। তারা বলতে আরম্ভ করে দিল, কোন কৃষ্ণকায় নিগ্রোকে আমরা আমাদের জমির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেব না। এই কথা বলে তারা এইটেই বোঝাতে চেয়েছিল যে, কোন কৃষ্ণকায় নিগ্রো যে অত্যধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন ক'রে শ্বেতাঙ্গ মালিক বা কৃষিজীবীকে হারিয়ে দেবে তারা তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

নিগ্রোজাতির কর্মবীর ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন এবং ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের মতো নিগ্রো জাতির কল্যাণকামী বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ মনীষী সমগ্র অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন, "কোনো মানুষকেই চিরকাল অন্ধকারের মধ্যে আটকে রেখে দেওয়া যায় না বা গর্তের মধ্যে ফেলে দাবিয়ে রাখা যায় না, যদি সেই মানুষ নিজে ইচ্ছে করে গর্তে না নামে।"

তাঁদের এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে খুব বেশী দিন দেরী হল না। অল্পদিনের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গদের লম্ফঝম্প বন্ধ হয়ে এল, তারা সুর পাল্টে অন্য ভাষায় কথা বলতে শুরু করল এবং কালো নিগার অধ্যাপকটা কী বলে তা শুনবার জন্য তার কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করল। উদারহৃদয় জর্জ কার্ভার সাগ্রহে তাদের গ্রহণ করলেন। তিনি তাদের পেয়ে খুশিই হলেন।

দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রো কৃষকদের যে সমস্যা, শ্বেতাঙ্গ কৃষকদের সমস্যা তা থেকে আলাদা নয়। মোটামুটি ভাবে দক্ষিণাঞ্চলের সব কৃষকদের একই সমস্যা, শাদা ও কালোর প্রয়োজন একই ধরণের এবং একই জিনিষের। জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার অন্ধকার সমুদ্রে একটা বড় রকমের ঢিল নিক্ষেপ করেছিলেন এবং শাদা-কালো নির্বিশেষে যত বেশী সংখ্যক লোককে তিনি উন্নততর ও সুখশান্তি-সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন ততই বেশী করে সেই ঢিলের আঘাত লেগে সমুদ্রে ঢেউ জেগেছিল এবং তার পরিধি ক্রমশঃ দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজো তার ছড়িয়ে পড়া থামেনি, কারণ আজো আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ সেদিনকার মতোই প্রবল, আজো নিগ্রোজাতি পদদলিত, বঞ্চিত, সম্পূর্ণ মানবিক অধিকার লাভের জন্য তাদের সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার এই দৃঢ় প্রত্যয় মনে মনে পোষণ করতেন যে তিনি যেদিন ইহলোক ত্যাগ করবেন সেদিন তিনি তাঁর অন্তরে অন্তত এ বিশ্বাস নিয়ে যেতে পারবেন, ভ্রাম্যমাণ কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর অন্যসব কাজের কথা লোক যদি মনে নাও রাখে, টাস্কেগির ভ্রাম্যমাণ কৃষি বিদ্যালয় বেঁচে থাকার সঙ্গে তাঁর নাম নিশ্চয় জড়িয়ে থাকবে। জর্জ কার্ভারের গাড়ীর উপরে প্রতিষ্ঠিত কৃষিবিদ্যালয় সেদিন দরিদ্র ও অনশনক্লিষ্ট কৃষকদের দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে যে বিপ্লব এনেছিল—হ্যাঁ বিপ্লবই বলব কারণ জর্জ কার্ভারের এই কাজের ফলে কৃষকদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল—তারই ফলে টাস্কেগি কৃষি বিদ্যালয় আজ শ্রেষ্ঠ কৃষি মহাবিদ্যালয় রূপে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এই কৃষি মহাবিদ্যালয়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "এই কলেজের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুৎসিতকে সুন্দর করে তোলা, মূল্যহীনকে মূল্যবান্ করা এবং তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকরকে মর্যাদাভূষিত করা। ভগবানের সৃষ্ট সামান্য ও দরিদ্রতম ব্যক্তিও যাতে স্থান পায়, মান পায়, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ লাভ করতে পারে, তার গৃহ শান্তি ও সুখের আগার হয় এবং সর্বোপরি তার জীবনের যাতে মূল্য বাড়ে, এই কলেজে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়।"

কার্ভারের ভ্রাম্যমাণ কৃষি কলেজের নাম ইতিমধ্যে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। বহু জায়গা থেকে তাঁর কাছে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিয়মকানুন জানতে চেয়ে ও এ বিষয়ে তাঁর উপদেশ এবং পরামর্শ প্রার্থনা করে বহু চিঠিপত্র এল। ভারত, রাশিয়া, চীন, জাপান, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক লোক অসীম আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হল। তারা এল কার্ভারের অত্যাশ্চর্য ভ্রাম্যমাণ কৃষি মহাবিদ্যালয় দর্শন করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তারা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের উদ্ভাবক সেই রোগা চোহারার ঢ্যাঙা, কালো ও কুৎসিত দর্শন অধ্যাপককে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবল, ইনি এঁর এই ক্ষীণ রুগ্ন দেহের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী এতবড় প্রতিভা লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন! কিন্তু এর জন্য মানুষটির এতটুকুও অহংকার নেই, নিজেকে জাহির করার চেষ্টা নেই, বরং এঁর গুণের কথা বলে কেউ এঁর প্রশংসা করলে ইনি যারপরনাই লজ্জা পান, অতিশয় বিব্রত বোধ করেন।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের এই সুবিপুল সাফল্য এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতিতে যিনি সবার চাইতে বেশী আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেন সেই মানুষটি হলেন ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন। তিনি জর্জ কার্ভারকে কাছে ডেকে আদর করে বসিয়ে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে দিতে চাইলেন, কিন্তু কার্ভার রাজি হলেন না, মাথা নেড়ে বললেন, না, না, বেশী মাইনে আমি চাই না। অত টাকা নিয়ে আমি কী করব? আমি একা মানুষ, তিনবেলা তিন মুঠো আহার এবং একটা মাত্র পোশাক হলেই আমার চলে যায়। আর ফ্যাশন অথবা সৌখিনতার কথা যদি বলেন, আমার সেসব কিছুই নেই বললেই চলে, শুধু আমার কোটের ভাঁজে বুকপকেটের কাছে একটা সুন্দর ফুল পেলেই আমি খুশি। আর, তার জন্য আমার কোনো ভাবনা নেই। আমার বাগানে অজস্র এবং রকমারি ফুল ফোটে।

জর্জ কার্ভারের বিশ্বজোড়া খ্যাতিতে পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোক আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উইলিয়ম ম্যাকিনলি এবং থিওডোর রুজভেল্ট, জর্জ কার্ভারের প্রাক্তন শিক্ষক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কৃষি-সচিব মিঃ জেম্‌স জি উইলসন।

কয়েক বছর ধরে পল্লী অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়ালেন জর্জ কার্ভার, কৃষকদের মধ্যে গিয়ে তাদের বিভিন্ন জাতের ফসল ও ফুল-ফলের চাষ করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে

বললেন, যেমন কলাই ও মিষ্টি আলুর চাষ। কিন্তু তাঁর উপদেশ এবং পরামর্শে বিশেষ কোন ফল হল না। কৃষকরা তেমন আগ্রহ দেখাল না। তখন জর্জ কার্ভার নিজে সয়াবীন নিয়ে পরীক্ষা—নিরীক্ষা করে তা থেকে এক ধরণের ময়দা আবিষ্কার করলেন। এ ছাড়াও সয়াবীন থেকে তিনি এক রকমের শস্তচূর্ণ এবং দুধ তৈরি করলেন। তাঁর গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত এই সয়াবীনের দুধ এবং ময়দা একদিন সারা দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হল। যেসব জমিতে এতকাল তুলোর চাষ হত সে জমিতে এইসব ফসল যে উৎপন্ন করার এখনো সময় হয়নি এবং জমি সেসব ফসল উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত হয়নি, জর্জ কার্ভার জমির গুণাগুন পরীক্ষা করে সেটা বুঝতে পারলেন।

হঠাৎ ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে ফসলের মহামারী দেখা দিল। অজন্মা নয়, ধসা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাজা তাজা গাছগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তাদের আর মাথা তোলার শক্তি রইল না।

এই মহামারীর মোকাবিলা করতে না পেরে দলে দলে অসহায় কৃষক প্রতিকারের আশায় জর্জ কার্ভারের কাছে ছুটে এল। কার্ভার বহুদিন আগে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাদের, কলাইর সংক্রামক ব্যাধি একবার বিস্তারলাভ করতে পারলে তা রোধ করা প্রায় দুঃসাধ্য, ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি খুবই সাজ্ঘাতিক, শুধু কেবল তুলো খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে। এরা সংখ্যায় বেশী হলে তখন আর কিছুতেই এদের আক্রমণ প্রতিরোধ কিংবা ধসা রোগের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা যায় না।

১৯ ৫ সালে এই উইভিল কীটের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের ফলে লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, অ্যালাবামা প্রভৃতি কয়েকটা অঞ্চলের সব তুলোর ক্ষেত সম্পূর্ণ ছারখার হয়ে গেল। হাজার হাজার কৃষক একেবারে সর্বহারা ও নিঃস্ব হল, বিশেষ করে তুলোর চাষই যাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। তাদের ফসল গেল, জমি গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব আশা ভরসাও নির্মূল হল।

মহামারীর একটা ঢেউ ভালো করে মিলিয়ে যেতে না যেতেই নূতন আর একটা ঢেউ আসবার সম্ভাবনা দেখা দিল, কারণ উইভিল কীটেরা মাটিতে যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ডিম পেড়ে রেখে গিয়েছিল তা থেকে আরো যে কোটি কোটি কীট জন্মগ্রহণ করেছে, তাই থেকেই নতুন মহামারীর আবির্ভাবের পথ সুগম হল। এই ডিমগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে না পারলে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ডিম ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হল তীব্র বিষ ব্যবহার করা, কিন্তু তার একটা মারাত্মক পরিণতিও আছে, তীব্র বিষের ক্রিয়ায় তুলোর বীজ-গুলিও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হবে।

ডাঃ জর্জ কার্ভার কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন সম্প্রতি টাস্কেগিতে ফিরে এসেছেন। এসে চাষীদের এই দুর্দৈব অবস্থা দেখলেন। তুলো-চাষীদের বুকফাটা কান্না তাঁকে বিচলিত করে তুলল। তাঁর নিজের জমিতে তখন তিনি তুলোর চাষ না করে কলাই বুনে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গাছের চারাগুলির দিকে চেয়ে থাকেন, সেগুলি তাজা আর বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে, উইভিল কীট সেগুলির কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কলাইয়ের গাছগুলি উইভিল কীটের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, শুধু তাই নয়, তিনি দেখলেন, কলাই উইভিল কীটের আক্রমণের একমাত্র প্রতিষেধক।

কলাইয়ের এই আশ্চর্য প্রতিষেধক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের মাথায় চমৎকার একটা আইডিয়া এল—তুলোর বদলে কলাইয়ের চাষ করলে কেমন হয়। তিনি একটা বিজ্ঞাপন লিখে তার অনেকগুলি নকল করে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—লাঙলের সাহায্যে তুলোগাছগুলি গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে জমিতে বেশ ভালো করে বিষমাখানো জলের ছিটে ছড়িয়ে দিন, দেখবেন, তা হলেই উইভিল কীটের বংশ সমূলে ধ্বংস হবে। তারপর সেই জমি একমাস কিংবা দেড়মাস চাষ না করে পরিত্যক্ত অবস্থায়

ফেলে রেখে দিন। পরে যখন বিষের ক্রিয়া সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে তখন সেই জমিতে কলাই বুনে দিন।

জর্জ কার্ভারের এই বিজ্ঞাপন পাঠ করে স্থানে স্থানে অনেকের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল, প্রতিবাদও কম হল না। অনেকে তাঁর কাছে নালিশ জানাতে এল, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তারা প্রশ্ন করল,—"তুলোর বদলে কলাইয়ের চাষ করতে বলছেন আপনি আমাদের, আপনার মতলবটা কী? আপনি কি আমাদের মেরে ফেলতে চান?"

কার্ভার তাদের সব নালিশ, সব আপত্তি ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর বললেন, "না, আমি আপনারা যাতে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পান তাই করতে চাই। আমি আপনাদের আবার আগের মতো সুখী এবং সম্পদশীল করে তুলতে চাই। কলাই মোটেই তুচ্ছ জিনিষ নয়, এর খাদ্যমূল্য যেমন যথেষ্ট, খাদ্য হিসাবেও এ অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর। আপনারা এতকাল পশুখাদ্যরূপেই শুধু কলাই ব্যবহার করে এসেছেন, তার বাইরেও যে এর অন্য কোন রকম ব্যবহার আছে তা আপনাদের জানা নেই। কলাই মানুষেরও খাদ্য এবং উপযোগী খাদ্য। কলাই দিয়ে খাবার তৈরি করে খেলে মানুষের উপকার হবে। তা ছাড়া, কলাই যে জমিতে উৎপাদন করা হবে সেই জমির উর্বরাশক্তিও অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। কলাই থেকে অনেক সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাবার যেমন তৈরি করা যায়, তেমনি কলাইতে মানুষের মাংসপেশী গঠন ও দৃঢ় করার উপযোগী প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। এ দিয়ে তৈরি এক পাউণ্ড খাবারের খাদ্যমূল্য এক পাউণ্ড গোমাংসের তুলনায় অনেক বেশী। সবচেয়ে বড় কথা, কলাই উৎপাদন করা মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং খুবই সহজ এবং পরিশ্রমও কম হয়।"

কলাই চাষ করার পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে জর্জ কার্ভার কৃষকদের হাতে একখানা কাগজে কলাই চাষের রীতিনীতি এবং কলাই দিয়ে তৈরি করা যায় এরকম একশো রকম খাবারের তালিকা লিখে দিলেন।

জর্জ কার্ভার টাস্কেগি শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের কাছে কলাইয়ের গুণ প্রমাণ করে দেখাবার উদ্দেশ্যে তা থেকে পাঁচ রকমের বিভিন্ন খাবার তৈরী করে তাদের খাওয়ালেন। খাবারগুলি হল সুপ, কৃত্রিম মুরগীর মাংস, স্যালাড, আইসক্রিম এবং কফি। এই পাঁচ রকমের খাবার ছাড়া আরো কয়েক রকম মুখরোচক খাদ্য তিনি তাদের পাতে পরিবেশন করলেন এবং সেগুলিও সবই কলাই থেকে তৈরি করা। শিক্ষকরা আনন্দের সঙ্গে এবং মুক্তকণ্ঠে একথা ঘোষণা না করে পারলেন না যে, এমন সুস্বাদু ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাবার, তাও আবার শুধু এক কলাই থেকে তৈরি, আর কখনো তাঁরা আস্বাদন করেননি।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু অধিকাংশ কৃষক কলাই চাষ করার ব্যাপারে ততটা উৎসাহ বোধ করল না বা তেমন আগ্রহ দেখাল না। তাদের মনে তখন পর্যন্তও যথেষ্ট দ্বিধা এবং সংশয়। সম্পূর্ণ অজানা নতুন কোন জিনিষ চট করে তারা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। আর চিন্তার দিক থেকে জর্জ কার্ভারের এই পরিকল্পনা ছিল বাস্তবিকই এক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার অর্থ ই কৃষকদের এতদিনকার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের গোটা ব্যবসাটাই ছিল আসলে তুলোর ব্যবসা এবং দক্ষিণাঞ্চলে তুলোর কারবারিদের তুলোর বাজার সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ছিল। কিন্তু কলাই চাষ করলে তার বাজার কোথায় পাওয়া যাবে? সার্কাসে এবং খেলাধুলায় ব্যবহৃত জন্তু-জানোয়ারগুলির জন্যই শুধু তখন খাদ্য হিসাবে কলাইর চাহিদা ছিল এবং সেই চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে দূর প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে হাজার হাজার বস্তা কলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী করা হত।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা ক্রমে একটু একটু করে তাদের জমিতে তুলোচাষের বদলে কলাইয়ের চাষ করতে আরম্ভ করে দিল। আগে হয়তো কোথাও কদাচিৎ দু-একখানী কলাইয়ের ক্ষেত চোখে পড়ত, এখন সে জায়গায় বেশীরভাগই কলাইয়ের ক্ষেত দেখা

যায়—তুলোর চাষ প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। প্রথম সে কৃষক মাত্র বিশ একর জমিতে কলাইয়ের চাষ শুরু করেছিল, শেষ পর্যন্ত সে চাল্লিশ একর জমির সবটাতেই কলাই বুনতে লাগল।

মখমলের মতো কোমল গাঢ় সবুজ কলাইয়ের ক্ষেতে শাদা শাদা অজস্র ফুলে ফুটে নয়নভোলানো এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি হয়েছে, মনে হয় দিগদিগন্ত ছেয়ে কে যেন শাদা ফুলের আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এল যখন আর কেউই তুলোর চাষ করে না। সবাই তুলোর চাষ করা ছেড়ে দিল। মন্টগোমারি ও অ্যালাবামা থেকে শুরু করে ফ্লোরিডার সীমান্ত অবধি যত কৃষিযোগ্য জমি আছে তার অধিকাংশ জমিতেই কলাই সর্বপ্রধান উৎপন্নদ্রব্য হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু অকস্মাৎ একটা বিপদ দেখা দিল, একে ভবিতব্যবিপাকও বলা যেতে পারে। প্রথমে যেসব কৃষকরা ডাঃ জর্জ কার্ভারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কলাইয়ের ফসল উৎপন্ন করতে আরম্ভ করেছিল তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা বিধবা মহিলাও ছিলেন। তিনি তাঁর তুলোর ক্ষেতে কলাইয়ের চাষ করিয়েছিলেন, শত শত বুশেল ফসল তিনি ক্ষেত থেকে আনিয়ে ঘর বোঝাই করলেন. কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল খদ্দের নেই। এই বিপদের আভাস সর্বপ্রথম পাওয়া গেল মহিলার কাছ থেকে, অক্টোবর মাসের এক অপরাহ্ণ বেলায় তিনি চলে এলেন সোজা ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের কাছে। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে কার্ভার দরজা খুলেই মহিলাকে সামনে দেখতে পেলেন।

বৃদ্ধা মহিলা জর্জ কার্ভারকে আগে কখনো দেখেননি তাই চিনতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি ডাঃ জর্জ কার্ভারের সঙ্গে কথা বলছি?"

"কেন বলুন তো?"

"আমি তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। আপনিই যদি ডাঃ কার্ভার হন তো আপনার কাছেই জানতে চাই, আপনি আমাদের কলাই চাষ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আপনার কথা শুনে কলাইয়ের চাষ করে এখন আমাদের কি হাল হয়েছে জানেন? একজনও খদ্দের জুটছে না, কলাই বিক্রী করতে না পেরে ঘরে জমিয়ে রেখেছি। কলাই ডালের পাহাড় হয়ে আছে আমার ঘরে। আমি একজন অনাথিনী বিধবা, কলাই যদি বিক্রী করতে না পারি, সব যদি পচে নষ্ট হয়, তবে আমার কি উপায় হবে বলতে পারেন?"

বৃদ্ধা মহিলা এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বললেন, কিন্তু জর্জ কার্ভার একটা কথারও জবাব দিতে পারলেন না, তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু এ প্রশ্ন কি একা বৃদ্ধা মহিলার? না, এ প্রশ্ন আজ এখানকার শত শত কৃষিজীবীর। দলে দলে কৃষক এসে তাঁকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল, সকলের আজ এক সমস্যা। কিন্তু জর্জ কার্ভার কারুরই কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর মুখে ভাষা জোগাল না। কিন্তু এটা তো তিনি জানেন, এ অবস্থার জন্ত একা তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী, তিনিই এই বিপদ ডেকে এনেছেন। কাজেই বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়ও তাঁকেই খুঁজে বার করতে হবে। এবং সেই কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করলেন।

এর আগে দাক্ষিণাঞ্চলের কৃষিজীবীদের সমস্যার একটা দিকই মাত্র তাঁর চোখে পড়েছিল, অন্ত আর একটা দিকও যে থাকতে পারে, সে কথা একবারও তাঁর মনে হয়নি। অনিচ্ছাকৃত হলেও সেই অপরাধের জন্যই ভগবান্ তাঁকে আজ এই শাস্তি দিচ্ছেন।

কলাই চাষ করার অনুকূলে জর্জ কার্ভার যে সকল জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিলেন তার সার্থকতা প্রমাণিত হতে আরম্ভ করেছে এতদিনে, কিন্তু সে সার্থকতার একটা বিপরীত দিকও যে আছে, সেকথা তিনি তখন একবারও ভাবেন নি। সেই সার্থকতাই আজ প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো ভয়ংকর মূর্তি ধরে সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে তার স্রষ্টাকর্তাকে ব্যঙ্গ করছে। ভয় দেখাচ্ছে। এ দৈত্য তাঁর নিজের সৃষ্টি, অবিকল ফ্রাংকেনস্টাইনের মতো।

জর্জ কার্ভার ঘর ছেড়ে রাস্তায় বের হলেন। যেখানে যান সেখানেই দেখতে পান তাঁর আপন অপরিণামদর্শিতা রক্তচক্ষু মেলে তাঁকেই শাসাচ্ছে। সব বাড়ীর আঙিনায় গোলাভর্তি ফসল। যে সকল কাটা হয়নি তা এখনো মাঠেই পড়ে আছে। বিক্রী হয় না তো ফসল তুলে কী হবে, সকলের মনের এখন এই একই ভাব। পরিত্যক্ত ফসল মাঠে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

জর্জ কার্ভার ঘুরে ঘুরে এই একই দৃশ্য দেখতে পেলেন, একই অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। সর্বত্র কৃষকদের একই দুর্দশা। তারা দল বেঁধে তাঁর কাছে ছুটে আসে, ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "বলুন জর্জ কার্ভার, আমরা এখন কী করব? আমাদের এতবড় সর্বনাশ হল তো শুধু আপনারই জন্য, আপনি যদি অমন করে না বলতেন তবে আমরা নিশ্চয়ই কলাইয়ের চাষ করতাম না। তুলোর চাষ নিয়েই থাকতাম।"

স্বাভাবিক নিয়মে কলাইয়ের বাজার যদি না পাওয়া যায় তবে জর্জ কার্ভারকেই যেমন করে হোক সেই বাজার সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন।

বহু বছর পরে এক সময় জর্জ কার্ভার তাঁর জীবনের সবচেয়ে সংকটময় এই দিনগুলির কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, "আমি সেই সংকটের দিনে কায়মনোবাক্যে শুধু ভগবান্‌কে ডেকেছি আর বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজেছি, কিন্তু কখনো সাহস হারাইনি।"

তখনো ভালো করে ভোর হয়নি, গাছের ছায়ায় তখনো রাতের অন্ধকার লুকিয়ে ছিল। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জর্জ কার্ভার চলে গেলেন তাঁর একান্ত প্রিয় পরিচিত এবং সান্ত্বনার স্থল নিবিড় অরণ্যের এক নিভৃত পরিবেশে। সেখানে নবপ্রভাতের নতুন রশ্মিরেখার সন্ধান করতে গিয়ে বলে উঠলেন, "হে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা, কেন তুমি এই বিশ্বপৃথিবী সৃষ্টি করেছ?"

তিনি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন কে একজন তাঁকে বলছে, "অতি ক্ষুদ্র মানুষ তুমি জর্জ কার্ভার, এ রকম বিরাট প্রশ্ন তুমি করো না। তুমি যেমন ক্ষুদ্র তেমনি ক্ষুদ্র প্রশ্ন কর।" কার্ভারের মনে হল স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে এ কথাগুলি বলছেন। তিনিও সেইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রিয় সৃষ্টিকর্তা, মানুষকে তুমি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছ?"

আবার ঈশ্বর তাঁকে বললেন, "হে ক্ষুদ্র মানব, এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না যা তোমার অধিকারের বাইরে। তোমার কৌতূহল তুমি সংযত কর।"

জর্জ কার্ভার তখন বললেন, "আমি আমার সর্বশেষ প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে বল, তুমি কলাই সৃষ্টি করেছ কেন?"

ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "সেই ভালো" এবং জর্জ কার্ভারের হাতের মুঠোয় খানিকটা পরিমাণ কলাইয়ের দানা গুঁজে দিয়ে বললেন, "চল তোমার গবেষণাগারে যাই।" তিনি জর্জ কার্ভারকে যেন তাঁর নিজের গবেষণাগারে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

মোহগ্রস্তের মতো জর্জ কার্ভার অনেকটা পথ হেঁটে কখন যে গবেষণাগারে এসে পৌঁছে গিয়েছেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি, কিন্তু একসময়ে সত্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষের মতো হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, তিনি গবেষণাগারের মধ্যে বসে আছেন। এ যে কেমন করে সম্ভব তিনি নিজে বলতে পারেন না এবং বুদ্ধিতেও তার ব্যাখ্যা মেলে না।

জর্জ কার্ভারের জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। যোগী যোগাসনে বসলেন।

গবেষণাগারের কবাট রুদ্ধ করে বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার বসলেন তাঁর নতুন তপস্যায়, নবযুগের নবীন তপঃ ঋষির তপ-সাধনা শুরু হল।

একমুঠো কলাইয়ের দানা নিয়ে জর্জ কার্ভার যত্ন করে সেগুলোর খোসা ছাড়ালেন, তারপর সারাদিন ও সারারাত বসে তিনি সেই দানাগুলোকে একটা একটা করে আলাদা করে নিয়ে সেগুলোর ভিতকার স্নেহ পদার্থ ও এক রকমের আঠার মতো নির্যাস বের করলেন,

পরে আবার সেই স্নেহ পদার্থ ও আঠালো নির্যাস থেকে লাক্ষা জাতীয় একরকম জিনিস এবং শর্করা ও শ্বেতসার আবিষ্কার করলেন। তাঁর সামনে এলোমেলো ছড়ানো রয়েছে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ এবং আরো নানা রকমের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তিনি বিভিন্ন তাপাঙ্ক ও চাপ সৃষ্টি করে সেই তাপাঙ্ক ও চাপের সাহায্যে সব জিনিষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

এমনিভাবে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনায় কয়েক রাত কয়েকটা দিন কেটে গেল, ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতরে জর্জ কার্ভার কি করছেন কেউ জানতে পারে না। কিন্তু তিনি যে নতুন একটা কিছু আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিরলসভাবে গবেষণা করছেন, এটা সবাই বুঝতে পারলেন।

বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের কঠোর সাধনা জয়যুক্ত হল। গবেষণাগারের অভ্যন্তরে থেকে তিনি প্রস্তুত করে চললেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানা জাতীয় কৃত্রিম অথচ মানুষের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন, কৃত্রিম দুধ, লেখার কালি, রঙ ও বার্নিশ, জুতোর পালিশ, ক্রিয়োজোট, মলম, দাড়ি কামাবার ক্রিম, এবং কৃত্রিম মাখন। এ সব জিনিষই কার্ভার প্রস্তুত করলেন একমাত্র একটি পদার্থ থেকে; সে পদার্থটা হচ্ছে কলাই। কলাইয়ের খোসা থেকে এ ছাড়াও তিনি তৈরি করলেন ভূমি-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, বিদ্যুৎশক্তি পরিবাহী যন্ত্র ও কয়লার জ্বালানী দ্রব্য।

*

তারপরেও আরো অনেক দিন গেল, রাত গেল, কিন্তু জর্জ কার্ভার তাঁর ঘরের দরজা খুললেন না, কিংবা বাইরেও বেরিয়ে এলেন না একটিবারের জন্য। কত লোক যে তাঁকে ডাকতে এসে তাঁর গবেষণাগারের দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গেল, কিন্তু সেই যে কয়েকদিন আগে তাঁর গবেষণাগারে প্রবেশ করেছেন তিনি এই কয়দিনের মধ্যে তা আর খোলেননি।

এমনিভাবে একটানা কেটে গেল তাঁর আরো দুরাত দুদিন, অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রান্তভাবে অনন্যমনা হয়ে তিনি তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্যরা, টাস্কেগি শিক্ষায়তনের ছাত্ররা, কয়েকবার তাঁকে ডাকতে এসেছিল, দরজায় করাঘাত করে জিজ্ঞাসা করেছিল তারা, "আপনি সুস্থ শরীরে আছেন তো স্যার?" তিনি দরজা না খুলেই ভিতর থেকে এই বলে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তোমরা এবার যাও, দয়া করে আমাকে বিরক্ত করো না। আমাকে ভালো থাকতে দাও। আমি কাজ করছি।"

যখন ছাত্রদের জর্জ কার্ভার এই কথাগুলি বললেন তখন কণ্ঠস্বর একটু বেশী রকমের রুক্ষ ও কর্কশ শোনাল, যা তাঁর স্বভাবের ব্যতিক্রম। স্বভাবত তিনি ভদ্রতা মেনে চলেন, অসৌজন্যমূলক ব্যবহার তিনি কখনো কারুর সঙ্গেই করেন না। তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, তিনি ভগবানের কোলের মধ্যে নিরাপদ্ আশ্রয়ে রয়েছেন। কোনো দিক থেকে কারুর কাছ থেকেই ভয় পাবার তাঁর কিছু নেই। তিনি নিজেকে ভগবানের হাতের যন্ত্র বলে ভাবেন, তিনি যা কিছু করছেন ভগবানই তা তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। তিনিই জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর বিস্ময়কর রহস্য উদ্‌ঘাটন করার ভার দিয়ে।

এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার পরে একসময়ে বলেছিলেন—"সেই মহান্ স্রষ্টা তিনটি সাম্রাজ্য দান করেছেন, সেই তিনটি সাম্রাজ্য হচ্ছে জীবজগৎ উদ্ভিদ জগৎ এবং আকরিক পদার্থ জগৎ। এখন তিনি তার সঙ্গে চতুর্থ আরও একটি জগৎ যুক্ত করেছেন—রসায়ন জগৎ। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম বস্তু আবিষ্কার ও তার উৎপাদন হচ্ছে এই চতুর্থ জগতের কাজ।"

এর কয়েক বছর পরে যখন নব আবিষ্কৃত কেমার্জি বিজ্ঞান তথা কৃষি-রসায়ন বিদ্যাকে মাটি, বাতাস এবং সূর্যালোকের অন্তর্নিহিত অবচেতন শক্তি থেকে ঐশ্বর্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে লোকে জানল তখন অ্যালাবামার কৃষিজীবী সাধারণ মানুষেরা বলতে লাগল, এ তো

আমাদের জানা জিনিষ। 'কেমার্জি' কথাটা সৃষ্টি হবার বহুদিন আগেই জর্জ কার্ভার আমাদের এ জিনিষের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিলেন, কাজেই অনেকদিন আগে থেকেই তিনি একজন কেমার্জিষ্ট।

একদিন ভোরবেলায় জর্জ কার্ভার তাঁর গবেষণাগারের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছাত্রদের ডাক দিয়ে, "এসো তোমরা সবাই, আজ আমি তোমাদের একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখাব", এই বলে তিনি তাদের গবেষণাগারের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

গবেষণাগারের দেয়াল ঘেঁষে তাকে তাকে অনেকগুলি শিশি-বোয়ম থরে থরে সাজানো। আর প্রত্যেক শিশি-বোয়মের গায়ে লেবেল আঁটা রয়েছে-তাতে লেখা 'কলাই'। ছাত্রদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। আবার প্রত্যেকটা শিশি-বোয়মের গায়ে কাগজ লাগিয়ে তাতে আলাদা আলাদা সব জিনিষের নামও লিখে রাখা হয়েছে। একমাত্র কলাই থেকে কত রকমের নতুন নতুন জিনিষ অধ্যাপক জর্জ কার্ভার আবিষ্কার করেছেন তার সব নমুনা এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে, এগুলির মধ্যে রয়েছে কয়েকরকম সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য, আচার, মোরব্বা, চাটনি, কফি, পাউডার, ধাতবদ্রব্য পালিশ করার জন্য এক জাতের পালিশ কাগজ, ঘষে ঘষে লাগিয়ে দেবার জন্য এক রকম তেল, দাড়ি কামাবার ক্রিম, কাগজ, লিখবার কালি, মেঝে ঢাকবার জন্য মোজেক জাতীয় এক রকম আস্তরণ, প্লাষ্টিক, শ্যাম্পু, কৃত্রিম রবার এবং এমনি আরো কত যে জিনিষ, সবগুলির নাম এখানে বলা সম্ভব নয়। কলাইয়ের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার স্বীয় প্রতিভাবলে এত সব জিনিষ সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি না বলে আমরা বরং বলতে পারি আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু এ তো সবে শুরু।

আবিষ্কারের প্রথম পর্বেই জর্জ কার্ভার কলাইয়ের রস থেকে এমন এক রকম দুধ তৈরি করলেন যা স্বাদে গন্ধে এবং রঙে অবিকল খাঁটি দুধের মতো, কোন তফাৎ নেই। কলাইয়ের খোসায় তৈরি আঠার মতো একটা জিনিষ থেকে একগুচ্ছ ফিতা বের করে তাতে মৃদু চাপ দিতেই তা থেকে উজ্জ্বল পীতাভ রশ্মি বিচ্ছুরিত হল, শ্বেতপাথরের মতো কঠিন ও শাদা চারকোণ বিশিষ্ট একটা আধারের মধ্যে তা রেখে দিলেন—আবিষ্কৃত হল লণ্ঠনের মতো চমৎকার একটা দীপাধার, ঝড়ঝঞ্ঝায় যা নিভে যাবার ভয় নেই।

ছাত্ররা দেখে অবাক্ হল। অধ্যাপক কার্ভারের নব-আবিষ্কৃত বিচিত্র ধরণের এগুলি জিনিষ তাদের মনে পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করল।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফল হল সুদূরপ্রসারী এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর আবিষ্কৃত কৃত্রিম দুধ বেলজিয়াম দেশের অন্তর্গত কঙ্গো প্রদেশের শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষভাবে জীবনরক্ষার সহায়ক বলে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হল। তখন কঙ্গো প্রদেশের গভীর অরণ্যে বসবাসকারীদের, গরু মোষ প্রভৃতি পালন করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। একদিকে বিষাক্ত মাছির দংশন এবং অন্যদিকে ছিল বাঘের আক্রমণ—এই দুই কারণে গৃহপালিত জীবজন্তু রক্ষা করা এক কঠিন সমস্যা ছিল। তাই সেখানে দুধের অভাব দেখা দিত। কোন শিশু মাতৃহীন হলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই তার মৃত্যু ডেকে নিয়ে আনত। কিন্তু ডাঃ কার্ভারের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে সে দেশে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল। কলাই থেকে তৈরি দুধ পান করে শিশুরা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসতে লাগল। যে পরিস্থিতি এক বিষাদময় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিল জর্জ কার্ভারের আবিষ্কার সেই পরিণতি থেকে কঙ্গোকে রক্ষা করল।

ক্রমশঃ

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অভয় বলে—বাবা, আর একটা বছর। কোন রকমে পাশটা করলে, যেমন করেই হোক একটা কিছু জুটিয়ে নেব। গীতা খোকন ওদের তো মানুষ করতে হবে। গোপেশ্বর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, তাই আমি ভাবছি বাবা। তোর মা যাওয়ার পর, খালি যেন মনে হচ্ছে আমারও ডাক এসেছে। হয়ত, কোনদিন, তোদের মায়ের মত, তোদের ছেড়ে চলে যাব। আমার আর কোন ভয় নেই বাবা। শুধু পিছুটান রয়েছে, মেয়েটা আর ছেলেটার জন্যে। আমি জানি, আমার অবর্ত্তমানে সব ভারই তোর ঘাড়ে পড়বে। তখন যে কি হবে, কি করবি, ওদের যে কি গতি হবে, তা আর ভাবিনে। সব ভাবনা চিন্তা আমি ছেড়ে দিয়েছি ভগবানের ওপর। তাঁর যা ইচ্ছে, তাই করবেন।

—বাবা, অভয় বলে, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করবেন না। যা হবার তাই হবে। কাল যদি কারুর পূর্ণ হয়, তবে কোনও ডাক্তার তো রদ করতে পারে না। মা যে আকাশ থেকে সব দেখছেন। আমি বলছি মা সমস্তই দেখছেন। আপনি শক্ত হোন। তাঁর জাগ্রত চোখ সব সময় মেলে রয়েছেন আমাদের দিকে—

অভয়ের প্রদীপ্ত মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকেন গোপেশ্বর। বাইরে উঠানে সরোজিনীর নিজ হাতে পোতা পেয়ারা গাছ, শিউলি ফুলের গাছ, সেই তুলসী মঞ্চে তুলসী গাছটি রয়েছে। ঘরের ভেতর, ঘরের বাইরে, সর্ব্বত্রই সরোজিনীর নিজ হাতের ছাপ, তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন যে বাড়ীর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এ যে ভুলবার নয়—

গোপেশ্বরের মনে হ'ল, অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন সরোজিনী। চোখে মধুর শান্ত দৃষ্টি, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে শান্তির সুধা। যেন উনি সকৌতুকে তাকিয়ে রয়েছেন। মৌন দৃষ্টি যেন মুখর হয়ে বলছে, কেন, এই তো আমি। কেন দেখতে পাচ্ছ না আমায়। মাত্র একটা পরদা ঝুলছে এঘর আর ঐ ঘরের মাঝে। আমায় কি দেখতে পাচ্ছ না? এই তো আমি। আমার বন্ধন তো ছিন্ন হয়নি। মরণ কি স্নেহ ভালবাসার বন্ধনকে কাটতে পারে? গোপেশ্বর সম্মোহিতের মত সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অভয় আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার নামে চিঠি এসেছে তা সাধারণ পোস্টকার্ড নয়, রীতিমত সবুজ রংএর একখানি দামী খাম। অভয় নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কে এই পত্র পাঠাল। শুভময় কি? তা তো হতেই পারে না। দিন দুই আগে, পোস্টকার্ডে শুভময় খুব দুঃখ করে পত্র দিয়েছে। তার মায়ের মৃত্যুর জন্য, খুব দুঃখ জানিয়ে সমবেদনা জানিয়েছে। শুভময় লিখেছে, অল্প বয়সে মাকে হারান যে কি কষ্ট, তা কি বুঝছিনে ভাই?

মার মতন এ পৃথিবীতে আর কে আছে? এমন স্নেহ, ভালবাসা, এই পৃথিবীতে আর কার কাছে পাব আমরা? পৃথিবীতে বুঝি এমন ভালবাসার আর তুলনাই হয় না। এমনি আরও কত কি। শুভময়ের চিঠিখানা পড়ে অভয়ের দুই চোখে জল এসেছিল। তার অন্তরের রক্তাক্ত বেদনার স্থানে আবার যেন কে নূতন করে ঘা দিয়ে রক্তাক্ত করে দিল। অভয় মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যায়। অভয় খামখানা নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে। উপরের ঠিকানা গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। হাতের লেখা কী সুন্দর।

এই রহস্যময় খামখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে এক অদ্ভুত ভাব দেখা যায়। এ যেন কোন এক হারানো রতন। এর অন্দরে কি আছে, তাই ভাবতেই ভাল লাগে। যতক্ষণ এটা বন্ধ আছে ততক্ষণ এ রহস্যময় কোন এক বস্তু। এক দুর্দম কৌতূহলে ওর সারা অন্তর ভরে যায়। কে এই পত্রদাতা? কে লিখল এ চিঠি, এমন সুন্দর সুশ্রী খামে। এ তো ডাকঘরের সাধারণ খাম নয়। এতো কোন সস্তা সামগ্রী নয়। হাটে মাঠে বাজারের জিনিষও নয়। এ মহামূল্য কোন্ মণি, কোন্ স্বপ্নধন এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিল।

অবশেষে জয় হয় কৌতূহলের। খুব আস্তে অতি সন্তর্পণে ছিঁড়ল খামখানাকে। সূর্যের আলোয় পত্রখানা দেখা যাচ্ছে। অভয় আস্তে আস্তে পত্রটি খামের গুপ্ত কক্ষ থেকে বের করল।

চমকে ওঠে অভয়। এ যে, মিনতির লেখা পত্র। এ যে স্বপ্নাতীত, আশাতীত। পত্র যে এত মধুর এত সুন্দর, হয়, তা কোনদিনই ভাবতে পারেনি অভয়। এর প্রতি লাইন, প্রতি অক্ষরে কত মধু, কত সুধা। জীবনের প্রথম দিকেই পেয়েছে কঠিন শোক। আবার সেই শোকের মাঝে, আর এক মমতাময়ীর সুধামাখা স্পর্শ। একদিকে ব্যথা অন্যদিকে অসহ্য আনন্দ বোধ। মাকে হারানোর চিরকালের অসহ্য দুঃখবোধের মধ্যে দেখা দিয়েছে অন্য এক করুণা ভালবাসার আহ্বান। এক অপূর্ব্ব আনন্দ স্নানে অভয়ের সারা মন ভরে যায়।

এক সময় ছুটি ফুরিয়ে যায়। এখন অভয়কে রওনা হতে হবে। অভয় ভাবে, সেই একদিনের সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাৎ। স্মৃতিপুঞ্জের কথা মনে পড়ে যায়। তার মালদহ রওনা হবার আগের দিনের কথা মনে পড়ে যায়। সমস্তদিন মা তাকে চোখের আড়াল করেননি। নিজহাতে সেই টিনের বাক্সটি গুছিয়ে দিয়েছিলেন। জামা, কাপড়, চাদরে সাবান দিয়ে, আবার নিজহাতে ইস্ত্রী করে দিয়েছিলেন। অভয় যে সব জিনিষ খেতে ভালবাসত, মা তাই বহু কষ্টে তৈরী করে সম্মুখে বসে খাইয়েছিলেন। বিদেশ বিভুঁয়ে, অপরিচিত জায়গায়, অন্য আত্মীয়বাড়ীতে কি ভাবে বাস করতে হয়, কি ভাবে চলাফেরা করতে হয়, এমনি বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হায় আজ কোথায় মা। গীতা, খোকন, অভয়ের কাছে কাছে, ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কতদিন পর তাদের দাদা বাড়ী আসবে, তাই ওরা ভাবছে। অভয় গীতাকে, খোকনকে কাছে টেনে বলে, আবার আমি পূজোর ছুটিতে আসব। কত খেলনা নিয়ে আসব। এখন মন দিয়ে, লেখাপড়া করবে—কিন্তু একা একা পুকুরে যেন চান করতে যাবে না, আর দিদির সঙ্গে ঝগড়া করবে না। ঝগড়া করলে, মা যে দুঃখ পাচ্ছেন। মা—আশ্চর্য্য হয়ে খোকন তাকায়—।

ম্লান হেসে, আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে অভয় বলে, মা যে ঐ—ঐখানে আছেন। ওখান থেকে মা সব দেখছেন। মা আবার আসবেন, আবার খোকনকে কোলে নেবেন। খোকন অভয়ের কোলে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় সন্ধ্যা হয়ে আসে। তুলসীতলায় ধূপ ধুনো দেয় গীতা। খোকন গঙ্গাজল ছিটিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে বলে, হরিবোল, হরিবোল। গীতা শাঁখ বাজায়। শঙ্খের শব্দ কাঁপতে কাঁপতে দূরে হারিয়ে যায়। অন্যান্য বাড়ী হ'তে শাঁখের শব্দ আসে। সন্ধ্যার আকাশ পবিত্র শঙ্খধ্বনিতে ভরে যায়। গীতা বাবার আহ্নিকের জায়গা করে দেয়। লক্ষ্মীর ঘরের মাঝখানে

একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে কুশাসন পেতে দেয়। গঙ্গাজলের ঘটিটা কাছে রাখে, রেড়ীর তেলের প্রদীপটায় তেল দিয়ে, সলতে উসকে দেয়।

গোপেশ্বরবাবু আহ্নিক শেষে এক পেয়ালা চা, সামান্য দুটি মুড়ি মুড়কি খান, এই তাঁর অভ্যাস।

অভয় খোকনকে কাছে টেনে নেয়। অভয়ের সারামন হু হু করে ওঠে। আজ তার মা নেই, সমস্ত ঘর শূন্য। মা যে কতখানি ছিলেন তা অন্যে কি বুঝবে। সরোজিনী এই সংসার মাথায় করে রেখেছিলেন। সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি দৃষ্টি দিয়ে, কত হিসেব করে সংসার চালাতেন। চিরকাল অতি দারিদ্র্যের মাঝে, অনশন অর্দ্ধাশন, চরম দুরবস্থার মাঝে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। তবুও সরোজিনী, কোনদিনই আক্ষেপ করেননি।

আহ্নিক শেষ হয়ে গেল, গোপেশ্বর এসে বসলেন রান্নাঘরে। গীতা ওঁর চা আর মুড়ি এনে দিল। গোপেশ্বর বললেন, খোকা কিছু খেয়েছিস রে? অভয় বলল, মুড়ি খেয়েছি। বাবা, তুমি গীতার দিকে বিশেষ লক্ষ রেখো। ছেলেমানুষ এই রান্না বান্না করতে গিয়ে, শেষে দুর্ঘটনা না বাধিয়ে ফেলে। তারপর ওর লেখা পড়া রয়েছে—

—যতটুকু পারি, সব সময় নজর রাখি। রান্নার কাজ ও না করলে আর কে করছে। সবই কপাল। সাবধান হয়েই কাজকর্ম করে। কিন্তু দৈবকে কে ঠেকাবে বাবা। আমি সব তাঁরই ওপর ছেড়ে দিয়েছি। তিনি যদি রক্ষা করেন, তবেই সব রক্ষা হবে। নইলে নয়—

একটু চুপ করে থেকে, গোপেশ্বর বললেন, এখানকার জন্যে ভাবনা করিসনে বাবা। ভাল করে, লেখাপড়া কর। কোন প্রকারে পাশটা যাতে করতে পার, এখন শুধু তাই দেখ বাবা।

দাদার কোলেই খোকনের চোখ জড়িয়ে আসে। গোপেশ্বর বললেন, এই দেখো। সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়বে। ওকে নিয়েই আমার মুশকিল। সমস্ত দিন হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াবে আর সন্ধ্যে হলেই ঘুমিয়ে পড়বে। দিনরাতে বার বার বলবে—দিদি, মা কোথায়? বার বার এ ঘর ও ঘরে ঢুকবে আর ডাকবে—মা—মা—বলে। ওকে নিয়েই আমার ভাবনা।

অভয় বলল, আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে যাবে। এখন অভ্যাস মত ঐ সব করছে, বড় হলে তখন বুঝতে শিখবে, তখন আর এমন করবে না। এখন থেকে একটু একটু করে পড়াশোনার দিকে নজর দিতে হবে—। তাতে অনেকটা ভুলে থাকবে।

—দশটার পর গীতার সঙ্গে স্কুলে যায়। মাষ্টার মশাইকে বলে দিয়েছি, একটু নজর রাখতে। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভুলে থাকে। যাহোক, দশটা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত যা হয় শোনে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশে অনেক কিছু ভুলে থাকে। উনি চলে যাবার পর আমার দিন রাত সব একাকার হয়ে গিয়েছে বাবা। ক্রমশঃ রাত বাড়তে থাকে। একটা দুঃসহ ব্যথায় অভয়ের মন ভরে যায়। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, ঠিক আগের মতই ঝিকমিক্ করছে। সরোজিনীর ইহলোক হতে প্রস্থানের পর, ফেলে রাখা সব স্মৃতিচিহ্নগুলি আজও অম্লান। তাঁর হাতের স্বাক্ষর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তাও হয়তো বেশীদিন থাকবে না। কালপ্রবাহে একদিন সরোজিনীর সব স্মৃতিচিহ্ন হাতের স্বাক্ষর, মহাকালের হাতের প্রলেপে সবই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। জীবনের নূতন বর্ণমালায়, শ্লেটের পুরাতন লেখাগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিস্মৃতির ছায়ায়, সরোজিনীর সমস্ত চিহ্ন, স্মৃতি, চিরকালের মত কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ভারাক্রান্ত মনে, অভয় ফিরে গেল মালদহে। মায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। মৃত্যুকালে মা তাকে বহুবার দেখতে চেয়েছিলেন। বহুবার নাম ধরে ডেকেছিলেন। অস্ফুট কণ্ঠে বারবার ডেকেছিলেন—খোকা—খোকা। বহুবার ছেলেকে দেখবার জন্যে এ পাশে ও পাশে তাকিয়েছিলেন। তাঁর শীর্ণ দুই চোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রু নেমে এসেছিল। সেই শেষ যাত্রার পূর্ব্বে, এই পৃথিবীর

সমস্ত মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসার শক্ত বাঁধন ছিন্ন করবার পূর্ব্বে, বোধ করি আপ্রাণ চেষ্টায় আর একবার অভয়কে ডেকেছিলেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হয়নি। এমনি অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অবিরত দুঃখ, বেদনা সয়ে সয়ে কত বাসনা, কামনা, কত ক্ষুধা নিয়ে তিনি ইহলোক ছেড়েছেন। এমনি কতবার, কত জন্ম, কত দিন, এই অচ্ছেদ্য মায়া মমতার জালে, কত পুত্র কত কন্যা, কত ভাই ভগিনী, স্বামী পিতা মাতাকে কাঁদিয়ে আবার এমনিভাবে, ইহকালের বন্ধন কেটে, সেই অদৃশ্য অচিন্তনীয় পথে গমন করছে। কিন্তু কেন যায়, কেন আবার আসে, এই পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের কি কারণ, তা কে বলতে পারে?

সরোজিনীর এত ঘরবাড়ী, তাঁর নিজ হাতে পোঁতা আম গাছ পেঁপে গাছ, তাঁর গাই বাছুর, তাঁর স্বামী ছেলেমেয়ে এসব কি ভুলে যাবেন? দেহের মত সেই অদৃশ্য মনটাও কি এই মাটির জগতের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখবে না? দেহের সঙ্গে কি মনটাও ছাই হয়ে যাবে বুঝি মনের ওপর আর কোনও আধিপত্য এই জড় জগতের সঙ্গে থাকে না, অথবা বুঝি অন্য কোন শক্তির অধীনে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। বুঝিবা প্রকৃতির এই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মে কোটি কোটি বছর আগেও কত জীবন সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তাদের আর কোনও অস্তিত্বই নেই। বুঝি তাই। বোধ করি এই জীবনপ্রবাহ এমনি চলবে—আপন গতিতে। এর পেছনে কোনও অদৃশ্য শক্তি নেই, একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। তবে বিশ্বজগৎ কি কোনও খামখেয়ালীর খেয়ালীপনার সৃষ্টি? অভয় আপনমনে তাই ভাবতে থাকে। তার মনের সেই প্রফুল্লতা সেই আনন্দ, সব যেন নষ্ট হয়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অভয় নিঃশ্বাস ফেলে। বইয়ের পাতা খোলা থাকে—চোখও থাকে খোলা। মন চলে যায়, দূরে—বহুদূরে।

এর মধ্যে একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল, আশালতার ব্যবহারে। যে দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি করে এতদিন আশালতা চলে আসছিলেন, সেই ব্যবধান যেন কিছুটা সরেগেছে মনে হ'ল। সরোজিনীর মৃত্যুর পর, মানসিক চিন্তাধারা যৎসামান্য বদলে গেছে মনে হয়। হয়তো এটাও ক্ষণিক। শ্মশান-বৈরাগ্যের মোহ কিছুদিন পর কাটিয়ে উঠবেন আশালতা। সরোজিনীকে তিনি জীবনে দেখেননি, অভয়দের সঙ্গে তাঁর স্বামীর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এই তিনি জানতেন। কিন্তু সেই সম্পর্কটা খুব বড় করে কখনও দেখেননি, এবং দেখার কোন দরকারও হয়নি। নিজের সুখশান্তি ও অঢেল অর্থ ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে সুখে জীবন কাটছে, সেখানে নিজ সুখেই তিনি আত্মহারা। অপরের দুঃখ বেদনা দারিদ্র্য সম্বন্ধে কোনদিনই কোন দুঃখের সামান্য রেখাপাত মনের ওপর হয়নি—ও সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। লোকের ওপর মাঝে মাঝে যে কৃপাদৃষ্টি করেন, তাতে নিজ ধনসম্পদের মহিমা ও ঐশ্বর্য্য জানানই হয়ে থাকে। কিন্তু আজ যেন কিছুটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। মিনতির সঙ্গে অভয়ের মেলামেশা কোনদিনই ভালচক্ষে দেখেননি। তাই নিজ মেয়ের ওপর সুস্পষ্ট নিষেধও ছিল। এখন সরোজিনীর আকস্মিক মৃত্যুতে যেন কিছুটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। অভয় কিন্তু ঠিক তাই আছে, অকারণে বাড়ীর মধ্যে যায় না এবং দ্বিতলে তো ওঠেই না।

স্কুলে শুভময়ের সঙ্গে দেখা হতেই শুভময় বলল, ইস্, এ কি চেহারা হয়েছে অভয়দা। অভয়ের এই শোক, মায়ের মৃত্যু, এ সমস্তই জানে শুভময়। তাই বলল, এখন পড়াশোনার দিকে মন দিতে হবে। আজ বিকেলে আমাদের বাড়ী এস অভয়দা। বাবা আরও নূতন নূতন বই কিনে এনেছেন। ছুটির পর একসঙ্গে যাব।

ছুটির পর ওরা এল দোতলার লাইব্রেরী ঘরে। ঘর খানাকে আরও নূতন নূতন আসবাবপত্রে সাজান হয়েছে। ঘরের মেঝের ওপর যে গালচেখানা পাতা রয়েছে তাও সুন্দর কারুকার্য্যে ভরা। এত নরম যে পায়ের চাপে পায়ের গোড়ালি ডুবে যায়। একটা নূতন বাহারে ঘড়ি, আর বইয়ের আলমারীতে ইংরেজী বাংলা নূতন বইয়ে ভর্ত্তি। শুভ বলল, বাবা নূতন একটা গ্রামোফোন কিনেছেন এই দেখুন।

অবাক্ হয়ে অভয় বলল, বাঃ, বেশ মজার তো। এটা দেখতে ছোট্ট একটা আলমারীর মত—

শুভ বলল, এটা টেবিল গ্রামোফোন বলতে পারেন। এই দেখুন, গান চলার সময় সামনের দুই পাল্লা খুলে দিলাম। উপরের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম। শুনুন কি সুন্দর গান। একটা কানা কেষ্টর গান—

অভয় অবাক্ হয়ে যায়। মানুষের গানের গলা কি এত সুন্দর হয়? অভয় তন্ময় হয়ে গান শুনতে থাকে। এক আশ্চর্য্য অনুভূতিতে ওর সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এমন সুন্দর গান এর আগে আর কোনদিন শোনেনি। অভয় বলল, এঁর গান আর আছে? আচ্ছা যে গাইছে তাকে কানা কেষ্ট বলছ কেন?

—বাঃ। উনি যে অন্ধ। তাই—

—অন্ধ! আচ্ছা—এমন যে গান গায় সে অন্ধ। একটা দুঃখের বেদনায় অভয়ের সারা মন ভরে যায়। কিন্তু অভয় ভাবে, উঁহুঃ, এঁকে অন্ধ বলা যায় না। এঁর বাইরের চোখ না থাকলেও অন্তরের যে চোখ তাতে সবই দেখছেন। অন্তরের চোখ অতি পরিষ্কার আর তীক্ষ্ণ। গান চলতে থাকে। এর আগে অভয় কিছু কিছু গান শুনেছে, কিন্তু এমন সুন্দর গান আগে শোনে নি। ক্ষণেকের জন্য মন অন্য জগতে চলে যায়। সমস্ত চিন্তা ভাবনা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে, ওর মন যেন লঘুপক্ষ পাখীর মত পাখনা মেলে অনাবিল আনন্দ স্রোতে ভেসে চলে যায়। পেছনের দিকে আর তাকায় না। মায়াহীন বেদনাশূন্য বোধহীন এক মন। এ যেন মুক্ত বিহঙ্গমের মত দুখানি অতি লঘু পক্ষ পাখা মেলে অনন্ত গগনে পাড়ি দিচ্ছে। গানের সুরের মাঝে অভয়ের সমস্ত চিন্তা ডুবে যায়।

একসময় শুভ বলে—আচ্ছা অভয়দা, আপনি অত কি ভাবছেন। কিন্তু ভেবে কি কিছু দুঃখ লাঘব হয়? মাঝ থেকে নিজের পড়াশোনা নষ্ট হয় শুধু—

অভয় বলল, সব কথাই ঠিক। কিন্তু চেষ্টা করেও চিন্তাকে তাড়াতে পারিনে। মা যে এত শিগ্‌গীর আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, তা ভাবতেও পারিনি। ছোট ভাই বোন রয়েছে, আর বাবার যা শরীরের অবস্থা, তাতে মনে হয়, বাবাও কোনদিন এমনি হুট্ করে চলে যাবেন। হয়তো আমার সঙ্গে দেখাও হবে না। যদি একা হতাম, কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে ভাবনা ছোট ভাই বোন দুটীর জন্য।

শুভময় বলে, দেখুন, কে যে দেখবে আর কি যে হবে, তা আগে থাকতে কেউই বলতে পারে না। যদি পারত, তবে সংসারের চেহারা অন্য রকমই হয়ে যেত। দেখবার মালিক তো ভগবান্। আমার মা বলেন, যার কেউ নেই, তার ভগবান্ আছেন। তিনিই দেখবেন। তিনিই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ভগবানের ওপর শুভময়ের এতটা বিশ্বাস দেখে অভয় অতি আশ্চর্য্য হয়ে যায়। সে নিজেও ঠিক বোঝে না। লোকমুখে শুনছে- ঈশ্বরই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু কেন করেছেন আর কি তাঁর উদ্দেশ্য—এ সম্বন্ধে তার নিজের কোন ধারণাই নেই। অবশ্য এ রকম বহু প্রশ্ন মনে আসে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য কাউকে কিছু প্রশ্ন করতে লজ্জা পায়। ভাবে, ছোট ছেলের মুখে এত বড় বড় কথা, বোধ করি লোকে হাসবে। বলবে হয়ত, ফাজিল ছোকরা কোথাকার।

অভয়ের মনে হয়, হয়ত মোনাদা এসব কথার উত্তর দিতে পারত। কিন্তু মোনাদা যে কোথায় তা কে বলবে?

গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। বাড়ীর সকলেই এখন ঘুমে অচেতন। শুধু ঘুম নেই অভয়ের চোখে। অভয় নিবিষ্টমনে বই পড়ে যাচ্ছে। এটা রহস্য সিরিজের বই নয়—কোন উপন্যাস, গল্প, বা ডিটেকটিভ বইও নয়। স্বামীজীর লেখা একখানা বই জোগাড় করে এনেছে অভয়। তাই পড়ছে। নিবিষ্টমনে পড়ছে, পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে, স্বামিজীর কথা।

"আপনারা অনেকেই জানেন না যে, পুনর্জন্ম প্রাচীন ধর্ম্ম সমূহের একটি অতি পুরাতন বিশ্বাস। ফ্যারিসী, ইহুদী, এবং খৃষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে ইহা সু-পরিচিত ছিল। আরবজাতির ইহা একটি

প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে এখনও ইহা টিকিয়া আছে। বিজ্ঞানের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। বিজ্ঞান তো বিভিন্ন জড় শক্তিকে বুঝিবার প্রয়াসমাত্র। পাশ্চাত্য দেশের আপনারা মনে করেন যে, পুনর্জন্মবাদ নৈতিক আদর্শকে ব্যাহত করে। পুনর্জন্মবাদের বিচার ধারা এবং যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক দিকগুলির পুরোপুরি আলোচনার জন্য আমাদিগকে গোড়া হইতে সব বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে।"

অভয় বই হতে মুখে তুলে তাকিয়ে থাকে। মায়ের মৃত্যু তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তার চিন্তাধারা ওলট পালট করে দিয়েছে। সাধারণতঃ তার মত বয়সের ছেলে যে চিন্তাভাবনা করে তার সঙ্গে অভয়ের চিন্তাধারা বিভিন্ন। অভয় অন্য কোন সমবয়সী ছেলে হতে পৃথক্। সংসারের অপরাপর পাঁচজনের মত গতানুগতিক পথে চলতে ওর মন চায় না। একে শৈশব থেকেই দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্য ওকে শক্ত করে তুলেছে। সংসার যে কি জিনিষ—আর এই সমাজের মানুষেরা যে কি চরিত্রের লোক—এখন সে সবই বুঝতে শিখেছে। প্রায় সকলের কাছে কোথাও ঘৃণা, কোথাও তাচ্ছিল্য অবহেলা এসবই পেয়েছে। নিজের দারিদ্র্য, অভাব, দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষুধার যাতনা সহ্য করা—ক্ষুধায় কাতর ভাইবোনদের কান্না, পিতা-মাতার নীরব অশ্রু বর্ষণ এ সবই দেখেছে অভয়। মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি তাই ধীরে ভোঁতা আর মোটা। আঘাতে আঘাতে সমস্ত মন হয়েছে ইস্পাতের মত কঠিন। তাই তরল হাসি, আনন্দ আর গভীর ভাবে মনকে আনন্দিত করে না।

ক্রমশঃ

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

৯

পরদিন বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্বদিনের মত সভাগৃহ প্রতিনিধি ও দর্শক দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল।

এদিনের সভা উদ্বোধন করলেন কয়েকজন পণ্ডিত সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র গান করে। তারপর কোরাণ থেকে একজন প্রার্থনা করলেন। তারপর কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

এদিনকার অধিবেশন খুব সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। সভাপতি মশায় প্রথমেই তিনটি প্রস্তাব স্বয়ং উত্থাপন করলেন। সেগুলি নিয়ে দেওয়া হল।

এই কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর শান্তি ও সত্যের বাণী দ্বারা ভারতবর্ষ ও মানবতার সেবা সকৃতজ্ঞ ভাবে উপলব্ধি করছে এবং ভারতের জনগণের দাবি পূরণের জন্য তাঁর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ নীতিতে পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করছে।

এই কংগ্রেস যে সকল বীর নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় দুঃখবরণের কর্মসূচী অনুসারে দুঃখ বরণ করেছেন এবং যারা কংগ্রেসের উপদেশানুসারে কোন প্রকার আত্ম পক্ষ সমর্থন না করে বা জামিন না নিয়ে কারাবরণ করেছেন এবং যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে আবদ্ধ আছেন, দেশের সেবার জন্য তাঁদের এই অবদান

গভীর ভাবে উপলব্ধি করছে এবং এই ত্যাগের মনভাব সজীব রাখতে এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রাখতে দেশের জনগণকে আহ্বান করছে।

এই কংগ্রেস আকালী শহীদরা যে অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং সমগ্র জাতির উন্নয়নের জন্য তাঁরা যে অহিংসার মহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা গর্ব ও প্রশংসার সহিত উপলব্ধি করছে।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ উপরোক্ত প্রস্তাব তিনটি হিন্দীতে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ভোটে গৃহীত হল।

তার পরের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই কংগ্রেস গাজী কামাল পাশা ও তুর্কী জাতিকে তাদের সাম্প্রতিক সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত—ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তার সব শক্তি প্রয়োগ করে তুর্কী জাতির মুক্ত ও স্বাধীন সত্তার বাধা সরিয়ে না দিচ্ছে এবং এবং নির্বিঘ্নে জাতীয় জীবন যাপনের এবং ইসলামের কার্য্যকর অভিভাবকত্বের ও অমুসলমানদের কর্তৃত্ব থেকে জাজিরাত-উল্-আরবের মুক্তির প্রয়োজনীয়ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের জনগণের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা জ্ঞাপন করছে।

শ্রীমতী নাইডু তাঁর অপূর্ব ভাষণে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বললেন।

প্রস্তাব সমর্থন করলেন পাঞ্জাবের দান সিং ও অন্ধ্রের হরি সর্বোত্তম রাও।

বারাণসীর শিবপ্রসাদ গুপ্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করে 'অমুসলমান' শব্দের পরিবর্তে বিদেশী শব্দ বসাতে বললেন।

বারাণসীর প্রখ্যাত পণ্ডিত বাবু ভগবান্ দাস সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

হাকিম আজমল খাঁ সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দিলেন, প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর মূল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

সেদিনের মত সভার কাজ শেষ হল।

১০

২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সন্ধ্যার সময় বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভার অধিবেশন আরম্ভ হল।

১৯২০ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনকে যেমন মালবীয় কংগ্রেস আখ্যা দিয়েছিলাম তেমনি এবারকার কংগ্রেসকে রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিষয়নির্বাচনী সভায় আলোচনার সময় দেখা গেল, রাজাগোপালাচারীই সব সব। তিনি যে প্রস্তাব উপস্থিত বা সমর্থন করলেন তাই গৃহীত হল। তাঁর বিরোধিতায় কোন প্রস্তাবই পাশ করা যেতে পারে নি। মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণের পর তিনিই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

বিষয়নির্বাচনী সমিতির দর্শকদের মধ্যে অনেকগুলি তামিল নাড়ুর যুবক উপস্থিত ছিলেন রাজাগোপালাচারী বক্তৃতা আরম্ভ করলেই তারা জোড় হস্তে ছোট গান্ধী ছোট গান্ধী বলে ব্যাঙ্গোক্তি করতে লাগল।

কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়েই সভার অধিকাংশ সময় কাটল। কাউন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের প্রায় সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থনের জন্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' থেকে মতামত উদ্ধৃত করতে লাগলেন। দেখে মনে হল যেন উকিলরা তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য 'ল' রিপোর্ট' থেকে নজির দেখাচ্ছেন।

আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর অর্দ্ধেক সদস্যের সুপারিশ অনুসারে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কাউন্সিলে প্রবেশের অনুকূলে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ঐ প্রস্তাবের সার মর্ম ছিল এই যে, খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার এবং অনতিবিলম্বে স্বরাজ অর্জনের জন্য অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে অসহযোগীরা কাউন্সিল প্রবেশের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হবেন এবং

যেহেতু নূতন কাউনসিলের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে অতএব—১৯২৩ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের পরিবর্তে প্রথম সপ্তাহে করতে হবে এবং অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজন হলে চূড়ান্ত মত প্রকাশের জন্য পুনরায় কংগ্রেসের নিকট উপস্থিত হতে হবে।

এই প্রস্তাবের ১১টি সংশোধনী প্রস্তাব বিভিন্ন সদস্যগণ উত্থাপন করলেন।

একটি প্রস্তাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কাউনসিলে প্রবেশের প্রস্তাব মুলতুবি রাখার কথা ছিল। কোন প্রস্তাবে তিন মাসের জন্য, কোন প্রস্তাবে কয়েক মাসের জন্য প্রস্তাবটি মুলতুবি রাখার কথা ছিল।

একটি সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল তিন মাসের জন্য প্রশ্নটি মুলতুবি রেখে পরে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হোক এবং ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আইন অমান্য আরম্ভ করার জন্য সর্বপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হোক।

বাবু ভগবান্‌দাস একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন, তাতে বলা হল যে, কংগ্রেস-সংস্থাগুলির ও তাদের অর্থের কোন সাহায্য না নেওয়ার শর্তে কাউনসিল প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল এবং পরবর্তী কালে কংগ্রেসের সভাপতি) একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন, তাতে বলা হল যে, কাউনসিল প্রবেশ সম্বন্ধে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে অটোনমি দেওয়া হোক এই শর্তে যে কোন কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভের পর শপথ গ্রহণ করবেন না বা কাউনসিলের কোন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন না।

২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের কোন প্রকাশ্য অধিবেশন হল না। সেদিনও দুই বেলায় বিষয়নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হল।

রাজাগোপালাচারী সমস্ত প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করলেন এবং গান্ধীজির প্রবর্তিত গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর জোর দিলেন।

তিনি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন, তাতে বলা হয়েছে যে,যেহেতু ১৯২০ সময় নির্বাচন বয়কট করায় যে প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গভর্ণমেন্ট তার ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করছিল সেগুলির নৈতিক শক্তি ধ্বংস হয়েছে এবং যেহেতু আগামী বৎসরের নির্বাচনে ভারতের জনগণের অংশগ্রহণ না করা একান্ত প্রয়োজন অতএব এই কংগ্রেস উপদেশ দিচ্ছে যে, কোন কংগ্রেস সদস্য যেন কোন কাউনসিলের পদপ্রার্থী না হন এবং সমস্ত ভোট-দাতাগণ ভোটদানে বিরত থাকেন এবং তাঁদের বিরত থাকার সংবাদ অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নির্দেশানুসারে উক্ত কমিটীকে জানান।

বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

স্বদেশ মিত্রমের এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার কয়েক মাসের জন্য প্রশ্নটি মুলতুবি রাখার জন্য প্রস্তাব করলেন।

এস্ রঙ্গ আয়ার উভয়পক্ষের মধ্যে আপোসের জন্য সভা মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করলেন।

যমনাদাস মেহতা প্রস্তাব করলেন যে ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত এই প্রশ্ন মুলতুবি রাখা হোক এবং ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সদস্যগণ নির্বাচনপ্রার্থী হন।

এস সত্যমূর্তি এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সহ মূল প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে অগ্রাহ্য হল। রাজাজীর প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু নোটিস দিলেন যে, তিনি ২৯শে তারিখের প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাব রাজাগোপালাচারীর সংশোধনী প্রস্তাব হিসাবে উপস্থিত করবেন।

(১১)

২৯শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল বেলা ২টার সময়। পূর্ব পূর্ব দিনের মত এদিনও সভাগৃহ পরিপূর্ণ হয়েছিল।

সভাপতি মশায় যথারীতি শোভাযাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে আসন গ্রহণ করার পর কলকাতার পণ্ডিত মাধোলাল মুকুল একটি গান গাইলেন তারপর কয়েকজন বাঙালী মহিলা সমবেত কণ্ঠে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন।

সঙ্গীত সমাপনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

সভাপতি মশায় এস সত্যমূর্তিকে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য আহ্বান করলেন।

সত্যমূর্তি বক্তৃতা মঞ্চে উঠে প্রথমে তাঁর প্রস্তাব পড়ে শোনালেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর বিশিষ্ট পণ্যদ্রব্যের বয়কটের সুপারিশ গ্রহণ করছে এবং সিদ্ধান্ত করছে যে কোন্ কোন্ ব্রিটিশ পণ্য সাফল্যের সহিত বয়কট করা যেতে পারে এবং তৎপরিবর্তে কোন্ কোন্ স্থান থেকে ঐ সকল দ্রব্য সহজে পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে বিষদ রিপোর্ট দুই মাসের মধ্যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট দাখিল করার জন্য একটি কমিটীর উপর ভার দেওয়া হোক।

আরও বলা হয়েছে, খদ্দর ও সমুদয় বৈদেশিক বস্ত্র বয়কট সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্মসূচী এই প্রস্তাব দ্বারা বিঘ্নিত হবে না।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটীর সদস্য হবেন : এন্ সি সেন, জে কে মেহতা, এন্ সি কেলকার, উমর শোভানী এবং অধ্যাপক রুচিরাম সাহানী।

প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে সত্যমূর্তি ইংরেজিতে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, যুক্ত প্রদেশের স্বামী ভক্তভীর্থ হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সি বিজয় রাঘবাচারিয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে মঞ্চের উপর দাঁড়ালে তাঁকে সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলী সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানাল কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ব্লক থেকে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি উঠল। প্রবীণ দেশপ্রেমিক ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতির প্রতি এই আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়।

যাই হোক বিজয় রাঘবাচারিয়া মশায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন অকার্য্যকর ও অনভিপ্রেত।

পণ্ডিত সুন্দরলাল হিন্দীতে পূর্ববর্তী বক্তাকে সমর্থন করলেন।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও শিবপ্রসাদ গুপ্ত মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর সি রাজাগোপালাচারী উঠে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে তিনি স্বীকার করছেন যে, তাঁদের মনে ক্রোধের ভাব জাগ্রত হয়েছে এবং একমাত্র ব্যক্তি যিনি সাফল্যের সহিত এটা দমন করেন সেই মহাত্মা গান্ধী তাঁদের মধ্যে উপস্থিত নেই। তিনি সকলকে ক্রোধের ভাব সম্বরণ করতে অনুরোধ করে বললেন যে, এই প্রস্তাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যার জন্য পরে অনুতাপ করতে হতে পারে, কারণ এই প্রস্তাব স্বদেশীর সাহায্য না করে ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী রাজ্যগুলির নিকট ভারতের অর্থ নৈতিক অধীনতা কায়েম করবে। খাদি ও অন্যান্য গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর জোর না দিয়ে তাঁদের উদ্যম নিয়োজিত হবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্থানে কোন্ কোন্ বিদেশী দেশগুলি গ্রহণ করবে তা খুঁজে বের করতে। তিনি সকলের নিকট গান্ধীজির নামে আবেদন জানালেন যেন গান্ধীজি তাঁদের নিকট থেকে সরে যাওয়ার এত অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা তাঁকে (গান্ধীজিকে) ভুলে না যান এবং এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন কারণ, এই প্রস্তাব কংগ্রেসকে একটি নূতন নীতি অবলম্বন করতে বলছে তা বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রস্তাবের অঙ্গীভূত নয়।

পদ্মরাজ জৈন হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর বি এন্ শাস্ত্রী মূল প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। তখন কয়েকজন প্রতিনিধি—তর্ক-বিরতির (closure) দাবি জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী মশায় বসে পড়লেন।

তারপর সভাপতি মশায় বিতর্কের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য সত্যমূর্তিকে আহ্বান করলেন। সত্যমূর্তি মশায় ওজস্বিনী ভাষায় বিপক্ষ দলের মত খণ্ডন করলেন।

সত্যমূর্তি মশায় আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি মশায়ের নির্দেশে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মঞ্চোপরি উঠে প্রস্তাবের উপর ভোট নিলেন।

প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে "মহাত্মাগান্ধী কি জয়" মধ্যে অগ্রাহ্য হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন রাজা-গোপালচারী—

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যে হেতু ১৯২০ সালের নির্বাচনে কাউন্সিল বয়কট করায় যে প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে গভর্ণমেন্ট তাদের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করছিল এবং দায়িত্বহীন শাসন চালাচ্ছিল সেগুলির নৈতিকশক্তি নষ্ট হয়েছে এবং অহিংস অসহযোগের একান্ত প্রয়োজনীয় কর্মসূচী হিসাবে আগামী বৎসরের নির্বাচনেও জনগণের সরে থাকা প্রয়োজন, সেইহেতু এই কংগ্রেস সকল ভোটারদের কোন কাউন্সিলের সদস্যপদ প্রার্থীরূপে দাঁড়ানো থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছে এবং এই উপদেশ অমান্য করে যদি কেউ নির্বাচন-প্রার্থী হন তাঁর পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকা এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নির্দেশানুসারে ওদের বিরত থাকার সংবাদ জানানোর জন্য উপদেশ দিচ্ছে।

এই প্রস্তাব উপস্থিত করে অন্যান্য কথার পর রাজাগোপালাচারী মশায় বললেন যে, পদ্ধতি নিয়ে বিরোধ থাকলেও কাউন্সিল বয়কট কার্য্যকর করা সম্বন্ধে সকলেই একমত। তিনি মনে করেন যে কাউন্সিল বয়কট করার একমাত্র ফলপ্রদ উপায় হচ্ছে কাউন্সিলের জন্য নির্বাচন বয়কট করা।

পাঞ্জাবের পণ্ডিত নেকিরাম এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাক্তার আনসারী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে, কলকাতায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং যা নাগপুর ও আমেদাবাদে স্বীকৃত হয়েছে তা পরিবর্তন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই কেউ দেখাতে পারেন নি।

বেগম হসরত মোহানী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে, তিনি ভাবতেই পারেন না যে, যারা পূর্ণ স্বাধীনতা চান তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগের কল্পনা করতে পারেন।

প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষে হওয়ার পূর্বেই সেদিনের মত অধিবেশনের কার্য্য শেষ হল।

ক্রমশঃ

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উইণ্ডসর ক্যাসল-এ অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল চ্যাপেলটি উল্লেখযোগ্য। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া তাঁহার স্বামীর স্মৃতিতে এটি নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার মহিমা তাজকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নির্মাণে পৃথিবীখ্যাত বহু জাতীয় মূল্যবান প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রিন্স অ্যালবার্টকে সমাহিত করা হইয়াছে নিকটস্থ ফ্রগমোর নামক স্থানে, সেইখানে সম্রাজ্ঞীর একটি নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে। সম্রাজ্ঞীর অনুমতি লইয়া সেই সমাধি আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। সমাধি স্তম্ভটি শ্বেত মার্বল পাথরে নির্মিত। দেখিতে সুন্দর।

লং ওয়াক নামক শড়কটি দেখিলাম। এটি দৈর্ঘ্যে তিন মাইল। জানা গেল এটি শ্রেষ্ঠ অ্যাভিনিউ বা বীথি। দুই পাশে সুদৃশ্য এল্‌ম বৃক্ষশ্রেণী—সংখ্যায় ১৬০০। অতঃপর শ' পশুপালন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। এটি অ্যালবার্টের তিনটি কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম। সম্রাজ্ঞীর নির্দেশে আমাদিগকে স্ট্রবেরি ও ক্রীম খাইতে দেওয়া হইল। স্ট্রবেরি এই জমিরই ফসল, ইংল্যাণ্ডে ইহা অপেক্ষা সুস্বাদু স্ট্রবেরি আর দেখি নাই। উইণ্ডসরের নিকটেই ইটন কলেজ, এদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত। এইভাবে আমরা নিকটস্থ নানা স্থান দেখিলাম, এবং ইংরেজ ভ্রাতাদের সদয় ব্যবহারের সুখস্মৃতি বহন করিয়া ফিরিলাম।

১০ই জুলাই মার্লবরো হাউসে প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস আমাদের জন্য একটি গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হইল সাড়ে চারিটা হইতে সাতটার ভিতরে। ইংরেজদের পোশাক কিভাবে বর্ণনা করিব জানি না। কোনও লেডি যদি আমার এই লেখা পড়েন, তিনি অবশ্যই ইহার মধ্যে আমার বর্ণনা খুঁজিবেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবেন। কোনও লেডির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন, "রাণীকে দেখিয়াছেন?" অথবা "প্রিন্সেসকে দেখিয়াছেন?"—তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান করা যাইবে তিনি ব্যগ্রভাবে পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাঁহার সজ্জা কেমন ছিল?" এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমার বর্বরতা প্রকট হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, কারণ আমি বলিব, "সেটি ত লক্ষ্য করি নাই।" অথবা তিনি কালো পোশাক পরিয়াছিলেন।" অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা স্বাধীনভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এরূপ উপলক্ষে আপ্যায়নকারী তাঁহাদের এই স্বাধীনতায় আর কোনও বাধা-নিষেধ আরোপ করেন না, কারণ ইহাই দস্তুর। আমাদের দেশের মত নিমন্ত্রণকারী অতিথিদের ব্যক্তিগতভাবে বলেন না যে এটা খান, ওটা খান, আরও খান ইত্যাদি। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় এক স্থানে জমা করা থাকে, তাহার রক্ষকের নিকটে গিয়া যাহা প্রয়োজন চাহিয়া লইলেই হইল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ দিয়া খাওয়াইবার রীতি সেখানে নাই। এই জাতীয় পার্টিতে পরস্পর পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। উদ্যানে রাশিয়ান ব্যাণ্ড বাজিতেছিল, এই দলে কয়েকজন বিখ্যাত রুশ গায়িকা ছিলেন। প্রাচ্য পোশাক ছিল তাঁহাদের পরিধানে,চোগা ও কোমরবন্ধ। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়াও অতিথিদের ভিতর দিয়া একসময়ে হাঁটিয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ রাশিয়ান

গায়িকাদের গান শুনিলেন। সঙ্গীত শেষে তিনি দলের প্রধানকে নিজে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয়রা নভেল পড়িয়া, উচ্চ ইংরেজ জীবনকে বেষ্টন করিয়া যে সুসংস্কৃত রুচি সম্পন্ন ঐশ্বর্য রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারিবেন না। আমি নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতেছি। আসামের বৃদ্ধ দফলা তাহার পাহাড়ে অবস্থিত গৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রদর্শনীতে সেই গৃহের মডেল নির্মাণের জন্য আসিবার সময় বলিয়াছিল, "আমি দেবতাদের আবাস-স্থলে চলিলাম।" আমাদের পুরাণ ইত্যাদিতে যদি দেবতাদের বর্ণনা যথাযথ হইয়া থাকে, তাঁহাদের রীতি-নীতি আচার-আচরণ বিলাসিতা শক্তি-সামর্থ্য যদি নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কোনও হিন্দু ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের উপর একবার চোখ বুলাইলেও বলিবেন, "এই ত স্বর্গ।" সমস্তটা দেশ, মাঠ-ঘাট, অরণ্য, প্রান্তর, পতিত জমি, জলাভূমি—সমস্ত ঘষিয়া মাজিয়া কাটিয়া, সমান করিয়া ছবির মত করিয়া রাখা হইয়াছে। মানুষের যত্ন এবং নৈপুণ্যে যতটা সম্ভব তাহা করা হইয়াছে। জমিতে চড়াই উৎরাই থাকাতে সৌন্দর্য আরও বাড়িয়াছে। নয়ন লোভন সবুজ মাঠ, তাহার ভিতর দিয়া রূপার সুতার মত ছোটখাটো স্রোতস্বিনী ছুটিতেছে, জল কানায় কানায় পূর্ণ। শস্যক্ষেত্রগুলি জ্যামিতিক নির্ভুল নক্সার ন্যায় সাজান। ফলের বাগান ফলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে চিরসবুজ অরণ্য, তাহাতে ফেজান্ট পাখীদের বাস। প্রাসাদতুল্য হর্ম্যরাজি দীর্ঘ বীথিকায় শোভিত। পার্কে হরিণ নিশ্চিন্তমনে চরিতেছে। হ্রদে বন্য হাঁস সাঁতার কাটিতেছে। গ্রীণ হাউস, পাম হাউস রহিয়াছে। ছোট ছোট গ্রাম, আমাদের দেশের ছোট শহরতুল্য। শহরগুলির প্রশস্ত পথগুলি পরিচ্ছন্ন, একই চেহারার বাড়িগুলি চমৎকার সাজান। দীর্ঘ চিমনি, কারখানা সমূহ প্রাণ চঞ্চল—এ সমস্ত তরঙ্গিত ভূমিকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। রেলে যাইবার সময় চোখের সম্মুখ দিয়া এসব দৃশ্য দ্রুত পার হইয়া যায়। প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন চলে ৫০ হইতে ৬০ মাইল বেগে। এদেশের ইহাই রেল-গাড়ির সাধারণ গতি। সবুজ ক্ষেতে যেগুলি বিন্দুবৎ মনে হয়, গোরুদের দলকে মাঠে চরিতে ও রোমন্থন করিতে দেখা যায়, ওদিকে মেষশাবকেরা লাফালাফি ছুটাছুটি করিতেছে, চাষের ঘোড়া দাঁড়াইয়া সেদিকে চাহিয়া আছে। সম্প্রতি চাষকরা উল্টান মাটির মধ্য হইতে কাক ও চড়ুই পাখীর দল পোকা খুঁটিয়া খাইতেছে। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ওদেশে কাকেরা মানুষের বসতির কাছে খুব যায় না। আগেই বলিয়াছি, একজন ভারতীয়ের ব্রিটেন, ফ্রান্স, কিংবা বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া চলিবার সময় এসব স্থানের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা প্রবলভাবে চোখে না পড়িয়া পারে না। আগাছা নাই, উদ্ভিদের পচা গাদা নাই, দুর্গন্ধ নোংরা খাল নাই। যে দিকে তাকান যায়, সর্বত্র সযত্ন হস্তাবলেপ ও সুরুচির চিহ্ন দেখা যায়।

উহারা দেশটিকে যেভাবে গড়িয়াছে, বাড়িগুলিও তেমনি সযত্নে গড়িয়াছে। ইংরেজদের ম্যানশন বা বড় বড় হর্ম্যগুলির সঙ্গে যে সব দীর্ঘ গাছের সারি রহিয়াছে তাহা দেখিবার মত। কাছাকাছি স্থান দিয়া কুলুকুলু ধ্বনি তুলিয়া হয়ত কোনও স্রোতস্বিনী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া এইসব হর্ম্যের পরিবেশ আরও সুন্দর হইয়া উঠে। পথ এবং ফুলের জমি সবই নানা রঙের ভাঙা পাথর বিছানো। ইহার পাশেই ফুলের জমি, নানা আকারের, যাহা কেবল এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত-জ্ঞানবিশিষ্ট মালির দ্বারাই সম্ভব। কোনও কোনও স্থানে ঘন গুল্ম স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার পাশে পাশে সাজানো বাগান আরও মনোহর দেখাইতেছে। পাহাড়ের ক্রমনিম্ন গায়ে বড় বড় গাছকেও স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে। এই সব গাছের পাতার আড়ালে কোকিল ও থ্রাশ পাখী (ছাতারে) ডাকে। ওদেশে আমি একটিও কোকিল

দেখি নাই, কিন্তু আমি অনেকবার তাহার কুহুধ্বনি শুনিয়াছি। এ ডাক আমাদের দেশের কোকিলের মত নহে। আমাদের কোকিল কুউ—কুউ—কুউ ক্রমাগত ডাকিয়া চলে। ইংল্যাণ্ডের কোকিলের ডাক একটু বেশি গম্ভীর এবং মোটা, এবং তাহার কুহুধ্বনি অনেকক্ষণ পর পর শোনা যায়। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, আমি যখন ইহা প্রথম শুনি, তখন এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, "এ কোন্ পাখীর ডাক?" অবশ্য গান গাওয়া পাখীরা ইংল্যাণ্ডে গ্রীষ্মকালে দেখা দেয়। হ্রদের ধারের জলে, ঘন শরবন সেখানে বুনোহাঁস বাসা বাঁধে। লাল ফুলের প্রশস্ত চক্রাকার পাতাগুলি জলের বুকে শান্তভাবে ভাসিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে এক-একটি ফুল তাহাদের লম্বা ডাঁটার উপর নিচের দিকে ক্লান্ত ভাবে মাথা নোয়াইয়া আছে। গৃহের নিকটে রহিয়াছে টেনিস খেলিবার জায়গা, এবং অন্যান্য খণ্ড খণ্ড সবুজ জমি, তাহার উপর ছোটরা খেলাধূলা করে, নিকটস্থ ফুলের ক্ষেতের ঝরণা ধারা হইতে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে বড়রা আর একস্থানে তাহার পাশে বেঞ্চিতে বসিয়া তাহা শুনিতেছে। সমস্ত স্থানটিতে নানা মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে—নূতন পুরাতন সব রকমই আছে। সেগুলি ইটালিয়ান অথবা গ্রীক। এখানকার গরম উদ্যান-গৃহে গ্রীষ্মমণ্ডলের গাছ পালিত হয়। গরম গৃহে মাস্কাটেল ও অন্যান্য জাতীয় আঙুর প্রচুর উৎপাদিত হয়। বৎসরের সব সময়েই ফলন হয়। হর্ম্য-সংলগ্ন কাচের ছাদবিশিষ্ট কনজার-ভেটরিতে বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করা চলে। পাশে বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘর। অন্য ঘরে এক তরুণী সান্ধ্যপোশাকে বসিয়া পিয়ানো বাজাইতেছে। তাহাকে দেবকন্যার মত দেখাইতেছে, সে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীত পৃথিবীতে নামাইয়া আনিতেছে। বসিবার ঘরে সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্য ও শিল্পপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। বসিবার আসনগুলি যেমন সুন্দর তেমনি আরাম দায়ক। ঘরের কোণায়, তাকে, কুলুঙ্গিতে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন কালের সুন্দর সব দ্রব্য সুরুচিসঙ্গতভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। জানালার পরদাগুলি অদ্ভুত সুন্দর। সিলিং-এ নানা চিত্র। পায়ের নিচের কার্পেটটিও সূক্ষ্ম কাজের এক আশ্চর্য নিদর্শন। যে পিয়ানোটি বাজিতে-ছিল, তাহাও কাঠ ও আইভরির সহযোগে সুন্দর চেহারা পাইয়াছে। ভাস্ সমূহ নানারঙের ফুলের ব্যুকে বা তোড়ায় সজ্জিত। ঘর সুগন্ধে ভরিয়া তুলিয়াছে। মাছের খাদ্যও আছে প্রচুর বংশ বংশ ধরিয়া গৃহ-লাইব্রেরীটি হাজার হাজার গ্রন্থে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতুলনীয় বহিরাবরণ সেগুলির। পারিবারিক প্রতিকৃতি চিত্র কত না! বহু শতাব্দীর পূর্বপুরুষদের চিত্র সেগুলি। কিন্তু প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জাতীয় সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় বহন করিতেছে। ডাইনিং টেবলটি যে কাপড়ে ঢাকা তাহা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, তাহার শুভ্রতায় কোথাও একটি ক্ষুদ্র চিহ্নও নাই। তাহার উপর ফুল, পাতা, ইত্যাদি সুরুচিসঙ্গত ভাবে সাজান, রূপার ডিশগুলি ঝকমক করিতেছে, তাহা অলঙ্করণ পূর্ণ, তাহা ভিন্ন চাটনি-পাত্র, পানপাত্র, ডিক্যাণ্টার ও অন্যান্য নানা আনুষঙ্গিক দ্রব্য। ইহার সঙ্গে আমাদের ভোজনরীতির কোনও তুলনা একমাত্র উন্মাদ ভিন্ন অন্য কেহ করিবে না। ছোটখাটো ব্যাপারেও আমাদের কত ত্রুটি। নুন রাখিবার পাত্রটি কি সুন্দর, ছোট্ট রূপার চামচ এই পাত্র হইতে নুন তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর যে নুন তোলা হয় তাহার বিশুদ্ধতা ও শুভ্রতা, তুলনা করিতে গেলে হল্যাণ্ড-এর শীতঋতুর তুষারের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশের নুন আর নুনের পাত্রের কথা ভাবুন। কিভাবে সে নুন তুলিয়া লই তাহাও ভাবুন। ইউরোপের লোকেরা কোনও খাদ্য দ্রব্য হাতে তুলিয়া খায় না, হাতে পরিবেশনও করে না। হাতে তুলিয়া একটি সিগারও কাহাকেও দেওয়া হয় না, উহা অশিষ্টতা। খাদ্যদ্রব্যের বেলায় দক্ষিণ ভারতে এই রীতি কিছু পরিমাণ মান্য করা হয়। কিন্তু বাংলা দেশে ভোজের সময় কিভাবে নিমন্ত্রিতদিগের পাতে খাদ্য তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা দেখিলে অস্বস্তি বোধ হয়। মিষ্টির দোকানে অথবা কলিকাতার হোটেলের খাদ্য পরিবেশনও রুচিবিগর্হিত। ইংল্যাণ্ডে যে সব

বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন খাদ্য পরিবেশন করা হয় সে পাত্রগুলিতে কত রকম ছবি। খাদ্যদ্রব্যগুলিও নানা শিল্পসঙ্গত চেহারার। আমাদের দেশে এদিক দিয়া কিছু স্থূল ধরণের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপে এ বিদ্যা শিল্পরুচির চরমে পৌঁছিয়াছে। আমি এই সুরুচির কথা এতটা আলোচনা করিতাম না যদি ইহা কেবলমাত্র ধনীদের সমাজেই আবদ্ধ থাকিত। পক্ষান্তরে এই রুচি উহাদের সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত। তাহাদের সকলেই, অবস্থা যাহাই হউক, তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা নিজেদের এবং তাহাদের পরিবেশে যাহা কিছু আছে রুচিসঙ্গত করিতে। এই বিষয়ে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, তাহারা ইহা আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করে, এবং ইহার জন্য সযত্ন পরিশ্রম করে। আর আমরা এ জিনিস ইচ্ছাও করি না, ইহার জন্য চেষ্টাও করি না। আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ইহাদের আরও পার্থক্য আছে। এখানে কোনও ব্যক্তির যদি ধোপা খরচ না জোটে তাহা হইলে সে নোংরা কাপড় পরিয়া দিন কাটায়। ইংলণ্ডে এরূপ লোক নিজ হাতে পোশাক কাচিয়া পরিষ্কার করে। আমাদের দেশে সম্মান বোধ এখনও নিচু স্তরের। আমার মতে ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব এই যে, ইহা নানা উপভোগ্য বস্তু, সকল সত্যনিষ্ঠ কর্মীর ক্রয় সীমার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে এবং শুধু তাহা ইউরোপের মানুষের নহে, পৃথিবীর সকল মানুষের।

ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রার মান আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ইংরেজদের মনে আরাম ও সৌন্দর্য যুক্তভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কি করিয়া ভাল ভাবে বাঁচিতে হয় তাহা তাহারা জানে, এবং ইহার জন্য যে উপকরণ দরকার তাহা আয়ত্ত করিবার উপায়ও তাহারা জানে। তাহারা উপভোগ্য উপকরণ সমূহকে মানব জাতিকে ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলিবার উপায় স্বরূপ মনে করে না, বরং তাহাকে উহারা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে, এবং তাহা আরও কি করিয়া উন্নত ও উপভোগ্য করা যায় তাহার জন্য পরিশ্রম করে। তাহারা জলের ডুবাইবার স্বভাবকে, আগুনের পুড়াইবার স্বভাবকে এবং গোলাপ গাছের কাঁটাকে ভয় করিয়া চলে নাই, তাহারা উহা অগ্রাহ্য করিয়া উহাদিগকে নিজের কাজের জন্য যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছে। বহুদিন পূর্ব হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ্রসাধন এক জাতীয় ধর্মোন্মাদনা, মস্তিষ্ক বিকার এবং ধর্মোন্মাদনা অর্থাৎ ইনস্যানিটি। তাহাদের জীবনের দাবি—সৌন্দর্য ও আরাম উপভোগ। এবং এই সর্বজনীন দাবি মিটাইতে উহাদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা। সেইজন্যই উহার উপকরণ সহজলভ্য হইয়াছে, এবং নিম্নস্তরের লোকেরও আয়ত্তাধীন হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার চাহিদা বহু দূরে অস্পষ্টভাবে মাত্র দেখা দিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে ইংরেজ জীবনের শিল্পরুচি সঙ্গত পরিবেশ মনে হয় যেন অতিমাত্রায় পরিকল্পনা ও পদ্ধতি মানিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এবং সেজন্য তাহা অত্যন্ত কঠোর এবং ক্লান্তিকর বোধ হয়। যেন সব কিছুই ইংরেজদের দৃঢ় চরিত্র ও সবল দেহের ছাপ পাইয়াছে। উহাদের শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় চোখে ধাঁধা লাগায়, সবুজ পর্ণপুটের ভিতর হইতে লাজুক কুঁড়িটির মত কোমল দৃষ্টিতে বাহিরে তাকায় না। উহা আমাদের শিল্প। কিন্তু স্বদেশবাসীগণ, তোমরা ইহার জন্য গর্বিত হইও না। আমরা যে এখনও এমন শিল্প রচনা করি ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য! কারণ ইহা সবটাই কাব্য, ইহা অন্য জগতের স্বপ্ন মাখা মধুর ভাব। এই কঠিন রূঢ় ক্ষুধার্ত জগতে ইহা বেমানান, যে ক্ষুধার্ত জগৎ কুমুদফুলকে মন্দ হাওয়ায় জলে খেলা করিতে দেয় না, জল হইতে উপড়াইয়া লয়, নিরীহ মেষশাবককে হত্যা করে, কোমল-চাহনি-যুক্ত গেজেল হরিণকে গুলি করিয়া মারে, পর্বতের নিকটস্থ জঙ্গলে মেঘের মত মন্থর গতিতে চলাফেরা করা হস্তীযূথের গলায় ফাঁস পরায়, সে জগতে কোমলকাব্য চলে কি? এ জগতে গদ্যময় জাগরণই একমাত্র টিকিয়া থাকিবার যোগ্যতা দিতে পারে, কাব্যেরভাবে ডুবিয়া থাকা চলিবে না। বাষ্প ও যন্ত্রের আকারে গদ্য কোটি কোটি লোকের

প্রভু, তাহার মধ্যে কাষ্যের বাটালি দ্বারা ক্ষুধা মিটাইবার জন্য মাসে পাঁচ টাকা আর একমুষ্টি অন্ন, আর শীতে শুইবার জন্য দুআনা দামের খেজুর পাতার পাটি ভিন্ন আর কিছু উপার্জন করা যাইবে না। আমাদের শিল্পের আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, এবং তাহার মৃত্যুই এখন প্রয়োজন যদি সে মাসে দশ আনার বেশি উপার্জন করিতে না পারে। শ্রমের মূল্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারু শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য। অন্ততঃ পক্ষে ব্যবসা হিসাবে ভারতীয় কারু শিল্পের সার্থকতা এদেশে খুব বেশি নাই। আধুনিক যন্ত্র আসিয়া ইহাকে ধ্বংস করিবে। সূক্ষ্ম মসলিন, অতি সূক্ষ্ম কারুযুক্ত পইসলি কাশ্মীরী শালকে ল্যাঙ্কাশিয়ার উৎখাত করিয়াছে, বার্মিংহাম এখন ধাতুশিল্পকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগে করিয়াছে। আসল নকল সবই শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইবে।

ইংরেজ জাতির জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে শিল্প বোধ কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তরূপে আমি একখানা কার্ডের কথা উল্লেখ করিতেছি। ঔপনিবেশিকদের ও ভারতীয়দের সম্মানে লর্ড মেয়ার আমাদিগকে একটি বল-নৃত্যের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্থান গিল্‌ডহল, কাল, ২৫শে জুন ১৮৮৬, শুক্রবার। কার্ডখানি একটি উৎকৃষ্ট চিত্র, অতএব আমি স্মৃতিচিত্র স্বরূপ ইহা বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। নক্সার ভঙ্গিটি প্রাচ্যদেশীয়। কার্ডের চারিটি ধারে এমন সুন্দর পাড় আঁকা, মনে হয় তাহা যেন হারুন-অল-রশিদের প্রাসাদের কার্নিশ হইতে নকল করা। তাহার পরেই যে পাড়টি আঁকা হইয়াছে তাহাতে উপনিবেশসমূহ ও ভারতবর্ষের ৫২টি ফুলের ছবি, এবং প্রত্যেকটি ফুলের যেমন বর্ণ, ঠিক সেই সব বর্ণে রঞ্জিত। ইহাদের মধ্যে Acmena elliptica (সিডনির লিলিপিলি), Swainsona greyana (ডারলিং নদীর পয়জন পী), Coplis trifolia (কানাডার গোলড থ্রেড), Cissampelos (ওয়েস্ট ইণ্ডীজের ভেলভেট লীফ), Citrus limonum (পশ্চিম আফ্রিকার লেমন গাছ), Vitis vinifera (কেপটাউনের ব্ল্যাক গ্রেপ) এবং Viola adorata (উত্তর ভারতের বনফশা)। এই ফুলগুলি কার্ডের চারিদিকে ফ্রেমের মত দেখাইতেছে, এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে প্রত্যেক দেশের মুদ্রাঙ্ক ও নাম চিত্রিত আছে। বামে প্রথমে সাইপ্রাস, তাহার পর কানাডা, মল্‌টা, উত্তমাশা অন্তরীপ ও ন্যাটাল। আরও নিচে একটি বন্দর—সেখানে বড় একটি জাহাজ ও মাছধরা নৌকা, তীরভূমি পাহাড়ী, দূরের আকাশে মেঘ—কেপ টাউনের ছবি। ইহার নিচে পর পর ওয়েস্ট ইণ্ডীজ, ব্রিটিশ গিয়ানা, পশ্চিম আফ্রিকা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ, এবং নিউ গিনি। কার্ডের বাম পার্শ্ব শেষ হইল। ডান পার্শ্বে, সারাসিনিক স্থাপত্যে যাহাকে বলে "জবাব" বা রিপ্লাই—সেই ভঙ্গিতে চিত্রিত হইয়াছে সাইপ্রাসের জবাবে মরিশিয়াস। ইহার পর নিউ জীল্যাণ্ড, ইহার সামরিক চিহ্নের নিচে দুইটি লোকের ছবি, একজনের হাতে তুলাদণ্ড, অন্যজনের হাতে একটি দণ্ড। ইহার পর হংকং, নিউ সাউথ ওয়েলস, এবং কুইনস-ল্যাণ্ড। কেপ টাউনের জবাবে দক্ষিণ পার্শ্বে সিডনি বন্দর, বন্দরে বড় একটি বাষ্পীয় জাহাজ, এবং বহু বৃক্ষ পরিপূর্ণ তীরভূমিতে গম্বুজ যুক্ত একটি হর্ম্য, গীর্জা ও অন্যান্য অট্টালিকা। সিডনির পরে আসিয়াছে স্ট্রেট সেটেলমেণ্টস, উত্তর বোর্নিও, সিংহল, ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ফিজি। এইখানেই দক্ষিণ পার্শ্ব শেষ। উপরের প্রান্তে দক্ষিণ দিকে লণ্ডন ও বাম দিকে গিল্‌ডহল। এই দুইয়ের মাঝখানে লণ্ডনের সামরিক চিহ্ন, তাহার এক দিকে একজন লণ্ডন রাইফল ভোলাণ্টিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ান ভোলাণ্টিয়ার, অন্যদিকে ইংলিশ গার্ডসম্যান ও নেটিভ ইণ্ডিয়ান সৈনিক প্রহরী স্বরূপ দণ্ডায়মান। জাতীয় এবং রাজকীয় পতাকাগুলি কার্ডের বিপরীত দিকে, এবং ইহার নিচে ক্যানাডার সামরিক চিহ্নের একটি অংশ, যথা গোলাপ, ত্রিপত্র ও কাঁটা, নিচে মুদ্রিত Domine Dirige Nos, (প্রভু, আমাদের পথ দেখাও)। নিচের পাড়ে অটাওয়া শহরের ছবি। এটি বাম পার্শ্বে অবস্থিত। দক্ষিণ পার্শ্বে কলিকাতা, ও তৎসহ গভর্মেণ্ট হাউস,

ময়দান, ও অকটারলোনি মনুমেন্ট। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শেরিফদের ও লর্ড মেয়ারের প্রতীক চিহ্ন। কেন্দ্রের পটভূমিতে একটি ভারতীয় খিলান, দুইটি স্তম্ভের উপর চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক পার্শ্বে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান নামক এক আদিবাসী, তাহার পাশে এক ঝুড়ি আনারস সহ একজন নিগ্রো। আরও কিছু দূরে দীর্ঘকায় এক ফার্ণ গাছের নিচে পিছনের দুটি পায়ে ভর করিয়া একটি ক্যাঙারু, একটি মেষশাবক ও একটি এমু পাখী। অন্য দিকে এক অস্ট্রেলিয়ান অশ্বারোহীর কাছে একজন ভারতীয় সহিস দণ্ডায়মান। আরও পশ্চাতে একটি বাঘশিকারের দৃশ্য ইহাতে একটি হাতী ও দুটি বাঘ রহিয়াছে। কার্ডের কেন্দ্রে নিমন্ত্রণ লিপি। কার্ডখানি ক্রোমো-লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত।

বল্-নৃত্যের অনুষ্ঠান ১৮৮৬ সনের ২৫শে জুন তারিখে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অনুষ্ঠানটি খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। ইহাতে প্রায় ছয় হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই লণ্ডন সোসাইটির সেরা ব্যক্তি। অতিথিদিগকে যথারীতি লর্ড মেয়ার দি রাইট অনরেবল জন্ স্টেপলস এফ-এস-এ'র সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। নৃত্য আরম্ভ হইল নয়টার সময়। নাচ সম্পর্কে আমার কিছু বলিবার নাই, কারণ আমি ইহা জানি না, বুঝি না। আমি শুধু নাচের দিকে চাহিয়া ছিলাম, এবং মাঝে মাঝে, যাহারা আমারই মত নাচে যোগ দেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি নাচ চলিয়াছিল।

ট্যালো চ্যাণ্ডলার্স হল-এ একটি শৌখীন সম্প্রদায়ের নাটক দেখিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশে এরূপ অভিনয় অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু লণ্ডনে যাহা দেখিলাম, তাহার সহিত সেগুলির তুলনা চলে না। বৃত্তিগত বিশেষ শিক্ষা না পাইয়াও স্ত্রীপুরুষ যেরূপ সুন্দর অভিনয় করিলেন তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। এমন কি লণ্ডনবাসীরাও, যাহারা উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখায় অভ্যস্ত, তাঁহারাও এই শৌখীনদের অভিনয়ে স্যাভয়, ড্রুরি লেন, অ্যাডেলফি, গ্লোব, গেইটি, প্রিনসেস, কমেডি, হে-মারকেট, স্ট্র্যাণ্ড, কভেন্ট গার্ডেন, অ্যাভিনিউ, এবং অন্যান্য থিয়েটার। প্রত্যেকটির জন্যই আমরা ফ্রী টিকেট পাইয়াছিলাম। এই সব থিয়েটার বিষয়ে আমার বলিবার উপযুক্ত ভাষা নাই। ইহাদের সহিত তুলনায় আমাদের বীডন ষ্ট্রীটের থিয়েটারগুলি ছেলেখেলা বোধ হইবে: এইটুকু মাত্র বলিতে পারি।

দুই দেশের থিয়েটারের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা হইতেই ইউরোপীয়দের এবং ভারতীয়দের কত ব্যবধান অনুমান করা যাইবে। ব্যবধান বিরাট। কিন্তু হায়, আমি আমার দেশবাসীর একটি সম্প্রদায়কে একথা বুঝাইতে পারি না। সীমাহীন প্রজ্ঞার অব্যর্থতা সম্পর্কে অনমনীয় বিশ্বাসই অজ্ঞতা। আফশোশের বিষয় এই যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় এবং ভারতবাসীগণ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রায় সমস্তরে ছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে, বলা উচিত গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহারা অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর আমরা উহাদের অপেক্ষা বহু দূর পিছাইয়া পড়িয়াছি। আমরাও অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু শম্বুক গতিতে। উহারা ছুটিতেছে রেলগাড়ির গতিতে। অবশ্য ইহা সম্ভব এই কারণে যে, পৃথিবীর সকল দিক হইতে ঐশ্বর্য উহাদের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে যে-ফ্রান্স ভাঙিয়া পড়িয়াছে, দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্যারিসের ইডেন থিয়েটারের মত একটি আনন্দ উপভোগের প্রতিষ্ঠান পালন করা সম্ভব হয় কি করিয়া? অস্ট্রিয়া বিদেশ হইতে কোনও সম্পদ আহরণ করিতে পারে না, তবু কেমন করিয়া ভিয়েনাতে ঐ থিয়েটারের মত প্রতিষ্ঠান পালন করে? এমন কি নিঃস্ব ইটালিও ভেনিস, ফ্লোরেন্স এবং রোমে উচ্চাঙ্গের অপেরা হাউসগুলি বাঁচাইয়া রাখে? আমাদের দেশ ইহাদের অপেক্ষা অধিক উৎপাদনকারী দেশ। ফ্রান্সের দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া, বোহেমিয়ার পাইন অরণ্যের দিকে চাহিয়া, জার্মানির রাই ক্ষেতের, দিকে চাহিয়া, দক্ষিণ ইটালির অলিভ উদ্যানগুলির দিকে চাহিয়া আমার মনে হইয়াছে তবে কেন আমরা এত দরিদ্র?

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীগণ স্মরণাতীত কাল হইতে গাছের সন্ত কাটা ডাল দিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘর তৈয়ারি করিয়া তাহাতে বাস করিতে অভ্যস্ত, শীতের দিনে ক্যাঙারুর চামড়া ভিন্ন গায়ে দিবার তাহাদের অন্য কিছু নাই, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহারা কীট পতঙ্গ এবং অন্যান্য কুখাদ্য খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ এখনও এই ভাবেই জীবন কাটাইতেছে। অথচ ইউরোপীয়দের হাতে পড়িয়া ঐ একই দেশ এখন কত ফসল ফলাইতেছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই সব পলিনেশীয়দের মধ্যে কি এখনও কোনও অর্থনীতিবিদ জন্মায় নাই, যে ব্যক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সুললিত ভাষায় এমন কথা প্রচার করিতে পারে যে, তাহাদের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ ইংরেজরা তাহাদের দেশের ঐশ্বর্য লুঠ করিতেছে বলিয়া? আমাদের দেশে এরকম অর্থনীতিবিদ আমরা সকলেই।

ক্রমশঃ

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অবিনাশ দু-একদিন পর পর মুকুট ও জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। মুকুট অনেক ঘণ্টার জন্যই বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে। জয়ন্তীকে অবিনাশ বলে গেল সময় হলে তার ফ্ল্যাটে আবার যেতে, সেখানেই জয়ন্তী স্থির হয়ে বসে কথা বলে। কিন্তু জয়ন্তীও ক্রমশ মুকুটের মত উপদেশের সুরে কথা বলতে চায়—

'অবিনাশ, তুমি বড় একটা বাড়ী নিয়ে কাজটা ভাল করে কর না কেন? কত উন্নতি করতে পারবে তাই ভাবি। শিল্পানুরাগী দলের সঙ্গে আলাপও তো কর না?' অবিনাশ চুপ করে থাকতে পারল না—

'জয়ন্তী, জীবনের আনন্দ কাকে বলে তোমরা কিছু বোঝ না—দিগন্তের মত একটা উন্মাদ আবহাওয়ায় আমি কখনই থাকতে পারতুম না—রাজীও নই। নিজের একটা অস্তিত্ব আছে আমি বিশ্বাস করি। আমার জীবনের আদর্শ একেবারেই অন্য রকম। তোমরা স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় হারিয়েছ, এখন পরাধীনতার সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেছ, সহ্যও করতে পারছ না—আবার গ্রহণ করতেও পারছ না। আমি যখন বিয়ে করব—ঘর বাঁধব, তখন দেখো বাইরের ঝঞ্ঝাট আমার শান্তি নষ্ট করবে না।

জয়ন্তী বুঝল তাদের বাড়ীর কোলাহলের মধ্যে অবিনাশ ভাল কিছুই দেখে না—সে যেন অবিনাশের কথা স্পষ্ট করে বুঝল না এমনই ভান করে বলল—

'আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া তোমার পছন্দ নয় বুঝি? ভাল না লাগার কোন কারণ নেই। কত রকম লোকের আনাগোনা—কখনও আমোদ-প্রমোদও হয় না কি?' নিজের সম্মান রাখার জন্যই, নিজের সংসারের মর্যাদা রাখার উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলল কিন্তু সে যে অন্তর থেকে বেরুল না তা অবিনাশের বুঝতে বাকী রইল না। জয়ন্তী তার সংসার রক্ষার্থে অতিরিক্ত বিড়ম্বনা সহ্য করে সেকথা ভেবে অবিনাশের মধ্যে মধ্যে সহানুভূতি হয় কিন্তু জয়ন্তী তার বিবাহিত জীবনের সংগ্রাম খুলে

আলোচনা করেনি কখনও, তাই অবিনাশ বেশী কিছু বলতে চায় না। অবিনাশ দাঁড়িয়ে ছিল, চলে যাবে বলেই সিগারেটটা ছাইদানীর মধ্যে নিবিয়ে দিল—দেখতে পেল একটা মোটর গেটের ভিতর ঢুকছে—গাড়ীর মধ্যে অনেক লোক। জয়ন্তীও ব্যস্ত হয়ে উঠল। চুল বাঁধা ছিল না, তাড়াতাড়ি খোঁপা জড়িয়ে নিল, চটি জোড়া পায়ে পরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, অবিনাশের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করল—

'এখনি যেও না—একটু বোসো অবিনাশ।

মুকুট তখনও ফেরেনি অবিনাশ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু অপেক্ষা করল। অপরিচিত ভিড়ের মধ্যে পড়ে যাওয়া তার নিতান্তই অপছন্দ কিন্তু সে জয়ন্তীর অনুরোধ এড়াতে পারল না।

মুহূর্তের মধ্যে একটি ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে এলেন এবং বেশ অন্তরঙ্গতার সহিত জয়ন্তীকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম নয় মনে হল। পরণে একটি ঘি রঙের রেশমের শাড়ী তাতে পাড় বা বুটা কিছুই নেই। ব্লাউজটি গাঢ় জাম রঙের—ঘামের দাগ ফুটে উঠেছে চারিদিকে—লম্বায় ব্লাউজটি নিতান্তই খাটো বলে দেহের শৈথিল্য সহজেই চোখে পড়ছে। মহিলা জামার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে হাল্কা লিপস্টিক লাগিয়েছেন। চোখে কাজল রেখা আর ভুরু দুটি ঘন করে টানা। পাউডার একটু অতিরিক্তই দেখাচ্ছিল। সাজসজ্জায় ত্রুটি বিশেষ ছিল না তবু তাঁর বয়স পঞ্চাশের চেয়ে বেশীও হতে পারে মনে হল। হয়ত প্রসাধনের সাহায্যে কয়েক বছর বয়স ঢাকতে পেরেছেন। খোঁপায় ফুল গুঁজতে গুঁজতে বললেন—

'মুকুট কোথায়? আমার নিতান্তই প্রয়োজন তাকে' বলেই শিশুর মত খিলখিল করে হাসলেন, একটু চোখ টিপলেন আর অকারণে মৃদু হাসলেন। উত্তরের আশা না করেই বললেন—

'জয়পুরে একটি চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য মুকুটের সাহায্য নিতে এসেছি, কাল সন্ধ্যায় সে দেখা করবে বলেছিল। কোন খবর দেয় নি তাই আজ চলে এলাম। সঙ্গে গাড়ীতে জয়পুরেরই বন্ধু কয়েকজন বসে আছেন। তুমিই তো মিসেস গুপ্ত? শুনেছি তুমিও আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক?' ভদ্রমহিলা কারুর উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই নানা ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করে গেলেন। অবশেষে জয়ন্তী উত্তর দিল—

'মুকুট এখনই না ফিরতে পারে, দেরী হবে মনে হয়। কিন্তু আপনি কি অপেক্ষা করবেন?'

'নিশ্চয়ই! বসি খানিকক্ষণ, ইতিমধ্যে ছবি দেখাও—মুকুটের নতুন কাজ আছে নাকি কিছু?' অবিনাশ এগিয়ে এসে ভদ্রমহিলাকে বলল—

'একটু চা এনে দিই আপনাকে?' ভদ্রমহিলা অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—

'এই যে নমস্কার ইয়ংম্যান, আপনার পরিচয় তো পেলাম না? মুকুটের আত্মীয় বা বন্ধু বলেই অনুমান করছি।'

'না, আমি আত্মীয় নই, তবে মুকুটের সঙ্গে পরিচয় অনেকদিন। জয়ন্তী ও আমি দুজনেই মুকুটের ছাত্র ও ছাত্রী ছিলাম, একত্রেই কাজ শিখেছি কিছুদিন। জয়ন্তীর স্টুডিও দেখেছেন? সে সুদক্ষ আর্টিস্ট জানেন তো?'

জয়ন্তী কপাল কুঁচকিয়ে অবিনাশের দিকে ইঙ্গিত করল চা নিয়ে আসতে। ভদ্রমহিলা হাতে পেয়ালা নিয়ে বেশ আরাম করে জমিয়ে বসে গল্প আরম্ভ করলেন।

'জয়পুরে একটা আর্টস্কুল আরম্ভ করতে চাই—মুকুট বলেছিল সে বিষয় পরামর্শ দিতে পারে। তোমরা সকলেই এসো আমার সঙ্গে খুবই খুশী হব।' ভদ্রমহিলা রীতিমত আন্তরিকতার সহিত কথা বললেন, সকলকে আপন করে নিতেই তিনি উৎসুক।

'রাজবাড়ীর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে। অনেকদিন বিধবা হয়েছি, ঘরসংসারের বন্ধন কিছুই নেই—বাইরের কাজ-কর্ম নিয়েই থাকি। নিজের সন্তান ছিল না কোনদিন, সতীনদের ছেলেমেয়েদের বড় করে দিয়েছি—এখন একেবারেই একা।'

অবিনাশ কৌতূহলের সঙ্গে অতিথির কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল—চায়ের ট্রে নিয়ে এসে জয়তীর সামনে রাখল। জয়তী কতগুলি চীজ টোস্ট এগিয়ে দিল—চা ঢালতে ঢালতে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল—মুকুটের গাড়ী প্রচণ্ড বেগে বাগানের ভিতর ঢুকছে, ঘরের সামনে এসে সশব্দে থামল। গাড়ী থেকে নেমে এসে মুকুট বলল—

'মিসেস সিং, এত দেরী হয়ে গেল, বড়ই দুঃখিত, তবু যাক আপনি একা পড়েন নি, এঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নিশ্চয়।'

মিসেস সিং অবিনাশ ও জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'এঁরাও সব আসবেন জয়পুরে!—এইমাত্র চা খাওয়ালেন যত্ন করে। আলাপ হ'ল এতক্ষণ।'

মুকুট গম্ভীর মুখে বলল—'জয়তীর মা অসুস্থ হ'ল হঠাৎ মারা গেলেন, উনি বাবার কাছে যাবেন শীঘ্র—আমি একলাই আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।'

অবিনাশের দিকে তাকিয়ে মুকুট বলল—'যাবে নাকি অবিনাশ?'

'না মুকুটদা, আমার এখানে অনেক কাজ। নেমন্তন্নের জন্য অশেষ ধন্যবাদ—অন্য কোন সুযোগে একবার নিশ্চয় যাব।' অবিনাশ কিছুতেই মুকুট ও তার বন্ধুদের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে জড়াতে রাজী নয়। নম্র কথায় নিজেকে ছুটি করিয়ে নিল।

পরের দিন ভোরে মুকুট, মিসেস সিং ও তাঁর দলের সঙ্গে জয়পুর রওনা হল। রাজবাড়ীর একটি বৃহৎ মহলে একখানা বড় আর একখানা ছোট ঘর মুকুটের জন্য ঠিক করা ছিল। চারিদিকে সবই ফিটফাট, প্রতিদিনের আহারাদির বাহুল্য দেখে মুকুট সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিল, প্রত্যহই যেন এক বিরাট আয়োজন।

কয়েকজন শিল্পীকে একত্র করে মুকুট স্কুলের কাজ আরম্ভ করল এবং কিভাবে কাজ চালাতে হবে তার একটি কার্যসূচি করে দিল। প্রদর্শনী সংক্রান্ত কতগুলি সমস্যার সমাধান হবে আশায় বিশেষ আলোচনা সভা বসবে, বহুলোক একত্র হয়েছে। জয়তীর ও তার নিজের কয়েকখানা বড় ছবি মিসেস সিং-এর সঙ্গে ছিল, অল্প-দিনের মধ্যে সেগুলি বিক্রী হয়ে গেল। জয়পুরের বিশিষ্ট খরিদ্দাররা মুকুট ও জয়তীর ছবির বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব লক্ষ্য করল এবং জয়পুরে উভয়ের ছবির বিশেষ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা উচিত বলে পরামর্শ দিল। তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে—তারই উদ্দেশ্য মিসেস সিং মুকুটকে জয়পুর নিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকজন প্রবীণ চিত্রকর সেই প্রদর্শনীর ভার নিয়েছিলেন। মুকুটের সাহায্য পেয়ে তাঁরা খুবই খুশী হলেন। রাজস্থানের ও অন্যান্য স্থানের শিল্পীদের যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে, তাঁদের ছবি সব জড় করা হ'ল। সারাদিন খুঁটিনাটি নানা কাজ করে এসে মুকুট ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সন্ধ্যা হতেই মতি ডুংরির ও লছমন ডুংরির আলো দেখা যায়। এখানে ওখানে প্রাসাদগুলিতে আলো জ্বলে উঠতে—মনোরম দৃশ্য মুকুটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাহাড়ের ওপর যেন দেয়ালির আলো।

মিসেস সিং তাঁর কয়েকটি বান্ধবীকে নিয়ে এসে মুকুটের সঙ্গে আর্ট স্কুলের বিষয় আলোচনা করলেন। মিটিং শেষ হতে মুকুট বেশ কয়েক গেলাস মদ্যপান করল। একাই বসেছিল তাই কতটা যে পান করেছে আন্দাজ করতে পারে নি। মাতাল অবস্থায় কেমন যেন অদ্ভুত চেহারায় মুকুট ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মহিলারা মুকুটকে ঐভাবে দেখে সকলেই মুখ টিপে একটু হাসলেন আর ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। রাজস্থানে রাজ-পরিবারের মহিলারা পানোন্মত্ত পুরুষদের দেখে বিচলিত হন না বরং তাদের বিষয় গর্ব করেই গল্প করেন। একজন বললেন, তাঁর শ্বশুর মহাশয়কে রোজ ধরে কাঁধে চাড়িয়ে নিয়ে আসতে হয়। আর একজন বললেন, এ তো কিছুই নয়—তাঁর খুড়শ্বশুরকে সর্বদাই খাটে শুইয়ে ঘরে আনতে হত, তিনি নিতান্তই বীর পুরুষ ছিলেন, অতিরিক্ত মদ খেয়ে বা অজ্ঞান হয়ে পড়তে তিনি ভয় পেতেন না। মুকুটের অবস্থা দেখে তাঁরা কিছুই অস্বাভাবিক মনে করলেন না—বরং মুকুটও যে বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি তাই

প্রস্থান হল। মৃদু হেসে তাঁরা বিদায় নিলেন। মুকুট সে রাত রীতিমত নির্বিঘ্নে ঘুমুলো।

পরদিন প্রভাতের আলো তাকে নতুন প্রেরণা এনে দিল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খুব ঘুরল—তারপর সারা সন্ধ্যা কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে বসে বিশেষ ভাবে মদ্যপান করল। জয়তী সঙ্গে না থাকায় মুকুটের ভোজন ও পান করা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল এবং সে কখনও কখনও অসুস্থ বোধ করছিল বলে একটু যেন চিন্তিত হয়ে পড়ল। আর্ট স্কুলের কাজগুলি সুসম্পন্ন করে সে খানিক নিশ্চিন্ত হ'ল। মুকুটের প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—মিসেস সিং অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। মুকুট দিল্লী ফেরার জন্য ব্যস্ত, হল।

* * *

এদিকে দেবাশিস দিন গুনছিল। জয়তীকে কাছে পাবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। বহুদিন পর জয়তী পিত্রালয় যাবে। নিজের সংসারে তার দায়িত্বের অভাব ছিল না। 'দিগন্ত'তে এসে অবধি সে আর দিল্লী ছাড়বার সুযোগ পায় নি। জয়তীর ট্রেন ঠিক সময় এসে পৌঁছল। শীলা তাকে বাড়ী নিয়ে এল। দেবাশিস পড়ার ঘরে বসেছিল, জয়তী এসে পৌঁছতেই সে বাবার বুকের ওপর মাথা রেখে শিশুর মত কেঁদে উঠল। এইভাবে সে কাঁদেনি কখনও। যেন বাঁধ ভেঙে পড়ল—দুজনে একটিও কথা বলতে পারল না। খানিকক্ষণ দুজনে নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তারপর দেবাশিস জয়তীর মাথায় হাত রেখে বলল—

'জয়মা, তুমি স্নান করে এস—কাপড় বদলে এস—মার কথা সব তোমার কাছেই বলব।' অল্পদিনের মধ্যে দেবাশিসের যেন বার্ধক্যে ধরেছে, তার চোখে আর তেমন দীপ্তি নেই—ম্লান মুখ, শুষ্ক কপোল, চাপা দুঃখের ঘনছায়া তাকে ঘিরে ফেলেছে। জয়তীকে সে নিজের শোকের কথা বলতে চায় নি—শান্তার পীড়িত অবস্থার কথা সে উল্লেখ করবে না মনস্থ করল। শুধু এই ক'টি কথাই বলল—

'মৃত্যু জীবনেরই একটি অংশমাত্র—জীবনটা অভিজ্ঞতা অর্জনের সুদীর্ঘ পথ মাত্র, একটি জীবনের কাজ ফুরালে আবার অন্য একটি জীবনের কর্তব্য এসে পড়ে, এইভাবে কেবল দেহেরই পরিবর্তন হতে থাকে। মানুষ তাই ক্রমাগত আসছে আর যাচ্ছে, কিছুই ফুরায় না। আমরা মায়া দিয়ে নিজেদের ভুলাই, মৃত্যুকে জীবনের সমাপ্তি বলে ভাবি, তাই নৈরাশ্য, দুঃখ, শোক ও ক্লেশ শান্তি কেড়ে নেয়। পুণ্যস্মৃতি তো কোনভাবেই লুপ্ত হতে পারে না, তবে মৃত্যুকে ভয় করি কেন। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের পরিণতি অতি সত্য হয়ে ওঠে না কি?'

শীলা দেবাশিসের পাশেই বসে কথাগুলি শুনছিল চোখ দুটি নীরবে মুছে নিয়ে বলল—

'পিতামাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না, তাঁরা স্মৃতির ভিতর দিয়ে অমর হন। তাঁদের হারিয়েছি—এ কথা ভাবতেই পারি না। কত শত শৈশবের স্মৃতির মধ্যে দিয়ে ফিরে আসেন, নিঃস্বার্থ প্রেমের বন্ধনে জড়িয়ে আছেন, দূরত্ব কোথাও দেখি না। আমার মার সেই পূত সুন্দর কল্যাণী মূর্তি শুকতারার মত জেগে আছে।'

শোকার্ত দেবাশিস বড় শান্তি পেল, সে বলল-

'শীলামা, তুমি জয়তীকে সান্ত্বনা দিতে পারবে আমি বিশ্বাস করি—কথাগুলি বড় অন্তর থেকে বলেছ তোমার কাছে কাছেই যেন থাকে জয়তী!' কিন্তু সে নিজেই স্থির থাকতে পারল না। চেয়ার থেকে উঠে ঘরেই পায়চারী করতে লাগল। স্নান সেরে নিয়ে জয়তী নিঃশব্দে বাবার কাছে এসে বসল।

মাথা নিচু করে বলতে লাগল 'বাবা, মা কি কি বলে যেতে পেরেছিলেন?'

'একখানা মস্ত ছবি রেখে গেছেন, তোমার খুব ছোট বেলাকার এই ছবিখানা কতবার দেখতেন আর বলতেন —দেখ, জয়তী যেন একটি ছোট্ট পরী। তোমার মা বার বার অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন বলে বড় চিন্তিত হয়েছিলাম। ডাক্তার দেখেই বললেন, হার্টের দুর্বলতা বিছানায় শুইয়ে দিলেন। কথা কমই বলতেন কিন্তু মনে

তাঁর অশান্তি কিছু ছিল না। যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন সেদিনও কোন কষ্ট ছিল না শরীরে। সাজিয়ে তুলে দিলাম সাব জিনিস তাঁকে, কি সুন্দর দেখিয়েছিল যখন সেই লাল পেড়ে গরদের শাড়ীখানা পরিয়ে দিল সকলে। তাঁর হাতে একটি মালা জড়িয়ে দিলাম নিজে হাতে। কোন্ তীর্থে সে একা যেতে পারবে জানি না—তবু তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক এই প্রার্থনা করি। আমায় বলেছিল তীর্থে যেতে ইচ্ছা করে।'

দেবাশিসের চোখেও জল এল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ মুছে আবার সংযত হয়ে জয়তীর দিকে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে নিজের শৈশবের কাহিনী বলতে লাগল। বহুকাল পর আবার কৈশোরের দুরন্ত দিনের কথা তার মনে পড়ে। তার পিতামাতার সঙ্গে কত দেশ-বিদেশে পাহাড়ে সমুদ্রতীরে সে ঘুরেছে—চোখের সামনে সেই সকল দৃশ্য ও ঘটনা যেন সত্য হয়ে ফুটে ওঠে। জয়তী বড় শান্তিতে বাবার কথা শুনছিল—মনের এই সহজ যোগাযোগ তাকে পুনরায় সুস্থ করে তুলবে, সে আশা করল। পিত্রালয়ের প্রকৃত আকর্ষণ আজ গভীরভাবে আজ অনুভব করতে পারল, বাবার কাছে বসে সে অনেক দুঃখও ভুলতে পারল। জয়তী অনুরোধ করল—

'বাবা, তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী চল। মুকুট শীঘ্র জয়পুর থেকে ফিরবে, সে ফেরার আগেই আমি ফিরতে চাই— তোমারও ভাল লাগবে, চল। মুকুটের শরীর প্রায় অসুস্থ হয় আজকাল।'

'কি হয়েছে তার?' দেবাশিস ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করতে জয়তী বলল—

'তুমি তো জান বাবা, তার দুর্বলতার কথা'—দেবাশিস মুহূর্তের মধ্যেই মুকুটের অসুস্থতার কারণ অনুমান করতে পারল—জয়তীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কন্যার জীবনের সংগ্রামের কথা তার কাছে নূতন নয়—তার কষ্ট দেখতে যেতে দেবাশিসের আগ্রহ হয় না—

'জয়তী, এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে আমার শত স্মৃতি জড়িয়ে আছে—এখানেই আরও কিছুদিন থাকি—বাদল ও মাদল খুব জমিয়ে রেখেছে, ওরা দাবা পাশা খেলতে শিখেছে—প্রায়ই আমায় হারিয়ে দেয়। বরং মুকুট ও তুমি কিছুদিন এইখানে এসে থাকো—বিশ্রাম পাবে দুজনেই। তাছাড়া এই বাড়ীতেই তুমি মানুষ হয়েছ, মুকুট তো এ বাড়ী ভাল করে দেখেনি। আমরা তিনপুরুষ এ বাড়ীতে একত্রে আছি।'

কলকাতায় থাকতে থাকতেই জয়তী অবিনাশের কাছ থেকে একটি লম্বা চিঠি পেল। দিল্লীর খবর বিস্তৃতভাবে দিয়েছে সে। চিঠিখানার সুর যেন ঠিক অন্য চিঠিগুলির মত নয়। তার নিজের বিষয় অনেক লিখেছে—

'জয়তী, তোমাদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি যে তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের অভাব বোধ করতে আরম্ভ করেছি। এবার দিল্লীতে এসে দেখবে, আমি ambition অর্থাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কথাটির অর্থ বুঝতে পেরেছি। এবার ভাবছি সংসার পেতে বসব মুকুট ঠিকই বলেছে, নইলে কাজে প্রেরণা আসে না। তোমাদের নিকটে পেয়েছিলাম আমার সৌভাগ্য, এবং চিরকাল এদিনগুলির স্মৃতি আমায় আনন্দ দেবে। আমি অধিক বিষয়েই উদাসীন এ কথা হয়ত সত্যি, খুব একটা জোর দিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করিনি কোনদিন। বন্ধুদের সঙ্গেও মিশেছি স্বাভাবিক সহজ ভাবে—মতামত খুব জাহির করিনি কোন বিষয়। জাতিভেদ, পদমর্যাদা, বয়স, চাকরী, এ কোন কিছুই বিচার করিনি—বন্ধুত্বর মাপকাঠি আমার নেই বললেই হয়। তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও সেইভাবেই হয়েছে। কিন্তু আমার অনেক বন্ধুদের নিয়ে তুমি কঠিন সমালোচনা করেছ—রাগ করেছ। অনিতাকে নিয়ে আমায় রীতিমত গালাগালি দিয়েছ। অনিতার বাবা ভারতীয় কিন্তু তার মা ফরাসী মহিলা। তিনি অনিতার বাবাকে ছেড়ে চলে যান এবং অনিতার বাবা বিদেশে বাস করতে শুরু করেন। মেয়েটিকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলেন তার ভাগ্য খুঁজে নেবার জন্য। আমেদাবাদে হঠাৎ এক জায়গায় আলাপ হ'ল। একটি শিল্প-কেন্দ্রে দুজনেই কাজ করছিলাম।

সেই থেকে সে আমার খোঁজ রাখে—পেছু পেছু ঘোরে। তার জীবনের কোনদিকেই স্থিরতা নেই—না আছে ঘর, না পেয়েছে স্নেহ ভালবাসা, না আছে আত্মসম্মান বোধ। এ রকম মেয়েদের দেখলে রাগের চেয়ে করুণা হওয়াই স্বাভাবিক—কিজন্য সে অস্বাভাবিক ব্যবহার করে আমি বেশ বুঝি—এবং তুমিও এখন জানলে। এ রকম গৃহহীন, ভবঘুরে, ছন্নছাড়া মেয়ে ও পুরুষের সঙ্গে কখন কখন আলাপ হয়ে যায়—তাদের গুণও অনেক আছে আর মানুষও মন্দ নয়। ভাগ্য তাদের মন্দ বলে তাদের অবজ্ঞা করতে পারি না। যথন সাধ্যে কুলায় সাহায্য করি। তুমি যে-সব সুযোগ পেয়েছ জীবনে, অনেকেই সে-সকল সুযোগ পায়নি, তুমিই তো সহানুভূতি বোধ করবে, সেই তো স্বাভাবিক। যাহোক, তোমরা শীঘ্র ফিরে আসবে আশা করি, আমায় ভুল বিচার করবে না এই বিশ্বাস রাখি।

জয়তী চিঠিখানা বেশ কয়েকবার পড়ল—এবং নানান অর্থ খুঁজতে লাগল। 'অনিতার সঙ্গে বন্ধুত্বের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্যই এ চিঠি লেখা। অবিনাশের লজ্জা হওয়া উচিত।' মনে মনে এই কথাগুলি বলতে লাগল। চিঠিখানা জয়তী দ্বিতীয়বার পড়ল এবং খামের ভেতর ঢুকিয়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। বালিশের নিচে ব্যাগ রেখে শুতে গেল। পরের দিন বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে, তার মনে শান্তি নেই কিন্তু ফিরে তার যেতেই হবে। দেবাশিস মনকে দুর্বল হতে দিল না। কন্যাকে ফেরার পথে একটুও বাধা দিল না।

ঊষার আলো অতি ক্ষীণভাবে উঁকি দিচ্ছে। দু-একটি পাখীর ডাক দূর থেকে শোনা গেল। দেবাশিস উঠে ঘরের বাইরে পায়চারি করতে লাগল। জয়তী পায়ের ধুলো নিতেই দেবাশিস আর স্থির থাকতে পারল না। বাবার এত বিমর্ষ মুখ জয়তী কোনদিন দেখেনি—নিজেও সে কাঁদতে কাঁদতে দিল্লী রওনা দিল। শীলা শ্বশুর মশায়কে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর এসে বসল। দায়িত্বপূর্ণ জীবনের সুকঠিন পথগুলি পার হতে হতে শীলা অসীম ধৈর্য লাভ করেছে। অন্তরের গভীর স্নেহমমতা দিয়ে আশপাশের সকলকে সে ঘিরে রাখতে চায়। অপূর্ব এক নিঃস্বার্থ প্রেম তাকে নিজের জীবনের শূন্যতার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছে। সে আর এখন ক্লিষ্ট নয়, মানসিক দুঃখকষ্ট তাকে বিশেষ দুর্বল করতে পারে না। বৃদ্ধ দেবাশিস ক্রমশঃ শীলার ওপরই নির্ভর করতে লাগল, শীলাও সান্ত্বনা পেল। ক্রমশঃ

পুণা আশ্রমে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডানলাভিল কটেজ-এ যখন অভাব-অনটনের মধ্যে ছিলাম তখন তিনচারবার কলকাতায় কালীদার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম তাঁর ওখানে গিয়ে, তিনিও আসতেন এলগিন রোডে মিলন সেন-এর ওখানে আমার গান শুনতে। এতে আমি বিশেষ উৎসাহ পেতাম, কারণ, সেসময়ে আমার আর্থিক অবস্থা ঠিক শোচনীয় না হ'লেও আমার শুভার্থীরা বলাবলি করতেন, আমি খুব ভুল করেছি পণ্ডিচেরির আশ্রম—গুরুস্থান—ছেড়ে এসে। কেবল কালীদাই হৃষ্ট হয়েছিলেন, আমাকে সঘনে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন: "মা ভৈঃ, আপনাকে কোনো সাধু বা গুরুই বাঁধতে পারবেন না—আপনি নিজের পথ নিজেই কেটে নিয়ে চলবেন।" কেন একথা বলেছিলেন সে-সময়ে তা বুঝতে পারিনি। কারণ, আমার (সে-সময়ে) মনে হ'ত যে, আমার জীবনের বিকাশ আর হবে না, গুরুহীন নিঃসহায় দিলীপকুমারের শেষ জীবনটা হয়ত ঠিক অনশনে না কাটতেও পারে, কিন্তু পণ্ডিচেরিতে যেমন রাজার হালে ছিলাম সে-রকম বিশ্বাস-বলীয়ান্ ও কাব্যসমৃদ্ধ জীবন আর ফিরে আসবে না। কিন্তু উপায় কি? পিতৃদেবের একটি বিষণ্ণ গান প্রায়ই মনে জাগত:

জগৎ যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না আর তায়।
নিয়ে যায় সব ভেঙেচুরে, শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।

তাই এই সময়ে ইন্দিরার নানা অধ্যাত্ম উপলব্ধি—বিশেষ ক'রে বারবার ঠাকুরের মহাপ্রসাদ লাভ—আমাকে ভরসা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরে যে দু-চার-জন বন্ধুর সমর্থনে আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলাম তাদের পুরোধা ছিলেন শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, কালীদা, কৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীরামদাস। এঁদের কথা আমি অন্যত্র লিখেছি। কিন্তু এঁদের কথা থেকে ঠিক কী পাথেয় পেয়েছি তার হয়ত হদিশ দিইনি স্পষ্ট ক'রে। তাই বলি—শ্রীগোপীনাথের বাণী থেকে আমি পেতাম ভরসা, কৃষ্ণপ্রেমের বাণী থেকে—আশ্বাস, শ্রীরামদাসের কাছ থেকে আশীর্বাদ আর কালীদার কাছ থেকে অনাবিল স্নেহের সমর্থন। এ-স্নেহ তিনি আমাকে অকুণ্ঠে দিতেন এই জন্যে যে, তিনি—বিশেষ ক'রে ইন্দিরাকে চিনতে পেরে—আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি নিঃসংশয় হয়েছিলেন। কী ভাবে ছোটখাটো নিদর্শনে তিনি তাঁর স্নেহ বোঝাতেন একটা দৃষ্টান্ত দেই।

১৯৫৩ সালে ৮ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রে আমরা জাপানমুখী বিমানে আমেরিকা রওনা হই দিল্লী থেকে। কালীদাকে জানিয়েছিলাম একথা। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন যে এ-বিমান দমদমের বিমান ঘাঁটিতে ৯ই তারিখে ভোর সাড়ে চারটেয় পৌঁছবে। দমদমে পৌঁছে বিমান থেকে নামতেই অবাক্, স্বয়ং কালীদা—সঙ্গে নলিনীদা (নলিনীকান্ত সরকার) ও শ্রীসুধীর সরকার (এম সি সরকার পাবলিশার্সের কর্ণধার)। আমি নামতেই অভিনন্দন: "Bon voyage!" (শুভযাত্রা!)

ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু মস্ত মহিমা। ঐ শীতের রাতে দশ পনরো মাইল ডিঙিয়ে আমাদের বিমানের জন্যে অপেক্ষা করা—শুধু আমাদের অভিনন্দিত করতে—এ কেবল কালীদার পক্ষেই সম্ভব। মনে আছে ইন্দিরা ও আমার উভয়ের চোখেই জল এসেছিল। আসবে না? কোথায় চলেছি সুদূর আমেরিকায়—সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে—সেখানে আমাদের কী গতি হবে কিছুই

জানি না। ভরসা কেবল কন্যাশিষ্যা ইন্দিরার উজ্জ্বল আত্মিক সমর্থন ও স্নেহনিলয় কালীদার মধুর গভীর আশীর্বাদ!

* * * *

বিশ্ব ভ্রমণান্তে দেশে ফিরে কোথায় আমরা থাকব, কী করব, সবই অজানা। যেটা চোখে-দেখা-যায় সেটা শুধু এই যে, আমার সাধনা হঠাৎ গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর বিষাদের আঁচল কুয়াশার দিকে ধাবমান,—সে-কুয়াশার ওপারে কী আছে কে বলবে? এই সময়েই কালীদা ভরসা দিয়েছিলেন তাঁর শক্তিমান স্নেহময় আশ্বাসে যে, আমি পণ্ডিচেরি ছেড়ে ভুল করিনি—আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে অন্য পথে।

এর পরেই হঠাৎ অনিকেত দুঃস্থ দিলীপ আশ্রয় পেল ডানলপ্‌ ভিল কুটিরে। হোক না সে-কুটির ভগ্নপ্রায়, মূষিক-অধ্যুষিত, ঝরুক না বর্ষায় প্রতি পদে নির্ঝরধারা, দারিদ্র্য দেখাক না ভয়, আত্মবিশ্বাস উঠুক না থেকে থেকে টলমল ক'রে—পণ্ডিচেরি ছেড়ে ঠিক করেছি না ভুল করেছি ভেবে,—ইন্দিরার মতন শিষ্যা যখন মিলেছে ও ডানলপ্‌ ভিল কটেজে সাময়িক আশ্রয় যখন পেয়েছি তখন একান্তী হ'য়ে সাধনায় মন বসালে কি "কল্যাণকৃৎ"-এর সত্য সত্যি দুর্গতি হ'তে পারে?—জপতাম আমি প্রাণপণে।

এই সময়েই এল আশ্বাস—না চাইতেই মিলে গেল—এর নাম যদি করুণা না হয় তবে করুণা কী বস্তু? আমার একটি গানে লিখেছিলাম:

"না চাইতে যে গো সকলি মিলিল
অহেতুক প্রেমে দিলে গহনে।"

কিন্তু যার অহেতুক প্রেমাশিস ছিল আমার সাধনার দৃঢ় ভিত্তি সেই গুরুই যে নেই আর—পায়ের নিচের মাটি উঠবে না কেঁপে? আমার মনে হয়—ইন্দিরার মাধ্যমে ঠাকুর যে আমাদের বার বার মহাপ্রসাদ দিলেন, অঘটনের পর অঘটন ঘটিয়ে তাঁর করুণাকে প্রত্যক্ষ করালেন, নানা সাধুসন্ত মহাত্মার আশীর্বাদ বিতরণ করলেন— এ সবই শুধু আমার আত্ম-অবিশ্বাসী সংশয়কে দাবিয়ে প্রভাতের আলো জাগাতে—তা ছাড়া কি? শ্রীঅরবিন্দ আমাকে উঠতে বসতে নানা যুক্তি ও নিজের অভিজ্ঞতার নজির পেশ করতেনও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই—ঠাকুরের করুণায় বিশ্বাসকে ষোলো আনা আঁকড়ে ধরাতে। তাই বারবারই বলতেন আমাকে যে, যোগ আমার স্বধর্ম, ভগবান্‌ আমাকে সংসার থেকে ছিনিয়ে আনেন নি যোগ নামে এক মরুভূমিতে অনাহারে শুকিয়ে মারতে।

কিন্তু যখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন অকস্মাৎ তাঁর দেহান্ত হ'ল তখন আমার বিশ্বাস কিছুতেই পারছিল না টাল সামলাতে: আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে, তাঁর পূর্ণযোগের অন্তিম সিদ্ধির আগে তিনি এমন হঠাৎ মহাপ্রয়াণ করবেন। এ-পূর্ণ সিদ্ধির তিনি নাম দিতেন অতিমানস (supramental) শক্তির অবতরণ তথা এক নব মহাজাতির অভ্যুদয়—advent of the Superman। তাঁর ভাষায়, এ-অবতরণের ফল হবে (Savitri Book XI):

The man and superman shall be at one,
And all the earth become a single life.
মানব অতিমানব সে-সুলগ্নে হবে একীভূত,
চলাচল হবে এক মহাজীবনের অভ্যুদয়।

আমার নিরাশা আসত জগতের গভীরায়মান অধোগতি দেখে। অতিমানব বা অতিমানস শক্তির কোনো দেশাচিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না—এই-ই কি শ্রীঅরবিন্দের চল্লিশ বৎসরের তপঃসিদ্ধির ফল? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবদ্দশাতেই মানব ও অতিমানবের রাখীবন্ধন হবে, যার ফলে "স্বর্গ নামিয়া আসিবে মর্ত্যে, স্বর্গে উঠিবে ধরণী"। বদ্ধমূল বিশ্বাসে ঘা খেলে মানুষ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়। তাই আমার মনে থেকে থেকে ঘনিয়ে উঠত আত্ম-অবিশ্বাস ও সংশয় যার পরিণাম হতাশা।

এই সময়েই ইন্দিরা এসে (কালীদার ভাষায়) আমার ভার নিল, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে চাক্ষুষ করলাম এক দিব্য জ্যোতি যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি তার নানা ভজন

ও বাণী—মীরার বাণী যা আমি পরে প্রকাশ করি শ্রুতাঞ্জলিতে। এ-বইটি কেমন করে জানি না রামকৃষ্ণ মিশনের মহাত্মা স্বামী মাধবানন্দের হাতে পড়েছিল। আমি যখন প্রথম বেলুড় মঠে যাই ইন্দিরাকে নিয়ে তখন স্বামীজীকে ইন্দিরার পরিচয় দিতেই তিনি বললেন: "জানি। আপনি ভাগ্যবান্ পুরুষ দিলীপবাবু, তাই শ্রীঅরবিন্দের মতন গুরু ও ইন্দিরার মতন শিষ্যা পেয়েছেন।" আমি উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম: "ইন্দিরার সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন যে এ কথা বলছেন?" উত্তরে তিনি হেসে বললেন: "শুধু আমি নয়, আরো অনেকেই জানেন যে, ওঁর মধ্যে অসামান্য কর্মনৈপুণ্য ও সাধনশক্তির বিরল সমন্বয় হয়েছে।"

সে সময়ে তিনি বেলুড়ের অধ্যক্ষ। তাই তাঁকে বলেছিলাম আমি: "স্বামীজী, আপনার শ্রীমুখ থেকে এ কথা শুনে আমি গীতার ভাষায়—হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ, হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ—ডবল হর্ষ।"

অতঃপর মন্দির গড়ার নানা অচিন্তনীয় যোগাযোগ হয়ে গেল—সে আর এক অঘটনের কাহিনী। তবে সে-কাহিনী বলবার এখনো সময় আসেনি। তাই শুধু বলি – হঠাৎ চমৎকার জমি পাওয়া গেল সস্তায়। এক মারাঠী বন্ধুর সহায়তায় মিলে গেল চমৎকার আর্কিটেক্ট ও কনট্রাক্টর।

কী আনন্দ! কী আনন্দ! মন্দির গড়া শুরু হ'ল। ডন ও রিচার্ডকে লিখে দিলাম, মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হ'লেই তাদের ডাক দেব। তারা পরমানন্দে পরে এক বৎসর বাদে এসে হাজির হ'ল।

মন্দির গড়া শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে এপ্রিল মাসে, সমাপ্ত হ'ল ১৯৫৯ সালে জানুয়ারি মাসে—ঠিক আমার জন্মদিনের তিন দিন আগে। গৃহপ্রবেশ করলাম ধুমধাম ক'রে ঠাকুরের বিগ্রহ পাল্কিতে বহন ক'রে সারা রাস্তা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" গাইতে গাইতে।

অতঃপর ইন্দিরার ফরমাশ মত গড়া হ'ল মনোহর বেদী, মাঝখানে কৃষ্ণ, দুধারে শিব ও ভবানী। এ-বিগ্রহ তিনটিই আমরা কাশীতে কিনেছিলাম। কিন্তু রাধারাণীর কোনো সুন্দর বিগ্রহ কোথাও পাইনি, শেষে তিনি ইন্দিরাকে দর্শন দিয়ে বললেন: "আমাকে পাবে জয়পুরে।"

কিন্তু জয়পুরে যাওয়া সহজ নয়—তবু না গিয়ে করি কী যখন রাধারাণী ডেকেছেন? প্রার্থনা করতে ব'সে গেলাম যেন জয়পুরে যেতে পারি অবিলম্বে। সুযোগও মিলল অভাবনীয় ভাবে: ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী থেকে পণ্ডিতজীর ডাক এল টেলিফোনে—রেডিওতে স্বদেশী সঙ্গীত গাওয়াই চাই। পুনা রেডিওতে পিতৃদেবের "ভারত আমার", "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" ও "আমার জন্মভূমি" গাইলাম মূল বাংলায় ও ইন্দিরার হিন্দী অনুবাদে। ইন্দিরার তিনটি স্বদেশী গানও গাইলাম হিন্দীতে: "হম ভারতকেহি রখবালে", "নিশ্চি উচা কদম বঢ়া" ও "জীবন কে পায়া জিস লিয়ে"।১

তারপর ১৯৬৫ সালে সদলবলে ডন রিচার্ডকে সঙ্গে ক'রে গেলাম দিল্লী হয়ে জয়পুরে। সেখানে আমরা বারো জন অতিথি হলাম তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রীসম্পূর্ণানন্দের রাজভবনে। সেখানে গান গেয়ে সৈনিকদের জন্যে কিছু টাকা তুললাম—ইন্দিরা ডন ও রিচার্ডের সঙ্গে কোরাসে গেয়ে। ওদের হিন্দী ভজন ও সংস্কৃত স্তোত্র গাইতে শিখিয়েছিলাম।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ভাগ্য—গান গাওয়া নয়—জয়পুরে রাধারাণীর একটি অতি চমৎকার মর্মর মূর্তি পাওয়া। কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে পড়ে যেত: রাধারাণীকে সত্যি ডাকলে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না।

আজও ভাবতে অবাক্ লাগে—কি ক'রে এ-অসম্ভব সম্ভব হ'ল—নিবান্ধব বিদেশে মন্দির গ'ড়ে ওঠা, নিঃস্বের হওয়া রাজ-অতিথি! এরপরে কি সংশয় পোষণ করা চলে যে, ভাগবতী করুণা অঘটনঘটনপটীয়সী?—খৃষ্টের ভাষায়:

"With men this is impossible; but with God all things are possible"—

মানুষ যা পারে না ভগবান্ পারেন ব'লেই না তিনি ভগবান্।

ঢের পরের কথা আগে ব'লে ফেললাম। স্মৃতিচারণে এক-একটা স্মৃতির সুতো আসে যেন রিলের পশমের মতন—একটু টানলে সবটুক খুলে আসে—তখন সবটুকুর তদারক করতেই হয়। আমার মনে হয় এই উক্তিই সহজ—"জো আপসে আয়। উসকো আনে দেও"—যে নিজে থেকে আসছে তাকে আসতে দাও না। তবে এ-ভঙ্গিমার যেমন সুবিধা আছে তেমনি মুস্কিলও আছে—নানা কথার পুনরুক্তি হয় অজান্তে। সব সময়ে তো মনে থাকে না কখন কী বলেছি কোন্ কনটেক্স্টে? মরুক গে, এ-অ্যাপলজি তো করেছি একাধিকবার—আর কেন এ-বিড়ম্বনা? ফিরে আসি ডানলাউন কটেজের প্রসঙ্গে।

১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পরম ভাগবত শ্রীরামদাস তাঁর কন্যাশিষ্যা মাতাজী কৃষ্ণাবাঈকে নিয়ে আমাদের মন্দিরে ছিলেন তিন দিন। এ-তিনটি দিন যে কেমন ক'রে কেটে গেল আনন্দের ঝড়ে—মনে পড়ে পিতৃদেবের কবিতা (আলেখ্য—বিধবা):

সুখের বছর হয় যে গত একটি ছোট দিনের মত,

দুখের বছর যুগের মত কাটে।

আবহমানকাল এই মানুষের অভিজ্ঞতা হয়ে এসেছে সব দেশেই। মনে হয়, জীবনদেবতার এই বিধির একটি উদ্দেশ্য—গভীর আনন্দকে বিরল ক'রে মহার্ঘ করা। যা সুলভ তার সুখ অভ্যাসবশে থিতিয়ে হয়ে দাঁড়ায় বড় জোর সোয়াস্তি। কিন্তু যে-আনন্দ বিরল সে থিতিয়ে কোনো স্পষ্ট ক্ষতিপূরণ বহন ক'রে এনে দেয় না—মহানন্দের উপসংহার নীরসতায়, আক্ষেপে—কি পেয়েছিলাম কিন্তু হারিয়ে দেউলে হয়ে ব'সে আছি। শেলির খেদ কার না বুকের তারে বেজে ওঠে: Rarely rarely, comest thou, spirit of delight!

শ্রীরামদাসের নন্দিত অভ্যুদয়ের অন্তে আবার ছেয়ে এসেছিল নীরসতার ধূসর মেঘ, মনে হ'ত তখন শেলির এই চিরস্মরণীয় খেদ—যার অাঁখর দেওয়া চলে:

দেখা দাও কয়বার আনন্দের হে প্রাণ-প্রতিমা!

আমাদের দৈনন্দিন নীরস অন্তরে

কদাচিৎ অন্তে ক্ষণতরে

বারিদে বিজলী সম ঝলকিয়া তোমার মহিমা

কোথায় লুকায় নাহি জানি:

পথ চেয়ে থাকি শুধু জাপি' সে-মধুর স্মৃতিখানি!

সত্যিই শ্রীরামদাস ও মাতাজীর যে আবির্ভাব হ'তে পারে আমাদের অর্ধভগ্ন কুটিরে, আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। কিন্তু এরই তো নাম করুণা—স্বপ্নের অতীত স্বপ্ন যে জাগরণে নামে এই অঘটন। লোক না সে ক্ষণতরে অসীম—আতিথ্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে যান শুধু তো অসীমেরই তৃষ্ণা জাগাতেই।

উচ্ছ্বাস? কিন্তু আশার অতীত করুণা যখন মহাসাগর মূর্তিতে ঝলকে ওঠে তখন সে-আনন্দকে উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কার মালা দিয়ে বরণ করব? ভাগবতের ঋষিও কি বলেন নি সোচ্ছ্বাসে যে, সাধুরা আসেন ব'লেই তীর্থ গ'ড়ে ওঠে? (১।১৩।১০)

শ্রীরামদাস সম্বন্ধে আমার উচ্ছ্বাসের মূলে আছে শুধু হৃদয়াবেগ নয়, কৃতজ্ঞতা। তাঁর শুধু সান্নিধ্যে নয়, তাঁর আশীর্বাদে আমার একাধিক পরম উপলব্ধি হয়—তাঁর কথামৃতে সত্যিই পেয়েছিলাম সুধাস্বাদ—বিশেষ ক'রে পুণায়। কত কথাই যে তিনি বলতেন অনর্গল—তাঁর দীক্ষার কথা, পরিব্রাজক জীবনের কথা, নানা অঘটনের কথা, সর্বোপরি—হরিনামের মাহাত্ম্যের কথা। বহুবারই তাঁর মুখে শুনেছি যে, তিনি শুধু "শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম" এই গুরুমন্ত্র জপ ক'রেই পরাভক্তি লাভ ক'রে শেষে সর্বভূতে ঠাকুরকে দেখেছিলেন—শুধু ক্ষণতরে নয়, চিরতরে। ভাগবতে ও নানা ভক্তিশাস্ত্রে আশ্বাস পাই যে, কলিযুগে শুধু হরিনামেই বস্তুলাভ হ'তে পারে: এ কথার মূর্ত প্রমাণ শ্রীরামদাস। এবার একটু পেছিয়ে যেতে হবে—তাঁর আশ্রমে কি ভাবে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বলতে।

তাঁর কয়েকটি বইয়ে তাঁর নানা দৈবী উপলব্ধির কথা প'ড়ে আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে যাই তাঁর "আনন্দাশ্রমে"—কেরলে।

আশ্রমটির পরিবেশ অতি সুন্দর—সবুজের আগুন লেগে থাকে প্রায় সোমবৎসর—বর্ষায় তো কথাই নেই। আমি গিয়েছিলাম বর্ষার অন্তে শরৎকালে। দুটি পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে চাঁদ উঠল—যেন শৈলবালার কপালে সোনার টিপের মত—আজও ভুলতে পারি নি সে-সৌন্দর্য। অদূরে নীল সমুদ্রের ক্ষীণরেখা কালিদাসের অবিস্মরণীয় শ্লোক মনে করিয়ে দেয়:

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা"
দূর দিগন্তে তমালতালীর অনিন্দ্য বনরাজি
তন্বীর মত শোভা পায় যেন সুনীল বসনে সাজি'।

তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রথমেই: "ভগবানকে পাওয়ার উপায় কি?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন: "তাঁর জন্যে পাগল হওয়া (to be Godmad)। কি রকম জানো? তুমি ছুটেছ ট্রেণ ধরতে—সময় কম, পথে একজন ডাকল—'শোনো হে, কথা আছে!' তুমি চেঁচিয়ে বললে: 'থাক্, পরে হবে—এখন ট্রেণ ধরি তো আগে।' যখন মনে হবে—আগে ভগবানকে পাই তো—তারপর আর সব, অর্থাৎ তাঁর স্থান সবার উপরে, তাঁকে পেলে তখনই আর সব পাওয়া সার্থক হবে,—তখনই তিনি ধরা দেবেন।"

মনে পড়েছিল খৃষ্টদেবের একটি অমূল্য বাণী:

"আগে ভগবানের রাজ্যে পৌঁছানো চাই তারপর আর সব কাম্য বস্তু মিলবে—পাবে ঠাঁই মর্ত্যলোকে।৩

শ্রীরামদাস এক কথায় সন্ন্যাসী হয়েছিলেন—ঠাকুরের স্বর শুনে: "সব ছেড়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়।" গুরুমন্ত্র জপ ক'রে তাঁর মনে নেমেছিল অফুরন্ত আনন্দনির্ঝর। দিব্যোন্মাদ। ভয় কিসের? আমাকে বলেছিলেন তিনি দেয়াল-আঁটা গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোক দেখিয়ে: "এ যে সাক্ষাৎ রামের অঙ্গীকার—রামদাস অনুভিবার উপলব্ধি করেছে তার জীবনে।" (তিনি 'আমি' বলতেন না, প্রতি মানুষকে ডাকতেন 'রাম', নিজেকে 'রামদাস') শ্লোকটি এই:

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
অনন্য মনে করে যে জীবনে আমার ধ্যান ধরায়,
চিরদিন তার বহি আমি ভার ঠাঁই দিয়ে তারে পায়।

তাঁর আশ্রমে আমি সাত-আট দিন ছিলাম—যার বিবরণ অন্যত্র লিখেছি ফলিয়েই। তাই এখানে শুধু উপক্রমণিকা হিসেবেই তাঁর উত্তরের চুম্বকটুকু পরিবেশণ করব। ক্রমশঃ

১। "কম ভাইকে" ছাপা হয় পরে "সুধাঞ্জলি"-তে; "নিশা উষা" ও "জীবন কৈ পায়া"—"শতাঞ্জলি-প্রেমাঞ্জলি"-তে। এ গান তিনটির অনুবাদ ছাপা হয় "ভাবাঞ্জলি"-তে ১৩৭২ সালে।

২। ওরা দুজন প্রথম পুণায় হরিকৃষ্ণ মন্দিরে এসেছিল—২৩।৪।৫৯, নিউইয়র্কে ফিরে গিয়েছিল—২৩।৪।৬০। দ্বিতীয়বার এসেছিল ১৩।৭।৬২, ফিরে গিয়েছিল ১৮।৫।৬৩। তৃতীয়বার এসে একবৎসরেরও বেশি ছিল ৩০।৬।৬৬—থেকে ৫।৭।৬৭।

৩। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness; and all these things shall be added unto you......St. Matthew.

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

শ্রীবিমল সিংহ

"মানুষ অস্ত্রকার জীব (man is a tool making animal)" ।

জৈব-বিবর্তন (biological evolution) এবং সমাজ বিবর্তন (social evolution)-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা "শ্রম" (labour), মূলধন (capital), প্রকৃতিজ সম্পদ (যাহাকে অর্থশাস্ত্রে "land" আখ্যা দেওয়া হয়) ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীয় সংজ্ঞার যথার্থ তাৎপর্য্য, ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং বৈষয়িক সমাজ সংগঠনে ইহাদের ভূমিকা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা দেখিয়াছি যে, ছয়-সাত কোটি বৎসর পূর্বে বৃক্ষাশ্রয়ী এক শ্রেণীর চতুষ্পদ প্রাণী ক্রমে দ্বি-বাহু শাখামৃগে পরিণত হইয়া, প্রায় দুই কোটি বৎসর আগে ভূমিতে অবতরণ পূর্বক ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল হন, এবং ইহাদেরই একটি বিলাঙ্গুল শাখা সম্ভবতঃ বিশলক্ষ বৎসর আগে পেছনের পা দুইটিকে প্রধানতঃ দেহভার বহনে এবং সামনের হাত দুইটিকে প্রধানতঃ আহরণ, শত্রু হনন, আত্মরক্ষা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রাখেন। ক্রমে তাঁহারা শুধু পদদ্বয়ের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে, হাঁটিতে এবং দ্রুত দৌড়াইতেও সমর্থ হন। আর দেহভার বহনের দায়িত্ব মুক্ত বাহুদ্বয় কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদি দেহাতিরিক্ত প্রত্যঙ্গের (extra-corporeal limbs) ব্যবহারে উত্তরোত্তর দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রতা অর্জন করে। ক্রমে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদির স্থলে ঐগুলিকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তিত করিয়া কৃত্রিম অস্ত্র প্রস্তুত শুরু হইল। দলবদ্ধ ভাবে বাঁচিয়া থাকার সংগ্রামে পরস্পর ভাববিনিময়ের অপরিহার্য্য তাগিদে বিচিত্র খণ্ডিত ধ্বনিময় (articulate speech) ভাষারও উদ্ভব হইল।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, সময়কে যেখানে লক্ষ অথবা কোটি বৎসরের অঙ্কে প্রকাশ করিতে হয় সেখানে কোন ঘটনার প্রকৃত আতীত্য নির্দ্ধারণ সহজ নহে, এবং সার্থকও নহে। কারণ আমাদের নিকট একলক্ষ অথবা দশলক্ষ বৎসর সমান কথাই। যে বৃক্ষাশ্রয়ী চতুষ্পদ প্রাণীর শাখা হইতে ক্রমে মানুষের উদ্ভব, সেই মূল শাখাটিকেই সম্ভবতঃ জীব-বিজ্ঞানীরা "প্রাইমেট্‌স্‌" (Primates) সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। তার পরবর্ত্তী পর্য্যায়ক্রমিক প্রশাখাগুলিকে যথাক্রমে "দ্বিপদ প্রাণী" (Anthropoidea), "নরাকৃতি প্রাণী" (Hominoidea), "দণ্ডায়মান (অর্থাৎ "দণ্ডের মত খাড়া") দ্বিপদ" (Homo erectus), "বুদ্ধিমান্ দ্বিপদ" (Homo sapiens), "যথার্থ বুদ্ধিমান্ মনুষ্য" (Homo sapiens sapiens) ইত্যাদি সংজ্ঞায় ভূষিত করা হয়। এই ক্রমবিকাশের ঠিক কোন্ পর্যায়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা "মানুষ" পদবাচ্য হইতে পারেন, তাহা নিশ্চিত ভাবে নির্দ্দেশ করা দুরূহ। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার রাজনীতিজ্ঞ (diplomat), বিজ্ঞানী (তড়িৎ-এর আবিষ্কার-এর সহিত যাহার নাম জড়িত), উদ্ভাবক (inventor), এবং চিন্তানায়ক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin)-এর একটী আপ্তবাক্যকে কার্ল মার্কস মানুষের সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা এই যে "মানুষ শস্ত্রকার জীব" (man is a tool making animal)। অর্থাৎ ক্রমবিকাশের যে পর্য্যায়ে আসিয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদির পরিবর্ত্তে ঐগুলিকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তরিত করিয়া কৃত্রিম অস্ত্র প্রস্তুত এবং ব্যবহার শুরু করিলেন ঠিক সেই পর্য্যায়েই তাঁহারা "মনুষ্যত্ব" লাভ করিলেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, ঐ বিশেষ পর্য্যায়টাও সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ বৎসরের ব্যাপার

কারণ, অদ্যাবধি পাঁচ অথবা দশ লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব হইতেই মনুষ্যরূপী প্রাণীরা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন বলিয়া অনুমান করা হয়। এবং ইহারই কোন এক পর্য্যায়ে তাঁহারা সচেতন ভাবে ঐ বস্তুগুলিকে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তৎপূর্বেই তাঁহারা শুধুমাত্র পদদ্বয়ের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ মনে করার কারণ নাই। অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার, এমন কি অস্ত্র প্রস্তুত পর্যন্তও, "দণ্ডায়মান দ্বিপদ" (Homo erectus) অথবা "দণ্ড" পর্যায়ের আগে ঘটিয়া থাকিতে পারে। তবে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পর হইতেই মনুষ্যরূপী প্রাণীদের দ্রুত মস্তিষ্কের প্রসার ঘটিতে থাকে এবং প্রস্তুত ব্যাপারে একটা সচেতন অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ক্রমে তাঁহারা "বুদ্ধিমান্ দ্বিপদ" (Homo sapiens) তথা "বুদ্ধিমান নর" (Homo sapiens sapiens)-এ পরিণত হন।

ন্যূনাধিক দেড়লক্ষ বৎসর পূর্বেকার কৃত্রিম অস্ত্র ব্যবহারকারী যে সব আদি মানুষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদিগকে গুহাশ্রয়-এর দখলদারীর জন্য অধুনা লুপ্ত অসি-দন্তী ব্যাঘ্র (sabre toothed tiger), চিতাবাঘ, হায়িনা (hyena) ইত্যাদি হিংস্র শ্বাপদ-এর সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। তাঁহাদের অধ্যুষিত গুহায় অতিশয় সাধারণ অথচ কৃত্রিম প্রস্তরাস্ত্রের সহিত হস্তী, অশ্ব, গণ্ডার, মহিষ অথবা বাইসন (bison), উষ্ট্র, বরাহ, মেষ, হরিণাদির যে সব অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কোথাও বা অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ, কোথাও বা অগ্নিতে দগ্ধ। ইহা হইতে তাঁহাদের সমাজবদ্ধ শিকারী জীবন এবং অস্ত্রের ব্যবহারের প্রমাণ ত মিলেই, অধিকন্তু তাঁহারা যে অগ্নির ব্যবহারও আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়। এই অগ্নির আবিষ্কার শুধু যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাহাই নহে, ইহাই আদিমানবের সর্ব্বপ্রথম যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। অগ্নিদগ্ধ মাংস সুস্বাদু এবং সুপাচ্যও বটে। প্রজ্বলিত অগ্নির সাহায্যে একদিকে তীব্র শীত, অপরদিকে উগ্র শ্বাপদ, এই উভয়বিধ শত্রুর আক্রমণ হইতেই আত্মরক্ষা করা যায়। কল্পনা করা যায় যে, প্রথমে তাঁহারা খাণ্ডবদাহনরূপ নৈসর্গিক দাবানল হইতে পলায়মান ভীত ত্রস্ত শ্বাপদাদি নিরীক্ষণ করিয়া, এবং দাবাগ্নিদগ্ধ পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করিয়া, অগ্নির এই বিচিত্র গুণাবলী আবিষ্কার করেন। প্রথমে সম্ভবতঃ দাবানল হইতেই অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে তাহা জিয়াইয়া রাখিতেন। ইহাতে অস্ত্রের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ "অস্ত্র পর্ব্বের" আগেই "অগ্নি পর্ব্ব" সম্ভব। পরে অবশ্যই অস্ত্রাদি প্রস্তুতকালে প্রস্তরের সহিত প্রস্তরের আঘাতে উদ্ভূত স্ফুলিঙ্গ হইতে, এবং ক্রমে অগ্নি-প্রস্তর অথবা অগ্নি-কাষ্ঠ (অরণি) হইতে অগ্নির উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত হইয়া থাকিবে। এইরূপে "আগ্নেয়াস্ত্রে" বলীয়ান্ আদিমানব পরবর্ত্তী একলক্ষ বৎসরে অতিক্রুত উন্নতি লাভ করেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বুকে গত দশলক্ষ বৎসরে পর পর প্রাদুর্ভূত একাধিক তুষারযুগের (glacial age) সর্ব্বশেষ তুষার যুগটির আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ মেরুঅঞ্চলের এবং তুষারশীর্ষ হিমালয়াদি পর্ব্বতের তুষার নামিয়া আসিয়া পৃথিবীর বুকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবৃত করিয়া ফেলে। অগ্নির সাহায্যে নিরাবরণ আদিমানব সেই হিমশীতল তুষারযুগও অতিক্রম করিয়া পৃথিবীরবুকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়েন। তারপর সেই সর্ব্বশেষ তুষার যুগের অপসৃতির শুরুতে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে আমাদের, অর্থাৎ বর্ত্তমান মানুষের, নিকটতম পূর্ব্বপুরুষ "বুদ্ধিমান নর" (Homo sapiens sapiens) এর আবির্ভাব ঘটে। ইঁহারা উত্তরোত্তর উন্নততর অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখেন। সুচারু এবং মার্জ্জিত ধরণের প্রস্তরাস্ত্র ছাড়াও তাঁহারা অস্থি, মৃগ-শৃঙ্গ, বৃষশৃঙ্গ, গজদন্ত ইত্যাদি নানাবিধ উপকরণে প্রস্তুত বর্শাফলক, বড়িশ (বড়শী), ধনুর্ব্বাণ, তিমি অথবা বৃহৎকায় মৎস্যাদি শিকারের রজ্জু সংলগ্ন বর্শা (harpoon), চর্ম্মনির্ম্মিত পরিধেয়, সেলাইএর সীবনী, এমন কি গজদন্তের

কারুকার্য্যময় অঙ্গাভরণও প্রস্তুত করিতেন। অপসৃয়মান তুষার যুগে প্রকৃতির বদান্যতায় সহজলভ্য শিকারের বিশেষ প্রাচুর্য্য ঘটে। ফলে আমাদের গুহাশয়ী নিষাদ পূর্ব্বপুরুষেরা "শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" হইতে আংশিক মুক্তি লাভ করিয়া "ললিতকলার" চর্চ্চা করিবারও অবকাশ পাইতেন। প্রায় বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তর গাত্রে অথবা গুহাপ্রাচীরে অঙ্কিত বিস্ময়কর চিত্রাবলী আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তারপর অন্ততঃ পাঁচ হইতে দশহাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এইসব নিষাদ পূর্ব্ব-পুরুষেরা ভূমিকর্ষণ, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ শিল্প ইত্যাদি কৌশল আয়ত্ত করিয়া যাযাবর বাসিন্দাত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন, এবং জনপদ নগরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। ইহা আমাদের মহাভারত অথবা রামায়ণ-এর যুগের অর্থাৎ দ্বাপর অথবা ত্রেতাযুগের বেশ কিছুকাল আগেকার কথা। অর্থাৎ সত্যযুগের কথা।

এই প্রাগৈতিহাসিক সমাজ বিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে শ্রম (labour), মূলধন (capital), উৎপাদন (production) ইত্যাদি সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থশাস্ত্রীয় তাৎপর্য্যের উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। জীবজগতে প্রত্যেক প্রাণীকেই বাঁচিয়া থাকার জন্য আয়াস করিতে হয়। কারণ বাঁচিয়া থাকা তথা প্রজনন মাধ্যমে বংশপরম্পরায় জীবনের গতি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা জীবনের ধর্ম্ম। বার্নাড শ-এর মিলনান্ত নাটক "অস্ত্র এবং মানুষ" (Arms and the Man)-এর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়মান নায়ক বলিতেছেন, "মানুষের কর্ত্তব্য যতদিন সম্ভব বাঁচিয়া থাকা" (It is our duty to live as long as we can)। এইরূপ সচেতন "কর্ত্তব্য" বোধ বর্জ্জিত হইলেও সহজাত প্রবণতা হইতেই প্রত্যেক প্রাণীকেই বাঁচিয়া থাকার প্রয়াস করিতে হয়। এবং সময় সময় এই প্রয়াস প্রাণান্তকরও হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে জাত ফলমূলাদি আহরণ, মুখে পূরণ, গলাধঃকরণ, অন্য জীবকে ভক্ষণার্থে তাড়ন, অন্য জীব দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন, এইসব প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট বাঁচিয়া থাকার স্বাভাবিক প্রয়াস অর্থশাস্ত্রীয় "শ্রম"-এর পর্য্যায়ে পড়িতে পারে না। তবে "মানুষ অস্ত্রকারক প্রাণী," মানুষের এই সংজ্ঞাটি মানিয়া লইলে "শ্রম," "মূলধন," "উৎপাদন," "প্রকৃতিজ সম্পদ (land)" ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীয় বয়ানের মোটামুটিভাবে অনেকটা কিনারা করা যায়। যেমন ধরা যায় যে, প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ঐগুলিকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তরিত অথবা বিকৃত করিয়া কৃত্রিম অস্ত্র প্রস্তুতের কাজকে আমরা "শ্রম" আখ্যা দিতে পারি। এখানে "সচেতন ভাবে" কথাগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কারণ প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুতে নিজের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের কাজও সর্ব্বক্ষেত্রেই শ্রম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পাখিরা প্রকৃতি হইতে খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া বাসা বাঁধে। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ বিস্ময়কর বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করে। তবে এই সব কাজ "সচেতন" প্রয়াস নহে, ইহা সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় যন্ত্রবৎ সম্পাদ্য। আবার "সচেতন প্রয়াস"ও সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রম-পদবাচ্য হইবে না। প্রথমতঃ ইহা সখের কাজ (labour of love) হইলে চলিবে না। ইহা প্রয়োজন সাধক হওয়া চাই। এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা "পূর্ব্বকল্পিত" হওয়া চাই। মার্কস বলেন যে বর্ত্তমানে আমরা শ্রমকে একটা সম্পূর্ণ মনুষ্যসুলভ ব্যাপার বলিয়া মনে করি। ঊর্ণনাভের কার্য্যাবলী তন্তুবায়ের কাজের সমগোত্রীয় এবং মৌমাছির মধুচক্র নির্ম্মাণ কৌশল অনেক বড় বড় স্থপতিকেও লজ্জা দেয়। তবুও শ্রেষ্ঠতম মক্ষিকা এবং নিকৃষ্টতম স্থপতির পার্থক্য এই যে, স্থপতি বাস্তব গৃহনির্ম্মাণের পূর্ব্বেই কল্পনায় তাহা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলেন। অতএব মার্কস-এর মতে পূর্ব্বকল্পিত ভাবে প্রয়োজনসাধক সচেতন প্রয়াসকেই "শ্রম" আখ্যা দেওয়া যায়।

অতএব দেখা যায় যে, এই "শ্রম" সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীর এলাকা বহির্ভূত; এবং মানুষের

ক্ষেত্রেও ইহা বিবর্তনের পথে বুদ্ধির ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ পরিণত অবস্থায়ই প্রযোজ্য। শুধু তাহাই নহে। এঙ্গেল্‌স-এর মতে শ্রম হইতেই মানুষের উদ্ভব (labour created man himself)। অর্থাৎ জীবনধারণের অথবা উন্নততর জীবন যাপনের সচেতন প্রচেষ্টা হইতেই মানুষের দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক যাবতীয় উন্নতি সাধিত হইয়া মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর বস্তুবাদী (materialist) দৃষ্টিতে মানুষের মানসিক তথা বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির ভিত্তিই হইল মস্তিষ্কের অর্থাৎ মস্তিষ্কাধারের অভ্যন্তরস্থ "মগজ" অথবা "ঘিলু" নামক বস্তুটির প্রসার। এবং মানুষের ক্ষেত্রে এই মস্তিষ্কের প্রসার নেহাৎই একটা "জৈব" বিবর্তনের ব্যাপার নহে। ইহা সম্পূর্ণভাবে "মানবীয়" বিবর্তন। অর্থাৎ ইহা অন্যান্য প্রাণীর মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া বাঁচিয়া থাকার নেহাৎই সহজাত জৈব প্রবণতা সঞ্জাত একটা অন্ধ প্রচেষ্টার ফল নহে। ইহা জীবন-সংগ্রামে একটা সচেতন প্রচেষ্টা সঞ্জাত বুদ্ধি-বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আবার ইহা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল নহে। সমাজবদ্ধ জীবনের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উত্তরোত্তর ধারাবাহিক অগ্রগতির সঞ্চীয়মান ফল। অতএব এঙ্গেলস মানুষের শ্রমকে সমাজ ভিত্তিক শ্রম (social labour) আখ্যা দিয়া থাকেন। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে শিকার এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আদিমানবকে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে হইত। এই অবস্থায় জীবনসংগ্রামের নবনব আবিষ্কৃত নিত্যনূতন কৌশল পরস্পরের নিকট শিক্ষণীয় এবং পুরুষ-পরম্পরায় সঞ্চালনীয় সচেতন ভাবে অতিশয় সরল অস্ত্রাদির ব্যবহার অথবা নির্মাণেও হস্ত-চক্ষু-মস্তিষ্কাদির সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। অতএব হস্ত কৌশলের উন্নতির সহিত মস্তিষ্কের উন্নতিও ওতপ্রোত। আবার এই উন্নতি ধারাবাহিক এবং অব্যাহত রাখিতে পরস্পরের ভাব-বিনিময় প্রয়োজন। ফলে ভাষার উদ্ভব। আবার এই ভাষার সহিত মস্তিষ্কের অর্থাৎ কল্পনাশক্তির সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। কারণ, ভাষার মাধ্যমে কোন বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে ঐ বিষয়টার একটা চিত্র বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই কল্পনার চোখে উদিত হওয়া চাই। এবং এই কল্পনা-শক্তি অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখে অনুপস্থিত অতীত বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ বিষয়ের চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করার শক্তি একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখা যায় এবং ইহাতেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা স্বতন্ত্র। অতএব এঙ্গেলস বলেন যে, প্রথম শ্রম এবং তৎপরে শ্রমের সহিত খাপ খাওয়ানো ধ্বনিময় ভাষা,—এই দুইটিই মূল উদ্দীপক, যাহার প্রভাবে বিলাঙ্গুল শাখামৃগের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কে পরিণত হইয়াছে (First labour, after it, and then with it, articulate speech—these were the two most essential stimuli under the influence of which the brain of the ape gradually changed into that of man)।

২৫৩ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

সাধারণ প্রকৃতিটি কেমন ভাল রূপে তাঁর জানা ছিল। রচনাকে সুস্পষ্ট ও সুন্দর করতে হ'লে এটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর লেখার স্থানে স্থানে দুর্বোধ্যতা যে নেই তা নয়, তবে সে-সকল দুর্বোধ্যতা আলোচ্য বিষয়ের দুরূহত্বের জন্যে। স্থানবিশেষে তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত বাগ্‌ধারা (idiom) ব্যবহার করেও রচনাকে একটু শক্ত করেছেন কিন্তু সেগুলি তাঁর জ্ঞাতসারেই ঘটেছে; এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :—

বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিতে হইয়াছে ইহার দোষ লইবার, ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন যাঁহারা, লইবেন না কারণ বিচার যোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না। (দ্র ৭)

রামমোহনের রচনার স্থানে স্থানে কাঠিন্য থাকলেও তার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের কাজ ব্যাহত হয় নি। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যে প্রবল আন্দোলন তিনি দেশমধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে নব পর্যায়ের গদ্য রচনা এক নূতন গতিবেগ পেয়েছিল এবং তারই ফলে ঘটল দেশীয় লোকদের দ্বারা সংবাদপত্র প্রকাশ। এই সংবাদপত্রও বাংলা গদ্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার কম সহায়তা করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদ-পত্রের হাতে বাংলা সাহিত্যের দুর্দশা ঘটেছিল যথেষ্ট। এই শোচনীয় অবস্থার হাত থেকে যিনি বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করলেন তিনি রামমোহনের পরম অনুরাগী ও শিষ্যকল্প দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য সাহিত্যের বুনিয়াদ দৃঢ়তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কেবল ধর্মমতাদিতে নয়, রচনাপদ্ধতিতেও দেবেন্দ্রনাথের উপর রামমোহনের প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্তমান। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সম্পাদক (১৮৪৩-১৮৫৪) অক্ষয়কুমার দত্তের উপর পড়েছিল আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এই প্রভাবের একান্ত বাইরে ছিলেন না। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সে-সকলের আলোচনা সম্ভব নয়। বারান্তরে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে কিন্তু তার আগেই একথা বলা যেতে পারে যে, রামমোহনের প্রবর্তিত গদ্যের ধারাকে আশ্রয় করেই আধুনিক বাংলার সর্বজনব্যবহার্য গদ্য রীতি গড়ে উঠেছে। *

১। তিনবার তিন লেখকের দ্বারা অনূদিত।

২। এই গ্রন্থ সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' নামক গল্পপুস্তক থেকে সংকলিত।

৩। দ্র— রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলী, পাণিনি কার্যালয় (১৩৩৫) প্রকাশিত।

৪। এই গ্রন্থ রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থের উত্তরে লিখিত হলেও তাতে খাঁটি দার্শনিক আলোচনার বদলে লৌকিক তর্কযুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদ খণ্ডনের প্রয়াস এবং রামমোহন রায়ের প্রতি বাক্য কটূক্তিমাত্র আছে।

৫। এই গ্রন্থও 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র অনুরূপ উদ্দেশ্যে এবং প্রণালীতে লিখিত।

৬। রচনাটির সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ'। এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য ইঁহারদের পরস্পর কথোপকথন।

৭। স্থানাভাবে এই রচনাটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা গেল না। আর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে সমগ্র রচনার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে তাতেও নিরস্ত থাকতে হ'ল।

৮। পরশ্রীকাতরতা।

* 'বেদান্তচন্দ্রিকা' এবং 'পাষণ্ডপীড়ন' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধারে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪১।

যুগগুরু রামমোহন

ক্ষিতিমোহন সেন

বাল্যকালে দেখিতাম কাশীর সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বদ্ধ প্রাণ গঙ্গার মুক্ত তীরে আসিয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করে। গঙ্গা যে মুক্তিদায়িনী তাহা কাশীর গলিতে বদ্ধ প্রাণী অনায়াসেই অনুভব করে। সনাতন হিন্দু সমাজের অগণিত বিধিব্যবস্থার আচারে বিচারে নিয়ন্ত্রিত হৃদয় মন প্রাণ তেমনি ভারতীয় সাধক ও ভক্তগণের মুক্তিদায়িনী সাধনাধারায় ও সাধকবাণীর মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির অমৃতকে আস্বাদন করে। হৃদয় মনের এই মুক্তিগঙ্গা যদি ভারতে প্রবহমানা না থাকিত তবে ভারতের চিত্ত এতদিনে শুকাইয়া মরিয়া যাইত।

সৌভাগ্য ক্রমে ভারতের মধ্যযুগের সাধক ও ভক্তেরা সবাই প্রেমের ও মিলনের মুক্তিবাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। আচার-বিচারের শৃঙ্খলের জয়গান কেহই করেন নাই, করা সম্ভবও নয়। কারণ, ইঁহাদের অনেকেই অতি নীচ, এমন কি অস্পৃশ্য অন্ত্যজ কুলে জন্মিয়াছেন, এবং দীন হীন মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন ভক্তের সংখ্যাও কম নহে। তারপরে ইঁহাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর, কাজেই শাস্ত্রের, বেদের ও সনাতন আচার নিয়মের যশোগান করার সম্ভাবনা ইঁহাদের নাই।

অথচ ইঁহাদের অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও জ্ঞান যে কত গভীর ও মধুর তাহা শুধু কথার দ্বারা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। আকাশ হইতে যখন বৃষ্টি হয় তখন তাহার অল্প অংশই ভূমির উপরিস্থিত নদী নালায় ধারারূপে বহিয়া যায় বা হ্রদসরোবরের জলাশয়ে বদ্ধ হইয়া থাকে। বৃষ্টির অধিকাংশই ভূমির নীচে অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে নামিয়া গিয়া গোপনে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই জলের জন্যই তৃষিত পাদপ বনস্পতি তাহাদের মূলকে গভীরে প্রেরণ করে, সন্ধানী মানব কূপ খাল খুঁড়িয়া সেই জলেই তৃষ্ণা নিবারণ ও কৃষিকর্ম করে ও এই অদৃশ্য ধারাই নিদাঘের দুর্দ্দিনে নদনদীর ধারাকে কোনমতে জিয়াইয়া রাখে। ঠিক তেমনি মানব সমাজে যে জ্ঞানের ধারার বৃষ্টি হয় তাহার অল্প অংশই উচ্চতলের মানবের মধ্যে দৃশ্যভাবে থাকে, তাহাই শাস্ত্র বেদপুরাণে ও দর্শনাদির নানা বড় বড় শব্দাবলীর মধ্যে আপনাকে নানাভাবে প্রকটিত করে। কিন্তু সেই জ্ঞানের অধিকাংশই মানবের 'গভীর-চেতন' লোকে (subconscious) নামিয়া যায় এবং সেখানে থাকিয়া মানব-সমাজের প্রাণ নানা ভাবে রক্ষা করে। যদি কেহ সন্ধান করিয়া সেই গভীরতায় নামিতে পারে তবে সেই জলের মাধুর্য্যে ও প্রাণপ্রদ প্রাচুর্য্যে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়ে।

যখন আমার বয়স অতি অল্প তখন একান্ত সৌভাগ্যবশে এবং দুই একটি ভক্তজনের সঙ্গগুণে আমি এই ভক্ত ও সাধকদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। ভারতের মধ্যযুগকে অনেকে না জানিয়া একটি অন্ধযুগ মনে করেন। কিন্তু ভক্তসাধকদের বাণীর সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, এই যুগের ঐশ্বর্য্য অপরিমেয়। তখন উত্তর-ভারতে রামানন্দ ও তাঁর পরবর্ত্তী সন্তগণ ভারতের সাধনার আকাশকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সন্তদের বাণী হইতেই আজ আমি কিছু আলোচনা করিব। তাহা ছাড়া পাঞ্জাবে, সিন্ধে তখন হিন্দু ও মুসলমান সুফীদের সাধনায়, বাঙলার বাউল ও বৈষ্ণবদের সাধনায়, দক্ষিণে শৈব ও বৈষ্ণব ও অসাম্প্রদায়িক নানা ভক্তজনের সাধনায় ভারত সেই সময় ঐশ্বর্য্যময়।

বৌদ্ধ ও জৈন সাধনা যখন ভারতে দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে, যখন জীবন্ত ধর্ম্ম কেবল দার্শনিক চুলচেরা

তর্কে বিতর্কে দাঁড়াইয়াছে, তখন ভারতের হৃদয়ের ধর্মতৃষ্ণা মিটিয়াছে এই সব কুলমানহীন সাধকদের সাধনায় ও বাণীতে। পণ্ডিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে সব অসাধ্য সাধনা করিতে সাহসী হন নাই ইঁহারা তাহাতে ভীত হন নাই। তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন, সাধনার সঙ্গে সাধনার মিলন, সকল পন্থ ও ধর্মসাধনার মৈত্রীর চেষ্টা অসাধ্য সাধন হইলেও সে-সব কথা বলিতে ইঁহারা একটুও সঙ্কুচিত হন নাই।

সাধকদের মধ্যে কথিত আছে যে, উত্তর-ভারতে মধ্যযুগে ভক্তিভাব নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল এমন সময় দ্রাবিড় দেশে উত্তর হইতে কোন কালে সমানীত ভক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সেই ভক্তি রামানন্দ আবার উত্তরে ফিরাইয়া আনিলেন, কিন্তু তাহা সকলদিকে ছড়াইয়াছিলেন ভক্ত কবীর। ভক্তদের মধ্যে প্রথিত সেই বাণীতে

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়ো কবীর নে সাতদ্বীপ নৌখণ্ড।

কাশীর আচার-বিচার এবং প্রাচীন সাম্প্রদায়িকতাবদ্ধ জীবনে আমার পক্ষে এই ভক্ত-বাণীগুলিই ছিল যথার্থ মুক্তির ক্ষেত্র। বড় হওয়ার পর যখন রাজা রামমোহন রায়ের নানা ক্ষেত্রের লেখার সঙ্গে পরিচিত হইলাম তখন তাঁহার ভিতরের ভাবটা আমার একান্ত পরিচিত মনে হইল। সেই সব সন্ত সাধকদের ভাবের সঙ্গে রাজার ভাবের কোন বিরোধ দেখিলাম না—মনে হইল রাজার মধ্যে, তাঁর বর্তমান যুগের মনীষিজনোচিত দৃষ্টির মধ্যে যেন ভারতের প্রাচীন মধ্যযুগের চমৎকার সুসঙ্গত সার্থকতা (fulfilment)।

ভারতে যোগই হইল বড় কথা। পণ্ডিতা জানে নানাবিধ বস্তুকে ও তাদের ভিন্নতাকে। তাহাকেই মধ্যযুগের কোন কোন ভক্ত 'সংখ্যা' বুঝিয়াছেন। অনেকবিধ তত্ত্বের অনেকধা স্বরূপলক্ষণ পরিচয়ই এই সংখ্যা বা সাংখ্য। সেই অনেককে একের মধ্যে সুসঙ্গত করিয়া দেখাই হইল যোগ। সংখ্যা হইতে যোগ ইঁহাদের মতে অনেক গভীর কথা। তাই ভক্ত রজ্জব (আকবরের সমসাময়িক রাজপুতানার সাধক) বলেন—

সংখ্যা জানে সয়ান সো জানূঁ।
জোগী জুক্তা ঔর অধিক মানূঁ॥
ভেদ বিভেদ মিলৈ জহঁ কোঈ।
পরম পুনীত তীরথ তহঁ হোঈ॥

যে সংখ্যা জানে তাহাকে সেয়ানা বলিয়া জানি। যে যোগে সব যুক্ত বলিয়া জানে তাহাকে আরও বেশী মানি। ভেদাবভেদ যেখানে মিলিতে পারিয়াছে সেখানেই তো পরম পবিত্র তীর্থভূমি।

এই দেশে নদীর সঙ্গে যেখানে নদীর মিলন সেখানে এক-একটি পবিত্র তীর্থ। নদীর সঙ্গে যেখানে সাগরের মিলন সে সঙ্গম একটি মুক্তির তীর্থ। যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সাধনাকে প্রেমে ও মৈত্রীতে সুসঙ্গত করিতে পারিয়াছেন, ভারতে তাঁহারাই মহাপুরুষ। মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেও এই সত্যটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়।

তখনকার দিনে ভারতে অনৈক্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া। তাই তখন মহাপুরুষদের প্রধান সমস্যা ছিল কি করিয়া এই দুই সাধনাকে প্রেমে মৈত্রীতে সুসঙ্গত করা যায়। আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলন বলিতে যাহা বুঝা যায়, তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বলিতে তাহা বুঝাইত না। আজ হিন্দু-মুসলমান উভয়ে এক দুঃখে এক দুর্দশায় পতিত। এখন রাজনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরেও নিতান্ত সহজেই একথা বলা চলে। এ কথা এখন রাজনৈতিক নিতান্ত সাধারণ জরুরী (expediency) কথা মাত্র। আজ পাশ্চাত্য সাধনাকে বা ইংরাজের সাধনাকে আমাদের সাধনার সঙ্গে সুসঙ্গত করিতে যে চায়, তার পক্ষে যেমন কঠিন প্রতিকূলতা, তখনকার দিনে প্রবল পরাক্রান্ত শাসক মুসলমানের সাধনাকে শাসিত হিন্দু সাধনার সঙ্গে মিলিত করিতে যাহারা চাহিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধেও প্রতিকূলতা তেমনি কঠিন ছিল। তাই ভক্ত রজ্জব বলিয়াছেন—

হাথ জোড়ু গুরু সু হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।
সাধনা মাঁ জৈ জোগ নহী ক্যা সাধনা পরমান॥

সেই পরম গুরুর কাছে হাতযোড় করিয়া বলিতেছি হিন্দু-মুসলমান যেন সাধনায় মিলিতে পারে। সাধনাতে যদি যোগই না রহিল তবে সাধনার সত্যতার আর প্রমাণ কি রহিল?

এ কাজ ত সহজ কাজ নহে। রামমোহন এই কঠিন কাজে যদি হাত না দিতেন, তবে তিনি ভারতের ক্ষুদ্র-দৃষ্টি জনসাধারণের কাছে একজন অতি বড় মহাপুরুষ অতি সহজেই হইতে পারিতেন। কিন্তু ভারতের পরম সৌভাগ্য যে তিনি সস্তা মহাপুরুষ হইবার সহজ পন্থা খোঁজেন নাই। আর এইজন্য তাঁর আপন বিশিষ্টতাটি এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তখনকার দিনে এই কাজে যাঁহারা হাত দিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা যে কত প্রবল তাহা এখন বুঝা কঠিন। তাঁরা উভয়দলেরই শত্রু। এই বিষয়ে কবীরের সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে:

কবীর যখন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার উপর মুসলমান মুল্লারা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমানভাবে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। মুল্লারা বলেন হিন্দুয়ানীর সঙ্গে মিলাইতে গিয়া কবীর মুসলমান ধর্মকে মারিল। হিন্দুরা বলেন যবনের মুখে সাধনার কথায় ভগবানের নামে হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল। এমন সময় বাদশাহ সেকেন্দর শাহ লোদী কাশীর কাছে সফরে আসিলেন। মুল্লা ও পণ্ডিত উভয়ে বাদশাহের কাছে কবীরের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিলেন। বাদশাহের লোক আসিয়া কবীরকে দরবারে লইয়া গেল। তখনকার দিনে অভিযুক্তদের একটি স্থান, অভিযোগকারীদের একটি ঘেরা স্থান নির্দিষ্ট থাকিত। একই ঘেরা জায়গায় মুল্লা ও পণ্ডিতদের একত্র অবস্থান দেখিয়া কবীর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। বাদশাহ এরূপ অসঙ্গত ব্যবহারে একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরূপ আচরণের অর্থ কি?" কবীর বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করিবেন কিন্তু আজ আমার একটু ভরসা হইয়াছে। আমি যাহা এতকাল চাহিয়া আসিতেছি আজ তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে দেখিলাম। ঠিকানায় একটু ভুল হইয়াছে—

"ঠিকানামেঁ থোড়ী গলতি হো গঈ।"

বাদশাহ বলিলেন—"কথাটা খুলিয়া বল।" কবীর কহিলেন—"আমি চাহিয়াছিলাম হিন্দু ও মুসলমানকে প্রেমে ও মৈত্রীতে ভগবানের চরণতলে মিলান যায় কি না। সকলেই বলিলেন তাহা অসম্ভব। আজ দেখিলাম তাহা সম্ভব হইয়াছে। অপ্রেমেই যদি তাহারা আজ এখানে মিলিতে পারিয়া থাকে তবে প্রেমে মিলিতে পারা আরো সহজ। আর তোমার সিংহাসনের নীচেই যদি তাদের মিলন সম্ভব হয়, তবে বিশ্বপতির সিংহাসনের নীচে কি আরও প্রশস্ত স্থান মিলিবে না? আজ অসম্ভবকে সম্ভব দেখিয়া আমার ভরসা হইয়াছে, মনে মনে যাহা চাহিয়া আসিয়াছি তাহাই আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম। তবে তাঁর সিংহাসন-তলে না হইয়া তোমার সিংহাসনের নীচে এই মিলন ঘটিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—সবই ঠিক হইয়াছে কেবল ঠিকানায় একটু ভুল হইয়া গিয়াছে।"

বাদশাহ কথাটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কবীরকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন।

মধ্যযুগে নানাবিধ সাধনার সুসঙ্গতিকে মনে প্রাণে কামনা করিয়াছেন এমন দুই শতের অধিক মহাপুরুষ সাধকদের বাণী পাইয়াছি। সম্ভব হইলে, দেখাইতে পারিতাম, তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরের সাধনাটি পরিপূর্ণ হইয়াছে রামমোহনের সাধনাতে। তেমন সময় ও সুযোগ এখন নাই। তাই প্রধানতঃ কবীরজী, দাদূজী ও রজ্জবজীর বাণী হইতেই আজ কিছু কিছু দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভক্ত নানকজীর হিন্দুমুসলমানকে মিলাইবার চেষ্টা সর্বজনবিদিত—বিশেষতঃ য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাও তাহা উত্তমরূপে লিখিয়াছেন।

কবীর বলিতেছেন—

কত বা পায়ে ধরিয়া বুঝাইলাম, কত বা কাঁদিয়া বুঝাইলাম, হিন্দু দেবদেবীই পূজে আর মুসলমানও কারও আপন হইতে চায় না।

কি ভনো মনায়ে। পার্ব পরি কি ভনো মনায়ো রোয়।
হিংদু পূজৈ দেবতা তুর্ক ন কাহু হোয়॥

খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে আর সব মুলুক কাহার? তীর্থ-মূর্ত্তিতেই যদি রাম নিবাস করেন তবে বাহিরের জগৎকে দেখে কে?

জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ ঔর মুলুক কেহি কেরা।
তীরথ মূরত রাম নবাসী বাহর করে কো হেরা॥

হিন্দুর হিন্দুয়ানী দেখিলাম, মুসলমানের মুসলমানী দেখিলাম, হায়, ইহারা কেহই পথ পায় নাই।

অরে ইনহুঁ রাহ ন পাঈ।
হিনুহুকী হিংদবাঈ দেখি তুরকন কী তুরকাই॥

সবাই বিধিব্যবস্থায় বেড়া (creed) রচিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নিরাপদ করিতে চায়, শেষে সেই সঙ্কীর্ণতাতেই ধর্ম মারা যায়। তাই কবীর বলেন—

ক্ষেতে দিলাম বেড়া, শেষে দেখি বেড়াটাই ক্ষেতকে খায়। তিন লোক সংশয়ের মধ্যে রহিল পড়িয়া, আমি কাহাকে কি বুঝাইব?

বেড়া দীনহী খেত কো বেড়াহী খেত খায়।
তীনলোক সংশয় পড়ী মৈঁ কাহি কহো সমুঝায়॥

এই প্রত্যেকটি কথা আমরা রামমোহনের মধ্যে পাই। রামমোহনের মতই কবীর তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া দেখিলেন; সত্যকে পাইলেন না। শাস্ত্রের জ্ঞান কবীরের ছিল না তবু শাস্ত্রের বন্ধনটা যে কত কঠিন তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন।

তাই কবীর বলেন---

তীর্থে তো কেবল জল, তাহাতে কিছুই হয় না, সে আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি। প্রতিমাগুলি তো জড়, কোন কথাই বলে না, সে আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি। পুরাণ কুরান তো কেবল কথা, সে আমি ঘটের পর্দ্দা সরাইয়া দেখিয়াছি। কবীর কহে শুধু প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা। আর সব যে মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য তাহা বেশ দেখিয়াছি।

তীরথ মেঁ তো সব পানী হৈ হোবৈ নহী কছু
অন্হায় দেখা।
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ বোলে নাহি
বোলায় দেখা॥
পুরাণ কুরান সব বাত হৈ যা ঘটকা পরদা
খোল দেখা।
অনুভবকী বাত কবীর কহৈ য়হ সব হৈ ঝুঠী
পোল দেখা॥

বেদের পুত্রী আসিলেন স্মৃতি, তিনি বাঁধিলেন এমন বাঁধন যে কিছুতেই যায় না ছাড়ান।

বেদকী পুত্রী স্মৃতি আঈ
বংধবত শংখ ছোড়ি ন জাঈ॥

রামমোহন সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংলাতেই তাঁর বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। এমন করিয়াই তিনি বাংলা গদ্যকে গড়িয়া তুলিলেন। কবীর তো মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছু জানিতেনই না। তবু সংস্কৃত হইতে ভাষার শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তাঁর বাণী কি চমৎকার!

হে কবীর সংস্কৃত হইল কূপ জল আর ভাষা হইল প্রবহমানা জলধারা। যখন চাও তখনি ডুব দাও; শরীর জুড়াইয়া যাইবে।

সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৈ তবাহি ডুবো শান্ত হোয় শরীর॥

সংস্কৃত ভাষা পড়িলেই লোক মনে করে, আমি জ্ঞানী, আমাকে সবাই জ্ঞানী বলুক।

সংসকিরত ভাষা পঢ়ি লীনহা জ্ঞানী লোক কহোরী॥

কোনো বিশেষ জাতির, সম্প্রদায়ের বা দেশেরই যে কেবল সাধনায় অধিকার আছে একথা কবীর মানিতেন না, তাই বলিয়াছেন, সাধুদের জাতি জিজ্ঞাসা করা বৃথা। সাধনাতে ছত্রিশ কৌম (Nationality) আছে, তাই এই প্রশ্নটাই অদ্ভুত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সাধক হইয়াছেন, ইহার মধ্যে কি কিছু বিচার করা চলে?

সন্ত ন জাত ন পুছো নিরগুণিয়াঁ।
সাধন মাঁ ছত্রিশা কৌম হৈ টেঢ়ী তোয় পুছনিয়াঁ।
হিন্দু তুর্ক দুই দীন বনে হৈ কছু নহী পহচানিয়াঁ॥

অন্তর বাহির দুইকে নিরন্তর করিয়া আছেন তিনি।

চেতন-অচেতন দুই তাঁর পাদ-পীঠ। যদি বলি তিনি কেবল অন্তরে তবে বাহির্জগৎ লজ্জায় মরে, যদি বলি তিনি বাহিরে তবে কথাটা হয় মিথ্যা।

ভিতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ বাহর কহুঁ তো
ঝুটা লো।
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চেত অচেত
দউপীঠা লো॥

লোকেরা ভুল করিয়াই সংসার ছাড়িয়া বনে যায়। তাই কবীর বলেন—

ভ্রান্তকে যে ঘরে ফিরাইয়া আনে সেই তো আমার প্রিয়। ঘরেই যোগ, ঘরেই মুক্তি, যদি অলখ গুরু তাহা দেখাইয়া দেন।

অবধূ ভূলেকো ঘর লাবে সো জন হমকো ভাবৈ।
ঘরমে জুক্ত মুক্ত ঘরহী মেঁ জো গুরু অলখ লখাবৈ॥

দেহ-তাড়নকে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়াই কবীর বলিলেন—

চক্ষুও মুদিব না, কানও রুধিব না, কায়ক্লেশও করিব না, নয়ন খুলিয়া হাসিতে হাসিতে আমি দেখিব, সুন্দরের রূপই সর্বত্র দেখিব।

আঁখ না মূদূঁ কান না রূধূঁ কায়া কষ্ট ন ধারূঁ।
খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখূঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ॥

কবীরের মত যে নীরস বৈরাগীর মত ছিল না, তাহা বুঝাই যায়, রামমোহনের সঙ্গে এসব বিষয়ে তাঁর চমৎকার ঐক্য।

বুদ্ধের মত তিনিও বলিয়াছেন, এই দেহ একটি তন্ত্রীবাদ্যের মত। ইহার তার টানিয়া খুঁটি মোচড়াইয়া প্রভুর রাগিণী বাহির হয়।

সাধো যহ তন ঠাট তংবুরে কা।
ঐঁচত তার মরোরত খুঁটী নিকসত রাগ হজুরে কা॥

প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় প্রভুর সুরটি বাহির করিতে পারিলে তবে তার জীবনের কাজ সিদ্ধ হইল। তারপর সকলের সাধনা, সকল মানবের সাধনা লইয়া নানাবিধ সুরের সমবায়ে এক সাধনসুরের মহাসঙ্গীত চলিয়াছে। প্রত্যেক পথের সাধনাই তার একটি একটি সুর। এইজন্য কোন একটি সাধনাকে নাই করা অর্থাৎ সেই মহা-সঙ্গীতকে ক্ষুণ্ণ করা। এই সুর অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে।

পঞ্চবীণা সত রাগ উচারৈ যো বেধত হিয়ে মঝারো হো॥

কবীরের এইসব অনুভব তাঁর ব্যক্তিগত। অবশ্য তাঁর ধর্ম-বন্ধু-বান্ধবও অনেক ছিলেন। তখনকার অনেক ভক্ত সাধকজনের সঙ্গে তিনি মিশিতেন, কিন্তু সম্প্রদায় হইয়া উঠিবে ভয়ে একটি সাধকসমাজ গড়িয়া তোলেন নাই। তাঁর পুত্র কমালও সম্প্রদায় গড়িলেন না। তাঁর শিষ্য দাদূ (কোনো কোনো মতে তাঁর পরম্পরাক্রমে শিষ্য) অনুভব করিলেন যে, এমন একটি সাধকমণ্ডলী গড়িয়া তোলা দরকার যেখানে সকলের সাধনা সামঞ্জস্য পাইতে পারে।

দাদূর সঙ্গে এসব বিষয়ে আকবরের চল্লিশ দিন ব্যাপী আলাপ হয়। আকবরও দাদূর এই সাধকসমাজের আনন্দ আস্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁর মণ্ডলীর নাম প্রথম রাখেন "অলখ দরীবা" অর্থাৎ যেখানে ভগবানের অনুভবের বিনিময় পরস্পরের মধ্যে হইতে পারে। তারপর নাম রাখিলেন "চৌগান" অর্থাৎ মুক্ত ময়দান যেখানে সকলেই স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের জন্য যায়। এই সাধন মণ্ডলীতেও সকলে যাইবেন, নিজ নিজ সম্প্রদায়-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিজেদের অধ্যাত্ম স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য। জয়পুরের রাজা ভগবান দাস (মানসিংহের পিতা) দাদূকে এইরকম সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা কি জিজ্ঞাসা করিলে দাদূ বলিলেন,—

"তোমরা নগরে কেন মাঝে মাঝে উদ্যান ও ময়দান রাখিয়াছ?" তারপর ইঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক বলিয়া এই মণ্ডলীর নাম সকলে দিলেন ব্রহ্মসম্প্রদায়। মাধ্বীদের মধ্যে পূর্বেই একটি ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ছিল বলিয়া দাদূ নামটি পরিবর্তিত করিয়া নাম দিলেন "পরব্রহ্ম সম্প্রদায়"। (এই বিষয়ে বিশ্বভারতী জর্নালে আমার লিখিত দাদূর ব্রহ্মসম্প্রদায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

দাদূর শিষ্য জয়গোপাল তাঁর "জীবনপরচী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—দাদূ মুসলমান বংশোচিত সাম্প্রদায়িক

পদ্ধতি ছাড়িয়া দিলেন অথচ হিন্দুদের সংকীর্ণ বিধি আচরণাদি হইতেও দূরে রহিলেন।

তুর্ককী রহ খোজ সব ছাড়ী
হিন্দুন কে করণীতে পুন ন্যারী॥

দাদূ ষড়্ দর্শনের পথ ছাড়িয়া ভগবদ্‌রঙ্গে নিশিদিন রঙ্গিয়া রহিলেন। তিনি বাহ্য সাজসজ্জা ভেখ ও সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি না মানিয়া পূর্ণব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানিলেন। দেবদেবী পূজা-পদ্ধতি তীর্থ ব্রত সেবা জাতি কিছুই মানিলেন না।

ষট্ দর্শন সে নাহি সংগা।
নিশ দিন রহে রামকে রংগা॥
স্বাংগ ভেখ পংপংথ ন মানী।
পূরণ ব্রহ্ম সত্যকরি জানী॥
দেবী দেব ন পূজা পাতী।
তীরথ্ ব্রত ন সেবা জাতী॥

(জয়গোপালকৃত জীবনপরচী)

ইহাতে বাহ্যপ্রতীক লিঙ্গমূর্তি আদি পূজার স্থান নাই বলিয়া এই সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-সম্প্রদায় বলিত (সুন্দরসার ১৩ পৃঃ, পুরোহিত হরিনারায়ণ কৃত)। ইহাতে বিস্তর হিন্দু সাধক ছিলেন, মুসলমান সাধকদের সংখ্যাও কম নহে। কাজী কাদমজী, সেখ ফরিদজী, কাজী মহম্মদজী, সেখ বহাদুরজী, বখনাজী, রজ্জবজী প্রভৃতি মুসলমান এই দলে ছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে দাদূ বিবাহিত হইয়া এই মণ্ডলী গঠনে হাত দেন। কবীরের মত ওঁরও আদর্শ ছিল সাধকরা সব বিবাহিত গৃহী হইবেন। দাদূর দুই পুত্র গরীবদাস ও মসকীন দাস। তাঁর দুই কন্যা নানী বাঈ ও মাতা বাঈ। পারিবারিক জীবনেও দাদূ খুব স্বাধীনতা দেওয়া ভাল মনে করিতেন। দাদূর ইচ্ছা ছিল তাঁর কন্যারা বিবাহিত হইয়া ধর্ম্ম সাধনা করেন। কন্যারা ব্রহ্মচারিনী থাকতে চাহিলেন। দাদূ বুঝাইলেন, কিন্তু বাধা দিলেন না। এই দুইটি যুবতী কন্যাকে অবিবাহিত দেখিয়া রাজা ভগবান্ দাস একটু অসন্তোষ জানান, দাদূ তাই জয়পুর রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন।

দাদূর আকাঙ্ক্ষা ছিল—

ইহাতে জ্ঞানী অজ্ঞান উচ্চ নীচ সকলেরই অনুকূল ধর্ম্মের একটি সরল ও মহৎ আদর্শ সকলেরই কাছে স্থাপিত হউক। ইহাতে উপাসনা-রীতি প্রবর্ত্তিত হইল সরল ও উচ্চ ধরণের, যাহাতে অতি সহজেই মানুষ পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। এই সাধনমণ্ডলে প্রত্যেক নরনারীর জ্ঞানে ও সাধনায় সমান অধিকার ছিল।

(চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী কৃত
দাদূপন্থী সাহিত্য, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

এই সাধনমণ্ডলী স্থাপনে সকল লোকই দাদূর উপর চটিয়া গেলেন। দাদূ বলিয়াছেন—

আমি যখন হইতে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িলাম তখন হইতে সকল লোক চটিয়া গেলেন। তবে সদ্‌গুরুর প্রসাদে আমার না আছে কোনো হর্ষ, না আছে কোনো শোক।

দাদূ জবহীঁ কম নিপখ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
সত গুরুকে পরসাদথেঁ মেরে হরখ ন শোক॥

বিশ্বাসে সাচ্চা ও ভাবে গভীর সাধনার্থীর সবারই জন্য এই মণ্ডলীর দ্বার মুক্ত রহিল। উচ্চনীচ জাতি বলিয়া কোন বাধা রহিল না। পুরুষ ও নারী, ধনী ও দরিদ্রের কোন ভেদ ইঁহারা মানিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহই ধন মান পদমর্য্যাদার জোরে নেতৃত্ব লাভ করেন নাই। সত্যের, ভাবের ও সাধনার দাবীই ছিল সবচেয়ে বড় দাবী।

এই সাধনা ছিল সর্ব্বমানবের মধ্যে প্রেম ও মমতা প্রচার করিতে। এই ধর্ম্ম কাহাকেও আঘাত করে না এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের অপ্রেম ঘটিতে দেয় না। এ ধর্ম্ম জগতের সকল মানবকে এক পরম পিতার সন্তান বলিয়া জানে, কাজেই সকলকে এক পরিবার ভুক্ত মনে করিয়া সর্বত্র ভ্রাতৃভাব ও ভগ্নীভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। বিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে পরস্পরের প্রেমে মিলিত করিয়া এই ধর্ম্ম সকলকে নব উদ্যমে নব নব কল্যাণের নিমিত্ত অগ্রসর করিতে চায় (দাদূপন্থী সাহিত্য, ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

ইহাতে একমাত্র নির্ম্মল ব্রহ্মের উপাসনাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। নিরঞ্জন নিরাকার অদ্বৈধ ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি, প্রেমের সহিত ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্ম ধ্যান ও ব্রহ্ম সমাহিত হইয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইঁহারা জাতি পংক্তির রীতি মানেন না। বাহ্যপূজার পদ্ধতিকে ইঁহারা সম্মান করেন না। অন্তরের মধ্যে পূজাই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ পূজা, (ঐ, ৭র্থ পৃষ্ঠা)।

দাদূর শিষ্য সুন্দরদাস দাদূর পরিচয়ে লিখিয়াছেন—

যিনি জাতি, কুল আর বর্ণাশ্রমকে মিথ্যা নাম বলিয়াছেন, সেই দাদূ দয়াল আমার প্রসিদ্ধ সদ্গুরু, তাঁহাকে আমার প্রণাম।

জিন জাতি কুল অরু বর্ণআশ্রম কহে মিথ্যা নাম হৈ।

দাদূ দয়াল প্রসিদ্ধ সদ্গুরু তাহি মোর প্রণাম হৈ॥

(সুন্দরদাস, গুরু-উপদেশ-অষ্টক)

সাধারণ লোকের বিরুদ্ধতার ভয়ে বীরের মত তিনি বর্ণাশ্রম প্রভৃতির উপর আঘাত করিতে ভীত হন নাই।

যখন হিন্দু-মুসলমান দুইপক্ষ ঝগড়া করিয়া মরিতেছিল তখন দাদূ দয়ালের উপদেশ দশদিক উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হইল। সুন্দর বলেন, এই পন্থই পরব্রহ্মের সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

দাদূ দয়াল দহদিশি প্রকট ঝগড় ঝগড়ি সে পথ থাক।

কহি সুন্দর পংথ প্রসিদ্ধ হৈ সম্প্রদায় পরব্রহ্মকী॥ (ঐ)

দাদূ গেরুয়া পরিতেন না, বিভূতি লাগাইতেন না, তিলক মালা ধারণ করিতেন না। মুসলমানী পদ্ধতি ত্যাগ করিলেন। হিন্দুর সকলগুলিও গ্রাহ্য করিতেন না।

ভগবাভী ভাবে নাহি, বিভূতি লগাবৈ নাহি টিকা মালা মানৈ নাহি।

তুরকো তো ছোড় গাড়ী হিন্দুনকী হদ্দছাড়ী…
(রজ্জবজী কৃত দাদূ দয়াল ভেটসবেয়া।)

ইহার একশত বৎসর পরে দাসজীকৃত পন্থপ্রথা গ্রন্থেও দেখি এই মণ্ডলী খুব বিশুদ্ধ ছিল। আজও ইঁহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত হইতে পারে নাই। ইঁহাদের উত্তরাদী নামে শাখা অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে একটু আধটু মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে, কিন্তু বিরক্ত, নাগা প্রভৃতি দলের বাধা পাওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও রজ্জবজীর শাখাতে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে যিনি সবচেয়ে বড় সাধক হন তিনি সকলের নেতৃপদে নির্বাচিত হন।

কবীরের ছিল যাহা আপন জীবনের সাধনা এবং যাহা কবীর কেবল বন্ধু-বান্ধব কয়েকজনকে লইয়া সাধনা করিতেন, দাদূ তাহাই লইয়া একটি সাধনার মণ্ডলী তৈয়ার করিলেন এবং কয়টি শতাব্দী ধরিয়া সেই আদর্শ যে নির্ম্মলভাবে আজও চলিয়া আসিতেছে সে-কথা রামমোহনের মণ্ডলীগত সাধনার শতবার্ষিকীর দিনে স্মরণীয়। ইঁহারাও জাতি, পংক্তি, দেবদেবী, বাহ্য আচার নিয়ম, বাহ্য চিহ্ন, ব্রত উপবাসাদি, পুরুষ ও নারীর অধিকার পার্থক্য, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য প্রভৃতি মানিতেন না।

দাদূর শিষ্য রজ্জবের সময় এই আদর্শটি আরও ভাব ও সাধনার ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিল। রজ্জব ছিলেন ভক্ত ও ভাবুক সাধক; শুষ্ক বৈরাগ্য তাঁর পথ নয়। তাই দেহকে ব্যথা বড় দুঃখ দিয়া জীবনকে শুষ্ক করিয়া যে সাধনা তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রজ্জব বলিলেন—

মনের মধ্যে রহিল অপরাধ, তাহার নাগাল না পাইয়া হাতের কাছে বেচারী দেহকে পাইয়া তাহার উপর ঝাল ঝাড় কেন? পাল্লামাতা পরের সঙ্গে ঝগড়ায় হারিয়া নিজের অসহায় ছেলেকে ধরিয়া ঠেঙ্গায়। এও যেন তাই। বেচারা কেবল মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবে 'হইল কি'? গর্ত্তের মধ্যে রহিল ভয়াল সাপ, তার নাগাল না পাইয়া গর্ত্তের উপরে কেবল আঘাত করিয়া লাভ কি? দেহকে কসিয়া তেমনি নিষ্ফল সাধনা। হে রজ্জব, কেন এমন কর? ভগবান্ অসহায় দেহখানিকে তোমার সাধনার সহায় করিয়া যে তোমার হাতে দিয়াছেন তার উপর অকারণ উৎপীড়ন না করিয়া তাহাকে প্রেমের সহিত প্রতিপালন কর।

কাঁস দেহে ন মাঁর সকে বাবী বীচ সর্প ভয়াল।

সো রজ্জব কছু করহিতো প্রাণকূ প্রেমপ্রতিপাল॥

সাধনার জন্য পূর্ণভাবে আমাদের ভিতরকার সব শক্তি ও সব সম্ভাবনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাই ছিল রজ্জবের মত। এক অংশের পোষণের নিমিত্ত অন্য অংশকে শুকাইয়া নষ্ট করা কখনো সাধনা নহে। তাই রজ্জব কহিলেন—

দয়া জিনিষটা ভাল তবু তাহা পোষণ করিতে গিয়া যদি কেহ পৌরুষকে বধ করিল, তাহাও ত দয়া হইল না, তাহা হত্যা করা হইল। ইহা কিছু ধর্ম নহে। এ যেন ভাইকে মারিয়া ভাইকে পোষণ করা, এই কথাটা বুঝিয়া দেখিলে আমরা এরূপ করিতে অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতাম। বাঘ বিড়ালাদি জন্তু দুই-একটি বাচ্চাকে শক্তিশালী করিতে অন্য বাচ্চাগুলিকে মারিয়া খাওয়ায়—তেমনি জীবনের কতকগুলি ভাবকে মারিয়া দুই-একটি বিশেষ ভাবকে শক্তিশালী করার যে সাধনা —বলিহারি যাই সেই সাধনাকে।

> দয়া লাগি নরপণ বধৈ খাতক ধরম ন কোয়।
> ভাইকঁ হতি ভাইকঁ পোষে সমঝে বহু দুখ হোয়॥
>
> বচ্চ মারি বচ্চ খিলাবৈ জে সে বাঘ বিলাড়ী।
> ভাব মারি ভাবকু সাধৈ সাধনকী বলিহারী॥

সাম্প্রদায়িক ভেদ বিভেদ ছাড়িয়া মৈত্রীতে সব সাধনা সুসঙ্গত করিয়া বৈচিত্র্যের দ্বারা পরিপূর্ণতার সাধনায় ভগবান্‌কে ভজন করিলে কি সুন্দরই না হইত। কিন্তু এ যে দেখিতেছি হিন্দুয়ানীর মধ্যেই হিন্দু খুসী, মুসলমানীর মধ্যেই মুসলমান খুসী, তবে রজ্জব, সেই প্রেমময় যে এক। তাঁর তো এ দুয়ের মধ্যে কোন ভেদ বুদ্ধি নাই।"

> হিন্দুগতি হিন্দুখুসী তুরক তুরকী মাহিঁ।
> রজ্জব আশিক এক কে তিনকে দুন্য নাহিঁ॥

তখন রজ্জবকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি তবে সাধনার নানা ভাব নষ্ট করিয়া পৃথিবীতে কেবল একটিমাত্র পথ রাখিতে চাও?" রজ্জব কহিলেন —"তবে তো বাঘবিড়ালের পদ্ধতিই হইল। সব বাচ্চা মারিয়া একটি বাচ্চা পুষিলাম মাত্র। পৃথিবীতে যত মানুষ তত ধর্ম। সকলের বিভিন্নতাকে মৈত্রী ও সুসঙ্গতি দ্বারা এক করিয়া একটি পরিপূর্ণ সাধনার বিচিত্র সৌন্দর্যে সুন্দর ঐক্যকে গড়িয়া তোলা।

জগতে চৌরাশী লক্ষ লোক (জনসংখ্যার জ্ঞান তাঁর এইরকমই ছিল)—এই চৌরাশী লক্ষ সম্প্রদায় রচনা করিয়া সেই বিশ্বম্ভর জগতে বৈচিত্র্য রচনা করিলেন। জনের জনের বিচিত্রতা দ্বারা নিখিল মানবের সাধনা বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইল।

> চৌরাশী লক্ষ সম্প্রদা করি বিসম্ভর সোয়।
> রজ্জব বৈচিত্র রচিয়া জনজন বৈচিত্র হোয়॥

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলের সব সাধনা লইয়া এই বিশ্বময় একটি মহাপ্রণীত এক ব্রহ্মের চরণের দিকে চলিয়াছে। নানাজনের সাধনার বিন্দু বিন্দু লইয়া সাধন রসের সিন্ধু হইয়াছে। এই বিন্দুগুলি না মিলিলে প্রত্যেকে শুকাইয়া জগৎময় একটি বিরাট মরুভূমি হইত মাত্র।

> এঁকে বন্দগী বিশ্বমে এঁকে ব্রহ্ম মিলি জায়।
> বুন্দ বুন্দ মিলি রস সিন্ধু কে জুদা জুদা মরু ভায়॥

কিন্তু চারিদিকে তখন ঘোর অজ্ঞান বিরুদ্ধতা, তার মধ্যে এই সত্য কয়জন বুঝিবে? তবু রজ্জবের ভয় নাই। তিনি বলিলেন—যুগে যুগে বারবার সত্যই মিথ্যাকে আঘাত করিয়া জয়ী হইয়াছে। হে রজ্জব, ত্রাস করিও না। এই মহাসত্যের ব্যতিক্রম কখনও হইবার নহে।

> সাচ সত্য দে বহু টৈক, জুগ জুগ বারংবার।
> রজ্জব ত্রাস ন কীজিয়ে তামে ফেৰ ন ফার॥

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ আশ্রয়ে না লুকাইয়া যাহারা সত্যের উন্মুক্ত সমরক্ষেত্রে নির্ভয়প্রাণে আসে তাহারাই বীর। এই জগৎ তাহাদের সাধনার সমরভূমি, এখানে প্রতিমুহূর্তেই তাহারা মনে করে যে প্রভুর জন্য তারা লড়িতেছে তাই সদাই প্রভুর সাথে সাথে আছে।

> ভেখ পখ ভাবৈ নহী সত্য নিরভয় প্রাণ।
> রজ্জব রহে সনাথ ঘর সুরা জক্ত মৈদান।

এই বীরেরাই নূতন জগৎকে সৃষ্টি করিবে। বীর

বিনা এই সাধনার জগৎ বাঁচতে পারে না। হে রজ্জব কোটি কাপুরুষ মিলিলেও তাহারা তাহাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া এক পা বাহিরে যাইতে সাহস করে না।

সূরা বিনা সংসার কু বিরচ্যা কধী ন জায়।
রজ্জব কায়র কোটি মিলি বাহর ধরে ন পায়॥

যে সত্যের জন্য বীরেরা প্রাণ দিতে পারে সে সত্য কখনো ক্ষুদ্র হইলে চলে না। তাই রজ্জবের সত্যও ছিল বিশাল। "সব সত্যের সঙ্গে যদি মেলে তবেই তাহা সত্য, নহিলে তাহা মিথ্যা। রজ্জব এই সত্য কথাটা বলিয়া দিল। এখন চাই তুই হও চাই রুষ্ট হও।"

সব সাচ মিলে সো সাচ হৈ না মিলে সো ঝুট।
জন রজ্জব সাচী কহী ভাবৈ রিঝি ভাবৈ রূঠ॥

কুরাণ পুরাণ বেদশাস্ত্র রজ্জব মানিতেন না, তিনি বলিলেন—

হে রজ্জব, বসুধাই সব বেদ আর অখিল সৃষ্টিই কুরাণ—। পণ্ডিত ও কাজীরা কতকগুলি কাগজপত্র দপ্তরকেই অখিল জগৎ মনে করিয়া ব্যর্থ হইতেছেন। বিশ্বসৃষ্টিই হইল শাস্ত্র। ওরে রজ্জব, শুষ্ক কাগজ কি পড়িব, সেখানে চাহিয়া দেখ নিত্যই তাজা জ্ঞান।

রজ্জব বসুধা বেদ সব কুল আলম কুরাণ।
পণ্ডিত কাজী বৈথড়ৈ দফতর ছানিয়া জান॥
সৃষ্টি শাস্তর হৈ সহী বেক্ত করে বখান।
রজ্জব কাগজ ক্যা পঢ়ে নিতহি তাজা গ্যান॥

সাধকের অন্তরের কাগজে প্রাণের অক্ষরে লেখা সে শাস্ত্র তাহা তো কেহ পড়ে না। মরমের সঙ্গীত ইহারা শুনিতেই পায় না।

সাধন হায় কী অংতর কাগজ প্রাণ অক্ষর মাঁহি
যহ পুস্তক কেউ বিলা বাঁচে মর্ম শব্দ ন সুনাহি॥

কোটি মানব মিলিয়া যে বিরাট মানব জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) তাহাতে বিরাট অনন্ত বেদ ঝলমল করিতেছে। বাহিরের বাহ্য আলো নিভাইয়া দিলে মরমী তার মরম পায়।

প্রাণ কোটি ব্রহ্মাণ্ড মে ঝলকে অনন্ত বেদ।
বাহরা জোত বুঝায়কে ভেদী পাবৈ ভেদ॥

হে হিন্দু, হে মুসলমান, সেই জীবন্ত শাস্ত্র পড়িয়া দেখ। বিশ্বনিখিলে এক মহাবিদ্যাই পাইবে, পড়িলেই জীবন্ত জ্ঞানে পণ্ডিতপ্রাণ হইয়া উঠিবে। শুষ্ক মৃত কাগজে মৃত অক্ষরে যে শাস্ত্র তাহার পাঠক মিলে অনেক। ঘটে ঘটে যে প্রাণময় বেদ, হে রজ্জব তাহা দেখ পড়িয়া।

প্রাণ পুস্তক দেখহু হিন্দু মুসলমান।
সবমে বিদ্যা একহি পঢ়ে সু পণ্ডিতপ্রাণ॥
কাগজ মুতা অক্ষরই পাঠক মিলে অনেক।
বেদ ঘট ঘট প্রাণময়ী রজ্জব বাঁচকে দেখ॥

এই মহাসত্য যাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছে তাঁহাদের সকলে যদি সাধনার প্রাঙ্গণে মিলিতে না পারেন তবে সকলেরই সাধনা দুর্বল হইয়া পড়ে। তাই তাঁহারাও তখন নানা মতের নানা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এই এক ভাবের ভাবুকদের লইয়া একটি সত্যসাধনার মণ্ডলী রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন।

একেলা কাহারও হৃদয়ে যদি এই প্রেম আসিয়া থাকে তবে তাহা শুধু ব্যর্থই হইবে। কারণ প্রত্যেকটি বিন্দুর মধ্যে যে সিন্ধুর ডাক আসিয়াছে। সেই বিরহী বিন্দুগুলি যদি একা একা সিন্ধুর দিকে চলে, তবে কি তাহারা প্রত্যেকেই ব্যর্থ হইবে না? তাই সিন্ধুবিরহী একটি বিন্দু অপর সকল বিন্দুকে ডাকে, কারণ, সব বিন্দু একত্র হইতে পারিলেই সংযোগে একটি ধারায় গতি মিলিতে পারে। একেলা কোন বিন্দু পৌঁছিতেই পারে না, মাঝের ব্যবধান ও পথই তার সব শক্তি সব জীবনটুকু শুকাইয়া মারিবে। আবার সব বিন্দু যদি একত্র হইতে পারে তবে সেই ব্যবধানকে, সেই পথকে নিজেদের পরিপূর্ণতায় প্লাবিত করিয়া দিতে পারে। হে প্রভু, তোমার দয়াতেই তোমার দরশ মেলে—বিন্দু বিন্দু সাধনা মিলিয়া আজ ক্ষীরসাগরে চলিয়াছে। এই সাধনার জীবন্ত ধারাই তো জীবন্ত গঙ্গা। এই গঙ্গায় স্নান না করিয়া মৃত গঙ্গায় স্নান করিলে লাভ কি?

প্রীতি অকেলী ব্যর্থ মহাসংঘবিরহী দিল হোয়।
বুংদ পুকারৈ বুংদ কো গতি মিলৈ সংজোয়॥
অকেল বুংদ পহুচৈ নহী সুখে পংথ জিংজোর।
পংথ ভর ভরে এক হোয় দরস দয়া প্রভু তোর॥
বুংদ বুংদ সাধন মিল হোয় সাগর অঁটি।
প্রাণ গংগা না পহুচা মুরদ গংগা সমাঁই॥

এই যে সাধকদের সৎসঙ্গ ইহাই তো সত্য তীর্থ। এখানে স্থান এবং কাল অতিক্রম করিয়া সব ধারা আসিয়া মিলিত হইতে পারে। যুগযুগের ধারা এখানে মিলিয়া অন্তহীন পদে সদা বহিয়া চলিয়াছে।

সত্য তীরথ সৎসঙ্গ হৈ স্থান কাল লংঘি জায়।
জুগ জুগকে ধারা মিলে অংতহীন পদ ধায়॥

তাঁদের সময়ে দেশদেশান্তরের যুগযুগান্তরের সব ধারা মাত্র কল্পনার কথা ছিল। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীতে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুদের চিন্তার ধারা নানাযুগের মধ্য দিয়া তার বিশিষ্টতা লইয়া চলিয়া আসিতেছিল, শক হূণ প্রভৃতি জাতি ভিন্ন ধারা আনিলেও তাহারা তেমন বিরুদ্ধভাব লইয়া আসে নাই, কাজেই হয় তারা চলিয়া গিয়াছে নয় তারা অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা যখন আসিল তখন হিন্দু তার জীবনী শক্তি হারাইয়াছে। তখন ভারতের খণ্ড খণ্ড জাতি, খণ্ড খণ্ড ধর্ম, খণ্ড খণ্ড রাজ্যকে প্রাণযোগে এক করিবার শক্তি আর তার নাই, তখন তার সৃষ্টিশক্তি নাই, তখন সে কেবল আচার-বিচারের জঞ্জালকে নিত্য বাড়াইতেছে। এমন সময় বিরুদ্ধ শক্তি ও ভাবা লইয়া মুসলমান আসিল, স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দু পরাভূত হইল। ভারতের এই নূতন জাতির সমাগম এখন আর কেবলমাত্র এমন একটি স্বতন্ত্র শক্তির সমাগম নয় যে কোনো রকমে তাহাকে পরিপাক করা চলিতে পারে। এ একেবারে বিরুদ্ধ শক্তির সমাগম। তাই উভয়দিকে অনেক দুঃখ চলিল। এই দুঃখে একদল প্রাকৃতিক নিয়মে অপরকে পরাভূত করিয়া নিজেদের আদর্শ আত্মশক্তিকে জয়ী করিতে চাহিল। মধ্যযুগে যেমন কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সাধকেরা যোগের কথা ভাবিতেছিলেন, তেমনি আবার স্বাভাবিক নিয়মবশেই হিন্দু-মুসলমান উভয়দলে কতক ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান্ লোকও অপর পক্ষকে পরাভূত করিয়া নিজেদের আদর্শকেই জয়ী করিতে চাহিয়াছেন। সমর্থ রামদাস স্বামী, ভূষণ কবি প্রভৃতি শিবাজী ছত্রশাল প্রভৃতিকে লইয়া হিন্দুদের দিক হইতে সে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমানের দিক হইতেও সে চেষ্টা কিছু কম হয় নাই। আওরংজেব তাদের আদর্শ। কিন্তু একেকে মারিয়া অন্যের জয়ী হওয়া ভারতের পন্থা নহে—তাই উভয় শক্তিই নিজেদের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য বাহির হইতে আগত অপর এক শক্তির নিকট হারাইল। স্বভাবের নিয়মে যাহারা সে যুগে নিজেদের শক্তিকেই কেবল জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারাও সামান্য শ্রেণীর লোক নন। তাঁহারা সকলেই গভীর ভাবে নিজেদের সাধনাকে সত্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের পন্থা হইল যোগের পন্থা। সে পথ তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়া সত্যকে অগ্রসর করিতে পারিলেন না। যদিও তাঁহারা স্বাভাবিক মনুষ্য স্বভাব নিয়োজিত হইয়াই এই পথ ধরিয়াছিলেন।

যাঁহারা আরও গভীর সাধক তাঁহারা নিজেদের দলের জয়ই বড় করিয়া না দেখিয়া উভয় সত্যকে যোগে বড় করিয়া দেখিতে চাহিলেন। তাঁহারাই ভারতের যোগদৃষ্টির মনস্বী। সকল দলের একটু একটু বাহ্য চিহ্ন মাত্র লইয়া নানাদলের বাহ্য চিহ্নের একটা খিচুড়ী পাকান মাত্র তাঁহারা করেন নাই। আকবরের ইচ্ছা ছিল অতি সৎ, অথচ কবীর প্রভৃতি সাধকদের মত গভীর দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি দাদূ প্রভৃতি সাধকদের সঙ্গে মিশিয়া খানিকটা নানা সম্প্রদায়ের বাহ্য চিহ্ন ও পদ্ধতিকে জোড়াতাড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দারা শুকো আরও গভীর লোকে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের বাহ্য প্রতীকগুলি লইয়া ধর্মের একটা অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার একাকার মাত্র তিনি করিতে যান নাই। তাঁহার সভা সাহিত্য কাব্য ও ধর্মালোচনায় সদাই ভরপুর থাকিত। একদিকে ভামিনী-বিলাস রসগঙ্গাধর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের কবি জগন্নাথ

মিশ্র, অন্যদিকে ভাষা কবি শম্ভুনাথ সিংহ, সরস্বতী শর্মা, বেদাঙ্গ রায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। তাঁহারই প্রভাবে আওরংজেবের সময়েও হিন্দী সাহিত্য একেবারে মরিয়া যায় নাই ও আওরংজেবের পুত্র আজম শাহ বিহারী কবির এক সংগ্রহ সম্পাদন করেন। তুলসী কবির সংগৃহীত পঁচাত্তরটি কবির কাব্যসংগ্রহ "কবিমালা" তিনি যত্নপূর্ব্বক আগাগোড়া পড়িয়াছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে দাদূপন্থী কবীরপন্থী সাধকদের সঙ্গে তাঁর গভীর আলাপ চলিত। ভক্ত বীর ভান, লাল দাস প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনায় দারার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন।

পঞ্জাবের ভক্তসাধক বাবালাল সর্ব্বদাই দারার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার জন্য যাইতেন। হিন্দু-মুসলমান সাধনার যোগ সম্বন্ধে তাঁর সুন্দর ও গভীর সব স্বপ্ন ছিল। মৃত্যুতে সবই অপূর্ণ রহিয়া গেল।

যে সব মনীষীরা তাঁহাদের সাধনালব্ধ গভীর দৃষ্টির দ্বারা ভারতের সত্য যোগের পন্থা বাহির করিতে চাহিয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায় হইতে আরও অনেক বড় এমন একটি মহান্ সত্যকে আদর্শ রূপে ধরিয়াছেন যাহা সাধন করিতে নিজেদের অনেক ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়িতে হয়। এইখানেই সমসাময়িক এমন অনেক ক্ষুদ্র লোকের বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতা তাঁহারা পাইয়াছেন যাহারা ভারতের যথার্থ সমস্যাকে কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। তবু তাঁহারা এইসব ক্ষুদ্রাত্মাদের কাছে সস্তা মহাপুরুষ না হইয়াই যথার্থ সত্যপালনের কঠিন দুষ্কর ব্রত দিনরাত্রি ধারণ করিয়া নিন্দা বিরুদ্ধতার শত শত আঘাত নিত্য সহিয়া নিজেদের তপস্যাকে অগ্রসর করিয়া চলিয়াছেন। রামমোহনের তপস্যাও ছিল এই রকমের। তাই তাঁহার সমসাময়িক, এমন কি তাঁহার কালের অনেক পরে আজও অনেকে তাঁহার যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই।

সমসাময়িক কালে বার বার অসম্মান অপমানের ভূষণে ভূষিত হওয়াই মহাপুরুষের লক্ষণ। এই লক্ষণ সকল যুগের মহাপুরুষদের সম্বন্ধেই খাটে। মহাপুরুষের লক্ষণ বুঝাইতে গিয়া ভক্ত রজ্জবজী বলিয়াছেন—

মহাপুরুষেরা সকল বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া অন্ধকারকে আলোকময় করিয়া দেন। অমূল্য মানুষ-জন্মে তাঁহারা প্রেম ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের সাধনায় সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়, দৈন্য সংশয় দূরে পলায়ন করে। প্রেমে ও ভাবে সকল চিত্ত ভরিয়া উঠে, হৃদয়ে পরমানন্দ জাগিয়া উঠে।

> মহাপুরুষ নিরবন্ধ করে তিমির প্রকাশ।
> অমোল মানুষ জন্মমেঁ থাপৈ প্রেম বিশ্বাস॥
> মুক্ত হোয় বন্ধ সব দৈন্য সংসৈ ভাগে।
> প্রেম ভাব সব চিত্ত ভরে পরমানন্দ উর জাগে॥

সকলের হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত প্রেমকে মহাপুরুষেরা আপন হৃদয়ের প্রেম দিয়া জাগাইয়া তোলেন, জাগাইবার আর উপায় ত নাই।

প্রেম বিনা প্রেম জাগে না। অগ্নিই অগ্নিকে জাগাইতে পারে। বীরই বীর্য্যকে জাগায়, ত্যাগীই ত্যাগকে জাগায়। হৃদয় হইতে হৃদয়ের ভাব সঞ্চারিত হয়। সাধনাই সাধনাকে জাগায়। সতী ও যতীকে দেখিয়াই প্রেম ও আরাধনা জাগিয়া উঠে।

> প্রেম ন জাগে প্রেম বিন আগ জগাবৈ আগ।
> শূরা শূরপন জগাবৈ ত্যাগী জগাবৈ ত্যাগ॥
> উরসে ভাব উর সংচরে সাধন জগাবে সাধ।
> সতী জতীকো দেখিকে জাগে প্রেম আরাধ॥

মানবের সকল বন্ধন খুলিয়া সেই বন্ধন-পাশ জ্বালাইয়া (bonfire) মহাপুরুষেরা অখিল ভরিয়া যে মহোৎসব করেন দুষ্ট ও নীচেরা তাহাতে দগ্ধ হইয়া মরে। এই সৌভাগ্য তাহারা যেন সহিতেই পারে না।

> মহোৎসব অখিল ভর ভয়ো বন্ধ পাশ জলাই।
> দুষ্ট কমীনা দহি মরে সৌভাগ্য সহা ন জাই॥

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এই দুঃখ পাইয়াছেন।

এই সব নীচ কুকুরেরা গোরখ, দাদূ সকলের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়াছে। কুত্তার সব ভাবই এই। কবীর, রবিদাস ও সকল সাধকের বিরুদ্ধেই এই চীৎকার চলিয়াছে। নীচের প্রাণই নীচ।

ভৌঁকাহিঁ গোরখ দাদূকুঁ কুত্তোকী মহ বান।
কবীর রৈদাস ঔর সব সন্তকুঁ ওহকা ওহ প্রাণ॥

তবে এই চীৎকারে একটা লাভ আছে বটে। যখন সবেই নিদ্রিত তখন কোনো মানুষ আসিলে লোকে টের পায় কুকুরের চীৎকার শুনিয়া। তেমনি অন্ধকার নিদ্রিত যুগে অনেক সময় মহাপুরুষদের আগমন লোকে টেরই পাইত না যদি এই-সব নীচরা বিরুদ্ধতার চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া না দিত।

কখন যে মহাপুরুষদের উদয় হয় অনেক সময় নিদ্রায় অন্ধ নয়ন তাহা দেখিতেই পায় না। নীচ এ অধমদের এই বিরুদ্ধতার চীৎকার শুনিয়াই অচেতন মানব সচেতন হইয়া মহামানবের আগমন অনুভব করে।

মহাপুরুষ উদয় কদি অংধ নৈন নহিঁ জোয়।
নীচ ওহকা শোর সুনি অচৈত সুচেত হোয়॥

মহাপুরুষ সত্য কি না বুঝিতে হইলে রজ্জবের প্রথম প্রশ্নই হইল এই সমসাময়িক কুকুরেরা তাহার বিরুদ্ধে সমবেত চীৎকার করিয়াছিল কি না।

কিন্তু এত বিরুদ্ধতাতেও মহাপুরুষদের অনন্ত মহা সত্তা পরাভূত হয় না। তাঁহাদের সাধনার সত্য বিরুদ্ধতার বিপুল পরিমাণকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না।

সমুদ্রের তলে সাগর প্রমাণ জলের সকল বিরুদ্ধতা জয় করিয়া বাড়বানল জ্বলে। মহাগিরির উচ্চ শিখরে নিম্নগামী জল উঠিয়া সেখানে হইতে ঝরিয়া পড়ে। ভাব ও প্রীতি কিছুতেই মরে না।

সিন্ধু বারি বড়বানল জ্বলে বারি বিরোধ জীতি।
মহাগিরি শির নিঝর ঝরে মরে ন ভাব প্রীতি॥

এই সবগুলি লক্ষণই রামমোহনের সম্বন্ধে খাটে। তাঁর সাধনা তাঁর সত্য মরিবার নহে। বিরুদ্ধতা তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন এবং এই বিরুদ্ধতাই আমাদের অচেতন মনকে সচেতন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, মহাপুরুষ আসিয়াছেন। আজও তাঁর সত্য তাঁর সাধনা কাজ করিয়া চলিয়াছে কারণ এখনো বিরুদ্ধতা চলিয়াছে।

বিরুদ্ধতাকে তিনি ভয় করেন নাই তবু সাধনা সাধনাকে খোঁজে। সাধনা সদাই দৃঢ় ও গভীরভাবে কাজ করিবার জন্য সাধনাকে খোঁজে।

বারির সঙ্গে বারি মিলে বলিয়াই সাগরে সব নদী চলিয়াছে। হে রজ্জব পূর্ণ পূর্ণকে চায়। ভাব ভাবের অনুসারী।

নদী নাথ আরাঁহ নদী বারি ভরি তই বারি
রজ্জব পূর্ণ পূর্ণ কুঁ মিলে ভাব ভাব উনহারী॥

সিন্ধুর দিকে যেমন নদী চলে তেমনি সাধক ও ভাবের ধারা চলিয়াছে। সকল বন্ধন ও মান ত্যাগ করিয়া সেখানে আপনাকে মিলাও। যুগযুগজয়ী সাধনা চলিয়াছে, লোকলোকের সাধক চলিয়াছেন। ভাব ও ভক্তির এই বিশ্বধারা ধরিয়া ভগবানের সহিত গিয়া মিলিত হও।

সংত ভাবকী ধারা চলে সিংধ যে নদী সমান।
ওহ মিলাকে আপ কুঁ তজি সব বন্ধন মান॥
জুগ জুগজয়ী সাধন চলে লোক লোক কা সংত।
ভাব ভক্তি ধারা ধরি জায় মিলো ভগবংত॥

রামমোহনের ব্যক্তিত্বে ও সাধনার মণ্ডলে রজ্জবের মহাপুরুষ ও সাধনার মণ্ডলের পূর্ণ পরিচয়ই পাই।

প্রত্যেক যুগেরই একটি বিশেষ দান আছে। সেই যুগ তখনকার দিনের মহামানবের শ্রেষ্ঠ উপহার লইয়া এক দেশের দ্বারে দাঁড়ায়। যথার্থ ভাবে এই দান গ্রহণ করার সামর্থ্য দ্বারা সেই সেই দেশ তাহার জীবনের সাত্ত্বিকতা ও সাধনার পরিচয় দেয়। জড়প্রাণ তামসিক মৃতপ্রায় দেশ এই দান গ্রহণ করিতে পারে না। কখনো ভয়ে কখনো অভিমানে ক্ষুদ্রজন উপাসিত কোন মনোহর সঙ্কীর্ণতা বিশেষের নাম লইয়া যুগের এই মহাদান প্রত্যাখ্যান করিয়া বিধাতার অভিশপ্ত দেশ যুগধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। কাজেই যে-সব মহাপুরুষ সমগ্র জাতির হইয়া এই মহাদান সত্য ভাবে গ্রহণ করিয়া যুগধর্ম্মকে রক্ষা করেন তাঁহাদের কাজ যেমন মহৎ তেমনি কঠিন। এমন মহাপুরুষ পাইবার সৌভাগ্য যে জাতির নাই তাহারা সেই মহাসম্পদ্ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দিন দিন

তামসিকতাগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। দেশের সব ক্ষুদ্রাশয় অন্ধলোকেরা এই মৃত্যুমুখে যাত্রাকেই জয়যাত্রা মনে করিয়া তাহাকে নানা উপচারে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেদের আসন্ন বিনষ্টিকে সকলের চেতনার ও দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখে।

মুসলমান যখন ভারতে আসিল সে তখন তার মরুভূমিতে প্রাপ্তজন্ম ধর্মের মধ্যে ভারতের জন্য কোন কোন মহাদান আনিয়াছিল। তাহাদের কঠোর সরল একনিষ্ঠা, তাহাদের দৃঢ় বাহুল্যবর্জ্জিত সাধনা তখনকার রসভারাক্রান্ত আচার-বিচার-বাহুল্য-ভারাক্রান্ত ভারতের পক্ষে অতি আবশ্যক ছিল। ভারত তখন তাহার জীবনের কেন্দ্র হারাইয়া, সৃষ্টিশক্তি হারাইয়া নিজেদের আচার-বিচারের জঞ্জালই দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছিল। ভারত হয় তো এই মহৎ দান গ্রহণ করিতেই পারিত না যদি ভারতের হইয়া কবীর, নানক প্রভৃতি উত্তর-ভারতের সাধকেরা, বাংলার বাউলেরা ও অন্যান্য প্রদেশের তৎকালিক গভীর সাধকেরা তাহা গ্রহণ করিতে না পারিতেন।

গঙ্গা যখন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন তখন সাধকবর মহাদেব স্বীয় জটাজালে সেই মন্দাকিনীধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুগে যখন পশ্চিম তাহার বিস্তৃত ও বহুধাবিচিত্র সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য লইয়া উপস্থিত হইল তখন ভাগ্যে ভারতের লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য রামমোহন আপন সাধনার মধ্যে সেই দান গ্রহণ করিলেন। তখনকার দিনে কেমন করিয়া নিজের দেশের বিশিষ্টতা না হারাইয়া এমন শ্রদ্ধার সহিত সেই দান গ্রহণ করিলেন যে তাহা চিন্তা করিলেও মন শ্রদ্ধায় নত না হইয়া যায় না। আজিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত কত বিদ্যাভিমানী সংস্কারমুক্ত হইয়া যে মহাদান শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে বা সেই গ্রহণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম, রামমোহন সেই শিক্ষাবিরল দিনে কেমন করিয়া সেই মহাদান শ্রদ্ধায় অথচ এমন অভিজাত শালীনতার সহিত যথার্থ বীর সাধকের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই সব অংশে ভারতের মধ্যযুগের এই সব সাধকদের সঙ্গে রামমোহনের মিল থাকিলেও অনেক দিকে প্রভেদও আছে। মধ্যযুগে সমস্যা ছিল প্রধানতঃ ধর্মগত ভেদকে মিলাইবার। তাই কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সাধকেরা তাঁহাদের সকল শক্তি, সকল সাধনা ঢালিয়া দিয়াছেন ধর্মসাধনার উপরে। হয়ত ধর্মভাবের গভীরতায় ও ধর্মের ধ্যানে সাধনায় রামমোহন ইঁহাদের কাছে হার মানিতেও পারেন। কিন্তু তাঁহার সময় সমস্যা যে সর্বদিক লইয়া। মধ্যযুগে এই সব সাধকেরা হিন্দু বা মুসলমান জ্ঞান ও শাস্ত্রাদি সামঞ্জস্য সাধনার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। কারণ উভয় দলের জ্ঞানই তখন অনেক পরিমাণে নিজেদের দলের ক্ষুদ্র সত্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুরোপ যখন এই যুগের প্রারম্ভে ভৌগোলিক সব ব্যবধান ভাঙিয়া ভারতে উপস্থিত হইল তখন তাহারা যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আনিল তাহা আর উপেক্ষণীয় নহে। তাহা পরাবিদ্যা না হইতে পারে, কিন্তু অপরা হইলেও তাহা সত্যই বিদ্যা। এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার মধ্যে যোগ স্থাপন করা, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই বিরাট সংঘাতে রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি শিক্ষানীতি ও উভয়দিকের নানাবিধ বিশিষ্টতার সমন্বয় করা সেই যুগে রামমোহন ছাড়া আর যে কেহ এমন অসাধারণরূপে করিতে পারিতেন, তাহা ত বুঝি না। এই যুগের সেই উষায় যখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিলেই হয়, সেই সময় তাঁহার মত এমন কে ছিলেন যিনি এমন গভীর ভারতীয় ও প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এমনিভাবে গ্রহণ করিয়া সেই কঠিন সমস্যা এমন করিয়া সমাধান করিতে পারিতেন। তিনি কোনমতেই সেই যুগের মাপে তৈয়ারী মানুষ ছিলেন না। আজ পর্য্যন্ত অনেকে তাঁহাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার অর্থ, তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহার কালের অনেক পূর্বেই জন্মিয়াছিলেন।

যে সব সমস্যা আজিকার সাধকদের সমক্ষে উপস্থিত, যে সব আকাঙ্ক্ষার সব আকাঙ্ক্ষা এই সব সমস্যাকে লইয়া

এই যুগকে উদ্বোধন করিয়াছেন মহা সাধক মহাপুরুষ রামমোহন। এই সব আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা কতক পরিমাণে যদিও ভারতের মধ্যযুগের মহাপুরুষদের মনে আসিয়াছিল তবু তখন সমস্যা আজকার মত এত জটিল হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের চারিদিকে প্রতিকূলতাও ছিল অপরিমেয়। রামমোহনের জন্ম হইল এমন এক বৈজ্ঞানিক যুগের উষাকালে যখন দেশে বিদেশে ভৌগোলিক সব ব্যবধান দূর হইয়া গিয়াছে, যখন অগণিত জাতি সম্প্রদায় তাহাদের বিচিত্র শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা লইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, যখন দুর্বল জাতিদের দুর্বলতা প্রবল জাতিদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, যখন শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা উৎকর্ষের নানা বিচিত্র ঘাত-সংঘাত প্রতিঘাত চলিয়াছে। রামমোহনও যুগারম্ভের এত বড় বিরাট রচনার যোগ্য মনীষা ও সাধনা লইয়া কেবল হিন্দু মুসলমান নহে জগতের সকল সাধনার মিলনের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, নূতন যুগের উদ্বোধন করিলেন। তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমানভাবে বীরের মত আসিয়া নব নব সৃষ্টিতে হাত দিতে হইল এবং সবই তিনি অসাধারণ-বীরত্বের সহিত সম্পন্ন করিলেন। কোনো মহাপুরুষকেই একসঙ্গে এতগুলি কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। তাঁহার এক-একটি কাজে তাঁহার সমকক্ষ সাধক মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনের জাগরণের জন্য একসঙ্গে এতগুলি কাজে হস্তক্ষেপ করার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। তাঁর বহুমুখী সাধনার নানা অংশ নানাভাবে পূর্বকালে সাধিত হইলেও কখনো একত্র সাধিত হয় নাই। তাই, তিনি এই মহাযুগের আদিলগ্নের শুভ মুহূর্তে জাতীয় জীবনকে উদ্বোধিত করিতে বিধাতার প্রেরিত মহাগুরু।

এক কথায় বলিতে হইলে, রামমোহন ভারতে একটি আকস্মিক সাধনার উপদ্রব নহেন—তাঁহার পূর্বে যুগে যুগে যুগধর্মের মন্ত্রে দীক্ষিত মহাপুরুষরা ভারতের সাধনাকাশে উদিত হইয়াছেন। সর্বতোভাবে বিচিত্র এই মহাযুগের প্রারম্ভে এত বড় বিরাট ও সমস্যাবহুল যুগের উদ্বোধক প্রবর্তক ও যুগধর্ম সাধনার মহাগুরু রামমোহনের মধ্যে পূর্ব যুগের সাধনাগুরু সকল মহাপুরুষেরই সার্থকতা। তাঁহাতেই সকল পূর্ব গুরুর পরিপূর্ণতা।

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৬।

স্বর্গ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বর্গ ? কোথা স্বর্গ ? তাহা আকাশে কি মৃত্যুর পরে
নয়,
স্বর্গ ভক্তের স্বপ্ন নয়ক, স্বপ্ন নয়ক মস্তিষ্কে কবির,
স্বর্গ—সে পদার্থ নয়ক, ধারণা নয়। মহা সমাধির
সাধনা সে ; নয় সে সুখের স্থান।—বড় দুঃখময়!
চলেছে যে মহাছন্দে চূর্ণজ্যোতি অশ্রান্ত অধীর,
কোটি কোটি মহাশূন্যে, তাহাদেরও একটা স্বর্গ
আছে।
ক্ষুদ্রতম কীট যা মাটির মধ্যে থাকে—পাছে
কারও পায়ে দলে' যায়, তারও স্বর্গ আছে জেনো
স্থির।
স্বর্গ—সে সাধনা যাহার অন্ত নাইক ; স্বর্গ—মহা
যোগ ;
স্বর্গ—পরের জন্য সহা ; স্বর্গ—পরের জন্য দুঃখভোগ।

এই যে সৃষ্টি—চলেছে সে একই মহা লক্ষ্য লক্ষ্য
করে'—
কেন্দ্র হ'তে ক্ষেপে, শূন্য হতে বিশ্বে, আত্ম হ'তে
পরে।
সভ্যতাও চলেছে সে একই দিকে—সেই স্বার্থ হ'তে
পরার্থে, স্ব-বৃত্তি হতে প্রেমে, নেওয়া হ'তে দেওয়ায়।
পরের জন্য স্বইচ্ছায় তীব্র জ্বালা মাথা পেতে
নেওয়ায়
যেই দুঃখ—সে-ই স্বর্গ। সেই মহা দুঃখ-মহাব্রতে
বুদ্ধ খ্রীষ্ট শ্রীচৈতন্য পরেছিলেন ছিন্ন চীর-বেশ,
সেই দুঃখের মহাছন্দে গেয়েছিলেন মহাকাব্যচয়।
কেন প্রশ্নের নাইক সীমা ? কেন বিশ্বের দুঃখের
নাইক শেষ ?
—পাছে এ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে সেই স্বর্গ কভু লুপ্ত হয়।
কি কাজ তবে কর্মে মানুষ ? সেদিন কাহার দুঃখ
করে দূর
ধন্য করে ? কি দুঃখে গাহিবে কবি—তাহার বীণায়
বাজাবে কি সুর ?

সেই-ই পরম সুখ—পরের দুঃখে কেঁদে যে সুখ
সুমধুর।
সেই-ই গরীয়সী চিন্তা—পরের সুখের জন্য চিন্তা
করা।
সেই-ই পুণ্যকর্ম—পরের জন্য সহা, দুঃখ করা দূর।
সেই-ই শ্রেয় ধর্ম—পরের প্রতি প্রীতি অনুকম্পাভরা।
সেই মহা দুঃখই স্বর্গ। সেই মহা দুঃখ—মহা সুখ।
সেই মহা সুখের কাছে স্বার্থের যা সম্ভোগ—সে
কতটুক!
সেই মহা প্রীতির কাছে সূর্য্যোদয়ে শশধরের মত
স্বার্থ পাণ্ডু হয়ে যায়—সে আলোকে বিশ্বে সমুদয়
হেয়, কুৎসিৎ অপবিত্র যা'—সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়।
ক্রন্দন নির্বাক্ হয়ে যায়, ও স্বয়ং মৃত্যু হয় সে
পদানত।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪

কলঙ্ক

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাতাবি কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর—
কলঙ্কী মন চেয়ে দেখ্ আজ সঙ্গী মিলেছে তোর।
দিবা অবসান, রবি হল রাঙা
পশ্চিমাকাশে নট্‌কনা-ভাঙা ;
সঙ্গীনের যাহা কিছু সাজ সাঙ্গ করেছি মোর,
কুঞ্জদুয়ারে বসে আছি একা কুসুমগন্ধে ভোর।

আধফুটন্ত বাতাবিকুসুমে কানন ভরিয়া আছে,
কি গোপন কথা গুঞ্জরি অলি ফিরিছে ফুলের কাছে ;
ফুটনোন্মুখ ফুলদলগুলি
পুলক-পরশে উঠে দুলি' দুলি'
গন্ধভিখারী সন্ধ্যার বায় ফুল-পরিমল যাচে—
সঙ্কোচে নত পুষ্পবালিকা, অতিথি ফিরে বা পাছে!

বেলা বয়ে যায়, উন্মাদ বায় আসি' কহে বার বার
সন্ধ্যা হয় যে, অন্ধ কুসুম খোল অন্তর-দ্বার।
মুকুল-গন্ধ অন্ধ ব্যথায়
কুঁড়ির বন্ধ টুটিবারে চায়,
লুটাইতে চায় সন্ধ্যার গায় রুদ্ধ আবেগ ভার,
বিকাইতে চায় চরণের পরে কৌমার সুকুমার।
মন্থর পদে সন্ধ্যা নামিল কাজল তিমিরে আঁকা,
দুয়ারে অতিথি, অন্তরে ব্যথা, সম্ভব সে কি থাকা'?
গন্ধে পাগল অন্তর যার
আবরণ মাঝে থাকে সে কি আর,
খুলি দিল দ্বার, পরাণ তাহার পরাগ শিশিরে মাখা,
কুঞ্জ ঘেরিয়া আঁধারে ছাইল স্বপ্ন-পাখীর পাখা।

বাতাবি-কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর,
হা রে কলঙ্কী হৃদয় আমার, সঙ্গী মিলেছে তোর।
দূর দিগন্তে রবি হল সারা
অম্বর ভরি ফুটে' উঠে তারা,
নব ফুটন্ত লেবুর গন্ধে আসিল তন্দ্রা-ঘোর ;—
কলঙ্কী মন, মুগ্ধ হৃদয়—এ কি পরিণাম তোর।

প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৭।

কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে

মনোরমা সিংহরায়

কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। উজ্জ্বল নির্মল ভোর
বিকশিত স্বাধীন সত্তার। স্বচ্ছ সেই আবরণে
অনাগত দিনের কামনা বার বার দেখা যায়।
তবুও হৃদয় কাঁদে আর আসে একান্ত স্মরণে
যে দিন গিয়েছে চলে নিয়ে তার ঐশ্বর্যসম্ভার।
অবসিত মোহভার। তবু সে তো আছে অমলিন।
যাও, ফিরে যাও তুমি, কিছু নেই আকাঙ্ক্ষা আমার
হীরে, মুক্তো, চুনী, পান্না,
শোনো তুমি হে উজ্জ্বল দিন।
কেন হেঁটে চলে যাও আলোকিত করে এ জীবন।
নীলাকাশে বিস্তৃত বাসনা
ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে কাল
আজন্ম রচিত স্বপ্ন হারিয়েছি জেনো সেই মন॥
আর আমি নবতরো কোনো ফুল
ফোটাতে পারি না।

সব ফুল ঝরে যায়, শ্যামলতা ক্রমে শেষ হয়।
এ বিষাদ অবাঞ্ছিত। ভবিষ্যৎ করছে নির্ণয়॥

সবটুকু মোছে নাকি

করুণাময় বসু

বিকেলের রোদটুকু মুছে গেলে মাঠে মাঠে
কৃষ্ণচূড়া বনে,
সবটু মোছে নাকি,
কিছু গন্ধ, কিছু রঙ থাকে না কি বাকি,—
জ্যোৎস্না হয়ে শেষ রাতে আকাশের
পাণ্ডুর নয়নে,
স্বপ্ন হয়ে, গন্ধে হয়ে বনে বনে গোলাপের
উদ্ভিন্ন যৌবনে।

জীবনের সব কিছু মুছে গেলে সব কিছু
মোছে নাকি,
কিছু স্মৃতি, কিছু সুর থাকে না কি বাকি?

যে স্মৃতি ছবির মতো সময়ের শুভ্র শূন্যতায়
লতাপাতা ফুলে ফুলে এঁকে রাখে
আশ্চর্য ব্যথায়!
যে সুর বকুল গাছে জ্যোৎস্না আঁকা ঘুম ভাঙা
রাতের বেলায়
ডেকে যায় চোখ গেল, চোখ গেল, পাখি হয়ে
করুণ গলায়:
ব্যথাটুকু তার
শুভ্র চেতনায় আদিগন্ত উদাস বিস্তার।
ফুল ফোটা জীবনের প্রথম প্রহরে
যে স্বপ্ন যে রঙ ছিল, স্মৃতি হয়ে, সুর হয়ে
জীবনের বাকিটুকু সুধা দেয় ভরে।
সেই স্মৃতি, সেই সুর
বসন্ত এনেছে কাছে, সুদূর শূন্যতা এক
জীবনের আলগাল
পার হয়ে চলে গেল দূর আরো দূর।

———

ছেলেদের পাততাড়ি

ব্রেমেনের বাদ্যকর

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগের কথা। জারমানি দেশে ব্রেমেন নামক শহরের কিছু দূরে একটি গ্রামে একটা বুড়ো গাধা থাকত। একদিন সে দুপুর বেলায় আস্তাবলে বসে বসে ঝিমচ্ছে এমন সময়ে দেওয়ালের ওদিক থেকে তার মালিকের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। সে কাকে যেন বলছে, "গাধাটা বেজায় বুড়ো হয়ে গেছে। কোনই কাজে আর আসে না, কেবল খায় আর ঘুময়। কালকেই ভাবছি ওটাকে বিদায় করব।"

গাধাটা ঠিক করল যে পরদিন ভোরে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তার মনে পড়ে গেল যে, কাছেই ব্রেমেন শহরে বাদ্যকরের অভাব কাজেই সে ঠিক করল যে, ওইখানে গিয়ে গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করবে। পরদিন ভোরবেলা সে ঘুম ভাঙ্গা মাত্র শহরের দিকে রওনা হলো।

কিছুদূর গিয়ে একটা কুকুরের সঙ্গে তার দেখা হলো। সেটাও মাঝে মাঝে তাদের গ্রামে যাতায়াত করত। কুকুরটা বল্লো "ভাই গাধা, আমার দুঃখের কথা আর কি বলব। আমার বয়স হয়েছে বলে আমি আর এখন শিকার করতে পারি না, কাজেই মালিক ঠিক করেছে যে আমাকে মেরে ফেলবে। তাই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি কিন্তু এখন ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়।"

গাধা বল্লো, "আমিও বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছি। ব্রেমেন শহরে শুনেছি বাদ্যকরের অভাব তাই সেইখানে যাচ্ছি গান গেয়ে কিছু রোজগার করবার আশায়। তুমিও চলনা সেখানে।" কুকুরটা ঠিক করল যে সেও গাধার সঙ্গে ব্রেমেনে যাবে।

যেতে যেতে তারা একটা রোগা ভিজে লোমওঠা বেড়ালকে দেখতে পেল। সে বল্লো—"আমার বয়স হয়েছে আর দাঁত ভেঙ্গে গেছে কাজেই ইঁদুর মারতে পারি না, তাই গিন্নী আমাকে বিদায় করে দিয়েছে। কোথায় যাব তাই ভাবছি।"

অন্য দুজন বলে উঠল, "আমাদের সঙ্গে চলো। তুমিও ব্রেমেনে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করতে পারবে।" এসব কথা শুনে বেড়ালটাও জুটে গেল।

তিনজনে মনের আনন্দে গান গেয়ে নাচতে নাচতে চলেছে এমন সময় একটা খড়ের গাদার উপর থেকে

একটা মোরগ খুব জোরে জোরে ডেকে উঠল। চমকে গিয়ে তিনজনেই জিজ্ঞাসা করল, "কি হে, অবেলায় চেঁচাচ্ছ কেন?"

সে বল্লো, "বাবা, আজকের মত চেঁচিয়ে নি, কাল সকালেই তো গিন্নী আমাকে হাঁড়িতে চড়াবে বলেছে।"

গাধা বল্লো—"কি সর্বনাশ! তুমিও বরং আমাদের সঙ্গে ব্রেমেনে চলো—আমরা সেখানে গান গেয়ে বা বাজনা বাজিয়ে পয়সা উপার্জন করব। তাছাড়া তোমার গলার তো বেশ জোর, কাজেই তুমি প্রধান গায়ক হবে।"

মোরগটা এরপর খুব খুসি হয়েই তাদের দলে জুটে গেল।

যেতে যেতে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগল। তখনও ব্রেমেন শহর বহুদূর কাজেই তারা ঠিক করল যে সে রাত্তিরটা জঙ্গলেই কাটাবে। সামনেই একটা বট গাছ দেখে গাধা ও কুকুর তার নিচে শুয়ে পড়ল আর বেড়াল ও মোরগটা গাছে চড়ে ডালে বসে ঘুমবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু ঘুম আর আসে না—প্রচণ্ড ক্ষিদে, কেবল খাবারের কথা মনে আসছে তাদের, এমন সময় মোরগটা চারিদিকে দেখে উপর থেকে বলে উঠল—"বন্ধুগণ, কিছু দূরে একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। ভেতরে মনে হচ্ছে যেন আলো জ্বলছে—চলো আমরা ওখানে যাই কিছু খাবার জুটতেও পারে।

চারজন তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো—আর সেই বাড়ীটার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগোতে লাগল। বাড়ীর কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল চারজন লম্বা-চওড়া লোক, একটা বড় টেবিলের চারদিকে বসে ভুরিভোজন করছে। তাদের হাতের কাছে বড় বড় লাঠি, কোমরে ছুরি গোঁজা, কাপড়-চোপড় অতি অপরিষ্কার আর জোর গলায় পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছে। টেবিলভরা নানা রকম মুখরোচক খাবার, মাছ, মাংস, কেক্, মিষ্টি, সরবৎ তো দেখাই যাচ্ছে, তাছাড়া আরও কত কি আছে তার ঠিক নেই। চার বন্ধুর জিব দিয়ে টস্ টস্ করে লাল ঝরতে লাগল।

অল্পক্ষণ পর গাধাটা কুকুরকে বল্লো—"বলো তো ভাই, কি করে খাবারগুলি পাওয়া যায়?"

কুকুর বল্লো—"ওদের কোন রকমে তাড়াতে পারলে পাওয়া যাবে খাবার। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়।"—

বেড়াল বল্লো "সে তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে।—ওদের হাতের কাছে ওই লাঠিগুলো দেখেছ? ভেবে-চিন্তে এগোতে হবে বাবা"।—

মোরগটা বল্লো—"ছুরিগুলোও বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না—গলায় ছোঁয়ালেই শেষ হয়ে যাব।"

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করল যে কিছু চালাকি করে ডাকাতদের সরাবার চেষ্টা করতে হবে।—গাধা তার সামনের পা-দুটি জানালার আলের উপর রাখল, কুকুরটা গাধার পিঠের উপর চড়ল, বেড়াল কুকুরের ঘাড়ে লাফ দিয়ে উঠল, আর মোরগটা উড়ে গিয়ে বেড়ালের মাথায় চেপে বসল। তারপর যে যেমন ভাবে পারে চেঁচাতে আরম্ভ করল আর অল্পক্ষণের মধ্যে গাধার ডাক, কুকুরের "ঘেউ ঘেউ", বেড়ালের "মেঁও মেঁও" আর মোরগের "কাঁ, কাঁ" য় চারিদিক ভরে গেল।

এই প্রচণ্ড অস্বাভাবিক আওয়াজে ডাকাতগুলি চমকে উঠল।—সঙ্গে সঙ্গে চারটি জন্তু কাচের জানালা ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।—টেবিলটা ঘিরে তারা চিৎকার করতে লাগল ও পরে ঘুরে ঘুরে আসবাব-পত্রগুলি ধাক্কাধাক্কি করে এদিক ওদিক করে দিল। এই সব দেখে ডাকাতগুলি হতভম্ব হয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল।

তখন আর চার বন্ধুকে পায় কে? তারা টেবিলে রাখা সব খাবারগুলি নিমেষের মধ্যে শেষ করে ফেল্লো। তারপর যে যেখানে ঘুমতে ভালবাসে, সে সেরকম জায়গা খুঁজতে লাগল বিশ্রাম করবে বলে। বেড়ালটা আগুনের ধারে গরমে আরাম করে শুলো, কুকুরটা দরজার পিছনে, গাধাটা উননের খড়ের গাদায় আর মোরগটা ছাদে চড়ে বসল।—কিছুক্ষণ পর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে ডাকাতগুলো আস্তে আস্তে জঙ্গল ছেড়ে বাড়ী ফিরে আসবে ঠিক করল। শীতের চোটে তাদের হাত-পা জমে গেছে আর খিদেও পেয়েছে খুব। বাড়ী পৌঁছিয়ে প্রথমেই তারা আগুন পোয়াবে ঠিক করল। ঘরে ঢুকেই প্রথম ডাকাতটা অন্ধকারে বেড়ালের চক্‌চকে চোখ দেখেই তাকে আগুন বলে ভুল করল। কাঠি দিয়ে সেখান থেকে আগুন ধরাবে বলে যেই না বেড়ালের চোখে খোঁচা দেওয়া অমনি বেড়ালটা ফাঁস করে লাফ দিয়ে ডাকাতের চোখমুখ নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল।

ব্যথায় চিৎকার করতে করতে ডাকাতটা পালাতে গিয়ে দরজার পিছনে কুকুরটার ঘাড়ে পড়ল; সেটা তক্ষুণি তার পা কামড়ে ধরল। ডাকাতটা এবার ভীষণ জোরে "বাঁচাও বাঁচাও" বলে চেঁচাতে লাগল। তার বন্ধুগুলি এই চিৎকার শুনে উর্দ্ধশ্বাসে পালাল। দু'টো গিয়ে ঘুমন্ত গাধার ঘাড়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আর গাধাটা অমনি রেগে গিয়ে তাদের দমাদম লাথি মারতে লাগল।

"মেরে ফেল্লো রে!" বলে সেই না সে দু'জন চেঁচাতে শুরু করল, অমনি চতুর্থ ডাকাত পালিয়ে গিয়ে দেওয়াল বেয়ে ছাদে উঠতে লাগল। মোরগটা এই আওয়াজ পেয়ে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল আর ডাকাতটা চমকে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে গেল। বাকি তিনটে ততক্ষণে পালিয়ে গেছে জঙ্গলে, এটাও কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিছন পিছন পালাল। চার বন্ধু আবার যথাস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে তারা বাড়ীটা ভাল করে ঘুরে দেখল। অনেক খাবার দাবার, কাপড় পয়সা ইত্যাদি সেইখান থেকে পাওয়া গেল কাজেই তাদের এরপর আর কোন অভাব রইল না। এই বাড়ীতেই তারা থাকত খেতো আর মনের আনন্দে মাঝে মাঝে গান বাজনা করত। মাঝে মাঝে ব্রেমেন শহরেও তাদের ডাক পড়ত কিন্তু কোনদিন তারা এই ঘটনাটি ভুলতে পারেনি, বিশেষ করে তাদের চার বন্ধুর প্রথম গানের মজলিশের কথা।

"বঙ্গভূমি" নাম হবে কেন ?

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ন্যায়শাস্ত্রে "আপ্তবাক্য" বা "authority"কেও অন্যতম "প্রমাণ" বলে গণ্য করা হয়। আইনজীবীরাও বিখ্যাত বিচারকগণের "রায়"কে "প্রমাণ" বা "নজীর" রূপে উত্থাপন করেন।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাঙ্গালীরা এবং ভারতীয়রাও কোনো কোনো বিষয়ে "authority" বলে মানতে পারি।

যে রবীন্দ্রনাথের রচিত দুটি গানকে আমরা ভারত ও বাংলাদেশের অধিবাসীরা জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকার করে নিয়েছি—সেই রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে' (১৩০২ হ'তে ১৩২৯ বা ১৮৯৫ হ'তে ১৯২২ সাল পর্যন্ত) তাঁর কাব্যে "বঙ্গ"কে "বঙ্গভূমি" নামেও চিহ্নিত করে গেছেন :—

(১) "বঙ্গভূমির প্রতি" (কবিতা)

রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম, পৃ-২০৬।

(২) "আহ্বান গীত"

"বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে

কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি।" ঐ, ১ম, পৃ-২০৭-২১১।

(৩) "বঙ্গমাতা"

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে

মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে

হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—ঐ, ১ম, পৃ-৫৬১।

রচনাকাল, ১৩০২ বা ১৮৯৫।

(৪) "দুই বিঘা জমি"

"নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।

গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

ঐ, ১ম, পৃ-৬৭৮।

রচনাকাল, ১৩০২ বা ১৮৯৫।

(৫) "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত"

"...কোকিলের কুহুরবে শিখীর কেকায়

দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে

রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে

যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি-অভিযানে—"

ঐ, ২য়, পৃ-৬২২

রচনাকাল, ১৩২৯ বা ১৯২২।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। মাধুর্যের স্রষ্টা। যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানতেন, তাঁরা লক্ষ করেছেন—অতি সুন্দর সুন্দর নামের তিনি আবিষ্কারক। বালক বালিকা, তরুলতা, পুষ্প, পশুপক্ষী, বিদ্যামন্দির, নানাজাতীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, পল্লী, সরণী, বাসগৃহ প্রভৃতিকে তিনি মনোহর, মধুর নামে অভিহিত করেছেন।

"বঙ্গভূমি" নামটি সুন্দর মনে না হ'লে দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে তাকে তিনি তাঁর কাব্যে স্থান দিতেন না। প্রথমদিকে ব্যবহার করে কানে বাজলে পরে পরিত্যাগ করতেন।

তাঁর কান যে শব্দ-ঝঙ্কার বিচারে কেমন তীক্ষ্ণ ছিল, সুমিষ্ট ও উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের সুরতাল নির্ণয়ে কেমন সুনিপুণ ছিল, তা যাঁরা তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, তাঁরাই জানেন।

তাঁর সেই অসাধারণ কর্ণে দীর্ঘ সাতাশ বছর কাল, বা সুমিষ্ট ও সুমধুর লেগেছে, সেই "বঙ্গভূমি" নাম পশ্চিমবঙ্গের জন্যে আমরা নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে রাখতে পারি।

বাঙ্গালী এবং ভারতবাসীর কাছে আমরা এই নতুন নামের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকেই প্রমাণ স্বরূপ খাড়া করতে পারি।

আমেরিকার উপর ভারতের প্রভাব

(রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ)

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ভাবের ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলছে সুদীর্ঘকাল ধরে। ১৭৮৭ সাল থেকেই তা সুরু হয়েছে। জর্জ নামে একটি মার্কিন পণ্য-বাহী জাহাজ ১৮১৫ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে আমেরিকা ও কলকাতার মধ্যে একুশবার যাতায়াত করেছে। ঐ সময়েই বস্টনে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের "প্রিসেপ্টস অব জীসাস : এ গাইড টু পীস অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস।" ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহনের রচনা ও ভারত সম্পর্কে অন্যান্য রচনার মাধ্যমে মার্কিন দার্শনিক এমার্সন, ওয়েন, থোরো, কবি হুইটম্যান, হপকিনস ল্যানম্যান, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হুইটনী ভারতীয় ভাবাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের এক সঙ্কটময় পর্যায়ে থোরোর আইন অমান্য শীর্ষক নিবন্ধ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পারস্পরিক গুণগ্রাহিতা ও ভাবের আদান প্রদানের ফলে দুই দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে সৌহার্দ্যের সেতু। প্রাচ্যবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু মনীষী ভারত থেকে আমেরিকা সফরে এসেছেন। ১৮৮৩ সালে এসেছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার। আর তার দশ বছর পরে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁরা দুজনেই শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন।

তারই প্রায় ২০ বছর পরে এলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে। ভারতের উপনিষদিক আদর্শ প্রচার ও শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহই ছিল তাঁর সফরের উদ্দেশ্য। তিনি মোট পাঁচবার আমেরিকা সফরে এসেছিলেন। প্রথম তিনি যখন সেদেশে যান তখন কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে নি, পশ্চিমী দুনিয়ায় তিনি প্রায় অপরিচিত। আমেরিকার "পোয়েট্রি" নামে একটি কাব্য সাময়িকী কবিকে পশ্চিমী দুনিয়ার সামনে তুলে ধরে। ঐ পত্রিকার ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় গীতাঞ্জলির ছটি কবিতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ড এই সকল কবিতা পড়ে মন্তব্য করেন "এসকল কবিতায় রয়েছে এক নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা, যেন সহসা নবীন গ্রীসকে আবিষ্কার করলাম।" প্রথমবার আমেরিকায় এসে তিনি নিউইয়র্ক, রোচেস্টার, হার্ভার্ড ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। এই সকল বক্তৃতা কবির সাধনা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, প্রায় এক বছর পরে কবি লণ্ডন হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। ফিরে আসার দুমাস পরেই পেলেন তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার সংবাদ। এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করার পর কবি "পোয়েট্রি" পত্রিকার সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোকে লিখলেন, "আমি এই সম্মানকে সগৌরবে বহন করব, এই সত্যকে স্মরণ করে উল্লাসবোধ করব যে মানবতার রত্নমালায় প্রাচী ও প্রতীচী হল যুগল মণির মতো। সারাক্ষণই পরস্পরকে স্পর্শ করেছে।"

পরের বছর বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রত্নমালায় পড়ল দীর্ঘ অশুভ ছায়া। কবি তখন থেকেই দেশে দেশে প্রচার করেছেন, "প্রাচ্যকে গ্রহণ করতে হবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, কারিগরি আর সাংগঠনিক দক্ষতা, পাশ্চাত্যের আত্মার পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন প্রাচ্যদর্শনের আধ্যাত্মিক উৎস থেকে জীবনী রসধারা।" আবার তিনি এলেন আমেরিকায় ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত অর্থাৎ চারমাস রবীন্দ্রনাথ সেবার সে দেশে কাটিয়ে গেছেন। ঐ সময়ে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও শ্রোতাদের তিনি স্বরচিত কবিতা ও গল্প পড়ে শুনিয়েছেন। নিউইয়র্কের কার্ণেগী হলে ন্যাশনালিজম সম্পর্কে একটি ভাষণে কবি নেশন ষ্টেটের নির্মমনিগড় ও ববর লোভকে ধিক্কার দিয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন, নিন্দা করেছেন যান্ত্রিক যুগের নৃশংস পরিণতির। দ্বিতীয় বারের সফরের সময়ে জাতীয়তা-বাদের বিরুদ্ধে এই সতর্কবাণী সম্পর্কে সকলেই যে তাঁর প্রতি প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল, তা নয়। বহু পত্রপত্রিকায় বিরূপ মন্তব্যও করা হয়েছিল। কবি সেবার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন। দ্বিতীয় বারের সফর খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম সফরে বেরিয়ে পড়লেন। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে কিছুকাল কাটিয়ে নভেম্বর মাসে এলেন আমেরিকায়। বিশ্বভারতীর কল্পনা ও আদর্শ তখন সবারই ভাল লেগেছিল। নিউইয়র্কের মিসেস উইলার্ড স্ট্রেট বাৎসরিক ৫০০০০ টাকা দিতে রাজী হলেন। তাঁর এই অর্থ সাহায্যেই ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীনিকেতন। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর মার্কিন জনসাধারণের মনে তখন অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে উঠেছে তারা। কবির আহ্বানে তারা তেমন সাড়া দেয়নি, মার্কিন সাহিত্যিক গোষ্ঠীও কবি সম্পর্কে তেমন উৎসাহ দেখাননি। এবারের সফর কবিকে হতাশ করেছিল অনেকখানি। তখন কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "এ দেশে আমি সময় কাটাচ্ছি যেন এক বিরাট রূপ দুর্গের কারাগারে বসে, মনের কোন খোরাক নেই আমার।" এ সময়ে ভারতে চলছে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ অসহযোগ আন্দোলন। আর একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন, "ভাগ্যের এমনই পরিহাস আমি যখন এপারে বসে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ের আবেদন জানাচ্ছি তখন সাগরের ওপারে বলছে অসহযোগিতার কথা।" ১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি ইয়োরোপ হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন এবং ইয়োরোপে পেলেন বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান যুগোপযোগী কর্মসাধনের জন্য বিশ্বদেবতা পাশ্চাত্য বীরদেরই বেছে নিয়েছেন, তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন অস্ত্র, দিয়েছেন ধর্ম। কিন্তু আদর্শের প্রতি যে ঐকান্তিক আস্থা থাকলে শয়তানের প্রলোভন ও উৎকোচকে জয় করা যায়, তা কি তাদের আছে? সমগ্র বিশ্বকে আজ তুলে দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্যের হাতে। মানুষের মহান্ সৃষ্টিকাজে যদি সে ব্যবহার না করে বিশ্বকে, তবে সে তার ধ্বংসকেই ডেকে আনবে।"

এর আট বছর পরে ১৯২৯ সালে কানাডার ভ্যানকুভারের ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে তিনি আসেন আমেরিকায়। কিন্তু ১৯২০-২১ সালের ভ্রমণের তুলনায় তাঁর এবারের অভিজ্ঞতা তিক্ততর। লস এঞ্জেলেসের বক্তৃতা শেষ করেই পরবর্তী ভ্রমণসূচী বাতিল করে দিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন।

১৯৩০ সালে শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম যান। সে বছর তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায়ও গিয়েছিলেন, মস্কোতে দু সপ্তাহ ছিলেন তারপর ইয়োরোপ থেকে জাহাজযোগে পঞ্চম ও শেষবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করেন। ওয়াশিংটনে পৌছবার পরেই হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। নিউইয়র্কে গঠিত হয় রবীন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কুলিজ ছিলেন সেই সমিতির সদস্য,

সভাপতি হেনরী মর্গেনথ। সমিতির পক্ষ থেকে কবির প্রতি সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল নিউইয়র্কের গবর্ণর ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট সহ তাতে পাঁচশরও বেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভোজপর্ব সাঙ্গ হবার পর হেনরী মর্গেনথের ভাষণের উত্তরে কবি বলেছিলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের পক্ষে পরস্পরকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার। ভারতবর্ষে যাবার পথ সন্ধান করতেই কলম্বাস একদিন আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন। পশ্চিমের পক্ষে ভারতমুখী সেই অসমাপ্ত অভিযানকে সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন।"

এর এক বছর পরে ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন: "আমেরিকার ধনোৎপাদন শক্তি তার অন্তর্দৃষ্টিকে কোন রকম ব্যাহত না করে তার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে খৃষ্টধর্মী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। এ গণতন্ত্র থেকে আসবে মানুষের আত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা। মানবতার কল্যাণে সে কাজে লাগাবে তার পার্থিব সম্পদকে, ব্যাধিকে করবে জয়, বেঁচে থাকবার বৈজ্ঞানিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রচারিত হয়ে তার ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে একদিন সকলের কল্যাণ সাধন করবে। আধুনিক বিশ্বে একমাত্র আমেরিকাই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে চিন্তা করে আধ্যাত্মিক পরিণতির কথা। পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না এমনটা।"

সর্বজনের কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান

১৮৯০ সালে আমেরিকায় প্রখ্যাত মাসিকপত্র হার্পার্স মানথলী একটি প্রশ্ন করেছিল: এখন থেকে একশ বছর পরেও কি ওয়াল্ট হুইটম্যান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবি বলে পরিগণিত হবেন, না বিস্মৃতির অতল আঁধারে চিরকালের জন্য তলিয়ে যাবেন?

পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সমাজে শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে হুইটম্যান তখন সর্বত্র সুপরিচিত। সেদিন ঐ প্রশ্নটি পড়ে মৃদু হাসিতে কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন, "এ একটি ধাঁধাঁর মত প্রশ্ন, একশ বছর পরে কালের কষ্টিপাথরে এই কথার যাচাই হবে।" এর দুবছর পরে ১৮৯২ সালে কবি পরলোক গমন করেন। শত বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আমরা দেখেছি পৃথিবীর মানুষ কবিকে ভুলে যাওয়া তো দূরের কথা, তিনি তাদের কাছে ক্রমেই অধিকতর ভাস্বর হয়ে উঠেছেন, তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে দেশ হতে দেশান্তরে।

আমেরিকার প্রখ্যাত দার্শনিক র‍্যালফ ওয়ালডো এমার্সন হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ "লিভস অব গ্র্যাস" সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন "এ যেন গীতা ও নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংমিশ্রণ।" আর হেনরী ডেভিড থোরো বলেছিলেন যে এই কাব্যের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় মনোভাবের অদ্ভুত মিল রয়েছে।

হুইটম্যান কাব্যে পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে ভারতীয় বেদান্তিক চিন্তাধারার খুবই মিল দেখতে পাওয়া যায়। বেদান্তবাদীদের মত হুইটম্যান উপলব্ধি করেছিলেন যে, বোধি দিয়েই সত্যকে জানতে হয়, বোধিই সত্যানুসন্ধানের পথ। তিনি বোধিকে আত্মার দৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। কিভাবে আমার আমির রহস্য ভেদ ও মায়ার আবরণ উন্মোচন করে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে হয় তা তিনি জানতেন। জনৈক বিশিষ্ট মার্কিন দার্শনিক এপ্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার মনে হয় এজন্যই তাঁর ভাব-ধারা তাঁর ভাষা হয়েছে ভারতীয়দের মনের মতো। তিনি যে এই দেশে এতখানি জনপ্রিয় তার মূলে তাঁর এই ভাবধারাও হয়তো খানিকটা রয়েছে।"

হুইটম্যান তাঁর কাব্যে গেয়েছেন মানুষের ও স্বাধীনতার জয়গান। প্রচণ্ড আশাবাদ, বিরাট দৃষ্টি, মৈত্রীভাবনা, নানা দেশের ও সমাজের মেলবন্ধন ও ঐক্যবোধ। গণতান্ত্রিক আদর্শবোধই তাঁর কাব্যকে করেছে মহিমান্বিত, করেছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সব মানুষই

সমান এই কথাই তাঁর কাব্যে অনুরণিত। এইখানে তিনি খাঁটি আমেরিকান।

১৮১৯ সালের ৩১শে মে আমেরিকার লংঅ্যায়ল্যাণ্ডের ওয়েস্টহিলসের একটি খামারে ওয়াল্টার হুইটম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তিনি ছাপাখানার মুদ্রাকর, সাংবাদিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রুকলীন এবং নিউইয়র্ক সিটিস্থিত বহু সংবাদপত্রে তিনি কাজ করেছেন। এই সময়ে তিনি যা কিছু লিখেছেন তার অধিকাংশই ছিল গদ্যরচনা। তখন মিতাচার সমর্থন করে তিনি "ফ্রাঙ্কলিন ইভানস" নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালে।

১৮৪০ দশকের শেষের দিক থাকে ১৮৫০ দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত হুইটম্যানের জীবনেও তাঁর চিন্তা ও ভাবধারার আসে বিরাট পরিবর্তন। তাঁকে দেখা যায় সম্পূর্ণ এক নূতন মহান্ কবিরূপে। তাঁর উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ "লিভস অব গ্র্যাস" প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। তখনই তিনি তাঁর নূতন নাম ওয়াল্ট হুইটম্যান গ্রহণ করেন।

মার্কিন দার্শনিক ও সাহিত্যিক এমার্সনই কবির জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন,"আমি তখন আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল ছিলাম, এমার্সনই আমাকে বাইরে টেনে আনলেন।" এমার্সন ছাড়া তিনি তাঁর সাহিত্য রচনায় যে সকল সাহিত্যিকের রচনা থেকে সবচেয়ে প্রেরণালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন থোরো, লোয়েল আর আছেন শেক্সপিয়ার। বাইবেলের প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি মানবিকতাবোধ, প্রেম, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানুষের জয়গান গেয়েছেন, নিপীড়িত মানুষের মনে সঞ্চার করেছেন শক্তি, জ্বালিয়েছেন আশার আলো। "প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" শীর্ষক কাব্যে তিনি সমগ্র বিশ্বকে ডাক দিয়েছেন :

> হে হৃদয় চলো ভারতে
> চলো সেই আদিম মননে
> শুধু দেশে দেশে কি সাগরে নয়
> সেই প্রথম স্বচ্ছ সজীবতায়,
> জীবনবেদের মুকুল যেখানে জেগেছে
> সেইখানে প্রাণের তারুণ্যে
> উপলব্ধি খোঁজো এশিয়ার পুরাণ কথায়।

কেবল কাব্যজগতেই নয়, গদ্যসাহিত্যেও চিরন্তন স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন হুইটম্যান। "স্পেসিম্যান ডেজ", "ডাইরিজ এবাউট দি সিভিল ওয়ার" প্রভৃতি গ্রন্থ "লিভস অব গ্র্যাসের" ভূমিকা ইত্যাদি তাঁর রচিত উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ১৮৬১-১৮৬৫ আমেরিকার ঘরোয়া সংগ্রাম বা সিভিল ওয়ার কবিসত্তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং ১৮৬২ সাল থেকে কবি বিভিন্ন হাসপাতাল ও সৈন্য শিবিরে আহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হয়, ঐ সকল কাব্য ঐ যুদ্ধের অভিজ্ঞতারই ফসল। ঐ সকল কবিতা প্রকাশিত হয় "ড্রাম ট্যাপ্স" নামক কাব্য গ্রন্থে। ১৮৬৪ সালে এই কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ঐ সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এব্রাহাম লিঙ্কন। কবির অসীম শ্রদ্ধা ছিল তাঁর উপরে। লিঙ্কন হত্যার পর কবি লিখেছিলেন, "যে স্বাধীনতা ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লিঙ্কন জীবন বিসর্জন দিলেন তাঁর সেই আদর্শই একদিন দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সমগ্রমানব জাতিকে একাবদ্ধ করবে।" এই মহান্ মুক্তিদাতার প্রতি কবির অন্তরের "ও ক্যাপটেন মাই ক্যাপটেন" এবং "হুয়েন লিল্যাকস লাস্ট ইন দি ডোরইয়ার্ড ব্লুমড" নামে দুটি অবিস্মরণীয় কবিতায় নিবেদন করেন।

১৮৭৩ সালে ওয়াশিংটনে থাকার সময়ে তিনি পক্ষাঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিউজার্সির ক্যামডেনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৮৯২ সালে ৭৩ বছর বয়সে তিনি সেখানেই পরলোকগমন করেন।

হুইটম্যান ছিলেন সর্বদেশের সর্বকালের কবি। জীবনের অপরাহ্নে বিশ্বের সর্বজনকে তিনি এই বলে আহ্বান করে গিয়েছেন :

> "এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া
> মহাদেশবাসীরা যে যেখানে রয়েছ শোন
> আর শোন সমুদ্রের অসংখ্য দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের
> মানুষেরা।
> শোন অনাগত শতাব্দীর সকল মানুষ, তোমরা
> প্রত্যেকে শোন,
> তোমরা সবাই শোন। কাউকেই তোমাদের
> আলাদা করে বলছি না, বলছি একসঙ্গে সবাইকে :
> কামনা করি তোমাদের স্বাস্থ্য,
> তোমাদের সবার জন্য শুভেচ্ছা
> আমার ও আমেরিকাবাসীদের পক্ষ থেকে।"

রাজা রামমোহন রায়ের রচনার উদ্ধৃতি

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস
সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
রামমোহন গ্রন্থাবলী হইতে

রামমোহনের 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইংরেজী অনুবাদ সহ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রচার করেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে' রামমোহনের প্রতিবাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদ মৃত্যুঞ্জয় এই গ্রন্থে করিয়াছিলেন।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড — ১২৮ পৃষ্ঠা হইতে)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত বেদান্তচন্দ্রিকার গোড়ার কিয়দংশ

ব্রহ্ম সম্বন্ধে বাদিগ্রস্তে সমায়াতে কলৌ যুগে। নান্যাঃ তিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥ ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্তস্থলাভিষিক্ত তত্ত্বজ্ঞানমানিরদের স্বকপোলকল্পিত স্বপ্রয়োজনসিদ্ধিতাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে করিও না। যেহেতুক বিশিষ্টাবিশিষ্ট শিষ্টেরদের সে কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিশুদ্ধ-মাতা-পিতৃক অবিগীত শিষ্টেরদের যদ্যপি স্বস্বজাতি ও কুল ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণশতেতেও অন্যথা কখন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে তথাপি এতদ্দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনয়তি কুমুদশান্তিং ধূর্ত্তবকো হি বালমৎস্যানাং এতৎশাস্ত্রার্থ ন্যায় বকধূর্ত্তেরদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে অনাস্থা না হয় কেবল এই তাৎপর্য্যেতে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে॥

হে শিষ্টসন্তানেরা ইদানীন্তন রাগান্ধ তত্ত্বজ্ঞানমানিরদের উপদেশকে বৈদ্যপুত্রের নেত্ররোগীর প্রতি উপদেশের ন্যায় জানিও যেমন এক বৈদ্যাত্মজ স্বানিকটাগত নেত্ররোগীকে অশ্বচিকিৎসাপ্রকরণীয় নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা গুদং দহেৎ। এই বচনের প্রকরণাদি জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত তাৎপর্য্যাপরিজ্ঞানে যথাশ্রুতার্থানুসারে নেত্ররোগীকে চিকিৎসোপদেশ করিয়া নেত্র-জ্বালা নিবৃত্তি কি করিবে অধিক জ্বালাদ্বয় বৃদ্ধি করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছিল। অতএব শ্রুতি স্মৃতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও শ্রোতা ও শুনিয়া বোদ্ধা এমন পুরুষ অতি দুর্লভ কিন্তু কাপটিক তত্ত্বজ্ঞানী অনেক। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীরদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্যায় যে অসদুপদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়ে নষ্ট হইয়া। যেমন শ্বশুরগৃহে সুখপ্রাপ্ত্যর্থে শ্বশুরাগমনেচ্ছু কোন অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুর-গ্রামপ্রান্তে দৃষ্ট কোন গোপকে শ্বশুরগৃহ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাক্যে দৃঢ়তরাস্থাতে স্বশ্বশুরগোপুচ্ছ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শ্বশুরগৃহে গমনকাম হইয়া আকর্ষণ ও পথগত কণ্টকশর্করাদিবেধ ও পাদপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন ভগ্নাঙ্গ হইয়াও তৎসুখপ্রত্যাশাতে গোপোপদিষ্ট গোপুচ্ছ-ধারণ ত্যাগ না করিয়া রাত্রিপ্রথমভাগে শ্বশুরবাহিরবাটীতে উপস্থিত হইয়া গোচোরজ্ঞানে শ্বশুরশ্যালকাদি-কর্ত্তৃক মুষ্টিযষ্টিপ্রহারে চূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল। হে শিষ্ট-সন্তানেরা তোমরাও তাদৃশোপদেশ গ্রহণে তাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইও না স্ববর্ণাশ্রম পিতৃপিতামহক্রমাগত কুলমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না নৈসর্গিক ভ্রমপ্রমাদকরণাপাটব বিপ্রলিপ্সাদোষচতুষ্টয়বিশিষ্ট পুরুষেরদের শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ স্ববুদ্ধিকল্পিত বাক্যে অনাদর করিয়া তদ্দোষ-চতুষ্টয়গন্ধমাত্রশূন্য পরমেশ্বরের বাক্যে ও বেদব্যাস মন্বাদির তন্মূলবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া তত্তৎপাত্রব্যাখ্যাভগবৎ শঙ্করাচার্য্যাদিবচনানুসারে তত্তৎশাস্ত্র তাৎপর্য্যার্থাব-

ধারণ ও তাঁহাবিহিতানুষ্ঠান করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পাদন করত পুরুষার্থচতুষ্টয়ভাগী হইয়া লোকে সৎপুরুষরূপে বিখ্যাত হও।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড, ১২৯ পৃঃ)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত বেদান্তচন্দ্রিকার শেষের কিয়দংশ

যদি বল আমি তাদৃশ অদ্বৈতজ্ঞানী হই এমন কহিও না তুমি তাদৃশ নও গীতাতে জীবন্মুক্তিবিবেকেতে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ কহিয়াছেন তাহার গন্ধমাত্র স্পর্শ তোমাতে নাহি বরং বিরুদ্ধ অনেক সংপূর্ণ লক্ষণ আছে যেহেতুক তোমারদের লোকৈষণা ও বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা ও স্রক্চন্দন-বনিতাদি ভোগবাসনা আছে এ সকলের মধ্যে একৈকের থাকাতেও তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরও হইতে পারে না যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি থাকে তাহার কি মঞ্জরী হইতে পারে সে যে আপনি ভস্মীভূত না হয় সেই যথেষ্ট যদি বল আমার মনে কোনহ বাসনা নাহি বটে তুমি এমন ভাল ভাল এমন পুরুষ বড় দুর্লভ পাতঞ্জল দর্শনে নির্বিকল্প-সমাধির উত্তমাধিকারী এতাদৃশ পুরুষকেই কহিয়াছে। তবে তোমারো নির্বিকল্প সমাধি বড় সুলভ। তাহা করিয়া দ্বৈতমাত্রজ্ঞানশূন্য হইয়া অদ্বৈতৈকরসসাগরে মগ্ন হইয়া থাক ভালমানুষেরদের সন্তানগুলি রক্ষা পাউক অনধিকারচর্চা বা তোমরা কেন করো॥ অনধিকার-চর্চা যে করিয়াছিলো ও তাঁহার যে প্রতিফল পাইয়াছিলো তাহা কি তোমরা শুন নাই আপনার চক্ষুর চৌক দেখিতে পায় না পরের চক্ষুর ধূলি তুলিতে চায়। পরমহংস পরিব্রজকাচার্য্য হইতে মনে করে আর যদি বল সাধনদশাতেই বিহিতানুষ্ঠানে থাকা সিদ্ধদশাতে নয় তবে তোমরা তত্ত্বজ্ঞানসম্প্রদায়েতে সিদ্ধদশা যাহাকে বলে তাহাই কি অবিহিতানুষ্ঠান করিবার জন্যে চাও। দেহপাত হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ইহাই কথা সম্প্রদায়সিদ্ধ আছে দেহ বিদ্যমানে জীবন্মুক্তিদশাকেও সিদ্ধদশা কহা যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ গীতোক্ত লক্ষণ দ্বারা জানা যায় এতদুভয় ব্যতিরিক্ত যে যে দশা সে সকলিই মুমুক্ষুর সাধনদশা। অতএব সে সকল দশাতে নিষিদ্ধাচরণ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক বিহিতাচরণের আবশ্যক।

পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্মলজলবদ্-বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধার্থ বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্ত-সিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ব বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কার শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষায় হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ-মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন। [illegible]

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ [illegible])

—[illegible]

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (রামমোহনের প্রত্যুত্তর)

ভূমিকা

ওঁ তৎ সৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্বসাধারণে প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোকদে

তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়॥ দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকা সাতষট্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু ওই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এ গ্রন্থ কাহার ভাষাবিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমত নহে অথচ প্রথম অবধি ৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমত জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠা এবং পংক্তির নির্দ্দেশপূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রলাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫, ১৫৬)

প্রত্যুত্তরের অংশবিশেষ

......এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন তাহার উত্তর একপ্রকার দেয়া যাইতেছে। ১৭ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যদি বল আমি তাদৃশ বটি, তবে তুমি যার-দিগ্যে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে" ইহার উত্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগীদের তুল্য হওয়া আমাদিগের দূরে থাকুক ভট্টাচার্য্য যেরূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাহাতে যেরূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানেও অপটু আছি ইহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে ১৭ পৃষ্ঠের ২ পংক্তি অবধি অঙ্গীকার করিয়াছি অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবর্ত্ত করাইতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বেদান্তের ও ঈশাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তেঁহ দেখেন আর যাহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে আছে তেঁহ শ্রদ্ধা করেন আর যাহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন করা ভট্টাচার্য্যকেই সম্ভব হয় যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্রবলে কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহাদের কোন আশ্চর্য্য কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমাদিগে এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার ২৪ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহাচ্ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয় আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুনো না যেমন গারুড়ী মন্ত্রশক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্যফলভাগী হয় তেমনি কি বৈদিক মন্ত্রশক্তিতে হয় না "উত্তর। এই যে দুই উদাহরণ ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহাচ্ছেদন

হয় আর সর্পাদিমন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভালো হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই সুতরাং ভট্টাচার্য্যের বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহাদের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানাপ্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন কিন্তু যাহাদের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

২৬ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "যদি কহ শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেববিগ্রহের হয় তোমারদের বিগ্রহের নয় যদি বল আমারদের বিগ্রহেরো বটে তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জান মন হইতে তাহাকে দূর কর ও তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতাবিগ্রহকে মিথ্যা বলিও তদনুরূপ কর্ম্মও করিও"। ইহার উত্তর ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনাদের শরীরকে ও দেবতাদের শরীরকে মিথ্যারূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি অতএব আমাদের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত আপন প্রিয়পাত্র শিষ্টসন্তানের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেবশরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন।...

(রামমোহন গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-১৬৮)

"কবিতাকারের সহিত বিচার" পুস্তকের কিয়দংশ

...কবিতাকার প্রথম পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা এই সকল পুস্তক প্রচার করিয়া দেশের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কবিতাকারের এরূপ লিখাতে আশ্চর্য্য কির নাই যেহেতু ধর্ম্মকে অধর্ম্ম করিয়া ও অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে যাহাদের জ্ঞান তাঁহারা পরমেশ্বরের উপদেশকে ধর্ম্মনাশের কারণ করিয়া যে কহিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে আমাদের সকল পুস্তকের তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে নশ্বর নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত হয় বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সৎকারি বটে কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগ্যে পুনঃ নিবেদন করিতেছি যে আমাদের প্রকাশিত তাবৎ পুস্তকের অবলোকন করিয়া যদ্যপি সকল হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় এমৎ দেখেন তবে কবিতাকারের প্রতি যাহা কহিতে উচিত জানেন তাহা যেন কহেন। ঐ প্রথম পৃষ্ঠার ১০ পংক্তিতে আর ২২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এই সকল মতের প্রকাশ হইবাতে লোকের অমঙ্গল ও মারীভয় ও মন্বন্তর হইতেছে। যদ্যপিও বিজ্ঞ লোক এ কথা শুনিয়া উপহাস করিবেন তথাপি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল হওয়া আপনং কর্ম্মাধীন হয় ঈশ্বর সম্বন্ধীয় [illegible] অথবা পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় পুস্তকের [illegible] সহিত [illegible]ার কোনো কার্য্যকারণ ভাব নাই আমাদের এই সকল পুস্তক প্রকাশের অনেক দিন পূর্ব্বে কবিতাকারের রোগ-নিমিত্ত এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ধনের হানি ও মানহানি জন্মে তাহাতেও বুঝি কবিতাকার কহিতে পারেন যে তাঁহার স্বকর্ম্মের ফল নহে কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তির গ্রন্থ করিবার দোষে ঐ সকল ব্যামোহ কবিতাকারের হইয়াছিল আপনাকে নির্দ্দোষ জানাইবার উত্তম পথ কবিতাকার সৃষ্টি করিয়াছেন বস্তুত অনেকের মঙ্গল ও অনেকের অমঙ্গল পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং সম্প্রতিও হইতেছে সেইরূপ মন্বন্তর অথবা আহারদ্রব্যের প্রচুর হওয়া ও মারীভয় কিংবা সুখে কাল হরণ করা তাবদ্দেশে কালেং লৌকিক কারণ সত্ত্বে হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে বরঞ্চ আমরা এরূপ সাহস করিয়া কহিতে পারি যে পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে যাহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখী ও নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্ম্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায় হইবেক॥...

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১-৭২)

"সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ"

[শেষাংশ]

প্রবর্ত্তক।—তুমি সহমরণ ও অনুমরণের অন্যথা বিষয়ে যে সকল শ্রুতিস্মৃতিকে প্রমাণ দিলে যদ্যপিও তাহার খণ্ডন কোনো রূপে হইতে পারে না কিন্তু আমরা ঐ হারীতাদি স্মৃতির অনুসারে সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি।

নিবর্ত্তক।—তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায্য ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান সর্ব্বথা অযোগ্য হয় দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে এবং ঐ বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা হয়।

প্রবর্ত্তক।– যদিও এরূপ বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা হারীতাদি বচনের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তথাপি সঙ্কল্পের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকত নিন্দা আছে এ নিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি।

নিবর্ত্তক।—পাপের ভয় যে কহিলে সে তোমাদের কথামাত্র যেহেতু ঐ স্মৃতিতেই কহিয়াছেন যে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। যথা। চিতিভ্রষ্টা চ যা নারী মোহদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥ প্রাজাপত্য ব্রতে অসমর্থ হইলে এক ধেনুমূল্য তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিদ্ধ হয়। অতএব পাপের ভয় নাই তবে লোকনিন্দাভয় যাহা কহিতেছ তাহাও অন্যায় যেহেতু যে সকল লোক জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীহত্যা না করিলে নিন্দা করে তাহাদের স্তুতি নিন্দাকে সাধু ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন না আর ঈশ্বরের ভয় ও ধর্ম্মভয় ও শাস্ত্রভয় এ সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রীবধেচ্ছু লোকের নিন্দাভয়ে স্ত্রীবধ করাতে কিরূপ পাতক হয় তাহা কি আপনি বিবেচনা না করিতেছেন।

প্রবর্ত্তক।—যদ্যপি এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্রপ্রাপ্ত নহে তথাপি তাবৎ হিন্দুর দেশে এইরূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এ প্রযুক্ত আমরা করি।

নিবর্ত্তক।—তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গলা ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরা প্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্ব্বতীয় লোক যাহারা২ পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দ্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত্ত করণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রসংমত যুক্তি হইয়াছেন সে শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অসম্মত এরূপ স্ত্রীবধ হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।

প্রবর্ত্তক।—এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত্ত করিতে দিব না ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রীঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না ইতি।

নিবর্ত্তক।—কেবল ভাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার

নিমিত্তে এরূপ স্ত্রীবধে পাপ জানিয়াও নির্দ্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতেছ তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু ব্যভিচারের আশঙ্কা পতি বর্ত্তমান থাকিতেই বা কোন্ না আছে বিশেষত পতি দূরদেশে বহুকাল থাকিতে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছ।

প্রবর্ত্তক।—স্বামী বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যেহেতু স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিম্বা দূরদেশেই থাকুন স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না স্বামীর মৃত্যু হইলে পর সেরূপ শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়।

নিবর্ত্তক।—যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এ ধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্ত্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্ত্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্ত হইতে পারে না যেহেতু অনেক অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে স্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রী না থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে। কায়মনবাক্যজন্য দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্ত করিবার কারণ শাসনমাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দুষ্কর্ম্ম হইতে কি স্ত্রীকে কি পুরুষকে নিবর্ত্ত করায় ইহা শাস্ত্রে ও প্রত্যক্ষে দেখিতেছি।

প্রবর্ত্তক।—তুমি আমাদিগ্যে পুনঃ২ কহিতেছ যে নির্দ্দয়তা করিয়া আমরা স্ত্রীবধে প্রবর্ত্ত হই এ অতি অযোগ্য যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বদা কহিতেছেন যে দয়া সকল ধর্ম্মের মূল হয় এবং অতিথিসেবাদি পরম্পরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে।

নিবর্ত্তক।—অন্য২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালক কাল অবধি আপন২ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য ২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ২ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ২ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবেদের অত্যন্ত দয়া হয়।

প্রবর্ত্তক।—তুমি যাহা২ কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব।

নিবর্ত্তক।—এ অতি আহ্লাদের বিষয় যে এখন তুমি এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯-১২)

"প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ" (শেষাংশ

২৪ পৃষ্ঠার শেষ অবধি লিখেন, দাহকেরা যে দেশাচার প্রযুক্ত বন্ধনাদি করে, সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যেহেতু পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইতেছে, যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরের দাহ না করে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে দাহ না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী শরীর হইতে মুক্ত হয় না, এই প্রযুক্ত স্ত্রীর মৃত শরীর যদি চিতা হইতে খণ্ড২ হইয়া ইতস্তত পড়ে, তবে স্ত্রীশরীরের প্রকৃষ্ট দাহ হয় না, এই জন্যে দাহকেরা বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রের অনুগত ব্যবহার এবং দাহকেরা বন্ধনাদি করে, তাহাতে তাহারদিগের পাপ নাই, পরন্তু পুণ্য হয় ও তাহার প্রমাণের নিমিত্তে আপস্তম্বের বচন লিখেন যাহার তাৎপর্য্য এই, যে বৈধ কর্ম্মের যে প্রবর্ত্তক এবং অনুমতিকর্ত্তা ও কর্ত্তা সকলে স্বর্গে যান, আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা সকলে নরকে গমন করেন। উত্তর। আপনকার বক্তব্য এই হইয়াছে, যে চিতায় অগ্নি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে কিম্বা অগ্নিস্পর্শ শরীরে হইলে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত কি জানি যদি বিধবা

মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে, উদ্দকে ক্রিয়মানে তু বীরাণাং বীরপত্নীভিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গামী যে কুরুবীর সকল যাহারা সম্মুখযুদ্ধে উৎসাহপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারদের পত্নী সকল মৃত শরীরের সহিত সহমরণ না করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া করিলেন। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন যে তিন উদাহরণ আপনি দিয়াছেন তাহাতে তিন স্থানেই অগ্নিপ্রবেশ শব্দ স্পষ্ট আছে, প্রবিবেশ হুতাশনং, তমগ্নিমনুবেক্ষ্যাতি. উপগুহ্য গিমাবিশন্। এবং ঐ তিন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে বিধবা প্রজ্বলিত যে অগ্নি ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন; অতএব ইদানীন্তন যে বিধবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ না করে কিন্তু অগ্নে বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে দাহ করে। আপনকার লিখিত সকামীর আদ্যোপান্ত ব্যবহারও তাহার সিদ্ধ হয় না, এবং সহমরণ জন্য যে কিঞ্চিৎ কাল স্বর্গভোগ তাহাও সে বিধবার সুতরাং হইবেক না; এবং যাহারা তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক বৃহৎ বাঁশ দ্বারা চাপিয়া বধ করেন তাঁহারা নিতান্ত স্ত্রীহত্যার পাতকী সর্ব্বশাস্ত্রানুসারে হইবেন। ইতি অষ্টম প্রকরণ ইতি।

প্রবর্ত্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ ১৮ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে প্রায় লিখিয়াছি যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ বিশ্বাসের অপাত্র সানুরাগা ও ধর্ম্মজ্ঞানশূণ্যা হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর শাস্ত্রানুসারে পুনরায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে না, এককালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশা হয়, অতএব এ প্রকার দুর্ভগা যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শুদ্ধ ভাবে কাল যাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, যাহাতে কুলত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে, এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া যায় যে সহমরণ করিলে স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহাযশ আছে যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে চিতাভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা যায়।

নিবর্ত্তক।—এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে; এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিলা তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে২ উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাঁহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যেই দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে২ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগ্যারূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী

মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন। মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক। তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্য্যন্ত যে কেহ২ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক২ পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহাদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন২ নিয়মিতকালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি২ তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন। মধ্যে২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা

হইল,তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যাভিচার দোষে মগ্ন হয় এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে। তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে। অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রায় তাহারদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়। কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনারকদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়। ইতি সমাপ্ত। ১৭৪১ শক ১৬ আগ্রহায়ণ।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—৩য় খণ্ড, ৪২-৪৮ পৃঃ)

প্রার্থনাপত্র

পরমেশ্বরায় নমঃ

সবিনয় প্রার্থনা

যাহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"; "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" অর্থাৎ "ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয়রহিত হয়েন ; " "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা জানা যায় না তদ্রূপ জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিস্বরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক ; অতএব অস্তিস্বরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন ?"—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন," —তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদূপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে "ঋগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি॥" "অর্থাৎ ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়, মোক্ষসাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্ত স্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ ও তালজ্ঞ

ইঁহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।” স্মার্ত্তধৃত শিবধর্ম্মের বচন “সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।” অর্থাৎ “শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।”

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহার উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থসাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন, ইহাই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধিভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি সেইরূপ এই ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইঁহাদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অল্প কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭—২৮)

রামমোহন সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী লোকদের মত

রামমোহন রায় ব্রহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে, তিনি যদি আর কিছুই না করিতেন, তাহা হইলেও ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য ভারতহিতকর এবং জগদ্ধিতকর কাজও করিয়াছিলেন। এইজন্য যাহারা ব্রাহ্ম নহেন এমন বহুসংখ্যক লোকও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন; ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্ত্তনের জন্যও, যাহারা ব্রাহ্ম নহেন, এমন অনেক লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার লোক হয়ত আরও কিছু বেশী হইত, যাহাই হউক, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের এমন অনেক প্রসিদ্ধ লোক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহাদের গুণগ্রাহিতা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিতে সমর্থ। এইসব গুণগ্রাহী লোকদের মধ্যে দেশী-বিদেশী উভয় রকমের মানুষই আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। যেমন ফরাসী পর্য্যটক ও বৈজ্ঞানিক ভীক্তোর ঝাকৃমোঁ (Victor Jacquemont) তিনি তাঁহার Voyage dans l'Inde গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন :—

"Before Coming out to India I knew that he was an able orientalist, a subtle logician and an irresistible dialectician; but I had no idea that he was the best of men". (English Translation from the original French.) তাৎপর্য্য।

"ভারতবর্ষে আসিবার আগে আমি জানিতাম তিনি একজন যোগ্য প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ, সূক্ষ্মবিশ্লেষণকারী নৈয়ায়িক এবং অজেয় তার্কিক কিন্তু আমার ধারণাই ছিল না, যে, তিনি নরোত্তম।"

ইহার পর রামমোহনের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করিয়া ঝাকৃমোঁ বলিতেছেন—

,'He never expresses an opinion without taking precautions on all sides,.........

"......He has grown in a region of ideas and feelings which is higher than the world in which his countrymen live; he lives alone; and though, perhaps the consciousness of the good he is accomplishing affords him a perpetual source of satisfaction, sadness and melancholy mark his grave countenance."
তাৎপর্য্য।

"সর্বদিকে সাবধানতা অবলম্বন না করিয়া (অর্থাৎ আটঘাট না-বাঁধিয়া) তিনি কখনও কোন মত প্রকাশ করেন না।"

"যে সব চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে তাঁহার স্বদেশবাসীরা বাস করেন, তদপেক্ষা উচ্চতর মনোলোকে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে; তিনি একাকী থাকেন; এবং যদিও, হয়ত তিনি যে হিতসাধন করিতেছেন, তাহার অনুভূতি তাঁহাকে সর্ব্বদাই আত্মপ্রসাদ দেয়, তথাপি তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হয়।"

বিস্তর সমসাময়িক ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলা রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহাদের উচ্চধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সব ছাপিবার স্থান হইবে না।

অন্য পাশ্চাত্য কয়েকজন বিদেশীর এবং একজন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিব। রামমোহনের সমসাময়িক আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ বুট লিখিয়াছেন :—

"To me he stood alone in the single majesty of, I had almost said, perfect humanity. No one in past history, or in present time, ever came before my judgement clothed in such wisdom, grace and humility. I knew of no tendency even to error".

তাৎপর্য্য,

"তিনি আমার চক্ষে, প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমায় একাকী দণ্ডায়মান। অতীত ইতিহাসে বা বর্ত্তমান সময়ে আর কেহ আমার বিচারের সম্মুখে এরূপ প্রজ্ঞা, সৌম্যতা ও নম্রতায় মণ্ডিত হইয়া উপস্থিত হন নাই। আমি তাঁহাতে কোন ভ্রান্তিপ্রবণতাও জানিতাম না।".

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির স্থাপয়িত্রী ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কী লিখিয়াছেন, যে রামমোহন ছিলেন "One of the purest, most philanthropic, and enlightened men India ever produced." "ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধচেতা, মানবপ্রেমিক ও জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল যে-সব মানুষকে জন্ম দিয়াছেন, রামমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।" তাহার পর ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কী তাঁহার সুমহৎ বুদ্ধিশক্তি, সুমার্জ্জিত শিষ্ট ব্যবহার, ভয়হীন নৈতিক সাহস, পূর্ণ নম্রতা, মানব-প্রেম-প্রবণতা, স্বদেশভক্তি এবং জলন্ত ধর্মভাবের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,

"We have before us the picture of a man of the noblest type. Such a person was the ideal of a religious reformer.......one searches the record of his life and work in vain for any evidence of personal conceit, or a disposition to make himself figure as a heaven-sent messenger."

তাৎপর্য্য।

"(এইসব গুণ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি, যে,) আমাদের সম্মুখে মহত্তম আদর্শের একটি মানুষের ছবি রহিয়াছে। এই রকম এই মানুষটি আদর্শ ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিয়া কোথাও ব্যক্তিগত অহঙ্কারের কোন প্রমাণ কিম্বা নিজেকে স্বর্গ হইতে প্রেরিত দূত বলিয়া খাড়া করিবার কোন প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

এইরূপ আরও অনেক প্রশংসাসূচক কথা ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাটস্কী বলিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী বলিয়াছেন :—

Raja Rammohan Roy, father of modern India, was one of the most remarkable personalities of his age. While representing all that was best in the Indian tradition, he showed his special genius in a line where the Indians of today are the weakest—in translating into practice by the force of will the dictates of idealism........He fought, with phenomenal heroism, against desperate odds, to realize his ideal. If India today wanted any model to shape her present destiny and future history, Rammohan should be the model. He was really the first to bring India abreast of universal history."

তাৎপর্য্য,

"আধুনিক ভারতবর্ষের জনক রাজা রামমোহন রায় তাঁহার যুগের বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত অন্যতম পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে অতীতকালাগত শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা তাঁহাতে ছিল, আবার অন্য এমন একদিকে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়াছেন, যেদিকে তাঁহার দেশের আজ-কালকার লোকেরা দুর্ব্বলতম—তিনি যাহা আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তাহাকে নিজের আচরণে পরিণত করিতেন। যদি আজ ভারতবর্ষ নিজের বর্ত্তমান ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনের জন্য কোন আদর্শ চান, তবে রামমোহন সেই আদর্শ। তিনিই বস্তুতঃ ভারতবর্ষকে

প্রথম বিশ্বেতিহাসে (অন্য সব জাতির সহিত) প্রগতিশীলদের দলে আনিয়াছেন।"

মিলভাঁ লোভি এইরূপ আরও অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কাহারও সব কথা উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। আর দু-জন বিদেশীর কথা উদ্ধৃত করিয়া পরে আমাদের দেশের তিনজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিব। একজন রামমোহনের সমসাময়িক ভারত প্রবাসী ইংরেজ সম্পাদক মিঃ বাকিংহাম, তিনি ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং রামমোহনকে ভালভাবে জানিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"Rammohan Roy might have had abundant apportunities of receiving rewards from the Indian Government in the shape of offices and appointments, for his mere neutrality ; but being as remarkable for his integrity as he is for his attainments, he has pursued his arduous task of endeavouring to improve his countrymen, to beat down superstition, and to hasten as much as possible those reforms in the religion and Government of his native land of which both stand in equal need. He has done all this to the great detriment of his private fortune, being rewarded by the coldness and jealousy of all the great functionaries of Church and State in India, and supporting the Unitarian Chapel, the Unitarian Press and the expense of his own publications, besides other charitable acts, out of a private fortune, of which he dovotes more than one-third to acts of the purest philanthropy and benevolence."

তাৎপর্য,

"রামমোহন যদি (গবর্মেণ্টের সমালোচনা না করিয়া) কেবল নিরপেক্ষ থাকিতেন, তবে পদ ও চাকরীর আকারে ভারতীয় গবর্মেণ্টের নিকট হইতে পুরস্কার পাইবার প্রচুর সুযোগ তাঁহার হইত, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির জন্য যেমন, সততার জন্যও তেমনি তিনি লক্ষ্যীভূত ছিলেন বলিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের উন্নতি সাধন, কুসংস্কার বিনাশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম ও শাসন প্রণালীতে সমভাবে আবশ্যক সংস্কার যথাসম্ভব সত্বর সাধনরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত দাপের প্রভূত ক্ষতি করিয়া এই সব করিয়াছেন। তাহাতে এই পুরস্কার পাইয়াছেন, যে, সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এবং খৃষ্টীয় ইংলণ্ডীয় গির্জ্জার বড় বড় পাদ্রীদের অমৈত্রী ও ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও ছাপাখানা চালান, নিজের কেতাব পত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ মানবহিতকর ও দয়াধর্মের কাজ করেন। তাহাতে তাঁহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যয়িত হয়।"

রামমোহন সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের দীর্ঘ অভিভাষণের এক জায়গায় আছে :—

"The German name for prince is furst, in English first, he who is always to the fore, he who courts the place of danger, the first place in fight and the last in flight. Such a furst was Rammohan Roy, a true prince, a real Rajah, if Rajah also, like Rex, meant originally the steersman, the man at the helm."

তাৎপর্য,

"প্রিন্সের জার্ম্যান প্রতিশব্দ ফুর্ষ্ট, ইংরাজী ফার্ষ্ট, তিনি যিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী, যিনি বিপদের জায়গাটি বাছিয়া লয়েন, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলায়নে শেষ জায়গা, রামমোহন রায় এইরূপ ফুর্ষ্ট ছিলেন, একজন সত্যকার প্রিন্স, বাস্তবিক রাজা—যদি লাটিন রেক্স শব্দটির মত রাজার মানে আদিতে ছিল কর্ণধার।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"Sitting at the feet of Rammohun Roy, let us be imbued with his lofty spirit—his love of country, his devotion to truth, his enthusiasm for progress—let us be regenerated

by the touch of his example, and we shall then have acquired the impulse which will carry us on to and will help us to secure for ourselves a place among the progressive nations of the earth and to accomplish those high destinies which, I believe, are reserved for us in the decrees of Providence."

তাৎপর্য্য,

"রামমোহন রায়ের পদপ্রান্তে শিক্ষার্থীরূপে উপবিষ্ট হইয়া, আসুন আমরা তাঁহার উচ্চাশয়তাতে অনুপ্রাণিত হই—তাঁহার স্বদেশপ্রীতিতে, তাঁহার সত্যপরায়ণতাতে ও প্রগতির জন্য তাঁহার সোৎসাহ উদ্যমে; আসুন আমরা তাঁহার দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে পুনর্জ্জন্ম লাভ করি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিদের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিব, এবং বিধাতা তাঁহার বিধানে আমাদের জন্য যে-সব উচ্চ সৌভাগ্য রাখিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইব"।

পরলোকগত বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—

"One thing, I believe, we all will be agreed upon—all sects, whether orthodox Hindus or progressive Brahmos, whether Mahomedans or Christians, that to Rommohun Roy is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a yogi, a suttee, or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship."

তাৎপর্য্য,

"আমরা গোঁড়া হিন্দু বা প্রগতিশীল ব্রাহ্ম, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, যাহাই হই, এই একটি বিষয়ে আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে একমত হইব, যে, বিদ্বান্ হিন্দুদিগকে ইহা প্রত্যয়জনক ভাবে জানাইয়া দিবার প্রশংসা রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য, যে ধর্ম্মলাভের জন্য কাহারও "যোগী" বা "সহমৃতা" বা অরণ্যগামী হইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু গৃহপরিবার ও জনসমাজই যথাযোগ্য ভগবদারাধনার পরিবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।"

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হিমালয়ের পার্ব্বত্য লোকালয় সমূহে ভ্রমণ কালে তাঁহার কথাবার্ত্তার অনুলিপি রাখিয়াছিলেন, তাহা Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda নাম দিয়া স্বামী সারদানন্দ পুস্তকাকারে বাহির করেন। তাহার ১৯ পৃষ্ঠায় আছে :—

"It was here, too, that we heard a long talk on Rammohun Roy, in which he (Swami Vivekananda) pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohun Roy had mapped out."

তাৎপর্য্য,

এখানেই রামমোহন সম্বন্ধে স্বামীজীর দীর্ঘ ভাষণ শুনিতে পাই, তাহাতে স্বামীজী বলেন, শিক্ষাদাতা রামমোহনের বাণীর তিনটি প্রধান সুর, বেদান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, স্বদেশপ্রীতি প্রচার, এবং সেই মৈত্রী যাহা হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ দাবী করেন, যে, রামমোহনের ঔদার্য্য ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কাজের তালিকা ও পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) সেই কাজ করিতেছেন।"

ভারতবর্ষে যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া লাভবান্ হইয়াছেন, যাহারা জ্ঞানী হইয়াছেন, দেশভক্ত হইয়াছেন, সংস্কার উন্নতি ও প্রগতি চাহিতেছেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও পৃথিবীর নানা দেশের সহিত মানসিক আদান প্রদান করিতে পারিতেছেন, পৃথিবীর সমসাময়িক ইতিহাসে শ্রোতা দর্শক ও কর্ম্মী হইতে

পারিতেছেন—তাঁহাদের একটি কথা স্মরণ করা ও মনে রাখা আবশ্যক। যখন ইংরেজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে এই প্রশ্ন উঠে, তখন একদল লোক (ক্ষমতাশীল ইংরেজ রাজপুরুষেরা প্রায় সবাই এই দলে ছিলেন) কেবল সংস্কৃত আরবী পারসী ও কিছু দেশভাষা শিখাইবার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু রামমোহন স্বয়ং প্রাচ্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও এবং সংস্কৃত শিখাইবার শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াও ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি শিখাইবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একটি আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তখন তখন সেই চিঠি ফলদায়ক হয় নাই। কিন্তু পরে যে ইংরাজী শিখাইবার পক্ষপাতী "ইংলিশ পার্টি" নামক দলের উদ্ভব হয়, তাহার প্রভাবে এবং লর্ড মেকলের মন্তব্য পড়িয়া বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী শিক্ষা চালাইবার দিকে মত দেন, এই "ইংলিশ পার্টি"র উদ্ভব কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠায় আছে:—

It is important to notice that the strongest influence in bringing this "English Party" into exsistence were the petition of Rammohun Roy and the practical experience of the Committee.

তাৎপর্য্য,

ইহা লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক, যে, ইংলিশ পার্টির উৎপত্তি যে প্রবলতম প্রভাবের ফলে হয় তাহা রামমোহন রায়ের আবেদন পত্র এবং কমিটির স্বীয় কার্য্যলব্ধ অভিজ্ঞতা।

মেকলের মন্তব্যেও রামমোহন রায়ের চিঠির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

প্রবাসী- কার্ত্তিক, ১৩৪০।

নির্ব্বাচনে অন্যায় পথ অবলম্বন

কংগ্রেসদলের (নয়া কং) বিরুদ্ধদল বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে তাঁহাদের বিজয় নানা প্রকার মিথ্যা ভোট দানের ফলে হইয়াছে। ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ব্বাচন হইলে নয়াকংদিগের বিজয় হইত না। একথাটা অতিরঞ্জন-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, নির্ব্বাচনে কোনও মিথ্যা ভোটদান হয় নাই। কারণ সকল নির্ব্বাচনেই মিথ্যাভোটের ক্রীড়া চলিয়া থাকে এবং এইবারেও চলিয়াছে বলিয়াই জনসাধারণ মনে করেন। তবে নয়াকং শ্রীমতী ইন্দিরার যুদ্ধজয়ের ফলে সাধারণের চক্ষে একটা নূতন গৌরব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিজয়, যেভাবেই নির্ব্বাচন হইত না কেন, এক প্রকার স্থির নিশ্চয় ছিল। "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে এই বিষয়ের একটা বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"রেড র‍্যাগ টু দি বুল (red rag to the bull)"—ষাঁড়ের নিকট লাল কাপড়ের টুকরা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের গত নির্বাচন সম্পর্কীয় আলোচনা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট ঐ "লাল কাপড়ের টুকরা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ নির্বাচন সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহারা শুধু উত্তেজিত নয়, উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছেন।

গত ৪ঠা এপ্রিল নবনির্বাচিত বিধান সভায় আদি কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কে যোগ দিয়া নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্য করিলে কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ বিশেষ রুষ্ট হইয়া উঠেন। প্রফুল্ল সেন বলিয়াছিলেন, এইবার নির্বাচন সম্পর্কে তাঁহার নিকট যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ৪০-৪৫ টি আসনে কারচুপি হইয়াছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, লোকের মনে যখন সন্দেহ দেখা দিয়াছে তখন একটি তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার উত্তর দেন প্রথমে কংগ্রেসের বর্ধমানের নাদনঘাট হইতে নির্বাচিত পরেশ গোস্বামী, যিনি ১৯৭১ সালের নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থীর নিকট প্রায় ১২ হাজার ভোটে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং ১৯৭২ সালে যেখানে পূর্ববারের বিজয়ী সি পি এম প্রার্থী মাত্র ২,৬৪১ টি ভোট পাইয়াছেন, সেখানে ৬১,৬১৭টি ভোট পাইয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বিস্মিত ও হতচকিত করিয়াছেন। তিনি প্রফুল্ল সেনকে ভীষ্মের সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, পিতামহ ভীষ্ম যেমন সবকিছু জানিয়া শুনিয়াও কৌরব পক্ষ লইয়াছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ও তেমনি সব জানিয়া সি পি এমের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ও কারচুপির কথা তুলিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেছেন, অথচ জনগণ যে সি পি এমের হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসকে গ্রহণ করিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। বর্ত্তমানের তরুণ রাজনৈতিক নেতারাও যে মহাভারত পাঠ করেন তাহা জানিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। তবে সম্ভবত সময়াভাবে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহা হইলে দেখিতেন যে, শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর কৌরবদের স্বপক্ষে কিছুই বলেন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যশাসন সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং রণজয়ী পাণ্ডবশ্রেষ্ঠও বিনীতভাবে ঐ উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল সেন যদি ভীষ্ম হন, তাহা হইলে বর্তমানে তিনি যে শরশয্যাশায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরেশচন্দ্র গোস্বামীর কথা বুঝি, কারণ প্রফুল্ল সেনের উক্তি তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। নাদনঘাটের নির্বাচনের অত্যদ্ভুত ফলাফল জনমনকে সন্দেহাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নেতা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের 'মেজাজ চ্যুতি'র কারণ বোঝা কঠিন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান নাটকের ঔরংজীবের কথা মনে হইতেছে। ভ্রাতৃহত্যা করিবার পর তিনি যেমন চতুর্দিকে "দারার ছিন্নমুণ্ড" ও "মোরাদের কবন্ধ" দেখিতেছিলেন, রায় মহাশয়ও তেমনি "প্রফুল্ল সেনের কণ্ঠে"ও জ্যোতি বসুর কথাই শুনিতেছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—"প্রফুল্লবাবু আজ জ্যোতি বসুর কথাই বলেছেন। গলাটা শ্রীপ্রফুল্ল সেনের কিন্তু কথাটা জ্যোতিবাবুর। জ্যোতিবাবুরা বাইরে যা বলে বেড়াচ্ছেন প্রফুল্লবাবু এখানে তারই প্রতিধ্বনি করলেন। শ্রীসেন বলেছেন ৪০।৪৫টি আসনে কারচুপি হয়েছে—আমরা বলছি হয়নি।" ব্যস! আবার কি? মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যখন বলিয়াছেন যে "হয়নি"—তখন তার উপর আর কোন কথাই চলিতে পারে না। আমাদের পরলোকগত ডাঃ বিধান রায়ের কথা মনে পড়িতেছে। একদিন বিধান সভায় তাঁহাকে উত্তেজিত হইয়া চিৎকার করিতে শুনিয়াছিলাম—"আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—আমিই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতিনিধি। তাই আমি যা বলি তাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কথা।" ছোট রায় তখ্‌তে বসিয়াই বড় রায়ের মেজাজ ও দাম্ভিকতাটা পুরাপুরিই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তবে সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষের কর্মশক্তি, বিচক্ষণতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কতটা আয়ত্ত করিয়াছেন ভবিষ্যৎই তাহার পরিচয় দিবে।

ভিয়েৎনামের ও বাংলাদেশের যুদ্ধ এক জাতীয় কি না

"যুগবাণী" পত্রিকার মতে এই দুই যুদ্ধের মধ্যে একই স্বাধীনতা প্রাপ্তির আবেগ দেখা গিয়াছে। আমাদের মতে দুই দেশের যুদ্ধের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বাংলা দেশ লড়িয়াছে সহস্র মাইল দূরের বিভিন্ন জাতির মানুষের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন নীতি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য। ভিয়েৎনামে লড়াই হইতেছে এক জাতির দুই রাষ্ট্রমতাবলম্বী দলের মধ্যে; রুশ-চীন সমর্থিত কম্যুনিষ্ট দলের সহিত আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্ত সাধারণতন্ত্রবাদী দলের। এখনকার যুদ্ধটা আরম্ভ হইয়াছে কম্যুনিষ্টদিগের সাধারণতন্ত্র এলাকায় অনুপ্রবেশের ফলে। বাংলাদেশে যুদ্ধ হইয়াছিল পঞ্চদশবৎসরাধিক কাল পশ্চিমপাকিস্থান কর্তৃক লুণ্ঠিত—উৎপীড়িত হওয়ার কারণে। একটা মতবাদ ঘটিত যুদ্ধ; অপরটি অতি বাস্তব লুণ্ঠন উৎপীড়ন ও শোষণ নিবারণ ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত। যুগবাণী বলিয়াছেন:

ভিয়েৎনামে আবার ভীমবেগে যুদ্ধ সুরু হয়েছে। এই যুদ্ধ মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায়। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া থেকে যাতে চিরতরে বিতাড়িত হয় এবারের যুদ্ধ সেই উদ্দেশ্যেই সুরু করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পিকিংয়ে গিয়েছিলেন। ভিয়েৎনামের ব্যাপারে একটা আপস-মীমাংসার আয়োজন করতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপন আলোচনায় নিক্সন ও চৌ এন লাই একটা বোঝাপড়ায় এসেও ছিলেন। নিক্সন তাইওয়ানের ওপর চীনের অধিকার স্বীকার করে নেন। প্রতিদানে চৌ এন লাই ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বন্ধের আশ্বাস দেন এবং ধীরে ধীরে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের সুযোগ দেওয়া হবে একথাও জানান। চৌ এন লাই আরও জানিয়েছিলেন যে এশিয়া থেকে সমস্ত মার্কিণ সৈন্য ও মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি অপসারণের পক্ষপাতী তাঁরা নন। কারণ এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান। তাকে প্রতিহত করার সাধ্য চীনের নেই। এশিয়ায় চীনকে কোন দেশ বিশ্বাসও করে না। তাই রাশিয়ার প্রভাব যাতে একচ্ছত্র না হতে পারে সেজন্য এশিয়ায় মার্কিণ উপস্থিতি চীনেরও কাম্য। ভিয়েৎনামের আগুনকে তাই ছাই চাপা দেবার গরজ নিক্সনের মতো চৌ এন লাইয়েরও ছিল।

কিন্তু ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা চীনের কথায় কর্ণপাত করেনি। তারা চীনকেই বিশ্বাস করে

না। তারা প্রকাশ্যে বলেছে যে অন্য রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া সমাধান তারা মেনে নেবে না। নিক্সন যখন পিকিংয়ে গিয়েছিলেন ভিয়েৎনামীরা তখন রাশিয়ার কাছ থেকে বহু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে। তারা জানত সশস্ত্র সংগ্রাম ভিন্ন স্বাধীনতা আসবে না, দেশের ঐক্যও সাধিত হবে না। তারা তারই জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেছিল। সেখানে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে আজ আমেরিকা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকার শক্তির পরিমাপ তাতেই হয়ে গিয়েছে। তাদের সাধ্যের সীমাও জানা গিয়েছে। ভিয়েৎনামে তাই এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের গতিকে তীব্রকর করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভিয়েৎনাম থেকে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসেছিল। তারা বাংলাদেশে একটি বিশেষ কথা বলে গিয়েছে। তারা বলেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গোড়া থেকেই ভিয়েৎনামবাসীরা সমর্থন করেছে, কারণ তারা জানে যে বাংলাদেশের ও ভিয়েৎনামের সংগ্রাম একই মহাসংগ্রামের দুটি অংশ মাত্র। এশিয়া থেকে সকল সাম্রাজ্যবাদী দখল ও শোষণকে দূর করার লড়াই দশকের পর দশক ধরে চলেছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, বার্মা, চীন সবাই স্বাধীনতার লড়াই করেছে—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এশিয়া পূর্ণ মুক্ত হয়নি। এইবার এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামে পূর্ণ আহুতি দেবার আয়োজন হয়েছে।

দুই যুদ্ধই এশিয়ার মুক্তি যুদ্ধ অথবা একটি মুক্তি যুদ্ধ ও অপরটি মতবাদ স্থাপন চেষ্টার সংগ্রাম তাহা বিচার্য্য।

গ্রামের কথা

"যুগশক্তি" (করিমগঞ্জ) পত্রিকায় একজন গ্রামবাসী লিখিতেছেন:

স্বাধীনতা পাওয়ার পর হইতেই অনেক আশা ও আশ্বাসবাণী গ্রামবাসীরা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কার্য্যক্ষেত্রে গ্রামগুলির কোনও উন্নয়নই হয় নাই। সরকারী বেসরকারী সকল স্তরেই শহরের সমস্যাদির প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার মনোভাব ইদানিং আরো বাড়িয়াছে। অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করে এবং তাহাদের প্রায় বাদ দিয়াই দেশ গঠনের যাবতীয় কাজ কর্ম করা হইয়া থাকে। আমাদের করিমগঞ্জ মহকুমার গ্রামগুলির অবস্থা সকল দিক দিয়াই শোচনীয় কিন্তু সেগুলির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে কাহাকেও বড় দেখা যায় না। শহরের যে কোন সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা যায়, এবং প্রতিকারও পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামের মানুষের নালিশ যথাস্থানে পৌঁছানোই কঠিন ব্যাপার, তদুপরি ধরাধরির উপযুক্ত শক্ত লোককে বিষয়টি সমজাইয়া দিতে না পারিলে প্রতিকার কোনও সময়ই হয় না। সংবাদপত্রগুলিতেও গ্রামের সমস্যা খুব একটা মর্য্যাদা পায় না, রাজনৈতিক দলগুলিই শহরের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত কার্যাকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন, কারণ নেতারা সকলেই শহর হইতে নেতৃত্ব করেন, এমন কি গ্রামাঞ্চলের জনপ্রতিনিধিরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরবাসী, ভোটের প্রয়োজন ছাড়া গ্রামের খবর নেওয়ার দরকার তাঁহারা বোধ করেন না।

শহরের মানুষ যে সমস্ত সমস্যা লইয়া প্রথমে হুলুস্থুল বাধাইয়া দেন, সেই সমস্ত সমস্যা গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন বছরের পর বছর শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে, প্রতিকারের কথা কেহ চিন্তাও করে না। আপনাদের কাগজেই দেখি, একদিন দুইদিন কেরোসিন পাওয়া যায় না না পেলে বিজলী বাতি শোভিত আপনাদের শহরে সোরগোল পড়িয়া যায়। অথচ ন্যায্য মূল্যে কেরোসিন না পাওয়া বা মধ্যে মধ্যে একেবারেই না পাওয়া আমাদের নিত্য দিনের সমস্যা। রেশনে চিনির বরাদ্দ একটু কম হইলে আপনারা তোলপাড় করেন, আমরা চিনির চেহারাই প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। মাছের অগ্নিমূল্য নিয়া গত সপ্তাহেও আপনারা লিখিয়াছেন, আমরা কোনও মূল্যেই মাছ পাই না। বেবীফুড গ্রামের

অধিকাংশ লোকই কিনিতে পারে না, অথচ গোদুগ্ধও গ্রামাঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য বস্তু, শহরে প্রায় সবই চালান হয়। আমাদের শিশুরা দুগ্ধের অভাবে ভাতের ফ্যান খাইয়া কপাল জোরের তারতম্য অনুসারে বাঁচিয়া থাকে কিংবা মারা যায়। এক ডজন সরকারী ডাক্তার এবং শতাধিক প্র্যাকটিশনার লইয়া আপনারা চিকিৎসার অব্যবস্থা নিয়া প্রায়ই নালিশ জানান, আর আমরা এক ডজন গ্রামের জন্য একজন মাত্র ডাক্তার পাইয়া ধন্য হই। রিক্সা চড়িতে না পাইয়া আপনারা গলদঘর্ম আর আমরা পায়ে চলা পথের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে বর্ত্তাইয়া যাই। বানে কিংবা খরায় যখন আমরা ফসল খোয়াইয়া সর্বস্বান্ত হই, আপনাদের তখন কোনরূপ চিত্তবৈকল্য দেখা যায় না, ককে মাস পর সেই কারণে যখন শহরের বাজারে চাউলের দাম বাড়িয়া যায়, তখন অবশ্য আপনাদের সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়, কিন্তু রেশনের বরাদ্দ একটু বাড়াইয়া দিলেই আবার শান্ত হইতেও সময় লাগে না।

সরকার অবশ্য বলিবেন যে উন্নয়ন ব্লকগুলির মাধ্যমে গ্রামগুলির উপকারের জন্য তাঁহারা পর্য্যাপ্ত খরচ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ২৫ বৎসরের বঞ্চনার ঠেলায় এইটুকু বুঝিয়াছি যে ব্লক অফিসগুলি এক ধরণের আড্ডাখানাও বটে। দেশবাসীর রক্ত জল করা ট্যাক্সের টাকা এখানে একদল সুযোগ সন্ধানী লোকের মধ্যে বণ্টিত হয়। ব্লক সমূহের সাহেব, আধা সাহেব মায় কেরানী-পিয়ন পর্য্যন্ত বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের মত উন্নাসিক মনোভাব লইয়া গ্রামবাসীদের সহিত ব্যবহার করেন, গ্রামের প্রতি অণুমাত্র মমতা ইহাদের নাই। কিছুদিন আগে বেকারী দূর করার নামে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের যে টাকা ব্লকগুলিতে আসিয়াছিল, তাতাতে কয়জন বেকার উপকৃত হইয়াছে, তাহার হিসাব লইলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। উন্নত সারের প্রয়োগ, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে যে পরিসংখ্যান মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাঁওতা মাত্র।

এইভাবে দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোকের সমস্যাকে অবহেলা করিয়া দেশ গঠনের কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হইবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে গ্রামগুলি নিশ্চিত ধ্বংস হইবে। প্রশাসন ও সমাজের যাঁহারা চিন্তাশীল অংশ তাঁহারা আরো কার্য্যকরী ভাবে গ্রামীন সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রসর না হইলে গোটা দেশই তাহার বিষময় ফল ভোগ করিবে।

দেশ-বিদেশের কথা

মহামতি লেনিনের অমর বাণী কতটা সফল হইয়াছে ?

খালমুখামেদোভ লিখিত, "প্রাভদায়" প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটি (তর্জমা) হইতে দেখা যাইবে যে, রুশরাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে লেনিনের উপদেশ অনুসরণ করাই একান্তভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। ইহার যাথার্থ্য লইয়া মতভেদ থাকিলেও প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ ও সুপাঠ্য। ইহাদ্বারা কম্যুনিষ্টদিগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি তাহা বুঝা যায়। আদর্শ অনুসরণ স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে যে কখনও একই পথেই চলে না, তাহা ইতিহাসের চর্চা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ান সমাজতন্ত্রের মহত্তম সাফল্যগুলির অন্যতম হল আমাদের দেশের সমস্ত জাতি ও অধিজাতিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাতলে সমবেত করা। আমরা চিরতরে শোষণ, নিপীড়ন, এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর বলপ্রয়োগের অবসান ঘটিয়েছি। আমরা সমান অধিকারভোগী স্বাধীন জাতিসমূহের নতুন ধরণের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ইউনিয়ন বা জাতিসংঘ গড়ে তুলেছি।

জাতিগত সম্পর্কের লেনিন-নীতির বিপুল সার্থকতা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাস প্রমাণ করেছে। এই সব আন্তর্জাতিক নীতিকে ভিত্তি করে সোভিয়েত সমাজ তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির অটুট সংঘ ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

এই বছরের ৩০ শে ডিসেম্বর সোভিয়েত জনগণ এই জাতিসংঘের ৫০-শৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে।

॥ ১ ॥

পৃথিবীর বৈপ্লবিক নব রূপায়ণে জাতিসংক্রান্ত সমস্যার স্থান ও ভূমিকা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ব্যাখ্যা করেছে এবং দেখিয়েছে যে, এই সমস্যা শ্রেনীসংগ্রামের স্বার্থের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। তত্ত্ব ও কর্ম প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামে সকল জাতির শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন।

পার্টির জাতিসংক্রান্ত কর্মসূচীর সার-বিষয়টি বর্ণনা করে লেনিন তাঁর মৌল নীতিগুলি নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারণ করেছেন— "জাতিসমূহের পরিপূর্ণ সাম্য; জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার; সমস্ত জাতির শ্রমিকদের মিলন।" লেনিন বলেছেন যে, সাধারণভাবে জাতিসমূহের সাম্য সম্পর্কে মামুলি বুলি আউড়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করে নিপীড়িত জাতির মার্কসবাদীদের জোর দিতে হবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতার উপর, আবার নিপীড়নকারী জাতির মার্কসবাদীদের জোর দিতে হবে জাতিসমূহের স্বতঃপ্রণোদিত ঐক্যের উপর। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, জাতিসমূহের সংসক্তি ও মিলনের দিকে, আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে এগুনোর আর কোন পথ নেই, থাকতে পারে না।

লেনিন একটি বৃহৎ বহুজাতিক রাষ্ট্র রূপে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার কল্পনা করেছিলেন। এই রাষ্ট্র কোন বিশেষ জাতিকে কোন বিশেষ সুবিধা দেবে না এবং জাতিসমূহের সাম্য ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে ভাষাসমূহের সাম্য সুনিশ্চয় করবে। এই রাষ্ট্র সংখ্যালঘু জাতিগুলির অধিকার ও অবাধ বিকাশের গ্যারান্টি দেবে। অকটোবর বিপ্লবের স্বল্পকাল আগে তিনি লেখেন: "আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্থাৎ নিপীড়িত জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা দাবি করি। এর কারণ এই নয় যে, অর্থনৈতিক দিক

থেকে আমরা দেশকে টুকরো টুকরো করার অথবা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আদর্শের স্বপ্ন দেখেছি। এর কারণ এই যে, আমরা চাই বৃহৎ রাষ্ট্র, ঘনিষ্ঠতর ঐক্য এবং এমন কি জাতিসমূহের মিলন, কিন্তু এসব আমরা চাই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা ব্যতিরেকে অচিন্তনীয়।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ইংরাজী সংস্করণ, ২১ শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩-৪১৪)

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের দেশের সমস্ত জাতি ও অধিজাতিকে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদী ভ্রাতৃসংঘে পরিণত করেছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ও তাদের পার্টিগুলি কোনঠাসা হয়েছে, জনগণেরসমর্থন হারিয়েছে এবং বিপ্লব কর্তৃক পরাভূত হয়েছে। পার্টি অনুসৃত লেনিনের জাতি সংক্রান্ত কর্মসূচী রুশিয়ার সমস্ত জাতি ও অধিজাতির জনগণের মনে পূর্ণ আস্থা জাগায় এবং সামাজিক ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে বৈপ্লবিক উদ্যম ও শক্তি জাগ্রত করে।

* * * *

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এনে দেয় রুশিয়ার সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সাম্য। এই জয় তাদের সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয় এবং আমাদের দেশের জাতি ও অধিজাতিগুলির সংঘ গড়ে তোলা ও সংহত করার প্রয়োজনীয় সমস্ত অবস্থা সৃষ্টি করে। রুশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, রুশিয়া ও প্রাচ্যের সমস্ত মেহনতী মুসলিমদের প্রতি আবেদন, রুশ ফেডারেশনের প্রথম সংবিধান এবং সোভিয়েত সরকারের অন্যান্য দলিল জাতিগত এবং জাতিধর্মগত সমস্ত বিশেষ অধিকার ও বিধিনিষেধ লোপ করে এবং ছোটবড় সমস্ত জাতির সাম্য ও সার্বভৌমত্ব এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করে।

রাষ্ট্র সংগঠনের লেনিনবাদী নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা রচনা করে। সমাজতান্ত্রিক ধরণের যুক্তরাষ্ট্র সমমর্যাদা-সম্পন্ন জাতিগুলিকে স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর সবপ্রকার বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে, জাতিগত বিবাদ-বিসংবাদ নির্মূল করতে সাহায্য করে, জাতিসমূহের সৌভ্রাত্রপূর্ণ সহযোগিতা এবং শ্রমজীবী জনগণের অভূতপূর্ব গণতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি সুনিশ্চয় করে।

ঐতিহাসিক বিকাশের বাস্তব ধারাই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ গড়ে তোলার তাগিদ দেয়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিধ্বস্ত উৎপাদন-শক্তিগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, অখণ্ড ও পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা ও যুক্তিসম্মত সামাজিক শ্রমবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা, শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে যাওয়া এবং সমস্ত জাতি ও অধিজাতির সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটানো অসম্ভব ছিল। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ ব্যতিরেকে প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে তাদের বাঁচানো অসম্ভব।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘ গঠনের ৫০শৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে : "রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাসে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘের প্রতিষ্ঠা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণার সংশয়াতীত জয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির জাতিসংক্রান্ত লেনিনবাদী কর্মনীতির সার্থক ফল।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি জাতিসংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী ও "বামপন্থী"

শোধনবাদী ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করেছে। এই সব ধারণার ফল কি হয় চীন তার দৃষ্টান্ত। জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতির লেনিনবাদী নীতিগুলি বর্জন করে মাওবাদীরা সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে সাঙ্গীকরণে বাধ্য করে এবং তাদের সম্পর্কে "চীনা করণের" কর্মনীতি অনুসরণ করে দেশে প্রবলভাবে হান জাত্যাভিমানের অনুশীলন করছে। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে সকল জাতির সাম্যের কথা বলা হলেও অ-হান জাতিগুলির লোকেরা (চীনে এঁদের সংখ্যা হবে পাঁচ কোটির মত) হীন অবস্থায় আছেন, এঁরা তাঁদের নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা প্রতিষ্ঠার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

জাতিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শোধনবাদী কর্মনীতির স্বরূপ দৃঢ়ভাবে উদঘাটন করে এবং অবিচলিতভাবে লেনিনবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করে সোভিয়েতের পার্টি আমাদের দেশের ছোট-বড় জাতিগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের মহৎ নীতিগুলি স্থাপন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসমূহের একটা সমিতি মাত্র নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন হল সোভিয়েত জাতিসমূহের স্বেচ্ছায় স্থাপিত অটুট সমাজতান্ত্রিক সংঘ। স্বশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বশাসিত অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকাগুলি ঐক্যবদ্ধ সোভিয়েত রাষ্ট্রের অচ্ছেদ্য অংশ। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ আমাদের দেশে জাতি ও অধিজাতিগুলির ঐক্যবদ্ধতার মহত্তম রূপ এবং জাতি ও অধিজাতিসমূহের অগ্রগতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি।

॥ ২ ॥

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের যুক্ত প্রচেষ্টায় নির্মিত সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে যে, সৃষ্টি-ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি এবং সৃষ্টিকার্যে "অসমর্থ" ও জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে "অযোগ্য" হওয়ার ফলে আত্মিক জীবনে স্থাণু জাতিগুলি সম্পর্কে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা তত্ত্বগুলি অসার ও অ-বৈজ্ঞানিক। আমাদের দেশে জাতিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করেছে যে, সক্রিয় ও স্বাধীন সৃষ্টির ঐতিহাসিক ক্ষমতা শুধু "বাছাই"-করা জাতিগুলির সম্পত্তি নয়, বরং এই ক্ষমতা সকল জাতিই পেতে পারে।

সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্রপূর্ণ সাহায্য, বিশেষ করে, রুশ জনগণের সাহায্যের ফলে আমাদের দেশের জাতি ও অধিজাতিগুলি এক পুরুষের মধ্যেই কয়েক শতাব্দী পথ অতিক্রম করেছে এবং কোন কোন জাতি পুঁজিবাদ এড়িয়ে সমাজতন্ত্রেও উপনীত হয়েছে। নতুন ধরণের সমাজ গড়ে তোলার কালে তারা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করেছে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা দূর করেছে এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ সমাজতান্ত্রিক রূপে উপনীত হয়েছে। লেনিনের পার্টি একমাত্র সঠিক ও ন্যায্য ভিত্তিতে জাতিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে, আর তা হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি, আমাদের মহান দেশের সমস্ত জাতির সাম্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

বুর্জোয়া ব্যবস্থা হল সামাজিক ও জাতিগত অসাম্য, নিপীড়ন ও হিংসা, তীব্র সংকট ও স্ববিরোধিতার ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। কয়েক বছর ধরে সাহসী ভিয়েতনামী জনগণের রক্তপাত ঘটানোর জন্য, মধ্যপ্রাচ্যে স্বাধীনতাপ্রিয় আরব জাতিগুলির ভূখণ্ড দখল করার ও লক্ষ লক্ষ আরবের শরণার্থীতে পরিণত হওয়ার জন্য, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের জনগণের সংগ্রাম নিষ্ঠুরভাবে দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদই দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে জাতিবৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় জাতিদ্বেষী সন্ত্রাসের জঘন্য অভিযান চালানোর জন্যও সাম্রাজ্যবাদই দায়ী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতির বাস্তব রূপায়ণের প্রেরণা সৃষ্টিকারী আদর্শ এক মহৎ আদর্শ। সোভিয়েত ইউনিয়নে অতীতের

অনগ্রসর জাতি ও অধিজাতিগুলির ঐক্য ও অগ্রগতির বাস্তব অভিজ্ঞতা বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণের উপর। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা ও ক্রমবর্ধমান আকর্ষণী শক্তির উৎসগুলি হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষককুলের মৈত্রী এবং সোভিয়েত জাতিগুলির অটুট বন্ধুত্ব ও ঐক্য। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই ঐক্য এখন শান্তিপূর্ণ সৃষ্টিশীল শ্রমে এবং কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের বিশাল কর্মসূচীর রূপায়ণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে অভিব্যক্ত হচ্ছে।

ছোট বড় প্রত্যেকটি জাতি কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে যথাযোগ্য সাহায্য করছে। সমগ্র দেশের ও প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলে আছে সমস্ত সোভিয়েত জাতির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও স্থায়ী পারস্পরিক সাহায্য। শুধু বিশেষ বিশেষ প্রজাতন্ত্র নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে জনগণের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফলেই এক একটি প্রজাতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উচ্চ শিখরে উপনীত হচ্ছে। দেশের সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিগুলির নিঃস্বার্থ সাহায্য ব্যতিরেকে কাজাখস্তানের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ অহল্যা ও পতিত জমি আবাদ করা এবং ভূমিকম্পের পর তাশখন্দের জনগণের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি পুনর্নির্মাণ করা কেমন করে সম্ভব হত?

বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক ও আধারের দিক থেকে জাতীয় সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্যগুলির ভিত্তিতে। যেখানে বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় জাতিও অধিজাতিগুলির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একেবারে নিরক্ষর ছিল, এমন কি, কোন কোন অধিজাতির নিজস্ব অক্ষরও ছিল না, আজ সেখানে অতীতের এই ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকারকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় যে, ৯ থেকে ৪৯ বৎসর বয়স্ক নরনারীর ৯৯.৭ শতাংশ সাক্ষর। অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র এবং স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শিক্ষাদানের বিদ্যালয়, শত শত মাধ্যমিক শিক্ষালয় ও বৃত্তি শিক্ষালয়, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান আকাদেমি, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির শাখাসমূহ স্থাপিত হয়েছে। আজ বহুজাতিক সোভিয়েত সাহিত্য বিকাশ লাভ করছে সোভিয়েতের বিভিন্ন জাতির ৮৯টি ভাষায়, বই প্রকাশিত হচ্ছে ১৪৫টি ভাষায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির আত্মিক বিকাশ, তাদের সংস্কৃতি সমূহের পারস্পারিক প্রভাব ও পারস্পারিক সমৃদ্ধিসাধনের ক্ষেত্রে রুশভাষা এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করছে। রুশভাষা জাতিসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রুশ ভাষার জনপ্রিয়তা কোন ভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে না বা তাদের হেয় করছে না।

নতুন সমাজ গড়ে তোলার কালে পার্টির মতাদর্শগত ও শিক্ষামূলক তৎপরতার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতি ও অধিজাতির শ্রমজীবী জনগণের চেতনার বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের আভ্যন্তরীণ রূপান্তর ঘটেছে, তারা নতুন, সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির আত্মিক গুণাবলী অর্জন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা অতীতের অনিষ্টকর অভ্যাস ও রীতিনীতি থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে। তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব, জাতিগত অবিশ্বাস, জাতিগত বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতা এবং অন্যান্য জাতির প্রতি জাতিগত ঘৃণার মত কুৎসিত জিনিসগুলি থেকে মুক্ত। তারা সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধের ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবোধের মনোভাব নিয়ে মানুষ হয়েছে। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির সামাজিক মালিকানা, অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ, শ্রমিকশ্রেণীর কমিউনিস্ট আদর্শ ও স্বার্থের ভিত্তিতে

জনগণের নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী—সোভিয়েত জনগণ গড়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের শক্তিশালী ঐক্য, তাদের সত্যিকারের সংঘবদ্ধতা। যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থগুলিকে ভাষা দেয় এবং লেনিনবাদী জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতি অনুসরণ করে একমাত্র কমিউনিস্টদের সেই পার্টিই সমস্ত জাতি ও অধিজাতিকে একটি অখণ্ড আন্তর্জাতিকতাবাদী ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে, তাদের প্রচেষ্টাকে নতুন সমাজ গড়ে তোলায় কাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম। মতাদর্শ, সংগঠনের ধরণ এবং কাজের প্রকৃতি অনুসারে একান্তভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়ায় এবং তার কর্মীদের মধ্যে আমাদের দেশের শতাধিক জাতি ও অধিজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সাফল্যের সঙ্গে বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। আমাদের পার্টির সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্মনীতি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘকে দৃঢ়তর করা এবং কমিউনিজম গড়ে তোলার সংগ্রামে জাতিগুলির সংঘবদ্ধতাকে ব্যাপকতর ও গভীরতর করা সুনিশ্চয় করছে।

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশের সমস্ত জাতি ও অধিজাতির প্রচেষ্টায় গঠিত অগ্রগামী সমাজতান্ত্রিক সমাজে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেকটি ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের এবং জাতি ও অধিজাতিগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্য অভিমুখী কর্মনীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে। পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে লিওনিদ ব্রেঝনেভ বলেন, "এই ঘনিষ্ঠ করে তোলার ব্যাপারটি ঘটছে এমন অবস্থায় যখন জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং সমাজতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীরতম মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশ্নে পার্টির কর্মনীতির সার কথা হল আমাদের সমগ্র সংঘের সাধারণ স্বার্থ এবং তার প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ সদাসর্বদা বিবেচনা করতে হবে।"

জাতিসমূহকে ও বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্যাগুলির উপর পার্টি সর্বদা নজর রাখছে। এ ক্ষেত্রে পার্টি যে কর্মনীতি অনুসরণ করছে তা' কমিউনিজম গড়ে তোলার বর্তমান স্তরের জটিল কর্তব্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের অবস্থান থেকে জাতিগত সম্পর্কের প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উপেক্ষা করে না, আবার সেগুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়েও দেখে না। পার্টি জাতীয়তাবাদ ও শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের এবং জাতীয় সংকীর্ণতা ও অহঙ্কারের যে কোন আকারের অভিব্যক্তির প্রতি আপসহীন মনোভাব অবলম্বন করতেই সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে শিক্ষা দেয়। পার্টি শ্রমজীবী জনগণের মনে সমস্ত জাতি ও অধিজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। "ক্ষুদ্র জাতিসুলভ সংকীর্ণ মনোভাব, সংগোপনে থাকা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার" এবং "সমগ্র ও সাধারণকে বিবেচনা করার এবং বিশেষকে সাধারণ স্বার্থের নীচে স্থান দেওয়ার" প্রয়োজনীয়তার প্রতি লেনিন বার বার অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন।

(সংগৃহীত রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭)

লেনিনের নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি সোভিয়েত জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘবদ্ধতা আরও বাড়িয়ে চলার জন্য কাজ করে চলেছে। অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক অগ্রগতির আরও উচ্চস্তরে পৌঁছানোর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতি দ্রুততর করার ও তার ভিত্তিতে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রে সামাজিক উৎপাদনের কার্যকারিতা, শ্রমের উৎপাদন-শীলতা এবং শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণ আরও বৃদ্ধি

করার নির্ধারক উপাদান। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রীভূত ও পরিকল্পিত পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা, বৃহদাকার শিল্পসংস্থাদি নির্মান, অর্থ বিনিয়োগ, শ্রমিক ও মজুরী সংক্রান্ত সংগঠনের ব্যাপারে অঙ্গ—প্রজাতন্ত্রগুলিকে ব্যাপক অধিকার দান অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করে তোলার ও বিশেষীকরণের অগ্রগতির এবং উৎপাদনের সমন্বয়সাধন ও কেন্দ্রীভবনের পথ সুগম করেছে। এর ফলে শ্রম, মালমশলা ও অর্থসম্পদের আরও যুক্তিসম্মত ব্যবহারএবং অর্থনৈতিক যোগ, সৌভ্রাত্রপূর্ণ সহযোগিতা ও জাতি সমূহের পারস্পারিক সাহায্য সম্ভব হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণ কার্যের অভিজ্ঞতা প্রমান করেছে যে, সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থগুলির মধ্যে সুসমঞ্জস যোগাযোগ ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমগ্র দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে অগ্রসর হওয়া। কারণ সমগ্র সোভিয়েত সমাজের কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে। অন্যদিকে এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে এবং সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের প্রসার ঘটাতে হলে পার্টিকে প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের ও প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক এলাকার স্বার্থগুলি বিবেচনা করতে হয়। এতে এমন সব অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে প্রজাতন্ত্রগুলি তাদের অধিকার ও সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগিয়ে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্বার্থগুলি মনে রেখে অগ্রসর হয়।

সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন বা সংঘ একটি বহুজাতিক রাষ্টের সংগঠনের সর্বাপেক্ষা স্বয়স্তর ও নিখুঁত রুপ। এতে সমগ্র সমাজের স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বার্থের সুসমঞ্জস মিলন ঘটেছে।

বর্তমান অবস্থায় জাতিগত সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়গুলির একটি হল এই যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির অবিরাম অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাদের অর্থনৈতিক জীবনের সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পার্টি তার কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংগঠনগুলির সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে বহুজাতিক রাষ্ট্রের পরাক্রম সংহত করার ব্যাপারটিকে সমগ্র রাষ্ট্রের দিক থেকে বিচার করে ও তার জন্য আগ্রহ দেখায়। পার্টি আমাদের অখণ্ড জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত যোগসূত্রকে সমতানে ও অবিরাম পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে চালু রাখার চেষ্টা করে।

লেনিনবাদী পার্টি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক নীতিগুলিকে দৃঢ়তর করার এবং কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ অখণ্ড সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর অবিচল দৃষ্টি রাখে। প্রত্যেকটি জাতি ও প্রত্যেকটি সংস্কৃতির প্রগতিশীল ঐতিহ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাকে সমর্থন ও প্রচার করে আমাদের পার্টি নতুন নতুন ঐতিহ্য এবং সকল জাতির মধ্যেই কমিউনিজমের নির্মাতাদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে তুলছে। জাতি ও অধিজাতিগুলির মধ্যে আত্মিক মূলগুলির নিবিড় বিনিময়, পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি এবং জাতীয় সংস্কৃতিগুলির মিলন ঘটছে উন্নত সমাজতন্ত্রের অবস্থায়। এর ফলে জাতীয় সংস্কৃতিগুলির সমাজতান্ত্রিক বিষয়বস্তু গভীরতর হচ্ছে এবং সোভিয়েত সমাজের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর হচ্ছে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের আধিপত্য এবং জাতিসমূহের মৈত্রী, সৌভ্রাত্র এবং অখণ্ড ঐক্য সোভিয়েত দেশের পরাক্রম আরও প্রবল হয়ে ওঠার এবং আমাদের দেশের জাতিসমূহের বহুজাতিক পরিবারের সমৃদ্ধি আরও বেড়ে যাওয়ার গ্যারান্টি।

—==—

সাময়িকী

চীন রাষ্ট্রের সকল মানুষ একজাতির ও এক ভাষাভাষী নহে একথা সর্ব্বজনবিদিত। কয়েক বৎসর পূর্বে চীন যখন তিব্বত দখল করে তখন বহু লক্ষ তিব্বতী ভাষা-ভাষী মহাযান বৌদ্ধকে জোর করিয়া চীনা করিয়া লওয়া হয়। যাহারা চীনা হইতে প্রস্তুত হয় নাই তাহাদিগকে ইহলোক ত্যাগ করাইতে চীনা মাওবাদীগণ দ্বিধা করে নাই। চীন ভারতেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দখল করিয়া লইয়াছে ও সেই সকল স্থানের বাসিন্দাগণ যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে তাঁহারাও চীনাভাষায় পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করেন বলিয়া আমরা মনে করি না। যে ভাষাকে চীনরাষ্ট্রে জাতীয়ভাষা বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে সেই ভাষা লিখিতভাবে প্রায় ৬০ কোটি লোকের পক্ষে একই ভাষা বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু কথিত ভাবে সেই লিখিত ভাষা এতই বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় যে সেগুলি পূর্ণরূপেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া ধরিতে হয়। যে সকল চীনা পিকিংবাসীদিগের সহিত একভাবে কথা বলে তাহারাই সংখ্যাধিক্য বশতঃ চীনদেশের গণ রাষ্ট্রের মালিক বলিলে ভুল হইবে না। আমরা শুনিয়াছি যে, উচ্চারণ-ঘটিত পার্থক্যের বিষয় না ধরিয়া যদি শুধু জাতি ও ভাষাগত বিভিন্নতাই ধরা যায় তাহা হইলে চীনদেশে নানা ভাষাভাষীর সংখ্যা নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী থাকিতে দেখা যায়।

ম্যাণ্ডারীন (পিকিংএ কথিত)	৫৩·৭	কোটি	ভাষাভাষী	
ক্যানটনি	৪·৫	,,	,,	,,
উ	৪·০	,,	,,	,,
মিন	৩·৭	,,	,,	,,
হাকা	২·০	,,	,,	,,
তিব্বতী	অজ্ঞাত	,,	,,	,,
অন্যান্য	অজ্ঞাত	,,	,,	,,

ধরা যাইতে পারে যে ১৫ কোটি চীনদেশের গণ রাষ্ট্রের অধিবাসী ম্যানডারীন ভাষাভাষী নহেন। কম্যুনিষ্ট মতবাদ অনুসারে এই সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ সর্বক্ষেত্রে সমাধিকার উপভোগ করিতে পারিবেন ধরিতে হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ সমাধিকার সম্ভোগ সংখ্যালঘিষ্ঠ দিগের কখনও হয় বলিয়া মনে হয় না। রুশ রাষ্ট্রের রুশের এশিয়া-স্থিত দেশগুলিতে লেনিনগ্রাড বা মস্কোর বাসিন্দাদিগের সহিত সমান অধিকার আছে বলিয়া সন্দেহ। রাষ্ট্রত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে কি হয় তাহা বলা যায় না, তবে কম্যুনিষ্ট হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়াতে পার্থক্য কামনা নিরোধার্থ রুশিয়ার ট্যাঙ্কের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। চীনদেশে পার্থক্য-প্রার্থী প্রায় ১১ লক্ষ তিব্বতী যে পৃথক হইতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে সেকথাও বিশ্ববাসীর অবিদিত নহে। সুতরাং রুশের বা চীনের সংবিধানে যাহাই থাকুক না কেন, বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে পৃথক হওয়া অথবা সাম্য আদায় করিয়া লওয়া অতি সুকঠিন কার্য্য।

শুধু কম্যুনিষ্টদিগের সম্বন্ধেই যে সমানঅধিকার প্রাপ্তির অসম্ভাব্যতার কথা উঠে এমন কথা বলা চলে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর সমান অধিকার আছে বলা চলে না। কারণ, প্রায় দুইকোটি কৃষ্ণকায় নিগ্রো মার্কিন দেশবাসী বহুক্ষেত্রে নানা প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত আছেন। অনেক স্থানে বাসে ট্রেনে হোটেলে কৃষ্ণকায়গণ শেতকায়দিগের সহিত একত্র চলিতে থাকিতে পারেন না। যদিও সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংঘের নির্দেশ অনুসারে নিগ্রোদিগের সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার আছে। আমেরিকার সংবিধান অনুসারেও কৃষ্ণকায় আমেরিকানগণ কোনও প্রকার অধিকারই হারাইতে পারেন না। ভারতেও সেইরূপ তথাকথিত

অস্পৃশ্য জাতির মানুষদিগকে এখনও নানা অপমান সহ্য করিতে হয়; যদিও আইনতঃ তাঁহারা সর্ব বিষয়েই অপর জাতির মানুষের সমতুল্য। নারীজাতির সাংবিধানিক সাম্যও সেইরূপ বহুস্থলে বাস্তব আকারে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রুশিয়ার লোকেরা বলেন, চীনদেশে সাম্যনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত নাই। চীনাগণ একথাটা অস্বীকার করেন এবং বলেন রুশ দেশের লোকেরাই লেনিন প্রতিষ্ঠিত নীতি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রেণী ও জাতি লইয়া অধিকারের ইতর-বিশেষ করা হইয়া থাকে। অদ্যাবধি এই ব্যাধির সুচিকিৎসা সম্ভবপর হয় নাই।

মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০০।৮০০ ভারতীয় ছাত্র

ডেট্রয়েট সহরে মিসিগান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক-গুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। এইগুলিতে প্রায় ২০০০ বিদেশী ছাত্র পাঠ করেন ও তাহাদিগের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা হইল ভারতীয় ছাত্রদিগের। সম্প্রতি মিসিগানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা অবসর সময়ে নানাস্থানে কাজ করিয়া নিজেদের খরচ চালায় তাহাদিগের কাজ করিয়া দিন গুজরান করিবার অনুমতি পত্র আছে কি না দেখিবার জন্য ঐ ছাত্রদিগের উপর অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে অনেক-গুলি ভারতীয় ছাত্রের উপর দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ জারি করা হয় যাহারা সপ্তাহে অনধিক ২০ ঘণ্টা কাজ করিবার অনুমতি পাইয়া ঐ সময়ের অধিককাল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগের উপরেও আইনভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ডেট্রয়েটের ভারতীয় বাসিন্দাগণ ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্য টাকা তুলিয়া প্রায় ২০০০০, হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অর্থ প্রধানতঃ ছাত্রদিগের আদালতের খরচের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। এক দিকে আমেরিকান রাষ্ট্রনেতাগণ আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতির সুনাম বিস্তারের জন্য বাহিরের ছাত্রদিগকে আমেরিকা যাইতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন ও অপরদিকে তাহারা আমেরিকার ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার কারণে উপার্জ্জন করিয়া খরচ মিটাইতে যাইলে তাহাদিগের উপর অভিযোগ আরোপ করিয়া তাহাদিগকে আমেরিকা হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই অবস্থায় ভারতীয় ছাত্রদিগের পক্ষে আমেরিকা গমন না করাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়।

আয়রল্যাণ্ডের আত্মত্যাগী বীর জোসেফ ম্যাকক্যান

আয়রল্যাণ্ডে যে ইংরেজ আইরিশ যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে প্রায়ই গুলিচালনা ও বোমা মারিবার ফলে উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হইয়া থাকে। এই সকল লড়াই প্রধানত পথে-ঘাটে আচমকা আক্রমণ করিয়া চালিত হয়। আয়রল্যাণ্ডের রিপাবলিকান সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাটালিয়নের সেনাপতি জোসেফ ম্যাকক্যান-এর বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৫ বৎসর। তিনি তাঁহার দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লোকে বলে যে তিনি স্বয়ং লড়াই করিয়া ১৫জন বৃটিশ সৈন্যকে নিহত করিয়াছিলেন ও বৃটিশ সৈন্যগণ তাঁহাকে মারিবার জন্য সর্বত্র খুঁজিয়া ফিরিত, কিন্তু কোনও সময়েই তাঁহাকে পাইত না। তিনি যে সকল বৃটিশ সৈন্যদিগকে মারিয়াছিলেন তাহারা সশস্ত্র ভাবে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া মারা গিয়াছিল। তিনি কোন ব্যক্তিকে পিছন হইতে অথবা নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করিয়া মারেন নাই। সম্প্রতি একদিন যখন তিনি একেলা নিরস্ত্রভাবে বেল-ফাস্টের একটি গলি দিয়া যাইতেছিলেন তখন কয়েকজন সাধারণ বস্ত্র পরিহিত বৃটিশ সৈন্য তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপর গুলি চালায়। তিনি পায়ে গুলি লাগিয়া পড়িয়া যান ও ঐ উর্দিবর্জীন সৈন্য-গণ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে পতিত অবস্থায় গুলির পর গুলি মারিয়া হত্যা করে। তিনি উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু বহুশত্রু বেষ্টিত নিরস্ত্র অবস্থায় কিছু করিতে পারেন নাই। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আইরিশ-বৃটিশ সম্বন্ধ আরও খারাপ হইয়াছে। এক সপ্তাহে ২৫০ বার গুলি চলিয়াছে ও

অনেক জনের প্রাণ গিয়াছে। ম্যাকক্যানের মৃতদেহ কবর দিবার সময় সহস্র সহস্র আইরিশ নরনারী যোদ্ধার বেশ পরিহিতভাবে শবাধারের অনুগমন করিয়াছিলেন।

অ্যাপোলো ১৬ র চন্দ্রাভিযান

অ্যাপোলো ১৬ বিগত ১৬ ই এপ্রিল ১৯৭২ চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করে। চন্দ্রে পৌঁছিয়া ২০ তারিখ এপ্রিল দুইজন অনন্তশূন্যের নাবিক, ক্যাপ্টেন জন ডব্লু ইয়ঙ্গ ও লেঃ কলঃ চার্লস এম ডিউক (ছোট) চন্দ্রে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের প্রথম অনুসন্ধান যাত্রা আরম্ভ করেন। এই কার্য্য তাঁহারা সাত ঘণ্টা কাল চালাইয়া চন্দ্র-অবতরণ যান ওরায়নে ফিরিয়া যান। দ্বিতীয় বার অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হয় ২১ তারিখ এপ্রিল। এইবার তাঁহারা ২॥০ মাইল দক্ষিণ দিকে গমন করেন ও নানা প্রকার নমুনা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ওরায়নে ফিরিয়া যান। শনিবার ২২শে এপ্রিল তাঁহারা শেষবার ভ্রমণে নির্গত হন ও উত্তর ধূম্রপর্বত পর্যন্ত গমন করিয়া ওরায়নে ফিরিয়া যান। তাঁহারা অতঃপর চন্দ্রে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন চন্দ্রদেশ হইতে ওরায়নকে শূন্যে উঠাইয়া চন্দ্র পরিবেষ্টন নিরত "ক্যাসবার" এ পৌঁছিয়া ঐ মহাকাশ যানের চালক লেঃ কমাণ্ডার টমাস কেনেথ ম্যাটিংলির সহিত মিলিত হ'ন। অতঃপর তাঁহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে সকল প্রস্তুতি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া লইয়া পৃথিবীর পথে যাত্রা করেন ও ২৮শে এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রীসমাস দ্বীপের নিকটে সমুদ্রবক্ষে অবতরণ করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল ১১৫ পাউণ্ড নমুনা প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। যাহা আনিয়াছেন তাহা আশানুরূপ না হইলেও যথেষ্টই হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলেও এই চন্দ্র অভিযান এক প্রকার পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা যায়।

ইয়াসুনারি কাওয়াবাটা

ইয়াসুনারি কাওয়াবাটা জাপানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলি রস অভিব্যক্তিতে সূক্ষ্ম অনুভূতিজাত ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ছিল। তাঁহাকে ১৯৬৮ খৃঃঅব্দে সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। জাপানে এখনকার মত উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। সুবুচি শোয়োর নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৫৯এ এ এবং মৃত্যু হয় ১৯৩৮খৃঃঅব্দে। ইয়াসুনারি কাওয়াবাটার জন্ম হয় ১৮৯৯ খৃঃঅব্দে। তাঁহার উপন্যাসগুলির প্রেরণা প্রধানত পুরাতন জাপানী সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত; এবং তিনি রুশদেশের সাহিত্য দ্বারাও কিছুটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কাব্যে, সাহিত্যে, নাট্যে, নৃত্যে, চলচ্চিত্রে ও অঙ্কনশিল্পে জাপানের স্থান অতি উচ্চে। জাতি হিসাবে জাপানীদিগের রসঅনুভূতি অতি আন্তরিক, নিগূঢ় ও স্বাভাবিক। জাপানী "নো" ও "কাবুকি" নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে কৃষ্টিজগতে একসময় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইয়াসুনারি কাওয়াবাটা জাপানের এই সুপ্রাচীন কৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া যুগোপযুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বিশ্ববাসীও একজন উচ্চস্তরের সাহিত্যিককে হারাইলেন।

স্মৃতিচারণ (১ম ও ২য় খণ্ড) শ্রীদিলীপকুমার রায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। ১২ টাকা ও ৬.৫০ পয়সা।

এই স্মৃতিচারণ পড়িয়া দিলীপকুমারকে নূতন করিয়া জানিবার সৌভাগ্য হইল। ইহাতে তাঁহার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তিনি ভগবৎ-প্রেমী ছিলেন। পরিবেশও পাইয়াছিলেন তিনি অনুরূপ। ইহা ভগবানেরই নির্দেশ। তাঁহার বাল্য কৈশোর যৌবনের যে চিত্রগুলি পাই, তাহাতেও সেই একই আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ যেন তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার নির্মলদা একটি অপূর্ব চরিত্র! মাটি দিয়া পুতুল গড়িবার কাজ তিনিই করিয়াছেন।

পরিবেশই মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করে। অথবা চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ আসিয়া জোটে। দ্বিতীয়খণ্ডে দেখিতে পাই, যেসব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ তিনি করিয়াছেন তাহা তাঁহারই কৃতিত্বের ফল। সাধনার ক্ষেত্রে এই ক্রম তাঁহাকে ধীরে ধীরে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। তবে তাঁহার সাধনার পথকে সুগম করিয়াছে তাঁহার গান। তিনি নিজে সুগায়ক। সাধনার বিষয়ে যে-একাগ্রতার প্রয়োজন, যে একাগ্রতা আনিতে যোগীরা যোগ-অভ্যাস করেন তিনি তাহা গানের মধ্য দিয়া সহজে পাইয়াছেন। গানের মত তন্ময়তা আর কেহ আনিতে পারে না। ইহার মধ্য দিয়া ভগবদ্দর্শন সহজে হয়।

এই খণ্ডে দেখিতে পাই তিনি অরবিন্দ সান্নিধ্যে আসিয়াছেন—প্রকৃত সাধনা তাঁহার এইখান হইতেই সুরু। সাধনার ক্রম ও তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার পরবর্তী খণ্ডে হয়ত দেখিতে পাইব। আমরা সেই খণ্ডটি দেখিবার প্রত্যাশায় রহিলাম।

আসরের গল্প: দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, ৭৯।১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য বার টাকা।

আসরের গল্প অর্থাৎ সঙ্গীত-আসরের গল্প। গল্পাকারে লিখিত হইলেও ইহা কল্পিত গল্প নহে। এই গল্পগুলি পূর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে।

'সঙ্গীতের আসর' লিখিয়া দিলীপবাবু পূর্বেই সুনাম অর্জন করিয়াছেন। যেসব খ্যাতনামা ওস্তাদের কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি না লিখিলে, কালে ইঁহাদের নাম পর্যন্ত লোপ পাইত। কিংবদন্তীর মত হয়ত কিছুদিন লোকের মুখে মুখে ঘুরিত, কিন্তু তাহা আর কয়দিন? বিশেষ করিয়া এইসব শিল্পীদের কথা কেহ কখনো লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না—এমনি অবজ্ঞাত ইঁহাদের জীবন। সেই কাজ তিনিই একমাত্র সমাধা করিলেন। এইসব তথ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ইহা সহজেই বোঝা যায়। তিনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ কি না জানি না, কিন্তু তিনি যাহা করিলেন তাহা ইতিহাস হইয়া রহিবে, সেই সঙ্গে ঐসব গুণী ব্যক্তিদের কথা লিখিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার এই কার্যের জন্য কৃতজ্ঞ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ৩০শে মে, ১৮৬৫ মৃত্যু : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ প্রথম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৭৯ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতীয় জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা

আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমার বাসিন্দাদিগের ১২ লক্ষ নরনারী শিশুর মধ্যে ১০৫২৪২, একলক্ষ পাঁচহাজার দুই শত বিয়াল্লিশ জন বস্তিতে বাস করেন। ইঁহাদিগের আট আটটি পরিবারের রন্ধনশালা একত্রভাবে আছে; পৃথক রান্নাঘর নাই। শতকরা ৮১টি পরিবারের স্নানের ঘর নাই। শতকরা ৩৭টি পরিবার অপরের সহিত একই পাইখানা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। শতকরা ৭৬ জনের ঘরে বিজলিবাতি নাই, বায়ু চলাচল কোনমতে হয় এবং অর্দ্ধেকের গৃহের সহিত কোন বারান্দা নাই। আসানসোল উন্নয়ন সংস্থার ইচ্ছা যে এই সকল বস্তিগুলি এরূপ সংস্কার করা হয় যাহাতে তাহার বাসিন্দাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে তাহাতে বাস করিতে পারে। এইজন্য তাহাদের হিসাবে চার কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বাংলা সরকার ইহার অর্দ্ধেক দিবেন পাঁচ বৎসরে। অর্থাৎ মোট বস্তিবাসীদিগের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মাথা পিছু প্রায় চারশত পঁচাত্তর টাকা ধার্য্য হইতেছে। একটি পরিবারে যদি নরনারী শিশুর সংখ্যা পাঁচ হয় তাহা হইলে সেই পরিবারের নিবাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে দুইহাজার তিনশত পঁচাত্তর টাকা দিয়া। পাকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজকাল বর্গফুটে ২০ হইতে ৩০ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ যে টাকা দেওয়া হইবে তাহাতে প্রায় ১০০ শত বর্গফুট নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। একখানা ১০ ফুট × ১০ ফুট ঘর হইলেই টাকা শেষ হইয়া যাইবে। রান্না, স্নান ইত্যাদি কোথায় হইবে? খোলা বারান্দা যদি থাকে তাহার টাকা কে দিবে? এই সকল বস্তিবাসীদিগের পরিবার পিছু মাসিক আয় ২৪৯ টাকা। ইঁহারা যদি মাসিক ৫০।৬০ টাকা দিতে পারেন তাহা হইলে ইঁহাদিগকে ৫০০০।৬০০০ টাকা কর্জ্জা দিলে তাহাতে যে গৃহ নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে সে গৃহে এক একটি পরিবার অল্পবিস্তর আরামেই বাস করিতে পারিবে। গৃহ বন্ধক থাকিবে এবং মাসিক ৫০।৬০ টাকা

দিলে গৃহের ঋণ ১০।২০ বৎসরে সুদে আসলে শোধ হইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে। সুদটা আইন করিয়া শতকরা ৪॥০ টাকা রাখা আবশ্যক এবং সেই সুদে টাকা কিছু কিছু ঋণ দিতে কারখানার ও কয়লাখাদের মালিকদিগকে এবং সরকার বাহাদুরকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এই জাতীয় ব্যবস্থা না করিয়া যদি অল্প খরচে দায়সারাভাবে বস্তি সংস্কার করা হয়, তাহা কখনও উচিত হইবে না। যদি টাকা ঢালিয়া উচিত ভাড়া আদায় চেষ্টা হয় তাহাও দরিদ্র শ্রমিকদিগের পক্ষে কষ্টকর হইবে। শুধু যদি গৃহগুলি তাহাদিগের নিজের হইয়া যায় তাহা হইলেই গরীবলোক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ করিয়া গৃহের মালিক হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে জমির মূল্য কম। সুতরাং গৃহের সহিত সকলেই অল্প অল্প জমি রাখিতে পারিবে এবং শাক শব্জি উৎপাদন কিম্বা হাঁস মুরগী পালন করিয়া জীবনযাত্রা আরও সুখময় করিতে পারিবে। তবে একথা বলিতেই হইবে যে এক পরিবারের পাঁচজন লোক একখানা ঘরে থাকিবে এইরূপ পরিকল্পনা সভ্যতার উন্নতিসাধনকর হইতে পারে না।

রুশিয়ায় কয়লা খাদের কর্ম্মীদের কথা

আসানসোল হইতে প্রকাশিত "কোল ফিল্ড্ ট্রিবিউন" পত্রিকায় প্রকাশ যে, মস্কো হইতে প্রফেসর আই এন পানিন ধানবাদে আসিয়াছেন ও তাঁহার উদ্দেশ্য রুশিয়ায়শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খনির কার্য্য শিক্ষার ছাত্রদিগকে ভারতীয় কয়লা খাদে পাঠাইয়া শিক্ষা দান ব্যবস্থা করা। তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম প্যাট্রিচে লুমুম্বা জন-বন্ধুতা বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো। প্রফেসর পানিনকে সেণ্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ষ্টেশনের কয়েকটি কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয় ও তিনি নানা স্থলের অবস্থা সাক্ষাৎভাবে পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটি বিশেষজ্ঞদিগের সভায় সকলের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেন। বিস্ফোরক বিষয়ে তিনি বলেন যে, ইউ-এস এস-আর এ চাপ দিয়া শক্তকরা কাগজের খাপে বিস্ফোরক রাখিয়া ফাটাইলে তাহা বেশ সস্তা ও কার্য্যকর হয়। ইহাতে ৬ নংএ-র পরিবর্ত্তে ৮ নং ডিটোনেটর ব্যবহার করা হয়। ইহার কারণ এই যে স্লারি বিস্ফোরকের সহিত ৬ নং ডিটোনেটর কাজ করে না। এবং স্লারি বিস্ফোরক আজকাল সকল প্রকার খাদে ও উন্মুক্ত কাটা খনিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রফেসর পানিন বলেন যে রুশিয়ায় কয়লা খাদে টেলিফোন ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। রেডিও ব্যবহারও হয়। রুশিয়ার খাদে যাহারা কাজ করে তাহারা মাসিক প্রায় ২৪০০ টাকা রোজগার করে। কেহ কেহ ৪০০০ টাকাও উপার্জ্জন করে। এই টাকাতে অধ্যাপক নিয়োগ করাও সম্ভব হয়। খনিতে যাহারা কাজ করেন তাঁহারা অসুস্থ হইলে স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া অল্প খরচে থাকিতে পারেন। যাহা ব্যয় হয় তাহার শতকরা ৩০ টাকা কর্ম্মীদিগকে দিতে হয়। বাকি ৭০ টাকা ট্রেড ইউনিয়ন হইতে দেওয়া হয়।

জীবনধারণে পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য

ডারউইনের মতে জীবজগতের ভিন্ন জাতির প্রাণীদিগের কোনও একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিকে বিশেষ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার ক্ষমতার উপরেই সেই সকল জাতির জীবগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করিয়াছে। যেগুলি পারিপার্শ্বিকের সংঘাত সহ্য করিতে পারে নাই সেই সকল জাতীয় জীবজন্তু ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণী জগতে ক্রমবিকাশের ধারা পারিপার্শ্বিকের সহিত সংঘাতে টিঁকিয়া থাকিবার উপরেই গঠিত ও নিণীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মানব জাতির জীবনধারণের সাহায্যের জন্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক সৃজন সম্বন্ধে যে নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে তাহা একটা কোন নূতন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর গড়িয়া উঠে নাই। জীবজগতে পারিপার্শ্বিকের অনুকূল অথবা প্রতিকূল ভাবের কথা ডারউইনের সময় হইতেই সর্ব্বজন জ্ঞাত আছে। নূতন কথা হইতেছে এই যে, মানুষ এখন দেখিতেছে যে তাহার নিজের জীবনযাত্রা পদ্ধতিই অনেক স্থলে তাহার জীবন রক্ষার প্রতিবন্ধক অবস্থার সৃজন করিতেছে। যথা, মানুষ

মাটির স্বাভাবিক গুণাগুণ, জলের পবিত্রতা ও হাওয়ার পরিষ্কার অবস্থা নিজের কার্য্যের দ্বারাই নষ্ট করিতেছে ও তাহার ফলে বহু মানবের স্বাস্থ্যনাশ ঘটিতেছে, অনেকের মৃত্যু হইতেছে ও জীবনধারণ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। মাটিতে বিষাক্ত ঔষধাদি ছিটাইয়া কীট-পতঙ্গ বিনাশ করিতে গিয়া অথবা কৃত্রিম সার ঢালিয়া মানুষ মাটির স্বাভাবিক সরসতা নষ্ট করিয়া মাটির মানব-জীবনধারণের অনুকূল গুণগুলি নষ্ট করিতেছে। এইভাবে মানুষ জলে ময়লা ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি নর্দ্দামা দিয়া ছাড়িয়া জলাশয়, নদী, হ্রদ, এমন কি সমুদ্রকেও কলুষিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই পরিষ্কার ও পবিত্র জলের অভাব সৃষ্টি করিতেছে। হাওয়ার ধোঁয়া, বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক বাষ্প এবং আজকাল পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে প্রসূত প্রাণনাশকারী তেজস্ক্রীয় রশ্মিও পরমাণু সঞ্চরণ করিয়া মানুষ বায়ুমণ্ডলকেও মৃত্যুর বিভীষিকাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে পূর্ব্বকালে পারিপার্শ্বিক ছিল স্বভাবজাত এখন তাহা হইয়াছে মানুষের করস্পর্শে ক্রমবর্দ্ধনশীল ভাবে বিষাক্ত ও মানব জীবন ধারণের অনুপযুক্ত।

এই সকল কথায় আলোচনার জন্য সুইডেনে একটা আন্তর্জাতিক বৈঠক বসিয়াছে ও তাহাতে সকল জাতির বিশেষজ্ঞদিগের সমাবেশ হইয়াছে। চেষ্টা হইতেছে যাহাতে সকল জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জগতের জলবায়ু মৃত্তিকা পবিত্র পরিষ্কার ও জীবনধারণ-সহায়ক হইয়া থাকে। এই আলোচনা বৈঠকে কেহ কেহ বলেন যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক; যেহেতু ঐ বিস্ফোরণ জগতের বায়ুমণ্ডলকে এমন ভাবে বিষময় করিয়া তুলিতেছে যাহাতে ভবিষ্যতে ঐ রূপ বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীতে মানবজীবন রক্ষা অসম্ভব হইবে। প্রায় সকল জাতিই এই কথাটা মানেন, অন্ততঃ কথায়; শুধু চীন দেশ এই কথায় আপত্তি করেন। চীনাদিগের মতে হাওয়ায় জলে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ আপত্তিজনক হইলেও আকাশে প্রাণনাশকারী রশ্মি বিকিরণ কিছুতেই নিবারণ করা চলিবে না। কারণ তাহা হইলে চীনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি আর সেইরূপ সবল থাকিবে না। সে যাহাই হউক, তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ যেভাবে পারিপার্শ্বিককে মানব জীবন ধারণের প্রতিকূল করে তাহার তুলনায় ধূম্র, ক্ষতিকর বাষ্প ইত্যাদি কিছুই নহে; এবং যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও পারমাণবিক কণিকা থাকিলে তাহা চীনের খাতিরে মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনও আবশ্যক থাকে না।

সুইডেনে যাঁহারা এই সকল আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে দারিদ্র্যও একটা পারিপার্শ্বিকের অবস্থা বলিয়া ধর্ত্তব্য হওয়া উচিত। ইহা যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেখিতে হয়, অর্থাভাব কত অধিক হইলে তাহা মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে হানিকর অবস্থার সৃজন করে। ইহার সহিত দেখিতে হয়, অন্যান্য কি কি অবস্থা আছে যাহা মানুষের দ্বারা সৃজিত, ও মানুষ যাহার পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, যাহাতে মানব জীবন রক্ষা কঠিন হয়। যথা, বলা যাইতে পারে যে, বহু স্থলেই খাদ্য, পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, বাসস্থান প্রভৃতি এরূপ আছে দেখা যায় যাহাতে মানব জীবন রক্ষার ব্যাঘাত হয়। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে এই সকল কথার উত্থাপনা প্রয়োজনীয়—অন্ততঃ ধূম্র বাষ্পের কথার তুলনায়। আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে সকলের মনে হইতে পারে। ১৯০১ খৃঃ অব্দের তুলনায়, সকল পারিপার্শ্বিকের (দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যাভাব প্রভৃতি ধরিয়া) উপস্থিতি সত্ত্বেও, ১৯৭১ খৃঃ অব্দে ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অপরিচ্ছন্ন ও জীবন ধারণের বিরোধী হইলেও যদি মানব জাতি ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়িয়াই চলে, তাহা হইলে ঐ সকল আলোচনার মূল্য কতটা ধরা যাইতে পারে? কারণ মানব জাতি শুধু যে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত হয় এইরূপ কথা বলা চলে না। জীবন ধারণ সহজ, সরল করিতেও মানুষ কম করে না। শুধু বিংশ শতাব্দীতেই যেসকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ও ঔষধের ক্ষেত্রে,

তাহাতেই মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা বহুলাংশে সুগম হইয়াছে। যথা, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্লেগ প্রভৃতি রোগের নিবারণ কারক ঔষধাদি রক্ত-স্রোতে প্রবিষ্ট করাইবার ব্যবস্থা। অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ, যথা পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষা হইতেছে। ইহা ব্যতীত যে সকল অবস্থা মানুষের জীবন ধারণ কঠিন করে সেই সকল অবস্থাও ক্রমশঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেষ্টার ফলে উন্নততর রূপ ধারণ করিতেছে। এই সকল কথাও মনে রাখা কর্তব্য।

সরকারী কারখানাতে লাভ লোকসান

ভারতবর্ষে যে-সকল সরকারী কারখানা ও কারবার চলিতেছে তাহার মধ্যে যেগুলিতে ১০ কোটির অধিক টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে সেগুলির অনেক কারবারই লোকসানে চলে। যথা মূলধন ও লাভ লোকসান বিচারে নিম্নলিখিত রূপ পরিস্থিতি দেখা যায়।

১।	হিন্দুস্থান স্টিল	১০৬২	কোটি	টাকা	মূলধন	১৯৬৯-৭০রে		লোকসান	১১ কোটি
২।	হিন্দুস্থান মেসিন টুল	২৯৩	”	”	”	”	”	”	৮৭ লক্ষ
৩।	ভারত ইলেক্ট্রনিক	১১	”	”	”	”	”	লাভ	২.৬ কোটি
৪।	হেভি ইলেক্ট্রিকাল (ইণ্ডিয়া)	১২৩	”	”	”	”	”	লোকসান	৭.৮ কোটি
৫।	হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পন	২৪৬	”	”	”	”	”	লোকসান	১৭.২ কোটি
৬।	ভারত আর্থ মুভার	১৬.৬	”	”	”	”	”	লাভ	২ কোটি
৭।	হিন্দুস্থান এরোনটিক্‌স্	২১২	”	”	”	”	”	লাভ	৩.৩ কোটি
৮।	ভারত হেভি ইলেক্ট্রিকালস	১৭৩	”	”	”	”	”	লোকসান	১.৪ কোটি
৯।	মাইনিং এণ্ড এলায়েডমেশিনারি কর্পন	৫৬	”	”	”	”	”	লোকসান	৬.৪ কোটি
১০।	এফ, এ, সি, টি,	৭০	”	”	”	”	”	লোকসান	১.৯ কোটি
১১।	ন্যাশনাল নিউজপ্রিন্ট	১১	”	”	”	”	”	লোকসান	৮৮ লক্ষ
১২।	হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্ম	১৫.৮	”	”	”	”	”	লোকসান	২ কোটি
১৩।	এফ, সি, আই,	২০৫	”	”	”	”	”	লাভ	২.২ কোটি
১৪।	আই, ডি, পি, এল,	৭৫	”	”	”	”	”	লোকসান	৯.২ কোটি
১৫।	এন, সি, ডি, সি,	১৮৪	”	”	”	”	”	লাভ	১.১ কোটি
১৬।	নেভেলি লিগনাইট	১৭০	”	”	”	”	”	লোকসান	৪.৪ কোটি
১৭।	এন, এম, ডি, সি,	৫০	”	”	”	”	”	লোকসান	২৭ লক্ষ
১৮।	ও, এন, জি, সি,	২০৩	”	”	”	”	”	লাভ	১১.৯ কোটি
১৯।	আই, ও, সি,	১৩১	”	”	”	”	”	লাভ	২.৪ কোটি
২০।	কোচিন রিফাইনারীস	২১.৮	”	”	”	”	”	লাভ	২.৪ কোটি
২১।	এস, টি, সি,	১৮.৪	”	”	”	”	”	লাভ	৪.৯ কোটি
২২।	ফুড কর্পন	২৯১	”	”	”	”	”	লাভ	৭.১ কোটি
২৩।	এয়ার ইণ্ডিয়া	৪৯	”	”	”	”	”	লাভ	২.৬ কোটি
২৪।	ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স	৪৭	”	”	”	”	”	লাভ	১.৩ কোটি
২৫।	শিপিং কর্পন	৮১			”	”	”	লাভ	৫.৯ কোটি

মোট হিসাবে ক্ষতির পরিমাণই প্রায় টাকায় আট আনা অধিক

হত্যা উন্মাদনার অভিব্যক্তি

কিছুকাল পূর্ব্বে ইসরায়েলের বিমান বন্দর লিডডাতে আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ বিমানযাত্রী বলিয়া মনে হয় এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তি একটি বিমান হইতে অবতরণ করে। তাহাদিগের জিনিসপত্র যখন মাশুলের জন্য পরীক্ষার কেন্দ্রে স্থাপিত হয় তখন তাহারা বাক্স খুলিয়া হঠাৎ যন্ত্র-বন্দুক, পিস্তল, বোমা প্রভৃতি বাহির করিয়া চারিদিকে একটা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সুচনা করে। যে সকল যাত্রী ঐ আক্রমণে হতাহত হন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন তীর্থযাত্রী। ইঁহাদিগের উপর যাহারা আক্রমণ চালায় তাহারা ছিল জাপানী। তিন জন জাপানী হত্যাকারী ২৪জন মানুষকে হনন করে ও তাহাদিগের মধ্যে ১৭জন ছিল পুয়েরটোরিকান তীর্থযাত্রী। যে তিনজন জাপানী এই বীভৎস নির্ম্মমতার জন্য দায়ী তাহারা হত্যাকর্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল ও নিজেদের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াই তাহারা ঐ নৃশংসতাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, অর্থাৎ ঐ ঘাতকদিগকে একপ্রকার হত্যা উন্মাদনা পাইয়া বসিয়াছিল ও তাহারা যেভাবে ঐ নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ করে তাহাতে তাহাদিগকে উন্মাদ ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। দুই ব্যক্তি ঐ সময়েই প্রাণ হারায় এবং তৃতীয় ব্যক্তি কোজো ওকামোটো ধৃত হয়। এই ব্যক্তির পিতা পুত্রের কার্য্যের জন্য তাহাকে যেন অনতিবিলম্বে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। জাপানী সরকার ১৫ লক্ষ ডলার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে মৃতব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারীগণের এক-একজনের জন্য ১০,০০০ হাজার ডলার ও আহতদিগের অংশে মাথা পিছু ৫০০০ ডলার প্রাপ্য হইবে। জাপান সরকার জাতিগত ভাবে বহুভাবে লজ্জা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইরূপ ঘটনা যে ঘটিতে পারে ইহা দেখিয়া পৃথিবীর সকল বিমান বন্দরে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি কোথাও বিমানে যাইতে চাহিলেই তাহাকে ও তাহার মালপত্রের তন্নতন্ন করিয়া তল্লাস হইতেছে। নরনারী নির্ব্বিশেষে। সকল বিমান বন্দরে এখন বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী শান্ত্রী মোতায়েন করা হইতেছে।

বাংলাদেশে পাকিস্থানী পঞ্চম বাহিনী

বাংলাদেশ পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক মানুষ রহিয়াছে যাহারা পাকিস্থানকে অন্তরে অন্তরে ঐ দেশে শক্তিশালী করিতে চাহে এবং পাকিস্থানের শক্তিবৃদ্ধির জন্য মিথ্যা প্রচার করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা অনুভব করে না। এই সকল পাকিস্থানভক্ত বাংলাদেশবাসীদিগের মধ্যে মৌলানা ভাসানীর দলের চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট জাতীয় অনেক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে। ইহারা ভারতীয়দিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে সতত নিযুক্ত এবং বাংলা দেশের হিন্দুদিগেরও (অকম্যুনিষ্ট) শত্রু। ইহারা কোথাও কোথাও বাংলাদেশের হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেই কথা ভারতবর্ষে রাষ্ট্র করিয়া ইহারা ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্বের বন্ধন ঢিলা করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের চীনপন্থী কম্যুনিষ্টগণ এই সকল অপপ্রচার ভারতবর্ষে চালাইবার প্রচুর চেষ্টা করিয়া থাকে। শেখ মুজিবুর রেহমান এই সকল কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সে কার্য্যে কতটা সক্ষম হইতেছেন তাহা বলা কঠিন। ভারতবর্ষে যাহারা কম্যুনিষ্ট প্রেরণা জাত প্রচার চালাইতেছেন তাহাদিগকে দমন করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই জাগ্রত ভাবে দেখা প্রয়োজন যাহাতে মৌলানা ভাসানীর অনুচরদিগের ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বিনাশ চেষ্টা সফল না হয়। বাংলাদেশ সরকারের কর্ত্তব্য যাহাতে ভারতের জন সাধারণ সহজে বাংলাদেশে গিয়া সকল বিষয়ের সাক্ষাৎ খবরাখবর পাইতে সক্ষম হ'ন, সে ব্যবস্থা করা।

শ্রেণীসংগ্রামের সর্ব্বগ্রাসী রূপ

মানুষ যেখানেই থাকে তাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করিবার জন্ম নানা কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হয়। ইহা হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলহ ও অপর প্রকার সংঘাতের সৃষ্টি হয়। যাহার সহিত যাহারই সংঘাত যে কারণেই হয়, তাহার ফলে দেখা যায়, পরস্পরের সম্বন্ধে নিদারুণ নিন্দার উত্থাপনা। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ থাকিলেই কেহ নিয়োক্তা কেহ নিযুক্ত, কেহ দান করে কেহ গ্রহণ করে, কেহ শোষক কেহ শোষিত, কেহ উপরওয়ালা কেহ তাঁবেদার, কাহারও হুকুমত কাহারও কার্য্য সেই হুকুম তামিল করা—সম্বন্ধের শেষ নাই এবং সকল সম্বন্ধই শেষ অবধি উল্টা-সোজা, সপক্ষ-বিপক্ষ অথবা ঐ জাতীয় দ্বিবিধ বৈপরীত্য জ্ঞাপক স্বরূপ অবলম্বন করে। সকল কিছুই শেষ অবধি দুই শ্রেণীগত হইয়া দেখা দেয় ও দুই শ্রেণীর সমন্বয়ের কোনও সম্ভাবনা কদাপি কোথাওই দেখা যায় না। শ্রেণীসংগ্রাম শুধু যে শোষক ও শোষিতের মধ্যেই চলিতেছে এমন নহে। যেখানেই দুইটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ একত্রে কার্য্য করিতেছে সেইখানেই তাহারা দুই শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং তাহাদের পরস্পর-বিরোধিতা শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ ধারণ করিতেছে। এই ভাবে শ্রেণীসংগ্রাম সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। মালিক মজদুর হইতে আরম্ভ হইয়া এখন সে সংগ্রাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্রেতা বিক্রেতা, শাসক শাসিত, শিক্ষক ছাত্র, ঋণদাতা ঋণগ্রাহক—যেদিকেই দেখা যাউক না কেন, দুই পক্ষ থাকিলেই শ্রেণীসংগ্রাম লাগিয়া যায়। পরস্পরের সহিত মিলিত থাকিয়া কার্য্যে সমবায়নীতি অনুসৃত কেন হয় না? হয় না সম্ভবত এই জন্ম যে, সংগ্রামই অস্তিত্বের মূল নীতি। মিলিয়া মিশিয়া চলা আদর্শ হইতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নহে। যে সকল বৈপরীত্য বর্ত্তমানে মনুষ্যজীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল,—সমাজে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী, রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক (পরিচালক) ও ছাত্র, গৃহে অভিভাবক ও প্রতিপালিত জন, হাসপাতালে চিকিৎসক ও রোগী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রেই একটি উত্তমর্ণ অথবা উপরওয়ালা ও অন্যটি অধমর্ণ অথবা যাহাকে উপরওয়ালাকে মানিয়া চলিতে হইবে। মতামতের ক্ষেত্রে যাহারা উপরওয়ালার তরফের তাহারা হইল দক্ষিণ পন্থী এবং যাহারা নিম্নস্তরের সপক্ষে তাহারা হইল বাম পন্থী। দক্ষিণ ও বামের যে শ্রেণীবিভাগ তাহা হইল যাহাদের সম্পদ আছে ও যাহাদের নাই এই দুই দলের পার্থক্যের উপর ন্যস্ত। সম্পদ যদি আসিয়া যায় তাহা হইলে বাম দক্ষিনে চলিয়া যাইতে পারে। সেই ভাবে একশ্রেণী হইতে অন্যশ্রেণীতে চলিয়া যাওয়া প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ স্থির নিশ্চয়ভাবে নিজ শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকেন না। সুবিধা হইলে শ্রেণী বদল অনায়াসেই হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে শ্রেণী-গুলি জীবজগতের বিভিন্ন জাতির ন্যায় স্বভাবে আকারে ব্যবহারে অপরিবর্ত্তনীয় নহে। যে অশ্ব সে গাভী হইতে পারিবে না এমন কোন নিয়ম শ্রেণীর মানুষগুলিকে বাঁধিয়া রাখে নাই। প্রয়োজন হইলে সিংহ ছাগশিশু হইতে পারে, মৎস্য জল ছাড়িয়া স্থলে বিচরণে সক্ষম হয় ও চতুষ্পদসকল আকাশপথে যাতায়াত আরম্ভ করে। শ্রেণী জাতির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চয় ভাবে কাহারও শরীর মন চরিত্রে স্থিতিশীল নহে। এই সকল কারণে শ্রেণীর দ্বন্দ্বের ভিতর জীবজগতের জাতিগুলির অস্তিত্বের সংগ্রামের আত্মজ্ঞাগত প্রাকৃতিক রূপ লক্ষিত হয় না। শ্রেণীর গঠন নির্ভর করে শ্রেণীগত ব্যক্তিদিগের দলবদ্ধ হইবার কৃত্রিম ও সাময়িক সুবিধা-বোধ জাত কারণগুলির উপর। সেই সকল কারণ শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে হঠাৎ হঠাৎ আর সুবিধাজনক থাকে না ও তখন সেই সকল ব্যক্তি এক শ্রেণী ত্যাগ করিয়া অপর শ্রেণীতে যোগদান করা অধিক সুবিধাজনক মনে করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে একই ব্যক্তি নিজ জীবনে নানান সময়ে নানান শ্রেণীতে যুক্ত থাকিতে পারেন।

রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের বাহুল্য

রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে-জাতীয় কর্ম্মক্ষমতা প্রয়োজন হয় বর্ত্তমান কালে শিক্ষালাভ করিয়া সেইরূপ বহুমুখী কার্য্য-শক্তি গঠিত হয় কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ, বর্ত্তমান যুগ হইল বিশেষজ্ঞদিগের যুগ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যও হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা। আধুনিক বিশেষজ্ঞদিগের বিশেষত্ব বিচার করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা নিজ নিজ বিশেষ জ্ঞান বা কার্য্য-ক্ষেত্রের বিষয়ে যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ক্ষুদ্রতম কণিকারও সন্ধান রাখেন তেমনিই তাঁহারা নিজ জ্ঞান বা গুণের বাহিরের কোন কিছুরই খোঁজ রাখেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা নিজ সীমার ভিতরে যেরূপ অনু-পরমাণুর বিচার করিয়া ব্যক্ত হয়, সীমার বাহিরে তাহা তেমনিই অক্ষমতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। রাষ্ট্র কার্য্য আজকাল প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং দেশের মঙ্গল বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রকর্ম্মীদিগের জ্ঞান ও বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং যদি রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের পরিচালকগণ সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ চালাইতে না পারেন তাহা হইলে দেশের উন্নতি যথাযথভাবে সাধিত হইতে পারে না। সকল দিকে দৃষ্টি রাখা সাধারণভাবে সকল বিষয় বুঝিতে পারার উপর নির্ভর করে। তাহা বুঝিতে হইলে নানা বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাঁহারা শুধু ক্রোমিয়াম স্টীল অথবা নাইলন ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ের কোনো সন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের দ্বারা দেশের মানুষের খাদ্য-বাসস্থান-বেকার-সমস্যা অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে মনে করা কিছুটা দুরাশার কথা। কারণ তাঁহারা যে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শুধু ক্রোমিয়াম স্টীল ও নাইলন দেখিতে শিখিয়াছেন সেই দৃষ্টি যে ব্যাপক ভাবে দেশের জনমঙ্গলের সকল সমস্যার পর্য্যালোচনা করিতে সক্ষম হইবে এইরূপ আশা করা যায় না। এই সকল কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মে সাফল্য লাভ করিবার জন্য কিছু কিছু মানুষকে সাধারণ ভাবে বহু বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাদান ব্যবস্থা জাতির মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় ও বৃহৎ বৃহৎ কারবারের পরিচালনা করিতে হইলে ঐরূপ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন প্রয়োজন হয়। যাঁহার কার্য্য দিগ্‌দর্শন, তিনি যদি দশ দিক বা অষ্টকোণের মধ্যে শুধু একটি মাত্র দিক বা কোণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হ'ন তাহা হইলে তিনি যেরূপ দিগ্‌দর্শনে অক্ষম প্রমাণ হইবেন, রাষ্ট্রক্ষেত্রের কর্ম্মীগণ যদি বস্ত্রবয়ন বা গণিতের কোন একটি শাখা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় না বুঝেন তাহা হইলে সেইরূপ রাষ্ট্রকর্ম্মীগণ দেশের কার্য্য পরিচালনাতে সক্ষম হইবেন না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নানান বিষয়ে জ্ঞান ছিল। যথা, অতি উচ্চ স্তরের ডাক্তার কেহ কেহ ডাক্তারী ব্যতীত অপর বিষয়ে এম. এ. পাশ ছিলেন। ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে কেহ কেহ পদার্থ বিজ্ঞান অথবা ইতিহাসে গবেষণার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের এঞ্জিনিয়ার-দিগের মধ্যে বিদ্যার অপরাপর শাখার অনুশীলনে কাহাকে কাহাকেও আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যাইত। দার্শনিকগণ অনেক সময়ে বিজ্ঞান চর্চ্চাও করিতেন। গণিত ও দর্শন, ইতিহাস ও চিত্রকলা এইরূপ মিলিত ভাবের অনুসন্ধিৎসাও লক্ষিত হইত। বর্ত্তমান কালে প্রথমতঃ পূর্ব্বকালের ন্যায় খ্যাতিমান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা রাষ্ট্রকার্য্যে অবতীর্ণ হইতে চাহেন না এবং যাঁহারা চাহেন তাঁহারাও অতি বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিষয়ের আলোচনা গবেষণাতে যোগদান করিতে পারেন না। এখন যখন দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষ নানাভাবে আসিয়া পড়িতেছেন এবং তাঁহারা বহু বিষয়ের আলোচনা ও বিচার করিতে বাধ্য হইতেছেন, সে অবস্থায় সাধারণ জ্ঞানের প্রসারও আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা তাহার অনুকূল হইতেছে না।

ফরাক্কা

ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভাগীরথীতে জলস্রোত বৃদ্ধি করিয়া

কলিকাতা বন্দরের জাহাজ চলাচল সহজ করা ও অন্ত উদ্দেশুটি ছিল গঙ্গার উপর দিয়া একটা রেল ও চক্রযান পথ নির্মাণ করা। কলিকাতার নদীতে জলস্রোত বৃদ্ধির প্রয়োজনও দুই কারণে অতি আবশুক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। প্রথম প্রয়োজন হইল অধিক সংখ্যায় ও বৃহত্তর আকারের জাহাজ চলাচল ও দ্বিতীয় প্রয়োজন হইল ভাগীরথীর জলের লবণাক্ত ভাব কিছুটা কমাইয়া বৃহত্তর কলিকাতার বাসিন্দাদিগের নোনাজল পান বন্ধ করার ব্যবস্থা। কলিকাতা বন্দর গঠন করা উচিত হইয়াছিল কি না আলোচনা করার আবশুকতা এখন আর নাই। কারণ, দুই শতাধিক বৎসর ধরিয়া যাহা হইয়া আসিয়াছে ও যাহার ফলে ভাগীরথীর দুই তীরে শত শত পাট কল ও অন্যান্য কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, শত শত কোটি টাকার চা, কয়লা, পাট ও যন্ত্রাদির রপ্তানি আমদানি হইয়া চলিয়াছে ও বৃহত্তর কলিকাতা ৭০ লক্ষ নরনারী শিশুর বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে ; বহুযুগ গত হইবার পরে সেইপ্রকার হওয়াটা ঠিক হয় নাই বলার কোন মূল্য থাকে না। তর্কের খাতিরে কোন শহর, কারখানা, বন্দর বা কোনও কিছুই না হইলেই ভাল হইত বলা যাইতে পারে কিন্তু সেইরূপ তর্কের কোন বিশেষ মূল্য আছে বলা যায় না। কলিকাতা বন্দর সমুদ্র হইতে ১২৫ মাইল দূরে নদীবক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীতে অনেক স্থলেই গভীরতার অভাব আছে এবং সেই কারণে বিশেষ সাবধানতার সহিতই জাহাজ প্রভৃতি নদীপথে লইয়া যাওয়া হয়। জলের তলায় অনেক স্থলেই বালির স্তূপ জমা হইয়া জলের গভীরতা হ্রাস করে ও জোয়ারের সময় ব্যতীত ঐ সকল বালির ঢিপি অতিক্রম করিয়া জাহাজ যাইতে পারে না। নদীবক্ষে জমা বালুকা স্তূপ ও কর্দ্দম ইত্যাদি যন্ত্র দিয়া কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয় ড্রেজার জাহাজ দিয়া। ভাগীরথীর জলপথ গভীর রাখিবার জন্ত বহুকাল হইতেই ঐ বালুকর্দ্দম নিষ্কাশন করিবার ড্রেজার জাহাজ ব্যবহার করা হইয়া আসিতেছে। গঙ্গার জলস্রোতের প্রবলতর অংশ পদ্মার পথে ক্রমশঃ মেঘনার দিকে চলিয়া যাইতেছে ও ভাগীরথীর দিকে জলস্রোত আর তেমন গতিবেগ ও পরিমাণ রক্ষা করিয়া চলিতেছে না। ফলে কলিকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচল দুরূহ হওয়াতে মাল আনা পাঠানর পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা প্রায় এক কোটি টন হইত, এখন তাহা সত্তর লক্ষ টনের অধিক হয় না।

এইরূপ অবস্থায় কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করিবার জন্ত ফরাক্কা পরিকল্পনা আকার গ্রহণ করে। ফরাক্কাতে বাঁধ বাঁধিয়া গঙ্গার জল রোধ করিয়া একটি হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ঐ জমান জল হইতে একটা বিরাট অংশ খাল কাটিয়া আনিয়া প্রয়োজন মত ভাগীরথীতে ছাড়িয়া দিয়া ঐ নদীর জলস্রোত বৎসরের সকল সময় একটা নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণের কম হইতে না দিবার ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতার বন্দরে জাহাজ চলাচল সহজ করা হইবে স্থির হইয়াছে। ঐ সঙ্গে জলস্রোত বৃদ্ধি করিয়া ভাগীরথীর জলের লবণাক্ত ভাব দমন করাও সম্ভব হইবে বলিয়া কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণ নির্দ্ধারণ করেন।

এই জলস্রোত বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির হয় ৪০০০০ কিউসেক অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে চল্লিশ হাজার ঘন ফুট। কিন্তু নানা প্রকার অপরাপর জল-খরচের নূতন নূতন কারণ সৃষ্টি করিয়া ঐ পরিমাণ জল ভাগীরথীতে ছাড়িবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফরাক্কা পরিকল্পনা পূর্ব্ব হইতে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাহ্য করিয়া লওয়ার পরেও শতাধিক নবনব সেচন ব্যবস্থা করিয়া উত্তরপ্রদেশ ও বিহার গঙ্গার জলধারা ফরাক্কায় পৌঁছাইবার পূর্ব্বে অনেকাংশে পরিমাণে অল্প করিয়া আনিয়াছে। এই সকল সেচন ব্যবস্থা অপর উপায়েও হইতে পারিত কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগের গা ঢিলা দিয়া নিজ কর্ত্তব্য না করার ফলে যে যেখানে যথা-ইচ্ছা গঙ্গার জল এভাবে ওভাবে ব্যবহার করিয়া ফরাক্কার কার্য্য প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সেচন কার্য্য ব্যতীতও অন্ত উপায়ে গঙ্গার জল ব্যবহার করিয়া ফরাক্কার জলের পরিমাণ হ্রাস

এরপর ৪৮৪ পৃষ্ঠায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়

যোগানন্দ দাস

ভূমিকা

'আধুনিক' শব্দটা আপেক্ষিক। দেড়শো বছর আগে, তারো দেড়শো বছর আগেকার তুলনায় যেটা 'আধুনিক' ছিল আজ আর তা' আধুনিক নয়। আজকের দিনে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে যেটা 'আধুনিক, দুশো বছর পরে সে-টা আর 'আধুনিক' থাকবে না হবে, 'সেকেলে'।

বর্তমান প্রবন্ধে 'আধুনিক' কথাটা প্রচলিত ঐতিহাসিক 'যুগ' অর্থাৎ মধ্যযুগের পরবর্তী যে যুগ, সেই যুগার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে আধুনিক যুগ বলতে সাধারণত ইংরেজ আমলকেই বোঝায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার নবজাগরণ বা রেনেশাঁস্ দিয়ে যার শুরু।

বাংলার এই রেনেশাঁস্ বা নবজন্মের প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল দুই সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের সভ্যতা বা সংস্কৃতির সংঘাত, যে দু'টো সংস্কৃতি জাতিতে, ধর্মে, রীতিনীতিতে, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে, ভাষায় ও চিন্তায় আলাদা। ইংরেজ এদেশে (গোড়ায় বাংলাদেশে* ও পরে গোটা ভারতবর্ষে) রাজা হয়ে বসবার দরুণ পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও সংস্কৃতির একটা সংঘর্ষ হয়। তার ফলে, নবাগত আধুনিক যুগের সব রকম চাহিদা মেটাবার জন্য গোটা সাবেকী বা মধ্যযুগীয় সমাজের একটা পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। যুগে যুগে এই পরিবর্তন হয়েছে।

॥ মুসলমান আমলে পরিবর্তন ॥

মধ্যযুগে, মুসলমান আমলে, ফার্শী ছিল সরকারী ভাষা, এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, শিক্ষিত ভদ্র বা 'বাবু' সমাজের, ইংরেজীতে যাদের 'Elite' বলা হয় তাদের ভাষা। কারণ তাতে সরকারী চাকরী পাবার এবং আদালতের কাজের সুবিধা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও বিশেষ ভাবে ফার্শী ভাষার মাধ্যমে অনেক নতুন বিদেশী চিন্তাধারা এদেশে এসে পৌঁছয় এবং এদেশের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে।

মুসলমান শাসক সমাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্রে থাকার দরুণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার ও ভারতীয় সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল,—ধর্মে, সামাজিক আচার ব্যবহারে, স্থাপত্যে, চিত্রকলায়, বিশেষ ভাবে সঙ্গীতে ও সাহিত্যে যা ছাপ রেখে গিয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক মিলনের নতুন সৃষ্টি নানক, কবীর, দাদূ, চৈতন্য প্রভৃতি। ভাষার ক্ষেত্রে উর্দু ও হিন্দুস্থানী, এবং এত আরবী ও ফার্শী ঘটিত বহু বাংলা শব্দ।

সুতরাং সে যুগেও দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাতের ও মিলনের জন্য নতুন পারিস্থিতিতে সমাজকে নতুন ক'রে গড়তে হয়েছে।

* বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ কথাটা নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' (পূর্ববঙ্গ) অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, ইংরেজ আমলের অবিভক্ত বেঙ্গল বা বাংলাদেশ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রামমোহনের সময়ে বাংলাদেশ বা 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' বিস্তৃত ছিল বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে।

॥ ইংরেজ আমলে পরিবর্তন ॥

ইংরেজ আমলেও তেমনি সরকারী চাকরী আদালতের মামলা, ব্যবসায় লেন দেন প্রভৃতির জন্ত ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা এদেশে প্রচুর পরিমাণে আসতে শুরু করে। সমাজের কাঠামো ও আদর্শের আবার একটা পরিবর্তন ঘটে।

কিন্তু মুসলমান আমলে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে ইংরেজ আমলের ঐ পরিবর্তনের একটা মস্ত বড়ো পার্থক্য আছে। ইংরেজ আমলে ভারতে ও বাংলা দেশে যে পরিবর্তন আসে, তার সঙ্গে সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাসের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, যে-টা মুসলমান আমলে ছিল না বল্‌লেই হয়।

॥ বিশ্ববিপ্লব ও রামমোহন ॥

ইংরেজ আমলে, রামমোহনের জীবিতকালেই য়োরোপ-আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন চলেছে, একটা মহাযুগ শেষ হয়ে আর-একটা মহাযুগের পত্তন হতে চলেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় রাজতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, রিপাবলিক বা প্রজা গড়ে উঠছে। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব গোটা পাশ্চাত্ত্য সমাজে একটা বিরাট্ পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সাহিত্যেও তার ছাপ পড়েছে।

এই সমস্তের সংঘাত এসে পৌঁছচ্ছে বাংলাদেশে, প্রতিধ্বনি তুলছে এশিয়ার সর্বপ্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানুষ বা বিশ্বমানব রামমোহন রায়ের চিত্তে।

বাংলার সমাজের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কি ধরণের পরিবর্তন এল এবং তার সঙ্গে রামমোহন রায়ের সম্পর্ক কোথায়, সে কথা বুঝতে গেলে এই পট-ভূমিকা মনে রাখা প্রয়োজন।

রামমোহনের সম্পর্কে যে কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, সেটা হ'ল, রামমোহন রায় জন্মেছিলেন দুনিয়াজোড়া একটা মহাযুগপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে, এবং সেই বিশ্ববিপ্লবের স্তন্যপানে রামমোহন পুষ্ট। রামমোহনের সর্বগ্রাসী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হ'ল, ধর্ম থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিশ্ববিপ্লবের সেই সর্বতোমুখী ভাব-ধারাকে হজম করবার ক্ষমতায়। শুধু ভারতে নয়, সেইদিনকার সারা দুনিয়ায় রামমোহন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সেই বিশ্বগ্রাসী হজম ক্ষমতা ছিল না। সেই জন্য তিনি শুধু বাংলা দেশের সংস্কৃতিকেই নূতন ক'রে গড়েন নি, তাঁর প্রভাব বাংলার ও ভারতের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে য়োরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

সেই জন্যই ইংলণ্ডের বহু ভাষা ও শাস্ত্র-বেত্তা ডঃ জন বাউরিং রামমোহনকে একাধারে সোক্রাটিস্, নিউটন্ ও মিল্‌টন্ বলেছেন। আমেরিকান জাবেজ টি স্যাণ্ডারল্যাণ্ড তাঁকে বলেছেন, একাধারে মোজেজ, গ্যারিবলডি ও ওয়াশিংটন্।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ বল্‌ছেন,

"It was his supreme moral and spiritual genius that made Rammohun Roy one of the heroes of *humanity*, who *more than any other living soul* shaped the course of *human history* at the beginning of the nineteenth century. Indeed it may be said with truth that his character and personality changed the face of Asia and *profoundly influenced Europe and European thought also*."[1]

তাৎপর্য। রামমোহন রায়ের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রতিভাই তাঁকে সমগ্র মানব জাতির অন্যতম মহাপুরুষ ক'রে তুলেছিল। উনিশে শতকের গোড়ায় গোটা মানব সমাজের ইতিহাস যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর (রামমোহনের) অবদানই সব চেয়ে বেশী। বস্তুত, সত্যই একথা বলা চলে যে, রামমোহনের চারিত্র ও ব্যক্তিত্ব সমগ্র এশিয়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং য়োরোপ ও য়োরোপীয় চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে রামমোহনের স্থান নির্ণয়ের সময়ে সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস, রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভা ও তাঁর জগৎব্যাপী জ্ঞান ভাণ্ডার, এবং 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের গঠনে সেই

সব বিশ্ব-চিন্তার প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রাখতে হবে, এবং স্থির করতে হবে, সেই যুগে রামমোহন ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি ছিলেন কি-না যিনি এই সর্বতোমুখী 'আধুনিক' যুগমানসের উপযুক্ত বাহন রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারেন।

॥ আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক কে ? ॥

প্রশ্ন উঠেছে, ১৮১৫ সালে রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের আগে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী প্রভৃতির গদ্য গ্রন্থ বাংলা হরফে বেরিয়েছিল, সুতরাং রামমোহন বাংলা গদ্যের জনক কি না ?

সন্তানের জন্ম না দিলে "জনক" হয় না। বাংলা সাহিত্যে রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বা কেরী ক'জন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ?

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুবিখ্যাত ও প্রামাণ্য ইতিহাসকার ডক্টর সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রামমোহনের অবদান আলোচনার পর বলছেন।

"When we consider all these achievements of Rammohun in the field of Bengali literature and language, the least we can say is, that without him Vidyasagar, Bankim Chandra and Rabindranath would not have been possible."-

> তাৎপর্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের এই সব কীর্তির কথা যখন বিবেচনা করি, তখন খুব কম করে এইটুকু বলতে পারি যে, তিনি (রামমোহন) না জন্মালে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্ভব হতেন না।

ডঃ সেন একথা বলেন নি যে, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় বা কেরী না জন্মালে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্ভব হতেন না। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যে রামমোহনেরই বংশধর, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় বা কেরীর বংশধর ন'ন। "জনক" কে ?

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রবন্ধে বলেছেন যে, মহামহোপাধ্যায়রা উপস্থিত থাকতেও "উপপ্লবকর্তা মহাত্মা" রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা ভাষার জলাশয়ের বদ্ধমুখ খুলে দিলেন। রামমোহন মৃত্যুঞ্জয় বা কেরীর বিষয়ে সে-কথা বলেন নি।

তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের (১৮৪৬-৪৭ খৃঃ) "সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় নিরূপণ" পুস্তকের (বা ঐ সভার বার্ষিক রিপোর্টে) তৎকালীন সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, "এই প্রসঙ্গে বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার সৃষ্টি আদৌ এদেশে তাঁহা (রামমোহন রায়) হইতেই হইল।"

সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, পণ্ডিত ও সাহিত্যবেত্তরা। তাঁরা সকলেই বাংলা গদ্যে রামমোহনের জনকত্ব বিষয়ে সম্পাদকের উক্তি মেনে নিয়েছিলেন, একজনও আপত্তি জানান নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় ইতিহাসকার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও রাজনারায়ণ বসু দু'জনেই রামমোহনের বাংলাগদ্যের প্রশংসা করেছেন, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় বা কেরীর বিষয়ে করেন নি।

অথচ তাঁরা যে মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তা নয়। অনেকেই তাঁদের উল্লেখ করেছেন, এবং উল্লেখ ক'রেও বাংলা গদ্যের জন্মদাতা হিসেবে রামমোহনেরই নাম করেছেন।

উল্লিখিত প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বেত্তাদের, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন প্রভৃতির সাহিত্যবোধের ও সাহিত্যবিচারের চেয়ে আজ যাঁরা সন্তানসন্ততিদের সন্ধান না রেখে শুধু

তারিখ ক'রে "জনকত্ব" নির্ধারণ করছেন, তাঁদের সাহিত্য-বোধের ও সাহিত্য-বিচারের দাম কি বেশী?

রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির বাংলা গদ্য বাংলা হরফে ছাপা বটে, গদ্যও বটে, তবে "বাংলা" নয়। রামরামের গদ্য বারো আনা ফার্শী, মৃত্যুঞ্জয়ের দেড়গজী সমাসযুক্ত* বাংলা দুর্বোধ্য ভাষা, না সংস্কৃত, না বাংলা। কেরীর বাংলা জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল, তাঁর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ যখন অবোধ্য ও অপাংক্তেয় ব'লে পরিত্যক্ত হ'ল, তখন বাইবেলের "বাংলা" অনুবাদের জন্য ডাক পড়ল অ-খৃষ্টান রামমোহন রায়ের, ক্রিশ্চান পাদ্রী উইলিয়ম কেয়ারির নয়, রামরাম বা মৃত্যুঞ্জয়েরও নয়।

রামমোহন রায় যে গদ্যের সৃষ্টি করলেন সেটাই হ'ল সর্বপ্রথম খাঁটী "বাংলা", ফার্শীর বা সংস্কৃতের দাসত্ব থেকে মুক্ত, স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ বাংলা, সংস্কৃতের বা ফার্শীর বকলমে বাংলা নয়। ছোট ছোট, স্বয়ং সম্পূর্ণ বাংলা শব্দের দ্বারা তৈরী। সাধু বাংলা, কিন্তু খাঁটী বাংলা, সংস্কৃতও নয়, ফার্শীও নয়।

সেইজন্যই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরসাধকেরা রামমোহন রায়ের গদ্যরীতির পথে চলেছিলেন, রামরাম মৃত্যুঞ্জয়ের পথে নয়। এই থেকেই বোঝা যায়, বাংলা গদ্যের "জনক" কে।

এখানে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের "বাংলা"র কিছু নমুনা দিলাম (১) বর্ণনামূলক (২) শাস্ত্রবিচারে।

(১) বর্ণনামূলক

মৃত্যুঞ্জয়:

"ব্রহ্ম প্রভৃতি কীট পর্যন্ত জীবলোকের এবং জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাসস্থানের ও অমৃতযবব্রীহ্যাদি ভাবভোগ্যবস্তু সকলের ও স্বস্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গনরকবন্ধমোক্ষন ব্যবস্থার ও কল্পমন্বন্তরযুগাদি রূপ কালবিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।" ('রাজাবলি', ১৮০৮ খৃঃ)।

রামমোহন:

"এক স্থানে এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন। ঐ মূর্ত্তির হস্তে একখানা ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিবস দৈবাৎ দুইজন ঘোড়সোয়ার দুই দিক হইতে ঐ মূর্ত্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে, ঐ ঢাল স্বর্ণময়, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্যদিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, এ কি স্বর্ণ ঢাল? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়।" ('সংবাদকৌমুদী', ১৮২৩ খৃঃ।)

(২) শাস্ত্রবিচারে

মৃত্যুঞ্জয়:

"এই বচনের প্রকরণাদি জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত তাৎপর্য্য-পরিজ্ঞানে যথাশ্রুতার্থানুসারে নেত্ররোগীকে চিকিৎসোপদেশ করিয়া নেত্রজ্বালা নিবৃত্তি করিবে অধিক জ্বালাদ্বয় বৃদ্ধি করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছিল। অতএব শ্রুতিস্মৃতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও শ্রোতা ও শুনিয়া বোদ্ধা এমন পুরুষ অতি দুর্লভ কিন্তু কাপটী তত্ত্বজ্ঞানীই অনেক। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীরদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্যায় যে অসদুপদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়ে নষ্ট হইও না। যেমন শ্বশুরগৃহে সুখপ্রাপ্ত্যর্থে শ্বশুরাগারগমনেচ্ছু কোন অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরগ্রামপ্রান্তে দৃষ্ট কোন গোপকে শ্বশুরগৃহজিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাক্যে দৃঢ়তরাস্থাতে শ্বশুরগোপুচ্ছ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শ্বশুরগৃহে গন্তুকাম হইয়া আকর্ষণ ও কর্কটশকরাদিবেধ ও পাদপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন-ভঙ্গাঙ্গ হইয়াও তৎসুখপ্রত্যাশাতে গোপোপদিষ্ট গোপুচ্ছধারণ ত্যাগ না করিয়া রাত্রিপ্রথমভাগে

শ্বশুরবহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া গোচৌরজ্ঞানে শ্বশুরশ্যালকাদিকর্ত্তৃক মুষ্টিযষ্টিপ্রহারে চূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল।" ('বেদান্তচন্দ্রিকা', ১৮১৭ খৃঃ)।

রামমোহন :

"অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষায় বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবে, আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন।" ('বেদান্তগ্রন্থ', ১৮১৫খৃঃ।)

॥ সমাজ ও সাহিত্য ॥

"জনকণ্ঠ" বিষয়ে তারিখের চেয়ে অনেক বড়ো কথা হ'ল সাহিত্যের স্বরূপ ও লক্ষণ বিচার।

ইংরেজী সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা সমালোচক লাসেল্ অ্যাবারক্রোম্বি বল্‌ছেন :

"The history of criticism has been very largely the history of attempts to formulate rules for criticism, chiefly by comparing the merits of several works of literature, and the means used to produce them. But rules derived from particular instances in one kind of literature do not give the security required. Over and over again such rules have been found wanting. When the number of instances has been enlarged, the rules have broken down."[৪]

তাৎপর্য। সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস হ'ল প্রধানত বিভিন্ন সাহিত্যিক রচনার পরস্পর তুলনার দ্বারা তাদের (সাহিত্যিক) গুণ নির্ণয় ক'রে এবং ঐ সব রচনার সৃষ্টিপদ্ধতির আলোচনা ক'রে সমালোচনার নিয়মকানুন তৈরীর চেষ্টার ইতিহাস। কিন্তু একই শ্রেণীর সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রচনার (বিচারের) উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব আনতে পারে না। বার বার দেখা গিয়েছে, ঐ সব (সাহিত্য সমালোচনার) নিয়মকানুন যথেষ্ট নয়। যখনই (তুলনার জন্য নমুনা স্বরূপ গৃহীত) সাহিত্যিক রচনার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, তখনই ঐ সব (সাহিত্য সমালোচনার পুরাণো) নিয়মকানুন ভেঙে পড়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, শুধু সাহিত্যের ধারা নয়, সাহিত্য সমালোচনার ধারাও যুগে যুগে বদলেছে, আজও বদলাচ্ছে। এক সময়ে "art for art's sake" সাহিত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। আজ আর তা নেই।

বর্ত্তমানে সাহিত্যবোধের মূলে সমাজবোধকে একটা বড়ো আসন দেওয়া হয়।

সাহিত্য-সৃষ্টির একটা ব্যক্তিমূল্য অবশ্যই আছে। সাহিত্য-স্রষ্টা যতক্ষণ সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত থাকেন, ততক্ষণ তিনি আর তাঁর সৃষ্টি ছাড়া দুনিয়ার সবকিছু তাঁর সামনে থেকে সাময়িক ভাবে মুছে যায়।

কিন্তু স্রষ্টা নিজে কি? তিনি ভুঁইফোড় জন্মান নি, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুল্‌ছেন না। যিনি যত বড়ো স্রষ্টাই হোন্, যত বড়ো কবি বা শিল্পীই হোন্, তিনি তাঁর সমাজেরই একটা অঙ্গ। শৈশব থেকেই তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধ সমাজে মানুষ, অথবা মানস ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর মানব সমাজের চিন্তাভাবনায় পরিপুষ্ট, সেই সব সামাজিক চিন্তা, আদর্শ, ভাবধারা সারা জীবন ধ'রে তাঁর শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে যায়, সজ্ঞানে বা তাঁর মগ্নচেতনায় গিয়ে বাসা বাঁধে।

স্রষ্টার সেই সচেতন বা অবচেতন মনের উপর প্রতিফলিত সমাজ-জীবনের বিচিত্র চিত্র স্রষ্টার প্রতিভার

ভেশিয়া কাচের মধ্য দিয়ে অপূর্ব রঙে ও রশ্মিতে রূপান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু কবির নূতন নূতন সৃষ্টির অন্তরালে সমাজের বাস্তব সত্তাকে অস্বীকার করা আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার রীতি নয়।

সমাজের সঙ্গে স্রষ্টার, কবির বা শিল্পীর যোগ অঙ্গাঙ্গী অবিচ্ছেদ্য যোগ। স্রষ্টা সৃষ্টি-ছাড়া ন'ন, সৃষ্টি সৃজন ক্ষেত্র বা সমাজ ছাড়া নয়।

সামাজিক মানুষ খণ্ডিত মানুষ নয়। একই মানুষ কারো ভাই, কারো ছেলে, কারো বা বাপ। আবার হয়তো সে একটা কারবারের মালিক কিম্বা কলেজের অধ্যাপক, কোনও ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারী, আবার সেই মানুষটাই কোনও পলিটিক্যাল্ পার্টির চাঁই ও থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক অথবা কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের অনুরাগী ভক্ত। একই মানুষের মধ্যে এই বিচিত্র সাধনা এসে যুক্ত হয়ে তাকে একটা পূর্ণ মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। সেই সমগ্র মানুষটিকে বিচার করতে হ'লে এদের কোনো একটি দিক নিয়ে বাকী সবকটা দিক থেকে তাকে আলাদা ক'রে দেখলে সে-দেখাটা এক পেশে দেখা হয়। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি ঐ মানুষটির জীবনের একটি দিক বাকী সবকটার সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্বন্ধযুক্ত।

তেমনি সমাজ বস্তুটিও একতারা যন্ত্র নয়। বীণার মত তাতে বহু তার, বিচিত্র ঝঙ্কার। ধর্মচিন্তা, রাষ্ট্র-চিন্তা, অর্থচিন্তা প্রভৃতি সব রকমের চিন্তা ও আদর্শই একটা সামগ্রিক সমাজের চিন্তাধারার বিভিন্ন প্রকাশ। সাহিত্য ও আর্ট'ও তাই।

বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ডেভিড্ ডেচিস্ সাহিত্য সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর Sociery and Literature গ্রন্থের গোড়াতেই বলছেন,

"Indeed, the more we consider the nature and function of any product of the human mind, the more we are led to the belief that categories devoted by such terms as "aesthetic" or "ethical" cannot be dealt with in isolation ; at some paint they overlap with other categories, and ultimately the complete study of one human activity necessitates the study of all other human activities."

> তাৎপর্য। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষের মনের কোনো একটা (বিশেষ) সৃষ্টির প্রকৃতি ও কাজ বিষয়ে যতই চিন্তা করা যায়,ততই আমাদের এই বিশ্বাসই জন্মায় যে, সৌন্দর্য বোধ (aesthetics) বা নীতিবোধ (ethics) বলে যে সব ভাগ করা হয়েছে, সেগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করা যায় না, মানুষের কর্মধারার কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে (নিজেদের সীমা রেখা লঙ্ঘন করে) একটা বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয় যুক্ত হ'য়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, মানুষের কার্যাবলীর একটা দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা করতে গেলে অন্য সমস্ত দিকের বিবেচনা অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুতরাং কোনো যুগের ও কোনো দেশের সাহিত্য বিচার করতে গেলেও সেই যুগের ও সেই দেশের সমসাময়িক অন্যান্য বিষয়ের অর্থাৎ গোটা যুগমানসের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সাহিত্য-বিচার করা প্রয়োজন।

অতএব, "আধুনিক" বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও লক্ষণ বিচার করতে গেলে এবং সেই বিচারের কষ্টিপাথরে "জনক" নির্ণয় করতে গেলে আগে দেখতে হবে (১) মধ্যযুগের বাংলার সমাজের প্রকৃতি কি ছিল, (২) তার সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক কি, (৩) "আধুনিক" সমাজের লক্ষণ কি, (৪) "আধুনিক" সমাজ-চিন্তার উপযুক্ত বাহন রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে গ'ড়ে তোলার প্রাথমিক কাজ কার হাতে হয়েছিল।

বাংলা গদ্যের জনক এবং "আধুনিক" বাংলা গদ্যের জনক, দুটি পৃথক্ বিচার।

এখানে গদ্যের 'স্টাইল্' বা শৈলীর কথা উঠতে পারে। যেমন, গত শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে 'রোমান্টিক্' স্টাইল্ দেখা দিয়েছিল, আদি গদ্যকারদের

মধ্যে এই বিশেষ স্টাইলের আভাস কার মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তাই দিয়ে জনকত্বের একটা বিচার সম্ভব। এ বিষয়ে, 'রোমান্টিক্' স্টাইলের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি, সমাজ বিবর্তনের কোন্ স্তরে রোমান্টিক্ স্টাইল্ সম্ভব, 'রোমান্টিক্' স্টাইলের মধ্যে যে "conflict" বা দ্বন্দ্বের নীতি আছে সেটা কিসের দ্বন্দ্ব, মধ্যযুগীয় চিন্তার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল আধুনিকতার বিদ্রোহ, না আধুনিকতার বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় চিন্তার conflict বা বিরোধ, সে কথাও বিচার্য।

তার আগে বিচার্য, style কাকে বলে? সাহিত্যের যে প্রকাশ ভঙ্গী, শিল্পচাতুর্য বা আর্ট শুধু সেইটিই কি স্টাইলের একমাত্র বিচার? এ বিষয়ে অ্যাবারক্রোম্বির একটা কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বল্‌ছেন:

"Style in the broadest sense, which includes mood and spirit and the choice of matter as well as technique and language, is the subject of criticism proper."[৫]

তাৎপর্য। খুব ব্যাপকভাবে বল্‌তে গেলে যে-'স্টাইল'-এর মধ্যে সাহিত্যের শিল্পরীতি ও ভাষা ছাড়াও আছে (সাহিত্যের) মনের গতি বা মেজাজ ও ভাবধারা এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন সেই-'স্টাইল্'ই সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃত বিষয়।

সুতরাং 'রোমান্টিক্' কি রোমান্টিক্ নয়, এইটিই "আধুনিক" সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। সাহিত্যের "মুড্", "স্পিরিট" এবং "চয়েস্ অফ ম্যাটার" এইগুলিও সমভাবে বিচার্য।

এই কথাগুলি, এবং সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ এবং অঙ্গাঙ্গী যোগের কথা মনে রেখে এইবারে আমরা মধ্যযুগের লক্ষণগুলি ও আধুনিক যুগের লক্ষণ, এবং ঐ সব লক্ষণ বিচারে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তনে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা কে নিয়েছিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

১। Lecture at Bangalore on September 27, 1998.

২। Sukumar Sen, "Th· Bengali Prose and Rammohun", *The rather of Modern India*, commemoration volume of the Rammohun Roy centenary celebrations, Calcutta, 1933, Part II, p.338.

৩। 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী' বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার 'বেদান্তচন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের প্রকৃত রচনার নির্ভরযোগ্য নিদর্শন নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলাকে সহজবোধ্য করবার জন্য পুনর্মুদ্রণের সময়ে লম্বা সমাসযুক্ত বাক্যগুলি আগাগোড়া ভেঙে ভেঙে ছোট করা হয়েছে, এমন কি মূল বইয়ের ব্যাকরণের ভুল সংশোধন করে ছাপা হ'য়েছে সুতরাং এইসব সংশোধিত পুনর্মুদ্রণের ভাষা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের আসল ভাষার বিচার হয় না।

৪। Lascelles Abercrombie, "Principles of Literary criticism", *Outline of General Knowledge*, London, 1932, p.862.

৫। "Principles of literary criticism", *op.cit.* p.862.

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেশকে যা দুঃখজনক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, জর্জ কার্ভারের বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে তা থেকে দেশ রক্ষা পেল। জর্জ কার্ভারের উদ্যম সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হল, তাঁর প্রতিভা জয়যুক্ত হল। তিনি এতকালের অবহেলিত ও নগণ্য কলাই থেকে যতগুলি পদার্থ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করলেন বাজারে তার প্রত্যেকটা জিনিষের বিপুল সমাদর হল, সেসব জিনিষে বিশ্বের বাজার ছেয়ে গেল এবং কোথাও একটি জিনিষও অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে রইল না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়তায় এবং ভিন্ন ভিন্ন তাপাঙ্ক ও চাপ সৃষ্টি করে কলাই থেকে যেসব জিনিষ আবিষ্কার করে তিনি জনসাধারণের হাতে তুলে দিলেন তা এতকাল লোকের কল্পনার অতীত ছিল এবং তা দিয়ে যে নতুন বাণিজ্য-জগৎ তৈরী হল সেখান থেকে দাক্ষিণাঞ্চলের কৃষি-ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করে রীতিমত ধনী হল।

নিরাশার জমাটবাঁধা কালো মেঘ কোথায় মিলিয়ে গেল, মেঘমুক্ত দীপ্ত সূর্যালোকে আকাশ ঝলমল করে উঠলো।

এবার জর্জ কার্ভার মিষ্টি আলু নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। আরো একটা নতুন শিল্পের গোড়াপত্তন হতে চলল। আগে তিনি মিষ্টি আলু নিয়ে একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন এবং ময়দা, গদের আঁঠা ইত্যাদি কতগুলি জিনিষ মিষ্টি আলু থেকে তিনি প্রস্তুতও করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার মুখে তিনি মিষ্টি আলুর সাহায্যে ১১৮টি নতুন জিনিষ তৈরি করলেন। এই সময়ে তিনি মিষ্টি আলু থেকে এক রকমের পাউডার আবিষ্কার করলেন। সে পাউডার কৌটায় ভরে অনেক দিন রেখে দিলে পরেও তা নষ্ট হয় না, জল মাখিয়ে তা দিয়ে কেক অথবা বিস্কুট অনায়াসে তৈরি করা চলে। জমাট করা খাদ্যবস্তুর মতোই মিষ্টি আলুর এই পাউডারও আজ খাদ্যশিল্প হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং প্রতি বছর এই পণ্য থেকে কোটি কোটি ডলার মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

কার্ভারের অনলস ও নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম নিত্য নিত্য নব নব আবিষ্কারের পথ খুলে দিতে লাগল। কমলালেবুর রস থেকে তিনি একটা আরক বের করলেন—এই আরক গরুর গায়ের ঘা সারাবার ভালো ঔষধ রূপে স্বীকৃতি লাভ করল এবং বিশেষ করে মাংস-বিক্রেতাদের কাছে এই ঔষধের চাহিদা যথেষ্ট বেড়ে গেল।

সাধারণত মানুষ যেসব জিনিষকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন বলে অবজ্ঞার চোখে দেখত জর্জ কার্ভার সেসব জিনিষকে একজন খাঁটি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তার মূল্য বিচার করতেন। সামান্য তৃণগুল্ম পর্যন্ত তাঁর কাছে সোনার মতো মূল্যবান্ এবং প্রয়োজনীয় ছিল, তার মধ্যেও তিনি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেতেন এবং তা খুঁজে বের করার জন্য বিজ্ঞান-সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তিনি সত্যই বিশ্বাস করতেন যে, সেই তৃণগুল্মলতা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও তার মধ্যে ভগবানের কল্যাণকর প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে রয়েছে। যেসব কাঁটায়ভরা গাছগুলি নিয়ে গ্রামের কৃষকরা অনেক সময়ে কৌতুক করত, হাসি-ঠাট্টা করত জর্জ কার্ভার সেই জাতের আড়াইশো বিভিন্ন রকমের গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। সেগুলোর মধ্য থেকে তিনি মানুষের উপকারে লাগতে পারে এমন সব ভেষজ পদার্থের সন্ধান আবিষ্কার করলেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করলেন যে, সেই কাঁটাগাছগুলিও ভেষজ পদার্থে অন্যান্য গাছের মতোই সমৃদ্ধ।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যখন রসায়ন বিজ্ঞানীরা রেয়ন এবং রেয়ন জাতীয় আরো কয়েক রকমের কৃত্রিম বস্ত্র আবিষ্কার করলেন, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষীজীবিদের তখন পর্যন্তও তার খবর অজ্ঞাত ছিল, তারা তখনো মান্ধাতার আমলের তুলোর চাষ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। উৎপন্ন তুলোর শেষ গাঁইট পর্যন্ত বাজারে বিক্রী হয়ে গেলেই তারা যারপরনাই খুশী থাকতো এই ভেবে যে, এবার তাদের কাজ শেষ, এবার বিশ্রাম আর আনন্দ করবার সময়। কিন্তু শেষের পরেও যে আরো কাজ বাকী থাকে এবং তাও আবার শেষ করে ফেলতে হয়, এ কথা কখনো তাদের মনে হয়নি। জর্জ কার্ভার সেই কথাটাই তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তুলোর ব্যবহার মান্ধাতার আমল থেকে গতানুগতিক ভাবে একই রকম ভাবে চলে এসেছে, এ যাবৎ তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তুলো আরো নতুন কী কী ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তারই তথ্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

[২১]

১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসের একটি গভীর রাত। কার্ভার তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তারপর এক সময়ে কাজ করতে করতে ক্লান্তি, অবসাদ ও যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যে বেঞ্চিতে বসে কাজ করছিলেন সেই বেঞ্চির ওপরে দেহ এলিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি যে এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন জর্জ কার্ভার তা নিজেও বুঝতে পারেন নি। তিনি শুধু জানতেন, ভগবানের নির্দেশ পেয়েছিলেন তাই তাঁর পক্ষে উৎপন্ন প্রতিটি কলাইয়ের দানা তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও অদম্য উদ্যমের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন প্লাস্টিক, সান বাঁধানোর জন্য তৈরী পাথরের কুঁচি, মোটরগাড়ীর টায়ার এবং জমির সার ইত্যাদি এইসব জিনিষ আবিষ্কারের ফলে তুলোর চাহিদা এমন অসম্ভব রকম বেড়ে গেল যে, তুলোর বাজার অল্পদিনের মধ্যেই রীতিমতো ফেঁপে উঠলো, কৃষিজীবীদের সুদিন উপস্থিত হল।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হচ্ছে সয়াবীনের তেল। আজকাল মোটরগাড়ীতে স্প্রেপেইন্ট করার উপকরণ হিসাবে সয়াবীন তেলের চাহিদা খুব বেশী, এই তেল দিয়ে রঙ তৈরী হয়।

ডাঃ কার্ভার তাঁর একক জীবনে যতগুলি জিনিষ আবিষ্কার করেছেন তার যে কোন একটি মাত্র জিনিষ আবিষ্কার করেই তিনি প্রভূত যশ এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারতেন, কিন্তু তিনি ধনী হতে চাননি। ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর কোন লোভ অথবা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁর সারা জীবন তিনি মানবের কল্যাণে ব্যয় করতে পেরেছেন। তিনগুণ ফসল উৎপন্ন হলেও প্রতিটি

কৃষিজীবীর যাতে বাজারে খদ্দের পেতে কোন অসুবিধা ভোগ করতে না হয় ডাঃ কার্ভার সেদিকে লক্ষ্য স্থির রেখেই তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বহুক্ষণ ধরে গবেষণার কাজে ডুবে থাকার পর ডাঃ কার্ভার একদিন শীতজর্জর প্রত্যুষে অবসন্ন দেহে ক্লান্তপদে রাস্তায় বের হলেন ভগবানের উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমেরিকার কলাই পণ্যশিল্পের শৈশব অবস্থা তখনো কাটল না,—প্রতি বছর এই পণ্যশিল্পের বিনিময়ে আয় হত মাত্র ৮০ মিলিয়ন ডলার। জর্জ কার্ভারের পরলোকগমনের পরে কলাই থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের যেসব পণ্যদ্রব্য বাজারে চালু ছিল তার সংখ্যা ছিল তিনশোরও বেশী এবং সেই অনুপাতে আয়ের পরিমাণও বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল। এইসব জিনিষ তৈরি করার জন্য আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল। পনির, জেলি, ঝাল আচার, চুলে মাখবার শ্যাম্পু, শুভ্র ও শাদা করার জন্য একরকম রাসায়নিক পদার্থ, অ্যাক্সেল গ্রিজ, লিনোলিয়াম বস্ত্র, ধাতব বস্তু পালিশ করার জন্য মশলা, কাঠে রঙ করার জন্য রঞ্জক, আঠালো পদার্থ, এবং প্ল্যাষ্টিক ইত্যাদি যে সব জিনিষ জর্জ কার্ভার কলাইকে উপাদান রূপে ব্যবহার করে আবিষ্কার করেছিলেন, পর্যায়ক্রমে সেইসব জিনিষের ক্রমবিন্যাস এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌছাল যে মানুষের মনকে তা বিস্মিত, মুগ্ধ ও বিচলিত করল এবং অতিশয় মূল্যবান্ ফসল হিসাবে কলাইয়ের মূল্য অনেকগুণ বেড়ে গিয়ে এখন তা আমেরিকার উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্য রূপে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

২২

নিগ্রোজাতির কর্মবীর বুকার টি ওয়াশিংটন ১৯১৫ সালের ১৪ই নভেম্বর পরলোকগমন করলেন। সমগ্র দেশ তাঁর শোকে মুহ্যমান হল, কিন্তু সেদিন জর্জ কার্ভারের বুকে এ শোক যতখানি বেজেছিল তেমন বোধকরি আর কারুরই নয়। তাঁর কাছে বুকার টি ওয়াশিংটনকে হারাবার দুঃখ হয়েছিল অসহনীয়। একজন অতি নিকট এবং পরমাত্মীয়ের বিয়োগব্যথায় মানুষ যেমন করে কাঁদে জর্জ কার্ভারও সেদিন তেমনি অঝোরনয়নে কেঁদেছিলেন। বুকার টি ওয়াশিংটন ছিলেন একাধারে সখা, সুহৃদ এবং গুরু, জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতো কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। তাঁদের উভয়ের মধ্যে তিল তিল করে যে নিবিড় বন্ধুত্ব সুদীর্ঘ ২০ বছর কাল একসঙ্গে থেকে একই মহৎ আদর্শ বাস্তবে রূপায়ণের কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে গড়ে উঠেছিল, সেই বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার বন্ধন মৃত্যুর একটি আঘাতে এক নিমেষে ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর চিন্তা হল, এই শূন্যতা তিনি কী দিয়ে পূর্ণ করবেন; একমাত্র কর্ম দিয়ে ছাড়া এই শূন্যতা তো আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করা সম্ভব নয়, তাই তিনি একজন যথার্থ কর্মযোগীর মতো কাজের মধ্যে ডুব দিলেন—সে কাজ দেশ ও জাতি গঠনের কাজ। বিজ্ঞানের সাহায্যে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধনের কাজ।

বুকার টি ওয়াশিংটন এবং জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন দাসত্বের পরিবেশের মধ্যে, জন্মথেকে দুজনেই ক্রীতদাস। এঁরা দুজনেই লাঞ্ছিত নিপীড়িত ক্রীতদাসত্বের বেদনায় জর্জর নিগ্রোজাতির জীবনে বহন করে এনেছিলেন মুক্তির আলো এবং স্বাধীনতার স্বাদ। দুজনেই অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও হতাশামাখা দুঃখময় ও অন্ধকার জীবন থেকে নিগ্রোজাতিকে মুক্ত করে এনে সম্ভাবনাময় ও উজ্জ্বল মুক্তজীবনের সিংহদ্বারে পৌছে দেবার এক কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা টাস্কেগির নিভৃত প্রদেশে তাঁদের কর্মস্থান বেছে নিয়ে টাস্কেগিকে একটি মনোরম এবং দর্শনযোগ্য নগরীতে উন্নীত করেছিলেন। বুকার টি ওয়াশিংটন মৃত্যুর পরপারে চলে গিয়েছেন কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মা টাস্কেগির

শিক্ষা ভবন ছেড়ে যায়নি, আজও তা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই শিক্ষাভবনের কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাতাসে কোন ঘরের দরজা কেঁপে উঠে হঠাৎ শিকল নড়ার শব্দ হলে ছাত্ররা বলে ওঠে, ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন এসেছেন জর্জ কার্ভারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করার জন্য এবং ডাঃ কার্ভার ডাঃ ওয়াশিংটনের পুণ্য স্মৃতির প্রভাব উপলব্ধি করে ভগবানের নির্দেশে গবেষণাগারে ধ্যানরত অবস্থায় বসে নানা রকম রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আবিষ্কারের ইন্দ্রজাল রচনা করেন। তাঁর গবেষণা অবশেষে এক নতুন এবং উদ্দীপনাময় স্তরে এসে পৌঁছাল।

বছর পাঁচেক আগে টাস্কেগি বিদ্যাভবনের অছি-পর্ষদ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের অধ্যক্ষতায় একটি কৃষিবিজ্ঞান গবেষণা বিভাগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে তা অনুমোদন করেছিল। সেই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে জর্জ কার্ভার অনেকগুলি ক্লাসে পড়ানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন এবং স্বীয় সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনে তৎপর হবার অবাধ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণা নিত্য নতুন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি কৃষি বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, প্রজনন বিদ্যা, ছাত্রদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জন্মরহস্য ও মানবদেহের পুষ্টি বিধান, উদ্ভিদ সৃষ্টি ও রোগনির্ণয় প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে সাফল্য অর্জন করতে লাগলেন এবং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে নিত্য নতুন বিস্ময়কর অবদান জুগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশী উৎসাহ এবং আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল কৃষিজাত ও শিল্পোৎপাদিত যেসব দ্রব্য লোকে তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বলে বিবেচনা করে, অনেক সময়ে অবহেলা করে ফেলেও দেয়, সেইসব অকিঞ্চিৎকর এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিষ থেকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী এবং মূল্যবান্ নানারকমের সব সামগ্রী প্রস্তুত করার দিকে। তিনি সয়াবীন থেকে তৈরি করলেন ময়দা, শ্বেতসার, তেল, কফি এবং প্রাতরাশের খাদ্যদ্রব্যরূপে গ্রহণযোগ্য এক রকমের সুস্বাদু আহার্য। ময়লা এবং নোংরা একরাশ করাতে চেরা কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরি করলেন শাদা ধবধবে ও মসৃন অবিকল একখানা শ্বেতপাথরের টুকরো। কলাইয়ের খোসা তাঁর গবেষণার ফলে পরিণত হল ফিনফিনে পাতলা একটুকরো কাগজে। তিনি একতাল কাদামাটিকে পরিণত করলেন চীনামাটির পাত্রে এবং এক জাতীয় গাঢ় নীলরঙের মাটি থেকে তৈরি করলেন কাপড়কাচার নীল। পরে অবশ্য জানতে পারা গিয়েছে যে এও এক রকমের দুষ্প্রাপ্য নীল, প্রাচীন মিশরবাসীরা এই নীলের ব্যবহার জানত, কিন্তু হাজার হাজার বছরের ব্যবধানের ফলে সভ্য জগৎ এ জিনিষটির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। শুধু আবিষ্কার নয়, জর্জ কার্ভার এই নীলের সাহায্যে রঙ তৈরি করে নিকটবর্তী এক গ্রামের একটা গির্জায় নীলরঙ করে দিয়েছিলেন।

সংসারে মানুষ প্রায়শই যেসব জিনিষের কোন মূল্য আছে বলে মনে ভাবে না, সেইসব মূল্যহীন, অনাবশ্যক ও তুচ্ছ জিনিষকে কাজের উপযুক্ত করে, মূল্যবান্ করে তোলাই হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম। ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্রে এই সৃষ্টির ধর্মই আজ কাজ করে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞান-সাধকদের মনে নিত্য নতুন সৃষ্টির প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করছে—ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তার জলন্ত উদাহরণ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান মানবজাতির উদ্দেশে তাঁর সেই সৃষ্টির ধর্ম। খাওয়া-পরা ছাড়াও সংসারে মানুষের অনেক কাজ করার আছে এবং কৃষিজাত কোন একটি একান্ত তুচ্ছ পদার্থকে সেই অনেক কাজের কোন-না-কোন একটিতে সার্থক রূপে ব্যবহার করা সম্ভব—এ কথাটি তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন। তাঁর আগে কোন বৈজ্ঞানিক অথবা আর কেউই কখনো একথা বলেননি। জানি না আর কারুর চিন্তায় কখনো তা ছিল কি না। পৃথিবীতে যা কিছু প্রতিদিন জন্মাচ্ছে, যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, তার সব রহস্য আমরা জানি না বটে, কিন্তু একটা কথা আজ আমাদের নিশ্চিতরূপে জানা হয়ে গিয়েছে যে, পৃথিবীর

তাবৎ জিনিষের মধ্যে এমন এক-একটা রাসায়নিক দ্রব্যগুণ নিহিত আছে যা আবিষ্কার করে মানুষ কাজে লাগাতে পারে।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের কতগুলি চিন্তাভাবনাকে লোকে নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, কোন মতেই তাকে আমল দিতে চায়নি। কিন্তু দশ বছর পরে তাঁর অনেকগুলি ভবিষ্যৎবাণীই বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি পাইন গাছের কাঠ থেকে কাগজ তৈরি করেছিলেন এবং যে পদ্ধতিতে সেদিন তিনি তা তৈরি করেছিলেন ২৫ বছর পরে তাঁর আবিষ্কৃত সেই পদ্ধতিই আমেরিকায় নতুন নতুন এবং বড় বড় কাগজ শিল্পের কারখানা খোলার পথ সুগম করে দিয়েছে। এখন একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এমন একটা সময় খুব শিগ্‌গীরই আসছে যখন মার্কিন দেশের মোটরগাড়ীর প্রস্তুতকারকগণ ইস্পাতের পরিবর্তে সেলুলোজ দিয়ে মোটরগাড়ী প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন। তাঁরা প্রতিটি গাড়ী তৈরির জন্য ৩৫০ পাউণ্ড কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার করবেন।

ডাঃ কার্ভার স্বীয় আবিষ্কৃত জিনিষগুলি পণ্যদ্রব্য রূপে যাতে বাজারে ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেন বহু খ্যাতনামা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সেজন্য বহু লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল এবং প্রচুর অর্থও তাঁকে দিতে চাইল, কিন্তু শত অনুরোধ কিংবা সহস্র প্রলোভন দেখিয়েও তারা তাঁকে বশ করতে অথবা তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শ থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না। তাদের অনুরোধের জবাবে তিনি শুধু একটা কথাই বললেন, "আমি জন্ম থেকেই নিজেকে বিজ্ঞান সাধনায় উৎসর্গ করেছি, আমি আজন্ম বৈজ্ঞানিক। আমার বিজ্ঞান-সাধনাকে কোনক্রমেই আমি বাজারের পণ্যদ্রব্য হতে দেব না, কারণ আমি বণিক্ নই।" জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জর্জ কার্ভার নিজেকে একজন জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সকলের কাছে নিজেকে ছাত্র বলেই পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। তিনি সর্বদা বলতেন, "আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জ্ঞানবৃক্ষের তলায় ফলের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছি।"

জর্জ কার্ভারের জীবনযাত্রা একেবারেই বাহুল্য বর্জিত, সরল এবং অনাড়ম্বর। তিনি বাস করেন অতি সাধারণ একখানি বাড়িতে, দুটি মাত্র কক্ষ তার। একখানা ঘরে তিনি পড়াশুনা করেন, সেখানা তাঁর অধ্যয়ন কক্ষ। বাকী আর একখানা ঘর তাঁর নানান জিনিষপত্র দিয়ে এমন বোঝাই যে সে ঘরের মধ্যে পা ফেলবার উপায় নেই। ঘরের দেয়ালে ছবি টাঙানো —তাঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি। তিন দিকে তিনটে বইয়ের তাক, মধ্যখানে মস্তবড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল; তার ওপরে অগোছালোভাবে গাদা করা বইয়ের পাহাড় ছাড়াও আছে বহু ষ্টালাগমাইট ও ষ্টালাকটাইটস্, বিভিন্ন প্রকারের ধাতব পদার্থ এবং পাথরের টুকরো। ঘরের কোণে রয়েছে একটা উনুন, গাছের পাতা এবং বাকল। এই জিনিষগুলি দিয়ে ডাঃ কার্ভার ঔষধ প্রস্তুত করেন। এমনি বহু রকমের গাছ ও লতাপাতার সব নমুনা সে ঘরের সবজায়গায় ছড়ানো।

জর্জ কার্ভারের শয়নকক্ষে পাতা রয়েছে একখানা বিছানা, তাঁর হারিয়ে যাওয়া মায়ের স্মৃতিবিজড়িত একটা চরকা—এই চরকায় তিনি সুতো কাটেন। বিছানার পাশে রাখা একটা ক্ষুদ্র টেবিল—শুতে যাবার আগে জর্জ কার্ভার সেই টেবিলের ওপরে বই রেখে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করেন, কখনো বা বাইবেল, কখনো বা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনগ্রন্থ, আবার অন্য সময়ে বিশ্বের বিখ্যাত মনীষী ও শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বেশভূষায়ও কোন আড়ম্বর বা বাহার ছিল না। এমন একটা কথা তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে যে তিনি ১৮৯৬ সালে যে বেশভূষা পরে টাস্কেগিতে এসেছিলেন ১৯১৫ সালেও তাঁকে সেই একই পোশাক পরিধান করতে দেখা

গিয়েছে। নিজের পরিধেয় পোশাক তিনি নিজেই প্রস্তুত করে নিতেন। কোটপ্যাণ্ট ছিঁড়ে গেলে জর্জ কার্ভার নিজেই ছেঁড়া জায়গাগুলিতে তালি দিয়ে ঠিক করে নিতেন। তিনি নিজের শার্ট নিজে তৈরি করতেন, মোজা বুনতেন, এমন কি জুতো তৈরি করতে পর্যন্ত জানতেন এবং নিজের পরবার জুতো নিজেই তৈরি করতেন। আমাদের দেশে যাকে বলে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই, জর্জ কার্ভারের ছিল তাই। তিনি লোকটা ছিলেন অত্যন্ত স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর। পরের উপর কোন কারণেই কখনো যাতে নির্ভর করতে না হয় তিনি সর্বপ্রযত্নে সর্বদা সেই চেষ্টাই করতেন। এ ছাড়া, তিনি কদাচিৎ কোন সভাসমিতি বা উৎসব আনন্দে যোগ দিতেন, কারণ তাঁর সময়ের যেমন অত্যন্ত অভাব ছিল, তেমনি ছিল তাঁর এসব ব্যাপারে আগ্রহের অভাব। জনতার ভিড় এড়িয়ে চলা বা তা থেকে দূরে সরে থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর এই ঘরকুনো স্বভাবের জন্য তাঁকে লোকে সমালোচনাও কম করত না। তিনি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, লোকজন ভালোবাসেন না, শুধু নিজেকে নিয়েই তিনি সবসময়ে ব্যস্ত থাকেন, এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে লোকের সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

অভিযোগ যে সত্য নয় সেইটে প্রমাণ করার জন্য জর্জ কার্ভার তাঁর নীতির পরিবর্তন করবেন ঠিক করলেন। মিসেস বুকার টি ওয়াশিংটন শিক্ষকদের সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে একটা সভার আয়োজন করলেন এবং জর্জ কার্ভারকেও সেই সম্বর্ধনা সভায় যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

কিন্তু বিদ্বজ্জন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সেই সভায় যোগদানের উপযুক্ত পোশাক জর্জ কার্ভারের ছিল না, কাজেই তিনি অন্যের কাছ থেকে চেয়ে একটা পোশাক জোগাড় করলেন এবং সেই পোশাক পরে বুক পকেটে একটা টকটকে লাল গোলাপ ফুল গুঁজে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ম্যাডাম বুকার টি ওয়াশিংটনের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। স্কুল প্রাঙ্গণ পার হয়ে যখন তিনি সেই বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন, পথে ছাত্ররা তাঁকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল "লতাগুল্মের অধ্যাপক" সান্ধ্য পোশাক পরে পার্টিতে যোগ দিতে চলেছেন।

ম্যাডাম ওয়াশিংটনের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে কলিংবেল বাজাতেই একজন ছাত্রী পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। মেয়েটি জর্জ কার্ভারকে দেখেই আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল, "অধ্যাপক কার্ভার! আসুন, আসুন, সোজা ভিতরে চলে আসুন।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণে যোগ দেবার সময় নেই, এজন্য আমি খুবই দুঃখিত। এক্ষুণি গিয়ে গবেষণাগারে আমায় একটা খুব জরুরী বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে বসতে হবে।" জর্জ কার্ভার এই কথা বলে পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, "ম্যাডাম ওয়াশিংটনকে দয়া করে এই কার্ডখানা দিয়ো, আর ব'লো, তাঁর প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা জাপনের জন্যই এসেছিলাম কিন্তু সময়ের অভাবের জন্য আমি সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারলাম না। তাই আমি চলে যাচ্ছি।"

বাড়ী ফিরে এসে কার্ভার তাঁর সান্ধ্য নিমন্ত্রণের পোশাক বদলে ছেঁড়া তালি দেওয়া সেই পুরানো প্যাণ্টকোট পরে আবার গিয়ে গবেষণাগারে ঢুকলেন।

বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সব সময় জগতের কোলাহল ও জনতার ভিড় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন, সব্বাইকে এড়িয়ে আলগা হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। কিন্তু হলে কি হয়, জগৎ তাঁকে ছাড়তে চাইত না। তাঁর দরজায় সব সময় মানুষের আনাগোনার আর বিরাম ছিল না। বিশ্বজগৎ তাঁর মাথায় একটার পর আর একটা খ্যাতি এবং সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেবার জন্য তাঁর দরজায় যেন ভিড় করে এসে দাঁড়াত। ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটির পরিচালকবৃন্দ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে রয়াল সোসাইটির অন্যতম সদস্যরূপে

নির্বাচিত করলেন। ১৯১৬ সালে রয়াল সোসাইটির সদস্য হবার পরমুহূর্ত থেকেই যশস্বী বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার নিজের নামের শেষে এফ. আর. এস. অক্ষর কয়টি বসাবার অধিকার লাভ করলেন এবং বিশ্বের সুধীজনের পাশে তাঁরও আসন স্থাপিত হল। একজন আমেরিকানের কাছে এ এক আকাঙ্ক্ষার বস্তু এবং দুর্লভ সম্মান। এ মহৎ সম্মান লাভের সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন একজন আমেরিকাবাসী পেয়ে থাকেন। জর্জ কার্ভারের এফ. আর. এস. হবার মূলে যাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা সব চেয়ে বেশী ছিল তাঁর নাম স্যার হ্যারি এইচ জনসন—প্রখ্যাতনামা বৃটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক। স্যার হ্যারি তাঁর জীবনস্মৃতি "আমার জীবন কাহিনী" নামক গ্রন্থে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখছেন—"টাস্কেগির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হলেন অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার, ইনি জাতিতে তো বটেই, মনে প্রাণেও একজন খাঁটি নিগ্রো। অধ্যাপক কার্ভার এমন চমৎকার এবং নিখুঁত ইংরেজী বলেন যে, শুনলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাড়া অন্য কিছু মনে হওয়া সম্ভব নয়। মনে হয়, ইনি যেন বাল্যকাল থেকেই অক্সফোর্ডে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছেন। আধুনিক বিশ্বে আমি এমন আর একজন লোকেরও সাক্ষাৎ পাইনি, উত্তর আমেরিকার উদ্ভিদ জগৎ তথা গাছাগাছালি সম্বন্ধে কার্ভারের মতো এমন বিশাল ও গভীর জ্ঞানভাণ্ডার যিনি আমার সামনে উন্মুক্ত করতে পেরেছেন।"

রয়াল সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করতে গিয়ে অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন—"এই বিরাট সম্মান লাভ করার আমি উপযুক্ত নই।"

২৩

১৯১৭ সালে আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধ মানেই নরহত্যা, আর জর্জ কার্ভার নরহত্যা সমর্থন তো করতেনই না, মনে প্রাণে নরহত্যাকে বড় ঘৃণা করতেন। কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধের ডাক যখন এল তখন মন থেকে সব দ্বিধা সংশয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জর্জ কার্ভার সেই যুদ্ধের একজন সৈনিক হলেন, ছাত্রদেরও স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। বললেন, "সমগ্র বিশ্ব যখন যুদ্ধ ও সঙ্কটের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে তখন কোন্ মানুষ পারে চুপ করে বসে থাকতে? কোনও জাতি পারে কি সেই সঙ্কটমোচনে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকতে? তেমন মানুষ অথবা তেমন জাতি যদি একটিও কোথাও থেকে থাকে তবে বিশ্বের শান্তির দিনেও তারা কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করার অধিকারী নয়।"

জর্জ কার্ভারের এ উদাত্ত আহ্বানে উত্তর আমেরিকার সর্বত্র উন্মাদনাময় সাড়া পড়ে গেল, গ্রাম ও শহর থেকে অসংখ্য নিগ্রো তরুণ ছুটে এল টাস্কেগিতে, সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্য সে কি তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ! নিগ্রো সৈন্যবাহিনীর একটি কোম্পানীর পতাকায় বেশ স্পষ্ট এবং বড় বড় অক্ষরে লেখা হল—"আমরা সমস্ত জগতের সামনে প্রমাণ দিতে চলেছি যে কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতির লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র থকে পলায়ন করে না।"

এই ঘটনার পরেও আমেরিকায় রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা অন্য কোন জাতীয় সঙ্কট, যখনই দেখা দিয়েছে নিগ্রোরাও অন্যান্য সকলের মতো সেই সঙ্কটের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বিপদ থেকে দূরে সরে থাকেনি এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিগ্রো সেনাবাহিনীর পতাকার লেখা উপরোক্ত কথাগুলি রীতিমত একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করেছিল সেও ছিল একজন নিগ্রো, তার নাম ছিল ক্রিসপাস অ্যাটাক এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রথম যে আমেরিকান সৈন্যটি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার লাভ করেছিল সেও একজন নিগ্রো ছিল এবং তাঁর নাম ছিল হেনরি জনসন। ......আর প্রথম মহাযুদ্ধের দারুণ খাদ্যসঙ্কটের সময়ে

উপবাসী দেশগুলিকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে অন্নাভাব থেকে রক্ষা করলেন যিনি তিনিও একজন কৃষ্ণকায় নিগ্রো। নাম তাঁর জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

১৯১৪ সালে জার্মানী যে যুদ্ধ শুরু করল পৃথিবীর আরও ২৯ টি দেশ সেই যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য দেশদেশান্তর থেকে অসংখ্য যুদ্ধপাগল মানুষ যখন ছুটে এল তখন দেখা গেল, কলে-কারখানায় অথবা ক্ষেতে-খামারে কাজ করার মতো লোক বেশী অবশিষ্ট নেই, ফলে লোকজনের অভাবে অনেক কল-কারখানার চাকা আর ঘুরছে না, জমি অনাবাদী পড়ে রইল, বহু খামার জনশূন্য হল। অনেক দেশেই দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার সৃষ্টি হল। মানুষ খেতে পায় না দুবেলা পেট ভরে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘর ছেড়ে পথে বের হয়েছে। জর্জ কার্ভার দেখলেন, মানবজাতি এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়ে বাঁচার উপায় খুঁজছে। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অসম সাহসে ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার। তাঁর সঙ্গে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আরও অনেকে এসে মিলিত হলেন। জর্জ কার্ভারের সর্বপ্রধান কাজ হল দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষগুলির মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা, উপদেশ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে তাদের চাঙ্গা করে তোলা। এ কাজ তিনি খুব ভালোই পারেন। যত বেশী সংখ্যক লোককে সম্ভব উৎসাহ দিয়ে তিনি তাদের নিজেদের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে এবং জনসাধারণের ব্যবহৃত পার্কে ফল ও শাকসব্জি উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "ক্ষুধায় পীড়িত কোন জাতি স্বাধীনতার জয়পতাকা বেশীদিন উর্ধ্বে-তুলে ধরে রাখতে পারে না।" শুধু তাই নয়, জর্জ কার্ভার এক-খানি খাদ্য-পতাকা তৈরি করে উর্ধ্বে ওড়ালেন, পতাকার গায়ে খোদাই করা অক্ষরের মতো যে লেখাগুলি জলজল করতে লাগল তা তিনি তৈরি করলেন বীট ও শালগম দিয়ে, নক্ষত্রগুলি তৈরি হল আলুর।

এ সমস্ত জিনিষ ছাড়াও নিভৃত পল্লীগ্রামের অভ্যন্তরে যে যে জিনিষ লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাত অনাদৃত অবস্থায় রয়েছে জর্জ কার্ভার সেই সব জিনিষের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আগাছা জাতীয় অনেক শাকসব্জি আছে লোকের কাছে যেগুলির কদর নেই অথচ মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে খুবই উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ তাতে রয়েছে। তিনি গ্রামবাসী দরিদ্র নিগ্রোদের ডেকে বললেন, "কৃষিজাত শাকসব্জির চাইতে অযত্নলালিত বন্য আগাছাগুলি স্বাদে ও গুণে কোন অংশে কম নয় এবং জীবনীশক্তি বৃদ্ধিতে তা যথেষ্ট সাহায্য করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বা লক্ষ্য করে থাকবে, বাগানে ফোটা গোলাপ ফুলের গন্ধের চেয়ে বুনো গোলাপ ফুলের গন্ধ ঢের বেশী মিষ্টি।"

জর্জ কার্ভার শুধু অন্যকে উপদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করলেন না। নিজেও নিজের জীবনে তা পালন করে যেতে লাগলেন। এমনিভাবে অনেক বছর যাবৎ একটু একটু অভ্যাস করার ফলে কতগুলি বুনো আগাছা তাঁর খাদ্যবস্তুতে পরিণত হল। সেগুলির মধ্যে আছে একজাতীয় ত্রিপত্র বিশিষ্ট গাছের পল্লব, বন্য লেটুস ও গোলমরিচের শাক ইত্যাদি।

তিনি বললেন, "মোরগ ফুল দিয়ে আমি চমৎকার স্যালাড বানিয়েছি।"

এমনিভাবেই জর্জ কার্ভার বহু আগাছা ও বুনো শাকসব্জি থেকে সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী তৈরি করে জনসাধারণকে খাইয়ে খাইয়ে তাদের খাওয়ার অভ্যাসই বদলে দিলেন, এবং তার ফলে নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের সময়েও তাদের মোটেই কষ্ট ভোগ করতে হয়নি।

জার্মানী তার ডুবো জাহাজ নিয়ে আক্রমণ শুরু করতেই মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা প্রবল হয়ে দেখা দিল। আটলান্টিক মহাসাগরে বহু যুদ্ধ জাহাজ ঘায়েল হল, অনেক পণ্যবাহী জাহাজ ডুবি হল। মার্কিন সরকার তখন বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণের

উদ্দেশ্যে বার্লি, বাদাম এবং চাউল থেকে বিভিন্ন রকমের ময়দা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়ে তা জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা এতই অখাদ্য হল যে, জনসাধারণ তা গ্রহণ করতে একেবারেই রাজি হল না। সৈনিকশিবিরগুলিতেও খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠল, তার মধ্যে রুটির অভাবই প্রধান। যেসব সৈনিকদের বয়স নিতান্ত অল্প তাদের ক্ষুধার আবেগ অত্যন্ত বেশী, বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তারা যা পায় তাই-ই গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। ডজন ডজন রুটি তারা মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে ফেলে। তাদের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দেবার উদ্দেশ্যে নতুন ধরণের রুটি তৈরি করার জন্য জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের ডাক পড়ল ওয়াশিংটন থেকে।

এর কিছুদিন আগে থেকে জর্জ কার্ভার মিষ্টি আলু দিয়ে নতুন এক ধরণের রুটি তৈরি করার চেষ্টায় মন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, মিষ্টি আলু থেকে ভালো জাতের ময়দা তৈরি করা সম্ভব। গমের ময়দার তুলনায় তা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয় এবং গমের ময়দার বদলে ব্যবহার করা চলে। সৈনিকদের জন্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার ভার যাদের ওপরে ন্যস্ত, অধ্যাপক কার্ভার তাদের ডেকে এনে মিষ্টি আলু থেকে উৎপন্ন ময়দা দিয়ে রুটি তৈরি করার প্রণালী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু জর্জ কার্ভারের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তারা যে এ জিনিষ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে এমন মনে হল না। জর্জ কার্ভার সেটা বুঝতে পেরে তাদের সংশয় দূর করার উদ্দেশ্যে নিজেই উনুনের কাছে এগিয়ে গেলেন। রুটি তৈরি করে উনুনের মধ্যে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই উনুনের ওপরকার ঢাকনা খুলে ফেলে তৈরি রুটি বের করে তাদের সামনে তুলে ধরলেন। এবার আর তাদের সংশয়ের কোন অবকাশ রইল না। কমিটির চেয়ারম্যান বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "বাঃ, গন্ধটা তো চমৎকার!" তারপরে তারা সবাই যখন সেই রুটির স্বাদ গ্রহণ করল, তাদের মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না, সবাই একবাক্যে প্রশংসা না করে পারল না—"সত্যিই অপূর্ব লাগছে খেতে।"

কার্ভারের নির্দেশ অনুযায়ী একটানা কিছুদিন পর্যন্ত শুধু কেবল মিষ্টি আলুর ময়দা দিয়ে রুটি তৈরির কাজই চলল। তারপর যখন জার্মানদের ডুবো জাহাজের আক্রমণ বন্ধ হল তখন আবার সাবেক গমের ময়দার রুটি তৈরি শুরু হল।

সারা যুদ্ধকালীন সময়ে জর্জ কার্ভার চিঠির জবাব দেবার কাজ নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিলেন। দেশ-বিদেশ থেকে এত বেশী সংখ্যায় চিঠি তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করল, আর তাদের মধ্যে এমন বিচিত্র ধরণের প্রশ্ন সব থাকত যে, তাঁর দিকে চেয়ে এক এক সময়ে মনে হত, তিনি যেন চিঠির পাহাড়ের নীচে চাপা পড়েছেন, তাঁর আর উঠবার বা চলাফেরা করারও বুঝি শক্তি নেই। তাঁকে দেখে অনেক সময় বিস্ময়ের আর অবধি থাকত না। এত অসীম ধৈর্য তিনি কোথায় পান! সবাই তাঁর উপদেশ এবং পরামর্শ চায়, তিনি চিঠি লিখে সকলের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেন। কারুকে ফেরান না, নিরুৎসাহ বা বঞ্চিত কারুকে করেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে বিশেষ করে ধনীদের মহল থেকে তাঁর কাছে লোভের ইশারাও আসে। তিনখানা খামে বন্ধ করা চিঠি পেলেন জর্জ কার্ভার। তাঁর কাজের জন্য তাঁকে পারিশ্রমিক দিতে চাওয়া হয়েছে সেই চিঠিতে, তিনখানা চেক পাঠিয়ে। টাকার অঙ্ক নেহাৎ তুচ্ছ করার মতো নয়, কিন্তু জর্জ কার্ভারকে টলানো গেল না। চেক তিনখানা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পত্রলেখকদের কাছে ফেরত পাঠালেন। চিঠির উত্তরে তাদের জানিয়ে দিলেন—"টাস্কেগি শিক্ষায়তনে এইসব কাজ করার জন্যই আমাকে রাখা হয়েছে এবং তার জন্য আমি মাসে মাসে বেতন নিয়ে থাকি। আপনাদের সেবা করা এবং সাহায্য করাও আমার এই কাজের অঙ্গ। তার জন্য আমি অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিতে পারি না।"

অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর অক্লান্ত সাধনা দ্বারা জীবনে যতগুলি জিনিষ আবিষ্কার করেছেন অপর কোন বৈজ্ঞানিক যদি তাঁর একটি মাত্র জিনিষ শুধু আবিষ্কার করতেন তা হলেও তার নাম বৈজ্ঞানিক হিসাবে আবিস্মরণীয় হত এবং তিনি প্রভুত ধন সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন অতি অনায়াসে। জর্জ কার্ভারও আবিষ্কারের জগতে তাঁর বিরাট ও বহুমুখী অবদানের জন্য তথা বিপুল সাফল্যের জন্য জগৎ জোড়া খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে কোটিপতি ধনী হতে পারতেন। প্রচুর আনন্দ, আরাম ও সুখ ভোগ করতে পারতেন। আরো সম্মান, আরো খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারতেন। কিন্তু এর কোনটাই জর্জ কার্ভারের কাম্য ছিল না। জর্জ কার্ভার যশ-সম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তি চান নি। তাঁর জীবনের যে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল তা হল মানুষের কল্যাণসাধন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সমগ্র জীবন তিনি সাধনা করেছেন। বিজ্ঞানের সাধনা করেছেন নতুনের সন্ধান আর নিত্য নব নব আবিষ্কারের জন্য এবং তাঁর জীবনের সেই সব আবিষ্কারের সাফল্যকে সার্থকভাবে মানুষের কল্যাণে রূপায়িত করেছেন।

কোটিপতি ধনী ব্যবসায়ীরা দলে দলে জর্জ কার্ভারের দরজায় এসে ভিড় করতে শুরু করলো তাঁর কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করার আশায় এবং পরামর্শ ও উপদেশের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ তাঁকে দিতে চাইল। যত টাকা তিনি চান তারা তা দিতে প্রস্তুত। গোছা গোছা ডলারের বাণ্ডিল হাতে নিয়ে তারা তাঁর পিছনে ঘুরতে লাগল। কিন্তু জর্জ কার্ভার ফিরেও তাকান না।

ফ্লোরিডা থেকে একদল কলাই উৎপাদনকারী কৃষিজীবী একশো ডলারের একখানা চেক এবং সেই সঙ্গে পোকায় খেয়ে নষ্ট করা একবাক্স কলাইয়ের দানা জর্জ কার্ভারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে লিখল, জর্জ কার্ভার যদি তাদের ফসল রোগমুক্ত করে দিতে পারেন তবে তারা তাঁকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করতে রাজি আছেন। জর্জ কার্ভার ফসলের রোগ নির্ণয় করে তাদের জানিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে তারা যে চেক পাঠিয়েছিল তাও তাদের কাছে ফেরত পাঠালেন। চিঠিতে লিখলেন, "ভগবান্ তোমাদের জন্য ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছ থেকে কোনরূপ প্রতিদান বা পারিশ্রমিক দাবী করেন না। তেমনি আমাকেও ভগবান্ ভার দিয়েছেন ফসলের রোগ সারাবার। ভগবানের দেওয়া কর্তব্য আমি পালন করেছি মাত্র, তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কোন অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি না।"

রঙ তৈরির কারখানার মালিকরা যেই শুনল অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার নির্ভুল ভাবে কয়েকটি বিশেষ ধরণের উদ্ভিজ্জ রঞ্জকদ্রব্য আবিষ্কার করেছেন অমনি তারা তাঁর কাছে একটা গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব করে পাঠাল এবং তার সঙ্গে পাঠাল একখানা সাদা চেক—টাকার ঘর শূন্য। তারা অনুরোধ জানাল, টাকার অঙ্কটা যেন জর্জ কার্ভার তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী বসিয়ে নেন। কার্ভার তাঁর নিজের আবিষ্কৃত ৫০৬টি বিভিন্ন ধরণের রঞ্জক পদার্থের নমুনা, সঙ্গে সাদা চেকখানাও ফেরত পাঠালেন। রঞ্জক পদার্থগুলি আবিষ্কারের সূত্র তারা জানতে চেয়েছিল, তিনি তাও তাদের জানালেন।

জর্জ কার্ভার কলাইয়ের খোসা থেকে যে কৃত্রিম শ্বেত মর্মর-প্রস্তর আবিষ্কার করে সবাইকে অবাক্ করে দিয়েছিলেন, একটা নামজাদা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসা করে মোটা মুনাফা লুটবার ফন্দী করল। ইতিমধ্যেই তারা তার ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল। আসল অভিসন্ধি গোপন রেখে তারা জর্জ কার্ভারকে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানালো। বেশ মোটা মাইনের চাকরি, কিন্তু কার্ভার সে আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকগোষ্ঠী তখন নিজেরাই তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল, অর্থাৎ তাদের গোটা কারখানাটাই

তারা সব যন্ত্রপাতি সমেত টাস্কেগিতে উঠিয়ে নিয়ে এল। বলা বহুল্য, জর্জ কার্ভারের মূল্যবান্ পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করা থেকে তারা বঞ্চিত হল না, যদিও তার জন্ম এক পয়সাও তাদের খরচ করতে হয়নি।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার টাস্কেগির শিক্ষায়তনে অধ্যাপকরূপে প্রথম যে বেতনে ঢুকেছিলেন এখনো তিনি সেই একই বেতন পান, বছরে মাত্র ১৫০০ ডলার। তাঁর বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব কয়েকবারই তাঁর কাছে করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। বলেছেন, "আমার প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী টাকা আমি বেতন পাচ্ছি, আরো বেশী টাকা দিয়ে আমার কী হবে?"

বেতন পেয়ে চেক নিয়ে এসে তিনি ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিতেন, কদাচিৎ তিনি তা ব্যাঙ্কে ভাঙাতে দিতেন। অনেকদিন ধরে একটার পর একটা চেক জমা হয়ে ড্রয়ারের মধ্যে স্তূপাকার হল এবং অবশেষে পুরু হয়ে তাতে ধুলো জমল—কার্ভারের কাছে যেন তা মূল্যহীন অকিঞ্চিৎকর। অর্থের প্রয়োজন সবার আছে কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে কার্ভার সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিরাসক্ত। তিনি মনে করেন, অর্থকে খুব উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁর মতে এইটেই মানুষের সব দুঃখ দুর্দশা ও ক্ষয়ক্ষতির মুখ্য কারণ।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের অধ্যাপনায় খ্যাতি ও তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার রশ্মি এমনভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, বহু লোকের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হল। বহু বিখ্যাত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বেশী বেতনে তাঁকে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করার জন্ম বিশেষ আগ্রহ দেখানো হল—এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বেশী বেতনে তাঁকে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করার জন্ম বিশেষ আগ্রহ দেখানো হল—এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী দুরকমই ছিল, কিন্তু জর্জ কার্ভার ভালো চাকরির সব সুযোগ প্রত্যাখানে করে টাস্কেগিতেই রয়ে গেলেন। একদিন প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক টমাস অ্যাল্‌ভা এডিসনের কাছে থেকে একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে তাঁর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মিলার হাচিসন বিখ্যাত নিগ্রো বিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি জর্জ কার্ভারকে সেই বিশেষ বার্তাটি জানিয়ে দিয়ে বললেন, "মিঃ এডিসন তাঁর নিউজার্সি শিক্ষাভবনে আপনি যাতে যোগদান করেন সেই উদ্দেশ্যে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আশা করি তাঁর এ অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন।"

"আমি ভেবে দেখব মিঃ হাচিসন।"

"হ্যাঁ, অধ্যাপক কার্ভার, আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন।" অতঃপর মিঃ হাচিসন জর্জ কার্ভারকে বেতন হিসেবে যে অর্থ দিতে চেয়েছেন টমাস অ্যালভা এডিসন তার পরিমানটাও ব্যক্ত করেন।

মিঃ হাচিসন টাস্কেগি থেকে চলে যাবার পরদিনই জর্জ কার্ভার চিঠি লিখে মিঃ এডিসনকে স্বীয় সিদ্ধান্ত জানালেন, লিখলেন, "আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ এই প্রস্তাবের জন্ম আমি আপনার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তথাপি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এখানকার লোকেরা আমাকে চায়। তাদের ত্যাগ করে যেতে আমি কিছুতেই পারব না।"

টমাস অ্যাল্‌ভা এডিসন মিঃ জর্জ কার্ভারের এই চিঠি পেয়ে তাঁর ওপরে একটুও রাগ করলেন না বা অসন্তুষ্ট হলেন না। কার্ভারের বুকের মধ্যে লুকানো এত বড় একটা মহৎ প্রাণের সন্ধান পেয়ে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। জাতির স্বার্থে নিজের ভবিষ্যৎকে অকাতরে বিসর্জন দেওয়া যে কত বড় ত্যাগ তা তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

কিন্তু জর্জ কার্ভারের বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই তাঁর এ মহৎ ত্যাগের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাঁকে বোকা ঠাওরাল, সমালোচনা করল। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে টাকার অঙ্কটা জানতে চেয়েছিল কার্ভারের কাছে, প্রশ্ন করেছিল, "মিঃ

এডিসন আপনাকে কত টাকা বেতন দিতে চেয়েছিলেন?"

কার্ভার প্রথমটায় এই ধরণের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যখন আর পারতেন না, বার বার এই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন তখন বিরক্ত হয়ে বলতেন, "ছয় অঙ্কের টাকা।" জবাবটা তিনি যেন তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারতেন।

বছরে এক লক্ষ ডলার বেতনের একটি প্রস্তাবও তিনি ঠিক এই ভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন।

জর্জ কার্ভার এই ভেবে সবচেয়ে অবাক হতেন, ভগবানের কাছ থেকে যে দান তিনি আশীর্বাদস্বরূপ পেয়েছেন তা তিনি অর্থের লোভে বিক্রী করবেন লোকে তাঁকে এতটা নীচ ও অর্থলোভী কী করে ভাবে? একবার একজন লোক চ্যালেঞ্জের সুরে তাঁকে বলেছিল, আপনি এখন এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা পাবার সম্ভাবনাকে হেলায় তুচ্ছ করে প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো একদিন এর জন্য আপনার অনুশোচনার অবধি থাকবে না। তখন ভাববেন, সেই লক্ষ লক্ষ টাকা থাকলে আপনি কত লোকের উপকার করতে পারতেন।

জর্জ কার্ভার উত্তরে বলেছিলেন, যে অর্থ আমার নিজের নয় তা আমি নিই কী করে? আর তাছাড়া সেই অর্থ যদি আজ আমার থাকত, আমি হয়তো আমার প্রিয় ভাইবোনদের কথা, জনসাধারণের কথা একেবারে ভুলেই যেতাম।"

২৪

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সুখ্যাতি দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল, সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁর নাম জানে, তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। দেশ-বিদেশের নানা স্থান থেকে প্রত্যহ হাজার হাজার চিঠি আসে, সব চিঠিতেই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত ঠিকানা লেখা থাকে—'কলাইয়ের মানুষ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।' টাস্কেগির ডাকঘরটি খুবই ছোট কিন্তু তার তুলনায় চিঠির সংখ্যা যথেষ্ট বেশী, আর অধিকাংশ চিঠিই আসে জর্জ কার্ভারের নামে। টেবিলের উপরে স্তূপাকার করে রাখা চিঠিগুলির প্রত্যেকখানি চিঠি যত্নের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে পড়েন তিনি, খুঁটিনাটি কথাও বাদ যায় না এবং সব চিঠির সব প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন বিশদভাবে। এ ছাড়া প্রত্যহ তাঁর কাছে অগুণতি লোক আসে দেখা করতে, তাদের সবারই পৃথক পৃথক প্রশ্ন, আলাদা আলাদা সমস্যা। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় প্রায় সব সময়ই দেখা যায়। তাঁর কাছে লোকজনের আসার আর বিরাম নেই, কত রকমের লোক, আর তাদের কত বিচিত্র ধরণের প্রশ্ন। আশ্চর্য্য মানুষ কার্ভার, অপরিসীম তাঁর ধৈর্য। কেউ কখনো তাঁকে রাগতে বা তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখেনি। যে কোন লোকই তাঁর কাছে আসে তাকেই তিনি আদর করে কাছে বসিয়ে মন দিয়ে তার সব কথা শোনেন, সব সমস্যার সমাধান বাত্‌লে দেন। কারুকেই তিনি কখনো ফেরান না বা অবহেলা করেন না, অসম্মান দেখান না। চারপাশে ছড়ানো নানান গ্রাম থেকে অজ্ঞ চাষাভূষারা আসে, ফসল ও শস্যবীজ সম্পর্কে কত কথা তাদের জানবার থাকে। শহরগুলি থেকে আসে বড় বড় বাগানের ধনী মালিকরা, কিভাবে বাগানের উন্নতিসাধন করা যায় তার নিয়ম কানুন তারা জানতে চায়। কার্ভারের কাছ থেকে সবাই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পায়, খুশি মনে চলে যায়।

জর্জ কার্ভারের কাছে এ ছাড়াও আসে ছোট ছোট শিশুর দল—জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা। দরিদ্র শ্রমজীবীদের কুটির থেকে ছোট ছোট বালক-বালিকারা এসে ভিড় করে কার্ভারের কাছে, তারা নাচে, গান করে, আনন্দ কলরবে ভরিয়ে তোলে কার্ভারের গৃহ অঙ্গন। তারা তাঁর সামান্য কোন কাজে লাগতে পারলেও তাদের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। কার্ভার শিশুদের সবার প্রিয়, সবার আপনার জন, সবার বন্ধু। তিনি তাদের সকলের সঙ্গী। শিশুরা আব্দার জানায় তাদের সঙ্গে কার্ভারকে তাদের বাড়ী যেতে হবে। তিনি তাই যান। খুশি

মনে শিশুদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এক-একদিন এক-একজন শিশুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হন, তার বাপমার সঙ্গে বসে অন্তরঙ্গভাবে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করেন। শিশুদের সঙ্গে মিশে কার্ভারও একজন আপনভোলা শিশু হয়ে যান, তাদের সঙ্গে তাঁর বয়সেই যতই ব্যবধান থাক, মনের ব্যবধান বিন্দুমাত্রও থাকে না।

সমগ্র টাস্কেগি শিক্ষায়তনের অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সম্মান ও খ্যাতির আসন সবার চাইতে উঁচুতে। পূতচরিত্র, নিষ্কলঙ্ক, নির্লোভ মানুষ হিসাবে তিনি সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু জর্জ কার্ভার নিজের সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন। এম্‌স শহরে বাস করার সময়ে, সেই চল্লিশ বছর আগে, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যে পোশাক কিনে এনে সাজিয়ে দিয়েছিল, এখনো সেই জীর্ণ পুরানো পোশাকটা মাঝে মাঝে পরে দেখেন, কেমন লাগে। কলাইয়ের খোসা থেকে তিনি যে গলাবন্ধনী তৈরির করেছিলেন নিজের হাতে, সেটা তাঁর এখনো আছে।

অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সময়ের ওপরে চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল, কিন্তু তাতে তাঁর উৎসাহের ঘাটতি দেখা গেল না। জনকয়েক উৎসাহী ছাত্র নিয়ে তিনি চিত্রাঙ্কনের ক্লাস খুলে বসলেন একটা। কাদা ও পাঁক থেকে আশ্চর্য এক রকমের রঙ উদ্ভাবন করে তিনি তাঁর ছাত্রদেরও তা প্রস্তুত করার প্রণালী শিখিয়ে দিলেন। কলাইয়ের খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে কি রকম করে যেন একখানা ছবি আঁকার উপযোগী ক্যানভাস তৈরি করলেন। প্রতিভাধর শিল্পীরূপে জর্জ কার্ভারের ইতিপূর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। লুক্সেমবুর্গ আর্ট গ্যালারিতে তাঁর আঁকা চিত্র 'চারটি পিচফল' শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম রূপে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা লাভ করেছিল।

টাস্কেগি শিক্ষায়তনে কার্ভারের যোগদানের পর কয়েক বছরের মধ্যে ছাত্ররা একটা চমৎকার অভ্যাস আয়ত্ত করেছে। প্রতি রবিবার জর্জ কার্ভারের ঘরে একটা আলোচনা বৈঠক বসে, সেই বৈঠকে তিনি হয় বিজ্ঞান কিংবা ধর্মশাস্ত্র বাইবেল নিয়ে আলোচনা করেন এবং ছাত্ররা গভীর মনোযোগের সঙ্গে জর্জ কার্ভারের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সম্মোহিতের মতো তা শোনে। তাদের এখন এমন অভ্যাস হয়েছে যে, একটিও রবিবার তাদের কেউ এ আলোচনা বৈঠক বাদ দিতে পারে না। রবিবার এলেই তাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে সাড়া জাগে। শেষে ছাত্রদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হল যে, কার্ভারের ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সকলের আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। আলোচনা বৈঠক আগে দু-এক রবিবার বাদ দেওয়া গেলেও এবং তার জন্য ধরাবাঁধা কোন নিয়ম কানুন না থাকলেও, পরে তা দস্তুরমতো নিয়মিত একটা ক্লাসে পরিণত হল এবং এই ক্লাসে যোগদানে আগ্রহী ছাত্রের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল। অবশেষে আলোচনা বৈঠক কার্নেগী গ্রন্থাগারের বড় হলঘরটাতে স্থানান্তরিত করা হল। কার্ভারের বক্তৃতা শোনার জন্য লোকের ভিড় ক্রমশ বেড়ে বেড়ে এমন হল যে সেটা আর শেষ অবধি শুধু কেবল ছাত্রদেরই আলোচনা বৈঠক রইল না, বয়স্ক ব্যক্তিরাও সমান আগ্রহ নিয়ে তাতে এসে যোগ দিতেন। এরকম একটা সপ্তাহ খুব কমই দেখা যেত, যে-সপ্তাহে শ্রোতাদের সংখ্যা কিছু কম হত, বা তিনশোটি আসনের মধ্যে একটি আসনও খালি পড়ে থাকত না।

জর্জ কার্ভার ঘড়ি নিয়ে বসে থাকতেন, অপেক্ষা করতেন আলোচনা বৈঠকে যোগদানের শ্রোতাদের আগমন প্রত্যাশায়, তারপর যেই ঠিক ৬টা বাজত অমনি তিনি আলোচনা শুরু করে দিতেন। সবাই যাতে সহজেই বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর কথাগুলি বলে যেতেন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলি সরস বর্ণনার মাধ্যমে এমন সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলতেন যে, ছাত্রদের তা বোঝার পক্ষে কিছুমাত্র অসুবিধা হত না। কোন সংশয় অথবা দ্বিধা তাদের মনে থাকত না। তারা অধ্যাপক কার্ভারের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হত। জর্জ কার্ভার তাঁর বক্তব্য বিষয় বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় কৌতুক ও হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন, অনেক সময় আবার ছাত্রদের তিনি চমক লাগাতেন এক-একটা কথা বলে।

ক্রমশঃ

পিতা ও পুত্র

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

রমাকান্তের অনেক গুণ ছিল, দোষের মধ্যে সে অত্যন্ত বদরাগী,—যখন রাগিত দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। কিন্তু এই রাগটা ঘরের মধ্যে যতটা প্রবলরূপে প্রকাশ পাইত, ঘরের বাহিরে ততটা নয়। এই কারণে রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যার অভাব ছিল না, সমাজেও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, কেবল ঘরের মধ্যে তেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না।

রমাকান্তের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি ছিল, তদুপরি নানান্ রকমের কারবারেও যথেষ্ট আয় ছিল, সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সংসারে থাকিবার মধ্যে রমাকান্ত নিজে, বুড়ি মা, আট বৎসরের একটি ছেলে ও বিধবা এক ভগ্নী। রমাকান্তের স্ত্রী ছেলেটিকে পাঁচ বৎসরের রাখিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন।

রমাকান্ত ছেলেটিকে অতিশয় ভালবাসিত, কিন্তু বাহিরে ব্যবহারে সে ভালবাসা প্রকাশ পাইত না, বরং অনেক সময়ে তাহা রূঢ়তারই আকার ধারণ করিত। ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে চিত্তের যে সরসতা, যে সহিষ্ণুতা আবশ্যক রমাকান্তের তাহা আদবেই ছিল না, অথচ অন্যের বহু চেষ্টাও তাহার কখন মনঃপূত হইত না; —এই কারণে ছেলেকে লইয়া রমাকান্তের প্রায়ই মার সঙ্গে খিটিমিটি বাধিত, যত ঝাল বেচারা মার উপরেই আসিয়া পড়িত। ছেলের অসুখ করিল, সে দোষ মায়ের। মা বলিতেন, "বাছা, আমি কি আর সাধ করে অসুখ ডেকে এনেছি, অসুখ করেছে আবার সেরে যাবে"। মাষ্টারের কাছে ছেলে পড়া পারিল না—সে দোষ মায়ের, মা তাহাকে আদর দিয়া খারাপ করিতেছেন। যেদিন নিতান্ত থাকিতে পারিতেন না, মা রাগ করিয়া বলিতেন, "রমা, আমাকে আর জ্বালাসনে, —তোর ভয়ে আজ পর্য্যন্তও ওকে একটা ভাল জিনিষ হাতে করে তুলে দিতে পারলুম না তবুও বলিস্ কিনা আমি আদর দিয়ে খারাপ করছি।—আজ যদি ওর মা থাকত"—বলিতে বলিতে চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত। এইরূপ সামান্য কারণে, সামান্য এদিক্ ওদিকে রমাকান্ত প্রায়ই বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিত। রমাকান্ত যে সব সময়ে ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিত তাহা নহে। সে সবই বুঝিত কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিত না। ইহাকে স্নায়ুর দোষই বল, আর স্বভাবের দোষই বল,—রমাকান্তের ইহা মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মাষ্টার হইতে ছেলের পড়াশুনা কিছুই হইতেছিলনা। রমাকান্ত যে ইহা বুঝিতেন না তাহা নহে। কিন্তু প্রতিকারের অন্য কোন ভাল উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কেবল মাষ্টারের উপর মাষ্টারই বদ্‌লাইতে লাগিলেন—অবশেষে কিছুতে না পারিয়া একশত টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের এক পেন্সন্ প্রাপ্ত হেডমাষ্টারকে ছেলের গার্ডিয়ান্ টিউটার স্বরূপ ঠিক করিয়া বাড়িতে রাখিয়া দিলেন।

লোকটি অতিশয় প্রবীণ, অতিরিক্ত বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ এবং কঠোর নীতিপরায়ণ। নিক্তির ওজনে তিনি সব কাজ করিতেন—একটু এদিক্ ওদিক্ হইবার যো ছিল না। স্কুলে থাকিতে ছেলেরা "বাঘা হেডমাষ্টার" তাঁহার নাম দিয়াছিল—ইহা হইতে তাঁহার শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে সকলেই অবধারণ করিতে পারিবেন—অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই ছেলের নামে বাপের কাছে আসিয়া নালিশ করিলে, রমাকান্তও ছেলেকে ধমক ধামক দিতেন। এইরূপে দিন যায়, একদিন মাষ্টার মহাশয় অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রমাকান্তের কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম। আমি আর পড়াইতে পারিব না।" "কেন, কি হইয়াছে?" "নাঃ, আমি আর পড়াইব না। অন্য লোক দেখুন।" "কি হইয়াছে বলুন না।" —অনেক কষ্টে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে, তিনি দ্বিপ্রহরে আহারের পর যখন একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন সেই অবসরে পুত্র তাঁহার চশমার খাপ হইতে চশমা বাহির করিয়া চোখে পরিতে গিয়া দুইখানা কাঁচই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে।

রমাকান্ত আর একটিও কথা না বলিয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন। তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া একটি ছোট অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহাকে আনিয়া ফেলিলেন। সেখানে তাহার মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড ভারী বই চাপাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলেন এবং নিজে ঘরের পার্শ্বে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলে চীৎকার করিতে লাগিল, "ও বাবা আমি আর করব না, কখ্খনো করব না বলচি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, খুলে দাও, গেলুম।" —চীৎকারে বাড়ী ফাটিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট অনবরত চীৎকারের পর বালকের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল—অবশেষে এমন হইল যে, রমাকান্তও সে স্বর আর শুনিতে পাইলেন না। রমাকান্ত একবার ভাবিলেন, "খুলিয়া দিই," আবার মনে হইল, "না, যথেষ্ট শাস্তি হয় নাই; এখনই আবার ভুলিয়া যাইবে,"—এমন সময় রমাকান্তের মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া রমাকান্তকে ঠেলিয়া শিকল টানিয়া খুলিয়া অবসন্ন মূর্চ্ছিতপ্রায় বালককে বুকে আগলাইয়া ধরিয়া "এমনও করতে হয়, ছেলেটাকে এমনও করতে হয়," বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। রমাকান্ত মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজ কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন—চোখ্ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল—বালকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

২

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমাকান্ত কাল ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবেন ঠিক করিয়াছেন—নূতন খাতাপত্র বই সব কিনিয়া দিয়াছেন। ছেলের আনন্দ উৎসাহ আর ধরে না। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রাত্রে রমাকান্ত শয়ন করিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার একটু জ্বরের মত দেখা দিল—ক্রমশঃ সেই জ্বর বাড়িতে লাগিল। প্রাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ঔষধপত্র কিছুই দিলেন না, বলিলেন, তিন দিন না দেখিয়া তিনি কোনও ব্যবস্থা করিবেন না। তখন সহরে বসন্তের অতিশয় প্রকোপ। হাজার হাজার লোক মরিতেছে। রমাকান্তের জন্য সকলের ভয় হইল।

তৃতীয় দিনে রমাকান্তের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া বসন্ত গুটিকা দেখা দিল। অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার পর্য্যন্ত আর সে ঘরে ঢুকিতেন না, দূর হইতে রোগীকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেন। ডাক্তার সকলকে রমাকান্তের ঘরের দিক্ একেবারে মাড়াইতে নিষেধ করিলেন, বিশেষতঃ সেই ছোট ছেলেটিকে যেন অন্তঃপুর হইতে কোনও মতে বাহিরে আসিতে না দেওয়া হয় এই কথা বারম্বার বলিয়া দিলেন।

রমাকান্তের মাতা কাহারও নিষেধ বার্ত্তা না শুনিয়া দিবারাত্র প্রাণপণে পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। ছেলেটি অন্তঃপুরে তাহার পিসিমার নিকটেই থাকিত।

সাতদিনের পর রমাকান্তের অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতে লাগিল, ডাক্তার আশা দিল।

* * *

তখনও অসুখ ভাল করিয়া সারে নাই। রমাকান্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়াছিল, পার্শ্বে মাতা বসিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। শিশু যেমন মায়ের কোলে সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া দিয়া আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া থাকে, রমাকান্ত মায়ের কোলে একখানি হাত এলাইয়া দিয়া সেইরূপ-ভাবে পড়িয়া ছিল। স্বপ্নও নহে, জাগরণও নহে,—রমাকান্তের মনে হইতেছিল কে যেন তাহাকে জীবনের এপার হইতে ওপারে সজোরে দোল খাওয়াইতেছে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল—হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া চোখ খুলিয়া রমাকান্ত দরজার কাছে কি একটা ছায়ার মত দেখিলেন। ক্ষীণ দৃষ্টি প্রাণপণে প্রসারিত করিয়া রমাকান্ত দেখিলেন, তাঁহারই পুত্র করুণ নয়নে একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। রমাকান্তের বুঝিতে বাকী রহিল না, নিষেধ সত্ত্বেও বালক লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। প্রায় দুই মিনিট কাল এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বালক আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার দুই চোখ যে বেদনা জানাইয়া গেল রমাকান্ত তাহা আর ভুলিতে পারিলেন না—শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা, অমন্ কর্‌চিস্ কেন বাবা?" রমাকান্ত কহিল, "না মা, কিছু না।

৩

অসুখ হইতে উঠিয়া রমাকান্ত সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দিল। রমাকান্ত আর সে রমাকান্ত নাই,—সে রাগ নাই, রুক্ষ মেজাজ নাই। রমাকান্ত একণে নিতান্ত শান্ত নিরীহ ভালমানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্রকে রমাকান্ত জননীবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন;—দুই হাত ভরিয়া তাহাকে জিনিষপত্র কিনিয়া দিতে লাগিলেন,—পড়াশুনার জন্তও তাহাকে আর পূর্ব্ববৎ শাসন করিতেন না,—সকল বিষয়ে তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। হঠাৎ পিতার এই ভাবান্তর, স্নেহ প্রাবল্যের কারণ ঠিক করিতে না পারিয়া পুত্র যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

রমাকান্ত কোনমতেই শরীর শুধরাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ডাক্তাররা তাঁহাকে একবৎসরকাল কোন শৈলনিবাসে গিয়া থাকিবার পরামর্শ দিলেন।

তাঁহার অনুপস্থিতিতে ছেলের পড়াশুনার কি হইবে রমাকান্ত তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন, বেনারস হিন্দুকলেজের বোর্ডিং এ ছেলেকে রাখিয়া তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনে গমন করিবেন।

কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া রমাকান্ত শীঘ্রই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। ছেলের পকেট খরচার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া বোর্ডিংএ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

ভাল দিন দেখিয়া রমাকান্ত পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। কলেজে পৌঁছিয়া রমাকান্ত পুত্রকে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সস্নেহে সমর্পণ করিয়া দিলেন এবং যাহাতে তাহার কোনওরূপ কষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া সেই দিনই আবার সিমলা অভিমুখে রওনা হইলেন।

দেখিতে দেখিতে একপক্ষ কাটিয়া গেল। রমাকান্ত সেদিন বাংলার সম্মুখে একখানা ইজিচেয়ার টানিয়া অলসভাবে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে বড় বড় কেলুগাছ মাথা উচু করিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—তাহাদের মাথার উপর একরাশ মেঘ কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে, দূরে বরাস্ গাছে আগুন লাগাইয়া স্তবকে স্তবকে লাল লাল ফুল ফুটিয়া আছে। আকাশ ঘোর নীলবর্ণ,—তাহার গায়ে ঠেস্ দিয়া সাদা মেঘে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—মনে হইতেছে যেন কে বস্তা বস্তা তুলা আনিয়া তাহাদের

সর্বাঙ্গে বিছাইয়া দিয়াছে। রমাকান্ত বসিয়া বসিয়া দেখিতে ছিলেন ও মাঝে মাঝে ছেলের ও বাড়ির কথা ভাবিতে ছিলেন, এমন সময়ে চাকর আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রামখানা ইংরাজিতে লেখা ঐরূপ :—

"আপনার পুত্র প্লেগে আক্রান্ত, বাঁচবার আর আশা নাই।" রমাকান্তের হাত হইতে টেলিগ্রামের কাগজ পড়িয়া গেল, তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বেশ পরিবর্তন না করিয়া সঙ্গে কিছু না লইয়া রমাকান্ত একছুটে তখনই রওনা হইলেন।

বেনারস ষ্টেশনে পৌছিয়া রমাকান্ত একটা ঠিকাগাড়ি ভাড়া করিলেন,—গাড়োয়ানের হাতে চারিটি টাকা গুজিয়া দিয়া বলিলেন, "হাঁকাও হাঁকাও, পাঁচ মিনিটে পৌছাইয়া দিতে পারিলে আরও বক্‌শিস্ মিলিবে।"

কলেজের দ্বারে আসিয়া রমাকান্ত যখন পৌছিলেন তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে—কাল রাত্রেই পুত্রের সৎকার হইয়া গিয়াছে।

রমাকান্ত কাশীতেই রহিয়া গেলেন, মাতা ও ভগ্নীকে নিকটে আনিলেন;—বিষয়সম্পত্তির প্রায় সমস্তই দানধ্যান দেবসেবায় ব্যয় করিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দেখা যাইত রমাকান্ত খালি পায়ে মলিনবেশে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যোড়করে গললগ্নী-কৃতবাসে বলিতেছেন, "দয়া কর ঠাকুর, দয়া কর, তোমার সেই রূপ একবার দেখাও, যাহাতে আমি তোমার মধ্যেই তাহাকে একবার দেখিতে পাই,—বড় অনাদরে সে চলিয়া গিয়াছে—তাহাকে একবার দেখাও ঠাকুর তাহাকে একবার দেখাও।" চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতে থাকিত।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমি জানি, আমি বিপজ্জনক মাটিতে পা দিয়াছি, কারণ অর্থশাস্ত্রের জটিলতায় প্রবেশ করি এমন সাধ্য আমার নাই। কিন্তু একদেশদর্শী রূপে বিচার করিতে না পারা আমার দুর্ভাগ্য, স্বীকার করিতেছি। অন্য দিকটাও বিচার করা আমি অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। অতএব সেদিকটিতে আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা সবিনয়ে নিবেদন করি। আমার কাছে কোনও রেফারেন্স বই নাই, কিন্তু আমি স্মৃতি হইতে বলিতেছি, আমাদের দেশ হইতে সোনা এবং রূপা বাহিরে চলিয়া যাওয়া দূরে থাক, বরং প্রতিবৎসর আমরা প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও রূপা এদেশে পাইয়া থাকি—এবং তাহা পুনরায় রপ্তানি করা হয় না। এই সোনা ও রূপা এদেশে মজুত করা হইয়া থাকে। আমি ভারতের যে অংশের বাসিন্দা, সেখানে ত্রিশ বৎসর পূর্বে সোনা দুর্লভ ছিল, এবং স্ত্রীলোকেরা শাঁখের, গালার, পিতলের অথবা খুব বেশি হইলেও, রূপার অলঙ্কার পরিয়া খুশি থাকিত। কিন্তু এখন নিম্নস্তরের স্ত্রীলোকেরাও সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছে। আমরা বৎসরে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড মূল্যের সোনা ও রূপা ক্রয় করিতেছি। অবশিষ্ট ৭ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে আমরা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের দ্রব্য বিদেশ হইতে কিনি। অবশিষ্ট থাকে ৪ কোটি ১ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা হইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের সুতিবস্ত্র আমদানি করি, এবং সাধারণ কর হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মাশুল দিই। গত ছয় বৎসরের গড় মাশুলের পরিমাণ ১৯ কোটি টাকা, বাকিটা ধার করিয়া মিটাই। এই দুটি বিষয়ে আমাদের দেশের ক্ষতি। আমরা বিদেশে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের তুলা ও সুতা পাঠাই, এবং ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের কাপড় কিনি। তফাৎ ৭০ লক্ষের। ইহা হইতে উৎপাদন যন্ত্রের মূলধনের উপর সুদ কাটিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা ইংল্যাণ্ডকে আমাদের জন্য কাপড় তৈয়ারির মজুরি স্বরূপ বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া থাকি। আমরা নিজেরা যদি এখানে বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে এই ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আমাদের দেশেই থাকিয়া যাইত। "হোম চার্জ" রূপে ইংরেজরা আমাদের নিকট হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করে ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে খরচ জোগাইতে হয়, যথা, সিভিল মিলিটারি খরচ, ছুটির জন্য অ্যালাউয়েন্স, পেনশন, ইংরেজ অফিশিয়ালগণ এদেশে যাহা জমায় তাহা, রেলপথ ও অন্যান্য জন-কল্যাণ মূলক কাজের জন্য যে টাকা উঁহারা ধার দেয় তাহার সুদ দিতে হয়। এই সুদ অ্যামেরিকা ব্যতীত প্রায় সকল দেশই ইংরেজকে দিতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা যদি রেল সংস্থা বিস্তারের জন্য শতকরা ৪ সুদে আরও টাকা ধার দিতে তাহা হইলে ভাল হইত মনে করি। সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের দেশ হইলে যে টাকাটা ইংরেজকে না দিয়া আমরা দেশেই রাখিতে

পারিতাম, তাহার পরিমাণ বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) হইতে কিছু বেশি। ইহার উল্টা দিকও আছে, যথা (১) ইংল্যাণ্ড চীনকে আফিং খাইতে বাধ্য করিয়া প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড আয় করিয়াছে, যাহা আমাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। (২) শান্তি স্থাপন, রেল বিস্তার ও ইংল্যাণ্ড এদেশের লোকদিগকে যে ব্যবসায়ের প্রেরণা দিয়াছে তাহাতে অনেক বেশি জমি চাষ হওয়াতে কাঁচা মালের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। (৩) ব্রিটিশ শক্তি আমাদের রক্ষকরূপে থাকাতে বিদেশীদের দ্বারা এদেশ আক্রমণের ভয় দূর হইয়াছে। এই সব বিবেচনা করিলে আমার মনে হয়, ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে অনেকে যেমন ভাবেন তেমন আর্থিক ক্ষতি আমাদের হয় নাই। আমি আমার এ মত প্রকাশ করিতেছি কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে, কারণ এবিষয়টি লইয়া আমি চর্চা করি নাই, তাই এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তবু আমি মত প্রকাশ করিতেছি এজন্য যে ইংল্যাণ্ডের কোনও ক্ষতিই আর কেহ স্বীকার করেন নাই।

আগের দিনে দেশের টাকা বৃহৎ শহরে গিয়া জমা হইত, যেমন দিল্লী এবং লখনৌতে, এবং সবই সেই সব স্থানের রাজদরবারে অতি জাঁকজমকের সঙ্গে খরচ করা হইত, লোকে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া অবাক হইত। সে এক আজব দৃশ্য। ময়ূর সিংহাসনে মোগল সম্রাটের সম্মুখে প্রধান মন্ত্রী সাষ্টাঙ্গ প্রণত, চারিদিকে যুক্ত করে পারিষদবর্গ দণ্ডায়মান, জল্লাদ তাহার কুঠার লইয়া বাম পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে। এই সব ঐশ্বর্য্য বিলাসের কথার বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাসে তাহাদের কথা নাই কেন যে, সব কোটি কোটি লোক জমি চাষ করিয়াছে ফসলের বীজ বুনিয়াছে, শস্য ঘরে তুলিয়াছে, কিন্তু চিরকাল অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে? ইংরেজরা এদেশে আসিবার পূর্বে এইসব কোটি কোটি নরনারী বেশি বস্ত্র পরিত কি না, গৃহপালিত পশু তাহাদের বেশি ছিল কি না, গায়ে বেশি সোনা পরিত কি না। আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি যে, কৃষকের খামার বাড়িতে বেশি শস্য থাকিত, কিন্তু তথাপি মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, গত মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে মানুষের যে দুর্দশা হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় তখন মৃত মানুষের মাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তেমনি বীভৎস দুর্ভিক্ষের কথা বার বার বলিয়াছেন কেন? গত শতাব্দীর ভারতীয় কৃষক জীবনের হল-ওয়েল, ভেরেলেস্ট ও কর্তৃপক্ষের বর্ণিত চিত্র যাহার উপর নির্ভর করিয়া বাকি বাংলার সুখী মানুষদের সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত প্রশংসাপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। এ সব পেন্টারদের হাত ভাবাবেগে চালিত হইয়াছিল, এবং সেজন্য তাঁহাদের চিত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারা মোটামুটি একটা সচ্ছলতা দেখিয়া থাকিবেন, যাহা তাঁহাদের দেশের সর্বত্র দরিদ্রদের যে দুর্দশা দেখিয়াছেন, তাহার তুলনায় অনেক ভাল মনে হইয়াছে। তবু আমি বলিতে বাধ্য যে তাঁহাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান অগভীর। অন্ততঃ সে জ্ঞান সমুদ্র উপকূলের ভূভাগেই সীমাবদ্ধ। এই সব অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা বেশি, চাষ করিবার লোকও বেশি। উচ্চ ভূভাগে কৃষিদের রক্তশোষণকারীরা এখানে ততটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু তথাপি একটি মাত্র ফসলের অজন্মায় ১১৭০ সনে যে হৃদয়-বিদারক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া গেল তাহার একটি মাত্র মারাত্মক আঘাতে বাংলাদেশের সমস্ত জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়া গেল। এখনও প্রমাণিত হয় নাই যে, এখন অপেক্ষা আগের দিনে লোকে সুখে ছিল, এবং এখন তাহাদের শস্য-ক্রয় ক্ষমতা যত বাড়িয়াছে, তাহার চেয়ে শস্য পূর্বে বেশি ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় আগের দিন সম্পর্কে আমাদের নির্ভরযোগ্য কোনও লিখিত বিবরণ বা দলিল নাই। ইহাও দুর্ভাগ্যের বিষয়, উপরের শ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তিই যে জাতি নহে এ শিক্ষা এখনও আমাদের হয় নাই। এবং আমরা ভাবিতে শিখি নাই যে, উচ্চ বা নিচ সকল স্তরের প্রত্যেকটি ব্যক্তি জাতির এক-একটি একক উপকরণ। জাতীয় সম্পদ এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি সকলের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই ইহা আমরা এখন দেখিতে পাই না। তবু অধিকাংশ

ইউরোপীয় জাতির তুলনায় আমরা এখনও অনেক বেশি দরিদ্র। এবং ইহার কারণ, যেমন বলা হইয়া থাকে ইংরেজ সরকার আমাদের সোনা রূপা দেশে লইয়া যাইতেছে বলিয়া, তাহা নহে। ইহার কারণ খুঁজিতে হইবে অধঃপতিত এবং স্থবিরত্ব-প্রাপ্ত জাতীয় চরিত্রের মধ্যে। যদি জনপ্রতি বাণিজ্যমূল্য ধার্য দ্বারা কোনও জাতির বস্তুসম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে অন্য জাতির তুলনায় তাহা বিস্ময়কর রূপে কম। ভারতীয় গড় বাণিজ্যমূল্য জনপ্রতি মাত্র ১২ শিলিং, ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ৩১০ শিলিং, ফ্রান্সের ১৬৮ শিলিং, জার্মানির ১৪৫ শিলিং এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌সের ১০৫ শিলিং। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের হিসাবটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় এখন আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং মূল্য। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে আমাদের দেশে যেটুকু উৎপন্ন হয়, তাহা অবুদ্ধিজাত অকৌশলী শ্রমের দ্বারা সাধিত হয়, এবং ইহার সাহায্যে জাতির উপার্জন বিচার করা হয়। আগে যাহা নিপুণ হাতের শ্রম ছিল, এখন তাহা অনিপুণ হাতের শ্রমে পরিণত হইয়াছে। সভ্য দেশসমূহে বিজ্ঞান, শিক্ষণ, এবং নিপুণ হাতের শ্রমকে পালন করিবার জন্য আইনের দ্বারা যে-সব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, ভারতে এখনও তাহা প্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশে গ্রামের কামার বা ছুতোর মিস্ত্রী এবং ক্ষেতের মজুরের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থার কোনও পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই এ কাজের জন্য যেটুকু শিক্ষা দরকার তাহা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা মাত্র, এ কাজের জন্য বিশেষ বুদ্ধিরও দরকার নাই, অর্থব্যয়েরও দরকার নাই, এবং ইহা দ্বারা যাহা উপার্জন হয়, তাহা দৈহিক শ্রমের মূল্য মাত্র। আমরা যাহা চাই, তাহা হইতেছে—মজুরির যথার্থ মূল্য এবং বুদ্ধিকৌশল ও ব্যয়সাধ্য শিক্ষা দিবার আয়োজন এবং বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইলে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কিছু মূলধন। দেহ ও মন ও তৎসহ কিছু মূলধন ব্যবহার করিয়া কিভাবে অধিক উপার্জন করা যায় সেই শিক্ষা লাভ করা বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আগে যে সব কৃত্রিম বাধা বুদ্ধি ও শিক্ষার দ্বারা লাভজনক কাজ করার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহা কার্যতঃ দূর হইয়াছে। আগে বৃত্তিগত জাতিভেদ মান্য করা হইত, এখন তাহা দ্বারা গৌরব বিচার করিবার প্রথা দূর হইবার মুখে। এখন বৃত্তি যাহাই হউক, শিক্ষা ও ঐশ্বর্য দ্বারাই গৌরব অগৌরব বিচার হইতেছে। আমরা পরিবর্তন-বিরোধী জাতি হইলেও ক্ষমতা লাভ ও আরাম ভোগের ইচ্ছা সব সময়েই আমাদের মনে ছিল, যেমন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মনে আছে। এই ইচ্ছাই সামাজিক বাধাকে উল্‌টাইয়া দেয় যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তি ও উচ্চকাঙ্ক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাকে ঘৃণা করা শিক্ষা দেওয়া ধর্ম, পৃথিবীকে যেভাবে ভণ্ড বানাইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত মন আমার এই মন্তব্যে হাস্য করিবেন, কিন্তু আমি বাস্তব জগতের কথা বলিতেছি, আত্মিক উচ্চস্তরের মানস বিষয় নহে, কারণ বাস্তবের ঊর্ধ্বে তাহার বাস। ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ, এবিষয়ে শাস্ত্রের আইন কঠোর, অথচ পরশুরাম তাঁহার কুঠারের সাহায্যে একুশবার উদ্ধত যোদ্ধা জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন—প্রতিবাদকারী স্ত্রীলোক বা শিশু কাহাকেও বাদ রাখেন নাই। অতঃপর দ্রোণের ন্যায় এক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ উত্তম অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে অন্যায়ের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম উল্লেখিত ব্যক্তিকে দেবতা পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে হিন্দুজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দেওয়া হইয়াছে। কেরানির কাজ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে হীন বৃত্তি, কিন্তু আজ হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে কি করিতে দেখিতেছি? অন্যান্য অনেক নিষিদ্ধ বৃত্তির কথা আর তুলিয়া লাভ নাই। দেখা যাইতেছে গৌরব এখন তাহার উচ্চ আসন হইতে নিচে নামিয়া আসিয়াছে, এবং লাভজনক শ্রমের জন্য বুদ্ধি, শিক্ষা এবং মূলধন নিয়োগের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এদিকে মনোযোগ এখনও অতি অল্পই দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে দেশে যে

সব আন্দোলন হইতেছে তাহার অধিকাংশই স্পষ্ট উদ্দেশ্যহীন। ভারতীয় চিত্ত যাহা অপ্রাপ্য, তাহাই পাইবার জন্য মাতিয়া উঠিতে ভালবাসে। যাঁহারা বলেন পাশ্চাত্ত্য চাকচিক্যের অগভীর আবরণের নিচে প্রাচ্য মনোভাবটিই আমাদের মধ্যে প্রবল ভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাঁহারা কিছু অন্যায় বলেন না। আমাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—অব্যবহিতের উর্ধ্বে দৃষ্টিপাতের অক্ষমতা। এই অবস্থায় কোনও জীবন্ত দেহ বাঁচিতে পারে না।

আমরা লাইসিয়াম থিয়েটারে গেলাম। সেখানে তখন "ফাউস্ট" অভিনীত হইতেছিল। মিষ্টার হেনরি আরভিং নামক সুবিখ্যাত অভিনেতা মেফিস্টোফিলিসের ভূমিকায় এবং খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী মিস্ এলেন টেরি মারগারেটের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। থিয়েটার গৃহটি অতি সুদৃশ্য, সম্মুখের দিকে কোরিনথিয়ান ভঙ্গির স্তম্ভ শ্রেণীর উপর গম্বুজ ও ছোট ছোট স্তম্ভ শ্রেণী। ভিতরটা সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত, পাকা শিল্পীর হাতের কাজ। এই গৃহে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসিতে পারে, এবং প্রতি রাত্রির অভিনয়েই পূর্ণ গৃহ, সেখানে তিল ধারণের স্থান থাকে না। রাত্রি ৮টায় অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অভিনয়েই যে দরজা দিয়া পিটে পৌছাইতে হয় সে পথে ভিড়ের আতিশয্যে যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। এইভাবে সন্ধ্যা ৬টা হইতে দর্শকগণ সেখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে। হেনরি আরভিং ও এলেন টেরি—ও তৎসহ মঞ্চে যে সব দৃশ্যাদি দেখান হয় তাহার মনোহারিত্ব প্রতি অভিনয়ে এত দর্শককে আকর্ষণ করে। দৃশ্যপটগুলি প্রকৃতই বিস্ময়কর, বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের জয় সূচিত করে তাহা। আগে যাহা অলৌকিক শক্তি ভিন্ন সম্ভব মনে করা হইত না, তাহা এখন লৌকিক শক্তিতে সম্ভব হইয়াছে। সহস্র শিখা আগুনের মাঝখানে মেফিস্টোফিলিস বসিয়া আছে এবং আগুনকে সে তাহার সর্বাপেক্ষা বন্ধুভাবাপন্ন ভৃত্যের ন্যায় আদর করিতেছে। শয়তানের রন্ধনশালাগুলি দেখা যাইতেছে, যেখানে অভিশপ্ত কঙ্কাল প্রেতদেহগণ ঘৃণ্য বস্তু সকল পাক করিতেছে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে শয়তানের তরবারিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হইতে লাভা ও জ্বলন্ত দ্রব্যাদি নির্গত হইতেছে। ডেভিল-নৃত্য। অবশেষে স্বর্গ হইতে দেবকন্যাদের আবির্ভাব ও তাহাদের মৃত মার্গারেটের দেহের উপর হস্ত বিস্তার। সব চিত্তাকর্ষক। ড্রুরিলেন থিয়েটারে আমরা 'হিউম্যান নেচার' (মানবচরিত্র) অভিনীত হইতে দেখিলাম। ইহার দৃশ্যে প্রাতঃকালীন সূর্য্যোদয়, রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্র, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ, সুদানের পর্বত, ট্র্যাফালগার স্কয়ার খুব সুন্দর ভাবে দেখান হইল, খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। শোনা গেল "ফাউস্ট" অভিনয়ের জন্য মঞ্চে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মিস্টার আরভিং-এর ২০,০০০ পাউণ্ড (৩ লক্ষ টাকা) ব্যয় হইয়াছে। আলহামব্রা থিয়েটারে বহু নর্ত্তকী একসঙ্গে নাচিতে দেখা গেল। মনে হয় সংখ্যায় তাহারা এক শতের অধিক হইবে। প্রকৃত সংখ্যা ভুলিয়া গিয়াছি। এটি রূপকথার জগৎ, ভৌতিক এবং চোখ ঝলসান এ রকম আমি আর দেখি নাই। এই সময় স্যাভয় থিয়েটারে 'মিকাডো' অভিনীত হইতেছিল। আমার মনে হয় এটি ভারতীয় থিয়েটারে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ভারতীয় থিয়েটারে ইহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। এটি অক্সফোর্ডেও দেখিলাম। কিন্তু লণ্ডনের ন্যায় চমৎকার হয় নাই।

ক্রমশঃ

পুণা আশ্রমে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরামদাস গুরুমন্ত্র নেওয়ার পরে ভিক্ষু পরিব্রাজক হয়েছিলেন—কুমারিকা থেকে কাশ্মীরে সর্বত্রই পেয়েছিলেন "রাম"-এর করুণস্পর্শ। (রাম বলতেন তিনি কৃষ্ণকে, রাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন এই উপলব্ধির অনুজ্ঞায়।)

দিনে দিনে কত রকমের অভিজ্ঞতা উপলব্ধিই যে তাঁর হ'ত—কত রকম দর্শন, জ্যোতি, ভাবসমাধি, পূর্ণ সমাধি—সর্বোপরি, নিত্যানন্দ! আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "আপনাকে ধন্য উপাধি দিয়েও জিজ্ঞাসা করতে সাধ যায়—আপনার মনে সংশয় বা বিষাদ কখনো আসত না?" উত্তরে তিনি হেসে বলেছিলেন: "সংশয় আসবে কী ক'রে—রাম-এর করুণালাভের পরে? তবে কখনো কখনো নীরসতা আসত। তখন রামদাস সব ছেড়ে করত বিজন কোনো শৈলচূড়ায় বা গুহায়—সঙ্গে সঙ্গে অশ্রান্ত জপ। অমনি সে ফিরে পেত হারানিধিকে—যার নাম নামানন্দ। তখন রামদাস ফের ফিরত লোকালয়ে—এ-আনন্দ সবাইকে বিতরণ করতে—তার নামানন্দের ছোঁয়াচে তাদের মনেও প্রায়ই জেগে উঠত সে-আনন্দের রেশ। আর সে যে কী আনন্দ রাম, কী বলব? একটা অঘটনের কথা বলি শোনো। একবার এক পাহাড়ে ব'সে নাম করতে করতে রামদাসের চোখের সামনে সূর্য ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আনন্দ—তন্ময় সমাধি। সমাধি ভাঙলে রামদাস দেখল—এক গোখরো সাপ তার পায়ের বুড়ো আঙুল চাটছে। রামদাস তাকে বলল: 'এ কী রাম? তোমার কিসের অভাব যে তোমার দাসের বুড়ো আঙুল চাটছ?' ধমক খেয়ে রামের সলজ্জে প্রস্থান—হা হা হা!"

সদানন্দ আত্মভোলা প্রেমিক পুরুষ তিনি। যেমন সরল তেমনি রসাল। কথায় কথায় হাসতেন, হাসাতেন। কেউ জেরা করতে এলে তাকে জখম করতেন রসিকতার তীরন্দাজিতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন ভগবান্ সাবিত্রীকে বলেছেন:

"Those who have looked on me shall grieve no more."

দুঃখের পেয়েছে পার—পায় যারা দর্শন আমার।

শ্রীরামদাস ছিলেন একথার প্রমূর্ত প্রমাণ। দুঃখ তাঁকে পেতে হয়েছে অগুন্তি বার কিন্তু তাঁর আনন্দকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। আমাকে বলেছিলেন (আমার ইংরেজীতে লেখা একটি স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত করছি—অনুবাদে):

"রামদাস যখন ভারতে পরিব্রাজক হয়ে দেশে দেশে চলেছে যেন হাওয়ায় উড়ে—তখন একবার পায়ে কাঁটা ফুটে তার সমস্ত পা বিষিয়ে উঠল। দেহে অসহ্য যন্ত্রণা কিন্তু রামদাস সমান আনন্দে নাম জপ করে চলল। অনেকেই দেখতে এল এ আশ্চর্য্য দৃশ্য—পায়ে এত বড় ফোড়া—প্রায় একটা আপেলের মত—ফুলে নীল হয়ে উঠেছে, অথচ এ অদ্ভুত সাধু সারা রাত ঘুমোতে না পেরেও সানন্দে সমানে জপ ক'রে চলেছে 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।'

"অথ এলেন গ্রামবাসীদের এক নাপিত। তিনি রামদাসের ফোড়া এক ঘা-য় ক্ষুর দিয়ে কেটে দিলেন। সবাই দেখে শিউরে উঠল—কিন্তু রামদাসের ফোড়া কাটার বেদনা রাম-এর করুণায় রূপান্তরিত হ'ল পরমানন্দে—শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম!

"আর একবার রামদাস রাতে এক গাছতলায় শুয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখে, এক কাটজর্জ'র লোমহীন কুকুর (mangy dog) তার নাকের কাছে লেজ পেতে ব'সে। রামদাস উঠে তার দুর্গন্ধ পেল না—পাবে কেমন ক'রে? সে যে দেখতে পেল সেই ঘেয়ো কুকুরের মধ্যে সাক্ষাৎ রামকে!"

রামদাস আমাকে গভীর স্নেহ করতেন ব'লেই আমাদের দীন কুটিরে এসে তিনদিন ছিলেন ভিড়ের মধ্যে। সেসময়ে দেখতাম মাতাজি কৃষ্ণাবাই তাঁকে কী ভাবে চোখে চোখে রাখতেন। ইন্দিরাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন প্রথম দিনই। বসতেন আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে রামদাসকে আগে নিজে হাতে খাইয়ে। ঠিক যেন মা ও শিশু। রামদাস প্রস্থান করার দিন বলেছিলেন কৃষ্ণাবাইকে দেখিয়ে: "Ramdas is merely a talker, Mataji is the doer!" শুনে কৃষ্ণাবাই হেসে হাত ধুয়ে বলেছিলেন: "বা-হ্!" কী সুন্দর ও পবিত্র ছিল এ-গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। ইন্দিরাকে শিষ্যা পেয়ে আমি রামদাস ও মাতাজির সম্বন্ধের মাধুর্য যেন আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

রামদাস ভালোবাসতেন হাসতে হাসতে কথা বলতে ও গান শুনতে। আমাদের ভজন গানে তাঁর চোখ চিক্ চিক্ ক'রে উঠত; ইন্দিরা মাতাজির গুণকীর্তনে একটি কবিতা লিখেছিল, প'ড়ে তিনি ইন্দিরাকে স্বভাবকবি ব'লে সনাক্ত করেছিলেন। তাঁর আশ্রমের Vision নামে মাসিক পত্রিকায় একটি নিবন্ধে রামদাসের ভাষা ছিল:

"Ramdas has met her (Indira) twice or thrice. She is an inspired poet. Here is her poem (on Mother Krishnabai):

"Mother, I bow to you
I do not know whether you are the Divine Mother:
But that all orphaned hearts feel the love of a mother in you—I know.
So, in that faith of a child, I bow to you."...

পুরো কবিতাটি মাতাজির স্বর্ণগ্রন্থে সাদরে ছাপা হয়েছিল।

এর অনুবাদ—অমিত্রাক্ষরে:

আমি মা, জানি না—তুমি জগন্মাতা কি না।
জানি শুধু এইটুকু—যত মাতৃহারা
শিশুরা তোমার স্নেহধারে নিত্য পায়
জননীর স্নেহস্বাদ, তাই মা, শিশুর
সরল বিশ্বাসে করি প্রণাম চরণে।

কিন্তু মাতাজি কখনো কোনো ভাষণ দিতেন না, ছায়ার মতন থাকতেন গুরুর পিছনে—অনন্যা সেবার্থিনী, গুরুর চরণে শরণাগতা। রামদাস আমাদের কাছে একাধিকবার বলেছিলেন যে মাতাজি আত্মিক উপলব্ধিতে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন। মাতাজি শুনে হেসে উড়িয়ে দিতেন, বলতেন: "শোনো কেন ওঁর কথা—ষাট বছর আগেও যে-শিশু ছিলেন আজও সেই শিশুই আছেন।"

মন্দিরে সকালে সভা বসত ন'-টায়—দশটা সাড়ে দশটায় ভাঙত। প্রথমে আমি গাইতাম, পরে রামদাস হয় নিজে থেকে কিছু ভাষণ দিতেন, নয় জিজ্ঞাসু ধর্মার্থীদের প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতেন সাবলীল ইংরেজীতে। বারবার একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে তাঁর ক্লান্তি আসতে কখনো দেখি নি কিন্তু মাতাজি সাড়ে দশটায় তাঁকে নিরস্ত ক'রে টেনে নিয়ে যেতেন শয়নকক্ষে। তারপরে সন্ধ্যায়ও ঐ ব্যবস্থা—সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা আমি গাইতাম, তারপর প্রশ্নোত্তর পর্ব। সব শেষে সবাই মিলে নাম গান, হয়—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ...না হয় শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। নামগানে যে এত আনন্দ ঝরে কে জানত?

১লা মার্চ পূজ্য অতিথি যুগলের প্রস্থানের দিন আমরা সবাই ম্রিয়মাণ। আমি গাইলাম সকালে ইন্দিরার সঙ্গে তার বাঁধা রামদাস কৃষ্ণ বাই স্তব :

মনে পড়ে LIFE DIVINE-এ শ্রীঅরবিন্দের বাণী :

"For without experience of pain we would not get all the infinite value of the divine delight of which pain is in travail."

ভাবার্থ : বেদনা কী বস্তু না জানলে সে-দিব্য আনন্দের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ত না যার প্রসূতি দুঃখ ব্যথা শোক তাপ।

উপনিষদে পাই : "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" রামদাস পালোয়ান ছিলেন না। নানা অসুখেই কষ্ট পেয়েছেন। সমস্ত দাঁত তাঁকে তোলাতে হয়েছিল—দারুণ "পাইয়োরিয়া" অসুখে। নরম শাকসবজী কলা দুধ—বিশেষ ক'রে দুধ—ছিল তাঁর মুখ্য পথ্য। মাতাজি কৃষ্ণাবাই তাঁকে প্রতিপদে না আগলে রাখলে তাঁর অকালমৃত্যু হতেই হ'ত একথা রামদাস আমাদের একাধিকবার বলেছিলেন ভানলাভিন কটেজে। কি ভাবে মাতাজি তাঁকে রক্ষাকবচের মতনই রক্ষা করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছিলাম যখন পুণায় সাধু ভাসোয়ানির "মীরা স্কুল" থেকে এলেন দুই ভদ্রলোক : রামদাসকে যেতেই হবে সন্ধ্যায় সেখানে ভাষণ দিতে। শিশু-সরল রামদাস একগাল হেসে বললেন : "যাব বৈকি—" অমনি সভামাঝে (ঘর লোকে ভর্তি) কৃষ্ণাবাই উঠে বললেন : "অসম্ভব। উনি স্বভাবে শিশু—সব ডাকেই সাড়া দেন। কিন্তু পুণার দারুণ শীতে সন্ধ্যায় বেরুলে ওঁর অসুখ করবে। আপনারা ওঁকে নিয়ে যেতে পারেন বিকেল চারটেয়। কিন্তু সন্ধ্যায় ওঁকে আমি বাইরে বেরুতে দিতে পারি না। দুঃখিত—কিন্তু নরুপায়।"

আরো অনেক কিছুই বলার আছে। কিন্তু তাহলে স্মৃতিচারণ হয়ে দাঁড়াবে মহাভারত তাই এবার হরি কৃ মন্দিরের অধ্যায়ে ফিরে আসি।

বন্দনা লো রামদস, বন্দনা লো মেরী।
বালরূপ হৈ অনূপ প্রীত-রীত তেরী।
নামরতন তরসে প্যাসে জগকো দেনে আয়া :
"জয় শ্রীরাম জয় জয় রাম, জয় জয় রাম"—গায়া।

পরে আমি এর অনুবাদও গাইতাম রামদাসের দেহান্তের পরে :

করি হে প্রণাম তোমায় রামদাস, অশ্রুজলে।
ছিল যে সরল শিশু শ্রীরামের ধরাতলে।
জগতে নামরতন বিলাতে এসেছিলে :
"জয় রাম জয় জয় রাম"—তুমি তাই গেয়েছিলে।
কে রাজা, কে কিঙ্কর? কোথা ভেদ আপনপরে?
বন্ধু বৈরী সবায় ডাকিলে প্রেমভরে।
প্রতি নামনিশ্বাসে নেয় নিশ্বাস রাম নিখিলে :
"জয় রাম, জয় জয় রাম"—তুমি তাই গেয়েছিলে।
চরণের ছোঁয়ায় তোমার ধন্য এ-ধরণী!
ধন্য ভক্ত তোমার, কৃষ্ণাবাই জননী!
রামদাস হয়ে রামের লীলাদোল উচ্ছলিলে :
"জয় রাম, জয় জয় রাম"—তুমি তাই গেয়েছিলে।

শেষ আমি তাঁকে ধরলাম যাবার আগে, তাঁর শ্রীমুখে শুনতে চাই তাঁর বিশ্বরূপ-দর্শন। (রামদাস সম্ভবতে কৃষ্ণদর্শনকে বিশ্বরূপদর্শন নাম দিতেন।)

রামদাস তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলতেন সরল আনন্দেই—আর কিছু রেখে ঢেকে বলতেন না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করবামাত্র বললেন হেসে : "তথাস্তু। শোনো।

"সে-সময়ে রামদাস অরুণাচল শৈলমূলে একটি গুহাতে অবিশ্রান্ত গুরুমন্ত্র জপ করত। সকালে কেবল একবার বেরিয়ে একমুঠো চাল সিদ্ধ করে কিছুটা খেয়ে বাকিটা ছড়িয়ে দিত বাইরে—কাঠবিড়ালীরা এসে লুপে নিত পরমানন্দে।

"একদিন কে যেন বললে রামদাসকে রামন মহর্ষিকে প্রণাম ক'রে আসতে। রামদাস সানন্দে তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে বলল—সে শুধু তাঁর আশিসার্থী। মহর্ষির করুণভরা দৃষ্টিতে রামদাসের দেহ

আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—মিলল মহর্ষির দৃষ্টি প্রসাদ, রোমাঞ্চ হবে না? তারপর ব্যস—সোজা গুহায় সাধনপীঠে বসে কেবল নামজপ, অশ্রান্ত নাম—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কয়েকদিন বাদে হঠাৎ মুরলীধর কৃষ্ণের ঘুরে ঘুরে নাচ রামদাসের চারদিকে—বাঁশি বাজিয়ে। আহা, সে কী প্রাণকাড়া নৃত্য ও বাঁশি!"

একদিন জিজ্ঞাসা করল: "কৃষ্ণকে আপনি সমাধিস্থ অবস্থায় দেখলেন, না খোলা চোখে?"

"খোলা চোখে—যেমন রামদাস তোমাকে দেখছে এখন। কিন্তু এ-ক্ষণনৃত্যে রামদাসের মন তুষ্ট হবার নয়—সে নাচ থেমে গেলে রামদাস আবার যে-তিমিরে সে-তিমিরে। তাই রামদাস প্রার্থনা জানাল তাঁকে যে সে শুধু একটি বর চায়—সর্বদা প্রতিমুহূর্তে সর্বভূতে কৃষ্ণ দর্শন। তিনি হেসেই হাওয়া।

"কিন্তু রামদাস কি ছাড়বার পাত্র?—ধরল ফের নামজপ। এইভাবে তিন সপ্তাহ কাটলে হঠাৎ হল তার বিশ্বরূপ দর্শন: যেদিকে সে তাকায় রাম—শুধু রাম—গাছ পাতা তৃণলতা মাটি পাথর বন পাহাড় ধুলো বালি... সর্বত্রই রাম, শুধু রাম—আর এমন রাম যে চিরদিনের সাথী, ক্ষণিকের অতিথি নয়।

সামনে এক গাছের গুঁড়ি—রামদাস জড়িয়ে ধরল। কিন্তু গুঁড়ি তো নয়—সাক্ষাৎ রাম। এক পথিক যাচ্ছে, রামদাস তাকে গিয়ে আলিঙ্গন করল 'রাম রাম রাম' ব'লে। সে তো প্রথমে ভয়েই সারা—কে পাগল? কামড়ে দেবে কি না কে জানে? কিন্তু পরে যখন দেখল পাগলের মুখে একটিও দাঁত নেই তখন নিশ্চিন্ত"—বলে রামদাসের সে কী শিশুসরল হাসি!"

আমরা একে একে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম চোখের জলে। আমি বললাম: "ঠাকুর! আপনি যে আমাদের ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হ'য়ে এসেছেন সে তো শুধু কৃপা করতে। নৈলে আমাদের কী আছে বলুন যা দিয়ে আপনাকে বরণ করতে পারি? বিন্দু সিন্ধুকে কেমন ক'রে ডাকবে?

রামদাস আশীর্বাদ ক'রে হেসে বললেন ইংরেজীতে—আমি টুকে নিয়েছিলাম আমার ডাইরিতে:

"Not drops. You have dug a sweet lake of love's pure cream here which is so inviting and cool that I have grown hoarse, don't you see, dipping into it again and again."

(টীকা: তাঁর স্বরভঙ্গ হয়েছিল ধর্মার্থীদের অশ্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে। রামদাস কী মধুর ঢঙে তাদের এ-অত্যাচারকে বরণ করে নিলেন মাখনের মধ্যে ডুব দেওয়ার উপমাপ্রয়োগে।)

তাঁকে একবার বলেছিলাম: "আপনার চিরপলাতক রামকে একবার বলবেন—আমাকেও দেখা দিতে।"

রামদাস উত্তরে বলেছিলেন: "সাধুর কাছে কি এ-নিবেদন করার দরকার হয়? রামদাস রামকে বলেছে আগেই।"

"কী বললেন তিনি?"

"বললেন—তিনি আসবেন আসবেন আসবেন গো।"

জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধন কাকে বলে সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেন কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ, কেউ জ্ঞানযোগ, কেউ ভক্তিযোগ। এ-যুগের একটি পরমা বাণী জীবসেবা। রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন। (তীর্থংকর দ্রষ্টব্য): "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছে মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে, এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।"

একদিনের কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন শান্তিনিকেতনে কবির অতিথি। কথায় কথায় কবি বললেন: "আজ নন্দলাল (চিত্রী) আমাকে জিজ্ঞাসা

করেছিল : "প্রতি যুগের এক একটি নিত্য আদর্শ থাকে বা গ'ড়ে ওঠে। এ-যুগের আদর্শ কী মনে হয় আপনার?' তাতে আমি উত্তর দিয়েছিলাম : 'মানুষ—যার মধ্যে ভগবান্ নেমেছেন। উপনিষদের ভাষায়: এষ দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। অর্থাৎ দেবতা যে-মাটির মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন তাকে ভালোবাসতে পারলে তবেই পরমা সিদ্ধি।"

কালীদার জীবনেও যে এ-বাণীর ঝঙ্কার বেজে উঠেছিল আমরা দেখেছি। রামদাসের জীবন একটু আলাদা। তিনি একদিকে মাটির মানুষ অন্যদিকে চিন্ময় কৃষ্ণকে অর্ঘ দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মধ্যেও পাই এই দুমুখী সাধনা : একদিকে দেবজ্ঞানে দরিদ্র নারায়ণ জীবসেবা :

বহুদিকে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

অন্যদিকে জীবন সংগ্রামে সব বাধা জয় ক'রে বরণ করা যিনি প্রতি হৃদয়ে আসীন : শ্যামা, শ্যাম বা শিব। যথা,

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ভরাক তোমা।

চূর্ণ হোক স্বার্থসাধ মান, হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে শ্যামা।

রামদাসের মধ্যেও দেখতে পাই এই দুমুখী সাধনা : পরাভক্তি লাভের ও জীবসেবার। তাই তাঁর কাছে আসত আর্ত তথা জিজ্ঞাসু। (অর্থার্থীও আসত কিন্তু মাতাজি তাদের আমল দিতেন না। বলতেন যারা, "শুধু সংসারী জীবনে দিব্য আত্মকেন্দ্রিক জীবন বরণ ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চেয়ে ভগবানকে ডাকে তাদের ভোগের রথের চাকায় তেল দিতে রামদাসের আনন্দাশ্রমে তাদের স্থান নেই।"

বলা বাহুল্য আমার ভালো লাগত রামদাসের এই মানবপ্রীতি। কিন্তু তাঁর স্নেহে আমরা সবাই স্নান করে শুদ্ধ হলেও জানতাম তিনি চান এই আত্মশুদ্ধিকে অর্ঘ ক'রে আমরা নিবেদন করব রামকে। তাই মানবপ্রীতি তাঁর কাছে মান্য হ'লেও বরেণ্য ছিল সব আগে ভগবৎ-প্রীতি, যার তিনি নাম দিতেন পরা ভক্তি।

কিন্তু তা ব'লে তিনি মানুষের অপমান সইতেন না। ডানলাভিন কটেজে একদিন তিনি বলেছিলেন তাঁর জীবনের একটি কাহিনী—বলি।

রামদাস বলেছিলেন : "একদা এক গুহায় রামদাস এক সাধুর পাশে ব'সে ধ্যান করছিল। সাধুজি পূজা করছিলেন সামনে রাখা একটি কৃষ্ণমূর্তির। হঠাৎ এক হরিজন এক ঝুড়ি ফলফুল নিয়ে এল গুহায়। সাধু তো রেগে আগুন, বলল : 'দূর হ অচ্ছুৎ। এখানে ঠাকুরের পূজো হচ্ছে জানিস না?' সে কেঁদে ফেলল। রামদাস উঠে কৃষ্ণমূর্তিটি ছোঁ মেরে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলল সাধুকে : 'ঠাকুর এসেছিলেন হরিজন রূপ ধ'রে। তাকে যখন তাড়ালে তখন ঠাকুরকেও তাড়াও।'

তাঁর মধ্যে যে আচারিপনার লেশও ছিল না, এই অসমসাহসিক দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। মন্তব্য অনাবশ্যক।

আমার তাই মন ভরে উঠত ভাবতে যে, কৃষ্ণকে পূজা ক'রে তিনি সত্যিই সর্বভূতে কৃষ্ণদর্শন করেছিলেন, নৈলে এ-হেন রোমহর্ষক অনাচার করতে সাহসী হতেন না কখনই। তাই তাঁর নানা ভাষণেই মেলে এই নিশ্চয়োক্তি যে, নির্বিকল্প সমাধিই মানুষের সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি নয়, সহজ সমাধিই সিদ্ধির মুকুটমণি, কেন না সহজ সমাধির ভূমিতে যিনি পৌঁছেছেন তিনি নির্বিকল্প সমাধির অনুভূতিকে পান তাঁর জাগ্রত চেতনায়।* তাঁর সর্বভূতে কৃষ্ণদর্শনের আমি অন্তত এই ভাষাই করেছিলাম —যদিও আমার আক্ষেপ হ'ত : "আহা, যদি তিনি কবি হতেন তাহলে এ-বর্ণনা আরো প্রাণস্পর্শী হ'ত।" আমাদের মন্দিরে তাঁর পদার্পণের আগে ইন্দিরা একটি গান বেঁধেছিল যেন আমার এই প্রতিপাদ্যটিকে প্রতিপন্ন করতেই। গানটি ইন্দিরা ভাবমুখে আরম্ভ করেছিল সমাধিতে শোনার পর—ভুজঙ্গপ্রয়াণ ছন্দে (পঞ্চমাত্রিক)। তারিখ ৩০এ জুন ১৯৫৬—অর্থাৎ রামদাসের আসার ঠিক আট মাস আগে। গানটি ভাবাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে ব'লে শুধু আটটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে আমার পুরো

অনুবাদটি পেশ করি। ইন্দিরা আবৃত্তি করেছিল :

জিধর মৈনে দেখা তুম্হে নাথ পায়া।
তু হর রঙ্গ হর রূপমে শ্যাম আয়া॥
তুম্হে দেখা আশা কি কলিয়োঁ মে খিলতে।
নিরাশাকে কাঁটো মে তুম হী হো মিলতে।
হরষমে অধর পর হো মুসকান বনতে।
তুম্হী বেদনাকে নিঠুর বাণ বলতে।
মিলা তেরা সুর হী হৈ জো রাগ পায়া।
তু হর রঙ্গ হর রূপমে শ্যাম আয়া॥......

....

যেথাই আমি তাকাই, দেখি তোমায় দুনয়নে।
প্রতিটি রঙ রূপেই ওঠো ঝলকি' এ-ভুবনে॥
আশার কলি ফুটিলে আনে তোমারি তো আভাষ,
নিরাশাকালো কাঁটার বুকে তোমারি বিলাস।
অধরে মৃদু হাসিতে তুমি ওঠো মঞ্জরিয়া।
বেদনাবাণে রক্ত ঝরে তোমায় উছলিয়া।
প্রতি রাগিণী করে আলাপ তোমারি মুর্ছনে।
প্রতিটি রঙ রূপেই ওঠো ঝলকি' এ ভুবনে॥
গগনে প্রতি তারার দীপ ধরে তোমারি বাতি,
ধরার সাথে চাঁদের যবে রাঙে মিলন রাতি।
স্নিগ্ধ সমীরণে তোমারি পাই যে পরশন।
ঘনালে ঘনঘটা সেথাও দাও গো দরশন।
বন্ধু অরি মাঝে তোমারি উদয় খনে খনে।
প্রতিটি রঙ রূপেই ওঠো ঝলকি' এ-ভুবনে॥
জানি গো তুমি নিখিলে রাজো প্রতিটি কণিকায়,
তবু আমার অন্তরে আনন্দছবি ভায় :
অঙ্গে পীত অম্বর শ্রীকণ্ঠে দোলে মালা,
চরণে বাজে নূপুর, মরি মরি মুরলীওয়ালা।
মীরার মন মজালে তুমি কান্ত হে কেমনে?
যেথাই মাথা নোয়াই নমি তোমারি শ্রীচরণে।

এরপর রামদাসের সঙ্গে দুএকটি পত্র বিনিময় হয়েছিল শুধু একটির কথা বলেই এ-পর্বের সমাপ্তি টানব।

আমাদের মন্দিরে একদিন কথায় কথায় একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে: "আপনি এবার বিশ্বভ্রমণে শুনেছি নানা ভয়ার্তকেই বলেছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না। গুজবটি কি সত্য?"

রামদাস বলেছিলেন: "হ্যাঁ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না।"

তিনি আনন্দাশ্রমে ফিরে গেলে আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলাম এসম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে। উত্তরে তিনি আমাকে লিখেছিলেন: প্রিয় রাম, রামদাস ওদেশে সত্যিই বলেছিল সবাইকে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না। একথা সে বলেছিল রামেরি প্রেরণায়। তাই তুমি এ-বাণীকে ঐশী বাণী—revelation—বলে গ্রহণ করতে পারো।

"তুমি লিখেছ—আমাদের সাহচর্যে তোমরা আনন্দ পেয়েছিলে। আমরাও তোমার ও ইন্দিরা দেবীর সাহচর্যে বিপুল আনন্দ পেয়েছিলাম হরেকৃষ্ণ মন্দিরের পুণ্য আবহে স্নান ক'রে। সে স্মৃতি চিরদিনই জাগবে আমাদের মনে।

"রামদাসের জন্মদিন? ১০ই এপ্রিল ১৮৮৪। সে সন্ন্যাস নেয় ২২ এ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে।

"তোমাদের হৃদয় যেন কৃষ্ণভক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে—যেন তাঁকে তোমরা দেখতে পাও সবখানেই। কোথায় তিনি নেই বলো—এ-আশ্চর্য দেবতাটি?

"আমাদের স্নেহাশিস নিও
একান্ত তোমাদেরই রামদাস।"

(এ পরম ভাগবতের তিরোধান ২৫ জুলাই ১৯৬৩)

---

* তোমরা বিন্দু কে বলল? তোমরা এখানে একটি নির্মল প্রেমনবনীর সরোবর সৃষ্টি করেছ—এত লোভনীয় ও স্নিগ্ধ যে বার বার ডুব দিতে দিতে আমার স্বরভঙ্গ হয়ে গেছে, দেখছ না?

* রামদাস-এর আশ্রমের পত্রিক VISION, September 1971 থেকে "Papa Answers"—পরিশিষ্টে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

ইস্‌লামী বৈশিষ্ট্য ও বাঙালী মনীষা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

লেখাটায় নামকরণ ও ভাবটা বিবেকানন্দের উক্তি (ইসলামী দেহ ও বেদান্তের মস্তিষ্ক) থেকে নেওয়া।

পূর্ব বাঙলা স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে নবজন্ম লাভ করেছে।

আমরা পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ অবাক্ হয়ে দেখছি। আর মনে মনে এবং প্রকাশ্যেও কথামালার সেই গল্পটার (সোনার কুটীর) মত ওঁদের কৃতিত্ব ও খ্যাতির অংশ নেবার কথা ভাবছি।

কিন্তু আজকের পশ্চিম বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত চীন-রুশ-গান্ধী জনসঙ্ঘ প্রমুখ নানা মতবাদী পরোক্ষে ক্ষমতা-ভোগ-লিপ্সু বাঙালীরা কি ঐ নব জাগ্রত ইসলামী দেহে নতুন "বাঙালী" মণীষা জাগ্রত ঐ নতুন বাঙালী জাতি? যাদের শতকরা ৯৫ জনই নিরক্ষর শৌর্য্যবীর্য্যের খ্যাতিহীন অন্নভোজী ক্ষীণকায় শস্ত্রবিদ্যায়ও শিক্ষিত নন, তাঁরা কোন্ ঐক্যমন্ত্রের বলে কোন্ দেশমাতার আহ্বানে সব ভুলে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভেদ জ্ঞান 'ইসলাম সভ্যতা ও ধর্ম প্রচার' কথা ভুলে এমন এক হয়ে গেলেন। যাঁরা সত্য সত্য 'ইসলামের মূলতত্ত্ব' 'ভেদাভেদহীন মানবতা' 'আমার কাছে সব মানুষ সমান' 'তিনি ইচ্ছা করলে সব মানুষকেই এক ধর্মীয় করতে পারতেন, তা করেন নি' কোরানের সত্য বাণীর সন্ধান পেয়ে নতুন করে কোরানের মর্মকথা উপলব্ধি করে জগতে আবার নতুন করে একটি স্বাধীন মত ও আদর্শ ও স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করলেন। (কাজী আবদুল ওদুদ 'কোরআন শরীফ' থেকে।)

নিশ্চয়, "বাঙালী মনীষা আর ইসলামী মানবতাবাদই" এর মূলে আছে। কিন্তু শুধু ধর্ম নয়, শুধু মনীষা নয়, শুধু দেশপ্রেম নয়,—শুধু ভাষা-প্রেমও নয়—সব মিলিয়ে এই পূর্ব বাঙলার মানুষের মনে যেন আশ্চর্য্য ভাবে জেগে উঠছে—তাঁদের বাঙালী মানসে প্রতিভাত হচ্ছে সেই আজ থেকে দুশো বছর আগের এক আশ্চর্য্য বাঙালী মনীষীর, রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। যাঁর শেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেই জাগরণের, সেই আবির্ভাবের সময়ে বাঙলার ইসলাম ধর্মী-সম্প্রদায়ের এই "দেশ ভাষা-ধর্ম-জাতি মনীষা" এমন করে সেদিন সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি; আজ কিন্তু সেদিনের সেই বাঙালী ইসলামী বাঙালী সম্প্রদায়ই আমাদের আদর্শ ভ্রষ্ট অন্য বাঙালী সম্প্রদায়ের সম্মুখে নতুন করে সেই প্রায় নির্বাপিত শিখাটা জ্বেলে দিয়েছেন 'ইসলামী দেহে বাঙালী মণীষার আলোকে। এবং তাই তাঁদের কাছে আজকের আমাদের চেতনা জাগানোর ঋণ অপরিশোধ্য। তবু স্মরণীয়, আজ শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র আমার অন্যতম গুরু।"

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

* * *

প্লেন দিল্লীর এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছতেই জয়তী দেখতে পেল অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে।

'মুকুট অসুস্থ নয় তো?' জয়তী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

'একটু ক্লান্ত সে, তাই আমি তোমায় 'দিগন্তে' পৌঁছে দিয়ে যাব, বলে এসেছি মুকুটকে।' অবিনাশ উত্তর দিল।

বাড়ী ফিরে এসে মুকুটকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে জয়তী সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'জয়পুরে কদিন খুবই হৈ চৈ হল' মুকুট বলল।

'প্রদর্শনীতে নানা দেশের শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হল—বেশ আনন্দে কাটল কদিন। রাজস্থানের লোকেরা ফুর্তি করতে জানে, আমায়ও শিখতে হল। যোগ দিতে হল রীতিমত।' মুকুটের কথাগুলি বলা শেষ হতেই দূর থেকে বহু লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—জয়তী বাক্সগুলি খালি করতে করতেই দেখল অতিথিরা ঘরে ঢুকে আসছে। মুকুট তাদের দেখতে পেয়ে বলে উঠল—

'জয়তী দেখো কারা এসেছেন।' জয়তী কাপড় গুলি ফেলে রেখে বারান্দায় বেরিয়ে এল, তার ইচ্ছা করছিল চীৎকার করে বলে সে কাউকে এখন দেখতে চায় না। জিনিষগুলি গোছাবার সময় আর হল না। কাপড় বদল করাও হল না।

'আসুন মিসেস সিং' বলে জয়তী শুষ্ক হাসি হেসে আপ্যায়িত করল।

'মুকুটকে আপনি কত যত্ন করেছেন, উনি বলছিলেন এইমাত্র। কদিন বেশ আনন্দে ছিলেন জয়পুরে।'

মিসেস সিং দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে জয়তীর হাত ধরে সহানুভূতির সুরে বললেন—

'তোমার বাবার কাছে কদিন ছিলে, বড় ভালো লাগল জেনে, এখন তিনি একটু সামলিয়েছেন বোধ হয়। বলছিলাম আমি কদিন এখানে থাকতে চাই, তোমাদেরই কাছে। খবর না দিয়ে চলে এলাম।'

মুকুট দূরে দাঁড়িয়ে ছিল—আনন্দ প্রকাশ করে বলল—'নিশ্চয় নিশ্চয়'—জয়তীও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'হ্যাঁ—নিশ্চয় নিশ্চয়'। মিসেস সিং তাঁর সুটকেস ও ব্যাগ নিয়ে আসতে বললেন। অবিনাশ জয়তীর অবস্থা দেখে একটু বিস্মিত হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল জয়তী যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। তাকে কোণে ডেকে নিয়ে বলল—

'মুকুট এদের নিয়ে কি যে বাড়াবাড়ি করে। তুমি বাড়ী এসে পৌঁছতেই অতিথিসমাগম—এইজন্যই তো বলি 'দিগন্তে' থাকলে পাগল হয়ে যেতাম। মিসেস সিং মানুষটিও নিতান্ত স্বার্থপর।' মুকুট ও মিসেস সিংএর

ন্যস্তবাগীশ ভাব দেখে অবিনাশ কি রকম একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল, তারপর মিসেস সিং-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—

'মিসেস সিং আমার ওখানে চলুন—কদিন হয়ত মন্দ লাগবে না। আরাম কিছু পাবেন না তবে আমাদের দলের সঙ্গে থাকলে আমোদে দিন কাটবে —ওখানে জমিয়ে আড্ডা হয় বেশ।' মুকুট অবিনাশের কথায় বাধা দিয়ে বলল—

'অবিনাশের বাড়ীতে গিয়ে থাকার কথা কল্পনাও করবেন না। ঐ স্বেচ্ছাচারী অলস দলটি পাগল করে দেবে আপনাকে। যা খুসী করে, যখন খুসী খায়— কাজ না করলেও চলে ওদের।

'কেন মুকুটদা? আপনার ধারণা ও রকম হয় কেন? জয়ন্তী যখনই আমাদের কাছে যায়, মাথা ঠাণ্ডা করেই ফিরে আসে তো? আমার বন্ধুদের ও পছন্দ করে বলেই তো মনে হয়—আপনিও সময় পেলে নিশ্চয় আসবেন।'

'তা ছেলে মানুষের দলকে জয়ন্তীর ভাল লাগা আর আশ্চর্য কি? ওকে দোষ দিই না, কিন্তু এখানে ওর অনেক দায়িত্ব।' মুকুট বেশ অল্প কথার মধ্যে অবিনাশকে বুঝিয়ে দিল যে খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়ায় ক্ষতি নেই তবে 'দিগন্ত' হ'ল জয়ন্তীর প্রকৃত কর্মস্থল।

জয়ন্তী মিসেস সিংকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল। অতিথি যেন আরামে থাকতে পারেন সেদিকে জয়ন্তী সতর্ক হল। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে মিসেস সিং ও মুকুট কথা বলতে ব্যস্ত—জয়ন্তী কফি ঢেলে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল—

'আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি যাই—কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসি—অনুমতি দিন।" তখন প্রায় ৯টা বাজল। দোকান বাজার খুলতে আরম্ভ করেছে, প্রথমেই জয়ন্তী অবিনাশের বাড়ী এসে থামল

'এক পেয়ালা কফি দাও অবিনাশ' বলে সে চেয়ারে বসে পড়ল।

'নিজের বাড়িতে তো এক দণ্ড শান্তিতে বসতে পাই না—সেখানে কফি খেতেও যেন ইচ্ছা করে না। সমস্তক্ষণই অতিথি সমাগম, ক্লান্ত হয়ে গেছি। আজ সারাদিন এদিকেই থাকব বলে এসেছি। মুকুট আজ মিসেস সিংকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত।'

অবিনাশ নিজের পকেটে একটা পরিষ্কার রুমাল গুঁজে নিয়ে বলল—

'আমার কিন্তু দৈনন্দিন রুটিন, তুমি যা হয় কিছু রান্না করে খেও, আমি হয়ত দুপুরে খেতে আসব কিন্তু দেরী হতে পারে।' সে তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছিল দেখে জয়ন্তী বলে দিল সে পারলে যেন খেতে আসে। একটি চাকরের সাহায্যে দু-একটি পদ রান্না করে জয়ন্তী মুকুটকে জানিয়ে দিল সে দুপুরে ফিরতে পারবে না—বিশেষ কাজ আছে দোকান বাজারে। মিসেস সিং ও মুকুট যেন অপেক্ষা না করেন। অবিনাশের flat খুব ছোটর মধ্যে গোছালো। টেবিলে দুজনের মত জায়গা লাগিয়ে জয়ন্তী কয়েকটি বই নিয়ে নিচু চেয়ারে আরাম করে বসল। তখন প্রায় ১টা বাজে। কে যেন সিঁড়ি উঠে আসছে মনে হল, আওয়াজ পেয়ে জয়ন্তী বলল—

'কতক্ষণ বসে থাকব অবিনাশ? এত দেরী করলে?'

'আমি অবিনাশ নই—'নারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অনিতাকে উঠে আসতে দেখে জয়ন্তীর যেন রাগে মাথা ঘুরে গেল। আবার সেই অনিতার সঙ্গে দেখা?

'অবিনাশ কোথায়?' অমায়িকভাবে অনিতা প্রশ্ন করল।

'তুমি কি এখানে সারাদিন কাটাবে? আমিও তাই ভাবছিলাম।' অনিতা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ—অবিনাশের জন্যই প্রতীক্ষা করছি—সে বহুদিনের বন্ধু আমার জানেন তো?' জয়ন্তী উত্তর দিল।

'পিকনিক হবে নাকি?' অনিতা বিদ্রূপের সুরে পুনর্বার প্রশ্ন করল।

''না, tete-a-tete। অবিনাশ আমাকে তার সঙ্গে খেতে বলেছে।' জয়ন্তী কথাগুলি একটুও নম্রসুরে বলবার চেষ্টা করল না।

অনিতা তক্তপোশের ওপর গিয়ে বসল। একটি

কথাও আর বলল না। কতগুলি মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্র ছিল, সেগুলির প্রথম পাতা থেকে শেষ পর্যন্ত উল্টে গেল—কিন্তু সে উঠবে না বোঝা গেল। তখন দেড়টা বাজতে আর দেরী নেই। অবিনাশ সিঁড়ি উঠে এসে দেখে দুই নারী মৌন হয়ে একই ঘরে বসে আছে। তার আর বুঝতে বাকি রইল না দুজনের মনের অবস্থা ঠিক কি রকম। তার কল্পনার অতীত এই দৃশ্য।

'কিছু খেতে পাব তো?' অবিনাশ মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, কেউ উত্তর দিল না। তিনজনে একত্রে বসে খেতে লাগল কিন্তু কারুর মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুলো না। অনিতা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে স্থির করল। এদিকে অবিনাশকে কাজে ফিরে যেতে হল। জয়তী মনে করে এসেছিল আজ অবিনাশের সঙ্গে বসে মন খুলে গল্প করবে কিন্তু তার সে আশা ধূলিসাৎ হ'ল। অবিনাশের ভাগ্যও সেদিন মন্দ—বন্ধুদের মধ্যে কলহ হয় তার ভাল লাগে না—বিশেষ করে জয়তীর সঙ্গে তার আবার মনোমালিন্য হবার আশঙ্কা দেখল। অনিতাও সরবে না, জয়তীও অবিনাশকে অনিতার সঙ্গে একা থাকবার সুযোগ দেবে না। অবিনাশ সেদিন শীঘ্র বাড়ী ফিরতে পারবে না আন্দাজ করল। অনেক দেরী পর্যন্ত বসে বসে জয়তী অবশেষে জিনিস পত্র কিনতে বেরিয়ে গেল। রাস্তার আলোগুলি জ্বলে উঠতে অবিনাশ বাড়ী ফিরল। ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি উঠছে বাড়ী চুপ চাপ দেখে নিশ্চিন্ত হল। দেখল কেউ নেই সেখানে। ধীরে ধীরে উঠে গেল এবং বসবার ঘরখানা নির্জন অবস্থায় পেয়ে খুশী হ'ল। গলা থেকে 'টাই'টা খুলে ফেলে জুতো জোড়া খুলতে শুরু করল। পায়ের আঙুলগুলো বেশ কয়েকবার টানল। মোজা জোড়া দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—তক্তপোশের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে হাই তুলল। একেবারে একা স্বাধীনভাবে বিশ্রাম করতে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। ক্লান্ত অবস্থাতে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কোথা থেকে জোলো হাওয়ার বেগ এসে সমস্ত ঘরখানা ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। ঘুমের ঘোরে অবিনাশ স্বপ্ন দেখছে, জয়তী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রমাগত কি যেন বলছে—অনিতার প্রতি তীব্র ঈর্ষা সে [illegible]র দমন করে রাখতে পারছে না—অবিনাশ তাকে বলছে সে যেন ভুল না বোঝে—অনিতাও দুঃখ ভোলবার জন্যই আসে। অবিনাশ জয়তীর হাতখানা ধরে টানছে আর বার বার অনুরোধ করছে ফিরে না যেতে। ঠিক এই সময় অবিনাশের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখে অনিতা একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে তাকে টানছে আর বলছে—

'ওঠ ওঠো অবিনাশ।

অবিনাশ এক লাফ দিয়ে উঠে বসল—'স্বপ্ন এত বিপরীত হয়'—সে ভাবল। অনিতা কাছে এগিয়ে এসে অবিনাশকে বলল—

'সারাদিন এখানেই অপেক্ষা করছিলাম—জয়তী তো আমায় সহ্য করতে পারে না—সে চলে গেল তাই। আমি ভিতরের ঘরেই ছিলাম—সেখানে কেউ নেই দেখে ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু তুমি যে পাশের ঘরে এসেছ সে তো টের পাইনি? কখন এসেছ তুমি?' অবিনাশ ভাবল খুব বেঁচে গিয়েছিল।

অনিতা অবিনাশের প্রেমের কাঙাল। জয়তী উপস্থিত না থাকায় তার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। অবিনাশের পাশে বসে তার হাত দুটি ধরল—নিতান্তই অসহায় করুণ মিনতি—অবিনাশ তাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারল না।

অবিনাশ আজ নিতান্তই বেকায়দায় পড়ল। অনিতার সমস্ত অনুরোধই সে মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। তার স্বাভাবিক পৌরুষ নারীর মোহিনী মায়ায় সচেতন হয়ে ওঠা আর আশ্চর্য কি? অনিতা যেন তাকে মুহূর্তের জন্য হলেও আজ অতি ঘনিষ্টভাবে অতি নিকটে পেয়েছে, রক্তিম অধরে তার বিজয়িনীর হাসি দেখা দিল—চোখদুটি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল—

'জয়তী ফিরছে নাকি আবার?'

'আশা করি সে আসতে পারবে। আমি অপেক্ষা

করছি—।' অবিনাশ বেশ জোর গলায় উত্তর দিতে অনিতার মন ঈর্ষায় ভরে উঠল। জয়তী কেন অবিনাশের সঙ্গ চায় সে কিছুতেই বুঝতে পারল না—অবিনাশের দিকে ছলছল নয়নে তাকিয়ে বলল—

'জয়তীর কিসের অভাব? সে কী চায় তোমার কাছে অবিনাশ?'

অনিতা নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই বার বার অনুভব করে কিন্তু আর কারুর জীবনে যে কোন সমস্যা থাকতে পারে সে আর কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না।

মানুষের মন এমনি অবুঝ, অপরের দুঃখের কারণ খুঁজে দেখা তার পক্ষে নিতান্তই কঠিন। সাড়ে ৮টা বেজে গেল, চারিদিক অন্ধকার, অনিতা অবশেষে বিদায় নিল। অবিনাশ আজ কিঞ্চিৎ শঙ্কিত। সে মহাসমস্যার মধ্যে পড়ল। অনিতার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে পারল না—তার প্রেমকে উপেক্ষা করল না কিন্তু অবিনাশ যা চায়নি তাই ঘটে গেল। সে নিজেকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারছিল না। স্নান করে কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল—মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে চায়—বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে আহার করে তারপর বাড়ী আসবে এই স্থির করল। প্রায় মধ্য রাত্রে সে বাড়ী ফিরে গেল কিন্তু উপরে উঠতে তার তখনও যেন একটু ভয় করছিল। Bachelor-দের একা থাকাও নিরাপদ নয় এই ভাবছিল মনে মনে। অনিতাকে কিছুতেই এড়াতে পারে না।

সারারাত ছট-ফট্ করেছে বিছানায়। অবিনাশের মনের ভার নামেনি তখনও। সকাল হতেই জয়তীর আবেগ ভরা মুখখানা মনে পড়ল। টেলিফোনে গিয়ে তাকে ডাকতে জয়তী উত্তর দিল—

'তোমার ওখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না—আমি অনিতার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

'আমি কি করব?' অবিনাশ রাগ করে বলল।

'যদি দেখা না করতে চাও সর্বদাই তাকে এড়িয়ে চলতে পার', বলল জয়তী। 'তোমার না জানিয়ে সে যেন না আসে, এ কথা বলে দিলেই তো সব চুকে যায়। তার অন্য বন্ধুও তো আছে, সেখানেও তো মধ্যে মধ্যে যেতে পারে। তুমি কি তার ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু?' জয়তীর কথার মধ্যে আজ বিশেষ একটি অর্থ পাওয়া গেল—সে কিছু আর ঢেকে বলল না। নিজের সংসারে সে নানা বাধার মধ্যে নিতান্তই নীরস জীবন যাপন করে—অবিনাশকে সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আপন মনে করে কিন্তু তাই বলে সে অনিতাকে সহ্য করবে না। অবিনাশ ও তার নিগূঢ় বন্ধুত্বের লীলাভূমিতে অনিতাকে সে প্রবেশ করতে দেবে না এ কথা অতি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল। অনিতার যে অবিনাশের উপর কোন দাবী থাকতে পারে না জয়তী ভাল করেই তা অবিনাশকে জানতে দিল।

মুকুট মদের নেশা কিছুতেই ছাড়তে পারছে না—জয়তীর অনুরোধ, ভৎর্সনা, অভিমান, মনঃকষ্ট, কোনটাতেই যেন মুকুটের মন সাড়া দেয় না—সে অবুঝ রুগীর মত একটি বিশেষ বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াল ডাক্তারের মানা সত্ত্বেও মুকুট কিছুতেই নেশা ত্যাগ করতে পারছে না। কাজে যখন মন দিতো মুকুট অতি নিখুঁতভাবেই কাজ করত—কিন্তু তার স্বাস্থ্য দিন দিনই ভেঙে যেতে লাগল। বন্ধুবান্ধব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, শিল্পীদের মধ্যে কানাঘুষো চলতে লাগল—সন্ধ্যাবেলায় মুকুট মানুষের মত থাকে না। প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটি ঘরে তাকে প্রায় বন্ধ রাখতে হ'ত। অতিথিরা যখন এসে কিছু প্রশ্ন করত জয়তীর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত চারিদিকে প্রচার করে দিতো হল মুকুটের পাকস্থলীতে বিশেষ রোগ হয়েছে, যন্ত্রণা ও ব্যথার তীব্রতায় সে শয্যাগত। লোকের মুখে কৌতুকের হাসি দেখে, তাচ্ছিল্যের কথা শুনে জয়তীর সকল গর্ব যেন চূর্ণ হয়ে গেল। মুকুটের হার্টের দুর্বলতা ক্রমশঃ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। চায়ের পেয়ালা হাতে ধরে যখন কথা বলছে, হাত তার কাঁপছে, গলার স্বরও অস্পষ্ট—

'দেখো জয়তী, ঐ যে বিরাট প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হচ্ছে, এই আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হ'ল। কেবল একটা দুঃখ

রয়ে গেল—আমি এতদিনে লক্ষ্য করলাম তুমি এখনও সন্তানের মা হওনি।' জয়ন্তী বাধা দিয়ে বলল—

'কেন তুমি দুঃখ করছ মুকুট? নির্ঝঞ্ঝাট না হয়ে কি দুজনে এত বড় কাজটা চালাতে পারতাম? কত দায়িত্ব নিয়ে এতদিন কাজ করেছ বল তো? আবার ছেলেমেয়ের চিন্তা করতে হলে তোমার আর একটা রোগ হত।'

অনেক সংগ্রামের পর মুকুট ও জয়ন্তী শিল্প-জগতে সাফল্য লাভ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ তারা এক দণ্ডও উপভোগ করেনি। তাদের দাম্পত্য জীবনের বৈশিষ্ট্য কিছুই গড়ে ওঠে নি। গভীর শূন্যতার নীরব আর্তনাদ জয়ন্তীর জীবনবীণায় একটা বেসুরা রাগিণী হয়ে বেজেছিল—কোথায় যে সুর মিলছিল না তাও সে খুঁজে পায়নি অথচ এই এক-টানা সুর সে আর যেন সহ্য করতে পারছিল না। কাজের নেশায় সে মেতে ছিল, কর্তব্যে ডুবে ছিল, কিন্তু বিবাহবন্ধনের নির্দিষ্ট প্রেমের প্রবাহ কোনদিন কি খুঁজে ছিল? সাফল্যই ছিল মুকুটের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং শিল্প জগতের রহস্য তার সব কিছুই জানা ছিল, তাই প্রতিযোগিতাকে সে কোনদিন ভয় করেনি। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে রস গ্রহণ করা বা দৈনন্দিন জীবন থেকে সুখ সন্তুষ্টি খুঁজে দেখা মুকুটের অভ্যাস ছিল না—আকাঙ্ক্ষাহীন জীবন তার কাছে অর্থহীন ছিল বললেই হয়। মুকুট ছিল রঙ্গমঞ্চের পরিচালক, জয়ন্তী দ্বিধাপূর্ণ নায়িকা আর অবিনাশ প্রধান দর্শক। জয়ন্তীর জীবনে দর্শকের প্রভাবই বিভিন্ন চিন্তার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করেছে এবং তার মানসিক চেতনা নানাভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। জয়ন্তী না বুঝেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং কতটা যে অবাঞ্ছিত, তা সে নিজেই ঠিক অনুমান করতে পারে নি বলে মনে হয়।

দিল্লীর শুষ্ক দিনগুলি ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল—ধূলোর রুক্ষ খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—দিল্লীবাসী বর্ষার জন্য আকুল হয়ে আছে। কালবৈশাখীর কালো মেঘ, আষাঢ়ের জলধারা, বাঙালীর মনে শত শত ভাবের ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। অবশেষে এক পশলা বৃষ্টি পড়ে চারিদিক স্নিগ্ধ হল। দূর গ্রামের পথে ময়ূর ও ময়ূরীরা নৃত্য করছে। পাথরের পাহাড়ের গা বেয়ে জল পড়ে যাচ্ছে—যেন জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধার করুণ অশ্রুধারা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মুকুট বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিকেল বেলা 'দিগন্তে' আর আনন্দকোলাহল শোনা যায় না—সবই নিস্পন্দ, প্রাণহীন। এই সুসজ্জিত সুন্দর গৃহে আজ জয়ন্তী ও মুকুট একা হল। এখন আর মুকুটকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসে না। এই বিষণ্ণ আবহাওয়া কখনও কখনও জয়ন্তীর অসহ্য মনে হত। সুদীর্ঘ তিনমাস মুকুট শক্তিহীন অবস্থায় জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে তবু জয়ন্তী অসীম ধৈর্য ও মানসিক বলের পরিচয় দিল। সেবার ভার আর কাউকে দিতে পারল না। মুকুটের বিরাট দেহ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল— বাক্‌শক্তিহীন অবস্থায় সে পড়ে ছিল। জয়ন্তীর মনে শত চিন্তা, সহস্র প্রশ্ন কণ্টকের মত ব্যথা দিচ্ছিল—মুকুটকে সে এই রোগ থেকে রক্ষা করতে পারল না—শুধু মৃত্যুর নিরানন্দময় ছায়া যেন উভয়কে ঘিরে রেখেছিল।

পূজোর ছুটি শেষ হ'ল। দেওয়ালির দিন এগিয়ে আসছে দীপান্বিতার শিখাগুলি যেদিন প্রতিবেশীদের গৃহ আলোকিত করল, জয়ন্তী তখন মুকুটের পীড়িত দেহের পাশে একাকী দাঁড়িয়ে। মুকুট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। রঙ্গমঞ্চের যবনিকা যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল। এতদিন সে জীবনের ক্ষয়লীলা তিলে তিলে দেখেছে, রোগাক্রান্ত পুরুষের মনঃকষ্ট মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। সর্বদা সে মুকুটের কাছেই ছিল। আজ একেবারে একা—দিগন্তের শেষ প্রান্তে কি?

দুঃসংবাদ পৌঁছতে দেরী হল না। বন্ধুমহলে সকলেই আশঙ্কা করেছিল মুকুট আর স্বাভাবিক হয়ে কাজ করতে পারবে না—চারিদিকে আবার ভিড় জড়ো হল। গাড়ী লোক কথা সান্ত্বনাবাণী—এ যেন আর এক পর্ব যা জয়ন্তী কোনদিন দেখতে চায় নি। নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে

এক এক করে এসে সকলে দেখা করে গেল —জয়তী নির্বাক কিন্তু নিঃসংশয়। মন তার যেন প্রস্তুত ছিল—এমনই একটা বিভীষিকা তার পিছনে পিছনে আসছিল—আজ সেই দৈত্য একেবারে সামনে এসে মুকুটকে তুলে নিয়ে গেল। এতদিন এরই প্রভাবে মুকুটের দিন কেটেছে কি ?

'দিগন্তের' সম্মুখে জনস্রোত—জয়তী নীরবে কৃতজ্ঞতা জানাল। সকলে সমবেত প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছে। শীলা এসে পৌছল। সে নিমেষের মধ্যে সংযত হয়ে সমস্ত কর্তব্যের ভার নিল - জয়তী কদিন বিশ্রাম করতে বাধ্য হ'ল।

মিসেস সিং জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে জয়পুরে যেতে।

'আমায় কিছুদিন সব কাজ থেকে মুক্ত দিন তারপর দেশ ভ্রমণে যাব' জয়তী বলল। শিল্পজগতে জয়তীর নাম হয়েছিল মুকুটেরই সাহায্যে—জয়তীর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা সে পূর্ণ করে দিয়ে গেছে। কিন্তু অভাব তার কী ছিল বাইরের জগতের কাছে কিছুই কোনদিন সে প্রকাশ করেনি। এক জেনেছিলেন বৃদ্ধ পিতা। তাঁর একমাত্র কন্যার জীবনের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের কথা কেবল তিনিই বুঝেছিলেন শান্তা শুধু আনন্দের আভাস পেয়েছিল। মুকুটের মৃত্যুসংবাদ দেবাশিসের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসেনি যদিও তবু প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। নিঃস্বার্থ ভাবে জয়তী তার সাধ্যমত সবই দিয়েছিল কিন্তু পেয়েছিল মর্মান্তিক শূন্যতা—নিত্য নূতন সংঘর্ষ।

* * *

দেয়ালির উৎসবে দিল্লী শহর একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে ; এই মহোৎসব উপলক্ষে ধনী দরিদ্র উভয়েই আনন্দ করছে দেখা যায়। চারিদিকে বাজী পোড়ানো চলছে, সারারাত তুবড়ীর আওয়াজে ঘুম হয় না—পানের দোকান, কুঁড়ে ঘর, রুগীর ঘর, বিরাট অট্টালিকা, সরকারী প্রাসাদ, সকল স্থানেই আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়, কোথাও রঙিন আলো, কোথাও লণ্ঠন, কোথাও প্রদীপ, কোথাও মোম বাতি। মিঠাইয়ের দোকানগুলি বরফি ও বাদামে ভরে ওঠে, কত রকমের ছাঁচ, কত রকমের রং। দোকানগুলিতে রেডিও এমনই উচ্চস্বরে বাজতে থাকে যে কান প্রায় ফেটে যায়—কথা বলা বা শোনা কিছুই সম্ভব হয়না। পাড়াপড়শী অন্তত একবার দাঁড়িয়ে ঐ বিকটস্বরের গীত ও বাদ্য শুনে যায়—সকলের মাঝখানে নিজের পরিচয় দিতে সেদিন ভালই লাগে—নিবিড় আলিঙ্গন, হাসি, ও কৌতুক। নূতন জামা কাপড়, জুতো, টুপি পরে সকলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; শিশু, কিশোর, যুবক, প্রবীণ, বৃদ্ধ, সকলেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আলো দেখছে—সুসজ্জিত দোকান দেখছে ; ফুলঝুরিতে কারুর হাত জ্বলে গেল—ভীষণ কান্না—। আবার পট্‌কার আওয়াজে সকলে চমকিয়ে গেল—শিশু ও মুহূর্তের মধ্যে কান্না ভুলে গেল। প্রকাণ্ড পাগড়ী পরা মিঠাইওয়ালা তার গোঁফে চাড়া দিয়ে বলে উঠল 'খুশ রহো বেটা।'

জয়তীর গৃহে আজ নিবিড় অমা। শীলা জয়তীকে কলকাতা নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত—দেবাশিস উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে জয়তীর জন্য কিন্তু দিগন্তর ঘরদোর না গুছিয়ে জয়তী দিল্লী ছাড়বে না। শীলা অবিনাশকে অনুরোধ করল সে যেন জয়তীকে সাহায্য করে এবং শীঘ্র কলকাতায় রওনা করিয়ে দেয়। সুদীর্ঘ পথ অবিনাশকে প্রত্যহ যাতায়াত করতে হবে—তবু সে জয়তীকে সাহায্য করবে কথা দিল।

ক্রমশঃ

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(১২)

৩০শে ডিসেম্বর বেলা ১টায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। সভাপতি মশায় সময়মত উপস্থিত না হওয়ায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, সভাপতি মশায় তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে (পণ্ডিতজিকে) কার্য্য পরিচালনার কথা বলেছেন।

এদিনকার দর্শকদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। অধিবেশন দীর্ঘ হওয়ায় অনেক দর্শক ও কতক প্রতিনিধি গয়া ত্যাগ করে দেশে চলে গিয়েছিলেন।

সভার কার্য্য শুরু হওয়ার প্রাক্কালে কুমারী তায়েবজী একটি সঙ্গীত গাইলেন। তারপর কয়েকজন বাঙালী বালক ও বালিকা শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর "মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণী গাহ আজি হিন্দুস্থান" সমবেত কণ্ঠে গাইলেন। তারপর শ্রীমতী সরস্বতী দেবী একটি গান গাইলেন।

যখন কুমারী তায়েবজীর গান চলছিল তখন সভাপতি দেশবন্ধু দাশ সভাগৃহে প্রবেশ করে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গান সমাপনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমেই সভাপতির নির্দেশে দীপ নারায়ণ সিংহ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুটি প্রস্তাব উপস্থিত করে বাঙলার সুযোগ্য সন্তান মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক) ও ফরিদপুরের প্রবীণ নেতা লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি অম্বিকা চরণ মজুমদারের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করলেন।

প্রস্তাব দুটি সকলে দণ্ডায়মান হয়ে পাশ করলেন।

তারপর পূর্বদিনে উত্থাপিত রাজগোপালাচারীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার একটি সংশোধন প্রস্তাব পেশ করে বললেন যে তাঁর প্রস্তাবটি উভয়পক্ষের মধ্যে আপোসে সহায়তা করবে। তিনি সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন তাঁর আপোসের প্রস্তাব গ্রহণ করে দলের ভাঙ্গন রোধ করেন।

সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যেহেতু ১৯২০ সালের কাউনসিল নির্বাচনে সমগ্র দেশের অধিকাংশ লোক ভোট না দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ভারতীয় নিজদের নির্বাচিত হতে দিয়েছেন এবং নাগপুর কংগ্রেসের উপদেশ সত্ত্বেও তাঁদের পদে ইস্তফা দেন নি, যার ফলে যদিও নূতন কাউনসিলগুলি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে না তথাপি সেগুলকে গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা যা কংগ্রেস অবসান করতে সঙ্কল্প নিয়েছে, সেই ক্ষমতা দূরীভূত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে অতএব এই কংগ্রেস ১৯২০ সালের অপেক্ষা কাউনসিল বয়কট বেশী ফলপ্রদ করার উদ্দেশ্যে সকল নির্বাচনকারীকে কংগ্রেসের সদস্যদের পক্ষে (যাঁরা নির্বাচিত হলে কাউনসিলে কোন অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন) ভোট দিতে আন্তরিক ভাবে উপদেশ দিচ্ছে।

পাঞ্জাবের কুমারী লজ্জাবতী হিন্দিতে এবং দীপ নারায়ণ সিংহ হিন্দি ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিজয়রাঘবাচারী মশায় মূল প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব তুলনামূলক সমালোচনা করে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিজয়রাঘবাচারী মশায় আসন গ্রহণ করার পর পঞ্জাবের আবদার রহমান গাজী রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাবের আলোচনা মুলতুবি রাখার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। ভোটাধিক্যে মুলতুবি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

এই সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যেহেতু কাউন্সিলের প্রথম বারের কার্য্য-কলাপ খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকারে এবং দ্রুত স্বরাজ অর্জনের বাধা স্বরূপ হওয়া ছাড়াও দেশের জনগণের অতিশয় দুঃখ ও কষ্ট ঘটিয়েছে এবং যেহেতু অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অবসানের জন্য পন্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় অতএব এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে, আইন অমান্য তদন্ত কমিটার রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাব ও খিলাফতের অন্যায়ের প্রতিকার এবং অবিলম্বে স্বরাজ অর্জনের প্রশ্নে অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাতে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হোক এবং এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে, ১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নূতন কাউন্সিলের অধিবেশন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের পরিবর্তে প্রথম সপ্তাহে করা হোক এবং অবস্থা বিবেচনায় এই বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য কংগ্রেসের নিকট পুনরায় উপস্থিত করা হোক।

প্রস্তাব উপস্থিত করে পণ্ডিতজি বললেন যে তিনি অসহযোগে পূর্ণ বিশ্বাস বজায় রেখেছেন এবং শত্রুর নিকট মাথা নত না করে পরিচ্ছন্ন অস্ত্রদ্বারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কাউন্সিলে প্রবেশের বিরোধী কিন্তু নির্বাচনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলে কাউন্সিল বয়কট অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হবে। তিনি আরও জানালেন যে তাঁর প্রস্তাব আয়েঙ্গার মশায়ের প্রস্তাব অপেক্ষা ভাল কারণ তাঁর প্রস্তাবে এক বৎসরের পরে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস প্রার্থী কোন কর্মসূচী গ্রহণ করবে তার ব্যবস্থা আছে। আয়েঙ্গার মশায়ের প্রস্তাবে পূর্ব্ব থেকে নীতি স্থির করা হয়েছে।

যমনাদাস মেহেতা পণ্ডিত নেহেরুর সংশোধনী প্রস্তাব ইংরেজিতে খুব জোরালো ভাষায় সমর্থন করলেন।

সি এস্ রঙ্গ আয়ার আয়েঙ্গার মশায়ের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংশোধনী প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে বললেন যে তিনি আপোসের প্রস্তাবের কোন উপকারিতা দেখছেন না, তিনি বুঝতে পারেন না কাউন্সিলের সমস্ত আসনগুলি দখল করলেও কি করে গভর্ণমেন্টকে পঙ্গু করা যায়।

শ্রীপ্রকাশ (কাশীর বাবু ভগবান দাসের পুত্র এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে নেহেরু গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী ও কয়েকটি রাজ্যের গভর্ণর) আয়েঙ্গার মশায়ের প্রস্তাব সমর্থন করে কংগ্রেসকে দলের মধ্যে ভাঙ্গন বন্ধ করতে সানন্দে আবেদন জানালেন।

পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় তারপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বললেন যে অত্যাচারের উন্মাদ গতি রোধ করা, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের কারাগার থেকে মুক্ত করা, গভর্ণমেন্টের কর্মচারী ছাঁটাই করে ব্যায় ভার লাঘব করা করদাতাগণের করের বোঝা কমানোর জন্য কাউনসিলে প্রবেশ দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেসের সদস্য কাউন্সিলে গরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং গভর্ণমেন্টের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ

করতে সমর্থ হবে। তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে তিনি পণ্ডিত মতিলালের প্রস্তাব সুপারিশ করলেন।

বিতর্কের উত্তর দিতে উঠে রাজাগোপালাচারী মশায় বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সভার অধিকাংশ সদস্য মুহুর্মুহু "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। 'সভাগৃহ নিস্তব্ধ হলে রাজাগোপালাচারী মশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীরস্থির ভাবে বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে প্রতিনিধিদের তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য আহ্বান করলেন।

তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর প্যাণ্ডেল থেকে প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য সকলকে বাইরে যেতে বলা হল, সভাগৃহে তখন মাত্র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকলেন। ভোট গ্রহণের পর দেখা গেল যে আয়েঙ্গার ও পণ্ডিত নেহেরুর সংশোধনী প্রস্তাব-দুটি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হল। রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর সেদিনের মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল। স্থির হল যে পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন হবে।

(১৩)

৩১শে ডিসেম্বর বেলা ২টায় কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। এদিনেও সভাপতি মশায় সময়মত না আসায় ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি বিজয়রাঘবাচারিয়া মশায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে বললেন যে দাস মশায় এখনও আসেন নি কাজেই তিনি এখন সভার কাজ চালিয়ে যাবেন।

পূর্বদিনের মত এদিনও কুমারী তায়েবজী তাঁর সঙ্গীত দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করলেন। তারপর একদল বাঙালী তরুণ তরুণী সমবেত কণ্ঠে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন। তারপর শ্রীমতী সরস্বতী দেবী ও নানাভাই উপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গীত দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করলেন।

সঙ্গীতের পর বিজয় রাঘবাচারিয়া মশায় দীপনারায়ণ সিংহকে পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য আহ্বান করলেন।

দীপনারায়ণ সিংহ নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :—

যেহেতু কংগ্রেস মনে করে যে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য—এবং ভারতীয় শ্রমিক ও ভারতীয় কাঁচামাল তাদের কাজে লাগানো (exploitation) বন্ধ করার জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের সংগঠন করা কর্তব্য অতএব এই কংগ্রেস অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং অন্যান্য কিষাণ সভাগুলি দ্বারা ভারতীয় শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীকে ভারতীয় শ্রমিক সংস্থা গঠনে সাহায্য করার জন্য ,'কো-অপ্ট" করার ক্ষমতা সহ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে একটি কমিটী গঠনের প্রস্তাব করছে : -

সি এফ্ এনড্রুস, যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ হালদার' স্বামী দীনানন্দ, ডাঃ ডি ডি সাথে, শৃঙ্গার ভেলু কেটিয়ার ও ই, এল, আয়াব।

কে ভি শাস্ত্রী ও বিহারের কে পি এন সিংহ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

শৃঙ্গার ভেলু কেটিয়ার নিজকে কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সকলের নিকট আবেদন করলেন।

সবসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। উপরোক্ত প্রস্তাব আলোচনার সময় সভাপতি মশায় শোভাযাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে সভাপতির আসনে উপবেশন করলেন।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, গভর্ণমেণ্ট এবং গভর্ণমেণ্টের শিক্ষায়তনগুলি বয়কট সম্বন্ধে কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে উক্ত বয়কট বজায় রাখতেই হবে এবং আরও প্রস্তাব করছে যে বর্ত্তমান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর স্থাপন এবং সর্ব্বপ্রকার উপায়ে

তাদের দক্ষতার উন্নতি করতে প্রত্যেক প্রদেশকে আহ্বান করছে।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপক কে পি এন সিংহ।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে আইনজীবিগণ ও মামলার পক্ষগণ কর্তৃক আদালত বয়কট বজায় রাখতে হবে এবং আরও ঘোষণা করছে যে পঞ্চায়েত স্থাপন এবং তার স্বপক্ষে জনমত গঠন করার জন্য অধিকতর চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর বসন্তকুমার মজুমদার কংগ্রেসের মূলনীতি (ক্রীড) পরিবর্তনের জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। বসন্তবাবু বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছিল। তখন বসন্তবাবু নোটিশ দিয়েছিলেন যে তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব উপস্থিত করবেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বপ্রকার সঙ্গত ও উপযুক্ত উপায় দ্বারা ভারতের জনগণ কর্তৃক স্বরাজ অর্জন অর্থাৎ সর্বপ্রকার বৈদেশিক সম্পর্কহীন পূর্ণ-স্বরাজ অর্জন।

প্রস্তাব সমর্থন করলেন শৃঙ্কর ভেল্ কোটিয়ার।

রাজাগোপালাচারী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠে বললেন যে বর্তমান ক্রীডে উভয় মতেরই স্থান আছে। এতে পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বাধীনতা উভয়ই বোঝায়। পন্থা সম্বন্ধে বললেন শান্তিপূর্ণ পথেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

পণ্ডিত সুন্দরলাল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দীতে বললেন। তিনি জানালেন যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে কিন্তু ক্রীড বদলের পূর্বে তাঁদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে হবে।

ফজলুল রহমন প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ভোটে দেওয়া হলে "মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়" ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

পরবর্তী প্রস্তাব আনলেন রাধাকৃষ্ণ ভার্গব। তাঁর প্রস্তাবে কংগ্রেসের সংবিধানে খৃষ্টমাসের ছুটী"র শব্দের পরিবর্তে "চৈত্র শুক্ল পক্ষ" গ্রহণ করার কথা ছিল।

স্বামী ভাস্করানন্দ প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং বিরোধিতা করলেন হরি সর্বোত্তম রাও ও পণ্ডিত নেকিরাম শর্মা।

ভোটে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর রাজাগোপালাচারী নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন:—

যেহেতু অযৌক্তিক সামরিক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়-বাহুল্য দ্বারা গভর্ণমেন্ট জাতীয় ঋণ পরিশোধ করার সীমা অতিক্রম করেছে এবং যেহেতু যে-সকল তথাকথিত নির্বাচিত বিধানসভা যা অধিকাংশ ভোটার অথবা তাদের বিশিষ্ট অংশের অসমর্থনে গঠিত আছে এবং এই সকল বিধান সভা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছে না এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও গভর্ণমেন্ট সেই সকল বিধান সভাগুলির ক্ষমতার আড়ালে ঐরূপ নীতি এখনও অনুসরণ করছে এবং যেহেতু—গভর্ণমেন্টকে যদি এই নীতি চালিয়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে ভারতের জনগণের পক্ষে সসম্মানে তাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ চালানো অসম্ভব হবে এবং সেইহেতু এই প্রকার দায়িত্বহীনতার গতিরোধ করা প্রয়োজন অতএব এই কংগ্রেস জাতীয় বয়কট সত্ত্বেও গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যে সকল বিধানসভা গঠিত হয়েছে বা পরে হবে সেগুলির জাতীয় ঋণ গ্রহণ অথবা কোন দায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা অস্বীকার করছে এবং পৃথিবীর সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে স্বরাজ অর্জনের পর ভারতের জনগন এখন পর্য্যন্ত যে সকল ঋণ বা দায় গভর্ণমেন্ট ন্যায় বা অন্যায়ভাবে গ্রহণ বা সৃষ্টি করেছে সেগুলির জন্য দায়ী থাকবে কিন্তু এই তারিখের পর জাতীয় বয়কট সত্ত্বেও গঠিত তথাকথিত বিধান সভাগুলির ক্ষমতা বা অনুমোদনের বলে যে-সকল

ঋণ গ্রহণ বা সৃষ্টি করা হবে তা শোধ করতে বা দায়মুক্ত হতে বাধ্য থাকবে না।

পদমরাজ জৈন এই প্রস্তাব হিন্দীতে সমর্থন করলেন।

লালা দুনীচাঁদ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেন।

বিজয় রাঘবাচারিয়া একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন যে রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব বিবেচনা করে আগামী কংগ্রেসের পূর্ব্বে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উপর ভার দেওয়া হোক।

বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

রাজাগোপালাচারী এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে বললেন যে তিনি পরবর্ত্তী কংগ্রেস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছেন।

তখন তাঁর সম্মতি ক্রমে মূল প্রস্তাব সংশোধিত হয়ে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন অব্বাস তায়েবজী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস পুনরায় অভিমত প্রকাশ করছে যে যখন স্বেচ্ছাচারী স্বৈরাচারী এবং মনুষ্যত্বহানিকর ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতিরোধে সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হয়েছে তখন সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে আইন অমান্যই একমাত্র সুসভ্য ও ফলপ্রসূ পথ এবং অবিলম্বে স্বরাজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনগণের সর্বব্যাপী জাগরণ ও জাতীয় লক্ষ্যে দ্রুত পৌছানোর জন্য আইন অমান্যের দাবি ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সব প্রকার প্ররোচনা সত্ত্বেও অহিংসার আবহাওয়া বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে এই কংগ্রেস কর্মীকে জাতীয় সংঘটনগুলি প্রসার ও শক্তিশালী করে—এবং গয়ার অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে তিলক স্বরাজ্যফাণ্ডের তহবিলে অন্ততঃ পক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করে এবং আমেদাবাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের শর্তানুসারে ৫০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত করে আইন অমান্যের প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ করতে আহ্বান করছে। এবং এই প্রস্তাব কার্য্যকর করার জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটীকে আবশ্যকীয় নির্দেশ দিতে ক্ষমতা দিচ্ছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটি সুন্দর ভাষণ দ্বারা এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বসন্তকুমার মজুমদার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দেশানুসারে অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

ফজলুল রহমান একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা ৩ মাসের মধ্যে আইন অমান্যের প্রস্তুতি সমাপ্ত করতে বললেন।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কে শাস্তানম এবং দিল্লীর গুরবক্স সিং হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর এটোয়ার বাবু রাম শর্মা একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস জোরের সঙ্গে অভিমত প্রকাশ করছে যে বৃহৎ আকারে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় উপস্থিত হয়েছে এবং যেহেতু যুক্ত প্রদেশ ও আসাম, সংশোধিত ফৌজদারি আইন যেখানে এখনও (Criminal Law Amendment Act) বলবৎ আছে, বৃহৎ আকারে অবিলম্বে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র অতএব এই-কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যেন অবিলম্বে সমগ্র ভারত থেকে বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে যুক্ত প্রদেশ ও আসামে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নির্দেশানুসারে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হোক এবং প্রত্যেক প্রদেশ তার লোকসংখ্যার অনুপাতে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করুক।

আরও প্রস্তাব করা হচ্ছে উপরোক্ত বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে মধ্যে চার হাজার আসামে এবং ষোল হাজার যুক্ত প্রদেশে নিযুক্ত করা হোক।

শিবনারায়ণ উর্দ্দুতে এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কৃষ্ণকান্ত মালবীয় এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন।

সিন্ধু প্রদেশের কাজী আবদুর রহমন মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রস্তাবগুলির উপর ভোট নিতে অতি সুন্দর অভিভাষণ দিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে যদি আগামী কালই অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী নির্দেশ দেয় তা হলে সকলে আনন্দের সহিত আসাম ও যুক্ত প্রদেশে যাবেন এবং অবস্থা অনুকুল হলে সকলেই এর জন্য প্রস্তুত আছেন।

প্রথমে তিনি বাবুরাম বর্মার সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট নিলেন। ভোটে বর্মার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

অনুরূপ ভাবে ফজলুল রহমন ও বসন্তকুমার মজুমদারের প্রস্তাব-দুটিও অগ্রাহ্য হল।

তারপর সর্বসম্মতিক্রমে মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

উপরোক্ত প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর শ্রীমতী নাইডু জানালেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী তামিল নাড়ুর সন্তানেরা আইন অমান্য আন্দোলন ফাণ্ডের জন্য ১১০ টাকার একখানি চেক পাঠিয়েছেন এবং ঐ ফাণ্ডে তায়েবজী সাহেব ১০০০টাকা ও কুমারী তায়েবজী ৫০০টাকা দান করেছেন। তায়েবজী সাহেব, তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডেও ১৫০০টাকা দান করেছেন। আরও অনেকে অনেক টাকা দিয়েছেন। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ১০০০টাকা দিয়েছেন।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন—রাজাগোপালাচারী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কংগ্রেসের কাজ করার সময় ছাড়া এবং যে ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে হিংস্রতার প্রকাশ হতে পারে সেইরূপ ক্ষেত্র ছাড়া অসহযোগীগণ আইনের সীমার মধ্যে আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

প্রকাশ থাকে সদুদ্দেশ্যে যথা ধর্মের অবমাননা, স্ত্রীলোকের শ্লীলতা হানি এবং বালক ও পুরুষের উপর অশ্লীল আক্রমণের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য বল প্রয়োগ করা কোন অবস্থাতেও নিষিদ্ধ নয়।

যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন:—

নিকট প্রাচ্যে খিলাফতের এবং তুর্কী গভর্ণমেণ্টের ঐক্যের গুরুতর শঙ্কাজনক অবস্থার-পরিপ্রেক্ষিতে এবং এর প্রতিরোধের জন্য হিন্দু-মুসলমান ও অন্য সকলের দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিপেক্ষিতে এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে খিলাফৎ ওয়ার্কিং কমিটীর সহিত পরামর্শ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এই রকম অন্যায় কাজে ভারতকে ব্যবহারের পথে বাধা দেওয়ার জন্য এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার জন্য হিন্দু-মুসলমান ও অন্য সকলকে সংঘবদ্ধ হতে হবে।

বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রী মশায় সমর্থন করায় প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব পেশ করলেন রাজাগোপালাচারী মশায়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস কমিটী কেপ টাউন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ডারবানের জয়েন্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েনকে ১০ জন প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষমতা সহ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। প্রতিনিধিদের সংখ্যা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে এবং সে সম্বন্ধে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট রিপোর্ট করবে।

এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে দুজন প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষমতাসহ কাবুল কংগ্রেস কমিটীকেও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর একটি প্রস্তাব দ্বারা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডাঃ এম্ এ আনসারী ও সি রাজাগোপালাচারীর স্থলে আগামী বৎসরের জন্য মোজ্জাম আলী, বল্লভ ভাই প্যাটেল ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হল।

সভাপতি মশায় উঠে বিদায়ী সম্পাদকগণকে তাঁদের কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর নাগেশ্বর রাও অন্ধ্রপ্রদেশে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

একটি প্রস্তাব দ্বারা আগামী অধিবেশন অন্ধ্রপ্রদেশে হাওয়া স্থির হল। অধিবেশনের স্থান পরে নির্দিষ্ট হবে।

সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পর—অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে দাঁড়ালেন ভাগলপুরের সুপণ্ডিত ও সুবক্তা,—দীপ নারায়ণ সিংহ। তিনি অনবদ্য ভাষায়—সভাপতির নানাবিধ গুণকীর্তন করলেন। জাতির সম্মান বজায় রাখার জন্য এবং যোগ্যতা ও মর্য্যাদায় সহিত সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য সভাপতিকে আবেগপূর্ণ ভাষায় ধন্যবাদ দিয়ে বললেন দাশ সাহেব দেশের গৌরব বলে স্বীকৃত হবেন।

তারপর তিনি প্রতিনিধিগণকে-স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে, গয়া মিউনিসিপালটী ও গয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে এই জাতীয় কাজে সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

দীপনারায়ণ সিংহ মশায় আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি মশায় তাঁর বিদায়ী অভিভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের প্রবল হর্ষধ্বনি ও "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি জয়" ধ্বনিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হলেন।

অভিভাষণ দেবার প্রাকালে তিনি বললেন যে তাঁর স্বরভঙ্গ হয়েছে সুতরাং তাঁর নিকট থেকে শ্রোতারা বক্তৃতার আশা যেন না করেন।

তিনি বললেন যে কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার জন্য নিজকে ও প্রতিনিধিগণকে অভিনন্দন জানাতে পারলে তিনি সুখী হতেন। তারপর তিনি বললেন যে বিরাট মতভেদ সত্ত্বেও প্রতিনিধিগণ আশ্চর্য্য ভাবে ধৈর্য্যের সহিত সভার কার্য্য পরিচালনা করতে দিয়েছেন তার জন্য তিনি হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। যদিও অধিকাংশ প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য রয়েছে তথাপি তিনি আশা ছাড়েন নি। তিনি বললেন যে—এমন একদিন আসবে যেদিন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন লাভ করতে পারবেন। তিনি বললেন যে পরস্পরের মতের প্রতি কি ভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয় তা তাঁরা শিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে আপাত দৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে বিরোধ দেখা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এক সঙ্গে আছেন। এক বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে দ্রুত স্বরাজ অর্জনের জন্য কোন কার্য্যই তাঁদের বিচ্ছেদ করতে পারবে না এবং তাঁরা সকলেই অহিংস অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাস করেন।

পরিশেষে তিনি প্রতিনিধিদের ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মশায়কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিলেন স্বেচ্ছাসেবকগণকে।

তারপর 'বন্দে মাতরম্' ও 'জয় জয়' ধ্বনির মধ্যে অধিবেশন সমাপ্ত করলেন।

ক্রমশঃ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

...বুদ্ধদেব এবং তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদ্-প্রণেতা ঋষিগণ কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের পেষণযন্ত্র হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি-মণ্ডল মহোদয়েরা, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল পাইয়া—তাহার শাঁস কোন কাজের হইল না, জল কোন কাজের হইল না—তাহার গাত্র হইতে রাশি রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত-পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন। এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়—কত না জানি দেশের উপকার সাধন হইতেছে। টিকিহীন মস্তকে টিকি গজাইতেছে, ফোঁটাহীন ললাটে ফোঁটা আবির্ভূত হইতেছে, বিলাতফের্ত্তারা গোবর খাইয়া তাহার প্রথম অঙ্কুর দিয়া মুখ শোধন করিতেছেন—দেশের উপকার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কী হইতে পারে? ইঁহারা এই এতগুলা ব্যক্তি, আর জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায় একাকী একজন—দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে কী মনে হয়? মনে হয় যে—অসংখ্য তৃণরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক নাগাল পায় না। যে কারণে প্রাচীন ভারত বুদ্ধদেবকে চিনিল না, ইহুদীরা ঈশাকে চিনিল না, সেই কারণেই রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কী? তাঁহার বিশ্বব্যাপী মহান্ হৃদয়কে স্বদেশের বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াও আঁকাড়িয়া পাইলেন না, তখন তাঁহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'ওটা বিধর্ম্মী—ওকে দূর করিয়া দেও।' এবং সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ত্রুটি করেন না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ সোপানে যাঁহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী লোকদিগের নাগাল ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থান করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ভ্রাতাদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা গঞ্জনার ধুলা-কাদা ইঁট পাটকেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।...

......ইউরোপীয়েরা দেশানুরাগের উত্তেজনায় কেমন অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করে এবং কেমন অবলীলাক্রমে তাহা করে, তাহা আমরা প্রত্যহই চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি; কিন্তু কুলানুরাগের উত্তেজনায় আমরা কি করি? করিবার মধ্যে করি কেবল—গাঁয়ে মানে না আপনি মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির প্রচার অথবা, যাহা একই কথা, হিঁদুয়ানির শ্রাদ্ধ। কখনও বা আমরা বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা হই, তখন আমাদের প্রতাপ দেখে কে?—এঁকে জাতে তুলিতেছি, ওঁকে জাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি, এঁ'র নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতেছি, ওঁকে সমাজে চালাইয়া লইতেছি—এইরূপ গুরুতর রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া

(মহাবীর ডন্‌কুইক্‌সোট আমাদের কাছে কোথায় লাগে!) আমরা আপনাআপনাকে সিংহ-শার্দ্দূল অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলানুরাগ হইতে আমাদের দেশে কার্য্য বড়জোর এই যা সম্ভব, এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না।

যদি বল 'দেশানুরাগ'! তবে তাহার এখনও ঢের বাকি, আমাদের দেশে তাহার গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব, আমাদের স্বদেশানুরাগও আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী নহে। বিলাতি ধুতির ন্যায় আমাদের বিলাতি স্বদেশানুরাগ ইংরাজি দোকানে খুব সন্তাদরে বিক্রীত হইতেছে—টাকাটা সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে; টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু না—বামন কায়েতের কুলমর্য্যাদা, তাহার বিনিময়ে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ যে সে লোকে মনে করিলেই 'পেট্রিয়ট' নাম ক্রয় করিতে পারে। এরূপ দেশানুরাগ জিনিস খুব সস্তা বটে, কিন্তু তাহার বিস্‌মোল্লায় গলদ্। বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশানুরাগ, আর সোনার পাথর-বাটি—দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও প্রভেদ নাই।

এই বিষ সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে, সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না; সেটি পলিসীর পথ নহে, কিন্তু সত্যের পথ – ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ। এই স্থলে আমি বিনীত ভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে এই একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা চাই —যেন ভগবদ্ভক্তি বলিতে তাঁহারা কেহ প্রতিমা পূজা অথবা মানুষ পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বার হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্ভক্তি উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই আমি এখানে বলিতেছি ভগবদ্ভক্তি; আর তিনি যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মিবারই অবকাশ পায় নাই, এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত কিছু সংসার-ধর্ম্ম কুলানুরাগই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক, তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের রাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের সেরা কাজ—এই কাজটি এখনও আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে।

কুলানুরাগ এ-পক্ষের নির্ভরস্থল, দেশানুরাগ ও-পক্ষের নির্ভরস্থল, বৈরাগ্য অনুভয় পক্ষের নির্ভরস্থল। বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণ ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা সেবন করি তবে আমরা বাহিরে পরাধীন হইলেও অন্তরে স্বাধীন হই; সেই সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসে—তাহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধাসিঞ্চনে প্রাণ পাইলে মনুষ্য না করিতে পারে এমন অসাধ্য কাজই নাই। দেশানুরাগী ব্যক্তি কামান-বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় করে—এই পর্য্যন্ত; ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি হৃদয়ের অনুরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যখন অনুভয় পক্ষের মুক্তসমীরণ হইতে উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া সকল পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের নিষ্কাম সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি কার্য্যে মূর্ত্তিমান দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ কর। উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া বিদ্বেষকে অনুরাগ দ্বারা জয় করিতে হয়, অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়, পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় গুণের উচ্ছ্বাস দ্বারা বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়—তাঁহার জীবনচরিতের প্রত্যেক পত্র প্রত্যেক ছত্র তোমাকে তাহার সন্ধান বাৎলিয়া দিবে। ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধিমন্দির দেখিয়া জয় পাইও না; যতদিন সেখানে তিনি বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার গাত্রে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ এবং কণ্ঠে উপবীত—দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিস্মৃত হন নাই। অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্ভক্তি

এবং বৈরাগ্যের কৈলাসশিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রহ্মগান করিতেছিলেন ; তাহার সাক্ষী সমুদ্রের মাঝখানে

> কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
> তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি ;
> দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
> প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
> তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।

এ গীত তাঁহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান ধর্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি এ দেশ এবং এ কালে দুয়ের মধ্যস্থলে দাণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া যে চকিতের মধ্যে দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন দেখিয়া মনে হয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ; তাহা বলিয়া তাহা কৃত্রিম পলিসীর কোনো ধার ধারে না ; তাহা অকৃত্রিম অনুরাগের স্বভাবসুলভ কার্য্যনৈপুণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা—প্রত্যুৎপন্নমতি। চুনবুদ্ধি-কন্যা আত্মঘাতিনী পলিসী সেই স্বর্গীয় দেবকন্যাটির মতো সাজগোজ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চোখে ধুলা দিতে পারে, কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পলিসী-বেত্তারা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খোট্টা বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতি-গণের মধ্যে হাঙ্গামা কোনমতে ঢুকিয়া যাইতে পারিলেই ভারতভূমির হাড়ে বাতাস লাগে ; কিন্তু কেমন করিয়া যে তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না। একা কেবল রামমোহন রায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দূরদর্শী প্রজ্ঞানয়নে স্পষ্টাকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একেশ্বরবাদের জয়ধ্বজার অধীনেই হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালি খোট্টা শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে পারে, মাতা—ভারতভূমি। পিতা—স্বয়ম্ভু ভগবান্! ইউরোপীয় জাতিদিগের যতকিছু মহত্ত্বের সাধনা সমস্তই প্রধানতঃ দেশানুরাগেরই উত্তেজনা ; রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি ও নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাঁহার কাজ ফুরাইল—আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন একজন মনুষ্য সেদিন আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন তবুও আমরা তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও চিনিতে পারিলাম না। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এক ফোঁটাও অশ্রু বর্ষণ করিলাম না—অথচ আমরা 'হায় সেকাল হায় সেকাল' করিয়া বুক চাপড়াইয়া রাস্তার মাঝখানে নূতন একতরো হাসেন, হোসেনকে আসরে নামাইতেছি।—ইহাতে হাসিব কি কাঁদিব ঠিক করিয়া ওঠা দায়। হাসেন হোসেনের নাট্যাভিনয় যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। রামমোহন রায় যে-পথে নিশান ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পথের অনুযাত্রী হও। ফালতো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি মায়া-চাতুরী ছাড়ো—পলিসী ছাড়ো। সাহসে ভর করিয়া এ-পক্ষ ও-পক্ষের মধ্যস্থলে, এ-দেশ এবং এ-কালের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও ; সেই বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় কর, অনুরাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় কর ; এইরূপ কর যে, দেশের তাহাতে মঙ্গল হইবে, কুলের তাহাতে মঙ্গল হইবে, পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭।

---

*......রামমোহন রায় অবশ্য এটা জানিতেন যে, উপবীত রাখিলেও স্বর্গলাভ হয় না, উপবীত ফেলিয়া দিলেও জাত যায় না।.. নীচের পইটা ছাড়াইয়া উপরের পইটায় উঠিলে নীচের পইটার কতকগুলি অবয়বের ছাপ তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে—যদিচ বর্ত্তমান পইটায় তাহা আদবেই কোনো কাজে লাগে না।......

সাগর পারে

সীতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এ বাড়ীটাতে গুছিয়ে বসতে একটু সময় লাগল। পারিবারিক বিপর্য্যয়ের ফলে কয়েক দিন নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, এখন আবার একত্রিত হলাম। দেশ থেকে আমার শ্বশুর ও ছোট ননদ এলেন। বাড়ীটা দোতলা। একতলায় অন্য ভাড়াটে। দুতলার সিঁড়ির দুপাশে দুটি ফ্ল্যাট। একটিতে গৃহ-স্বামী নিজে থাকেন সপরিবারে আর একদিকের ফ্ল্যাটটি আমরা ভাড়া নিলাম। ঐ মহারাষ্ট্রীয় পরিবারটি আয়তনে নিতান্ত মন্দ ছিলেন না। কর্ত্তা, গিন্নি, গিন্নির একজন বিধবা বোন এবং ছেলেমেয়ে ছ'সাতটি। মেয়েগুলি মন্দ ছিল না। তাদের একটি জ্যাঠতুতো বোনও তাদের সঙ্গে থাকত মনে হচ্ছে। ওরা সব ক'জনই অবিবাহিত, পনেরো থেকে পাঁচ-এর মধ্যে বয়স, তবে আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। কর্ত্তা অতি কর্ম্মব্যস্ত তাঁর সঙ্গে কোনোদিন বাক্যালাপ হয়নি। গৃহিণীটি একটু রাশভারি তবে নাকতোলা type-এর নয়, কথাবার্ত্তা বললে বেশ সহজ ভাবেই গল্প করতেন। তাঁর বিধবা ছোটবোন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, কথাবার্ত্তা প্রায় বলতেনই না। বোনঝির দল তাঁকে ডাকত "ভিমি" বলে, সত্যই তাঁর নাম "ভীমা" ছিল কি না জানি না, তবে চেহারায় একেবারেই ভীমা ছিলেন না, অতিশয় রোগা সোগা মানুষ।

দিন একরকম একঘেয়ে ভাবেই কেটে যেতে লাগল। নিজের পীড়িত মেয়ে নিয়ে আমি নিজের ঘরে বসে থাকতাম, আর এক শূন্য ঘরে আমার বড় জা বসে থাকত। তবে দুই ঘরেই নূতন অতিথি আসবার সম্ভাবনা ঘটেছিল। তাদের জন্য প্রস্তুতি কিছু কিছু চালাতে হচ্ছিল। আত্মীয়-স্বজন কিছু এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। দুটি নূতন আয়ারও সন্ধান করা হচ্ছিল অনাগত শিশুদের জন্য। বাড়ীতে কিছু জন-সমাগম ঘটেছিল, তা ছাড়া পাশের বাড়ীর মেয়েরা ছিল, গল্প করতে প্রায়ই জুটে যেত। এদের মধ্যে রমা বলে একটি মেয়ে গল্প করতে খুব ওস্তাদ ছিল বলে মনে পড়ে। আমি তাদের চেয়ে অনেক বড়, তা ছাড়া উচ্চশিক্ষিতা বলে একটা নামডাক ছিল, আমার সঙ্গে তার তত জমত না। বড় জা সুহাসিনী বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, কাজেই তার সঙ্গেই জমত বেশী।

এই পরিবারটি কতদিন আগে দেশ থেকে এসে ব্রহ্মদেশে বাসা বেঁধেছিলেন জানি না, তবে দেশের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ছিল খুব। প্রায়ই ভারতীয় অতিথি এসে দেখা দিতেন তাঁদের বাড়ী। মধ্যে মধ্যে আমার চেনা লোকও বেরিয়ে পড়ত তাদের মধ্যে। একদিন Bomanji বলে এক পার্শী ভদ্রলোক আমি পাশের বাড়ী থাকি শুনে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। গেলাম দেখা করতে। তিনি বোধহয় রেঙ্গুন কোর্টে ব্যারিষ্টারি করতেন তখন। আবিষ্কার করলাম যে, আমার বাল্যকালে এলাহাবাদে থাকাকালীন তাঁকে দু একবার আমাদের বাড়ী দেখেছি। আমার বাবার সঙ্গে দেখা

করতে আসতেন। এঁরই এক ভাই, আর এক বোমানজি শান্তিনিকেতনে খুব যাওয়া-আসা করতেন, ওখানের সব কিছু সম্বন্ধে খুব interest দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উল্লেখ করতেন "বামনজী" বলে। সেটা কৌতুকবশতঃ কি আর কোনো কারণে তা ঠিক জানি না।

আর একদিন শুনলাম লালা লাজপত রায় তাঁদের বাড়ীতে রাত্রে ডিনার খেতে আসছেন। ওঁকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম, এলাহাবাদে তিনি আমাদের বাড়ী এসেওছিলেন। আমি গৃহস্বামিনীকে বলে পাঠালাম যে, আমি একটু ঐ ধন্যনামধন্য অতিথির সঙ্গে দেখা করতে চাই, তিনি আমার বাবার বন্ধু। তিনিও তৎক্ষণাৎ রাজী, কর্ত্তা আবার তদুপরি বলে পাঠালেন, আমি যেন রাত্রি বেলা তাঁদের ডিনারেও যোগদান করি। সেটা অবশ্য আমি সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করলাম।

লাজপত রায়ও এলেন। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। দেখলাম আগের মত আর দেখতে নেই। অনেক রোগা আর বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। আমার পরিচয় শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। বাবা জেনেভায় গিয়েছেন শুনে বললেন, "তোমার বাবা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে পেলে আর কিছু চান না। আমি নিতান্ত বাধ্য না হলে কোথাও বেরই না।" অল্পক্ষণ পরেই চলে এলাম।

এই বাড়ী আসার পর আমাদের একজন সহৃদয় বন্ধু জুটেছিলেন। ইনি সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নাম শুনে বা কথাবার্ত্তা শুনে বুঝবার উপায় ছিল না যে তিনি বাঙালী নয়। বাংলা ঠিক বাঙালীর মতই বলেন তবে তিনি আসাম প্রদেশের অধিবাসী। ব্রাহ্মসমাজের লোক, কাজেই আমাদের বাড়ী খুব শীঘ্রই এলেন। ইনি রেঙ্গুন মেল্ দৈনিকের সম্পাদক হয়ে এসেছিলেন, এবং আমরা যতদিন ব্রহ্মদেশে ছিলাম ততদিন ওখানেই ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বেশীর ভাগ ভারতীয়েরা ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করেন তখন ইনিও চলে আসেন। ঐখানে থাকা কালীনই তিনি আমার একটি বাঙালী ছাত্রীকে বিবাহ করেন। দুঃখের বিষয় সে ভদ্রমহিলা আর এখন জীবিত নেই। সুরেশবাবু ওখানে আসার কিছুদিন পরেই তাঁর এক বন্ধু মহেন্দ্রনাথ ফুকনও ওখানে আসেন। তিনিও কাগজ সম্পাদনে সুরেশবাবুকে সাহায্য করতেন। ইনি খুব artistic temperament-এর মানুষ ছিলেন। নানা দিকে এঁর interest ছিল, তার মধ্যে অভিনয় করা একটি।

আমরা যতদিন ওখানে ছিলাম, ততদিন সুরেশবাবু যখন যেমন দরকার হত, আমাদের সাহায্য করতেন। এটা শুধু যে আমাদের বাড়ীতেই করতেন তা নয়, পরোপকারী বলেও খুব তাঁর নাম রটে গিয়েছিল। আর এক বাঙালী পরিবার একবার খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়ীর এক মহিলাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আর কেউ আমাদের বাড়ী না আসুক, আমি জানি সুরেশবাবু নিশ্চয়ই আসবেন।"

সুরেশবাবু যখন প্রথম ওখানে যান, তখন কাগজের সম্পাদকরূপে প্রায়ই বড় বড় সিনেমা হাউসে complimentary টিকিট পেতেন। নিজের জন্য ও বন্ধুদের জন্য একটা গোটা boxই পেতেন প্রায়। তিনিও তখন অবিবাহিত মানুষ, অত টিকিট দিয়ে কি করবেন, এগুলি আমাদের বড়ই কাজে লাগত। ভাল ভাল ছবি যে কত দেখেছি তার ঠিক নেই। তার ভিতর দুটির কথা মনে পড়ে Ten Commandments এবং Ben Hur। এক একটা ছবি একবারের বেশীও দেখেছি।

সব চেয়ে খুশি হয়েছিলাম Anna Pavlovaর নাচ দেখে। এঁকে এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। যখন নাচ দেখতে গেলাম, মনে হল যেন magic দেখছি। মহিলার বয়স তখন ৪৪ বা ৪৫ হবে, অথচ মনে হচ্ছিল যেন ১৭ কি ১৮ বছর বয়সের তরুণী। দেহটা যেন রক্ত মাংস দিয়ে গড়া নয়, জ্যোতির্ম্ময় অন্য কোনো উপাদানেই গড়া। সঙ্গের নর্ত্তক তাঁকে এমন অবলীলায় ঘাড়ে মাথায় তুলছিলেন যেন তিনি শোলা দিয়ে তৈরি। একটি জিপ্সীদের নাচ ও একটি রাধাকৃষ্ণের নাচ দেখলাম। শুনেছিলাম যে রাধাকৃষ্ণের নাচে, কৃষ্ণের ভূমিকায় নাকি উদয় শঙ্কর কোথাও কোথাও অবতীর্ণ

হয়েছিলেন তবে রেঙ্গুনের স্টেজে তিনিই ছিলেন কি না তা আমার মনে নেই।

এই অনন্তযৌবনা উর্ব্বশীকে কলকাতায় ফিরে আসার পরে আর একবার দেখেছিলাম। তখনও সেই এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। বয়স যেন এক দিনও বাড়েনি, রূপ একতিলও ক্ষয় হয়নি। অথচ বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। এরকম মানুষ ক্ষণজন্মা, শিক্ষায় দীক্ষায় গড়ে পিটে এদের তৈরি করা যায় না। এঁর জায়গা বোধ হয় কোনোদিনই আর পূর্ণ হবে না।

আর একটি নাচের দলের কথা বেশ মনে পড়ে। এঁরা অবশ্য Anna Pavlovaও সমপর্য্যায়ের নয়, তবে ঐ সময় পাশ্চাত্ত্য জগতে এঁরাও খুব কুশলী শিল্পী বলে যশস্বী হয়েছিলেন। এঁরা আমেরিকান দুজনেই। নর্ত্তকীর নাম Ruth Denis এবং নর্ত্তকের নাম Ted Shawn. পুরুষটির Red Indian শিকারীর নৃত্য দর্শকবৃন্দকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। মহিলাটি দেখতে খুব সুন্দরী, নাচতেও পারতেন খুব ভাল। ইনি একটি ময়ূরকণ্ঠী রংএর বুটি দেওয়া বেনারসী পরে এমন সুন্দর নেচেছিলেন যে সে ছবিটি যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। শাড়ী পরা ব্যাপারটাকেই যেন তিনি একটা নৃত্যনাট্যে পরিণত করেছিলেন।

এ ছাড়া আরো যে কত থিয়েটার আর ছবি দেখেছিলাম তার ত গোণাগুন্তি নেই। তখন বয়সটা ছিল অল্প, আমোদ-প্রমোদের দিকে একটা স্বাভাবিক টান ছিল। বাড়ীর আবহাওয়াটা প্রায়ই tragic থাকত, তবুও সেটা অতিক্রম করে মানুষের স্বভাব বৈচিত্র্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। এই সময়ই একটা ইংরেজি নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম Journey's End বলে, সেটা খুব ভাল লেগেছিল। রেঙ্গুনে ছবি বা থিয়েটার ভাল যা কিছু আসত, বেশীর ভাগই পাশ্চাত্ত্য, দেশী জিনিষের বেশী আদর ওখানে দেখতাম না। ভারতীয় ছবি মধ্যে মধ্যে আসত, ব্রহ্মদেশীয় ছবি কোনোদিনই দেখিনি, বোধহয় হতও না তখন। ও দেশের "পোয়ে" নাচের খুব নাম শুনতাম, তাও খুব বেশী কিছু দেখিনি। যা ছিটে ফোঁটা দেখেছি তা কিছু ভাল লাগেনি। ওদেশের লোকেরা খুবই আমোদপ্রিয়, নাচ গান হল্লোড় খুব ভালবাসে। তবে কোনো art-কেই তারা খুব উচ্চ স্তরে তুলতে পেরেছে বলে মনে হত না। Public Festival তেমন কিছু তাদের আমি দেখিনি। বর্ষা নামার আগে তারা এর ওর গায়ে জল ঢেলে দিয়ে একটা উৎসব করে। দলে দলে পায়ে হেঁটে, truckএ চড়ে, গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ায় আর লোকের গায়ে জল দেয়। অনেকটা আমাদের হোলি খেলার মত। তবে শুধুই জল, তাতে রং বা অন্য কিছু নোংরা কখনও মেশায় না। আর কেউ অপত্তি করলে কখনও তার গায়ে কিছু দেয় না। অন্যদেশীয় লোক যাঁরা এখানে থাকেন, তাঁরা নিজেদের নিয়ম মত সব পালা পার্ব্বণই করেন। দুর্গাবাড়ীতে ঘটা করে দুর্গা পূজা হয়। খ্রীষ্টানরা বড়দিন পালন করেন, ইষ্টার পালন করেন। ওখানে মাদ্রাজীদের মধ্যে অনেক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। তারা ত একমাস আগে থাকতে Christmas-এর জন্য তৈরি হয়। যার যেমন সাধ্য নূতন পোশাক আশাক তৈরি করে। ছোট ছেলেরা রাত্রে মিছিল করে Carol গেয়ে বেড়ায়। ২৫শে ডিসেম্বর সবাই সেজে গুজে গির্জ্জায় যায় এবং ভাল করে খাওয়া দাওয়া করে। আমরাও ওখানে মাঘোৎসবের সময় ঘটা করেই উৎসব করতাম। ১১ই মাঘ প্রীতি ভোজন হত, বালক-বালিকা-উৎসবও ঘটা করেই হত। ব্রাহ্ম যাঁরা নন, তাঁরাও অনেকে খুব উৎসাহ সহকারে এ সবে যোগ দিতেন। বাঙালীদের এখানে অনেক আড্ডা Club ইত্যাদি ছিল। চট্টগ্রামবাসীদের আবার আলাদা Club ছিল। স্থানীয় অনেক লোক চট্টগ্রামবাসীদের বাঙালী বলে স্বীকার করত না, এঁরা কার্য্যতঃ যেন সেটা স্বীকারই করে নিয়েছিলেন।

আমার স্বামীর ছোট বেলার থেকেই অভিনয় করার নেশা ছিল। এখানে এসে তাঁর দুজন খুব উৎসাহী সহযোগী জুটেছিলেন। একজন Rangoon Mail-এর মহেন্দ্র ফুকন আর একজন কলকাতার সাহিত্যিক

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। ইনি কি কার্য্য উপলক্ষে জানি না, বছর কয়েক তখন এখানে এসে ছিলেন। এঁদের বেশ একটি দল গড়ে উঠেছিল। কয়েকটা অভিনয় তাঁরা এখানে করেছিলেন, সেগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এর মধ্যে গিরীশচন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" আমি দেখেছিলাম। সব জড়িয়ে অভিনয় ভালই হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিনয় ছাড়া আর কোনো অভিনয় আমি দেখিনি। পেশাদার বাঙালী থিয়েটার ত জীবনেই দেখিনি। তবে এঁদের অভিনয় ভালই লেগেছিল। একটা খুঁৎ ছিল, সেটা সেকালে অনিবার্য্য ছিল। স্ত্রীলোকের ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করেছিলেন, কারণ তখনকার দিনের বাঙালী ভদ্রমহিলারা কখনই ষ্টেজে উঠে পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় করতে রাজী হতেন না। পুরুষরা করলেও একটা মেয়ের পার্ট বেশ ভাল হয়েছিল বলে মনে পড়ে। প্রফুল্ল নাটকে জগমণির ভূমিকায় সুশান্ত দত্ত বলে এক ভদ্রলোক অভিনয় করেছিলেন, সেটা খুবই realistic এবং কৌতুক উদ্দীপক হয়েছিল। "পাহারাওয়ালা মাঁয়"র অপূর্ব্ব চেহারা আমার এখনও মনে পড়ে।

ওখানের বাঙালী স্কুল 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী'র মেয়ে বিভাগের ছাত্রীরা একবার "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় করেছিল, তা ভালই লেগেছিল।

ওখানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দ্বারা চালিত একটি বড় হাসপাতাল আছে। ওখানকার যে স্বামীজি এসবের দেখাশুনা করতেন তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসতেন। তাঁর নাম স্বামী শ্যামানন্দ। তাঁর সঙ্গে একবার তাঁদের hospital দেখতে গিয়েছিলাম। খুব বিরাট প্রতিষ্ঠান, দরিদ্র রোগীই বেশী দেখলাম। এঁরাই চালান মনে হল, paying ward আছে বলে মনে হয় নি। অবশ্য আমার ভাল করে এখন কিছু মনে নেই।

ওখানেও একটি বড় চিড়িয়াখানা আছে শুনে একদিন দেখতে গিয়েছিলাম। তবে দেখে বিশেষ কিছু খুশি হতে পারলাম না। জানোয়ার অনেকগুলি দেখলাম বটে, তবে তারা বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা ঠিক বোধগম্য হলনা। রেঙ্গুনে Royal Lakes প্রভৃতি আরো দু-একটা বেড়াবার জায়গা আছে, সেখানেও গিয়েছি দুচার দিন। দেশ থেকে শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়স্বজন দুচারজন মধ্যে মধ্যে এসেছেন। আমার বাপের বাড়ীর দিক থেকে আমার দাদা একবার গিয়েছিলেন। আর একবার কয়েক বৎসর পরে বাবা কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলেন ইউরোপ থেকে ফিরবার পথেই বোধ হয়। আর কেউ কোনোদিন যান নি।

১৯২৫ এর শেষে November মাসেই সম্ভবতঃ আমার ছোট ভাই অশোকের বিয়ে হয় স্যার নীলরতন সরকারের ছোট মেয়ে কমলার সঙ্গে। বিয়ে অনেকদিনই ঠিক ছিল, কমলাও আমাদের বাল্যকাল থেকেই সুপরিচিতা, তবু আমাদের বাড়ীর বউরূপে তাঁকে দেখবার বাসনাটা ছিল। তা ছাড়া অশোকের বিয়ে আমাদের বাড়ীর শেষ বিয়ে। কিন্তু বিয়েতে যেতে আমি পারলাম না। পূজোর সময় আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এর আগে অনেকদিন আমি অসুস্থ ছিলাম এবং ছেলে হবার পর সারতেও আমার অনেকদিন লাগল। কাজেই সাগর পাড়ি দেবার সাধ্য আর আমার হল না। এরই মাস দেড়েকের মধ্যে আমার বড় জা সুহাসিনীরও একটি কন্যা হল। কন্যার নাম হল শান্তি এবং ছেলের নাম হল অনিরুদ্ধ।

এই সময় দুটি নূতন আয়ার আবির্ভাব হল বাড়ীতে সুহাসিনীর কন্যার জন্য যিনি এলেন তিনি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা, তবে অতি সুসজ্জিতা এবং খুব দ্রুতবেগে ইংরেজি বলেন। নাম কিটি। দেশী নাম হয়ত কিছু ছিল, সেটা সে কখনও বলত না। মাদ্রাজী রোম্যান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। মেম-বাড়ীতে অনেক কাজ করেছেন সেটা তাঁর ইংরেজি বলা এবং নানারকম সৎ ও অসৎ অভ্যাসের দ্বারাই প্রমান হত। যা হোক তিনি বেশীদিন রইলেন না, কাজেই তাঁর বিষয়ে আর বেশী কিছু লিখবার নেই।

আমার শিশু পুত্রের জন্ম যে আয়াটি এল, সেও মাদ্রাজী খ্রীষ্টান, নাম উৎরিও মারী অম্মল। আয়া হলে কি হবে, এর মত remarkable স্ত্রীলোক আমার জীবনে আমি কমই দেখেছি। এরা তিন পুরুষে খ্রীষ্টান কাজেই অনেকটা কায়দাদুরস্ত হয়ে গিয়েছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, আবার পরিবারের মধ্যে বেশ উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকও ছিল। আয়ার একজন মাসতুতো ভাই ব্যারিষ্টার ছিলেন। বড় রেল কর্ম্মচারীও দু-একজন ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, এতে এদের সামাজিক ভাবে মেলামেশা করায় কিছুই এসে যেত না। সমানেই সকলের বাড়ী সকলে যাওয়া আসা করত। এইটা আমার বড় ভাল লাগত। বাঙালী হিন্দুঘরে হলে উচ্চ-পদস্থ আত্মীয়েরা এ-সব আয়া চাকর শ্রেণীর আত্মীয়দের চোখ চেয়ে দেখতেই পেত না। এদের ও-সব কোনো বালাই ছিল না। নিজের ভাষায় লেখাপড়া খানিক দূর সে শিখেছিল। ইংরেজি বলতে পারত, বুঝতেও পারত। তেলেগু ভাষাও জানত। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরেই চাকুরে স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, তবে বিবাহিত জীবনে সে সুখী হতে পারেনি। স্বামীর স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। অল্পবয়সে পাঁচটি সন্তান নিয়ে সে বিধবা হয়। তখন থেকে সে খেটে খাচ্ছে, কোনো ধনী আত্মীয়ের দ্বারস্থ হয় নি।

মাঝারি আকৃতির আঁট সাঁট গড়নের শ্যামাঙ্গী মানুষ। শরীরে সামর্থ্য যেমন, মনে সাহস তেমন। কখনও কোনো কাজে পেছত না। দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে নিয়ে বস্তীতে বাস করত, এবং বস্তী জীবনের যত রকম দুর্ভোগ আছে, অনায়াসে তার মোকাবিলা করত। শক্ত পোক্ত পুরুষ মানুষরাও সব কাজে তার পরামর্শ নিত। মারামারি লাগলে নির্ভয়ে ডাণ্ডা হাতে এগিয়ে যেত, এবং প্রতিপক্ষকে হঠিয়ে দিয়ে ছাড়ত।

এদিকে মনে তার দয়ামায়া খুব ছিল। অন্যায় দেখলে যেমন গর্জ্জন করে লাঠি হাতে দাঁড়াত, দুঃখীর দুঃখেও নিজের সীমিত সম্বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বস্তীবাসী কত মেয়েকে যে সে রোগে ও সন্তান-সম্ভতি হওয়ার পর খাবার জোগাত তার ঠিক নেই। আমি মধ্যে মধ্যে জানতে চাইতাম, ওরা তোমার কে হয়? বলত, কেউ হয় না, এক জায়গায় থাকি তাই। মাতাল, অকর্ম্মণ্য বুড়ো পুরুষ মানুষকে যেমন রেগে গাল দিত, তেমনি তাদের সাহায্য করতে, কাজ জুটিয়ে দিতে সব সময় তৎপর ছিল। তাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক? না তারা এক জাতের। জাত বলতে সে বুঝত এক ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ তারাও রোমান ক্যাথলিক। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় আস্থা ছিল, এবং গৌরব বোধও ছিল অত্যন্ত। গির্জ্জায় যাওয়া, এবং সব ক'টি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা এ সে অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে করত। আমার বাড়ী যখন সে কাজ করতে আসে তখন তার দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। Anthony ও Xavier ওরফে দাসু, এই দুটি ছেলে বড় Ruth এবং Papa এই দুটি মেয়ে ছোট। এরা সারাদিনই আমার বাড়ী যাওয়া-আসা করত এবং শেষের বছর-দুই সকলে আমার বাড়ীতেই ছিল। বড়মেয়ে রুথ দেখতে কালোর মধ্যে বেশ শ্রীমতী ছিল, পাপার ভাল নাম যে কি ছিল তা এখন আমি ভুলে গিয়েছি। সে চেহারায় এবং ধরণ-ধারণে খুব বেশী Uncle Tom's Cabinএর টপসীর মত ছিল। সব ক'জন মিলে বাড়ী সরগরম করে রাখত। এরা স্কুলে যেত, এবং রোমান ক্যাথলিক বালক-বালিকার করণীয় সব রকম ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। প্রতি খ্রীষ্টোৎসবে তাদের জন্ম নূতন পোশাক করা হত, এবং সাধ্যমত সুখাদ্য প্রস্তুত করে আয়া তাদের খাওয়াত। তামিল কথা যেমন শুনে শুনে আমি খানিকটা শিখে গিয়েছিলাম, তামিল রান্নাও চেখে দেখবার অনেক সুযোগ ঘটেছিল। তামিল জলখাবারও। এগুলির ভিতর দু-চারটে ভালই লাগত। তবে চালের গুঁড়োর আধিক্য ছিল বেশী, এবং মিষ্টির এরা বিশেষ ধার ধারত না। সুজি ও চিনি দিয়ে হালুয়ার বদলে ওরা সুজি, নুন, লঙ্কা দিয়ে হালুয়া বানাত। এর এক মাসতুতো বোন অভাবে পড়ে মাদ্রাজী খাবার তৈরি করে বিক্রী করত। মানুষটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং জানাশোনা,

কাজেই তার কাছে মাদ্রাজী "আপো" এবং "দোসে" আমি প্রায়ই কিনতাম। খাবারগুলি মন্দ নয়। আমার দ্বিতীয়া কন্যা যখন কথা বলতে শিখেছিল, তখন এই মহিলাকে সে "আপোআম্মা" বলে উল্লেখ করত।

আয়া শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার মধ্যেই কাটিয়েছিল। এর কিছু কিছু প্রমাণ তার পোশাক-পরিচ্ছদও গহনাগাটির মধ্যে ছিল। সাধারণতঃ সাজগোজ বেশী কিছু করত না, তাদের জাতের সাদাসিধা রঙীন জামা কাপড়ই পরত। এ সব মেয়েরা শাদা শাড়ী কদাচিৎ পরত। তবে কোনো পর্ব্ব উপলক্ষে বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে কোনো উৎসব হলে তাকে খুব দামী দক্ষিণী রেশমের শাড়ী এবং গলায় সুন্দর কারুকার্য্য করা সোনার কণ্ঠী পরতে দেখতাম। ঐ দু-তিনটি জিনিধ তার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পন্ন জীবনের চিহ্ন ছিল, ছেলে-মেয়েদের জন্যে তুলে রেখে দিয়েছিল।

এই নূতন খোকা-খুকী দুজন এসে বাড়ী আবার খানিক জমজমাট হয়ে উঠল। আমার শ্বশুর এবং ছোট ননদ এসে কিছুদিন থেকে গেলেন। আমার শরীর ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন কোনো সময়েই ভাল থাকত না, ভাল মন্দ মিশিয়ে দিন কাটতে লাগল। পাড়ায় একজন চট্টগ্রামবাসিনী লেডী ডাক্তার ছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যেতাম। তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, পোশাক আশাকও মেমসাহেবের মত করতেন। নামটাও বিদেশী ছিল। তবে মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গল্পগাছা করতে কখনও কোনো বাধা অনুভব করিনি। তাঁর বাবা বোধহয় যৌবনকালে পূর্ব্ববঙ্গের ভাওয়াল রাজবংশে কাজ করতেন। ঐ রাজবাড়ীর কুমার রমেন্দ্র নারায়ণের পরিবারের লোকজনের অনেক গল্প করতেন। ইনি সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়ে আমাকে সাহায্য করতেন; শুধু যে ডাক্তারির ক্ষেত্রেই তা নয়। যতদিন ওখানে ছিলাম, ততদিন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আমি কলকাতায় ফিরে আসার পরেও ইনি যখনই কোনো কাজে কলকাতায় এসেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করেছেন।

এক ভাবেই দিন কাটছিল। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। তারপরেই এল আমার ব্রহ্মদেশ বাসে সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখের দিন। আমার ছেলে এবং বড় জা সুহাসিনীর মেয়ে প্রায় একই সঙ্গে দারুণ রক্ত আমাশা রোগে আক্রান্ত হল। চিকিৎসা বিভ্রাট খানিকটা হল। অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলায় চূড়ান্ত হল। নিজের ইচ্ছামত ঠিক কিছু করতে পারব না বুঝতে পেরে আমি রুগ্ন শিশুপুত্র নিয়ে বাড়ী ছেড়ে যাওয়াই ঠিক করলাম। অত তাড়াতাড়িতে কোথায় জায়গা পাওয়া যায়? সুরেশ ভট্টাচার্য্য তাঁর ছোট flat তখনই ছেড়ে দিলেন, বললেন, ওখানে গিয়ে উঠুন আপনারা, দুটো ছোট ঘর আছে আপনাদের চলে যাবে। আমি আফিসের বাড়ীতে ঠিক থাকতে পারব। আমরা গিয়ে সেই flatএ উঠলাম। রুগ্ন বড় মেয়েকে এই দারুণ রোগের ছোঁয়াচের মধ্যে রাখার সাহস হল না। তাকে তার চাকরের সঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী তাকে অতি স্নেহের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। বেশ কয়েকদিন তাকে সেখানে থাকতে হল।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর প্রসঙ্গে এর আগে লিখেছিলাম যে, শুনেছিলাম তিনি পরলোক গমন করেছেন। খবরটা যিনি আমায় দিয়েছিলেন তিনি ভুল করেই দিয়েছিলেন বোধহচ্ছে। এখন এক বন্ধুর চিঠিতে জানলাম যে, জ্ঞান রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় জীবিত আছেন এবং কলকাতার উপকণ্ঠেই বাস করেন। এতে আনন্দিত হলাম, এবং নিজে ভুল তথ্য পরিবেশন করার জন্য লজ্জিত হলাম।

আমাদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও আমরা আমাদের শিশু পুত্রকে বাঁচাতে পারলাম না। প্রথমেই চিকিৎসায় মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছিল। সেই চিকিৎসার দ্বিতীয় দিন রাত্রেই আমরা তাকে হারালাম।

তখনকার অবস্থা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই। জীবনে এই আমার প্রথম সন্তান শোক। নিজে তখন আবার হঠাৎ পীড়িত হয়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম। বাধ্য হয়ে আরো দু-একদিন আমাকে ঐ বাড়ীতেই

আটকে থাকতে হল। কিন্তু ভদ্রলোককে কতদিন আর তাঁর বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে রাখা যায়? আগের বাড়ীতে, ঐ যৌথ পরিবারের মধ্যে আর ফিরব না ঠিকই করেছিলাম। ঐ পাড়ার মধ্যেই তিনজন বাঙালী অধ্যাপক একটা ফ্ল্যাট নিয়ে মেস করে থাকতেন। সেই সময় কি কারণে জানি না তাঁরা তিনজনেই দেশে চলে গিয়েছিলেন। ফ্ল্যাটটি যাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল তাঁর অনুমতি নিয়ে আমরা দিন দুই পরে সেখানে উঠে গেলাম। পূর্ব্বের বাসস্থান থেকে কিছু কিছু জিনিষপত্র আনিয়ে নিলাম। জ্ঞানরঞ্জনবাবুদের বাড়ী থেকে বড় মেয়েটিকেও আনিয়ে নিলাম। শুনলাম, সুহাসিনীর মেয়ে ক্রমে ভাল হয়ে উঠছে।

ঐ পাড়াতেই Bigandet Streetএ একটি ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গেল। সব জিনিষপত্র আনিয়ে নিয়ে ঐ বাড়ীতে এসে উঠলাম। পুরণো আয়াকে আনিয়ে নিলাম নূতন চাকর একটা রাখলাম। এ বাড়ীতে এসেই একজন পূর্ব্বপরিচিত লোক পাওয়া গেল। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা দুজনেই ময়মনসিংহের লোক, কাজেই আমার স্বামীর সঙ্গে চেনাশোনা ছিল। আমার একটা সুবিধা হল যে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজটি খুবই কাছে ছিল। প্রবীণ ব্রাহ্ম কুলদা প্রসাদ নিয়োগী এইখানেই বাস করতেন, তাঁর স্ত্রী আমার খুব খোঁজখবর নিতেন। আর একজন অনেক কাল ব্রহ্ম-প্রবাসী ব্রাহ্ম ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার এখানেই বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। এঁরা আমাদের খুব সাহায্য করতেন দরকার হলেই। এঁদের বাড়ীরই একটা অংশে আর একজন ব্রাহ্ম ভাড়াটিয়া বাস করতেন, এঁদের গৃহিণীর দুই বোনকে এক সময় আমি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়িয়েছিলাম। ভদ্রলোক ভারি সুকণ্ঠ ছিলেন, এত সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত করতেন যে সেজন্যেই তাঁদের মনে আছে।

এই বাড়ীটাতে যতদিন ছিলাম, খানিকটা নিশ্চিন্ত-তার মধ্যে ছিলাম। বড় রকম দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে একটু যাওয়া-আসাও হত। মাঘোৎসবাদিতেও যেতাম। এই বাড়ীতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা সুস্মিতা জন্মগ্রহণ করে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হয়েছিল যে এখানে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথ একবার রেঙ্গুন বেড়িয়ে যান। আমার বাবাও একবার ইউরোপ ঘুরে ঘরে ফিরবার মুখে আমাকে দেখে যান।

পাড়াটা মন্দ ছিল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেক গল্প লেখার মাল মশলা পাওয়া যেত। গোটা দুই-তিন উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোট গল্পের খোরাক এইখান থেকে জোগাড় করা। মোটামুটি ভদ্রলোক এবং ব্যবসাদার লোকই এখানে থাকত। আমার উপর তলায় একজন Anglo Indian সাহেব থাকত, তার সঙ্গিনী মেমটি বেশ সুন্দরী। তবে রেঙ্গুনে সর্ব্বদাই অজানা লোক সম্বন্ধে সাবধান হয়ে চলতে হত। কখন কার পেট থেকে কি বেরয় তার ঠিক নেই। আয়া সারাক্ষণ আমাকে সাবধান করত, "এ সব মেম সাহেবদের সঙ্গে বেশী কথা বোলো না আম্মা, দুদিন পরেই টাকা ধার চাইবে এবং কোনো দিনও তা শোধ দেবে না।" বাস্তবিক হয়েও ছিল তাই।

পাশের বাড়ীটাতে এক সাহেবী পোশাক পরা মহিলা বাস করতেন, গায়ের রং কাল। সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক সাহেব থাকত। বোধ হয় গান্ধর্ব্ব বিবাহের পতি। মহিলার মেজাজ অতি রুক্ষ ছিল, ঝগড়াঝাঁটি তাদের প্রায় সারাক্ষণই লেগে থাকত। গালাগালির শব্দে কান পাতা যেত না। বেশী রেগে গেলেই মহিলা সাহেবকে ধরে বেদম প্রহার দিতেন। সাহেবকে একদিকে ভাল বলতে হবে, সে উল্টে মারত না, খালি আত্মরক্ষার চেষ্টা করত। কিন্তু মার ত আবার নানা রকমের আছে, কেউ হাতে মারে, কেউ ভাতে মারে। একদিন সকালে উঠে শুনি মহা কোলাহল। সাহেব রাত্রে মেমের আলমারি ভেঙ্গে তার সব অলঙ্কারপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। মেম আমার আয়ার সঙ্গে আলোচনা করছেন যে কি করে

তাকে ধরা যায়। বলা বাহুল্য, ধরতে, আর তিনি তাকে কোনোদিনই পারেন নি। এদের নিয়ে আমি সেকালে "উগ্রচণ্ডা", বলে একটা গল্প লিখেছিলাম।

সুস্মিতা হবার দিন আমার স্বামী আবার কোথায় থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে চলে গিয়েছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে খবর দিয়ে আনা হল। মেয়ের আবির্ভাব যথাসময়ের কিছু আগেই হয়ে থাকবে। আমার পূর্ব্বপরিচিতা লেডী ডাক্তারটিই আমার কাছে ছিলেন এবং আমার পুরণো আয়া মেরীই নার্সের কাজ করেছিল। সে এসব কাজ ও ভালই জানত। মেয়ের নাম রাখা হল সুস্মিতা এবং চোখ দুটো তখন খুব ঘন নীল দেখাত বলে ডাক নাম তখন থেকে হয়ে গেল নীলি। এই মেয়ে ছোট বেলাতেই বড় বেশী ভাষা-সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেল। সে মা ও বাবার কাছে শুনত পশ্চিম বাংলার ভাষা। তার বাবা নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বলতেন পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা। বাড়ীর চাকর প্রভৃতি বেশীর ভাগ বলত তামিল ও হিন্দি। অতএব কোনো একটা ভাষাকে অবলম্বন না করে সে সব ক'টা ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ আহরণ করে একটা নূতন ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল। সেটা আমরা বুঝতাম ও তার আয়া সপরিবারে বেশ বুঝতে পারত, অন্যদের ততটা বোধগম্য হত না। ১৯৩০-এ আমি যখন আবার কলকাতায় ফিরে এলাম, তখনও সে ঐ ভাষাতেই কথা বলত। তার কথা বুঝতে না পেরে তার মাসতুতো বোনেরা তার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতে আরম্ভ করল।

ক্রমশঃ

অবনীন্দ্র-স্মৃতি রক্ষা প্রসঙ্গে

শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ও ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

ভূতাত্ত্বিকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, আজ যেখানে রসহীন, প্রাণহীন মরুভূমি, সেখানে এক কালে ছিল একাধিক স্রোতস্বিনী। ক্রমে ক্রমে স্রোতের বেগ এল কমে, জমে গেল কাদা আর পাঁক। এক পা এক পা করে এগিয়ে এল রসহীন মরু বালু; গ্রাস ক'রে নিল সব কিছুকে। সামান্য জল যা রইল, চলে গেল পৃথিবীর অন্তস্তলের গভীরে। গাছেরা বাঁচার তাগিদে বহুকষ্টে অনেক গভীরে শিকড় চালিয়ে দিয়ে সামান্য রস আহরণ করতে লাগল। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও এই অবস্থা দেখা যায়। প্রাক্ হরপ্পার (কালিবঙ্গন প্রভৃতি অঞ্চলে) যুগ থেকে দেখা যায় ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতিতে ছিল স্রোতের বেগ। তার ঢেউ এক কালে অন্য দেশের সংস্কৃতিতেও রসের যোগান দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার বেগেও ভাঁটা পড়ল এবং এক সময় সকলের অজ্ঞাতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল ; দেখা দিল ভারতের মানসিক নদীতে কুসংস্কার রূপী পাঁক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম নিলেন মহাত্মা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে। ডঃ রমা চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়, "বিশ্ববিধাতার মঙ্গল বিধানে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে অকস্মাৎ শত

শত সূর্য একত্রে উদিত হয়েছিল প্রোজ্জলতর প্রভায়।" ঐসব সূর্যদের কিরণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তৎকালীন সদাশয় ইওরোপীয়রা। তাঁদের সকলের প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর ঘুম ভাঙা—বিশ্বকে নতুন ক'রে জানবার আশায় জেগে উঠল।

অবনীন্দ্রনাথ ঐ সূর্যদের কিরণে প্রস্ফুটিত একটি ফুল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতবাসীরা যখন প্রাচ্যের সব কিছুতে খারাপ দেখছিলেন ও পাশ্চাত্যের চাকচিক্য-পূর্ণ, স্বার্থান্ধ সভ্যতার দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ, পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত হয়েও, ভারতের প্রাচীন গৌরব অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতির চিত্রাবলী আঁকতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর চিত্রাবলীর মধ্যে স্থান পেয়েছিল রাধাকৃষ্ণ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কচ ও দেবযানী প্রভৃতি। শিল্পচর্চাকে তিনি নীচ ব্যবসায়ীক-ভিত্তিক করতে পারেন নি। টলস্টয়ের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, "True science and true art are the products of sacrifice and not of certain material advantages।" বাস্তবধর্মীতার নামে শিল্পে আজ যে প্রহসন চলছে তাঁর দর্শনে তা স্থান পায়নি। অবনীন্দ্রনাথের দর্শন ছিল, রমাঁরলাঁর ভাষায় প্রকাশ করা যায়, "Art is the supreme play of the spirit which liberating itself from the cruel laws of life, becomes by itself the creator of life and master of laws which govern the Universe modelled by the spirit in the image of reality। এই কারণেই বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি বিশ্ব-সভায় স্থান পেয়েছিল। বহুকাল পরে ভারতের ঐতিহ্য-পূর্ণ শিল্প পৃথিবীর শিল্পীদের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বিশ্বশিল্পী সমাজ তাকে সম্মান জানাল।

অবনীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম দেখে তাঁর কাছে ছুটে এলেন মহামানবী ভগিনী নিবেদিতা; আশা, ভারতের সেবা কার্যে নতুন প্রেরণা পাবার। সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি দুই-ই তিনি পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। শুধু নিজেই নয়, অবনীন্দ্রনাথ ভারতসেবার কাজে শিষ্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন। তবে তাই বলে বিশ্বাস করা উচিত হবে না যে, তিনি দেশের কাজে বিশ্বকে ভুলে গিয়েছিলেন। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর মধ্যেও ছিল ন্যশনালিজম্ ও ইন্টার-ন্যাশনালিজমের ছাপ।

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাস থেকে চলেছে পশ্চিম বাংলার নানা অঞ্চলে অবনীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী সভা। এই সকল সভায় নানা ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছেন বটে কিন্তু খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্পর্কে সামান্য আলোচনার প্রয়াস আছে।

মহামানবের স্মৃতি রক্ষা অর্থে সাধারণতঃ আমরা বুঝি তাঁর ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিষ, কিছু কীর্তি নিদর্শন ও পত্রাবলী সংরক্ষণ করা যুগ যুগ ধরে। প্রশ্ন জাগে, সকল মানুষই কি তার পত্রাবলী, ব্যবহৃত জিনিষে রেখে যায় তার সত্তা? এটা ঠিক, কীর্তি মানুষের চিন্তার পরিবাহক। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, কয়েকটা সার্টিফিকেট সংরক্ষণ করলেই মহামানবের স্মৃতিরক্ষা করা যায় না। তাঁর জীবন-দর্শনকে রক্ষা করাই প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা। কয়েক মাস আগে পশ্চিম বাংলায় যখন ভারতের কৃতীসন্তানদের মূর্তি ভাঙার জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় কলকাতার কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, হঠকারীরা মূর্তি ভেঙে অপরাধ করেছে বলে চেঁচালেও আমরাই তাঁদের বেশি অপমান করেছি—মুখে মহামানবদের দর্শনকে আদর্শ বলে আওড়েছি বটে, কিন্তু নিজেদের বেলায় অন্য পথ ধরে সস্তায় সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেছি।

অতএব পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, আজকের দুনিয়ায় যেভাবে বক্তৃতা ও ছবিতে মালা দিয়ে মহামানবদের স্মৃতি রক্ষা করার চেষ্টা চলছে, ভবিষ্যতের কাছে তার কোন দান নেই। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য চাই সরকার ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যুক্ত প্রয়াস। মন-প্রাণ

সঁপে দিয়ে কাজ করবার মত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি ক'রে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, ভুলে যেতে হবে পদ ও ডিগ্রীর গরিমা। সকলকে সমান অধিকার ও সমান সম্মান দিলে তবেই অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার কাজ ভাল ভাবে এগুবে—নইলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

শিল্পীদের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা দরকার। কারণ তাঁরা ব্যতীত আর কারো পক্ষে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার কাজ করা সম্ভব কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁদের উচিত হবে আচার্য দেবের হাতে আঁকা সবকটি ছবি ও অন্য কোন কারু শিল্প যদি থাকে তা সংগ্রহ করে এক জায়গায় রাখা এবং পরে ঐসব ছবির সৃষ্টির কালানুযায়ী সাজান, যাতে যে কোন ব্যক্তি আচার্যদেবের প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে পারে। সরকারের উচিত হবে শিল্পীরা যাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য আর্থিক সাহায্য, বেতার ও সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণকে ঐ কাজে সাহায্য করতে উৎসাহিত করা এবং অবনীন্দ্রনাথের নামে একটি আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত সংগ্রহশালা তৈয়ারী করা। এছাড়াও প্রত্যেক সংগ্রহশালায় যাতে একটি করে অবনীন্দ্র গ্যালারি থাকে তারও ব্যবস্থা করা দরকার এবং ছবিগুলি পুনর্মুদ্রন ক'রে সাধারণের মধ্যে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সাহিত্যিকদেরও উচিত হবে, কিভাবে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি সংগ্রহ করা যায় তার পথ আবিষ্কার করা এবং সেইভাবে সরকারকে উপদেশ দেওয়া। সুতরাং বলা যায়, বুদ্ধিজীবীরাও সরকার যদি যুক্তভাবে কাজে হাত না দেন তবে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা করা কখনোই সম্ভব নয়। সবার উপরে শিল্পীদের মনে রাখতে হবে যে, অবনীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী ছিলেন। তাঁর শিল্পচেতনাকে হারবার্ট রীডের ভাষায় বলা যায়, "all that is beautiful is art or that all art is beautiful, that what is not beautiful is not art and that ugliness is the negation of art," শিল্পীরা যদি গ্রহণ না করেন তবে সংগ্রহশালার কোন দাম থাকবে না। তাঁরা পারবেন না সুন্দর ও মহান্ কিছু সৃষ্টি করতে। আধুনিক কালে শিল্পের নামে যে প্রহসন চলছে, যার সম্বন্ধে গোর্গি কেপিস্ বলেছেন, "most of the recent group of artists has returned from abstract images to concrete objects in their environment. They have become fascinated by vulgar features of everyday life, and they have chosen them as emblems. Seductive selling devices of the competitive society—advertising pictures, containers, packages, and the mass produced heroes of comic strips—are their preferred images.*** Most of the mushroom art movements seem to have forgotten the essential role of artistic creation", আরও জোরদার হয়ে উঠবে। অনেক দূরে সরে যাবেন অবনীন্দ্রনাথ, আর তাঁর বিখ্যাত শিল্পী কীর্তির নিদর্শনগুলি পড়ে থাকবে কর্মযোগীর প্রাণহীন দেহের মতো।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

তীর্থপতি মাষ্টারের সেই কথা এখনও যেন অভয় শুনতে পায়—এগিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে চল। সেই থেকে অভয় এগিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু সঠিক পথের উদ্দেশ খুঁজে পাচ্ছে না। পথ খুব জটিল, খুবই বন্ধুর আর কুটিল আর বড় যন্ত্রণাময় কণ্টকাকীর্ণ। রাত বাড়তে থাকে। অভয় নিবিষ্ট মনে পড়ে চলতে থাকে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী।

সকাল হতেই অভয় বই পত্র নিয়ে পড়াশোনার তাড়জোড করে। দুঃখ-শোক-কষ্ট এসব নিয়েই তো জীবন। তা বলে হা-হুতাশ করে এমন মানব জীবনকে সে নষ্ট করতে পারে না। তার মাথার ওপর রয়েছে কর্ত্তব্য। মা যে স্বর্গে বসে সবই দেখছেন। তাঁর আদরের খোকা—যে বড় হয়ে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করবে—তার বৃদ্ধ পিতাকে দুঃখ দারিদ্র্য থেকে শান্তি দেবে। এ যে, মা ওপরে বসে তাই ভাবছেন। বই নিয়ে বসতেই অবাক হয়ে গেল অভয়। এক হাতে চায়ের কাপ আর প্লেটে ডিম সেদ্ধ ও বিস্কুট নিয়ে আজ মিনতি আসছে।

অবাক বিস্ময়ে অভয় বলল, এ কি, তুমি যে! কেন, কানাই গেল কোথায়?

—কে, কানাই? সে আর যাবে কোথায়? আজ আমিই নিয়ে এলাম। বাড়ী থেকে ফিরে যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেছ অভয়দা।

—একার আবার? সেদ্ধ ডিমটা দেখিয়ে অভয় বলল। মিনতি বলল, মায়ের ব্যবস্থা। তোমার চেহারা খুব খারাপ হয়েছে, তাই রোজ সকালে সেদ্ধ ডিম দেবার কথা মা বলেছেন। অভয় কিছু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। মনের মধ্যে এতদিন যে অভিমানটুকু ছিল, আজ তা সবই মিলিয়ে উড়ে যায়। মানুষকে যে আমরা কত ভাবে ভুল বুঝে থাকি, তা বলা যায় না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অভয় বলে, কই, আর তো গান শুনিনে। তা এখন পড়াশোনা কেমন চলছে—

—ঐ এক রকম—মিনতি অভয়কে দেখতে থাকে।

—আমার গান কি ভাল লাগে অভয়দা—

—গান? ওঃ, খুব ভাল লাগে। অনেকদিন শুনিনি। ভোর বেলাকার গান শুনতে খবু ভাল লাগে—

মিনতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দুই তরুণ মন। একজনের মনে শোকের ছায়া। পিতা ও ভাইবোনের জন্য দুঃসহ চিন্তা। আর একজনের মন শিশিরস্নাত ফুলের মত। দেখলে চোখ জুড়োয়, মন আনন্দে মেতে ওঠে। মিনতির এই সান্নিধ্য যে কোন তরুণেরই কাম্য মনে হয়। ওর আকর্ষণ যে কত দুর্নিবার, কত মোহময় তা বোধকরি মিনতির নিজের কাছেই অজ্ঞাত। এর মধ্যে উমেশের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উমেশ কোথায় যেন যাচ্ছিল।

সে-ই ডাকল, অভয় অভয়। অভয় ফিরে তাকিয়ে দেখল উমেশ। কাছে এসে বলল, কি, আজকাল আর যে দেখতেই পাইনে। কি, ব্যাপার কি?

—ব্যাপার কিছু না। শরীর ভাল নয় আর মনটাও ভাল নয়।

—হুঁ, কিন্তু সংসার তো এমনিই। মানুষ তো মরবেই। তাই এই মৃত্যু দেখে অত উতলা হলে চলবে না। বাবা, মা কারুর কি চিরকাল বেঁচে থাকে? কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের জীবনযাত্রা যাতে সুন্দর হয়, সুষ্ঠু হয় তার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। দেশের অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছ অভয়? উমেশ অনেক

কথা বলে যায়। অভয় কোন কথার উত্তর দেয় না। যে উৎসাহ যে উদ্দীপনা এর আগে ছিল, আজ তার বাষ্পটুকুও নেই। মায়ের মৃত্যু তার তরুণ হৃদয়কে ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে। অতি অল্প বয়স থেকে রূঢ় দারিদ্র্যের মূর্ত্তি দেখেছে। অনশন অর্দ্ধাশন বহু অভাব কত দুঃখ কষ্ট তারা তিলে তিলে ভোগ করেছে। পিতা মাতার অসহায় অবস্থা দেখেছে, আর পাশাপাশি দেখেছে অবস্থাপন্ন লোকদের অবস্থা। তাদের প্রভূত প্রাচুর্য্য, তাদের অহেতুক বিলাস-বাহুল্য। দেখেছে তাদের কত অহংকার, কত অর্থ আর খাদ্যের অপচয়। কিন্তু তারা কিছু পায়নি। রোগে তারা ঔষধ পথ্য পায়নি। ভগবানের অনুগ্রহে, বহুদিন ভুগে ভুগে কোন মতে সেরে উঠেছিল তারা। ঠিক কুকুর শেয়ালের মত জীবনযাপন করেছে, আর ভিক্ষুকের মত এর ওর কাছে হাত পেতেছে। কিন্তু কোথাও সহানুভূতির কোন প্রকৃত স্বাদ পায়নি। সর্ব্বত্র থেকেই বিতাড়িত হয়েছে। তাদের দুঃখিনী মা, বহু কষ্টে মানুষ করেছেন। লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি, জল তুলে, মুড়ি ভেজে, ঘুঁটে বিক্রী করে এমনি কত কাজ করে, তা জানেন ভগবান। অভয় দেখেছে তার বাবাকে। সেই চির দারিদ্র্য, ব্যাধিতে জর্জ্জরিত, চিরদুঃখী, চিরঅভাবগ্রস্ত, এক অতি নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ মানুষকে। আশাহীন ভরসাহীন করুণ মুখ অন্নাভাবে অতি শীর্ণ দেহ চিকিৎসার অভাবে দেহ ব্যাধিগ্রস্ত। বাবার করুণ মুখ সব সময়, অভয়ের মনে, চিরকালের মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অভয় ভাবে, কি হবে অপরের কথা ভেবে। অন্যে কি তাদের এই নিঃশব্দ আত্মত্যাগের কোন মূল্য দিয়েছে? তাদের মত অপরাপর লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের জীবনের মূল্য কি দেশবাসী দিয়েছে? না, দেয়নি। আর কোনদিন দেবেও না। অভয় ভাবে, অতীতে কত সর্ব্বত্যাগী, আপন ভোলা মানুষ নিজের সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে, দেশের জন্য, দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়েছেন, এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু দেশবাসী কি তাঁদের স্মরণ করে? তাঁদের কী কোন স্বীকৃতি আজ পর্য্যন্ত দেশবাসী দিয়েছে? অভয়ের মনে পড়ছে, তার মোনাদার কথা। দেশবাসী কি সেই মন্মথর কোনও খোঁজ রাখে? তাকে জানবার কি কোনও চেষ্টা করেছে? এমনি কত শত সহস্র মন্মথ লোকচক্ষুর অন্তরালে আজও বেঁচে রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা চিরদিনই এমনি অবজ্ঞাত থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাবেন। উমেশের কথায় অভয় জবাব দেয়, দেখি। মনটা বিশেষ ভাল নয়।

উমেশ বলে, অভয় তোমার যেন কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। এর আগে যে উৎসাহ দেখেছিলাম, এখন যেন তা দেখা যাচ্ছে না। ক্লাবে তাই আমরা বলাবলি করি—

অভয় হেসে বলে, কথাটা সত্যি। কিন্তু উমেশ প্রকৃতি জীবনে দেখ। তারা ভেতর সব সময় অদল বদল হচ্ছে। পরিবর্ত্তন আর পরিবর্দ্ধন নিয়েই জগৎ চলছে। ভাঙ্গা-গড়া তো দিনরাতই হচ্ছে। সেখানে মানুষের মনের পরিবর্ত্তন হলে, বা চিন্তার পরিবর্ত্তন হলে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আমার তো মনে হয়, সেটাই স্বাভাবিক। কোন কিছু একনিষ্ঠতা প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

—উমেশ ক্ষণেক ভেবে বলল, প্রকৃতির ভেতর যে পরিবর্ত্তন হয় তার সঙ্গে এটার কি সম্বন্ধ আছে? এ জিনিষ তো আলাদা—

—না, আলাদা নয়। সবই একই ব্যাপার। এক সময় যা খুব ভাল লাগত, কালক্রমে তার ওপর বিরাগও আসে। আর সেটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠতেই উভয়েই সচকিত হয়ে উঠল। কখন যে মেঘ জমে উঠেছে, তা খেয়াল ছিল না। সোঁ-সোঁ শব্দ—আর চারিদিক অন্ধকার হওয়াতে উভয়েই সচকিত হয়ে দেখল, ভয়ানক ব্যাপার। তুমুল বর্ষণ আর ঝড় এগিয়ে আসছে। পথের লোক ছুটছে—দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। অভয় আর দাঁড়াল না। একলাফে একটা দোকানের ভেতর আশ্রয় নিল।

এখন শুধু পড়া। টেষ্ট পরীক্ষায় অভয় ভাল ফল

করেছে। শুভময় বলে, দেখ অভয়দা, তুমি ফার্ষ্ট ডিভিশনে নিশ্চয়ই পাশ করবে। চাই কি অঙ্কে লেটার পেতে পার। বাবাকে একখানা চিঠি লিখে অভয় পড়তে বসে। মাঝে মাত্র দুমাস সময়। মার্চের বার তারিখে পরীক্ষা, এখন আর সময় নেই। এখন শুধু পড়া। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই অভয়ের। দিনরাত পড়ে যাচ্ছে। বিকেলে শুধু অল্প সময়ের জন্য, বাইরে ঘুরে আসে। তারপর পড়া চলে, অনেক রাত পর্য্যন্ত। এ যেন দুরূহ তপস্যা। বোধ করি এই রকম মনঃসংযোগ নিয়ে সাধনার নামই তপস্যা। এ হ'ল পাশের জন্য তপস্যা—আর সে সাধনা, সে তপস্যা হ'ল, পরমজ্ঞান আর চরম সত্যকে উপলব্ধি করা। অভয় ভাবে, কঠিন সাধনা ছাড়া মহৎ কিছু লাভ করা যায় না। এমনি গভীর মনঃসংযোগ করে যে বিষয়ই ধরা যায় না কেন, বোধ করি তাকে জয় করা, কঠিন নয়। অভয়ের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়। তাকে যে ম্যাট্রিক পাশ ভাল ভাবেই করতে হবে। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে অভয় পড়ে। রাত একটা বেজে যায় আলো কমিয়ে দেয়। টেবিলের ওপর এক গ্লাস জল ঢাকা থাকে। সেই এক গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলে। নিস্তব্ধ ঘরে স্তিমিত আলোয়, বিছানার ওপর চুপ করে বসে থাকে। চকিতে মনের আকাশে ভেসে ওঠে, তার দেশের ছবি, তার বাড়ীর ছবি। গাঁয়ের সেই রাস্তা ঘাট, পথের ধারে বহুদিনকার পুরাতন অতি বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছটি, ষষ্ঠীতলা, হালদার পুকুর আর পালের পুকুরের ছবি। বাড়ীর ছবিখানি চোখের ওপর আরো স্পষ্ট ফুটে ওঠে। গীতা খোকন এমন ঘুমুচ্ছে। গীতার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে, একটা পা তার পিঠের ওপর দিয়ে, খোকন ঘুমুচ্ছে। বাবা ওদের পাশে শুয়ে আছেন। মাথার চুল পেকে গেছে, রুগ্ন-শীর্ণ শরীর। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। সব যেন দেখতে পায় অভয়। সেই পুরাতন ঘর, মেজে এবড়ো খেবড়ো। ছেঁড়া বালিশ—ছেঁড়া পাটি—মলিন জীর্ণ দুখানি কাঁথা। ঘরের এককোণে সেই অতি পুরাতন লণ্ঠনটি রয়েছে। বাইরে উঠানের একপাশে গোয়ালঘর। ওদিকে কুয়োতলা—তার পাশে পেয়ারা গাছ আর লাউ কুমড়োর মাচা। তার পাশে ছাইগাদার ওপর ঘুমুচ্ছে কালু কুকুরটা। এক-একবার অস্ফুটভাবে ঘেউ ঘেউ করে, আবার ঘুমোয়। বাছুরটা বুঝি একবার ডাকল ওর মাও সাড়া দেয়। ঠিক ঠিক সব যেন দেখতে পায় অভয়। গরুর ডাকে, বাবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আলোটা একটু উসকে দিয়ে বাইরে এলেন। চারদিকে একবার দেখে নিয়ে, দরজার সামনে আলো রেখে, জল খেয়ে তামাক সাজতে লাগলেন। বাবার এই অভ্যাস। দরজার সামনে আলো রেখে অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তামাক খাওয়া—তারপর আর ঘুমোন না। সমস্ত রাত জেগেই কেটে যায়। গীতা খোকনকে ভালভাবে শুইয়ে দিয়ে, চুপচাপ হুঁকো টানতে থাকেন। আবার ভোর হয়ে আসতে থাকে। ঠাকুরবাড়ীর বুড়ো পূজারী, তারণ কাকার ভাঙ্গা গলার কীর্ত্তন গান শোনা যায়।

রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়—একটা অস্ফুট আলো আকাশ বাতাসে ফুটে ওঠে। ঠাণ্ডা বাতাসের মাঝে তারণ কাকার ভাঙ্গা গলার কীর্ত্তন গান ভেসে যায়—হরেরাম হরেরাম রাম-রাম হরে-হরে। অভয় যেন সব শুনতে পায়—সব দেখতে পায়। তার মা যেন ফিরে এসেছেন। লালে পেড়ে সাড়ী, হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর। সরোজিনী যেন ডাকেন, খোকা, ও খোকা। ঘুমো বাবা আর রাত জাগিস্‌নে। অভয় সব দেখতে পায়। সব স্পষ্ট—সব স্পষ্ট। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে তার মা। সেই শীর্ণ চেহারা, শীর্ণ মুখ। চোখে শুধু অজস্র স্নেহ ভালবাসার অফুরন্ত ভাণ্ডার। মা যেন বলছেন—রাত জেগে পড়িসনে বাবা। ঘুমো, এই তো আছি। তুই ঘুমো খোকা—আমি বাতাস করি। কে যেন এসেছে সত্যি। একি স্বপ্ন একি ঘুমের ঘোর। অভয় ডাকে—মা—মা—

কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—অভয়দা—অভয়দা—

অভয় উঠে বসে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়।

আবার ডাক ভেসে আসে—অভয়দা—অভয়দা—

দুই হাতে চোখ রগড়ে অভয় দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি। একহাতে চায়ের কাপ—

চোখে জল দাও অভয়দা। আমি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি। ঘুমের ঘোরে মা-মা বলে ডাকছিলে। অভয় মিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন দিনের আলো। রাতের সেই স্বপ্ন ঘেরা রহস্য মাখা আলো নেই। নেই—সেই অনন্ত প্রশান্তি আর স্তব্ধতা। তার হারানো মা আবার হারিয়ে গেছে দিনের আলোর মাঝে—

বাবাকে পত্র দেয় অভয়। পরীক্ষার আর দেরী নেই। পরীক্ষা শেষ হলেই সে বাড়ী যাবে। বড্ড মন কেমন করছে। গীতা খোকন কেমন? তাদের খুব সাবধানে রাখার জন্যে বার বার লিখেছে অভয়। তারিখের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে অভয় দিন গুনতে থাকে। আর মাঝে মাত্র দশদিন। পরীক্ষায় কি যে হবে তাই ভাবে অভয়। ওর বুক টিপ্ টিপ্ করে। কোন রকমে এই দশটা দিন কেটে গেলে বাঁচে। পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই সেই দিনই বাড়ী যাবে। বাড়ীর জন্য মন অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠেছে। শুভময় তাকে দেখা করবার জন্যে বলেছে, বিকেলের দিকে যাবে। অভয় আবার বইয়ের দিকে মন দেয়। ঘড়ির কাটা ঘুরে যেতে থাকে। দরজার দিকে চোখ পড়তেই দেখে মিনতি দাঁড়িয়ে।

মিনতি বলে—দশটা যে বাজে। জল খাবার খেয়ে নাও অভয়দা। আমার স্কুলের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা। এখন নিজের শরীরের দিকে খুব লক্ষ্য রাখ অভয়দা। সময় মত খাওয়া নাওয়া করা চাই।

—তা সত্যি কথা। কিন্তু এখন আর কোনদিকে চোখ দিতে পারিনে। এই পরীক্ষার ওপরই আমার সব যে নির্ভর করছে—

মিনতি বলে—দেখো, তুমি ঠিকই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবে। অত ভাবনা করছ কেন? আসছে বছর আমার পরীক্ষা। আমার ভাবনা শুরু হয়েছে এখন থেকেই।

অভয় হাসল। বলল, তোমার আবার ভাবনা। দু-দুটো প্রাইভেট মাষ্টার রয়েছে—

—তা রয়েছে। কিন্তু আমার যে কিছুই মনে থাকে না। কিছুক্ষণ পর মিনতি চলে যায়। কিন্তু আর পড়ায় মন বসে না, বাইরে রোদের তেজ খুব। সদর রাস্তায় নানান্ লোকের নানা কোলাহল। স্কুল অফিসের আদালতের ছাত্ররা বাবুরা তাড়াতাড়ি ছুটছেন। ছাতা মাথায় দিয়ে লোকে হাঁটছে, কেউ কেউ সাইকেলে যাচ্ছে।

অভয় খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাতাসে বইয়ের পাতা ফর্ ফর্ করে উড়তে থাকে। টেবিলের ওপর থেকে খাতা পেনসিল বাতাসের বেগে পড়ে যায়। অভয়ের এখন কোনদিকে দেখবার অবসর নেই। রাতের সেই স্বপ্নটা যেন দেখতে পায়। মা এসেছিলেন। মায়ের সেই চির পরিচিত ডাক। সেই মধুর ডাক, কি ভোলবার? সেই ডাক যে অভয় এখনও শুনতে পাচ্ছে—খোকা ও খোকা। ঠিক যেন সব সেই দেশ—সেই দেশের ঘর বাড়ী। তার গাঁ—ছায়া ঘেরা বন জঙ্গল ঘেরা তার অতি পরিচিত গাঁয়ের বাড়ী। মা যেন গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকছেন - খোকা ও খোকা—মায়ের সেই শীর্ণ চেহারা। পরণে লাল পেড়ে সাড়ী। হাতে শুধু একগাছি লোহা আর শাঁখা। অভয় পলকহীন চোখে, শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

এই লোকজন কলকোলাহল, সব যেন তার চোখের সম্মুখ থেকে উধাও হয়ে গেছে। এই দৃশ্যমান জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে, অভয় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কানে শুধু ভেসে আসে মায়ের সেই পরিচিত ডাক—খোকা—ও খোকা—

দুপুরে পড়ছিল অভয়। দরজায় একটু শব্দ হতেই অবাক হয়ে দেখল, মিনতি দাঁড়িয়ে—

—এ কি, স্কুলে যাওনি—

—না, যাই নি। খাওয়ার পর হঠাৎ শরীরটা ভাল লাগল না। এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলাম। আচ্ছা—অভয়দা, ম্যাট্রিক পাশ করে কোথায় পড়বেন।

—কোথায় পড়ব ? দাঁড়াও আগে পরীক্ষা হোক, পাশ করি, তারপর যে সব ভাবা যাবে—

ঘাড় দুলিয়ে মিনতি বলল—না—না। পাশ তো করবেনই। আমি বলছি দেখবেন। ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করবেন। ভাবছি কোথায় পড়বেন। এখানে তো কলেজ নেই—

—পড়া কি আর হবে? এখানে কলেজ থাকলে তবুও পড়াটা হ'ত। পড়তে হলে হয় বহরমপুর—না হয় কলকাতা। কিন্তু আমায় খরচ কে দেবে?

—খরচ? তা বাবাকে না হয় বলবেন। মনে হয় আপনি যদি বলেন, বাবা কক্ষনো অস্বীকার করবেন না। সত্যি অভয়দা, আপনাকে পড়তেই হ'বে।

হাসিয়া অভয় বলে—আচ্ছা পাগল তো। আমার তো পড়ার খুব সাধ। কিন্তু টাকা কোথায়? আমার বাবার অবস্থা জান। কোন রকমে দিন চলে যায়। বাবার কোন সাধ্য নেই যে আমায় খরচ দেন।

মিনতি বলল, বইয়ে পড়েছি, কত গরীব ছাত্র বহু কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছেন। সেই কথাই বলছি অভয়দা। ম্যাট্রিক পাশ করার পর, যেমন করে হোক কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যান। দু-একটা টিউশন জুটিয়ে কারুর বাড়ীতে থেকে, কতজনাই এমনি করে করে লেখা পড়া করে! শেষে জীবনে উন্নতি করেছে। তা তুমি কেন পারবে না?

অভয় অবাক হয়ে যায়। মিনতির মুখ আর কথাগুলো যেন কোন প্রতিজ্ঞায় সুদৃঢ়। কিন্তু অভয় আশ্চর্য্য হয়। তার পড়ার জন্যে মিনতির এত আগ্রহ কেন?

মিনতির মুখের পানে চেয়ে অভয় বলল, হাঁ, চেষ্টা করব। খুবই আমি চেষ্টা করব। সত্যি কতজন কত কষ্ট সহ্য করে লেখাপড়া শিখেছেন। দেশের আর দশের মধ্যে গণ্যমান্য মানুষ হয়ে উঠেছেন। কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে খুবই উপকার করলে আমার। কিন্তু ও সব তো পরের কথা। এমন সামনের ভাবনা ভাবি—

মিনতি বলল, সামনের ভাবনা কি আবার?

—অনেক অনেক ভাবনা। পরীক্ষা তো বটেই, এ ছাড়া কত যে ভাবনা চিন্তা, সে কি বলে শেষ করা যায়?

মিনতির সুন্দর মুখে হাসি ফুটে উঠল। মিনতি বলল, অভয়দা, তুমি নিজেকে একজন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মত কথা বলছ। যেন কতই না বয়েস হয়েছে তোমার। ঠিক বুড়ো লোকদের মত পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছ।

অভয় হাসল। হেসে বলল, পাকা পাকা কথা শুধু মাথার চুল পাকলেই কি মুখ দিয়ে বেরোয়? অবস্থাগতিকে, নানান্ আঘাত খেয়ে, অল্প বয়সেই অনেক অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান জন্মে যায়। আমার অবস্থা তুমি এখন ঠিক বুঝতে পারবে না। তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আর আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর অনেক পার্থক্য।

মিনতির মুখে ম্লান ছায়া দেখা দিল। মিনতি বলল, অভয়দা, তোমার কি এখানে অসুবিধে হচ্ছে?

—অসুবিধে? না—না—ওসব কিছু নয়। শুধু খাওয়া থাকা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে তো? আমার অনেক ভাবনা। কি যে তা ভাবনা, তা আমি ঠিক করে তোমাকেও বোঝাতে পারব না।

মিনতি আশ্চর্য্য হয়ে বলল,—বাঃ, নিজে কি ভাবছ, কি চিন্তা ভাবনা তা নিজে বলতে পার না?

অভয় কথার জবাব দিল না—শুধু হাসল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে কটা যেন বাজল।

এঁকি এর মধ্যে তিনটে বেজে গেল। যাই এখন—

সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল।—এল খবর। স্কুলে পাশের খবর এসেছে। খবর নিয়ে এল, অভয়ের সহ-পাঠী রাখাল। রাখাল দ্রুতবেগে এসে ডাকল,—অভয়,

অভয়। দুপুরে অভয় কি একখানা বই পড়তে পড়তে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, রাখালের চীৎকারে জেগে উঠল। কোঁচার কাপড় গায়ে জড়িয়ে বাইরে এসে বলল, আরে রাখাল যে। কি ব্যাপার? হাসতে হাসতে রাখাল বলল, এখনও ঘুমুচ্ছ? এদিকে স্কুলে রেজাল্ট এসেছে যে। তুমি ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছ—

—সত্যি?

—হাঁ। নাও, জামা গায়ে দিয়ে নাও। স্কুলে চল। আমরা সবাই পাশ করেছি। শুধু আবদুল আর পরেশ ফেল করেছে। নাও আর দেরী নয়।

অভয় তাড়াতাড়ি জামা জুতো পরে নিল। আজ পরীক্ষার পাশ ফেলের কথা। ছাত্র, অভিভাবক, সবাই শহরে শুধু স্কুলের দিকে ছুটছে। কাল পরশু বেরুবে. কাগজে কাগজে নামের তালিকা। তখনকার দিনে দৈনিক খবরের কাগজে ম্যাট্রিক পাশের খবর ছাপা হত নাম আর ডিভিশন্ সুদ্ধ। স্কুলে অভয় যখন পৌঁছাল. তখন চারিদিকে শুধু হৈ চৈ শব্দ. সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে, সকলের মুখেই হাসি। কেউ কেউ খবর নিচ্ছে, জেলা স্কুলে কটা পাশ করল; বা কটা গেল কোন্ বিভাগে। কেউ বলছে, রতন চাটুয্যে নিশ্চয়ই স্কলারশিপ্ পাবে। এদিকে আজ আবার ড্রামাটিক ক্লাবে থিয়েটার. 'শাজাহান' নাটক হবে। এখন থেকেই শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রী। ছেলে বুড়ো আজ আর কেউ বাদ যাবে না। খাবারের দোকানে মিষ্টি বিক্রীর ধুম পড়ে গেছে। ছেলেরা দল বেঁধে যাচ্ছে খাবারের দোকানে হৈ চৈ করে. এ ওকে খাওয়াচ্ছে।

শুভময় একবার জোর করে অভয়কে নিয়ে চলল নিজের বাড়ীতে। আজ যে বড় সুখের দিন। কিন্তু এই সমস্ত সুখ ও আনন্দকে ছাপিয়ে অভয়ের সারা বুক একটা তীব্র ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠছে: এমন আনন্দের দিনেও—তার চোখ দিয়ে এক সময় জল গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুছবার আগেই দেখে ফেলল শুভময়। শুভময় বলল, ও কি অভয়দা, তোমার চোখে জল কেন?

—না—না। ও কিছু নয়। বোধ করি চোখে কিছু পড়েছে। শুভময় ঘাড় নেড়ে বলল উঁহু—ও আমি বুঝেছি। তুমি আমায় ফাকী দিতে পারবে না: মায়ের জন্য চোখে জল এসেছে। ঠিক কি না বল। অভয়ের চোখের ওপর ভেসে উঠল মায়ের সেই মুখখানা। মায়ের যে বড় সাধ ছিল তার খোকা পাশ করবে। পাশের খবর পেলে সত্যনারায়ণের সিন্নী দেবেন। গাঁয়ের পাঁচজনকে ডেকে ঠাকুরের প্রসাদ দেবেন। মা বলবেন, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর। খোকা আমার পাশ করেছে। আহা মায়ের যে কত আশা ছিল। হায়, আজ সে পাশ করেছে, কিন্তু আজ কোথায় তার দুঃখিনী মা। অভয়ের মনে হ'ল এই মুহূর্তে তার মা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই শীর্ণ মুখ আজ হাসিতে পূর্ণ। হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে। যেন বলছেন—খোকা, ও খোকা। সত্যনারায়ণের পুজোটা দিস্ বাবা। ঠাকুরের কাছে মানৎ করেছিলাম যে। চোখের ওপর ভেসে উঠল সেই গাঁয়ের ছবি। ছায়া ঘেরা বনজঙ্গলে ঘেরা তাদের গাঁ পলাশপুর। চারধারে বন, কোথাও আমবাগান, বাঁশবন আর কলাবাগান। বড় বড় অশ্বত্থ গাছ আর বটগাছে জড়াজড়ি করে রয়েছে। এ পাশে ও পাশে ছোট ছোট ডোবা—মজা পুকুর—তালবন আর বাদলা বন। গাঁয়ের বটতলা. তারপর তার ঠিক পাশ দিয়ে পায়ে চলার সরু পথ। চোখের ওপর এক মুহূর্ত্তে সব ভেসে উঠল। একে একে চোখের ওপর জেগে উঠল, তার বাবা মা, গীতা আর খোকনের মুখ।

শুভময় বলে, অভয়দা, ও অভয়দা। অভয় যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। অবাক হয়ে তাকায়।

—কি ভাবছিলে অভয়দা। না—দেরী হয়ে যাচ্ছে চল চল। অভয়কে নিয়ে এল বাড়ীতে। ওপরের সেই পড়ার ঘর। চারিদিকে কত আলমারী—কত বই। শুভময় বলল, বস অভয়দা। অভয় চারিদিকে তাকিয়ে

তাকিয়ে দেখতে লাগল। কত চেয়ার, টেবিল, কত বই—

কিন্তু অভয়ের মন চলে গিয়েছে বাড়ীতে। কালই একখানা চিঠি দিতে হবে বাবাকে। খোকন গীতাকেও লিখতে হবে। কিন্তু এখন তার কি কর্তব্য। পড়া আর হবে কি না সন্দেহ। এখানে কলেজ নেই—যদি থাকত তবে নিশ্চয়ই একটা উপায় হ'ত কিন্তু জেঠাবাবু কি আর তাকে পড়াতে রাজী হবেন?

চাকরের হাতে একরাশ খাবার আর চা নিয়ে ঢুকল শুভময়।

আজ অমিয়াও সঙ্গে এসেছে।

—এ কি, এত খাবার কে খাবে?

শুভময় বলল, কেন, আমরা। আমরা দুজন তো বটেই আর সুপ্পুরিও খাবে।

অমিয়া রেগে বলল, আবার আমায় ঐ নামে ডাকছ। দাঁড়াও মাকে বলে দিচ্ছি। অভয় মুগ্ধ দৃষ্টিতে, এই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সত্যি তো। ওকে ওর ভাল নামেই ডাকা উচিত। তবে ডাকনামটা তো নেহাৎ খারাপ নয়। চেয়ারের পেছনে মুখ লুকাল অমিয়া। অভয় বলল, বাঃ, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন, এস আমরা একসঙ্গে খাই—

শুভময় বলল, ও খাবে না, লজ্জা হয়েছে। তা না থাক্, আমাদের কাপে চা ঢেলে দে –

চা খাওয়া শেষ হলে, শুভময় বলল, চল অভয়দা, মার সঙ্গে দেখা করে আসবে। স্বভাবতঃই অভয় একটু লাজুক প্রকৃতির। তাই অভয় বেশ চিন্তিত হয়ে উঠল। এর আগে বহুবার সে এখানে এসেছে, কিন্তু এই লাইব্রেরী ঘর ছাড়া বাড়ীর ভেতরে কোনদিন যায়নি। সে শুভময়ের পেছনে, বারান্দা পার হয়ে, অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আলাদা একটা বাড়ীর মধ্যে পৌঁছল। অভয় দেখল, মস্ত বাড়ী, এটা এদের অন্দর মহল। বিরাট লম্বা চওড়া বারান্দার একপাশে একখানি চেয়ারে বসে আছেন শুভময়ের মা। শুভময়ের মাকে দেখে অভয় অবাক হয়ে গেল। মানুষ যে এত সুন্দর হতে পারে, এর আগে তা ভাবেনি। জ্যাঠাইমাও খুব বড় লোকের বউ, কিন্তু তিনিও এত সুন্দর নন।

শুভময় বলল, মা—এই অভয়। অভয় প্রণাম করতেই শুভময়ের মা বললেন, শুভর কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনতে পাই। তা এখন কলেজে পড়বে তো—

—দেখি কি হয়।

—না—না, পড়বে বৈকি। নিশ্চয়ই পড়বে। তবে যে কোন একটা লাইন ধরে পড়াই ভাল। যেটা তোমার নিজের বেশ ইচ্ছে, ধর ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, এমনি একটা লাইন নিয়ে পড়াশোনা করা উচিত।

—ঘাড় নুইয়ে অভয় বলল, হুঁ—তা বটে।

—আমি তো শুভকে ইঞ্জিনিয়ার করব। আমার তাই ইচ্ছে আর কর্তার ইচ্ছেও তাই। এরপর আর দু একটি কথার পর অভয় ফিরে এল। অভয়ের এখন অনেক চিন্তা। শুভময় বলল, অভয়দা ঠিক আটটার মধ্যে চলে আসবেন কিন্তু। টিকিট কিনে আমি ওখানেই থাকব। আজ তো দারুণ ভীড় হবে—ঠিক নটায় আরম্ভ হ'বে থিয়েটার।

বাড়ী ফিরতেই মিনতি বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন অভয়দা, বাবা বাড়ী এসে, তোমায় ডাকছিলেন।

দোতালার ঘরে অনেকগুলো কাগজপত্র খুলে কি সব দেখছিলেন, যোগেশ্বর দত্ত। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে জেঠার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই যোগেশ্বর বললেন, খুব খুশী হয়েছি। কাল গোপেশ্বরকে পত্র দিয়ে পাশের খবরটা জানাবে। তা এখন কি করবে ঠিক করেছ?

ভয়ে ভয়ে অভয় বলল—আমার ইচ্ছে পড়ি –

—হুঁ, কিন্তু কি পড়বে? আচ্ছা—আমি ভেবে চিন্তে দেখি, যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই। আমার মনে হয়, বহরমপুর কলেজ ভাল। তোমার সঙ্গে যারা যারা পাশ করেছে, তারা কে কোথায় পড়বে, সব খোঁজ নাও। তারপর ঠিক করা যাবে। আচ্ছা এস এখন।

অভয়ের আনন্দ আর বাধা মানে না। তার

জীবনের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। জেঠাবাবু যখন নিজমুখে বলেছেন, তখন আর কোন বাধা নেই। হাসিমুখে অভয় ফিরে এসে সুখবরটা জানাল মিনতিকে।

মিনতি বলল—আমি আগেই বলেছিলাম না? এখন মাকে প্রণাম করে এস অভয়দা।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অভয়ের আজ যে বড় আনন্দের দিন। এই কয়মাস দিনরাত্রের মধ্যে, মাত্র দু একঘণ্টা দু চোখের পাতা এক করেছিল। সমস্ত দিন রাতের মধ্যে একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল, পরীক্ষায় ভাল ভাবে পাশ করা। সেই অধ্যবসায়, সেই পরিশ্রম এখন সার্থক হয়েছে। তার সেই গ্রাম, এখন বহুদূর। সেই ছায়াঢাকা গ্রাম চারিদিকে শুধু আম কাঁঠাল বাগান আর বাঁশবন। এখানে ওখানে শুধু মজা পুকুর। সেখানকার বাসিন্দারা প্রায় সবাই চাষী আর মধ্যবিত্ত। বহু কষ্টে তারা সংসার চালায়। বহু পরিশ্রমে তারা ফসল তোলে। সেখানে না আছে স্কুল—না আছে কোন রাস্তাঘাট। তবুও সে ভালবাসে তার সেই অখ্যাত অবজ্ঞাত গ্রামকে। বোধ করি, এমন সুন্দর মধুভরা দেশ আর কোথাও নেই। আম জাম তেঁতুল আর নানা ফলফুলের ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা, মাটীর নমনীয়তা আর কোথায় আছে? কান পাতলেই শোনা যাবে নানান্ পাখীদের কলরব। সেই অনন্ত দিগন্তপ্রসারী মাঠ—রাস্তার ধারে ধারে বৃদ্ধ বটগাছ অশ্বত্থগাছ, আকাশে মেঘের খেলা—শীর্ণ নদীটির ধারে, তরমুজ, ফুটি, পটলের ক্ষেত আর কাশবন। এসবের তুলনা কোথায়? এই দেশ কি ভুলে থাকা যায়? দূরে থাকলেও, সে কখনও তার জন্মভূমি গ্রামকে ভুলতে পারবে না। সেখানকার প্রতি ধূলিকনা যে তার সর্ব্বাঙ্গে মাখা। অভয় চোখ বন্ধ করে, তার গাঁয়ের ছবি দেখতে পায়।

ধূলোভরা রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে দেবদারু, বাবলা, আম, কাঁঠাল গাছের জড়াজড়ি ভিড়। পথের পাশে, নটুর মুদীখানা দোকান—তার পাশে সদা ময়রার খাবারের দোকান। সদানন্দ ঠিক নিজের জায়গায় বসে দাঁড়ীপাল্লা হাতে করে, মুড়কী, জিলেপী, রসগোল্লা ওজন করছে। ছোটখাট মানুষটা। মাথার চুল ছোট করে ছাটা—আর সব চুলই পেকে সাদা। পরনে ছোট আটহাতি লাল পেড়ে ধুতি—কাঁধে সাদা গামছা। সদানন্দ নিজের তক্তপোশটির ওপরে বসে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কাল কুচকুচে ছোট্ট হুঁকোয় তামাক টানে। কখনও ক্যাচকোঁচ শব্দ তুলে, গরুর গাড়ী চলে যায়। লাঙ্গল কাঁধে চাষীরা মাঠে যায়—রাখাল ছেলেরা তাল পাতার ছাতা—টোকা মাথায় দিয়ে পাল পাল গরু নিয়ে মাঠে যায়। আবার রাস্তা হয় নির্জ্জন। দুপুরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে সারা গাঁয়ের ওপর। রোদের তেজ আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে। বাবলা বনের ওপার হতে ভেসে আসে ঘুঘুপাখীর ডাক। এ সমস্তই অভয় চোখ বুজলেই দেখতে পায়। তার সেই পলাশপুর গাঁ। পলাশপুরের নদীনালা রাস্তার ধুলো মাটি কাদা,—বাতাস—কত ফুলের সুগন্ধ, পাখীদের ডাক, মধুর গান সব সে দেখতে পায় শুনতে পায়, সব সে সর্ব্ব মনপ্রাণ শরীর দিয়ে অনুভব করে। পলাশপুর যেন তাকে ডাকছে—অভয়—অভয়—। আর ভেসে আসে তার চিঃদুঃখিনী মায়ের ডাক—খোকা—বাবা আমার—

ক্রমশঃ

সঙ্গীত সঙ্কলন

রাজা রামমোহন রায়

আমায় কোথায় আনিলে।
আনিয়ে সাগর-মাঝে তরী ডুবালে।
নাহি দেখি পারাপার,
চারিদিক অন্ধকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার
ঘূর্ণিত জলে।
কোথা রইল পিতামাতা,
কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়া রইল কোথা
বন্ধু সকলে॥

(ইমন কল্যাণ, তেওট)

ভাব সেই একে,
জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।

(সাহানা, ধামার)

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়,
যাহাতে করিলে প্রীত, জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল, তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভোল তাঁরে, এ ত ভাল নয়॥

(বাগেশ্রী, আড়াঠেকা)

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।*

(সুরট, কাওয়ালি)

ভজ অকাল নির্ভয়ে,
পবন তপন শশী ভ্রমে যার ভয়ে।
সর্ব্বকালে বিদ্যমান,
সর্ব্বভূতে যে সমান,
সেই সত্য, তারে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে॥

(রামকেলি, আড়াঠেকা)

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব, তবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত বাসনা বাড়িবে তত-
ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে খেদ, ভ্রান্তি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কামক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন॥

(রামকেলি, আড়াঠেকা)

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে;
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত,
স্নেহে কহ হ'ল এত,

বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে
কিম্বা ধনজন-বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর
চিন্ত সত্য-পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।

(রামকেলি, আড়াঠেকা)

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর;
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া,
কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ,
সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান,
ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

(সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা)

মন, একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্বত্র থাকে,
ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কে বা আন কাকে, একি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে,
আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, একি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব,
বিবিধ নৈবেদ্য সব
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার।

(টোড়ি, আড়াঠেকা)

এত ভ্রান্তি কেন মন, দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্বান্তরে।
সূর্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপে করে স্থিতি,
শশীতে শীতলতা। জগতে এই রীতি,
তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে।

(বেহাগ, আড়াঠেকা)

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে করে একি অনুষ্ঠান।
পরাৎপরে করি পর অপরে পরম জ্ঞান।
জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার,
অলভ্য বাণিজ্য ভাবে না দেখি সুসার।
অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান।

* ১৮৩২ খৃঃঅব্দে সেপ্টেম্বর বিলাত হইতে রামমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে এই গীতটি পাঠাইয়া পরে লিখিয়াছিলেন :—
"এই অবকাশে ব্রহ্মসমাজের কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি, যদ্যপি তোমরা ও বিষ্ণুবাবাজী উচিত মান, গায়কদিগকে দিবে।"

যোগেশচন্দ্র স্মরণে

কানাইলাল দত্ত

বিদগ্ধ সমাজে যোগেশচন্দ্র বাগল একটি অতিপরিচিত নাম। গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ তিনি চারণের ন্যায় বাংলা ও বাঙালির কর্মকথা আমাদের শুনিয়ে আসছেন। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষা সাহিত্য ধর্ম-সমাজ সংস্কার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়াসের যে বিস্ময়কর বিকাশ বাঙালি জীবনে ঘটেছিল তারই তথ্যনির্ভর অথচ রোমাঞ্চকর ইতিহাসকার যোগেশচন্দ্র। বিদেশী শাসকের অনীহা ও উপেক্ষা এবং আমাদের অনাদর এবং আত্ম-বিস্মৃতির অভিশাপে নিকট অতীতের অতি প্রয়োজনীয় সেই ইতিহাসের আকর অবলুপ্ত হতে বসেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যত তীব্র আকার ধারণ করেছে আমাদের আত্মসচেতনতাও তত বেড়েছে। এই সচেতনতা আত্মবিশ্বাসের দ্বারা স্থিতিশীল হয়। বাঙালির অতীত সুকৃতির কথা এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজ শুরু করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র তাঁর সার্থক উত্তরসূরী।

যোগেশচন্দ্র সাংবাদিক রূপেই কর্মজীবনে অবতীর্ণ হন। মুখ্যতঃ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ এবং অল্প পরিমাণে দেশ সাপ্তাহিকের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক খবরাখবরের মূলধারা ধরেই সাময়িক পত্র পত্রিকার চলতে হয়। প্রতিদিন শত শত সংবাদ তৈরি হচ্ছে। তার মধ্য থেকে সাময়িক পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় গুটি কয়েক মাত্র খবর বেছে নিতে হয়। সংবাদ বাছাই কাজটির উপরই সাময়িক পত্রের উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভরশীল। সার্থক সাংবাদিক ভিন্ন সুচারু রূপে এই কাজটি করা যায় না।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামত ও পরিবেশিত তথ্যাদির মূল দায়িত্ব লেখকের। তথাপি কাগজের আদর্শ রক্ষার্থে মতবাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং মর্যাদা ও সুনামের জন্য তথ্যাদির যাথার্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। দক্ষ সাংবাদিকের ন্যায় যোগেশচন্দ্র সুচারুরূপে এই কাজটি দীর্ঘকাল ধরে করে এসেছেন। বিদগ্ধ সমাজে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত তথ্যাদি সাধারণতঃ বিনা বিতর্কে গৃহীত হতো। প্রবাসীর মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। চলতি সমস্যা সম্পর্কে প্রবাসী কি বলেন তা জানবার জন্য বহুজনে সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন। প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা--সংবাদিকপ্রবর শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এজন্য নিশ্চয়ই সর্বাধিক। তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ কাজে যোগেশচন্দ্র সহ প্রবাসীর অন্যান্য সহকারীদের অবদান কম নয়। কিন্তু গবেষক যোগেশচন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং বিপুল খ্যাতির আড়ালে আজ সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত ম্লান ও বাহুলাংশে বিস্মৃত।

গবেষক যোগেশচন্দ্রকে যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা আমার নেই। দু-চারটা প্রবন্ধের দ্বারা তা করা যায়ও না। বাঙলা ও বাঙালির কর্মকথাকে বাদ দিয়ে আমাদের লেখাপড়া জ্ঞানচর্চা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই বিদ্যার্থী থেকে পণ্ডিতজন পর্যন্ত প্রায় সকলকে কোন না কোন সময়ে যোগেশচন্দ্রের

রচনাবলীর শরণ নিতে হয়। সুতরাং কালক্রমে সুধীজনেরা গবেষক যোগেশচন্দ্রের প্রকৃত মূল্যায়নে উদ্‌যোগী হবেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আমি এখানে তাঁর গবেষণা পদ্ধতির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

যোগেশচন্দ্রের গবেষণার বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী। আমাদের সমাজে যা কিছু ঘটে তার পেছনে ব্যক্তি মানুষের বিপুল ও বিস্ময়কর অবদানটি বর্তমান সময়ে তেমন গুরুত্বসহকারে আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই। সাধারণতঃ ঘটনাবলীর ঝোঁক বা প্রবণতা বিচার বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু যোগেশ চন্দ্র বোধ হয় ব্যক্তি মানুষের কর্মকৃতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। প্রতিভাবান্ ও কর্মদক্ষ মানুষের দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমসাময়িক ঘটনা প্রভাবিত হয়। সেগুলি নতুন আকার ধারণ করে এবং নূতনতর মূল্য লাভ করে। সেজন্যই যোগেশচন্দ্র এক-একজন মানুষের জীবন ও কর্মকথাকে কেন্দ্র করে সেযুগের নানা আন্দোলন ও বিবিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কথা শুনিয়েছেন।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি খুবই অর্থবহ। যোগেশচন্দ্র তাঁর শেষ জীবনের বাসস্থান নব বারাকপুর সমবায় পল্লীতে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জনদের নিয়ে একটি সাহিত্য চক্র গড়ে তোলেন। এটির নাম দেন তিনি সাহিত্যিকা। যোগেশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর এর নাম হয়েছে যোগেশচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য বাসর। এই সংস্থার কাজকর্ম উপলক্ষে বারংবার তাঁকে বলতে শুনেছি, আমরা জনতা চাই না, জন চাই। এটা জনতার যুগ। প্রতি পদক্ষেপে জনগণেশের দোহাই পাড়া তো ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো, এক দুই জন মানুষ যাঁরা নেতৃত্বে থাকেন তাঁদের সিদ্ধান্তই জনতার সিদ্ধান্ত বলে প্রচারিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি ক্রান্তিকারী চিন্তা কোন না কোন ব্যক্তির মাথায় প্রথমে আসে। সেই চিন্তাকে ক্রমে রূপান্তরিত করে, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যিনি সৃষ্টি করেন এবং অনুগামী সংগ্রহ করেন তিনি নেতা। এদের দ্বারাই দেশ সমৃদ্ধ হয় জাতি বড় হয়। সুতরাং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সর্বাধিক। যোগেশচন্দ্র সেই ব্যক্তি মানুষকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর গবেষণায়। যাঁরা স্বীকার করেন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানুষ গড়ে ওঠে, তাঁরা একথায় ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু যারা বিশ্বাস করেন মানুষ ঘটনা সৃষ্টি করে, তাঁরা এর দ্বারা আশ্বস্ত হবেন বলেই আশা করি।

যোগেশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে আমি খাঁটি মানুষ ও জ্ঞান-তাপস শব্দ-দুটির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু তাঁর পাদপ্রান্তে বসেই আমি এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছি। যোগেশচন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎকার একজন খাঁটি মানুষ ও জ্ঞানতাপস মূর্ত ছিল। গীতায় দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগে দৈবী অবস্থালাভের যোগ্য মানুষের গুণাবলীর উল্লেখ আছে। এই ২৬টি গুণের অনেকগুলি আমি যোগেশচন্দ্রের প্রতিদিনের আচরণে দীর্ঘদিন ধরে নিত্য প্রত্যক্ষ করেছি। কেবল আমি কেন? যারাই তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন তারা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন বলেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বগুণে স্বাধীনতা আন্দোলন কালে দেশবাসীর চরিত্র উন্নত হয়েছিল। গান্ধীজি নির্দেশিত একাদশ ব্রতধারী মানুষের সংখ্যা তখন অগুনতি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীরশ্রম, অস্বাদ, ভয়বর্জন, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি ব্রতপালনের দ্বারা সাধারণ মানুষের চরিত্র অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী বাংলার বীর্যময় প্রকাশের এই চরিত্রশক্তি আরও দৃঢ় হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র ও সমসময়ের অনুরূপ মানুষের চরিত্র এর সাক্ষ্য বহন করছে। তখন বিত্ত-কৌলিন্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি; বোহিমিয়ান যৌবনের বিপথগামী হাওয়ার সুযোগও ছিল সীমাবদ্ধ। তাই সমাজে বিদ্যা ও চরিত্রের সমাদর ছিল।

সর্বোপরি যোগেশচন্দ্রের আধারটি ছিল খাঁটি। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ কথাটা তো আর কথার কথা নয়? খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমার কল্যাণে আজকের সমাজে একপ্রকার অর্ধশিক্ষিত মানসিকতার প্রাবল্য ঘটেছে। ফলে শ্রদ্ধা প্রায় অবলুপ্ত। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ভাঙচুর, খুনজখম, চরিত্রসঙ্কট। এই রকম সমাজে যোগেশচন্দ্রের ন্যায় আত্মসমাহিত প্রচারকুণ্ঠ পণ্ডিতের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমাজকে তিনি যা দিয়েছেন তার বিনিময়ে সমাজ তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে নি, যথোপযুক্ত মর্যাদাও দেয় নি। তিনি অবশ্য তার জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ কোনদিন প্রকাশ করেন নি। পরন্তু আমরা কেউ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি অসন্তুষ্টই হতেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন আধ্যাপক কবীর সাহেব। তিনি, স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় যোগেশচন্দ্র একযোগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের নিকট থেকে কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক পেনশন পান। স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার শুধুমাত্র কয়েকটি টাকা পেনশন মঞ্জুর করলেই যোগেশ চন্দ্রের প্রতি কর্তব্য করা হলো এ আমরা মনে করতে পারি নি। সেজন্য আমাদের ক্ষোভ ছিল। যোগেশচন্দ্র তা জানতেন। কিন্তু সরকারের এই সামান্য কাজটুকুর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। তিনি আত্মসন্তুষ্ট ছিলেন বলেই বোধ করি দুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে তাঁকে দেখিনি কোনদিন।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন যোগেশচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। প্রিয়রঞ্জন সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাভোগ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। নির্লোভ ত্যাগব্রতী এই মানুষটির নির্মল চরিত্রের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। স্বাধীন ভারতের ভাগ্যবিধাতারা অনেকেই তাঁর অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করলে একটা মন্ত্রী নেহাৎকল্পে একটা রাজ্যপাল বা অনুরূপ কিছু সহজেই হতে পারতেন। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে বলতেন—দেশ আপনার যোগ্যতার সমাদর করল না, তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদুহাস্য সহকারে অনুচ্চকণ্ঠে বলতেন—কেন এই তো বেশ আছি—দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করি, মাইনে পাই, অন্নবস্ত্রের কষ্ট নেই—আবার কি চাই। বেশ তো আছি। গল্পটা শুনেছিলাম যোগেশচন্দ্রেরই মুখে। আত্মসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জন ছিলেন যোগেশচন্দ্রের আদর্শ।

যোগেশচন্দ্র হাসপাতালের ফ্রি বেডে ভর্তি হন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার সরকারী ব্যয়ে কেবিনে রেখে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হলে তিনি স্বস্তি বোধ করেন কিন্তু প্রথমে কেবিনে গিয়ে সরকারের ব্যয় বাড়াতে রাজি হন নি। পরে অবশ্য আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে তিনি কেবিনে যান। যতটুকু না নিলে জীবন রক্ষা হয় না তার চেয়ে এক কপর্দকও বেশি তিনি সম্ভবতঃ কখন গ্রহণ করেন নি। এমন একজন মানুষ সম্পর্কে যত যত্ন করেই লিখি না কেন, সেই চরিত্র মহত্ত্ব ও মাধুর্য ফুটিয়ে তুলবার সাধ্য আমার নেই। যোগেশচন্দ্রের পরলোক গমনের বহু পূর্বে লেখা সুধীজনের কয়েকখানা পত্রাংশ দিয়ে আমি আজ স্মৃতি তর্পণ শেষ করব। এই সব চিঠিপত্রে যোগেশচন্দ্র চরিত্র কিঞ্চিৎ সত্য স্বরূপে প্রকটিত হবে। অপরে লেখা চিঠিপত্রই হলো জীবন চরিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে স্বীকৃত। যোগেশচন্দ্র এই সব চিঠিপত্র কখন রাখেন নি। অকস্মাৎ সামান্য কয়েকখানা চিঠি আমার হাতে আসে।

যোগেশচন্দ্র নানাভাবে নবীন গবেষকদের সাহায্য ও সহায়তা দান করতেন। বহুজনে দেশী বিদেশী গবেষকদের তাঁর নিকটে পাঠাতেন। এই সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকারের ২৬।৯।৫১ তারিখের একখানি চিঠিতে পাই:

"এইটি কালিকা কানুনগোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুপেন,

M.A. সে Lord Canning 1858-1862 (যুদ্ধ বাদ দিয়া) গবেষণা করিতেছে, Ph. D থিসিস লিখিবার জন্য। আমার বাসায় থাকে এবং আমার গ্রন্থাগার হইতে বই লইয়া নোট করে। বঙ্গে নব জাগরণ সম্বন্ধে বই ও খবর আপনাদের হাতে আছে। ইহার সঙ্গে আলোচনা করিবেন ও সাহায্য দিবেন।"

এই পর্যায়ে আরও চিঠি আছে। আচার্য যদুনাথের বাড়িতে বসে যে ছাত্র কাজ করছেন তাঁকে তিনি নিজেই পাঠাচ্ছেন যোগেশচন্দ্রের নিকট—এটা জানবার পর আশা করা যায় এ পর্যায়ে আর কোন চিঠির আবশ্যকতা নেই।

যোগেশচন্দ্রের নিকট আচার্য যদুনাথ যে সবদা চিঠি লিখে গবেষক পাঠাতেন তা নয়। অনেক সময় মুখে মুখে নির্দেশ শুনে অনেকে যোগাযোগ করতেন। কলকাতার বাইরে থেকেও গবেষক আসতেন। এই রকম একটি পত্রের অংশ নিচেয় দিলাম। লিখছেন জনৈক J. R. Ahmed তাং ৬।১।৫৩।"

"I am a research scholar preparing my thesis for Ph D. degree from the Punjab University. The subject of my thesis is Genesis of Indian struggle for freedom in the days of the East India Co. from 1757 to 1857. I went to see Dr. Jadunath Sarkar, the well-known historian, to seek some aid and guidance. He directed me to contact you and he gave me your address."

যোগেশচন্দ্রের অজিত তথ্যাদি তিনি অকপটে অপরকে ব্যবহার করতে দিতেন। এমন কি পুস্তক বা প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হবার আগেই দিয়ে দিতেন অনেক ক্ষেত্রে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাতি শ্রীঅনিল শীল কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কিছু তথ্য তাঁর প্রয়োজন পড়ে। ১৯৬১ সনের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাক্রমে এ দেশে আসেন। তখন তিনি যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করেন। যোগেশচন্দ্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সানন্দে অনিল শীল মশায়কে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন। শীল মশায় ধন্যবাদ দিয়ে লিখলেন; "I have received the manuscript—it will be returned on the 20th Feb. 1961" নির্মোহ জ্ঞান-সাধক না হলে এমন করে পাণ্ডুলিপি কেউ অপরকে ব্যবহার করতে দিতে পারেন না।

কেবল সংগৃহীত তথ্যই যোগেশচন্দ্র যে দিতেন তা নয়। অপরের জন্য খুঁজে পেতে নানা সাল তারিখ ও তথ্য উদ্ধার করে দিয়েছেন এমন কথা আমার জানা আছে। এই পর্যায়ে রাজশেখর বসু মহাশয়ের একখানি চিঠি মাত্র উদ্ধৃত করব।

দশই জুন ১৯৫৫ তারিখে ৭২ নং বকুল বাগান রোড থেকে রাজশেখর বসু মহাশয় লিখছেন— "প্রীতিভাজনেষু, রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের যে ট্রাস্ট ডীড রচনা করেছিলেন তাতে এক জায়গায় যেন আছে—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এখানে উপাসনায় যোগ দিতে পারেন, যদি তাঁদের বেশ পরিচ্ছন্ন হয়। আপনার যদি অসুবিধা না হয় তবে এই সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি আমাকে লিখে জানাতে পারেন কি? প্রবাসীর জন্য 'আশ্রমিক সমাজ' প্রবন্ধ লিখছি, তারই জন্যই দরকার।"

যোগেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন ও রিজিওনাল রেকর্ড কমিশন পশ্চিম বঙ্গের সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিতেও যোগেশচন্দ্র গৃহীত হন। এ সবই তাঁর ঐতিহাসিক বিজ্ঞাবত্তার স্বীকৃতির পরিচায়ক। কিন্তু কোন রকম স্বীকৃতির পরোয়া না করেই কত মানুষকে যে তিনি সাহায্য ও সহায়তা দান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ বিষয়েও তিনখানা সামান্য সামান্য উদ্ধৃতি দেব। এর থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি ঐতিহাসিক বিষয়ে যোগেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য সুধীজন বিশেষ

শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। অন্য আর একটি বিষয়ও এর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তা হলো—সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের দিন দিন প্রচেষ্টায় নীরবে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহায়তা দান। এই ঔদার্য আজকের সমাজে সুলভ নয়।

বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩০শে এপ্রিল ১৯৫৩ তারিখে লিখেছিলেন :

"Dear Mr. Bagal,

Perhaps you know I am a member of thc Editorial Board set up by the Govt. of India for writing a history of the Freedom Movement. I think you have already been in touch with Sri S. M. Ghosh, who is the Secretary of the Board. I will like to have a talk with you in this matter......"

রাজ্য সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের নিকট পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে স্মারকলিপি পেশ করেন তার রচয়িতা ছিলেন স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহ। এজন্য তিনি যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের নিকট থেকে নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য নিয়েছিলেন। কংগ্রেস ভবন থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৫৪ তারিখে তিনি যোগেশচন্দ্রকে লিখছেন :

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়াছি।

(১) অমৃতবাজারের কপি যে পাইতেছি না। তাহার পুরা textটা আপনার কাছে আছে কি? সেই editorial-এর textটা চাই, পাইলে quote করিয়া দিতাম। কোথায় পাইব?

(২) Govt Resolution 1905 দেখিয়াছি। তাহাতে Risleyর উল্লেখ আছে। সেইজন্য Risleyর letterএর textটা পড়িতে চাই। কোথায় পাইব?

(৩) দেখিতেছি Risleyর Proposalএর জবাবে মাদ্রাজ সরকার linguistic unityর কথা তুলিয়াছেন। বাংলা সরকার কি বলিয়াছিলেন? ছোট নাগপুরের বেলায় খালি commercial consideration-এর কথা বলিয়াছিলেন? তাঁহারা linguistic argument-এর কথা কি তোলেন নাই? সেই জন্য সেই memorandum দেখিতে পারিলে ভাল হইত। কোথায় পাওয়া যাইবে?

(৪) Town Hall conference against partition 11. 1. 1905—তাহার proceedings পাইব কোথায়? আপনার কাছে extract টোকা আছে কি?

এই materialগুলি যদি আপনার নিকট থাকে তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত। সোমবার তো দেখা হইতেছে॥"

প্রাচ্য বাণী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সংস্কৃতপ্রেমী শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী চট্টগ্রামের মানুষ। তাঁরা এক সময় ঠিক করেন চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করবেন। সেজন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। যতীন্দ্রবিমলের উপর তথ্যসংগ্রহের ভার পড়ে। এই কাজেও যোগেশচন্দ্র সহায় হতে পারেন এই ধারণায় ৩নং ফেডারেশন স্ট্রীট থেকে ১৯৫৩ সনের ২৮শে জুন তারিখে যতীন্দ্রবিমল যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে আছে :

"আমার বিশ্বাস আপনি বিভিন্ন বিষয়ে এত সন্ধান করেন যে আপনার চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়েও কিছু জানা থাকা সম্ভব বা কোন্ কোন্ পুস্তক বা পুঁথিতে এ বিষয়ে সংবাদ জানা যেতে পারে তাও আপনি বলতে পারবেন।"

যোগেশচন্দ্র বহুজনকে হাতে ধরে লেখা শিখিয়েছেন। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস বরিশা বাজারে যোগেশচন্দ্রের পাশেই থাকতেন। তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেকগুলি বই আছে। এর গোড়ার দিকের প্রচুর লেখা যোগেশচন্দ্র আগাগোড়া সংশোধন করে দিতেন। অনেকদিন দেখা গেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুনর্লিখিত হয়েছে। পরের দিকে তাঁর লেখায় প্রভূত উন্নতি ঘটে। যোগেশচন্দ্রের নিরন্তর উৎসাহেই তিনি লিখতে প্রবৃত্ত হন এ কথা বহুজনেই জানেন। স্বর্গত যাদুকর পি সি সরকার

ঐ রকম আর একজন লোক। সুদূর লণ্ডন থেকে তিনি যোগেশচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ২০শে আগষ্ট ১৯৫৩ তারিখে লিখছেন :

"জীবনে কোনদিনই আপনাদের কথা ভুলিবার নয়। আপনি আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়া এবং সংবাদ ছাপাইয়া আমাকে প্রথম জীবনে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।...লণ্ডন হইতে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য এই যে আমি আপনাদের কথা বিদেশে বসিয়াও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।"

যোগেশচন্দ্রের বন্ধুভাগ্য ছিল। নানা সুখে দুঃখে যারা তাঁর খোঁজ খবর নিতেন, তাঁর সান্নিধ্য কামনা করতেন এমন খ্যাতিমান্ লোকের সংখ্যাও বিস্তর। যোগেশচন্দ্রের নিকটে এলে বিক্ষুব্ধ-আর্ত-পীড়িত মানুষ শান্ত হয়ে ও শান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন। সুখ দুঃখ বোধ তাঁকে পীড়িত করতে পারত না। তাঁর মনের জোর ছিল সীমাহীন। এমন কি শারীরিক অপটুতাকে পর্যন্ত এই জোরে তিনি মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত অস্বীকার করে চলেছেন।

বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ২৪শে মে ১৯৫২ তারিখে যোগেশচন্দ্রকে লেখেন, "জীবনে বন্ধুলাভ সহজে হয় না। অথচ আপনার মত একজন বন্ধুলাভ করে যদি আমি নিজ দোষে তা হারাই তবে তা সত্যই আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য।"

যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। আমরা দেখেছি, পরলোকগত সজনীকান্ত দাস ও রামপদ মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা গান্ধীবাদী নেতা শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, নারায়ণ চৌধুরী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহু ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতের মানুষের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ছিল। সে সব ঘটনার কেন্দ্রস্থলে থেকেও যোগেশচন্দ্র তাঁর চরিত্রের নির্মলতার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধা প্রীতি লাভ করতেন। ঐ এক দুর্লভ চরিত্রগুণ।

ব্যক্তিগত দুঃখ শোক যোগেশচন্দ্রকে বিচলিত করতে পারত না এ কথা পূর্বে বলেছি। ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যোগেশচন্দ্র পুত্রশোক পান। এই উপলক্ষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি চিঠি বিশেষ অর্থবহ।

প্রিয়বরেষু,

যোগেশবাবু, দুঃসংবাদ জানতাম না। আজ সকালে সজনীকান্তের নিকট জ্ঞাত হলাম। কাল টেলিফোনের সময় হয়তো আপনার অজ্ঞাত মনেও তৃষ্ণা থেকে গেছে। বন্ধুর প্রীতি সান্ত্বনা এই বিয়োগতাপ কাতরতার মধ্যে এক বিন্দু শীতলতা এনে দেয়।

সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। ভগবান্ আপনাকে সান্ত্বনা দিন।"

এই চিঠিতে যোগেশচন্দ্র কি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন তা তিনিই জানেন। সান্ত্বনার কোন প্রয়োজন তার ছিল না সে কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তারাশঙ্করের মর্মবেদনা প্রকাশের জন্য ঐ চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল। সজ্জন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসাবে ওটা তাঁর কর্তব্য কর্মও বটে। আজ যোগেশচন্দ্রের পরলোকগমনের ফলে আমাদেরও কিঞ্চিৎ মর্মপীড়া সৃষ্টি হয়েছে আর সে বেদনা থেকে আমরা আমাদের কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে যোগেশচন্দ্রের যথার্থ মূল্যায়নে যদি ব্রতী হই, তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন করি তবেই তা সার্থক হবে।

———

বিস্মৃতপ্রায় কবি

কণিকা কর

একদিন ঘরে ঘরে সরলমতি শিশুকণ্ঠে পদ্যমালার সরল কবিতা শোনা যাইত। "রাতি পোহাইল, ওঠো প্রিয়ধন। কাক ডাকিতেছে করহ শ্রবণ॥" "বেড়াতে বেড়াতে আলস্য ঘুচিবে। পূর্ব দিকে সূর্য উঠেছে দেখিবে॥ সোনার বরণ সোনার কিরণ। ছটা তার স্বর্ণতারের মতন। তা' দেখে আনন্দ হইবে তোমার। তাই বলি বাছু ঘুমায়ো না আর॥" "দুর্গন্ধ মিঠাই মোণ্ডা দিলেও তা' নিও না। সহজে যা' জীর্ণ হয়, তার বেশী খায় যে। পেটুক তাহারে বলে, শেষে কষ্ট পায় সে॥" "হড় হড় দুড় দুড় মেঘ ডাকিছে, পথঘাট ছেড়ে লোক বাড়ী ফিরিছে। চিক্‌মিক্‌ বিদ্যুতের আলো হানিছে। শন্‌ শন্‌ শন্‌ রবে বায়ু বহিছে।" "তুমিও তো ভাল ছেলে দেখে শিখে লও। ভালবাসা চাও যদি, নিজে ভাল হও॥" শিশুশিক্ষায় মন্টেসরি কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী উদ্ভাবনের পূর্বের যুগে, শিশুদের কোমল অন্তরে স্বাস্থ্যের কথা, প্রকৃতির পরিচয়, নীতি উপদেশ প্রভৃতির প্রতি আগ্রহ উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন কবি মনোমোহন বসু এই সকল সহজ কথায়। কবির পিতৃভূমি কলিকাতার অদূরে ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। কলিকাতায় হাতীবাগান অঞ্চলে তিনি বাস স্থাপন করেন। সেই পথ এখন তাঁহার নামাঙ্কিত। সমাজ-কল্যাণে লোকসঙ্গীত, যাত্রা, তরজা, হাফআখড়াই যাহাতে প্রচলিত হয়, তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার রচিত নাটক, উপন্যাসাদি সে-যুগের উপযোগী। যে হিন্দু মেলা সেযুগে দেশমধ্যে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটাইয়াছিল, কবি মনোমোহন তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

মনীষী রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনায়, ১৮৬৫ অব্দে, স্বদেশিকদের সভাগঠিত হয়—তাঁহার সহযোগী, ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দুমেলার উৎপত্তি ইহা হইতেই। মেলার কর্ম্মকর্তারা প্রতি মাসে আলোচনা-চক্রে বসিতেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ, কবি মনোমোহন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাবলম্বন ও জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। ১৮৬৭ হইতে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মোট চোদ্দবার মেলা হইয়াছিল। প্রথম দিকে চৈত্রমেলা নামে চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা বসিত। গরমে অসুবিধা বলিয়া, পরে ফাল্গুনে, এবং শেষে মাঘমাসে হিন্দুমেলা নামে তাহার অধিবেশন চলিত। মেলায় নানা স্বদেশী পণ্যের সহিত ব্যায়ম, অভিনয়াদি প্রদর্শনের আয়োজন ছিল। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের "হিন্দুমেলার উপহার" গণেন্দ্রনাথের, "লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে", সত্যেন্দ্রনাথের "মিলি সব ভারতসন্তান, একতান একপ্রাণ," দ্বিজেন্দ্রনাথের "মলিন মুখচন্দ্রমা, ভারত তোমারি, রাত্রিদিবা ঝরিছে লোচনবারি॥" প্রভৃতি নব নব গীতিমাল্যে হিন্দুমেলার গৌরব ঘোষিত হয়। সর্বত্র জাতীয়তা জাগিয়া উঠে।

মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে, ১৮৬৮ অব্দে কবি মনোমোহনের ভাষণে "...সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইলেই...একটি মহৎ বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত হইবে, যে তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে! তাহার ফলের নাম

করিতে এক্ষণে সাহস হয় না। অপর দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া, তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিতে থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই......

"হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন, আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব জ্যেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষা জন্য, শারীরিক বলাধান জন্য, মনের উৎকর্ষ জন্য, শিল্পবিজ্ঞানের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে মিলিত হই।" ১৮৭০, ১১ই এপ্রিলে শারীরিক ব্যায়ামএর জন্য বলেন—"বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম। সুস্থ চিত্তে সুস্থ দেহে পাইবে আরাম॥"

"শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন আমরা হীন হয়ে পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভরতা দিনদিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আসিলে আমরা পরিতে পারি না।...এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে, কিছুই হইতেছে না।" ফলে বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কবির দুই পুত্রই—মতিলাল এবং প্রিয়নাথ প্রথম ভারতীয় সার্কাস গঠন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

কবির পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ৫ আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্রকর অবনীন্দ্রকৃষ্ণ কবিরই বংশধর। তুলিকার সহিত লেখনী ধারণ করিয়া চিত্রকর কবির জীবন আলেখ্য—"চিত্রকারের ভাবোচ্ছ্বাস" শীর্ষক গাথায় রচনা করিয়া সভায় দান করেন। এইটি কবিজীবনের এক প্রামাণিক সার সংক্ষেপ। পুরাবস্তুর পেটিকা থেকে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"কোথা দেব পিতামহ! কবিবর মহাপ্রাণ!—
কোন লোকে আছ এবে, গাহিছ হে কিবা গান ?
আজিকার হেন দিনে,
তব কথা পড়ে মনে,
জাগে হৃদে ক্ষণে ক্ষণে সে মুরতি সুমহান্!
ভেসে আসে সমীরণে, বীণার ঝঙ্কার তান।
মনে পড়ে বাল্যকালে,
যাপিতাম কুতূহলে,
বসি তব পদতলে আনন্দ-পুত্তলিপ্রায়,
আনন্দ রচিত যেন বিভাসিত সমুদায়!
মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা,
সাঙ্গ হ'লে ধূলা-খেলা,
স্তব্ধ সান্ধ্য-ছায়া-ঢালা সুদূর গগন গায়,—
দেখাইতে সন্ধ্যাতারা,—ফুটিতেছে কি বিভায়!
উপকথা ছলে সদা
শিখাইতে কত কথা,
মনে পড়ে সে বারতা, জীবন-উষায় মোর—
নব রাগে সুরঞ্জিত উজলিত দিগন্তর।
নাহি সে তপন আর,
চারিদিক অন্ধকার,
প্রভাতের সহচর নীরব বিহগবর,
ফুটে না কুসুম আর—আজি মরুভূ অন্তর।
আছিনু বালক তখন,—চিনি নাই তোমারে,
বুঝিনি কি রত্ন তুমি, সাহিত্যের সংসারে ;
এবে যবে দিন গত,
পড়ি তব গ্রন্থ যত,
বুঝিতেছি কি অমৃত ছিল তব ভাণ্ডারে ;
কিবা সুধা যোগায়েছ উজলিয়া ভাষারে।
ছিল যবে আস্তকাল বঙ্গনাট্য রচনার,
দেখাইলে দৃশ্যকাব্য—অপরূপ চমৎকার!
উদ্ঘাটিলে কি বিচিত্র
প্রেম-ভক্তি-প্রীতি-চিত্র!
দেশবাসী মুগ্ধনেত্র, তেজে তব প্রতিভায় ;
অমর তোমার কীর্তি, বঙ্গকবি-নাট্যকার!
নাটকে তুলেছ তুমি অপূর্ব করুণ সুর,
হাস্যের তরঙ্গে পুনঃ ভাসায়েছ হৃদিপুর ;
অশ্লীলতা-বিবর্জিত,
ধর্ম-নীতি-বিমণ্ডিত,
নাটক-অভাব যত, তুমিই করেছ দূর,

প্রথম স্থজিলে হাস্য, অনাবিল সুমধুর।
হিন্দুমেলা নামে সেই স্বদেশের অনুষ্ঠান,
কায়মনোবাক্যে তুমি দিলে তাহে যোগদান ;
দেশী শিল্প, দেশী কর্ম,
দেশী ভাব, দেশী মর্ম,
দেশীয় সমাজ ধর্ম—সকলি করিতে ত্রাণ,
উন্মাদিনী বক্তৃতায় মাতাইলে শত প্রাণ।'
স্বদেশীয় যে আন্দোলন উঠেছে এখন,
স্বদেশসেবার তরে এত যে ব্যাকুল মন,
কাহার জাতীয় গান,
তুলিয়া প্রথম তান,
সুষুপ্ত স্বজাতি-প্রাণ করিল গো উদ্দীপন ?
সাধিয়া কাঁদিয়া কে গো জাগায়েছে ভ্রাতৃগণ!
যবে বঙ্গপরিকর যত অভ্যুন্নতগণ,
বিচুর্ণিতে আর্য-ধর্ম দুর্গ সনাতন ;
প্রাচীন সে দুর্গদ্বারে,
লেখনী-কৃপাণ-করে
অটল সাহসভরে দাঁড়ালে, নির্ভীক মন।
যুক্তি অস্ত্রে ফিরাইলে, ধর্মদ্রোহী যুবগণ।
সমাজ নিবীর্য্য যবে ঘোর বিশৃঙ্খলতায়,
অত্যাচার প্রপীড়িত—নবযুগ সাধনায় ;
নবীন প্রবীণ মতে,
মিলাইতে সাধ্যমতে,
হ'লে 'মধ্যস্থ' রূপেতে তুমি সমাজে উদয়,
মূলমন্ত্র হ'লো তব করিবারে সমন্বয়।
কবিতা কাননে তুমি পঞ্চমে তুলিয়া তান,
কলকণ্ঠে গেয়েছিলে কত সুমধুর গান!
গাঁথিলে যে 'পদ্মমালা'
শোভিল শিশুর গলা,
যেন শেফালিকামালা-কোমল বয়ান ;
খাঁটি বাংলা কবিতার অটুট রাখিল মান।
বিজিগীষা-প্রণোদিত সঙ্গীত-সমর-ক্ষেত্রে,
দিগ্বিজয়ী বীর তুমি, যেন পার্থ কুরুক্ষেত্রে ;
বাঙ্গালার কবি-গুরু,
'গুপ্ত-কবি' তব গুরু—
হ'য়ে কবিকল্পতরু, হারিল তোমার অস্ত্রে ;
যথা দ্রোণ পরাজিত শিষ্য অর্জুনের হস্তে।
নাট্যে, গানে, বক্তৃতায়, কাব্যে, উপন্যাসে তুমি,
মাতায়েছ চিরদিন রঙ্গভরা বঙ্গভূমি ;
সর্ব-রস-অবতার,
দীপ্ত মূর্তি প্রতিভার,
কবিবর বাঙ্গালার, স্বদেশ-কল্যাণ-কামী ;
ব্যর্থকাম গুণগ্রাম বর্ণিতে আজি গো আমি।
সঙ্গীত উৎসব সব, তব সাথে হয়েছে নীরব,
বাণীর মন্দিরে তাই, রহিল আলেখ্য তব।
সন্তপ্ত বাঙ্গালী সবে,
স্মরিবে সে উৎসবে,
নিতান্ত ব্যথিত হবে, ভাবি তবকীর্তি দেব!
আসিবে এ মন্দিরে ছুটে ঘুচাতে অন্তর তাপ।'

রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার সাহিত্য-সুধাকর রচিত এই গীতি সভায় হয় :—

ধন্য তুমি, জন্মভূমি
অয়ি পুণ্যময়ি শ্যামাঙ্গনে!
যাঁর কীর্তি, নাট্য-গীতি,
পে'লে পুণ্যে সে মনোমোহনে॥
মাতৃভক্ত পুণ্যপ্রাণ, রাখিতে মায়ের মান,
তুলেছ প্রথমতান,
প্রথমে সে দেশ-সম্ভাষণে।
দীর্ঘল জীবন ধ'রে কায়-মনে সেবা ক'রে,
এনে ফুল থালি ভ'রে
দিত ডালি বাণীর চরণে—
সেত হেথা নাহি আর থেমে গেছে হেথাকার
বীণার ঝঙ্কার-তার,
শুধু সুর জাগে মা স্মরণে।
শুধু সুরে মনে হয়, এখনো জাগিয়ে রয়,
গান তার বিশ্বময়
ব'য়ে রেশ গগনে পবনে—
গেছে সে, উপায় নাই, এখন মা এই চাই,

যেন এঁকে রেখে যাই
কবি-স্মৃতি জীবনে মরণে ॥”

(২)

কে এঁকেছে রে এ ছবি
কি জানি কি তুলিকায়।
পলকে যে ছায়া লোকে
সাকারে প্রতিভা ভায় ॥
সেই মুখ চোখ সেই সৌম্যকায়,—
দীপ্ত রবিরাগে কবি-প্রতিভায়,
আঁকা ভাবটুকু নীরব ভাষায়
রস-গাম্ভীর্যের মিলন ফুটায়
দেখে চিত্রপটে স্মৃতিনিদর্শনে
জাগে না কি মনে সত্য জাগরণে
আঁখির ইঙ্গিতে মৌন সম্ভাষণে
প্রতিভার শত পথ সে দেখায় ?
কবি-স্মৃতি-চিহ্ন এ ত শুধু নয়,
কবি চিত্রকর স্বগুণে উভয়
একাধারে চির-পরিচিত রয়
প্রতিভায় দু'য়ে একি ত পর্যায়।
কবি পরলোকে, হেথা চিত্রকর,—
চিত্রে কীর্তিমান পৌত্র গুণধর,—
পেয়ে বরদার আশীর্বাদ-বর
আলেখ্য-লেখায় আদর্শ জাগায়—
বাণী বরপুত্র যে মনোমোহন,—
রেখে তার প্রীতি-স্মৃতি-নিদর্শন
হলো ধন্য পুণ্য বাণী-নিকেতন,
“বঙ্গ-পরিষদ্” গণ্য গরিমায় ॥

রবীন্দ্রনাথের উক্তি—“The unfortunate people who have lost the harvest of their past, have lost the harvest of their present age. They have missed their seed for cultivation ...The time has come for us to break open the treasure trove of our ancestors and use it for our commerce of life.” পুরা আলোচনা নিরর্থক রোমন্থন মাত্র নহে। অতীত ও বর্তমানের মাঝে ইহা যুগমিলন সেতু। তাঁহাদের স্মরণ করিয়া ধন্য আমরা ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্।

ভারতের বিপ্লব আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা

সন্তোষকুমার অধিকারী

প্রথম মহাযুদ্ধে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ সমর্থন ক'রে, গভর্ণমেণ্টকে সবকিছু সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, যুদ্ধের শেষে ইংরাজ ভারতবাসীর হাতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন তুলে দেবে। ১৯১৭ সালে ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারতবাসীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মণ্টেগুর ভারতে-শাসন-সংস্কার সম্পর্কীয় রিপোর্ট তৈরী হবার আগেই লণ্ডনের কিংস বেঞ্চ ডিভিশনের জজ রাউলাটকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করা হ'ল। উদ্দেশ্য হ'ল : দেশের যে কোন স্থানে যে কোন লোককে বিনা বিচারে আটক করে রাখবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলে দেওয়া। ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ তারিখে এই রাউলাট কমিটির সুপারিশ আইনে পরিণত হয়।

রাউলাট বিল আইনে পরিণত হওয়ায় গান্ধীজীর মোহমুক্তি ঘটল। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দেশবাসীকে ডাক দিলেন এবং ৩০শে মার্চ তারিখে দেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানালেন।

এই বিলকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ সরকারের নগ্ন বর্বরতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিওয়ানওয়ালা বাগে একটি ছোট বাগানে নিরীহ জনসাধারণের একটি প্রতিবাদ সভার ওপরে হঠাৎ বিনা প্ররোচনায় ও বিনা নোটিশে পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ডায়ার তাঁর সৈন্যদলকে গুলি বর্ষণের হুকুম দিলেন।

সে এক বীভৎস নিষ্ঠুরতা। বৃদ্ধ নারী ও শিশুর ওপরে সৈন্যদের নির্বিচার গুলি বর্ষণে যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হ'ল, কোন সভ্য জাতির ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না।

এই কুৎসিত ও পাশবিক বর্বরতায় সমস্ত ভারতবর্ষ স্তম্ভিত। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে এই ঘটনার তদন্তে ব্রতী হলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট' উপাধি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন—

"নিরস্ত্র ও নিঃসহায় জাতির উপর মনুষ্যঘাতী অস্ত্রেশস্ত্রে বলীয়ান শক্তি যে অত্যাচার করিল, তাহার তুলনা কোন সভ্য সরকারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।...........

আমি দেখিতেছি যে, সম্মানের নিদর্শন আমার এই উপাধিটি পূর্বোক্ত অপমান ও লজ্জাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। আজ আমি এই সম্মানের পদটির ভারমুক্ত হইয়া অপমানিত, লাঞ্ছিত, মানুষের প্রতি অযোগ্য ব্যবহার প্রপীড়িত দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে চাই।"

গান্ধীজী কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদকে সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিতে সমস্ত পৃথিবীর সামনে ইংরাজ শাসনের নগ্নতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। গান্ধীজীর কথা—"I do not want to embarrass the Government now." ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার তখনই তদন্তের জন্য একটি কমিশনের প্রহসন বসালেন। এবং তাড়াহুড়ো করে মণ্টেগুর শাসন-সংস্কার বিলটিকেও পাশ করালেন (২৪ ডিসেম্বর ১৯১৯)। অমৃতসরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল এই শাসন-সংস্কার আইনের সপক্ষে। কারণ গান্ধীজী সহযোগিতার পক্ষপাতী। কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীর বিপক্ষে

দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি প্রতিরোধমূলক নীতি গ্রহণের পক্ষে মত দিলেন।

আমাদের উদারনৈতিক নরমপন্থী নেতাদের চেতনা রূঢ়ভাবে আহত হ'ল, যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউস অব্ লর্ড্‌স্ জেনারেল ডায়ারের কাজের প্রশংসা করলেন এবং সাধারণ ইংরাজ সমাজ টাকার তোড়া তুলে উপহার দিলেন ডায়ারকে। নৃশংস বর্বরতার জন্য পৌর অভিনন্দনের এমন ঘটনাও বোধ হয় সভ্য জগতে আর ঘটেনি।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের চিন্তাধারার কিছুটা পরিবর্তন ঘটল কারণ: চিত্তরঞ্জন, তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি। সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে গান্ধীজী দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই সময় গান্ধীর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। তিনি এক নতুন অস্ত্র হাতে নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন; সে অস্ত্র হল অহিংসামূলক অসহযোগ। কলকাতা ও নাগপুরের অধিবেশনে তিনি আন্দোলনের আহ্বান দিলেন, আর এই আহ্বানকে সমর্থন করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯১৫ সালে যতীন মুখার্জীর মৃত্যুর সঙ্গে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলেও, এবং যুদ্ধের মাঝখানে বিপ্লবীদের কর্মধারা কিছুটা শিথিল হয়ে এলেও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ১৯১৮ সালের জুন মাসে ঢাকার কলতাবাজারে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখী সংঘাতে প্রাণ দিলেন নলিনী বাগচী ও তারিণী মজুমদার। জালিওয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডে তাদের রক্তে রক্তে জ্বালা ধরেছে। কিন্তু প্রতিরোধ আইনে অধিকাংশ নেতাই তখন জেলে। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইনের অনুকূলে সরকারের সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন।

বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের সদিচ্ছায় যেমন বিশ্বাসী ছিল না, গান্ধীজীর অহিংসা-নীতিতেও তেমনি শ্রদ্ধাবান্ ছিল না। অথচ গান্ধীজী তাদের সহযোগিতাও চাচ্ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধী নীতিকে সমর্থন করায় বিপ্লবীরা বিব্রত বোধ করল। অবশেষে চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহে একটি আলোচনা সভা বসল। গান্ধীজী এই সভায় সন্ত্রাসবাদ ও হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাসী কর্মীদের কাছে অনুরোধ জানালেন— "আমায় একবার সুযোগ দাও।*

অহিংস অসহযোগের কর্মতালিকা সামনে রেখে গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসে প্রভাব বিস্তার করলেন। অহিংসার নীতিতে মোটেই বিশ্বাসী নন, এমন বিপ্লবী কর্মীরা—বিশেষ করে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা 'ভারতসেবক সংঘে' সংঘবদ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে এই সংঘের নাম পরিবর্তিত হয় 'সিটিজেন্স প্রোটেকসন লীগ'এ। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে সমস্ত দেশ প্লাবিত হয়ে যায়। শুধু বাংলাদেশেই চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে প্রায় ষোল হাজার লোক কারাবরণ করে। দেশব্যাপী যখন তুমুল উত্তেজনা' ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চরম বিব্রত' তখন হঠাৎ গান্ধীজী চৌরীচৌরা নামক স্থানে একটি হিংসাত্মক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। এইভাবে আন্দোলনের স্রোতকে রুদ্ধ করে দেওয়ায় অতি আশাবাদীরও আশা ভঙ্গ হ'ল। দেশবন্ধুও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। রুদ্ধ আবেগে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। বিপ্লবের পক্ষপাতী হিংসায় বিশ্বাসী নেতারা বুঝলেন, গান্ধীজী নির্ভরযোগ্য নন। যারা এতদিন গান্ধীর দিকে চেয়ে অপেক্ষা করেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, নতুন করে আন্দোলনের পথ নির্দেশ দেওয়ার সময় এসেছে।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ভারতবর্ষের বিপ্লবী যুবক সমাজ, যারা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন গান্ধীজীর আন্দোলনের মুখ চেয়ে, তাঁরা হতাশ হ'লেন। ১৯২০ সালে শাসন-সংস্কার আইনের সদিচ্ছাস্বরূপ বিপ্লবী নেতাদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এবারে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ঢাকা কলকাতা ও

উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে বিপ্লবাত্মক কার্য্যসূচী দানা বেঁধে উঠতে লাগল। ১৯২৩ সালে "রেড বেঙ্গল" সংস্থার আবির্ভাব দেখা গেল। কলকাতায় সন্তোষ মিত্রর নেতৃত্বে দুটি দুঃসাহাসিক ডাকাতি হ'য়ে গেল। অনুশীলন সমিতি এ সময়ে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রতুল গাঙ্গুলি ও নরেন সেনের পরিচালনাধীন। চট্টগ্রামে সূর্য্য সেন সক্রিয় হয়ে উঠছেন। সমস্ত উত্তর প্রদেশে বিপ্লবাত্মক কার্য্যসূচী পরিচালনার নেতৃত্ব নিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।

রাসবিহারী বসুর একদা সহকর্মী শচীন সান্যাল বিভিন্ন স্থানের বৈপ্লবিক সংস্থাগুলিকে একটি সর্বভারতীয় সংস্থার পরিচালনায় আনার জন্যে একটি পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টায় তিনি কলকাতায় এলেন এবং অনুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

রাসবিহারী বসু ও যতীন মুখার্জীর পর শচীন সান্যালই এমন একটি ব্যপক প্রচেষ্টায় মন দিয়েছিলেন। কাশীর বাঙালীটোলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শচীন সান্যাল ১৯০৮ সালে তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন অনুশীলন সমিতি। পরে, পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নাম বদলিয়ে রাখা হয় 'যুবসঙ্ঘ'। শচীন সান্যালের এই সংগঠন বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির একটি শাখা ছিল। দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতেন শশাঙ্কমোহন (অমৃত) হাজরা। যুবসঙ্ঘ (Youngmen's Association) সম্বন্ধে সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে—"শচীন্দ্র নিঃসন্দেহে এই সঙ্ঘকে দেশে অপরাধমূলক কাজের প্রসারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।" শচীন্দ্র মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন এবং তাঁর সংগঠনের জন্যে অর্থ ও বোমা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। তিনি স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইস্তাহার বিলি করে উত্তেজনার সৃষ্টি করতেন। তাঁর কথা ছিল, ইউরোপীয়দের বিতাড়িত না করলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী রাসবিহারী বসু ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে কাশীতে এসে শচীন সান্যালের সঙ্গে মিলিত হন। সে সময়ে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর ফোটোও চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা সত্ত্বেও শচীন্দ্র তাঁকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। রাসবিহারী বসু শচীন সান্যালের সংগঠনকে শক্তিশালী করবার চেষ্টায় মন দেন। রাত্রে তিনি দলের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে রাসবিহারী বসু যখন বোমা ছুঁড়তে শেখাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ একটি বোমা ফেটে যাওয়ায় তিনি এবং শচীন্দ্র আহত হন।

শচীন্দ্র এর পরে তাঁর সঙ্গে এক মারাঠী যুবকের আলাপ করিয়ে দেন। এই যুবক 'গদর' দলের একজন নেতা। এ'দেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সুযোগ খুঁজ-ছিলেন। নাম বিষ্ণু গণেশ পিংলে। পিংলে রাসবিহারী বসুকে জানালেন যে, আমেরিকা থেকে গদর দলের চার হাজার লোক ভারতে চলে আসছেন এবং তাঁরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত।

রাসবিহারী বসুর নির্দেশে শচীন্দ্র লাহোরে গিয়ে অন্যান্য বিপ্লবী গদর সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদেরকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। শচীন্দ্র তাঁদের জানান যে, বোমা তৈরী করার কৌশল তাঁদের জানা আছে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে শচীন্দ্র পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে ফিরে এলেন। রাসবিহারী দলের একটি জরুরী সভা ডেকে ঘোষণা করলেন যে, সমস্ত দেশে এক সামরিক অভ্যুত্থান আসন্ন। তিনি বললেন যে, দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার সময় এসেছে।

সেই সভায় ঠিক হয় যে এলাহাবাদ কেন্দ্রের ভার নেবেন শিক্ষক দামোদর স্বরূপ। রাসবিহারী নিজে পিংলে ও শচীনকে নিয়ে লাহোরে সংগঠনের মূল কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন। দুজন যুবকের ওপরে ভার দেওয়া হল, তার বাংলা থেকে বোমা নিয়ে আসবে। বিনায়ক

কপিলের ওপর ভার পড়ল সেই বোমা পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়ার। বিভূতি ও প্রিয়নাথ—দুই যুবককে দেওয়া হল বেনারসের সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করবার ভার। রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্র লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন কিন্তু তারপরে শচীন ফিরে এলেন বেনারসের ভার নিতে। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে মণিলাল ও কপিল আঠারোটি বোমার একটি বাক্স নিয়ে লাহোর রওনা হলেন। মণিলাল লাহোরে পৌঁছালে রাসবিহারী তাঁকে জানান যে, ২১ তারিখে অভ্যুত্থানের দিন স্থির হয়েছে। মণিলাল শচীন্দ্রনাথকে দিনটি জানিয়ে দেন। কিন্তু পরে কর্মসূচীর পরিবর্তন করা হয়, অথচ শচীন্দ্রনাথ সে পরিবর্তন জানতে পারেন না।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যপী এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা পুলিশ জানতে পারল গুপ্তচর কৃপাল সিংহের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তল্লাসী ও গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেল। রাসবিহারী বসু পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে বারানসীতে পালিয়ে এলেন। পিংলে কয়েকদিন পরেই সেই বোমাগুলি সঙ্গে নিয়ে মীরাটে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন। "...he was arrested on the 23rd march in the lines of the 12th Indian Cavalry with a box in his possession containing ten bombs sufficient to annihilate half a regiment." লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় পিংলের ফাঁসী হয়।

রাসবিহারী জাপান চলে যান। তাঁর নির্দেশ ছিল উত্তর প্রদেশে সংগঠনের ভার থাকবে শচীন্দ্রনাথ ও গিরিজাবাবুর (নগেন্দ্রনাথ দত্ত) ওপরে। গিরিজাবাবুর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

১৯২০তে শচীন্দ্রনাথ ছাড়া পান কিন্তু মুক্ত হয়েই তিনি উত্তর প্রদেশের সংগঠনের জন্য কাজ শুরু করেন। ১৯২২ সালে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে, বিপ্লবীরা তাঁদের সংগঠনকে দৃঢ়তর করে তোলবার সংকল্প নেন।

এই সময়ে শচীন্দ্রের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেতাদের যোগাযোগ ঘটে। তিনি নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছে প্রস্তাব দেন যে উত্তর প্রদেশ পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের একটি সর্বভারতীয় সংস্থার মধ্যে আনা দরকার। বেনারসে শচীন্দ্রনাথের সংগঠনে রাজেন লাহিড়ী ও শচীন্দ্রনাথ বকসীর মত ব্যক্তিরা ছিলেন। কুমিল্লা থেকে যোগেশ চ্যাটার্জী এসে যোগ দিলেন। ১৯২৩ সালে বাংলাদেশে উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে বিপ্লবাত্মক কার্য্যের তৎপরতা যেমন বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশি নির্যাতনও তেমনি প্রচণ্ড হয়ে উঠল। ১৯২৪ সালে 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' জারি করে বিপ্লবীদের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করা হতে লাগল।

এই সময়ে চট্টগ্রামের একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি গভর্ণমেন্টকে বিচলিত করে তুলেছিল। ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশ্য রাজপথে রেল অফিসের ১৭০০০ টাকা লুট করা হল। যাঁরা লুট করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবেন দে, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস।

চট্টগ্রামের পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হ'ল। আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী। কিন্তু জে এম সেনগুপ্তর চেষ্টায় দুজনেই ছাড়া পান।

১৯২৪ সালের শেষদিকে পুলিশ অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষকে গ্রেপ্তার করল। বর্ধমান জেলে অনন্ত সিংহ গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টার মন্মথ সেন-এর কাছে ৩, ১, ১৯২৫ ও ১৫, ১, ১৯২৫ তারিখে দুটি বিবৃতি দিয়ে ছিলেন কার্যকলাপ ও অন্যান্য কর্মীদের সম্বন্ধে। (Reference F 253/H/Poll-1925—Appendix IX.)

ইহার উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ সূর্য্য সেন, নির্মল সেন ও চারুবিকাশ দত্তের সন্ধান করতে

লাগল। কিন্তু সূর্য্য সেন পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সংগঠনের কাজ করে যেতে লাগলেন।

১৯২৪ সালে শচীন্দ্রনাথের চেষ্টায় এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সমর্থনে বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় সংস্থা হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি। এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন শচীন্দ্রনাথ, পরিচালক সংসদে থাকেন সূর্য সেন, রাজেন লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র, চারুবিকাশ দত্ত ও আরও অনেকে।২

এই এ্যাসোসিয়েশন (এইচ আর এ) যে সব বৈপ্লবিক কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার মধ্যে কাকোরি ডাকাতি, দিল্লী এ্যাসেম্ব্লির ঘটনা, দক্ষিণেশ্বরের বোমার কারখানা, ভুসওয়াল বোমার মামলা, লাহোর ষড়যন্ত্র... প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইচ আর এ'র পরিকল্পনা অনুসারেই ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মত ঘটনা ঘটে।

এইচ আর এ'র সংগঠনের জন্য শচীন্দ্রনাথ কাশী থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি কয়েকটি শক্তিমান্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবককে সংগঠনের মধ্যে টেনে আনেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে দীপ্তিময় যার নাম, তিনি হলেন যতীন্দ্রনাথ দাস।

আমরা জানি, পরবর্তীকালে (১৯২৯-এর ১৩ই সেপ্টেম্বরে) এই দুর্দান্ত যুবক যতীন্দ্রনাথ লাহোর জেলে অনশনে মৃত্যুবরণ করেন। ৬৩ দিন ধরে অনশনে তিলতিল করে মৃত্যুর পথে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক মৃত্যু ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে যেমন গৌরব এনে দিয়েছিল, তেমনি প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাঙালী যুবকের দেশপ্রেম ও সুদৃঢ় মনোবল।

১। Such members of the Jugantar or Western Bengal Party as reverted to Revolutionary conspiracy after the Royal amnesty, realised that it was impossible for them to make any headway against the popular sentiment of Nonviolence... Some of the leaders interviewed Mr. Gandhi but he begged them to give his programme a chance.

(File No. 61/Home/Poll-1924 P. 21.)

২। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য) পৃঃ ১৬।

ক্রীড়া জগতে ভার প্রশিক্ষনের অবদান

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

বর্তমান জগতে ভার নিয়ে প্রশিক্ষণের প্রভূত* প্রচলন হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান জিজ্ঞাস্য—যে কোন ক্রীড়াতেই ক্রীড়ার উপযোগী শরীর গঠন করার জন্য ভার নিয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি?

এক সময়ে আমাদের ধারণা ছিল, দৌড়, হাইজাম্প, বক্সিং, ফুটবল প্রভৃতি গতি-সঞ্চরণশীল ক্রীড়ায় ভার নিয়ে প্রশিক্ষণে শরীরের মাংসপেশী সমূহের স্বাভাবিক নমনীয়তা দূরীভূত হয়ে তাহার অযথা শক্ত হয়ে ওঠে (steep muscle)। এই সকল শক্ত পেশী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গতিবেগের (speed) পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে কিন্তু এ চিন্তা ধারায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যে কোন ক্রীড়াতেই শারীরিক শক্তি, সহশক্তি, জীবনিশক্তি ও লেগে থাকার শক্তির সমন্বয়ে সামগ্রিক শারীরিক উন্নতিই এক জন দক্ষ ক্রীড়াবিদ্ তৈয়ারী করিতে সমর্থ হয়। একটু ভাল ভাবে চিন্তা করলে আমরা লক্ষ্য করব যে গ্রীসের অলিম্পিক আদর্শের মধ্যেও ঐ রকম কয়টি কথার উল্লেখ আছে যথা —Strength, Stamina, Agility এবং Endurance।

আমাদের জানা প্রয়োজন, প্রতিটি ক্রীড়াতেই উপরোক্ত প্রতিটি গুণের প্রয়োজন। সুতরাং শারীরিক শক্তি ব্যাতিরেকে অন্যান্য গুণের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা অনেক সময় সার্থক ক্রীড়াবিদ হয়ে উঠবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বর্তমান সময়ে প্রতীচ্যে Circuit Training নামে একটি কথার বিশেষ প্রচলন হয়েছে। ইংরাজীতে Circuit training কথাটির সংজ্ঞাগত অর্থ হল—

—A series of graduated exercises that involve principle of progressive resistance or as is now progressive loading and require both physical and mental controlled effort.

এ বিষয়ে বিখ্যাত অষ্ট্রেলিয়ান কোচ Percy Wells Cerutty বলেছেন ভার প্রশিক্ষণে সাধারণ অষ্ট্রেলীয় ক্রীড়ামান বিশ্বপর্যায়ের মানে পর্যবসিত হয়েছে।

Victorian Weight Lifting Association এবং Malavar Harris Club-এর প্রেসিডেন্টের অধীনে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি বহু খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই এখানে ভার নিয়ে প্রশিক্ষণের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর Herbert Elliot যখন ৪ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে মাইল দৌড়ান সেই সময় তিনি Cerruty's Camp-এ যোগদান করেন। এরপর প্রায় তিন মাসের মধ্যে তিনি ৪ মিনিট .০৬ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

শোনা যায় তাঁর এই উন্নতির মূলে ছিল সপ্তাহে দু'দিন দুঘন্টা করে বারবেল নিয়ে ব্যায়াম। এর পর বৎসরই তিনি ৩ মিনিট ৫৪.৫ সেকেণ্ডে মাইল দৌড়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিষয়টির উল্লেখ করে Cerruty বলেছেন Herbert Elliot এই সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় বারবেল ব্যায়াম অনুশীলন করেছেন।

Herbert Elliot নিজেও বলেছেন Cerruty ক্যাম্পের বহু ক্রীড়াবিদের সঙ্গে তিনি নিজেও উক্ত পদ্ধতিতে তাঁর অনুশীলন চালিয়েছেন।

একটি আধুনিক পত্রিকায় কোন এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ক্যানাডীয়ান জাতীয় ক্রীড়াদলের

---

* Training—অনুশীলন।

প্রতিযোগীদের যোগ্যতা সম্পন্ন করে তোলার জন্য জিমন্যাষ্টিক ও মেডিসিন বলের ব্যায়ামের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ভার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

অতীত দিনের ৩০ মিটার থেকে ৪৪০ গজ পর্য্যন্ত দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী Miss Betty Cuthbert আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে বলে গিয়েছেন, ক্রীড়াপোযুক্ত শরীর গঠনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ান মেয়েরাও তখন ডাম্বেল বারবেল ভারী বুট প্রভৃতি নিয়ে তাদের নিত্যকার ব্যায়াম পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

Betty Cuthbert বলেছেন, মেয়েদের পেটের শ্লথ পেশীসমুহকে সবল করে তোলার জন্য শায়িত অবস্থায় পালা করে একের পর এক পা উত্তোলন করা একটি ভাল ব্যায়াম। ভার নিয়ে পেটের ব্যায়ামও পেটের পেশী সমুহকে শক্তিশালী করে তোলার উপযোগী একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী বিরুদ্ধ পরিবেশ ও বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বিশ্ব ক্রীড়ামানের ক্রমোন্নতি। আমরা দেখতে পাই বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও বিশ্ব ক্রীড়ার ক্রমান্বয় রেকর্ড ভাঙ্গার পালা কি বিপুল গতিতে আজ অগ্রসরমান। আমরা দেখতে পাই কয়েক মাস অন্তর অন্তর নিত্য নূতন প্রতিযোগীর নতুন বিশ্ব রেকর্ডের সমন্বয়ে বিশ্ব জগতে নব নব আবির্ভাব।

এই উন্নত ক্রীড়ামানের রহস্যটি কি? সেটা কি প্রতিযোগিতার উত্তেজনা? ভাল খাদ্য? ভাল প্রশিক্ষণ?

হ্যাঁ, এই উন্নত ক্রীড়ামানের জন্য এদের প্রত্যেকেরই অবদান আছে। কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয়। আমাদের আরও উপলব্ধি করার আছে। একথা আমাদের জানা উচিত, বর্তমানের ক্রীড়াবিদেরা তাদের পূর্বগামীদের অপেক্ষা সবল সক্ষম এবং অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু

যখন ক্লান্তি জর্জরিত মানুষের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী, পেশীতন্তু এবং মনোবল শ্রান্তিতে বিকল হয়ে যায় তখন এই শক্তি এবং সামর্থ্যই তার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাকে তার জয়লাভের পথের দিকে চালিত করে।

কষ্টসহিষ্ণুতাই ক্রীড়াবিদ্‌কে কৃতিত্বের পথে নিয়ে যায়। বর্তমান ক্রীড়াবিদ্‌দের অসীম জীবনী শক্তি সম্পন্ন শরীরের প্রতিটি তন্ত্রীই যেন কষ্টসহিষ্ণুতার এক-একটি প্রতীক।

বর্তমানে তারা অধিক সময় ব্যাপিয়া অধিকতর কঠিন ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রশিক্ষণের পক্ষপাতী। আজ তারা উপলব্ধি করেছেন একমাত্র এই উপায়েই উচ্চ প্রতিযোগিতা মান ও প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর হয়। এই প্রতিযোগীদের অনেকেই এখন জিমন্যাশিয়াম শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এখানে তাঁরা ক্রমবর্ধমান (against Progressive Resistance) বাধার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা উচ্চ ক্রীড়ামানের জন্য উপযুক্ত শরীর গঠনের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।

বর্তমান অলিম্পিকের প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত বিশ্ব রেকর্ড সমূহের তুলনামুলক বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি, সমস্ত বিষয়েই বিশ্ব ক্রীড়ামান দ্বিগুণ বা ততোধিক পরিমাণ উন্নতি লাভ করেছে। এ বিষয়ে ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এর একমাত্র কারণ ক্রীড়াবিদ্‌দের উপোরোক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ।

বছরের পর বছর ক্রীড়া প্রীতযোগিতার মান ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। ৭৫ বৎসর পূর্বে অলিম্পিকে যেটা হয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ মান রূপে প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমানে সেটাই হয়ত আবার অতি সাধারণ মান রূপে পরিগণিত হয়েছে। বিষয়টি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৮৯৬ সালের অলিম্পিকে যুক্তরাষ্ট্রের R. Guret ১৬ পাউণ্ডের বল ৩৬ ফুট ২ ইঞ্চি দূরে নিক্ষেপ করে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন। বর্তমান পর্য্যায়ে G. Fuchus ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে তাঁর আঘাত প্রাপ্ত পা নিয়ে ৫৫ ফুট এগার ইঞ্চি এবং এক ইঞ্চির আট ভাগের পাঁচ ভাগ দূরে বল নিক্ষেপ করে মাত্র তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে ক্রীড়ামান প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ উন্নততর হয়েছে।

১৮৯৬ সালের অলিম্পিক হাইজাম্পের রেকর্ড ছিল ৫ ফুট সওয়া এগার ইঞ্চি আর ১৯৫২ সালের গ্রেট ব্রিটেনের Ron Porit ৬ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লাফিয়ে মাত্র পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬২ সালের অলিম্পিকে একাধিক প্রতিযোগী ৭ ফুট ব্যবধানের উচ্চতা পার হয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় Valery Brummel ৭ ফুট ৫ইঞ্চি অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৮৯৫ সালের পোল ভল্ট রেকর্ড ছিল ১০ ফুট পৌনে দশ ইঞ্চি। বর্তমানে বিশ্বের একাধিক প্রতিযোগী ১৬ ফুট উচ্চতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। এখনকার অধিকাংশ প্রতিযোগিরই লক্ষ্য ১৮ ফুট উচ্চতা অতিক্রম। আজ মানুষ তার সেই লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ হয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগে সুইডেনের "ফেজেল ইসাকসন" ১৮ ফুট ১ ইঞ্চি লাফিয়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

বর্তমান জগতের সকল ক্রীড়াবিদ্ই একবাক্যে স্বীকার করেন, ভার নিয়ে প্রশিক্ষণেই এই উন্নত মান লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। ভার নিয়ে প্রশিক্ষনই বর্তমান জগতে শক্ত সবল ও কর্মঠ ক্রীড়াবিদ্দের আবির্ভাব ঘটাতে সমর্থ হয়েছে।

ইংলিশ ফুটবল টিম একবার রাশিয়ান মস্কো ডায়নামো দলের নিকট নিকৃষ্ট ক্রীড়ামানের পরিচয় প্রদানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়। এই সময়ে এ বিষয়ে একজন ইংরাজ শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে রাশিয়ান কোচ বলেছিলেন —"আপনাদের ক্রীড়াবিদেরা যথেষ্ট সবল নয় বলেই তারা আজ এই প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়েছেন।"

যুক্তরাষ্ট্রের 'Notre Dame' সংস্থার নাম উল্লিখিত হলেই ফুটবলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ক্লাবের সভ্যগণও বহুদিন ধরেই নিজেদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে ভার নিয়ে অভ্যাস শুরু করেছেন। বাস্কেটবল খেলোয়াড় এবং অন্যান্য ক্রীড়াবিদেরাও এখানকার ইয়ুনিভার্সিটি ব্যায়াম কেন্দ্রে নিয়মিত বারবেল ব্যায়াম করেন।

লণ্ডন অলিম্পিক গেমসে ব্রিটেনের ডিস্কাস্ বিভাগের কোন প্রতিনিধি তৎকালীন স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় শিক্ষক Tony Chapman-কে প্রশ্ন করেছিলেন, "বিদেশী খেলোয়াড়েরা কোন্ পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে এত পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হচ্ছেন?"

উত্তরে Tony তাঁকে বলেছিলেন, "এর মধ্যে একটি মাত্র সত্যই নিহিত আছে, আর সেটি হচ্ছে তারা আমাদের তুলনায় দ্বিগুণ বলশালী, দ্বিগুণ কষ্টসহিষ্ণু ও দ্বিগুণ তৎপর।"

রাশিয়ান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন Leonid Scherlakaov ট্রিপল জাম্পে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। শোনা যায় প্রশিক্ষণ কালে তিনি কোমরে ভার বেঁধে নিয়ে লাফ দেওয়া অভ্যাস করতেন।

তিনি বলেছেন- তাঁর নিম্নাঙ্গটি অস্বাভাবিক সবল ও সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই রকম ক্রমবর্ধমান ভার নিয়ে অভ্যাস করেছেন।

হেলসিঙ্কী অলিম্পিকের ম্যারাথন রেস চ্যাম্পিয়ন Emil Zatopek শ্রমবহুল প্রশিক্ষণের যেন এক মূর্ত প্রতীক। কৃতিত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ কালীন তিনি বছরে হাজার ঘন্টারও অধিক সময় প্রশিক্ষণে অতিবাহিত করেছেন। এই সময়ে তিনি ভারী বাস্কেট বল, জুতা অথবা অন্য কোন রকম ভার নিয়ে প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভ্যাস করেছেন। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তিনি অভ্যাস করেছেন যাতে প্রতিযোগিতার সময় তিনি মুক্তভাবে সহজ ভঙ্গীতে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হন।

পূর্বতন দিনের বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গকারী স্বল্প পাল্লার দৌড়বীর Knut Lindeberg তাঁর ক্রীড়া-জীবনের প্রাথমিক পর্য্যায়ে একজন ভারোত্তলনকারী ছিলেন। ফ্রান্সের দূর পাল্লার দৌড়বীর James Bunin ভার প্রশিক্ষণের দ্বারা তাঁর শরীর এমন ভাবে তৈয়ারী করেছিলেন যে সংবাদপত্রে তখন তাঁকে "দৌড়ের হারকিউলিস" বলে অভিহিত করা হত (Hercules of foot racing) ।

জগৎবরেণ্য দৌড়বীর Pavo Nurm মোট বোঝাই ঠেলাগাড়ী ঠেলে দৌড়ে তাঁর পা দুটিকে সবল করে তুলেছিলেন।

ব্রিটীশ "ক্রশ কান্ট্রী ইউনিয়ন" সেক্রেটারীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এতগুলি উচ্চ পর্য্যায়ের দৌড়বীর আপনি পেলেন কেমন করে?"

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "অতি সহজেই আমি তাদের তৈরী করে নিয়েছি। তাদের প্রতিজনই বিশ্বের যে কোন লোকের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে। সুতরাং আজ তারা বিশ্বের সর্বোত্তম।"

লণ্ডন অলিম্পিকে Wilbur Thompson ৫৬ ফুট ২·২ইঞ্চি দূরে বল নিক্ষেপ করে অলিম্পিক রেকর্ড করেন। এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হয়ে একজন ব্রিটিশ প্রতিযোগী তাঁকে বলেছিলেন, "আমি তোমার মতনই শক্তিশালী কিন্তু আমি তো তোমার মতন এটা পারি না। তোমার পক্ষে এটা তবে কি করে সম্ভব হয়?"

উত্তরে Thompson বলেছিলেন, সেদিন "তুমি তো আমার মতন শক্তিশালী কিন্তু তুমি কি Horizontal Bar-এ ১০৫ বার chin up করতে পার? আমি প্রত্যেক দিনই সকাল বেলায় এটা অভ্যাস করি।"

১৬ পাউণ্ড শটপুটের এক সময়কার বিশ্ব রেকর্ড অধিকারী James Fuchs-কে তাঁর সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, ভার নিয়ে প্রশিক্ষণই তাঁর সাফল্যের একমাত্র কারণ।

শটপুট্ বিভাগে Parry O'brien একটি জনপ্রিয় নাম। তাঁর সম্বন্ধে এও জানা যায় যে তিনিও ভার নিয়ে প্রভূত পরিমাণ প্রশিক্ষণ করতেন।

যুক্তরাষ্ট্রের Manny Seaman জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষক। প্রধানতঃ তাঁর প্রশিক্ষণই জো লুইকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হওয়ার পথে পরিচালিত করেছিল। এই সময়ে একাধিক বিশ্বশ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের মুষ্টিযোদ্ধা তাঁর নিকট শিক্ষাধীন ছিলেন।

Seaman বলেছেন "যখনই আমি কোন মুষ্টিযোদ্ধার ঘুঁসির জোর কম বোধ করি তখনই আমি ডাম্বেল ব্যায়ামের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।"

Pat O'Halloran ছিলেন একজন খ্যাতনামা ভারোত্তলক। তিনি তাঁর শান্ত শিষ্ট সৌম্যদর্শন সাত চৌদ্দ ওজনের ভাইকে ভার প্রশিক্ষণের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে নিয়োজিত করেন। এই বালকই পরবর্তীকালে উপর্যুপরি দু'বার ইংলণ্ডের ইণ্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ন রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। শোনা যায়, তার প্রবল মুষ্টাঘাতে সময় সময় প্রতিপক্ষ যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠত।

বর্তমানে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে ভার নিয়ে প্রশিক্ষণ একটি সুসংবদ্ধ রীতিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি চ্যাম্পিয়নই সম্ভবতঃ এখন ভার প্রশিক্ষণে অভ্যস্ত।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন কুস্তীগির Paul Barlenbachই জগতের মধ্যে এমন একজন মানুষ যিনি পরবর্তীকালে মুষ্টিযুদ্ধেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। শোনা যায় Barlenbachও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভার উত্তোলন অভ্যাস করতেন।

আমাদের জানা প্রয়োজন যে বিদেশের প্রতিটি চ্যাম্পিয়ন মল্লযোদ্ধা নিয়মিত ভাবে ভারোত্তলন অভ্যাস করেন। ভাল কুস্তীগির হওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রভূত শক্তি। আর এই জন্যই প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ ভারোত্তলনকারী ব্যায়াম।

ক্যানাডীয়ান হেভীওয়েট ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়ন Dave Bailie একাদিক্রমে প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগে অংশ গ্রহণ করে প্রতিটি বিষয়েই নিজেকে একজন কৃতী ক্রীড়াবিদ্ বলে প্রমাণিত করেছেন। তিনি ক্যানাডীয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২২টি বিভাগে প্রথম তিনটি বিভাগে দ্বিতীয় এবং চারিটি বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

তিনি শটপুট বিভাগে রেকর্ড করার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং ডিসকাসেও অনুরূপ সাফল্য প্রদর্শনের অধিকারী ছিলেন।

বেলী সম্পর্কে ইহাও জানা যায় যে তিনি নিয়মিত ভার প্রশিক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন।

বক্সিংএ অনভিজ্ঞ Harold Koch নামে কোন ভারোত্তলনকারী ব্যায়ামবিদ্ (Barbel man) "গোল্ডেন

গ্রাভস” সংস্থা পরিচালিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে লাইট ওয়েট বিভাগে জয়লাভ করেন। অন্যান্য ক্রীড়া.প্রতিযোগিতাতেও হয়ত বা এটা সম্ভব হতে পারে।

এ কথা সত্য যে ভার নিয়ে প্রশিক্ষণই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সব নয়। ক্রীড়াবিদেরা তাঁদের নিজ নিজ বিভাগের জন্য অবশ্যই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে দৌড়বীর দৌড় অভ্যাস করবেন, কুস্তীগির কুস্তী লড়বেন, মুষ্টিক মুষ্টিযুদ্ধ করবেন, কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে সবতোভাবে বিশেষ প্রয়োজন শরীরিক শক্তির। এই শারীরিক শক্তির সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য গুণের সমন্বয় ঘটলেই তবে একজন ক্রীড়াবিদের দ্বারা অবিশ্বাস্য অসম্ভব অথবা অশ্রুত-পূর্ব কোন কিছু করা সম্ভব হতে পারে। তার পূর্বে নয়।

মিষ্টার আমেরিকা উপাধিধারী Denis Tinerino নামে বিখ্যাত শরীর শিক্ষাবিদ তিন বৎসর ভার প্রশিক্ষণের পর ফেন্সিং (Fencing) বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ করে বহু প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে সমর্থ হন। ফেন্সিং-এর খোঁচা দেওয়া (Lunges) এবং কাটানো পদ্ধতি (Counter retreat) তিনি ভার নিয়ে অভ্যাস করতেন। পরবর্তীকালে Denis Tinerino ষ্টেট ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী সাব্যস্ত হন।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভার প্রশিক্ষণে শিক্ষা প্রাপ্ত মানুষ সাধারণতঃ একাধিক ক্রীড়ায় পারদর্শিতা লাভ করে। এর একমাত্র কারণ ভার নিয়ে প্রশিক্ষণে শক্তি, সামর্থ, সহ্যশক্তি ও মানসিক শক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠা স্বাস্থ্য যে কোন ক্রীড়াতেই পারদর্শিতা অর্জনে সাহায্য করে।

বিশ্বজয়ী মল্লবীর হাকেন্সমিট (George Hackenschmidt) তাঁর অতীত জীবনে ছিলেন একজন ভারোত্তলনকারী। ইতিপূর্বে ভারোত্তলনে তাঁর অনেকগুলি বিশ্বরেকর্ডও ছিল। কিন্তু এ-কথাটা খুব কম লোকই জানে যে তিনি রাশিয়ার একজন চ্যাম্পিয়ন সাইক্লিষ্টও ছিলেন।

লৌহবল নিক্ষেপকারী James Fuchus প্রথম জীবনে একজন ফুটবল খেলোয়াড় (American Football) হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ফুট বলে বাধাদান (Blocking), কাটান (Tackling) এবং গতি (Speed) তখন সত্যসত্যই দর্শনীয় ছিল।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ৯.৭ সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়েছেন; হাইজাম্প করেছেন ৬ ফুট, লং জাম্প ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। ঐ একই সময়ে তিনি ১৭২ ফুট পৌনে এগার ৪ ইঞ্চি দূরে লৌহ বল নিক্ষেপ করে একটি বিশ্ব রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছেন।

আইরিশ চ্যাম্পিয়ন Davie Guiney (শটপুটে) Dick O'Raffetry (হাইজাম্প) এবং Ronney Taylor (ডিসকাস্) প্রভৃতি ক্রীড়াবিদেরা সকলেই ভার প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাঁদের যথোপযুক্ত শরীর গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এই তথ্যবহুল সংবাদ বিশ্বেরই উন্নতিকল্পে Michael Fallon বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন একদিন। এ সম্বন্ধে তিনি কোন তত্ত্বকথা আমাদের শোনাতে চাননি। তিনি শোনাতে চেয়েছেন যে কথা সত্য, সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং ফলপ্রসূ। মনে হয় আমাদের দেশেও এ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

বন মর্মর

ডাঃ নন্দলাল পাল

স্বপ্ন দেখছিলাম।

ছোট বেলায় আমি খেতে বসেছি। বায়না ধরলাম, গল্প বল, নইলে খাব না। হঠাৎ কোন গল্প মনে পড়ছিল না দিদিভাই-এর। আমিও খাওয়া বন্ধ করে বসে রইলাম।

দিদিভাই বলল, শোন্ রাখাল, আজ তোকে নাগারাজের গল্প বলব।' দিদিভাই বলেছিল, কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগেনি। এতদিন দিদিভাই-এর মুখে শুনেছি, রাজা মানেই হল সাত মহলা বাড়ীর মালিক। তাঁর অনেক হাতি ঘোড়া, দাসদাসী, সিংহাসন, রাজদণ্ড, রাজকীয় পোশাকের বাহার। কিন্তু এ কেমন রাজা যে নিজে এবং যার প্রজারা নেংটির মত কাপড় পরে।

আচমকা দরজায় দুম দুম করে ঘা পড়ল। ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে তাকালাম। কী আশ্চর্য, আমি যে নাগাপাহাড়েই আছি। ছোট বেলায় দিদি-ভাইএর মুখে শোনা গল্প কি তবে অবচেতন মন থেকে আজ নাগাপাহাড়েই স্বপ্নে দেখা দিল?

শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। দু'দিন ধরে আমাশয়ের মত হয়েছিল। তাই হাসপাতাল থেকে এসেই সামান্য খেয়ে দরজা বন্ধ করে লেপের নীচে ঢুকে পড়েছিলাম। হাতে ছিল C. V. Furer-Halmendorf সাহেবের লেখা 'দি নেকেড্ নাগাস্' (The Naked Nagas) বইখানা। কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

এখানে এসেছি মাত্র দিন কয়েক আগে। চমৎকার বাংলো। তাই প্রথম দিকে রাত্রে পেট্রোমাক্স জ্বালাতাম। দু'তিন দিন পরে যখন মিলিটারী ক্যাম্পে বেড়াতে গেলাম তখন সুবেদার সাহেব একথা সেকথার পর আমাকে বলেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি ও নতুন লোক, এখনকার অবস্থা এখনও ভাল ভাবে জানেন না। যাহোক, রাত্রে এত উজ্জ্বল বাতি জ্বালাবেন না।'

পরদিন সার্কেল অফিসার মিঃ যোসেফের বাসায় বেড়াতে গেলাম। তিনিও একই কথা বললেন। মিঃ যোসেফ আর একটু খোলাসা করেই বললেন, 'ডক্টর, উজ্জ্বল আলো বৈরীদের পথের নিশানা দেয়। এ ছাড়া ওরা বুঝতে পারবে যে ডাক্তারের বাংলো এখন খালি নেই। সুতরাং......'

সুতরাং আর বেশী আমাকে বলার প্রয়োজন নেই। সেদিন থেকেই সন্ধ্যার আগে ভোজন পর্ব সমাধা করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তাম। ঘরে আলো জ্বালাবার প্রয়োজন হয়নি কোনদিন।

আবার দরজায় দুম দুম শব্দ হচ্ছে। আমি চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছি। একটা অজানা ভয় ও আশঙ্কায় মনটা কেঁপে উঠল। কান খাড়া করে রইলাম।

"ডাক্তার সাহেব উঠিব, উঠিব। জলদি উঠিব।" সঙ্গে সঙ্গে দরজায় প্রচণ্ড দুমদাম শব্দ।

তবে কি সত্যি ওরা এল? কিপিরিতে ডঃ পালিত বলেছিলেন, "একা কখনও ট্যুরে যাবেন না, ডঃ চৌধালি। আমার কিন্তু এখানে তিন বছরের অভিজ্ঞতা। ওদের নাকি আবার ডাক্তার একজনের দরকার। অন্ততঃ আমার সেমা চাকরটা ত তাই বলে। কোন্ ডাক্তার কোথায় আছেন সব বৈরীদের নখদর্পণে। ওরা নাকি হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেবে। তবে আপনাকেও ওদের সঙ্গে আণ্ডারগ্রাউণ্ড হতে হবে।"

এই মুহূর্তে ডঃ পালিতের গলাটা যেন আমার কানের কাছে আবার বাজতে লাগল, 'ওদের নাকি আবার

ডাক্তার একজনের দরকার—।' তবে কি আজই ওদের দরকার হল ? এবং এখনই ?

গা'টা ছম ছম করে উঠল। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাইরে জোৎস্না ঝিকমিক করছে। সেদিনের তিথিটা আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে খুব সম্ভব পূর্ণিমার দু'একদিন আগে বা পরে হবে। কিন্তু এ কী, সে কি আমার মনের ভাবটা টের পেল ? এবার যে সে এসে আমার বেডরুমের দরজায়ই ঘা দিল। মনে হল, সত্যি বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। মনে মনে ইষ্ট নাম জপতে লাগলাম। এবার কিন্তু সে একেবারে আমার মাথার পাশের জানালায় ঘা দিল।

'ডাক্তার সাব, উঠিবি উঠিবি।'

জানালার দিকে তাকালাম। কিন্তু যা দেখলাম তা'তে হাত-পা অবশ হয়ে এল। আগন্তুক যেই হোক, তার দু'কাঁধে দুই প্রহরণ - এক কাঁধে সুদীর্ঘ বল্লম এবং অন্য কাঁধে প্রকাণ্ড নাগা দা—জ্যোৎস্নার আলোকে ঝক ঝক করছে।

বুঝলাম বিপদে পড়েছি। কিন্তু এখন যদি নার্ভাস হই, তবে নির্ঘাত হার্টফেল করবে। মনে পড়ল সেই মহাজন বাণী—'তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়ম্ অনাগতম্।' সাহস সঞ্চয় করে বললাম। 'কে, কে তুমি ?'

'কে তুমি ?' আমার গলার স্বরটা নিজেই যেন চিনতে পারলাম না। আশ্চর্য, এত বড় বিপদে পড়েও নিজের গলাকে বেশ নিরুদ্বেগ মনে হল। আমার গলার শব্দ বন্ধ দরজা জানালার গায়ে ঘা খেয়ে আবার আমার কাছেই ফিরে এল।

চাঁদের আলোর এক ফালি জানালায় পর্দার ওপর দিয়ে এসে ঘরে পড়েছে। হঠাৎ মনে হল, আমার বাংলোর পেছন দিকে কাদের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। হ্যাঁ, ফিসফিসানি নয়, একাধিক লোকের চাপা কথাবার্তা। নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম, ঐ সব কথাবার্তার দু'একটা শব্দের অর্থও যদি বোঝা যায়।

নিঝুম রাত্রি। নির্জন ঘর। হৃৎপিণ্ডের শব্দটাও যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। লাব্-ডাব্, লাব্-ডাব্। মনে পড়ল, ডাক্তারী পড়বার সময় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন রোগীদের দেখিয়ে প্রথম ডিমনষ্ট্রেশন শুরু হল, তখন আমার জন্য যে রোগীদের নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন রেজিষ্ট্রার ডঃ হরেন ঘোষ, যাঁকে আমরা সবাই হরেনদা বলে ডাকতাম এবং এর থেকে যিনি পরবর্তী কালে সার্বজনীন হরেনদা হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রথম রোগীটাই ছিল হার্ট কেস্—মাইট্রেল ষ্টেনোসিস্ (Mitral Stenosis)। মাইট্রেল এরিয়াতে ডায়েষ্টলিক মারমার (Diastolic murmur)—বাংলা করলে দাঁড়ায় মর্মর ধ্বনি। সবে মাত্র থার্ড ইয়ারে উঠে মেডিক্যাল ওয়ার্ড করতে এসেছি, আর সেখানে প্রথম রোগীই কিনা মাইট্রেল ষ্টেনোসিস্ কেস্।

হরেনদা রসিক পুরুষ। রসিকতা করে বললেন, 'কাব্যে মর্মর ধ্বনি পড়েছ আর বসন্ত কালে বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সে মর্মর ধ্বনি হয়ত উপলব্ধি করেছ। তবে সোনা আমার' এবার তোমাকে হৃদয়ের মর্মর ধ্বনি অনুধাবন করতে হবে। আর তা যদি পার তবে জেনে রেখো, হার্ট কেসের অনেক কিছুই তোমার শেখা হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, প্রথমেই একেবারে এ মর্মর ধ্বনি তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হবে না। তার জন্য চাই আগে নরম্যাল্ (normal) হার্ট সাউণ্ড আয়ত্ত করা।' এই বলেই তিনি আমাকে অন্য এক রোগীর কাছে নিয়ে গেলেন যার অন্ততঃ হার্টের কোন অসুখ ছিল না। তার বুকের ওপর ষ্টেথোস্কোপ রেখে হরেনদা বললেন, 'আগে শোন এবং বুঝতে চেষ্টা কর এ সাউণ্ড। বইয়ে পড়েছ, হার্টের প্রথম সাউণ্ড বা সিষ্টোলিক সাউণ্ড এবং দ্বিতীয় সাউণ্ড বা ডায়েষ্টলিক সাউণ্ড। এখানে ভাল করে শোন—প্রথম সাউণ্ডটা 'লাব্' এবং দ্বিতীয় সাউণ্ডটা 'ডাব্'এর মত হচ্ছে। এই 'লাব্ডাব্' সাউণ্ড আগে বুঝবার চেষ্টা কর।' এরপর তিনি অন্য ছাত্রের কাছে চলে গিয়েছিলেন। হরেনদা ত এত সহজে আমাকে 'লাব্ডাব্' আয়ত্ত করতে বলে গেলেন, কিন্তু আমি

ষ্টেথোস্কোপ বসিয়ে যা শুনতে পেলাম, তার হয় সবটাই 'লাব্' না হয় সবটাই 'ডাব্' আর না হয় সবটাই কিছু নয়। অবশ্য পরবর্তী কয়েকদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় সে 'লাব্ডাব্' আয়ত্ত করেছিলাম। কিন্তু আজ নাগাপাহাড়ে বসে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আমার হার্টের শব্দ আমার কাছে এতই স্পষ্ট যে তা বুঝবার জন্য ষ্টেথোস্কোপের দরকার নেই। খালি কানেই আমি তার 'লাব্ডাব্' শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু না, বহু চেষ্টা করেও সে কথাবার্তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। দুর্বোধ্য নাগা ভাষায় সে আলাপ -আলোচনা হচ্ছে।

বিছানায় ওপর বসে মিলিটারী ক্যাম্পের দিকে তাকালাম। আমার বাংলো থেকে মিলিটারী ক্যাম্প প্রায় অর্ধমাইল দূরে। ক্যাম্পের চার কোণে চারটি বিবরে বসে সিপাইরা ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমার বাংলোর এদিকে কোন সান্ত্রী নেই। আমার বাংলো থেকে ফার্লং-চারেকের ভেতরে জনমানবের কোন অস্তিত্ব নেই। যদি আমি সাহায্যের জন্য জোরে চেঁচাই, তবে তা চারদিকের পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার কাছে ফিরে এসে আমাকেই বিদ্রূপ করবে—অন্য কা'রো কানে পৌঁছাবে না। সুতরাং সে চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং তা'তে ফল আরো খারাপ হতে পারে।

আমার গলার স্বর বোধ হয় বন্ধ ঘরের দেওয়াল ভেদ করে আগন্তুকের কানে পৌঁছায়নি। তাই সে আবার দরজায় ঘা মেরে বলল, "ডাক্তার সাব, উঠিব উঠিব।

আমিও আবার বললাম, 'কে তুমি ?'

এবার বোধ হয় সে শুনল। যথাসম্ভব চেঁচিয়ে বলল, 'মুই লেসামং।'

'লেসামং, কোন্ লেসামং তুমি ?'

'মুই লেসামং, হস্পিট্যাল কা লেসামং আছি।'

হস্পিট্যাল কা লেসামং। তবে কি হাসপাতালের এ্যাটেনডেন্ট লেসামং ? বিছানা থেকে নেমে পর্দার উপর দিয়ে কাঁচের জানালার ওপাশে আগন্তুককে দেখে নিলাম। কোন্ লেসামং চিনবার উপায় নেই। আপাদ-মস্তক এক ওভারকোটে ঢাকা। মাথায় বানরমুখ টুপি

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'লেসামং, তুমি এত রাত্রে কেন এসেছ, কি হয়েছে ?'

প্রত্যুত্তরে লেসামং যা বলল তার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় যে, আচুংবা দোভাষীর স্ত্রীর ছেলে হয়েছে বিকাল চারটায়, কিন্তু এখনো ফুল (Placenta) বেরোয়নি। ওরা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। মেয়েটির ভীষণ রক্তস্রাব হচ্ছে এবং অবস্থা খুবই খারাপ। সুতরাং আমি যদি একবার গিয়ে দেখি তবে খুবই ভাল হয়।

একটা কথা চকিতে আমার মনে এল। লেসামংকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পেছন দিকে চাপা গলায় কা'রা কথা বলছে ?'

লেসামং বলল, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক এসেছে। তবে ওরা একসঙ্গে এসে আমাকে বিরক্ত করতে চায় না।

দরজা খুলে বাইরে এলাম। প্রায় গোল চাঁদটা তখন মাথার ওপর। মিলিটারী ক্যাম্পে ঢং করে রাত একটা বাজল।

মুহিমংকে ডেকে তুললাম। বাংলোর এক পাশে চাকরদের জন্য নির্দিষ্ট যে ঘর আছে সে ঘরে মুহিমং থাকে। মুহিমং নাগা ছেলে—জাতিতে ইমচুংগর।

মুহিমং-এর ঘরের দরজায় ঘা দিল লেসামং। একবার—দু'বার—তিনবার। কিন্তু মুহিমং-এর কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সুতরাং মুহিমং ঘরেই আছে।

লেসামং বলল, 'স্তার, আপনি একবার ওকে ডাকুন।'

আমি তা'ই করলাম। দু'তিন বার ডাকতেই ভগ্নকণ্ঠে জবাব দিল মুহিমং, 'স্তার, মুই এত্তা আছি।' অর্থাৎ আমি এখানে আছি।

আমি বললাম, 'দরজা খোল মুহিমং।'

মুহিমং দরজা খুলল। বললাম, 'কেন এতক্ষণ তুমি জবাব দাওনি মুহিমং ?'

মুহিমং হঠাৎ হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'স্যার, আমি ভয় পেয়েছিলাম বোধ হয় জংলী (বিদ্রোহী) লোকেরা এসে গেল। তাই খাটের নীচে ঢুকে পড়েছিলাম।'

বেচারা মুহিমং! বৈরী নাগাদের ভয় দেখছি তারও কম নয়।

মুহিমং বলল, 'সাহেব, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

বুঝলাম মুহিমং একা থাকতে ভয় পাচ্ছে। তাই সে-ও আমাদের সঙ্গে চলল।

বাংলোর পেছন দিকে বাঁক ঘুরে যেতে হবে দোভাষী আচুংবার বাড়ীতে। প্রায় এক মাইল রাস্তা।

পথের দু'ধারে পাইন ও ধূপগাছের সারি। বাতাসে পাতাগুলো যেন শিস্ দিচ্ছে। মাঝে মাঝে তুলোর মত সাদা দু'এক খণ্ড মেঘ গগনচুম্বী পাহাড়গুলোর মাথায় বসে আছে। আকাশে চাঁদ—চারদিকে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। মনে হচ্ছিল যেন কোন এক স্বপ্নময় জগতের ভেতর দিয়ে চলেছি। কিন্তু সে সৌন্দর্য উপভোগ করার অবকাশ কোথায় আমার? আজকে আমার দক্ষতার উপর অনেককিছু নির্ভর করছে। আচুংবা দোভাষীর স্ত্রীর ছেলে হয়েছে বিকাল চারটায়, তার ফুল এখনো বেরোয়নি। এখন রাত একটা। নানা প্রাগৈতিহাসিক চিকিৎসা হয়েছে এবং সে চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় ডাক্তারের ডাক পড়েছে। এর আগে পুংরো এলাকায় এমনটি আর হয়নি। মনে মনে আচুংবার স্ত্রীর অবস্থা কল্পনা করলাম এবং তার সঙ্গে কল্পনা করলাম আমার অবস্থাও। রিটেন্ড্ প্লেসেন্টা কেস (Retained placenta case)। মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় এবং তারপর হাউস সার্জন হিসাবে কাজ করবার সময় এরূপ রোগী অনেক দেখেছি এবং চিকিৎসাও করেছি অনেক। রীতিমত ঘটার ব্যাপার। কম করেও দু'জন ডাক্তারের দরকার। একজন রোগীকে অজ্ঞান করবে এবং অন্যজন অপারেশন্ করবে। কিন্তু এখানে ডাক্তার বলতে সবেধন নীলমণি আমি। আমাকেই সবকিছু করতে হবে। সহায় আছে একমাত্র কম্পাউণ্ডার জর্জ। কিন্তু সে-ও ট্রেণ্ড কম্পাউণ্ডার নয়।

নেফার আদিপর্বে যখন কেউ সেখানে যেতে ভরসা পেত না, তখন কম্পাউণ্ডার জর্জ ঢুকেছিল নেফার চাকুরিতে। কেরালার কোন এক অখ্যাত গ্রামে বাড়ী তার। বাড়ী থেকে পালিয়ে জর্জ নিজো ভাগ্যের সন্ধানে এসেছিল আসামে। সেখানে এক চা-বাগানে কুলি সর্দারের কাজ করত জর্জ। অবসর সময়ে বাগানের হাসপাতালে গিয়ে কম্পাউণ্ডার, ড্রেসারদের সঙ্গে আড্ডা দিত সে। এখানেই হয় তার হাতে-খড়ি। কিছুদিন পর কুলি সর্দারীর কাজ জর্জের ভাল লাগল না। বাগানের হাসপাতালে কয়েক বছর কাজ করে মোটামুটি সব কাজই আয়ত্ত করল জর্জ। তারপর কিভাবে যেন কম্পাউণ্ডারের এক সার্টিফিকেট যোগাড় করে ১৯৫০ সালে নেফার চাকুরীতে কম্পাউণ্ডার হিসাবে ঢুকে পড়ে। জর্জের এ কাহিনী আমি ডঃ ত্রিবেদীর মুখে শুনেছিলাম।

এই মুহূর্তে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। কে বুঝবে এসব কথা? আচুংবা দোভাষীর স্ত্রীর ছেলে হয়েছে—ফুল বেরোয়নি। সুতরাং যেমন করেই হোক ডাক্তারকে তা বের করে দিতে হবে। যদি না পার তবে তোমার ডাক্তারী বিদ্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী—এসবের এক পয়সার দামও নেই আচুংবার কাছে।

ষোলটা মুণ্ডশিকারী আচুংবার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এর চেয়ে বৈরীদের হাতে পড়াও বোধ হয় ভাল ছিল।

প্রথম যেদিন এখানে এলাম, সেদিনই রাত্রে আচুংবা এসেছিল দেখা করতে। হেড দোভাষী—সুতরাং দায়িত্ব তার কম নয়। কখন্ কোন্ অফিসার আসেন যান তার খোঁজ-খবর তাকে রাখতে হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই যেন মনে হয়েছিল আচুংবা তার চারপাশের অন্য দশজনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। ইস্পাতের মত কঠিন শরীর। মাথার চুল গোল করে ছাঁটা। গোল গোল দুটি চোখ যেন শিকারী নেকড়ের মত সব সময় ঝকঝক্ করছে।

আচুংবা এসেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল,

সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ডঃ পালিতের কথাগুলি বেজে উঠল।

আসার পথে কিপিরিতে পরবর্তী কনভয়ের জন্য দু'দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ডঃ পালিত সেখানকার মেডিক্যাল অফিসার। তিনি প্রায় অযাচিত ভাবেই বলেছিলেন, 'ডঃ চৌরালি, নাগাহিল্‌স্ ত এলেন। যদি সসম্মানে এবং নির্ভয়ে চাকুরী করতে চান, তবে আচুংবা দোভাষীকে যে কোনও ভাবে বশে রাখবেন। মোলটা হেড্‌হান্টার সে। তার কথায় পুংরো এরিয়া ওঠে বসে। সে যদি প্রসন্ন থাকে, তবে সান্ত্রী-সিপাই কিছুরই দরকার হবে না। আপনার এলাকায় আপনি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন। কোন বৈরী নাগা আপনাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু সে যদি বিগড়ায়, তবে সান্ত্রী সিপাই কিছুই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

এ হেন আচুংবা এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। সুতরাং আপ্যায়নের কিছুই বাকী রাখলাম না। কফি ত খাওয়ালামই, সঙ্গে বিস্কুট ডালমুট যা ছিল সবই তাকে মুঠো মুঠো করে দিলাম। খুব খুসী হয়েছিল আচুংবা। যাবার সময় আমাকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল। সানন্দে আমি তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আচুংবার ভাই এসে আমাকে নিয়ে গেল তার বাসায়। আমার বাংলো থেকে যেখানে পুংরো টিলা বের হয়ে ঝুর্মাক নদীর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে এবং যেখানে অজস্র ধূপগাছ সবুজ মেখলার মত পুংরো টিলাকে জড়িয়ে ধরেছে এবং যেখান থেকে ঝুর্মাক নদীর ছলছল শব্দ অস্পষ্ট কানে আসে, সেখানে আচুংবার ঘর। হেড দোভাষী। চমৎকার সুন্দর সরকারী বাসা তার আছে। কিন্তু সেখানে সে থাকে না। শহরের একপ্রান্তে নিজের হাতে নাগা কায়দায় তৈরী বাড়ীতে সে থাকে।

আচুংবার ঘরে পৌঁছে দেখি, আমার সম্মানে আচুংবা অনেক আয়োজন করেছে। ঘরের মাঝখানে প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে মদের গেলাস হাতে আচুংবা বসে আছে। পাশে দু'টো মদের বোতল। তার পাশে একটা কাঠের উঁচু পিঁড়ি। আমাকে দেখেই আচুংবা ও তার স্ত্রী ছুটে এসে 'জয় হিন্দ' বলে অভ্যর্থনা করল। তারপর আচুংবা আমাকে সেই কাঠের পিঁড়িতে বসতে বলল। স্বামী স্ত্রী দু'জন বিচিত্র সাজে সেজেছিল। আচুংবার গায়ে সুন্দর একখানা নাগা চাদর। পরণে নাগা নেংটি। দু'হাতে হাতির দাঁতের বলয়। গলায় অসংখ্য লাল পাথরের মালা। আচুংবার স্ত্রীর পরণেও নাগা চাদর। গায়ে কামিজ এবং গলায় অসংখ্য লাল পাথরের মালা।

আচুংবাকে অনুসরণ করে আমিও অগ্নিকুণ্ডের পাশে পিঁড়িতে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা গেলাস এনে দিল আচুংবার স্ত্রী। কোন ভূমিকা না করেই আচুংবা বোতল থেকে মদ ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আচুংবার স্ত্রীও আর-একটা গেলাসে মদ ঢেলে খেতে লাগল।

আমি ইতস্ততঃ করে বললাম, 'দোভাষী আমি ত ও জিনিষ খাই না।'

আচুংবা বলল, 'কেন ?'

'আমার পছন্দ হয় না।'

'পছন্দ হয় না ?' আচুংবা যেন আকাশ থেকে পড়ল। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স কোন লোক কোনদিন মদ খায় নি—এ আবার কেমন কথা। আচুংবা বলল, 'ম দেবতার গায়ে হাত দিয়ে হাত পোড়েনি, একথা যদি বলেন তবে বিশ্বাস করতে পারি, ডাক্তার সাহেব, কিন্তু আপনার বয়সের কোন লোক কোনদিন মদ খায়নি বললে বিশ্বাস করব না।'

আমি যতই এড়াতে চাই, আচুংবা যেন ততই জড়াতে চায়। আমাকে উদ্ধার করল আচুংবার স্ত্রী—। আমার গেলাসের মদ সে তার নিজের গেলাসে ঢেলে নিল এবং তারপর উঠে গিয়ে একটা কাঠের রেকাবী এনে পাশে রাখল।

রেকাবির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলাম। অন্ততঃ সের দুই বড় বড় মাংসের টুকরো নৈবেদ্যর মত সাজানো। ওর মধ্যে আবার সেদ্ধ বড় বড় কী এক রকমের পাতা এবং অসংখ্য কাঁচা লঙ্কা। এ পরিমাণ মাংসে আমার কমসে কম দু'দিন যাবে।

আমার চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন লক্ষ্য করেই বোধ হয় আচুংবা বলল, 'হরিণের মাংস, ডাক্তার সাহেব। আপনার বরাত বড় ভাল' আপনার নাম করে আজ শিকারে বেরিয়েছিলাম।'

অবিশ্রাম মদ খেয়ে চলল আচুংবা ও তার স্ত্রী। আচুংবার মুখের তামাটে চামড়া যেন বেগুনী হতে লাগল। ছোট চোখ দু'টো তার ক্রমশঃ আরো ছোট হয়ে আসতে লাগল। আচুংবা বলল, 'আজ হরিণের মাংস খান ডাক্তার সাহেব, কাল অজগরের মাংস খাওয়াব।' তারপর বলল, 'আমি ষোলটা হেডহান্টার আচুংবা। নিজের হিম্মতকে বাড়িয়ে বলি না। কাল নিশ্চয়ই আপনাকে অজগরের মাংস খাওয়াব।'

হঠাৎ আচুংবা গা থেকে চাদরখানা খুলে ফেলে দিল। তারপর 'এই দেখুন' ব'লে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে তার বুকটা দেখিয়ে দিল। আমি সবিস্ময়ে গুনে গুনে দেখলাম, আচুংবার বুকে উল্কি দিয়ে ষোলটা মানুষের মাথা আঁকা।

আচুংবার চোখের দিকে তাকালাম। মদের নেশায় আর নিজের বীরত্বের ব্যাখ্যায় আচুংবার চোখ দু'টো শ্বাপদের চোখের মত জ্বলছে। তবু তার চোখে চোখ রেখে চললাম, 'বল না দোভাষী: তোমার সেই ষোলটা মুণ্ড শিকারের কাহিনী।'

অতীত বীরত্বের কাহিনী মনে পড়ায় এবং আমার মত শ্রোতা পেয়ে আচুংবা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'সে অনেক দিন আগের কথা।' মদের গেলাসে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে আচুংবা বলল, 'তখন আমি পুরোপুরি যুবক।' একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'মাত্র বাইশ বছর বয়স। মিনি বস্তিতে গিয়েছিলাম মাটির হাঁড়ি আনতে। ঐ একটা মাত্র বস্তি যেখানে মাটির হাঁড়ি তৈরী হয়। চারপাশের বিশ-পঁচিশটা বস্তিতে ওরাই মাটির হাঁড়ি যোগান দেয়। বর্মা সীমায় সে বস্তি। এখান থেকে পুরো দু'দিনের রাস্তা। অবশ্য সোজা মিনিক বস্তি হয়ে একদিনে পৌঁছান যায়। কিন্তু মিনিক বস্তির সেমারা আমাদের জাতশত্রু। সেমা ও ইমচুংগরদের শত্রুতা চিরদিনের। আমাদের বস্তি আর মিনিকের মধ্যে কতবার যে লড়াই হয়েছে তার বোধ হয় হিসাবও নেই। ফেরার পথে কেমন যেন খেয়াল হল মিনিক বস্তি হয়ে একদিনে পৌঁছে যাই। মাথার বিরাট বোঝা। তাই ভাবলাম, একদিনের রাস্তা যদি কমাতে পারি তবে মন্দ কি। মনে মনে ভাবলাম, মিনিক বস্তিটা একটু এড়িয়ে গেলেই চলবে। কিন্তু এড়িয়ে যাওয়াই হল কাল।'

আচুংবা একবার আড় চোখে স্ত্রী ইয়াংলার দিকে চেয়ে হেসে মদের গেলাসে আর একটা চুমুক দিল। সামনের আগুনটাকে একটু উসকে দিল। তারপর বলল, 'ওই যে ইয়াংলা—আমার স্ত্রী—ওকেই এখন জিজ্ঞেস করুন, ডাক্তার সাহেব।'

ইয়াংলা নিজেদের দুর্বোধ্য ভাষায় আচুংবাকে কী বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। সে হাসিতে যোগ দিল আচুংবাও। আমি সে কথা বা হাসি কোনটারই অর্থ বুঝতে না পেরে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'দোভাষী, তারপর কি হল?'

ইয়াংলা আবার কি বলল। আচুংবা হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল। বলল: 'এ কি ডাক্তার সাহেব, মাংস ত ঠাণ্ডা হয়ে জল হয়ে গেল। আপনার জন্য ইয়াংলা নিজের হাতে মাংস রান্না করেছে। আপনি না খেলে আমি ভীষণ রাগ করব।'

আমিও যেন এতক্ষণ স্থান-কাল পাত্র ভুলে আচুংবার গল্প শুনছিলাম। আচুংবার কথায় আমারও যেন খেয়াল হল। সামনে ষোলটা মুণ্ড শিকারী আচুংবা স্বয়ং তার অতীত বীরত্ব গাথা বলে চলেছে। তার বুকে উল্কি

উঠল। এহেন আচুংবার স্ত্রী ইয়াংলা আমার জন্ত মাংস রান্না করেছে। সুতরাং সে মাংস না খেয়ে উপায় কি।

সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আচুংবা ও ইয়াংলার চোখের দিকে তাকালাম। মদের ঘোরে উভয়ের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। রেকাবী থেকে এক টুকরো মাংস তুলে তাতে কামড় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝালে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জলে উঠল। দু'কান দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরুতে লাগল। আমি থু থু করে তা ফেলে দিলাম।

হো হো করে হেসে উঠল আচুংবা। বলল, 'এ কি ডাক্তার সাহেব, আপনি বাঙালী বলে ইয়াংলা একদম ঝাল ছাড়া রেঁধেছে। খুব কম করে মাংসে ঝাল দিতে আমিই তাকে বলেছি।'

মনে মনে ভাবলাম, 'হে ভগবান, এই যদি ঝাল ছাড়া রান্না হয় তবে ঝাল কাকে বলে তা ত আমার এখনও জানতে বাকী। কিন্তু মুখে বললাম, 'না দোভাষী, রান্না চমৎকার হয়েছে। ঝাল একদম কম। আমার জিহ্বার খানিকটা জায়গায় ঘা হয়েছে। তাই বোধ হয় এমনটা হয়েছে।'

আচুংবাও বলল, 'তাই বোধ হয় হবে।'

আমি গল্পে ছেদ পড়তে দিলাম না। বললাম, 'বল দোভাষী, তারপর কি হল।'

আমার আগ্রহ দেখে আচুংবা খুশী হল। বলল, 'ডাক্তার সাহেব, মিনিক বস্তি অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি। যদি চিরশত্রু সেমাদের হাতে পড়ে যাই, সে আশঙ্কাও আছে। এড়াতে গিয়েও এড়াতে পারলাম না।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তবে কি সেমারা ধরে ফেলল?'

আচুংবা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব, ধরে ফেলল। তবে সে যে-সে ধরা নয়। একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে।' ইয়াংলার দিকে চেয়ে আবার হেসে উঠল আচুংবা। তারপর বলল, 'খামার থেকে ফিরছিল ইয়াংলা। সুন্দরী ইয়াংলা। আমাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়াল। কিন্তু সে চাহনিতেই ঘায়েল করল আমাকে। ভাবলাম, এই ত সেই মেয়ে যাকে আমি চাই। মরা বস্তির গাঁও-বুড়োর মেয়ের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে দিতে চাইছে। এরা এক পয়সাও কনে পণ নেবে না। বাবা তা'তেই খুশী। বাবা হিসেব করেছে, অন্যত্র বিয়ে হলে কম করেও একটা মিথুন, দু'টো শূকর, গোটা দশেক মুরগী, গোটা দশেক নাগা চাদর এবং গোটা দশেক নাগা দা ত কনে পণ হিসাবে না দিলেই নয়। অথচ মরার গাঁও বুড়ো চুয়াংগা আমার বাবার বন্ধু। তাই পণ না নিয়েই আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কেবল আমার আপত্তিতে বিয়ে হচ্ছে না।

'ইয়াংলাকে দেখলাম, ডাক্তার সাহেব। ইয়াংলাও আমাকে দেখল এবং এই দেখাদেখির ভিতর দিয়ে একের মনের ভাষা অন্যে টের পেলাম।

'হঠাৎ চমক ভাঙল ইয়াংলার কথায়। ইয়াংলা বলল, "বুঝতে পেরেছি তুমি ইমচুংগর। তাড়াতাড়ি পালাও। সামনে আমাদের বস্তির লোক আসছে ক্ষেতের কাজ করে। যদি তোমাকে দেখে তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।"

'আমি মরীয়া হয়ে বললাম, "কিন্তু তোমাকে না নিয়ে পালাই কী করে?"

'ইয়াংলা বলল, সর্বনাশ, বলছ কি? তা'হলে আমার বাবা বল্লমের মাথায় তোমার মাথাটি গেঁথে বস্তিতে ফিরবে।"

আমি বললাম, সে-ও ভাল। কিন্তু এমনিভাবে গেলে তুমিও আমার মনটি নিয়ে বস্তিতে ফিরবে।"

ওপাশ থেকে ইয়াংলা আবার দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা বলে হেসে উঠল। আচুংবাও সে হাসিতে যোগ দিল।

আমি বললাম, 'বল দোভাষী, আমার কিন্তু গল্পের এমন জায়গায় থামাটা একটুও সহ্য হচ্ছে না।'

আচুংবা বলে চলল, 'ইয়াংলার বস্তির অনেক লোক তখন এসে পড়েছে। ওরা সবাই আসছিল খামার থেকে। আমি পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ডাইনে জঙ্গল, বাঁয়ে গভীর খাদ। সুতরাং ধরা পড়তে

হল। আমাকে ওরা ঘিরে ফেলল। আমি মতুংরির লোক জেনে ওদের আনন্দের সীমা রইল না। আমাকে ধরে নিয়ে মরাং-এ বন্দী করে রাখল।"

'দুঃসংবাদ হাওয়ার আগে ছোটে, আমি যে সেমাদের বস্তি মিনিকে বন্দী হয়ে আছি এ খবর কেমন করে জানি না, আমাদের বস্তিতে পৌঁছাল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল মতুংরিতে। এদিকে সেমারাও বসে রইল না। আমাকে ধরে রাখার ফল কি হবে তা ভাল করেই ওরা জানত। বহুদিন পর আবার মতুংরি ও মিনিকের মানুষের রক্তে জিঘাংসার আগুন জ্বলে উঠল। সেমাদের রক্তে চিরদিনের হিংসা নিবৃত্ত করতে ছুটে আসছে ইমচুংগররা।

'সেমাদের পাল্টা আক্রমণে ইমচুংগররা বেশ বেকায়দায় পড়ল। আমি কিছুই স্থির করতে পারলাম না। রক্ত আমার টগবগ করে ফুটছে। এত বড় একটা লড়াই হচ্ছে, আর আমি তা'তে অংশ নিতে পারছি না। আমি তখন সেমাদের মরাং-এ বন্দী। হাত-পা, বুক-পিঠ সব বাঁধা—নড়বারও ক্ষমতা নেই। সেমারা ঠিক করেছিল আমাকে কেটে আমার মাথাটা উঁচু বাঁশের মাথায় টাঙিয়ে রাখবে, যা'তে আর কোনদিন কোন ইমচুংগর যুবক কোন সেমা মেয়ের পানিপ্রার্থী না হয়। যেদিন রাত্রে আমাকে কাটবে বলে স্থির করেছিল সেদিন ভোরবেলাই মতুংরির ইমচুংগররা সেমাদের আক্রমণ করল। বন্দী অবস্থায় শুয়ে শুয়ে মিনিক বস্তির ছেলে-বুড়ো ও মেয়েদের উল্লাসে বুঝতে পারছিলাম ইমচুংগররা লড়াইয়ে হারছে। তার পরিণাম কি তা'ও বুঝতে পারছিলাম। আমার মুণ্ডের সঙ্গে আরো অনেক ইমচুংগরের মুণ্ডে মুণ্ডমালা তৈরী করে সেমারা ঝোলাবে। আমার অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল। স্বজাতির এমন দুর্দিনে আমি একটা শত্রুরও মাথা নিতে পারছি না। অথচ আমিই এর কারণ।

'হঠাৎ দেখি পা টিপে টিপে ইয়াংলা মরাং-এ ঢুকল। ক্ষিপ্র ভাবে আমার বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, "পালাও, শীঘ্র পালাও। ইমচুংগররা লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হয়েছে। ওরা পালাচ্ছে, আর সেমারা ওদের পেছনে ধাওয়া করেছে।"

'ছাড়া পেয়ে আমি পাগলের মত ছুটলাম। মিনিক টিলার গা বেয়ে সেমারা ইমচুংগরদের তাড়া করতে করতে মিনিক নদীর দিকে নামছিল। পেছন থেকে আমি তাদের আক্রমণ করলাম। আমার বর্শা ও দা-এর ঘায়ে বারো জন সেমা কিছু বুঝবার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি চীৎকার করে ইমচুংগরদের বললাম, 'আমি আছি, ভয় নেই। মতুংরির মুখে কালি দিয়ে তোমরা পালিয়ো না।"

'ইমচুংগররা আমার চিৎকারে ভরসা পেয়ে নদী থেকে চড়াই বেয়ে সেমাদের আবার আক্রমণ করল। সামনে ওরা, পেছনে আমি আর মাঝখানে সেমারা। দেখতে দেখতে সেমারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আমি একাই আরো চার জনকে শেষ করলাম। বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত ইমচুংগররা মিনিক বস্তির ছেলে বুড়ো মেয়েদেরও রেহাই দিল না। তাদের রক্তে ভেসে গেল বস্তি। দীর্ঘ-দিনের শত্রুতার আগুন যে মেয়েকে কেন্দ্র করে জ্বলে উঠেছিল, সেই ইয়াংলাকে নিয়ে এলাম মতুংরিতে। কেবল তাকেই বাঁচতে দিয়েছিলাম আমরা।"

কাহিনী শেষ করে আচুংবা নিজেদের ভাষায় কি বলল। খিল খিল করে হেসে উঠল ইয়াংলা।

আমি যেন চেতনা ফিরে পেলাম। আচুংবার গল্পের শেষ দিকে সবকিছু ভুলে আমার যেন মনে হয়েছিল, সে লড়াই আমার চোখের সামনে হচ্ছে আর তার ভেতর থেকে রক্তস্নাত আচুংবা বেরিয়ে এসেছে। তার গলার যোলটা মুণ্ডের মালা। সে মুণ্ডগুলো ক্রমশঃ মিলিয়ে গিয়ে আচুংবার গলার উল্কি আঁকা হয়ে রইল।

... ...

আচুংবা দোভাষীর ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম।

আমার সামনে ও পেছনে ছিল নাগা-বাহিনী, যারা আমার বাংলোর পেছনে বসে ফিসফিস করছিল। মুছিমং হাতে হারিকেন নিয়ে আমার পাশে পাশে রয়েছে সারাটা রাস্তা। পথে কেউ একটিও কথা বলেনি। বলবেই বা কে?

আচুংবা বেরিয়ে এল। রীতিমত উদ্‌ভ্রান্ত তার চোখের দৃষ্টি। আমাকে বলল, 'সাহেব, ইয়াংলাকে আমার বাঁচিয়ে দিন। সে যদি না বাঁচে, আমিও বাঁচব না। কত চেষ্টা করল সুসেলা, কিন্তু ভূতকে কিছুতেই তাড়াতে পারল না। আস্ত মিথুন দেব বললাম, তবু ব্যাটা ভূতের নড়বার নাম নেই।'

সুসেলা বুড়ীর দিকে তাকালাম। সুসেলার দুর্দান্ত প্রভাব এলাকাতে। সুসেলা শুধু দাই নয়—সে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং রোজা। বহুদূরের বস্তি থেকেও তার ডাক আসে। সুসেলা নাকি ইচ্ছা করলে দেবদারু গাছের মাথাকে মন্ত্র পড়ে মাটিতে নামিয়ে দিতে পারে এবং যে পর্যন্ত না সুসেলা হুকুম দেবে, সে পর্যন্ত দেবদারু গাছ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে থাকবে।

ঘরের একদিকে আচুংবা দোভাষীর স্ত্রী ইয়াংলা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে বিকাল চারটায়। কিন্তু এখনও নাড়ী কাটা হয়নি। ওদের ধারণা, ফুল না বেরুলে নাড়ী কাটতে নেই। কাটলে প্রসূতি এবং গেরস্থ—উভয়ের অমঙ্গল। অবিশ্রাম রক্তস্রাবে ইয়াংলার পাহাড়ী মজবুত শরীরটাও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

সীতার জন্য লঙ্কা ছারখার হয়েছিল, হেলেনের জন্য ট্রয় আর ইয়াংলার জন্য মিনিক বস্তি। এ হেন ইয়াংলাকে যদি না বাঁচাতে পারি, তবে রক্ষা নেই।

প্রথমেই আমি কাঁচি বের করে নাড়ীটা কেটে বেঁধে দিলাম। হা হা করে উঠল সুসেলা বুড়ী। তাকে বাধা দিল আচুংবা। আচুংবার ভাবখানা হল, দেখাই যাক না ডাক্তার শেষ পর্যন্ত কী করেন।

ঘরে একটি মাত্র কাঠের মাচান ছিল। তার ওপর ইয়াংলাকে ধরাধরি করে তুললাম। নাড়ী পরীক্ষা করলাম। নাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করলাম।

একটা লিষ্ট লিখে কমপাউণ্ডার জর্জকে পাঠালাম হাসপাতাল থেকে ঔষধ আনতে। তার সঙ্গে গেল এক নাগা বাহিনী।

আমি এদিকে শুরু করলাম ইয়াংলার চিকিৎসা। বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয় কয়েকটা ইনজেকশন দিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এল জর্জ। যে প্রচণ্ড রক্তস্রাব হয়েছে তা'তে রোগীকে রক্ত দেওয়া উচিত। কিন্তু এখানে কোথায় সে ব্যবস্থা। নাড়ীর ভেতরে স্যালাইন চালিয়ে দিলাম।

ঘণ্টাখানেক পর নাড়ীর অবস্থা একটু ভাল মনে হল। আমি একটু খুশী হলাম।

বাইরে থেকে জরায়ুর চাপ দিয়ে (Credes method) ফুলটাকে বের করবার সব রকম চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। দুশ্চিন্তা আবার আমাকে চেপে ধরতে লাগল। একটি মাত্র রাস্তা খোলা—জরায়ুর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফুলটাকে বের করা (Manual removal of placenta)।

কম্পাউণ্ডার জর্জের দিকে তাকালাম। বললাম 'এনাস্থেসিয়া দিতে পারবে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'টোকে চেটে জর্জ বলল, 'না।'

ঘরের ভেতরে অনেক লোক। আচুংবা ত আছেই, আরো আছে দোভাষী হেয়াসুং ও মুছিমং। আরো আছে গাঁওবুড়োর দল। এরা সবাই কৌতূহলী—এরা সবাই দেখতে চায়, কেমন করে নতুন ডাক্তার আচুংবা দোভাষীর বউ-এর ফুল বের করে।

তাকালাম সুসেলার দিকে। ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত সুসেলা ফুঁসছে। তার চিকিৎসা, তার মানমর্যাদা,

প্রভাব প্রতিপত্তি—সব কিছুর প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে নতুন ডাক্তার। মুসেলাও দেখে নেবে। এক মাঘে শীত যায় না।

আমি ঈথার ঢেলে ইয়াংলাকে অজ্ঞান করলাম। কম্পাউণ্ডার জর্জকে বললাম, 'তুমি এই ফানেলটা ধরে থাক এবং আমি যখন বলব তখন ফানেলের ওপর ঈথার ঢালবে। পারবে তো?'

ইতস্ততঃ করে জর্জ বলল, 'পারব।'

প্রায় কুড়ি মিনিট পরিশ্রম করে জরায়ুর ভেতর থেকে হাত দিয়ে বের করে নিয়ে এলাম ফুলটা। আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠল আচুংবা।

এরপর প্রয়োজনীয় গোটা কয় ইনজেকশন দিলাম।

ইয়াংলার বুক, নাড়ী ইত্যাদি আবার পরীক্ষা করলাম। অবস্থা একটু ভালর দিকে মনে হল।

বাইরে এলাম। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট। চারদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। গাছে গাছে পাখিদের কাকলী। শরামতী পাহাড়ের বরফ ঢাকা মাথাটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে।

আচুংবা নীচু গলায় ফিসফিস করে গাঁওবুড়োদের সঙ্গে কী আলাপ করছিল। আলোচনাটি কী জানতে উৎসুক হলাম। মুছিমংকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, 'আচুংবা ও গাঁওবুড়োর দল আমার ওপর খুব খুশী হয়েছে। ওরা বলছে, ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই মুসেলার চেয়ে বড় গুণিন, নইলে এমনটা সম্ভব নয়।'

... ...

প্রায় এক মাস পরের কথা। হাসপাতালে যাবার জন্ম তৈরী হয়ে মাত্র বাইরে পা দিয়েছি, এসে উপস্থিত হল আচুংবা, মুখটা তার খুশী খুশী। তার পেছনে প্রকাণ্ড ঝুড়ি মাথায় আর একটি লোক। লোকটি ঝুড়িটাকে মাটিতে রাখল। এর ভেতর থেকে আচুংবা বের করল বিরাট মহিষের আস্ত একখানা ঠ্যাং, দু'খানা শূকরের ঠ্যাং, চারটি মুরগী, সের দুই চাল এবং দু'বোতল মধু (ভেতো মদ)। তারপর বলল, 'ডাক্তার সাহেব, গরীব বলে অবহেলা করলে চলবে না। এটুকু আপনাকে নিতেই হবে।'

আচুংবা চলে গেল।

ঘরে এসে মুছিমংকে বললাম, 'আজ তোর ছুটি। তুই আজ বস্তিতে যা এবং যাওয়ার সময় ঐ ঝুড়িটা নিতে ভুলিসনি যেন।'

ছেলেদের পাততাড়ি

মেক্সিকোর রূপকথা

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগের কথা—মেক্সিকো দেশের একটি বড় গ্রামে এক ধনী-চাষী বাস করত। তার বহু জমি ও চাষবাস ছিল। যদিও তার অবস্থা খুবই সচ্ছল ও নিজের বেশি কাজ করতে হতো না তবুও সে গম কাটার সময় ক্ষেতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রোদে দাঁড়িয়ে লোক-জনের তদারক করত।

নূতন গমের আটা দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু খাবার রান্না হয় মেক্সিকো দেশে। এই জন্য চাষী নিজে গম পিষার সময় যথাস্থানে দাঁড়িয়ে দেখত কতটা আটা জমা হচ্ছে। একদিন তার মনে হলো যে আটার পরিমাণ খুবই কম। নিশ্চয় ক্ষেতে চোর ঢুকেছে। এরপর থেকে ক্রমশঃ গমের পরিমাণও কমতে শুরু করল। চাষী মহাভাবনায় দিন কাটাতে লাগল। শেষে একদিন বাড়ী গিয়ে ছেলেদের ডেকে এই বিষয় পরামর্শ করতে বসল।

চাষীর তিন ছেলে। বড়টি অতি কুঁড়ে, মেজোটির অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না, আর ছোটটি অতি ধীর শান্ত। চাষী তিনজনকে ডেকে বল্লো—দেখ, ক্ষেতে চোর ঢুকেছে; রোজ রাত্রে গম ও আটা চুরি হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে যে চোর ধরতে পারবে তাকে আমার সব সম্পত্তি দান করব।" বাপের কথা শুনে বড় ছেলে পরদিন চোর ধরতে যাবে ঠিক করল।

আয়েসী মানুষ, সন্ধ্যের আগে তার ঘুম ভাঙ্গে না কোন দিন। সেদিনও সেই সময় উঠে, কাঁধে বন্দুক তুলে, মাথায় টুপি পরে, মাংস পরটাগুলি একটি পাত্রে ভরে নিয়ে সে বাড়ী থেকে আস্তে আস্তে রওনা হলো। ঘুমে চোখ তার ভরা, হোঁচট খেতে খেতে সে ক্ষেতের দিকে এগোতে লাগল। প্রচণ্ড হাই তুলতে তুলতে যাচ্ছে এমন সময় সামনেই একটা কুয়ো দেখে সে ঠিক করল যে এইখানেই সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। টুপিটা ভাল করে মুখের উপর চাপা দিয়ে সে কুয়োর পাড়ে হেলান দিয়ে বসা মাত্রই সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ রাত্রি তার নাসিকা-ধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে উঠল।

হঠাৎ একটা কর্কশ ভাঙা গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে চোখ খুলতেই সে দেখল যে, একটা কুৎসিত কোলা ব্যাঙ, পাশে বসে কথা বলে চলেছে।

ব্যাঙটা বলছে—শুনছ হে, আমাকে ক্ষেতে নিয়ে চলো—আমি তোমায় চোর ধরে দেবো।"

চাষীর ছেলে হেসে বল্লো, আরে, তুমি আমাকে কি সাহায্য করবে? যাও, যাও কুয়োর ভিতর ফিরে যাও। এই বলে সে ব্যাঙটাকে তুলে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলো। আর কিছুদূর সে ক্ষেতের দিকে হেঁটে চল্লো

ও সেখানে পৌঁছবা মাত্র গুছিয়ে বসে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুতেই আর সে জেগে থাকতে পারল না।

রোদের আলোয় যখন তার আবার ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে দেখল যে সমস্ত গমগুলি কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। তারপর আর কি করে? বাড়ী ফিরে তার বাপ ও ভাইদের বলতে হলো যে সে চোর ধরতে পারেনি।

এবার মেজো ছেলের চোর ধরবার পালা। পরদিন রাত্রে সে কাঁধে বন্দুক ফেলে হাতে তরকারি পরটাগুলি বেঁধে নিয়ে চোর ধরতে বেরল। সঙ্গে তার জল খাবার একটি ভাঁড়। কুয়োর কাছে পৌঁছেই সে ভাঁড় ভরে জল খাবার ব্যাবস্থা করল। কুয়োর থেকে জল তুলতে যাবে এমন সময় ব্যাঙটাকে দেখতে পেলো।

সেটা বল্লো—"আমাকে ক্ষেতে নিয়ে চল। আমি তোমার চোর ধরে দেব। এরপর সে ভাঙ্গা গলায় গান গাইতে শুরু করল। এই বিকট আওয়াজে মেজ ছেলের হাত থেকে ভাঁড়টা কুয়োর ভিতর পড়ে গিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল। হতভাগা, বেআক্কেলে আপদ কোথাকার। গান করবার আর সময় পেলে না, এক্ষণি চেঁচামেচি থামাও বলছি," বলে সে চিৎকার করে উঠল ও নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে চল্লো।

ক্ষেতের কোণে লুকিয়ে বসে সে বন্দুক উঁচিয়ে চোর ধরবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে রইল। হঠাৎ একটা মর্ম্মর ধ্বনি শুনে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল যে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী পাখী উড়ে এসে ক্ষেতের দিকে নামছে। তার রংবেরংএর পালকগুলি আকাশের গায়ে যেন ঝলক দিচ্ছে। চাষীর ছেলে ভাবল—"এই নিশ্চয় চোর।" তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে সে পাখীটার গায়ে গুলি চালিয়ে দিল, কিন্তু গোটাকতক পালক মাত্র ঝরে পড়ল। পাখীটা তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ডানা মেলে উড়ে গেল। চাষীর ছেলে বহুক্ষণ ক্ষেতে বসে রইল তার অপেক্ষায়, কিন্তু পাখীটা আর ফিরে এলো না। তখন হতাশ হয়ে সেও বাড়ী ফিরে গিয়ে বাপকে বল্লো যে সেও চোর ধরতে পারেনি।

ছোট ছেলের কথা সকলে ভুলেই গিয়েছিল। যখন মেজোভাই বিফল হয়ে বাড়ী ফিরে এলো তখন ছোট ভাই ঠিক করল যে পরদিন সে চোর ধরতে যাবে।

বড়ভাই তার এই কথা শুনে হাসতে লাগল; কিন্তু মেজটি রেগে বল্লো, তোমার তো কম আস্পর্দ্ধা নয়। আমি চোর ধরতে পারলাম না আর তুমি পারবে?"

চাষী এদের কথাবার্ত্তা শুনে হেসে বল্লো—"ঠিক আছে—সবাই চেষ্টা করছে চোর ধরতে; তুমিও আজ রাত্রে চেষ্টা করো।"

তৃতীয় রাত্রে ছোট ছেলে বন্দুক হাতে বাড়ী থেকে বেরোল। তার হাতে একটি পাত্রে কতগুলি শুকনো রুটি। এইগুলি খাবে বলে সে কুয়োর ধারে এসে বসেছে এমন সময় একটা ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলো। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে একটা মোটা কোলা ব্যাঙ সেখানে বসে আছে। নিচু হয়ে ব্যাঙটাকে হাতে তুলে নিয়ে সে বল্লো, "এই যে বন্ধু, তুমি রুটি খাবে? এই নাও, এগুলি বেশ মুচ্‌মুচে।"

ব্যাঙটি ওর রুটিতে ভাগ্য বসাল। খাওয়া হয়ে যাবার পর সে বল্লো, "আমাকে ক্ষেতে নিয়ে চলো, আমি তোমাকে চোর ধরতে সাহায্য করব।"

"তাই নাকি? তা হ'লে তোমাকে নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে যাব" বলে চাষীর ছেলে ব্যাঙটাকে হাতে তুলে নিল। ব্যাঙ তখন বল্লো, "তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—ওই কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে পাথরগুলি জলের ভিতর ফেলতে থাক, তারপর মনে মনে যা চাও তা বল্‌তে থাকবে। এইগুলি তুমি নিশ্চয় পাবে।"

চাষীর ছেলে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল এইসব শুনে। ব্যাঙ যা বলেছে সে তাই করল। কুয়োর পাড়ে গিয়ে সে জলের ভিতর পাথরগুলি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল আর বল্লো—"আমি যেন চোরটাকে আজ ধরতে পারি—আর আমার যেন খুব সুন্দর বউ আসে ঘরে আর যেন আমি বাপের বাড়ীর থেকেও ভাল বাড়ীতে থাকতে পাই।—"

কিছুক্ষণ পর ব্যাঙটাকে তুলে নিয়ে সে ক্ষেতের

দিকে রওনা হলো। ক্ষেতে পৌঁছে গমের গাছগুলির মধ্যে লুকিয়ে যেই বসেছে, অমনি উপর থেকে পাখী ওড়ার আওয়াজ তারা পেলো। উপরে তাকিয়ে দেখল যে একটি অপূর্ব্ব সুন্দর পাখী গমের শীষগুলি খাচ্ছে। পাখীটাকে তাক করে যেই না চাষীর ছেলে বন্দুক তুলে গুলি করতে গেছে অমনি ব্যাঙটা কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠল, "মেরো না বন্ধু, ওকে মেরো না। ও তোমার অতি প্রিয়জন।"

চাষীর ছেলে আশ্চর্য্য হয়ে যেই না বন্দুক নামিয়েছে অমনি পাখীটা উড়ে এসে তাদের কাছে বসল। এরপর অতি মধুর গান গেয়ে সে তাদের বুঝিয়ে দিল যে সে আসলে পাখী নয়। তাকে এক যাদুকর পাখীর রূপে পরিবর্ত্তিত করেছে—আসলে সে এক রাজকন্যা। রোজ রাত্রে সেই গমের ক্ষেতে এসে গম খেয়েছে কারণ তার অন্য খাবার আর কিছু জোটে নি।

ব্যাঙটা আর থাকতে না পেরে সেই কর্কশ স্বরে গান ধরল। বুক ফুলিয়ে বিকট আওয়াজ করে সে যেই না গান গাইতে শুরু করল সেই মুহূর্ত্তে পাখীটার গায়ের পালকগুলি ঝরতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে সে একটি পরমা সুন্দরীর রূপ ধারণ করল।

ব্যাঙ তখন চাষীর ছেলেকে বল্লো—"তুমি তো সুন্দরী বউ চেয়েছিল—এই সুন্দরী তোমার বউ হবে।"

হতভম্ব হয়ে চাষীর ছেলে তখন সেই মেয়েটির হাত ধরে বাড়ীর পথে রওনা হলো। কিন্তু পথে আরো একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার হলো—বাড়ীর কাছে পৌঁছে সে দেখল যে তারে বাপের বাড়ীর নিকটে আর একটি চমৎকার বাড়ী কে যেন রাতারাতি তৈরি করে দিয়ে গেছে। ব্যাঙটা সেইটি দেখিয়ে বল্লো, "এই বাড়ীটি তোমার। এইখানে তোমরা বাস করবে।"

চাষীর ছেলে দৌড় বাপের বাড়ীতে গিয়ে তাদের সকলকে নিয়ে এলো তার বউ দেখাতে ও সেই সময় তার বাপকে সব ঘটনাগুলি শোনাল।

বড় ভাই সব দেখে শুনে আপসোস করে বল্লো, "হায় রে হায়! কি কুক্ষণে ব্যাঙটাকে তখন কুয়োয় ফেলেছিলাম।"

মেজছেলে চিৎকার করে বল্লো, "হায় রে হায়, কি কুক্ষণে হতভাগা ব্যাঙটার গান তখন শুনি নি।"

কিন্তু চাষী ছোট ছেলের সৌভাগ্য দেখে অতি আনন্দিত হলো, ও তাকেই কথামত নিজের সম্পত্তি সর্ব দান করে দিল। তারপর সেই ছেলে, বউ ও ব্যাঙটা খুব সুখে নূতন বাড়ীতে বাস করতে লাগল।—

পাট বাঙালীর জীবনের অভিশাপ

"যুগবাণী" সাপ্তাহিক বলিতেছেন :

পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের কলোনী একথা আমরা বলি না, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় শোষণের মাত্রা যে দিনে দিনে গভীরতর হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকছেন একথা অস্বীকার করা চলে না। এই শোষণের অন্যতম শিকার পাটচাষীরা। পাট বাংলায় জন্মে, পাটকলগুলিও বাংলায়, পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর বড় বন্দর কলকাতা। সবাই জানে পাটজাত দ্রব্য থেকে ভারত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। বাংলার পাট ভারতের কোষাগার সমৃদ্ধ করে, কিন্তু পাট থেকে বাঙালীর ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। পাটকলগুলির মালিকরা অবাঙালী, পাটকলের শ্রমিক ও কর্মচারীরা অবাঙালী ; পাটদ্রব্য রপ্তানীজাত আয়ের কোন ভাগই বাঙালী পায় না। পাটের কারবারে একমাত্র যে বাঙালীরা জড়িত আছে তারা হল পাটচাষী। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত, শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। তার কারণ পাট চাষের আয় লাভজনক নয়, লোকসানজনক। ধানের জমিতে ধান চাষের বদলে পাট চাষ করা হয়। সরকারের নির্দেশ ধানজমিকে পাটের জমিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ দেশ ভাগের আগে পাট চাষ হত পূর্ব বাংলায়। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষ না হলে পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে যেত ও বিশ্বের বাজারে ভারতের এই পুরনো রপ্তানীদ্রব্য আর পাঠানো যেত না। তাতে ক্ষতি হত অবাঙালী পাটকল মালিক ও শ্রমিকদের এবং ভারত সরকারের তথা সারা দেশের। বাঙালীর কোন ক্ষতি হত না। বরং পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত ধানের জমিতে ধান ফলাতে পারলে এ রাজ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিত না। ভারত সরকারের নির্দেশেই দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলায় পাট চাষ ব্যাপকভাবে সুরু করা হয়। খুবই দুঃখের বিষয় বাঙালী চাষীর তাতে ক্ষতিই হয়ে আসছে। অন্নাভাবে পাটচাষীরা জীর্ণ শীর্ণ হচ্ছে। সাধারণভাবে বাঙালীও খাদ্যাভাবগ্রস্ত হচ্ছে—কারণ পাট জন্মাতে গিয়ে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি পড়ছে।

পাটচাষীরা তাদের জমিতে ধান জন্মালে আজকাল বছরে দুটি তিনটি ফসল ফলাতে পারত। পাটচাষের জন্য জলা জমি চাই। সেই জমিতে বছরে দুই কিস্তি ধান অনায়াসে ফলানো যায়। তার ফলে চাষীদের সম্বৎসরের অন্ন বাঁধা থাকত এবং আজকাল খোলা বাজারে চালের মণ আশি টাকা হওয়ায় তাদের ভালো আয়ও হত। সরকার যত চেষ্টাই করুন চালের বাজার দাম খুব বেশী কমবে না। সরকার নিজে রেশন দোকান মারফত অতি অখাদ্য পচা চাল ১·৪২ পয়সা কে জি দরে বিক্রী করছেন। লোকে ঐ চাল পারলে ছেড়েই দেয়। বাজারে তার চেয়ে ভালো সিদ্ধ চাল ১·৭৫ পয়সায় পেলে লোকে খুশি মনে নেয়। ২ টাকা বা তদূর্ধ্ব দাম হলেও খোলা বাজারে চালের ক্রেতার অভাব হবে না। কাজেই ধান চাষ আজকাল সত্যই লাভজনক। ধান চাষে ঘরের অন্ন সংস্থানের গ্যারান্টি থাকে ও ভালো দরে ধান চাল বিক্রয়ের বাজারের অভাব নেই। সে ক্ষেত্রে পাট চাষী পাচ্ছে কী ?···

পাট ছয় মাস না বিক্রয় করে গুদামজাত রাখার সামর্থ্য তার নেই—কারণ ছয় মাস পরিবারশুদ্ধ লোক না খেয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া আছে মহাজনের চাপ।

করতে বাধ্য পাটচাষী মহাজনের কাছে আরও ঋণগ্রস্ত হয়, সংসারে আরও অভাবতাড়িত হয়, দারিদ্র্য তার বুকে আরও চেপে বসে। এই পাটচাষীটি কিন্তু বাঙালী। সে মরে। কিন্তু তার পরিশ্রমের ফসলে মুনাফার পাহাড় জমায় বাজোরিয়াদের মতো হাফ-জুয়াচোর পাটকল মালিকরা ও তাদের এজেন্টরা। পাটকলের শ্রমিকরা সবাই অবাঙালী। তারা মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা বাংলার বাইরে মণিঅর্ডার করে পাঠায়। সেই টাকায় বিহারে, উত্তর প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে তাদের পরিবার প্রতিপালিত হয়, সেখানে তারা জমি, গরু ইত্যাদি কেনে, তাদের ঘরে লক্ষ্মীর আসন পড়ে। ভারত সরকার পাট রপ্তানী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে খুশি হন। সবারই শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে—মরছে শুধু একজন, সে বাঙালী পাট চাষী।

পাট বাঙালীর জীবনে আজ অভিশাপ হয়ে আছে। শোষণমুক্ত বাংলা গড়তে হলে পাটের দিকে গোড়াতেই আমাদের নজর দিতে হবে।

চন্দ্রে অভিযানের সার্থকতা

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কীটিং "আমেরিকান রিপোর্টারের" ১৭ইমে সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

চাঁদে সার্থক অভিযান চালিয়ে অ্যাপোলো ১০ ফিরে এসেছে আর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠেছে : "মহাকাশ অভিযানের জন্য এই বিপুল অর্থব্যয় সার্থক কি?"

এটা অবশ্যই যুক্তিসম্মত প্রশ্ন। আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের সদস্য ছিলাম তখন এই প্রশ্নটি নিয়ে প্রতিনিয়ত বিচার বিবেচনা করেছি এবং প্রতি বছর আমাদের মহাকাশ কর্মসূচীর ব্যয়বরাদ্দের বিষয়ে ভোটও দিতে হয়েছে।

আমি স্থির করি যে ওই কর্মসূচী সমর্থন করব, এবং নীতির বিচারেই তা করেছি। তখন পৃথিবীতে এমন অনেক সমস্যা ছিল যা আমাদের সমাধান করতে হবে, এবং এখনও তা আছে।

কিন্তু যখনই বিষয়টি বিবেচনা করেছি তখন প্রতিবারই এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে মানুষকে চাঁদে অবতরণ করানোর এই কর্মসূচী আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত।

এখানে চাঁদে উপনীত হবার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নকে হারাবার প্রশ্ন ছিল না, আমার যুক্তিতে বিষয়টি ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইজ্জত সৃষ্টির চাইতে অনেক বড় কিছু। প্রশ্নটি নেহাতই আমাদের সীমিত সম্পদকে ও পার্থিব প্রকল্পগুলিকে উপেক্ষা করে সরিয়ে নিয়ে মহাকাশ কর্মসূচীতে বরাদ্দ করার ছিল না।

মানুষকে শেষ পর্যন্ত চাঁদে পৌঁছে দেবার এই কর্মসূচীতে এক দশকে সাকুল্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫০০ কোটি ডলার (১৮,২০০ কোটি টাকা)। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক সামগ্রিক জাতীয় আয় ১০০০০০ কোটি ডলার (৭২৮,০০০ কোটি টাকা)। ওই বিচারে ওই অর্থকে সামান্যই বলা চলে।

আজ আমি মনে করছি এই অর্থব্যয় শুধু যুক্তিযুক্তই হয় নি, এতে যে পার্থিব কল্যাণ হয়েছে বা হবে তা মোট ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি—কিন্তু সেদিন আমার যুক্তি এই লাভ-খরচের হিসাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ওই যুক্তি ছিল আরও গভীরে নিহিত।

উদাহরণ স্বরূপ, এই মহাকাশ কর্মসূচীর ফলে ভারতে প্রত্যক্ষভাবে অনেক উপকার হবে। তিনটি ক্ষেত্রে বেশ বড় রকমের উপকার হবে বলে আমার মনে আসছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

মার্কিন মহাকাশ কর্মসূচী আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া উপগ্রহগুলি থেকে ভারত রোজই আলোকচিত্র পাচ্ছে, এবং ঐগুলি ভারতের আবহাওয়াবিদ্‌দের দৈনন্দিন পূর্বাভাস দান ও আসন্ন ঝড় বিষয়ে সতর্কবাণী প্রচারে সবিশেষ সহায়ক হচ্ছে।

পৃথিবীর সম্পদ

স্বল্পকালের মধ্যেই আর্থ রিসোর্সেজ্ অবজারভেশন সিস্টেম (পৃথিবীর সম্পদ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা) নামে একটি কর্মসূচী চালু হবে। ভারত এবং অপর ২০টি রাষ্ট্রের

সহযোগিতাক্রমে কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের জন্য কি নৈসর্গিক সম্পদ ঐ সকল দেশে আছে সুনির্দিষ্ট ভাবে সেগুলির অবস্থান নির্ণয় করা হবে।

শিক্ষামূলক টেলিভিশন

কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষামূলক টেলিভিশনের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে ভারতে। একটি মার্কিন যোগাযোগ রক্ষাকারী উপগ্রহের মাধ্যমে ভারত দেশের উত্তরাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ৫,০০০ গ্রামে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করবে। ভারত সরকার উপগ্রহটি নিয়ন্ত্রণ করবেন, টেলিভিশন সেট প্রভৃতি সরঞ্জাম নির্মাণ করবেন, এবং সম্প্রচারের জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলি তৈরি করবেন।

সুনির্দিষ্ট এই প্রকল্পগুলি ছাড়া যারা বিশ্বের পক্ষে কল্যাণকর হবে এরূপ বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে—মনে হচ্ছে যেন এই হিতকর বিষয়ের কোন ইয়ত্তা নেই।

মহাকাশ কর্মকাণ্ডের সূত্রে ভেষজ, শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবস্থাপন প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং উন্নতিও হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে একদল মহাকাশ বিজ্ঞানী শহর উন্নয়নের সমস্যা নিরসনের জন্য "সিস্টেম্‌স ইঞ্জিনিয়ারিং" নামক পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন। এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম কাজে লাগান হয় চন্দ্র সম্পর্কিত কর্মসূচীতে।

মহাকাশ কর্মসূচীর শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি হল মহাকাশে দূর থেকে দূরান্তরে যাত্রার পথে যে জ্ঞানলাভ হবে এবং তা থেকে বাস্তব যে কল্যাণ বর্তাবে সকল জাতিকে সে সবের অংশভাগী করা। এই নীতি থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি।

তবে, জ্ঞান অর্জন ও বাস্তব কল্যাণ ছাড়াও আমার মহাকাশ কর্মসূচী সমর্থনের পিছনে একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল। একে বলা যায় বিশ্বাস—অসম্ভবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাকে জয় করার যে প্রয়োজন আছে মানুষের সেই প্রয়োজন সম্পর্কে বিশ্বাস। ঐ মনোভাবকে আমল না দিলে মানুষের মধ্যে একটা কিছুর মৃত্যু ঘটবে। আর এ হল এমন একটা গুণ যার পরিমাপ ডলারে বা টাকায় করা যায় না।

মনে পড়ে, চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পদার্পণকারী মানবসন্তান নীল আর্মস্ট্রং তাঁর ঐতিহাসিক অভিযানের কয়েকমাস পরে বোম্বাই এসেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ বিক্রম সরাভাই এবং টাটা মৌল গবেষণা কেন্দ্রে তাঁর অধীনস্থ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন।

আশ্চর্যের বিষয়, ডাঃ সরাভাই আর্মস্ট্রং-এর অভিযানের প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিষয়ের চাইতে ব্যবস্থাপনা-গত বিষয়ে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাপারে তাঁর কখনও সন্দেহ হয়েছিল কি না।

নীল বলেছিলেন যে তাঁর কখনও সন্দেহ হয়নি। ডাঃ সরাভাইকে তিনি বলেন, "একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল আমাদের এবং অ্যাপোলো কর্মসূচীর সকল কর্মীই জানতেন সে লক্ষ্য যথার্থই কি। লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় সম্পর্কে মাঝে মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে আমাদের, তবে লক্ষ্য থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি আমরা।"

আমি মনে করি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চন্দ্র অভিযানগুলি এক বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ওগুলির সার্থকতা থেকে অপ্রত্যক্ষ অপর এক কল্যাণ হয়েছে আমাদের; সপ্রমাণ হয়েছে: সকলে একসঙ্গে কাজ করলে কোন লক্ষ্য সিদ্ধিই সাধ্যাতীত নয়।

আজ যখন আমি ৫০ ও ৬০ দশকে আমার সেনেটে ভোটদানের কথা মনে করি, তখন অতীত বিচার করে উপলব্ধি হয় যে ঠিকই করেছিলাম আমি এবং যথার্থ যুক্তিসঙ্গত কাজই করেছি।

কাছাড়ে রেলওয়ের অবস্থা

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "যুগশক্তি" পত্রিকাতে কাছাড় পাহাড়ী অঞ্চলের রেলওয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হইতেছে:—

হিল সেকশনে বা কাছাড় জেলায় যাহাদের ট্রেনে

যাতায়াত করিতে হয়, তাঁহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন যে গোটা দেশের রেলওয়ে ব্যবহার সহিত সামঞ্জস্যহীন এক ছন্নছাড়া রাজত্বে তাঁহারা বাস করিতেছেন। অন্যান্য অঞ্চল হইতে যে সমস্ত যাত্রীবাহী কামরা বাতিল করা হইয়াছে, তাহাই এখানে ব্যবহার করা হয়। জল কিংবা আলোর ব্যবস্থা কামরাগুলিতে প্রায়শই থাকে না, এমন কি অভিযোগ করা হইলে রেলের কারিগররা পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থাগুলি চালু করিতে পারে না কারণ সুইচ, বাল্ব বা টেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নষ্ট থাকে। ডিল সেকশনে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা অতীব নিকৃষ্ট, যদিও উহার দাম একেবারে আকাশস্পর্শী। সবকিছু দেখিলে মনে হয়, রেল কর্ত্তৃপক্ষ এই লাইনের যাত্রীসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, নিজেদের হাতে অণুমাত্র দায় দায়িত্বের ঝামেলা রাখেন নাই।

করিমগঞ্জের যাত্রীদের অবস্থা শোচনীয়। জেলার বাইরে যাওয়ার কার্য্যতঃ একটি মাত্র ট্রেন তাহাদের জন্য আছে, কারণ শিলচর হইতে সকালে যে ট্রেনখানা তাহা ধরিতে হইলে বদরপুরে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করিতে হয়। ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ট্রেনখানা ধর্মনগর হইতেই যাত্রী বোঝাই হইয়া আসে, করিমগঞ্জে আসিলে পর আর তিলধারণের জায়গা থাকে না। আগে একখানা কামরা সরাসরি করিমগঞ্জ হইতে বঙ্গাইগাঁও অবধি যাইত, এখন কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাও তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সীটিং কিংবা স্লিপিং রিজার্ভেশনের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই, করিমগঞ্জ হইতে যাঁহারা কলিকাতা যাইবেন, তাঁহাদের জন্য একটি মাত্র আসন বরাদ্দ আছে। সবচাইতে বড় কথা, করিমগঞ্জ, বদরপুর বা শিলচর হইতে রিজার্ভেশন বা দূরপাল্লার সময় তালিকা সম্পর্কে কোনও সংবাদ সংগ্রহ করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কাছাড়ের এম. পি. বা কেউ কেউ রেলওয়ের বিভিন্ন কমিটিতে আছেন, অন্যান্য প্রতিনিধিও দুই-একজন আছেন, তাঁহারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়া যদি কাছাড়ের রেলযাত্রীদের এই সমস্ত দুর্ভোগের কিছুটা অন্ততঃ অবসান ঘটাইতে পারেন, তবে জনসাধারণ কৃতজ্ঞ বোধ করিবে।

বৃটেনের বাসস্থান ব্যবস্থা

বৃটেনে এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ গৃহ আছে। ঐ দেশের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। অর্থাৎ বৃটেনে প্রতি তিনজন মানুষের বাসের জন্য একটা করিয়া গৃহ আছে। উপরোক্ত এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ গৃহের মধ্যে অর্দ্ধেক-গুলিতেই গৃহের মালিক বাস করেন। শতকরা ৩০টি গৃহ স্থানীয় কোন জনসাধারণের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও তাহাদের নিকট হইতে ভাড়ায় লওয়া হইয়াছে। বৃটেনে এই জাতীয় গৃহ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১৬০০। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নির্ম্মিত গৃহও অনেক আছে। ১৯৭০ খৃঃঅব্দে ৩৬২০০০ নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং এইগুলির মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল গৃহ নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ। যাঁহারা নির্ম্মিত গৃহ ক্রয় করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গৃহের মূল্য দিবার জন্য ত্রিশ বৎসরাধিক কাল সময় গ্রহণ করেন।

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে পেনশন ভোগী। গৃহ-মূল্য বৃটেনে ভারতের সহরের তুলনায় খুব অধিক বলিয়া মনে হয় না। প্রায় এক হাজার বর্গ ফুট মাপের সুগঠিত, জল, নালা বিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গৃহের জন্য খরচ হয় ৩৩৮৪ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৬০৯১২ টাকা। এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভাড়া দেন মাসিক প্রায় ১৮০ টাকাতে (ইংলণ্ডে)। এই ভাড়া স্কটল্যাণ্ডে হয় মাত্র ১০০ টাকা মাসিক। বাড়ীগুলিতে মাঝারি আকারের পরিবার, ৫।৬ জন মানুষ, আরামে বাস করিতে পারেন। যে সকল অর্থসাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান কিস্তিতে বাড়ী কেনার সাহায্য করেন তাঁহারা সচরাচর পূর্ণ মূল্যের শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ টাকা ঋণ হিসাবে দিয়া থাকেন। এই ঋণ ৩০।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাখা চলে এবং শোধের ব্যবস্থা এইরূপ করা হয় যাহাতে কোন ঋণগ্রাহককেই নিজ মাসিক আয়ের এক-চতুর্থাংশের অধিক শোধের কিস্তি হিসাবে কখনও দিতে হয় না। অর্থাৎ ৬০০০০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহ ক্রয় করিলে ক্রেতাকে ৬০০০।১২০০০ টাকা মাত্র দিয়া গৃহ লইতে হয়। তৎপরে ঋণের টাকা শোধ করিবার জন্য সুদ ও আসলের জন্য মোট মাসিক ৫০০ শত টাকা অবধি দিতে হইতে পারে। বৃটেনের রোজগারের পরিমাণ প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই মাসিক ২০০০ হাজার টাকার অধিক। সুতরাং ঐরূপ কিস্তি দিতে তদ্দেশের মানুষ সহজেই পারে বলিয়া মনে হয়।

সাময়িকী

আমেরিকার নূতন ভোটদাতা

জুলাই ১৯৭১ খৃঃ অব্দ হইতে আমেরিকার ভোটদাতাদিগের বয়স আইনতঃ কমাইয়া ১৮ বৎসর করা হইয়াছে। ইহার ফলে আগামী নভেম্বর মাসে যে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন হইবে তাহাতে এক কোটি এক লক্ষের অধিক নূতন ভোটদাতা ভোট দিতে সক্ষম হইবেন। এই সকল নূতন ভোটদাতাদিগের মধ্যে অনেকেই এখন কলেজে পাঠ করিতেছেন। যদিও বয়স বিচারে মনে করা হইতে পারে যে ইহারা অপরিণত-বুদ্ধি; কিন্তু জ্ঞান ও শিক্ষার হিসাবে এই সকল নব্য ভোটদাতাগণ পরিণত বয়স্ক আমেরিকানদিগের তুলনায় বিন্দুমাত্র ওজন করিয়া ও বুঝিয়া ভোট দিতে অপারগ নহেন।

রেলগাড়ীতে যাত্রীদিগের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা

ইংরেজদিগের শাসন কালে বহু ইংরেজ ব্যবসাদার ও রাজকর্ম্মচারী রেলগাড়ীতে যাতায়াত করিতেন বলিয়াই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, রেলগাড়ীতে যাত্রীদিগের খাওয়ার ব্যবস্থা উত্তম ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সরেশ মাল মশলা ব্যবহার, রসুইকরদিগের রন্ধনবিদ্যা প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়াই যাত্রীদিগের আহারের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল বলিয়াই সকলে মনে করেন। ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইলে পরে রেলপথের পরিচালনা পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় হইয়া যায় ও পুরাতন খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন লোকের উপর ঐ কার্য্যভার অর্পণ করা হয়। এই ব্যক্তিগণ ভাল ভাবেই কাজ চালাইত; যদিও ঠিক পূর্ব্বের মত হইত না। এই সকল খাদ্য-সরবরাহকারীদিগের এই কার্য্যে যথেষ্ট লাভ হইত ও তাহা দেখিয়া রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের বহু নায়কের প্রাণে বেদনার সঞ্চার হয়। কারণ, কাহারও যদি লাভ হয় তাহা হ'লে রাষ্ট্রনেতাদিগের মতে শুধু এই কথাই প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণকে শোষণ করা হইতেছে। শুধু রাষ্ট্রনেতাদিগের জীবনযাত্রা যদি ব্যয়-বহুলভাবে আরামদায়ক করা হয় তাহাতে সেকথা উঠে না। তাঁহারা বাড়ী, গাড়ী, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ভ্রমণসুবিধা ইত্যাদি পাইলে তজ্জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা সাধারণের নিকট হইতে আদায় করা হইলেও শোষণ নহে, কারণ রাষ্ট্রনেতাগণ সাধারণের সেবাতেই সদা নিযুক্ত, নিজ লাভের জন্য তাঁহারা কোন চেষ্টাই করেন না। তাঁহাদের আত্মীয়কুটুম্বগণ যদি লাভের কার্য্যে লাগিয়া যান তাহা হইলে তাঁহারা নিজগুণেই সেই লাভ করিয়া থাকেন; রাষ্ট্রনেতাদিগের কোনও পক্ষপাত জনিত চেষ্টার ফলে নহে। যাহাই হউক, রাষ্ট্রনেতাগণ রেলপথে খাদ্য সরবরাহ কার্য্যে এতই খরচ করিলেন যে তাঁহাদের দুর্নাম হইয়া গেল। খাদ্যের অবস্থাও বিশেষ নিকৃষ্টরূপ ধারণ করিল। সুতরাং বর্ত্তমান রেল-মন্ত্রী শ্রীহনুমন্তাইয়া পুনর্ব্বার ঠিকাদার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলেন ও ছানিয়া চষিয়া এমন সকল ঠিকাদার আবিষ্কার করিলেন, যাহার কোনও তুলনা হয় না। এখন রেলপথে যাহারা খাদ্য সরবরাহ করিতেছে তাহারা সকল দিক্ দিয়াই অযোগ্য ও কার্য্য-ক্ষমতাহীন। যেমন অপরিষ্কার ও অখাদ্য বস্তু সরবরাহ করা হয় তেমনি কর্ম্মীদিগের চালচলন বস্ত্র ও ব্যবহার। মূল্য বিচার করিলে মনে হয় যে এক টাকার খাদ্য চার টাকায় বিক্রয় করিবার এ ব্যবস্থা যদি শোষণ না হয়

তাহা হইলে শ্রীহনুমন্তাইয়া শোষণ বলিতে কি বুঝেন? এবং তিনি যেক্ষেত্রে সর্ব্ববিত্তাবিশারদ সেস্থলে তিনি খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কেন? মোট-বাহক কুলি ও খাদ্য পরিবেশক ভৃত্যের পার্থক্য কি তিনি বুঝেন না? কর্দ্দমাক্ত বাসন ও আলকাতরা-বর্ণের চা যে খাদ্যের টেবিলের অনুপযুক্ত তাহা কি তাঁহাকে শিখাইতে হইবে? উত্তর ভারতের মানুষ যে লঙ্কা ও লাউ একত্রে সিদ্ধ করিলে তাহা খাইয়া তৃপ্তিলাভ করে না, তিনি কি তাহা জানেন না? দক্ষিণ ভারতের রন্ধন ব্যবস্থা অন্য প্রকার হইলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শে সেদেশে আমরা কোনও পার্থক্য কখন লক্ষ্য করি নাই। আর একটা কথা হইল সময়ের কথা। মধ্যাহ্ন-ভোজন ব্যবস্থা যদি ৩টার সময় হয় এবং রাত্রের আহার গাড়ী কাটিবার অজুহাতে যদি ৬৷৷. টার সময় পরিবেশন করা হয় তাহাও অব্যবস্থার কথা। গাড়ী যদি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে তাহা হইলে সেই গাড়ী হইতে খাদ্য দিবার ব্যবস্থাও যথাযথরূপ হওয়া উচিত। করিডর নাই। মাঝখানে মালবাহী গাড়ী আছে ইত্যাদি বলিলে তাহাতে শুধু রেল-কর্ম্মচারীদিগের অক্ষমতাই প্রমাণ হয়। সকল ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, দক্ষিণ ভারতের কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা আমরা যতটা অসীম ও সর্ব্বব্যাপ্ত মনে করিতে ইচ্ছা করি কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাহা ততটা সর্ব্বদোষমুক্ত নহে। শ্রীহনুমন্তাইয়া অন্ততঃ দক্ষিণ ভারতের কর্ম্ম পরিকল্পনা প্রেরণার প্রতীক নহেন। তিনি যদি অপরের দোষ খুঁজিয়া না বেড়াইয়া নিজের কর্ম্মসাফল্যে অধিকভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন তাহা হইলে হয়ত তাহাদ্বারা দেশের কার্য্য আরও উত্তমরূপে হইতে পারিত।

শুনা যায় শ্রীহনুমন্তাইয়া ফরাক্কা বাঁধের কার্য্যেও পূর্ব্বেকার কর্ম্মচারী ও ঠিকাদারদিগকে অনেক স্থলে অপসৃত করিয়া নিজের অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন ও তাহার ফলেই এখনও ফরাক্কা হইতে কোনও জল ভাগীরথীতে আসিতেছে না। এইসকল কর্ম্মচারী ও ও ঠিকাদার কে এবং কি দেখিয়া শ্রীহনুমন্তাইয়া তাহাদিগকে ফরাক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। তাহা লোকসভার সভ্যাদিগের দেখা কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে যদি কোনও তোষণ বা পোষণের কথা থাকে তাহা হইলে সে কথারও পূর্ণ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, শোষণ নিবারণ যেরূপ আবশ্যক, অযোগ্য ব্যক্তির তুষ্টি অথবা পুষ্টি সাধনে বাধা দেওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন।

ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা

ভারতবর্ষে যাহারা বিদেশ হইতে ভ্রমণ করিতে আইসেন তাঁহাদিগের যাতায়াত, হোটেলে বাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি যদি আরও অনেক সহজ ও সস্তা না করা হয় তাহা হইলে ভ্রমণকারীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয় না। দিল্লীতে বর্ত্তমানে কোনও ভ্রমণকারীই দৈনিক দেড়শত টাকা ব্যয় না করিলে থাকিতে খাইতে সক্ষম হ'ন না। যাতায়াতের রেল-ভাড়াও অত্যধিক এবং যেদিন টিকিট চাওয়া হয় তাহার তিনদিন পরে টিকিট পাইলে তাহা পরম সৌভাগ্যের কথা বলিয়া মনে করা হয়। সারাদিন ট্যাক্সীতে ভ্রমণ করিলে ৫০।১০০ টাকা খরচ হয়। সুতরাং কেহ যদি দিল্লীতে তিনচার দিন ভ্রমণ করিতে থাকিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার মোট ব্যয় দৈনিক ২০০।২৫০ টাকা হয়। তৎপরে যদি কেহ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ৫০০০হাজার মাইল রেলপথে গমনাগমন করেন তাহাতেও রেলভাড়া প্রভৃতি ১৫০০।২০০০ টাকা হয়। অর্থাৎ কেহ যদি শত দিবস ভারতভ্রমণ করেন তাঁহার ব্যয় হইবে ২০০০০ হাজার টাকা। ইহার উপর শ্রীহনুমন্তাইয়ার অক্ষমতার জন্য রেলপথে যাহা তাহা খাইয়া যদি কাহারও অসুখ হইয়া যায় তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রেলগাড়ীতে স্থানাভাব হইয়া কোথাও কোথাও বসিয়া থাকিয়া ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনাও থাকিবে বলিয়া ধরিতে হইবে। ভ্রমণকারীদিগের সুযোগ-সুবিধা যথাযথরূপ না করিলে তাঁহারা বহুসংখ্যায় ভারতভ্রমণে আসিবেন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ ব্যবহার জন্য প্রয়োজন দৈনিক অনধিক ৭৫ টাকায় সর্ব্বত্র পুরা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা; ট্যাক্সীভাড়ার দৈনিক হার অনধিক ৫০ টাকা বাঁধিয়া

দেওয়া এবং রেলপথে ঠাণ্ডা গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভাড়া কম করা। এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাহাতে এখনকার হিসাবে অর্দ্ধেক খরচে সকলে ভারতভ্রমণ করিতে পারেন। রেলপথে খাদ্য সরবরাহ পরিষ্কার ও সুস্বাদু করা আবশ্যক। ইহার জন্য যে সকল ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইবে তাহাদিগের নিকট অভিযোগ-পুস্তক থাকিবে এবং সকল যাত্রীদিগের মতামত সেই পুস্তকে লিখিবার ব্যবস্থা যাহাতে করা হয় তাহা দেখিতে হইবে। আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বে রেলপথে সর্ব্বত্রই ঠাণ্ডা সোডা লেমনেড প্রভৃতি পাওয়া যাইত। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, রেলপথে শুধু কোকা কোলা ব্যতীত অপর কোন পানীয় বিক্রয় করা হয় না। কোকা কোলা বহুলোকই পান করেন না। কর্ত্তৃপক্ষ কি কারণে কোকা কোলা বিক্রয়ার্থে যাত্রীদিগের অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলে রেলের মালিকদিগের সম্বন্ধে যাত্রীদিগের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে পারে। ইহার মধ্যে যদি কোন পক্ষপাতের কথা থাকে তাহার উচ্ছেদ আবশ্যক।

কালাপাহাড়ী বর্ব্বরতা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-বিধ্বংসী বর্ব্বরতার জন্য যে সকল মানুষ অখ্যাতি ও অপযশের নিম্নতম স্তরে স্থাপিত হইয়াছেন, কালাপাহাড়ের নাম তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া মুসলমান হইয়া ইনি সকল ভাবে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মুসলমান নৃপতিদিগের দ্বারা ইনি সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন ও পরে ইনি শত শত মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া নিজের হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষ প্রকটভাবে ব্যক্ত করেন। কালাপাহাড় নামটাই পরে সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাস-বিরুদ্ধতার সহিত সমার্থক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা কিছু সর্ব্বজনস্বীকৃত ও জনমানসে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে তাহাকে ঘৃণ্য ও বর্জ্জনীয় প্রমাণ চেষ্টাকে কালাপাহাড়ী বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কালাপাহাড় সংস্কার বিচার অথবা সমালোচনায় বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল শাবল, গাঁইথি ও হাতুড়ির উপর। তর্ক বা আলোচনার দ্বারা পরিবর্ত্তন সাধন করিবার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু যাহাদের আস্থা ন্যায়বিচারের উপর ন্যস্ত নহে ও যাহারা পাশব শক্তি ব্যবহারের উপরেই নির্ভরশীল, তাহাদের পক্ষে কালাপাহাড়ের পথে চলাই সহজ ও সরল। মতানৈক্য সকল যুগেই থাকিয়াছে, বর্ত্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সভ্যতার পরিস্থিতিতে নানান মত থাকিলে হাতুড়ির ব্যবহারে সকল মতকে এক করিবার চেষ্টা করা হয় না; যেখানে সেইরূপ চেষ্টা হয় সেখানে সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত নাই বলিয়াই ধরা হয়। বর্ত্তমান কালে নানা দেশে মতবিরোধের কারণে নানা প্রকার দ্বন্দ্ব হইতে দেখা যাইতেছে এবং সকল ক্ষেত্রেই যে সেই দ্বন্দ্ব অহিংস নীতি অনুসরণে চালিত হইতেছে এমন কথা বলা যায় না। বহু ক্ষেত্রেই হাতাহাতি, গুলি বন্দুক ও রক্তপাত হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু সকল যোদ্ধাদিগের মতেই তাঁহাদের যুদ্ধ সভ্যতার ও মানবীয় আদর্শবাদের সংস্কার ও প্রসারের জন্যই হইতেছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদিও যেস্থলে শান্তভাবে তর্ক আলোচনা না করিয়া শুধু লগুড় ব্যবহারেই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে সেক্ষেত্রেও সভ্যতার গতি ও ছন্দ সুরক্ষিত থাকিতেছে এমন কথা মানিয়া লওয়া কঠিন ও কষ্টকর। সকলের মতেই অপর পক্ষ মূর্খ এবং সেই কারণে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্ নীতি অনুসরণে পরস্পরকে শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এই মূল্যায়ন কিছু ভুল নহে যদিও ঔষধে বিশেষ কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

রাষ্ট্রক্ষেত্রের মতবাদ পুরাকালের ধর্ম্মমতবাদের সহিত তুলনীয় হইলেও ঠিক একভাবে রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলিকে অনুপ্রেরণা দান করে না। কারণ, রাষ্ট্রীয় মতবাদ বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুসারে অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই হিসাবে প্রাচীন ধর্ম্মমতের কঠিন অপরিবর্ত্তনীয় কাঠামো আজকালকার রাষ্ট্রীয় মতবাদের

ভিতরে লক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলি মতবাদ অপেক্ষা নেতৃত্ববাদেই অধিক নির্ভরশীল। নেতাদিগের সুবিধা, প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝিয়া মতবাদের অর্থ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং সেই কারণে রাষ্ট্রীয় দলগুলির দ্বন্দ্ব মতবাদের খাতিরে হইতেছে বলা হইলেও বস্তুতঃ তাহা ব্যক্তিগত বিরোধের তাগিদেই চালিত হয়। সুতরাং যদিও পরস্পরের মতামতের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্ত জাতির মানস ক্ষেত্রে ঝড় বহাইবার অভিনয় প্রায়ই করা হইয়া থাকে তথাপি বাস্তব নির্ণয়ের হিসাবে দেখা যায় যে,বিভিন্ন মতবাদের কোনও বোধগম্য মূল্যায়ন প্রায় কখনই করিবার চেষ্টা হয় না। মনে হয় যেন চারিদিকে বিশ্বাস-বিধ্বংসী আক্রমণের ফলে প্রগাঢ় বিশ্বাসের অসংখ্য প্রাকার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও সেইসকল ধ্বংস স্তূপের উপর নব নব মতবাদের বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে, কিন্তু সত্যই কি সেইরূপ কিছু হইতেছে? কোনও মতবাদই কি মানব মনে সত্য সত্যই গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও মতবাদ বিনাশ কার্য্যের ভিতর কি আমরা প্রাচীন কালের মন্দির ভাঙ্গিবার মত কোন সতেজ আক্রমণ-শক্তি অথবা উৎকট আগ্রহ দেখিতে পাই? রাষ্ট্রক্ষেত্রে বহুব্যবহৃত "পলিসি" কথাটির কোন গভীর বিশ্বাসের ভিত্তি নাই। আছে শুধু ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সুবিধার কথা, এইজন্ত রাষ্ট্রক্ষেত্রের সকল আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ ও অপপ্রচার প্রায় সর্ব্বদাই পলিসির কারণে চালিত হয়, বিশ্বাস বা মানসিক নির্ভরের কথা লড়াই ঝগড়ার মূল অনুসন্ধানে প্রয়োজন হয় না। আমেরিকার সহিত রুশিয়ার অথবা চীনের সহিত পাকিস্থানের মৈত্রী কিংবা ঐ-সকল জাতির অপর কোন শত্রুতার মূলে যদিও রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা মতবাদের কথা তোলা হয়, তাহা হইলেও বিষয়টা সত্য সত্যই মতলবের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া অনুসৃত হয়। এক কথায় অন্তরের একান্ত বিশ্বাস অথবা কোন আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বর্ত্তমানে রাষ্ট্রক্ষেত্রের মানসিক অবস্থার পরিচায়ক নহে। মতলব সিদ্ধি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বড় কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মতবাদ বিনাশ, নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূর্বকালের ভাঙ্গন গঠনের কথা আজকাল আর চলে না। ধর্ম্মান্ধতা নাই কিন্তু জনসাধারণকে উস্কাইয়া লড়াইবার জন্ত একটা সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করা এখনকার রাষ্ট্রীয় পলিসি বা মতলব সিদ্ধির পন্থা। আমরা মনে করিতে পারি যে রুশ, চীনা বা আমেরিকান কোনও কালাপাহাড় এমন একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিবেন যে তাহার ফলে কোন কোন মতবাদ পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া নূতন আদর্শের স্থাপনা সুদৃঢ় করিবে; কিন্তু তাহা হইতে পারিবে না এই কারণে যে, আদর্শ বা মতবাদ মতলব ও পলিসির নিকট সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন।

দেশ-বিদেশের কথা

রুশ আমেরিকার চূড়ান্ত বোঝাপড়া

আজকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মীমাংসাগুলি কখনই প্রায় সহজ সরল আলোচনা বা সম্বন্ধ নির্ণয় বলিয়া প্রচারিত হয় না। সকল কথাই চরম, চূড়ান্ত বা শেষ কথা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে; কারণ এই যে সহজ সরল আলোচনা অথবা সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের আজকাল আর কোনও দাম নাই। সুতরাং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন যখন নানা দেশের সহিত আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ পরিষ্কার করিয়া লইয়া অবশেষে মস্কোতে অবতরণ করিলেন তখন সকলেই মনে করিল যে এইবার চূড়ান্তের চূড়ান্ত ও চরমের চরম ঘটিবেই ঘটিবে। যাহা ঘটিল তাহাতে রুশিয়া, আমেরিকা অথবা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, অবস্থিতি বা পরিস্থিতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় ভিত্তির সুদৃঢ়ভাব আরও জোরাল হইল অথবা শত্রুতা কিম্বা মিত্রতা নূতন উপায়ে সুচিকিৎসা অথবা পুষ্টিলাভ করিয়া নব কলেবর প্রাপ্ত হইল এইরূপ কিছু হইবার লক্ষণ কেহ দেখিল বলিয়া মনে হয় না। ব্যাপারটা অনেকটা নির্ব্বাচন কালের পরিক্রমণের মতই মনে হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহার ভিতরে এমন কোনও সারবস্ত রূপ গ্রহণ করে নাই যাহা দ্বারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয়ন নূতন পথে চলিবে বলিয়া মনে হইবার কোন নূতন কারণ সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বিচার করা যায়।

রুশ-আমেরিকা অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ন ক্ষেত্রে এই জাতীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মেলামেশা ও আলাপ আলোচনা বহুবার হইয়াছে ও নানা প্রকার রীতিনীতির পুনর্নির্দ্ধারণ চেষ্টাও বারে বারে করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নূতন পথে চলিয়াছে এমন মনে করিবার কোনও নূতন লক্ষণ দেখা যায় নাই। এখন যাহা ঘটিল তাহার ফল দুই মহাজাতি নিজেদের সম্বন্ধ বিষয়ের মূলনীতি দ্বাদশ সূত্রে ব্যক্ত করিলেন। ঐ দ্বাদশ-সূত্র বিচার করিলে মনে হইতে পারে যে, সেইগুলির কোন কোনটি মূলনীতি বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থিত করার বিশেষ কোন কারণ ছিল না, কিন্তু বিশ্ববাসী নিক্সন বা ব্রেঝ্‌নেভ যা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য এই ধারণাই এখন ছাপার অক্ষরে প্রবল শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে দ্বাদশ সূত্র অনুসারে এখন রুশ-আমেরিকান রাষ্ট্র-সম্বন্ধ পরিচালিত হইবে বলা হইয়াছে সেইগুলি হইল নিম্নলিখিতরূপ। (১) পরস্পরের অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। (২) সামরিক ভাবে পরস্পরের সহিত মোকাবিলা চেষ্টা অথবা পারমাণবিক যুদ্ধে কোনও মতেই প্রবৃত্ত না হওয়া। (৩) সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা সৃজন চেষ্টা যাহাতে সকল জাতি শান্তিতে ও নির্ব্বিবাদে নিজ অধিকার বজায় রাখিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। (৪) সততার সহিত সকল সন্ধির সকল সর্ত্ত মানিয়া চলা। তাহা দুই জাতির ভিতর হউক বা বহু জাতির সম্বন্ধ লইয়াই হউক। (৫) পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার। (৬) সামরিক অস্ত্রশস্ত্র লাঘব ব্যবস্থা দ্বিজাতীয় ভাবে করিবার ব্যবস্থা করা। (৭) অর্থনৈতিক ও ব্যবসাগত সম্বন্ধ দৃঢ়তর রূপে গঠন চেষ্টা এবং সামুদ্রিক ও আকাশ পথে যাতায়াতের উন্নততর ব্যবস্থার আয়োজন করা। (৮) বিজ্ঞান ও কার্য্যকর কলাকৌশল ব্যবহার ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সহায়তা সংযোগ স্থাপন চেষ্টা। (৯) কৃষ্টির ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ গভীরতর ভাবে গঠন চেষ্টা ও পরস্পরের কৃষ্টির মূল্যায়নে ঘনিষ্ঠ উপলব্ধির আয়োজন করা। (১০) যুক্ত ভাবে এরূপ ব্যবস্থা করা যাহাতে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রের সকল ব্যবস্থা দীর্ঘ-

স্থায়ী ও কার্যকর নিয়মানুবর্তীভাবে চলিতে পারে। (১১) বিশ্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে কাহারও কোনও বিশেষ দাবী বা অধিকার মানা হইবে না ও সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। এবং (১২) এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও পুরাতন সন্ধি ও অপরাপর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দায়িত্বসকল সংরক্ষিত থাকিবে ও তজ্জাত দাবিদাওয়ার কোন পরিবর্তন হইবে না।

দুই জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার বিষয়ে এই নবরচিত দ্বাদশ সূত্রের প্রভাব কতটা সক্রিয় হইবে তাহার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে প্রভাব বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ যেসকল পুরাতন গোষ্ঠীগত দায়িত্ব স্বীকার করিয়া এখন আমেরিকান ও কম্যুনিষ্ট দলগুলি নানা ক্ষেত্রে সামরিক সাহায্য দানে নিযুক্ত আছে, বর্তমান দ্বাদশ সূত্র তাহাতে কোনও পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার বোমা বর্ষণ অথবা রুশিয়ার বিমান ও কামান সরবরাহ এই নূতন পরিস্থিতিতে কিছু মাত্র কম বেশী হইবে না। যেমন চলিতেছিল কম্যুনিষ্ট-অকম্যুনিষ্ট যুদ্ধ সেই ভাবেই রুশ-চীন ও আমেরিকান সমর্থিত ভাবে চলিতে থাকিবে। বিশ্ব মহাযুদ্ধ অথবা পারমাণবিক সংগ্রাম সম্ভাবনা এই নূতন দ্বাদশসূত্রী নীতির আবির্ভাবে কোনও ভাবে হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নিক্সনের কম্যুনিষ্ট জগৎ ভ্রমণের ফলে বিশ্বশান্তি কিভাবে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে সে কথার উত্তরে বলিতেই হইবে যে বিশ্বশান্তি যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে। মারামারি কাটাকাটি যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে এবং দলাদলির প্রেরণা কোনভাবেই বিশ্ব মৈত্রীর হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না।

অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, বাহিরে যাহা বলা হইতেছে আসলে ভিতরে ভিতরে রুশিয়া, চীন ও আমেরিকা তাহার উপরেও অন্য কিছু গুপ্ত সর্তে আবদ্ধ হইয়াছে এবং সেই সর্তগুলিই হইল আসল কথা। কিন্তু সেগুলি যতকাল অজানা থাকিবে ততদিন তাহার আলোচনা অর্থহীন।

তুর্কীদিগের স্বাধীন রাষ্ট্র

১৯১৯-২২ খৃঃ অব্দ তুরস্ক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়। স্বৈরাচারী তুর্কী সুলতানদিগের রাজ-শক্তির উচ্ছেদ করিয়া ঐ সময় মুস্তাফা কেমাল পাশা তুরস্কে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংস্থাপন করেন। কেমাল পাশাকে ঐ জন্য আতাতুর্ক্ নাম দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যে শুধু সুলতানদিগের রাজত্ব ভাঙ্গিয়া দিয়া আধুনিক কেতার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার মহিমার একমাত্র পরিচয় নহে। তিনি ঐ সঙ্গে তুরস্কের জনসাধারণকে প্রাচীনতার গভীর অন্ধকার হইতে তুলিয়া আধুনিকতার আলোকময় শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। পুরাতন ধর্মান্ধতার অবসান করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আসিল। প্রাচীন লাল টুপি উঠিয়া গিয়া তুর্কীদিগের মস্তকে য়ুরোপীয় হ্যাট শোভমান হইল। মুসলমান দরবেশ জাতীয় মোল্লা-দিগকে বিতাড়িত করিয়া তুর্কীদিগকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও মুক্তি দেওয়া হইল। আইন পরিবর্তন করিয়া নানা বিষয়ে পুরাতন বর্বরতার শেষ হইল; যথা বহু-বিবাহ নিবারণ। তুর্কী ভাষা পূর্ব্বে আরবী অক্ষরে লিখিত হইত। তাহা বদলাইয়া এখন ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার আরম্ভ হইল। পুরাতন আভিজাত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট খেতাব প্রভৃতি তুলিয়া দেওয়া হইল এবং পুরাতন জোব্বা আলখাল্লা জাতীয় পোশাক ব্যবহার অচল করা হইল। ধর্মভিত্তিক আদালত ও বিচারব্যবস্থা বন্ধ হইল ও ইসলাম আর অতঃপর রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইল না। স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দান করিয়া নারী জাগরণের নূতন সুব্যবস্থা করা হইল।

নূতন তুরস্ক মুস্তাফা কেমাল পাশার আদর্শে জাতীয় উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া সে

গতিবেগ রক্ষা করিতে পারে নাই। কেমাল পাশার মৃত্যুর পর নানাক্ষেত্রে কিছু কিছু অধোগমন লক্ষিত হয়। জাতির একতা সুরক্ষিত হইতেছেনা দেখিয়া নানা প্রকার চেষ্টা হয় যাহাতে জাতীয়তা বোধ কোনও ভাবে নষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাইতে থাকে। ২৭ মে ১৯৬০ খৃঃ অব্দে তুর্কী সেনা বাহিনী জেনারেল সেমাল গুরসেলের অধিনায়কত্বে তুরস্কের ডিমক্রাটীক দল চালিত শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া জাতীয় একতা সংঘের নির্দ্দেশে শাসনভার সেনা বাহিনীর হস্তে তুলিয়া ল'ন। নাগরিকদিগের প্রতিনিধিগণ শাসন কার্য্য হইতে অপসৃত হ'ন ও তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দলগুলি রাষ্ট্র কার্য্য হইতে সরিয়া যান। রাষ্ট্রীয় দলগুলি পুনর্ব্বার নিজেদের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন ১৯৬১ খৃঃ অব্দে। ১৯৬১ এ যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে Justice Party ৪৫০ জন সভ্যের মধ্যে ২৫১টি আসন দখল করেন। Republican Peoples Party পা'ন ১৪৪টি আসন। অপর ছয়টি দল মিলিতভাবে ৫০টি আসনও পা'ন নাই। ১৯৬১ খৃঃ অব্দে তুরস্কে পুনর্ব্বার শাসন ক্ষমতা সামরিক হস্তে চলিয়া যায়। সেনাপতিগণ বলেন, রাষ্ট্রনেতাগণ শুধু বিভেদ সৃষ্টি করিতেই পারেন; এবং পারেন অরাজকতার ঝড় বহাইতে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনেতাদিগের দ্বারা কোনও উন্নতিকর কিছুই ঘটে না। সামরিক নেতাগণ কিন্তু নিজেদের হস্তে শক্তি রক্ষার চেষ্টা করেন না। যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নাগরিকদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রনেতাগণ অনেক সময় সেনাপতিদিগের সহায়তা বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে চাহেন না। ইহার জন্ত সেনাপতিগণ বিশেষ দায়ি নহেন। তুরস্কের সেনাবাহিনীর রাজত্ব চালাইবার ইচ্ছা বিশেষ নাই। তাহারা শুধু নিজ কার্য্য করিতেই ইচ্ছুক। অপরের বোঝা স্কন্ধে উঠাইতে বিশেষ আগ্রহ তাঁহাদিগের নাই।

চীনদেশে নেতৃত্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

নিক্‌সনের সহিত মুলাকাত হইবার পরে মাওৎসেতুঙ্গকে আর কোথাও কেহ দেখিতে পায় নাই বলিয়া একটা গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে যে, চেয়ারম্যান মাও সম্ভবতঃ কোন কঠিন রোগের আক্রমণে অচল অবস্থায় আছেন কিম্বা তাঁহার মৃত্যুও হইয়া থাকিতে পারে। কথাটা চাপা দিয়া রাখার কারণ চীন দেশে নেতৃত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাবল্য। পূর্ব্বকার দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও কোথায় আছেন কেহ জানে না। তিনি হয়ত বাঁচিয়া নাই। হয়ত বা বন্দী হইয়া কোথাও আটক আছেন। অথবা লুকাইয়া কোথাও সুযোগের অপেক্ষাতেও গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারেন। যাহাই হউক, নেতৃত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলায় তাঁহারও অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে, একথা ভুলিলে চলে না। চু এন লাই, বয়স ৭৪ বৎসর ও মাওৎসেতুঙ্গ-এর বর্তমানে দক্ষিণ হস্ত, তিনি নেতৃত্বভার লইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও মাওৎসেতুঙ্গের উপস্থিতির অভাবে তাঁহাকেই অনেকে চেয়ারম্যানের আসনে বসাইবার চেষ্টা করিবে। আবার নানা স্থানে মাও বিরোধী চু এন লাই-এর অপসারণ-কামী ছোট বড় গন্ডিও এখন বর্তমান আছে। এই সকল দলের মানুষ চু এন লাইকে উচ্চাসনে উঠিতে দিবে না বলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বিষয়টা সুতরাং খুব সহজ থাকিবে না—মাও যদি নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকেন। নেতৃত্বের কলহ অবশ্যই আরম্ভ হইবে এবং হইলে তাহা প্রায় একটা মহা বিপ্লবের আকার গ্রহণ করিবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞদিগের বিশ্বাস।

---

৩৬৮ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

করিবার আয়োজন চলিতেছে। যথা, কাবেরীতে গঙ্গার জল যন্ত্রদ্বারা উঠাইয়া পাঠাইবার চেষ্টা। এই কাবেরী পরিকল্পনার জন্য দায়ী কেন্দ্রের মন্ত্রী কে. এল রাও। তিনি কোন্ অধিকারে গঙ্গার জল কাবেরীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। গঙ্গার জল গঙ্গার প্রয়োজনে ব্যবহার করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যেখানে গঙ্গাতেই (ভাগীরথী ত গঙ্গারই নাম) জলাভাব ও সেই জলাভাবহেতু গঙ্গাতীরনিবাসী মানুষের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, সেখানে গঙ্গার জল কোন্ নীতি অনুসরণে কাবেরীতে ঢালিবার আয়োজন হইতেছে? এইরূপ ব্যবস্থা করিলে দক্ষিণ ভারতের মানুষের লাভ হইতে পারে কিন্তু গঙ্গা দক্ষিণ ভারতের নদী নহে। গঙ্গার উপকূলস্থ মানুষের দাবী আগে দেখিয়া পরে গঙ্গার জল অন্য কাহারও ব্যবহারে লাগান যাইতে পারে। আরও দেখিতে হইবে, গঙ্গার জল ব্যবহারে কোথায় কতজন মানুষের কতটা সুবিধা হইতেছে। সংখ্যায় অধিক যাহারা তাহাদিগের দাবী অপরের অগ্রে মানিতে হইবে। কলিকাতা বন্দর ঠিকভাবে না চলিলে প্রায় এক কোটি মানুষের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে জল সেচন করিয়া হয়ত দুই দশ লক্ষ মানুষের কিছু কিছু চাষের সুবিধা হইবে। সুতরাং ঐ সেচন কার্য্য বন্ধ করিয়া ফরাক্কা হইতে নূতন খাল দিয়া ৪০০০০ কিউসেক জল ভাগীরথীতে ছাড়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইহা কোন প্রাদেশিক দাবীদাওয়ার কথা নহে। ন্যায়ের কথা। সর্ব্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্ব্বাধিক উপকার যাহাতে হয় তাহাই হইল মানবীয় ন্যায়ের সার কথা।

কে এল রাও আর ৪০০০০ হাজার কিউসেক কথাটাই উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না। প্রথমে ২০০০০ কিউসেক বলিতেন এখন ১৫০০০ বলিতেছেন। এই ব্যক্তির নীতিজ্ঞান বা ন্যায়বোধ ত নাইই, এমন কি ফরাক্কা সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া ইনি ফরাক্কার উদ্দেশ্য কি তাহাও ভুলিয়া বসিয়া থাকেন। ভাগীরথীর জলস্রোত অন্ততঃ ৪০০০০ কিউসেক না বাড়াইলে কলিকাতা বন্দর রক্ষা সম্ভব হইবে না। সে অবস্থায় ৪০০০০কে কাটিয়া প্রথমে অর্দ্ধেক ও পরে অর্দ্ধেকেরও কম করিবার কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ ১৫০০০ কিউসেক জলবৃদ্ধি হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না এবং তাহা করা না করা সমান। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও কাবেরীতটের বাসিন্দাদিগকে তাহাদিগের যে জলের প্রয়োজন তাহার ৩এর ৮ অংশ মাত্র দিবার ব্যবস্থা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে ৪০০০০ স্থলে ১৫০০০ কিউসেক জল বহাইলে কলিকাতা বন্দরের জাহাজ চলাচল হইবে কি না।

আর একটা কথাও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। তাহা হইল প্রাদেশিক দাবী দায়িত্বের কথা। ফরাক্কা যদি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা না হইয়া প্রাদেশিক হইত তাহা হইলে কার্য্যে বিলম্ব অথবা নানা প্রকার অর্থহীন প্রসঙ্গের উত্থাপন ঐ সূত্রে কখনও হইত না। কে এল রাও বা হনুমন্তাইয়ার বাণীও আমাদের শুনিতে হইত না। আমাদের কর্ত্তব্য ফরাক্কা পরিকল্পনার কার্য্যভার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগের হাত হইতে সরাইয়া লইয়া উহা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের করায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করা। তাহার পরে দেখিতে হইবে কি উপায়ে ও কোথায় চাপ দিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(২৯ জুন, ১৮৯৩—২৮ জুন, ১৯৭২)

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৭৯

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ২৯শে জুন কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্বজন-পরিচিত নেতা গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র প্রবোধচন্দ্রের প্রথম সন্তান প্রশান্তচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা নীরদবাসিনী ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠা ভগিনী। জ্যেষ্ঠতাত অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ সে-যুগের বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সুবোধচন্দ্র বিবাহ করেন নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মণিকা দেবীকে। গুরুচরণ মহলানবিশের গৃহে সর্ব্বদাই দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাগম হইত ও প্রশান্তচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বিদ্বান্ ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতেই যাঁহাদিগের সহিত পরিচয়ে প্রশান্তচন্দ্রের মনের বিকাশ সুগম হইয়াছিল তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও অন্যান্য অনেকে। সে-যুগ ছিল স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার যুগ। দেশের আকাশ তখন মানবীয় প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে শুভ্রস্নাত এবং দেশাত্মবোধজাত বলিষ্ঠ ভাব-অভিব্যক্তি তখন ছিল সকল আসরেরই একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির বাণী তখন সকলের মুখে এবং বাংলার বাহিরেরও মহান্ নেতৃবৃন্দ যথা গোখলে, রানাডে, লাজপত রায় প্রভৃতি মহামানবগণও এদেশ-বাসীর আপনার জন রূপে আদৃত হইতেছিলেন।

প্রশান্তচন্দ্র বাল্যকালে পাঠের জন্য ব্রাহ্মবালক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হ'ন এবং সেই বিদ্যালয় হইতেই

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পরে জীবনক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকার করেন ও প্রশান্তচন্দ্র আজীবন পুরানো বন্ধুদিগের সহিত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এই সময় প্রশান্তচন্দ্রের সহিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতে আরম্ভ হয়। পরে বি এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে যখন প্রশান্তচন্দ্র কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন তখন রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গমন করিলে এই দেশের ছাত্রদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় গভীরতর হয়। প্রশান্তচন্দ্র তখন কেমব্রীজ হইতে লণ্ডনে আসিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।)

(কেমব্রীজে প্রশান্তচন্দ্র কিংস কলেজে যোগদান করিয়া গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে গণিতে ও পরে পদার্থ বিজ্ঞানে ট্রাইপোস পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি অর্জ্জন করেন।) কিন্তু ১৯১৫ খৃঃ অব্দে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আগমন করেন ও এদেশে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে একটা অধ্যাপকের কার্য্য পাইয়া যাওয়াতে কেমব্রীজে ফিরিয়া না গিয়া অনুশীলন কার্য্য এই দেশেই করিবার উদ্‌যোগ করেন। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনাই তাঁহার কার্য্য হইলেও তিনি গণিতে অধিক অনুরাগী ছিলেন ও অঙ্কশাস্ত্রীয় সম্ভাবনার বিশ্লেষণ ও বাস্তব পরিমাণ বিচার করিতেই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিতে দেখা যাইত। প্রথমতঃ জীববিজ্ঞান অন্তর্গত বিভিন্ন পরিণতির সম্ভাবনা সংক্রান্ত গণনাতেই তিনি নিযুক্ত থাকিতেন; কিন্তু পরে অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁহার অনুশীলন কার্য্য প্রসারিত হইতে লাগিল। আদমশুমারি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান লইয়া তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে শীঘ্রই পরিসংখ্যানবিদ্ হিসাবে পণ্ডিতজন সমাজে খ্যাতিমান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল ও কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহার কার্য্যের জন্য এফ আর এস (ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির সভ্য) উপাধি লাভ করিলেন।

এই সময়ে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত পূর্ব্ব পরিচয়ের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আবদ্ধ হ'ন ও প্রায় দশ বৎসর কাল বিশ্ব ভারতীর কর্ম্মসচিবের কার্য্য করেন। বিশ্বের নানান দেশে তাঁহার যাতায়াত এখন হইতে প্রয়োজন হইতে আরম্ভ করে ও তিনি যে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করিলেন সেইখানে নানান দেশের বিদ্বৎজন সমাগম হইল।) ভারত স্বাধীন হইবার পরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আরম্ভ হইল। পরে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে পরিকল্পনায় আকার প্রকার নির্ণয়ন কার্য্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন ও তিনি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। ইণ্ডিয়ান স্টাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে বিদেশী পণ্ডিত ও অপরাপর ক্ষেত্রের বিশিষ্ট নেতাদিগের আগমন একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকলের নাম এই স্থলে দেওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানের বাহিরের যাঁহারা বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহাদিগেরও অনেক এই শিক্ষাকেন্দ্রে আগমন করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের স্বনামধন্য যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে আমরা এইখানে চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন লাই ও উত্তর ভিয়েৎনামের ডাঃ হো চি মিন্‌হ্‌কে দেখিয়াছি। নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্নাও এখানে আসিয়াছেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিকাল ইন্‌স্টিটিউটে আসিয়াছেন তাঁহাদিগের সংখ্যা অনেক। যাঁহারা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁহাদিগের মধ্যে মনে পড়ে অধ্যাপক গ্রুনেবার্গ, অধ্যাপক নীল্ বোর্‌হ্ ও অধ্যাপক সীমৃন্‌জ্এর নাম। অধ্যাপক জে বি এস হলডেন এই শিক্ষাকেন্দ্রে আসিয়া কাজ করিয়াছিলেন। স্যর রোনাল্ড্ ফিশারও এইখানে বহুবার আসিয়া

থাকিয়া গিয়াছেন। জগতের আরও বহু গণ্যমান্ত মানুষ এখানে বারবার আসিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুও অনেকবার এই ইন্‌স্টিটিউটে আসিয়াছিলেন।

এই সকল আনাগোনার মূলে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তাঁহার পৃথিবীব্যাপী ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বন্ধনসূত্রে দূর-দূরান্তের কত গুণীজনকে যে বন্ধুত্বের টানে ভারতের নিকট আনিয়াছিল তাহার হিসাব করা সহজ নহে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রশান্তচন্দ্র জগতের উচ্চ শিক্ষিত সমাজে ভারতের জাতীয় প্রতিনিধি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আজ তাঁহার অবর্ত্তমানে বিশ্বের বহু জ্ঞানীজন আর ভারতে আসিবার কোন আকর্ষণ অনুভব করিবেন না। তর্ক বিচার ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় প্রশান্তচন্দ্র সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাক্যালাপেও সুচতুর ছিলেন ও সকল স্তরের ও সকল বয়সের মানুষকেই তিনি কথায় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বহু পরিবারেই আপনার জন বলিয়া গণ্য হইতেন।

বহু দেশের অসংখ্য বন্ধুবান্ধবই আজ তাঁহার মৃত্যুতে শোককাতর। রবীন্দ্রযুগের যে মানসিক জাগরণ তাহা দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুভূত হইয়াছিল। বহু নবীন চিন্তাশীল তখন বাঙ্গালা দেশে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এখন যাঁহারা ক্রমে ক্রমে জীবন-ক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতেছেন। এই সকল ব্যক্তির প্রতিভা সাহিত্যে কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে ও নানা শিল্পকলায় প্রতিভাত হইয়াছিল। গণিত ও ফলিত বিজ্ঞানের ব্যাপক অঙ্গনে দেখা গিয়াছিল প্রশান্তচন্দ্রের জ্ঞানমার্গের কর্মনিষ্ঠা। গভীর চিন্তা, বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের শানিত অস্ত্রে তিনি অজানার অন্ধকার বিদারণ করিয়া বহুক্ষেত্রের মানসিক তমিস্রা অপসারণ সহজ ও স্থিরনিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক।

অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি

নীতি কথাটার সকল সময় কোন নৈতিক অর্থ থাকে না। অর্থাৎ নীতির সহিত ধর্মাধর্ম বোধ বা শুভ-অশুভ ঘটনার যে সম্বন্ধ তাহা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকল সময় রক্ষিত হয় না। ন্যায় যাহা শুধু তাহাই যদি নীতির অন্তর্ভুক্ত হইত তাহা হইলে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিত। বর্তমানে আমরা নীতি বলিতে কোন কার্য্য বা বিষয়ের যে প্রেরণা বা পরিচালনার বিধি তাহার মূল বা সারাংশটুকুর কথাই মনে করি। অর্থাৎ অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা কূটনীতির মধ্যে যে সকল জনহিতবিরুদ্ধ অন্যায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায় সেই সকল অশুভ উপস্থিতিগুলিকেও ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থনীতি অনেক স্থলে যাহা আবশ্যক ও উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে রাষ্ট্রনীতি অপর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণে সেই সকল প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া অর্থনীতিকে ভিন্ন পথে চালাইবার ব্যবস্থা চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনীতির মুশলাঘাতে অর্থনীতির সর্ব্বনাশ সাধন প্রায়শঃই হইয়া থাকে এবং এইরূপ ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গের অঙ্গে বহুবারই আঘাত করিয়াছে। কলিকাতা বন্দরের জলাভাব ও নানা উপায়ে এই বন্দর হইতে মাল রপ্তানী আমদানী না করিয়া সেই ব্যবসায় অন্য পথে চালাইবার চেষ্টা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির একটা স্বাভাবিক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জলাভাব হ্রাস চেষ্টার যে কোন ব্যবস্থাই করা হয়, রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ তাহা নাকচ করিয়া ঐ অবস্থা চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ঘোরাফেরা করেন। ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা বহুপুরাতন ও ভারতীয় আর্থিক পরিকল্পনার একটি সর্ব্ববিশেষজ্ঞ-স্বীকৃত অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু বহু কোটি টাকা ব্যয় করিবার পরেও ফরাক্কা লইয়া ছিনিমিনি খেলা এখনও স্থগিত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের করণ কি প্রতিভার আধার কেন্দ্রীয় বাঙ্গালী-বিরোধী নেতাদিগের গুপ্ত নির্দ্দেশ নির্ব্বাহক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদিগের এখন একমাত্র চেষ্টা কি করিয়া কলিকাতা তথা বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন সম্পূর্ণ করা যায়। বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় প্রেরণা উদ্ভূত রাষ্ট্রনীতি এই সকল বাঙ্গালা-বিধ্বংসী প্রচেষ্টার বিপরীত কোনও আন্দোলন অথবা বিধিব্যবস্থা করিতে অপারগ ও অসমর্থ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে

রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সর্বনাশের গভীরে নিক্ষেপ করিতে অনায়াসেই সক্ষম হইতেছে। এই যে রাষ্ট্রনীতি তাহা রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য, জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা অথবা সর্বসাধারণের মঙ্গল, কোন কিছুই মানিয়া চলেনা। কূটনীতি কথাটা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই সচরাচর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বর্তমানে ভারতের প্রদেশগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে একটা দেশের আভ্যন্তরিক কূটনীতির জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার মূলে আছে অত্যধিক সংখ্যায় রাষ্ট্র নেতা সৃষ্টি। সত্যকার দেশাত্মবোধ ও নেতৃত্বগুণ না থাকিলে মানুষ নানা প্রকার দুষ্কর্মে লিপ্ত হইয়া দল পাকাইতে থাকে এবং ভারতে বহু সংখ্যায় প্রদেশ সৃজন করিয়া এইরূপ একটা অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে সন্দেহ করেন যে, তথাকথিত রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোথাও কোথাও সমাজবিরুদ্ধতা-দোষদুষ্ট অপরাধীদিগের সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি যে এই অবস্থায় কাল-কূটনীতির বিষে জর্জরিত হইয়া পড়িবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গনে তাহা হইলে অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতিও কূটনীতি কোনভাবেই জনমঙ্গল বা দেশহিত আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা পরিচালিত নহে; শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত লাভলোকসান, শক্তিবৃদ্ধি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা লইয়াই ঐ সকল নীতি গঠিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জেরেমি বেনথাম বর্ণিত "সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য" লইয়া মানুষের অর্থকরী চেষ্টা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগের সমাজতরণীর গতিনির্দ্দেশও এব্রাহাম লিনকনের ভাষায় "সমাজ-শাসন সমাজের লোকের দ্বারা ও সমাজের মঙ্গলার্থেই" হইতে দেখা যায় না। কূটনীতির মধ্যে কূটভাব ক্রমবর্দ্ধনশীল ও বর্তমানে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার পঙ্কে পূর্ণ নিমজ্জিত। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে অর্থনীতি যত অধিক রাষ্ট্রশাসন কার্য্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে ততই তাহাদ্বারা দুর্বলের শোষণ ও প্রবলের ধনভাণ্ডার পূরণ ব্যবস্থা দমিত হইবে। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় নাই। যে পাপ পূর্বে ছিল তাহা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রহিয়া গিয়াছে ও তদুপরি কিছু নূতন নূতন রাষ্ট্রক্ষেত্রের পাপও আর্থিক প্রচেষ্টাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কূটনীতি এখন জগৎ জাতিসভার আসর হইতে উঠিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল গণ্ডি, গোষ্ঠী ও দলের প্রাণশক্তির রূপ ধারণ করিয়াছে।

গৃহ-সম্পদের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দ্দেশ

সম্প্রতি বিহার প্রদেশে স্থির করা হইয়াছে যে কোন সহরে কেহ দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ঘরবাড়ী রাখিতে পারিবে না। যদি কাহারও দুই লক্ষাধিক মূল্যের গৃহ-সম্পদ্ থাকে তাহা হইলে তাহাকে হয় কোন বিশেষ রাজকর দিতে হইবে নয়ত বাধ্যতামূলকভাবে আইনগ্রাহ্য সীমার অতিরিক্ত অংশ সরকারকে "বিক্রয়" করিয়া দিতে হইবে। "বিক্রয়" অর্থে বুঝিতে হইবে নির্দ্ধারিত মূল্যের একটা অংশমাত্র (তাহাও কিস্তিতে) দিয়া সরকার সম্পত্তি গ্রাস করিতে পারিবেন। কোন সহরে অধিক মূল্যের ঘরবাড়ী রাখা তাহা হইলে একটা অতি মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কারণ কি? বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা কি ভাড়াটিয়াদিগের সুখ-সুবিধার কোনও বিশেষ অন্তরায় সৃজন করে? আমার ত জানি যে দরিদ্র যাহারা তাহারা বৃহৎ বৃহৎ ইমারতে বাস করে না। তাহারা বাস করে বস্তিতে এবং বস্তির মালিকগণ সচরাচর ৫০ টাকা মাসিক ভাড়া দিয়া জমি লইয়া তাহাতে কাঁচা ঘর বানাইয়া শতকরা বার্ষিক চল্লিশ টাকা লাভে সেই সকল মানুষের বাসের অযোগ্য ঘরগুলি ভাড়া দিয়া গরীবের দুর্দশা আরও গভীর করিয়া তুলিয়া থাকেন। পাকাবাড়ী যাঁহারা ভাড়া দেন তাঁহারা ভাড়াটিয়ার সকল বায়নাক্কা সামলাইয়া শেষ অবধি খাটান টাকার উপর বাৎসরিক শতকরা পাঁচ টাকাও পান কি না তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং বস্তি উঠাইয়া দিয়া অল্প ভাড়ায় মনুষ্যবাসের উপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ ব্যবস্থা না করিয়া তথাকথিত সোসিয়ালিজম-এর ক্রীড়াক্ষেত্রে

লোক দেখাইবার জন্য একটা অর্থহীন গৃহ-সম্পদের উচ্চ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া বিহার সরকার কোনও জনহিতকর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন বলা যায় না। গৃহ সম্পদ প্রথমতঃ এক প্রকারের সম্পদ্ ব্যতীত অপর কোনও ভাবের কোনও মানবীয়তা-বিরুদ্ধ বিষময় প্রতিষ্ঠান নহে। যদি কোনও ব্যক্তি একশতটি বাস বা লরী রাখিয়া ব্যবসা করিতে পারে অথবা এক কোটি টাকার হীরা-জহরত দিয়া দোকান সাজাইয়া বসিতে পারে, অথবা পাঁচ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বসাইয়া একটি কারখানা চালাইতে পারে; তাহা হইলে সুনীতি অথবা জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠার কোন আদর্শ বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া এই গৃহ সম্পদের উচ্চতম সীমা নির্দ্দেশ করা হইতেছে কেন? আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি এইজন্য যে এই সীমা-নির্দ্দেশের কথা বিহার ব্যতীত অপরাপর প্রদেশেও উত্থাপিত হইয়াছে। শুনা গিয়াছে পশ্চিম বঙ্গেও ঐ ব্যবস্থা করিয়া বৃহৎ গৃহাদি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা হইবে। আজকাল কলকাতায় গৃহ-নির্ম্মাণের খরচ হয় জমির মূল্য না ধরিয়া বর্গ ফুট প্রতি ৫০।৭৫ টাকা। স্বাস্থ্যের নিয়ম অনুসারে একজন মানুষের ঘুমাইবার স্থান অন্তত ১০০০ ঘনফুট হওয়া উচিত। ইহা ব্যতীত খাইবার, লেখাপড়া ও অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্যও মাথাপিছু ১০০০ ঘনফুট স্থান প্রয়োজন হইতে পারে। বারান্দা, সিঁড়ি, স্নানাগার, রন্ধনশালা প্রভৃতিরও আবশ্যক থাকে। অর্থাৎ মাথাপিছু ৩০০০।৪০০০ ঘনফুট বাসস্থান থাকা অন্যায় ত নহেই, তাহা থাকা উচিত। ৬০ টাকা বর্গফুট হিসাবে ৩০০।৪০০ বর্গফুটের মূল্য দাঁড়ায় (জমি বাদে) ১৮০০০ হইতে ২৪০০০ টাকা। আমাদের দেশে কোন কোন পরিবারে অনেক সময় ২০-২৫জন মানুষের আবির্ভাব দেখা যায়। পরিবারে পিতামাতা, বৃদ্ধা পিতামহী, বিধবা ভগিনীও তাহাদের সন্তানাদি এবং সাত পুত্র ও পাঁচকন্যা থাকা এখনও আইন-বিরুদ্ধ করা হয় নাই। পুত্রবধূ ও জামাতা থাকাও রীতি বা নীতি বিরোধের উদাহরণ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে না। সুতরাং ৫।৭ লক্ষ টাকার গৃহ থাকিলে তাহা সমাজ-বিরোধিতার নিদর্শন বলা চলে না। বিশেষ করিয়া যে স্থলে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ৪০০।৫০০ বস্তিবাসীকে তিলে তিলে প্রাণে মারিবার ব্যবস্থা আইন-বিরুদ্ধ নহে।

গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ভাড়াটিয়া রাখা রুশিয়া ও চীন দেশে রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ কিন্তু ঐ সকল দেশে ব্যক্তিগত সম্পদ্ হিসাবে কারখানা, বাস, ট্যাক্সি, গহনার দোকান প্রভৃতি রাখাও কাহারও পক্ষে চলে না। এই দেশের সমাজবাদ কম্যুনিজম নহে। আমাদিগের সোসিয়ালিজম রাষ্ট্রনেতা তথা উচ্চপদস্থ আমলাদিগের ইচ্ছা ও সুবিধা বুঝিয়া চলিয়া থাকে। বৃহৎ বৃহৎ গৃহ প্রভৃতির কিছু কিছু যদি উক্ত সম্পদের অধিকারীদিগকে আইন দেখাইয়া ছিনাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ঐ সকল গৃহসম্পদের মালিকগণ। রাষ্ট্রনেতা ও আমলাগণ নানা ভাবে সুবিধা লাভ করিবে। গৃহ-সম্পদের মূল্য নির্দ্ধারণ, পুরাতন ভাড়াটিয়াদিগকে তুলিয়া দিয়া অথবা তাহাদিগের ভাড়ার পরিমাণ নির্দ্ধারণ, ক্ষতিপূরণের অর্থ-সরকারী তহবিল হইতে উঠাইয়া যাহার প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া প্রভৃতি বহু কার্য্যে আমলাগণ নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। গৃহগুলি অপর বাসিন্দাদিগকে দেওয়াও একটা নূতন কার্য্য হইবে। সরকারী বিভাগের সংখ্যা বাড়িবে। আমলাদিগের সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধনশীল হইবে নিশ্চয়ই। সমাজবাদ কতটা সার্থকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে সে-কথার আলোচনা করাও নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমরা, সকলেই জানি রাষ্ট্রীয়দলের নেতৃবৃন্দ ও আমলাদিগের মিতালি হইতে জনসাধারণ কতটা লাভবাণ হয়।

সমাজবাদের নকশা

সমাজবাদের মূল কথা হইল মানব জীবনকে সমাজ অবলম্বন করিয়া অস্তিত্ব, নানা পথে গতিরক্ষা ও পূর্ণতা লাভ করিতে শিক্ষা দেওয়া। ব্যক্তি যদি সকলক্ষেত্রে শুধু নিজের অস্তিত্ব ও সুবিধার কথাই ভাবিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিতে চায়, শুধু যদি নিজের ক্ষমতার উপরেই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়, সমাজের সহিত তাহার দেনা-পাওনার কথা যদি শুধু ব্যক্তিগত

সুখ-সুবিধার ওজন বুঝিয়াই স্থিরীকৃত হয়; তাহা হইলে মানব জীবন ব্যক্তিকেই কেন্দ্র করিয়া গতিশীল হয়। সমাজবাদ ইহার পরিবর্ত্তে চায় মানুষকে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা পিছনে রাখিয়া সকল মানবের সমবেত অস্তিত্বকেই সম্মুখে স্থাপন করিয়া চলিতে শিখাইতে। মানুষ তাহার নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা ভুলিয়া যদি সমাজের সকল ব্যক্তির ভালমন্দ বিচার করিয়াই চলিতে শিখে তাহা হইলেই সমাজবাদের আদর্শ যথাযথ ভাবে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু মানব জীবন বলিতে আমরা যে প্রাণশক্তির মানবদেহে অবস্থিতির কথা বুঝি, সেই দেহ, সেই প্রাণ ও তাহাদের যুগ্ম অবস্থিতি শুধু ব্যক্তির মধ্যেই থাকিতে পারে। ব্যক্তি ব্যতীত সমাজ বলিয়া কোনও দানবীয় মহাদেহ নাই। বহু ব্যক্তির বহু দেহের সমবেত অবস্থিতি হইতেই সমাজের উৎপত্তি হয় এবং সকল ব্যক্তির প্রাণ-শক্তির মিলিত বিকাশ হইতেই সমাজ-প্রাণ বিকশিত হয়। কিন্তু সমাজের কোন নিজস্ব বিরাট ও সর্ব্বব্যাপ্ত অভাব বোধ অথবা তাহার নিবৃত্তির কথা বাস্তবে উঠিতে পারে না। কারণ ভোগ্য যাহা তাহার ভোগী হইল ব্যক্তি ও ব্যক্তির ভোগের মাধ্যমেই সমাজের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান আসবাব চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতির অভাব দূর হইয়া থাকে।

এরূপ অবস্থায় বহু ব্যক্তি যদি নানা প্রকার অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক দুর্দ্দশার চরমে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে সমাজবাদের নাম করিয়া তাহাদিগের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ উপেক্ষা করিয়া চলা একটা অতিবড় সামাজিক অপরাধ হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা বলেন, সমাজের খাতিরে ব্যক্তিকে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করিয়া সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া চলিতে হইবে, তাঁহারা যেন একথা ভুলিয়া না যান যে সর্ব্বসাধারণও বহু ব্যক্তির সমাবেশ মাত্র এবং সর্ব্বজনের অধিকাংশ অথবা একটা বৃহৎ অংশ যদি অভাব ক্লিষ্টভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সমাজকেও নিজ সমষ্টিগত সুখ-সুবিধা (অর্থাৎ সমাজ-পরিচালকদিগকে) ভুলিয়া সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে। ইহা যদি না করা হয় তাহা হইলে ব্যক্তি যেভাবে সমাজকে রূপদান করিয়া সকল ব্যক্তির উপরে স্থান দিয়াছে, সেই ভাবেই আবার সমাজকে (অর্থাৎ সমাজ-পরিচালকদিগকে) নিজ উচ্চ আসন হইতে অপসৃত করিয়া অপর কোন সংস্থা সৃজনে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইবে।

অর্থাৎ সমাজবাদ যদি জাগ্রত জীবন্তভাবে মানব-গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চায় তাহা হইলে সমাজের সকল ব্যক্তির সুখ-সুবিধার দায়িত্ব সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বহুব্যক্তি সমাজের উৎপন্ন ভোগ্য বস্তুর কোন অংশ আহরণে অক্ষম হয় তাহা হইলে সেইরূপ সামাজিক অর্থনীতির কোন মানবীয় সার্থকতা থাকে না। এবং তাহাই হয়, যদি অসংখ্য ব্যক্তি কোনও ভাবেই সেই অর্থনীতিতে সাক্ষাৎ ও উপার্জ্জনশীল অংশীদার হইতে না পারে। বেকার মানুষ যদি কোনও কাজ না করিয়া উপার্জ্জনহীন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং সমাজ যদি তাহাকে কোনও বেকার-ভাতা না দিয়া শুধু সমাজবাদের তত্ত্বকথা শুনাইয়া পথে পথে পতাকা হস্তে মিছিল বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেয়, তাহা হইলে সেই সমাজবাদ নিঃসন্দেহ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে একটা অতিবড় প্রবঞ্চনার সূচনা করে। আমাদের দেশে যে সোসিয়ালিষ্ট নকশা অনুসরণে রচিত (socialist pattern) সমাজবাদ তাহা পণ্ডিত নেহেরুর প্রাণে শান্তি জাগ্রত করিয়াছিল কিন্তু লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। ক্ষুন্নিবৃত্তি অপেক্ষা বড় কথা হইল আত্মসম্মানবোধের কথা। পরিণত কর্ম্মশক্তি ও শিক্ষা থাকিতেও যদি মানুষ কাজ করিবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহার আত্মমর্য্যাদা যেভাবে আহত হয় তাহার প্রতিকার কোন নকশা দেখাইয়া করা যাইতে পারে না।

এখন কথা হইল ঐ লক্ষ লক্ষ বেকারদিগের কার্য্য ব্যবস্থা কি ভাবে করা সম্ভব? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি

এখনও বলিতেছি যে, এই সমস্যার সমাধান গোল ঘরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসিয়া জল্পনা-কল্পনা দ্বারা সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন, কর্মশক্তি কোথায় কি ভাবে কতটা অব্যবহৃত রহিয়াছে তাহার হিসাব বাস্তব অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্ধারণ করা। সমাজের সকল ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তু কি কি পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে তাহারও একটা হিসাব করা আবশ্যক বিশেষজ্ঞদিগের সহায়তায়। তৎপরে কর্মশক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল উৎপাদন ব্যবস্থা করিয়া এবং সর্ব্বসাধারণকে জীবন নির্ব্বাহের উন্নততর মান অবলম্বন করিয়া নব উৎপাদিত বস্তু সকল ক্রয় করিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রচার ও উদাহরণ দেখাইয়া করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতীয় কর্ম্মশক্তির পূর্ণ ও সফল ব্যবহার সম্পূর্ণ করিতে হইবে। যত্রতত্র অল্প অল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া এবং কিছু কিছু বাছাই করা বেকারদিগকে চাকুরীতে বহাল করিয়া এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে না। কারণ চাকুরী সৃষ্টির ঐতিহ্য চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, নব সৃষ্ট চাকুরী যখন আমলাদিগের পরিকল্পনাজাত হয় তখন তাহা শুধু মাহিনা দেওয়ারই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সেই চাকুরী কোন অর্থনীতি-সমর্থিত উৎপাদন কার্য্যের সূচনা করে না। বেকারগণ যদি মাহিনা লইয়া বাস্তব উৎপাদন ক্ষেত্রে নিষ্কর্ম্মাই থাকিয়া যান তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে কোনও অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান হয় না।

এমন কাজ করিতে হইবে যাহাতে মানুষ বস্তু তৈয়ার করা অথবা জনগণের এরূপ সেবা করিতে নিযুক্ত হইবে, যাহার মানবীয় অর্থনীতিতে কোন মূল্য থাকে। যথা কলিকাতায় ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য সহরে যে সহস্র সহস্র রিকশা চলে সেগুলি উঠাইয়া দিয়া যদি মোটর সাইকেল রিকশার প্রবর্ত্তন করা যায় তাহাতে মানুষের শ্রমলাঘবও হয় এবং আরোহিগণেরও সময়ের অপচয় ততটা হয় না। শুধু যদি ২০০০০।২৫০০০ মোটর সাইকেল রিকশা পশ্চিম বাংলা সরকার চালিত করিতে পারেন তাহাতে লক্ষাধিক যুবকের মাসিক ২০০।৩০০ টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে। যাহারা এখন রিকশা টানিয়া প্রাণপাত করিতেছে তাহারা যাহা রোজগার করে তাহার জন্য কোনও মানুষের প্রাণ দিবার কোন আবশ্যক দেখা যায় না। তাহারা গ্রামে ফিরিয়া গিয়া ক্ষেত খামারে কাজ করিলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারে। কলিকাতায় ও অন্যান্য সহরে সহস্র সহস্র মানুষ ঝুড়ি লইয়া বা পথের ধুলায় মালপত্র সাজাইয়া দোকানদারী করিয়া থাকে। এই সকল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা সভ্যজগতের রীতিবিরুদ্ধ। এইগুলিকে উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোঁটার উপর স্থাপিত "কিয়স্ক" জাতীয় দোকান ঘর নির্মান করিলে ঐরূপ "কিয়স্ক"গুলিতেও বহুলক্ষ মানুষ নিযুক্ত হইতে পারে। এই সকল "কিয়স্ক" হইতে যদি শীতল ও উষ্ণ পানীয় ও নানা প্রকার খাদ্য-বস্তু বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে সাধারণের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইতে পারে। ঐ সকল পানীয় ও খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহের কার্য্যেও বহু নরনারী নিযুক্ত হইতে পারেন। কাগজের বাক্সে ভাত, খিচুড়ী, মাছ, মাংস, রুটি ইত্যাদি সকল খাদ্যই বিক্রয় করা যাইতে পারে এবং যদি সরকারী সাহায্যে ঐ সকল খাদ্য অল্প লাভে বিক্রয় ব্যবস্থা করা যায় তাহাতে যাহারা দূর হইতে কর্মক্ষেত্রে আগমন করেন তাঁহাদের আর কষ্ট করিয়া আনা ঠাণ্ডা খাবার খাইতে হয় না। এই "কিয়স্ক" পশ্চিম বঙ্গের সহরগুলিতে ৫০০০০ বসান সম্ভব এবং তাহাতে ৪।৫ লক্ষ লোকের সংস্থান সম্ভব হইতে পারে।

বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা-বিপত্তি

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বহু স্থলে বৎসরাধিক কাল হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে জনসাধারণের শুধু যে মহা অসুবিধা হইতেছে তাহাই নহে; ইহার ফলে কারখানা বন্ধ রাখিতে হইতেছে, উচ্চ উচ্চ নিবাস স্থল ও দফতরের উঠিবার নামিবার "লিফ্‌ট" বন্ধ হইয়া কার্য্যও জীবনযাত্রা অসম্ভব হইতেছে। কখন কখন "লিফ্‌ট" মধ্যপথে আটকাইয়া থাকিয়া মানুষের জীবন

বিপন্ন হইতেছে। হাসপাতালে রুগীদিগের এমন কি অস্ত্রচিকিৎসাকেন্দ্রে শায়িত রুগীদিগেরও হঠাৎ আলো বন্ধ হওয়ায় বিপদ্‌জনক পরিস্থিতিতে থাকিতে হইতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্য ঔষধ প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্যাদি, যাহা সর্ব্বদাই শীতল কক্ষে অথবা আলমারিতে রাখা হয়, বৈদ্যুতিক যন্ত্র অচল হইয়া যাওয়ায় গরম হইয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দোকানপাট, ভোজন করিবার রেস্তোরাঁ প্রভৃতির বহু লোকসান হইতেছে। এক কথায় যে অসুবিধা ও ক্ষতি বিদ্যুৎ সরবরাহ থামিয়া যাওয়ায় হইতেছে তাহার মূল্য বিচার করিলে পশ্চিম বঙ্গের দৈনিক এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে বলা অত্যুক্তি হইবে না। অর্থাৎ বাৎসরিক প্রায় চার কোটি টাকা। বস্তুত ক্ষতি ইহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইতেছে যদি বলা যায় তাহাও ভুল না হইতে পারে। এই ক্ষতি হইতে বাঁচার ব্যবস্থা করা যদি দশ-বিশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে সে ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত এবং এই জন্য যদি সরকারকে টাকা ধার করিতেও হয় তাহাও করা উচিত। যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে, যেহেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ যথাযথভাবে করা হইতেছে না সেই কারণে, বিদ্যুৎ সরবরাহের যে একাধিপত্যের অধিকার তাহা উঠাইয়া দিয়া সাধারণকে নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন করিয়া সমবায় রীতিতে বণ্টন করিয়া লইতে দেওয়া উচিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে দিলে সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হইবে ও জনসাধারণের কোনও অভিযোগ করিবার কারণ থাকিবে না। যদি বলা হয়, বর্ত্তমানে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে তাহা কি হইবে, তাহার উত্তরে বলা যাইবে যে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত কেন্দ্রগুলি কিছু কিছু বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা রাখিলে যেটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে তাহা ব্যবহার হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া শুনা যায় দশ-সহস্রাধিক গ্রামে নূতন করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করার আবশ্যক আছে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে সরকারী ভাবেও কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কারবারের দ্বারা যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠান যাইতে পারে। গ্রামে বিদ্যুৎ যদি না যায় তাহাতে ততটা ক্ষতি হইবে না যতটা সহরে ও কারখানায় না যাইলে হইয়া থাকে।

কলিকাতার রাজভবন এলাকায় বৈদ্যুতিক আলোকের ঘটা দেখিলে অবশ্য মনে হয় না যে এই নগরীতে কোনও বিদ্যুতের অভাব আছে। অনেক সময় দিবালোকেও এই অঞ্চলে শতাধিক অতি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতে থাকিতে দেখা যায়। তাহাতে মনে হয় যে বিদ্যুতের অভাবটা রাজভবন অঞ্চলে ততটা নাই যতটা সাধারণ মানুষদিগের নিবাস অঞ্চলে আছে। প্রায় প্রত্যহই কলিকাতা ও সহরতলিতে কোথাও না কোথাও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়। ইহা যে কর্ম্মচারীগণ করেন তাঁহাদিগের কার্য্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব হইতেছে কি না দেখিবার জন্য সাধারণের তরফ হইতে বিশেষ পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভি আই পি দিগের সুবিধা বুঝিয়া যদি এই ব্যবস্থা চালিত হইতে থাকে তাহা হইলে কোনওদিনই বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্য্য উপযুক্ত ভাবে সাধিত হইবে না। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের কর্ণধার-দিগকে অন্ধকারে বসিয়া গরমে ঘর্ম্মক্লান্ত হইতে হইলে সমস্যার সমাধান শীঘ্র শীঘ্র হইবে মনে হয়।

ধাপা অঞ্চলে খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম

প্রথমে সরকারী গণ্যমান্যগণ স্থির করেন যে ইডেন গার্ডেনে যেখানে ক্রিকেট খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম আছে সেইখানেই আকার বৃদ্ধি ও সংস্কার করিয়া এমন একটা খেলার মাঠ ও দর্শক বসিবার স্টেডিয়াম নির্ম্মাণ করা হইবে যেখানে ফুটবল ক্রিকেট হকি ত খেলা হইবেই, এমন কি সকল প্রতিযোগিতার খেলাই হইতে পারিবে। টেনিস, সন্তরণ, প্রভৃতি ঐখানেই চলিতে পারিবে। মহামান্য মাতব্বরদিগের কথায় যাঁহারা সর্ব্বদাই "হ্যাঁ" বলিয়া থাকেন তাঁহারা ঘন ঘন শিরঃসঞ্চালন করিয়া স্টেডিয়াম নির্ম্মাণ ঠিক করিয়া দিলেও ক্রমে ক্রমে ক্রিকেটের অভিজ্ঞ সমঝদারগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন

শেষাংশ ৫৭৫ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

সলিল বিশ্বাস

মানব সভ্যতার প্রাভাতিক মুহূর্ত থেকে আর্য-ভূমি ভারতবর্ষে যে জ্ঞান সাধনার সুরু হয়েছিল—তার বিস্তৃতি এবং সার্থক উত্তরণ বিস্ময়কর। প্রাচীন ভারতের মনীষা পার্থিব এবং আধিভৌতিক প্রজ্ঞানকে পেছনে ফেলে পারমার্থিক এবং আত্মজ্ঞানকেই শ্রেয়স্কর বলে অভিহিত করেছিল। ভারত-মনীষার এই চারিত্র ধর্ম থেকে স্বাভাবিক ভাবে মনে হ'তে পারে যে অধ্যাত্ম-বাদের লীলা-নিকেতন ভারতভূমিতে মোক্ষ কামনার অনিবার্য আকুলতায় পরাজ্ঞান সাধনা ছাড়া অন্যান্য জ্ঞান-চর্চা হয়ই নি।—কিন্তু ভারতীয় মনীষার চারিত্র ধর্মের যাথার্থ্য ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়।

বিচিত্র মত, প্রজ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয়ে ভারতীয় মনীষা গড়ে উঠে। সনাতন ভূমি ভারত-বর্ষে পরাজ্ঞান, অপরাজ্ঞান পার্থিব-অপার্থিব, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের বৈজ্ঞানিক স্রোতধারা চিরন্তন ঐক্যতানের অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলেছে। এখানে এই মহা মানবের সাগরতীরেই দেখি দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়।

ভারতীয় দর্শনের পারমার্থিক জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য হচ্ছে যে, দর্শনের অভিজ্ঞা অর্জিত সত্যতা আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা নির্ভর নয়। কিন্তু তবুও, সাহজিক বিশ্বাস, তীব্র যুক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচারের মাঝে প্রত্যক্ষ তথ্যের অভিজ্ঞতার নিরূপণ এবং বৌদ্ধিক ধ্যান সঞ্জাত প্রজ্ঞানকেই দর্শনের উৎস-ভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় আর্য ঋষি বিজ্ঞানকেও বিশেষ 'দর্শন' হিসেবেই দিয়েছেন। ঋষি দৃষ্টিতে দর্শন-বিজ্ঞানের অবশ্য কর্তব্য হলো—মানবিক জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা এবং সমস্যার সমাধান করে সত্যের শাশ্বতী শিখা জ্বালিয়ে দেওয়া। এখানেই দর্শন ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষিতেই, ভারতীয় দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের একটি স্বভাবজ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পারস্পরিক আলোচনায় মাধ্যমেই বিষয়টি সহজ হয়ে ওঠে।

॥ আকাশ জিজ্ঞাসা ॥

আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কাছে আকাশ-রহস্য এক বিস্ময় জিজ্ঞাসা। আকাশের অন্তহীন শূন্যতা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ছেদহীন অনুসন্ধান এখনও নিশ্চিত যাথার্থ্যের প্রামাণ্য স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে নি। অতীত ভারতীয় দার্শনিক মনীষাও আকাশ রহস্য সম্পর্কে নির্বাক ছিল না। ভারতীয় দর্শনের আকাশ-রহস্য অনুশীলন এবং উত্তরণ এক অপূর্ব বিশেষত্ব এবং মৌলিকত্ব বহন করে আনে।

ভারতীয় দর্শনে জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন এবং পারস্পরিক রূপান্তর বিষয়তত্ত্বের স্বীকৃত আলোচনা দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব জিজ্ঞাসার সমাধান অনুসারে বিশ্ব সংগঠনের বহুবিদিত পাঁচটি মৌলিক উপাদান 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল'-ভূতের পর্যায়ে বিভক্ত। 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল' ভূতকে 'তন্মাত্র' এবং 'মহাভূত' নামে নিরূপিত করে 'তন্মাত্র'-কে মহাভূতের সৃজক নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভূত'—শব্দটি জড় বা জীব এবং যে কোন পদার্থের

সংজ্ঞা পরিচায়ক শব্দ—অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন স্বীকার করে আকাশকে জড়ের পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই পর্যায়িক তাৎপর্য গভীরভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

আকাশকে 'তন্মাত্র' রূপে শক্তি হিসাবে এবং পুনর্বার 'মহাভূত' রূপে পদার্থ হিসাবে অভিহিত করে ভারতের দার্শনিক মনীষা এক গভীর মনন ব্যঞ্জনার পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় এ সত্য সফল প্রতিপন্ন হ'য়েছে যে, বিশেষ অবস্থায় আলোক শক্তি জড় কণিকায় অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ রূপে চলার শক্তি অর্জন করতে পারে।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে 'তন্মাত্র আকাশ' সমগ্র তন্মাত্রের আদিরূপ ও সৃজক শক্তি এবং অন্য কোটিতে সমগ্র মহাভূত পরমাণু আকাশ-মহাভূত পরমাণু থেকেই আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক আকাশকে 'সর্বব্যাপী জড়ত্ব ধর্মহীন সত্তা'—এবং 'তন্মাত্রিক আদি বড় কণিকা'র দুটি বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন আবয়বিক অস্তিত্ব রূপে অভিহিত করেছে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর-প্রজ্ঞান অনুসারে আদিম ও অভিব্যক্তিক দু-টি ক্রমিক পরিণামের ভেতর দিয়েই আকাশ অস্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত হয়। আদিম আকাশকে সূক্ষ্ম এবং স্থূলভূতের সম-মাত্রিক সমন্থান আধিকারিক অভিহিত করে, সর্ব্যাপী, অবয়বহীন এবং নির্বিশেষ সত্তা রূপে স্বীকার করা হয়েছে।' বিজ্ঞানভিক্ষু 'দেশ' এবং 'আদিম আকাশ' ধারণার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নেন নি, তাই তিনি আকাশকে 'সমান-দেশকম্ আকাশ স্বরূপম্'—বলেছেন।

ভারতীয় দর্শনের অনন্ত অভিজ্ঞান বেদান্ত ও আকাশের 'আদিম এবং 'তন্মাত্র বা পরিণত' রূপের দু-টি বিভক্ত সত্তাকে 'পুরাণং খম্' এবং 'বায়ুরং খম্'—বলে অভিহিত করেছে। বেদান্তের 'আদিম' এবং 'তন্মাত্র' বা পরিণত আকাশকেই বিজ্ঞানভিক্ষু 'কারণাকাশ' এবং 'কার্যাকাশ' নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আদিম আকাশের পরিবর্তিত পরিণত অবস্থাই হচ্ছে তন্মাত্রিক আকাশ এবং এই প্রজ্ঞন থেকেই জড়ত্বধর্ম বিচ্যুত আদিম আকাশ থেকেই যে জড়ধর্মী আকাশ তন্মাত্রের উৎপত্তি—এই যাথার্থ্য উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞান মনীষা যেমনি আকাশ জিজ্ঞাসায় দ্বন্দ্বহীন মতৈক্যের অভিজ্ঞান অর্জন করতে পারে নি, তেমনি, ভারতীয় দর্শন মনীষার সামগ্রিক অনুশীলনও সাংখ্য পাতঞ্জল এবং যোগবার্ত্তিকের আনুপাতিক নয়। বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ আকাশের পরমাণু অস্তিত্বকে স্বীকার করেন নি। তিনি আকাশকে ক্রিয়াহীন (inert), অবয়বহীন (Non-atomic) সর্বব্যাপী আকাশরূপী শব্দবাহী মাধ্যম হিসাবে অভিহিত করেছেন। ন্যায় এবং বৌদ্ধ দার্শনিকও আকাশ প্রসঙ্গে কণাদ অভিজ্ঞানেরই কম-বেশি পুনরুচ্চারণ করেছেন এবং তাঁরা আকাশকে 'ভূত' অর্থে স্বীকার করেন নি। এমন কি, ভারতীয় জড়বাদী দার্শনিক চার্বাকও আকাশকে 'তন্মাত্র' ও 'মহাভূতের' সৃজক শক্তি হিসাবে ধারণা অর্জনের নিহিত তাৎপর্য ধরে নিতে পারেননি। ন্যায়, বৈশেষিক বৌদ্ধ এবং চার্বাক প্রজ্ঞান অনুসৃতি তাই সাংখ্য, পাতঞ্জল-যোগবার্ত্তিক বিচ্ছিন্ন হয়েই গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় দর্শনের আকাশ জিজ্ঞাসায় এই চিহ্নিত প্রেক্ষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের আকাশ গবেষণার আলোচনায় ভারতীয় দর্শনের বিশেষত্ব ও মৌলিকত্বের অনন্যতার পরিচয় মিলবে।

ভারতীয় দর্শনে আকাশকে প্রথমে 'তন্মাত্র' রূপে শক্তি হিসাবে এবং পুনর্বার মহাভূত রূপে পদার্থ হিসাবে অভিহিত করার ভেতর দিয়েই আকাশ জিজ্ঞাসায় আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা-অর্জিত সত্যই বিকাশ লাভ করছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, বিশেষ অবস্থায় আলোকশক্তি জড়কণিকার (ফোটন) তরঙ্গরূপ। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকরা আলোক শক্তির তরঙ্গরূপে চলাচল প্রসঙ্গে ভারহীন, মিতামিত-অস্তিত্ব সর্বব্যাপী 'Ether'-এর কল্পনা করেছিলেন,

কিন্তু উনিশ শতকেরই আট দশক পেরিয়ে (১৮৮৭) মর্লি (Morley) ও মিকেলসন (Michelson) বিজ্ঞান গবেষণায় 'Ether'-এর অস্তিত্বের প্রমাণ পান নি বলেই 'Ether' কল্পনা বিজ্ঞান জগতে বর্জিত হয়ে ওঠে। 'Ether' অভিজ্ঞান বর্জিত হবার ফলে সন্ধানী বিজ্ঞান-মানস অধিকতর সমস্যা জটিল মুহূর্তে উপনীত হলো এবং সেই জটিলতর সমস্যার সরণিতে বিজ্ঞান মনীষী আইনস্টাইন নতুন এক সমাধান নিয়ে এলেন। আইনস্টাইন' অভিমত থেকে উৎসুক অনুসন্ধিৎসু মন জানতে পারল যে, কথিত 'দেশ' বা 'শূন্য প্রদেশ'—কেবল মাত্র পদার্থশূন্য এবং তাতে কোন শক্তির অস্তিত্বই নেই তাই নয়,—উহাতে তাড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের (Elcetromagnetic field) ধর্মও নেই। শক্তিকণা বা ফোটনরূপে আলোকরশ্মি প্রবিষ্ট না হ'লে উহাতে অভিহিত ক্ষেত্রের ধর্ম অন্তর্ভুত হয় না। শূন্যদেশ সম্পর্কে অর্জিত এই অভিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান আনতে পারল না; পারল না বৈজ্ঞানিক ডিরাকের 'Anti-matter'-এর ধারণাও।

অঙ্ক শাস্ত্রের জটিল সমীকরণ সমাধান থেকে বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁর বিপরীত জড়ধর্মী সত্তার (Anti matter) সিদ্ধান্ত অর্জন করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, আকাশ তো শূন্য নয়-ই দৃশ্যত মহাশূন্য এক প্রকার বিপরীত জড়ধর্মী সত্তার আকর বিশেষ এবং এই 'সত্তার' ধর্ম হচ্ছে জড়ো স্বাভাবিক ধর্মের প্রতিকূল-মুখীন। কিন্তু ডিরাকের এই 'Anti-matter'-এর ধারণা বিজ্ঞান মনীষার মনন-গ্রাহ্য নয়।—বায়ুশূন্য আকাশে কোন জড়বস্তু অনিবার্য ধর্মে মাটির দিকে নেমে এলেও সম-প্রেক্ষিতে কোন 'Anti-matter' উর্ধ্বমুখীন হ'য়ে ছুটবে। শক্তি প্রয়োগের ফলে শক্তিশীল কোন জড়বস্তু শক্তির অভিমুখেই গতিচ্ছন্দী হয়ে ওঠে; কিন্তু ডিরাক ভাষ্য অনুসারে কোন 'Anti-matter' শক্তি প্রয়োগের প্রতিকূল অভিমুখেই চলবে। ডিরাকের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাশূন্যের বিশাল ব্যাপ্তিতে অবিচ্ছিন্ন গতিতে এই 'Anti-matter' থেকেই 'Matter'এর অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে। দুর্বোধ বলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডিরাকের এই 'Anti-matter' তত্ত্বকে উনিশ শতকের 'Ether' কল্পনার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পদার্থ বিজ্ঞানীর জটিল জিজ্ঞাসার মুহূর্তে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী নূতনতর তাত্ত্বিক সমীক্ষা অর্জিত 'সতত সম্প্রসারণশীল বিশ্বের' (Expanding Universe) সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন। মহাশূন্যে ছড়ান নীহারিকা পুঞ্জের বর্ণালী—অনুশীলন এই সত্য প্রকাশ করল যে, নীহারিকা পুঞ্জ অবিরাম অনির্বাদ গতিতে মানুষের দৃষ্টি সীমা পেরিয়ে ছুটে চলছে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই বিশ্ব জগতের অবয়ব অবিচ্ছিন্ন বর্দ্ধিত হয়ে চলছে। এই 'প্রক্রিয়ার' সূত্র হিসাবে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন যে, নীহারিকা এবং নক্ষত্ররাজির অদৃশ্য অন্তরে প্রোটন এবং ইলেকট্রনে গঠিত আদিম জড়কণিকা হাইড্রোজেন পরমাণুর অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে। এই অভিজ্ঞানে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, হাইড্রোজেন, প্রোটন ও ইলেকট্রন শক্তিকণিকা ফোটনের প্রাথমিক মুহূর্ত শূন্য আকাশেই ঘনিয়ে আসছে, সুতরাং 'শূন্য আকাশ'কে আর শুধু মাত্র 'অনন্ত শূন্য" বলে মেনে নেওয়া যায় না, তাকে শক্তি ও জড়কণিকা সৃষ্টির উৎসাধার হিসাবে স্বীকার করতেই হয়। মহাশূন্যের এই 'উৎসাধার' থেকে উৎপন্ন অফুরন্ত শক্তিও জড়কনিকার চাপ সম্প্রসারের কারণেই শূন্যের নীহারিকা পুঞ্জ অবিরাম সীমানা পেরিয়ে ছুটে চলেছে। আকাশ-জিজ্ঞাসায় ভারতীয় দার্শনিক মনীষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান মননার এখানেই মিল খুঁজে পাই।

খৃষ্টপূর্ব ৫ম—৮ম শতাব্দীতে ভারতীয় দার্শনিক মনীষা 'তন্মাত্র' রূপে সূক্ষ্মভাবে এবং মহাভূত হিসাবে স্থূলভাবে ও অন্যান্য তন্মাত্র মহাভূত সমূহের উৎস-কারণ রূপে আকাশকে অভিহিত করে একটি অপূর্ব্ব বিজ্ঞান নির্ভর প্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকের 'Ether' পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক মর্লি ও মিকেলসনের গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্ত এবং নতুন প্রেক্ষিতে আইনষ্টাইনের অর্জিত অভিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে

বৈশেষিক প্রণেতা কণাদ,, ন্যায় ও বৌদ্ধ দর্শনের সত্যই প্রমাণিত হলো ; অন্য প্রেক্ষিতে, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গবেষণায় সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শন অভিমতই প্রতিষ্ঠিত হলো।। বেদান্ত এবং যোগবার্ত্তিকের সিদ্ধান্ত ছুঁয়েই যেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডিরাক বলছেন যে, বিপরীত জড়ধর্মী সত্তায় (Anti-matter) পূর্ণ 'শূন্যতা' (Space) থেকেই অবিচ্ছিন্ন গতিতে জড়ধর্মী কণিকার সৃষ্টি হচ্ছে।

॥ শক্তি-উৎস : দর্শনে এবং বিজ্ঞানে ॥

ভারতীয় দর্শনে জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেল-বন্ধন এবং পারস্পারিক, রূপান্তরণ আলোচনা দেখতে পাই। ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য এবং দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যায় এই সত্যের নিদর্শন মিলবে। ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই পাঁচটি উপাদানের সামগ্রিক অস্তিত্ব রচনার ফলেই দৃশ্যমান বস্তু বিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। প্রাচ্য-দার্শনিক মনীষা-ভাবিত এই 'পঞ্চভূত' তাত্ত্বিক প্রজ্ঞান অনুসারে 'ভূত' সমূহকে 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল' বিভাগে কল্পনা করে উভয়কেই 'তন্মাত্র' ও 'মহাভূত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য এবং দর্শনে 'ভূত' শব্দকে জড় বা জীব অথবা যে কোন পদার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ-মানীয় শব্দ রূপেই নির্ণীত করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে 'তন্মাত্র'কে মহাভূতের সৃজক শক্তি রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

আসন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক সাময়িক প্রেক্ষাপট দেখে নিতে হবে। ভারতীয় সাহিত্য দর্শনে 'বেদ'-কেই প্রাচীনতম রচনা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই 'প্রাচীনতা' কেবল প্রাচ্য ক্ষেত্রেই সমীহ অর্জন করে নি, বিশ্ব মনীষার কাছ থেকেও শ্রদ্ধা স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বেদ সমূহে 'ঋক্'-বেদই প্রাচীনতম কালে গ্রথিত ; সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জাগরণ তারও পূর্ব কাল থেকে। জিজ্ঞাসার এই প্রেক্ষাপট থেকেই ঐতিহাসিকেরা 'বেদ' রচনা কাল নির্ণয় করতে প্রচেষ্টা নিয়েছেন। মনীষী ভারততত্ত্ববিদ্ ম্যাকস্‌ম্যুলার 'ঋক্' বেদের কাল খৃষ্টপূর্ব দশ থেকে বারো শতাব্দী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করেই ম্যাকস্‌ম্যুলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা উন্নত আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় বর্জিত হয়েছে। কিন্তু, ম্যাকস্‌ম্যুলারের এই অভিমত 'সংস্কারের' মত কিছু পাশ্চাত্য মননাকে সংক্রামিত করেছে বলেই তাঁরা ঋক্-বেদকে অধিকতর প্রাচীন কালের বলে আর মেনে নিতে পারছেন না। শ্রদ্ধেয় জর্মান মনীষী ভিনটারনিট্‌স্ খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে শুরু করে খৃষ্টপূর্ব আট শতক অবধি বৈদিক যুগের সীমা রেখা টেনেছেন। কিন্তু তাঁর এই কাল নির্ণয়ও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নির্ভর নয়। প্রাচ্য মনীষী তিলক তাঁর 'গীতা রহস্যে'র প্রসঙ্গিত আলোচনায়, বিস্তৃত প্রেক্ষিতে, চার হাজার পাঁচ শত বছরের কম নয় বলেই ঋক্ বেদের কালের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমীকরণ ফলশ্রুতির মতন যদিও এই কাল-সীমা বিদগ্ধজনের মতৈক্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবুও, মনীষী তিলকের এই অভিমতকেই অধিকতর ক্ষেত্রেই মেনে নেওয়া হয় এবং এই অনুসারে বেদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক এবং উপনিষদের রচনা কাল খৃষ্টপূর্ব ষোল শতক অবধি সীমিত হয়। ভাবতে বিস্ময় লাগে, এই সুপ্রাচীন আরণ্যক এবং উপনিষদের যুগেই যুগাশ্রয়ী মনীষা এই 'পঞ্চভূততত্ত্ব' অর্জন করেছিল।

এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, উপনিষদেই ভারতীয় দর্শন মননার পরম প্রকাশ ব্যঞ্জিত হয়েছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থনায় একশো আট খানা উপনিষদের কথা জানতে পারলেও এগার খানা উপনিষদই বহুশ্রুত, এবং সমালোচকরা বলেন যে, মায়াবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র এবং গীতাভাষ্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জিত রূপে এই এগার খানি উপনিষদও 'লিখে' ছিলেন। এই উপনিষদ তালিকার 'দশম' তৈত্তেরীয় উপনিষদে 'পঞ্চভূততত্ত্বের' বিশ্লেষিত আলোচনা দেখতে পাই। একটি স্বার্থক উদাহরণ তুলে নিলে আমাদের আলোচনা আরও পরিচ্ছন্ন হবে :

১. তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।

আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ুর মত, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবী থেকে ওষধির উৎপত্তি হয়েছে।—এই ওষধি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়ে পুরুষের সৃষ্টি করেছে।

মৈত্রী এবং পৈঙ্গল উপনিষদও 'পঞ্চভূততত্ত্বের' আলোচনা করেছে। আমরা একটি উদাহরণ তুলে নিতে পারি :

১. অথ পঞ্চমহাভূতানি ভূতশব্দেনোচ্যতে; পঞ্চতন্মাত্রা ভূতশব্দেনোচ্যতে।

পাঁচটি ভূত মহাভূত শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়;—এবং,

পাঁচটি তন্মাত্রা ভূত শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়।

উপনিষদ-উত্তর দিনে সাংখ্য দর্শনও এই তত্ত্বের অন্বয়ের আলোচনা করেছে। এই প্রসঙ্গে সে আলোচনা অনিবার্য স্মরণ-সাপেক্ষ বলে মনে করি।

কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শনের রচনা কাল সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছন যায় নি। বিজ্ঞানভিক্ষুর 'সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য' এবং মধ্বাচার্য কৃত 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' সাংখ্যের উল্লেখ থেকে এ কথা অনুমান করা যায় যে, চোদ্দ শতকের পরে কিছুতেই 'সাংখ্য' রচিত হ'তে পারে না। আচার্য শংকরও সাংখ্য-মত খণ্ডন করেছিলেন, সুতরাং, সাংখ্যের কালপ্রাচীনত্বে কোন সংশয় উচ্চারণ করা যায় না।

সাংখ্য অনুসারে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—গুণের সামগ্রিক সাম্য থেকেই প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটে। এই প্রকৃতি দু'ভাবে রূপান্তরিত হবার ফলে প্রথম পর্যায়ে 'মহৎ' বা 'মনীষা' (intelligence) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 'অহংকারের' সৃষ্টি করে। এই 'অহংকার' থেকেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ 'তন্মাত্রে'-র সৃষ্টি,—এবং এই পাঁচ 'তন্মাত্র' থেকেই মহাভূতের বা বস্তুবিশ্বের সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গ—স্বার্থক উদাহরণ তুলে নিচ্ছি :—

১. সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাং প্রকৃতিঃ; প্রকৃতের্মহান্; মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং—তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি—, ইত্যাদি।

ভারতীয় দর্শন যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ-'তন্মাত্র'-কে পাঁচটি সূক্ষ্মভূত নামে অভিহিত করেছে, তেমনি, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীকে পাঁচটি মহাভূত রূপে চিহ্নিত করেছে। ভারতীয় দর্শন মনীষা স্থূলভূতকে জড় পরমাণুর সাম্য-প্রজ্ঞা হিসেবে মেনে নিয়ে সূক্ষ্মভূতকে তাদের অন্তর্নিহিত গুণাত্মিক শক্তি রূপে অভিহিত করেছে। অতএব, 'তন্মাত্র হ'তে মহাভূতের উৎসারণ ঘটছে'—এই উচ্চারণ নিহিত স্বচ্ছ অর্থ হচ্ছে যে, শক্তি থেকেই জড়ের উৎপত্তি অনিবার্য হয়ে উঠছে। ভারতীয় দর্শন এই প্রজ্ঞান অনুসারেই জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন রচনা করেছে।

কিন্তু আরণ্যক থেকে সাংখ্য অবধি ক্রমানুসৃত এই 'পঞ্চভূততত্ত্ববাদ' উত্তর দিনে বৈশেষিক, ন্যায়, চার্বাক এবং বৌদ্ধ দর্শনে এক নতুন বাঁক নিয়েছে। কণাদ, গৌতম, চার্বাক এবং বৌদ্ধদার্শনিক আকাশকে 'ভূত' বিশেষ রূপে গণনা করেন নি। তাঁরা 'ব্যোম' বর্জিত ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ' এই চারটি মহাভূত থেকে দৃশ্যমান বস্তু বিশ্বের আবির্ভাব কল্পনা করেছেন। তাঁদের প্রবর্তিত এই নতুন ভাবনাকে 'চতুর্ভূততত্ত্ব' নামে অভিহিত করা যায়। ভারতীয় দার্শনিকদের এই 'চতুর্ভূততত্ত্ব' প্রসঙ্গে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের গ্রীস্-মনীষী 'এম্পিডোক্লিসের' কথাও চলে আসে, সমকালীন গ্রীসে তিনিও 'চতুর্ভূততত্ত্বের' প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর রেখে যাওয়া বাঞ্ছিত বলে মনে করছি।

আধুনিক ঐতিহাসিক অনুশীলনে ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য দর্শনের প্রাচীনত্ব ম্যাক্স্মুলার-নির্ণয় কালকে পেরিয়ে গেলেও যেমন কিছু পশ্চিম দেশের পণ্ডিত-সমালোচকেরা সংস্কার বশতঃ তাকে মানতে পারছেন না

তেমনি অনেক পণ্ডিতও গ্রীস-মনীষী 'এম্‌পিডোক্লিস'-কে সামনে রেখে বলছেন যে, ভারতীয় দার্শনিক মনীষার এই মহাভূততত্ত্ব গ্রীস থেকেই সমাহৃত। কিন্তু, এই বিশ্বাস এবং মন্তব্যের মধ্যে অন্ধ আবেগ এবং অকারণ মানসিক অক্ষমতা ছাড়া কোন ঐতিহাসিক তথ্যের সত্য নিহিত নেই। শ্রদ্ধেয় মনীষী এমপিডোক্লিস্‌ খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে তাঁর অনুশীলন অর্জিত মতবাদ প্রবর্তন করেন; কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক মনীষা খৃষ্টপূর্ব ষোল শতকের পরেই 'মহাভূততত্ত্বের' ঘোষণা করেন। সাংখ্য-উত্তর দিনের দার্শনিক কণাদ, গৌতম, চার্বাক এবং বৌদ্ধ দার্শনিক 'তন্মাত্র-আকাশ'-কে তন্মাত্র ও মহাভূতের সৃজক শক্তি হিসাবে কল্পনা করার প্রজ্ঞান-গভীরতাকে ছুঁয়ে যেতে পারেন নি; এমন কি সমকালীন গ্রীস-দার্শনিকও নয়; কিন্তু চৈনিক দার্শনিক সু-চিং দু' হাজার দু'শ বছর আগেই এই 'পঞ্চভূত-তত্ত্বের' মৌলিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিল্‌ছে। মনে হয় চার হাজার পাঁচ শ' বছর আগে উত্তর দার্শনিক মনীষার প্রতিফলন থেকে চীন-মনীষীও দূরাস্থিত ছিলেন না।

ভারতীয় দর্শনের জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন কল্পনার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন অর্জিত সমর্থন নিয়ে প্রথম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এগিয়ে এলেন। আধুনিক বিজ্ঞান জগতে তিনিই প্রথম জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্নতা এবং তাদের পারস্পরিক রূপান্তরণের তত্ত্ব প্রচার করেন। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় জানতে পারা গেল যে, বিশেষ অবস্থায় তরঙ্গধর্মী শক্তি কণাধর্মী জড়ের মত এবং কণিকাধর্মী জড় তরঙ্গধর্মী শক্তির সদৃশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অনুশীলনের ভেতর দিয়ে এই সত্য অর্জিত হ'লো যে, জড়ের বিনশনের ফলেই শক্তি উৎপত্তির উৎস খুলে যায়। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকরা সার্থকভাবে শক্তি কণিকা বা গামারশ্মি থেকে (X-rays) ইলেকট্রন ও পজিট্রন যুগ্ম জড়কণিকা সৃষ্টির সফল দক্ষতা অর্জন করলেন। আইনস্টাইন প্রবর্তিত মতবাদ অনুসারে, জড় ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের সমীকরণ এই সত্যই প্রকাশ করে যে, ন্যূনতম ক্ষুদ্র অনুমিত জড়কণিকা বিপুল শক্তি রাশির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত ও সক্রিয় হ'তে পারে। পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে এই সমীকরণ অর্জিত সত্যের নিদর্শন মিলল। কিন্তু, জড় কণিকা থেকে বিপুল শক্তিরাশির উৎপন্ন-কৌশল বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হ'লেও শক্তি থেকে বিপুল পারমিক জড়সৃষ্টির সম্ভাব্য তোরণ এখনও আধুনিক বিজ্ঞান মনীষার সীমায়ত্ত হ'য়ে ওঠেনি।

॥ পদার্থের মৌলিকত্ব জিজ্ঞাসা : দর্শনে ও বিজ্ঞানে ॥

ভারতীয় দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রান্ত থেকে পদার্থের মৌলিকত্ব জিজ্ঞাসা এসে পড়ছে এবং এই জন্যেই এসে পড়ছে যে, অনেক অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রামাণিক সত্যের পাথেয় নিয়ে ভারতীয় দর্শন মনীষাকে সমালোচনার উপাদান হিসাবে নির্ণয় করা হ'চ্ছে। পদার্থের যৌগিক ও মৌলিক স্বরূপ-নির্ণীত হবার পর এ প্রশ্ন আরও অন্বিষ্ট হয়ে আসে।

মানুষ ইতিহাসের আদিম ঊষা মুহূর্ত থেকে দৃশ্যমান জগতের বস্তুরাশির মধ্যে একটি ক্রমিক শৃঙ্খলা-আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছে। সেই পুরোনো জিজ্ঞাসা আর উত্তর সন্ধানের অনিবার্য প্রয়াস আর উত্তরণকে পাথেয় করেই আধুনিক বিজ্ঞান সুসম-পরিণতি অর্জন করেছে। আধুণিক বিজ্ঞানের এই উজ্জ্বল মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা সভ্যতার ইতিহাসের আদিম মুহূর্তের ভারতীয় দার্শনিকদের বিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রতিভার উত্তরণ দেখে বিস্মিত হই।

ভারতীয় দার্শনিক বিজ্ঞান মানস পাঁচটি বিশিষ্ট উপাদানে দৃশ্যমান বস্তু জগৎ নির্ণীত হয়েছে বলে বর্ণনা করলেও 'মাটি, জল ও বাতাস'-কেই বস্তু-বিশ্বের 'মূল' উপাদান-পদার্থ রূপে গণ্য করে আসছে; কিন্তু কখনও তাদের 'মৌলিক' পদার্থ রূপে অভিহিত করে নি। কারণ জল, মাটি এবং বাতাস এই বস্তু-জগতের উপাদান জেনেই তাঁরা জানার অবসান মেনে নেন নি। তাই, বিশ্ব নির্মিতির গভীরতর সত্য সন্ধান এবং দৃশ্যত পদার্থের

গভীরে নিহিত মৌল শক্তি-অস্তিত্বের অনুশীলন করেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক কণাদ তাঁর পরমাণু 'তত্ত্বের' রচনা করেছিলেন। কণাদের পরমাণুতত্ত্বের প্রসঙ্গেই গ্রীক-মনীষী ডিমোক্রিটাসের'পদার্থের মৌলিক মৌলিক কণা পরমাণুর কল্পনা'র কথা মনে আসে।

ভারতীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নির্বাচিত বিশ্ব নির্মিতির উপাদানগুলিকে 'মূল' বলে গণ্য করলেও 'মৌলিক' বলে অভিহিত করেন নি। এদিক থেকে তাঁদের বিজ্ঞান-গবেষণার আশ্চর্য মৌলিকতা অনুমান করা যায়। বৈশেষিক দার্শনিক কণাদের কথানুসৃতিতে আমরা 'মূল' পদার্থকে কোন 'গঠিত পদার্থের-উপাদান-কারণ' বলতে পারি, কিন্তু 'মৌলিক' পদার্থকে কখন-ই 'উপাদান কারণ' বলতে পারি নে। 'মৌলিক' পদার্থ স্ব-স্বভাবে অবিচ্ছিন্ন এবং অবিভাজ্য। 'পানীয় চা এবং সোডা ওয়াটারের' 'মূল' উপাদান 'গুঁড়ো চা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস;' কিন্তু, সোনা, ব্রোমিন এবং নাইট্রোজেন স্ব-স্বভাবে অবিচ্ছিন্ন-অবিভাজ্য 'মৌলিক'-পদার্থ। 'মূল'-পদার্থ কখনও কখনও আনুষঙ্গিক উপাদান সহযোগে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু 'মৌলিক' পদার্থ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অথচ একটি মাত্র উপাদানে গঠিত এবং যা থেকে আর কোন উপায়েই দ্বিতীয় ধর্ম বিশিষ্ট কোন উপাদান-ই বের করা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান, তাই পদার্থ শ্রেণীকে শুধু মাত্র 'পদার্থ' বা 'Matter' বলে মেনে নিতে পারে নি, পদার্থ শ্রেণীকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। বিশুদ্ধ 'পদার্থ'কে মৌলিক পদার্থ বা 'Element' বলা হয়েছে এবং অ-বিশুদ্ধ পদার্থকে যৌগিক পদার্থ বা 'Matter' বলা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, যৌগিক পদার্থকে আবার পরীক্ষা করে 'রাসায়নিক যৌগ' এবং 'যান্ত্রিক মিশ্রণ' তথা 'কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড (Chemical Compound) এবং 'মেকানিকাল মিক্সচার্' (Mechanical Mixture) বলা হ'য়েছে। ভারতীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা 'মূল' এবং 'মৌলিক' শব্দ দু'টির এবং প্রয়োগিক, ব্যবহারিক এবং শাব্দার্থিক আকাশ-মাটি ব্যবধান বিস্মৃত হন নি; তাঁদের এই অ-বিস্মৃতি আজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সত্যের পরিণতি অর্জন করেছে।

খৃষ্টপূর্বাব্দের ভারতীয় দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের এই 'পদার্থ বিশ্বাস' কিন্তু খৃষ্টাব্দ-উত্তর পশ্চিমী বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন নি। আঠার শতকের শেষার্দ্ধ অবধি তাঁরা এই পদার্থগুলিকে মৌলিক-পদার্থের মর্যাদায় অভিহিত করে এসেছেন। কিন্তু, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়্যর এবং ক্যাভেণ্ডিশের এবং উত্তর দিনে ল্যাভয়সিয়্যরের একক সার্থক আবিষ্কারের ফলে জল ও বাতাসের যৌগিকত্ব প্রমাণিত হ'লে অনুমানের মোহ মুক্তি ঘটে। জল ও বাতাসের সত্য আবিষ্কারের পরে 'মাটি'- রহস্যও আর অজ্ঞাত থাকে নি, রহস্যের অন্তরাল থেকে 'সিলিকন' ও 'এ্যালুমিনিয়মের' স্বরূপ-সত্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে।

সভ্যতার আদিম উষা মুহূর্ত থেকে পৃথিবীর মানুষ গঠিত পৃথিবীর উপাদানকে জানার অন্তহীন জিজ্ঞাসা নিয়ে আসছে। গত দু'শতকেরও বেশি সময়ের বিজ্ঞান সাধনায় জানা গিয়েছিল যে, অতীত কল্পিত পাঁচটি মূল উপাদানে নয়, বিরানব্বুই টি মৌলিক উপাদান-ই এই বস্তুরাশির বিচিত্র সমাজ গড়ে তুলেছে। কিন্তু বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেল যে, অজস্র বস্তু-রাশির এই পৃথিবী মাত্র দ্বি-বিধ প্রকৃতির বৈদ্যুতিক পদার্থে গঠিত হয়েছে।—এর পরেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদার্থের স্বরূপ অন্বেষণে ছেদ টানে নি। অনুসন্ধানে প্রমাণিত হ'লো যে, পদার্থের অন্তিম প্রকৃতি ও পরিচয় মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমানায় ধরে নেওয়া যায় না। এই নূতনতর অভিজ্ঞাত পরিচয় বৈজ্ঞানিকের কাছে কোন্ নতুন দিগন্ত রহস্য বহন করে আনবে বিজ্ঞান তা' জানে না।

॥ দেশকালের অনুমিতি : সামগ্রিক অনুশীলন॥

প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক সত্যে এ কথা অনিবার্য স্বীকার্য যে, দেশকালের প্রকৃত অস্তিত্ব মেনে নিয়েই বিজ্ঞান সাধকেরা জড় বিজ্ঞানের বিপুল বিচিত্র সৌধ নির্মাণ করে তুলেছেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই দেশকালের

কোন বাস্তব সত্তা নেই ; এই সত্তা 'অস্তিত্বে'র প্রজ্ঞান বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধি ব্যাপ্তিত, আনুভূতিক বা নির্বিকল্প প্রজ্ঞা (Intuitionality) উৎসারিত। এই প্রজ্ঞান অনুপস্থিত বিজ্ঞান অনুশীলনের উত্তরণ বক্তাব্য ছিল না। বিজ্ঞান সাধকেরা তাঁদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি অর্জিত তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে দেশ-কালের পটতলে সাজিয়ে এই দ্বৈত যোজনার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। এই পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মিতির ফলে এই একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং দেশ-কালের অনুমিত 'প্রজ্ঞান' বিজ্ঞান সাধনায় অপরিহার্য। ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাধনার এই অপরিহার্য প্রজ্ঞানকেই অঙ্গীকার করেই গড়ে উঠেছে।

'ভারতীয় দর্শন বর্ণিত 'তন্মাত্র' বা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকৃত 'অবপরমাণু' (infraatomic particle) যদি দেশ-কাল ও কার্যকারণ সূত্রের প্রেক্ষিতে স্থাপিত না হয় তা' হ'লে এই 'তন্মাত্র' বা 'অবপরমাণু' আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে না—পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্যের এই উচ্চারণ মুহূর্তেই বুঝে নিতে পারি যে, দেশ-কাল ও কার্যকারণের সীমার মধ্যে ধরতে না পারলে কোন জড়কণিকার ধারণাই আমরা অর্জন করতে পারব না। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার প্রশ্নে একটি সার্থক উদাহরণ তুলে নিতে পারি :—

১. 'অত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্ত ধর্মকেষু দেশকাল-নিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু—।'

'দেশ' অবচ্ছিন্ন (Position in space), 'কাল' অবচ্ছিন্ন (Position in the time series) এবং 'নিমিত্ত' অবচ্ছিন্ন (Position in the causal series) অবস্থায় সূক্ষ্মভূত কণিকার অভিব্যক্তি ব্যাপ্তিত হয়।

'দেশ-কাল' সম্পর্কে এই অনিবার্য উচ্চারণ সত্ত্বেও পাতঞ্জল দর্শন তার কোন স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা স্বীকার করে নি,—তাকে 'সবিচারা নির্বিকল্প প্রজ্ঞা' (Empirical intuitionality) রূপে অভিহিত করেছে। সাংখ্য দর্শনেও পাতঞ্জল অনুসরণেরই অনুরণন শুনতে পাই। কিন্তু ন্যায়, বৈশেষিক এবং চরক সংহিতায় এই মতানুসৃতির প্রতিকূল প্রতিভাস দেখতে পাই। ন্যায় এবং বৈশেষিক—'দেশকালের' স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা স্বীকার করেছে এবং চরক সংহিতা তাকে দ্রব্য সংজ্ঞাবাচক অর্থে অভিহিত করেছে। চরকভাষ্যে—

১. খাদীন্যাত্মা মনঃ কালোদিশশ্চ দ্রব্য সংগ্রহঃ।'
—পাঁচটি মহাভূত, আত্মা এবং মন, দেশ-কাল—সবই দ্রব্যের সদর্থ বাচক।

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসেও দেশ-কাল সম্পর্কে পারস্পরিক বিরোধী আলোচনাও দেখতে পাই যদিও বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, 'দেশ-কাল' বিজ্ঞান সাধকের বুদ্ধি ব্যাপ্তিত অস্তিত্বহীন সত্তা'—তবুও বৈজ্ঞানিক ডিরাক বলছেন যে, দেশ (space) হচ্ছে এক বিপরীত জড়ধর্মী সত্তায় পরিপূর্ণ এবং তা থেকেই অবিরাম অবিচ্ছিন্ন গতিতে জড়ধর্মী কণিকাপুঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে। ডিরাকের এই 'Anti-matter' তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

ভারতীয় দর্শনে 'দেশ'-এর দু'টি অস্বীকার্য অঙ্গ—'ব্যাপ্তি' ও 'দিকের' পর্যালোচনাও হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন সর্বব্যাপ্ত মহাশূন্যের মধ্যে নিয়মিত নির্ধারিত আকারের পদার্থ সংস্থানের পারস্পরিক যোগ থেকেই 'দিকধর্মী' দেশের ধারণার উৎসারণ ঘটেছে। যদিও 'দিক' হিসাবে দেশের কোন ব্যবহারিক একক নেই, তবুও 'ব্যাপ্তি' হিসাবে তার এককের ব্যবহার করা যায়। সংঘটন পরম্পরার শৃঙ্খলা বোধ সঞ্জাত 'ক্ষণ' বা 'মুহূর্ত'-কে কাল পরিমাপক 'একক' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

॥ কার্যকারণবাদ : প্রেক্ষিতের দর্শন ও বিজ্ঞান ॥

সাহিত্যে-দর্শনে রাজনীতি-সমাজনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান- শিল্পে এবং সঙ্গীতে আমরা সৃষ্টির এক অন্তহীন সুষম প্রবাহের ছন্দ শুনে চলেছি। আমাদের কাল-ক্রমিক মুহূর্ত মননার এবং ভাবনার বিচিত্র আনুভূতিক ব্যঞ্জনাই সক্রিয় অস্তিত্বের উপলব্ধি বহন

করে আনছে এবং এই সক্রিয় অস্তিত্বের প্রবণতাই জীবন ছন্দ প্রবাহের অন্তহীনতা প্রমূর্ত করে তুলছে। ভারতীয় জীবন বেদের অখণ্ড বিশ্বাস, সক্রিয় অস্তিত্বের এই অন্তহীন প্রবাহমানতা প্রাণী জগতের সীমানা পেরিয়েও সক্রিয় গতিশীল রয়েছে এবং তাই-ই সৃষ্টির অস্তিত্বের অন্তশীলা চিরন্তনী শক্তি। জীবন সত্যের এই প্রজ্ঞানিক বিশ্বাস থেকেই দার্শনিক 'কার্যকারণবাদ' অর্জন করেছেন।

যে উপাদান কিছু সৃষ্টি করে তাই-ই সৃষ্ট বিষয়ের 'কারন' এবং এই অর্থে 'কারণ-ই' সকল কাজ এবং সৃষ্টি-প্রবাহের মৌলিক উপাদান। কাজ উৎপন্ন হবার পূর্বে 'অসৎ', 'কারণ'কে আশ্রয় করেই তাকে 'সৎ'এর অস্তিত্ব অর্জন করে নিতে হয়।

এই মুহূর্তে যা' ঘটেছে তার 'কারণ' হ'লো সংঘটিত ঘটনার প্রাক্ মুহূর্তিক ঘটনা এবং বর্তমান ঘটনাই তার অব্যবহিত পরবর্তীর 'কারণ', এই তত্ত্বকেই, দর্শনে এবং বিজ্ঞানে, 'কার্যকারণবাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নিয়মকেই, কোথাও কোথাও 'হেতুবাদ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দার্শনিক কপিল 'কার্যকারণ-বাদ' বা 'হেতুবাদ'কে স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্য দার্শনিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অন্তর্লীন আলোচনা করতে গিয়ে শক্তির সংরক্ষণ এবং রূপান্তরণ নিয়ম (Law of Conservation and transformation of energy) প্রসঙ্গে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গিত আলোচনার অন্তিম অভিমত এই যে, বিশ্ব জগতের ক্রমায়ত অভিব্যক্তি মুহূর্ত মাত্রও থেমে যেতে পারে না, কারণ, তার অর্থ হ'লো ছন্দিত জীবন ও গতির নিঃশেষ বিনশন। দর্শনের এই জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা কেবল দার্শনিকের বিচিত্র সৃষ্টির উপাদানই হয়ে ওঠে নি, রবীন্দ্রনাথের জীবন বাণীর অন্তর্লীনছন্দ-সুরেরও রচনা করেছে। কিন্তু সৃষ্টির এই ক্রমাভিব্যক্তি মুহূর্ত মাত্র না থামলেও এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার উৎস শক্তির পরিমাণ অব্যাহত থাকে বলেই কার্য সমষ্টির শক্তি কারণ সমূহের মধ্যে নিহিত থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য এবং ব্যাসভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্বচ্ছ আলোচনা করেছে।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনে মৌলিক পার্থক্য বেশি নেই, যেমন নেই ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনেও। সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিশ্ববীক্ষণের প্রেক্ষিতে সাংখ্য পাতঞ্জলের সাদৃশ্যতাই সহজ দৃষ্ট, কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকের সঙ্গে তেমন কোন মিলে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাংখ্য ভাষ্যের হেতু বা কার্যকারণবাদ তাই প্রায় বৈশেষিকে ভিন্নায়ত আলোচনার প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছে। ন্যায় বৈশেষিক 'কার্য' ও 'কারণের বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করেছে।

যদিও কণাদ এবং গৌতম 'তিন' কারণের উল্লেখ এবং আলোচনা করেছেন, তবুও ভারতীয় দর্শনে উপাদান বা সমবায়ী (Material Causes) এবং নিমিত্ত কারণ (Efficient Causes)—এই 'দুই' কারণেরই সাধারণ স্বীকৃত আলোচনাই দেখতে পাই। উৎপন্ন-পূর্ব কার্য উপাদান বা সমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণের সক্রিয় সমন্বয়ের ভেতর দিয়েই দৃশ্য অস্তিত্বের রূপান্তর অর্জন করে। কলে এবং কারখানায় অবিরাম সুতো থেকে কাপড় এবং তিল থেকে তেল উৎপাদিত হ'চ্ছে। এখানে, সুতো এবং তিল উপাদান বা সমবায়ী কারণ,—(Material Causes) তিল কাপড় এবং যে সাহায্যকারী শক্তির সাহচর্যে সুতো এবং এবং তেলে রূপান্তর লাভ করল—সেই সহকারী শক্তি-ই নিমিত্তকারণ (Efficient Causes) নামে অভিহিত। উপাদান কারণকে কার্যে সক্রিয় করে তোলাবার জন্যে নিমিত্ত কারণের অনিবার্য প্রয়োজন, নিমিত্ত কারণ বিচ্যুত উপাদান কারণ কখনই কার্যের উৎপত্তি আনতে পারে না। 'কারণ' প্রসঙ্গিত আলোচনায় পাতঞ্জল একটি অপূর্ব উদাহরণের যোজনা এনেছে।

এ বিষয়ে নির্ভয় নির্ভর উক্তি করা যায় যে, প্রাকৃতিক জগতের সুষম নিয়মের অস্তিত্বের (Law of uniformity of Nature) প্রত্যয় থেকেই এই কার্য-

কারণবাদ উঠে এসেছে। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন এই প্রত্যয়ের গভীরে নিহিত রয়েছে। এই তত্ত্বের অস্বীকৃতি কেবল দর্শনের জগতেই অচলতা বহন করে আনবে না,—বিজ্ঞানকেও স্থাবর (stagnant) করে তুলবে। এই অনস্বীকার্য প্রজ্ঞান থেকেই বিজ্ঞানও 'কার্য-কারণতত্ত্ব' বা হেতুবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ধারণায় মৌলিক ও যৌগিক বস্তুপুঞ্জে গঠিত দৃশ্যমান এই বিশাল পৃথিবী একটি যন্ত্রের রূপ অর্জন করেছে এবং যার শরীর ঘিরে চাকা, দণ্ড, কাঁটা ও তারের রচিত একটি জটিল জাল জড়িয়ে রয়েছে। এই উপাদানগুচ্ছের প্রত্যেকটি উপাদানের গতি অন্ত-টিতে সঞ্চালিত হয়ে তাকে গতিশীল করে যে চিরন্তন সম-ক্রমিক ছেদহীন গতিশীলতা বা গতি-সন্ততির (Continuity of motion) সৃষ্টি করছে—তার ফলেই বিশাল বিশ্বযন্ত্রটি অবিরাম চলিষ্ণু হ'য়ে উঠছে। বিজ্ঞানের একটি সনাতন প্রত্যয় রূপে গতি-সন্ততির ধারণা অভিহিত হয়েছে। এই ধারণা অনুসারেই আমরা বুঝতে পারি যে, গতিশীল জড়বস্তু ছেদহীন গতিপথে অবিরাম ছুটে চলে, কোথাও যতি মাত্র চিহ্নও রেখে যায় না। কালের গতিধারাও এই নিরবচ্ছিন্নতার অস্তিত্বই বহন করে আনে।

মানবিক মননা, দর্শন ও বিজ্ঞানের শীলিত প্রজ্ঞান থেকে এই বিশ্বাস অর্জন করেছে যে, এ মুহূর্তে যা ঘটছে তা' পূর্বর্তীরই ফল এবং বর্তমান সংঘটনই অব্যবহিত পরবর্তীর প্রতিফলন সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানের এই অর্জিত প্রত্যয়ই বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদ বা হেতুবাদ এবং এই 'বাদ'-(Ism) নির্ভর করেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমানে চলছে। কার্যকারণের নিয়মের প্রেক্ষিতে জড় ও শক্তি থেকে বিজ্ঞান সাধকেরা এই বিশ্ব জগতের উদাহরণ রচনা করেছেন; সুতরাং, ঘটনার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই কার্যকারণের নিয়মের বাঁধনে বাঁধা, তার ব্যতিক্রমের কোন পথই আর খোলা নেই। কার্যকারণ নীতির এই অনতিক্রম্য শাশ্বত ধারণা থেকেই বিজ্ঞানের নৈশ্চিত্যবাদ (Determinism) অর্জিত হয়েছে। দেখেছি, কিছু সমালোচক এই সাধনা এব অদৃষ্টবাদকে অবিচ্ছিন্ন সত্তার মর্যাদায় অভিহি করেছেন; কিন্তু তা যেমন অযৌক্তিক তেমি অবাঞ্ছিত।

কিন্তু সাম্প্রতিক দিনে কিছু বৈজ্ঞানিকের ধারণ হচ্ছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে ক্ষে বিশেষে কার্যকারণবাদের বন্ধন খানিকটা শ্লথ হ এসেছে। এই ধারণার পরিণাম থেকেই একটি নতু আলোচনা উঠে আসছে।

॥ শঙ্কর এবং হাইসেনবার্গ : নতুন দিগন্ত ॥

দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস আচার্য শঙ্কর এব হাইসেনবার্গ—দুটি স্বর্ণ স্বাক্ষর নাম। মনীষী আচা এবং বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ পূর্বানুসৃত দর্শন বিজ্ঞানকে এক নূতনতর প্রত্যয়ের অভিধায় কালান্তকার করে তুলেছেন। দার্শনিক মননায় আচার্য শঙ্করে 'মায়াবাদ' এবং বিজ্ঞান সাধনায় বৈজ্ঞানিক হাইসে বার্গের 'অনৈশ্চিত্যবাদ (Principle of Uncertainty)- দর্শন এবং বিজ্ঞানকে এক নতুনতর বাঁক-ক্রম এব প্রত্যয় প্রজ্ঞানে উপনীত করেছে। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি ক্রমিক আলোচনা আনতে পারি।

সম্ভাব্য প্রশ্নটিকে মেনে নিয়েই বলছি, যদিও আচা শঙ্কর মায়াবাদের প্রথম স্রোষ্টা পুরুষ নন, তবুও, তিনি এই মতবাদের সার্থকতম রূপকার। ঋক'—মুহূর্ত থেকে 'মায়া' ভাবনা এবং মননার সংক্রমণ দেখা যায় এব উপনিষদ ও বৌদ্ধ দার্শনিকতায় এর অনুস্যূ চলে এসেছে। উত্তর দিনে আচার্য শঙ্করই তাকে পরিমার্জন ও সুমিত—শৃঙ্খলার গ্রন্থনায় এনেছে এবং সব দর্শন মতবাদের শীর্ষ চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠি করেছেন। 'ঋক' মুহূর্ত থেকেই মায়াবাদের অনুভূতি এব ভাবনা অনুসৃত ছিল বলে মায়াবাদের অন্য না 'বিবর্তনবাদ' ও।

প্রায় চার হাজার পাঁচ শ' বছর পূর্বদিনে, ভারতে আর্য ঋষিদের বিশ্ব সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং প্রক্রিয়ার গভীর বর্ণি গ্রন্থনায় আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি গ্রাহ্য দৃশ্যমান বি

জগৎ মায়াময় রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন, দৃশ্যমান বিশ্ব চরাচরের প্রকৃত স্বরূপের একটি 'ভ্রান্তিমূলক' উপলব্ধি-ই আমরা অর্জন করতে পারি, 'স্বরূপ'কে ধরে এবং বুঝে নিতে পারিনে। বেদান্ত দর্শন 'মায়া'-কেই দৃশ্যত 'বিশ্বের' সৃষ্টি-উৎস বা উপাদান কারণ নামে অভিহিত করেছে। 'মায়া' শক্তির প্রভাবেই অনিত্য, বিকৃতি এবং অবাস্তবতা, নিত্য অ-বিকৃতি এবং বাস্তব সত্যের রূপ ও মর্যাদা অর্জন করে। উপনিষদ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম ও আত্মার অবিচ্ছিন্নতা স্বীকার করেছে। আচার্য শঙ্করের অভিমতে, জগৎ ব্রহ্ম বা আত্মার বিকাশ নয়—বিবর্ত। ব্রহ্ম বা আত্মার একটি 'অংশ' বিবর্ত ফলশ্রুতিতেই মায়ারূপ আত্মিক অস্তিত্ব অর্জিত করে এবং এই 'মায়া'ই জগতের সৃষ্টি বহন করে আনে। সুতরাং জগৎ যে 'ব্রহ্ম'ই—এই প্রজ্ঞান অর্জন না করা অবধি—মানুষ 'জগৎ'-কেই সত্য ভেবে নেয়। ব্রহ্মজ্ঞান অর্জিত হলেই এই মিথ্যার মুক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বেদান্তের 'মায়া' দর্শন প্রসঙ্গে সাংখ্যের প্রকৃতি বাদের কথা উঠে আসে। সাংখ্য 'প্রকৃতি'-কে বিশ্ব বিধায়নার 'কারণ' রূপে অভিহিত করেছে, যেমন বেদান্ত করেছে—'মায়া'কে। এই প্রাক্তন-উৎস থেকেই বিশ্বসৃষ্টি বিবর্তের অপূর্ব ব্যঞ্জনা এসেছে।

ব্রহ্ম বা আত্মার সত্তা বিবর্তের ফলে সৃষ্ট 'মায়া' থেকেই সঞ্চারিত ক্রিয়াহীন অ-সীম অ-ভার আকাশ 'তন্মাত্রে'র উৎসারণ ঘটে এবং তারই বর্দ্ধিত জটিলতার অন্তরাত মহাভূত পরমাণুর সৃষ্টি বহন করে আনে। সুতরাং, এই কারণেই—'মায়াবৃন্তের স্ফুটিত প্রসূন এ জগৎ অনিত্য মায়াময়।'

কিন্তু 'মায়া' এবং 'জগৎ' উভয়েই পরম সত্য স্বরূপ 'সদ্ব্রহ্ম' থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে; সুতরাং যদিও 'জগৎ' অসত্য এবং মায়াময়, তবুও তা' সদ্ব্রহ্মেরই ছায়ারূপ; এ অর্থে, 'জগৎ'-ও যুগ্মভাবে 'সৎ' এবং 'অসৎ' প্রশ্রয়েই লালিত। এই প্রসঙ্গেই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রকাশ কল্পনা করা হয়েছে। সসীম ও রূপময় জগতের পার্থিব অস্তিত্বেই অসীম ও অরূপ সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। বেদান্ত দার্শনিক এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছেন। বেদান্তের এই প্রজ্ঞানেই বলা যেতে পারে ব্রহ্ম এবং জগতের অবিচ্ছিন্নতার অর্থই হলো অরূপ-রূপের নির্গুণ-গুণের এবং ঐক্য-বৈচিত্র্যের সুসামঞ্জস্যিক মেলবন্ধন এবং এখানেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মিল খুঁজে পাই।—অভিমতটি আলোচনা নির্ভর।

বিংশতি পূর্ব বিজ্ঞান জগতে যান্ত্রিক বিশ্বধারণা বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ(Doctrine of Causation) নৈশ্চিত্য বাদ (Doctrine of Determinism) প্রাকৃতিক নিয়মানু-বর্তিতার সিদ্ধান্ত (Law of Uniformity of Nature) এবং গতি-সন্ততিবাদ (Law of Continuity of Motion) সমূহ অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা অর্জন করেছিল; বস্তুত এই ধারণাগুচ্ছের ওপর নির্ভর করেই বিজ্ঞান প্রগতির সৌধ মিনার গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিংশতির প্রাথমিক পাদ থেকে বিজ্ঞান জগতে নূতন নূতন যুগান্তক আবিষ্কার মুহূর্ত থেকে এই ধারণা-সমূহের প্রত্যয় বাঁধন শিথিল হয়ে এলো। বিজ্ঞান এক নতুন যুগের সূর্য তোরণে উপনীত হলো। রেডিয়াম এবং পলোনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং ইউরেনিয়াম পরমাণুর তেজস্ক্রিয় ধর্মেরআবিষ্কার মুহূর্ত থেকে এই নতুনের অভিযান সুরু হ'লো।

এই আবিষ্কারের সার্থক ফল স্বরূপ বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যক্ষ করলেন যে, এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহের পরমাণু গুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে সকল অবস্থায় এক অ-ব্যতিক্রম্য নির্দিষ্ট হারে ভেঙে ভেঙে অন্য পরমাণুর রূপান্তর অর্জন করছে। বৈজ্ঞানিকরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করলেন যে,পদার্থ বিশেষে এই ভাঙনের পরিমিতি অনেক অনেক বেশি থেকে আশ্চর্য মাত্রায় কমও হ'তে পারে। এই নিয়ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ পদার্থ 'লক্ষ লক্ষ বছর' স্থায়ী হ'তে পারে, আর কোন কোন পদার্থ বা বিস্ময়কর রূপ মুহূর্ত স্থায়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু এ সত্বেও এই দীর্ঘ-ক্ষণস্থায়ি তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর অস্তিত্ব

কালের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়-সীমা মুহূর্ত্ত নির্ণয় করা সম্ভব হলো না ; ঠিক এমনি ভাবেই 'সমষ্টিগত ভাবে' কোন বিশেষ পদার্থের পরমাণুর ভাঙনের হার ক্রমিক নির্ধারিত হ'লেও 'ব্যেষ্টিগতভাবে' সেই পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুর পরিণতির মুহূর্ত বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞাতই রইলো। পারমাণবিক গবেষণার এই নতুন অর্জিত অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানের পূর্ব্বানুসৃত হেতুবাদ (Doctrine of Causation) এবং নৈশ্চিত্যবাদের (Doctrine of Determinism) প্রত্যয় বাঁধন শিথিল করে দিয়ে নতুন প্রজ্ঞান-প্রত্যয় অর্জিত 'গড় নিয়ম' (Statistical laws) বহন করে আনল ; বৈজ্ঞানিক এই নতুন নিয়ম'কে স্বীকার করলেন।

কেবল 'গড় নিয়ম'(Statistical laws) নয়, পূর্বানুসৃত গতি-সন্ততিবাদের (Law of Continuity of Motion) পরিবর্তে পরমাণুর কোয়াণ্টামবাদ ও এলো। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিরীক্ষিত হ'লো যে, আদিম জড়কণিকা প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন-ই পরমাণুর শরীর গঠন করেছে, কোন পরমাণুই মৌলিক অবিভাজ্য নয়। প্রোটন এবং নিউট্রনের সমবায়ে নির্মিত পরমাণু কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেকট্রনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে সুতীব্র গতিতে ছুটে বেড়ানোর ফলেই আলোক রশ্মির বিকিরণ ঘটে। এই বিকীর্ণ আলোক রশ্মির বর্ণালী অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিক এই সত্য অর্জন করেছেন যে, ইলেকট্রন অবিচ্ছিন্ন গতিতে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে চলে না,— লাফিয়ে চলার রীতি-ই অনুসরণ করে। এই অর্জিত প্রজ্ঞান থেকেই পরমাণুর 'কোয়াণ্টামবাদের উৎসারণ এবং এই মতবাদের সঙ্গে আইনস্টাইন ও প্লাঙ্ক প্রবর্তিত তেজরশ্মি কণিকাবাদের নিকট মিল দেখা যায়।

আদিম জড়কণিকা, অণুপরমাণু এবং আলোক রশ্মির অবস্থা বিশেষে কণিকা ধর্ম-তরঙ্গ ধর্ম প্রকাশের যে নতুন-প্রমাণ পাওয়া গেল তার ফলে আর কোন ক্রমেই,— নৈশ্চিত্যবাদ (Doctrine of Determinism) অনুসরণ করা গেল না ; দেখা দিল 'সম্ভাবনাবাদ' (Theory of Probability)। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে গেল, অনুপরমাণু সম্পর্কে প্রাকৃতিক নিয়মের একানুবর্তিতাই (Law of Uniformity of Nature) কি যথার্থ? এই কালান্তর পরিবর্তন মুহূর্তেও? বিংশতির বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিল। বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ তাঁর 'অনৈশ্চিত্যবাদ'— (Law of Indeterminism) নিয়ে এগিয়ে এলেন। একানুবর্তিতার অবসানে বিজ্ঞান জগতে এক নতুন রূপান্তর ঘটে গেল।

পুরাতন-নূতনের এবং বিয়োজন-নিয়োজনের সামগ্রিকতার সত্য এই যে, আদিম জড় কণিকা সমূহ এবং অণুপরমাণুর সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের অর্জিত ধারণা বিশ্ব জগতের যথার্থ 'স্বরূপ' সম্পর্কে যে অভিজ্ঞান অর্জন করেছে তার সঙ্গে দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোন মিল নেই। বিংশতির বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিকে কণিকারূপ ফোটন হিসাবে মেনে নিয়ে বলছেন যে, দৃশ্যমান বিশ্বজগতের অনির্মাপ্য মহাশূন্যের, গ্রহকুল, নক্ষত্ররাজি, নীহারিকাপুঞ্জ এবং জীব, জড় ও উদ্ভিদের সামগ্রিক বিস্তৃতিতে অগণিত আদিম জড়কণিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, এবং ফোটনের দল অবিরাম অবিচ্ছিন্ন দুরন্ত গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই 'ছুটন্ত' কণিকার পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। কোথাও বা ভারী, কোথাও বা কম এবং 'পরিমাণ' সদৃশ্যতায়-ই যেন কোথাও বা তড়িৎ গতি আবার কোথাও বা সামান্য কম-বেশি হয়ে উঠছে।

আদিম জড়কণিকা পুঞ্জ এবং অণুপরমাণু অবিচ্ছিন্ন ছুটে চলার গতি পথে মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভূতির কেন্দ্র-মূলে অবিরাম আঘাত হানছে। মানব শরীরের স্নায়ু সূত্র এই আঘাত মস্তিষ্ক কোষে বহন করে নিয়ে যায় এবং এরই প্রতিক্রিয়ার ফলে বর্ণ-রসের এক রসভ-ছান্দিত বিচিত্র জগৎ মানুষের মানস-লোকে ফুটে উঠে। কিন্তু, মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় কোষে এই প্রতিক্রিয়ার 'সংঘটন স্বরূপ' টিকে বৈজ্ঞানিকরা ধরে নিতে পারেন নি। মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভূতির কেন্দ্র-মূলে আগত যে বহির্জাগতিক আদিম শক্তি কণিকার নাচের ছন্দের আঘাত লাগে তাই-ই প্রসুপ্ত চেতনার গহনে বিচিত্র

অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তই আমাদের দর্শন জগতে আহ্বান জানায়, বাউলের একতারায় সুর জাগিয়ে তোলে,—'দুনিয়া মনেরই কারসাজি ভাই, মনেরই কারসাজি।'—এ অভিজ্ঞান মানতেই হয়।

বিংশতির বিজ্ঞান এ জগতের সত্য-রূপ সম্পর্কে সনাতন দর্শনের বাণীই উচ্চারণ করছে:—'অরূপম-রসমগন্ধমস্পর্শমশব্দম্।'—যে জগৎকে আমরা ইন্দ্রিয় অনুভূতিতে ধরে নি, আমাদের সেই 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'-র জগৎ আমাদেরই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' আমরাই রচনা করেছি। বিজ্ঞানের এই বিচিত্র পরীক্ষিত সত্যের উপলব্ধি 'বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ'-ই; বেদান্ত ভাষ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য খুবই কম।

বেদান্ত বল্‌ছে, দেশ, কাল ও কার্যকারণ পারম্পারিকতার মেলবন্ধন থেকেই 'মায়া'-র আবির্ভাব ঘটে; কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ হ'লো—অসীম, অনাদি, অনন্ত এবং অদ্বৈত – অর্থাৎ দেশ-কাল অতীত এবং কার্যকারণ নিয়ম-বিচ্যুত। বিজ্ঞানও বলেছে দেশ, কাল ও কার্য্যকারণের অবসান বিচিত্র দৃশ্যমান জগতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শারীর মানুষের অস্তিত্বের অবলুপ্তি বহন করে আনবে। এই অভিজ্ঞানেই, বৈজ্ঞানিক তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রের (Electromagnetic field) সঙ্গে বেদান্তের 'মায়া' ও সাংখ্যের 'প্রকৃতির' তুলনা করতে পারি এবং আকাশ 'তন্মাত্র'-কে—'দেশের' সমান ধর্ম মানেরও বলা যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান দেশ-কাল-কার্যকারণের সীমানা মুক্ত রাজ্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অনুভব করছে। এই 'অনুভূতি' হয়ত এক নতুন বিস্ময় বহন করে আনবে।

কিন্তু মানব মন, দেশ-কাল ও কার্যকারণের পারম্পরিকতা বিমুক্ত হয়ে কোন পদার্থ বা বিষয়ের ধারণা করতেই পারে না। বেদান্ত তাই পরমসত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে—'অবাঙ্‌মানসো গোচর:'—বলে অভিহিত করেছে।

॥ পরমাণুতত্ত্ব : প্রবীন ও নবীন ॥

মানব সভ্যতার প্রাচীন মুহূর্ত থেকে পরমাণুতত্ত্ব চলে আসছে। কাল ক্রমিকতার বিচিত্র বিবর্তন পেরিয়ে এই পারমাণবিকতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সত্যের রূপান্তর লাভ করেছে। পরমাণুতত্ত্বের সেই ক্রমিক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের প্রচেষ্টা নয়।

আর্য্য ভারতের দার্শনিক বিজ্ঞানী কণাদের 'পরমাণুবাদ' বহুখ্যাত—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কণাদ বল্‌ছেন যে, যদিও কোন পরমাণু সেচ্ছায় অবস্থান করতে পারে না, তবুও তারা অস্থায়ী বা বিনশন ধর্মী নয় এবং পরমাণু অনৌপাদানিক ও অবিভাজ্য। তিনি পরমাণুকে গোলাকার কল্পনা করে ওর ওজন, গতিবেগ, স্থিতিস্থাপাত এবং চাঞ্চল্য ইত্যাদি কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মের স্বীকার করেছেন। নানা বর্ণ, গন্ধ এবং বিচিত্র রূপে মানবিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অনুভূত বৃত্তিও পরমাণুর বিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন ধর্ম। ন্যায় দার্শনিক গোতম পারমাণবিক জিজ্ঞাসায় কণাদেরই দ্বিতীয় উচ্চারণ করেছেন।

কণাদের পরমাণু পরিকল্পনায়, এক জাতীয় 'ভূতের' একাধিক বা বহু পরমাণু মিলিত হয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এবং বিজাতীয় 'ভূতে'র পরমাণু থেকে বিষম ভৌতিক অণু বা যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। 'অণু'-র গভীরে পরমাণু বিন্যাসের ভিন্ন বিশিষ্টতা থেকে বিচিত্র অণু বা পদার্থের সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রত্যয়ই হ'লো কনাদের রাসায়নিক সংযোগ বাদের বৈশিষ্ট্য। এক ঘন সমচতুস্তলকের আকারে (Cubical arrangement) পরমাণুর এই বিন্যাস ঘটে। চারিদিকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে ছ'টি পরমাণুকে ঘিরে অন্য ছ'টি পরমাণু অবস্থান করে। কণাদের এই পরমাণুবাদের সঙ্গে খৃষ্ট-পূর্ব ৪৭০-৩৬০ শতকের গ্রীস-দার্শনিক ডেমোক্রিটাস্ এবং ১৮০৮ শতকের মনীষী ডালটনের পরমাণুবাদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল, ঔপাদানিক তন্মাত্রের পরিমাণ ও বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর

সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল মতে দুই বা বহু পরমাণুর মিলনের ফলে 'অণু'র অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়।

অণু-পরমাণুতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় বেদান্ত দর্শন অনেকাংশে সাংখ্য-পাতঞ্জল ছুঁয়ে গেছে। বেদান্ত দর্শনের অভিজ্ঞান অনুসারে 'সূক্ষ্মভূত'ই স্থূলভূত বা 'মহাভূত'—পরমাণু—সৃষ্টির অনিবার্য উৎস।

এই প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জৈন দার্শনিক উমাস্বাতীর পরমাণু ভাবনার কথাও উঠে আসে। আরণ্যক, উপনিষদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় এবং বৈশেষিকের মত 'জৈন-দর্শন' ও জীব, জড় বা কোন পদার্থের সংজ্ঞা হিসেবে বহু ব্যবহৃত 'ভূত' শব্দটি নির্বাচন করে নি। পদার্থের সংজ্ঞা অর্থে 'পুদ্গল' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। জৈন পরমাণুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আণবিক আকর্ষণ এবং সংযোজন ক্রিয়া সম্পর্কিত ভাবনার ওপর নির্ভর করছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, স্বকীয় ধর্মের বৈষম্য থেকেই 'পুদ্গল-পরমাণুকে' দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৈষম্য ধর্মের প্রাবল্যের ফলেই বিপরীতধর্মী দুটি 'পুদ্গল' পরমাণু পারস্পরিক আকর্ষণে রাসায়নিক মেলবন্ধনে (Atomic linking) মিলিত হয়। এমন কি, গুণগত বিপুল পার্থক্যের ফলে সমধর্মী দুই 'পুদ্গল' পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক মিলনও রচিত হ'তে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ দুটি সমধর্মী আত্মীয় পরমাণু উভয়ে উভয়কেই আরও দূরেই সরিয়ে দেয়।

উপরন্তু, জৈন-দার্শনিক 'অণু' এবং 'পরমাণু'র মধ্যে অনুসৃত স্বীকৃত ব্যবধানও রাখেন নি। তিনি পরমাণুকেই 'অণু' এবং পরমাণু পুঞ্জকে 'স্কন্ধ'-নামে অভিহিত করেছেন। পরমাণুতত্ত্ব ভাবনায় জৈন-দার্শনিক কণাদের অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়ছেন—অর্থাৎ তিনি পরমাণুর বিনশন স্বীকার করেন নি এবং তাকে অন্তিম ও আদি-মধ্যে অন্তহীন জড়কণিকা রূপে কল্পনা করেছেন। জৈন দার্শনিক 'স্কন্ধের'ও বিভাজন নিরূপণ করেছেন। বিস্ময়কর ভাবে লক্ষ্য করতে হয় যে, জৈন-দর্শনে 'অনন্তন্যূক' স্কন্ধের বিবরণ আছে। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণিত 'বিশালকায় অণুকে' (High Polymer) এই পর্যায়ে নির্বাচন করা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান পর্যালোচনা প্রসঙ্গে উমাস্বাতীর কথা অনিবার্য হয়ে পড়ে এই জন্যেই যে, উনিশ শতকের প্রথম পাদে প্রখ্যাত সুইডিস্ মনীষী বিজ্ঞান-রাসায়নিক বার্জিলিয়াস বিজ্ঞান জগতে যে দ্বৈত-প্রকল্পের (Dualistic hypothesis) প্রবর্তন করেন, তার সঙ্গে জৈন-দার্শনিকের বিজ্ঞান ভাবনার আত্মীয়তা অনুভব করা যায়।

কেবল পরমাণু পরিকল্পন নয়, আর্য-ভূমির বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা অণু-পরমাণুর গতিতত্ত্ব সম্পর্কেও নীরব ছিলেন না। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন যে, অণু-পরমাণুর গতিস্পন্দই তরঙ্গ গতি, স্রোতগতি এবং পরিবহন প্রবাহকে গতিশীল রাখছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিক সমগ্র ভূত কণিকার অবিরাম অবিচ্ছিন্ন গতিস্পন্দনকে একটি বিশিষ্ট ধর্ম রূপে অভিহিত করেছেন। বেদান্ত ও সাংখ্য দার্শনিক অণু-পরমাণুর অবিচ্ছিন্ন গতিস্পন্দনকেই (Vibratory motion) দৃশ্যমান জাগতিক প্রক্রিয়া-সক্রিয়তার মৌলিক শক্তি রূপে অভিহিত করেছেন। অণু-পরমাণুর এই আবর্তিত চক্রাকার গতি এবং কম্পনকে ভারতীয় বিজ্ঞান-মানস দার্শনিকেরা 'পরিস্পন্দ' তত্ত্ব নামে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় দর্শনের এই 'পরিস্পন্দ' তত্ত্ব থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আভাস ব্যঞ্জিত হয়ে উঠছে।

সুতরাং, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় দার্শনিকদের বিজ্ঞান মননার কথা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হ'তে হয়। যে বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি, কোন একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে তার সামগ্রিক আলোচনা স্বচ্ছ-সহজ করে তোলা সম্ভব নয় এবং নিঃসন্দেহে, এ আলোচনা কোন যোগ্য-ব্যক্তিদের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল। হয়ত বা আগামী দিনের অনুসন্ধিৎসু মন এ বিষয়ে সার্থক সময় সচেতন হয়ে উঠবে।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রদর্শনীতে উপস্থিত ঔপনিবেশিক ও ভারতীয়দের জন্য ডিউক অভ বেডফোর্ড অনুগ্রহ পূর্বক পল্লী-অঞ্চলের কৃষি-সম্পর্কিত যাবতীয় দর্শনীয় দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্রলি খামার ও উওবার্ণ-এর গবেষণা-ক্ষেত্র দেখিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচরাল সোসাইটির অধীনে এইখানে বহুজাতীয় পরীক্ষার কাজ চলে। আমাদের এই ভ্রমণ-তালিকায় ডিউকের নিজস্ব খামার অ্যাবি, এবং উওবার্ণে অবস্থিত তাঁহার পার্ক ও উদ্যান-সমূহ স্থান পাইয়াছিল। ২৩শে জুন (১৮৮৬) বুধবার ডিউকের অতিথিগণ সহ একখানি স্পেশাল ট্রেন ইউস্টন স্টেশন হইতে ছাড়িয়া রিজমণ্ট অভিমুখে চলিল। সুদৃশ্য পল্লীনিসর্গ অতিক্রম করিয়া চলিলাম আমরা। দুধারে গ্রীষ্মকালীন সবুজ শষ্যায় সূর্যের স্বর্ণরৌদ্র সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সে যেন বার্লি, স্ট্রবেরি, র‍্যাস্পবেরি, আপেল ও পিয়ারের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে কবে ইহারা পাকিবে। কি সরল। তাপমূর্চ্ছা কাহাকে বলে জানে না, মরোকো হইতে আরব পর্যন্ত যে তপ্ত হাওয়া মরু বালুকার পাহাড় উড়াইয়া প্রবাহিত হয়, যাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্যারাভানের উটেরা মাটিতে বসিয়া পড়ে, সেই 'সিমুম' কাহাকে বলে তাহাও জানে না। ভারতের সমতল জমিতে যে অগ্নিতপ্ত প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহ বহিয়া চলিতে চলিতে জমির ঘাস এবং গাছের পাতা পুড়াইয়া দেয়, তাহাও জানে না। আর জানে না দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কথা যাহার ফলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দেশটাকে মরুভূমি করিয়া তোলে।

ডিউক তাঁহার অতিথিদের সম্মানে তাঁহার অধীন কর্মরত লোকদের সেদিনের মত কর্মবিরতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমাদের গমন-পথে বিপুল হর্ষধ্বনি। আমরা যত আমাদের গন্তব্যের কাছে আসিতে লাগিলাম, জনতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং হর্ষধ্বনি আরও প্রবল এবং উল্লাসপূর্ণ হইতে লাগিল। আমাদের জন্য গাড়ি প্রস্তুত ছিল। আমরা ক্রলি খামারে গিয়া পৌঁছিলাম, এবং সেখান হইতে গবেষণা-ক্ষেত্রে। কৃষি রসায়নে বিশেষ খ্যাত রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচরাল সোসাইটির সেক্রেটারি, সেখানে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে-সব পরীক্ষা চলিতেছে, যে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে এবং সে-সবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর আমরা পার্কের ভিতর দিয়া পার্ক কৃষিক্ষেত্রে আসিলাম। এখানে বহু জাতীয় গোমেষ ইত্যাদি পশু দেখিলাম, তাহারা দেখিতে খুব চমৎকার। আমরা ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িয়াছি অতএব উওবার্ণ অ্যাবির পশ্চিম দিকে আমাদের নামিতে বলা হইল, এইখানে খুব উৎকৃষ্ট ভোজনের আয়োজন করা হইল। ডিউক নিজে এই অনুষ্ঠানের পুরোধা হইলেন এবং যথারীতি ভাষণও দেওয়া হইল। লাঞ্চের পরে মারকুইস অভ ট্যাভিস্টক(ডিউকের পুত্র) আমাদিগকে সব দেখাইলেন, অ্যাবিতে পারিবারিক অনেকের প্রতিকৃতি টাঙান আছে। কয়েকজন বিখ্যাত পেণ্টারের

হাতের প্রতিকৃতিও আছে। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্যানে ভ্রমণ করিলাম, এবং ফ্লিটউইকে স্পেশাল ট্রেনে উঠিয়া সাড়ে ছয়টার সময় লণ্ডনের সেণ্ট প্যানক্রিয়াস স্টেশনের দিকে যাত্রা করিলাম। উওবার্ণে যেভাবে গবেষণাদি চালান হইতেছে তাহা দেখিয়া আমি কিছু নিরাশ হইয়াছি। নিখুঁত পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডেই দেখিতে আশা করি। সেখানে মানুষের বুদ্ধি উত্তম অভিজ্ঞতা সমস্তই প্রয়োগ করা হয়, এবং সর্বদা উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। কৃষিতেও তাহাই। তথাপি উওবার্ণে যে-সব বর্ণনা আমি নীরবে শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল গোড়াতেই গুরুতর ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কৃষি কার্যে গবেষণা বা নানা জাতীয় পরীক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, অবিশ্রান্ত উদ্যোগ এবং ধৈর্য দরকার হয়, ইহা এই গবেষণার দুর্ভাগ্যই বলা চলে। কারণ একমাত্র এইসব গুণের বিচার-বিবেচনা প্রসূত প্রযুক্তি দ্বারাই ভিত্তি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া তবে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য কার্যফল ফলান সম্ভব হয়। কিন্তু কার্যতঃ পূর্বগঠিত মতকে প্রমাণ করিবার জন্য সব সময়েই তাড়াহুড়া করিয়া পরীক্ষা চালান হয়। প্রথমেই যে একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়িয়া লইতে হয়, সে কথাটা ইঁহারা ভুলিয়া যান। ইহাতে ফললাভ মনোমত হয় না, শেষে যত দোষ পড়ে আবহাওয়ার ঘাড়ে। কৃষি বিষয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করিতে হইলে সব একসঙ্গে তালগোল না পাকাইয়া আমার মতে দুইটি স্পষ্ট এবং পৃথক কর্মধারা অনুসরণ করা উচিত। প্রাথমিক কর্তব্য, যাহাকে আমি মূল ভিত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তাহা হইতেছে যে-সব ক্ষেত্রে নানাভাবে পরীক্ষা চালান হইবে সে-গুলিকে আগাগোড়া একই রকম করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। জমিতে জমিতে কোনও দিক দিয়া কোনও পার্থক্য যেন না থাকে। যদি দুই একর জমিতে সার দিতে হয়, একটিতে গোবর সার, অন্যটিতে খৈলের সার, যাহা দ্বারা দুইটি ক্ষেত্রেই গম বুনিয়া দুইটি সারের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা হইলে এই দুই সারের পার্থক্য ব্যতীত ঐ দুইটি ক্ষেত্রে যেন অন্য কোনও দিক দিয়া অবস্থার কোনও পার্থক্য না থাকে। জমি ও পারিপার্শ্বিকের দিক দিয়া যেন দুইটি ক্ষেতই সম্পূর্ণ এক অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ দুই জাতীয় সারের ক্রিয়ার যে পার্থক্য দেখা যাইবে, সেই পার্থক্য সৃষ্টির মূলে যেন অন্য কোনও কারণ বিদ্যমান না থাকে। তাহা হইলে সারের উৎকর্ষ বিচার সম্ভব। পরীক্ষাকারীদের এ বিষয়ে স্থূল ধারণা কিছু আছে, কিন্তু জমিতে কোনও পার্থক্য ছিল না, তাহা প্রমাণ করিবার মত ধৈর্য তাঁহাদের নাই।

আমাদের সাধারণ বিচারে জমি ও অন্যান্য অবস্থা সম্পূর্ণ এক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের হিসাবের বাহিরে থাকিয়া যায়, যাহা প্রমাণ ব্যতিরেকে বুঝা যায় না, এবং তাহা আবিষ্কার করিয়া নানাভাবে পরীক্ষাদি করিয়া তবে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমি এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত যে, দুইটি জমি সম্পূর্ণ এক হইলেও বিনা সারে তাহাতে শস্য ফলাইলে তথাপি দুই ফসলের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিবে। দুই রকম সারের তুলনামূলক গুণ বুঝিতে হইলে সার দিবার পূর্বে ঐ দুই জমির উৎপাদনে যে পার্থক্য দেখা দিবে তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া তবে সারের পরীক্ষা করিতে হইবে। এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া, আবহাওয়ার নানা প্রভাব হইতে জমিকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে। জমিতে শস্য কিছুদূর পর্যন্ত বাড়িবার এক সপ্তাহ আগে বা পরে এক পশলা বৃষ্টি হইলে ফসলের পরিমাণে অনেক পার্থক্য ঘটে। ইংল্যাণ্ডের লোকদের পক্ষে বিজ্ঞানের পূর্ণ সাহায্য পাওয়া সম্ভব, সেখানে তাহাদের হাতে অনেক উপায় আছে, ইচ্ছা আছে, সেখানে তাহারা কাঁচ-ঘরে অ্যারিকা পাম জন্মাইতে পারে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সেখানে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার জমিতে একই উত্তাপ ও আর্দ্রতা বজায় রাখা অসম্ভব নহে। এ সব বিষয়ে যাঁহারা আমার অপেক্ষা অনেক বেশি জ্ঞানী তাঁহাদের কাজের সমালোচনা করা আমার পক্ষে অবশ্যই দুঃসাহস,

সন্দেহ নাই। কিন্তু উওবার্ণের পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষার প্রাথমিক শর্ত পালন করা হয় নাই। খোসাছাড়ানো কটন-কেক ও মেইজ-মীলের সারের তুলনামূলক পরীক্ষা সেজন্য ঠিকমত হয় নাই। অজ্ঞ চাষীরা জানে, মেইজ-মীলের সারের অপেক্ষা কটন-কেকের সার অনেক উৎকৃষ্ট। প্রথমটির দাম প্রতি টন পাউণ্ড ১-৫-১, দ্বিতীয়টির দাম প্রতি টন পাউণ্ড ৫-১৩-০। অতএব যে দুটি ক্ষেতে দুই রকম সার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ফলে কটন-কেক ব্যবহৃত ক্ষেতে অনেক ভাল ফসল উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল। পরীক্ষা ৯ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ সন পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল কটন-কেকের উৎকর্ষ প্রমাণ করা। কিন্তু এত দিন পরীক্ষা চালাইয়াও তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষাকারীগণ ইহাতে বিস্মিত। ইহার পর তাঁহারা ইহার কারণ জানিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলেন, "এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণ খুঁজিতে গিয়া অনুমান করা হইল, এবং অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণও মিলিল যে, জমিতে সারের পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়াতে এবং ইহার ফলে নাইট্রোজেন অধিক জমিয়া যাওয়াতে সর্বোচ্চ পরিমাণ যে ফসল পাওয়া গিয়াছে তা মেইজ-মীলের সারের দরুন অথবা কৃত্রিম বিকল্প সারের দরুন, অতএব অধিক শক্তিসম্পন্ন কটন-কেকের সার তাহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে পারে নাই।" অতএব দেখা যাইতেছে দুই জাতীয় সারের তুলনামূলক বিচার হইতে ইহাদের কার কি মূল্য তা যদি ঠিকমত জানা না হয়, তাহা হইলে উওবার্ণ খামারের গবেষণা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যাইবে? এই অস্বাভাবিক এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত যে, মেইজ-মীল সার কোনো মতেই কটন-কেক সার হইতে হীন নহে, যদি নয় বৎসরের পরীক্ষার পরে করা হয় এবং তাহা ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচরাল সোসাইটির অধীন পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে প্রশংসা করা চলে না। আবার, সার দেওয়া হয় নাই এমন জমিতে বৎসরের পর বৎসর চাষ করিয়া যে গম পাওয়া গেল, তাহা হইতেও প্রমাণ করা যায় যে আবহাওয়ার বদল নিয়ন্ত্রণ না করিলে বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। দেখা যাইতেছে, এক একর বিনা সারী জমিতে ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ পর্যন্ত এইরূপ ফসল ফলিয়াছিল: ১৮৭৭—২২.৫ বুশেল। ১৮৭৮—১৫.৮ বুশেল। ১৮৭৯—১০.১ বুশেল। ১৮৮০—৯.৬ বুশেল। ১৮৮১—২৫.৭ বুশেল। ১৮৮২—১২ বুশেল। ১৮৮৩—১৬ বুশেল। ১৮৮৪—২৩ বুশেল। ১৮৮৫—২১.২ বুশেল। ১৮৭৭ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত পরিমাণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ, বুঝা যাইতেছে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অবিরাম চাষে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার পর ফসলের পরিমাণ একলাফে হঠাৎ বাড়িয়া গেল, এবং তাহার পর হ্রাসবৃদ্ধি অনিয়মিত। শস্যও ক্রমে পরিপুষ্টি হারাইয়াছে। প্রথম বৎসরে বুশেল প্রতি ৬১.৮ পাউণ্ড দানা পাওয়া গিয়াছে। এবং যদিও এই পরিমাণ পরে খুব কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে, কিন্তু কখনও প্রথম বৎসরের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। ১৮৮৫ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৫২.২ পাউণ্ড। এই হ্রাসবৃদ্ধি কি আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঘটিয়াছে? তাহা হইলে ইহাই বলি যে, ফলন যদি অন্য শক্তিশালী অথচ নিয়ন্ত্রণের বাহিরের কারণের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহা নিয়ন্ত্রণাধীন তাহার উৎকর্ষ প্রমাণ করা যাইবে কিরূপে? আমার পক্ষে বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাতের গবেষণা বিষয়ে এরূপ সমালোচনা করিতে আমি বেদনাবোধ করিতেছি, বিশেষ করিয়া আমি যখন ইঁহাদের নিমন্ত্রিত অতিথি। আমাদের দেশেও কৃষি গবেষণা হইয়া থাকে, এবং আশা করি তাহা শিক্ষা ও সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে করা হইবে, এবং ইহার মূল্যও সবাই ক্রমে অধিক উপলব্ধি করিবেন। অতএব ঐ গবেষণায় যে-সব অসঙ্গতি ঘটিয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করিতেছি। যাহা হউক, বহু ত্রুটি সত্ত্বেও উওবার্ণ ক্ষেত্রের গবেষণা হইতে অনেক কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃত্রিম সার সম্পর্কে

মূল্যবান্ অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। বিশেষ করিয়া অ্যামোনিয়াম সল্টগুলি বিষয়ে। ডিউক অভ বেডফোর্ড এইসব পরীক্ষার জন্ম রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচর্যাল সোসাইটির হাতে ১২৭ একর জমি ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এই পরীক্ষার ত্রুটি উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অনেক সুবিধা আছে। যে পরীক্ষা যেখানে আরম্ভ হয়, পরবর্তী পুরুষও তাহার ধরাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চলে, কারণ প্রকৃতি তাহার যে-সব তথ্য গোপন রাখিয়াছে তাহা উদ্ঘাটন করা একটি জীবনে সম্ভব হইতে পারে না। এই রকম একজন উত্তর পুরুষ সার জন বেনেট লইস। তিনি কৃষি গবেষণার জনক। তাঁহার রটহ্যামস্টেডের পরীক্ষা-ক্ষেত্র আমি দেখি নাই। 'মার্কলেন এক্সপ্রেস'-এর মিস্টার ফোর্ড একবার আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই।

বহু বিজ্ঞান-সেবীর নিকট কৃষির উন্নতি একটি 'হবি' বা শৌখিন পেশা। সাধারণ মানুষ ইহা হাস্তকর মনে করিতে পারে, কিন্তু হবি সাধারণ মানুষের জন্ম নহে। সাধারণ লোকের কোনও বিষয়ে টান বা আকর্ষণ থাকে, পছন্দ থাকে। ইউরোপ ও অ্যামেরিকা হবি হইতে মহামূল্য সব আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাকে কেউ ইচ্ছা করিলে বিশেষ বৃত্তি বলিতে পারেন কিন্তু হবি ইহা হইতে পৃথক, এবং বড় জিনিস। ইহা কোনও বিষয়ে আন্তরিক এবং অক্লান্ত নিষ্ঠা, এবং সেই বিষয়ে অতৃপ্তিকর আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা, এবং ইহা এমন একটি অনুভূতি যাহা মস্তিষ্ক-বিকারের সীমা স্পর্শ করিয়া চলে, এবং ইহা হইতেই এমন সব আশ্চর্য আবিষ্কার হইয়াছে আধুনিক অগ্রগতি যাহার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। আমাদের দেশে এমন হবি কোথাও দেখা যায় না। এবং তাহার প্রধান কারণ আমরা আপাততঃ মাঝারি শ্রেণীর মানুষ। আমাদের কোনও আবিষ্কার নাই, কোনও উদ্ভাবন নাই, পৃথিবী জোড়া কোনও খ্যাতি নাই। আমাদের হবি—ধর্ম। কখনও বা ইহা হবির চেয়েও অধিক, ইহা মস্তিষ্ক-বিকার। সুখের বিষয় সমাজ ধর্মীয় উন্মাদনাকে পূজা করে। আমরা দুর্বলজাতি বলিয়াই কি ধর্ম আমাদের হবি? কারণ, দেখা যায় প্রত্যেকটি দেশেই স্ত্রীজাতি, রুগ্ন, এবং পঙ্গু, ইহারা সর্বদাই খুব ধর্মীয় ভাবাপন্ন। প্রকৃতির এই ধারা অনুসরণ করিয়া, প্রত্যেক দেশের এবং কালের শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় ভাবাপন্ন হইবার জন্ম নিজদিগকে কৃত্রিম উপায়ে—অনশনে, অনুশোচনায়, দুর্বল করিয়া লইয়াছে। দৈহিক দুর্বলতা এবং মানসিক দুর্বলতা, দুইই ধর্মীয় ভাব লালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। স্বজনহারা ব্যক্তি, হতাশ ব্যক্তি, অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম একটি সান্ত্বনাদানকারী আশ্রয়। বন্দী মণ্টি ক্রিস্টোর ক্ষত-হৃদয়ে ইহা সন্তাপ-নিবারণী প্রলেপের কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই, অথবা ভেনিসে ডোজদের (ডোজ=প্রধান বিচারক) প্রাসাদের ভূনিম্নস্থ কক্ষগুলির ভিতর দিয়া লইয়া যাইবার সময় গাইড যে মুমূর্ষু অনুতপ্ত হতভাগ্যের কাহিনী শুনাইতে-ছিল তাহার পক্ষে ধর্ম সান্ত্বনার কারণ। আমাদের দেশের বহু ব্যক্তি এই রূপ দেহমন ক্ষীণ করিয়া মনে ধর্মের প্রলেপ পুরা উপভোগের জন্ম প্রস্তুত হয়। ইহাই তাহাদের হবি, ইহা ভিন্ন অন্ত হবি তাহাদের নাই। অধিকাংশই সংসারের চাপে অস্থির অতএব ইহা ভিন্ন অন্ত হবির কথা তাহাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব। ঈশ্বরের দিকে মন দেওয়া ভাল কাজ। কিন্তু ধর্ম বিকৃত রহস্তবাদের দিক হইতেই হউক অথবা উদ্দাম উন্মাদনার দিক হইতেই হউক—উভয় দিক হইতেই ধর্ম মস্তিষ্ক-বিকারে পরিণত হয়। এই দুই জাতীয় মস্তিষ্ক-বিকারের মধ্যে শেষেরটি আমার পছন্দ।

কাউণ্টেস অভ রোজবেরি, করেন অফিসের নিকটস্থ তাঁহার লণ্ডনস্থ গৃহে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অন্তান্ত নিমন্ত্রণকারী—ডাচেস অভ ওয়েস্টমিনস্টার তাঁহার হাইড পার্ক সন্নিহিত গৃহে। মার্কুইস অভ হার্টফিল্ড, ও ডিউক অভ নর্দামবারল্যাণ্ড—সাইয়ন হাউসে, গার্ডেন পার্টিতে। ১৮৭৪ সন পর্যন্ত ডিউকের লণ্ডন বাস ছিল স্ট্রাণ্ডে, নর্দামবারল্যাণ্ড হাউসে। পথ নূতন ভাবে প্রস্তুতের জন্ম ঐ গৃহটি ভাঙিয়া দেওয়া

হয়। অতঃপর তিনি সাইয়ন হাউসে বাস করিতে থাকেন। এটি কিউ গার্ডেনস-এর কাছে লণ্ডনের সাবার্বে, কয়েক মাইল পশ্চিমে। নর্দামবারল্যাণ্ড হাউসের মাথায় একটি প্রস্তর-নির্মিত সিংহ ছিল, তাহা এক্ষণে সাইয়ন হাউসের মাথায় আনিয়া বসান হইয়াছে। এই সিংহ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে, ইহা হইতে বুঝা যায় অন্ধবিশ্বাসী মানুষ পৃথিবীর সব স্থানেই আছে। একদা একটি লোক প্রচার করিয়াছিল, সে এই সিংহের ল্যাজ নড়িতে দেখিয়াছে। শুনিবামাত্র সিংহের চতুর্দিকে বিরাট ভিড় হইল, সিংহ কখন আবার ল্যাজ নাড়ে তাহা দেখিবে। দূর-দূরান্তর হইতে লোক আসিয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া রাস্তায় এমন ভিড় জমিয়া ছিল যে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ গঠিত জন্তুটি সকলকেই সেদিন নিরাশ করিল। এমন কি বহু অপেরা গ্লাস এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভাবেও সে ল্যাজ একচুল নড়িল না। সাইয়ন হাউসের একটি ইতিহাস আছে। পূর্বে এটি পঞ্চম হেনরি প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ ছিল—ইহা সাইয়নের সেন্ট সেভিয়র ও সেন্ট ব্রিজেটের নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। অষ্টম হেনরি এই সম্পত্তির অভিভাবকত্ব সমারসেটকে দান করেন, এবং তিনি ইহাকে প্রাসাদে পরিণত করেন। পরে এটি ডিউক অভ নর্দামবারল্যাণ্ডের অধীনে আসে। ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে এই স্থান হইতে লেডি জেন গ্রে টাওয়ার অভ লণ্ডনে গিয়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাঁহার দাবি পেশ করেন। এবং এইস্থান হইতেই, চার্লস-১ এর শিরশ্ছেদের পূর্বে তাঁহার সন্তানদের সেন্ট জেমস প্যালেসে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়।

এক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠান দেখিতে ক্যামব্রিজে গিয়াছিলাম। অনুষ্ঠানটি সার জর্জ বার্ডউড, সার এডওয়ার্ড বাক ও নরসিংগড়ের মহারাজাকে এল্‌এল্‌-ডি উপাধিদান উপলক্ষে। যাত্রার জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে পৌছানর পর অভ্যর্থনা সমিতি আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। এই সমিতি টাউন কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দ্বারা যুগ্মভাবে গঠিত হইয়াছিল। নানা দর্শনীয় দেখিবার পর আমরা ক্লান্ত বোধ করিলে আমাদিগকে গিলডহলে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে আমাদের সম্মানার্থে খুব চমৎকার ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান সেনেট হাউসে অপরাহ্নে আরম্ভ হইল। হাউসটি দেখিতে খুব সুন্দর, করিন্‌থিয়ান স্টাইলে নির্মিত স্তম্ভগুলির শীর্ষ বা ক্যাপিট্যাল রোমের জুপিটার মন্দিরের স্তম্ভশীর্ষের অনুসরণে নির্মিত। সীলিং খুব উচ্চাঙ্গের অলঙ্করণে সজ্জিত এবং মেঝে কালো ও শাদা মার্বলে নির্মিত। মঞ্চে ভাইস চ্যানসেলর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সভ্যগণ উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা এই মঞ্চের পাশে আসন দখল করিলাম। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা কয়েক শত হইবে, তাহারা উপরের গ্যালারিতে বসিয়াছিল। এবং সেই উচ্চ স্থান হইতে তাহারা মঞ্চে উপবিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক মণ্ডলীর উদ্দেশে নানা রকম রসিকতা নিক্ষেপ করিতেছিল। এ সবই স্ফূর্তি ও কৌতুকের পরিচায়ক। উদ্দিষ্ট সকলেই ইহা সম কৌতুকের সঙ্গেই গ্রহণ করিলেন। আমরা অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা এইটিই বেশি উপভোগ করিয়াছিলাম। প্রথমে ভাইস চ্যানসেলরের ভাষণ দ্বারা অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। তাহার পর যাঁহারা ডিগ্রী গ্রহণ করিবেন তাঁহারা একে একে মঞ্চে আনীত হইলেন। একজন প্রোফেসর ল্যাটিন ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। ছাত্ররা মাঝেমাঝে নানা মন্তব্য করিয়া বাধা সৃষ্টি করিতেছিল, প্রোফেসরটিও হাসিমুখে তাহার জবাব দিতেছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতেই কৌশলে মুখ ফিরাইয়া জবাব দিতেছিলেন। যাহা শুনিলাম তাহার সব কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, মোটামুটি ভাবার্থটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বক্তৃতা শেষ হইলে সম্মানসূচক আচ্ছাদনে নূতন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডক্টরকে সজ্জিত করা হইল। অতঃপর তাঁহার স্থান দ্বিতীয় জন গ্রহণ করিলেন। তারপর তৃতীয় জন।

এইভাবে অনুষ্ঠান শেষ হইল। কিন্তু ছাত্ররা এখনও তৃপ্ত নহে, তাহাদের ইচ্ছা আরও বক্তৃতা চলুক, কিন্তু সে ইচ্ছা তাহাদের পূরণ হইল না।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দেখিতে গেলাম। এখানে ৪,৬০০০০ এর উপর গ্রন্থ আছে, উপরন্ত বহু পাণ্ডুলিপিও রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পর কিং'স কলেজে গেলাম। ১৪৪১ সনে ষষ্ঠ হেনরি কর্তৃক এই কলেজটি স্থাপিত হয়। এখান হইতে আমরা একটি সুন্দর চ্যাপেলে গেলাম, তাহার সকল অংশের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রদ্ধেয় গাইডগণ আমাদের দেখাইলেন। আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল রঙীন কাঁচের জানালাগুলি, এগুলির উপর বাইবেলের কাহিনী চিত্রিত ছিল। এই চিত্রগুলি ১৫১৫ হইতে ১৫৩১ সনের মধ্যে নির্মিত। কিং'স কলেজ দেখিবার পর আমরা আরও দুইটি কলেজ পরিদর্শন করিলাম। ইহাদের একটির অঙ্গনের একটি গাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। শুনিলাম ইহা মিলটন কর্তৃক রোপিত হইয়াছিল। এই গাছ হইতে একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইলাম।

মেসার্স র‍্যান্‌সম্‌স্ সিম্‌স্ অ্যাণ্ড জেফ্রিস আমাদিগকে ইপসউইচে অবস্থিত অরওয়েল কারখানা দেখিতে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। এইখানে প্রতি বৎসর বহু কৃষি-যন্ত্রাদি নির্মিত হয়, এবং এখান হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি করা হয়। গ্রেট ইষ্টার্ণ রেলওয়ে আমাদের জন্য একখানা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই ট্রেনে আমরা ইপসউইচের বিপরীত দিকে জিপিং নদীর তীরে অবস্থিত একটি স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অরওয়েল ওয়ার্কস-এর একটি স্টীমারে আমরা নদী পার হইলাম। স্টীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া আমরা ইপসউইচের অদূরে জার্মান সমুদ্র দেখিতে পাইতেছিলাম, সেখান হইতে সমুদ্র ১২ মাইল দূরে। এখানে নানা দর্শনীয় স্থান দেখিলাম, ইপসউইচের এই সব বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শহরের লোকেদের খুব গর্ব। গ্রেট ব্রিটেনের যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই স্থানীয় লোকদের নিজ নিজ শহর বিষয়ে গর্বিত হইতে দেখিয়াছি। আমাদের কাছে তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে "শহরটি কেমন লাগিল?" ইহাতে অন্যায় কিছু নাই, কারণ নিজ নিজ স্থানের উন্নতির জন্য সে-সব স্থানের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কলহ থাকিলেও তাহা ভুলিয়া এক যোগে কাজ করে। টাউন হল, লাইব্রেরী, মিউজীয়াম এবং অন্যান্য স্থায়ী সর্বজনীন ব্যবহার্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য মোটা অর্থ দান করে। এমন কি ইপসউইচের ন্যায় ছোট শহরেও রেনেসাঁস ভঙ্গিতে নির্মিত একটি টাউন হল আছে, একটি মিউজীয়াম আছে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় আছে, একটি কর্ণ হল আছে, পাবলিক হল আছে। আর্ট গ্যালারি আছে, গবেষণার জন্য বৃক্ষোদ্যান আছে, যাত্রীদের জন্য ইনসটিট্যুট আছে, কর্মরত লোকদের জন্য কলেজ আছে। অন্যান্য দর্শনীয়ের মধ্যে Sparrowe's House নামক একটি প্রাচীন স্থাপত্য ভঙ্গির অট্টালিকা দেখিলাম। উর্সটারের যুদ্ধের পর চার্লস-২ এইখানে লুকাইয়া ছিলেন এবং এখানকার পাবলিক হাউস (মদের দোকান) ডিকেন্স-এর সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র মিস্টার পিকউইকের নৈশ অভিযানের স্থান রূপে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর আমরা অরওয়েল কারখানা দেখিতে চলিলাম। অরওয়েল নদীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এখানে একটি ফাউনড্রি বা ঢালাইয়ের কারখানা আছে। এই কারখানাটি ওদেশের সর্ববৃহৎ আলো হাওয়ার ব্যবস্থাযুক্ত কারখানা। এখানে অবিরাম গলিত ধাতু পাত্রে বাহিত হইয়া ছাঁচে ঢালাই হইতেছে। প্রতি বৎসর এখানে লক্ষ লক্ষ লাঙলের ফলা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফাউনড্রি হইতে আমরা কামারের কারখানায় গেলাম। এখানে বহুসংখ্যক চুল্লি আছে, সেখানে লৌহ দণ্ড উত্তপ্ত করিয়া তাহা হইতে নানা হাতিয়ার নির্মিত হইতেছে। বাষ্প পরিচালিত শস্য মাড়াইয়ের যন্ত্র দেখিলাম, ইহা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের পক্ষে খুব উপযোগী। কারখানার প্রতিনিধিগণ আমাদের জন্য উত্তম লাঞ্চের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা কে আমাদের বেশি খাতির করিবেন তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন। মিস্টার জেফ্রিস, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-গণ বিশেষ ভাবে আমাদিগকে যত্ন করিতেছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের একজন বড় অফিসার তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতেন, তাঁহার নাম মিস্টার আর. বি. মুখার্জি। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে ওখানে পাঠাইয়াছিলেন কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উদ্দেশ্যে। সবাই তাঁহার খুবই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং জেফ্রিস দম্পতি ও সন্তানগণ মিস্টার মুখার্জিকে তাঁহাদের শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের ছোট্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কথা তাঁহাকে কি জানাইব? সে বলিল, "Give my love to Mr. Mukharji."

ক্রমশঃ

শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্য-জীবন'-এর আলোয়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বহুযুগের ওপার থেকে আমাদের কানে আজও ভেসে আস্‌ছে ভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত দিব্যবাণী : অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌। "যে পৃথিবীতে এসেছো তুমি, তা অনিত্য এবং দুঃখময় ; সুতরাং ভালোবাসো আমাকে, আরাধনা করো আমার।" যুগে যুগে কত বাণী কত কণ্ঠে উচ্চারিত হোলো। তাদের বেশীর ভাগই কালের বুকে ক্ষণিকের তরঙ্গ তুলে আবার মিলিয়ে গেছে কাল-সমুদ্রের বক্ষে। কিন্তু গীতার দিব্যসঙ্গীতের ঐ ধুয়াটীর মধ্যে চিরন্তনের এমনই একটি স্পর্শ আছে যা আমাদের অন্তরের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যের সমস্ত তমসাকে অপসারিত করে একটি অপরাজেয় আশার সোনার কাঠির ছোঁয়ায়।

"আমাকে ভালোবাসো, আমার আরাধনা করো।" কেন ভগবানকে ভালোবাস্‌বো ? কেন তাঁর ভজনা করবো ? কারণ তাঁর মধ্যেই যে আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ রয়েছে। তিনি যে সচ্চিদানন্দ। তিনি যে শুধু সৎ অর্থাৎ আছেন, তা নয় ; তিনি যে শুধু চিদ্‌ঘন, তাও নয় ; তিনি পরমানন্দঘনমূর্ত্তি অনন্ত বাসুদেবও বটে। তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁর নিজের মধ্যে তরঙ্গিত হচ্ছে একটি কূলশূন্য আনন্দের সমুদ্র। যাঁকে আমরা ভগবান বলি তিনি সৎ অর্থাৎ সত্য অর্থাৎ যাঁর কখনো কোন পরিণাম নেই,সর্ব্বদেশে যিনি বিরাজমান এবং যিনি সবই হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, Sachchidananda of the Vedanta is one existence without a second ; all that is, is He. আনন্দকে সৎ থেকে কোনকালেই বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার উপায় নেই। নাম-রূপের এই যে বৈচিত্র্যময় জগৎ—এই জগৎ তো তাঁরই লীলা যিনি আছেন ব'লেই সব আছে, পরমচৈতন্যস্বরূপ যাঁর চিচ্ছক্তির নিরন্ত প্রকাশ সৃষ্টির এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, আর বিচিত্রকে এই যে তিনি অনবরত প্রকাশ ক'রে চলেছেন রূপের অন্তহীন লীলার মধ্যে—এই নিত্য নব সৃষ্টির বিচিত্রতা একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আস্বাদন থেকে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, That play is the universe and that delight is the sole cause, motive and object of cosmic existence. এই বিশ্বজগৎ তো সেই ভুবনেশ্বরের খেলারই অঙ্গ আর এই খেলা চলতেই পারতো না যদি না খেলার মধ্যে থাকতো সেই লীলাময়ের আনন্দ। এ খেলার উৎপত্তি একমাত্র আনন্দ থেকেই, এ খেলার পিছনে রয়েছে শুধু আনন্দেরই প্রেরণা, এ খেলার লক্ষ্যও আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ঋষি বলছেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ থেকেই এই সমস্ত জীবের উৎপত্তি, আনন্দকে আশ্রয় ক'রেই এরা বেঁচে আছে এবং আনন্দের মধ্যেই এরা মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব জুড়ে এই যে লীলার একটা অফুরন্ত স্রোত বয়ে যাচ্ছে—এই লীলার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আনন্দ ছাড়া আর কোন হেতুর সন্ধান পাইনে আমরা। যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয় তিনি তো পূর্ণ, অনন্ত, কোনোই অভাব নেই তাঁর, কোন কিছুই কামনা করেন না তিনি। তবে কোন্‌ প্রয়োজনের তাগিদে ব্রহ্ম চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় করে

নামরূপের এই সংখ্যাহীন জগৎ সৃষ্টি করতে গেলেন? খুবই বিদ্‌ঘুটে এই প্রশ্ন। যাঁর কোন অভাব নেই, কোন বাসনা নেই জগৎ সৃষ্টির জন্য—কেন তাঁর এই মাথা ব্যথা? চির-মুক্ত তিনি। তিনি সক্রিয় হ'য়ে রূপের লীলায় নিজেকে প্রকটিত করবেন অথবা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে নিজের মধ্যে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের শক্তিকে গুটিয়ে রাখবেন—সবই একান্ত ভাবে নির্ভর করে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপরে। তিনি তো কারও অধীন নন। তবুও তিনি যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে সৃষ্টির বন্ধনকে স্বীকার ক'রে নেন, অসীম হ'য়েও সীমার মধ্যে আপন সুরটিকে বাজাতে থাকেন, অরূপ হ'য়েও রূপের লীলায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন তখন ব্রহ্মের এই লীলায়নের পিছনে একটি মাত্র কারণই আমরা আবিষ্কার করতে পারি এবং এই কারণটি হোলো আনন্দ। আনন্দ॥ আনন্দ॥। From Delight all these beings are born, by Delight they exist and grow, to Delight they return. তৈত্তিরীয় উপনিষদ—ইংরেজী অনুবাদ—শ্রীঅরবিন্দ।

কিন্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দই যদি সমস্ত কিছু হ'য়ে থাকেন, এই বিশ্বভুবন যদি সেই পরিপূর্ণ পরমসত্তার লীলার আনন্দের জন্যই তৈরী হ'য়ে থাকে তবে জগতে দুঃখ কেন? কারণ যিনি সৎ অর্থাৎ আছেন, ছিলেন এবং অনন্তকাল ধরে থাকবেন, দেশ-কাল-বস্তুর দ্বারা সীমিত নন যিনি, তাঁর অস্তিত্বের পরিপূর্ণতার মধ্যে যেমন শূন্য (nothingness) বলে কিছু থাকতেই পারে না, তেমনি দুঃখ ব'লেও কিছু থাকতে পারে না। অসীমের মধ্যে আনন্দ নেই, এমন কথা আমরা ভাবতেই পারিনে। কেন ভাবতে পারিনে? কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "All illimitableness, all infinity, all absoluteness is pure delight." সমস্ত নিঃসীমতা, সমস্ত অন্তহীনতা, সমস্ত পরিপূর্ণতা একটি বিশুদ্ধ আনন্দ। চিদ্‌ঘন পরমসত্তার পূর্ণতার মধ্যে অসীম আনন্দেরই ছড়াছড়ি। সত্য আর আনন্দ—এ দুটো শব্দ পৃথক হ'লেও একটা থেকে আর একটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলে, যেখানে সীমা সেখানেই অতৃপ্তি। দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখবো, যেখানেই পরিণামশীল কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আমাদের হৃদয় আমরা ভ্রান্তির বশে অর্পণ করি সেখানেই জীবনে দুঃখকেই আমরা ডেকে আনি। পক্ষান্তরে সীমার বন্ধনকে অতিক্রম ক'রে যেখানে আমাদের সমস্ত সত্তা দিক থেকে দিগন্তরে বহুজনের মধ্যে বিকীর্ণ হ'য়ে যায় সেখানেই চৈতন্যের সেই মহাবিকিরণ আনন্দের একটি অনির্ব্বচনীয়তায় আমাদের হৃদয়কে কানায় কানায় ভরিয়ে তোলে। যা সীমিত, যার পরিণাম আছে—তা সে বস্তুই হোক অথবা ব্যক্তিই হোক—তাকে ভালোবাসলে দুঃখ পেতেই হবে। মনে পড়ছে স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী: "ভ্রান্তিবশতঃ কোন পরিণামশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয় অর্পণ করিও না। কারণ তাহা হইতে দুঃখের উদ্ভব। তুমি বন্ধু বিশেষকে ঐরূপ হৃদয় অর্পণ করিতে পারো, কিন্তু কাল সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তুমি স্ত্রীকে হৃদয় অর্পণ করিতে পারো, কিন্তু সে হয়ত কাল বাদে পরশু মরিয়া যাইবে। এই রূপেই জগৎ চলিতেছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, সেই প্রভু ভগবানই একমাত্র অপরিণামী। তাঁহার ভালোবাসার কখনো অভাব হয় না।" ব্যক্তিকে বা বস্তুকে ভালোবেসে দুঃখ কেন? কারণ যাকে ঢেলে দিচ্ছ হৃদয়ের ভালোবাসা সে তো তোমার ভালোবাসার বন্ধনের মধ্যে থাকতে রাজী নয়। আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেমন জল গলে যায় তেমনি যাকেই তুমি হৃদয় অর্পণ করছো সে-ই তোমার আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে কোন্ সুদূরে স'রে যাচ্ছে। যে মানুষটাকে আজ তুমি ভালোবাসছো একবছর পরে দেখবে সেই মানুষটা আর সে-মানুষ নেই। সে একদম বদ্‌লে গেছে। তোমাকে সে যেন বুঝতেই পারছে না। তার হৃদয়ের মধ্যে তোমার জন্য যদি বা একটু জায়গা অবশিষ্ট থাকে সেই প্রেমের স্বল্পতা তোমাকে নিরাশ করবে। আর অল্পে তো মানুষের সুখ নাই। মানুষের আনন্দ ভূমায়। তাই তো এমন কাউকে আমরা ভালোবাসতে চাই যাঁর প্রেমের মধ্যে উত্তম পুরুষের একবচনের নাম-গন্ধ নেই, যিনি

প্রতিদানের কোন অপেক্ষা না রেখে ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসবেন আমাকে, যাঁর হৃদয়কে অধিকার ক'রে থাকবো শুধু আমি। তাই আনন্দের জন্যই আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা নিবেদন ক'রে দেবো তাঁকেই যাঁর কখনো কোনো পরিণাম নেই, যাঁর ভালোবাসার কখনো অভাব হয় না। আর একমাত্র অপরিণামী তো ভগবানই। তিনি সৎ। তাই তাঁর মধ্যেই আমাদের যথার্থ আনন্দ। স্বামীজীর ভাষায়, "হৃদয়ের ভালোবাসায় কেবল একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার? তাঁহারই অধিকার, যাঁহার কখনো কোনো পরিণাম নাই। কে তিনি? ঈশ্বর।"

সুতরাং এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে: যা কিছু নিঃসীম, যা কিছু শাশ্বত তার অন্তহীনতা, তার পরিপূর্ণতা একটি বিশুদ্ধ আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সত্য যিনি, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ যিনি, ঠাকুরের ভাষায় 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' যিনি তাঁকে খণ্ডিত ক'রে দেখার কোনো মানে হয় না। যিনি সৎ, তিনিই আবার আনন্দ। তবুও যখন আমরা বলি, ব্রহ্মের অসীম সত্তার আনন্দ-অংশ থেকে এই সকল ভূতের উৎপত্তি হয়েছে তখন এমন ধারণা আমরা যেন না ক'রে বসি যে ব্রহ্মের এই আনন্দ (self-delight of Brahma) কোথাও গিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই আনন্দ নিজেকে অবারিত ক'রে চলেছে সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় অনন্ত প্রবাহের মধ্যে। ব্রহ্মের এই যে সৃষ্টির খেলা চলেছে সংখ্যাহীন সৌরজগৎ জুড়ে—এই তো শক্তিরই খেলা। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম আপন পরমাশক্তিকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টির অন্তহীন প্রবাহের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। এই প্রকাশ কোনো বাধ্য-বাধকতা থেকে আদৌ নয়। যে-ব্রহ্মের চিন্ময় অনন্ত সত্তার মধ্যে রয়েছে একটী পরিপূর্ণতা তিনি যে সর্বতোভাবে স্বাধীন, তিনি যে তাঁর কর্মের অধীন নন, এটি আমাদের ধরে নিতেই হবে। কারণ, ব্রহ্ম যদি প্রকৃতির ইচ্ছায় পরিচালিত হন তবে তিনি চিদ্‌ঘন সর্ব-শক্তিমান্ ব্রহ্ম নন। তিনি অনন্ত হতে পারেন কিন্তু সেই অনন্ত জড়েরই পর্য্যায়ভুক্ত। তিনি শক্তির চেতন অধিকারী হ'তে পারেন—কিন্তু সেই শক্তির সর্বময় কর্তা তিনি নন, কারণ তাঁর শক্তিই প্রভু হয়ে তাঁকে চালাচ্ছে। শ্রী অরবিন্দ বলছেন, **A Brahma compelled by Prakriti is not Brahma, but an inert Infinite.** সুতরাং ব্রহ্মের শক্তির সৃজনাত্মক এই খেলা যখন বাধ্যতা-মূলক নয় তখন ধরে নিতে হবে, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিতি-বিধায়িনী প্রলয়ঙ্করী শক্তির মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করতেও পারেন, না-ও করতে পারেন। গতির যে একটা শক্তি, একটা বেগ বা প্রৈতি রয়েছে তাঁর মধ্যে সেই শক্তিকে প্রকটিত করার অথবা না করার অন্তর্নিহিত অধিকার তারই।

তাই যদি হয় তবে স্বীকার করতেই হয়, নিজের আনন্দকে আস্বাদন করবার জন্যই লীলার এই অফুরন্ত স্রোত ব'য়ে চলেছে জগৎ জুড়ে। এই অনন্ত গতিশীলতার ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্রহ্মের স্বতঃস্ফূরিত আনন্দেরই প্রকাশ, প্রেমেরও প্রকাশ কারণ ভগবান প্রেমস্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ; **God is Love and Delight.** যাকে আমরা বিশ্বসত্তা বা **World existence** বলি—সে তো শিবের আনন্দময় নৃত্য। সেই নটরাজ আনন্দে পাগল হ'য়ে নাচছেন আর সেই নাচের ঘূর্ণীপাক ভাগবানের দেহকে কতরূপেই না আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রকটিত করছে। কিন্তু এই চঞ্চল নৃত্যের মধ্যে মহাদেবের শুভ্র সত্তার প্রশান্ত স্থৈর্য্য রয়েছে অটুট, অতলস্পর্শী। নৃত্যের চাঞ্চল্য সেই স্থৈর্য্য এবং প্রশান্তিকে আদৌ স্পর্শ করছে না। ভগবান যা ছিলেন, অনন্ত কাল ধরে যা আছেন এবং অনন্ত কাল ধ'রে যা থাকবেন তাতে কোনোকালে কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগবে না। সমস্ত পরিবর্তনকে অতিক্রম ক'রে আছে সেই পরমসত্তা। নাচের আনন্দই হচ্ছে নটরাজের নৃত্যের একমাত্র লক্ষ্য। কী অপূর্ব ভাষায় শিবনৃত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: **World-existence is the ecstatic dance of Shiva which multiplies the body of the God numberlessly to the view;**

it leaves that white existence precisely where and what it was, ever is and ever will be; its sole absolute object is the joy of the dancing. এই বিশ্বসত্তা, World-existence যদি শিবের আনন্দময় নৃত্য না হোতো, এই নৃত্যের মধ্যে যদি সচ্চিদানন্দের আনন্দরূপের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ না থাকতো তবে কোথায় থাকতো সৃষ্টির মধ্যে রূপের এই অন্তহীন বৈচিত্র্য ?

"মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হ'তে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হ'ত স্বপনের।" (বলাকা-রবীন্দ্রনাথ)

ব্রহ্মের তো কোনো অভাব নেই, কোনো কামনা নেই। তিনি তো পূর্ণ।

"নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।" (বলাকা)

পূর্ণ যিনি, সমস্ত অভাবের ঊর্ধ্বে যিনি, জগৎসৃষ্টির জন্ত তাঁর এমন কি দায় ছিল ? সবই তাঁর ছিল, ছিলো না শুধু ধন-মানের পরিপূর্ণতার মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দ।

"পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই তো একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে।"
(বলাকা)

এই আনন্দের জন্তই, হে পূর্ণ ব্রহ্ম, তুমি

"এমনি ক'রেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্য্যোদয়।
এমনি ক'রেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।" (বলাকা)

কিন্তু যিনি সৎ অর্থাৎ যিনি আছেন, ছিলেন এবং চিরকাল ধরে থাকবেন তিনি যদি অনন্ত আনন্দই হন, আনন্দই যদি তাঁর স্বরূপ হয় তবে জগৎজুড়ে এত দুঃখ,এত কষ্ট কেন ? কারণ বাইরে থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই পৃথিবী দুঃখে ভরে রয়েছে। বেদনা ভরা সংসারে সুখ যেন আগন্তুক পাখী ;—কিছুক্ষণের জন্ত শাখায় ব'সে তাকে দোলা দিয়ে ফুরুৎ ক'রে উড়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine-এ এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গিমা। তিনি বলছেন, জীবনে আনান্দর পরিমাণ দুঃখের পরিমাণের অনুপাতে অনেক বেশী। The sum of the pleasure of existence far exceeds the sum of the pain of existence. অস্তিত্বের মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে সেই আনন্দই হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা, আমাদের একেবারে খাঁটি ঘরের জিনিষ। দুঃখ স্বাভাবিক নয়। ওটা ক্ষণকালের জন্ত এসে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। আনন্দ আমাদের সহজ স্বাভাবিক সম্পদ ব'লেই তার সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই। আমাদের চেতনায় সে থেকেও নেই। চোখ আমাদের এত বড়ো সম্পদতার সম্পর্কেও একই কারণে আমাদের চেতনার অভাব। আনন্দ যখন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সুখের অনুভূতির তরঙ্গচূড়ায় পৌঁছায় তখনই তার তীব্রতার মধ্য দিয়ে আনন্দের স্পর্শ আমরা অনুভব করি। সুখের এই তীব্রতাই আমাদের কাছে আনন্দ রূপে প্রতিভাত হয়। এই আনন্দকেই আমরা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু প্রাত্যহিকের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটির মধ্যে বেঁচে থাকার যে একটা সহজ আনন্দ আছে তা আমাদের কাছে কেমন যেন

পানসে। তা সুখও নয়, দুঃখও নয়। তবু জীবনের মধ্যে আনন্দ তো রয়েছেই, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন a great practical fact. কারণ, আনন্দের জন্য যদি একটা সর্ব্বজনীন এবং সর্ব্বগ্রাসী প্রবণতা না থাকতো তবে জীবনকে আঁকড়ে থাকবার একটা জোরালো প্রবৃত্তি এমন ক'রে আমাদের রক্তের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারতো না। এই self preservation-এর প্রবণতা এলো কোথা থেকে? নিশ্চয়ই বেঁচে থাকার মধ্যে একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে ব'লেই জীবনকে আমরা ভালোবাসি। জীবন ক্ষণিকের তা জানি। কবির ভাষায়

"তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,
শেষ ক'রে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।
(বলাকা)

কিন্তু জগৎকে, জীবনকে 'এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া'ই কবির কাছে সত্যের চূড়ান্ত নয়। মৃত্যুর ছায়ায় আমরা বাস করছি ঠিকই, কিন্তু কী গভীর ক'রে জীবনকে আমরা চাইছি। জগতকে কী গভীর করে আমরা ভালবাসছি। এই একান্ত করে চাওয়ার মধ্যে কি কোন সত্যই নেই? এই 'লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা' সুন্দর ভুবনে আমরা কি কেউ সাধ ক'রে মরতে চাই? মানুষের মধ্যে আমরা কি বেঁচে থাকতে চাই নে? জানি তো এই পৃথিবীর পান্থশালায় দিগদিগন্ত থেকে সমাগত আমরা যাত্রীরা এক রাত্রির জন্য মিলিত হয়েছি। রাত্রির অবসানে চলে যাবো একা একা অজানার মধ্যে। সঙ্গে কেউ যাবে না। তবুও পান্থশালায় আগুনের ধারে ক্ষণিকের এই কলরবমুখর আড্ডা আমাদের মুসাফিরদের কাছে কতই না প্রিয়।

"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো-অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে;
অবশেষে
এক হ'য়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।" (বলাকা)

দুঃখকে এড়িয়ে যাবার দিকে একটা প্রবণতা সর্ব্বজনীন। "কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালোবাসা?" জীবনের পানপাত্র যদি বেদনার তিক্তরসে কানায় কানায় ভরা থাকতো তবে জীবনকে কেউ আমরা ভালোবাসতাম না। 'মরণ হ'লে বাঁচতাম'—ওটা আমাদের শুধু একটা মুখের কথা। তবুও বেঁচে থাকার আনন্দের দিকটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে দুঃখে যে আমরা এত বিচলিত হয়ে পড়ি তার কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: "It is abnormal to our being, contrary to our natural tendency and is experienced as an outrage on our existence, an offence and external attack on what we are and what we seek to be." "দুঃখ জিনিষটা আমাদের সত্তার পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়; আমাদের সহজ প্রবণতা দুঃখকে আমল না দেওয়ার দিকেই, দুঃখের অভিজ্ঞতাকে আমাদের অস্তিত্বের উপরে একটা হামলা ব'লেই আমরা মনে করি, আমরা মূলতঃ যা এবং যা আমরা হ'তে চাই, দুঃখ তার উপরে একটা বহিরাক্রমণেরই সামিল, দুঃখ তার বিরুদ্ধে একটা অপরাধ।"

ঔপনিষদিক তত্ত্বের আলোয় এটা পরিষ্কার ক'রে বোঝা গেল, আনন্দের জন্য মানুষের মধ্যে রয়েছে একটা

অপরাজেয় প্রবণতা। আনন্দকে অন্বেষণ করার দিকে জীবনের এই যে ঝোঁক রয়েছে, এর শিকড় আমাদের একেবারে মর্ম্মের মজ্জার মধ্যে। বস্তুতঃ আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত ব্যাপারটাই আনন্দ পাওয়ার জন্যই। এই আনন্দের অন্বেষণকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: the fundamental impulse and sense of Life. আগামীকালের আনন্দের উজ্জ্বল সম্ভাবনাই তো মানুষকে দিচ্ছে বেঁচে থাকার প্রেরণা। তার চারদিকে যা-কিছু, সবই তো জলবুদ্বুদের মতো ফুটেই মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন বাজিকরের ভোজবাজি। এই আছে, এই নেই। কাল-স্রোতে ভেসে চলেছে জীবন-যৌবন-ধন সমস্ত কিছুই।

"অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে;
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল-সমুদ্রের 'পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডমরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর-মাঝে
নয় নয় নয়।" (পরিশেষ—রবীন্দ্রনাথ)

এই প্রলয়ের তীরে, মৃত্যুর এই ছায়ায় মানুষের কিন্তু বেঁচে থাকার আগ্রহ কী প্রবল। স্বামীজীর ভাষায়,

"সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালোবাসা।

সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা।"

প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির ধারা যখন ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে তখনও মানুষ কিসের আশায় জীবনের প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে আছে? নিশ্চয়ই আনন্দের আশায়। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন—The unconquerable impulse of man towards God, Light, Bliss, Freedom, Immortality অর্থাৎ ভগবান, আলো, আনন্দ, স্বাধীনতা, অমরতা—এদের জন্য মানুষের অপরাজেয় যে একটা প্রবণতা—এই প্রবণতাই বিশ্বব্যাপী বিনাশের অকরুণ খেলার মধ্যেও আমাদিগকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনন্য-করণীয় ভাষায়,

"যাবে সব যাবে চলে, তবু ভালোবাসি,—
চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান।"

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, ভগবান যখন সচ্চিদানন্দ এবং এই সমস্ত কিছুই যখন সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন দুঃখ-ব্যথার অস্তিত্ব আদৌ কেমন ক'রে সম্ভব? সচ্চিদানন্দ তো প্রকৃতির ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত কোন জড় সত্তা নন। তিনি চিদ্ঘন, পরম চৈতন্যস্বরূপ। সেই শান্তম্, শিবম্ অদ্বৈতম্-এর আনন্দময় নৃত্যই হচ্ছে এই জগৎ। এই নৃত্যলীলায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সেই সুন্দরের "পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন।" তাই যদি হয়, ভগবান যদি চিদ্ঘনই হন এবং সৃষ্টি যদি হয় ভগবানের চিত্ত-শক্তির 'নিঃশেষ আনন্দেরই আন্দোলন' তবে সেই আনন্দঘন চিন্ময় পরম দেবতা তাঁর সৃষ্ট জগতের জীবগণকে এত দুঃখের আগুনে পোড়াচ্ছেন কেন? পৃথিবীতে অশুভশক্তির এত প্রাদুর্ভাব কেন? আমারা যদি বলি দুঃখ হচ্ছে একটা অগ্নি-পরীক্ষা, যে আগুনে পুড়িয়ে তিনি আমাদিগকে শুদ্ধ করেন তা হলেও এই জবাবের মধ্যে নৈতিক সমস্যার সমাধান নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ। প্রমাণিত হয় ঈশ্বর প্রতাপশালী যাঁর নিয়মের কাছে নতিস্বীকার না ক'রে উপায় নেই, বড়ো জোর যাঁর খেয়ালকে তৃপ্ত করবার আশা আমরা পোষণ করতে পারি। কারণ, যিনি নির্য্যাতন আবিষ্কার করেন আমাদের যাচাই করবার একটা উপায় হিসাবে, যন্ত্রণা দিয়ে যিনি আমাদের পরীক্ষা ক'রে দেখেন আমরা খাঁটি না ভেজাল, তিনি হয় স্বেচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার অপরাধী, নয় তো নৈতিক কোনো চেতনা নেই তাঁর মধ্যে। এই নৈতিক সমস্যার জটিলতাকে এড়ানোর জন্য যদি আমরা বলি, নৈতিক কোন পাপ করলে—তা এজন্মেই হোক অথবা পূর্ব্ব জন্মেই হোক—তার ফল ভুগতেই হবে এবং পাপের সেই অনিবার্য ফল হচ্ছে দুঃখ,

স্বাভাবিক পরিণাম হচ্ছে শাস্তি তা হলেও কিন্তু মূল নৈতিক সমস্যার গিঁট আমরা খুলতে পাচ্ছিনে। শেষ প্রশ্ন থেকেই যায় : কে মানুষের মধ্যে তৈরী করলো অশুভ প্রবৃত্তি? পাপ করার প্রবণতা এলো কোথা থেকে? নৈতিক পাপ তো আসলে মানসিক ব্যাধি অথবা অবিদ্যা। মানসিক ব্যাধি থেকে বা অবিদ্যা থেকে নৈতিক অপকর্ম যদি আমরা ক'রেই ফেলি তবে তার জন্য এত সাংঘাতিক শাস্তি পেতে হবে কেন? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : "The inexorable law of Karma is irreconcilable with a supreme moral and personal Deity, and therefore the clear logic of Buddha denied the existence of any free and all-governing personal God; all personality he declared to be a creation of ignorance and subject to Karma." অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমনি ফল এই নির্মম নিয়ম এবং করুণা-ঘন এক পরম দেবতার অস্তিত্ব—এ দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? এবং এই কারণেই বুদ্ধের পরিচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধি অস্বীকার করেছিলো সর্ব্বনিয়ন্তা স্বাধীন কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন সমস্ত ব্যক্তিসত্তাই অবিদ্যার সৃষ্টি, কর্ম্মের অধীন।"

কিন্তু সচ্চিদানন্দই যখন জগতের স্রষ্টা এবং তিনিই যখন সবই,—তখন দুঃখ ব্যথার অস্তিত্ব কেন—এ সমস্যা তো উঠবার নয়। তবুও এই সমস্যা নিদারুণ হ'য়ে আমাদের মনকে আন্দোলিত করবে যদি আমরা ধ'রে নিই—ঈশ্বর বিশ্বজগতের বাইরে রয়েছেন কোথাও এই জীব-জগৎ তিনি নন, ভালো-মন্দ, দুঃখ-ব্যথা তিনি তাঁর জীব-সকলের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু নিজে আছেন সমস্ত ভালো-মন্দের ও দুঃখ-ব্যথার উর্দ্ধে। উর্দ্ধ লোক থেকে তিনি দেখছেন সবই, জগৎ শাসন করছেনও তিনিই, দুঃখময় পৃথিবীতে তাঁরই ইচ্ছাকে পূর্ণ করছেন তিনি। তবে তাঁকে কোন মতেই মঙ্গলময় এবং প্রেমময় বলা যেতে পারে না। যদি তিনি অপরিবর্ত্তনীয় কোন নিয়মের দ্বারা জগৎকে পরিচালিত হ'তে দেন, তাঁর সাহায্য থেকে যদি জগৎ বঞ্চিতও থাকে অথবা সেই সাহায্য যদি আংশিক হয় তা হলেও তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গল ও প্রেমস্বরূপ বলায় কোন মানে হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ তাই বলছেন, On no theory of extra-cosmic moral God, can evil and suffering be explained. অর্থাৎ ভগবান জগৎ-ছাড়া,এরকম কোনো মতবাদ দিয়ে অমঙ্গল আর দুঃখের আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না। যদি করতে যাই সেটা হবে আসল প্রশ্নকে এড়ানোর জন্য যুক্তির নামে একটা প্যাঁচালো কৌশলের আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে বেদান্তের সচ্চিদানন্দ extra-cosmic বা জগৎ-ছাড়া নন। তিনি বলছেন : Sachchidananda of the Vedanta is one existence without a second : all that is, is He. বেদান্তের সচ্চিদানন্দ এক এবং অদ্বিতীয়। যা কিছু আছে, সবই তিনি। তা হলে অশুভ এবং দুঃখ যদি থাকে তবে তিনিই তো সেই দুঃখ বেদনা ভোগ করছেন জীবের মধ্যে। জীব তো তাঁরই মূর্ত্তবিগ্রহ। এই বৈদান্তিক পরমতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সমস্যাটিকে দেখলে সমস্যার চেহারাই পালটে যায়। ভগবান কেমন করে তাঁর জীবসকলের জন্য এমন দুঃখ সৃষ্টি করলেন যার থেকে তিনি নিজে মুক্ত?—এই প্রশ্নের যে উত্তর পেলাম শ্রীঅরবিন্দের The Life Divineএ, সেই উত্তরই পাই রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ ভাষায় 'মিলন' কবিতাটীর মধ্যে :

"তোমারে দিব না দোষ।জানি মোর ভাগ্যের ভ্রূকুটি,
ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত, যত তার ত্রুটি,
যত ব্যথা আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে
অহরহ। জানি যে তুমি তো নাই ছাড়ায়ে আমারে
নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে। আমি মোর তোমাতে বিরাজে।
দেওয়া-নেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত তুমি-আমি মাঝে
দুর্গম বাধারে অতিক্রমি। আমার সকল ভার
রাত্রিদিন রয়েছে তোমারি 'পরে, আমার সংসার
সে শুধু আমারি নহে।" (পরিশেষ—রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন ঔপনিষদিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। The Life Divine-এ মূলতঃ বেদান্তেরই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার মূলেও প্রাণরস ঢেলে দিয়েছে উপনিষদেরই মৃত্যুহীন বাণী, তপোবনের মৃত্যুঞ্জয় পরম ঘোষণাগুলি। শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। রবীন্দ্রকাব্যেও দার্শনিকের চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর প্রচুর। কিন্তু ঐ কাব্যের মৌলিক আবেদন আমাদের হৃদয়াবেগের কাছে। The Life Divine-এ যে সত্যকে আমরা বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোয় জানি, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই একই ঔপনিষদিক সত্যকে মর্ম্মের মধ্যে আমরা গভীর ক'রে অনুভব করি। কবির কাব্যের মধ্যে ধ্বনির এমন একটি অনির্ব্বচনীয় যাদু থাকে যা আমাদের হৃদয়ের বীণাতন্ত্রীতে বিশেষ একটা সুরকে জাগিয়ে তোলে। ঐ সুর জাগানো লজিকের নিয়মে সাজানো গদ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। আর রক্তে প্রাণ না দুললে কোনো বড়ো কাজের মধ্যে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি নে। এইখানেই কাব্যের পরম অবদানের মহিমা ব্যবহারিক দিক থেকে।

কিন্তু বিষয়বস্তু থেকে দূরে স'রে যাচ্ছি। প্রবন্ধের কলেবর আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যিনি "নাই ছাড়ায়ে আমারে নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে", আমার মধ্যে থেকে যিনি অহরহ আমার দুঃখের ভাগ নিচ্ছেন, যাঁকে extra cosmic বলার কোনো মানে হয় না, তাঁকে হৃদয়হীনতার অপরাধে অপরাধী করা চলে না। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যার একটা সদুত্তর পাওয়া দরকার। প্রশ্নটি হোলো, যিনি সচ্চিদানন্দ, এক এবং অদ্বিতীয় এবং অনন্ত, তিনি নিজের মধ্যে এমন কিছুকে স্বীকৃতি দিলেন কেন যা আনন্দ নয়, যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় আনন্দের সম্পূর্ণ বিপরীত ব'লে।

অবশ্যই এই মোক্ষম প্রশ্নের জবাব আমরা The Life Divine-এর মধ্যেই পাবো। কারণ, জীবনের গভীর সত্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে যতই paradox ব'লে মনেহোক না কেন, তাদের মধ্যে কোনখানে একটা মিল আছেই আর এই মিলকে যতক্ষণ আমরা প্রজ্ঞার আলোয় আবিষ্কার করতে না পারছি ততক্ষণ আমাদের মধ্যে একটা দারুণ অতৃপ্তি থেকেই যাচ্ছে। For all problems of existence are essentially problems of harmony. জীবনের সমস্ত সমস্যাই তো আসলে একটা সমন্বয়েরই সমস্যা। যাদের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিনে আমরা তাদের ভিতরকার অসঙ্গতির মধ্যে কোন সমন্বয় আবিষ্কারের চেষ্টা না ক'রে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে কারা? যাদের মনটা ঘুমিয়ে আছে, আচ্ছন্ন হয়ে আছে, একথা তামসিকতার মধ্যে। যাদের মন জাগ্রত তারা অজানাকে জানবার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা দুর্বার কৌতূহল অনুভব করবেই। উপনিষদের ঋষিদের মধ্যে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, অধরাকে ধরবার, মহাতমসার পারে জ্যোতিতে পৌঁছাবার একটা গভীর পিপাসা ছিল। আর তাঁদের চিত্তের মহাজিজ্ঞাসাগুলির উত্তরও তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। সচ্চিদানন্দের মধ্যে দুঃখের অস্তিত্ব কেমন ক'রে সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা। The Life Divine-এ দুঃখের সমস্যার ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

জর্জ কার্ভার জীবনে কখনো ধূমপান করেননি। ধূমপান সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"ভগবান মানুষকে নাক দিয়েছেন সুগন্ধ গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য, মানুষ তার নাককে ধূম উদ্গীরণের চিমনি হিসেবে ব্যবহার করবে ভগবানের যদি তাই-ই অভিপ্রায় হত তবে নাক না বানিয়ে অনায়াসে তিনি আমাদের নাকগুলোকে ঊর্ধ্বমুখী সরু চিমনি, তৈরি করতে পারতেন। তা যখন তিনি করেন নি, তখন বুঝতে হবে ধূমপান করে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জর্জ কার্ভার একবার বলেছিলেন, "আমি বিশ্বপ্রকৃতিকে একটা বড় রকমের বেতার বার্তার সীমাহীন ব্যবস্থা বলে মনে করি। প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি পল অনুপলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। আমরা যদি যথাস্থানে ঠিক সুরটি ধরতে পারি তবেই তাঁর অমৃত বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে, তাঁর অনুচ্চারিত বাণী আমাদের বোধগম্য হবে।"

মৃত্যুকে জর্জ কার্ভার তাঁর পরম নির্ভর এবং একমাত্র আশ্রয় বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনো মৃত্যুভয়ে ভীত বা সন্ত্রস্ত হননি। প্রায় সময়ই তিনি বলতেন, "অনেক জিনিষের মতো মৃত্যুও আমাকে সাহায্য করেছে। মৃত্যু এত বেশী সাহায্য আমাকে করেছে যা আমি আর কারুর কাছ থেকে কখনো পাইনি, তাই আমি মৃত্যুর কাছে ঋণী। আমি কবে মারা যাবো সেটা বড় কথা নয়। আমি যতদিন বাঁচবো আমার সেই জীবনকালের মধ্যে কী এবং কতখানি বেশী জিনিষ আমি দিয়ে যেতে পারবো, কোন্ মহত্তর কর্তব্য আমার দ্বারা সাধিত হবে এবং তা জগতের কল্যাণের কাজে লাগবে কি না সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা।"

অধ্যাপক কার্ভার ছাত্রদের কাছে ছিলেন সেরা শিক্ষক, সবচেয়ে প্রিয় মাষ্টারমশাই। তাঁর ওপরে ছাত্রদের প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচল আস্থা। শিক্ষকের ওপরে ছাত্রদের এ রকম গভীর শ্রদ্ধা ও পরিপূর্ণ নির্ভরতা খুবই কম দেখা যায়। যখনই বা যে কারণেই হোক কার্ভারের ছাত্ররা জাতিবিদ্বেষ বা নিষ্ঠুর বর্ণ-বৈষম্যের শীকার হয়েছে তখনই তারা তাদের গুরু, বন্ধু ও নেতা জর্জ কার্ভারের শরণাপন্ন হয়েছে, পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহারে যখনই তাদের অন্তর বেদনায় রক্তাক্ত হয়েছে তারা সান্ত্বনা পাবার আশায় ও প্রতিকারের উপায় জানবার জন্য তাঁর কাছে ছুটে এসেছে, আর কার্ভার তাদের সব কথা স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন, তিনি তাদের অপমানে বিচলিত বা ধৈর্যহারা না হবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন নিন্দা-প্রশংসা, মান-অপমান সব সমান ভাবে তুচ্ছ করে অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আপনার লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে। তিনি ছাত্রদের একটা কথা বেশ জোরের সঙ্গে প্রায়ই বলতেন, "বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের ঘৃণার আগুনে নিজেরাই একদিন পুড়ে মরবে। কোন ক্ষতি তারা তোমাদের করতে পারবে না। পৃথিবীতে এমন এক দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন কৃষ্ণাঙ্গরা আর এভাবে পায়ের তলায় পড়ে থেকে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা পদদলিত হবে না, শ্বেতাঙ্গদের চাবুকের ঘায়ে আর তাদের দেহ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হবে না, শ্বেতাঙ্গদের লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন আর তারা সহ্য করবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের

মার খাওয়ার দিন শেষ হবে। নিগ্রোরা সেদিন পরিপূর্ণ মানবাধিকার আদায় করার জন্ত সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে।" "ওরা যদি দিতে না চায় ?" —একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরে জর্জ কার্ভার বলেছিলেন, "ওরা তো দিতে চাইবেই না। যতকাল পারে ওরা ওদের জুলুম আর অত্যাচারের রথ চালিয়ে যাবে আমাদের পিষে মারবার জন্ত, কিন্তু আমরা কৃষ্ণাঙ্গরা কিছুতেই তা হতে দেবো না। এই অসাম্য, এই অবিচার দূর করতেই হবে। আমি অনুভব করছি, আমাদের সেই বন্ধন-মুক্তি ও নব-জাগরণের নতুন যুগ শুরু হয়েছে, কিন্তু হয়তো বেঁচে থেকে সে জাগরণের পূর্ণ রূপ দেখে যেতে পারবো না। তোমরা যারা তখন থাকবে তারা যেন দেখতে পাও। তার জন্ত হয়তো তোমাদের সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ও তিতিক্ষার সঙ্গে। অজ্ঞানের অন্ধকারে আমাদের যে সব ভাইবোনেরা এখন ডুবে আছে সেদিন তারা জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিন তারা স্পষ্ট উপলব্ধি করবে বন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবনকে, এই পৃথিবীর বুকে তারা স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বিচরণ করবে। তোমরা সবাই এ যুগের মুক্তিদূত, সেই অনাগত যুগের বাণী তোমরা নিজেদের মধ্যে বহন করে চলেছো। আজ থেকে যদি তোমরা তার জন্ত তৈরি থাকো তা হলে তখন তোমরা অনুভব করতে পারবে, তোমরা কারুর চাইতে হীন নও। পৃথিবীর সব মানুষের সঙ্গে তোমাদের আসন, সুখ-সম্পদ সকলের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করার যে অধিকার বিধাতা তোমাদের দিয়েছেন কেউ চিরকাল তা থেকে তোমাদের বঞ্চিত ক'রে রাখতে পারবে না।"

জর্জ কার্ভার একদিন ক্লাসে পড়াবার সময় আলোচনা প্রসঙ্গে ছাত্রদের বললেন, "তোমাদের হয়তো কখনো এমন জায়গায় যাবার প্রয়োজন হতে পারে যেখানে আছে চূড়ান্ত বর্ণবৈষম্য, হয়তো পথে যেতে যেতে চোখে পড়বে বড় বড় এবং স্পষ্টাক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড 'নিগ্রোদের চাই না'। কিন্তু মনে রেখো এটা একেবারে নতুন নয়, কিংবা প্রথমও নয়। এর আগে এরকম অনেক হয়েছে। এমনি অপমান, এমনি ঘৃণা ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশুখৃষ্টকেও সহ্য করতে হয়েছিল তিনি যখন গ্যালিলিতে ছিলেন।"

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বন্ধুত্ব লাভের আগ্রহে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ এবং রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রপতিও কয়েকজন ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরে অনেক দূর দেশ থেকে দীর্ঘ পথ ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করেও অনেক দেশের রাজা এবং রাজপুত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে এসেছিলেন। সুইডেনের যুবরাজ জর্জ কার্ভারের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থেকে, ফসল কেটে নেবার পরে ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্যের দানাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার কাজে লাগাবার পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন এবং এই কাজ শিখবার জন্ত তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ টাস্কেগিতে ছিলেন।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বহুদিন ধরে অব্যাহত ভাবে চিঠিপত্র লেখালেখি চলেছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিণতি কী দাঁড়ায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটলো কি না ভারতে, বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। গান্ধীজীর কাছ থেকেই তিনি অহিংস সংগ্রামের আদর্শ প্রথম লাভ করেন যখন গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে বিশ্বের চমক সৃষ্টি করেছিলেন। জর্জ কার্ভার গান্ধীজীকে ফলমূল ও শাকসব্জি ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ পরামর্শ দিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিলেন এবং যে-সমস্ত ফলমূল ও শাকসব্জিতে খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ খুব বেশী আছে মহাত্মা গান্ধীর পরাধীন ও দরিদ্র জন্মভূমি ভারতের উর্বর ও সরস মৃত্তিকায় অনায়াসে তা উৎপন্ন করা সম্ভব হতে পারে,

ভারতের দরিদ্র কৃষকরাও এর দ্বারা অপরিসীম উপকৃত হবে। ডাঃ কার্ভার এইসব ফলমূল ও শাকসব্জির একটি বিস্তৃত তালিকা মহাত্মা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমেরিকার ক্রোড়পতি ও পৃথিবীবিখ্যাত ধনী হেনরি ফোর্ড ছিলেন বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩৭ সালে। এই পরিচয়ই পরে সুগভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তারপরে অবস্থা এমন হল যে, দীর্ঘদিন একজন আর একজনকে না দেখে থাকতে পারতেন না। বছরে অন্তত একবার দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ না হলে দুজনের মনে হত, কী যেন বড় জিনিষ একটা তাঁরা হারালেন, সে ক্ষতি কোনক্রমেই আর পূরণ হবার নয়। এজন্য যেমন করেই হোক বছরে অন্তত একবার দুজনে এক জায়গায় মিলিত হতেন এবং কয়েকটা দিন গল্প-গুজবে ও আনন্দে কাটাতেন। এই সুনিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক কার্ভারের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই বন্ধুত্ব স্থাপিত হবার প্রথম পর্যায়ে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার যেতেন হেনরি ফোর্ডের মিশিগানের বাড়ীতে অথবা জর্জিয়ার বাগানবাড়ীতে। পরে যখন কার্ভারের স্বাস্থ্য ভাঙতে আরম্ভ করলো, তিনি আর আগের মতো বেশী চলাফেরা বা পরিশ্রমের কাজ করতে পারতেন না, তখন হেনরি ফোর্ডই যেতেন টাস্কেগিতে জর্জ কার্ভারের সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে আসার জন্য।

হেনরি ফোর্ডের এইভাবে টাস্কেগিতে যাওয়া-আসা করার ফল হল সুদূরপ্রসারী। জর্জ কার্ভারের বিজ্ঞান গবেষণা ভবন এবং সংরক্ষিত উদ্যানটি পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন যে শত শত কৌতূহলী শ্বেতাঙ্গ দর্শক টাস্কেগিতে আসতে শুরু করলো তার মূলে প্রধানত ছিল জর্জ কার্ভারের সঙ্গে হেনরি ফোর্ডের গভীর বন্ধুত্বের প্রভাব, না হলে তখনকার দিনে কোন শ্বেতাঙ্গ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের জন্য তৈরি বিদ্যালয়ের দরজায় পা দিতেন কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আরো কিছুকাল পরে শ্বেতাঙ্গ সমাজ এই বিদ্যালয়টির প্রতি এমন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ দান করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি।

ফোর্ড এবং কার্ভারের মিলনের ফলে যে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সূচনা হল তারই ফসল মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ আবিষ্কৃত হল—কৃত্রিম রবার। জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এই কৃত্রিম রবার।

হেনরি ফোর্ডের জর্জিয়ান বাগানে প্রায় সব জায়গা জুড়ে সোনালী রঙের এক জাতীয় দীর্ঘ লম্বা শুঁড়শাখা-বিশিষ্ট গাছ জন্মাতো, অনাদরে অবহেলায় উৎপন্ন এই গাছ যে কস্মিনকালেও মানুষের কোন কাজে আসতে পারে এটা কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জর্জ কার্ভারের দৃষ্টি এই অযত্নসম্ভূত গাছগুলির দিকে শুধু যে আকৃষ্ট হল তাই-ই নয়, বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যার এক নতুন সম্ভাবনাময় জগতের সন্ধান পেলেন তিনি তার মধ্যে। এই গাছের ত্বক্ থেকে শ্বেতাভ নির্যাস আহরণ করে জর্জ কার্ভার গবেষণা শুরু করলেন, আবিষ্কার করলেন রবারের সমজাতীয় গুণবিশিষ্ট একটা পদার্থ। রবারের পরিবর্তে তারই সমগোত্রীয় একটা কৃত্রিম বিকল্প পদার্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে গিয়েই জর্জ কার্ভার এইভাবে কৃত্রিম রবার আবিষ্কার করলেন। এ জিনিষটি আজ এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনযাত্রার নানা স্তরে নানাভাবে মানুষের কাজে এমনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে রবারকে অপরিহার্য বললেও কিছু বেশী বলা হয় না।

২৫

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের কলাইউৎপাদক কৃষিজীবীরা তাদের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটা সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হল। তাদের প্রথম কাজ হল, কলাইয়ের প্রকৃতি ও উৎপাদন সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। [illegible]

তা যে আসলে মাটির বুকে লতানো গুল্মে জন্মায় এ তথ্যটা অনেকেরই জানা ছিল না। কলাইয়ের লতানো গাছ মাটি থেকে বড় জোর দুএক ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় এবং কলাইয়ের শুঁটির ভারে গাছের মাথা যত ভারী হয় ততই সেটা একটু একটু করে মাটিতে নুয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, কলাইগাছ না বলে কলাই, লতা বলাই সঙ্গত।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে মার্কিন দেশের জনসাধারণ কলাই উৎপাদন করতেই যে শুধু জানতো না, তাই নয়, কলাইয়ের দোষগুণ সম্বন্ধেও তারা অজ্ঞ। কেউ কেউ আবার এ জিনিষটাকে ভয়ের চোখেও দেখতো, কারণ তখন অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল, কলাই খেলে প্লেগ হয়, কলাইয়ের দানার মধ্যে প্লেগের জীবাণু বাসা বেঁধে আছে। অনেকে ভাবতো কলাই স্রেফ শুয়োরের খাদ্য। কলাই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় এ সংবাদ বেশী লোকের জানা ছিল না। তাই এটা যখন তারা প্রথম শুনলো তারা, দস্তুরমতো চমকে উঠলো। কাজেই কলাইয়ের প্রকৃত কি গুণ আছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলাই হল সমিতির প্রধান কাজ এবং এই কাজের জন্য তাদের একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

সমিতির প্রথম যেদিন বৈঠক বসলো সেদিনই সদস্যরা এমনি একজন বিশেষজ্ঞ কিভাবে কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করলেন। একজন সদস্য এমনি এক বিশেষজ্ঞের বিষয় উল্লেখ করলেন আলোচনা প্রসঙ্গে, নাম তাঁর জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

একজন সদস্য জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি কি বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখেন?

"না, তিনি একজন শিক্ষক।"

"সামান্য একজন শিক্ষক ব্যবসা সম্পর্কে কী বোঝেন?"

"তিনি ব্যবসা সম্পর্কে কিছু বোঝেন না বটে, কিন্তু কলাই সম্বন্ধে তিনি সবকিছু জানেন।"

"তিনি কোথায় থাকেন? কোন্ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন?"

"টাস্কেগিতে থাকেন। সেখানকার কৃষি শিক্ষায়তনের শিক্ষক।"

"কিন্তু সে তো নিগ্রোদের কলেজ।"

"হ্যাঁ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারও একজন নিগ্রো।"

নিগ্রো কথাটা শুনে সদস্যদের মধ্যে অনেকেরই নাসিকা কুঞ্চিত হল, সাহায্যের জন্য একজন নিগ্রোর শরণাপন্ন হতে বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ সদস্যদেরই বেশী আপত্তি কিন্তু যিনি জর্জ কার্ভারের নাম উল্লেখ করেছিলেন তিনি সকলের সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দিয়ে বললেন, "আমি ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের গবেষণাগার নিজে দেখে এসেছি। সেই গবেষণাগারের মধ্যে আমি আমার জীবনের মূল্যবান্ বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেছি। কলাই থেকে উৎপন্ন তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কারের কতগুলি নমুনা তিনি আমায় দেখিয়েছেন, সেগুলিকে অমূল্য সম্পদও বলা যায়। তাঁর প্রতিভায় আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়েছি। ডাঃ জর্জ কার্ভার একজন বিক্রেতা নন বটে, একজন প্রতিভাবান্ বৈজ্ঞানিক রূপে তিনি যা করতে পারেন তা আর কেউই পারে না। তিনি কলাইয়ের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞ কৃষককে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা যেমন সুষ্ঠুভাবে বোঝাতে পারেন, খুঁটিনাটি জিনিষ বলে দিতে পারেন, এমন খুব কম লোকই পারে।"

তথাপি আপত্তির সুর ওঠে—"কিন্তু একজন নিগ্রোকে…?"

"কিন্তু, নিগ্রো বলেই সে অচ্ছুৎ হয়ে গেল? তার গুণ আমরা দেখবো না? সেই মানুষটির কালো চামড়ার নীচে ঢাকা আছে যে প্রখর প্রতিভাদীপ্ত মন, আমাদের জনসাধারণের শুভ কল্যাণের জন্য আমরা তাঁর সেই সুন্দর মনকে কেন কাজে লাগাবো না, বলতে পারেন?"

বৈঠকে ঘোর তর্কাতর্কি আর গরম গরম কথার ফোয়ারা ছুটলো, পরে সমিতির সভাপতি অনেক চেষ্টায় সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি বলি কি, এ বিষয়ে আমাদের মধ্য থেকেই কেউ একটা প্রস্তাব উত্থাপন করুক।"

জর্জ কার্ভারের পক্ষ নিয়ে যিনি এতক্ষণ কথা বলছিলেন মুহূর্তের মধ্যে তিনিই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, প্রস্তাব উত্থাপনের ভঙ্গীতে বললেন, "আমি এই সভায় প্রস্তাব করছি, টাস্কেগি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোক, তিনি এসে নিজেই বলবেন কলাই সম্বন্ধে তাঁর কতখানি কী জানা আছে।"

সভার মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আর একজন চীৎকার করে বলে উঠলেন, "আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।"

ক্রমশঃ

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

সুবিমল সিংহ

(৮)

"মানুষ, শস্ত্র-কার জীব (man is a tool-making animal)"—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কথিত এবং কার্ল মার্কস সমর্থিত "মানুষ"-এর এই সংজ্ঞাটীর অনুসরণে আমরা "শ্রম" শব্দটীর একটা অর্থশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা পাইয়াছি। তাহা এই যে, জীবন ধারণার্থে অথবা উন্নততর জীবন যাপনার্থে পূর্ব্বকল্পিত সচেতন এবং সার্থক প্রয়াসকেই শ্রম আখ্যা দেওয়া যায়। বাঁচিয়া থাকার জন্য অন্যান্য প্রাণীর সহজাত বৃত্তি (instinct) সুলভ অন্ধপ্রয়াস হইতে মানুষের শ্রমের বিশেষণার্থে "উন্নততর জীবন যাপন" "সচেতন" 'পূর্ব্বকল্পিত' 'সার্থক' (অর্থাৎ "প্রয়োজন সাধক") এই শব্দগুলির প্রয়োগ।'

"শ্রম" যদি "সচেতন" এবং 'পূর্ব্বকল্পিত" প্রয়াস হয় তবে ইহার সহিত "চেতনা" এবং "কল্পনা"ও ওতপ্রোত। অর্থাৎ "শ্রম" নেহাতই একটা "দৈহিক" প্রয়াস নয়। ইহার সহিত মানসিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসও জড়িত। অতএব শ্রম সম্পূর্ণরূপেই একটা মনুষ্য-সুলভ ব্যাপার। এবং ক্রমবিকাশের যে পর্য্যায়ে আসিয়া মনুষ্যরূপী প্রাণীরা (Hominids) চেতনা এবং কল্পনা শক্তির অধিকারী হইয়া বুদ্ধিমান্ দ্বি-পদ (Homo Sapiens)-এ পরিণত হইলেন, সেই স্তরেই শ্রমেরও আবির্ভাব ঘটিল। অথবা বলা যায় যে "শ্রম"-এর আবির্ভাব-এর সঙ্গে সঙ্গেই '-মানুষ"-এরও উদ্ভব হইল।

তবে শ্রম হইতেই মানুষের উদ্ভব (labour created man himself)"—এঙ্গেলস-এর এই উক্তি অধিকতর তাৎপর্য্যপূর্ণ। এবং ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইলে অথবা ইহার কতটুকু অঙ্গীকার্য্য আর কতটুকু বা অস্বীকার্য্য, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে "শ্রম"কে আরেকটু ব্যাপক অর্থে দেখিতে হয়। অর্থাৎ মনুষ্যরূপী প্রাণীদের (hominids) বুদ্ধিমান্ দ্বিপদে (Homo Sapiens) পরিণতির পূর্ব্বে এবং পরে, এই উভয় স্তরেই তাঁহাদের জীবন ধারণার্থে অথবা উন্নততর জীবন যাপনার্থে "অচেতন", স্বল্প-'চেতন" অথবা "সচেতন" সর্ব্ববিধ প্রয়াসেরই পর্য্যালোচন করিতে হয়।

মনুষ্যরূপী প্রাণীদের ক্রম-বিবর্ত্তনে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য যে দুইটী ঘটনা তন্মধ্যে একটী হইল শুধুমাত্র পেছনের দুইটী পায়ের উপর ভর করিয়া সোজাভাবে দাঁড়ানো অর্থাৎ "দণ্ডায়মান দ্বি-পদ (homoerectus)"-এ পরিণতি। অপরটী হইল কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদি দেহাতিরিক্ত প্রত্যঙ্গের (extra corporeal limbs) ব্যবহার। এই দুইটী ঘটনার কোন্টী আগে কোনটী পরে ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে মনে করা যায় —এবং সঙ্গত ভাবেই—যে এই উভয়ই একে অন্যের সহায়ক অথবা পরিপূরক স্বরূপ যুগপৎ ঘটিয়া থাকিবে। কারণ জীবনসংগ্রামে হাত দুইটীকে দেহভার বহনের দায়িত্ব-মুক্ত করিয়া কেবল মাত্র আহার্য্যাহরণ, শত্রুহনন, আত্মরক্ষাদির কাজে ব্যাপৃত রাখিতে হইলেই শুধুমাত্র পদদ্বয়-এর উপর ভর করিয়া দাঁড়ানোর এবং চলাফেরার প্রয়োজন আসে। আবার পা দুইটীর উপর দেহভার বহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে পারিলেই হস্তদ্বয় সেই দায়িত্ব মুক্ত হইয়া জীবনসংগ্রামে অধিকতর সহায়ক হইতে পারে। অতএব হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয়ের ব্যবহারের বিশেষায়ন অথবা স্বাতন্ত্র্যায়ন (specialization অথবা differentiation of function) পরস্পরের উপর নির্ভর-শীল এবং পরস্পরেরর অনুপূরক।

কিন্তু হস্ত এবং পদের ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যায়নের সহিত অস্ত্রের ব্যবহার-এর সম্পর্ক থাকিতেও পারে আবার

নাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ জীবনসংগ্রামে আহার্য্যাহরণ, শত্রু হনন, আত্মরক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে বাহুর ব্যবহার সশস্ত্র হইতে পারে, নিরস্ত্রও হইতে পারে, যদি নিরস্ত্রহয় তাহা হইলে অস্ত্রের ব্যবহার-এর ব্যতিরেকেই অথবা পূর্ব্বেই "দণ্ডায়মান দ্বিপদে" পরিণতি সম্ভব। অর্থাৎ মনে করা যায় যে প্রাক্ মানুষ-পর্য্যায়ে অন্য সকল প্রাণীর মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের মানাইয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকার সহজাত বৃত্তি (instinct) সুলভ প্রয়াস হইতেই শুধুমাত্র পদদ্বয়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জ্জিত হইতে পারে। ইহা শুধু যে সম্ভব তাহাই নয়, জীবজগতে এইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিশেষায়ন, রূপান্তর, অথবা উদ্ভব জৈব বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন আফ্রিকার তৃণ-ভূমি-বিচারী জিরাফ দিগন্ত-বিস্তৃত শাদ্বল প্রান্তরের স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চ বৃক্ষের পত্রাদি ভক্ষণের প্রয়াস এবং অভ্যাস হইতে সুদীর্ঘ গ্রীবা লাভ করিয়াছে। কারণ তাহাদের একদিকে তৃণও চাই, অপরদিকে বৃক্ষপত্রও চাই। তেমনি মনে করা যায় যে, যে নিরক্ষীয় (equatorial) অঞ্চলে প্রথম "দণ্ডায়মান দ্বি-পদ"এর আবির্ভাব ঘটে তথাকার স্বভাবজ, অনারোহ্য অথচ কেবল মাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায়ই প্রসারিত বাহুদ্বারা অধিগম্য, অনুচ্চ বৃক্ষ গুল্মাদির (যথা, কদলী) ফল পত্রাদি আহরণের অভ্যাস হইতেই ক্রমে অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসরে তাঁহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখেন। আবার কাহারও কাহারও মতে বৃক্ষাশ্রয়ী শাখামৃগের পর্য্যায়েই একটি আনুভূমিক (horizontal) শাখায় পদদ্বয় স্থাপন করিয়া উর্ধ্বতর শাখাপ্রশাখাদি হস্তদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক সোজা হইয়া চলাচলের অভ্যাস-এর মধ্যেই "দণ্ডায়মান দ্বিপদ"-এর আদি কারণ নিহিত ছিল! এইরূপ চলাচলকে cruriation আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

তবে আমরা দেখিয়াছি যে বৃক্ষাশ্রয়ী শাখামৃগের পর্য্যায়েই বৃক্ষশাখা ধারণ পূর্ব্বক চলাফেরা অথবা অবলম্বিত থাকার অভ্যাসের ফলে অঙ্গুলিগুলি দীর্ঘ হইয়া হস্তদ্বয় ধৃতিক্ষম (prehensile) হয়। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে অর্জিত এই ধৃতিক্ষম হস্তের শক্তি আজও মানব শিশুর মধ্যে নিজেকে ধারণ করিবার আর কোন শক্তি না থাকিলেও কোনও বয়স্ক লোকের অঙ্গুলি অথবা অনুরূপ একটা সরু কাঠি মুষ্টিমধ্যে অবলম্বন করিয়া বেশ কয়েক সেকেণ্ড ঝুলিয়া থাকার শক্তি দেখা যায়। অথচ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে তাহার বৎসরাধিক সময় লাগে এবং হাঁটিতে শিখিবার পথে প্রথমে বেশ কিছুদিন cruriation সদৃশ চলাচল অভ্যাস করিতে হয়।

যাহাই হোক, আমরা দেখিয়াছি যে, এইরূপ ধৃতিক্ষম হস্ত দ্বারা বৃক্ষাশ্রয়ী অবস্থায় আহার্য্যাদি আহরণ করিয়া মুখে পুরিবার অভ্যাস হয়। পরবর্তী পর্য্যায়ে অর্থাৎ বৃক্ষাশ্রয় হইতে অবতরণের পর ভূচর অবস্থায়ও সেই অভ্যাস অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। অধিকন্তু সেই ভূচর অবস্থার কোন এক সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্যে অথবা কঠোরতর জীবনসংগ্রামের চাপে কাষ্ঠ-খণ্ড প্রস্তরাদি অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া সেই ধৃতিক্ষম হস্তের অধিকতর সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনাও বাস্তবে রূপায়িত হইয়া থাকিবে এবং একবার অস্ত্র ব্যবহারের সার্থকতা অথবা সাফল্য প্রত্যক্ষীভূত হইলে উত্তরোত্তর ইহার ব্যবহার বাড়িতেই থাকিবে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, ধৃতিক্ষম হস্ত এবং উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই অস্ত্রের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী নয়। ধৃতিক্ষম হস্তকে অস্ত্র ব্যবহারে নিয়োজিত করিতে হইলে অন্ততঃ অনুরূপ একটা ন্যূনতম পর্য্যায়ের বুদ্ধি বিকাশেরও প্রয়োজন। কারণ, দেখা যায় যে একমাত্র মানুষ অথবা মনুষ্যরূপী প্রাণীরাই ধৃতিক্ষম হস্তের অধিকারী নহেন। মানুষ অথবা মনুষ্যরূপী প্রাণীদের ক্ষেত্রে শুধু সামনের দুটী পাই বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে হস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। হস্তীর ক্ষেত্রে পদ-চতুষ্টয় যথারীতি থাকিয়াই নাসিকাগ্রটী প্রসারিত হইয়া ধৃতিক্ষম হস্তে (শুঁড়ে) পরিণত হইয়াছে। এবং "হস্ত" অথবা "কর"এর অধিকারী বলিয়াই এই বৃহৎকায় প্রাণীটী "হস্তী" অথবা "করী" আখ্যায় ভূষিতও হইয়াছে। কিন্তু মানুষের সহিত হস্তীর তফাৎ এই যে, হস্তীর দেহের

অনুপাতে মস্তিষ্কের পরিমাণ বর্তমান মানুষের তুলনায় প্রায় পনর ভাগের এক ভাগ। প্রাক্-মানুষের তুলনায়ও সম্ভবতঃ অন্ততঃ পাঁচভাগের এক ভাগ হইবে। অতএব ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে মনুষ্যরূপী প্রাণীরা সর্ব্বপ্রথম অস্ত্র ব্যবহারের সূচনা করেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তিনটী বিষয়ের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্তী স্তর হইতে ক্রমবিকাশের পথে লব্ধ প্রতিক্ষম হস্ত এবং জীবনসংগ্রামে তাহার (নিরস্ত্র) ব্যবহারের অভ্যাস। দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র ব্যবহারের উপযোগী বুদ্ধির বিকাশ। তৃতীয়তঃ উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ।

এখানে আরও স্মরণীয় যে, বৃক্ষাশ্রয়ী শাখামৃগের ক্ষেত্রে শুধু হস্তদ্বয়ই প্রতিক্ষম নহে। তাঁহাদের হস্ত এবং পদ উভয়ই দীর্ঘাঙ্গুল এবং প্রতিক্ষম অর্থাৎ বলা যায় যে, তাঁহারা চতুষ্পদ (Quadruped) হইতে "চতুর্ভুজ"-এ (Quadrumanons অথবা Quadrumanual) রূপান্তরিত হইয়াছেন। অধিকন্তু অনেকের প্রতিক্ষম একটা লাঙ্গুলও আছে। এই সমস্তই গাছের ডালপালাদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলাফেরা অথবা ভারসাম্য রক্ষার তাগিদ হইতে। কিন্তু সম্মুখস্থ পদদ্বয় অথবা প্রত্যঙ্গদ্বয় (fore limbs) মুখের সন্নিহিত থাকারদরুণ স্বভাবতঃই ইহারা আহার্য্যাদি আহরণ, মুখে পূরণ ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত হইয়া ইহাদের স্বাতন্ত্র্যায়ন ((differentiation) ঘটিয়া ইহারাই "হস্ত" আখ্যার অধিকারী হইয়াছে।

মনুষ্যরূপী প্রাণীদের "দণ্ডায়মান দ্বিপদ"এ পরিণতির গুরুত্ব সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, শুধু অস্ত্রাদি ব্যবহারের জন্যই যে ইহা আবশ্যক ছিল তাহাই নয়, বুদ্ধি বিকাশের জন্যও ইহার প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে, বুদ্ধির বিকাশের সহিত মস্তিষ্কের প্রসারও জড়িত। কিন্তু পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায়, ভূপৃষ্ঠের উপর লম্ব (vertical) অথবা খাড়া ভাবে অবস্থিত মেরুদণ্ডের উপর স্থাপিত মস্তকটী ধারণ করা যেরূপ সহজ, চতুষ্পদ প্রাণীর মত আনুভূমিক (horizontal) মেরুদণ্ড সংলগ্ন মস্তকটী ধারণ তত সহজ নহে। প্রাক্-মানুষ পর্য্যায় হইতে মানুষ পর্য্যায় অবধি মনুষ্যরূপী প্রাণীদের মস্তিষ্কের প্রসার হইয়াছে প্রায় তিনগুণ। অতএব মনুষ্যরূপী প্রাণীদের প্রথমে "দণ্ডায়মান দ্বিপদে" পরিণত না হইয়া "বুদ্ধিমান্ দ্বিপদ" (homosapiens) অথবা "যথার্থ বুদ্ধিমান্ নর" (homo sapiens sapiens) এ পরিণতি সম্ভব ছিল না। বৃক্ষাশ্রয়ী শাখামৃগদের ক্ষেত্রেও বৃক্ষে উপবিষ্ট অবস্থায়ও খাড়াভাবে অবস্থিত মেরুদণ্ডের উপর অপেক্ষাকৃত ভারী মস্তক ধারণ সহজ। এবং মনে করা যায় যে অনেকটা সেই কারণেই তাহাদের মস্তিষ্কেরও কতকটা প্রসার আগেই ঘটিয়া থাকিবে। যাঁহারা বৃক্ষাশ্রয় ছাড়িয়া ভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই হয়ত বৃক্ষশাখাদি প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উপযোগী ন্যূনতম বুদ্ধি ছিল। কিন্তু উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার যোগাযোগ না ঘটায় হয়ত সকলে তাহা করেন নাই। যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তাইয়া গেলেন, এবং বিশেষ মর্য্যাদার সহিতই। অন্যেরা হয়ত ভূপৃষ্ঠের উপর ভয়ে ভয়ে চলিতেন। তাড়া খাইলেই গিয়া গাছে চড়িতেন। অথবা হয়ত তাঁহাদের সীমিত প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যাইত। পক্ষান্তরে আদি অস্ত্রধারীরা হয়ত কঠোরতর প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া মরিয়া হইয়াই ঐ পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা আকস্মিক অথবা accidental হইতে পারে কি না, জীব-মনোবিজ্ঞানীরাই বলিতে পারেন। অন্য জীব দ্বারা তাড়িত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া হয়ত একটা পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেন। তার পর ইহার চমৎকার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাতেই অভ্যস্ত হইলেন। ক্রমে এই অস্ত্রের ব্যবহারই আদিতে বৃক্ষাশ্রয়ী মূল "প্রাইমেটিজ" (Primates) শ্রেণীর প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত একটি মনুষ্যরূপী প্রশাখাকে অন্য সমস্ত প্রাণীর উপর একহাত লওয়ার সুযোগ দিল।

আরেক দিক দিয়া দেখিতে গেলে অতি প্রাথমিক স্তরে সহজাত বৃত্তি এবং সচেতন বুদ্ধির পার্থক্য খুবই ক্ষীণ এবং নিরস্ত্র জীবনসংগ্রাম হইতে সশস্ত্র জীবনসংগ্রামে উত্তরণ খুব একটা নাটকীয় ব্যাপার নয়। এমন কি

আদিতে নিরস্ত্র জীবনসংগ্রামের সহিত, সশস্ত্র জীবন-সংগ্রাম অপেক্ষা, জটিলতর বুদ্ধির বিকাশ জড়িত থাকিতে পারে। যেমন ধরা যায় যে, ধৃতিক্ষম হস্তদ্বারা আহৃত পক্ক এবং অপক্ক উভয়বিধ ফল মুখে তুলিয়া দন্ত দ্বারা দংশন এবং চক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ইহাদের বর্ণ এবং আস্বাদন-এর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন, এবং ইহাদের পার্থক্য বিধান, একটা অতি প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহার সহিত অস্ত্রাদিরও কোন সম্পর্ক নাই। তবুও ইহাতে চক্ষু জিহ্বাদি "জ্ঞানেন্দ্রিয়", বাক্-পাণি-আদি "কর্ম্মেন্দ্রিয়", মস্তিষ্করূপ বিচার-বিশ্লেষক "অন্তরেন্দ্রিয়", অসংখ্য সূক্ষ্ম এবং জটিল স্নায়ুতন্ত্র, ইত্যাদির সমন্বিত প্রয়াস জড়িত। পক্ষান্তরে, যদি লক্ষ্য করা যায় যে একটি অনারোহ্য বৃক্ষশাখাগ্রে অবলম্বিত পক্ক ফল, শাখাটীকে আন্দোলিত করিলেই ভূপাতিত হয়, তাহা হইলে সেই পন্থা অবলম্বন করিতে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সম্ভবতঃ এতগুলি ইন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র-মস্তিষ্কাদির এত খাটুনিও হয় না। তবে যিনি বা যাঁহারা বৃক্ষোপরি থাকিয়া শাখাটিকে আন্দোলিত করিবেন এবং যিনি বা যাঁহারা বৃক্ষতলে থাকিয়া ফল কুড়াইবেন তাঁহাদের মধ্যে একটা সহযোগিতা অথবা বুঝাপড়া থাকা দরকার (যাহাকে "সমাজবাদী" অর্থশাস্ত্রে সম্ভবতঃ বলা হয় "উৎপাদনমূলক সম্পর্ক"—Production relation)। যাই হোক, "বুদ্ধির দৌড়" আরেক পা গেলেই "আবিষ্কার" করা যাইবে যে, একটা বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা আঘাত করিলেও হস্তদ্বারা অনধিগম্য ঐ ফলগুলিও সহজেই হস্তগত করা যায়। এই বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখাটাই আদিম মানবের প্রথম হাতিয়ার। তার পরই বিচার করিতে হইবে, হাতিয়ারটা উপযুক্ত রকমের দীর্ঘ কি না, অর্থাৎ আসিবে হ্রস্ব-দীর্ঘের পার্থক্যের বিচার। কিন্তু এই হ্রস্ব-দীর্ঘের বিচারও রংএর পার্থক্যের সহিত আস্বাদন-এর সম্পর্ক স্থাপন পূর্ব্বক পক্ক-অপক্কের পার্থক্যের বিচার অপেক্ষা সম্ভবতঃ সহজসাধ্য ব্যাপার। এইরূপে ক্রমে আসিবে কোন বস্তুর আকৃতি অথবা ওজনের লঘুত্ব-গুরুত্বের বিচার, আকৃতির লঘুত্ব-গুরুত্বের সহিত ওজনের লঘুত্ব-গুরুত্বের সম্পর্ক স্থাপন, আকৃতি অথবা ওজনের লঘুত্ব-গুরুত্বের সহিত সেই বস্তু দ্বারা আঘাতের লঘুত্ব-গুরুত্বের সম্পর্ক স্থাপন, ইত্যাদি ব্যাপার। ফলে অস্ত্রাদির ব্যবহার ক্রমে অধিকতর সচেতন বিচার-ভিত্তিক হইবে, ইহাদের ব্যবহারের জটিলতা বাড়িবে, ব্যবহারের জটিলতা বৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতিশক্তি এবং মস্তিষ্কের বিচারশক্তি, স্নায়ুতন্ত্র অস্থি মাংস-পেশী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন অথবা ক্রমবিকাশ ঘটিবে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, জীবন সংগ্রামে ধৃতিক্ষম হস্তের ব্যবহার, যাহা আদিতে সহজাত বৃত্তি-সুলভ ছিল, তাহা ক্রমে সরল হইতে জটিল, জটিল হইতে জটিলতর, অচেতন হইতে অর্দ্ধচেতন, অর্দ্ধচেতন হইতে সচেতন হইয়াছে, এবং প্রয়োজনানুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিন্যাস সহ বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে।

এই ধারণার ভিত্তিতেই আমরা এঙ্গেলস-এর "শ্রম হইতেই মানুষের উদ্ভব (labour created man himself)", এই উক্তির তাৎপর্য্য বিচার করিতে পারি।

———

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সকাল হতেই, সুখবরটা শোনাতে যায় শুভময়কে। আজ আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না অভয়। সরাসরি শুভময়দের দোতলা বৈঠকখানায় উঠে যায়। দরজা ভেজান। একটু ঠেলতেই দরজা খুলে যায়।

—কে? অভয় তাকিয়ে দেখল, মস্ত বড় সোফার ওপর আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে, কি একটা বই পড়ছে, সুপুরি—বা অমিয়া। অমিয়া ধড়মড় করে উঠে বসল।

—শুভ কোথায়? অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। কি অদ্ভুত সুন্দর চেহারা। ধপ্‌ধপে ফরসা রং—গোলাপ ফুলের মত আভা সারা গায়ে। মুখখানি যেন ফুটন্ত পদ্মফুল। সেই মুখ পদ্মের চার পাশে কালো কুচকুচে কোঁকড়ান চুলের রাশি। অভয় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। চোখ নামিয়ে নেয় অমিয়া। মৃদুস্বরে বলে, বসুন। দাদাকে ডেকে দিচ্ছি। আর একবার অভয়ের দিকে তাকিয়ে, অমিয়া দরজা ঠেলে চলে যায়। একটা অতি মিষ্টি সুগন্ধ—,সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অভয়ের মনে হয়, ঘরে এতক্ষণ একটা আলো ছিল, সে আলো যেন নিভে গেল। পাশাপাশি আর একটা মুখ, মনের মাঝে জেগে উঠল। সে মুখ মিনতির। কিন্তু মিনতির ভাষা সে যেন বুঝতে পারে না। মিনতির রূপ আছে। কিন্তু সে রূপ বড় প্রখর। সূর্য্যের আলোর মত দীপ্তিভরা কিন্তু যেন স্নিগ্ধ নয়।

শুভময় আসে। গানে গল্পে বেলা বাড়তে থাকে। অভয় বারবার দরজার দিকে তাকায়। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, অমিয়াকে আর দেখা যায় না। আর একবার দেখবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু না—আর অমিয়া আসে না। কিন্তু অভয়ের যেন মনে হয় অমিয়া ধারে কাছেই কোথায় আছে। নিজের মনের মাঝে বার বার এই কথাটাই যেন উঠতে লাগল। অমিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখছে। কামনা-কলুষহীন মনের এই ইচ্ছার ভেতর অন্য কোন কালিমা ছিল না। আমরা ফুল দেখতে ভালবাসি—সুন্দর জিনিষ দেখলে মন আনন্দিত হয়। একটা অপূর্ব্ব পুলকে, সমস্ত মন যেন প্লাবিত হয়ে যায়। তার ভেতর অন্য কোন কুৎসিত লোভের ছায়া দেখতে পাওয়া যায় না। অভয়ের এই ইচ্ছাটা ঠিক তাই। দেখবার এই আকর্ষণ—এ কামনাহীন কলুষহীন আকাঙ্ক্ষা। অভয়ের বয়স অল্প, সংসারের অভিজ্ঞতা নেই, বিচিত্র মানুষের বিচিত্র ইচ্ছা, চরিত্র সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞানই নেই। এই জগতে কত সহস্র সহস্র বিচিত্র মানুষ আছে। তাদের নিষ্ঠুর কর্ম্মপ্রণালী, মনের নীচগতি, নীচ কর্ম্ম, নীচ চিন্তাধারা কি আশ্চর্য্য ভাবে, অতি গোপনে, সমাজ সংসারের ভেতর দিয়ে, ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে, এ সম্বন্ধে অভয়ের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। আমাদের সব ইচ্ছাই যে পূরণ হয় না সেখানে বহু বাধা, বহু বিঘ্ন বিপদ্ আছে—সে সম্বন্ধে অভয়ের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই নিষ্কলঙ্ক মনের মাঝে একটি সুন্দর কিছু

দেখে সৌন্দর্য্যপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে অভয় সংযত হত।

কারণ, অসম্ভব কোন বস্তুকে না পাবার যে দুঃখ, হতাশা, সেই দুঃখ বেদনাকে অকারণ বরণ করতে নিশ্চয়ই অভয় রাজী হ'ত না। কিন্তু অল্প বয়সের অনভিজ্ঞতার এই এক যন্ত্রণা। কিন্তু অভয়ের পিপাসিত চোখ আজ নূতন করে অমিয়াকে আবিষ্কার করেছে। হঠাৎ অভয় সচকিত হয়ে উঠল—উঃ, এখন যে বেলা বারটা। অভয় দাঁড়িয়ে পড়ে।

শুভময় বলে, পড়ার কি হ'ল তা জানিও, অভয়দা। বলছিলে যে বাড়ী যাবে একবার, তা কবে যাচ্ছ—

—দেখি আজ জেঠাবাবু কি বলেন। জেঠাবাবুর কথা শুনে তবে বাড়ী যাব। আজ তো নয়ই, সম্ভবতঃ কাল যাব—

শহরের দোকানপাট তখন বন্ধ হয়নি। বেলা একটা নাগাদ সব দোকান বন্ধ হবে—আবার খুলবে তিনটেয়। সুরকীর রাস্তা তেতে উঠেছে—আর গরমও মন্দ নয়। অভয় হঠাৎ অবাক হয়ে যায়। রাস্তার দুধারের কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, রাস্তার মাথার ওপর একখানা সুদৃশ্য লাল রংএর বিরাট গালচে কে যেন বিছিয়ে রেখেছে। কি আশ্চর্য্যই না লাগছে। রাস্তার ওপাশে খেলার মাঠ—তারপরে বাঁধের রাস্তা। সমস্ত পথ এখন নির্জ্জন—দুধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ সমস্ত রাস্তার ওপর কৃষ্ণচূড়ার ফুল ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। রাশি রাশি ফুল—ফুলের কুঁড়ি সমস্তই রাস্তায় ছড়াছড়ি। ছোট ছোট পাখী, মৌমাছি, প্রজাপতি, ভিড় করেছে, এই ফুলের মেলায়। অবাক্ হয়ে, অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বাঃ, কী সুন্দর—

অভয়ের মনে পড়ে যায় তার গাঁয়ের কথা। সেই পলাশপুর গাঁ। গাঁয়ের লোক চাষবাস করেই খায়। মাটির মর্যাদা তারা বোঝে—তাই আজও গ্রাম ছেড়ে যায় নি। শহরের আধুনিক সভ্যতা তাদের ভোলাতে পারেনি। তাদের গাঁয়ের রাস্তায় কাদা হয়, বর্ষার জলে চারদিক ভরে যায়। তবুও সেই ভাল। সেখানকার লোকজন, লণ্ঠন হাতে করে, কাঁধে গামছা নিয়ে, লাঠি ঠুক্ঠুক করতে করতে পথ চলে। দৈবাৎ যদি রাস্তায় সাপ থাকে, তারা মানুষের পায়ের শব্দে সরে যায়।

বনে বনে শেয়াল ডাকে, কচিৎ বাঘের ডাকও শোনা যায়। গভীর বনে একটানা ভাবে ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিঁ ঝিঁ করে ডেকে যায় - কুক্ কুক্ করে পেঁচার গলার আওয়াজ ভেসে আসে। নিশাচর পাখী, চাম্‌চিকে, বাদুড়, পেঁচারা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে আতা গাছে, পেয়ারা গাছে। বড় বড় গাছের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক জ্যোৎস্নাপোকা ঠিক হীরে মাণিকের মত জ্বলতে থাকে। নিস্তব্ধ গ্রামে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার। রাত গভীর হতে, গভীরতর হয়। মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস বয়ে যায়।

এ রূপের তুলনা কোথায়? মাঠে-মাঠে কচি ধান গাছে বাতাস দোলা দিয়ে যায়। ক্ষেতে কুমড়ো, লাউ, শশা—নানা তরীতরকারী ওঠে। বাড়ীর আনাচে কানাচে মাচায়-মাচায়-ঝিঙে, উচ্ছে, লাউ দুলতে থাকে। টগর, গন্ধরাজ, বেল, মালতী ফুলের সুগন্ধে সমস্ত ঘর বাড়ী মৌ-মৌ করতে থাকে। অভয় যেন ফিরে যায় তার গাঁয়ে।

পলাশপুরের নদী বন মাঠ সব যেন তাকে ডাকতে থাকে। অভয় ভাবে, কী হবে বেশী আশা করে। সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তো একদিন শেষ হবেই। তবু কামনা বাসনা কি তাতে মিটবে? চাই, চাই—আরও চাই। এই চাওয়ার কি কোন শেষ আছে? তাতে কি জীবনে শান্তি আসে? না তাতে আসে সুখ? তার চেয়ে নিভৃত পল্লীর মেঠো ঘরে, ক্ষেতে খামারে পরিশ্রম করে, উদারান্ন জুটিয়ে যে শান্তি পাওয়া যাবে তার তুলনা কোথায়? অভয়কে সহস্র টানে টানতে থাকে তার গাঁ। অভয়ের মনে হয়, সে যেন বন্দী। অভয় ভাবে, কবে সে এই শহরের খাঁচা থেকে মুক্তি পাবে। অভয় যেন শুনতে পায়, তার মা ডাকছেন —খোকা—ও খোকা। কিন্তু কোথায় তার মা? তার

চিরদুঃখিনী মায়ের শেষ শয্যা পাতা হয়েছে সেই গাঁয়ের শেষ প্রান্তে—নদীর ধারে বালুর চড়ায় —আগুনের শয্যায়। সেই জলন্ত অগ্নিশয্যায় তার মা চিরকালের মত বিলীন হয়ে গেছেন। আঃ সেই স্থান যে তার চির তীর্থস্থান। তার মা যে সেই বালুর শয্যায় চির বিশ্রাম নিতে নিতে, মাঝে মাঝে যেন ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন—খোকা—ও খোকা—

অনেক রাতে হঠাৎ অভয়ের ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন ব্যাকুলভাবে ডাকছে—অভয়দা—ও অভয়দা। অভয় চোখ কচলে তাকিয়ে দেখে মিনতি—

মিনতি বলল, শিগ্রী এসো অভয়দা। বাবা—বাবা—

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে অভয় বলে—কি হয়েছে—

—বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। শিগ্রী ডাক্তার ডেকে আনো অভয়দা। যাও, দেরী কোরো না। বাড়ীতে তখন কলরব উঠেছে। চারদিকে আলো, চাকর-বাকররা ছুটোছুটি করছে। প্রতিবেশী গগন মোক্তার,ললিত উকীল দ্বিজেন পেশকার অতুল কবরেজ সব চলে এসেছেন। নানাজনে নানা কথা বলছে। কে যেন কাঁদছে। বোধ করি মিনতির বা প্রণতির গলা। বীরুর কান্নাও শোনা যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই এসেছে অভয়। খাটের ওপর শোয়ান হয়েছে যোগেশ্বরবাবুকে। কিন্তু জ্ঞান নেই। গলার ভেতর থেকে মাঝেমাঝে গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। মাথায় বরফ দেওয়া হয়েছে, ঔষধও চলছে। কিন্তু ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। সকলেই ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে আছে, রুগীর মুখের দিকে। আশালতা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন স্বামীর মুখের দিকে। মুখ নির্ব্বিকার যেন পাথরপ্রতিমা। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে জেঠাবাবুর মুখ। সে এর আগেও দু-চারটে মৃত্যু দেখেছে। তার মনে হয়, আর নিষ্কৃতি নেই। কদিন থেকে কাকের ডাক বড্ড বেশী শুনতে পেয়েছে। অনেক রাত্তে ঘুম ভেঙে গেলে কাল পেঁচার কুক্ কুক্ অলক্ষুণে ডাক শুনতে পেয়েছে। একটা যেন মস্ত অমঙ্গল এ বাড়ীতে হবে, কদিন থেকে তার মনে হচ্ছিল। কিন্তু এঁরা তো বিশ্বাস করেন না—বরং হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, ওসব বাজে কুসংস্কার। কিন্তু আজ এই কাল রাতে, মৃত্যুদূতের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, মৃত্যুদূতের বিশ্রী কালো ছায়া সে যেন দেখতে পাচ্ছে। কোন এক অজানা রহস্যময় পার থেকে নেমে এসেছে, সেই মৃত্যুদূত। এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ ঘেরা, নানা স্মৃতি বিজড়িত, স্নেহভালবাসা শতেক মায়ার বন্ধন থেকে, এক নিমিষে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সে। এই সংসার, যশ মান সম্পদ সব হবে মিথ্যা। অভয় যেন বুঝতে পারে, আর বেশী দেরী নেই। কিন্তু এসব কথা কে শোনে। কাকেই বা বলবে এসব কথা।

ভোর বেলায় যোগেশ্বর দত্ত চলে গেলেন। একটা আর্ত্ত চীৎকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যোগেশ্বর দত্তর সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন হ'ল। তাঁর বন্দিত্ব আজ ঘুচল। সূর্য্যের প্রসন্ন আলোকের সঙ্গে পিঞ্জরে আবদ্ধ প্রাণপক্ষী বন্দিত্বের শৃঙ্খল মোচন করে যাত্রা করল সেই অনির্ব্বাণ অফুরন্ত আলোকের দিকে। এতদিনে যোগেশ দত্ত ছুটি পেলেন। তাই এই প্রসন্ন প্রভাতের সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোর মাঝে বেজে উঠল সেই ছুটির ঘণ্টা—ঢং—ঢং—ঢং—।

মহা সমারোহে যোগেশ্বর দত্তর শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল। এখান ওখান হতে শ্রাদ্ধে বহু লোকজন এল। আশালতা প্রচুর পয়সা খরচ করলেন,স্বামীর শেষ কাজে। যোগেশ্বর দত্তর দুই শ্যালক, শ্বশুর শাশুড়ী সকলেই এসেছিলেন। গোপেশ্বর এসেছিলেন, কিন্তু দুদিনের বেশী থাকতে পারেন নি। এই দুঃসহ শোকের মাঝে, আশালতার সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তাই হয়নি। গোপেশ্বর দরিদ্র কিন্তু তাঁর দাদা যোগেশ্বর ছিলেন অর্থবান্ এবং বহু সম্পত্তির মালিক। একণে আশালতার বাবা, মা, দুই, ভাই এখন অভিভাবক। সেখানে গোপেশ্বরের সঙ্গে আর কি কথা হতে পারে? গোপেশ্বরের একমাত্র চিন্তা এখন অভয়ের জন্য। যোগেশ্বর যদি বেঁচে থাকতেন তবে অভয়ের কলেজে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আর কোনও আশা নেই। অভয় তাই বলল

শুভময়কে, —বুঝলে শুভ, আমাদের কী অদ্ভুত অদৃষ্ট। যাকে বলে, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। আমাদের সেই অবস্থা। বোধ করি ভগবানের ইচ্ছা নয়, লেখাপড়া শিখি। জন্মকাল থেকে বড় কষ্টে মানুষ হয়েছি। খাওয়া পরা সব ব্যাপারেই কী যে নিদারুণ অভাবের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। বোধ করি, এই রকম অদৃষ্ট নিয়েই আমরা জন্মেছি। ভাবি, অদৃষ্টের নিয়ম লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

তাই এক এক সময় ভাবি, আমরা কত অপরাধই না করেছিলাম, তাই এই শাস্তি। শুভময় চুপ করে থাকে। অভয় বলে, বাবা চলে গেছেন। আমাকেও এবার এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। যদি জেঠাবাবু বেঁচে থাকতেন তবে আশা ছিল। কিন্তু এখন আর কোনও আশা ভরসা নেই। জেঠাইমা এখন তাই বললেন।

শুভময় বলল, তুমি চলে যাবে অভয়দা। আর বোধ হয় দেখা সাক্ষাৎ হবে না।

—দেখা হওয়া? মৃদু হেসে বলল অভয়—না বোধ হয় আর কেন আশাই নেই। এখানে থাকব কোন্ ভরসায়, বা কিসের জোরে। এক জ্যাঠাবাবুর জোরেই এখানে ছিলাম। কিন্তু সেদিক থেকে, ভগবান তাও ঘুচিয়ে দিলেন। ওঁদের সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ কি? আমরা গরীব। গরীব আত্মীয়কে কি বড়লোক আত্মীয় ভালবাসে না শ্রদ্ধা করে। ওঁরা বরং আমাদের ভয় পান, পাছে আমরা ওঁদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াই।

চাকরে চা আর খাবার দিয়ে গেল। অভয় একবার দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু আজ আর সুপুরিকে কোথাও দেখা গেল না।

অভয়ের বুক হতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চায়ে চুমুক দিয়ে অভয় ভাবল, তার কি আশ্চর্য স্পর্দ্ধা। দেখতে ভাল লাগে। ওর সংস্পর্শ, কথা, সবই ভাল লাগে। কিন্তু এই ভাল লাগার পরিণাম কি? সে কে? সে তো সামান্য—অতি নগণ্য একটি ছেলে। কোথায় আকাশের চাঁদ, আর কোথায় এক হীন মাটির প্রদীপ। একি অদ্ভুত দুরাশা তার।

শুভময় বলল, অভয়দা, যেখানে থাক না, কেন, চিঠি দিলে যেন উত্তর পাই। তোমার বাড়ীর ঠিকানায় পত্র দেব। যদি কোথাও যাও তবে জানাবে।

—হাঁ, উত্তর ঠিক দেব। কিন্তু শুভ, এই চিঠির আদান প্রদান কতদিন থাকবে জানিনে। আমি তো দেখছি, সময় আর মানুষের অবস্থা সবকে ভুলিয়ে দেয়। তবুও আমি তোমায় ভুলব না। তবে, শেষ পর্য্যন্ত এই শপথ হয়ত আর থাকবে না।

—না, থাকবে। তুমি দেখো অভয়দা। শুভময় জোর দিয়ে এই কথা কটি বলল।

বোধ করি এই রকমই হয়। দুটি সংসার-অনভিজ্ঞ বালক, আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় কত রকম শপথই না করে দেখা যায়, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, কত শত শপথ, কত ব্যথা বেদনা, ভালবাসা, স্নেহ, সব এক নিমেষে মুছে গেছে। মহাকাল ভেঙ্গে চুরে মানুষকে বারবার নূতন করে গড়ে দিচ্ছেন। তবুও বোধ করি, স্নেহ, মায়া ভালবাসা মিথ্যা নয়। এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে এটাই অতি সত্য। একদিন এরাও উভয় উভয়কে ভুলে যাবে, তখন কোথায় থাকবে অভয়, আর কোথায় থাকবে শুভময়।

— ——

ক্রমশঃ

শ্রীভগবত দাস বয়াট

আচমকা কেঁদে উঠল মেয়েরা। আর সেই কান্নার শব্দে পাড়ার অন্য ঘরের মেয়ে পুরুষ ছুটে গিয়ে ওদের দরজায় জড় হল। আমি গেলাম না। পড়ার ঘরে টেবিলের সামনে বসে বুঝতে পারলাম, নিতু বাগ্‌দী মারা গেল। কিন্তু মুখ ফুটে কথাটা প্রকাশ করতে সাহস হল না। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হলাম।

অপ্রিয় কথা। সুতরাং ভাল ভাবে না জেনে শুনে ঘোষণা করা অন্যায়। তবে এ কথা সত্য যে নিতু বাগ্‌দী মরণাপন্ন অবস্থায় রাত কাটাচ্ছে। আজ না হলেও দিন কয়েকের মধ্যেই ওর শ্বাস কার্য্য চিরতরে স্তব্ধ হবে। ওকে আর সুস্থাবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাবে না। পাড়ায় মোড়লি করার দিন ওর অস্তমিত। তা হলেও এখনই এই মুহূর্ত্তে ওর মৃত্যু হোক তা যেমন কেউ চায় না, তেমনি আমিও চাই না। কারণ সে আমাকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আমাকে ধনী নামে জাহির করেছে। যার ফলে আমার ঘরে চোর-ডাকাতের উপদ্রব না বাড়লেও মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে অহরহ।

পাশের বাড়ীর বাসিন্দা নিতু বাগ্‌দী। সংসারে পাঁচজন পোষ্যের মধ্যে চারজন কর্ম্মক্ষম,—রোজগারী। তবু মাটির ঘরে অতি হীন ভাবে দিন কাটায়। ঘরটিও জীর্ণ। যেন বাতাসে কাঁপছে। বলে, ওর এই হীনাবস্থার মূলে ধনীদের শোষণ। অথচ কোনদিন দেখলাম না কোন ধনী ওর রোজগারের অর্থ ছিনিয়ে নিচ্ছে। বরং ওকে অনেকে সামলে চলতে উপদেশ দেয়। কিন্তু সে কথা সে কানে নেয় না। ঠুলি আঁটা কলুর বলদ যেমন একই পথে পরিভ্রমণ করে, তেমনি সেও ওর স্বভাবের দাস। জন্মগত অভ্যাস ধমনীর রক্তস্রোতে যেন মিশে আছে।

আগে সে কাজ করত। কিন্তু এখন রোগে পড়ায় ওর কাজ বন্ধ। ওর ছেলে, বৌ আর মেয়ে কাজ করে। যা আনে তাতে সংসার আগেও যেমন চলছিল এখনও তেমনি চলে। তবে এখন খরচা একটু বেড়েছে। নিতুর ওষুধ-পথ্যে যে খরচা হচ্ছে তাতে কিছু ঋণ ধারও হচ্ছে। কিন্তু তবু ওর বাড়ীর লোকজনরা আমার মতই চায় না যে নিতু মারা যাক্। সকলের ইচ্ছা বেঁচে উঠুক। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। তাহলেও সবার মনে ঐ এক প্রশ্ন,—আর সে সেরে উঠবে কি?

কি যে রোগ তা জানি না। ওর আত্মীয় স্বজন হয়ত জানে, কিন্তু প্রকাশ করে না। বলে, দুবার কুকুরে কামড়েছিল। তাই বাঁচতে চেয়ে আধ মরা হয়ে পড়েছে। পেটের নাভিমূলের চার ধারে বারটা ইনজেকশন নিয়ে ওর জীবনেরও বারটা বেজে গেছে। আবার কখনও বলে বিড়াল আর ইঁদুরের ঘন ঘন কামড়ের ফলে ওর জীবনের এই দুরবস্থা। যাক্, এত সব জন্তু জানোয়ারের কামড় সহ্য করে যে বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। আরও আশ্চর্য্য যে আমি ওর বিচারে মানী না হলেও ধনী। অথচ পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে আমাকে ধনী বলে স্বীকার করবে। পাড়ার বাইরে অনেকেই আমাকে মান্য করে তা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু ধনী পদবীতে আজও আমি কারো কাছে আখ্যায়িত হইনি। তবু ওর কাছে আমি যেন পড়াশুনা না করেই এম-এ ডিগ্রি পেয়ে গেছি।

নিতু বিড়ির কারখানায় কাজ করত। ওর ছেলেরও ঐ কাজ। ওর স্ত্রী ও মেয়ে করে কোন এক ধনী পরিবারে ঝি-এর কাজ। সুতরাং ধনীদের পোষকতায় ওরাও পোষিত। কিন্তু ওর মতে ধনীরাই ওদের পেষণ করছে। ধনী শ্রেণীর উপর ওর জন্মগত বিদ্বেষ। কতকগুলো মুখস্থ করা বুলি মনে রেখেছে। সেগুলো আওড়িয়ে সে পাড়ার সর্দার। নামের পুরোভাগে রায়বাহাদুর লেখার মত সেও কমরেড লিখতে শুরু করেছে।

হঠাৎ কান্নার রোল বন্ধ হল। যে সব মেয়ে পুরুষ ওদের দরজার সামনে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা একে একে সরে পড়ল। কে একজন জোর গলায় বলে উঠল, আর মরবে না। একটু আগুন জেলে সেঁক তা'

দে তা হলেই সেরে উঠবে।

কথাটা শুনে কৌতূহলী হলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়ীর দোরগোড়ায় হাজির হলাম।

শীতের সকাল। তার উপর আজ দু'দিন বাদলা। ঠাণ্ডার প্রকোপ তাই খুব বেশী। আর এই ঠাণ্ডার প্রকোপে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে গেছল। রুগ্ন শরীর। ঘরে শীতবস্ত্রেরও অভাব। ঠাণ্ডা রোধের কোন ব্যবস্থা না থাকায় হাত-পায়ে শীতলতা ও চোখ মুখে কেমন যেন এক বিকৃত ভাব ফুটে উঠেছিল। যাতে বাড়ীর লোক-জন ভেবেছিল, এখনই বুঝি মারা যাবে। কিন্তু মরল না। একটু সামলে নিয়েছে। যাক্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এই তো মাত্র দু'মাস শয্যাশায়ী। এর মধ্যেই শেষ হবে? তা হতে পারে না। তাহলে যে ঈশ্বরের মান সম্মান খর্ব্ব হবে। যে নাকি যমেরও অরুচি! যম যাকে নিতে এসেও নিল না,—কি জানি যমালয়ে গিয়ে পাছে পার্টি পলিটিক্সের বুলি আওড়ায়! তাহলে তো বিব্রত হতে হবে! সুতরাং নিতুর মেয়াদ যে এখন শেষ হবার নয়,—তা স্পষ্ট বুঝা গেল। তাই হোক;—মরার চেয়ে বেঁচে থেকেই শান্তি বেশী। ফাঁসির চেয়ে জেল খাটায় অশান্তি অনেক।

মা চঞ্চলা যে আমার ভাগ্যে কোন দিন অচঞ্চল নয়, তা আমি জানি। ভুলেও তিনি আমার উপর কৃপা বৃষ্টি করেন নি। বিশেষ করে শৈশব থেকে বাগ্‌দেবীর শরণাপন্ন হওয়ায় তিনি যেন আরও রুষ্ট। পরে বিদ্যাচর্চ্চার বিরত হয়েও তাঁকে তুষ্ট করতে পারি নি। শোনা যায় লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর সাপ নেউলের সম্বন্ধ। সে কারণে মা কমলার আমার উপর শত্রুতা। তাহলেও কোন প্রকারে একটু লেখাপড়া শিখেছিলাম বলে খেটে খুটে খেতে পাচ্ছি। আটপৌরে একটা চাকরি জুটিয়ে মাসে কিছু আয় করছি। কিন্তু এতেই আমি নিতুর বিচারে বড়লোক! আর আমার উপর ওর বিদ্বেষও কম নয়। যেহেতু আমি ওর নাগালের মধ্যে রয়েছি এবং আমি দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ, সেই হেতু ওর দলের সকলেরই আমার উপর প্রবল আক্রমণ। নানা পূজা আদায় মোটা টাকা চাঁদা দাবী, উৎসব ও পার্ব্বণ উপলক্ষে এটা-সেটা আদায় উশুল;—এ যেন নিত্য লেগেই আছে। ভিক্ষা বা সাহায্য নয়,—দিতেই হবে, —এই রকম জোর দাবী।

তাই ভাবি, ওদের কথা বলার কথা ফুরিয়ে গেলে বলি,—একটু দূরে কত ধনী লোক রয়েছে;—কেউ মিল মালিক,—কেউ আড়ৎদার,—কই তাদের কাছে গিয়ে তো কিছু চাও না? আর যত চাপ আমার উপর!

জবাবে নিতুর দলের লোকরা বলে,—তারা কেন দেবে মশায়,—তারা তো ভিন্ পাড়ায় বাস করে। আপনি যখন পাড়ায় আছেন, তখন আপনার উপরই তো আমাদের জোর। আপনার আছে বলেই তো চাইছি। মনে মনে বলি,—ওদের কাছে চাইতে গেলে তো পাবে না। উল্টা ওদের কোপে তোমাদের ঘাড় গর্দ্দান কাটা যাবে।

অবসরে ওদের বিষয় চিন্তা করে আমার মনে এই সিদ্ধান্ত বলবৎ যে ওরা কমিউনিজম যে কি, তাই বুঝে না। যা করে বা বলে তা ঈর্ষা-প্রণোদিত। আমি ওদের মত কুঁড়ে ঘরে বাস করলেও কুঁড়ে নই। ওরা যেমন একদিন কাজ করে বেশী কিছু টাকা কামালে দু'একদিন কাজে যায় না,—আমি কিন্তু তেমন নই। শুধু এই কারণে ওদের আমার উপর ঈর্ষা নয়। আমার একার রোজগারে যে আমার সংসার সচ্ছল, অথচ ওদের প্রত্যেকের বাড়ীর প্রতিজনই রোজগার করে সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাতে পারছে না,—তাতেই হিংসা।

আমার ঘরের পাশে এক ফালি জমি, যেটুকু এমনি ফাঁকা পড়ে ছিল, সেটা ওরা সবাই মিলে ঘিরে বেড়ে বেআও করে দখল করল। বাধা দিতেও সাহস পেলাম না। কারণ আমি একা, আর ওরা অনেক। ওদের দলে দু'একজন রাজনৈতিক নেতাও আছে। ওরাই ওদের সাহস জোগাচ্ছে। তারা ভোট পেয়ে গদী কায়েম করার স্বার্থে ওদের হাতে হাত মিলিয়েছে। সুতরাং সবাই মিলে এখন যা বলবে তাই ওরা মানতে বাধ্য! জল চিরকাল নিম্নমুখী। কিন্তু সবাই যদি এক জোটে বলে, জলের গতি ঊর্ধ্বগামী, তা হলে তাই সত্য! তাই ভাবি, এই দল নেতারা দেশ সেবায় এগিয়ে এলেও কোন

দিনই ওদের কাছ থেকে সুফল আশা করা যাবে না। মন যে ওদের স্বার্থপ্রণোদিত। স্বীয় বিবেকবুদ্ধিকেও ওরা ওদের কাছে বিকিয়ে ফেলেছে। তাই তো ওদের আস্ফালন। ঐ নিতু আর নিতুর দলভুক্ত যত সব ছোট লোক, ওরাই এখন তাক বুঝে নেতাদের মাথায় চড়ে বসেছে।

ঐ পাড়ার সবাই শ্রমিক। রোজগার ওদের কম নয়। ঘরের প্রতিজনই কর্মী। মেয়েরাও বাবু বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করে। কেউ বা রাজমিস্ত্রীর সহকর্মিণী। কিন্তু রোজগার বেশী হলেও নানা বদ্ দোষ ওদের। মদ খায়, জুয়া খেলে আবার কখনও বা যেখানে সেখানে গিয়ে পয়সা খুইয়ে ঘরে ঢুকে। কিন্তু তাতেও ওদের কদর কমে নি। যেহেতু ওরা নিজেদের কমরেড বলে জাহির করে। আর কমিউনিজম অর্থে ওরা বুঝে, লুঠপাট ও দাঙ্গাবাজী।

ওদের দলপতি সুহাস সরকার বেশ মোলায়েম ভাবে জানাল,—ওরা আপনার জায়গায় একটা প্রাইমারী স্কুল করতে চায়। সাধারণের মঙ্গলের জন্যই ওদের এই প্রচেষ্টা। আশা করি পাড়ার মানুষ হয়ে আপনি ওদের সঙ্গে সহযোগিতাই করবেন।

—কিন্তু আমি যে টাকা দিয়ে জায়গা কিনেছি। তিনশ' টাকা দিয়ে জায়গা কিনলাম, ঘরের অকুলান হওয়ায় আর দুটো রুম বাড়াব বলে; -সেই জায়গাটা কি আমার এমনি ভাবে নষ্ট হবে?—মহা স্বার্থপরের মত আমি প্রশ্ন করলাম।

নষ্ট হবে কেন, জায়গার তো সদ্‌গতি হচ্ছে। রুষ্ট ভাবে সুহাস সরকার উত্তর দিল।

—তা'হলে আমায় তিন শ' টাকা আপনি দিয়ে দিন।

—আমি কেন দিব। আপনি ভেবে নিন, ঐজায়গাটা আপনি দান করলেন।

এই কথায় কি জবাব দিব, তাই ভাবি। নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুহাস বলে,—আমাদের রাশিয়ার অমুক মনীষী বলেন,—Wealth should be looked upon as a possession of the community to be cultivated nd safeguared.

—কি কথাটার মানে বুঝলেন? বললাম,—না।

একটু মুচকি হেসে সুহাস জানাল, লেখা পড়া যখন শিখেছেন, তখন বই-টই পড়ুন। মনটা উদার করুন, —কেমন। কথা বলেই সে চলে গেল।

যাক্, মনকেই প্রবোধ দিলাম। লোকে কত বেশী টাকা জুয়া খেলায় হেরে যায়, জানব তেমনি সখ করে একদিন জুয়া খেলে তিন শ' টাকা হেরেছি। সেই সময় একথা মনে হল না যে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমি ঐ এক ফালি জমি দান করলাম। কারণ, আমার কাছে ওরা ভিখারীরও অধম।

যথাকালে সুহাস বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হল। ছোট খাটো একটা কাঁচা মাটির ঘর তৈরী হল সুহাস সরকারের খরচায়। মাষ্টারও দু'জন নিযুক্ত হল। কিন্তু ইস্কুল চলল না। প্রথম কথা, কম মাইনায় কে কদ্দিন পড়াবে? আর দ্বিতীয় কথা, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা শেখার আগ্রহ মোটেই নেই। ওরা তো সব ঐ বৃক্ষেরই ফল। শ্লেট পেনসিল আর বই খাতা নিয়ে পড়তে এসে মাষ্টারের সামনে খেয়াল খুসী মত বিড়ি টানতে সুরু করল।

যাক্, ইস্কুল উঠে গেলেও ঘরটা তো রইল। সেই ঘরে তখন সকাল সন্ধ্যা জুয়ার আড্ডা বসতে লাগল।

শীতের সকাল। রোদে পিঠ পেতে ঘরের বাইরে নিতু বসে ছিল। জীর্ণ, কঙ্কালসার দেহ। রোগে ভুগে ভুগে আরও বেশী শীর্ণ হয়েছে। বললাম,—কেমন আছ?

—আর বাবু, এবার মরে গেলে বাঁচি।

—সে কি, মরবে কেন? হাসপাতালে ভর্ত্তি হও গে।

—সিট পাব না যে। সখেদে একটা নিশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল নিতু।

বললাম,—কেন, তোমাদের দলের নেতাদের ধর। ওদের রেকমেণ্ডে সীটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কৈ, তাঁরা তো আসেন না।

কিছু বললাম না। নিশ্চুপ রইলাম। নিতুও কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে জানাল,—উনারা আসবেন। খবর দিয়েছি। আমার অবদানও তো কম নয়। আগার

বছরের অবদান। বহুবার পিকেটিং করেছি। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জখমও হয়েছি। বাস জ্বালিয়েছি। সরকারী অপিসের খাতাপত্র তছনছ করেছি। আমাকে যখন উনারা নিলেন জানেন, তখন আসবেনই, আজ না হলেও কাল আসবেন।

বলেছিলাম, আসবে না। আর হলও ঠিক তাই। সুহাস সরকার আসে নি। কিন্তু এসেছিল অন্যজন। জনসেবক দলের নেতা বিজয় দাস। নিজের দলটা একটু পুরু করতে এগিয়ে এল। নিতু বাগ্দীর তদবির তদারক সুরু হল।

বিজয় দাস শুধু রাজনৈতিক কর্মী নয়, এম বি, বি এস ডাক্তার এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। বেশ পয়সা ওয়ালা লোক। নিতুর চিকিৎসা স্বয়ং করল না। রেকমেণ্ডে সে হাসপাতালে সীট পেল।

পাড়াটার ওপর নজর পড়ল বিজয় ডাক্তারের। রাস্তা ঘাট পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হল। পাড়ার কয়েকজন গরীবদের রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ভাবল, আগামী জেনারেল ইলেকশনে সে সব ভোটই কায়েম করবে। স্কুলটা আবার চালু হল। আর দিন পনের বাদে আধ সারা অবস্থায় হাসপাতাল হতে ফিরে এল নিতু বাগ্দী। ওকে দেখে মনে হল, স্রোতের জলে ভেসে আসা একটা আধ পোড়া কাঠ।

দশটা পাঁচটা যথারীতি স্কুল চলতে লাগল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিয়ম মাফিক উপস্থিতিতে মনে হল আর বুঝি স্কুল বন্ধ হবে না। সুহাসের তৈরী বাড়ী। বোধ হয় সেই কারণে সুহাসের নাম বজায় রেখে বিদ্যালয়ের নূতন নামকরণ হল, সুহাস বিজয় বিদ্যাপীঠ। পাড়াটা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হল। অল্প কয় দিনেই অনেক রদ বদল ও রূপান্তর ঘটে গেল। কিন্তু নিতু আর সম্পূর্ণ সেরে উঠল না। কিন্তু বিজয়ের সেদিকে হুঁস নেই। আসন্ন জেনারেল ইলেকশনে সে কম্‌পিট করবে। আর নির্ব্বাচন পর্ব্বও আগতপ্রায়। ভোট পেয়ে ওকে এম-এল-এ হতেই হবে। প্রস্তুতি অনেক আগের থেকে শুরু করেছে, এখন প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় আছে, যাতে সব ভোটগুলো ওরই কায়েম হয়।

সুহাস সরকার দাঁড়িয়েছে। তারও লক্ষ্য পাড়াটার উপর। একদিন সে এই পাড়ায় ধুলো মাড়ায় নি, এখন আপন গরজে হাজির। ঘরে ঘরে সবার খোঁজ খবর নেয়। নিতুর কাছেও গিয়ে দাঁড়ায়। নিতু বলে,—আমি তো অক্ষম, খাটাখুটি মোটেই করতে পারব না। তবে ভোটের দিন ঠিকই যাব ভোট দিতে। ভোট নষ্ট তো করতে পারি না।

সুহাস খুসী হল। বলল,—ঠিক আছে। তোমাকে তো জানি। তুমি পার্টিকে খুব ভালবাস। নাও, কিছু রাখো,—দেখবে এতল্লাটের ভোট যেন নষ্ট না হয়। এই বলে সে' দু'শ টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল। আর নিতুও তা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করল।

এদিকে সে বিজয় ডাক্তারের কাছে থেকেও মোটা টাকা নিয়ে রেখেছে। ওকেও আশ্বাস দিয়েছে, ওদের দলের সব ভোটই ওর কেনা হল। কিন্তু সে কাকে ভোট দেবে তা তো মোটেই ভাবল না।

ভোটের দিন সকালেই নিতু ভোট দিয়ে বাড়ী ফিরল। হেঁটে যাওয়ার শক্তি ছিল না, রিকশায় গেছল। এবং রিকশায় ফিরেছিল। কিন্তু কাকে সে ভোট দিল তা অনেকে অনুমানে জানলেও আমি কিন্তু অনুমান করতে পারি নি। কারণ দুপক্ষেরই সে টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছে। কেউ তা জানে না, কিন্তু আমি দেখেছি। দু'পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেছে। আরো যদি কেউ আসত, তাহলে তার কাছেও টাকা নিত। কিন্তু ভোট নষ্ট না করে সে একজনকেই দিয়েছে। সেদিকে সে মহা ঘুঘু।

ভোট কাউনটিং-এর পর ফলাফল জানা গেল। কিন্তু দেখলাম, আমরা ভোট দিয়ে যমালয় থেকে নিতুকে ফিরিয়ে আনলাম। অথচ সে ভোট দিয়ে ওর প্রিয়জনকে জিতাতে পারে নি। কারণ নির্দ্দলীয় প্রার্থী মুকুন্দ ঘোষ সেবার অধিক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করল। নিতু এখন ভাবছে, সুহাস বাবুর দেওয়া দু'শ টাকা আত্মসাৎ করে সে ভীষণ ভুল করেছে। বিলিয়ে দিলে পারত।

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের একটি ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বিনা টিকিটে কাউকে প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল। আমরা যখন প্যাণ্ডেলের ভিতর যাওয়ার জন্য একটি গেটের সম্মুখীন হলাম তখন দেখলাম যে, দীনবন্ধু এনড্রুস সাহেব ধুতি পাঞ্জাবী ও গলায় পাটকরা চাদর জড়িয়ে প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশের জন্য উদ্যত হতেই গেটের প্রহরারত স্বেচ্ছা-সেবক টিকিট দেখতে চাইলেন। সাহেবের সঙ্গে প্রতিনিধির কার্ড ছিল না বোধ হয় তিনি তা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতাও মনে করেন নি, তাঁর নিকট কার্ড ছিল না। তিনি সেই কথা জানিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের বাধা অগ্রাহ্য করে প্যাণ্ডেলের দিকে পা বাড়াতেই কর্তব্যপরায়ণ স্বেচ্ছাসেবক এনড্রুস সাহেবের গলার চাদর দুহাতে ধরে তাঁকে টেনে রাখলেন। এরকম অভাবনীয় ব্যাপারে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল, ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। স্বেচ্ছাসেবককে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করা হল, অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সদস্য সংবাদ পেয়ে দৌড়ে এসে সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সসম্মানে তাঁকে ভিতরে নিয়ে ডায়াসে বসালেন। এই ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী।*

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পরই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করলেন। এই পার্টি গঠনের কার্য্যে লণ্ডনের প্রিভি কাউনসিলের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার অতি সুপুরুষ ভগবান দীন দুবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

অধিবেশনের পর গয়ার দ্রষ্টব্য স্থান গুলি ও বৌদ্ধ গয়া দর্শন করে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ রজনী মোহন সান্যাল ও শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে পাটনা বেড়াতে গিয়ে আমার সহপাঠী বন্ধু পাটনা হাইকোর্টের বিশিষ্ট এডভোকেট নিরঞ্জনারায়ণ সিংহের আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম। নিরঞ্জ পরবর্ত্তী কালে পাটনা বিধান সভার স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিরঞ্জ অতি আগ্রহের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করল। যে কয়দিন পাটনায় ছিলাম, তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

একদিন পাটনা হাইকোর্টে গিয়ে আমার কয়েকজন বন্ধু ও সহপাঠী এডভোকেটের সঙ্গে দেখা হল। আমরা নিরঞ্জর বাড়ীতে উঠেছি শুনে তাঁরা একবাক্যে বললেন, আমরা থাকতে দাঁড় টানার বাড়ীতে উঠতে গেলে কেন? নিরঞ্জর অপরাধ তার পৈতৃক ব্যবসা ছিল পাটনা থেকে আরম্ভ করে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত ফেরি ঘাটের ইজারদারি। রাজসাহীতে তাদের ইজারদারি ছিল। রাজসাহীর বাসা থেকেই নিরঞ্জ পড়াশুনা করে রাজসাহী কলেজ থেকে এফ্ এ পাশ করে, তার পর কলকাতায় পড়বার সময়ও আমরা এক মেসে ছিলাম।

আমার বাঙালী উকিল বন্ধুরা বিহারীদের সম্বন্ধে অনেক কটাক্ষপাত করলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ একদিনও আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন না।

পাটনা সহর পরিদর্শন করে আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। আমার বাসায় কয়দিন থাকার পর রজনীরা দেশে ফিরে গেল।

বিশেষ অধিবেশন—দিল্লী-১৯২৩

(১)

গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই ১৯২৩

দালের ৯ই জানুয়ারী চৌরী চৌরা মামলার রায় বেরুল। তাতে জানা গেল যে, ২২৮ জন বিচারাধীন আসামীর মধ্যে ৬ জন জেলে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেছে। একজনকে গুরুতর অসুখের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকী আসামীদের মধ্যে ৪৭ জন নিরপরাধী সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি লাভ করেছে। দুজনকে দু বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাকী ১৭০ জন আসামীর প্রতি হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ডাকাতির অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ভীষণ সংবাদে সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

গয়া কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের উভয় দলের কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জারের দল তাদের নিজ নিজ মত প্রচারে লেগে গেল। ১০ই জানুয়ারী তামিল নাড়ু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক সভায় কংগ্রেসের কর্মসূচী সম্বন্ধে বলতে উঠে মিঃ রাজাগোপালাচারী মন্তব্য করলেন যে নেতারা তাঁদের (নো-চেঞ্জারদের) পরিত্যাগ করেছেন, একটি মাত্র বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে মাত্র এই কারণে। অবশ্য তাঁরা (নো-চেঞ্জাররা) কোন ঝগড়া করেন নি বা তাঁদের (প্রো চেঞ্জারদের) কাজে বাধা দেওয়ার ইচ্ছাও, প্রকাশ করেন নি। নেতাদের স্নেহ ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচী-সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলা।

অপর দিকে স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচী প্রচারের জন্য দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 'নেশন' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন যে স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে উল্লিখিত মত গ্রহণ করা। তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ভাবে মনে করেন যে গয়া কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার ব্যর্থতা বুঝতে মাত্র মাস কয়েক সময় লাগবে। তিনি আইন অমান্য প্রস্তাব কার্য্যকর মনে করেন না এবং যেভাবে আইন অমান্য করা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে সেভাবে আইন অমান্য করা সম্ভব হবে না। জাতীয়তার জন্য আবশ্যক বিবেচিত না হলে তিনি এর বিশেষ কোন গুণও দেখেন না। তাঁর বক্তব্য এই বলে তিনি শেষ করলেন যে নূতন দল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (নোচেঞ্জার) পুনরায় মিলিত হবে এবং এর জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হবে।

১৬ই জানুয়ারী পুণার শিবাজী মন্দিরে এক জনসভায় নরসিংহ চিন্তামন কেলকার ঘোষণা করলেন যে যতদিন নূতন দলের সংখ্যা-লঘিষ্ঠতা সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় পরিণত না হয় ততদিন তিনি আন্দোলন চালিয়ে যেতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন।

ইতিমধ্যে কাঁকিনাড়া (কোকনদ) কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ জানাল। ২০শে জানুয়ারী অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান কাঁকিনাড়া স্থির করল।

এই সময়ে উভয় দলের মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা চলতে লাগল। এই উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে ২৭শে জানুয়ারী অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর একটি অধিবেশন আহ্বান করা হল। উক্ত সভার নেতৃত্ব করলেন দেশবন্ধু দাশ।

উভয় পক্ষের বহু তর্ক বিতর্ক আলোচনার পর নিম্নলিখিত আপোষের প্রস্তাব গৃহীত হল :—

(১) ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষকে কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য বন্ধ রাখতে হবে।

(২) পরস্পরের কাজে বাধা না দিয়ে কর্মসূচীর অন্যান্য বিষয়ে কাজ করার স্বাধীনতা সকলের থাকবে।

(৩) অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সম্বন্ধে গয়াতে গৃহীত কর্মসূচী প্রচার করার স্বাধীনতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থাকবে।

(৪) অর্থসংগ্রহ এবং তার জন্য আবেদন করা এবং প্রয়োজনানুসারে গঠন মূলক কর্মসূচীর জন্য স্বেচ্ছাসেবক লিষ্টভুক্ত করা এবং গঠনমূলক কর্মসূচী ও অন্যান্য 'কমন' বিষয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সহিত সহযোগিতা করবে।

(৫) ৩০শে এপ্রিলের পর প্রত্যেক দল যে পন্থা উপযুক্ত বিবেচনা করবে তা গ্রহণ করতে পারবে।

(৬) উপরোক্ত ব্যবস্থা করা হল এই সর্তাধীনে যে, কোন প্রদেশে বর্তমান কাউনসিলগুলি সময়ের পূর্বে ভেঙ্গে যাবে না।

প্রস্তাব সি রাজাগোপালাচারী কর্তৃক উত্থাপিত ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কর্তৃক সমর্থিত হয়ে গৃহীত হল।

১৮ই মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণের বার্ষিকী পালনের জন্য সমগ্র দেশে হরতাল পালিত হল।

৩১শে মার্চ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন যশোহরে আরম্ভ হয়। এই কনফারেন্সে ২রা এপ্রিল তারিখে অধিকাংশ প্রতিনিধিদের ভোটে আইন অমান্য সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি নিয়ে দেওয়া গেল :—

যেহেতু বর্তমান সময়ে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কর্মী এবং জনসাধারণ নীরব এবং কাজ সম্বন্ধে তাদের উদ্দীপনা কমে গিয়েছে এবং এই পরিস্থিতির সুযোগে দেশের শত্রুরা নানা উপায়ে আন্দোলন ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে এবং নূতন নূতন কর ধার্য্য করে জনসাধারণকে উত্যক্ত করছে এবং যেহেতু বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী মনে করে যে, আইন অমান্য এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন দ্বারা দেশে পুনরায় উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত, অতএব এই কনফারেন্স সাব্যস্ত করছে যে এর জন্য আইন অমান্যই শ্রেষ্ঠ উপায়, অতএব এই সম্মিলনী প্রস্তাব করছে যে এর জন্য লবণের উপর ধার্য্য নূতন কর দিতে অস্বীকার করা তাদের উচিত এবং এই কনফারেন্স—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর উপর ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার ক্ষমতা দিতে অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করছে।

এই রকম সময়ে পাঞ্জাবে এবং উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য যা মহাত্মা গান্ধী বহু চেষ্টায় স্থাপন করেছিলেন তা ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত হল।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অনুন্নত ও অস্পৃশ্য হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এতে গোঁড়া মুসলমানরা ক্ষেপে গেল। ২১শে এপ্রিল এক বিবৃতিতে স্বামীজি এই আন্দোলনের যে কারণ দেখিয়েছেন তা নিয়ে দেওয়া গেল।

ধর্মান্তরিত হিন্দুগণকে শুদ্ধ করে পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই আন্দোলন (শুদ্ধি) শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। উলেমারা তাঁদের বক্তৃতা দ্বারা এবং অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন দ্বারা এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিয়েছেন। জমিয়েত উল উলেমার প্রচারণার সমর্থনে উলেমারাই গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করার সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করছে। এই ঘটনার পর যখন হিন্দুরা দেখল যে তাদের ধর্ম বিপন্ন তখন তারা ভারতী শুদ্ধি সভা প্রতিরোধক-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করল। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটীও দায়ী।

স্বামীজি আরও জানালেন যে কিছুদিন পূর্বে তিনি কংগ্রেসের ও তার কাজের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং শুদ্ধি আন্দোলনের জন্য তিনি কংগ্রেসের কোন সাহায্য কখনও চান নি। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চান যে এই আন্দোলনে তাঁর রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নেই। তিনি সমগ্র হিন্দু সমাজকে একটি মাত্র সম্প্রদায়রূপে সংগঠন করতে চান এবং তাদের ভিতর থেকে সমুদয় বৈষম্যকে দূরীভূত করতে চান। তিনি জানালেন যে, তাঁর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, ৭ কোটি অস্পৃশ্যদের হিন্দুসমাজভুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নেবেন না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কেউ কেউ এই উক্তি মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়েছে বলে মনে করেছেন। মুসলমানরা ত অস্পৃশ্য নন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জানালেন যে এটা তাঁর ধারণার বাইরে।

মার্চ ও এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে ব্যাপক ভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আরম্ভ হল। সেখানকার ভয়াবহ

অবস্থা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য দেশবন্ধু দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, হাকিম আজমল খাঁ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সদস্য করে একটি কংগ্রেসে ডেপুটেশন পাঞ্জাবে প্রেরিত হল।

ডেপুটেশনের সদস্যগণ পাঞ্জাবে গিয়ে দেখলেন যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে, মালাবার ও মুলতানের স্মৃতি একদিকে ও শুদ্ধি ও হিন্দু সংগঠন অন্যদিকে পরস্পরের মনে বিদ্বেষের ভাব এনে দিয়েছে। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ ডেপুটেশনকে জানাল যে মুসলমানরা বিধান পরিষদে, মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী অফিসে তাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের দাবি করছে। হিন্দু ও শিখেরা এই রকম সাম্প্রদায়িক দাবির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ডেপুটেশনের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না। পাঞ্জাবের অবস্থা অপরিবর্তিত রইল।

(২)

কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে যে আপোস হয়েছিল তার সর্তানুসারে ৩০শে এপ্রিল তারিখ শেষ হওয়ার পর রাজাগোপালাচারী ২রা মে তারিখে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বললেন যে ৩০শে এপ্রিল তারিখ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদে উভয় দলের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে। স্বরাজ্য পার্টি আগামী কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে এবং অন্যান্য দলের প্রার্থীদের পরিবর্তে তাদের নির্বাচিত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করার ইচ্ছা ঘোষণা করেছে। অতএব আমাদের নো-চেঞ্জারদের গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে কাউন্সিল বয়কট সাফল্যমণ্ডিত করা কর্তব্য। আমরা আশা করি পারস্পরিক সদিচ্ছায় এবং বিনা বাধায় আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারব।

আবার উভয় পক্ষ দেশময় নিজ নিজ মত প্রচারে লেগে গেলেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন ১২ই মে তারিখে আরম্ভ হয়। উক্ত কমিটীর সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেদিন অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীগুলি দখল ও ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরদিন চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সভাপতি আউট অব অর্ডার রুলিং দিয়ে প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। ঐ রুলিং-এর বিরুদ্ধে দাশ মশায় বিস্তারিত আলোচনা করে বললেন যে সভাপতি মশায়ের আইনজ্ঞানের একান্ত অভাব। সভাপতি মশায় তাঁর রুলিং বদলালেন না।

অনুরূপ অন্যান্য প্রস্তাবও ঐ একই কারণে সভাপতি মশায় নাকচ করলেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, সভার কার্য্য প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এই উক্তির দরুণ সভাপতি মশায় শরৎবাবুকে সভা হতে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং দাশ মশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, শরৎবাবুর মন্তব্য সভাপতির অপমান জনক কি না। দাশ মশায় স্বীকার করলেন, এরূপ মন্তব্য করা শরৎবাবুর পক্ষে উচিত হয় নি। বহু সদস্য শরৎবাবুর ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানালেন। শরৎবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তার পর দাশ মশায় তাঁর দলবল সহ সভা-গৃহ ত্যাগ করলেন।

১৯শে ও ২০শে মে তারিখের বেজওডা (বিজয়াওডা) সহরে অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনটি প্রকাশনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রস্তাব দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার সুপারিশ করা হয়েছিল, অবশ্য যদি উভয় পক্ষ বিশেষ অধিবেশনের

সিদ্ধান্ত মেনে নিতে স্বীকার করেন এই সর্তে।

ঐ সভা কাউনসিল বয়কট প্রস্তাব স্থগিত রাখার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

এই রকম সময়ে ফরিদপুর জেলায় মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়।

২৩শে মে তারিখে দেশবন্ধু দাশের সভাপতিত্বে বোম্বাই সহরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর একটি অধিবেশন হয় এবং পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের উভয় দলের মধ্যে আপোষ মূলক প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয়। (প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন ১১৮, বিপক্ষে ছিলেন ১১১।)

প্রস্তাবটি নিম্নলিখিত মত ছিল :—

যেহেতু কাউনসিল প্রবেশের স্বপক্ষে কংগ্রেসে একটি প্রবল মত আছে এবং যেহেতু কংগ্রেস সদস্যদের বর্তমান বিভেদের ফলে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ইতিমধ্যেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে অতএব—কংগ্রেস সদস্যদের দলাদলি বন্ধ করে সংযুক্ত ভাবে দাঁড়ানো একান্ত আবশ্যক এবং তজ্জন্য গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের সাফল্যের জন্য ভোটারদের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালানো বন্ধ করা হোক।

এই প্রস্তাব নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদ হয়। অল্প ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর একটি বিবৃতি দিয়ে সি রাজাগোপালাচারী ও রাজেন্দ্র প্রসাদ (সেক্রেটারীদ্বয়) যমনালাল বাজাজ (কোষাধ্যক্ষ), বল্লভ ভাই প্যাটেল, ব্রজকিশোর, মোয়াজ্জাম আলী এবং দেশপাণ্ডে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য পদ ইস্তফা দেন। দেশবন্ধু দাশও উক্ত কমিটীর সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে ডাঃ আনসারী সভাপতি নির্বাচিত হন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, টি, প্রকাশন্ এবং ডঃ মামুদ সাধারণ সম্পাদক—এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দার তেজ সিং, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, ডঃ ভরতরাজন নাইডু ও কাজি আবদুল মজিদ ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নির্বাচিত হন।

উভয় দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন না হওয়ায় ফলে উভয় পক্ষের নেতাগণ দেশময় পরিভ্রমণ করে নিজ নিজ পক্ষের মতের জন্য জোর প্রচার কার্য্য চালাতে লাগলেন।

এমন সময় ভারতের ভাগ্যাকাশে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের কালো মেঘ আবার দেখা দিল। কোহাটে ভীষণ দাঙ্গার ফলে তথাকার মুষ্টিমেয় হিন্দু অধিবাসীদের অধিকাংশই ঘাতকের খড়্গাঘাতে প্রাণত্যাগ করল এবং তাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হল।

১৩ই জুন নেলোরে টি প্রকাশনের সভাপতিত্বে অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নো-চেঞ্জারগণ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাতে বলা হয় যে বোম্বাইয়ের অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাব কারুর উপর বাধ্যতামূলক নয় ঘোষণা করা হোক এবং গয়া কংগ্রেস কাউনসিল বয়কটের যে কার্য্যক্রম সুপারিস করেছে তা কার্য্যকর করা হোক।

এই প্রস্তাব নিয়ে প্রচুর বাক্‌বিতণ্ডা চলে। ৫ ঘণ্টা আলোচনা ও তর্কাতর্কির পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। তার পরিবর্তে এক প্রস্তাব দ্বারা সমুদয় জেলা কংগ্রেস কমিটীগুলিকে কাউনসিল বয়কট প্রচার কার্য্য থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সভায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ হয়। তাতে বলা যে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অহৈতুক বিরোধ এড়ানোর জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে অনুরোধ করা হোক।

বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটীও ১৮ই জুন তারিখে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করে। তাতে বলা হয়েছে, বোম্বাইতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী কাউনসিল প্রবেশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পাশ করেছে তা গয়া কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের পরিপন্থী হওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে

বলা হোক যাতে তারা এই প্রশ্নের মিমাংসার জন্য অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করেন।

ইতিমধ্যে কাঁকিনাড়া ‡ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হল।

অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ১৫ই জুন তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলীর নাম সুপারিশ করে।

তারপর কেরল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২২শে জুন, সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২৭শে জুন, যুক্ত প্রদেশ ৩০শে জুন, এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ৩রা জুলাই তারিখে একমাত্র মৌলানা মহম্মদ আলীর নাম সুপারিশ করে।

নব নির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটিতে যে সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে তাদের ধিক্কার দিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় কিন্তু ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। এর ফলে কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে নাগপুর অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহুত হল। দেশবন্ধু দাশ সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে বোম্বাইতে গৃহীত প্রস্তাবই পুনরায় পাশ হল। রাজাগোপালাচারী প্রবলভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন কিন্তু ভোটের সময় তিনি ও তাঁর অনুগামীগণ ভোট দিতে বিরত থাকেন।

এই অধিবেশনে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা সাব্যস্ত হল।

পুনর্বার নূতন করে ওয়ার্কিং কমিটী গঠিত হল। সভাপতি হলেন অন্ধ্রের জনপ্রিয় নেতা কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়া, সেক্রেটারী হলেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গোপাল কৃষ্ণ আয়ার এবং সদস্য নির্বাচিত হলেন তসদ্দক শেরওয়ানী। কোষাধ্যক্ষ হলেন বোম্বাইয়ের রেবাশঙ্কর জগজীবন এবং গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, জর্জ যোসেফ, মহম্মদ সফী ও ডঃ ভরদারাজালু।

২২শে জুলাই কাঁকিনাড়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সভায় দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়া সভাপতি; টি প্রকাশন ও কে নাগেশ্বর রাও সহ ১৫ জন সহ সভাপতি এবং বুলুসু শাম্বমূর্ত্তি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম জাতীয় পতাকা রক্ষা করতে গিয়ে এক বৎসর কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি মাদ্রাজ বিধান সভার স্পীকার হন।

৩রা আগষ্ট তারিখে কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়ার সভাপতিত্বে বিশাখাপত্তনমে (ভিজাগাপট্টম) অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর একটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনে রাজাগোপালাচারী, তসদ্দক শেরওয়ানী, গৌরীশঙ্কর মিশ্র, দেশপাণ্ডে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, অন্তরঙ্গ গোপাল কৃষ্ণ, টি প্রকাশন্, নাগেশ্বর রাও প্রভৃতি ৪৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

রাজাগোপালাচারী একটি প্রস্তাব দ্বারা নাগপুরে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে সেপ্টেম্বর মাসে যত শীঘ্র সম্ভব বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন করার জন্য বললেন। যদি অধিবেশনের স্থান সম্বন্ধে কোন অসুবিধা হয় তা হলে অন্য কোন স্থানে অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে সভাপতির উপর ভার অর্পিত হল।

* অনুরূপ আর একটি ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর মহাত্মা গান্ধী যখন বাংলায় মফঃস্বলে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের জন্য অর্থসংগ্রহে বেরিয়েছিলেন তখন রাজসাহী জেলা ভ্রমণে আমি তাঁর এসকর্ট ছিলাম। ঐ সময় নওগাঁতে থিয়েটার হলে একটি মহিলা সভা আহ্বান করা হয়। সভায় মহাত্মা গান্ধীর অভিভাষণের ব্যবস্থা ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিকে যদিও দেশের মহিলাগণ প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতে আরম্ভ করেছিলেন তবে এখনকার মত অতটা স্বাধীনতা লাভ করেননি। তা ছাড়া নওগাঁর মত ক্ষুদ্র সহরে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্যই ওই সভা আহ্বান করা হয়েছিল।

মহাত্মাজি বাইরে দরজা দিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার পর তাঁর সঙ্গী খাদি প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত কর্মী সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মশায়ও মহাত্মার পেছনে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে উদ্যত হইতেই স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে সবিনয়ে জানালেন যে, এই সভায় মহাত্মা ছাড়া আর কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। একমাত্র ব্যতিক্রম স্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে আমি মহাত্মার সঙ্গে থাকব। সতীশ বাবু বললেন যে মহাত্মা হিন্দীতে বক্তৃতা করবেন, তিনি তা বাংলাতে অনুবাদ করে শোনাবেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হলো যে, স্থানীয় জনৈক মীরাট প্রবাসিনী তরুণী উপস্থিত আছেন, তিনিই হিন্দী অনুবাদ করে শোনাবেন। সতীশবাবু সে কথা শুনলেন না। তারপর সর্বপ্রকার অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করে সিঁড়ির ধাপে পা দিতেই আমার সহপাঠী বন্ধু নওগাঁর উকিল প্রাণেশচন্দ্র বাগচী সজোরে সতীশবাবুর গলার চাদর দুই হাতে ধরে তাঁকে টেনে নামালেন।

* 'কাকিনাড়া শব্দের ইংরেজি রূপ দেওয়া হয়েছিল "Cocanada"; তা থেকে বংলায় আমরা করেছিলাম "কোকনদ"। বর্তমানে ইংরেজি বানান "Kankinada" করা হয়েছে। ক্রমশঃ

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

সপ্তম অধ্যায়

'দিগন্তে'র শ্রী অনেকদিনই ম্লান হয়েছিল। দীর্ঘদিন জয়ন্তী কোন দিকে দৃষ্টি দেয়নি—রাতদিন মুকুটকে শুধু আগলে রেখেছিল। বিরামবিশ্রামহীন দিনগুলি, নির্বাক্ পীড়িতের তত্ত্বাবধান, জয়ন্তী ক্লান্ত হয়েছিল কিন্তু সেদিকে তার কোন নজরই ছিল না। এতদিন সে একা থাকবার সুযোগ পায় নি বলে দুঃখ করেছে, সে নিজেকেই শুধু খুঁজে পেতে চাইছিল, অদৃষ্ট তাই বিদ্রূপের হাসি হাসল, অবশেষে একা হল সে। গর্ব করে বাবাকে বলেছিল তার স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু হায় এ যেন ভীষণ দুঃস্বপ্ন, কোন এক উন্মাদ ঝড়ের আলোড়ন, দেহমনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। মৃত্যুর মধ্যে শান্তির লেশমাত্র সে খুঁজে পেল না। শিল্পীগোষ্ঠী ও বন্ধুবর্গ যারা জয়ন্তী ও মুকুটের জীবন ঘিরে রেখেছিল, জয়ন্তীকে অতি ভাগ্যবতী ছাড়া এতদিন আর কিছুই ভাবেনি তারা। তার অন্তরের অতৃপ্তির ও বিষাদের কালিমা সর্বত্র অলক্ষ্য রয়ে গেছে। এই জনকোলাহলের কাছ থেকে সে যে দূরে সরে যেতে চাইছিল—সুগভীর নীরবতার অতলস্পর্শ খুঁজেছিল, একমাত্র দেবাশিস অনুমান করেছিল তা।

ছবি, রঙ, তুলি বই, খাতা, কাগজ, কার্ড স্কেচ, শিল্প জগতের শত সহস্র অবলম্বন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল —জয়ন্তী যেন সেদিকে আর তাকাতে চাইল না। অপ্রয়োজনীয় সব কিছু ছিঁড়ে ফেলে দিল—জানালাগুলি ভাল করে খুলে দিয়ে বাইরের শুদ্ধ বাতাস ঢুকতে দিল। জনস্রোত, সঙ্গী বন্ধু আমোদ আনন্দ, মান, যশ, কী না চায় মানুষ? এ সকল বস্তুরই কাঙ্গাল সে, কিন্তু চতুর্দিক থেকে যখন প্রবল বেগে বাহ্যিক কামনাগুলি মানুষকে চেপে ধরে, তার শান্তি কেড়ে নেয়, সে তখন বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, সংসার থেকে নির্লিপ্ত হতে চায়। তার বাসনা স্তূপ অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে যায়—অজানা পথে পথভ্রান্ত পথিকের মত সে ঘুরে বেড়ায়। এতদিনের জীবননাট্য থেকে জয়ন্তী মুক্ত হবার উপায় খুঁজেছিল—অতি গোপন অনন্ত অহম কোথায় দূরে ফেলে রেখেছিল সে তাই ভাবছিল। সত্য যতই ভয়ঙ্কর হোক তবু তাকে সে খুঁজবেই। নিজেকে সে খুঁজে বার করবেই যতদিন লাগুক।

পশ্চিমের রক্তিম আকাশ একটি বিশাল চিত্রপটের মতন দেখাচ্ছিল, জয়ন্তীর দৃষ্টি পড়ল সেইদিকেই, জানালার অতি নিকটে গিয়ে সে দাঁড়ালো। শৈশবে সে মার হাত ধরে সূর্যাস্তের রঙিন খেলা দেখতো, অস্তাচলের রমণীয় দৃশ্য দেখে মনে হল যেন একটি শিশু তার বাক্সের সব রঙগুলি দিয়ে অজস্র রেখা টেনেছে—তারপর সব রকম রঙ একত্র করে মিলিয়ে দিয়েছে। গগনাঙ্গনে নিত্য যে রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায় মহাশিল্পীরই সৃষ্টির খেলা অতি অপূর্ব অতুলনীয় রূপের লীলা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণের বাতাস বইতে লাগল, চতুর্দিক স্নিগ্ধ ও শান্ত হল। জয়ন্তী গেট খুলে বেরিয়ে গেল—সুদীর্ঘ পথ সম্মুখে। বেশ কয়েক মাইল একা হেঁটে আসবে এই ইচ্ছা। অনেক দূর পর্যন্ত এইভাবে দ্রুত গতিতে সে হাঁটলো, পথের শেষে একটি গুরুদোয়ারের কাছে এসে থেমে গেল। কি যেন একটা গম্ভীর সুর কানে ভেসে আসছিল, 'কাজল ঘন মাঝে, নিশি আঁধার মাঝে'। ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এল। একটি বারান্দার কোণে ইজি চেয়ারখানা টেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। বই খুলে পড়তে লাগল কিন্তু এতখানি পথ হাঁটার ক্লান্তিতে সে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। অবিনাশ আসবে বলে গেছে কিন্তু সে তখনও আসে নি—। আবার হাতে বই নিয়ে জয়ন্তী পড়তে চেষ্টা করল—কিন্তু চোখের পাতা আর খুলে রাখতে পারল না।

নিঃশব্দে গেট খুলে অবিনাশ কখন বাগানে ঢুকে এসেছে, বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে জয়ন্তী কিছুই টের পায় নি। অবিনাশ গেট থেকে দেখেছে জয়ন্তী ঘুমুচ্ছে তাই সে নিঃশব্দে পাশে এসে বসল। চারিদিক ঘিরে অন্ধকার, জনমানব নেই। কি নির্ভয় নিরাসক্ত ভাবে জয়ন্তী ঘুমুচ্ছিল—অবিনাশ এসে তার কপালে হাত দিল।

'দেরী হয়ে গেল আসতে, তুমি এতক্ষণ একা ছিলে—কিছু মনে কোরো না।' অবিনাশ বলল। জয়ন্তী সোজা হয়ে বসল—

'বড় ভাল লাগল একা থাকতে—অনেক পথ হেঁটে এসেছি—ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—কিন্তু নিরাকুল সন্ধ্যায় এই নির্জন কোণটি সত্যিই ভাল লাগল।'

অবিনাশ পাশের একটি চেয়ারে বসে পড়ল—

'কবে কলকাতায় যাবে বল? সহর থেকে আসতে আমার দেরী হয় খুব, রোজই এ রকম হবে—তুমি কলকাতায় তাড়াতাড়ি গেলেই ভাল, এখানে তুমি সারাদিন একা থাকবে কেন? কিছুদিন ঘুরে এসো।'

'আমি আগামী সপ্তাহে যাব, ততদিনে কাগজপত্রগুলি দেখা হয়ে যাবে। তোমার ফিরতে রাত হয় সেও ভাবি।'

'খুব পরিশ্রম গেছে কিছুদিন তোমার জয়ন্তী, একটা লম্বা ছুটিতে কোথাও বেড়িয়ে এসো।'

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করে।' জয়ন্তী বলল।

'আমি তো তোমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে পুরণো আবার সবচেয়ে ।' অবিনাশ হাসল।

'তোমার বিবাহিত জীবন যেন কোন বিশাল কাহিনীর একটি খণ্ড। কত রকমের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধুত্ব জটিল দ্বন্দ্ব। কি হাঙ্গামার জীবন—সে তুলনায় আমার অলস স্বভাব স্বীকার করছি।' জয়ন্তী বাধা দিয়ে বলল—

'দোষ দিতে পার আমায় কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি চিরদিনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বাধীনতার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব ছিলাম—মুকুট শিল্প জগতে আমায় খুবই এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এতটা কোলাহলের জীবনের মধ্যে যে এসে ঠেকতে হবে তা ভাবিনি—ঐ বাসনা চক্রের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রবেশ করতে আকর্ষণ আর নেই অবিনাশ। শিল্পী নির্জনতা চায় নইলে তার সাধনাও নষ্ট হয়—অন্যান্য ব্যবসার মত হয়ে ওঠে।'

অবিনাশ সমর্থন করবার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠল—

'এ কথা আমি খুবই বিশ্বাস করি, তোমার মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি। একটা স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেই বিবেক ঠিক থাকে। কিন্তু জয়ন্তী, তুমি বিলাসের মধ্যে থেকে অভ্যস্ত, মুকুটকে বিয়ে করেছিলে বলে সে সবও পেয়েছিলে ভুলে যেও না। সে গরীব শিল্পী ছিল না কোনদিন।'

'হ্যাঁ—শিল্পের জন্যই এতটা সহ্য করেছি, মুকুট ছাড়া কেউ এ বিষয় এতটা সাহায্য করতে পারতো না। মা বাবার মনে আমি আঘাত দিয়েছি,তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে বিয়ে করিনি। শিল্প জগতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব বলে বড়ই সাধ ছিল, মুকুটকে তাই বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে মানুষ জীবনে আরও অনেক কিছু চায়। অবিনাশ, আজ আর সেকথা স্বীকার করতে দ্বিধা করি না।'

'যা ভাল লাগে মন খুলে আমায় বলতে পার—আমি বোধ হয় তোমাকে যতটা চিনি তুমি নিজেকেও অতটা ভাল করে বোঝ কি না সন্দেহ।'

অবিনাশ অভিভাবকের মত জয়ন্তীর কাছে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করল—জয়ন্তী আজ বিনা তর্কে সব মেনে নিল। এতদিন কেবল উপদেশ দিয়ে এসেছে অবিনাশকে, আজ কিছু বলবার পেল না।

'কিন্তু অবিনাশ একটুও আভাস দাও নি তো যে অনিতার মত মেয়েকে তুমি এতটা প্রশ্রয় দিয়েছ?'

'প্রশ্রয় মানে? ক্রমাগত দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছে—না শুনে পারি? তোমার তাতে আপত্তি কি? আমি কি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি? তুমিও তো আভাস দাওনি যে শুধু শিল্প জগতে সুখ্যাতি লাভ করার আশায় মুকুটকে বিয়ে করবে? মুকুটের কাছে প্রেমের তত্ত্বের বিশেষ মূল্য ছিল বলে তো আমার মনে হয় না।'

'তা হয়তো সত্যি। অস্বীকার করছি না, কিন্তু এক মানুষের কাছে সব তো আশা করা যায় না।' অবিনাশ ধীরে ধীরে বলল—

'তাহলে আজ সত্য কথা স্পষ্ট করেই বলতে দাও। তুমি আর আমি মুকুটের কাছে কাজ শিখতাম, তোমার আর আমার মধ্যে যদিও বন্ধুত্ব ছিল তবু তোমাকে কোনদিন ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে এ কথা জানতাম তুমি মুকটের প্রেমে পড়নি কোনদিন।'

'তুমি তো ছেলেমানুষ ছিলে তখন অবিনাশ—তোমার ওপর ভরসা ছিল না কিছু—স্থিরতা ছিল না কোন বিষয়ে তোমার।'

'আমার মত লোকের ওপর তোমার আস্থা ছিল না হতে পারে কিন্তু মুকুটকে কতটুকু তুমি জানতে? জিদ ছিল তার কতগুলো বিষয়, তার প্রকৃতির বিশেষত্বই ছিল তাই তাকে আমিও ভালবাসতাম। অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল কাজের, শিল্পদক্ষতা ছিল প্রচুর কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি সে কোনদিন বিয়ে করবে।'

'অবিনাশ, বিয়ের সম্বন্ধে তোমার কোন মতামতই ছিল না—তুমি আজও সেই একদল সখাসখী নিয়ে দিন যাপন করো, বিশেষ করে সখী-পরিবৃত হয়ে'—

'আমি কি তাদের প্রেমে মত্ত মনে কর? তবে চির-কুমার রয়ে যাব এও ভাবি না। শিল্প চক্রের সভাপতি না হতে পারলেও চিরকুমার সভার সভাপতি হবার সখ আমার নেই।'

দুই বন্ধুর আলোচনার মধ্যে মান অভিমানের মাত্রা বাড়তে বাড়তে শেষে অভিযোগ ও মনোমালিন্যে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দিল। 'অন্য একদিন এ বিষয়ে কথাবার্তা হবে' এই বলে দুজনে চুপ করে গেল। দুদিনের মধ্যেই জয়ন্তী কলকাতায় যাবে বলে ঠিক করে ফেলল। রওনা দেবার পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে পড়বার ঘরে বসে অবিনাশ ও জয়ন্তী কতগুলি দলিলপত্র দেখছিল। টেবিলের ওপর একটি ছোট আলো জ্বলছে। আলো ও আঁধারের জালিকাটা ছায়া জয়ন্তীর মুখের ওপর পড়েছে। হাতের ওপর মাথা রেখে সে বিশ্রাম করছিল। মুখখানা নিতান্তই বিমর্ষ। অবিনাশ সিগারেট ধরালো, ধোঁয়াটা ওপরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—

'তোমায় তো আজ থেকে জানি না, এক রকমই রয়ে গেলে তুমি জয়ন্তী, আর আমার টানও কমলো না।' সিগারেটটা মুহূর্তের মধ্যে নিবিয়ে ফেলে দিল। অবিনাশ খানিকটা অস্থির বোধ করছিল, মনটা কেমন যেন করছিল তার।

জয়ন্তীর মুখে আজ কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা বা উৎসাহের দীপ্তি নেই।

'অত নৈরাশ্য আমার ভাল লাগে না—মন শক্ত কর, আবার কাজে মন দাও'—অবিনাশ বলল।

'তুমি আমায় সাহায্য করবে তো?' জয়ন্তী প্রশ্ন করল।

'আমি আহমেদাবাদ ফিরে যাব, শীঘ্র যেতে হবে—তুমি কলকাতা থেকে ফেরার আগেই হয়তো যাব।'

জয়ন্তীর মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল—'এতদিন তো বলছিলে আমার জন্য তোমার ভাবনা হয়, কাছাকাছি থাকবার তো তোমার কোন উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না।' যেন আহত হরিণীর মত সে একবার অবিনাশের দিকে চাইল। চুলগুলি আলুথালু গম্ভীর মুখ। অবিনাশ তাকে উপহাস করছিল কি না সন্দেহ হল। বিস্মিত হয়ে তাকাল একবার, তারপর মাথাটা নিচু করেই রইল। অবিনাশ বলল—

'আহমেদাবাদে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে। আমার মার ইচ্ছায় মত দেবো হয়তো। মেয়েটিকে চিনিও না ভাল করে, যেটুকু পরিচয় ছিল তাতে বেশ ঘরোয়া বলে মনে হয়। আমাদের ঘরে মানাবে। আমার পিতৃবিয়োগের পর আহমেদাবাদের বাড়ীর সম্পূর্ণ ভার আমাকেই নিতে হয়েছে—তাই শীঘ্র ফিরে যেতে হবে।'

জয়ন্তী যেন আকাশ পাতাল কিছুই বুঝতে পারল না। অবিনাশ তার বিবাহের বিষয় খুলে আলোচনা করছে জয়ন্তী বিশ্বাসই করতে পারল না। এতদিন জয়ন্তীকে সে কতভাবে জানিয়েছে সে নিতান্তই তার প্রতি আকৃষ্ট, অনুগত, কিন্তু অবিনাশ কি ছলনা করেছিল এতদিন? অপরের সমস্যা সম্বন্ধে জয়ন্তী চিরদিনই উদাসীন, আজও তাই অবিনাশের বিবাহ সম্বন্ধে সে বিরুদ্ধ হয়ে উঠল—অবিনাশকে সে অন্য কোনদিকে দৃষ্টি দিতে দেবে না—শুধু বন্ধুত্বের রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখে দেবে এই কি সে চায়?

অবিনাশ জয়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু সে তার নিজের মতামত জলাঞ্জলি দিয়ে জয়ন্তীকে সন্তুষ্ট করতে রাজী নয়। সে চোখে আঙুল দিয়ে জয়ন্তীকে দেখাতে চায় সংশয় সন্দেহ, বিরোধ, বিদ্বেষ, এ সব মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, মানুষকে সে তাই বলে ঘৃণা করতে পারে না। জয়ন্তী হার মানল। এতদিন অবিনাশকে ভাল করে জানতে চায়নি সে—এখন তাই মহা সমস্যার মধ্যে পড়ল। আজ কোন্ রমণীর পাণিগ্রহণ করতে অবিনাশ এগিয়ে চলেছে? সে স্বপ্নেও ভাবতে পারল না। পূর্বে অনিতার প্রতি তার সহানুভূতি দেখে জয়ন্তী অতি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল, এখন অবিনাশ বিয়ে করতে যাবে? একটা বিকট রকমের স্বার্থপরতা তার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল, অবিনাশের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলার পর সে যেন আর দিল্লীতে একদণ্ডও থাকতে পারছিল না। ঘরে বাইরে কোন স্থানেই তার আকর্ষণ রইল না—দিগন্তর ঘরে ঘরে চাবি পড়ল, একটি বিশ্বাসী লোকের হাতে বাড়ী রেখে জয়ন্তী কলকাতা রওনা হ'ল।

অষ্টম অধ্যায়

ট্রেন কলকাতা পৌঁছতে দেরী হল না। দেবাশিস ব্যাকুল হয়েই অপেক্ষা করছিল। জয়তী খানিকক্ষণ স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল, তারপর ধীরে ধীরে বাবার ঘরে গিয়ে বসল। শীলা দুজনকে একত্রে বসবার সুযোগ করে দিয়ে নিজে অন্য ঘরে চলে গেল। জয়তীর চোখে জল নেই, তার দৃষ্টির মধ্যে আবেগ নেই—মুখে কেমন যেন একটা বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য চাপা আগুনের মত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। আহার সেরে এসে জয়তী দেবাশিসের পাঠাগারে গিয়ে বসল। একটিও কথা যেন সে বলতে পারল না। সাদা-কালো পোষা বেড়ালটির মাথায় হাত বুলোতে লাগল। মাথা নিচু করেই বসেছিল জয়তী—দেবাশিস তার সামনে একটি চেয়ারে এসে বসল। জয়তীর মনের কোণে কেমন যেন বিদ্বেষ—উন্মত্ত অপরিতৃপ্তির ম্লানছায়া—বহুদিনের অব্যক্ত অভিমান, নৈরাশ্য ও ক্লান্তি। কন্যার গভীর অন্তরে যে অশান্তির বহ্নি জ্বলন্ত রয়েছে তা পিতার অনুমান করতে দেরী হল না। দেবাশিস বলল—কিছুই করা গেল না তাহ'লে?

'মুকুট অতিরিক্ত পরিশ্রম করছিল, তার উচ্চাভিলাষের তাড়নায়—সে যেন মনের স্থিরতা হারিয়ে ফেলছিল, বিপদের আশঙ্কা আমার মনে বহুদিন থেকে উঁকি দিয়েছে।' জয়তী আপনা হতেই কথাগুলি বলল।

'চিত্রকরের জীবনে স্থিরতা প্রায়ই থাকে না—তার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার জন্যই এত খেটেছিল সে অতবড় একটা শিক্ষা কেন্দ্র দাঁড় করাতে গেলে দৃঢ়তার প্রয়োজন। সাংসারিক বা পারিবারিক শান্তি বা সুখের দিকে সে উদাসীন ছিল তা আর আশ্চর্য কি? সে সংসারী ছিল না বলেই মনে হয়।' দেবাশিস স্থির হয়েই উত্তর দিল। অতি ধীর প্রশান্ত মূর্তি কিন্তু দৃঢ়তার অভাব ছিল না তার স্বভাবে। মানুষের চরিত্রের দুর্বলতা তার কাছে সহজেই ধরা পড়ত।

জয়তী যে বিবাহিত জীবনে নিতান্তই অসুখী হয়েছিল সে কথা দেবাশিস ভালমতেই বুঝেছিল—কিন্তু জয়তীর নিজের মুখ থেকেই সব কথা শুনতে চায় সে। কন্যা যে তার কঠিন সংগ্রামের কথা এতদিন গোপন রেখেছিল, পিতা সেবিষয় অবগত ছিলেন। তাই চেয়েছিলেন কন্যাকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখে তাকে শান্ত করতে। কন্যার যে সকল বিশেষ গুণ তার চরিত্রের ঐশ্বর্য—দেবাশিস সেগুলি রক্ষা করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। জয়তীকে অতি নিকটেই কিছুদিন রেখে দেবে তাই ইচ্ছা ছিল। কলমে কালি ভরতে ভরতে সে বলল--

'আমাকে ভুলে যাওনি তো? সে গ্রামে থাকে এখন, তাকে চিঠি দিও। এই ঘরখানায় তুমি বসে বসে ছবি আঁকতে, এইখানেই স্টুডিও কর। আবার ভাল করে ছবি আঁকো, আমার মনে হয় বহুদিন ওদিকে মন দিতে পারনি তুমি।'

দেবাশিসের বুকের মধ্যে—আজ গভীর বেদনা গুমরে গুমরে উঠছে, জয়তীকে কিভাবে সে আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলবে তাই ভাবছে।

'বাবা, আমি তো খুবই মন দিয়েছিলাম কাজে—তোমায় তো লিখেছিলাম সব বিস্তৃতভাবে প্রদর্শনীর বিষয়ও। মুকুট ক্রমশঃ বাড়ীটাকে প্রায় আর্ট গ্যালারি করে তুলল—বাইরের জগতে সুখ্যাতি লাভের জন্য, ছবি বিক্রীর জন্য অনেক অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্ছনীয় জিনিস জীবনে ডেকে আনল। নিরিবিলি বসে ছবি আঁকার সুযোগ আমার ক্রমশঃ কমতে লাগল, বাধা বাড়তে লাগল। মুকুট এরই মধ্যে তার বড় বড় অর্ডারগুলি তৈরি করতো, কিন্তু আমি আর মন বসাতে পারতাম না। অতবড় সংসারের হাঙ্গামা—সামাজিকতার কঠিন শাসন, আমার আর ভাল লাগত না—ভিড়ের মধ্যে থাকতে থাকতে মনটা কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠেছিল। অবিনাশ অনেকদিনের বন্ধু, তার কাছে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। মুকুট একাই সব করবার জন্য ব্যস্ত, সে কোন কথার মধ্যেই আমায় ডাকতো না—

অনেক অনুরোধ করেছি তার দায়িত্ব ভাগ করে নেবার অধিকার দিতে। কিন্তু মুকুট কিছুতেই আমায় সে সুযোগ দিল না। বড় ক্ষুণ্ণ মনে দিন কাটিয়েছি বাবা। দুজনের মধ্যে এত বড় একটা সেতু বাধা উঠেছিল কিছুতেই সে বুঝলো না। মতামত বা মন্তব্য শোনবার তার মুহূর্ত মাত্রও সময় ছিল না সে রকম ধৈর্যও ছিল না। আমি নিঃসন্তান ছিলাম বলে নিঃসঙ্গ ছিলাম কিন্তু মুকুট ছিল উদাসীন। তার মত শক্তিশালী পুরুষের প্রভাবে আমার স্বাভাবেরও পরিবর্তন হয়েছিল। কাজে প্রেরণা দিয়েছিল সে স্বীকার করি, শিল্পকলার বিষয় আমার নূতন করে শিক্ষা মুকুটের হাতেই হয়েছিল। কিন্তু বিবাহিত জীবন বা সাংসারিক সমস্যা তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ বস্তু ছিল—স্বামীর দায়িত্ব সে নিতে পারে নি—আমায় তার কর্মক্ষেত্রে একটুও স্থান দিতে চায় নি। সম্পূর্ণ নিজের এলাকায় সে যেন তার কাজ নিয়ে নিমগ্ন থাকতো, আমার সেখানে অধিকার বা দাবী কিছুই ছিল না। বিশেষভাবে যখন পরাজয় মেনে নিলাম তখন ইচ্ছামতই সে চলতে পেরেছে। তারপর আবার নেশা ধরল। কোন রকম মতামতই সে শুনতে রাজী হয়নি—আঘাতের পর আঘাত সহ্য করতে করতে যেন নিজের কাছে হেরে গেছি মনে হ'ত। জীবন তখন নিতান্তই শুষ্ক ও অর্থহীন হয়ে উঠল। বাবা, তোমায় আজ সত্য কথা বলি—আর ঢেকে কি হবে?—তিলে তিলে নিজের সত্তাকে চূর্ণ করেছি—বাইরের শান্তি রক্ষা করেছি এটুকুই গর্ব ছিল।'

দেবাশিস সহানুভূতির সহিত জয়ন্তীর কথাগুলি শুনছিল, তার স্পষ্টবাদিতাকে শ্রদ্ধাও করছিল মনে মনে—

'কিন্তু জয়ামা, তুমি যদি শিল্প জগতের উন্নতির পথে না পৌঁছতে পারতে তাহলে কি সুখী হতে? মুকুটকে বিয়ে করা তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, সেই তো বিশেষ সাহায্য করেছে তোমায়, তুমি তো সময় নষ্ট করনি, কত জিনিস শেখবার সময় পেয়েছ, তবে শিল্প জগতের দায়িত্ব থেকে তোমায় ওভাবে সরিয়ে দেওয়া আমিও সমর্থন করি না।'

'হ্যাঁ বাবা, সময় অনেক নষ্ট হয়েছে—গত কয়েক বছর শুধু কলের পুতুলের মতই উঠেছি বসেছি, মানুষের মত হাসতে কাঁদতে পারিনি। শুধু সমাজের কাছে সুনাম রক্ষা করবার জন্য নিজের শিক্ষা শক্তি মতামত সব জলাঞ্জলি দিয়েছি তাও স্বীকার করছি—'

'তাই-কি সব সত্যি? অত বড় বাড়ীখানা সুন্দর করে রেখেছিলে, সাজিয়েছিলে, কত রকম মানুষকে জেনেছ, দেখেছ, কত গুণী শিল্পীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে এভাবে। যে সব ধনাঢ্য ব্যক্তি চিত্রকরকে সাহায্য করতে পারে, ব্যবসায়ী সমৃদ্ধিশালী পদস্থ ব্যক্তি সকলেই তো বন্ধুর মত মিশেছে, তাদের উৎসাহ ছাড়া চিত্রজগতে উন্নতি কমই হয়। মুখোস পরতে হয় অনেকবার, হাসি না পেলেও হাসতে হয়, আনন্দ না পেলেও স্ফূর্তি দেখাতে হয়। কিন্তু আজকালকার শিল্প জগতের অনেকখানিই তো এই বাইরের আদান প্রদানের ওপর নির্ভর। স্বাধীনতা কতখানি থাকে মানুষের? শুধু ছবি নিয়ে পড়ে থাকতে পারে কজন? দর্শকের মন্তব্য, লোকের প্রশংসা, ভাল খরিদ্দার এ সবই তো ক্রমশঃ সংগ্রহ করতে হয়, নইলে কাজ এগোয় না। প্রাচীন কালে শিল্পী শুধু সাধনার জন্য সংগ্রাম করেছে, দারিদ্র্যকে ভয় করেনি যশের জন্য মোহ ছিল না তার, এখন তো সে সব আদর্শ অনেকখানি লুপ্ত হয়েছে দেখি।

'আনন্দ কিছুই পাইনি মনে হয় এক-একবার। ঐ লোকের মেলা যেন আমায় কেমন পাগল করে দিয়েছিল—মুকুট ঐ ভিড়েরই একটি অঙ্গ মাত্র—তাকে আলাদা করে চিনতে পারিনি কোনদিন।'

'আপনজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা রক্ষার জন্য যে সময় ও সুযোগের প্রয়োজন শিল্পীর জীবনে তা দুর্লভ। কোন চিত্রকর বা শিল্পী পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। বাজনদার ও গায়ক সঙ্গীতজ্ঞর উৎসাহ ছাড়া খ্যাতি অর্জন করতে পারে না। রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়েই নেতারা দেশসেবার কাজে অগ্রসর হয়, পরস্পরের সাহায্য ছাড়া কোন বড় কাজ চালানো সম্ভব হয় না—পরস্পরের মধ্যে গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক

নাও থাকতে পারে তবু সদ্ভাব রাখা বাঞ্ছনীয়। পরশ্রী-কাতরতা দাম্ভিকতা পরস্পরকে অশান্তির প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—কিন্তু তবু কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না! তুমি যদি নির্ঝঞ্ঝাটভাবে গৃহস্থর জীবন যাপন করতে চাইতে তাহলে এই বিশাল শিল্প গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করতে না। বিদেশে সুদীর্ঘ দিন কাটিয়ে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলে সবই বৃথা হোত যদি স্বাধীন চিত্রকর না হতে পারতে। এই বিরাট কর্ম জগতে স্থান খুঁজে নিতে পারতে না। লেখক, শিল্পী বা চিত্রকর সকলকেই এই এক পন্থা অবলম্বন করতে হয়, নানান ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে, বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ পথ হাতড়াতে হাতড়াতে চলা—অবশেষে আত্মপ্রকাশের পূর্ণ পরিণতি। উদ্দেশ্য একই ছিল দুজনের কিন্তু আদর্শ এক রাখতে পারনি বুঝতে পারি। কিন্তু তাই বলে সব ধ্বংস হয়ে গেছে বলে একবারও ভাববে না। তুমিও বিশ্বাস রাখো নিজের শক্তির ওপর। মুকুট অকালে প্রাণ হারিয়েছে, তাকে কেউ বদলাতে পারতো না। তুমি আজ নিজের ওপর নির্ভর করতে পারবে আমি জানি। তোমার নিজস্ব শক্তি একটুও হারাও নি এই মনে রাখবে। কিছুদিন বিদেশে কোথাও বেড়িয়ে এলে আবার দেহমনে শক্তি ফিরে পাবে—কাজে উৎসাহ পাবে—ভেবে দেখ কিভাবে আবার কাজে মন দিতে পার।'

দেবাশিস করুণা বা সহানুভূতির আবেগ প্রকাশ করল না—জয়ন্তীকে পুরাতন বিভীষিকা থেকে মুক্ত করে নেবার জন্য সহজ পথ দেখিয়ে দিল। সে জয়ন্তীর মনে কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে তুলল—তার নতুন করে ইচ্ছাশক্তি জেগে উঠুক তাই দেবাশিসের একমাত্র কামনা।

'বাবা, আমি দিগন্তে এখনই ফিরে যেতে পারব না—আমার এখনও ঐ ভিড়ের দুঃস্বপ্ন কাটেনি। কিছুদিন ঘুরে আসি, বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে চাই। মহুয়া ও যোসেফ বম্বেতে আছে, তাদের দেখতে ইচ্ছা করে। তাদের বিয়ের পর বম্বেতে কাজ করছে দুজনে।'

'বন্ধুরা তো শীলার কাছে খবর নিয়ে যায়—তাদের আসতে বল, ভালই লাগবে দেখা হলে।'

'আমি কিছুদিনের জন্য আবার বিদেশে যাব ভাবছি, দেখি দিদি কি পরামর্শ দেয়।'

'অলোক লণ্ডনে আছে জান বোধহয়—তোমার মার মৃত্যুর পর চিঠি দিয়েছিল। শীলাকে লিখেছে বাদলকে তার কাছে রেখে পড়াতে পারে—তিন বছর ঐদিকেই আছে সে। অলোক এখনও একা—সে বিয়ে করেনি তাই বাদলকে তার কাছে রাখতে চায়—একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সে ভর্তি হয়েছে—শীলাকে বলছিলাম নিজে গিয়ে বাদলকে ভর্তি করে আসতে। ছুটিতে বাদল অলোকের কাছে যাবে আসবে। শীলা আমায় একা রেখে যেতে চায় না।'

'বাবা, আমি তোমার কাছে থাকবো'—জয়ন্তী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'জয়মা না, তোমায় আটকে রাখব না, বাদল, হেমেন এরাও তো আছে আমার সঙ্গেই। পুরনো ছেলে হেমেন আমার কাজ নিয়েই থাকে—খাবার টেবিলে কেবল দেখা হয়। একটা কলের মতই সে কাজ করে।'

হেমেনের নাম করতে দেবাশিসের মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল, স্নেহে পরিপূর্ণ হৃদয় তার। জয়ন্তীর ও শীলার বিষয় তার বিশেষ চিন্তা—তাদের জন্য কিছু করতে পারলেই সে যেন সন্তুষ্ট।

'এবার বাড়ীর মেয়েরা বেড়িয়ে আসবে—ঠিক করে ফেলো' দেবাশিস বলল—

জয়ন্তী কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে যাবে ইচ্ছা প্রকাশ করল। ক্রমশঃ

প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্ত্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী মণ্ডলী ও সামরিক বাহিনী প্রধানদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

রাষ্ট্রপতি—আবু সয়ীদ চৌধুরী

ময়মনসিংহ জেলার সুপরিচিত এক জমিদার বংশে ১৯২১ সালের ৩১শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার স্পীকার শ্রীআবদুল হামিদ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। শিক্ষালাভ করেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম্ এ, বি এল্ পাশ ক'রে আইনে উচ্চ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত ইংলণ্ডে যান এবং লিন্কনস্ ইন্ (Lincoln's Inn) থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে, ১৯৪৭ সালে ইংলিশ বারে যোগদান করেন।

তিনি প্রায় ১৪ বৎসর ঢাকা হাইকোর্টে দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং বিশেষ ক'রে সাংবিধানিক ও বাণিজ্যিক সংক্রান্ত আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেটও ছিলেন। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে তিনি ভূতপূর্ব পূর্বপাকিস্তানের এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের প্রধান আইন উপদেষ্টা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

ভূতপূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান কমিশনের সদস্যরূপে দেশের সংবিধান প্রনয়ণে তিনি সাহায্য করেন। প্রাদেশিক বার কাউন্সিল সৃষ্টির পর থেকে তিনি তার সদস্য ছিলেন এবং এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেলের পদাধিকার বলে তার সভাপতি ছিলেন। ১৯৬১ সালের ৭ই জুলাই তিনি ঢাকা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি একজন বিশিষ্ট রোটারিয়ান ছিলেন এবং একবারের জন্য ঢাকা রোটারি ক্লাবের সভাপতিও হন।

ছাত্র জীবন থেকে তিনি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৬ সালে সর্বভারতীয় মুস্লিম্ ছাত্র ফেডারেশনের বৃটিশ শাখার সভাপতি ছিলেন। জাতি সংঘের সাধারণ সভার (ইউনাটেড্ নেশনস্ জেনারেল এ্যাসেম্ব্লি) চতুর্দশ অধিবেশনে তদানীন্তন পাকিস্তান প্রতিনিধিদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং সেখানে আইন সংক্রান্ত কমিটিতে তিনি তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মিঃ সয়ীদ ১৯৫৯ সালে মিঃ আই আই চুন্দ্রীগড়ের সভা-নেতৃত্বে গঠিত কোম্পানী আইন কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন।

তিনি ভূতপূর্ব পূর্বপাকিস্তান যক্ষ্মা সমিতি এবং পাকিস্তান জাতীয় যক্ষ্মা সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রদেশের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে গঠিত কেন্দ্রীয় বোর্ডের দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব-জজ্ সম্মেলনে এবং আইনের মাধ্যমে বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে তিনি ব্যাংককে প্রেরিত হ'য়েছিলেন। এই সালেরই নভেম্বর মাসে তিনি চার বৎসরের জন্য ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাক্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। লণ্ডনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান এবং জাতি সংঘে বাংলাদেশ সরকারের

বিশেষ দূত স্বরূপ, বাহিবশে তিনি প্রাধান প্রবক্তা ছিলেন।

বর্তমানে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি।

প্রধান মন্ত্রী শেখ্ মুজিবুর রহমান

১৯২৯ সালে ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলায় টাঙ্গিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে কলিকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজ থেকে তিনি বি এ পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সফল ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলে পরিচিত হন—যে ভাষা আন্দোলনের ফলে "বাংলা ভাষা" পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় ভাষার অন্যতম ভাষারূপে স্বীকৃত হয়।

১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী লীগের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি উক্ত পার্টীর সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হন। যুক্ত-ফ্রন্ট্ মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়ার পর, তাঁকে কিছুকালের জন্য গ্রেপ্তার করে রাখা হয়। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ যখন বে-আইনীভাবে ক্ষমতা দখল করে, তখন শেখ্ মুজিবুর রহমানকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে তিন বৎসর জেলে আবদ্ধ রাখা হয়।

১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত শাসনের নিমিত্ত তাঁর ছয় দফা দাবীর কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। অবিলম্বে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাস্যকর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের ফলে মুজিবের মুক্তিলাভ এবং আয়ুব খাঁর পতন হয়। ইয়াহিয়া খাঁ তখন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান দুটি নির্বাচন কেন্দ্রে জয়লাভ করেন। একটি কেন্দ্রে ছিলেন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপরটিতে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ভোটের ব্যবধান ছিল ১২২, ৪৩৩।

(Reproduced from "Bangladesh" Bulletin Vol. 1 No. 3 of July 14, 1971)

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর—মন্ত্রীসভা বিষয়ক, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও বেতার।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি—সৈয়দ নজরুল ইস্‌লাম

ময়মনসিংহ জেলায় যশোদল নামক ক্ষুদ্র একটি গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জেলা সহরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৪৫ সালে এম এ উপাধি লাভ করেন।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই তিনি বাস্তব রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষণ প্রাপ্ত হন। সুযোগ্য নেতা হিসাবেই তিনি সলিমুল্লা মুস্‌লিম হল ছাত্র ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন এবং সর্বদলীয় কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে ভাষা আন্দোলনকে সফল করবার জন্য তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পুত্র সৈয়দ নজরুল ইসলামের পক্ষে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু নিয়তি তাঁর জন্য পূর্বাহ্নেই স্থির করে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক স্থান। যদিও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীতে যোগদান করে কর ধার্য্য বিভাগে মাত্র এক বৎসর কাজ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উক্ত সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে তিনি ময়মনসিংহে আনন্দ মোহন কলেজের লেকচারারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন এবং তদবধি তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আসছেন। তাঁর অবিচলিত সততা, বিশ্বাসের সাহসিকতা এবং উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা অতি শীঘ্রই তাঁকে স্বদলীয় লোকদের নিকট অতীব প্রিয় ও অপরিহার্য্য করে তুলেছিল। ১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং সেই বৎসরেই তিনি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগেরও সহকারী সভাপতি হন। উক্তপদে তিনি এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন।

১৯৬২ সালে আয়ুব শাহী স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে জন-গণ-সংগ্রামের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা। ১৯৬৬ সালে শাসক গোষ্ঠী ছয় দফা কর্মসূচীর ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হ'য়ে, আওয়ামী লীগের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে দিল। শেখ মুজিবুর রহমান সহ শত শত আওয়ামীলীগ নেতা ও কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'ল। এই সময়ে সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে তিনি সঠিকভাবে পার্টী পরিচালনা করে বিশেষ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৬৯ সালে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে যখন শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল, তখন পুনরায় সৈয়দ নজরুল পার্টীকে নির্ভুল পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি গণতান্ত্রিক এ্যাকশন কমিটি সংগঠন করেছিলেন যার কর্মসূচী ও কার্য্যাবলীর দ্বারা ১৯৬৯ সালের গণজাগরণ সফল হয়েছিল এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে হয়েছিল। সেই বৎসরেই শেখের সঙ্গে তিনি রাওলপিণ্ডিতে গোলটেবিল কনফারেন্সে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তার আলোচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর সদস্য নির্বাচিত হন এবং তারপর ন্যাশনাল এসেম্বলীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির ডেপুটী লীডারও নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি মুজিব মন্ত্রীসভার শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী।

অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী—শ্রীতাজউদ্দীন আমেদ

ঢাকার একটি ক্ষুদ্রগ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ায় তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থশাস্ত্রে অনার্স সহ বি এ পাশ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে রাজনৈতিক বন্দী অবস্থায় কারাভ্যন্তরে আইনের ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৩৭ সালে স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে কতিপয় অন্তরীণ রাজবন্দীর সংসর্গে আসেন এবং ১৯৪০ সালের কাছাকাছি শ্রী আবুল হাসিমের প্রভাবে মুস্‌লিম লীগের রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ১৯৪৪ সালে মুস্‌লিম লীগের বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন তিনি দেখলেন যে, মুস্‌লীম লীগ সাধারণ মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করে জনবিরোধী চক্রান্তের সামিল হয়েছে, তখন তিনি মুস্‌লীম লীগের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেন। কিন্তু তার অর্থ এইনয় যে, তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে উত্থিত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিচালনার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনে তাঁর দৃপ্ত ভূমিকা এখনও দেশ-বাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা কালে শ্রীতাজউদ্দীন উহার অন্যতম প্রধান সংগঠনকারী ও সুদৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন। পার্টীর লক্ষ্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং কঠিন পরিশ্রমের জন্য তিনি ক্রমশঃ পার্টীর নেতৃত্বের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি পার্টীর সাংগঠনিক সম্পাদক হন এবং ১৯৬৪ সাল থেকে সাধারণ সম্পাদক রূপে কাজ করছেন। ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক স্বরূপ কাজ করেন।

নির্বাচন ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অভুতপূর্ব। ১৯৫৪ সালে তিনি আইনের ছাত্রাবস্থায় পূর্ববঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়েও তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে ন্যাশনাল এসেম্বলীতে নির্বাচিত হন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলিকাতায় ১৯৪৪ সালে এবং তদবধি উভয়ের মধ্যে গভীরভাবে রাজনৈতিক সমঝোতা এবং মতৈক্য চলে

আসছে। রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও আমেদ সাহেব বিভিন্ন সামাজিক কর্মসংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। তাঁর পাঠ্য তালিকার ক্ষেত্র যেমন বিরাট তেমনই বিচিত্র। তিনি বিদেশের বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি মুজিব মন্ত্রী সভার অর্থমন্ত্রী। ভূমিরাজস্ব ও পরিকল্পনার দায়িত্বও তাঁরই উপর ন্যস্ত।

অস্থায়ী অর্থমন্ত্রী - ক্যাপ্টেন মনসুর আলি

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কুরিপাড়া গ্রামে ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জের বি এল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হন। অতঃপর তিনি ১৯৪৫ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং প্রথম শ্রেণীতে এল এল বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসরই তিনি পাবনা জেলা কোর্টের এ্যাডভোকেট হন, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ভাল পশার জমিয়ে ফেলেন ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

১৯৫১ সালে তিনি পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ সংগঠন করেন এবং তিনি তার সম্পাদক হন। ১৯৫২ সালে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সালে তিনি পাকিস্থানের প্রাক্তন হাই কমিশনার মিঃ আবদুল্লা-অল্-মামুদকে পরাজিত করে পূর্ববাংলা বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে জঙ্গী আইন প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মন্ত্রীপদে বহাল ছিলেন।

আয়ুবশাহীর দমন নীতির বিরুদ্ধে পাবনা জেলায় আন্দোলনে নেতৃত্ব করবার অপরাধে পূর্বপাকিস্তান গণ নিরাপত্তা অর্ডিনান্স বলে তাঁকে ১৯৬৪ সালে গ্রেপ্তার করে ৬ মাসের উপর কারাগারে আটক রাখা হয়। পুনঃরায় ১৯৬৭ সালে বিখ্যাত ভুট্টো বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রায় এক বৎসর কারাবন্দী করে রাখা হয়। পরবর্তী বৎসর সরকার কর্তৃক ভুট্টোর বিষাক্ত বাণী বিতরণের ব্যাপারে বার এ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় পৌরোহিত্য করার অপরাধে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনানুসারে আরও এক বৎসরের জন্য কারাবাসের শাস্তি তাঁকে দেওয়া হয়। পরে আপীলে হাইকোর্ট কর্তৃক এ শাস্তি নাকচ হয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট হওয়ার দরুণ তিনি পরপর পাঁচবার পাবনা জেলা বার এসোসিয়েসনের নেতা ও সভাপতি ছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত পাবনা ল' কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী আলি সাহেব বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সহকারী সভাপতি। ১৯৭০ সালে তিনি প্রাদেশিক এ্যাসেম্বলিতে সদস্য এবং বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি মুজিব মন্ত্রীসভার যোগাযোগ মন্ত্রী।

খোন্দকার মোস্তাক আমেদ

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ, শীর্ণকায়, মৃদুভাষী-৫৩ বৎসর বয়স্ক খোন্দকার আমেদ একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বলে সুপরিচিত। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং অতি সাধারণ জীবন যাপন করেন।

সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেন ১৯৪২ সালে এবং তদবধি উল্লেখযোগ্য সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে আসছেন এবং বিভিন্ন সময়ে প্রায় সাত বৎসর কাল কারাবাস করেন।

কুমিল্লা জেলার দাসপাড়া দাউদকান্দী গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন কলিকাতার খিদিরপুর একাডেমিতে। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল্ বি উপাধি গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে

সোহরাব হুসেন

যশোহর জেলার মাগুরায় ১৯২৬ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শ্রীহুসেন ১৯৪৬ সালে ডিষ্টিংসন সহ বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উপাধি লাভ করে এই বছরই মাগুরা বারে যোগ দেন।

১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করে মাগুরা মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি যশোহর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদকের পদাধিকারী ছিলেন।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে তৎকালীন জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ প্রার্থীহিসাবে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিই পূর্বপাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নির্বাচিত প্রথম সদস্য যিনি ১৯৬৩ সালে জাতীয় পরিষদের রাওয়ালপিণ্ডি অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি পূর্ব-পাক্ অধিবাসীদের অসন্তোষসমূহের প্রতিকার করা না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা বাধ্য হবেন পঃ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ্ করতে।

মিঃ সোহরাব হুসেন বিশ্বের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক এবং ইউরোপের আরও বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন, তদ্ভিন্ন তিনি সৌদি আরব সহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রেও ভ্রমণ করে এসেছেন।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাংলা দেশে পাক-বাহিনীর বর্বরোচিত অভিযান শুরু হবার পর তিনি মুজিব নগরে চলে আসেন এবং মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মুজিবনগরে থাকা কালীন তিনি কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির সদস্য ছিলেন এবং মুক্তি বাহিনীর রিসেপশন ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মিঃ হুসেন মাগুরা ডিগ্রী কলেজের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিরও অন্যতম সদস্য।

বর্ত্তমানে তিনি মুজিব মন্ত্রীসভার বন, মৎস্য ও পশু-পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওস্‌মানী

শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে ১৯১৮ সালে জেঃ ওস্‌মানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদর্শ পূর্বপুরুষ প্রখ্যাত হজরত শাহ নিজামুদ্দীন ওস্‌মানী পরম শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম্মপ্রাণ হজরত শাহ্ জালালের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীহট্টে আসেন। জেনারেল ওস্‌মানীর পিতা পরলোকগত খান বাহাদুর মফিজুর রহমান বেঙ্গল (পরে আসাম) সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পদে উন্নীত হ'য়েছিলেন।

তাঁর পিতৃব্য পরলোকগত গজনফর আলি খান, সি এস্ আই; সি আই ই; ও বি ভি; আই সি এস্, ১৮৯৭ সালে আই সি এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেঃ ওস্‌মানী শিক্ষালাভ করেন কটন্ স্কুলে এবং পরে শ্রীহট্টে সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রি-কুলেশন পাশ করে, ১৯৩৮ সালে আলিগড় মুস্‌লীম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ইউ টি সি এর বিভিন্ন উচ্চ পদে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং এম্ এ পরীক্ষার প্রাক্-কালে তিনি ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে ক্যাডেট্ স্বরূপ যোগদান করেন। দেরাদুনে ভারতীয় সামরিক শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষান্তে তিনি ১৯৪০ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন।

অতঃপর দ্রুতগতিতে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি ১৯৪১ সালে ক্যাপ্টেন এবং ৪২ সালে মেজর হয়ে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ২৩ বৎসর বয়স্ক যুবক ওস্‌মানী ছিলেন তদানীন্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ব্রহ্মদেশের

রণাঙ্গনে মেজর বা তদূর্দ্ধ র‍্যাঙ্কের মুষ্টিমেয় এসিয়ার অফিসারদের অন্যতম।

তিনি আই সি এস্ পরীক্ষোত্তীর্ণ থাকার দরুণ, যুদ্ধান্তে তাঁকে ভারতীয় রাজনৈতিক সার্ভিসের জন্য মনোনীত করা হয়, কিন্তু তিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তিনি সিনিয়ার অফিসারের কোর্স সমাপ্ত করবার পর, বৃটিশ আমলে তাঁকে লেঃ কর্ণেলের পদে প্রমোশন দেওয়ার বিষয়ও বিবেচিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালের ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সদস্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁকে ভারতীয় কূটনৈতিক বিভাগে যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান করেন, কিন্তু পুনরায় তিনি সেনা বিভাগে থাকাই পছন্দ করেছিলেন।

ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং প্রথম যুদ্ধোত্তর স্টাফ কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চস্থান দখল করে, তিনি ষ্টাফ্ কলেজের একটি শূন্য পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি লেঃ কর্ণেল পদে প্রমোশন পান এবং কোয়েটার ষ্টাফ কলেজ থেকে পি এস্ সি ডিগ্রী লাভ করেন।

জেনারেল ওস্মানী ষ্টাফ্ এবং কমাণ্ড্ উভয় স্থলেই বহু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। যথা:—১ নং গ্রেডের জেনারেল ষ্টাফ্ অফিসার এবং সহকারী এ্যাড্‌জুটেন্ট্ জেনারেল, সমন্বয় পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত ষ্টাফ্ অফিসার এবং কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল শাখার অফিসার। ৯।১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কম্যান্ডার, ইষ্ট্ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডার এবং পরে কেন্দ্রীয় কম্যান্ডার। ই পি আর-এর এডিসনাল কম্যান্ডার ইত্যাদি।

১৯৫৬ সালে তিনি কর্ণেল পদে প্রমোশন পান এবং সৈন্য পরিচালনার ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। উক্ত পদে তিনি পুরোপুরি ১০ বৎসর ছিলেন। সেন্টো এবং সিয়েটোর বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে তিনি পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং পাকিস্তানের বিমান প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি ছিলেন। দশ বৎসর কর্ণেল স্বরূপ এবং কয়েক মাস অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ার-এর কার্য করে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরূপে তাঁর ছয়জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তৎকালীন পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ নির্বাচন কেন্দ্রে বহু ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল যখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হল তখন তিনি ক্যাবিনেটের অন্যতম মন্ত্রীর মর্যাদা সহ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্ণেল এম্ এ জি ওস্মানী পি এস সি; এম্ সি এ কে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে জেনারেলের পদে প্রমোশন দিলেন। ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল জেনারেল ওস্মানী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পদ ত্যাগ করেন।

বর্তমানে তিনি মুজিব মন্ত্রীসভার নৌ ও বিমান পরিবহন মন্ত্রী।
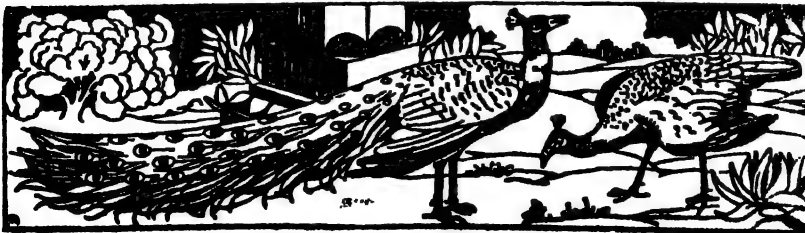
পুণা আশ্রমে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

শ্রীরামদাসের অভ্যাগমের কিছুদিন পরেই আমাদের অতিথি হ'য়ে এলেন স্তর পল ডিউক্‌স্‌ কে. বি. ই. Knight Commander of the British Empire)। আমার স্মৃতিচারণের দ্বিতীয় ভাগে এঁর নাম আছে। এঁকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম কালীদার কাছে কলকাতার হিমাদ্রি আফিসে। কালীদা তাঁর স্বকীয় চড়াও (aggressive) ঢঙে প্রথম দিকে স্তর পলকে আক্রমণ করেছিলেন—স্তর পল যা-ই বলেন কালীদা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন। কালীদা প্রায়ই নানা আগন্তুককে এভাবে পরীক্ষা করতেন। সে সময়ে আমি একদিকে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, পাছে একটা "সীন" হয় ভেবে, অন্যদিকে স্তর পলের শান্ত অথচ দৃঢ় তর্কভঙ্গিতে আশ্বস্ত হয়ে মনে মনে তারিফ করেছিলাম তাঁর দৃঢ় অথচ নিরুপত্তাপ প্রতিবাদের ঢঙ—'বৃটিশ ডগেডনেস।' পরে কালীদা তাঁকে সাদরেই বরণ করেছিলেন বন্ধু ব'লে—যদিও প্রথম দিকে বেধেছিল 'কুরুক্ষেত্র'—'ধর্মক্ষেত্রে' পৌঁছানোর প্রাক্কালে। কিন্তু আগে বলি আমাদের মন্দিরে স্তর পলের অভ্যুদয়ের কাহিনী।

স্তর পল কৃষ্ণপ্রেমের একটি চিঠি নিয়ে এসেছিল—যাকে বলে 'লেটার অব ইনট্রডাকশন।' তাতে কৃষ্ণপ্রেম লিখেছিল, স্তর পল মিস্টিকদের সগোত্র—ভারতীয় যোগেরও অনেক কিছু খবর রাখেন। মাস দুই পরে তাকে আমি লিখি ধন্যবাদ দিয়ে, এমন অপরূপ দরদী অতিথিকে আমাদের মন্দিরে পরিবেষণ করার জন্যে। কৃষ্ণপ্রেম লিখেছিল আলমোরা থেকে (২২এ আগষ্ট ১৯৫৭):

"I am glad you liked Sir Paul. We found him a nice and very sincere man, otherwise I would not have given him your address. But now-a-days there are so many humbugs in Ashrams (and elsewhere !) that I did want him to come in touch with at least some genuine people...Moreover, it is not only his charm : he is also a man of great courage as you must have seen for yourself." *

আমার জীবনে বহুবিধ চরিত্রের মানুষ এসেছেন যাঁদের ভালোবেসে নিজেকে চরিতার্থ মনে করেছি। এঁদের মধ্যে স্তর পল একজন বিশিষ্ট মনীষী—পুরুষসিংহ—মানুষের মতন মানুষ—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে worth his salt ; তাঁর সব গুণপনার কথা বলতে গেলে এ-স্মৃতিচারণের বহর অত্যধিক বেড়ে যাবে, তাই শুধু তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

প্রথম কথা, তিনি বুদ্ধিমান্ হয়েও বুদ্ধিবাদী ছিলেন না। যাকে বলে মিস্টিক, ঠিক তাদের দলে না হ'লেও উদাসী তথা বৈরাগী। ৬৬ বৎসর বয়সে যে-মানুষ দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় বেপরোয়া হ'য়ে—কখনো কোনো সরাইখানায় কখনো বা গাছতলায় শুয়ে কাটায়

* খুশী হয়েছি শুনে যে স্তর পলকে তোমাদের ভালো লেগেছিল। তিনি সত্যিই চমৎকার আর খুব আন্তরিক। কিন্তু আজকাল নানা আশ্রমে এত ভণ্ড আসীন (শুধু আশ্রমেই নয়—সর্বত্রই) যে আমি চেয়েছিলাম তিনি কয়েকটি খাঁটি কুলীনের সংস্পর্শে আসেন। আর শুধু তাঁর চরিত্রের সুষমার জন্যেই নয়—তুমি নিশ্চয়ই টের পেয়েছ তিনি একজন অসমসাহসিক পুরুষ।

কাল কী হবে না ভেবে—একটা গান মনে প'ড়ে গেল, ছেলেবেলায় শোনা :

"আমি সদাই হেসে হেসে বেড়াই ভেসে ভেসে, এ ভব সাগরে কারে ডরি না"—স্যর পলকে দেখলে মনে হ'ত যেন এ-গানটি হুবহু তাঁর মনের প্রতিচ্ছবি। ইন্দিরার একটি মীরাভজন আরো সুপ্রযুক্ত (গানটি সুদীর্ঘ, তাই মাত্র প্রথম কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করেই থামব) :

অব দী হৈ যহ নৈয়া নদীমে বহা,
জা লগী জিস কিনারে চলে জায়েঙ্গে।
অব তো করুণাকি জব ভী উঠেগী হবা
হম উসীকে সহারে চলে জায়েঙ্গে।

আমরা অকূলের ডাকে ভাসায়েছি আজ তরী,
যাব চ'লে যে-কূলেই পারী-সে খেয়া ভিড়ায়।
তার করুণার হাওয়া ওঠে যদি মর্মরি',
আমরা পাল তুলে যাব—যেথা-ই সে নিয়ে যায়।
আমরা চলেছি উধাও কেটে তটবন্ধন,
দিয়ে বিদায় সঙ্গী সাথী প্রিয়পরিজন,
আমরা গাহিব গীতালি কৃষ্ণ মেঘের সাথে,
আমরা সাধিব মিতালি অচিন পথের সাথে,
আমরা কারিয়া বরণ কড়কা তুফান সাথে
যাব ভেসে এ জগত ভুলে নীল মোহানায়।

প্রতি সাধকের কমেই এক বাউল গায় এ-ঘর ছাড়া উদাস গান—যার বাদী সুর (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) : "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনোখানে।" গায়—কিন্তু সবাই সে-সুরে কান পাততে পারে না—ভয় পায়—পারে কেবল সে-ই যে (কৃষ্ণপ্রেমের ভাষায়) স্বভাবে অসম-সাহসিক ও স্বধর্মে পরিব্রাজক। স্যর পল এ-সুরে কান পেতে অনিকেত (homeless) জীবন বরণ ক'রে নিয়েছিলেন—নিষ্পরোয়া হ'য়ে দেশদেশান্তরে ভেসে ভেসে পৌঁছতে কোনো বাঞ্ছিত নীলমোহানায়। জীবনে তিনি অনেক ঘা খেয়েছিলেন আরো এই জন্যে যে তিনি ছিলেন স্বভাব কোমল, স্পর্শকাতর। কিন্তু এসব আঘাত স'য়ে তিনি শুষ্ক কঠোর 'সিনিক' হন নি, হয়েছিলেন নরম দরদী প্রেমিক, ক্রিটিক নয়—যোদ্ধা, বিরক্ত বৈরাগী নয়—মধুর বিরাগী, সর্বোপরি সঞ্চয়ী নয়—দিলদরিয়া—যার ফলে তাঁকে প্রায় দেউলে হতে, হয়েছিল। গত যুদ্ধের সময় তিনি রুষ দেশে গিয়েছিলেন সমসেট মম-এর মতন ওদের সামরিক খবরা-খবর নিতে। তাঁর এ-দুরন্ত দুঃসাহসের কাহিনী তিনি পরে ফিরে এসে প্রকাশ করেন তাঁর রোমাঞ্চকর স্মৃতিচারণে—Secret Agent, S.T. 25। বইটি ইন্দিরা পুণার এত পুরানো গ্রন্থাগার থেকে কিনে আনে। পড়তে পড়তে গা.য় কাঁটা দেয়। কতবার যে তিনি "অন্ধকারে মহাঘোরে ভপ্তা বৈতরণী নদী" থেকে ফিরে এসেছিলেন—যাকে বলে touch and go—ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার যার রক্তে মরণকে সে ডরাবে কেমন ক'রে? ফিনল্যাণ্ড থেকে সীমান্ত পেরিয়ে রুষ দেশে পৌঁছনো—যখন আশে পাশে রুষ পদাতিক সীমান্তরক্ষী পাহারা দিচ্ছে—সে এক রোমান্স—পড়তে পড়তে মনে হয় "Truth is stranger than fiction" প্রবচনটি কবিকল্পনা নয়। তারপর রুষদেশে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা—অভাবনীয় ভাবে এখানে ওখানে আশ্রয় পাওয়া কোন সদয় বন্ধু বা বান্ধবীর নিভৃতকক্ষে। শেষে ধরা প'ড়ে সাইবিরিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বাস ও শেষে প্রিন্স ক্রপটকিনের মতন সেখান থেকে ফিরে বহু বিপদ ডিঙিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে K.B.E. উপাধি পাওয়া—এসব ওঁর মুখে শুনতে শুনতে মনে হত—অঘটনই বুঝি এ-বিচিত্র জীবনযোদ্ধার মুখ্য উপজীব্য। বলতে ভুলেছি—ইনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতকার—Conductor—এমন কি রুষদেশেও একসময়ে অপেরায় কণ্ডাকটর হ'য়ে নাম কিনেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের আগে। বোধহয় সেই সময়েই রুষভাষা শিখেছিলেন—নৈলে বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় রুষদেশে যেতে পারতেন না।

স্যর পল যখন সাইবিরিয়ায় কয়েদী ছিলেন সে সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তাঁর পরিচয় হয় এক শিখ যোগবিৎ-এর সঙ্গে—যে তাঁকে হঠযোগের আসন ও রাজযোগের প্রাণায়ামে দীক্ষা দেয়। এ-যোগসাধনার ফলে তিনি যে শুধু নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছিলেন তাই

নয়, সন্ধান পেয়েছিলেন এক নতুন জগতের যার খবর মেলে না বুদ্ধির পরীক্ষাগারে কি সঙ্গীতের কুঞ্জকাননে। তাঁর YOGA FOR THE WESTERN WORLD-এ স্যর পল তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ডমরুস্বনে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন : "Yoga is a proccss of death and birth : death to the old life, birth to a new one : অর্থাৎ যোগসাধনার ফলে মায়িক জীবনের মরণ সেধে জন্মলাভ করি আমরা এক নবজীবনে।

শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় স্যর পল আরো বিশদ ক'রে লিখেছেন যে, যোগ কোনো দুর্বোধ্য নেপথ্যতত্ত্বের প্রহেলিকা নয়—জীবনের প্রতিপদে কী ভাবে পা ফেললে চলা সহজ ও প্রাণসাধনা সফল হবে তারই নির্দেশিকা—যার পথ কাটা হয় আত্মবোধের অচিন লোকের গ্রামছাড়া বনস্থলীর মধ্যে দিয়ে, এমন অনেক ঘুমন্ত নিয়ন্ত্রী শক্তিকে জাগিয়ে তুলে—বুদ্ধির রাজপথে যাদের কোনো হদিশ মেলে না। এসব শক্তি (লিখছেন স্যর পল) চায় ধাপে ধাপে আমাদের অন্তরাত্মাকে জাগতিক আলোআঁধারী অভীপ্সলোক থেকে উত্তীর্ণ করবে এক নিত্যানন্দ দিব্য চেতনায় যার প্রসাদ বিনা মানুষ জীবন্মুক্ত হতে পারে না।

স্যর পল আরো তিনটি বই লিখেছেন : AN EPIC OF THE GESTAPPO—অর্থাৎ, হিটলার ১৯৩৩ সালে যে দুর্দান্ত পুলিশবাহিনী গ'ড়ে তোলেন তার বিবৃতি ; COME HAMMER, COME SICKLE ও THE UNENDING QUEST বলা বাহুল্য আমি এই শেষের বইটির জন্যেই উৎসুক ছিলাম। কিন্তু স্যর পল বইটি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন কথা দিয়ে ফিরতি পথে অস্ট্রেলিয়ায় মারা যান। পরে লণ্ডনে খোঁজ করে ক'রেও এ বইটি পাই নি।

তিনি আমাদের অতিথি হ'য়ে তাঁর জীবনের ও সাধনার সম্বন্ধে কত কথাই যে বলতেন শুনে সত্যিই অবাক্ লাগত ইংরাজ অভিজাতের মধ্যে এমন সহজ আত্মউদ্ঘাটনের প্রবণতা দেখে। কিন্তু তিনি আরো বেশি চাইতেন আমাদের সাধনার খবর নিতে। ইন্দিরার কাছে মীরার আবির্ভাবের সংবাদে তিনি শুধু যে হৃষ্ট হয়েছিলেন তাই নয়, পুলকিত হ'য়ে আমাদের দাদা ও দিদি ডেকে বেঁধেছিলেন তাঁর সরল স্নেহডোরে। শুধু তাই নয়, আমার ভাগবতের অনুবাদ Immortals of the Bhagavat-এ তিনি এক সুদীর্ঘ প্রাক্কথন (Foreword) লিখে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন—যে-Forewordটি পরিশিষ্টে দিয়েছি—স্যর পল ও আমার দুটি ইংরাজী চিঠির সঙ্গে। প্রথমে ভেবেছিলাম ইংরাজী রচনা পরিশিষ্টে না-দেওয়াই ভালো। কিন্তু পরে মনে হ'ল আমার একটি উদ্দেশ্য যখন স্মৃতিচারী ভঙ্গিতে বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবীর ছবি আঁকা তখন এ-চিঠি ও প্রাক্কথন অপ্রাসঙ্গিক হবে না—এদেরমধ্যে দিয়ে চিত্রিত বন্ধুর মনের ছবিটি আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠবে ব'লে। পরিশেষে স্যর পল সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে চাই।

তিনি আমাদের অতিথি হ'য়ে এসে এখানে দু'তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—আমাদের আশ্রমেও একটি। বক্তৃতা দুটির বিষয়বস্তু ছিল আসন। কত রকম দুরূহ আসনে যে তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন দেখে সবাই আশ্চর্য হ'ত। আরো নানা শহরে তিনি বক্তৃতা দিতেন আসন দেখিয়ে। একদিন বলেছিলেন যে, আসনের বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হ'য়ে যারা আসে তাদের তিনি শুধু আসন দেখিয়েই ক্ষান্ত হন না, সেই সঙ্গে বলেন আমাদের মহান্ যোগের সম্বন্ধে নানা কথা—যার অন্তিম লক্ষ্য আত্মবোধ ওরফে বস্তুলাভ। ইন্দিরার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর নরলীলার আনন্দ বিস্ময় ফলিয়ে তুলেছেন, আমার এ প্রতিপাদ্যটি স্যর পল অকুণ্ঠে গ্রহণ করেছিলেন কালীদা ও রামদাসের মতনই। বলতে কি, কথা ব'লে এমন আনন্দ আমি খুব কমই পেয়েছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাকেই ব'লে যেতে হয় আমাদের কথা। শ্রোতারা বড় একটা কিছু বলেন না—বড় জোর দুচারটি মন্তব্য করেন। কিন্তু কথালাপে উদ্দীপনা জাগে যখন দুই পক্ষই আলাপের রসদ জোগায়—যখন এ-পক্ষ যা বলে ও-পক্ষ শুধু সেটুকু গ্রহণ ক'রেই থামে না, বলে এ-সম্পর্কে

তার যা যা বলবার আছে। স্যর পল প্রতিপদেই এই রসদ জোগাতেন তাঁর অসামান্য বুদ্ধির আলোকপাত ক'রে। এরই অন্য নাম দরদী তথা উদ্দীপক। মনে আছে একবার বম্বেতে এক বিখ্যাত চিত্রতারকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাকে লণ্ডনে আমি স্নেহপাত্রী ব'লে বরণ করেছিলাম—তখন সে ছিল দশবর্ষীয়া বালিকা। বম্বেতে তার সঙ্গে দেখা বিশ পঁচিশ বৎসর পরে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল : "দিলীপদা, পণ্ডিচেরিতে তোমরা কী করো?" বলা বাহুল্য এ-শ্রেণীর প্রষ্টাকে নচিকেতার সমানধর্মিণী নাম দেওয়া যায় না।

স্যর পল যে এত সহজে আমাদের সাধনার নানা অঘটন নিজে চাক্ষুষ না ক'রেও বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন তার কারণ শুধু এ নয় যে, আত্মিক জগতের ছন্দ সুরের প্রতি তাঁর নিটোল শ্রদ্ধা ছিল, এ-ও বটে যে তিনি এ-ছন্দ সুরের কিছুটা নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর জীবনসাধনায়। এ-সাধনায় যে তিনি ভারতবর্ষের সনাতন প্রজ্ঞার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন একথা তিনি একাধিকবার আমাদের কাছে প্রায়ই বলতেন সকৃতজ্ঞে। তাই হয়ত আমাদের এ-সনাতন জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগের পথে চলতে দেখে তিনি আমাদের সাগ্রহে বরণ করতে পেরেছিলেন সহযাত্রী ব'লে। প্রতিদানে আমরাও তাঁকে বরণ করেছিলাম সমানধর্মী ব'লে, যাদের পথ ভিন্ন হ'লেও লক্ষ্য এক। অন্য ভাষায় স্যর পলকে আমরা আরো কাছে পেয়েছিলাম তিনি স্বভাবে ভক্তিপন্থী ছিলেন ব'লে তাই তিনি Yoga for the Western World এ প্রথম অধ্যায়েই উদ্ধৃত করেছেন বিখ্যাত প্রেমিক সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসির একটি অনুপম প্রার্থনা :

"Lord, make me an instrument of Thy peace. Where there is hatred let me sow love; where there is doubt—faith; where there is despair—hope; where there is darkness—light. Grant that I may seek to console rather than be consoled, to understand rather than be understood, and to love rather than be loved; for it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life."

এবার স্যর পলের অধ্যায় শেষ করি আমার একটি চিঠির অনুবাদ দিয়ে :

হরিকৃষ্ণ মন্দির ৫ই অক্টোবর, ১৯৫৭
পুনা—১৬

(ভাবানুবাদ)

স্যর পল ডিউক্স্

বন্ধুবরেষু,

যদি এখন তুমি বিলেতে নাও থাকো তাহলেও আশা করি এ-পত্র তোমার হাতে পৌঁছবে যথাকালে।

আজ সকালে আমার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে। থাকবে না? কাল কী কাণ্ডই হয়ে গেল। শোনোই না।

আমি কাল মীরাবাই সম্বন্ধে লেখা আমার নাটক BEGGAR PRINCESS পড়ে শোনাচ্ছিলাম পঞ্চম অঙ্ক প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে—ভক্তসংসদে। সবাই মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিল মীরার ভিখারিণী হ'য়ে বৃন্দাবনে গাছতলায় ঘুমনোর কাহিনী। এমন সময়ে ইন্দিরার হঠাৎ সমাধি —নিশ্চল নিথর মূর্ত্তি, শুধু দুই গাল বেয়ে দুটি রূপালি ধারা নামছে ধীরে ধীরে। পড়ার শেষে ভজন। তারপর সবাই ইন্দিরাকে প্রণাম করল একে একে। ওদের মধ্যে ছিল ইন্দিরার দশবৎসরের ছেলে প্রেমল। সে-ই আমার কাছে প্রথম এসে বলে—ইন্দিরার হাতে পায়ে চন্দনগন্ধের কথা। আমি জানতাম ইন্দিরা কদাচ এসেন্স ব্যবহার করে না। তাই চমকে উঠেছিলাম বৈকি। তাড়াতাড়ি ইন্দিরার কাছে যেতেই আমিও পেলাম তার হাতে ও পায়ে চন্দনগন্ধ। আরো কয়েকজন ভক্ত ও ভক্তিমতীকে ডাক দিলাম, তারাও ঘ্রাণ নিয়ে আশ্চর্য হ'য়ে ফিশ ফিশ করে বলাবলি করতে থাকে— চন্দনের গন্ধই তো! পরে এ-গন্ধ আরো গাঢ় হ'য়ে প্রায় সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার এক গুরুভাই বিমল মৈত্র এখন উত্তরকাশীতে একলা সাধনা

করে। কিছুদিন আগে সেখান থেকে একটি পত্রে সে আমাকে লিখেছিল যে, স্বনামধন্য নগ্ন যোগী স্বামী কৃষ্ণাশ্রম সম্প্রতি উত্তরকাশীতে এসেছিলেন—তাঁর কাছে গিয়ে বসতেই সে তাঁর অঙ্গসৌরভে চমকে উঠেছিল। স্বামী কৃষ্ণাশ্রম ঘোর তুষারপাতের সময়েও নগ্ন দেহে থাকেন প্রায় সর্বদাই সমাধিস্থ। এহেন মহাযোগীর পক্ষে কী না সম্ভব? কিন্তু ইন্দিরা যোগে দীক্ষা নিয়েছে তো মাত্র সেদিন—১৯৪৯ সালে। ইতিমধ্যে—মাত্র আট বৎসরে—কেমন ক'রে তার মধ্যে এহেন যোগ-বিভূতির আবির্ভাব হ'ল? পরে ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলল যে, ধ্যানে যখনই ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে তখনই ওর গায়ে চন্দন বা কস্তুরী গন্ধের আবির্ভাব হয়। আমি বললাম, "কিন্তু কই, আমাকে তো এর আগে কোনোদিন বলো নি?" ও হেসে বলল, "বললেই যে তুমি সবাইকে ব'লে ফেল।" আমি বললাম: "ব'লে কি অন্যায় করি বলতে চাও? আমরা দিনের পর দিন আলোচনা করি এ-ও-তা নিয়ে—কোথায় কে কাকে ঠকিয়েছে, কার হাতে কে খুন হয়েছে, কোন্ গুণ্ডা কোন্ ব্যাঙ্ক লুট করল, কে কোথায় পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে আকাশ বাতাস বিষিয়ে তুলল—এই সব। আমি ও-পথে পা না বাড়িয়ে না হয় দুটো সৎকথাই বললাম—সমাধির কথা, চন্দনগন্ধের কথা, ঠাকুরের কথা।" কিন্তু মুশকিল এই যে, ইন্দিরা ওর নানা যোগবিভূতির কথা কাউকেই বলতে চায় না—আমি ওর গুরু ব'লেই ও স'য়ে থাকে যখন আমি ফাঁশ ক'রে দেই ওর মধ্যে যা যা দেখেছি।

জানি অবশ্য—ঠেকেও শিখেছি তো—যে, অনেকেই এসব অঘটনের কথা শুনে "the old old story" ব'লে হাসেন। হাসুন না মনের সাধে—যখন জানি, শেষ হাসিতে তাঁরা জিতবেন না। বলছি তো ঠাকুরেরই কথা। তাছাড়া কার না বলতে সাধ হয় যখন কানে-শোনা দৈবী লীলা চোখে-দেখার (পুঁড়ি, ঘ্রাণে পাওয়ার) কোঠায় এসে হাজির দেয়?

তুমি জানো—আমি স্বভাবে বিশ্বাসীও বটে সংশয়ীও বটে। আমার মধ্যে সংশয়ী যে দিলীপ, সে বিশ্বাসী দিলীপকে ধমকায় ঘাড় ঘাড়ি, বলে: "সাবধান, অকাট্য এজাহার না পেলে বিশ্বাস করে বোসো না—পস্তাবে। লোকে বিশ্বাস করবে না দেখো।"

ইন্দিরা শুনে হাসে, বলে: "দাদা, তুমি কেন যাও লোককে বিশ্বাস করাতে? না-ই করল ওরা বিশ্বাস? প্রত্যক্ষ অনুভবে সত্য বলে জেনেছি, আমার রক্তে যার দোলা লেগেছে তাকে সমস্ত জগৎ নামঞ্জুর করলেও কি আমার নিজের কাছে তা নামঞ্জুর হ'তে পারে? সত্যবাদীকে কেউ মিথ্যুক ভাবলে ক্ষতি হয় কার? সত্যনিষ্ঠের, না সেই অবিশ্বাসীর, যে সত্যকে মিথ্যা ভেবে ভুল করল?" এই ধরণের বাগ্বিতণ্ডা হয় মাঝে মাঝে আমাদের দুজনের—অবশ্য স্নেহের তর্কাতর্কি—"বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি"-র বিতণ্ডা নয়।

যাই হোক, কালই রাতে আমার ঈপ্সিত প্রমাণ হাজির দিল। বলি সংক্ষেপে।

কাল রাতে, এগারোটায়, আমি ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে বসেছি এমন সময় হঠাৎ ইন্দিরা পাশে এসে বসল। আমি বললাম: "দেখি তো এখনো তোমার হাতে পায়ে গন্ধচন্দন আছে কি না।" পরীক্ষা ক'রে দেখলাম পায়ের সুগন্ধ রয়েছে কিন্তু হাতের সৌরভ মিলিয়ে গেছে। চুলে বা দেহে সুগন্ধের লেশও নেই।

মিনিট পাঁচেক বাদে দেখি—তখনও সমাধিস্থ—চোখের কোণে সেই প্রেমাশ্রু। সমাধি ভাঙার পরে কথা বলতে পারে না, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ ওর হাতে ফের সেই সুগন্ধ। ও গদগদ কণ্ঠে শুধু বলে "ঠাকুর! ঠাকুর!" বুঝলাম, ও ঠাকুরের চরণ ছুঁয়েছে। এমন সময়ে ও হঠাৎ আমার হাত ধরল—সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার হাতেও সুগন্ধ। তখন আমাদের পাশের ঘরে থাকত যোগেন্দ্র ওরফে মোহান্ত। বম্বের এক নিযুতপতির পুত্র—ভক্তিমান্, উচ্চশিক্ষিত, একদা শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে যাওয়া-আসা করত। তাকে ডাকতেই সে ছুটে এল। ইন্দিরা তাকে ছুঁতেই তার গায়েও সুগন্ধ ছেয়ে গেল!

পরদিন সকালে বারান্দায় ফের ওর দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়েই সমাধি, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ। প্রতিবেশী স্যর চুনিলালকে ডেকে পাঠাতেই তিনি হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। আমি ইন্দিরাকে বললাম তাঁকে ছুঁতে। ছোঁওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যর চুনিলাল সুগন্ধী হ'য়ে উঠলেন। সামনের আটচালায় থাকতেন যে-পাঞ্জাবী পরিবার—স্বামী স্ত্রী ও দুই মেয়ে—তাঁদেরও ডেকে পাঠিয়ে ইন্দিরাকে বললাম প্রত্যেককে ছুঁতে। ও ছুঁতেই ফের সেই চন্দনগন্ধ! তাঁরা তো আহ্লাদে আটখানা!

কখনো কখনো সমাধির উচ্চভূমি থেকে একটু নিচে নেমে এলে ইন্দিরা গান শোনে মীরার। কত সময়ে—আমরা সবাই দেখেছি—ওর বিষম নিশ্বাসের কষ্ট—(ক্রনিক হাঁপানি তো!) এমন সময়ে হঠাৎ সমাধি—সঙ্গে সঙ্গে মুখে অপরূপ হাসি—অথচ বেদনাও ওকে ছাড়ান দিচ্ছে না, হাঁপাচ্ছে। ও তখন "দাদা! গান শুনেছি।" ব'লে ধুঁকতে ধুঁকতে আবৃত্তি ক'রে যায় ধ্যানশ্রুত গান—আমি টুকে নিই—আটাশ বত্রিশ ছত্রিশ—এমন কি চুয়াল্লিশ লাইনের গানও এই ভাবেও কখনো কখনো হাঁপাতে হাঁপাতে আবৃত্তি করেছে। এত দীর্ঘ গানের সব পদ ওর অসুস্থ অবস্থায়ও মনে থাকে কী ক'রে—ভেবে পাই না! আমি নিজে মনে করি—এ-অঘটনের জুড়ি নেই। অথচ লোকে প্রায়ই বলে বিজ্ঞ হেসে—অঘটনের যুগ গত! আমার একটি জনপ্রিয় গানের আখর অনেকের মনে দাগ কেটেছে: "ওরা জানে না তাই মানে না—আমি জানি তাই মানি—আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি তাই নাথ আমি জানি।"

ইতি দাদা।

* * *

এ-চিঠিটি স্যর পলকে লেখা চিঠির মূলানুগ অনুবাদ নয়। কিছু বাদ দিয়ে কিছু জুড়ে এ-চিঠিটি যেন এক পুরোনো রচনার নবসংস্করণ দাঁড়িয়ে গেছে। তাই স্যর পলকে লেখা মূল চিঠিটি পরিশিষ্টে জুড়ে দিলাম—আরো এই জন্যে যে, তার শেষে আছে শ্রীঅরবিন্দের মূল্যবান্ মন্তব্য অঘটন সম্বন্ধে।

নয়

মানুষের মন বিচিত্র। স্যর চুনিলাল ডানলাভিন কটেজের সংস্কার সাধনের জন্য এক পয়সাও খরচ করতে চান নি ইন্দিরাকে গভীর ভক্তি করা সত্ত্বেও। শেষে একদিন শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক তাঁকে বলেন যে ইন্দিরার শয়নকক্ষে জলে পড়ে জলপ্রপাতের মতন, তাঁর কর্তব্য এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া। তখন স্যর চুনিলাল অল্প অল্প মেরামতি করলেন, যাকে বলে tinkering—কিন্তু কটেজটির নানা দেয়াল ধ্বংসে পড়ছিল, তাদেরও তো সংস্কার চাই। তাছাড়া রান্নাঘর বাইরে, সেখান থেকে একদিন আমাদের বাসন কোশন সব চুরি হ'য়ে গেল। কিন্তু স্যর চুনিলাল এসব প্রসঙ্গ তুলতেই দিতেন না। তিনি অসময়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু বুঝেও বুঝতে চাইতেন না যে, আমরা চিরদিন এভাবে তাঁর কৃপাশ্রিত হ'য়ে থাকতে চাই না, চাই যে-কোনো উপায়ে হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তাই আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু ক'রে দিলাম একটি দুর্লভ বাংলোর, যার আছে অন্ততঃ তিনটি শয়নকক্ষ ও একটি 'হল' ঘর। 'হল' না হ'লেই নয়, কেননা আমাদের সাধনার ভিৎ-ই ছিল ভজন। দিনের পর দিন আমি বই প্রবন্ধ কবিতা লিখতাম বটে, কিন্তু আমাদের ভজনে দিনে দিনে ভজনার্থীদের সংখ্যা জোয়ারের জলের মতনই বেড়ে উঠেছিল যে। স্যর চুনিলাল জানতেন আমাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা, কিন্তু যেন দেখেও দেখতে চাইতেন না। তাঁর সাফাই ছিল এই যে, এ-ধরণের তুচ্ছ অসুবিধা প্রায় সবাইকেই সইতে হয়, আমরা প্রখ্যাত সাধক-সাধিকা, আমাদের কাছে অসহ্য হবে কেন? আমরা বুঝতাম তাঁর মনোভাব, কিন্তু তিনি যেন বুঝেও বুঝতে চাইতেন না যে, আমরা ঠিক মমুলিপন্থী সাধক-সাধিকা নই। দেশকাল পাত্রভেদে ধর্মার্থীদের সাধনারও রং ঢং বদলে যেতে বাধ্য। তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, আমরা বিদেশে বিভুঁয়ে এসে একটি হলঘর-ওয়ালা বড় মন্দির গড়তে পারব চারপাঁচটি শয়নকক্ষ সমেত।

এই সময়েই ঘটেছিল অঘটন। আর্কিটেক্ট

কন্ট্রাকটারও মিলে গেল, জমিও পেয়ে গেলাম সস্তায়—চমৎকার পরিবেশ। সবাই মানল—এ অঘটন।

অথ আমরা স্থির করলাম—সাতটি শয়নকক্ষ চাইই চাই—শ্রীকান্ত, একান্ত, প্রশান্ত ও মোহান্ত থাকবে, দুটি অতিথিদের জন্যে, একটি ভজনকক্ষ যেখানে ঠাকুরের বেদী বসানো হবে। একটি বাগানও বসানো হবে—শ্রীকান্ত ও ইন্দিরা ভার নিল। বাগানের জন্যে চাই অনেক জল—নানা আম গাছ, লেবু গাছ, কদম গাছ, আরো কত গাছ...কিন্তু কোথায় জল? এক সদয় বন্ধু খুঁড়ে দিলেন টিউবওয়েল—সমস্যার আশু সমাধান হয়ে গেল। শ্রীকান্ত এক প্রবীণ মালীকে নিয়োগ করে কী খাটুনিই যে খাটত—সে একটা দেখবার জিনিষ।

কিন্তু মুশকিল হ'ল স্থপতির একটি বিধান নিয়ে। সে ছয়টি শয়নকক্ষের ছক কাটল বটে—স্নানাগার সমেত, কিন্তু ভজনকক্ষের পাশেই রান্নাঘর। ইন্দিরা বেঁকে বসল, এ হতেই পারে না। বলেও শেষটায় হঠাৎ—এক দিব্য প্রেরণায়ই বলব—একটি মনোহর নতুন ছক কাটল ভজনকক্ষের পাশে খোলা প্রাঙ্গণ - Patio—তার পরে রান্নাঘর। কনট্রাক্টর মুখ ভার করলেন, "এ অসম্ভব—আনপ্রাকটিকাল!" আমি তখন হেসে বললাম: "বন্ধুবর, আমাদের একটি বাংলা প্রবচনে আছে—আমার ছাগল যদি লেজের দিকে কাটি—কার কী বলার থাকতে পারে?" অনুবাদ ক'রে বুঝিয়ে দিতে তিনি বিরস মুখেও সরস হাসি না হেসে পারলেন না। জয়, হাসির জয়!

পরে দেখা গেল—ইন্দিরার ছক অতি শোভন ও নিখুঁৎ। ভজনকক্ষে ভিড় বেশি হ'লে প্রাঙ্গণেও লোকে বসতে পারে স্বচ্ছন্দে। আমাদের আলাদা বৈঠকখানাও ছিল না, পরে প্রাঙ্গণটির শীর্ষে ছাতা বসানো হ'লে সেটিও এ-ওঘর হ'য়ে দাঁড়াল। আনপ্রাকটিকাল হয়ে দাঁড়াল চমৎকার! এক অঘটন ইঁট কাঠ চুন সুরকির স্তরে। অঘটনের কোথায় "প্রবেশ নিষেধ?"

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মন্দির গড়া সম্পূর্ণ হ'ল। আমরা ডানালাভিন কটেজ থেকে ঠাকুরকে পাল্কিতে চড়িয়ে পাল্কি মাথায় ক'রে নগর সঙ্কীর্তন করতে করতে এলাম ডানলাভিন কটেজ থেকে সোজা হরিকৃষ্ণ মন্দিরে—ইন্দিরা-নিলয়ে। সে কী আনন্দ! আমরাও চলেছি—ঠাকুরও চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে চিরসাথী, নিত্য বন্ধু! রাস্তায় ইন্দিরার দুহাত তুলে সে কী মনোহর নাচ! ভিড় জ'মে গেল দুধারে—কত লোক ছুটে এসে ওর পায়ের ধুলো নেয়। থেকে থেকে ভাব সমাধি হয় ওর। তারপর সমাধি ভাঙলে ফের যাত্রা সুরু। আপ্তবাক্যে পাই—ঠাকুর "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"—আমি বাংলায় অর্থ জুড়লাম:

মূক হয় সদালাপী, পঙ্গু গিরিচূড়ে ধায়,
বিদেশও স্বদেশ হয় ঠাকুরের করুণায়।

ডন ও রিচার্ডকে লিখে দিলাম সবিস্তারে। ওরা মহানন্দে উড়ে এল শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসবের ঠিক দুদিন আগে—১৩ই আগষ্ট, ১৯৬৯। তারপরেই জন্মাষ্টমী।

জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয়!
জয় হরি, জয় হরি, নাই নাই ভয়!

(প্রাকৃমন্দির পর্ব সমাপ্ত)

বঞ্চিতা

(গল্প)

আরতি বসু

ঐ এক বিশ্রী ব্যাপার। প্রতিরাত্রে প্রায় একই সময়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুমের ভীষণ ব্যাঘাত হয়। ঘুমের মধ্যে অনুভব করি কে যেন কাঁদছে। বালিশ আঁকড়ে ধরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। একটা চাপা আর্তনাদ কিংবা অস্বস্তিতে সমস্ত ঘরটা ভরে যায়। আমি বন্ধ দরজায় হাত রাখি। খুট্ করে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ হয়। শ্রীতা চম্‌কে বলে—এই। আরও একটু থেমে বলে, কোথায় যাচ্ছ? আমি কি অপ্রস্তুত হই? কি জানি! তাড়াতাড়ি মিথ্যা ভাষণ করি—বাথরুমে। ও বলে —ও দিকে কেন? বাথরুমের দরজা তো এদিকে। আমি যেন বাস্তবে ফিরে আসি। ও তাই তো, ঘুমের ঘোরে ঠিক বুঝতে পারিনি। অনর্থক মিনিট পাঁচেক সময় বাথরুমে কাটিয়ে আবার আমরা রাত্রের শয্যায় আছড়ে পড়ি। আমার ঘরের দুপাশে দুটো দরজা। একটা দিয়ে বাথরুমে যাওয়া যায়। আরেকটা দিয়ে বাগানে। দোতলার সিঁড়িটা নেমে গিয়ে একেবারে যেখানে মিশেছে সেটাই আমার বাগান। কতকগুলো নামী আর অনামী ফুল আর তার সঙ্গে কিছু সবজির সারি। তার পাশেই ছোট্ট একটা ঘর। সেই ঘরেই...।

সারাটা দিন আমি খুবই ব্যস্ত থাকি। একটা বেসরকারী অফিসে চাকরি করছি প্রায় বছর দশেক। অফিস যাওয়ার আগে আর অফিস থেকে এসে পর্য্যন্ত সমানে লিখে চলি। এতটুকু বিরাম নেই, এতটুকু বিশ্রাম। মাঝে মাঝে শ্রীতা এসে পাশে দাঁড়ায়। অনুযোগ করে, অভিমান করে। বলে —কি এত লেখ, ছাইপাশ কিছুই বুঝিনে। কিন্তু আমি জানি আমার প্রতিটি গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র ওর মুখস্থ। সমস্ত দুপুর ধরে শ্রীতা ওদের কথা ভাবে, ওদের নিয়ে মনে মনে সমালোচনা করে, তারপর আমি ফিরলে আমাকে এমন সব জটিল প্রশ্ন করে যে আমি রীতিমত থতমত খেয়ে যাই। ভাবি, কে বলবে শ্রীতা একটা সামান্য স্কুলে পড়া মেয়ে। বিদ্যে যার প্রবেশিকার দরজা পর্য্যন্তও এগোয়নি। শ্রীতা আমারই লেখা থেকে মাঝে মাঝে আমাকেই উদ্ধৃতি করে শোনায়—আচ্ছা, তুমি নিজের কাছ থেকে কেন একটু ছুটি নাও না বল তো? আমি সিগারেট পুড়িয়ে চলি, নিঃশব্দ প্রহর পার হয়ে যাই। কেন নিই না, সে কি নিজেকে ভুলে থাকব বলে?

সত্যিই আমি বুঝিনা কেন আমার জীবনে নিঃশ্বাস ফেলবার পর্য্যন্ত এতটুকু সময় নেই। কোথাও কোন মুহূর্ত্তকে আমি আমার জন্য তুলে রাখিনি। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও বাড়ী এসে আমি খাবার সময় পাই না। তাড়াতাড়ি কলমটাকে টেনে নিই। শ্রীতা হাত থেকে ওটা কেড়ে নেয়। বলে, দেখ তো হাতের শিরাগুলো কেমন ফুলে উঠেছে। একটু পরেই না হয় লিখনা গো। থালায় সে যত রাজ্যের ভাল ভাল খাবার জড়ো করে রেখেছে। তারই একটা তুলে দিতে থাকে আমার মুখে। আর তখনই আমি এলিয়ে পড়ি। যে মনটার সঙ্গে এতক্ষণ যুদ্ধ করছিলাম সেটা হঠাৎ যেন বড় বেশী অবশ হয়ে পড়ে। আসলে ভেতরে ভেতরে আমি যে ভীষণ ক্লান্ত সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারি না। শ্রীতার কোলে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম ভাঙে, দেখি ও আমার মাথার গায়ে পরম আবেগে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই শ্রীতা! আমার সমস্ত জীবনকে সমস্ত স্বপ্নকে পরম যত্নে ভরিয়ে রেখেছে। আমি নিজেকে একেবারে

হারিয়ে ফেলেছি। আমি কি চাই, কি না চাই কিছুই আজকাল আর বুঝতে পারি না। শ্রীতা যা দেয়, মনে হয় সেটাই চাইছিলাম এতক্ষণ ; যা দেয় না, ভাবি ওটার বোধ হয় দরকার নেই আমার জীবনে।

সত্যি বলতে কি জীবনে আমি শ্রীতার কোন তুলনা পাই না। শুধু আমার জন্যই নয়, সংসারের অন্য মানুষের জন্যও শ্রীতা ঠিক এমনি করেই ভাবে। এমনি করেই কাঁদে। সমস্ত দিন আমার কথা ভেবে ভেবে সারা হয়। রাত্রেই কি ঘুমোতে পারে? পারে না। তখন ওর চিন্তা মালতীকে নিয়ে। বলে, লক্ষ্মীটি তুমি একটা ভাল ছেলে দেখনা গো। মেয়েটার সমস্ত জীবনটাই যে পড়ে আছে। আমি উত্তর করি না। পাশ ফিরে শুই। অন্ধকারে আমার মুখটাকে শ্রীতা দেখতে পায় না। ভাবে শুনতে পাইনি ওর কথা। তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। আমাকে এপাশে ফিরায়। গলা জড়িয়ে বলে —আচ্ছা, ওর কি সংসার করতে ইচ্ছে হয় না? ওর কি ভাল লাগা নালাগা বলে কিছুই নেই? বোঝ না কেন বল তো? আমি ম্লান হাসি। বলি, কি মুশকিল। আমি কি তাই বলেছি কোনদিন? আর তা ছাড়া...। শ্রীতাকে আরেকটু কাছে টেনে নিই, তারপর ওর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলি—তাছাড়া ও তো বেশ ভাল করেই সংসার করছে শ্রীতা। রাঁধছে বাড়ছে, ঘর দোর পরিষ্কার করছে, ঠাকুরঘর করছে, তুমি তো সংসারের চাবি ওর হাতেই তুলে দিয়েছ। তবে আবার নতুন করে সংসার কি করবে?

আমার অনভিজ্ঞতাকে ও যেন পরম তৃপ্তিতে উপভোগ করে। তারপর মন্তব্য করে, আহা কি বুদ্ধি রে আমার— পরের সংসার বয়ে বেড়াবার জন্য তো ঘুম নেই মেয়েদের! জান, তুমি মিথ্যেই বই লেখ। আসলে মেয়েদের মনকে তুমি কিছু বোঝনি, কিছু না।

আমি আর কথা বাড়াই না। যেন শ্রীতার কাছে হেরে যেতেই চাই। বলি—তা হবে। মনে মনে শুধু উচ্চারণ করি পরের? মালতী কি পরের সংসার করছে?

এইভাবে কথা বলতে বলতে কখন আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ি। অনেক রাত্তিরে হঠাৎ একবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হয় কে যেন কাঁদছে। চুপি চুপি, খুব চাপা স্বরে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরোতে যাব, শ্রীতা আমার হাতটা টেনে ধরে—এই, কোথায় যাচ্ছ এত রাত্তিরে? শ্রীতাকে আমি মনে মনে উত্তর দিই,— কোথাও আমি যাই না শ্রীতা, কোথাও যেতে আমার ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে......মাঝে মাঝে সব যেন আমার কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

এই নিয়েই আমি বেঁচে আছি। আমার বেদনা, যন্ত্রণা, আমার ভালয় মন্দয় মিলে মিশে। সংসারে দুটি প্রাণী। আমি আর শ্রীতা। আমাদের এখনও কোন সন্তান হয়নি। অবশ্য ঠিক দুটি প্রাণী বলা যায় না। আরও একজন আছে। সে ঐ মালতী। ওকে কেন্দ্র করেই শ্রীতার যতকিছু ভাবনা। ও বছর দুয়েক হ'ল আমাদের সংসারে এসেছে। একা একা সমস্ত কাজ করতে শ্রীতার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মালতী আসার পর এখন একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। শ্রীতা অবশ্য প্রথম প্রথম এমন কিছু কাজ ওকে দিত না। কিন্তু ও-ই আস্তে আস্তে সমস্ত সংসারের দায় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিল। ও বোধহয় শ্রীতার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে।

ইদানীং ওর বিয়ের জন্যে শ্রীতা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি অফিস যাওয়ার সময় আমাকে জ্বালাতন করে মারে। আমি যেন সারাদিনে একটি ভালছেলের সন্ধান করে রাখি। এবং বাড়ী ফিরেই যেন মালতীকে সেই সুখবরটা দিতে পারি।

আমি হাসতে থাকি—আচ্ছা, অফিসে কি ঘটক মশাইদের মেলা বসেছে যে সেখান থেকে একটা খবর আনলেই হোল। কিন্তু কোন কথাই শ্রীতা শুনবে না। বলে, এত বন্ধুবান্ধব, কেউ কি দিতে পারে না একটি ভাল সম্বন্ধ?

—পারবে না কেন? কিন্তু তোমার মালতী যে বিয়ে করতে রাজী হবে এমন কথা জানলে কি করে? শ্রীতা

ধমক দিয়ে ওঠে।—থাম। তোমাকে আর সর্দারি করতে হবে না। মালতী কি চায় না-চায় আমি তোমার চেয়ে ভালরকমই জানি। এখন তোমায় যা বলছি তাই কর। আমি আর বাদানুবাদ করি না। মুখে বলি—আচ্ছা। বলেই তাড়াতাড়ি পথে বার হই। ঘড়ি তো আর আমার জন্যে বসে থাকবে না।

বলা বাহুল্য সারাদিন অফিসে আমি একটি ছেলেরও সন্ধান করি না। কারণ, শ্রীতা না জানলেও আমি জানি যে মালতী বিয়ে করবে না, করতে চায় না, করতে পারে না—

অফিসের অনেকগুলো কাজ পড়ে আছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি টাইপ করে চলি। একটার পর একটা কাগজ সরে যায়। নতুন কাগজ আসে। কাগজ নয়, সরতে থাকে আমার অতীত দিনের ছবিগুলো। ঠিক ছায়াছবির মত ভেসে উঠতে চায় চোখের সামনে। মামার বাড়ী, সেখানকার গ্রাম, সকাল, সন্ধ্যে, শ্বাণ্ডর আর, আর দুটি ছেলেমেয়ের নিষ্পাপ দু'টি মুখ—মানস আর মালতীলতা।

মালতীলতা! নামটা বারবার মনে মনে উচ্চারণ করি। তৃপ্তি পাই, আনন্দ হয় প্রাণে। অনেকদিন ঐ নামটা উচ্চারণ করিনি যে। প্রায় দু-বছর। যেদিন থেকে মালতী এ বাড়ীতে এসেছে। আমার কাছে। ভুল বলছি, কাছে নয়, সংসারে। কারণ, এখানে আসার পর থেকে ও বরং দূরেই সরেছে বেশী। এমনকি অনেকদিন দুজনের দেখা সাক্ষাৎ-ও হয় না। ওর সেই সকাল থেকে কাজ। এটা করা, ওটা করা, যেন ফুরোতেই চায় না, আর আমারও তাড়া—অফিসের তাড়া, জীবনের তাড়া। তাড়াতাড়িই এই জীবনটাকে বুঝি শেষ করতে চাই। তাই বিশ্রাম নিই না এতটুকু, কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ি। ফিরি সেই সন্ধ্যেবেলা। এসেই কলমটাকে তুলে ধরি।

অবশ্য ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি ব্যস্ত ও হই না, কারণ, মনের মধ্যেকার সেই তাগিদটুকুকে সেই দুবছর আগেই বিসর্জন দিয়েছি যে। ওর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি, সারাদিন ওর সঙ্গে কথা বলবনা, ওর দিকে তাকাব না। ওকে যে একদিন চিনতাম এ কথা ভুলে থাকতে হবে আমাকে প্রতিমুহূর্তে। আমি এতদূর প্রতিজ্ঞা করতে রাজী হইনি, কারণ, জানি একই ছাদের তলায় থেকে এতটা উদাসীনতা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া তাতে শ্রীতার মনেও কোন রেখাপাত করতে পারে। তার চেয়ে এই-ই ভাল। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দুজনে মুখোমুখি হব না। আর ঠিক এই কারণেই বোধহয় আমি অফিসে ছুটে আসি এত তাড়াতাড়ি। আসলে ওর সামনে থেকে সরতে পারলেই আমি ওর মুখোমুখি বেশী করে হতে পারি। ও তখন আমার সঙ্গে কত কথা কয়। আমি উত্তর দিই খুব আস্তে আস্তে। পাছে শ্রীতা শুনতে পায়। মালতী জিজ্ঞেস করে, আমাকে ভুলে থাকতে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? আমি বলি—কষ্ট হচ্ছে কি? কই না তো। আসলে তুমি বোধহয় পুরুষ মানুষকে ঠিক চেন না মালতী। ওরা সব পারে। সব, সব। তাই একটা মেয়েকে ভুলে যাওয়া ওদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তারপর নিজের মনেই ধিক্কার আসে। দূর, কোথায় শ্রীতা। আর শ্রীতা কি এসব নিয়ে মাথা ঘামায়? অমন সরল সুন্দর মেয়ের তুলনা আমি তো আর কোথাও দেখিনি। তা না হলে সেবারে যখন ওর ছোট ভাইয়ের টাইফয়েড হয়েছিল তখন ও প্রায়ই সকালের দিকে মালতীর হাতে আমার সব দায়িত্ব তুলে দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যেত। ও তো আমাদের সন্দেহ করতেও পারত। কিন্তু করে নি। ওর আচরণে আমি বারবার সেই সরলতার প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। অথচ আমি? প্রতিদিন অভিনয় করে চলেছি সরল সাজার। একবার শ্রীতাকে ভুলে থাকছি, আর একবার মালতীকে।

মালতী শ্রীতার বিশ্বাসের মর্যাদা সত্যিই রেখেছিল। কিন্তু আমি কি পেরেছিলাম? শ্রীতার বাপের ফেরার সুযোগটুকু নেব বলে সে ক'দিন দুপুরেই ফিরে আসতাম। অসময়ে আমাকে আসতে দেখে মালতী অবাক হতো,

ভয় পেতো। জিজ্ঞেস করত—এখন? অসময়ে যে। আমি বলতাম—এমনিই। মালতী ঘৃণায় মুখটা ফিরিয়ে নিত। বলত, ছিঃ। কাজকে ফাঁকি দিয়ে এমন প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া কি ভাল? আমি বলতাম—কিন্তু...। আমার বক্তব্যকে মালতী মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলত—কোন কিন্তু নয়। কাল থেকে এমন কাজ আর কোরনা। তারপর ধীরে ধীরে চলে যেত আমার সামনে থেকে। আমি বিছানায় এলিয়ে পড়তাম। একটু পরে কিছু খাবার আমার টেবিলের ওপরে রেখে যেত। জলটা সযত্নে চাপা দিয়ে রাখত। আমি দুহাত দিয়ে কপালটাকে চেপে ধরতাম। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। সমস্ত শরীর যেন অপমানে পুড়ে যাচ্ছে। একবার আর্তনাদ করে উঠতাম—মালতী! মাথাটা একটু টিপে দেবে? বিশ্বাস কর, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। আশ্চর্য্য কঠিন দেখাত মালতীকে। বলত, মাথার যন্ত্রণাটা এ সময়ে অফিসেই হবার কথা। আর তখন নিশ্চয়ই টিপে দেবার কোন লোক পাওয়া যেত না। সেই রাত্তির পর্য্যন্ত মাথাকে অপেক্ষা করতেই হতো। আজও তাই হোক—যতক্ষণ না বৌদি ফিরে আসে।

আমি অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতাম। এই কি সেই মালতীলতা! যে আমার জন্য তার সমস্ত জীবনটুকু দিতে রাজ্য ছিল? না, না, ছিল নয়, এখনও আছে। কিন্তু শ্রীতার সামনে, আড়ালে নয়। শ্রীতার বিশ্বাসকে ও ঠকতে দেবে না এই-ই ওর জীবনজোড়া পণ। আমাকে তাই আমার প্রতিজ্ঞার কথাটাকেই মালতী বারবার মনে করিয়ে দেয়। ও আর আগের মালতীলতা থাকবে না, ও হবে আমার আশ্রিতা মালতী। কিন্তু আশ্চর্য্য, ওর এত কঠোরতাও আমাকে দমাতে পারেনি, আমি আবার পরদিনও তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আর ওর চোখের দিকে তাকিয়েই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, আমার বাড়ী বলেই মালতী আমাকে ঢুকতে দিতে বাধ্য, তা না হলে ও সেই মুহূর্তেই আমার মুখের ওপরে দরজা দিয়ে দিত। সেদিন মালতী কোন কথা না বলে সরে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আজকে একজন অফিসের স্টাফ মারা যাওয়াতে... ও গম্ভীর হয়ে বলল, আমি তো কৈফিয়ৎ চাইনি। শুধু পায়ে ধরে তোমার কাছে একটা অনুরোধ করছি, তুমি এমন কিছু কোর না যাতে তোমার ওপর আমি শ্রদ্ধা হারাতে পারি। তোমার ওপর আজীবন শ্রদ্ধা নিয়েই আমায় পৃথিবী থেকে চলে যেতে দাও।

এর পরের দিন আমার সত্যিই তাড়াতাড়ি ছুটি হবার কথা। সেদিন শনিবার। কিন্তু আমার বাড়ী যাবার নিজস্ব অধিকারকে তবু বিসর্জন দিতে হ'ল। এর পরেও কি হ্যাংলামি সাজে? তাই যতক্ষণ না শ্রীতা ফেরে আমাকে বাইরেই কাটাতে হ'ল।

সেদিন রাত্তিরে আমি শ্রীতাকে অনুরোধ করলাম যে, যদি ভাই ভাল থাকে তাহলে আর পরদিন যেন ও না যায়। আসলে পরদিন ছিল রবিবার। তাই সারাদিনের সেই ভয়াবহতার কথা ভেবেই আমাকে সাবধান হতে হ'ল। বলা বাহুল্য, স্ত্রীর প্রতি এই আকর্ষণ শ্রীতাকে গর্বিতই করল। পরম নিশ্চিন্তে ও ঘুমোতে পারল। অথচ আমাকে জেগে থাকতে হ'ল সারারাত। আমার ওপর মালতী যতই শ্রদ্ধা হারাচ্ছে নিজের ওপর বিশ্বাস যেন ওর ততই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ তো হতে পারে না। মালতীকে আমি কিছুই দিতে পারিনি। শুধু ঐ শ্রদ্ধাটুকুকে সম্বল করেই ও এ বাড়ীতে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। তা ঐ শেষ সম্বলটুকুও যদি কেড়ে নিই তাহলে আমিবাঁচব কি করে? মালতীর কাছে যে আমার আর কোন মূল্যই থাকবেনা।

আবার ভাবি, মালতী কি আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে তার এই শ্রদ্ধাটুকুকে সত্যিই নিবেদন করতে চায়, না কি আমার প্রবৃত্তিকে পথের ধুলোয় নামিয়ে শ্রীতার গায়ে সেই প্রতিশোধের ধুলো মাখিয়ে দিতে চায়? হয়তো এতসব কিছুই চায় না। মালতী চায় শুধু আমার অন্যায়েরই প্রতিদান দিতে। তাকে রাজার মত যা দিতে পারিনি, ভিখিরি হয়ে সেটুকু চেয়ে নিতে সে ঘৃণাবোধ করে!

একদিন খেলাচ্ছলে যে সিঁদুর তার সিঁথিতে এঁকে

দিয়েছিলাম তাকেই মালতী জীবনের সর্ব্বস্ব বলে ধরে নিয়েছিল। অথচ আমার কাছে তা ছিল নিতান্তই অভিনয়।

তাই কবেকার সেই মালতীলতার কাছে শপথ করা হৃদয়টা যৌবনের দরজায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। মালতী অভিমান-জড়িত কণ্ঠে ছোট্ট একটা কৈফিয়ৎ চাইল। তার সঙ্গে এমন ছলনা কেন করলাম। আমি অবাক হলাম। ছলনা তো নয়। সেদিনের সেই ঘটনা, সে তো একটা অভিনয় মাত্র। অভিনয়? মালতী যেন পাষাণ হয়ে গেল।

মামারবাড়ীর সেই গ্রামে দুজনে ছেলেবেলায় কত খেলা করেছি। পাড়ায় যখন থিয়েটার হতো, মালতী আর আমি স্বামী-স্ত্রীর পার্ট নিয়েছি। কত ফাগ পরিয়ে দিয়েছি ওর সিঁথিতে। এমনি করেই কবে দুজনার হৃদয় দুজনার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি খানিকটা সিঁদুর নিয়ে ওর মাথায় দিয়ে দিয়েছিলাম। মালতী অস্ফুটে আর্তনাদ করেছিল—তুমি এ কি করলে মানস। এ তো ফাগ নয়, এ যে সিঁদুর। আমি বললাম—তাতে কি হল? এ তো তোমায় কত পরিয়েছি, তখন তো আপত্তি করনি? ও ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, বলেছে—তুমি কিছু বোঝ না মানস, কিছুই বুঝতে চাও না। তোমাকে আমি কেমন করে বোঝাই মেয়েদের দুবার সিঁদুর পরতে নেই। আমি তখন কেমন যেন হয়ে গেলাম। মুখে বললেও মনে মনে জেনেছিলাম, আমার সেদিনকার সেই আচরণটা ঠিক অভিনয় ছিল না। আমি বুঝি সত্যি সত্যিই সে রকম কিছু একটা চাইছিলাম। না হলে আঠারো বছরের একটা তরুণ কি সিঁদুর আর ফাগে পার্থক্য সত্যিই বুঝতে পারে না।

হঠাৎ জ্ঞান যেন হারিয়ে গেল। মালতীকে আকর্ষণ করলাম সজোরে। বললাম—মালতী, তোমার ভয় নেই, তোমার মানস কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা। মনে রেখ, আমি চিরকাল তোমারই থাকব। আজ বেশ বুঝতে পারি, মালতী সেদিন আমার কথা এতটুকুও বিশ্বাস করে নি। মুখে বলেছিল—কিন্তু আমার কি হবে মানস? আজকের এই স্বীকৃতি আমি কেমন করে পাব? কে আমার এই পবিত্র ঘটনার সাক্ষী থাকবে?

আমি বলেছিলাম কেউ নয় মালতী, কেউ নয়। তার দরকারও নেই। দুটো হৃদয়ের স্বাক্ষরই যে সবচেয়ে বড় কথা।

তারপর কালের হাওয়ায় সেই স্বাক্ষর কবে মুছে গেল। আমি লেখাপড়া শিখে চাকরী নিয়ে কলকাতা চলে এলাম। মামার বাড়ী, সেই গ্রাম, সেখানকার মালতীলতা আস্তে আস্তে আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াল।

মালতী ছিল আমার দিদিমার আশ্রিতা। গঙ্গাসাগর মেলা দেখতে গিয়ে দিদিমা এই মেয়েকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই মেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে অঝোরে কাঁদছিল মালতী। দিদিমা দেখতে পেয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তারপর অনেক চেষ্টা করেও মালতীর বাবা-মার খোঁজ-খবর দিদিমা পাননি। পাঁচ বছরের মেয়েও একদিন পরিবেশের চাপে পড়ে বাপমাকে ভুলে গেল। সেদিন থেকে আমার দিদিমাই হলেন একাধারে ওর মা বাবা। অজ্ঞাতকুলশীলা তাঁর আশ্রয়েই লালিতা হতে লাগল।

খুব ছেলেবেলায় মালতীকে আমার ঠিক মনে পড়ে না। এগারো বছরের কিশোরী শরীরটাই আমার মনে বেশী প্রভাব ফেলেছিলো। তখন আমি প্রায়ই মামাবাড়ী গিয়ে থাকতাম। ওকে দেখতাম; ওর সঙ্গে খেলা করতাম, পাড়ার যাত্রাদলে দুজনে যোগ দিতাম। ও আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট ছিল বোধহয়। সমস্ত দুপুরটা দুজনে মিলে পরের বাগানের ফল চুরি করে খেতাম। কাঁচা আম পেড়ে ওকে দিতাম, মালতী দিদিমার রান্নাঘর থেকে কাচালঙ্কা, নুন, তেল সব নিয়ে আসত। সবকিছু মিশিয়ে পরম তৃপ্তিতে দুজনে আচার খেতাম। আমার মায়েরা এক ভাই, এক বোন। মামার বদলীর চাকরী। তিনি কোন সময়েই বাড়ীতে থাকতেন না। বিয়েও করেননি। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসতেন।

সেইসব ছেলেবেলার দিনগুলো একসময় আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে এসেছিল। চাকরী পাবার পরে মামাবাড়ী যাওয়া আর খুব বেশী হয়ে উঠত না বছরে একবার যেতে পারতাম কি না সন্দেহ। যখন যেতাম, মালতীর সে এক অন্য মূর্তি। একটাও কথা বলত না। সমস্তদিন রান্নাঘরে থাকত। পরিবেশন করার সময় মাত্র একবার দেখা পেতাম। আমার অন্তরের ভিতরকার বিশ্বাসঘাতক শয়তানটাকে যেন ও দেখতে পেত। আশ্চর্য্য কোনরকম কৈফিয়ৎ দাবী করত না আমার কাছে। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতাম না দিদিমা কেন ওর বিয়ের চেষ্টা করেন না। অজ্ঞাতকুলশীলা বলে কি কেউ রাজী হত না, নাকি ওই দিদিমাকে বারণ করেছিল? তারপর একদিন আমাকে সেই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল। খবর এল দিদিমার খুব অসুখ। বাঁচবার আশা নেই। মাকে নিয়ে সেই রাত্রেই চলে গেলাম। তিনদিন যমে মানুষে টানাটানি, তারপর সব শেষ। মা তো কেঁদে কেঁদে প্রায় অচৈতন্য। মালতী কিন্তু পাষাণ প্রতিমা। আমি তো জানি মালতীও দিদিমার আরেক মেয়ে। কিন্তু জীবনে বিচলিত হওয়া ওর যেন বারণ ছিল। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে একদিন দুজনে মুখোমুখি হলাম। স্নান সেরে পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছিল। আমি বাগানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিলাম। সেই অবস্থায় মালতী একটু এগিয়ে এল। আমার চোখে স্থির দৃষ্টি তুলে ধরলে। বললে, এতদিন পরে একটা কথা যদি বলি বোধহয় আমার অন্যায় কিছু হবে না। মালতীর দু চোখের ওপর দৃষ্টি রেখেই বললাম—বল। মালতী একটু ভাবল, তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, এখন আমি কোথায় যাব? শুনেছি বিয়ে করেছ কিছুদিন হল। স্ত্রীর সম্মান আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু বাড়ীতে দাসী রাখারও প্রয়োজন হয়।

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। আমি আর্তনাদ করলাম—মালতী!

মালতীকে তখন খুব পবিত্র আর স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। আমি যেন ওর কপালে আর সিঁথিতে কেমন একটা লালচে আভা দেখলাম। সেটা কি আমারই দেওয়া সেই স্বীকৃতি? মনে মনে কবেকার সেই কথাটা উচ্চারণ করলাম। মনে রেখ তোমার মানস কোনদিন তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আমাকে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে দেখে মালতী জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে বিপদে ফেললাম? বুঝেছি, বৌদির কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথা ভাবছ; বেশ তো, তাঁকে বোলো, দিদিমার বাড়ীতে যে কাজ করত সে আমাদের বাড়ী কাজ করতে চায়।

আমি স্থির, নিষ্পন্দ, নিঃশব্দ। অতি কম্পিত কণ্ঠস্বরে শুধু উচ্চারণ করলাম– মালতী, আমাকে তুমি আর কত ছোট করে দিতে পার, বলবে?

মালতী আর দাঁড়াল না। যেতে যেতে বলে গেল—কাউকে ছোট করে আমার সুখ নেই, কিন্তু আমি জানি এর চেয়ে বেশী সম্মান আমার প্রাপ্য নয়।

মনে আছে মালতীকে কয়েক দিন পরে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। তার জন্য শ্রীতাকে কি কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল আজ আর স্মরণে নেই। শুধু এটুকু জানি, মালতী নিজেকে দাসী মনে করে এ বাড়ীর সমস্ত কাজ মাথায় তুলে নিয়েছে, অন্যদিকে সংসারের চাবিকাঠি তার হাতে তুলে দিয়ে মালতীকে পরম সম্মানে সম্মানিত করতে শ্রীতা এতটুকু দ্বিধা করেনি।

এই মালতী। একেই আমি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। যত দেখেছি ততই বিস্মিত হয়েছি। বুঝেছি প্রতি, পলে পলে এই একটা মেয়ের কাছে আমি কি অস্বাভাবিক অপমানিত হয়ে চলেছি। শ্রীতা তার স্বামীকে যেমন শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রেখেছে, এই মেয়ে তেমনি ভাবেই সেই আসনটাকে ধুলোয় ঠেলে নামিয়ে আনছে। সিংহাসন আর পথের ধুলো—এ দুটোর টানা পোড়েনে আমি শুধুই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ছি।

অজান্তে যদি মালতীর ঘরে ঢুকে পড়েছি, আমাকে যেন চোর হতে হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা বলেনি ও। দুশ্চরিত্র মনে করে ঘৃণায় প্রাণ সরিয়ে নিয়েছে।

আশ্চর্য্য। আমি কিছুতেই এতদিন জানতে পারিনি যে, মুখে কোন কথা না বলেও নীরবে এতটা প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

আমি এখন শ্রীতার পাশে শুয়ে আছি। শ্রীতার ভালবাসায়, শ্রীতার দরদে, শ্রীতার আবেগের আলিঙ্গনে আমি আবদ্ধ। কিন্তু কি ভীষণ খারাপ আমার লাগছে আমি বলে বোঝাতে পারব না। কেন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিরাত্রে এই মিথ্যাভাষণ করছি? আমি চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বাগানে যাবার দরজায় হাত রাখব অথচ শ্রীতা ভাববে ঘুমের ঘোরে আমি বুঝি বাথরুম চিনতে ভুল করছি। নিজের সঙ্গে এই মিথ্যা-চারের যে কি প্রয়োজন তাও আমি বুঝতে পারি না। শুধু মালতীকে আমার বলতে ইচ্ছে করে, তুমি অত রাত্রে কেন অমন করে কাঁদ মালতী? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, চাপা স্বরে? বোঝনা কি আমি শ্রীতাকে জড়িয়ে থেকেও তখন কোন মতে, কিছুতেই ঘুমোতে পারি না? আকাশ-কাঁপা তোমার আর্তনাদে আমার সমস্ত সাধের সংসারটা যে ছারখার হয়ে যায়।

আমি ঘুমোতে চেষ্টা করি। মনকে বোঝাই মালতী কাঁদে না। কাঁদতে পারে না। কেবলই তার মানসকে কাঁদিয়ে নিয়ে সুখ পায়।

কাল সকালে ভাবছি শ্রীতা ওঠার আগেই অফিস চলে যাব, তা না হলেই আবার সেই এক কথা শুনতে হবে।—মেয়েটার জন্য কিছু ঠিক করলে? আচ্ছা, তুমি এত পাষাণ কেন বল ত? ও যে কেমন হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। ওর কি সংসার করতে ইচ্ছে হয় না? মালতী কি বঞ্চিতা হয়েই থাকবে সারা জীবন? বিশ্বাস কর, রাত্তিরে তোমার কাছে শুতে আসতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে; মনে হয়, ও যে একলা ঘরে একলা আছে গো।

আমি তখন কি করবো? সব কথা কি শ্রীতাকে বুঝিয়ে বলতে পারব? পারব না। কারণ, সে সাহস আমার নেই। গোপনে শুধু উচ্চারিত হবে ক'টি কথা। এ সংসারে কে বঞ্চিতা শ্রীতা। তুমি না মালতী? মালতী-ই যদি হয় তবে আমি কেন সারাক্ষণ, সারাবেলা শুধু ঐ মেয়েটাকেই চিন্তা করে চলেছি? যে স্বামীকে পেয়ে তোমার জীবনের সকল পাওয়া পূর্ণ হয়ে গেছে, যার পাশে শুতে আসতে তুমি ওরই জন্যে লজ্জা পাও, জান না তোমার সেই স্বামী মালতীরই পাশে শুয়ে আছে।

তুমি ভাবছ, মালতী জীবনে কিছু পেলে না, তাই ওর জন্যে এত চিন্তা করে মরছ। মালতীও হয়ত তাই জানে। শুধু আমারই জানা নেই তোমাদের ভেতরে আসলে বঞ্চিতা কে। যাকে পুরোপুরি পেলে তোমরা দুজনেই বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেতে, সেই মানুষটাই যে তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু। তবু বলব, তোমার জন্যেই আমার বেশী দুঃখ হয় শ্রীতা, তুমি তো জান না যে এ সংসারে আশ্রয় দিয়ে তুমি যাকে করুণা করে চলেছ, এর চেয়ে অনেক বড় আশ্রয়ের মালিক সে আগে থেকেই হয়ে আছে। তবে তফাৎ এই, সে কিন্তু তোমাকে করুণা করতে সাহস করে না। কারণ, এই সত্যটুকু তার নিজেরই জানা নেই।

রাজমাতা*

(১৭৭২ খৃষ্টাব্দ মে, জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬)

জ্যোতির্ময়ী দেবী

জ্যৈষ্ঠের উজ্জ্বল দিন। তারা ভরা নির্মল আকাশ।
বনে বনে শুক্ল রাত। গাছে গাছে পাতায় পাতায় স্থির হয়ে
রয়েছে বাতাস।
প্রাঙ্গণ প্রত্যন্ত ভাগে ক্ষুদ্র গৃহে একখানি,
ধাত্রী কোলে সুপ্ত শিশু পাশে মাতা ফুলঠাকুরাণী।
সহসা দুয়ার প্রান্তে ডাকে পরিজন
'আজ ষষ্ঠ দিবসের রাত—
এখানে পিঁড়ার পরে রাখিলাম তাল পাতা মসী ও লেখনী।
ওরে ধাত্রী, আসিবেন ধাতা—তোর কোলে রবে শিশু। লেখা হবে
ভাগ্যলিপি।
আজ যেবেনা মঙ্গলদীপ যেন। ঘুমায়ো না ধাত্রী ও জননী।'
কোলে শিশু। নিদ্রাতুর-নেত্র ধাত্রী। পাশে মাতা শয্যাপরে।
তৈল পূর্ণ মঙ্গল প্রদীপ জ্বলিতেছে কাঁপিতেছে কভু থর থরে।
প্রাঙ্গণে প্রহর গোনে নিদ্রাহীন রাত।
অকস্মাৎ ছায়াময় কে আসে পুরুষ।
নিল কি লেখনী হাতে—
কি লেখে? কোথায় লেখে? ভালে কিংবা তালপত্রে,—
—"মোচন করিও বৎস, ধর্ম আর সমাজের মূঢ় আচার কলুষ"—
'জ্বালিয়ো জ্ঞানের দিব্য আলো' দেশে।
অর্দ্ধ সুপ্ত মাতা। শিয়রে দাঁড়ান বুঝি ধাতা।
কহিলা, 'পুত্র তোর রাজা হবে। তুমি রাজমাতা।'
বাতাসে কাঁপিল দীপ থর থর।
নিদ্রা টুটে যায়।
কার রাজ্য। কোথা রাজ্য! কোথা রাজা প্রজা। ক্ষুদ্র গ্রাম ঘর!
দেখেছে স্বপন।
কোথা লেখা? হাসিল জননী।—ধাত্রী কোলে হাসে সুপ্ত শিশু?
রাজমাতা? রাজশিশু?
ওরে এই মোর মহারাজ্য ধন। কোলে লয়ে মাতা তারে করিল চুম্বন।

* রাজা রামমোহনের জননীর নাম ছিল তারিণী দেবী। কিন্তু তিনি ফুলঠাকুরাণী নামে খ্যাত ছিলেন। দেশীয় সংস্কার আছে শিশুজন্মের ছ'দিনে ষেটের পূজা হয় ও বিধাতা পুরুষ নব জাতকের ভাগ্যলিপি লিখতে আসেন।

রামমোহন বিদ্বেষের মূল অনুসন্ধান

অ. চ.

রাজা রামমোহন রায় যুগ-পরিবর্ত্তক মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ভারতের নব জাগরণের আকাশে উদীয়মান সূর্য্যের মতই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার আলোকে জাতীয় চরিত্রের বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে সুচিন্তার বিকাশ সতেজ ও সহজ হইয়াছিল। ভারতীয় হিন্দু জাতির জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে যে নূতন প্রেরণার উন্মজ্জন তাহার মূলে রহিয়াছে রাজা রামমোহনের সমাজ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রীয়-সংস্কারের বহু ধারাবাহিত বিতর্ক ও প্রচেষ্টা। হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলায় প্রকাশ করিয়া তিনি নিজ জাতির সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে ভারতের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয়, মুসলমান এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান প্রগাঢ় ছিল এবং ভারতের যে সকল ব্যক্তি হিন্দু ছিলেন না তাঁহারাও রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয় জীবন ক্ষেত্রের অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সকল বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পথে চলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে রাজা রামমোহনের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং সর্ব্বত্রই ভারতের সকল দেশ ও জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেই অনুষ্ঠান যাহাতে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন। শুধু পশ্চিম বঙ্গের অল্পসংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তি এই প্রদেশের রামমোহন-বিদ্বেষীদিগের মুখপাত্র হইয়া রামমোহন-বিরুদ্ধতা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশে বহুকাল ধরিয়া যাহারা রামমোহনের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ জীবনে সেই আদর্শ উপলব্ধির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় অগণিত। জাতীয় কৃষ্টি, জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারাই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন প্রায় সকলেই রামমোহনের প্রতি অশেষ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। একথা বলিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না যে, রাজা রামমোহন রায় যদি এই দেশে না জন্মাইতেন তাহা হইলে জাতীয় নব জাগরণ বহুকাল অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বহু মহামানবই রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অপর যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণে অগ্রসর হইয়া জাতীয় জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের নাম করা এই স্থলে সম্ভব নহে। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও আরও বহু সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বিপ্লবী ও সমাজ সংস্কারক বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে জাতীয় জীবন ক্ষেত্রে গঠনমূলক কার্য্যের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন ও তাঁহাদিগের নাম রামমোহন-ভক্তদিগের মধ্যে উল্লেখ করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

রামমোহন-বিদ্বেষের মূল কারণ হইল, কোন কোন ব্যক্তির উপকার প্রাপ্তি স্বীকার না করিবার নিন্দনীয় আবেগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন যে, নিন্দুকগণ প্রায় সর্ব্বত্রই যাহাদের দ্বারা উপকৃত হয় তাহাদেরই নিন্দা করিয়া নিজেদের আত্মসম্মান বোধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশেও অকৃতজ্ঞতাপুষ্ট কিছু কিছু মানুষ দেখা যায়। তবে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প।

রামমোহনের কীর্ত্তি, মতামত, জন্মের তারিখ প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা যে আলোচনার উত্থাপনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা তাঁহাদের স্বভাবজাত উপকার-স্বীকৃতির অনিচ্ছা উদ্ভূত। এই অকৃতজ্ঞতার বিষ এতই প্রকটভাবে প্রদর্শিত হইতেছে যে, তাহাতে দেশবাসীর মধ্যে রামমোহন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার কোন লাঘব না হইয়া ঐ সকল নিন্দুকদিগের প্রতিই ঘৃণার ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের নিকট আমরা শুধু সমাজ সংস্কার ও ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ও কৃষ্টির পুনরুদ্ধারের জন্যই ঋণী নহি; আমরা তাঁহার অনুপ্রেরণাতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে শিখিয়াছি। তিনি একাধারে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে শুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়া আমাদের নিজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে জাগ্রতদৃষ্টি হইতে শিখাইয়াছিলেন এবং সেই একই সময়ে পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়া নূতনের সন্ধানে ইয়োরোপীয় আদর্শের ক্ষেত্রে প্রেরণা অনুসন্ধানে যাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্র ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে জাতীয়তার সারবস্তু বলিয়া প্রচার করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আধুনিককালে দেশাত্মবোধকে ভারতের মানুষের নিকট উচ্চ আদর্শের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়োরোপে একটা সময় গিয়াছিল যখন শিক্ষিত মানুষ ল্যাটিন ব্যতীত অন্যভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না। মাতৃভাষা শুধু অশিক্ষিতজনের দৈনিক জীবনযাত্রার বিষয়ে অতি সাধারণ কথায় ব্যবহৃত হইত। পরে দীর্ঘকাল বহু চেষ্টার ফলে ইয়োরোপের কথিত ভাষাগুলি প্রকৃষ্টরূপে গঠিত হইয়া উচ্চাঙ্গের আলোচনায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। রামমোহনের সময়ে এদেশে বাঙ্গালা ভাষা কেহ যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিতে সক্ষম ছিলেন না। আইন আদালত অথবা অন্য উচ্চস্তরের আসরে কেহ বাঙ্গালা ব্যবহার করিত না। পণ্ডিতজনের মধ্যে সংস্কৃত এবং দরবার বা আদালতে ফারসী প্রচলিত ছিল। ইংরেজী ব্যবহার প্রায় হইতই না কেননা ইংরেজী শিক্ষা তখনও ঠিকমত আরম্ভ হয় নাই। বাঙ্গালা পদ্য চলিত কিন্তু গদ্য আড়ষ্টভাবে সংস্কৃতের অনুকরণে লেখা হইত। এই কারণে রামমোহন যখন পুস্তিকা প্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন তখন তাঁহাকে উপযুক্ত গদ্য ভাষা সৃষ্টি করিয়া লইতে হইল। তাঁহার গদ্য রচনা পণ্ডিতদিগের বাঙ্গালা গদ্য অপেক্ষা অনেক সহজ সরল ভাবে বোধগম্য ছিল এবং এই কারণে তাঁহাকে বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা বলা হইয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায় নিজ জীবনকালের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষাকে তর্ক, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যম করিয়া তুলিলেন ও সেই যুগ হইতেই বাঙ্গালা আধুনিক ভাষার রূপ ধারণ করিল। বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিজ রূপ ধারণের মূলেও ছিলেন রাজা রামমোহন। এবং তিনি প্রথম উচ্চ জাতীয় হিন্দু যিনি সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া তদ্দেশস্থ গুণীজনদিগকে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত পরিচিত করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যাবলী আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সংযোগ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে নূতন পদক্ষেপের সূচনা বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তিনিই মানব সমাজে মানবীয় অধিকার নির্দ্দেশ কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম। সকল দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠা স্থিরনিশ্চয় ও অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা মহাপুরুষদিগের অপবাদ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের মূল্যায়ন অথবা মিথ্যা প্রচার মহাপুরুষদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না।

---

৪৯২ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

যে ফুটবল খেলার মাঠে কখনও ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হইতে পারে না। যে পূর্ণ সমতল ভাব ও ঠাসা ঘাস না থাকিলে ক্রিকেট খেলার বাধা সৃষ্টি হয়, ফুটবল বুট পরিয়া দাপাদাপি করিলে জমির সে অবস্থা কখনও রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া দৌড়ের জন্য রচিত পথ, সন্তরণের জলপথ প্রভৃতির সহিত টেনিসের সমন্বয় আরোই অসম্ভব। ফুটবল খেলুড়ে ও ব্যবস্থাপকগণ বলিলেন, স্টেডিয়াম দীর্ঘ ও খেলার মাঠ তাহার এক পার্শ্বে হইলে দর্শকগণ নামিয়া আসিয়া খেলার মাঠের নিকটে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার চেষ্টা করিবে। ফলে সেই খোলা জায়গাটুকুতে যদি ক্রিকেটের "পিচ" নির্ম্মাণ করার ইচ্ছা থাকে ত জমিতে লোক চলিয়া তাহার আর কোনও বস্তু থাকিবে না। সুতরাং সংযুক্ত স্টেডিয়াম ধামা চাপা পড়িল। নূতন হাওড়া ব্রীজ পরিকল্পনার ধাক্কায় এলেনবরা কোর্সের ফুটবল স্টেডিয়ামও হইতে বাধা পড়িল। সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন নূতন কোন উপায় সন্ধানে,যাহাতে কলিকাতা-বাসীর ফুটবল খেলা দেখিতে সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি শুনা গিয়াছে সল্ট-লেক এরিয়া অথবা ধাপার নোনা জলের এলাকায়, যেখানে সরকারী ব্যবস্থায় বাড়ীঘর রাস্তা বাগান ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতেছে, সেইখানে একটা বিরাট স্টেডিয়াম নির্ম্মাণ করা হইবে। এ বিষয়ে যাঁহারা সরকারী গণনায় অতি বিচক্ষণ ও জানুনেওয়ালা তাঁহারা এবারও শিরঃসঞ্চালন করিয়া বিষয়টাকে সমর্থন করিয়াছেন ও গণ্যমান্য উপর-ওয়ালাগণ বলিয়াছেন, এই স্টেডিয়াম হইবেই হইবে, হইতেই হইবে, না হওয়া কোনও মতেই চলিবে না। কেহ কেহ ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মানুষে অত দূরে যাইবে কেমন করিয়া ? উত্তর হইল, বাসে চড়িয়া। বাস কোথা হইতে আসিবে কিম্বা অপরদিকের বাস বড় খেলার দিন ধাপায় চালাইয়া দিলে সেই সময় জনসাধারণ বাদুড় ঝুলিয়া যাতায়াতের জন্য নিজ নিজ অঞ্চলে বাস পাইবে কি করিয়া ইত্যাদি কথা কেহ আর ভয়ে উঠায় নাই। আফিস হইতে দৌড়িয়া গিয়া দলে দলে কেরাণীগণ যে খেলা দেখেন তাহা সাত মাইল দূরে যাইতে হইলে কেমন করিয়া হইবে ? কলিকাতা ময়দান, ভবানীপুর টালিগঞ্জ চেতলা অথবা হাওড়া শ্যামবাজার বেলগাছিয়া হইতে সমদূরবর্ত্তী। হাওড়া হইতে ধাপা প্রায় এগার মাইল হইবে, টালিগঞ্জ হইতেও প্রায় ঐরূপ। ধাপায় স্টেডিয়াম হইলে হাওড়া টালিগঞ্জ হইতে কেহ খেলা দেখিতে যাইতে পারিবে বলিয়া সন্দেহ। মনে হয় যে ধাপায় স্টেডিয়াম নির্ম্মিত হইতে তাহা বিশেষ জনপ্রিয় হইবে না। ময়দানে যেমন করিয়া এখন খেলা হয় তাহাই চলিতে থাকিবে। ক্রিকেট খেলাও ইডেন উদ্যানে পূর্ব্বের মতই চলিবে বলিয়া মনে হয়। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ধাপায় ক্রীড়া-কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া একটা খুব লাভ হইবে না। স্টেডিয়ামের নিচে যে সকল দোকান, অফিস,ভোজনালয় প্রভৃতি হইতে পারে তাহাও ধাপায় চলিবে কি না সন্দেহের বিষয়।

ওকিনাওয়া হইতে হানয়ে বোমা বর্ষণ

আমেরিকান বোমারু বিমানের কিছু কিছু জাপান রাষ্ট্রের ওকিনাওয়া দ্বীপ হইতে উত্তর ভিয়েৎনামের হানয় সহরে বোমা ফেলিতে যায় ও বোমা ফেলিয়া আসিয়া ঐ দ্বীপেই বিশ্রাম করে। ওকিনাওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অনেক কাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দখলে ছিল কিন্তু কিছু পূর্ব্বে দ্বীপটি পুনরায় জাপানকে ফিরাইয়া দিয়া আমেরিকা জাপানের সহিত বন্ধুত্ব গাঢ়তর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন ঐ দ্বীপকে বোমারু বিমান কেন্দ্র করিবার কোনও ন্যায্য অধিকার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের থাকিতে পারে না, এবং বর্ত্তমানের বিমান পরিচালনার জন্য জাপান আমেরিকার তীব্র সমালোচনা করিয়া ওয়াশিংটনকে অভিযোগ জানাইয়াছেন। আমেরিকা বলিয়াছেন যে, আবহাওয়ার কারণে ঐরূপ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু এই কথায় জাপান সন্তুষ্ট হ'ন নাই এবং বলিয়াছেন যে ঐরূপ কার্য্য করা বন্ধ করিতে হইবে।

আমেরিকা বহুকাল পূর্ব্বে পাকিস্থান হইতে বিমান পাঠাইয়া অপরাপর দেশের সামরিক রক্ষণ ব্যবস্থার আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিত। তখন ঐ কার্য্যের বহু নিন্দা জগৎ জাতি-মণ্ডলীতে উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা ধরা পড়িয়া বিশেষ লজ্জা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এখন অপরের বিমান-বন্দর ব্যবহার করিয়া নিজের অন্যায় বিমান আক্রমণ চালনা করিয়াও আমেরিকা লজ্জিত হইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। সামরিক শক্তি ও অর্থ অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে সম্ভবত লজ্জা হওয়ার আর সম্ভাবনা বা প্রয়োজন থাকে না।

ব্যাঙ্কের টাকা চুরি

বড় বড় অনেকগুলি ব্যাঙ্ককে জাতীয় করিয়া লইবার পরে ব্যাঙ্কের টাকা জুয়াচুরি করিয়া অপহরণ করা খুবই বাড়িয়াছে। ইহার একটা কারণ জাতীয় করাইবার ফলে ব্যাঙ্কের অনেক অনেক শাখা খোলা হইয়াছে ও পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শাখাগুলির অভিজ্ঞ কর্মচারীদিগের নূতন শাখায় পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগের কার্য্যে নবনিযুক্ত অনভিজ্ঞ কর্মচারীদিগকে রাখা হইতেছে। অপর একটি কারণ এই যে, যাহারা এই সকল জুয়াচুরির সহিত জড়িত তাহারা ব্যাঙ্কের কর্মচারীদিগকে কোনও না কোন উপায়ে নিজেদের টাকা অতি শীঘ্র দিয়া দিবার জন্য রাজী করায় ও তাহার ফলে তাহাদের টাকা দিবার পূর্বে চেক ইত্যাদি ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই টাকা দিয়া দেওয়া হইয়া যায়। চেকে অদল বদল করা হইয়াছে কি না, তহবিলে টাকা সত্য সত্যই আছে কি না এ সকল পুরাপুরি অনুসন্ধান না করিয়াই ইহাদের কাজ শীঘ্র শীঘ্র করা হইয়া যায়। এমনিতে ব্যাঙ্কের একটা টাকা বাহির করিতে অনেক সময় লাগে, একথা সর্বজন-বিদিত। কিন্তু কখন কখন কাহারও কাহারও কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হইয়া যায়। এইরূপ যখনই হয় তখনই উচ্চ কর্মচারীদিগের সন্দেহ করিবার প্রয়োজন হয়। তাঁহারা যাহাতে সকল সময় যথাযথ পরীক্ষা(বৈজ্ঞানিক উপায়েও) করিয়া তবে মোটা টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন ইহা একটা অপরিবর্তনীয় রীতি বলিয়া স্থির করা আবশ্যক।

গরীবের নিকট রাজস্ব আদায়

উচ্চহারে খাজনা মাশুল ও রাজস্ব আদায় যদি শুধু এমন ভাবেই করা সম্ভব হইত যাহাতে দরিদ্রদিগের উপর তাহার চাপ না পড়িয়া শুধু যাহারা দিতে পারে তাহারাই তাহা দিত, তাহা হইলে সামাজিক অবস্থাটা অনেকটা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের দেশে, যাহার আয় অত্যল্প ও যাহার ঘরে শিশুরা দুধ পায় না ও রুগীদিগের ঔষধ জুটে না, তাহারাও খাজনা মাশুল দিয়া অর্দ্ধাহারে কাতর হইয়া দেশনেতাদিগের দেশ সেবার প্রহসন দেখিতে থাকেন। দেশনেতাগণ কোন রাজস্ব না দিয়া দেশবাসীর খরচে ভ্রমণ, আরামে বাস করা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, কিন্তু গরীব যে সে অর্দ্ধগজ কাপড় ক্রয় করিলে অথবা চায়ে এক চামচ চিনি দিয়া চা পান করিলেও, তাহাকে রাজস্ব দিতে হয়। দেশে সহস্র সহস্র বাসস্থান নির্মাণ করা হইয়াছে যাহাতে রাষ্ট্রকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সুবিধামত উপায়ে বৃহৎ বৃহৎ সহরে নিবাস করিতে পারেন; কিন্তু পাঁচলক্ষ গ্রামের মানুষ বৃক্ষছায়ায় থাকে, না কি করে, তাহা কেহ দেখিতেও চাহেন না। গরীবদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা ত নাই এদেশে পরন্তু অসহায়কে আরও নিঃসম্বল করিয়া দিবার আয়োজন আছে অসংখ্য রকমের।

রামমোহন জিজ্ঞাসার পথিকৃৎ রাখালদাস হালদার

ক্ষিতীশ রায়

রাখালদাস হালদার (১৮৩২-১৮৮৭) তাঁর নামের ইংরেজী আদ্যাক্ষর দিয়ে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। সম্ভবত তাঁর দেশী-বিদেশী অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁকে ডাকতেন R.D.H. বলে। এই নিবন্ধে আমরাও তাঁকে সেই নামেই উল্লেখ করব।

রামমোহন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে R.D.H. যে একজন বিশিষ্ট পথিকৃৎ ছিলেন, পরম্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ঘটনার সূত্রে সেই তথ্যটুকু তুলে ধরার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা। প্রসঙ্গে আসবার আগে R.D.H.-এর নিজস্ব বৃত্তান্ত সামান্য কিছু জানা দরকার, অন্তত তাঁর প্রথম জীবনের। * ১

Rev. C. H. A. Dall * ২ হাওড়ায় Calcutta to London by the Suez Canal শীর্ষক একটি বক্তৃতায় (১৮৬৯) বলেছিলেন, 'যারা বলেন বাঙালীকে বিলাত পাঠালে সে বিগড়ে যায় আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। সে দেশে গিয়ে রামমোহনের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল এমন কথা কেউ বলবেন না। রাজৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্ বণিকপ্রবর দ্বারকানাথ ঠাকুরও লণ্ডনে যাবার ফলে নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন—এমন কথা কুত্রাপি শুনিনি। আবার একজন বাঙালী যিনি এ যাত্রায় আমার সহযাত্রী ছিলেন (R.D.H.) এবং যিনি এক বৎসর কাল লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকরূপে ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা সম্যকরূপে অনুধাবন করেছেন, মার্টিনো, টেইলর, ম্যাক্সমূলর, ট্রেভলিন ও উড্-এর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিদের নিকট-সংস্পর্শে এসেছেন—বিলাত যাবার ফলে তাঁর যে কোনো দিক থেকেই অধোগতি হয়নি—এ আমি জোর করে বলতে পারি।'

Rev. Dall যে রামমোহন ও R.D.H.-এর নাম একই সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন—সম্ভবত তার অন্যতম কারণ এই যে, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় উভয়ে ছিলেন প্রায় একই পথের পথিক।

জগদ্দল-হুগলির হালদারেরা ছিলেন পীরালি ব্রাহ্মণ। এঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব—খড়দহের গোসাঁইরা ছিলেন এঁদের গুরু। বাড়িতে নিয়মিত বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা ছিল। R.D.H.-এর পিতা বেচারাম হালদার (১৭৮৪-১৮৬৯) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বাংলা ও ওড়িশা অঞ্চলে পূর্তবিভাগে কাজ করতেন। শিশু অবস্থায় R.D.H.-এর মা মারা যান, তাঁকে মানুষ করেন জেঠাইমা রেবতী দেবী। R.D.H. এর হাতেখড়ি হয় পাঁচ বছর বয়সে। বেচারাম বালাসোরে যখন ছিলেন, R.D.H. ইংরেজী ও ওড়িয়া শিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর দশ বছর বয়স (১৮৪২)। সে-সময় কয়েকজন আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে বালক R.D.H. পুরীর জগন্নাথদর্শনে যান। জনৈক সহযাত্রীর মুখে তিনি শুনেছিলেন যে শ্রীক্ষেত্রের এমনই মহিমা যে মন্দিরের অভ্যন্তরে নাকি ছায়া পড়ে না। R.D.H. মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে প্রমাণ করেছিলেন যে সেখানকার বিগ্রহেরও ছায়া পড়ে। ১৮৪৪-৪৫ অব্দে তিনি চুঁচুড়া ও হুগলিতে স্কুলে ভর্তি হয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করেন। সংস্কৃতে অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হয়েছিল। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সুযোগ নিয়ে কুলপুরোহিত R.D.H.কে কালীসাধনায় দীক্ষা দেন—যখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। দুটি বছর খুব অস্থিরতার মধ্যে তাঁর দিন কাটে। অতঃপর ১৮৪৭ অব্দে খড়দহের ললিত গোসাঁই তাঁকে

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। কিন্তু তাতেও তাঁর ধর্মপিপাসার নিবৃত্তি ঘটেনি। এই ঘটনার বৎসর কাল পরেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হবার ফলে অন্য খাতে তাঁর জীবনের ধারা বইতে শুরু করে। ১৮৩৮ অব্দে তাঁর বয়স ১৬, কিন্তু ওই বয়সেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। 'প্রভাকরে'ও তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। সাহিত্য রচনার সূত্রে তিনি বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসেন। আরও যে-দুজনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয় তাঁরা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও অনঙ্গমোহন মিত্র। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সূত্রে তাঁর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত শুরু হয় এবং তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে একেশ্বরবাদের কথায় গভীর ভাবে আকৃষ্ট বোধ করেন। এই সময়ে একেশ্বরবাদী কোন কোন ইংরেজ লেখকের বই তিনি গভীর মনোযোগে পাঠ করেছিলেম, তাঁদের মধ্যে ছিলেন থিয়োডোর পার্কার, চ্যানিং, এডওয়ার্ড ডেনিস প্রমুখ মনীষী। এঁদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রব্যবহারও ছিল। আর তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিলেন রামমোহন রায়। মনে হয় এই রকম সময়েই R.D.H. রামমোহনের Precepts of Jesus,the Guide to Peace and Happiness বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। ১৮৫১ অব্দ এই অনুবাদ 'সুখ শান্তির উপায় স্বরূপ যিশু প্রণীত হিতোপদেশ' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়।

এবার (১৮৫১) তিনি মনে মনে স্থির করলেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবেন। সেইসঙ্গে তাঁর ধারণা হ'ল বৈষ্ণব শাক্তদের মতো ব্রাহ্মেরা যদি কেবল হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদায়-বিশেষ হন তাহলে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে প্রগতি আনা সম্ভবপর হবে না। অনঙ্গমোহন মিত্রকে সঙ্গী করে ছুটলেন দেবেন্দ্রনাথের কাছে এই কথা বলতে। দেবেন্দ্রনাথ সব কথা মন দিয়ে শুনে বললেন— সরাসরি বিপ্লব ঘোষণা না করে আপাতত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে ধর্মীয় জীবন যাপন করাই যথেষ্ট ; তবে কেউ যদি ব্রাহ্মধর্মের নিয়ম মেনে চলতে চান তবে তাঁর পক্ষে সমাজভুক্ত হওয়াই ভালো। কথাটা R.D.H.-এর বেশ মনে ধরল। সেই বছরেই ২৪ পরগনার বাঁধ সংরক্ষণের কাজে ব্যাপৃত থাকা কালে আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বেচারাম কোম্পানীর কাজ থেকে অবসর নিলেন। কোম্পানী তাঁর জন্য বিশেষ পেন্‌শনের ব্যবস্থা করল, ছেলে R.D.H.কে বাপের অফিসেই কেরাণীর কাজে বহাল করল। বেচারাম চলে গেলেন জগদ্দলে, ছেলে খিদিরপুরে বাসা ভাড়া করে চাকরী করতে লাগলেন।

পরের বছর (১৮৫২) R. D. H. দেবেন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। কিন্তু এতেই তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার নিরসন হল না। অক্ষয়কুমার দত্ত ও অনঙ্গমোহন মিত্রকে সঙ্গী করে, দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে জোড়াসাঁকো বাড়িতেই রামমোহনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে তাঁরা এক 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করলেন। সভার অধিবেশন হত প্রতি বুধবার সন্ধ্যায়। সূচনায় সমাজসংস্কার বিষয়েই আলাপ আলোচনা হত, ক্রমশ আলোচনার পরিধি বিস্তৃত হয়ে ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়েও বিতর্কের সূত্রপাত হল। R. D. H. বললেন, উপাসনা কালে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার অকিঞ্চিৎকর, বাংলাতেই সংক্ষেপে পরমেশ্বরের উপাসনা করার পর দেড়-দুই ঘণ্টা কাল ধর্মীয় ও সামাজিক প্রসঙ্গ অবতারণা বিধেয়। বলা বাহুল্য দেবেন্দ্রনাথ নব্যব্রাহ্মদের এই সব নূতন মত স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন নি। R. D. H. আপন উদ্‌যোগে খিদিরপুরে যে ব্রাহ্মসমাজস্থাপন করেন, সেখানে তাঁর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কাশীশ্বর মিত্র, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভবানীপুরে যে জ্ঞানপ্রকাশিকা সভা পত্তন করেন (তত্ত্ববোধিনী সভার অনুকরণে) সেখানেও এই বিংশতি বর্ষীয় তরুণটি অল্প বয়সেই প্রগতিমূলক আলাপ আলোচনার একটি কেন্দ্র রচনা করে নেন।

এ বিষয়ে একটি কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী R. D. H. তাঁর ডায়েরিতে বিবৃত করেছেন।

১৮৫৩ অব্দের ২১ মার্চ তারিখে সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, কলকাতার কতিপয় ব্রাহ্ম শিষ্যও এসেছেন তাঁর সঙ্গে। উপাসনার পর প্রস্তাব হল সভার নিজস্ব ভবনের ট্রস্ট ডীড্ নিয়ে আলোচনা হবে। R. D. H. সরাসরি প্রস্তাব করলেন, সভার লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে নূতন নামকরণ হোক ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ। ভবানীপুরের মুখপাত্রেরা বিরোধিতা করে বললেন, সভার আদি নামই বহাল থাক! দেবেন্দ্রনাথ দোটানায় পড়ে আড়ালে R. D. H.কে পরামর্শ দিলেন, নামকরণের ব্যাপারটা যদি অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি যোগে সভার কার্যসূচির অন্তর্গত না হয়ে থাকে, তাহলে প্রস্তাবটা মুলতবী রাখা যায়। পরের অধিবেশনের আগেই যদি কলকাতার কিছু ব্রাহ্ম সদস্যশ্রেণিভুক্ত হতে পারেন তা-হলে R.D.H.-এর প্রস্তাবিত নামান্তরের সপক্ষে দল ভারি করা যায়। R. D. H. বিপক্ষদলকে আপন প্রস্তাবের অনুকূল করার উদ্দেশ্যে দু-চারটি কথা নিবেদন করার জন্য সভাপতির অনুমতি চেয়ে নিলেন। অতঃপর ঝাড়া পনরো মিনিট ধরে এমন সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করলেন যে ভোট গ্রহণের সময় দেখা গেল, বিপক্ষে যত ভোট স্বপক্ষেও তত। তখন সভাপরিচালনার রেওয়াজ অনুসারে সভাপতি ব্রাহ্মসমাজ নামের সপক্ষে মত দেওয়ায় স্থির হয়, ট্রস্ট ডীডে ওই নামই রাখা হবে। অল্প বয়সেই R. D. H. উত্তম বাগ্মী ছিলেন, যুক্তি প্রয়োগেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

পূর্বের বছর (১৮৫২) জুলাই মাসে জগদ্দলের নিজ বাটীতেও R. D. H. ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন, বেচারামের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও। ৩১ অক্টোবর তাঁর আমন্ত্রণক্রমে দেবেন্দ্রনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজ-ভবনে উপনিষদের ধর্ম বিষয়ে মৌলিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

জোড়াসাঁকো বাড়িতে আত্মীয়সভা স্থাপনের ব্যাপার থেকে অনুমান হয় R. D. H. হয়তো ভেবেছিলেন রামমোহনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হলে ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাস পরিহার করে যুক্তিবাদের শক্ত বুনিয়াদে দাঁড়াতে হবে। ১৮৫৪ অব্দের ১ জানুআরি পলতার বাগানের ঘটনা ৩০ অনুধাবন করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে দেবেন্দ্রনাথের সাবধানী রক্ষণশীলতাকে যাঁরা নাড়া দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের অগ্রণী ছিলেন অক্ষয়কুমার ও R. D. H.। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, ব্রাহ্মদের একত্র ভোজন, পরস্পরের মধ্যে কন্যার বৈবাহিক আদান-প্রদান, উপবীত বর্জন—প্রভৃতি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার প্রস্তাব মুখ্যত আসত R.D.H.-এর কাছ থেকে। কেবল প্রস্তাব করে তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র ছিলেন না। প্রস্তাব কার্যে পরিণত করতে চাইতেন। পলতার বাগানের ঘটনার পর তিনি জগদ্দল গিয়ে উপবীত ছাড়ায় পিতা বেচারাম আপন বক্ষে ছুরি মারতে উদ্যত হয়েছিলেন একথা মহর্ষি তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখে গেছেন।

নব্য ব্রাহ্মদের আচরণে এরকম আতিশয্য যখন দেখা যেত, দেবেন্দ্রনাথ পরোক্ষ ভাবে তাঁর আপত্তি প্রকট করার জন্য হিমালয়ে চলে যেতেন—দীর্ঘ কালের জন্য।

অস্থিরমতি R. D. H. তাঁর প্রস্তাবিত বিপ্লব কার্যকর করার পথে বহু বিঘ্ন দেখে কিন্তু দমলেন না। ১৮৫৫ অব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের দিনলিপি থেকে দেখা যায় একই দিনে তিনি মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হচ্ছেন অনঙ্গমোহনের সঙ্গে। তত্ত্ববোধিনী দপ্তরে গিয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। তার পরেই চলে যাচ্ছেন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে কথা বলতে।

সেই সঙ্গে চলেছে তাঁর সেই রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থ অনুবাদের কাজ, 'সুখ শান্তির উপায় স্বরূপ যিশু প্রণীত হিতোপদেশ'। আমেরিকান মিশনারি সাহেব Dall-এর সঙ্গে এই বইয়ের বিষয়ে তাঁর অনেক কথাবার্তা হয়। রামমোহনের বহু খ্রীষ্টান বন্ধুদের মতো এই আমেরিকান পাদরিও নিশ্চয় R. D. H.কে বুঝিয়ে

দিতে চেয়ে থাকবেন যে এক নামে ছাড়া রামমোহন অন্তরে অন্তরে ছিলেন খ্রীষ্টান। হয় তো বলে থাকবেন যে তাঁর বিলাতের বন্ধুরা (যাঁরা রামমোহনের বিলাত প্রবাস কালে তাঁর অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন) তাঁকে সেই মর্মে পুস্তক পত্রিকা চিঠিপত্রও পাঠিয়েছেন। অন্যান্য একেশ্বর-বাদী খ্রীষ্টান পাদরিদের মতো Dall নিশ্চয় ভেবে থাকবেন হিন্দু সমাজের আওতা থেকে ব্রাহ্ম একেশ্বর-বাদীদের যদি বিচ্যুত করা যায়, বিশেষ বুদ্ধিতে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়েরা যদি যিশুর ধর্ম গ্রহণ করেন— তাহলে ক্রমে দেশের অন্যান্য জনসাধারণও ধর্মান্তরিত হতে আপত্তি করবে না।

অপর পক্ষে হিন্দুসমাজের পক্ষপুটে থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রগতির সম্ভাবনা সুদূর জ্ঞান করে অসহিষ্ণু হতাশায় রামমোহনের মতো R. D. H.ও একসময় হয়তো ভেবে থাকবেন, একেশ্বরবাদই মুখ্য—কোন্ ধর্মের কি নাম গৌণ। ধর্মান্তরের ফলে সমাজে সার্বিক উন্নতি সাধন সম্ভবপর যদি হয়, নামে কি আসে যায়। এই নিছক অনুমানের ভিত্তিতে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারা যায়, পাদরি Dallএর প্ররোচনা ও অর্থানুকূল্যে কেন R. D. H. তাঁর সঙ্গে বিলাত যাত্রায় সম্মত হয়েছিলেন।

বিলাতে গিয়ে R. D. H.এর মোহভঙ্গ হতে যে বিলম্ব হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিতেই। Dallএর দেওয়া শেষ পাইটুকু শোধ দিয়ে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ১৮৬১ অব্দের ২ জুন তারিখে লণ্ডন থেকে তিনি বন্ধু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, 'কপালে যাহা থাকুক, আমি খ্রীষ্টান ধর্মের নিমিত্ত এখানে আসি নাই। সাংসারিক বিষয় শিখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব এই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।' সে যাই হোক, আমাদের এই নিবন্ধের দিক থেকে এই প্রসঙ্গ অবান্তর বলে আমরা ডায়েরির রামমোহন-জিজ্ঞাসা অংশগুলির প্রতিই দৃষ্টি দিতে চাই। ডায়েরি পাঠে দেখা যায়, R. D. H.এর মুখ্য আগ্রহ ছিল বিলাতের একেশ্বরবাদী ও মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও রামমোহনের বিষয়ে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা।

১৮৬১ অব্দের ১১ এপ্রিল তারিখে 'নেমেসিস্' স্টিমার থেকে R. D. H. সুয়েজের পথে বিলাত যান। তাঁকে বিদায় দিতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনিই সম্ভবত পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথের কন্যা শরৎকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।*৪ বিলাত যাবার পথে এবং বিলাতে থাকতে এই যদুনাথের সঙ্গে R. D. H.এর নিয়মিত পত্রব্যবহার ছিল। সিংহল থেকে ১৮ এপ্রিল তারিখের চিঠিতে লিখলেন:—'পিতাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে ও তাঁহাকে বলিবে পরমেশ্বর আমার রক্ষক ও সহায়ক রূপে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন: আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন কদাচন। পরমেশ্বর তাঁহাকেও নিয়ত রক্ষা করুন।'

১৮৬১ অব্দের ২১ মে তারিখে তিনি বিলাতে পা দেন। অব্যবহিত পরেই যে সব ইংরেজ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকে পত্রব্যবহার ছিল (যথা চ্যানিং, টেইলর, মার্টিনো) তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরের দিন আইলিংটন্ স্কুলঘরে তিনি হিন্দু শাস্ত্রে একেশ্বরবাদ ও রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

২৮ মে তারিখে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন*৫ ও তাঁর স্ত্রীর (রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) সঙ্গে তাঁদের কেনসিংটন্‌স্থিত বাড়িতে R. D. H. দেখা করেন। সে সময় জ্ঞানেন্দ্র-মোহন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে বাংলাভাষা ও হিন্দু আইনের অধ্যাপক।

১২ জুন তারিখে R.D.H. অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমূলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।*৬

১৬ জুন তারিখে লণ্ডন থেকে রেলযোগে R. D. H. ব্রিস্টল গেলেন। এই ব্রিস্টল যাত্রা অংশের অনুবাদ দেওয়া হল:

১৬ জুন। সকাল আটটায় রেলযোগে ব্রিস্টলের পথে রওনা হওয়া গেল। আজ আমি তীর্থযাত্রী—চলেছি রামমোহনের সমাধি দেখতে। পথে যেতে সুন্দর গ্রামাঞ্চল চোখে পড়ল—একেবারে যেন নদীর উপত্যকার মতো দেখতে। ট্রেন থেকে পলকের

জল বাথ্ শহরটা নজরে এল—বোঝা গেল কেন এই শহরকে অনেকে সুন্দর সুঠাম প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে তুলনা করেন। ব্রিস্টল পৌঁছলাম বিকেল দুটোয়—লণ্ডন থেকে দূরত্ব ১১৮ ১/২ মাইল। ঘোড়াগাড়ি চেপে মিসেস চাম্পিয়নের বাড়ি। শোনা যায় কবি জেমস্ মন্ট্গোমেরি এবং আরো বহুখ্যাতনামা ব্যক্তি এঁর বন্ধুস্থানীয়। এলিজা জেন ও সারা নামধেয় পরিচারিকাযুগল বাড়ির গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে বিদেশী অতিথিকে স্বাগত করার জন্য ঔৎসুক্যে অধীর। গেটের কাছে গাড়ি থামতেই তারা দ্রুত পায়ে আমার কাছে চলে এল। আমার পূর্বে আরো যে একজন ভারতীয়—জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলি—এবাড়িতে উঠেছিলেন, তাঁর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করল একজন, একজন আমার পোর্টমেন্টোটি বহন করে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতর। বেশ ঘরোয়া পরিবেশ। রেভাঃ জেমস আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানি দেখিয়ে দিলেন। হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসলাম। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য মিসেস চাম্পিয়ন নেমে আসতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে দেখা হল একেবারে ডিনার টেবিলে। মাতৃসমা মহিলা, আমায় এমন ভাবে স্বাগত করলেন যেন আমি তাঁর নিজের সন্তান। এরকম আন্তরিকতা কদাচিৎ দেখা যায়। এখানে দিন বেশ লম্বা, সূর্যাস্ত হয় ন'টার পরে। তাই ডিনার সেরে আমি পায়ে হেঁটে শহরের দিকে রওনা দিলাম—মজুরদের এক সভার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। বক্তৃতার পর মিস কার্পেন্টারের *৭ 'রেড্ লজ' বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমায় স্বাগত করলেন। রামমোহনের ও তাঁর নিজের ফোটোগ্রাফ উপহার দিলেন আর দিলেন কিছু বই। সন্ধ্যায় ক্লিফ্টন ফিরে গিয়ে মিঃ ব্রাউনের বিরাট বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সন্ধ্যাটা ভালোই কাটল—তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ও শাশুড়ী।

স্টেপল্টন গ্রোভ্
রামমোহন রায়ের সমাধি

১৭ জুন। প্রাতরাশের পর মিসেস্ ব্রাউন ও তাঁর মা তাঁদের ফীটন যোগে এসে পড়লেন। রেভাঃ মিঃ জেমস্ ও আমি সেই ফীটনে চেপে মিস এস্টলিনের আবাস-অভিমুখে রওনা হলাম। রামমোহনের শেষ অসুখের সময় যে ডাক্তার এস্টলিন তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন ইনি তাঁরই মেয়ে। অপর যে চিকিৎসক ছিলেন শেষ সময়ে, Physical History of Mankind গ্রন্থের লেখক ডঃ প্রিচার্ড্ এঁদের আত্মীয়। শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ অব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রামমোহনের মুখমণ্ডলের একটি যে ছাঁচ নেওয়া হয়েছিল সেটি মিস্ এস্টলিন আমায় দেখালেন। আর দেখালেন রাজার মাথার শাল-পাগড়ি। মিসেস ব্রাউন সেটি আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। লাল রঙের শাল আলোয়ান ও হাসিয়া দিয়ে মোড়া প্রকাণ্ড পাগড়ি, ওজনেও বেশ ভারি। ভিতর দিকের বেষ্টনী দেখে মনে হল, রাজার মাথায় তেলে তৈলাক্ত। মাথার পরিধি নিশ্চয় আমার মাথার পরিধি থেকে ইঞ্চিখানেক বড় ছিল। অথচ আমার মাথার বেড় কিছু কম নয়, টুপির দোকানে সচরাচর আমার মাথার মাপে টুপি সহজে পাওয়া যায় না, প্রায়ই মাপে ছোট হয়।*৮ অতঃপর আমরা গাড়ি চেপে স্টেপলটন গ্রোভে গেলাম। মিস কাসেলের অতিথি হয়ে ১৮৩৩ অব্দের শরৎকালে রামমোহন এই বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। অতি রমণীয় জায়গা এই স্টেপলটন গ্রোভ—দেখে মনে হল স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে রাজা স্বর্গারোহণ করেছেন। যে ঘরে আমার প্রখ্যাত স্বদেশবাসী তাঁর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেই ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। জানালার বাইরে মনোমুগ্ধকর নিসর্গ শোভা। অন্তিম সময়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং আজো যাঁরা জীবিত রয়েছেন তাঁদের মুখে শোনা বর্ণনার ভিত্তিতে আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম: ২৭ সেপ্টেম্বরে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত শান্ত রাত্রি, আবাল্য যে দেশে প্রতিপালিত সে-দেশ থেকে বহু দূরে তিনি শেষ শয্যায়

শয়ান, মৃত্যু-শয্যার আশে পাশে রয়েছেন যাঁরা—কেউ তাঁর আত্মীয়পরিজন নন, ডঃ প্রিচার্ডের মতো বিচক্ষণ চিকিৎসকেরাও তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেছেন, (আমাদের অতি-পরিচিত ডেভিডের ভগ্নী অথবা ভাইঝি) মিস্ কেয়ার*৯ মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন; রামমোহনের পালিত পুত্র রাজারাম একপ্রকার হতচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন...। এই সব কল্পিত ছবি মানসপটে ভেসে উঠতেই চোখ আমার জলে ভরে এল। অতঃপর*১০ মরদেহ সমাধিস্থ হবার স্থানটি দেখতে গেলাম। ডঃ ল্যাণ্ট কারপেন্টরের কথায় এ-স্থানটি তৃণাচ্ছাদিত উদ্যানের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এল্‌ম্ গাছের ছায়ায় নিচে অবস্থিত একটি বিতান। সেই সঙ্গেই মিস্ অকল্যাণ্ড লিখিত কবিতার নিম্নলিখিত ছত্রগুলি আমার স্মরণে এল:—এই সেই ঠাঁই, এখানে

> পাথর খুদে স্মারক লেখার প্রয়োজন নেই। একমেবাদ্বিতীয় এই নির্জন সমাধির উপর কোনো স্তম্ভ রচিত হয়নি। কেবল ছায়াঘন এলম্ গাছের বিনম্র শাখা পবিত্র অন্ধকারে আচ্ছাদন করে রেখেছে রাজার শীতল মরদেহ। যেদিন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পিতৃভূমির আকাশে পুণ্যের সূর্য উদিত হবে, সকল দুরিত দূর করবে অরুণ কিরণ, যেদিন ভারতসন্তানেরা রাজার মধ্যাহ্নদীপ্ত পূর্ণ প্রাণের পরিচয় লাভ করবে, ব্রহ্মানুভূতির একসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে,—সেদিন হয়তো সেই সন্তানেরা এই স্থানে আসবে তীর্থযাত্রীর মতো, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় উদ্দীপ্ত হয়ে সন্ধান করে নেবে এই পবিত্র ঠাঁই, এই মাটি সিক্ত করবে তাদের আনন্দ বিষাদের শিশিরাশ্রু দিয়ে, কারণ, এ সেই ঠাঁই যেখানে তাদের দেশ ও জাতির পরম মিত্র ও প্রবক্তা তাঁর শেষ শয্যায় শয়ান রয়েছেন।

২৭ জুন ১৮৬১ তারিখে লণ্ডনে ফিরে এসে R.D.H. মিঃ ম্যাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শুনেছিলেন এঁর একেশ্বরবাদী মন্দিরে রামমোহন নিয়মিত ভগবৎ উপাসনায় যোগ দিতেন।

ওই বছরেই ৬ আগষ্ট তারিখে রেভাঃ উইলিয়ম এডামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কলকাতায় থাকতে এডামের সঙ্গে রামমোহনের গভীর বন্ধুতা হয়েছিল। এককালে এঁর আশা ছিল রাজাকে ইনি ধর্মান্তর গ্রহণে সম্মত করাতে পারবেন। বাইবেলের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে মতভেদ হওয়ায় সম্বন্ধে চিড় দেখা দেয়, কিন্তু এডাম আজীবন রামমোহনের গুণগ্রাহী অনুরাগী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর ইনি আমেরিকার বস্টন শহরে ১৮৪৫ অব্দে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Life and Labours of Rammohun Roy। দেশে ফিরে আসার পর R. D. H. নিজের সম্পাদনায়, নিজের খরচে এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ১৮৭৯ অব্দে। ১৮৮১ অব্দে এডামের মৃত্যু হয়। তাঁর ভাইঝি মিস হেলেন এডামের (পরে মিসেস উইথল) সঙ্গে R.D.H.এর বন্ধুতা বজায় ছিল আজীবন। সোফিয়া কলেট ১৮৮২ অব্দে R.D.H.কে যে চিঠি লেখেন তা থেকে জানা যায়, রাজার জীবনীর জন্য তথ্য সংকলনে হেলেন তাঁকে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন।

৬ অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে এইচ সি রবিনসনের বাড়িতে R. D. H.-এর সঙ্গে ডঃ বুট্ ও প্রফেসর বীসলির পরিচয় হয়। বীসলি ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর ও 'পজিটিভিস্ট রিভিয়ু' কাগজের সম্পাদক। ডঃ বুট্ রাজাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন বলে তাঁর বিষয়ে অনেক কথা বলেন। বুট বরাবরই রাজাকে ঈশ্বরবিশ্বাসী রূপে দেখেছেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিধান মেনে চলতেন, স্বদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস অথবা সংস্কারে আঘাত দিতে চান নি বলে জাত তিনি অমান্য করেননি,উপবীতও ত্যাগ করেন নি— যদিচ নিছক সংস্কার ছাড়া এ সবের অন্য উপযোগিতা তিনি স্বীকার করতেন না। তাঁর আচারবিচার নিয়ে যাতে নিন্দাকুৎসার রটনা না হয় সেই উদ্দেশ্যে সঙ্গে দু-জন হিন্দু অনুচর এনেছিলেন*১১। একবার তিনি নাকি লণ্ডনের বিশপকে বলেছিলেন যে খ্রীষ্টধর্মের বিষয়ে শুনতে জানতে শিখতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত কিন্তু যত দিন না প্রমাণ হয় তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসে ভুলত্রুটি রয়ে

গেছে, ততদিন তিনি তাঁর সহজ সরল বেদান্তপ্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। স্কচ্ মিশনারীদের কেউ কেউ সতীদাহ নিবারণে রাজার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। কিন্তু এঁদেরই একজন যখন রাজাকে ডিনারে আমন্ত্রণ করেন, বুটের বাড়ি না গিয়ে তিনি সেই স্কচ্ প্রতিপক্ষের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। বুট্‌কে তখন বলেছিলেন, মিত্রের শিষ্টাচারকে যতটা মূল্য তিনি দেন তার অধিক মূল্য দেন শত্রুপক্ষের শিষ্টাচারকে। ডিম খেতে তিনি খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু একই পাত্র থেকে পর পর দুটি ডিম খেতে তিনি চাইতেন না—উচ্ছিষ্ট দোষের ভয়ে। একটা সময় ভারতের রায়ত-সাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য পার্লামেন্টে তাঁর ডাক পড়েছিল। নিছক সরকারী এত্তেলার জোরে পার্লামেন্টে হাজিরা দেওয়া তাঁর মনঃপূত হয়নি। বলেছিলেন, এ নিয়ে যদি জোর-জবরদস্তি করা হয়, তিনি ফ্রান্সে চলে যাবেন বলে কৃতসংকল্প। অবশেষে পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্য তাঁর বাড়ি এসে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, সে-বছর (১৮৩১), কোম্পানী শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে কি না বিবেচনার জন্য যে সিলেকট কমিটি গঠিত হয়েছে তাঁরা সেই কমিটিরই সদস্য। সুতরাং রামমোহন যদি তাঁর সাক্ষ্যে প্রকৃত তথ্যাবলী উপস্থিত করেন, কমিটি তদনুসারে পার্লামেন্টের কাছে তাঁদের বক্তব্য ও সুপারিশ পেশ করবেন। রাজা তখন বাংলার রায়তদের দুরবস্থা নিয়ে একটি পুস্তিকা লেখেন, উপরন্তু একাধিক পত্রে সিলেকট কমিটির সদস্যদের অবগতির জন্য বহু তথ্য সরবরাহ করেন। সেগুলি তখন পার্লামেন্টের ব্লু-বুকে ছাপা হয়; পরে সমস্ত লেখা একত্র করে রামমোহন একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, নাম দেন Exposition of the Practical Operations of the Judicial and Revenue Systems of India। ডঃ বুট্ আরো বলেন, ইংলণ্ডের রিফর্ম বিল পাশ হয় কি না হয় তা নিয়ে রামমোহনের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। তিনি বলতেন ইংরেজরা যদি নিজেদের দেশে সুশাসনের ব্যবস্থা করতে না পারেন, ভারতের লোককে সুশাসনে রাখবেন কী উপায়ে? রিফর্ম বিল কী ভাবে কতখানি এগোচ্ছে সে-বিষয়ে নিয়ত খোঁজখবর নেবার জন্য সকল ব্যবস্থা সারা হলেও তিনি তাঁর স্কটলণ্ড যাত্রা স্থগিত রেখেছিলেন। প্রথম দিকে রামমোহন থাকতেন রিজেন্ট পার্কের সন্নিহিত অভিজাত পল্লীতে একটি সুরম্য অট্টালিকায়, পরে তিনি উঠে যান বেডফোর্ড স্কোয়ারে তাঁর নিকট বন্ধু ডেভিডের ভাই জন্ হেয়ারের বাসভবনে। পরিশেষে বুট বলেন, সব কিছু জড়িয়ে যদি বিচার করতে হয় তাহলে তিনি বলবেন তাঁর দেখা সকল মানুষের মধ্যে রাজা ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পরের বছর (১৮৬২) ২২ এপ্রিলে R. D. H. গেলেন তাঁর সতীর্থ (তিনি তখন লণ্ডনের য়ুনিভার্সিটি কলেজে আইন পড়েন এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা পড়ান) এডওয়ার্ড এস. হাউজের আমন্ত্রণক্রমে তাঁদের রীডিং শহরের বাড়িতে ইষ্টারের ছুটি যাপন করতে। হাউজ পরবর্তী জীবনে পাদরি হয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িতে নানা দেশের ধর্ম বিষয়ক বিস্তর গ্রন্থের একটি লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরিতে R. D. H. রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। ডায়েরিতে লেখেন, দেশের মহৎ জীবন কিংবা মহৎ ঘটনা সম্পর্কে দেশের লোকের নিরুৎসাহ ঔদাসীন্য বড়ই শোচনীয় ও গ্লানিকর। বলেন, ভারত কিংবা ভারতীয়দের বিষয়ে বহু তথ্য ভারতে বসে পাওয়া যায় না, বিলাতে এসে সন্ধান করে নিতে হয়—এটা খুবই দুঃখের কথা।

২ মে তারিখে লণ্ডন ফিরে R. D. H. খবর পেলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ বিলাতে এসে পড়েছেন। দু'দিন পরে তাঁদের বাসস্থানে গিয়ে অভ্যাগতদের তিনি স্বাগত জানিয়ে এলেন।

২৫ মে তারিখে এডামের বাড়ি গিয়ে তাঁর মুখেই রামমোহনের উপর লিখিত বক্তৃতা শুনে এলেন ও বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে এলেন এদেশে প্রকাশের জন্য। ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে অন্যত্র।

সারা জুন মাসটা কাটল দেশে ফেরার তোড়জোড় করতে। ১৮৬২ অব্দের ১৯ জুন তারিখে যদুনাথকে

লিখলেন, ঢাক ঢোল না পিটিয়ে চুপি চুপি তিনি দেশে ফিরতে চান। ঠাট্টা করে বললেন তাঁর প্রত্যাবর্তনটা হবে রামমোহনের এংলো-হিন্দু স্কুলের সেই 'ভালো ছেলেটির' মতো—যে নাকি স্কুলকর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে এক নাগাড়ে তিনটি বছর বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে, একদিন তার আগের ক্লাসের অভ্যস্ত জায়গায় অম্লান বদনে ফিরে এসে বসেছিল—ভাবনা এমন যেন কিছুই হয়নি।

২১ জুন কোলোসিয়াম্ গিয়ে R. D. H. দ্বারকানাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি দেখে এলেন।

২৬ জুন তারিখে উইলিয়ম্ রস্কোর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে R.D.H. সাক্ষাৎ করেন। বিলাতে পা দেবার পর সর্বপ্রথম যে বিশিষ্ট ইংরেজের সঙ্গে রাজার দেখা হয় তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও মৃত্যুপথযাত্রী রস্কো।

৩০ জুন এডামের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা।

২ জুলাই তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং ৪ জুলাই সাদামটনে জাহাজ ধরলেন ভারতের পথে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন ১৮৬২ অব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে। বৃদ্ধ বেচারাম ভান করলেন যেন ছেলের প্রত্যাগমন তিনি দেখেও দেখেন নি।

দেশে ফেরার পরেও R.D.H.-এর রামমোহন জিজ্ঞাসা অব্যাহত ছিল। ১৮৬৩ অব্দের জানুয়ারী মাসে রামমোহনের সাক্ষাৎ শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের*১২ সঙ্গে সাক্ষাৎক্রমে রাজার বিষয়ে অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তার কিছুটা ছিল সত্য ঘটনা, কিছু কিংবদন্তী। ১৮৬৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে বর্ধমানে গিয়ে রাজার খাস চাকর রামহরি দাসের সঙ্গে আলাপ ক্রমে R.D.H. রাজার দিনচর্য্যার একটি ফিরিস্তি সংগ্রহ করেছিলেন। অকিঞ্চিৎকর হলেও সে-ছবি হয়তো অনেকের আগ্রহ উদ্রেক করবে :

> ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগ করে রাজা কফি পান করতেন। অতঃপর কতিপয় অনুচর সহ প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতেন। সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরে এসে শৌচাদি কর্ম্ম সারতেন। সেই সময় গোলক দাস নাপিত তাঁকে সেই দিনের খবর কাগজ পড়ে শোনাত। অতঃপর প্রাতরাশ সেরে তিনি ব্যায়ামাদি করতেন। ব্যায়ামের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে চিঠিপত্র নিয়ে বসতেন। তারপর স্নানের পালা। ভাত খেতেন দশটায়—সে সময়েও আরেক দফা তাঁকে খবর কাগজ পড়িয়ে শোনানো হত। আহারের পর খালি তক্তপোশের উপর ঘণ্টাখানেক নিদ্রা যেতেন। ঘুম থেকে উঠে হয় গল্পগুজব করতেন, নয় তো বন্ধুবান্ধবের বাড়ি বেড়াতে যেতেন। বিকেল তিনটায় সময় জলখাবার, পাঁচটায় মরসুমী ফল ও মেওয়া খেয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোতেন। নৈশ ভোজন হত রাত দশটায়। তারপর রাত দুপুর অবধি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলত। শুতে যাবার আগে জল খাবারের সময় যে-কেক্ খেতেন তারই কয়েক টুকরো মুখে দিতেন। এই কেক্ ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়, তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'হালিলা'। লিখতে যখন বসতেন, ধারে কাছে কেউ যেতে পেত না—সুতরাং কখন যে তিনি লিখতেন কেউ তা জানত না।* ১৩

R.D.H. দুই দেশ থেকেই প্রচুর প্রামাণ্য তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করেছিলেন। রামমোহনের জীবনীকার সোফিয়া কলেট্‌কে কিছু কিছু তথ্য সরবরাহও করে-ছিলেন। বাসনা ছিল, তিনি স্বয়ং রামমোহনের জীবনী লিখবেন। দেশে ফেরার পর সরকারের অধীনে গুরুদায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়ত ব্যস্ত থাকায় এবং ১৮৮৭ অব্দে তাঁর অকাল বিয়োগের ফলে, সে ইচ্ছা আর কার্যে পরিণত করে যেতে পারেন নি। রামমোহন-জিজ্ঞাসার দিক থেকে এই মৃত্যু প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তদপেক্ষা শোচনীয় এই যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সুকুমারের সংগ্রহ থেকে এইসব সযত্ন-রক্ষিত মহামূল্য সামগ্রী ১৮৯৬ অব্দে চুরি হয়ে যায়। সে-সময় সুকুমার হালদার বর্ধমানে সরকারী চাকুরীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুড়িয়ে বাড়িয়ে অবশিষ্ট যা-কিছু পেয়েছিলেন তার বেশির ভাগ তিনি সাহিত্য পরিষদে দান করে-ছিলেন, কিছু হয় তো ছিল রাঁচি সামলং কার্শে হালদার

বাড়ির রাখালদাস মেমোরিয়েল লাইব্রেরিতে। সুকুমার হালদার আর ইহজগতে নেই, তাঁর পুত্র অসিতকুমারও পরলোকে। জানা যায় না মেমোরিয়েল লাইব্রেরির অমূল্য সংগ্রহের এখন কি অবস্থা।

পরবর্তী জীবনে ছোটনাগপুর অঞ্চলে মিশনারিদের কাণ্ডকারখানা দেখে R.D.H. খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ব্রাহ্মদের বিষয়েও বিদ্রূপ করে একদা তিনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ কোনো কালে হ্রাস পেয়েছিল বলে শোনা যায় না।

১ R. D. H.-এর The English Diary of an Indian Student: 1861-62 (প্রকাশ ১৯০৩) পুস্তকের ভূমিকায় হরিনাথ দে একটি চমৎকার চরিত্রচিত্র তুলে ধরেছেন।

২ Reverend C. H. A. Dall ছিলেন একজন আমেরিকান মিশনারি। খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করার জন্য ইনি কলকাতায় এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে R. D. H.-এর পরিচয় হয় ১৮৫৫ অব্দে। সম্প্রতি রামমোহনের জন্মতারিখ প্রসঙ্গে Rev. Dall-এর কথা বিশেষভাবে শোনা গেছে। ১৮৮০ অব্দে তিনি খবর কাগজে একটি বিবৃতিসূত্রে জানান যে, ১৮৫৮ অব্দে রামপ্রসাদ রায়ের বাড়িতে উপস্থিত থাকা কালে, তিনি রামমোহনের এই কনিষ্ঠপুত্রের মুখে শুনেছিলেন যে তাঁর পিতা কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগরে ১৭৭২ অব্দের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

৩ দ্রষ্টব্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্টাংশ।

৪ আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে যদুনাথের কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে R.D.H.-এর জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার হালদারের বিবাহ হয়েছিল। অসিতকুমার হালদার এঁদের পুত্র।

৫ মিস কলেট্-এর রামমোহন জীবনীর জন্য ইনি রামমোহনের দিনচর্যা বিষয়ে একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন, পিতার কাছ থেকে শোনা গল্পের ভিত্তিতে।

৬ তাঁর Biographical Essays (1884) গ্রন্থে ম্যাক্সমূলর রামমোহন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

৭ Last Days in England of Raja Rammohun Roy গ্রন্থের লেখিকা, Mary Carpenter এঁর পিতা Lant Carpenter ও ইনি মৃত্যুকালে রামমোহনের পরিচর্যা করেছিলেন। পরে ইনি ভারতে আসেন। এঁর বইয়ে R.D.H.-এর উল্লেখ আছে।

৮ R.D.H.এর পুত্র সুকুমার হালদার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর পিতার সংগৃহীত রামমোহন স্মারণিক সম্ভার দান করেছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবত সেই সব সামগ্রীর অন্যতম হবে রাজার মাথার এক গুচ্ছ চুল। মাথার যন্ত্রণায় রাজা যখন কাতর, তখন তাঁর বাবরি চুলের কিছুটা ছেঁটে রেখে দেওয়া হয়। তা থেকে একটি গুচ্ছ মিস এস্ট্লিন R.D.H.কে দিয়েছিলেন।

৯ দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবার পর রামমোহন হেয়ার পরিবারের হেফাজতে থাকতেন তাঁদের লণ্ডনস্থিত বেডফোর্ড স্কোয়ার বাড়িতে। বিলাতে রাজার সমস্ত কাগজপত্র এই বাড়িতেই থাকার সম্ভাবনা হেতু R.D.H. হয়তো এঁদের বাড়ি থেকে রামমোহন স্মরণ সম্ভার কিছু সংগ্রহ করে থাকতে পারেন। অন্তত এই অনুমানের বশবর্তী হয়ে সোফিয়া কলেট্ R. D. H.-কে ১৮৮২ অব্দে একটি চিঠি লিখে সেই সব সামগ্রী কিংবা তৎসংক্রান্ত সংবাদ ভিক্ষা করে একটি চিঠি দেন। মূল চিঠি সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে আছে।

১০ রাজার মৃত্যুর পর ইনি একটি বই লেখেন, A Review of the Labours, Opinions and Character of Rajah Rammohun Roy in a discourse on Occasion of Death, Delivered in Lemin's Mead Chapel, Bristol; A Series of Illustrative Extracts from His Writings; And a Biographical Memoir to which is subjoined an Examination of some derogatory statements in the Asiatic Journal, 1833.

১১ এই অনুচরদ্বয়ের নাম সম্ভবত রামরতন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস।

১২ চন্দ্রশেখর দেবই সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদীদের উপাসনার জন্য মন্দির স্থাপনের কথা বলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ সালে) দেবের লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধ Reminiscences of Rammohun Roy প্রকাশিত হয়।

১৩ রামহরি দাসের কথা বলতে গিয়ে R. D. H. লিখেছেন, রাজার নাম শুনলেই এই প্রভুভক্ত ভৃত্যের চোখে জল আসত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়

যোগানন্দ দাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মধ্যযুগীয় সমাজ ও সাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা দেশে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বা জাতীয়তাবোধ ছিল না। কারণ, সে-যুগটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক যুগ,রাজায় রাজায় লড়াইয়ের যুগ, প্রজার কোনো স্বাধীন সত্তা বা মত নেই। সে-সময়ে বাঙালী হিন্দু সমাজের (যাদের মাতৃভাষা বাংলা) প্রধান নিয়ামক ছিল ধর্মের শাসন। সেই জন্য, সে-যুগের বাংলা সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে প্রধানত ধর্মীয় ভাবধারাকে আশ্রয় ক'রে।

সুতরাং সেই যুগের বাংলা সাহিত্যকে বুঝতে গেলে আগে চেনা দরকার সে-যুগের ধর্মীয় মানসকে।

মধ্যযুগের দুটি প্রধান ধর্ম-ধারা ছিল হিন্দু ও মুসলমান। মুসলমান সমাজ বা ধর্মের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তখন পর্যন্ত কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠেনি। সুতরাং মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে এখানে মধ্যযুগের হিন্দু ধর্ম ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাই প্রাসঙ্গিক।

সে-যুগের ধর্ম বলতে প্রধানত বোঝায় (১) বৈষ্ণব ধর্ম, (২) প্রচলিত পৌরাণিক ধর্ম। যেমন শৈব ও শাক্ত, মনসা সম্পর্কিত প্রভৃতি, (৩) মরমিয়া বা 'মিস্টিক্' ধর্ম এবং (৪) সন্ন্যাসীর ধর্ম।

সন্ন্যাসীর ধর্ম বা উদাসীর ধর্ম মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে যায় নি, এক দেহতত্ত্বের গান ছাড়া।

শৈব ধর্ম বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে শিবের গাজন। বাংলা সাহিত্যে শাক্ত ধর্মের দান রামপ্রসাদী। রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীতে প্রচলিত শাক্ত বামাচারী পঞ্চমকারের কাপালিক বা অঘোরপন্থী ছাপ নেই। আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার বাৎসল্য ভাবের প্রভাব, মা-কে নিয়ে ছেলের মান অভিমান আব্দার।

সহজিয়া প্রভৃতি মরমিয়া বা মিস্টিক্ সাহিত্য ছিল গুহ্য ও সঙ্কেতময়। সাধকরাই কেবল তার মানে বুঝতেন। জনসাধারণের মধ্যে সে-সাহিত্যের কোনো প্রচার ছিল না।

এ ছাড়া ছিল মঙ্গলকাব্য, যেমন মনসামঙ্গল প্রভৃতি; লোকসাহিত্য, যেমন বাউল, ভাটিয়াল, সারিগান, ময়নামতী, পাঁচালী, তরজা বা কবির লড়াই।

সে যুগের প্রধানতম ধর্ম হ'ল ভক্তিধর্ম। ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। মধ্য-যুগের বাংলাদেশে রেনেসাঁস্ বা নবজন্ম এনেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, কারণ ঐ ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বাণী মানবধর্মের অঙ্কুর ('শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই")। গুহ্য মরমিয়া ধর্মেও তার আভাস ছিল।

বাংলা সাহিত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দান শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি, এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি, বৈষ্ণব পদাবলী।

এই বৈষ্ণবধর্মের বা ভক্তিধর্মের লক্ষণ কি? কারণ, ঐ সব লক্ষণই বৈষ্ণব সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

ভক্তিধর্মের লক্ষণ মানে, ভক্তির লক্ষণ। ভক্তি কা'কে বলে বুঝলেই ভক্তিধর্মের স্বরূপ বোঝা যাবে এবং তা থেকে সে যুগের প্রধানতম সাহিত্যের বা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ হবে।

ভক্তি কা'কে বলে ?

ছয় জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্যের মধ্যে দু'জন হলেন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী। ভক্তিধর্মে এই দু'জন আচার্যের প্রামাণ্যই সকলের চেয়ে বড়ো।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর "শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ" গ্রন্থে বলছেন :

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (১।১।১১)*

অর্থাৎ, উত্তমা ভক্তি হ'ল ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন বা কৃষ্ণ-সাধনা। কিভাবে এই কৃষ্ণের অনুশীলণ করতে হবে?—(১) অন্য কোনো অভিলাষ থাকবে না, (২) জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত হতে হবে অর্থাৎ, জ্ঞান ও কর্ম্মকে বর্জন করতে হবে, * এবং (৩) অনুকূল পরিবেশ (অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণ কীর্তন বা কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হয় বা মন যেখানে কৃষ্ণের অনুকূল হয়), অনুকূল সাহচর্যে (অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তদের সংসঙ্গে) ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন বা সাধনা করতে হবে।

আজকের আপোষের যুগে যেমন স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে পৌরাণিক প্রতিমা পূজার একটা আপোষ চলেছে, তেমনি চলেছে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম "সমন্বয়ে" একটা অর্থহীন আপোষ। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির "সমন্বয়" সম্ভব নয় কারণ দুইয়ের সম্পর্ক হ'ল সাপে-নেউলের সম্বন্ধ। খাঁটি ভক্তি জ্ঞান-বর্জিত।

* শ্রীশ্রীল-রূপগোস্বামী-প্রভুপাদ-প্রণীতঃ শ্রীশ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুঃ, শ্রীহরিদাস দাসেন সম্পাদিতঃ, শ্রীমুকুন্দদাস দাসেন প্রকাশিতঃ, শ্রীধাম নবদ্বীপাৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৬২ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৩।

* এখানে 'জ্ঞান' বলতে শাস্ত্র বা 'বিধি' সম্মত ব্রহ্মজ্ঞান চৈতন্যচরিতামৃত দ্রষ্টব্য), এবং কর্ম বলতে যাগ-যজ্ঞাদি দান-প্রতিগ্রহ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বা 'বৈধ' কর্ম। শাস্ত্রবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত ভক্তি হল 'বৈধীভক্তি।' বৈধী ভক্তি অধমাভক্তি, জ্ঞান-কর্ম-বিবর্জিত ভক্তিই উত্তমা ভক্তি।

"শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্" শাস্ত্রবাক্য। জ্ঞান লাভ করতে গেলে মনে শ্রদ্ধার ভাব থাকা দরকার। কিন্তু 'ভক্ত্যা লভতে জ্ঞানম্' অর্থাৎ ভক্তির সাহায্যে জ্ঞানলাভ হয়, একথা কোথাও কোনো শাস্ত্রে নেই। শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক কথা নয়। জ্ঞান লাভ করতে গেলে ভক্তিকে বাদ দিতে হবে, নয়তো ভক্তিসাধন করতে গেলে জ্ঞানকে বাদ দিতে হয়। সোনার বাটি হয়, পাথর বাটি হয়' কিন্তু সোনার পাথর বাটি হয় না।

ভক্তিশাস্ত্র মতে ভক্তি অর্থে জ্ঞানহীন বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাস। সেইজন্য মধ্যযুগের ধর্মীয় লক্ষণ হল "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

মধ্যযুগে য়োরোপের ক্যাথলিক ধর্মেরও লক্ষণ ছিল অন্ধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে তর্ক বা যুক্তি তুলেছে, সে হয়েছে হেরেটিক বা বিধর্মী। তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সমাজের প্রথম লক্ষণ জ্ঞানবিরোধী, বিচার-বিহীন অন্ধ বিশ্বাস। সাহিত্যেও তার ছাপ পড়েছে।

পঞ্চভাবের সাধনা

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ বিচার করতে গেলে ঐ যুগে ধর্মীয় সাধনার কথা আলোচনা করা দরকার, যা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে সেই যুগের সাহিত্যে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা পঞ্চভাবের সাধনা। কৃষ্ণের অনুশীলন করতে গেলে পাঁচ ভাবে সেটা সম্ভব,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্ত। এর মধ্যে প্রথম চারটি "এহ বাহ্য", অর্থাৎ বাইরের জিনিষ। শ্রেষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ সাধনা হ'ল, মধুর বা কান্তভাবের সাধনা,—রাধা-কৃষ্ণের ভাব-সাধনা বা, আসলে, রাধাভাবের সাধনা।

শ্রীচৈতন্য অবতার। কিসের অবতার?—রাধাভাবের অবতার। রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের জন্য তিনি শচীগর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলা)।

রাধাভাবের সাধনা হ'ল নারীভাবের সাধনা। একা কৃষ্ণ পুরুষ, আর সাতকোটি বাঙালী রাধা বা গোপিনী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই পঞ্চভাব বৈষ্ণব সাহিত্যে পঞ্চরস হয়ে দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদাম বসুদামের সখ্যভাবই এবং রাধার সখীদের সখীভাবই সাহিত্যে সখ্যরস রূপে প্রকট হয়েছে। নন্দগোপাল ও যশোদার যে বাৎসল্যভাব তাই সাহিত্যে বাৎসল্য রসরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম—বিরহ মিলন প্রভৃতি বিচিত্রভাবে মধুর বা কান্তরসের অপূর্ব্ব সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে।

কিন্তু মধ্যযুগের এই সব কটি ভাব বা রসই পেলব। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকের যে নব রস, তার মধ্যে রুদ্ররস, বীররস প্রভৃতির দেখা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না। উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সাধনা এর মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু সবটাই রাধাভাবের বা নারীভাবের সাধনা ও সাহিত্য।

পুরুষকার মধ্যযুগের সাহিত্যে কোথাও নেই। একমাত্র মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে কিছু আভাস আছে। কিন্তু সেখানেও সেই সাহিত্যরস কি ভাবে ফুটেছে?

আগাগোড়া শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসা দেবীর লড়াইয়ের কাহিনী। চাঁদ সদাগরকে মনসাপূজা করতেই হবে, চাঁদ সদাগর কিছুতেই তা' করবে না। শেষ পর্যন্ত মনসাপূজা করতে হ'ল।

অর্থাৎ মধ্যযুগীয় চাঁদ সদাগরের কাহিনী হ'ল দৈবশক্তির কাছে পুরুষকারের পরাজয়ের কাহিনী।

সে যুগের সীতারাম প্রভৃতি বারোভূঞা জমিদারের শৌর্যবীর্যের কাহিনীর কোনো প্রতিফলন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নেই।

মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লক্ষণ হ'ল, ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেওয়া 'ব্যবস্থা' অনুসারে অন্ধভাবে আচার পালন।

সুতরাং মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ ও ধর্মের লক্ষণ হ'ল (১) ভক্তিধর্মের যুক্তি ও বিচারহীন, জ্ঞানবর্জিত ভক্তি সাধন বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঐভাবে আচার পালন, (২) নারী ভাবের ও দাস্যভাবের সাধনা এবং (৩) পুরুষকারের পরাজয় (রাষ্ট্রে মুসলমানের কাছে হিন্দুর দাসত্ব)।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও সমাজ ও ধর্মের এই 'মুড্' বা 'স্পিরিট্' প্রতিফলিত হয়েছে।

এই যুগের সাহিত্যের 'চয়েস্ অফ্ ম্যাটার' বা বিষয়-বস্তু নির্বাচন হ'ল: শিবের গাজনে শিব, মনসামঙ্গলে মনসা, চণ্ডীকাব্যে চণ্ডী, শাক্ত সাহিত্যে (রামপ্রসাদ) তারা, বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণ। পাঁচালী, যাত্রা, কথকতার বিষয়বস্তু পৌরাণিক। তরজা বা কবির লড়াই অশ্লীলতা ভরা। মূল বিষয়বস্তু, ধর্ম ও দেবদেবী।

এইবার আমরা আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যের লক্ষণ বিচারে প্রবৃত্ত হব।

ক্রমশঃ

ছেলেদের পাততাড়ি

দান প্রতিদান

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

এক চাষীর তিন ছেলে ছিল। বড়টির নাম লোহারাম, মেজোর নাম উলটারাম, ও ছোটর নাম বুদ্ধুরাম। বুদ্ধুকে নিয়ে সকলে হাসিঠাট্টা করত ও বাড়ীর লোকেরা সকলেই তাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখত।—একদিন বাড়ীতে কাঠ ফুরিয়ে গেছে শুনে বড় ছেলে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবে ঠিক করল।—চাষীবউ তার সঙ্গে পরটা তরকারি তৈরী করে দিল ও কিছু ঠাণ্ডা মিষ্টি সরবৎও দিয়ে দিল।

জঙ্গলে পৌছবামাত্র লোহারামের একটি থুড়থুড়ে বুড়োর সঙ্গে দেখা হলো। বুড়ো বল্লো "ওহে চাষী ভাই, আমাকে কিছু খেতে দাও না। তেষ্টায় মরে যাচ্ছি—ক্ষীদেও বেজায় পেয়েছে।"

লোহারাম বল্লো, "দূর্ দূর্। তোকে আমার খাবারের ভাগ দেব কেন? যাঃ, যাঃ। বিদায় হ!" লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে সে নিজে খেতে বসে গেল।—খাওয়া দাওয়া শেষ করে কুড়ুল খানা তুলে যেই সে এক কোপ বসাতে গেছে একটা গাছের গুঁড়িতে অমনি কুড়ুলটা তার হাতের থেকে খসে গিয়ে তার গায়ের উপর পড়ল। তখন সেই রক্তাক্ত অবস্থায়, সে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হলো।

মেজো ছেলে উলটারাম তার পরদিন কাঠ কাটতে বেরুল। তার মা তাকেও খাবার দাবার গুছিয়ে দিল। জঙ্গলে গিয়ে কিছুদূর এগিয়ে তারও সেই বুড়োটার সঙ্গে দেখা হলো। বুড়ো তারও কাছে খাবার চাইল কিন্তু সেও বিরক্ত হয়ে "বল্লো, আমি কি নিজে না খেয়ে তোমাকে খাওয়াব? যাও যাও, বিদায় হও।" খাওয়া দাওয়া সেরে সে কাঠ কাটতে যেই গিয়েছে অমনি কুড়ুলটা হাতের থেকে ফস্‌কে গিয়ে তার পায়ের ওপর পড়ে পা কেটে গেল। তখন অন্য কাঠুরেরা তাকে কাঁধে করে বাড়ী পৌঁছে দিল।

এবার একমাত্র বুদ্ধুরাম বাকি রইল।—সে তার পরদিন সকালে তার বাবাকে বল্লো, "এবার আমাকে কাঠ কাটতে যেতে দাও জঙ্গলে। 'তার বাপ বল্লো, "দেখো বাবা, তোমার ভাইদের কি অবস্থা হয়েছে। তাছাড়া জানই তো তোমার বুদ্ধি কম। তোমাকে কোন সাহসে জঙ্গলে পাঠাই বল ত?"

বুদ্ধু কিন্তু কিছুতেই কথা শুনলো না। শেষে চাষী অনিচ্ছাসত্বেও তাকে কাঠ কাটতে পাঠাতে রাজী হলো। তার মা রাগ করে তাকে কিছু বাসী খাবার ও টক্ সরবৎ সঙ্গে দিয়ে দিল। বুদ্ধু এই নিয়েই খুসি হয়ে জঙ্গলের পথে রওনা হলো।—কিছু দূর যেতেই সেই বেঁটে বুড়োটা তার পথ আগলে দাঁড়াল। তারপর তার খাবারের দিকে তাকিয়ে বল্লো, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে—কিছু খেতে দেবে?"

বুদ্ধুরাম বল্লো, "এখানে এসে বসো। আমার সঙ্গে কিছু বাসী খাবার আছে, তার ভাগ চাও তো নিশ্চয় দেব।—আর সরবৎটাও টক্, তাও দিতে পারি।" দু'জনে রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় বসে খাবারগুলি বার করল। কি আশ্চর্য্য, কোথায় সেই বাসী খাবার-গুলি গেল? তার বদলে চমৎকার খাস্তা কচুরি আর তরকারি কলাপাতায় মোড়া আছে। এমন কি সরবৎটাও ঠাণ্ডা ও মিষ্টি হয়ে গেছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বুড়োটা বল্লো—"তোমার কাছে আমি এত উপকার পেলাম যে এর বদলে আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই। ওই যে দূরে ওই পুরনো গাছটা দেখছ, ওটাকে কেটে ফেল। ওর গুঁড়ির ভিতরে কিছু গুপ্ত ধন পাবে।"—

বুদ্ধু দৌড়ে গিয়ে সেই গাছটায় কুড়ুলটা বসাতেই একটা সোনার হাঁস গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকে উড়ে বেরিয়ে এলো।—বুদ্ধু সেটাকে তুলে নিয়ে কাছেই একটি ছোট সরাইখানায় গিয়ে উঠল ও সেখানেই রাত কাটাবে ঠিক করল।—সরাইখানার মালিকের তিনটি মেয়ে—এরা সোনার হাঁসটি দেখে তার পালকগুলি নেবার লোভে বুদ্ধুর ঘরের সামনে ও আশেপাশে ঘোরা-ঘুরি করতে লাগল।—

বড় মেয়েটি ভাবল—"লোকটা দেখছি ঘরের বাইরে গেছে—এইবার ক'টা পালক নিয়ে আসা যাবে।" ভিতরে গিয়ে যেই না সে হাঁসের ডানা ধরেছে অমনি তার হাত সেখানে আটকে গেল। কিছুতেই সে হাত ছাড়াতে পারল না।

অল্পক্ষণ পর মেজো বোন ঘরে ঢুকল। দিদির অবস্থা দেখে সে তাকে ছাড়াতে গেল কিন্তু গায়ে হাত দেওয়া মাত্র সেও দিদির পিছনে আটকে গেল ও কিছুতেই হাত ছাড়াতে পারল না।

আধঘণ্টা পর ছোট বোন পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল পালক সরাতে।—বাকি দুই বোন চিৎকার করে উঠল—"আসিস্ না এখানে—সাবধান! পালা পালা!" কিন্তু সে ভাবল, "বা রে বা, এরা নিশ্চয় আমাকে পালকের ভাগ দিতে চায় না বলে এরকম করছে।" এই না ভেবে সে আরও আগ্রহ করে এগিয়ে এসে তাদের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এরপর তিনজনেই হাঁসের গায়ে আট্‌কে রইল সারা রাত।

পরদিন ভোরে বুদ্ধুরাম ঘরে ঢুকেই কোনদিকে না তাকিয়ে হাঁসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।—তিনটি মেয়ে হাঁসের সঙ্গে চলেছে সে বিষয় তার কোন খেয়ালই নেই। তারা ওর সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে চল্লো। যেতে যেতে একটা ধান ক্ষেতের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেছে এমন সময় গাঁয়ের বড় মোড়ল তাদের এইভাবে যেতে দেখে চিৎকার করতে আরম্ভ করল—

"বলি তোমরা কি সব লজ্জার মাথা খেয়েছ? তিনজনে মিলে একটা ছেলের পিছনে দৌড়চ্ছো কেন? থামো থামো"—বলতে বলতে সে ছোট মেয়েটার হাত ধরে টানতে শুরু করল। কিন্তু তাকে তো ছাড়াতে পারলই না বরং উলটে সেও গেল মেয়েগুলির সঙ্গে আটকে ও তাদের সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে চলতে লাগল।

একটু এগিয়ে গিয়েই তাদের ছোট মোড়লের সঙ্গে দেখা হলো।—সে বড় মোড়লের খোঁজে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বুদ্ধুরামের পিছনে এতগুলি লোক দেখে সে চেঁচাতে শুরু করল, ও বড় মোড়ল মশাই। বলি কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? এদিকে মোড়ল গিন্নি তোমার খোঁজে আমাকে চারদিকে দৌড়োদৌড়ি করাচ্ছে আর তুমি কিনা তিনটে মেয়ের আঁচল ধরে ছুটোছুটি করছ। ছিঃ ছিঃ।' এতেও যখন মোড়ল মুখ ফিরিয়ে দেখল না তখন সে দৌড়ে গিয়ে মোড়লের কাপড় ধরে টানতে শুরু করল। এরপর সেও গেল ঐ দলের সঙ্গে আট্‌কে।—

এইভাবে যেতে যেতে তাদের দু'টো চাষীর সঙ্গে দেখা হলো। দুই মোড়লে চিৎকার করে তাদের ডাকতে লাগল, "বাঁচাও, বাঁচাও, শিগগির এসে আমাদের বাঁচাও এই যাদুকরের দলের হাত থেকে"। কিন্তু হায়, তারা যেই না মোড়লদের গায়ে হাত দিয়েছে অমনি

তারাও গেল আট্‌কে আর এরপর সাতজন লোক বুদ্ধুরাম ও তার হাঁসের সঙ্গে চলতে লাগল।

বেশ কিছুদূর গিয়ে তারা একটা শহরে এসে পৌঁছল। সেখানের রাজকন্যা জন্ম অবধি কখনও হাসে নি। সেই জন্য রাজামশাই জাহির করেছিলেন যে, রাজকন্যাকে যে হাসাতে পারবে, তার সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। বুদ্ধুরাম শহরে ঢুকেই এই কথা শুনে তার দলবল নিয়ে রাজকন্যার সমুখে উপস্থিত হলো।—রাজকন্যা এই সাতজন লোকের অবস্থা দেখে এত জোরে হাসতে শুরু করল যে কেউ তাকে থামাতে পারল না।

কিন্তু রাজামশাই কথা রাখতে রাজি হলেন না। বুদ্ধুরামের মত বোকা ছেলেকে তিনি জামাই করতে চাইলেন না। কাজেই প্রথমে নানা প্রকার আপত্তি করে তারপর বল্লেন—।

"বেশ তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবো রাজকন্যার যদি তুমি বা তোমার কোন বন্ধু দশ হাজার পিপে সরবৎ খেতে পার।"

বুদ্ধুর মাথায় বাজ পড়ল। এ কি সম্ভব কোন মানুষের পক্ষে? মনের দুঃখে সে আবার জঙ্গলে ফিরে গেল।—যে গাছের থেকে সোনার হাঁস বেরিয়েছিল সেইখানে যেতেই দেখল যে' সেই বুড়োটা গাছের নিচে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছে।—তার কি হয়েছে জিজ্ঞেস করার দে বুদ্ধুকে বল্লো, "আমার অসম্ভব তেষ্টা পেয়েছে। কিছুতেই এ তেষ্টা মিটছে না। ঠাণ্ডা জলও আমার সহ্য হয় না। একটা পিপে ভরা সরবৎ খেয়েও এ তেষ্টা মিটল না।—কি করি বল ত?"

বুদ্ধুরাম বল্লো, "আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেই তোমার তেষ্টা মিট্‌তে বাধ্য হবে।—" রাজবাড়ীতে গিয়েই সেই সরবতের পিপেগুলি দেখেই বুড়োটা সরবৎ খেতে শুরু করে দিল। এক একটা পিপে শেষ করে সেগুলিকে বাইরে ফেলতে লাগল। বুদ্ধুরাম হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগল। সারাদিন এইভাবে সরবৎ খেয়ে সন্ধ্যেবেলায় সব পিপে সে খালি করে দিল।

বুদ্ধুরাম নাচতে নাচতে রাজার কাছে গেল বিয়ের কথা তুলতে। কিন্তু রাজামশাই তখনও মত দিলেন না। তিনি এবার বল্লেন, "তোমার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেব যদি তুমি এমন কোন লোক আনতে পার যে ওই স্তূপাকৃত রুটিগুলি সব একদিনে খেতে পারে।"

বেচারা বুদ্ধু আবার জঙ্গলে গিয়ে সেই গাছতলায় হতাশ হয়ে বসে রইল। কিছু দূরে দেখল, একটা লোক হাত-পা মুড়ে বসে আছে, তার শরীর মোটা মোটা দড়ি জড়িয়ে বাঁধা। বুদ্ধুকে সে বল্লো, আমার নাম আষ্টেপৃষ্ঠে, ওই দোকানের যত পাঁউরুটী ছিল সব খেয়েছি কিন্তু আমার এই প্রচণ্ড কিদে কিছুতেই মিটছে না। আপাতত পেট বেঁধে বসে যাতে আছি কিদের যন্ত্রণা কিছুটা কমে।'

বুদ্ধু ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লো'—

"ওঠো হে ওঠো। আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যে সেখানে তোমার যত ইচ্ছে তুমি তত খেতে পারবে।"

রাজবাড়ীতে গিয়ে সেই স্তূপাকৃত রুটিগুলি দেখেই লোকটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি সে রুটিগুলো খেলো যে সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগেই সমস্ত রুটিগুলি তার খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বুদ্ধু আবার রাজার কাছে বিয়ের কথা তুল্লো। কিন্তু রাজামশাই এবারেও তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। তিনি বল্লেন—"আরো একটি কথা যদি আমার রাখতে পার তো তোমার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব। একটা জাহাজ নিয়ে এসো, যেটা ডাঙায় চলে ও জলেও ভাসে।—"

বুদ্ধু এবার দেরি না করে দৌড়ে জঙ্গলে ফিরে গেল। সেই গাছতলায় দেখল যে সেই বুড়ো বসে আছে। বুড়ো তাকে দেখেই বল্লো—"আমিই তোমাকে সাহায্য করবার জন্য সরবৎ ও রুটি খেয়েছি—এবারেও একটি জাহাজের ব্যাবস্থা করেছি। তুমি আমার উপকার করেছিলে বলে আমিও তোমাকে সাহায্য করছি। ওই দেখো ওই জাহাজটা—এটা ডাঙায় চলে আবার জলেও ভাসে।"

বুদ্ধু জাহাজটিতে উঠে তক্ষুণি রাজার সামনে গিয়ে হাজির হলো। রাজামশাই এবার আর আপত্তি করতে পারলেন না, কাজেই পরদিন রাজকন্যার সঙ্গে বুদ্ধুরামের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা নিয়ে বুদ্ধুরাম মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

ফরাক্কা

পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও অগ্রগমনের জন্য ভাগীরথীর জলস্রোত বৃদ্ধি একান্তভাবে প্রয়োজন। এই বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান, আলোচনা ও বিচার করিবার পরে ফরাক্কা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সুবিধা সৃষ্টির জন্য গঙ্গার জল নানাভাবে ফরাক্কাতে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই এদিকে ওদিকে চালাইয়া দিয়া ফরাক্কা পরিকল্পনাকে বানচাল করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয় ও সেই অপকর্ম অনেকাংশে করিয়াও ফেলা হইয়াছে। এই বিষয়ে "যুগবাণী" সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে—

কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী কে এল রাও কলকাতায় এসে বাঙালী জাতির উদ্দেশ্যে চরম পত্র দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হুগলী নদীতে সব সময় ৪০ হাজার কুশেক জল দেওয়া সম্ভব হবে না, ২০ হাজার কুশেক বা তার কম জল নিয়েই বাঙালীকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং হুগলী নদীতে জল প্রবাহ শুকিয়ে যাবার ফলে যদি কলকাতা বন্দর ও নগর ধ্বংসও হয়ে যায় তাহলেও সারা ভারতের স্বার্থে বাঙালীকে তা মেনে নিতে হবে। সারা ভারতের স্বার্থে বাঙালীকেই শুধু চিরকাল স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় একথা আমরা জানি। বাঙালীর জন্য ভারতের আর কেউ স্বার্থ ত্যাগ অবশ্যই করবে না—করতে কেউ কখনো বলেও নি। কিন্তু কে, এল, রাও যা বলেছেন তার অর্থ হল বাঙালীকে এবার আত্মহত্যা বরণ করতে হবে। স্বার্থ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা থেকে খাল কেটে জল বের করে নিয়ে সেখানকার সেচ ব্যবস্থা বাড়ানো এবং গঙ্গা থেকে কাবেরী নদী পর্যন্ত খাল কেটে গঙ্গার জল দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাওয়া। গঙ্গার জল থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করাই এইসব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। বাংলায় গঙ্গার অবস্থা কি হয়েছে তা কলকাতার অদূরে চন্দননগরে গেলেই বোঝা যায়—মুর্শিদাবাদে গঙ্গা হেঁটে পার হওয়া যায়। ফরাক্কা প্রকল্প করা হয়েছিল গঙ্গায় জলপ্রবাহ বাড়াতে ও কলকাতার বন্দরের স্বার্থে হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়াতে। কে, এল, রাও ফরাক্কা প্রকল্পকে বানচাল করতে চান। যখন হুগলী নদীতে এখনই জল বাড়ানোর আশায় সবাই উৎসুক হয়ে আছে তখন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে ফীডার ক্যানাল খনন করা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ফরাক্কা সম্পর্কে সকল তথ্য একত্রিত করে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সেচমন্ত্রী কে, এল, রাও অতি রূঢ় ভাষায় রাজ্য সরকারকে সেজন্য নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, শ্বেতপত্র বের করলে সারা ভারত বাঙালীর ওপর ক্রুদ্ধ হবে। কেন? তথ্য প্রকাশ করতে গেলেই বাঙালীর মহা অপরাধ হবে কোন্ কারণে? এ থেকে একটা কথাই বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী বলতে চান যে বাঙালীকে সারা ভারতের স্বার্থে জবাই করা হবে, কিন্তু বাঙালী প্রতিবাদে সামান্য শব্দও করতে পারবে না। এই কি নব্য ভারতের নব্য বিধান? কে, এল, রাও আরও বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বুদ্ধিমান

ব্যক্তি ও তিনি যাও সাহেবের সব কথাই মেনে নিয়েছেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর এ কথার সত্যতা অস্বীকার করেন নি। তাহলে কি তিনি বাঙালীর আত্মহত্যার দাবী মেনে নিলেন? এমন কি শ্বেতপত্র প্রকাশের কথাও আর শোনা যাচ্ছে না। বাঙালী জাতির উৎসাদনের নতুন ষড়যন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত করতে বাংলার সরকারই কি শেষ পর্যন্ত সাহায্য করবেন?

কংগ্রেসী সরকার অন্যত্র কি করিতেছেন

সকল রাষ্ট্রীয় দলই নির্ব্বাচনের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিয়া থাকেন। কার্যতঃ যাহা করা অসম্ভব এবং দলপতিদের যাহা করিবার কোনও ইচ্ছা নাই সেই সকল প্রতিশ্রুতিও দরাজ হস্তে বিতরণ করিয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল প্রতিশ্রুতি যখন দেওয়া হয় তখন ঐ সকল ব্যক্তির মন্ত্রী বা বিধান সভার সভ্য হইবার পূর্ব্বের দায়িত্বহীন অবস্থা। সেইজন্য তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কোন দায়িত্বগত মূল্য থাকে না। কিন্তু নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার পরে মন্ত্রীরা কিছু বলিলে তাহার একটা দায়িত্বের দিক থাকে। অনেক প্রদেশেই কিন্তু মন্ত্রীগণ প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপরতা প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইতেছেন দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের সমালোচনাও হইতেছে প্রচুর। "ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয়ভাবে বলা হইয়াছে:—

তিন বছরের মধ্যেই ত্রিপুরার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে। বিগত পাঁচিশ বছরে যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা আগামী তিন বছরেই সম্ভব হইবে বলিয়া ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত সেদিন দশ হাজার কৃষকের মহতী জমায়েতে তেজোদৃপ্ত ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। চমৎকার ভাষণ। সকলকেই চমৎকৃত করিতে সফলকাম হইয়াছে। চমৎকারিতার দুইটি দিক ছিল। একটা কালো অন্ধকার দিক অন্যটা কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের রক্তিম সূর্য্যোদয়। কালো দিকটা হইল অতীত কাল আর ভবিষ্যতটাই হইল প্রভাত-সূর্য্য। বিগত পাঁচিশ বছর কংগ্রেসী শাসন দেশকে উন্নত বা সমৃদ্ধ করিয়া সর্বসাধারণের অভাব অভিযোগ বিদূরিত করিয়া সুখী ভারত গড়িয়া তুলিতে কেন সক্ষম হয় নাই—শ্রীসেনগুপ্ত উহা অতি সুন্দর ভাবে তত্ত্ব ও তথ্যাদি সহ পরিবেশন করিয়াছেন। কংগ্রেসের আদর্শ এবং নীতির কোন দোষ নাই; উহা পূর্ব্বে যাহা ছিল আজও তাহাই আছে, ভবিষ্যতেও উহার কোন হেরফের হইবে না। অতীতের কংগ্রেসীরাই যত নষ্টের মূল। অতীতের কংগ্রেসীরা নীতি ও আদর্শ মাফিক কাজ না করিয়া মুনাফাশিকারী, স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিদের ক্রীড়নক হইয়া দেশে কায়েমী স্বার্থের পাইকারী কারবার খুলিয়া দিয়াছিল এবং নিজেরা ঐ কায়েমী স্বার্থকে মদৎ দিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে একটা বাকসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিল। তাই অতীতের কংগ্রেস কেবল কথা দিয়াছে তথা কথা-মালায় গোটা ভারতকে স্বর্গ বা স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার রঙ্গীন চিত্র অঙ্কিত করিয়া জাতিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেই সচেষ্ট ছিল। বঞ্চনার ব্যাপারে মোহিনী শক্তিরও একটা সীমা থাকে। দেশ বা জাতিকে বেশীদিন ঐ মোহ রোগ কাবু করিয়া রাখিতে পারে নাই। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনেই দেশবাসী কংগ্রেসকে তাহার অপদার্থতার জন্য সমুচিত জবাব দিল। এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস তথা নবকংগ্রেসের অভ্যুত্থান। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত একজন রক্ষণশীল কংগ্রেসী; অতীতে ছিলেন এবং বর্ত্তমানেও হইয়াছেন। মাঝখানে ১৯৬৯ সালে বাকসর্বস্ব কংগ্রেসকে কর্মময় জগতে টানিয়া নিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না, তখন প্রথমে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ পরে কংগ্রেস হইতেও নিজেকে অপসারিত করিয়া কংগ্রেসের নীতি আঁকড়াইয়া রাজনৈতিক দল গঠন করেন। আজ কার্য্য কারণেই তিনি আবার কংগ্রেসী হইয়াছেন এবং যোগ্যতার জন্যই মুখ্যমন্ত্রিত্ব তথা কংগ্রেস দলনেতা হইয়াছেন। অতএব তিনি বীরদর্পেই ঘোষণা দিয়াছেন সেদিন—"আমি কথার কথা বলিব না, কাজের কথাই বলিব—কাজ করিব।" আজ কংগ্রেস যাহা বলিতেছে,

কাজেও তাহাই করিতেছে। শ্রীসেনগুপ্তের মতে যথাযথ কাজ করিতে পারিলে ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানে তিন বৎসর কালই যথেষ্ট।

মহতী কৃষক জমায়েতের শ্রোতৃমণ্ডলী তাহাদের নেতার বক্তৃতা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই। হইলেও তাহা দোষের হইত না। কারণ সকলেরই আজ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, ইন্দিরাজীর কংগ্রেস কথায় ও কাজে এক। চমৎকারিতার এখানেই শেষ নহে। শ্রীসেনগুপ্ত কবুল করিয়াছেন, এক মাসের মধ্যে (কেহ কেহ বলে দুই মাসের মধ্যে) দুই হাজার বেকারের চাকুরী দেওয়া হইবে এবং মন্ত্রিপরিষদের ভ্রাতৃপ্রতিম সরকারী কর্মচারীদের মেজাজ সরিফের নিমিত্ত অতি সত্বরই রাজ্য পর্য্যায়ে পে-কমিশন গঠন করিবেন। ব্যাস্। কৃষক, বেকার ও সরকারী কর্মচারী —একে একে সকলেরই হাঁ করা মুখ তিনি মূক করিয়া দিয়াছেন। নূতন সরকার গঠিত হওয়ার পর শ্রীসেনগুপ্ত দীর্ঘ আড়াই মাস মৌন ছিলেন; কিন্তু অলস ছিলেন না। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকেও ঘরে বসাইয়া রাখেন নাই। তিনি স্বয়ং কয়েকবার দিল্লী ছিল্লী করিয়াছেন আর মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের দ্বারা সমগ্র ত্রিপুরা চষিয়া বেড়াইবার কাজ করাইয়াছেন। দীর্ঘ আড়াই মাস প্রস্তুতি চলার পর কর্মকাণ্ড ঘোষিত হইয়াছে। কর্মকাণ্ড ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী ধারিয়াও আসিয়া হাজির হইয়াছেন ত্রিপুরাতে। তাঁহারও লক্ষ্য কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ। ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানে তথা উন্নতি বিধানে কেন্দ্রীয় সরকারও নাকি রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিশেষ আগ্রহী তাহা শ্রী ধারিয়ার সাংবাদিক বৈঠকে কবুল করিয়া গিয়াছেন।

তবে কিনা উভয়ের কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক রহিয়াছে। যে ফাঁক ভবিষ্যতে ফাঁকিতে পরিণত হইবার অবকাশ রাখে। প্রথমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী মোহন ধারিয়ার কথাই ধরা যাক। তিনি বলিয়াছেন ত্রিপুরার সমস্যা সমূহ যেমন জটিল তেমনি বহু খণ্ডে বিভক্ত একটি প্রকাণ্ড কর্মকাণ্ড। ত্রিপুরার আর্থিক সম্বল এই কর্মকাণ্ডের নিকট সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। অতএব ইহার সার্থক রূপায়ণ কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। এই প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের নিকট পুরাপুরি ভাবে আত্ম সমর্পণ করেন তবেই উহা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ ত্রিপুরার উন্নয়নের চাবিকাঠি একটি একটি করিয়া আলাদা ভাবে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই; সামগ্রিকভাবে গোটা চাবি-গুচ্ছটি এক সঙ্গে (রেল দাও, রাস্তা দাও, বিদ্যুৎ দাও অর্থ দাও,—সর্বশেষ পর্য্যায়ে দাও শিল্প) পাইতে হইবে। শ্রী ধারিয়ার মতে এই জন্য রাজ্যসরকারের শক্তিশালী টীম গঠন করা আবশ্যক এবং তৎসঙ্গে রাজ্যবাসীকে যুক্ত করিয়া কেন্দ্রের নিকট দাবী পেশ করা উচিত। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের সর্তটা তুলনায় কম শক্ত নহে। তিনি বলিয়াছেন যথাযথ কাজ করিতে পারিলে ত্রিপুরার সমস্ত সমস্যা সমাধানে তিন বছর সময়ই যথেষ্ট। এই "যথাযথ" শব্দের অর্থ হইল, তাঁহাকে তিন বছর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করিবার গ্যারাণ্টি দিতে হইবে এবং এই সময়ে কোন প্রকার উৎপাত-উপদ্রব সৃষ্টি করা (ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাদি) চলিবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় রাজ্যবাসী সর্বসাধারণের পক্ষে এই ধরণের সর্ত্ত মানিয়া নেওয়া বোধহয় অসম্ভব কিছু নহে; কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি এবং আমলাতন্ত্র এই—গণতান্ত্রিক সর্ত্তাধীনে যাইবে কি? যাইতে পারে কি? না; যাইতে পারে না। কথা দিতে পারে, সাথীও হইতে পারে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের আত্ম বিলুপ্তির আশঙ্কায় সেবোটেজ ও (Sabotage) করিতে পারে। তবেই দেখা যায় ত্রিপুরার উন্নয়ন "রাধার নাচনের" পাল্লায় পড়িয়াছে।

জর্জ্জী ডিমিট্রভ

বুলগেরিয়ার জননেতা ও স্বাধীন বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধান মন্ত্রী জর্জ্জী ডিমিট্রভ ১৮ই জুন ১৮৮২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেই

জন্মিয়াছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে স্কুল ছাড়িয়া কর্মক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনে নিযুক্ত হইতে হয়। তিনি প্রথমে ছাপা খানায় হরফ বসাইয়া মুদ্রন কার্য্যের শিক্ষানবিশ হ'ন। সেইখান হইতেই তিনি শ্রমিকদিগের সংঘবদ্ধতার জন্য কার্য্য আরম্ভ করেন ও শীঘ্রই একজন জনপ্রিয় ও শক্তিশালী শ্রমিক নেতা হইয়া দেশবাসীর নিকট দেখা দেন। ডিমিট্রভ বিপ্লববাদী ছিলেন। তাঁহার সকল বক্তৃতাতেই তিনি জনগণের অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কথা বলিতেন এবং শোষকদিগের অন্যায়গুলির প্রতিবাদও তিনি জোরাল ভাবেই করিতেন। প্রথম মহা যুদ্ধে তিনি সর্ব্বত্র ঘুরিয়া সাম্রাজ্যবাদীদিগের হইয়া যুদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতেন এবং অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণের জন্য খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি আদায় করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল যুদ্ধ বিরোধী কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে জর্জী পুনরায় জন নেতার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। দারিদ্র্য, রুগ্নতা, অত্যাচার, মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন তিনি প্রবল আন্দোলন চালাইতেছেন সেই সময়েই প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাপিটাল সামরিক নেতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া (জুন ১৯২৩) শাসনশক্তি কাড়িয়া লইয়া ফ্যাশিষ্ট ধরণের রাষ্ট্র গঠন করেন। ডিমিট্রভ অতঃপর তাঁহার আন্দোলন চালাইলেন স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে। এই সময় যে বিপ্লব চেষ্টা হয় তাহা সক্ষম না হওয়ায় ডিমিট্রভ ও অপর অনেকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হ'ন। ডিমিট্রভ প্রায় ২২ বৎসর দেশ হইতে বাহিরে থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদাই দেশের কথা লইয়া নানা দেশে আন্দোলন চালাইতেন। ১৯৪৫ হইতে ১৯৪৯ (তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯৪৮) পর্যন্ত তিনি দেশের রাষ্ট্র কার্য্য প্রাণপাত করিয়া চালাইয়াছিলেন। বুলগেরিয়ার বর্তমান উন্নতি ও গঠনশীলতার মূলে প্রধান কর্মী ছিলেন ডিমিট্রভ। (নিউজ ফ্রম বুলগেরিয়া)

সাময়িকী

পশ্চিম বঙ্গের বাজেট

ছাব্বিশে জুন ১৯৭২, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় চলতি বছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেটের সর্বপ্রধান লক্ষণ যা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এর ছবিরঙ ও ছাবরঙ। এই বাজেটে আছে বার্ধক্যের ও নির্জীবতার ছাপ। বাজেটের প্রস্তাবগুলোর উপর চোখ বোলালেই মনে হয় এর মূলে রয়েছে পক্ককেশ প্রবীণের পরিণত ও সাবধানী বুদ্ধি, যা সযত্নে পরিহার করে গেছে সেই সব বিষয় যেখানে উঠতে পারে বিতর্কের ঝড়, যেখানে আঘাত লাগতে পারে কায়েমী স্বার্থে বা পরিবর্তন আনতে পারে অত্যন্ত চিন্তাধারার জগতে যেখানে তারুণ্যের প্রাণ-চঞ্চলতা আনতে পারে অনেক ঢেকে রাখা জটিলতা। কি শিক্ষা বাবদে, বা স্বাস্থ্য বাবদে বা কৃষি বাবদে বেশী টাকা বরাদ্দ করলেই সেই বাজেট বিপ্লবী স্বভাব লাভ করে না; তার কারণ এই বরাদ্দ অর্থ যে একটি স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীরই থলি স্ফীত না করে যে বৃহৎ জনসাধারণের জীবনকে উন্নত, সুস্থ ও সমৃদ্ধ করে তুলবে তার কোনো অঙ্গীকার এর মধ্যে নেই। যে আপোষহীন, সতর্ক, নিরলস ও সংগ্রামী চেতনা এই বাঙালী জনসাধারণের জীবনে এই

বিপ্লব আনতে পারে তার কোনো পরিচয় এই বাজেট বহন করে না। মনে হয় এই বছরের বাজেটও অন্যান্য বছরের বাজেটের মামুলি পথ ধরবে। বাঙালী জনসাধারণ যে বিরাট আশা নিয়ে বর্তমান সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে বিগত নির্বাচনে, সেই আশা কি রূপ নিতে পেরেছে এই বাজেটে? এই বাজেটে নেই নতুন পথ কেটে চলার গতিবেগ, নেই তারুণ্যের সৃষ্টির কল্পনা, নেই আভিযানিক দুঃসাহসিকতা।

দেখা যাক এই বাজেটের গোড়ার কথা কি? এই বাজেটের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যা ঘাটতি হচ্ছে, তার ভিতর থেকে দশ কোটি টাকা পূরণ করা। যে ব্যয়-বাহুল্যের জন্যে এই ঘাটতি হচ্ছে তার মোটা অংশই কি গঠন মূলক কাজে লাগানো হবে—না টাকাটাই খরচ হবে, গড়ে উঠবে না কিছুই। কেবল টাকা খরচ করলেই শুভ ফল পাওয়া যায় না—যদি অপচয় বাঁচান না যায়, যদি অলসতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, যদি অসৎ ও অসাধু আচরণকে কঠোরভাবে দমন না করা যায়, যদি কপটের চাতুর্য্যের কাছে প্রশাসনের বুদ্ধিমত্তা পরাজিত হয় তবে অর্থই ব্যয় হবে, তা দিয়ে বাঙালী মানুষও হবে না বাঙালীর দুঃখও দূর হবে না। বাঙালীর দুর্গতি মোচন করার মত বরাভয় এই বাজেটে আছে কি? সকলের সমবেত চেষ্টা করা উচিত বাজেটের হাতুড়ি পিটিয়ে সেই হাতিয়ার তৈরী করতে যা দিয়ে অগ্রসর হবার পথের বাধা বিচূর্ণ হবে।

এবার সামান্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে, ব্যয়-বাহুল্যের জন্যে যে ঘাটতি হচ্ছে, তার কিয়দংশ মেটাবার জন্য কর বসিয়ে বাড়তি দশ কোটি টাকা তোলার জন্যে কি পথ এই বাজেটে অনুসৃত হয়েছে।

কর বাড়ানো হচ্ছে সিনেমা টিকিটের উপর। এর দুটো বিভিন্ন দিক আছে। একদিকে যদি ইংরাজী ও হিন্দি ছবির উপর কর বাড়ানো হয় তাহলে ক্ষতির গুরুতর আশঙ্কা নেই। কিন্তু বাঙলা ছবির মুমূর্ষু অবস্থা। তার উপর যদি টিকিটের দাম বাড়ে তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। বাঙলা ছবির দর্শক কেবল বাঙালীরা—বেশীর ভাগ অবাঙালী গোটা কর্মজীবন বাঙলায় কাটিয়েও বাঙলা বলতে, পড়তে, লিখতে পারে না। বাঙালীর গড়পড়তা আয়, ইংরাজী ও হিন্দি ছবি যারা দেখে তাদের আয়ের চেয়ে কম। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে সিনেমা টিকিটের দাম বাড়ানোর আঘাতটা মারাত্মক ভাবে পড়বে বাঙালীদের উপরেই। এর একমাত্র প্রতিকার যে, বাঙলা ভাষায় যে ছবি দেখানো হবে তার টিকিটের দাম বাড়ানো হবে না, বাড়ানো হবে বাঙলা ভাষা ছাড়া আর যে কোনো ভাষায় তোলা সিনেমার টিকিটের দাম। কি উপায়ে এই ধরণের আইন বলবৎ হতে পারে তার সমুচিত ব্যবস্থা বিধান সভায় নেওয়া উচিত। একে যদি অপবাদ দিয়ে বলা হয় এটা বাঙালীর প্রাদেশিক মনোভাব তবে পশ্চিম বঙ্গের বুকের উপর বসে অন্যদের বীভৎস প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। যদি পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীকে আত্মরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ পথ নিতে হয়, তাকে প্রাদেশিকতা আখ্যা কিছুতেই দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব করা হয়েছে, পণ্যবাহী ও মনুষ্যবাহী যানের ভাড়া বাড়ানোর। এটা শুনতে সহজ, কাজেও সোজা, কিন্তু এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে রেলপথের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। তার ফলে যে-সব কাঁচা মাল বা খাদ্যদ্রব্য অন্য প্রদেশ থেকে আমদানী হচ্ছে, বাঙালীকে বেশী দাম দিয়ে তা কিনতে হচ্ছে। বাঙলার শিল্পজাত লোহা ইস্পাতের পণ্য বা তুলাজাত পণ্য, যা বাঙলার বাইরে রপ্তানী হতে পারে, তারও দর এত বেশী পড়ছে যে বাঙলার উৎপন্ন বস্ত্র দরের প্রতিযোগিতায় পিছু হটছে। এর মূলে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মাশুলের বিপরীত ধর্মী নীতি। এর উপর পঃ বাঙলা সরকারও যদি করের বোঝা চাপান তবে এর অপরিহার্য্য ফল হবে অতিরিক্ত দ্রব্য মূল্যস্ফীতি—যার ফলে হবে উৎপাদন হ্রাস ও সমস্ত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অপমৃত্যু। এই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করবার মত সংগঠন ক্ষমতা কি সরকারের আছে? এই

মূল্যবৃদ্ধির আঘাত এসে পড়বে বেশী করে আপামর সাধারণ বাঙালীদেরই উপর। কারণ অধিকাংশ বাঙালীই খুচরো ক্রেতা। যে-সব বাঙালী ব্যবসা করেন তাঁরাও গোড়াতে ক্রেতা, পরে খুচরো বিক্রেতা। পাইকারী বিক্রেতা বা কাঁচামাল বিক্রেতা যেমন অবলীলাক্রমে অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য ছোট ক্রেতার স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে পারে, ছোট বিক্রেতার ক্ষমতা সেই তুলনায় অনেক কম। দ্রব্যমূল্যের স্ফীতি যে সরকার বন্ধ করতে উদ্যোগী সেই সরকারের পক্ষে এই প্রকার করমর্দন কি সঙ্গত?

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়ে। যেমনি জিনিষের দাম বাড়বে তেমনি সরকারী কর্মচারীদের দাবী সোচ্চার হবে যে তাঁদের মহার্ঘ ভাতা বাড়াতে হবে। আর সেই দাবী মেটানোর জন্য বৃহত্তর জনসাধারণকে শোষণ করে আবার অতিরিক্ত কর ধার্য্য করতে হবে। অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য স্ফীতি ও অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার ঘূর্ণীঝড়ে সমগ্র উন্নয়ন ব্যবস্থাই বানচাল হবে—এযাবৎ যা হয়ে এসেছে। এই যে ক্রমোচ্চ প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে কোন সামাজিক নীতি বা ন্যায়বিচার রয়েছে, বা কি প্রাশাসনিক দক্ষতা আছে? এটা কি দেউলে নীতি বা নীতির দেউলে অবস্থা নয়?

তারপর মূল্যবান্ পাথর—স্বাভাবিক বা রাসায়নিক, কৃত্রিম বা বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত মুক্তা, সোনা বা রূপা দিয়ে গড়া ঝালরের কাজ করা জিনিষের উপর অতিরিক্ত কর বসানোর প্রস্তাব আছে। এটার বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে না, এটা ছেলেভুলানো ছড়ার অনুবাদ মাত্র। এর থেকে তহবিলে কতখানি মোটা টাকার অঙ্ক আসবে তার কোনো হিসাব দেওয়া হয়নি। এর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই; শুধু এই খাতে যা অর্থ সংগৃহীত হবে সেটা পরিহাসের পর্য্যায়ে না গিয়ে পড়লেই খুসীর কারণ হবে।

বাজেটের যে দৈন্য মনকে পীড়িত করে সেটা হচ্ছে বাঙালীর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বা করতে হবে তার অস্পষ্টতা। আমাদের এই মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বাঙালীদের জন্যেই, তাদের বিশেষ অবস্থা ভেবেই তৈরী করা উচিত। তাদের সকল কিছু গুরুতর সমস্যা দূর করার জন্য যে সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মসূচী—আশু প্রতিকারের পন্থা ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—দৃঢ়ভাবে অনুসরণের একান্ত আবশ্যক তার আভাস এই বাজেটে ঝিলিক দিয়ে উঠছে না। কালো মেঘের চারিপাশে কোনো রূপোলি রেখার চিহ্ন নেই। উচ্চ সোপানের মন্ত্রী মহাশয়েরা বক্তৃতায় ও বাক্যে বেকারত্ব প্রতিরোধের যে জোরালো আশ্বাস দেন, এই বাজেটের, মধ্য দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি বলিষ্ঠভাবে কি কর্মপদ্ধতি দিয়ে কিভাবে রূপায়িত হবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। এইটেই প্রতীয়মান হয় যে মন্ত্রীমণ্ডলী মনে মনে যা ভাবেন বা ইচ্ছা পোষণ করেন, বাস্তব বাজেটের মধ্য দিয়ে তাকে ফলবান্ করার জন্য কি পথ প্রকৃষ্ট সে বিষয়ে হয় তাঁদের যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা নেই নয় তাঁরা সম্পূর্ণভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস সংগ্রহ করতে পারছেন না।

বর্তমান বিধানসভায় অনেক তরুণ সদস্য আছেন,—এই বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। দেশের বেকার বাঙালী যুবকরা আশা করেন বিধানসভার এই সব তরুণ সদস্যেরা অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে, পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই সব সমস্যার মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসবেন এবং এই দুরূহ কাজে পদে পদে যে সব বাধা আসবে তারা যেন সে সকলকে জয় করার অনমনীয় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই পণ গ্রহণ করতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে যেন বাঙালীর শিল্প, বাঙালীর শ্রম, বাঙালীর বিদ্যা, বাঙালীর বুদ্ধি, বাঙালীর কর্মসংস্থান সর্বাগ্রাধিকার লাভ করে—এর জন্য যদি কেউ মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিযোগিতায় অন্য প্রদেশের কাছে পিছু হটবে—তবে তাই যদি সত্য হয়, তবে পিছুই হটুক পশ্চিমবঙ্গ। তবে একথা সত্য নয়, যারা এ কথা বলে তারা ঈর্ষার বশীভূত হয়েই একথা বলে, বাঙালী নেতৃত্বকে বিভ্রান্ত করবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে আজ বাঙালী গৌণ স্থান অধিকার করে

আছে, সে নিজ জন্মভূমিতে আজ পরবাসী,- এখানে যদি বাঙালীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে বাঙালী পিছু হটবে না, এগিয়েই যাবে—এইটাই অন্যদের ভয়ের কারণ। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীর দাবী সবচেয়ে বড় এবং যে প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত সেই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, এই মনোভাবকে যদি প্রাদেশিকতা বলা হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের অন্নজল সেবনে পরিপুষ্ট অন্য অন্য প্রদেশের লোকদের, বাঙালীকে অবহেলা করে, স্বজনপোষণ কি নির্লজ্জ প্রাদেশিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে যেন বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা পূর্ণতা লাভ করবার পথে অগ্রসর হতে পারে।

"মুসাফির"

ভারত-পাকিস্থান চুক্তির ফল

অনেকের মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সিমলার বৈঠকে পাকিস্থানের সহিত যে বিলি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা উভয় দেশের পক্ষেই বিশেষ লাভজনক হইবে। কাহারও কাহারও মতে শ্রীমতী ইন্দিরার দখল করা জমি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। এই সমালোচক-দিগের মতে পাকিস্থান কাশ্মীর লইয়া গঙ্গামাও ইউ এন এর দরবার চালাইয়া চলিবে। সুতরাং প্রথমতঃ শ্রীমতী ইন্দিরার বাংলা দেশে যুদ্ধজয়ের পরেই যুদ্ধবিরতি না করিয়া সমগ্র কাশ্মীর অন্ততঃ দখল করিয়া লওয়া উচিত ছিল এবং, দ্বিতীয়তঃ সিমলার বৈঠকে পাকিস্থানের সহিত কোনও ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয় হইত। "যুগবাণী" পত্রিকা বলেন :—

ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রায় ······ হাজার সৈন্যের প্রাণ বলি দিয়ে যে বিপুল বিজয় লাভ করেছিল সিমলার আলোচনার টেবিলে শ্রীমতী গান্ধী তাকে পরাজয়ে পরিণত করে ছেড়েছেন। কারণ তিনি রাজি হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া সমস্ত সীমান্ত থেকে ভারতীয় সৈন্যদের সরিয়ে আনতে, যুদ্ধে পাকিস্তানের যে সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল এলাকা আমরা দখল করেছিলাম তা ফিরিয়ে দিতে এবং যুদ্ধবন্দীদেরও ফেরৎ দিতে। ভুট্টো দুটি লক্ষ্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন—ভারত কর্তৃক অধিকৃত পাক অঞ্চলগুলি ফেরৎ পাওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের ফেরৎ পাওয়া। তিনি দুটি বিষয়েই সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু পরিবর্তে ভারত কী পেল? কাশ্মীর প্রশ্নটি এখনো খোলাই রইল, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও একটি রাজ্যমাত্র একথাও আর বলা উচিত নয়, —কেননা কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা আলোচনাযোগ্য ও মীমাংসাযোগ্য প্রশ্নরূপে সিমলা চুক্তিতেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

দেশ-বিদেশের কথা

জাতীয়ভাবে কয়লাখনি পরিচালনা

কোকিং কয়লার ২১৪টি খনি জনসাধারণের হাত হইতে আইন করিয়া লইয়াই সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারত কোকিং কোল লিঃ কোকিং কয়লার দাম টন পিছু তিন টাকা বাড়াইয়াছেন। মূল্য বৃদ্ধির কারণ খরচ বৃদ্ধি। প্রধানতঃ খরচ বাড়িয়াছে মালকাটাদিগের বেতন ও ভাতার টাকা অধিক নির্দ্দিষ্ট হওয়ার ফলে। অন্য খরচ বৃদ্ধির কারণ হইল, ভারত কোকিং কোল, খোলা বাজারে উচ্চ মূল্য যে নরম ও শক্ত কোক বিক্রয় হইত, সেই বিক্রয়ের পরিমাণ রক্ষা করিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারেন নাই। এই বিক্রয় না হওয়ার কারণ উৎপাদন কম হওয়া এবং ওয়াগন না পাওয়া। ইহা ব্যতীত কর্ম্মীর সংখ্যাও ভারত কোকিং কোলের অপেক্ষাকৃত অধিক। লোক রাখিয়াও বেশী উৎপাদন সেরূপ হয় না। জাতীয় করিয়া লইলেই যদি সকল কার্য্যেই লোকসান হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে সমষ্টিবাদী অর্থনীতি গঠন কঠিন হইবে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—"ভাগের মা গঙ্গা পায় না।" কারবার কারখানাগুলি যদি সমগ্র জাতির হইয়া যায় অর্থাৎ যদি সকল কারবারেই জাতির সকল ব্যক্তির ভাগ থাকে তাহা হইলে সকল কর্ম্মকেন্দ্রই ভাগের মা হইয়া দাঁড়ায়।

সিমলার শীর্ষ বৈঠক

ইংলণ্ডের "নিউ স্টেটস্‌ম্যান" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে সিমলার ভারত-পাকিস্থান শীর্ষ বৈঠক একটা বিশেষ সফলতার আবহাওয়া সৃজন করিয়াছে। ইহাদ্বারা দুই জাতি আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের দুই দিকে বসিয়া পরস্পরকে শত্রু চিন্তা করিয়া হাতিয়ার শানাইতে ব্যস্ত থাকিবে না। প্রাচীরের গাত্রে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, বাক্যালাপ হইতেছে এবং যাইবার সময় উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে আবার মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া হাসি মুখে বিদায় লইয়া গিয়াছেন। যেখানে প্রায় কুড়ি বৎসরের অধিককাল মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল, শত্রুতা ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল না সেইখানেই, যুদ্ধ বিরতি রেখা কেহ গায়ের জোরে বদলাইবার চেষ্টা করিবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটা মহা পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের আকাশ পথে পাকিস্থানের বিমান চলিবে, পাকিস্থানের উপর দিয়াও ভারতীয় বিমান যাতায়াত করিবে ইহাও কম কথা নহে। একথা ঠিক যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয় নাই, ৯০০০০ হাজার পাকিস্থানী সৈন্য এখনও বন্দীই রহিয়াছে কিন্তু ঐ সকল কথা লইয়া সিমলায় কোনও প্রকার কলহের সূচনা হয় নাই। এই যে কোনও প্রকার বিবাদ না করিয়া কয়েক দিন সকলে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন ইহা কম কথা নহে। নূতন করিয়া যখন আবার বৈঠক বসিবে তখন বহু কথাই পূর্ণ আলোচিত হইয়া ন্যায্য নিষ্পত্তির পথে অগ্রসর হইবে। পাকিস্থানের নেতাগণ এই শীর্ষ বৈঠকে নূতন মনোভাব লইয়া আসিয়াছিলেন এবং মনে হয় এই বৈঠক হওয়াতে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্থান সম্বন্ধ একটা নূতন ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই শীর্ষ বৈঠক নিশ্চয়ই বহু রুদ্ধ দুয়ার খুলিবার পূর্ব্বাভাস এবং সেই কারণে যাহারা শান্তি ও উন্নতি চাহেন তাঁহারা ইহার মধ্যে এক নূতন বন্ধুত্বের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন।

পশ্চিম বাংলাতে বাঙ্গালীর স্থান

"যুগবাণী" পত্রিকা নিম্নলিখিত হিসাবটি প্রকাশ করিয়াছেন :—

কলকাতায় যারা উপার্জনশীল তাদের শতকরা ৭৪ জনই অবাঙালী। পশ্চিম বাংলার চটকলগুলিতে

অবাঙালী কর্মীর হার শতকরা	৭১ জন
কাপড়ের কলে ,, ,, ,, ,,	৫৪ ,,
ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ,, ,, ,, ,,	৫০ ,,
কাগজ কলে ,, ,, ,, ,,	৭৩ ,,
পশ্চিম বাংলার সব কলকারখানাগুলিতে ,, ,, ,, ,,	৬১ জন

প্রতি বছর অবাঙালীরা বাংলা থেকে দেশে টাকা পাঠায় ২৮০ কোটি টাকা।

রুশ ইরাক চুক্তি

১৯৭২ সালের ৯ই এপ্রিল বাগদাদে স্বাক্ষরিত সোভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি সর্বোচ্চ সোভিয়েতের উভয় সভায় পররাষ্ট্রীয় বিষয় সংক্রান্ত কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর হুকুমনামা বলে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত করেছে।

গত ১৩ই জুন ক্রেমলিনে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি এন ভি পোদগোর্নির সভাপতিত্বে সভাপতিমণ্ডলীর এক বৈঠক বসে।

সভাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত—ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি পাকাপাকিভাবে অনুমোদন করার বিষয়টি বিবেচনা করেন।

এই সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি ভি কুজনেৎসোভ বলেন যে, সোভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি ইরাক এবং সমগ্র আরব দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি বলেন যে, এই চুক্তির প্রধান তাৎপর্য হল এই যে, আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আনুষ্ঠানিক রূপে লিপিবদ্ধ এই চুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরাক অটুট বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে তাদের সম্পর্ক গড়ে তোলায় ও উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার প্রসার ঘটানোর জন্য এবং বিশ্বশান্তিকে দৃঢ়তর করা, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামে তাদের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উভয় রাষ্ট্র পবিত্র বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেঝনেভ উল্লিখিত কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন। কুজনেৎসোভ বলেন যে, উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সকল বিকাশই সোভিয়েত-ইরাক চুক্তির পথ প্রস্তুত করেছিল। সম্প্রতি ইরাক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার সম্পর্ক গভীরতর অর্থবহ হয়েছে ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। উভয় দেশের সম্পর্কের আওতায় এসেছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তথা জরুরী আন্তর্জাতিক সমস্যা সংক্রান্ত বহুবিধ প্রশ্ন।

অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতার চুক্তিগুলি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে ইরাকে প্রায় ৭০টি নানা ধরণের প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে জেনে আমরা খুসী।

বৈঠকে পররাষ্ট্র বিষয় সংক্রান্ত কমিশনের পক্ষ থেকে উক্ত কমিশনের সহকারী সভাপতি এবং লিথুয়ানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এ জে স্নেকাস, কাজাখস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ডি এ কুনায়েভ, ইরখুতস্ক অঞ্চলের তাইশেত্স্ক জেলার একটি যৌথ খামারের সভাপতি জি এস অরনোভা, আজারবাইজানের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি কে এ খালিলোভ এবং পার্টির মস্কো আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ভি আই কোনোটোপ ভাষণ দেন। সকলেই চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদনের পক্ষে রায় দেন।

এন ভি পোদগোর্নি বলেন, "প্রায় এক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত-মিশর মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি অনুমোদন করেছিল। আর এখন আমরা সোভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।"

পোদগোর্নি বলেন, "গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করা উচিত যে, সোভিয়েত-ইরাকী চুক্তি তৃতীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে উদ্যত নয়, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থের পক্ষে এই চুক্তি ক্ষতিকর নয়। বরং চুক্তিতে এমন সব সংস্থান আছে যেগুলি অন্যান্য দেশ ও জাতির একান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের অনুকূল। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন, সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য উভয়পক্ষ চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র ইহুদী স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ, জাতিদ্বেষ ও অ-শ্বেতাঙ্গদের এক-ঘরে করে রাখার ব্যবস্থার নিঃশর্ত ও চূড়ান্ত অবলুপ্তির জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে বলে উভয় পক্ষ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলি উল্লিখিত সংস্থানগুলির অন্তর্ভুক্ত। সার্বভৌমত্ব, মুক্তি, স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য জাতিসমূহের সংগ্রামে সমর্থন জানানোর ব্যাপারে উভয়পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে ও অন্যান্য শান্তি-প্রিয় জাতিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

"এবিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে সোভিয়েত-ইরাকী চুক্তি আরব প্রাচ্যের জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে এবং ঐ অঞ্চলের প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির পক্ষে হিতকর। এই চুক্তি তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যকে সংহত করার পথ সুগম করবে। এইরূপ ঐক্য যে একটা কার্যকর শক্তি, এই ঐক্য যে কার্যকর ফল দিতে পারে এই সত্য ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানী নামক একটি বিদেশী একচেটিয়া তৈল সংস্থার সম্পত্তি জাতীয়করণের ইরাকী সরকারের ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইরাকী সরকারের এই সুবিদিত পদক্ষেপ বহু আরব রাষ্ট্রের সরকারের অনুমোদন ও কার্যকর সমর্থন লাভ করেছে। এতে সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির শত্রুতাপূর্ণ চক্রান্তের বিরোধিতা করার ব্যাপারে সংহতি ও পারস্পরিক সহায়তা অভিব্যক্ত হয়েছে।"

ইরাকী প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী নেতৃত্বের জাতীয় পরিষদ এই চুক্তি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছেন বলে জানা গেছে।

সোভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদন করে একটি হুকুমনামা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিকোলাই পোদগোর্নি হুকুমনামা এবং অনুমোদন সংক্রান্ত দলিলপত্র স্বাক্ষর করেন।

পুস্তক পরিচয়

পঞ্চদশী—শ্রীশান্তা দেবী, গল্পসংগ্রহ, প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য—পাঁচ টাকা।

পনেরটি গল্পসংগ্রহে স্বনামধন্যা প্রবীন লেখিকা জীবনের নানা দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। অতি বিদুষী, সেকালের কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, ইত্যাদি ঐতিহ্যে তিনি সে-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকা। প্রবাসীর তৎকালীন কয়েকটি লেখক-লেখিকা বাংলা সাহিত্যের নানা নূতন দিক উন্মোচনে অগ্রণী ছিলেন। শান্তাদেবী ও কনিষ্ঠা ভগ্নী সীতাদেবীর অবদান অপরিসীম সে-ক্ষেত্রে।

আধুনিক কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েরা এবার সাহিত্যে নিজেদের খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত হল। শান্তাদেবীর রচনায় বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য অধিক, বিশেষতঃ তাঁর উপন্যাসগুলিতে। প্রথম একক উপন্যাস চিরন্তনী থেকে শেষ উপন্যাস অলখঝোরা পর্য্যন্ত এক পেলব মাধুর্য্য ও ভাবাকুল জগতের অনুভূতি পাওয়া যায়।

পঞ্চদশীর 'সুনন্দা গল্পে এ ধরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই। 'সুনন্দা' লেখিকার প্রথম গল্প, লেখিকার মতে "কাঁচা"। সাধারণ একটি গল্পের কাঠামোতে অসাধারণ লিপিচাতুর্য্য। বাস্তবধর্ম্মী নয়, লিরিক ধর্ম্মী। বর্ণনার বিন্যাসে রঙে আঁকা ছবি কখনও কখনও ফুটে উঠেছিল তরুণী লেখিকার হাতে, যদিও আখ্যান-সংস্থানের পশ্চাৎভাগের যুক্তি দুর্বল।

বইখানিতে প্রায়ই বঞ্চনার চিত্র। 'ব্রজরাজ', 'শিক্ষার পরীক্ষা,' 'দুইবোন' 'গৃহত্যাগী', 'রুদ্ধগৃহ', ইত্যাদি গল্পে বিভিন্ন চিত্র। 'ছুটি' গল্পের নায়িকা গৌরীও একদিনের ছুটি থেকে বঞ্চিত, 'সন্তান' গল্পে বাৎসল্যময়ী মুকুল সুস্থ সন্তানলাভে বঞ্চিত। 'জীবে দয়া'য় চিত্র বোমা-ভয়ে পলাতক বাঙালী পরিবার বিভূতিভূষণের অনুবর্ত্তনকে মনে পড়ায়। সেখানেও বাড়ীওয়ালার কাছে পলাতকা বিপন্ন। 'গৃহসংস্কারে'র বৃদ্ধা পরিজন-স্নেহ-বঞ্চিত। তিলোত্তমার কিশোর দিনের রোমান্স ও বিক্ষোভের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া। 'পথহারার' সর্ব-বঞ্চিতা বিধবা হিন্দুনারীর মর্ম্মবেদনা, অসহায়তা ও অন্তিমে প্রকৃত প্রেমের সন্ধানলাভ বিশদ ও বিবৃত ভাবে পরিস্ফুট। 'মরণজয়ী' গল্পে লেখিকা রাজনীতির একটি দিক দেখিয়েছেন।

'শিক্ষার পরীক্ষা' গল্প শান্তাদেবীর অনেক গল্পের মত ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। এইসূত্রে বিদেশী সাময়িকী 'Nation and the Athenaeum' এর সমালোচনা উদ্ধৃত করি :—

'Tara Sundari might have sat for Chaucer or Katherine Mansfield, an ancient universal type yet convincingly individual."

'দেয়ালের আড়ালে' এক ভাগ্যহীন যুবকের অ্যাকসিডেন্টে পা খোয়ানোর করুণ কাহিনী হাসপাতালের পরিবেশে। কিন্তু দুঃখের কালমেঘে রূপালী পাড় পাশের ক্যাবিনের রোগীর বোন অপুর শেষ কথাটি—"দাদা, দাও না তোমার কার্ডটা অনাদিবাবুকে। ওতে বাড়ীর ঠিকানা লেখা আছে।"

সর্ব্বহারার বঞ্চনার মধ্যে সুখের সন্ধানের একটি সার্থক গল্প 'ফুটকী'। কৈশোর প্রেম ও এক অপরূপ পরিণতির চিত্রায়ণে উজ্জ্বল মধুর হয়ে উঠেছে গল্পটি।

'রুদ্ধগৃহে' যে কাব্যধর্ম্মী লিপিবিন্যাস রূপকথার রাজ্যের ছায়ামাখা; 'পথহারা'র যে হতাশ-পূর্ণ-প্রেম সন্ধান; 'সুনন্দা'র যে অনন্ত বিরহ—সব উত্তরণ করে বাস্তব রূপায়ণে প্রেম সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে 'ফুটকী' গল্পে। এখানে ভাবালুতার, উচ্ছ্বাসের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু সুদক্ষা লেখিকার পরিমিতি জ্ঞান অতি প্রশংসনীয়। মাণিক..."তারপরে একদিন আমি ভাল মালা কিনে আনব। আঁধার ঘরে বিয়ে হবে না, অনেক আলো জেলে ভাল করে বিয়ে হবে।"

শান্তা দেবীর লিপিকুশলতা, শিল্পজ্ঞান, চরিত্র চিত্রণের শক্তি, রচনার মাধুর্য্য ও নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণ এতদিন পরে নূতন করে বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তিনি বাংলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠ লেখিকা, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর নাম চিরোজ্জ্বল রাখা করবে।

এই ছোট ছোট মনোহারী গল্পগুলি আধুনিক লেখক-লেখিকার কাছে সংহতি, ভাষাভঙ্গি, নিত্যকার জীবনের নিখুঁত রূপায়ণের আদর্শ স্থাপিত করবে। সহজ, স্বচ্ছ, সুলিখিত পনেরোটি গল্পই উপভোগ্য।

বাণী রায়

বেদান্ত দর্শন ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, সংশোধক ও সম্পাদক স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী এবং বেদান্তবাগীশ শ্রী আনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য, প্রকাশক উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩, অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি এন্টালি রোড, কলিকাতা—১৪, শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী সাধারণ সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, স্বামী ভাস্বরানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী-১, স্বামী গম্ভীরানন্দ, অধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া, হিমালয়, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, মূল্য ১ম—৩য় খণ্ড ৪, ৪র্থ খণ্ড ৩, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১৮+১৩, ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ। প্রথম সংস্করণ।

বেদান্তদর্শন, স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী প্রকাশন, ১ম থেকে ৪র্থ অধ্যায়, অনুবাদক, ব্যাখ্যাতা, সংশোধক, সম্পাদক পূর্ববৎ, প্রকাশক স্বামী বুধানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, মূল্য ১ম অধ্যায় ৬, ২য় ও ৩য় ১৩, ৪র্থ ৯,—মোট ৪১, মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৪৩-।- প্রাক্‌কথন মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়কৃত ১০২-।- ৩৮। দ্বিতীয় সংস্করণ, অধুনা প্রাপ্তব্য।

সম্প্রতি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বৃহত্তম বেদান্তগ্রন্থ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। রামমোহনের সময় থেকে বাংলা ভাষায় বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ লিখিত হয়ে আসছে। কিন্তু ১৮১৫-১৯৭০ সালের মধ্যে বহু বেদান্তবিষয়ক বই বাংলা ভাষায় লেখা হলেও আজ পর্যন্ত স্বামী বিশ্বরূপানন্দের চেয়ে কঠোর পরিশ্রম ক'রে এত বড় বই আর কেউ লেখেন নি। এ-মহাগ্রন্থ শুধু যে বেদান্তের বিষয়ে লিখিত সর্ববৃহৎ গ্রন্থ তাই নয়, এটা বাংলা ভাষায় লিখিত সমস্ত বইএর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থ। উৎকর্ষের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য হলেও শুধু অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজে বিশ্বরূপানন্দ যে কঠোর শ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্যে তাঁকে জাতীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

পৃথিবীতে যত রকম দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে বেদান্ত যে সর্বোত্তম তার অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম চরিত্রের গুণে, তা উদারমতাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রে স্বীকার করেন। মহাজ্ঞানী রামমোহন যে বৈদান্তিক মতবাদের ভিত্তিতেই তাঁর উপাসনা পদ্ধতি নির্মাণ করেছিলেন, তার কারণই তাই। তিনি তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার দ্বারা বুঝেছিলেন যে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগীয় ইসলামি সভ্যতা এবং নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কোন সংযোগবিন্দু খুঁজে পেতে হলে বেদান্তকে অবলম্বন করা চাই। বেদান্তের মধ্যে এসে আমরা ভারতীয় আর্যসভ্যতা, ইসলামীয় একেশ্বরবাদ ও খ্রীষ্টীয় অপৌত্তলিক প্রেমধর্মমূলক ঈশ্বরোপলব্ধির সুসমন্বয় খুঁজে পাই; ব্রহ্ম, আত্মা ও ত্রাণকর্তার মহান্ উবর্তন বৈদান্তিক চেতনায় বিলীন হয়ে যায়।

রামমোহনের পর স্বামী বিবেকানন্দ শুধু সারা ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে বেদান্তের বৈদ্যুতিক বাণী প্রচার করেন। দুবল, সংকীর্ণ মানবাত্মার বেড়া-ভাঙার মাতন নামিয়ে উদ্দাম উল্লাসে এই তামসিকতাগ্রস্ত জড়ের দেশে তিনি পূর্ণ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত চৈতন্যের আলো জ্বেলে দিয়ে গেলেন। সে আলো বিশ্ববাণী হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল।

বেদান্ত প্রচারক রূপে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ উত্তর সাধক হিসেবে স্বামী বিশ্বরূপানন্দ যে মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন, তার কোন তুলনা নেই। দুরূহ, আপাতদৃষ্টিতে চিত্ত বিকর্ষক, নীরস শাঙ্করভাষ্যের মূল, বিশুদ্ধ নির্ভুল বঙ্গানুবাদ, বৈয়াসিক ন্যায় মালা, তারও বঙ্গানুবাদ, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ও চতুঃসূত্রী পর্যন্ত ভাস্বরপ্রভা টীকা প্রদান ক'রে তিনি বেদান্তে অনভিজ্ঞ পাঠককে বেদান্তবিষয়ক পূর্ণ শুদ্ধ জ্ঞান লাভের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। যেমন একদিকে তিনি অমানুষিক শ্রম স্বীকার করেছে, অন্য দিকে তাঁর ব্যাখ্যারও তেমনি উৎকর্ষের কোন তুলনা নেই। তাঁর ব্যাখ্যা পড়লে সকলেই বুঝতে পারবেন যে, যেমন ব্রহ্ম সকল রসের উৎস, শুদ্ধ স্বরূপ নন, যার জন্যে ব্রহ্মবাদকে সকল

রসাস্বাদনের শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রে কাব্যরসিক আলঙ্কারিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে, কাব্যরস "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর," তেমনি বেদান্ত বেওক শাস্ত্রালোচনা মাত্র নয়; বরং সকল রসের উৎস কোথায়, তার অতি চিত্তাকর্ষক মানচিত্র স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দ যা বলেছেন, তার প্রতি সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত :—"বেদান্তসূত্রের উপর বহু ভাষ্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত বলিতে সাধারণ লোকে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদই বুঝিয়া থাকে। আশা করি এই গ্রন্থপাঠে বহু ব্যক্তি শঙ্করবেদান্তের যথার্থ মর্ম গ্রহণে সমর্থ হইবেন। বেদান্ত-তত্ত্ব ধারণা করিতে সাধারণ লোকেরও কোন অসুবিধা হইবে না।"

বর্তমান সমালোচক একজন অদীক্ষিত অশিক্ষিত বেদান্তরসিক পাঠক মাত্র, সুতরাং সাধারণ লোকের কাজে এই বই কতটা সাহায্য করতে পারবে, তা বলার অধিকার তার আছে। কোন পূর্ব সংস্কার, ধারণা ও অভিজ্ঞতা না থাকলেও খোলা মন নিয়ে পড়তে বসলে যে কোন বাঙালি পাঠক দুই সংস্করণে চার-চারটি খণ্ডে সম্পাদিত এই মহাগ্রন্থ অবলম্বনে শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০) প্রচারিত বৈদান্তিক জীবন দর্শন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারবেন। বিশ্বরূপানন্দের বিশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, এর চেয়ে বড় প্রশংসার কথা আর কিছু হতে পারে না।

বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন গোঁড়া ধর্মান্ধ বৈষ্ণবেরা অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে চৈতন্য মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের কুৎসা করেছেন। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে উপযুক্ত সময়ে যদি এঁর আবির্ভাব না ঘট্‌ত, তাহলে সারা ভারতে প্রথমে পুরো বৌদ্ধধর্ম এবং অনিবার্যভাবে অব্যবহিত পরে পুরো ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় ঘট্‌ত, ভারতীয় আর্য মনীষার সকল দান নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যেত। শঙ্করকে কটূক্তি করার সুযোগ পাবার জন্য কোন দ্বৈতবাদী ভক্তই তখন লীলা করার সুযোগ পেতেন না। পরবর্তী সব দ্বৈতবাদী-অদ্বৈতবাদী দর্শনই শঙ্কর ভাষ্যকে কেন্দ্র ক'রে গঠিত, এমন কি শ্রীঅরবিন্দের The life divineও। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক," তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধভাবে বুঝতে হবে। এ বিষয়ে দিলীপকুমারের একটি রচনাংশ প্রসঙ্গত স্মরণীয়:—"মায়াবাদীদের বিন্দুবিসর্গও তোমরা জানলে না, বুঝলে না, এমন-কি খোঁজ পর্যন্ত করলে না, অথচ ব'লে বসলে মায়াবাদীরা নির্মম—স্নেহ-বিরাগী—নীরস। শঙ্করকে খুলে পড়লে না একটিবারও অথচ তাঁকে পুলিপোলাও চালান দিলে এই চার্জে যে, এ-জগৎকে তিনি অসিদ্ধ ধ'রে মানুষকে বরখাস্ত করেছেন তাঁর অদ্বৈতবাদ থেকে। বললে—তিনি বে-দরদী প্রেমবিমুখ, শুষ্ক, কঠোর। কিন্তু বলতে চাও কি মানুষকে যে ভালোবাসেনি, কখনো সে বলতে পারে ভুলেও :—জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থম্... জীবন্মুক্তরা দেহধারণ করেন লোকের উপকারের জন্যেই—তাঁদের অশন বসন চলন বলন এমন-কি নিজের শরীর পর্যন্ত উপভোগের জন্য নয়?" (হাসিবাঁশি, ১০ পৃষ্ঠা।)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকে আরো বেশি ক'রে প্রণাম জানাতে মন চায় এই জন্যে যে, তিনি ভারতের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-ব্যাখ্যাতা শঙ্করকে আমাদের কাছে সুবোধ্য ক'রে উপস্থাপিত করেছেন। শঙ্কর সম্বন্ধে দিলীপকুমারের ১৯৪২ সালে লেখা একটি মন্তব্য পড়লে বিশ্বরূপানন্দের মহান্ করণীয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে :—

"এ-যুগ শঙ্কর-বিমুখ তো বটেই—যেহেতু বৈরাগ্য-বিমুখ। শঙ্করের তেজো দীপ্ত স্তব বা সূত্রগুলি ঝঙ্কারিত হয়ে উঠত—সম্ভ্রম জাগ্‌ত সেই চিরকুমারের প্রতি যিনি প্রেমের নাম না ক'রেও বহু মানুষকে দিয়ে গেছেন প্রেমের দীক্ষা, নৈষ্কর্ম্যতন্ত্রী হয়েও জীবনে কিনেছেন অদ্ভুতকর্মা নাম, অবাঙ্‌মনসোগোচরমের উপাসক হয়েও আমরণ তার তরফে যুক্তির ওকালতিই করে গেছেন—কায়মনোবাক্যে।" (ঐ, ১০-১১ পৃষ্ঠা।)

বিশ্বরূপানন্দের ভাষার প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতার একটু নিদর্শন দিয়ে এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনা শেষ করা হল। আশা করি, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির পাঠাগারে বইটি মর্যাদাজনক স্থান পাবে :—

"এই মায়া সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের শক্তি। ইহা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব সম্ভব হয় না। যুক্তিদৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়। এই হেতু মায়া ও তাহার কার্য জগৎকে এই মতবাদে মিথ্যা বলা হয়। এই মিথ্যা শব্দের অর্থ—বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীকত্ব নহে, পরন্তু অনির্বচনীয়ত্ব। এই 'মিথ্যা' শব্দ এই অর্থে এই শাস্ত্রে পারিভাষিক। এই মায়ারূপ উপাধি এবং তৎকৃত নামরূপাদি উপাধিযোগেই শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হন এবং তিনিই বিভিন্নরূপধারী নটের ন্যায় জগতের যাবতীয় কার্যরূপে ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হন।"

অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, এই এই অভিমতই শাক্ত গীতিকা, বৈষ্ণব পদ, কবির, নানক, মীরা প্রভৃতির ভজনাবলী—সর্বত্র অনুস্যূত ও ব্যাখ্যাত।

অধ্যাপক ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্রে পণ্ডিত নেহেরুর কথা

পত্নী কমলা ও কন্যা ইন্দিরার সহিত

নেতাজী সুভাষের সহিত

ঐতিহাসিক ঘটনা—ব্রিটেনের নিকট হইতে রাজ্য প্রাপ্তি
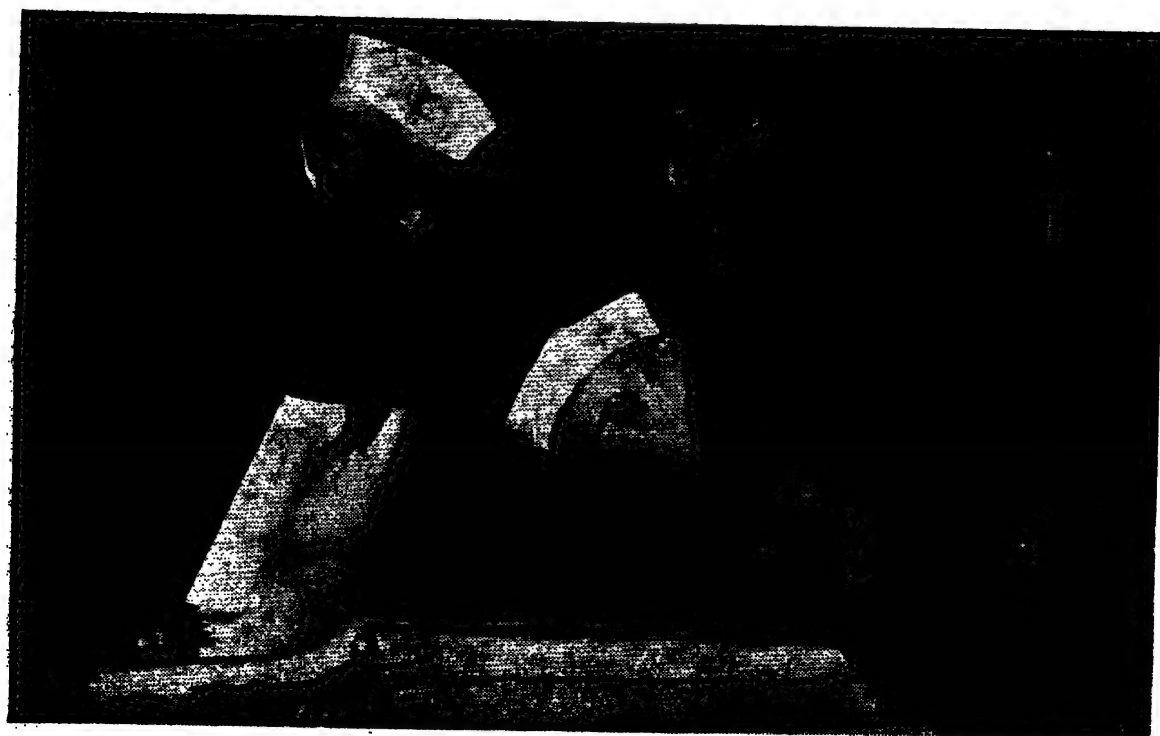
সংবিধান সাক্ষর

ঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭৯

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সমাজবাদ কাহাকে বলে ?

যে রাষ্ট্রে সকল ব্যক্তির সমান সুখ সুবিধা অর্জ্জনের উপায় পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে; অর্থাৎ কোন বিশেষ গণ্ডি বা গোষ্ঠীর মানুষের অপর সকল ব্যক্তির তুলনায় অধিক সুখ সুবিধা প্রাপ্তির পৃথক ব্যবস্থা বা সুযোগ সৃজন করা হয় না এবং সকল মানুষই নিজ নিজ প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ভাবে যথাসম্ভব উন্নতির পথে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইয়া যাইতে কোনও বাধা প্রাপ্ত হ'ন না; সেইরূপ রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক বা সমাজবাদী রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। মানুষের উন্নতির যে সকল উপায় সমাজ-পরিচালকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে, যথা শিক্ষার ব্যবস্থা, গমনাগমনের সুবিধা, চিকিৎসার আয়োজন অথবা শ্রমশক্তি যথাযথ ভাবে নিয়োগ করিয়া উপার্জ্জন করিবার সহজলভ্য বন্দোবস্ত প্রভৃতি; সেই সকল আয়োজন যদি কোথাও থাকে এবং রাষ্ট্রান্তর্গত কোন কোন স্থানে না থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে সেই রাষ্ট্রে নানান লোকের জন্য নানান ব্যবস্থা থাকায় সকল মানুষের সমান সুযোগ সুবিধা নাই, সুতরাং সেই রাষ্ট্রে সমাজবাদ সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নাই। শিক্ষা, সুচিকিৎসা বা উপার্জ্জনের সুযোগ কেহ পায় এবং অপর কেহ পায় না; এরূপ অবস্থাকে সমাজবাদী পরিস্থিতি বলা চলে না। কাহারও গৃহে যাইবার পথ সুগম ও যন্ত্রযান যোগে যাতায়াত ব্যবস্থা সমন্বিত, আবার অপর কাহারও গৃহ কর্দ্দমাক্ত দুর্গম ও সংকীর্ণ শস্যক্ষেত্রের পথে অবস্থিত। কোথাও কৃষাণ কৃত্রিম ব্যবস্থা লব্ধ জল সেচন সাহায্যে সহজেই উত্তম ফসল পায়, কোথাও বা তাহাকে সতত্তই আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাষের আয়োজন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত অপরাপর নানা প্রকার ব্যবস্থা ও অবস্থার কারণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল নিবাসী

ব্যক্তিদিগের বাৎসরিক মাথা পিছু উপার্জ্জন কোথাও ৭০০।৮০০ টাকা কোথাও বা ২০০ টাকা বা তাহা অপেক্ষাও অল্প। এরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত রাষ্ট্রে সমাজবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত এখন কথা কেহ বলিতে পারে না। দেশে ব্যক্তিগত অধিকারে গঠিত বৃহৎ বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি রাষ্ট্র-অধিকারে আনয়ন করা হয় তাহা হইলেও যতদিন নানান ব্যক্তির জীবন-যাত্রা ও উপার্জ্জন ব্যবস্থা নানান প্রকার থাকে ও কেহ অনেক সুখ-সুবিধা লাভ করে ও কেহ করে না, ততদিন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা চলে না। ব্যক্তিগত সম্পদ রাষ্ট্রকরায়ত্ত করিয়া আমলাদিগের হস্তে তুলিয়া দেওয়ার অর্থ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে যদি সকল মানবের মধ্যে সুযোগ সুবিধার সাম্য সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে তাহাকে সমাজবাদ নামে আখ্যায়িত করা যায় না। যদি কোন রাষ্ট্রে সকল কারখানা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয় এবং সকল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও কৃষিক্ষেত্রও ব্যক্তিগত অধিকার হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকারগত করা হয়, তাহা হইলেও, দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে উপার্জ্জন, সম্পদ ও জীবনযাত্রার সুখ-সুবিধার পার্থক্য প্রকটভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা চলে না।

প্রথমত দেখিতে হইবে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন ও কর্ম্মসূত্রে প্রাপ্ত গৃহ, যানবাহন, টেলিফোন, ভৃত্য, আসবাব প্রভৃতি কতটা কাহাকে দেওয়া হয়। যদি মাসিক ৫০০ শত হইতে পঞ্চ সহস্র টাকা অনেকে রাষ্ট্রীয় কার্য্যসূত্রে প্রাপ্ত হ'ন তাহা হইলে যদি দেশের অপর সকল বাসিন্দা উহা অপেক্ষা অনেক অল্প উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হ'ন সে ক্ষেত্রে কেহ বলিবেন না যে ঐ রাষ্ট্রে সমাজবাদ প্রবল গতিতে প্রবাহিত আছে। যদি শত শত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেইগুলিতে রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদিগকে বিনা ভাড়ায় অথবা অতি অল্প ভাড়ায় থাকিতে দেওয়া হয়, এবং দেশের সাধারণ মানুষ যদি অতি নিকৃষ্ট কুঁড়ে ঘরে, বস্তিতে বা বাসিন্দাবহুল ফ্ল্যাট গৃহে থাকিতে বাধ্য হয় তাহা হইলেও সেইরূপ পরিস্থিতি সমাজবাদের অস্তিত্ব পরিচায়ক নহে। সরকারী চাকুরেগণ যদি "বাতানুকূল" ট্রেনগাড়ীতে যাতায়াত করেন ও সাধারণ মানুষ যদি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বহুল কামরাতে মানুষের চাপে অর্দ্ধমৃত ভাবে গমন করিতে বাধ্য হ'ন তাহাও সমাজবাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। সাধারণ মানুষ যদি ট্রাম ও বাসে বাদুড়ঝোলা ভাবে যাইতে বাধ্য হ'ন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিশেষ সুবিধা উপভোগী কর্ম্মীগণ যদি সরকারী যন্ত্রযানে আরামে ভ্রমণ করিতে পারেন তাহা হইলে সাম্য নীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কেহ বলিবে না।

পদাধিকারজাত বিশেষ সুযোগ সুবিধা উপভোগ যে রাষ্ট্রে প্রচলিত সে রাষ্ট্রে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা যদি এরূপ হয় যাহাতে বহু শিক্ষা প্রাপ্তি ইচ্ছুক অল্পবয়স্ক নরনারী শিক্ষা না পাইয়া নিরক্ষর থাকিয়া যা'ন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে বহু নরনারী রোগ ভোগ করিয়া মহা কষ্টে দিন কাটান কিম্বা মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন তাহা হইলেও ঐ অবস্থা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে না। ইহা ব্যতীত আরও অনেক কথা থাকিতে পারে যাহাতে সাম্যের আদর্শ বিনষ্ট হয়। জাতির কথা, ভাষার কথা, ধর্ম্মের কথা ও দরবারের সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ঘনিষ্ঠতার কথা। সাম্য যেখানে প্রকটভাবে অবর্ত্তমান সেখানে নানাপ্রকার লোক দেখান সাম্য অথবা সমাজবাদের লক্ষণ শুধু সাধারণের মন ভুলান ভাবে সৃষ্টি করিলেও তাহাদ্বারা মানুষের মূল মানবীয় অধিকারগুলি জন্মলাভ করে না এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বহু আনুষঙ্গিকের অভাবও দূর হয় না। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের অনন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত্রের যথাতথা হইতে দু-চারিটি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় করিয়া লইলেই সাম্য বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হয় না। সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা তখনই হয় যখন সকল মানুষ সমানভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে, চিকিৎসার

সমান সুযোগ পায়, কর্ম্মশক্তির উপযুক্ত ও পূর্ণ ব্যবহার করিয়া যথাশক্তি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং সমাজে মাথা উঁচু করিয়া অপর সকলের সহিত সমানে ও সসম্মানে চলিতে ফিরিতে পারে। যদি সেইরূপ না হইয়া মানুষকে সর্ব্বদাই সকল কার্য্যে ও সকল প্রচেষ্টায় আমলাদিগকে তৈল মর্দ্দন করিয়া অথবা উৎকোচ প্রদান করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতে হয়, কোন কিছুর "লাইসেন্স", "পারমিট" বা "কনট্রাক্ট' পাইতে হইলেই রাজদরবারে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হয়, মুরুব্বি না থাকিলে সকল বিষয়েই অসফলতা তীব্রভাবে কর্মপ্রচেষ্টাকে গ্রাস করে; তাহা হইলে রাষ্ট্রে মানব স্বাধীনতা অথবা সাম্য ও সুনীতির কোন মূল্যই থাকে না। কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র করায়ত্ত করিয়া লইলেই তাহাতে সর্ব্বসাধারণের কোন লাভ হইবে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। ইহাতে সাধারণের কোন কোন ব্যক্তির ক্ষতিই হইতে পারে এবং হয়। লাভ কাহারও হয় না বলিলেই ঠিক হয়—শুধু আমলাদিগের শক্তিবৃদ্ধি হয়। বলা যাইতে পারে যে পুঁজিপতিদিগের লাভের পথ বন্ধ করার ইহা একটা উপায়; কিন্তু পুঁজিপতিদিগের লাভ কমাইবার জন্য বহু মধ্যবিত্ত ব্যক্তির কষ্টসঞ্চিত সম্পদ কাড়িয়া লওয়ার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এবং এইভাবে ব্যক্তিগত উপার্জ্জন, সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয়ের অধিকার খর্ব্ব করিলে তাহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের লাভ হইতেছে প্রমাণ করিতে না পারিলে ঐরূপ ভাবে ব্যক্তিগত সম্পদ কাড়িয়া লওয়া সাধারণের উপর অকারণ অত্যাচার বলিয়া ধার্য্য হইবে ও তাহার নিবারণ ব্যবস্থা জনমঙ্গলকর বলিয়া ধরিতে হইবে। অর্থাৎ পুঁজিপতিদিগের লাভ বন্ধ করিতে গিয়া যদি তুলনামূলকভাবে অনেক অধিক পরিমাণে মধ্যবিত্ত ও গরীবদিগের ক্ষতি করা হয়; এবং আমলাদিগের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া অর্থনৈতিক দুর্নীতির প্রশ্রয় লাভ ব্যবস্থা বিস্তৃত হইতে সুযোগ পায় তাহা হইলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি কখনও হওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা চেষ্টা প্রথমতঃ সেই সকল উপায় অবলম্বনে করা উচিত যাহাতে সমাজের সকল মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইতে সক্ষম হ'ন। যখন সকলেই জাতীয় মোট উৎপাদন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন তখনই কথা উঠিতে পারিবে যে জাতির আর্থিক উন্নতি কোন্ পথে অগ্রসর হইলে জাতির অধিক মঙ্গল হইতে পারিবে। যদি আর্থিক প্রচেষ্টার প্রসার ব্যক্তিগত অধিকারের পথেই চলিলে অধিক হইবে মনে হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয়করণের উপর জোর না দেওয়াই উচিত হইবে। যদি মনে হয় যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদই অধিক লাভজনক হইবে তাহা হইলে সেই পন্থা অনুসরণই কাম্য হইবে। তবে এখন অবধি যাহা দেখা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীগণ জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনা ক্ষেত্রে বিশেষ সফলকাম হইতে পারিবেন।

বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারী অসামর্থ্য

লেনিন রুশিয়াকে রুশিয়াবাসীদিগের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিয়াছিলেন বৈদ্যুতিক শক্তির অবাধ উৎপাদন ও তদ্দ্বারা রুশিয়ার সর্ব্বত্র আধুনিক যুগের উপযুক্ত মানব জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সর্ব্বব্যাপ্ত ব্যবস্থা করিবার। আমাদিগের রাষ্ট্রে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাষ্ট্র-নেতৃবৃন্দ আমলাতন্ত্রের নিকট আত্মবলিদান দিয়া যাহা কিছু করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা দ্বারা সমাজের মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুখ সুবিধা ত উপভোগ করিতেছেনই না, বরঞ্চ তাঁহাদিগের অবস্থা ক্রমশঃ আরই অভাবক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্র-করায়ত্ত করিয়া দেশবাসীর মূলধনের অভাব দূর করা হইবে কল্পিত হইয়াছিল। দেশের সকল মানুষের মূলধনের অভাব দূর করিতে হইলে প্রায় দুইলক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। ব্যাঙ্কগুলি খালি খালি করিয়া সকল অর্থ গ্রামবাসীদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেও মাত্র ১০০০/২০০০ কোটি টাকা মুরুব্বিদিগের সহায়তায় কোন কোন হাতে

যাহা গ্রামবাসীর নিকট আসিতে পারে। ফলে দেশের যে সকল মানুষের মূলধন প্রয়োজন তাহাদিগের মধ্যে শতকরা এক দুই জনের কিছু কিছু মূলধন প্রাপ্তি ঘটিবে; বাকি সকলে, যাহারা কিছু পাইয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর মনোভাব পোষণ করিয়া সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে প্রতিকূলতায় প্রবৃত্ত হইবে। যাহা করিলে গ্রামবাসীদিগের সত্যই উপকার হইত সে চেষ্টা কেহ করিল না। যথা, যে সকল গ্রামের কোন যানবাহন চলিবার উপযুক্ত রাজপথ নাই সেইগুলিকে যদি রাজপথ নির্মাণ করিয়া ভারতের সকল এলাকার সহিত সংযুক্ত করা যাইত তাহা হইলে অন্ততঃ সকল গ্রামের আর্থিক উন্নতির পথ খুলিয়া যাইত। ইহা না হইলে ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশ সমগ্র দেশের প্রায় বাহিরে থাকিয়া যায় ও অর্থ-নৈতিক গঠনকার্য্য সকল দিকে পৌঁছাইতে পারে না। কয়লার খনি, ইস্পাত ও তাম্র প্রভৃতির ব্যক্তিগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত কারবার রাষ্ট্র-করায়ত্ত করিয়া জনসাধারণের কিভাবে কোন উন্নতি হইবে তাহা কাহারও বোধগম্য হয় নাই।

কোন নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমলাদিগের পরিচালনা প্রচেষ্টা বিফল হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে স্বদেশ ও বিদেশে বহু সহস্র কোটি টাকা ঋণ করিয়া ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ব্যক্তিগত অধিকারে যাহা গঠিত হইয়াছে তাহা অনেকাংশে অধিক ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া ব্যক্তিগত অধিকারের কারবারগুলিকে আরও বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার অনেকগুলি রাষ্ট্র-করায়ত্ত করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের মানুষ আর সঞ্চয় ও আর্থিক গঠনের দিকে যাইতে ইচ্ছুক থাকিতেছে না। অর্থ নানাভাবে ব্যয় করিয়া ভোগে লাগাইবার আগ্রহই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে ও সরকারী ব্যয় বাহুল্যের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছে ও তাহার ক্রয়শক্তি হ্রাস হইয়া সকল দ্রব্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। এই মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি ক্রমঃবর্দ্ধনশীল ও ইহার ফলে বেতনভোগী মানুষের যতই বেতনবৃদ্ধি হয় মূল্যবৃদ্ধি হইয়া তাহার বেতনবৃদ্ধির কোন ফল ফলে না। মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব ইহাতে অফুরন্ত আকার গ্রহণ করে ও দেশের অর্থনীতি অচল হইয়া দাঁড়ায়। আর একটা কথাও সকলকে সমাজবাদ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া রাখে। ইহা হইল সঞ্চয় করিয়া ঘরবাড়ী জমিজমা ক্রয় করিয়া সুখে দিন কাটানর পথ বন্ধের আশঙ্কা। কেহ নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দামের গৃহ অথবা নির্দেশ-অতিরিক্ত জমি রাখিতে পারিবে না, ইত্যাদি ব্যবস্থা সাধারণের স্বাধীনতা হরণ চেষ্টা। পরে ঐ নীতি অনুসরণে মানুষকে রাষ্ট্রের দাসত্বে বন্ধন করা হইবে বলিয়া মনে হয়।

আমলাতন্ত্রের অকর্মণ্যতা বিশেষভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে লক্ষিত হইতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে ক্রমাগতই বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় এখানে নয় সেখানে বন্ধ করা হইতেছে। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে যে সকল কার্য্য করা হয় তাহা প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইতেছে। গৃহস্থের ও দোকানদারের খাদ্য বস্তু, ঔষধ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসায় অসুবিধা হইতেছে এবং কল কারখানা থাকিয়া থাকিয়া বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপ হইতেছে অনেককাল ধরিয়া ও আমলাদিগের কর্ম্মশক্তি নাই বলিয়াই ইহার কোনও প্রতিকার হইতেছে না। যাঁহারা কোটি কোটি টাকা ঋণ করিয়া অপব্যয় করিতে পারেন তাঁহারা যে ব্যবস্থা করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন অধিক করিয়া করাইতে পারেন না একথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। সাধারণ এই সরকারী দীর্ঘসূত্রিতার ফলে শত শত কোটি টাকার লোকসান, বহু অসুবিধা ও স্বাস্থ্যহানি সহ্য করিয়া চলিয়াছেন। বিশেষ কোনও চেষ্টাও সরকারী তরফে কেহ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। লেনিনের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্বন্ধে উপদেশ; তাহারও কোন মূল্যবোধ কাহারও মনে জাগ্রত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। কি কর্ত্তব্য তাহা যে বুঝিতে চাহে না,

শুধু রাষ্ট্র হস্তে ব্যক্তির অধিকার বিনষ্ট করিতেই ব্যস্ত থাকে, তাহার দ্বারা সমাজবাদ অথবা অপর কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সে শুধু নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিতে চাহে; অর্থাৎ অপরের শক্তি ও অধিকার বিনাশ করিয়া। আমলাদিগের বা রাষ্ট্র-নেতাদিগের একাধিপত্য প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহা জনমঙ্গলকর হইবে এইরূপ ধারণার মূলে কোনও সত্য আছে কি না তাহা বিশেষ অনুসন্ধান ও বিচারের কথা।

চিনি লইয়া কি হইতেছে?

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে চিনির মূল্য কিলো পিছু ১৬ পয়সা হ্রাস করা হইবে। বাজারে কিন্তু কেহ চিনি ক্রয় করিতে যাইলে দোকানদার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য চাহিতেছে এবং অনেক স্থলে চিনি নাই বলিতেছে। শুনা যায় যে নূতন মূল্য স্থির হইয়াছে এক টাকা নিরানব্বই পয়সা কিলোতে এবং বাহিরে খোলা বাজারে তিন টাকা, চার টাকা কিলো হারে চিনি বিক্রয় হইতেছে। মূল্য হ্রাস হইলে জনসাধারণ মনে করেন যে দ্রব্যের উৎপাদন অনেক অধিক হইয়াছে কিন্তু চিনির উৎপাদন শুনা যাইতেছে বর্ত্তমানে অনেক কম হইয়াছে। যদি এই কথা সত্য হয় তাহা হইলে মূল্য হ্রাস হইতেছে কেমন করিয়া? দুর্মুখ লোকে বলিবে যে উৎপাদন ঠিকই হইয়াছে শুধু উৎপন্ন বস্তুর অনেকাংশ কালো বাজারে চলিয়া যাইতেছে এবং সেই পরিস্থিতিতে উৎপাদক কারখানাগুলি অল্প মূল্যে কিছু চিনি সরকারী দোকানগুলিকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া কালো বাজার হইতে লাভের ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন চিনি উৎপাদন সত্য সত্যই অল্প হইয়াছে এবং তাহার কারণ আখের চাষ উপযুক্ত পরিমাণে করা হইতেছে না, মূল্য কম স্থির করার জন্য। যাহাই হউক বুঝা যাইতেছে যে ইহা সুব্যবস্থার অভাবের আরেকটা উদাহরণ। অর্থনীতি ক্ষেত্রে সরকারী হুকুমও চালবে অথচ সেই হুকুম কার্যকর হইবে না, উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করিবে, এই রীতি চলিতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী

বর্ত্তমান যুগে যে সকল মহামানব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে পাশ্চাত্য বিদ্যার ও ভারতীয় জ্ঞানের আধার ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ইংলণ্ডেই বাস করিয়া শিক্ষালাভ করেন ও পরে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় শাসকদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মহাবিপ্লবীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন ও যোগ-সাধনা করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান অনুসরণে পরম সত্য উপলব্ধি করিয়া ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন এবং এখন হইতে এক বর্ষকাল তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হইবে। তাঁহার ভক্তদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই ভক্তি মার্গের পথিক; কিন্তু অনেকে আছেন যাহারা শ্রীঅরবিন্দকে ভারতীয় বিপ্লববাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিশেষ সংবর্ধনার অধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। একথা ঠিক যে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাইবার পূর্ব্বে স্বাধীনতা লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া বিপ্লবেই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সহিত সর্ব্বভারতীয় বিপ্লবীদিগের সংযোগ ছিল এবং তিনি বাংলার বাহিরে মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশের ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহাকাঙ্ক্ষী বহু লোকের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহাকে যখন ব্রিটিশ শাসকগণ গ্রেপ্তার করিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তখন তিনি দর্শন ও যোগ-সাধনার উপর নির্ভর করিতেন না। ঐ সকল অভিযোগ কাটাইয়া তিনি যখন ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করাই স্থির করিলেন তখন হইতেই তাঁহার বিপ্লবী জীবনের অবসান হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ হইল।

তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর প্রতিদিন বহু সময় ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন

তাহা তাঁহার শিষ্যদিগের সম্মুখে যোগের একটি নতুন অর্থ উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। মানব জীবন যে এক উন্নততর জীবনেরই অংশ এবং সৃষ্টির সকল সত্তাই যোগসূত্রে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এই শিক্ষাই শ্রীঅরবিন্দ জগৎবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। বিশ্লেষণ অস্ত্রে সকল বৈপরীত্য উন্মোচিত করিয়া ভিতরের ঐকাত্ম্য প্রদর্শন দর্শন ক্ষেত্রে সহজসাধ্য নহে; কিন্তু তাহা অসম্ভব নহে। জবাহরলাল নেহেরু শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পরে বলিয়াছিলেন যে তিনি ভারতের পূর্ব্ব-যুগের ঋষিদিগের শেষ প্রতিনিধি। তাঁহাকে জানিলে ও বুঝিলে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সহিত ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠা সম্ভব হয়।

ফরক্কা

ফরাক্কাতে যে ঠিক কি হইবে তাহা শুধু অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে প্রথমতঃ যে সকল অবস্থাগত সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ফরক্কা বাঁধ ও ভাগীরথীর জলস্রোত রক্ষার জন্য অতিরিক্ত জল আনিবার খালের পরিকল্পনা স্থির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, শেষ অবধি দক্ষিণ ভারতীয় মন্ত্রীদিগের কূটতর্কের অন্যায় অবতারণার ফলে সেই সকল ধারণাই বর্জ্জন করিয়া নূতন পথে চিন্তা করিবার প্রয়োজনের সূচনা হয়। কে এল রাও-এর মতে সর্ব্বসময়েই যে ৪০০০০ কিউসেক জলের আবশ্যকতা সকল বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল তাহা ২০০০০ কিউসেকে পরিণত হয় এবং তিনি আরও বলেন যে গঙ্গার উপরদিকের জলস্রোত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার অপরাপর প্রদেশেরই পশ্চিম বাংলা অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই জাতীয় কথার অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে কেন্দ্রীয় সরকার শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে সকল পরিকল্পনাকে বাস্তব আকার দান করেন সে সকল অর্থব্যয় অপর প্রদেশের মন্ত্রীদিগের ইচ্ছামত যখন তখন নাকচ করিয়া খরচের খাতায় লেখার ব্যবস্থা হইতে পারে। অর্থাৎ সকল প্রদেশেরই ভিতর দিয়া যে সকল নদী, খাল, রাজপথ বা রেলপথ গিয়াছে সেইগুলির ব্যবহার প্রাদেশিক শাসকদিগের ইচ্ছায় চলিবে; কেন্দ্রের নিখিল ভারতীয় বিলিব্যবস্থাকে গ্রাহ্য করিতে প্রদেশ বাধ্য নহে। ইহা দ্বারা মনে হইতে পারে যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অথবা ইষ্টার্ণ রেলওয়েকে বিহার প্রদেশের মালিকগণ দেওয়াল তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারেন কিম্বা যথেচ্ছা ভিন্ন পথে চালাইয়া দিতেও পারেন। কিন্তু ঐ প্রকার অধিকার বিহার বা উত্তর প্রদেশের থাকিতে পারে না এবং থাকা উচিতও নহে। সুতরাং গঙ্গার জলস্রোত যত্রতত্র বহাইয়া চালাইবার অধিকারও তাঁহাদের থাকা উচিত নহে এবং সেইরূপ অধিকার আছে ধরিয়া লইয়া তাঁহারা যদি গঙ্গার জলস্রোত খাল কাটিয়া অন্যদিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহাও আইনতঃ তাঁহাদিগকে করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। কারণ সমগ্র ভারতের স্বার্থ প্রথমে রক্ষণীয় ও প্রাদেশিক স্বার্থরক্ষার কথা তাহার পরে আসে। পশ্চিম বঙ্গ যদি রাজপথ ও রেললাইন কাটিয়া দিয়া বিহার ও উত্তর প্রদেশের গমনাগমন ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দেয় তাহা প্রায় খাল কাটিয়া গঙ্গার জলস্রোতের ভিন্ন পথে চালনারই সহিত তুলনীয় হইবে। এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে সকল বিহার ও উত্তর প্রদেশ বাসীকে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করাও ঐ জাতীয় উৎকট প্রাদেশিক অধিকার জাহির করার একটা পন্থা হইতে পারে।

আমরা জানি না শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কি উপায় উদ্ভাবনা করিয়া ফরক্কা সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি বিহার ও উত্তর প্রদেশের খালগুলির জল লইবার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রয়োজন মত ভাগীরথীতে ফরক্কা হইতে ৪০০০০ কিউসেক জল আনিবার সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুখ্য মন্ত্রীর "সাদা কাগজ" সাদা থাকিবে। যদি তাহা না হইয়া কে এল রাওয়ের কারসাজিতে সিদ্ধার্থশঙ্কর পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থহানিকর কোন ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া থাকেন তাহা হইলে সাদা কাগজের বর্ণ মসীলিপ্ত হইয়া দেখা দিবে।

কলিকাতার ভবিষ্যৎ ফরক্কার জলস্রোত নিয়ন্ত্রণের

উপর নির্ভর করিতেছে। কলিকাতার যদি জলাভাবে বন্দর হিসাবে অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির একটা চরম দুরবস্থা উপস্থিত হইবে। লক্ষলক্ষ মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকিবে না ও বহু সহস্র কোটি টাকায় নির্ম্মিত এই বিরাট সহর ক্রমশঃ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে।

দিল্লী বিমান বন্দরে বিমান ধ্বংস

কয়েক দিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর একটি ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমান বোম্বাই হইতে দিল্লী আসিতেছিল। দিল্লীর বিমান বন্দরে অবতরণ করিবার সময় প্রথম চেষ্টাতে বিমানটি নামিবার পথ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাওয়াতে বিমান চালক পুনর্ব্বার বিমান বন্দর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া অবতরণ করিবেন স্থির করিয়া আকাশ পথে পুনঃ পরিক্রমণ আরম্ভ করেন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে তিনি ঐভাবে আকাশে উড়িয়া চলিবার সময় কিছু দূরের মাসাদপুর গ্রামের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া ভূপতিত হ'ন ও সকল যাত্রী ও বিমানকর্ম্মী সহ নিহত হ'ন। বিমানটিতে ১৪ জন যাত্রী ও ৪ জন কর্ম্মী ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন পার্লামেন্টের সভ্যও ছিলেন; আর ছিলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান, একজন রুশিয়ান ও একজন আমেরিকান। বিমানটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া দুই বর্গ কিলোমিটার জুড়িয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় ও মৃত ব্যক্তিদিগের চেহারা দেখিয়া সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়। ভারতীয় বিমানগুলির নিরাপদ গমনাগমনের একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ দুর্ঘটনা দ্বারা সেই সুনাম নষ্ট হয় ও সেইজন্য সর্ব্বসাধারণের মনে এই বিমান ধ্বংসের কথাটি একটি গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। সকলেই জানিতে চাহিতেছেন যে এরূপ দুর্ঘটনা কেমন করিয়া সম্ভব হইল। বলা হইয়াছে ঐ সময় ঝড় বৃষ্টির কোন প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল না; কিন্তু সত্যই কি ছিল না? মাসাদপুর গ্রামের নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি কি বিমান বন্দরের অতি নিকটে? যদি তাহা হয় তাহা হইলে সেইগুলির সম্বন্ধে বিমান চালকদিগকে সতর্ক করিবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানগুলি কত পুরাতন ও সেগুলি ঠিকভাবে চলে কি না ইত্যাদি নানা প্রশ্নই সকলের মনে জাগ্রত হইতেছে। একটা তদন্ত হইবে নিঃসন্দেহ এবং তাহা হইলে পরে হয়ত জানা যাইবে ঐ দুর্ঘটনা কি কারণে সম্ভব হইয়াছিল। এরূপ যাহাতে আর কখনও না হয় সে ব্যবস্থা করার চেষ্টা অবশ্যই হইবে।

মানব জীবন ধারণের বিপরীত অবস্থা

মানুষ যেখানে ও যেভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে সেই পারিপার্শ্বিক কোথাও কোন সময় জীবন নির্ব্বাহের সহায়ক হয় এবং অপর কোথাও অন্য সময়ে অবস্থান্তরে জীবন ধারণের পক্ষে বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল হয়। এই বিষয়টি বর্ত্তমানে মানব মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিতেছে; কারণ বহুস্থলে মানুষ নিজেই নিজ জীবন ধারণ অসম্ভব করিয়া তুলিতেছে এবং বিশেষজ্ঞদিগের মতে মানুষ নিজ কর্ম্মধারা সংশোধন করিয়া জীবন ধারণ সহজ ও সম্ভব করিবার চেষ্টা না করিলে আর এক শত বৎসরের মধ্যেই এই পৃথিবী মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া যাইবে ও মানুষ অগণিত সংখ্যায় অকাল মৃত্যু বরণ করিয়া মনুষ্যজাতির ধরা পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্দ্ধানের সূচনা সম্পাদনে নিযুক্ত হইবে। এই যে পারিপার্শ্বিককে জীবন ধারণের অযোগ্য ও বিপরীত করিয়া তোলা ইহা বাস্তবে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বায়ু মনুষ্য চালিত কল কব্জা চুল্লি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ধূম্রে ও বিষাক্ত বাষ্পে ক্রমশঃ এমনভাবে শ্বাস গ্রহণের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে যে সর্ব্বত্রই মানুষ কি করিয়া ধূম্র ইত্যাদি বৃদ্ধি না পায় সেই চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈদ্যুতিক ব্যাটারী চালিত মোটর গাড়ী ও চুল্লির পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎ ব্যবহার কি করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে বলা যাইতেছে। সহরের ও কারখানার নালার জল এখন অবাধ যথেচ্ছ নিকটস্থ নদী বা সমুদ্রে ফেলা হইয়া থাকে। ইহার ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব

ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মাছও আর পূর্ব্বের ন্যায় নদী বা সমুদ্রে বর্দ্ধিত হইতেছে না। স্থলে যে সকল কীট বিনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহার বিষে খাদ্য বস্তু উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি হইতেছে। ইহা ব্যতীত পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় রশ্মির উদ্ভবও কখন কখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও যন্ত্র বাহুল্যের ফলে আকাশে বাতাসে এমন মারাত্মক শব্দ উত্থিত হইতেছে যে স্নায়ু পথে সেই দুঃসহ শব্দতরঙ্গ মানুষের বিনাশের কারণ হইয়া দেখা দিতেছে। মানুষও যন্ত্রজাত শব্দের প্রাবল্যের সহিত নিজ কণ্ঠ বা হস্তচালিত বাদ্য ইত্যাদি প্রসূত শব্দ জুড়িয়া কোলাহল শতগুণ করিয়া তুলিতেছে। মিছিল, সভা, কীর্ত্তন, ঐকতান বাদ্য, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি নানা উৎকট শব্দ উৎপাদনের উৎস ভারতবর্ষে মানবকর্ণ বিদারণ করিয়া তাহাকে শারীরিক বিনাশের আরও নিকটে লইয়া যায়। শব্দ যে পরিপার্শ্বিককে মানব জীবন ধারণের অযোগ্য করিয়া তোলে একথা সর্ব্বজন-বিদিত কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ অকারণে প্রবল শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া নিজ জীবন বিপন্ন করিতে দ্বিধা করে না।

মানুষ নিজ কর্ম্ম পদ্ধতি দ্বারা এই কথাই প্রমাণ করে যে তাহার বিশ্বাস মনুষ্যজীবন কিছুতেই কোন চরম পরিণতিতে পৌঁছাইয়া বিলোপের আবর্ত্তে পড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে ভোগসামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি সমানে চলিবে ও তাহার কোন শেষ হইবে না। কিন্তু বস্তুতঃ কোন কিছুই অসীম বৃদ্ধির পথ অবলম্বনে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বৃদ্ধি সর্ব্ব সময়েই বর্দ্ধনশীল, যাহা তাহাকে নিজ ভারেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যবস্থাও নিজ আকার বৃদ্ধির ফলে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। ইংরেজীতে বলা হয় পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার নাম "সিলভার জুবিলি" অথবা রজত জয়ন্তী। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইলে পরে মানুষের স্বভাবতই মনে হয় পঁচিশ বৎসর স্বাধীন থাকিয়া কি লাভ হইল, কোন্ কোন্ উচ্চ আদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল, জাতি কি কি মহৎ কার্য্য করিল? ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে গৌরবের কথা নাই এমন নহে; আবার যে অগৌরবও নাই তাহাও বলা চলে না। খুব বড় কথা হইল এই যে আমরা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলাম ও অন্য অনেক রাষ্ট্র স্বাধীন হইবার পরে একনায়কত্বের স্বৈরাচারে নিমজ্জিত হইয়া গিয়া থাকিলেও আমরা পঁচিশ বৎসর কাল নিজত্ব রক্ষা করিয়া সাধারণ-তন্ত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণতন্ত্র অনুগামী রাষ্ট্র ও আমরা পাঁচবার সাধারণ নির্ব্বাচন কার্য ২০ কোটি ভোট দাতার দ্বারা শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত করিতে পারিয়াছি। ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমাদের সংবিধান প্রণয়ন যেভাবে করা হইয়াছিল ও সেই সংবিধান যেরূপ নানান শাখা প্রশাখার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া গঠিত হইয়াছিল তাহাও কম প্রশংসনীয় নহে। জগতের ইতিহাসে যেসকল রাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনার কথা বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ভারতীয় সংবিধানের রচনা কাহিনীও সেই সকলের মধ্যে স্থান লাভ করিবে। ভারত শাসন ক্ষেত্রে অনেক স্থলে দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া গিয়া থাকিলেও অপর বহু বিষয়ে উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা একটি নব গঠিত দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে গৌরবের কথা, স্বীকার করিতেই হইবে। ভারত যদি বিদেশীদিগের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়া বৈদেশিক প্রেরণায় কারখানা-বাদ প্রতিষ্ঠা চেষ্টা না করিত তাহা হইলে ভারতের আদর্শচ্যুতির সম্ভাবনা ততটা প্রকট ভাবে রূপায়িত হইত না। বিগত পঁচিশ বৎসরে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কারণে ভারত কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; এবং সকল সময়েই

পরবর্ত্তী অংশ ৭১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা

অধ্যাপক শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা প্রধানত বহির্মুখী। দেহ ও প্রাণচেতনার রাজ্য অতিক্রম ক'রে এলেও এখন পর্যন্ত এই সাহিত্যে বিচার-বিশ্লেষণ-প্রধান মনোজিজ্ঞাসাও ভালো ক'রে ফোটে নি। তিন-চার জন ষাটের বেশি বয়স্ক অতি-প্রবীণ সাহিত্যিকের রচনায় এই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ-পটুতা দেখা গেছে : দিলীপ-কুমার, মণীন্দ্রলাল, বলাইচাঁদ, অন্নদাশঙ্কর ও বুদ্ধদেব ; এঁদের মধ্যে মণীন্দ্রলাল, প্রায় অবসৃত। অন্তরাকৃতির কোন চিহ্ন এ-সাহিত্যে আর দেখা যায় না। বিভূতি-ভূষণের পরলোকগমনের পর এবং দিলীপকুমার "অঘটন" নিয়ে মেতে ওঠার ফলে, যে মনোবিশ্লেষণ এযাবৎকাল আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব'লে পরিগণিত হয়েছে, তাতে বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের বীতরাগ বরাবর লক্ষ্য করা গেছে। এ-ক্ষেত্রে যথোচিত বিকাশের আগেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদ্বর্তিতা উদ্বেগজনক অবক্ষয়ের বিষয়।

মনোজিজ্ঞাসাকেও অতিক্রম ক'রে মানবের অন্তর্লোকে সন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণের উৎসুক প্রয়াস সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে বারবার দেখা গেছে যা প্রকৃত পক্ষে মনোজিজ্ঞাসার স্বাভাবিক পরিণতি। চিন্তাশীল মানুষ জীবনের সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবে, অথচ তার সমাধান কোথায়, তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে না, এমন হতে পারে না। সমাধান অন্বেষণে লেখকের অক্ষমতা তার সৃষ্টিকর্মের অসম্পূর্ণতাকেই প্রতিপন্ন করে। সাহিত্য সৃষ্টি করে যে মানস-চেতনা, সে দেহ ও প্রাণের রাজ্যে, ঘটনাবলী, পরিবেশ-রচনা ও চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তার অনুসন্ধান প্রায় শেষ ক'রে মানসিক বিচার ও ব্যবচ্ছেদপ্রবণ বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বহুকাল থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকে মনেরও ঊর্ধ্বলোকের কোন চেতনার আলোয় সমগ্র বিশ্বসত্তাকে নতুনভাবে নিরীক্ষণ করতে পাশ্চাত্য শিল্পীরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সেই অভীপ্সা আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষত ইংরেজি ভাষায় রচিত সাহিত্যে ক্রমেই পরিস্ফুট হল সমারসেট মম, অলডাস হাক্স্‌লি প্রভৃতির রচনায়। ইংরেজি সাহিত্যের এই ঊর্ধ্বাভিসারে সহায়তা করেছেন ইংরেজ ব্যতীত আইরিশ, আমেরিকান ও ভারতীয় সাহিত্যিকবৃন্দও। জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় মহাদেশীয় ভাষায় সাহিত্যেও এই ধারার স্ফুরণ দেখা গেল হেরমান হেসে, লুইজি পিরানদেল্লো প্রভৃতির রচনায় কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যথাসময়ে এই ঊর্ধ্বপ্রয়াণের চিহ্ন একেবারে দেখা গেল না বললেই হয়। বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়ের রচনায় চকিতে দেখা দিয়ে এই অলখ্‌ জগতের পরম আলোক আমাদের জীবনভরা বেদনা নাশের কোন ব্যবস্থা না ক'রে যেন চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৯৫০ সালে বিভূতিভূষণের অকালমৃত্যুর পর আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য বিশেষভাবে শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর-বলাইচাঁদ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের দ্বারা অনুসৃত বিশেষ এক ধরনের কাহিনী ও চরিত্র প্রধান সাহিত্য সৃষ্টির দিকে মোড় ফিরল। রোমান্সই হোক বা নভেলই হোক, ছোট গল্প হোক বা দীর্ঘায়ত উপন্যাস হোক, সব রচনাতেই অগভীর চেতনার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্বমনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অভিব্যক্তির দিকে থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে

নিতান্ত পশ্চাৎপদ তার অসংশয় পরিচয় বহন করবে গত ত্রিশ বছরের কবিতা-নাটক-গল্প-উপন্যাস। অবশ্য রাজনৈতিক মতবাদ রূপায়ণের কাজে কিম্বা পারি-পার্শ্বিকের একান্ত অধীন যে জনতা তার অন্ধ আবেগ প্রমূর্ত করার সাধনায় বাঙালি সাহিত্যিকেরা যে মোটামুটি রুশ-চৈনিক-মার্কিন ধারা বরাবর এগিয়ে চলেছেন, সে-সত্য অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। কিন্তু অনুদ্দীপ্ত স্থূল যৌন আবেগ রূপায়িত করার মার্কিন পদ্ধতি বা বড় জোর আলবের্তো মোরাভিয়ার বস্তুনিষ্ঠ সমাজ দর্শনের অনুকরণ, কৃষক-দরদী চীনা বা শ্রমিক-সেবক রুশ সাহিত্যশিল্পীর অত্যন্ত গতানুগতিক মামুলি জীবনচিত্র-অনুসরণ—এ-সবের দ্বারা আধুনিক বাঙালি সাহিত্যিকদের কোন রসসিদ্ধি বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা নেই। যে-বৈফল্যবোধ বরিস পাস্তেরনাকের মতো মহান্ শিল্পীকেও অভিভূত করেছে, তাঁর চেয়ে অনেক নিম্ন স্তরের হয়েও বাঙালি সাহিত্যিকেরা যদি তাঁরই ধারা অনুসরণ করেন তা হলে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যর্থতার গ্লানি তাঁদের বিধিলিপি।

প্রবুদ্ধ চেতনার দ্বারা জাগতিক সমস্যাগুলির বিচার করার, নতুন সংশ্লেষণী মনোবৃত্তি নিয়ে অভাবিতপূর্ব সমাধান অনুসন্ধানের কোন প্রচেষ্টা আজ কোথাও দেখা যায় না। বাঙালি সাহিত্যিকরা কেউ কেউ অবচেতনার দ্বার উদঘাটন ক'রে পাতালপুরীর রহস্যময় গহ্বরে সন্ধানী রশ্মির আলোক সম্পাত করলেও উর্ধ্বচেতনার তোরণদ্বার অতিক্রম করার সাধনায় তাঁদের তামসিক উদাসীনতা দেশের কল্যাণকামী-মাত্রকে ব্যথিত করবে।

১৯৪১-৭১ সালের মধ্যে লিখিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সামান্য চিত্তরঞ্জিনী শক্তি ব্যতীত স্থায়ী কোন সাহিত্যসম্পদ প্রায় কোন রচনাতে দেখা যায় না। মননশক্তির যে-গভীরতার সঙ্গে অন্তরলোকের স্বত উচ্ছ্বসিত রসপ্রবাহ সংযুক্ত হলে তবে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, যা একাধিকবার পাঠে প্রাণহীন ব'লে প্রতীয়মান হয় না এবং যা সমসাময়িকতার একান্ত বশম্বদ নয়, সে-গভীরতার ক্ষীণতম আভাসও দেখা যায় না পূর্বোক্ত চার-পাঁচ জনের কোন কোন রচনায় ছাড়া। বস্তুত যে-মহৎ মানসের অভিব্যক্তিতে বাংলা সাহিত্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশকে প্রথম উষাসঙ্গমে রঞ্জিত পূর্বাশার মতো নবোন্মেষরাগরক্তিম হয়ে উঠেছিল, তা যেন বড় বেশি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছে। আমাদের জন্যে পড়ে আছে বিকৃত কামপ্রবৃত্তি আর দলীয় রাজনীতির চর্চা।

১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ এবং ৭ই ডিসেম্বর জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে প্রবেশের ফলে দ্রুত আবির্ভূত রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় পরম্পরার প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শোচনীয় অপকর্ষ সাধিত হয়েছে। কোন জাতির সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়ের যুগে তার সাহিত্য সম্পূর্ণ অক্ষত থাকা অসম্ভব। অবশ্য এর জন্যে "অবস্থার দাস" বাঙালি নিজেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। সমগ্রভাবে বিচার করলে বাঙালি আজ যে সাংস্কৃতিক অধোগতির সম্মুখীন হয়েছে, সেই ধ্বংসোন্মুখ অপকর্ষের প্রভাব পড়েছে তার সাহিত্যেও। মুসলিম আমল বা নবাব-বাদশাহি রাজত্বের অবসানে এবং ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে এই বাংলা দেশেই একদা যে নিম্নরুচি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, ইংরেজ রাজত্বের অবসানে এবং হিন্দুস্থানি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনায় তারই কদর্যতর পুনরাবির্ভাব দেখা যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যের তথা সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের বিশেষত সঙ্গীতের সাম্প্রতিক অধোগতির কারণের মূলে যে হিন্দুস্থানি অর্থাৎ হিন্দি-উর্দু ভাষাসাম্রাজ্যবাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব সক্রিয়, তার প্রমাণ স্বরূপ ১৩৭৫ সালের কার্তিক সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের দুটি মূল্যবান্ অভিমত উল্লেখ করা হল। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণদান কালে আচার্য সুনীতিকুমার বলেছিলেন, "আমাদের স্কুল এবং কলেজগুলিতে পাঠরত অহিন্দিভাষী বালক-বালিকাদের জন্য

আবশ্যিক হিন্দির আমি তীব্র বিরোধী।" তারপর রবীন্দ্রনাথের একটি রচনাংশ তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন:—

"বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিল হইবে, সে যদি হিন্দুস্থানিদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁচে বাংলা লিখিতে থাকে, তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানি তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে, অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ, এ-সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, তবে ইহা মরিতে চাহিবে না এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা, অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।' সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুঁদিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা—বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে-সুবিধা তাহা দু দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে-সুবিধা, তাহাই সত্য।" ("হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়", ১৩১৮, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৮১-৮২।)

এর পর সুনীতিবাবু নিজেই বলছেন:—

"এই জাতীয় অভিমত আমি নাগরী অক্ষরে হিন্দির মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যের জন্য যাঁহারা উদ্বিগ্ন, সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দিভাষী, তাঁহাদের স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বলিতে শুনিয়াছি।... হিন্দির গর্ভে নিমজ্জিত করার পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির 'হিন্দিকরণ' করিতে চাহেন। অভিপ্রেত না হইলেও কার্যক্ষেত্রে ভাষানীতির রূপায়ণ ঐ পথেই যাইতেছে।" (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৭৫, পৃষ্ঠা ২১-২২)।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গর্ব ক'রে বলেছিলেন, বাঙালি গানের রাজা। সেই গর্বোক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রে সরকারি প্রশ্রয়ে মাইক সহযোগে মস্তানদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে কুশ্রাব্য হিন্দুস্থানি গানের প্রচার চলতে দেওয়া হচ্ছে এই আশায় যে এর ফলে হিন্দি গানের জনপ্রিয়তা তথা হিন্দি ভাষার প্রসার বৃদ্ধি পাবে।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্কিপর্বে ১১৬০-১৮৩১ সালে যেমন রাশি রাশি কবি-গান ও খেউড়-শ্রেণীর গীতিকা লেখা হয়েছিল, তেমনই বর্তমান কালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অজস্র গল্প, উপন্যাস ও গদ্যকবিতা রচিত হচ্ছে যেগুলির অন্তঃসারশূন্যতা সমধিক পরিস্ফুট। যথেষ্ট পরিমাণে দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তপদাবলী, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদী এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীতও গ্রামোফোনে রেকর্ড করা বা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় না। অথচ অতি অক্ষম আনাড়ি কবিদের রচনা জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে প্রচার ক'রে বাংলা গানের মান ও আদর্শ নামিয়ে এনে হিন্দি গানের পর্যায়ে ফেলার চেষ্টা চলেছে।

এই অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের মনোভূমিতে যেখানে আগাছার ফসল ফলেছে সর্বাধিক, সেই দলীয় রাজনীতির মহা-অরণ্যে বাঙালি আজ পথহারা। বাঙালি সাহিত্যিকের স্বধর্ম প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। বাঙালির মন আজ রসোপলব্ধির মূল উৎসের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ব'সে আছে। যেখানে বিশ্বমন ঊর্ধ্বগামী হয়ে মহত্তর সার্থকতার নক্ষত্র-লোকে আরোহণের জন্যে তার বহুদিনের স্বপ্নকুসুমগুলি একে একে চয়ন ক'রে সযত্নে নবীন অর্ঘ্য প্রস্তুত করছে বিশ্বদেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদানের অভিলাষে, সেই সমৃদ্ধ মানসের স্বপ্নপ্রাঙ্গণ কাননভূমিতে পুষ্পচয়নব্রতী কোন বাঙালি সাহিত্যিককে আজ আর দেখা সহজ নয়।

সাহিত্য যেখানে রাজনৈতিক দলীয় প্রচারধর্মী, সাহিত্যে যেখানে গোষ্ঠীচেতনার প্রকাশ, সেখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অনুগামী। কিন্তু যেখানে সাহিত্যে বৃহত্তর সম্প্রসারিত চেতনা নিয়ে জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান খোঁজার প্রয়াস পাওয়া হয়, সেখানে বাঙালি সাহিত্যিক পশ্চাৎপদ।

সাধারণ গড়্‌পড়্‌তা মনের কাজই হচ্ছে, যে কোন জিনিসকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখা, অংশকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা। মহতী বুদ্ধি বা বোধির কাজ বস্তুকে সমগ্ররূপে দেখা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিচার ক'রে দেখা। আধুনিক বাঙালি লেখকের রচনায় এই সমগ্র দৃষ্টির একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথের রচিত সমসাময়িক জীবনসমস্যাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এখনকার মনস্বীদের লেখা প্রবন্ধগুলির তুলনা ও আলোচনা করলে তা বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের কালান্তর বা স্বদেশ শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময়ে বিস্তীর্ণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির ওপরে স্থাপিত সমস্যাগুলিকে মুক্তদৃষ্টিতে দেখে তাদের প্রতিকার নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি সর্বত্র অক্ষুব্ধ প্রশান্তির সঙ্গে ধীরভাবে সমস্যাগুলির সব দিক বিশ্লেষণ ক'রে একটি সর্বজনহিতকর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস করেছেন। এখনকার প্রবন্ধলেখকরা সমস্যার আলোচনার সময়ে সেই অটল মানসস্থৈর্য ও চিত্তপ্রসার একেবারেই দেখাতে পারেন না। সেই জন্যে প্রধানত সমস্যাজড়িত সাহিত্য-সৃষ্টি করলেও এ-যুগের সাহিত্যিক কোন স্পষ্ট বা বলিষ্ঠ সমাধান দিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কি শরৎচন্দ্রের মধ্যেও এ-যুগের লেখকদের মতো দ্বিধা ও সংশয় ছিল না।

বাংলা সাহিত্য এখন কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট গতিচক্রের মধ্যে বারবার আবর্তিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনায় পূর্বনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ ক'রে গতানুগতিক বিষয় নিয়ে বৈচিত্র্যহীন ভঙ্গিতে রসসৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতের পাঁচালি রচনার সময় থেকে বাঙালি লেখকের যে-স্বভাব—একজনের পরিকল্পিত অভিনব কোন রচনার অনুকরণে অনেকগুলি বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি-সৃষ্টি—তা আজও প্রবলভাবে বর্তমান। আমাদের এখন কিছুদিন অন্তর্মুখী হয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিচারণা প্রয়োজন। অন্যথায় আমরা হারিয়ে-ফেলা অন্তঃপ্রেরণার চির-প্রবহমান উৎসধারা খুঁজে পাব না, অন্যমনস্ক বহির্মুখী প্রাণাবেগ ও মানসিক বিক্ষোভের মরুবালুতে আমাদের আত্মচেতনার স্বচ্ছসলিলা নদীটি হয় তো চিরদিনের জন্যে শুকিয়ে যাবে।

এই আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে যখন ভৌগোলিক বাংলাদেশে বাঙালি জাতি সম্প্রদায়নির্বিশেষে বিশেষ ভাবে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, উদ্বাস্তু এবং চমৎকারা অন্নচিন্তায় প্রপীড়িত। বাঙালির বাসভূমি রাষ্ট্রীয় দিক থেকে বহু খণ্ডে বিভক্ত; সে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অপমৃত্যুর সম্মুখীন। জীববিশেষের পক্ষে যেমন অন্য জীবের উদরে প্রবেশ ক'রে তার দেহপুষ্টি ঘটিয়ে তার অঙ্গীন হয়ে তার পরিচয়ে পরিচিতরূপে জীবিত থাকা বীভৎস মৃত্যুর নামান্তর মাত্র, সেই রকম পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের অঙ্গীভূত হয়ে বাঙালির পক্ষে স্বারাজ্য-সিদ্ধি কখনও সম্ভবপর নয়। এই রাষ্ট্রচেতনাপ্রধান যুগে রাষ্ট্রনৈতিক স্বকীয়তা লুপ্ত হলে সাংস্কৃতিক লুপ্তিও ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী। এ-ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানরা অনেকটা সচেতন হলেও পূর্ব বঙ্গের হিন্দু, পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান এবং বিশেষ ক'রে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা একেবারে বোধশূন্য।

নিজের দোষে নানা কদাচার ও কুৎসিত মতবাদের দাসত্ব ক'রে পারিপার্শ্বিককে প্রবলভাবে প্রতিকূল ক'রে তুলে বাঙালি সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তির উদ্দাম প্রবাহ হারিয়ে ফেলেছে যার বেগে সে অতীত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যসাধনাতেও পূর্ণ সাফল্য আয়ত্ত করেছিল।

নিজের দোষে নানা কদাচারে ও কুৎসিত মতবাদের দাসত্ব ক'রে পারিপার্শ্বিককে প্রবলভাবে প্রতিকূল ক'রে তুলে বাঙালি সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তির উদ্দাম প্রবাহ হারিয়ে ফেলেছে যার বেগ সেই অতীত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যসাধনাতেও পূর্ণ সাফল্য আয়ত্ত করেছিল।

সাম্প্রতিক গদ্য কবিতাগুলি পাঠ করে ঐ প্রাণশক্তির অভাব আরও বেশি ক'রে বুঝে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন জীবন ধারণের সমস্যা এত প্রবল ছিল না, পূর্ববর্তী মোগল আমলের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবোধ সম্পন্ন ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার কল্যাণে বাঙালিরা বিশেষত বাঙালি হিন্দুরা উদার মুক্তির আলোকে বহির্বিশ্বকে দেখার, জানার ও বিচার করার সুযোগ পেয়েছে, তখনও বাঙালিকে নিজের অধিকারে সচেতন প্রতিষ্ঠার সুযোগ অর্জনের জন্য হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবিরা অজস্র উদ্দীপনাময়ী কবিতায় সাহিত্যক্ষেত্র সমৃদ্ধ করেছেন। আর এখন তমসার অন্ধকারে চারিদিক যতই ঢেকে আসছে, নিস্তেজ গদ্য কবিতার কন্টকগুল্মে ততই বাংলার কাব্যকুঞ্জ জঙ্গলে পরিণত হতে চলল। ভারতচন্দ্রের আমলে কৃষ্ণনাগরিক বঙ্গীয় কাব্যে যেমন আলঙ্কারিক কৌশল দেখানোই সর্বস্ব ছিল, এখনও তেমনি কলিকাতা মহানগরীর কবিকুল কয়েকটি বুলি ও মুদ্রাদোষের বিরক্তিকর পুনঃ প্রদর্শন সম্বল ক'রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আসর দখল ক'রে অসার কাব্য সৃষ্টি করছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির লক্ষ্য রসলিপ্সা নয় দেশসেবা বা জনসেবা নয়, মহৎ আদর্শের বিবরণ নয়, কেবল একটি কসরৎ দেখিয়ে অতি নিন্দনীয় পলায়নী ও পরাজিত মনোবৃত্তির নমুনা রেখে-যাওয়া। এই সব কবিতার আবেদন শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে নয়, আঙ্গিকে রসজ্ঞ সুকুমারমতিদের কাছেও নয়, একটা বিশেষ রসগ্রহণে অভ্যস্ত একটি গোষ্ঠীর কাছে। এর চেয়ে কবিওয়ালাদের গানও যে অনেক ভালো ছিল। সে-সব তো তবু বোঝা যেত! অর্থশূন্য প্রলাপের কোন্ প্রয়োজন আছে আনন্দলিপ্সু বা দিশাসন্ধানীর কাছে? যে-রচনা মনে আনন্দের উদ্দীপনা আনে না, কর্তব্য বোধের প্রেরণায় সঞ্জীবিত করে না, তার কোন দরকার নেই। এই সব কবিতা প্রায়ই কবি নিজে এবং তাঁর দলের দুচার জন লোক ছাড়া অন্য কোন পাঠক একেবারে বুঝতে পারেন না, এটা বহুপরীক্ষিত সত্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গদ্য কবিতা লিখেও এ অবস্থার অন্যথা সাধন করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর পার হয়ে গেলেও গদ্য কবিতার এ-ব্যাপারে কিছু মাত্র উৎকর্ষ লাভ হয় নি। সুতরাং কাদের জন্য এবং কেন ওগুলি লেখা হয় সে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। সাহিত্যজগৎ থেকে এই লিখনশৈলটি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেলে শোকাশ্রুপাতের কোন কারণ থাকবে না। কারণ অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের এ-কথাটি অপ্রতিবাদ্য যে, গদ্যে কবিত্ব হলেও কবিতা হয় না। কবিতার জন্যে ছন্দের সহযোগিতা অপরিহার্য। শিক্ষিত কলারসিক বাঙালি সমাজ আজ ধ্বংসোন্মুখ না হলে এইসব অপকৃষ্ট আবর্জনা কবিতা বলে গণ্য হত না।

আজ বাঙালি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলছে। এমন সঙ্কট জাতির জীবনে কদাচিৎ আসে। এক লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত ভূখণ্ডে প্রায় বারো কোটি বাঙালি এক জাতীয়তার বন্ধনে রাষ্ট্রবদ্ধ হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আগে এ-সঙ্কটের অবসান হতে পারে না। কিন্তু কবি তাঁর কর্তব্য এই সময় কিভাবে পালন করেছেন? কিছুই করছেন না তিনি এবং করার মতো প্রাণশক্তিও তাঁর নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুর্বল অসহায় কামাতুরতা আর অনুপযোগী বিদেশাগত রাজনৈতিক মতবাদের চর্বিত-চর্বন দেখতে দেখতে চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স। ফরাসি বিপ্লবের সময়। চারিদিকে মাৎস্যন্যায়। অন্তর্বিপ্লবে দুর্বল খণ্ডবিখণ্ড ফ্রান্স। লোভী ইউরোপিয় রাজন্যবর্গ সুযোগ বুঝে নবীন গণতন্ত্রের এলাকা খণ্ডে খণ্ডে ভাগ ক'রে নেবার জন্য এগিয়ে আসছে। বত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক ফরাসি

কর্মচারি রুজে দ'লিস্ স্ত্রাসবুর্গ শহরে ব'সে জার্মান মেয়রের প্রদত্ত ভোজসভায় লক্ষ্য করলেন, ফ্রান্সের দিকে এগিয়ে চলেছে অবশিষ্ট ইউরোপের লুব্ধ বাহু। রাত্রে বাড়ি ফিরে তিনি লিখলেন এক অমর কবিতা। সুর-সহযোগে গীতিকারূপে। তারপর দীর্ঘকায় বলিষ্ঠদেহ ঐ যুবককে চারণ কবিগায়কের মতো দেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রতি কুটীরে প্রতি প্রাসাদে গিয়ে গাইতে শোনা গেল :

"স্বদেশজননীর সন্তানগণ। এসো যাত্রা সুরু করি, গৌরবের দিন সমাগত। আমাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার তার রক্তপতাকা উত্তোলন করেছে। আমাদের মাতৃভূমিতে হিংস্র সৈনিকদের গর্জন শুনতে পাও কি? তারা বরাবর তোমাদের কাছে আসছে তোমাদের পত্নী ও সন্তানদের হত্যা করতে। অস্ত্র নাও, নাগরিকগণ। সেনাবাহিনী গঠন কর। অভিযান চালাও, যাতে অপবিত্র শত্রুশোণিতে আমাদের চাষের জমিতে সেচের কাজ করা হয়।"

এই হল বিখ্যাত লা মার্সেইএজ (La Marseillaise) গীতিকার মর্মার্থ। এই উদ্দীপনার চিহ্নমাত্র বাংলা সাহিত্যে নেই। বাঙালি সাহিত্যিক দেশের দুর্দিনে প্রেরণাসঞ্চারের কৌশল ভুলে গেছেন বহুদিন। অধ্যাত্ম চেতনাবর্জিত, দেশপ্রেমবিবর্জিত, রসোপলব্ধি বঞ্চিত শিল্পসৃষ্টিসামর্থ্যবিহীন এই লেখকগোষ্ঠীকে বাতিল ক'রে নবীন সাহিত্য রচনার কাজে অগ্রণী হতে আগামী ভাবী তরুণদলকে আহ্বান জানাই।

Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrive !

স্বদেশভূমির সন্তান সবে আয় রে আয় রে আয়।
কীর্তিলাভের শুভ অবসর যায় রে বহিয়া যায়।

(অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।)

শেষ কথা হল এই যে, ত্রিশ বছরের "প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা" কি বলছেন, কি লিখছেন, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এঁদের আর কিছু দেবার নেই। কতগুলি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আর সাম্মানিক ডক্টরেট এঁদের ভাগ্যে জুটল, তার বিচার নিরর্থক। ব্যক্তি মানবকে ভগবান ও মুক্তির দিকে, দেশবাসীকে স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দেবার জন্যে এঁরা কিছুই লেখেন নি, লিখবার ক্ষমতাও এঁদের নেই। এঁদের শিক্ষাদীক্ষা নিম্নস্তরের, বহির্জাগতিক জ্ঞান ও অন্তর্জাগতিক সূক্ষ্মানুভব, কিছুই এঁদের নেই। অতএব, এঁদের বাতিল ক'রে স্মরণ করা যাক শ্রীঅরবিন্দের সেই দীপ্ত উক্তি :

We do not belong to the past dawns but to the noons of the future.

আমরা অতীতের উষায় আবদ্ধ নই, বরং ভবিষ্যতের মধ্যাহ্নবর্তী।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

২৬

১৯২০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার আমেরিকার ইউনাটেড পিনাট্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য আলাবামার মন্টগোমারিতে গেলেন। সেখানেই সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এক্সচেঞ্জ হোটেলে অধিবেশন বসেছে, প্রতিনিধিদের সব আসনগুলিই ভর্তি, প্রতিনিধিরা সবাই উপস্থিত। এই ঐতিহাসিক এক্সচেঞ্জ হোটেল থেকেই কনফেডারেট কংগ্রেস আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে সামটার দুর্গ আক্রমণের আদেশ ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই-ই হল আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রথম সূচনা। এবং আজ, সেই ঘটনার ৫৯ বছর পরে সেই গৃহযুদ্ধের ফলে দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত একজন নিগ্রো প্রাক্তন প্রভুদের সভায় বক্তৃতা করতে এসেছেন।

সেদিন ছিল অসহ্য গরম, প্রতিনিধিরা সবাই জামার আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে বসেছিলেন। কতগুলি ক্ষুদ্র বোতলের মধ্যে কলাইয়ের নির্যাস থেকে প্রস্তুত নানা রকম জিনিষের নমুনা ভরে নিয়ে তা একটা সুটকেসে বোঝাই করে জর্জ কার্ভার সেই বেজায় ভারী সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এক্সচেঞ্জ হোটেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ললাট ঘামে ভেজা, দর দর ধারে ঘাম ঝরে পড়ছিল সর্বাঙ্গ দিয়ে কিন্তু রুমাল বের করে যে ঘাম মুছে ফেলবেন তিনি, তারও উপায় নেই। তাঁর দুহাতই জোড়া।

হোটেলের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে জর্জ কার্ভার প্রথমেই বাধা পেলেন হোটেলের দারোয়ানের কাছে, সে তাঁকে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দিল না। মাঝ পথে কার্ভারকে থামিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "কী চাই তোমার এখানে ?"

কার্ভার বললেন, "আমি পি-নাট্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনের সভাপতির সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছি।"

"এখানে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার নেই।" বলেই কার্ভারকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দারোয়ান।

জর্জ কার্ভার এবার একটু জোর দিয়েই বললেন, "কিন্তু আমি এখানে নিজের গরজে আসিনি, আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠানো হয়েছে।"

দারোয়ান বেজায় একগুঁয়ে, কিছুতেই সে জর্জ কার্ভারকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না। তিনি কী আর করবেন, ফিরে যাবেন কি না ভাবলেন একবার, তারপর ডায়েরীর একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে কি যেন লিখলেন, দারোয়ানের হাতে সেটা দিয়ে বললেন, "দয়া করে এই কাগজটা সভাপতির কাছে একটু পৌঁছে দেবে কি ?"

দারোয়ান তাতেও রাজি হল না।

ঠিক তক্ষুনি দরজার কাছে কথা কাটাকাটির শব্দ পেয়ে একজন লোক বাইরে বেরিয়ে এল। কার্ভারের হাত থেকে সেই লেখা চিরকুটখানা নিয়ে সে ভিতরে গেল। কয়েক মিনিট পরে একজন বার্তাবাহক উপর থেকে নেমে এসে জর্জ কার্ভারকে সসম্মানে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল, বলল, "আমার সঙ্গে আসুন দয়া করে।"

পিছনের যেদিকে লিফ্‌টে করে মাল ওঠানো নামানো হয় লোকটি সেই দিকের পথ দিয়ে অধ্যাপক কার্ভারকে নিয়ে এগিয়ে চলল। অবশেষে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে পৌছালেন। গভীর পরিশ্রমে তাঁর দেহ যথেষ্ট ক্লান্ত, কিন্তু প্রবীণ বৈজ্ঞানিক বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট করলেন না। সেই মুহূর্তেই বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি তাঁর সুটকেসটা খুলে সামনে রেখে দিলেন। তারপর ধীর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ভাষণ দিতে শুরু করলেন।

প্রথমে তিনি বললেন, "আপনাদের বিরাট কর্মযজ্ঞে আমার ক্ষুদ্র দান নিয়ে আমাকে এসে যোগদান করার জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি।"

তারপর, অল্প সময়ের মধ্যেই জর্জ কার্ভার সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের এমনভাবে মন কেড়ে নিলেন যে, শেষ পর্যন্ত কারুর আর মনেই রইল না জর্জ কার্ভার নামে একজন নিগ্রো অধ্যাপক শ্বেতাঙ্গদের সম্মেলনে আজ প্রধান বক্তা। আগে যদিও অনেকের মনই দ্বিধায় ও সংশয়ে দোদুল্যমান ছিল যে, একজন নিগ্রো অধ্যাপককে এভাবে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে করে আনা উচিত হয়েছে কি না, কিন্তু কার্ভারের বক্তৃতা শুনতে শুনতে তারা সবকিছু ভুলে গেল।

যখন অধ্যাপক কার্ভার তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন তখন শ্রোতারা একথা মনে ভাবতেই ভুলে গেল যে, বক্তা ভিন্ন জাতের লোক, সে কালা আদমি, সে নিগ্রো। তারা উল্লাসে ও আনন্দে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল জর্জ কার্ভারকে। এটা অপ্রত্যাশিত হলেও একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের আজকের এই জয় আগামী দিনের বিরাট জয়ের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা মাত্র।

পরের মাসে...পত্রিকায় জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বক্তৃতার খবর বেশ বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল এবং তার উপরে মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। সারা আমেরিকায় রীতিমত একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল।

শুধু মুখে বক্তৃতা দিয়েই নয়, কার্ভার শ্রোতাদের সামনে তাঁর আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাযির করে দেখালেন। সুটকেসের ভিতর থেকে কলাইয়ের উপাদানে প্রস্তুত বিবিধ সামগ্রীর নমুনা তুলে তিনি দেখাতে লাগলেন দর্শকদের। দর্শকরা এক-একটি জিনিষ দেখে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, মুখে তাদের আর কথা বেরোয় না।

চার মাস পরে অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটি তারবার্তা পেলেন ..."২০শে জানুয়ারী প্রভাতে ওয়াশিংটনে আমরা অপনার সাক্ষাৎ কামনা করি। কলাইয়ের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সেদিন আপনাকে কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে তুলে ধরতে হবে।"

শুল্ক সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসনাল কমিটির অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে এবং আমেরিকার কলাই উৎপাদক কৃষিজীবীদের স্বার্থ তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। এক কথায় বলা চলে, আমেরিকার কলাইয়ের বাণিজ্য শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে এক রকম বাণিজ্যিক শুল্ক। মনে করুন, একজোড়া জুতো আমেরিকার তুলনায় ইউরোপে কম খরচে তৈরি করা সম্ভব হয়, তার প্রধান কারণ ইউরোপের লোকেরা অল্প মূল্যের জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত এবং শ্রমিকদের মজুরির হারও আমেরিকার তুলনায় যথেষ্ট কম। আমেরিকার শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে কি হল? ইউরোপে তৈরি সস্তা দামের জুতোয় আমেরিকার বাজার ছেয়ে গেল এবং আমেরিকার পাদুকা শিল্প বিষম মার খেল, জুতো তৈরির কারখানাগুলি কাজের অভাবে অচল অবস্থায় পৌছল, মুচিরা কর্মহীন বেকার হয়ে পড়ল। এই বিপর্যয় রোধ করার উদ্দেশ্যে শুল্ক প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হল যাতে আমেরিকার

ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পর্যাস্ত হয়ে পিছু হটতে না হয়, ইউরোপ থেকে আমদানী করা জিনিষপত্র মার্কিন দেশে তৈরি জিনিষপত্রের চেয়ে বেশী দামের না হয়।

অবিকল একই রকমের আর একটা সমস্যা আমেরিকার কলাই-উৎপাদক কৃষিজীবীদের সামনে এসে হাজির হল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদার অর্ধেক পরিমাণ কলাই প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা হত—এই রীতিই বহুদিন ধরে চলে আসছিল। কলাই আমদানী করার যে ব্যয় হত তার পরিমাণও বেশী ছিল না। কারণ প্রাচ্য ভূখণ্ডের চীন প্রভৃতি কতগুলি দেশে শ্রমিকদের উদয়াস্ত যে রকম পরিশ্রম করতে হত, সেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির তুলনায় মজুরি পেত যৎসামান্য। তাছাড়া শুল্কের হারও ছিল নামমাত্র—প্রতি পাউণ্ডের জন্য আধ সেন্ট। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলাই উৎপন্ন করার চাইতে প্রাচ্য দেশগুলিথেকে তা আমদানী করতে ব্যয় অনেক কম হত এবং শুধু এই কারণেই মার্কিন কলাই শিল্প ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। কলাই উৎপাদনকারী কৃষিজীবীরা দাবী করে বসল, আমাদের শিল্পকে বাঁচাবার জন্য দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে আমদানী করা প্রতি পাউণ্ড কলাইর উপরে অন্ততঃপক্ষে চার সেন্ট ট্যারিফ কর বসাতে হবে। তারা আরও বলল, কলাইয়ের ওপরে এরকম একটা শুল্ক ধার্য করলে প্রাচ্যদেশীয় উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আমরা জোরের সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারব কিছুতেই আমরা আর মার খাব না।

কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের কলাই উৎপাদনকারী কৃষিজীবীদের মনে সর্বদাই এরকম একটা সংশয় ছিল যে, মার্কিন সরকার তাদের দাবীতে সাড়া দেবেন না। মার্কিন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই কলাই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর রাখত না, দেশের আর দশজন সাধারণ লোকের মতোই কলাইয়ের শিল্প হিসাবে ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল সে সম্বন্ধেও তাদের কোন ধারণা ছিল না। সমগ্র আমেরিকায় তখন একটি মাত্র মানুষ ছিলেন যিনি এবিষয়ে আলোকপাত করতে পারতেন—তিনি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

শুধু এই কারণেই ওয়াশিংটন থেকে জর্জ কার্ভারের ডাক পড়ল। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি একটি তারবার্তা পেলেন।

ওয়াশিংটনে জর্জ কার্ভার যখন গিয়ে পৌছোলেন তখন কিন্তু শুল্কের ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না। তিনি মনেই করতেন ও কাজটা আসলে হচ্ছে অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতদের কাজ, রসায়ন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের ও বিষয়ে কিছু করার নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের দরিদ্র কৃষিজীবীদের মর্মন্তুদ দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে এমন বিচলিত করে তুলেছিল যে, এই ডাক পেয়ে প্রথমে তাদের কথাই তাঁর মনে পড়েছিল। তাদের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার কথা তিনি মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না। তাদের কল্যাণচিন্তাই তাঁর দিনরাত্রির ধ্যানজ্ঞান। তিনিই তাদের অনেককে কলাইচাষে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন এবং বিবেকের কাছে এখন তাঁর এ জন্য জবাবদিহি করার সময় এসেছে। এখন এটা তাঁর কর্তব্য তাদের এই শিল্প-বিপর্যয়ে তাদের রক্ষা করা।

ওয়াশিংটনে পৌছোবার পরের শনিবার জর্জ কার্ভার কংগ্রেসনাল কমিটির অধিবেশনে যোগ দিলেন। সময় তখন বিকেল চারটে। তিনদিন ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা চালিয়েও কমিটির সদস্যরা শুল্কের ব্যাপারে কোন মীমাংসায় পৌছাতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে ক্লান্ত ও অনেকটা যেন বিরক্ত হয়ে তাঁরা অধিবেশন মুলতুবী রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এখন একজন মাত্র লোকের উপর তাঁদের শেষ ভরসা, তিনি যদি কোন মীমাংসা করে দিতে পারেন তবেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা আছে, নচেৎ যে কী হবে তা কেউ জানে না। তাদের শেষ ভরসাস্থল হলেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

কমিটির অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি সভাকক্ষের চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বলে উঠলেন, অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার আছেন নাকি এখানে? এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্লান্ত, অবসন্ন, ন্যুব্জদেহ একজন নিগ্রোর উপর তাঁদের সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, হাতে তাঁর ভারী ব্যাগ ঝোলানো, সেটা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সভামঞ্চের দিকে এগোচ্ছেন। সভায় তৎক্ষণাৎ একটা কলরব উঠল একজন লোক জর্জ কার্ভারের ব্যাগটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "আপনার ও ব্যাগটার মধ্যে কী আছে? তরমুজ বুঝি? আপনার নৈশভোজের খাবার?"

অধ্যাপক কার্ভার লোকটার কথার কোন জবাব দিলেন না, তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। কারণ এরকম অভদ্র ব্যবহার তিনি শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে বহুবার বহু জায়গায় পেয়েছেন। এদের তিনি ভালোভাবেই চেনেন।

অপর এক ব্যক্তি আবার ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ট্যারিফ সম্বন্ধে নিশ্চয় একজন বিশেষজ্ঞ, কি বলেন? আচ্ছা, আপনার কি নাম আংকেল?"

এবার কার্ভার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বললেন, "আমি বিশেষজ্ঞ নই, সত্যি কথা বলতে কি ট্যারিফ সম্পর্কে আমি আদৌ কিছু জানি না। আশা করি আপনি জানেন।"

শ্বেতাঙ্গরা কিছুক্ষণ ধরে এমনিভাবে জর্জ কার্ভারকে বিদ্রূপের হুল ফোটাতে থাকল। তারপর সেটা যখন একটু কমল তখন অধ্যাপক কার্ভার বললেন, "আমি এখানে ট্যারিফ সম্বন্ধে বলতে আসিনি, আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে কলাই।"

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পেরেছি," কমিটির সভাপতি মিঃ জোসেফ ডব্লু ফোর্ডনি বললেন। তিনি ভদ্র হলেও যেন কিছুটা অধৈর্য। "অধ্যাপক কার্ভার, আপনার বক্তব্য বিষয় সভায় উপস্থাপিত করার জন্য আমরা কিন্তু আপনাকে দশ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারছি না।"

'ধন্যবাদ," অধ্যাপক কার্ভার বললেন, "আপনাদের আন্তরিকতা উপলব্ধি করছি।"

জর্জ কার্ভার তাঁর ভাষণ শুরু করার আগে সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, দেখলেন, সবাই শ্বেতাঙ্গ, একজনও কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা অন্য জাতের লোক নেই। তাঁর বুক যে একটুও কাঁপল না, একথা ঠিক নয়, তবু তিনি বাইরে যথেষ্ট সাহস দেখালেন। ভিতরে ভিতরে যদিও ভয়ে ভাবনায় তাঁর বুক কাঁপছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল, কারণ তাঁর ব্যাগ খুলে জিনিষপত্রগুলি বের করতেই হয়তো দশ মিনিট সময় লাগবে, কোন কথা বলারই সুযোগ হয়তো তিনি পাবেন না। এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি তাঁর ব্যাগ খুলে ফেললেন। যে স্বল্প মুহূর্ত তাঁকে দেওয়া হয়েছে তারই মধ্যে তিনি দুচার কথা যা পারেন বলবেন স্থির করলেন।

জর্জ কার্ভার সরল গম্ভীর কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, যেমন ভাবে একজন শিক্ষক বলেন তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ করে—"আমি অ্যালাবামা, টাস্কেগি থেকে আপনাদের কাছে কলাই সম্বন্ধে দুচার কথা বলবার জন্য এখানে এসেছি। টাস্কেগি শিক্ষাভবনে আমি কৃষি নিয়ে গবেষণা করি। সেখানে আমি কলাইয়ের বিভিন্ন রকম ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে ফল লাভ করেছি তাই আমি প্রমাণ সহযোগে আপনাদের দেখাতে চাই। আপনাদের চমৎকৃত করা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু যা মানুষের অনেক উপকারে লাগতে পারে তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলে তা অবহেলিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। গবেষণা করে আমি যতটুকু যা জেনেছি কলাই সম্বন্ধে তা আপনাদের দেখাবো।" এই বলে কার্ভার ব্যাগের ওপরকার ডালা তুলে ধরতেই কয়েকজন সদস্য কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ঝুঁকে দেখতে গেল নিগ্রো বৈজ্ঞানিকের ব্যাগের ভিতরে আরব্য রজনীর কী গুপ্তধন লুক্কায়িত রয়েছে।

জর্জ কার্ভার ব্যাগের মধ্য থেকে ছোট্ট একটা শিশি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "এই ছোট্ট শিশিটার মধ্যে

যে সাদা তরল পদার্থ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই তরল পদার্থ হল দুধ।"

"কলাই থেকে তৈরি দুধ না কি?" মিঃ ফোর্ডনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এ হচ্ছে কলাই থেকে নিষ্কাশিত নির্যাসের দুধ। এবং এ হচ্ছে আইসক্রিম। এও কলাই থেকে তৈরি," বলে জর্জ কার্ভার অন্য একটা শিশি শ্রোতাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলেন।

"ও আইসক্রিম সোডায় ব্যবহার করা যাবে?" জিজ্ঞাসা করলেন একজন সদস্য।

"এ রকম সুস্বাদু আইসক্রিম আপনি খুব কমই খেয়েছেন, একথা আমি সাহস করে বলতে পারি। আপনি একটা আইসক্রিম খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চান? দেব তৈরি করে?"

সেই লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল," না, না, তার কিছু দরকার নেই। আর, তা ছাড়া আপনার সময়ও তো খুব কম।"

"আর এই দেখুন, আর একটা জিনিষ ভদ্রমহোদয়গণ।" ব্যাগের মধ্য থেকে একটা নল বের করে তা হাতে নিয়ে জর্জ কার্ভার বললেন, "এটা হল এক রকমের প্রাতরাশের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য, এটা আমি তৈরি করেছি কলাই ও মিষ্টি আলুর সংমিশ্রণে।"

"আপনি কি মিষ্টি আলু নিয়েও গবেষণা করেন নাকি অধ্যাপক কার্ভার?" জিজ্ঞাসা করলেন কমিটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য মিঃ জন, এল, গার্নার। ইনি পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জর্জ কার্ভার সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "এ যাবৎ আমি একমাত্র মিষ্টি আলু থেকেই ১০৭টি বিভিন্ন পদার্থ আবিষ্কার করেছি।"

"আপনার মুখে যা শুনেছি এ কি সত্যি?" মিঃ গার্নার রীতিমত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"সত্যি বৈকি মিঃ গার্নার। ১০৭টা জিনিষের সবগুলিরই নমুনা এখন অবশ্য আমি আপনাদের দেখাতে পারব না, কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। তারপর অধ্যাপক কার্ভার তাঁর ব্যাগ খুলে একটার পর একটা আবিষ্কৃত জিনিষের নমুনা শুধু কেবল বেরই করতে লাগলেন, আর অন্য দিকে শ্রোতারাও এমনভাবে প্রশ্ন করতে লাগল যেন একটার পর একটা প্রশ্ন তীরের ফলার মতো এসে জর্জ কার্ভারকে বিঁধতে লাগল। অগুনতি, অসংখ্য প্রশ্ন।

মিঃ ফোর্ডনি এই সময়ে বলে উঠলেন "আপনার দশ মিনিট সময়ের তিন মিনিট কিন্তু চলে গেল মিঃ কার্ভার।"

জর্জ কার্ভার কমিটির সদস্যদের দিকে ফিরে একটুখানি মৃদু হেসে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ। এই তিন মিনিট সময়ের বেশীর ভাগই তো আপনারা নিয়ে নিলেন। মনে করা যাক সেই তিন মিনিট সময় আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তা কি হতে পারে না বলুন?"

"নিন্, আপনারই জিত হল," মিঃ ফোর্ডনি বললেন সহাস্যে, "এবার চালিয়ে যান।"

"ভদ্রমহোদয়গণ, যে কথাটা এতক্ষণ আমি আপনাদের বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছিলাম সেই কথাটা হচ্ছে এই যে, কলাই আর মিষ্টি আলুর সংমিশ্রণে একটা চমৎকার প্রাতরাশের খাবার বানানো যায়। পৃথিবীতে এর জুড়ি আর একটি খাবারও নেই। মিষ্টি আলু আর কলাই মিলিয়ে যে খাদ্য তৈরি হবে তাতে আমাদের দেহের পুষ্টির জন্য যত রকম পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন তার সব উপাদানই পাওয়া যাবে।"

এই সময়ে মিঃ গার্নার কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ আমি দেখতে পাচ্ছি এই আলোচনাটা বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে, সবারই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি মিঃ কার্ভারের বক্তৃতার সময় আরো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হোক।"

অন্যান্য সদস্যরাও মিঃ গার্নারের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তখন অধ্যাপক কার্ভার আবার বলতে শুরু

করলেন। তিনি ওয়ারসেষ্টসায়ার আচারের একটা শিশি, একটা চাটনির বৈয়ম, কয়েকটা প্রসাধন সামগ্রীর নল এবং কুইনিন মেশানো একটা ওষুধের ফাইল সবার সামনে উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, "কড়াই শুঁটি থেকে গৃহীত উপাদানে প্রস্তুত বহু সামগ্রীর মধ্যে মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের নমুনা এখানে আপনাদের দেখাচ্ছি। কিন্তু বক্তৃতা করার জন্ত যে সময় আমাকে আপনারা দিয়েছিলেন সে সময় বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে।"

"না, না, আপনি চালিয়ে যান", সদস্তরা সবাই ব্যগ্রকণ্ঠে ব'লে উঠলেন।

জর্জ কার্ভারের বক্তৃতায় বাধা পাবার আর কোন ভয় রইল না। তিনি পুনরায় বলতে সুরু করলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ,অন্ত প্রসঙ্গ অবতারণার আগে একটা কথা আমি আপনাদের বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কথাটা হ'ল এই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়াইশুঁটি উৎপাদনকারীদের আজ বড় দুর্দিন, তাই তাদের বাঁচানো আজ সবচেয়ে বেশী দরকার।"

"আপনি তা হ'লে ট্যারিফ শুল্ক সম্বন্ধে কিছু বলবেন ব'লে মনে হচ্ছে", কমিটির সভাপতি মন্তব্য করলেন "অথচ আপনিই গোড়ায় বলেছিলেন ট্যারিফ সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান নেই।'

"ও হ্যাঁ, ট্যারিফ শুল্কের কথা ব'লছেন তো?' জর্জ কার্ভার ফিরে আবার বললেন কথাটা। তাঁর চোখের দুই তারা তখন যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। 'ভদ্রমহোদয়গণ, ট্যারিফ শুল্ক সম্বন্ধে আমি যতটুকু যা জানি তা হ'ল, অবাঞ্ছিত লোকদের এই ব্যবসা থেকে হটিয়ে দেওয়া।" তাঁর এই মজার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। মিঃ ফোর্ডনি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যাপকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন "চালিয়ে যান ভাই।" তারপর আরো জোরগলায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "আপনার সময় অফুরন্ত।"

অধ্যাপক জর্জ কার্ভার একটুখানি মৃদু হেসে আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। বক্তৃতা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমনভাবে তাঁর স্যুটকেসের ভিতর থেকে কৃত্রিম ঝিনুক, মাংসের টুকরো, স্যালাড, ভিনেগার, চর্বি, ছাপার কালি, সাবান, শ্যাম্পু এবং এমনি ধরণের তিনশোটি উৎপন্ন দ্রব্য বের করলেন, দেখে মনে হ'ল একজন যাদুকরের থলের মধ্য থেকে বিচিত্র এই জিনিষগুলি যেন অবিকল ম্যাজিকের মতো বেরিয়ে এল, সবগুলি জিনিষই কিন্তু এক কড়াইশুঁটি থেকে উৎপন্ন। জর্জ কার্ভার দু'ঘন্টারও বেশী সময় ধ'রে অনর্গল বক্তৃতা করলেন। তাঁর বলা যখন শেষ হ'ল তখন সারা সভাগৃহ মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনিতে কম্পিত হ'তে লাগল, সকলে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, বিপুল অভিনন্দন জানালেন।

জর্জ কার্ভার এবার ফিরে যাবেন ব'লে তৈরি হলেন, মিঃ ফোর্ডনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, "অধ্যাপক কার্ভার, কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেসব অত্যাশ্চর্য জিনিষ আপনি আজ আমাদের দেখালেন, ইতিপূর্ব্বে সে-রকম জিনিষ দেখবার সৌভাগ্য আর কখনো আমাদের হয়নি।"

ডাঃ জর্জ কার্ভারের এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের ফলে সেই কমিটি কড়াইশুঁটিকেও ১৯২১ সালের রক্ষামূলক ট্যারিফ বিলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিল। কড়াই শুঁটি শিল্পের একজন বড় মালিক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মিঃ টম হাইন অধ্যাপক কার্ভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ শ্রেষ্ঠ উপহার পেলে আপনি সবচেয়ে খুশি হবেন বলুন তো।"

জর্জ কার্ভার মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "শুধু একখানা হীরা।"

এর কিছুদিন পরে মিঃ হাইন একটি হীরাখচিত প্লাটিনামের আংটি কিনে জর্জ কার্ভারকে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে মিঃ হাইন অধ্যাপক কার্ভারের দেখা করতে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যে উপহার পাঠিয়েছিলাম তা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?"

জর্জ কার্ভার উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, "আপনার দেওয়া উপহার পেয়ে আমি ভারি খুশি হয়েছি।"

"কিন্তু আপনাকে তো কই সেটা আঙুলে পরতে দেখছি না।"

"আপনার উপহার আমি বিশেষ যত্নের সঙ্গে একটা ভালো জায়গায় রেখে দিয়েছি, দেখবেন চলুন", ব'লে মিঃ হাইনের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চললেন জর্জ কার্ভার।

কার্ভার তাঁর অতিথিকে নিয়ে গেলেন নিজের গবেষণাগারে, একটা প্রকাণ্ড বাক্সের ডালা খুলে তাঁকে দেখালেন অন্যান্য আরো বহু মূল্যবান্ ভূতাত্ত্বিক নমুনার সঙ্গে সাজানো সেই উজ্জ্বল হীরের আঙটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়াইশুঁটি উৎপাদনকারীরা এইসব জিনিষ তাঁর কাজের পুরস্কার হিসেবে তাঁকে দিয়েছে।

২৭

বিরাট সাফল্য এবং বিপুল খ্যাতি সত্ত্বেও জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে যে অপাংক্তেয় সেই অপাংক্তেয়ই র'য়ে গিয়েছেন, এখনো তাঁকে ভ্রমণ করতে হয় জিম্-ক্রো গাড়ীতে চ'ড়ে—রেলগাড়ীর এই কামরা কেবলমাত্র কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের জন্যই নির্দিষ্ট করা ছিল বলে দাক্ষিণাঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার সময়ে সর্বদাই তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে নিগ্রোদের জন্য তৈরি আইন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হ'ত। অনেকবার এমন হয়েছে যে শহরে তিনি বক্তৃতা করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন সেই শহরের সব লোকই ভয়ংকর নিগ্রোবিদ্বেষী, তারা কার্ভারকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। তিনি সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। জর্জ কার্ভার যখনই দাক্ষিণাঞ্চলে কার্যোপলক্ষে গিয়েছেন তখন সর্বদাই আহার ও বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে তাঁকে ভীষণ বিব্রত থাকতে হয়েছে। তৃষ্ণা পেলে সর্বসাধারণের জলের কল থেকে জল পান করতে পারতেন না। তাঁকে অঞ্জলি পেতে ঝরণার জল পান করতে হয়েছে যেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকত "কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের জন্য"। অথবা অনেক সময় ভাঙা পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর নদীর ঘাটে নেমে জল খেতে হ'ত।

একবার হ'য়েছে কি, মন্টগোমারি শহরের কাছাকাছি একটা ক্ষুদ্র শহরের স্কুলে তিনি বক্তৃতা করতে গিয়েছেন। ট্রেন থেকে ষ্টেশনে নামতেই এক শ্বেতাঙ্গিনী ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। মহিলাটি দাক্ষিণাঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কতগুলি প্রামাণ্য তথ্যচিত্র তুলবার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কার্ভারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একজন শিক্ষক এসেছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ীও ঠিক করা ছিল। জর্জ কার্ভার মহিলা ফটোগ্রাফারকে একই ঘোড়ার গাড়ীতে সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং তিনি আনন্দে রাজি হলেন। এতে যে দোষের কিছু আছে এটা কিন্তু কার্ভার কিংবা সেই মহিলা কারুরই একবারও মনে হ'ল না। দু জনে শিক্ষাসমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে পথ অতিক্রম করলেন। হোটেলের দরজায় পৌছে গাড়ী থেকে নেমে যাবার সময় মহিলাটি জর্জ কার্ভারকে ধন্যবাদ জানালেন।

মধ্যরাত্রে একটা বিশ্রী ঝন্ ঝন্ আওয়াজ আর কতগুলি লোকের কর্কশ কণ্ঠের গালাগাল ও চীৎকার শুনে হঠাৎ জর্জ কার্ভারের ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেও তিনি দেখতে পেলেন, মাথায় টুপি পরা অশ্বারোহী এক দল, সবার হাতে বন্দুক। জর্জ কার্ভার প্রথমটায় বুঝতেই পারেননি যে, তিনি নিজেই তাদের শিকারের লক্ষ্য, লোকগুলি তাঁকেই খুঁজে বের করবার জন্য এসেছে। কিন্তু যখন তিনি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা একটা লোককে চীৎকার ক'রে ব'লতে শুনলেন, "সেই বদমায়েস নিগারটা কোথায় গেল একজন ভদ্র শ্বেতাঙ্গ মহিলার সঙ্গে এক গাড়ীতে চড়ার যে সাহস করে?" তখন আর তাঁর বুঝতে বাকী রইল না লোকগুলির আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নিজে।

একটা অজ্ঞাত অস্বাভাবিক ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল, সর্বাঙ্গ দিয়ে দর দর ধারে ঘাম ঝরতে শুরু করল। কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করলে মৃত্যু অনিবার্য। বুকে সাহস সঞ্চয় ক'রে জর্জ কার্ডার তাড়াতাড়ি ক'রে পোশাক প'রে নিলেন এবং বাড়ীর পিছন দিককার দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। শীতে আর ঠাণ্ডায় জর্জ কার্ডারের সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসতে লাগল। এই শহরে জর্জ কার্ডার নতুন আগন্তুক। পথঘাট সবই সম্পূর্ণ অজানা, শুধু রেলষ্টেশনের পথটা অস্পষ্ট ভাবে তাঁর মনে পড়ে। মারমুখী জনতার ভিড় বহু পিছনে রেখে কার্ডার নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেলেন এবং গভীর খাদকাটা একটা নালার মধ্যে নেমে আত্মগোপন ক'রে রইলেন। লোকগুলি চীৎকার করতে করতে কাছে এসে প'ড়ল। কিন্তু কার্ডারকে দেখতে পেল না।

ক্রমশঃ

রামায়ণে আর্য সমাজ

রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী

বিশ্বসাহিত্যে রামায়ণ একটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। বিদগ্ধ সমালোচক **Barriedale Keith**-এর মতে, রামায়ণের রচনাকাল মহাভারত রচনার বহুকাল পূর্ব্বে। Keith-এর লিখিত বিবরণ অনুযায়ী বাল্মীকি ভারতের আদি কবি। Keith-এর বিশ্বাস, রামায়ণের কাব্যোৎকর্ষে প্রভাবিত হয়েই উত্তর কালে মহাভারত মহাকাব্যরূপে স্বীকৃত হয়েছিল।

মহাভারত মূলতঃ ইতিহাসাশ্রিত কাব্য। ইতিহাসের ভাবা-চিত্রের মধ্যে বিধৃত হয়েছে তৎকালীন মানুষের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবন-পরিচয়। অতএব কাব্যত্ব মহাভারতের মুখ্য পরিচয় নয়। জীবন রস স্ফুরণ ও ঐতিহাসিক শিল্পকলার মধ্যে কাব্যত্ব ফুটে উঠেছে মাত্র। এই জন্য অনেকে রামায়ণকে ভারতের আদি কাব্য এবং মহর্ষি বাল্মীকিকে আদি-কবি বলে অধ্যায়িত করে থাকেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকগণের অভিমত, রামায়ণ ত্রেতাযুগের রচনা এবং বেদব্যাস রচিত 'মহাভারত' রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ব্ববর্তী বা পরবর্তী রচনা, এ সম্পর্কে কোনরূপ প্রামানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মীয় উপাদান বিচারে উক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা কালের আভাস পাওয়া গেলেও, তা নিছক অনুমান-নির্ভর।

রামায়ণিক যুগ বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়

কালকে ইঙ্গিত করে না ; কারণ কাব্যের সঙ্কলণ কোন নির্দিষ্ট কালে আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে যায়নি। আরম্ভ থেকে সমাপ্তির সঙ্কলন একটি সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই সুদীর্ঘ কালই প্রকৃত রামায়ণের কাল। ঐ সময় কালের মধ্যে আর্য্য নৃপতিগণের বীর মহিমা ও কীর্ত্তি গাথাসমূহ রামায়ণের কথাবস্তু। মহর্ষি বাল্মীকি, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের জীবন-কথাকে রূপকের সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে এবং ইতিহাসের বৈচিত্র্যহীন দৃশ্যপরম্পরা থেকে উদ্ধার করে তার মধ্যে ব্যক্তিরূপের বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। ফলে, বিভিন্ন চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। চরিত্র চিত্রণের ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন সমাজের বহু প্রয়োজনীয় তথ্য অবিসংবাদিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনেকে 'রামায়ণ'কে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে মর্য্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের অভিমত, রামায়ণের ঘটনাবলী কল্পনা প্রসূত। রাম-রাবণের যুদ্ধ কোনরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। অতএব কেবল কাব্য হিসেবেই রামায়ণের স্বীকৃতি। ঐতিহাসিক উপাদান বিচারে এর মূল্য নেই বললেই চলে। অবশ্য এমন একটি অভিমতকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না ; কারণ রামায়ণ রচনার পুর্ব্বে রামায়ণ গান সমাজে কাহিনী আকারে প্রচলিত ছিল। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঐ কাহিনী-গুলি তদানীন্তন কালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আনুমানিক সহস্র খ্রীঃ পূর্ব্ব হতে রামায়ণ কাহিনীর সংকলন কার্য্য আরম্ভ হয়। বাল্মীকির মত প্রতিভাবান্ কবি ঐ সময় কালে আবির্ভূত হয়ে বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলিকে বিশুদ্ধ কাব্য মন্ত্রে পরিশুদ্ধ করে শিল্পরূপ দান করেন। বলাবাহুল্য, কাহিনী, উপকাহিনী ও কিম্বদন্তীর মধ্যেও ইতিহাস রচনার বহু উপাদান নিহিত রয়েছে। এই উপাদান গুলি থেকে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। রামায়ণ কাব্যে যে সকল কাহিনী ও উপকাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেগুলি কল্পনা প্রসূত নয়, বরং অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণে বর্ণিত নগর, নদী ও পর্ব্বতসমূহ সকলই ঐতিহাসিক। ভারতের বহু তীর্থস্থানগুলির সঙ্গে রামায়ণ কাব্যস্থিত ছোট খাটো ঘটনা বিবরণের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রয়েছে। তাছাড়া যুগ প্রচলিত লৌকিক কিম্বদন্তীর সঙ্গেও রামায়ণে বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্ব ও তথ্যের মাঝে মাঝে যে সকল অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা থেকে প্রমাণ হয় না যে রামায়ণের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সংশ্লিষ্ট কাহিনী বা ঘটনা বিবরণের মধ্যে যতটুকু অলৌকিকতা ও অবিশ্বাস্যতা পরিদৃষ্ট তা কবির স্বেচ্ছাকৃত পরিকল্পনা মাত্র। এ প্রসঙ্গে আচার্য্য মাখনলাল রায়চৌধুরীর একটি মন্তব্য বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা' গ্রন্থে লেখক বলেছেন, 'বাল্মীকি' ত নির্ব্বোধ ছিলেন না। তিনি কেন এই সমস্ত আপাত দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য কাহিনীর সমাবেশ করিয়াছেন? বোধহয় এই কাহিনীগুলি ইচ্ছাকৃত রচনা, কারণ সমস্ত স্তরের লোকের জন্যে রামায়ণ পরিকল্পিত। সরল বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী, পুরুষ এবং নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ সকলের উপযোগী ও উপভোগ্য সামগ্রী রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সংযোজিত ঘটনা বিবরণগুলিকে বিনা বিচারে অমূলক বলা যায় না।

রামায়ণ কাহিনীকে অনেকে রূপক ধর্ম্মী বলে আখ্যায়িত করেন; কারণ তাদের মতে, রামায়ণ আর্য্যগণের কৃষি জীবনের প্রতীক স্বরূপ। ঐতিহাসিক সমালোচক Weber মনে করেন, সীতা মূলতঃ আর্য্য-গণের কৃষিভিত্তিক জীবনের রূপক এবং রামচন্দ্র আর্য্য সভ্যতার প্রতীক। সীতা শব্দটি রূপকের আধারে ব্যাপ্তিত। শব্দটির অর্থ হলভৃত, অর্থাৎ যিনি হল বহন করেন। রামচন্দ্র অরণ্য-সংকুল দক্ষিণ ভূমিকে কৃষি-কার্য্যের উপযোগী করে আর্য্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তারে অগ্রণী হয়েছিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ ভূমির বিস্তৃত অঞ্চল কৃষি কর্ম্মের অনুকূল করে তোলেন ; কিন্তু আর্য্য সংস্কৃতি বিরোধী রাজা রাবণ রামচন্দ্রের সঙ্কল্প সাধনের মূলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। রাম-জায়া সীতাকে

অপহরণ করে এবং দাক্ষিণাঞ্চলের কৃষি সম্পদকে বিনষ্ট করে তিনি আর্য্য সভ্যতার গতিপথ রুদ্ধ করেছিলেন। পরে কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী বানরদের সহায়তায় রাবণকে নিহত করে রামচন্দ্র দাক্ষিণ ভারতে আর্য্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। তাই রাবণের বিরুদ্ধে রামের অভিযান অনেকের মতে, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সভ্যতার রূপক বলে অভিহিত।

রামচন্দ্রের রূপ বর্ণনায় নব দুর্ব্বাদল শ্যাম কথাটি সর্ব্বাধিক ব্যবহৃত। এক্ষেত্রে অনেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামায়ণ কাব্য সম্পূর্ণরূপে রূপক ধর্ম্মী। অবশ্য এমন যুক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে। সমালোচক জ্যাকবি বলেছেন, বিষয়টি প্রাচীন ভারতের একটি পুরাবৃত্ত মাত্র। 'রামায়ণ' কাব্যে, দাক্ষিণ ভারতে আর্য্য সভ্যতার বিস্তারের কথা প্রচ্ছন্নভাবে বিবৃত হলেও, কাব্যটিকে পুরোপুরিভাবে রূপক ধর্ম্মী বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা রামায়ণিক লোকসমাজের রসিকজনের কান এবং মন তখনো রূপকবিদ্ধ হয়নি। কাব্যের প্রধান আবেদন, গল্পরস, প্রাণময় জীবনানুভব এবং চারিত্রিক আদর্শ। কবির রচনা রীতি তাঁর পরিচ্ছন্ন রস সচেতনতার স্পর্শে বলিষ্ঠ ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। এখানেই রামায়ণের বহিরঙ্গের যথার্থ সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে সমকালীন জীবন বেদনার স্বতস্ফূর্ত অনুবর্তনের ফলে। কবি সমকালীন ভারত সমাজের গার্হস্থ্য জীবনাদর্শকে এক প্রাণময় রূপ দান করেছেন। এই উচ্ছ্বসিত প্রাণময়তা রামায়ণ কাব্যকে ভারতীয় জীবন ধর্ম্মে সমৃদ্ধ করেছে। এখানেই কবির যথার্থ শিল্প সফলতা। জীবন বেদের সুমিত রূপই রামায়ণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। কাব্য গাথায় তত্ত্ব আরোপিত হলেও, তা কোথাও উপজীব্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি। সমসাময়িক জীবনের বিভিন্নমুখী অনাচারের বিরুদ্ধে বাল্মীকির মোহমুক্ত শিল্প দৃষ্টি কোন কোন স্থানে তত্ত্বাভিমুখী হয়ে উঠলেও, প্রাণময় জীবনানুভবই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা রামায়ণ কাব্যকে বিচার করলে নানা ভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়।

রামায়ণিক সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ঘটেছে। তার মধ্যে নর, বানর এবং রাক্ষসেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। দেবতারা রয়েছেন নেপথ্যে। রামায়ণের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাদির সঙ্গে দেবতাদের কোন সংযোগ নেই। বস্তুতঃ রামায়ণিক সভ্যতার ঐক্য মূলে রয়েছে নর, বানর ও রাক্ষস জাতির ধর্ম্ম, সমাজ ও চরিত্রজগত আদর্শের একটা নিবিড় সম্পর্ক। ঐ ত্রিবিধ জাতির জীবন ও প্রাণরসের সঙ্গে যেন রামায়ণিক সভ্যতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

রামায়ণ যুগের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ক্ষেত্র বিশেষে নীতি দুষ্ট বলে মনে হলেও তা বিশেষ কোন একটি জাতির সভ্যতাকে ইঙ্গিতায়িত করে না ; বরং বিভিন্ন জাতির যে সমন্বিত ইতিবৃত্ত, চরিত্রনীতি ও গার্হস্থ্য জীবনাদর্শ লুকিয়ে রয়েছে তারই অনীতি ও অসঙ্গতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে এই সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ঘটলেও তাদের আচার আচরণ, নীতিজ্ঞান ও সমাজবোধ ভিন্নধর্ম্মী। তাদের কারণ ও কার্য্য বিপরীত। সভ্যতার মান নির্ণয় ব্যাপারে ঐ জাতিগত বৈসাদৃশ্যগুলি নিঃসন্দেহে সমীক্ষার বস্তু। রামায়ণিক যুগ সভ্যতা বা সামাজিকতাকে যাঁরা নীতিদুষ্ট বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁদের এরূপ অভিমতের বিশ্লেষণাত্মক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি বিশেষ যুগের সভ্যতাকে বিচার করতে হলে সেই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত জাতির সামাজিক প্রকৃতি, সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সর্ব্বপ্রথমে ঐতিহাসিক বীক্ষণের দ্বারা পর্য্যালোচনা করতে হয়। এরূপ পর্য্যালোচনার ফলে, সভ্যতা তার বিকাশের পথে যে যে সামাজিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে, তার সবিশেষ চিত্র পর্য্যালোচকদের মানসপটে ভেসে ওঠে তখন সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসুবিধা হয় না। উপরন্তু সামাজিক পরিবেশ ও সভ্যতার বিকাশ যে সূত্রটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই সূত্রটিকেও আবিষ্কার করা সহজ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, ঐ

ভারতীয় জাতীয় সৈন্য বাহিনীর জন্য আদালতে গমন

প্রথম কারাবরণ

কবির সহিত শান্তিনিকেতনে
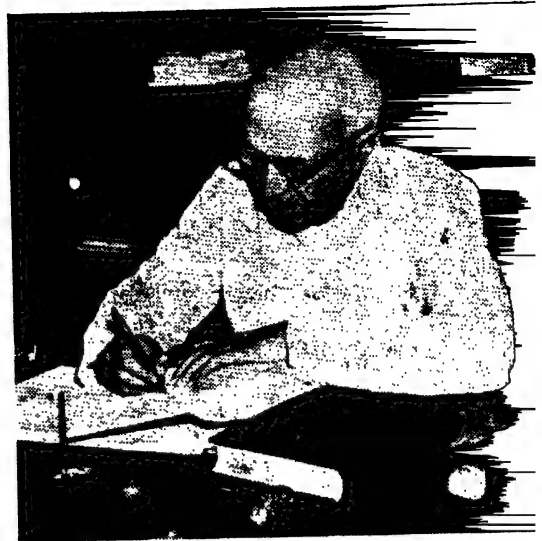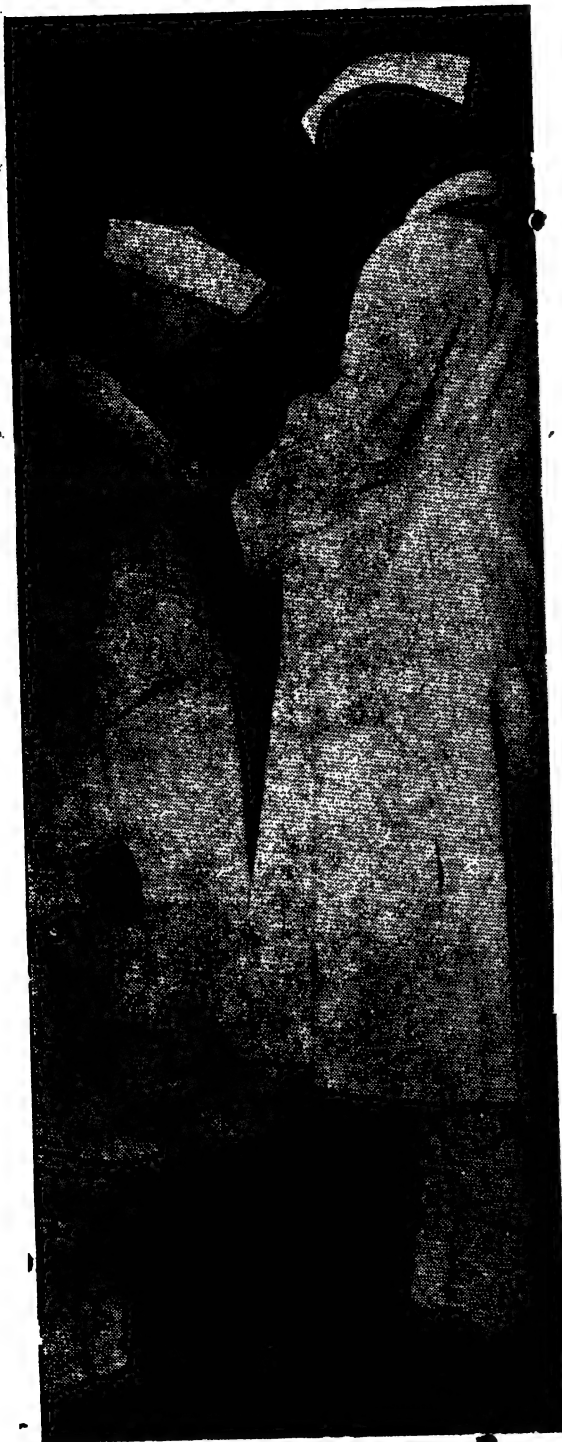
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাক্ষর
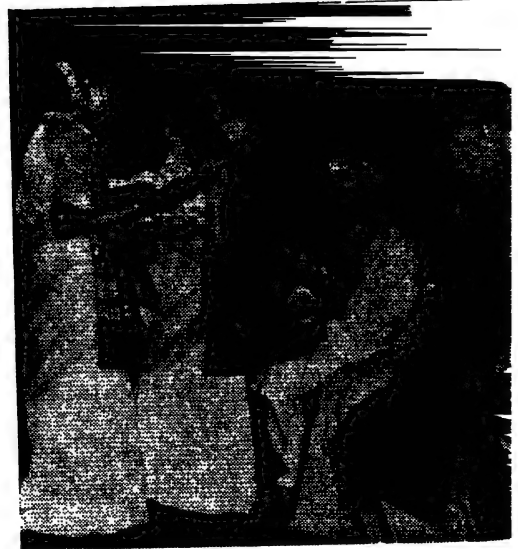
বিশ্বভারতীর বার্ষিক উপাধি দান
অনুষ্ঠান উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে

সূত্রটিই সভ্যতার প্রকৃতি এবং চরিত্র নিরূপণের নির্ভর যোগ্য মাপ-কাঠি। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে সামাজিক পরিবেশ, সভ্যতা বিকাশের মূল নিয়ামক নয়। সামাজিক পরিবেশের দোহাই দিয়ে যাঁরা কোন একটি যুগের সভ্যতাকে বিচার করতে চেয়েছেন, তাঁরা কেবলই জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে, তাঁদের বিচার বিশ্লেষণ পরিপূর্ণ সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এই বিচারণায় তাঁরা কেবল সমাজকে যন্ত্ররূপে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। উপযোগী পদ্ধতি অনুসন্ধান না করে তাঁরা কেবল সামাজিক পরিবেশ এবং ঘটনা সমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর পরিণাম হয়েছে বিভ্রান্তকর। তত্ত্ব হয়ে উঠেছে বিপথগামী। একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, সভ্যতা জাতির জীবনী। সভ্যতার ইতিহাস জাতিরই ইতিহাস। জাতির সভ্যতাকে জানতে হলে তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠনের তুলনামূলক যে পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে তার দ্বারা জানতে হয়। তাছাড়া কোন সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের মানসিক প্রতিবর্তী অবিচ্ছিন্ন নয়। সেই হেতু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রীতিনীতি সমাজবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলিও একই ভাব ধারায় বিচার্য্য হতে পারে না। তাই একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক ভাবে একের পর এক তাদের বিবেচনা করতে হয়। অনুরূপভাবে এই বিষয়গুলিও অন্তরূপে সমীক্ষার বস্তু।

রামায়ণে নর, বানর, রাক্ষস একই পিতার ঔরসজাত সন্তান হলেও তারা ভিন্ন জাতি। তাদের সমাজ এবং জাতিগত ভাবধারাও ভিন্ন ধর্ম্মী। রাক্ষসদের জাতি কুল বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলেও তারা জাতি কুল বিবর্জিত নয়। অনার্য্য জাতি রূপে তাদের পরিচয়। রামায়ণে অনার্য্য শব্দটির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দটির অর্থ অনার্য্য। রাক্ষসেরাই যে অসুর বা অনার্য্য জাতি, বৈদিক শ্লোকে তার সমর্থন আছে। আবার যেহেতু তারা অনার্য্য, আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি তাদের বিদ্বেষ চিরাগত।

রামায়ণে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার সংঘাত ঘটেছে। এই দু'য়ের দ্বন্দ্বে পরিশেষে আর্য্য সভ্যতারই বিজয় ঘোষিত হয়েছে। নরোত্তম রামচন্দ্র আর্য্য সভ্যতার প্রজ্বলন্ত প্রতীক। অনার্য্য সভ্যতার প্রতীক বিশ্রবা মুনির পুত্র রাক্ষস রাজ রাবণ। বাল্মীকির ভাষায় রামচন্দ্র প্রিয়দর্শণ, আর্য্য পৌরুষের ভাবগত মহিমা এবং অপরাপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাল্মীকির পরিকল্পনায় রামচরিত্র এক মহিমান্বিত জীবন রহস্য। পক্ষান্তরে, রাবণের রূপাদর্শ অনার্য্য সদৃশ। অরণ্যকাণ্ডে রাবণের রূপ বর্ণনায় উল্লেখ আছে। বাল্মীকি রাবণের রূপচিত্র স্বল্পতম রেখাচিত্রের সাহায্যে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় রাবণ, 'পাপরাশি সদৃশ কৃষ্ণ বর্ণ সেই রাক্ষস পতি'।

রামায়ণে, আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের অন্তরালে নিশ্চয় কোন ঐতিহাসিক সত্য বা জাতিগত বিরোধের সংমিশ্রিত ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে। এই ইতিবৃত্তই আর্য্য ধর্ম্মাদর্শের চরিতকথা '—আর্য্য জীবনের শুচিস্নিগ্ধ চরিত্রনীতি। রামায়ণ তাই বৃহৎ জীবনের মহাকাব্য। বেদ এবং অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন উপলব্ধি বিষয়ে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলির যে সকল উত্তর সমূহ প্রদত্ত হয়েছে রামায়ণে ও মহাভারতে সেই একই উত্তর কাহিনীর মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে। তাই রামায়ণ ও মহাভারত আজও লোকসমাজে পঞ্চম বেদ রূপে পরিচিত। রামায়ণে যদি কোন বাণী থাকে, তবে তা হচ্ছে মনুষ্যত্বের মহত্তর আদর্শের বাণী, আর সেই মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ, রামচন্দ্র। শুধু এক যুগেই নয়। এই নরোত্তম সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের আরাধ্য পুরুষ। বহু-শতাব্দী পরেও ভারতচিত্তে তাঁর জীবনাদর্শ আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

রামায়ণ আর্য্যদের গৌরব কীর্ত্তন। আর্য্যদের চরিত্র চিত্রনের ফাঁকে ফাঁকে মহর্ষি বাল্মীকি তদানীন্তন কালের আর্য্য সভ্যতার স্বরূপ চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

রামায়ণ কাব্যে আর্য্যদের মাহামম্বিত জীবন রহস্য অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। রামের মত প্রেমময় প্রাণময় এবং চন্দন চর্চিত চরিত্র; ভরতের মত নীতিনিষ্ঠ ও ধর্ম্মশীলভ্রাতা, লক্ষ্মণের মত শ্রদ্ধাবনত দেবর, সীতার মত শুচিস্নিগ্ধা কল্যাণীবধূ, আর্য্য সমাজের মহিমান্বিত জীবনাদর্শের প্রতীক স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণে একটি বিশেষ যুগের ভারত জীবনাদর্শ বাল্মীকির চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল; আর তারই ফলস্বরূপ রামায়ণ কাব্যের সৃষ্টি।

মহামতি বাকল সাহেব সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থখানিতে মন্তব্য করেছেন,—মানবিক উন্নতিই সভ্যতার প্রাচীন লক্ষণ। এই উন্নতি প্রধানতঃ দুই প্রকারের—নৈতিক ও বৌদ্ধিক। প্রথমটি কর্ত্তব্য বিষয়ক, দ্বিতীয়টি জ্ঞান বিষয়ক। সভা হতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং সভ্যতা শব্দের মৌল অর্থ,—সামাজিকতা।

রামায়ণে, নর, বানর ও রাক্ষস, এইত্রিজাতির সভ্যতার পরিচয় বিবৃত হয়েছে। তার মধ্যে মানব সভ্যতাই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। রামায়ণের আর্য্য সভ্যতাই বিশ্ব সভ্যতার আদিরূপ এবং ভারতবর্ষ বিশ্ব সভ্যতার আদি ভূমি।

মহর্ষি বাল্মীকি আর্য্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পাশাপাশি আরও দুটি বিপরীতাচারী জাতির জীবন ধারাকে তুলে ধরেছেন এবং নানা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব জাতির মানবত্ব প্রমাণ করেছেন। মহৎ চরিত্রের মূল্য এবং মর্য্যাদাকে উপলব্ধি করতে হলে তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয়। আর্য্য চরিত্র চিত্রনে মহাকবি তাই অনার্য্য জাতি সম্ভূত আরও দু'টি জাতির জীবন ধারাকে পরিপ্রেক্ষণের কাজে লাগিয়েছেন। ফলস্বরূপ মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গতিবেগ এবং হৃদয়ের ঔদার্য ইত্যাদি অবিসংবাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাল্মীকির মানব চরিত্র ক্ষেত্র বিশেষে বাস্তবতা থেকে সরে গেলেও কোন চরিত্র প্রাণহীন হয়ে পড়েনি। মহাকবির বর্ণনায় সর্ব্বত্র মানবাত্মার বলিষ্ঠ রূপই আত্মপ্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য পঞ্জী

(১) রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা: মাখন লাল রায় চৌধুরী।

(২) রামায়ণ কথামৃত: সুরেন্দ্র মোহন ভৌমিক

(৩) ইতিহাসের দর্শন: মনোরঞ্জন রায়।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গ্রেট ব্রিটেনের সকল বড় শহরই আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কে কত বেশি আতিথেয়তা দেখাইতে পারে তাহার জন্য প্রতিযোগিতা চালাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে ম্যানচেস্টারের আয়োজনকে অন্যতম সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুন্দর বলা চলে। এই নানা জাতীয় লক্ষ কর্মীর ভিড়ওয়ালা শহরের উৎপন্ন বস্ত্র পৃথিবীর নানা দেশে ব্যবহৃত হয়। অত্যাচারিত নাপিত রিচার্ড আর্করাইট (পরে স্যার রিচার্ড আর্করাইট) কিংবা ঘড়িনির্মাতা জন কে, কিংবা তন্তুবায় জেমস হারগ্রীভস কি কখনও ভাবিয়াছিলেন যে ওয়াটার ফ্রেম অথবা স্পিনিং জেনি একদিন পৃথিবীর তন্তুশিল্পে বিপ্লব আনিবে? এবং তাহার সাহায্যে ইংল্যাণ্ড অপরিমিত উপার্জন করিবে, এবং পৃথিবীর অনেক অংশে ইহা যুদ্ধের, সম্পত্তি লাভের এবং ট্যাক্সের গৌণ কারণ হইবে? অথবা তাঁহারা কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ঐ সব আবিষ্কার, যাহা প্রথমে ভুল বোঝার ফলে লোকের নিকট আমল পায় নাই, তাহা হইতে পরে আনুষঙ্গিক অনেক বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিরাট বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, যন্ত্রের কারখানা, বিস্তৃত ব্লীচিং প্রতিষ্ঠান এবং আরও কত অনুরূপ শিল্প উৎপাদন এজেন্সি গড়িয়া উঠিবে? অথচ এ সমস্তই সম্ভব হইয়াছে। আমি ত কখনও রিচার্ড আর্করাইট, অথবা জন কে, অথবা জেমস হারগ্রীভস-এর মত ব্যক্তি দ্বিতীয় আর দেখি নাই। কিংবা তাঁহাদেরই মত অত্যাচারিত তাঁহাদের একই পথের পথিক পূর্ববর্তীগণ—জন ওয়াইয়াট, লুই পল এবং টমাস হাইজ-এর মত ব্যক্তিও আর দেখি নাই। ইঁহাদের পরবর্তী শব্দহীন সুতাকাটা যন্ত্রের উদ্ভাবক ক্রম্পটন, কার্ডিং মেশীনের উদ্ভাবক—ডায়ার, বাষ্পচালিত তাঁতের উদ্ভাবক ও উন্নত সংস্করণের প্রবর্তক—কার্টরাইট, শার্প রবার্টস এবং হরক্স, ড্রেসিং মেশীনের উদ্ভাবক জনসন ও র‍্যাডক্লিফ, অথবা কুম্বিং মেশীনের উদ্ভাবক জোশুয়া হাইলম্যান—ইঁহাদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। আমাদের ম্যানচেস্টারের নিমন্ত্রণকারী আমাদিগকে সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলে রাজকীয় সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন এবং কাপড়ের কলের সমস্ত বিভাগ দেখাইয়া আমাদের মানসিক আনন্দ দান করিলেন।

এই ভাবে একশত কুড়ি বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ ভূমিতে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহা ভিতরের দিকে দ্রুত মূল চালনা করিয়া বৃক্ষের পুষ্টি ও ফল ফলাইবার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ইহাতে ম্যানচেষ্টার, ল্যাঙ্কাশিয়র এবং সমগ্র ব্রিটেনের পরম উপকার হইয়াছে, এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে পৃথিবীরও উপকার হইয়াছে। এই একই জাতি ঐ একই বীজ ভারতের জমিতেও বপন করিয়াছে, কিন্তু স্ট্রবেরির বীজ সাহারা মরুতে বপন করিলে যাহা হয়, ভারতেও তাহাই হইয়াছে। কেননা দুই দেশের জাতীয় চরিত্রে পার্থক্য রহিয়াছে। দশহাজার স্পিণ্ডল বা টাকু যুক্ত কাপড়ের কল ও গ্রাম্য তাঁতে যে পার্থক্য, প্রায় সেই পার্থক্য। রেলওয়ে ট্রেন ও গোরুর গাড়ীতে যে পার্থক্য। ইহা

অতিশয়োক্তি হইতে পারে, তবু ইহা হইতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় জাতীর চরিত্রের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা মোটের উপর বুঝা যাইবে। স্বীকার করা আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে তবু বলি, আজ যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত সরকার গঠিত হয় তাহা ব্রিটিশ জাতির সরকারের ন্যায় সফল হইবে ইহাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে কি ধরণের লোককে তাহারা নির্বাচিত করিবে তাহাই ভাবি। যাহাই হউক, দেশের যে অবস্থা চলিতেছে, তাহা হইতে আমি অনুমান করি, বর্তমানে দেশের লোকের যে চরিত্র বা মনোভাব তাহাতে এই লোকদের ভিতর হইতে যাহাদিগকে ছাঁকিয়া আনিয়া নির্বাচিত করা হইবে, তাহারা ক্ষমতা হাতে পাইবামাত্র প্রথমেই গোহত্যা সমস্যা বিষয়ে প্রশ্ন তুলিবে।

গোহত্যা নিবারণ খুবই উত্তম কাজ সন্দেহ নাই, এবং ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবারও নাই। পক্ষান্তরে একজন হিন্দুরূপে এবং ব্রাহ্মণরূপে, এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের মনোভাবের প্রতি সম্মানবশতঃ, গোহত্যা নিবারিত হইলে আমি আনন্দিতই হইব, আরও আনন্দিত হইব, যদি মানুষের দ্বারা বা অন্য প্রাণী দ্বারা সকল প্রাণীহত্যা নিবারিত হয়, এবং সমস্ত বিশ্ব, শান্তি, প্রীতি, এবং শুভ ইচ্ছায় পূর্ণ হইয়া উঠে—কোথাও ঈর্ষা, যুদ্ধ, বেদনা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকে। কিন্তু ইহা ত জগৎকে আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার ইচ্ছা। বিচিত্র স্বার্থক, প্রশ্নের অতীত, সমালোচনার অতীত করিয়া মিলাইয়া দিবার উপযুক্ত কোনও কাটাছাঁটা পরিকল্পনা আমার নাই। সেজন্য আমি বিনীত ভাবে চিন্তা করিতেছি—এই গোরক্ষা আন্দোলনমাত্র আংশিকভাবে সফল হইতে পারে একমাত্র নীলগিরির সংখ্যালঘু টোডাদের মধ্যে। নীলগিরির টোডাদের প্রতি গোষ্ঠীপতির মৃত্যুতে তাহার বিদায়ী আত্মার সঙ্গে তাহার বহুসংখ্যক মহিষ হত্যা করিয়া থাকে এই প্রথার বিরুদ্ধে নীলগিরির কলেকটর ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে উহারা কিছু সংযত হইয়াছে, বলি দিবার জন্য মহিষের সংখ্যা কমাইয়াছে। অথবা যে জাতির মধ্যে এত চারণ ভূমি আছে যে গোরুর সংখ্যা সীমাহীন বৃদ্ধি পাইলেও কোন অসুবিধা হইবে না, তাহাদের মধ্যে গোরক্ষা আন্দোলন সফল হইতে পারে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হিন্দুজাতি চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। এই হিন্দুজাতি তিন সহস্র বৎসর পূর্বের শৈশবে যাহা পাইবার জন্য কাঁদিত, সেই জাতি বৃদ্ধ হইয়াও সেই সব তুচ্ছ খেলনার জন্য কাঁদিতেছে, এ দৃশ্য কৌতুককর। কিন্তু তরুণ ভারতের পক্ষে সমকালের উপযুক্ত জিনিষ চাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান অবস্থায় আরও একটি জিনিস প্রয়োজন। অর্থাৎ সমস্ত দাবি এমন খোলাখুলি এক প্রকাশ্য ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে, ইহার মধ্যে কোনও প্রতারণা অথবা অসাধুতা প্রচ্ছন্ন নাই। গোরক্ষা আন্দোলন যে অর্থনৈতিক আবরণে ঢাকা হইয়াছে, যাহার সুতার দৈর্ঘ্য অনেক কিন্তু বয়ন ও বিন্যাস দৃঢ়তাহীন। গোরক্ষা প্রশ্নের গোড়াতেই একথা অনুমান করা অসম্ভব যে, সীমাহীন সংখ্যক গোরুর জন্য সীমাহীন পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা চলিবে। পশুখাদ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, যে হারে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা না ভাবিয়া এবং যে হারে চাষের জমি কমিয়া যাইতেছে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অরণ্য-সম্পদ রক্ষার জন্য যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা বিবেচনা না করিয়াও একথা ভাবা যায় না যে যত গোরু, তত খাদ্য মিলিবে। ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত মানুষকে বিদায় করিয়া সমস্ত মহাদেশটিকে শুধুমাত্র গোরুতে পূর্ণ করিয়া তুলিলেও যত গোরু, তত খাদ্য মিলিবে কল্পনা করা অসম্ভব। সম্ভবতঃ এ অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইবে এই অনুমান করা হইয়াছে, কারণ দিনে দিনে অল্পাহারের দরুণ কয়েক পুরুষের মধ্যেই, জাপানীদের খেলনা-উদ্যানের গাছের

মত গোরু ছাগলের চেহারা পাইবে এবং ছোটনাগপুরের উচ্চভূমিতে পাথরের মধ্যে খাদ্য সন্ধানরত বামনাকার পশুর ন্যায় ছোট হইয়া যাইবে। এই জাতীয় মোক্ষম যুক্তির সাহায্যে পশুখাদ্যের সামান্য অসুবিধার মীমাংসা করা হইয়া থাকিবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা আরও তুচ্ছ কয়েকটি বিবেচনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এগুলি ঐ যুক্তির সাহায্যে দূর করা যাইতেছে না। যথা—গোরক্ষকদের যুক্তি অনুসারে অর্থনৈতিক দিক হইতে দুধের জন্য গোরু পালন করা অনেক বেশি লাভজনক, এবং ইহা তাঁহারা অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কশাইখানায় গোরু বিক্রির জন্য লোকেদের উপর চাপ দেয়, তাহাকে কোন্ আইনে নিরস্ত করা যাইবে, সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। যদি বেশি লাভের জন্য দুধের গোরু রাখিতে হয়, তাহা হইলে যাহারা কম লাভে গোরু কশাইদের কাছে বিক্রি করে, তাহারা অবশ্যই তাহা কাহারও চাপে পড়িয়া করে। নানা কারণে আগের অপেক্ষা গোরুর চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে মহিষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গোহত্যা আন্দোলন নিছক ধর্মীয় আন্দোলন, এবং ইহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যে সব গ্রন্থে আমাদের পূর্বপুরুষদের গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণের কথা আছে, সেই গ্রন্থের সেই অংশ বাদ দিতে হইবে, ব্যাখ্যার তোড়ে ভাসাইয়া দিতে হইবে, অথবা মিথ্যা অর্থ আরোপ করিতে হইবে, তাহার পর আমাদের গোমাংস বর্জিত ধর্মে, পৃথিবীর ১৩০ কোটি মানুষ—যাহারা এই মাংসকে বিধিসঙ্গতরূপে খাদ্য বলিয়া জানে তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে। যে আইনের পিছনে আশিহাজার ব্রিটিশ বেয়নেটের সমর্থন রহিয়াছে, ধর্মের নামে একটি খাদ্যাভ্যাসকে নিষিদ্ধ করিবার জন্য সেই আইনের সাহায্য প্রার্থনা করা বিপজ্জনক। ভিন্ন ধর্মীয় কোটি কোটি মানুষের কাছে গোমাংস অতৃপ্তিকর নহে। তাহাদেরও অনেক বিষয়ে দৃঢ় মত আছে। আমাদিগকে যাঁহারা শাসন করিতেছেন, তাঁহারা মূর্তিপূজাকে পাপ বলিয়া গণ্য করেন। এক ধর্মের মতে আত্মিক জগতের অতি গ্রীষ্ম মণ্ডলে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র ধূমপান। আবার এক ধর্মের মতে তেল চকচকে হৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণের হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিলে স্বর্গে যাইবার পরিচয় পত্র মিলে। যদি অন্যের আচরিত প্রথা তোমার নিকট পাপ বলিয়া গণ্য হয় তবে তাহা আইনের সাহায্যে জোর করিয়া বন্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত কর, তাহা হইলে তোমার কোন আচরিত প্রথাকে তাহাদের কাছে পাপ মনে হইলে তাহারা যদি তাহা বন্ধ করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি আপত্তি করিবে কি? এই গোরক্ষা আন্দোলন বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই গত শতাব্দীতে দিল্লীর সাম্রাজ্য যখন ভিত্তিসমেত কাঁপিতেছিল, ভাঙিয়া পড়িবার দেরি নাই, তখনও সম্রাট বাহাদুর শাহ উদয়পুরের রাণা অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যে সব কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এই গোহত্যার বিষয় তাহার অন্যতম।

জাতীয় মন কোন্ দিকে বহিতেছে সেই দিকটি দেখাইবার জন্যই এই সব প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। আমাদের দেশের লোকদের যদি নিজেদের পরিচালনাধীন ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে চীনারা তাহাদের রেলওয়ে লইয়া যাহা করিয়াছিল, তাহারাও যদি তাহাই করে তবে আমি বিস্মিত হইব না। আমাদের শিক্ষিত দেশপ্রেমীরা আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "রেলওয়ে টেলিগ্রাফ না থাকিলেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি সুখে ছিলেন না?" আসল কথা আমরা অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ, অথবা অতীতকে ভুলিয়া গিয়াছি, বর্তমান সম্বন্ধে অসতর্ক এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধ। কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন কি যে, আমরা যে মাটির উপর বাস করিতেছি, যে বাতাস নাকে টানিতেছি, যে আহার আমরা গ্রহণ করিতেছি, যে জল আমরা পান করিতেছি, তাহার প্রত্যেকটিতে কি পরিমাণ মরফিয়া মিশান আছে? কারণ আমরা যে এই পৃথিবীকে একটি স্বপ্ন জগৎ করিয়া লইয়া তাহাতে ছায়ামূর্তির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মানুষের

অগ্রগতির প্রান্তে আমরা যদি আধুনিকের স্থান লাভ করিতে চাহি, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদের জাতীয় চরিত্র বদলাইতে হইবে। ইহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। তাহা যদি না করিতে পারি, তবে একটি গভর্মেণ্ট—এবং যে গভর্মেণ্ট আমাদের জাতি অপেক্ষা অন্ততঃ এক শত বৎসর অগ্রসর হইয়া আছে, তাহার সংস্কার সাধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই আমি আশা করিতেছি আমাদের জাতীয় কংগ্রেস, আমাদের জাতিকে অজ্ঞতা, হীনতা, কুসংস্কার ও অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রথাগুলি হইতে উদ্ধার করিবার কাজে গভর্মেণ্টকে সাহায্য করিবে। ব্রিটিশ জাতির সংস্পর্শে আসিবার ভাগ্য আমাদের দৈবাৎ ঘটিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে জাতিভেদ প্রথার জঘন্যতম রূপটি দেখিয়াছি। যদি অতীত ইতিহাসের উপর আরও স্পষ্ট আলো নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বাহিরের একটার পর একটা আক্রমণের ফলে বংশের পর বংশ হীনচরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোটি কোটি মানুষকে কয়েকজন মাত্র উন্নত জাতির মানুষ শাসন করিতেছে, উন্নত উপায়ে, ন্যায়ের দ্বারা, বলপ্রয়োগের দ্বারা নহে, ইহা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম, এবং ইহা ব্রিটিশগণ ভারতে সম্ভব করিয়াছে। এই উদার নীতি হইতেই কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক কারণেই। এবং সময় যখন আসিয়াছে, তখন ইহা "ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" বা অন্য নামে টিকিয়া থাকিবে। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে অবশ্য একটি সম্প্রদায় আছে, সে সম্প্রদায়ের লোকেরা ইংল্যাণ্ডকে স্পেন যেমন ছিল তেমন দেখিতে চাহেন। তাঁহারা ভারতকে ব্রিটিশের পদানত দেখিতে চাহেন। ইহার ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে তাঁহারা অন্ধ। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ হইবে না।

ম্যানচেষ্টার হইতে আমরা লিভারপুলে গেলাম। বাণিজ্যিক দিক হইতে লিভারপুল ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শহর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, যখন ঔরংজেব দাক্ষিণ ভারতে মারহাট্টাদের সঙ্গে সর্বনাশা যুদ্ধে রত, সে সময় লিভারপুল মাত্র একটি জেলেদের গ্রাম ছিল। এখন সেখান হইতে বৎসরে কুড়িহাজার জাহাজ ছাড়িয়া পৃথিবীর নানা স্থানে যায়। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়া যেসব বাষ্পীয় পোত অ্যামেরিকায় যায়। এই জাহাজগুলির মালিক প্রধানতঃ 'কুনার্ড', 'ইনম্যান" 'হোয়াইটস্টার', 'ন্যাশন্যাল', 'গ্যিয়ন', 'অ্যাংকর', এবং 'অ্যালান' পরিবহন প্রতিষ্ঠান। যেসব স্থান আমরা পরিদর্শন করিলাম তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কোরিন্থিয়ান স্থাপত্য স্টাইলের সেণ্ট জর্জেস হল, ইহার কক্ষগুলি সুন্দর ভাবে গ্র্যানিট, পোর্ফিরি এবং অন্যান্য দামী প্রস্তরে অলঙ্কৃত। ইহার গ্র্যাণ্ড হল্-এ ২৫০০ লোকের বসিবার স্থান আছে, একটি বৃহৎ অরগ্যান আছে তাহার পাইপের সংখ্যা ৮০০০। আমরা টাউন হল এবং এক্সচেঞ্জ বিলডিং-এও গিয়াছিলাম। লিভারপুলে একটি বড় লাইব্রেরি আছে, বিনা মাশুলে সকলেই এখানকার গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। একটি মিউজীয়াম আছে, ব্যক্তিগত দানে এটি গড়িয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে ১০০,০০০-এর বেশি বই আছে।

লিভারপুল হইতে আমরা বার্কেনহেডে উপস্থিত হইলাম। এই শহরটি মারসি নদীর অপর পারে। এই শতাব্দীর আরম্ভে এটি ১০০ জন অধিবাসীর একটি গ্রাম মাত্র ছিল, এখন এটি মস্ত বড় এক শহর। এখানে এখন বিস্তৃত ডকইয়ার্ড সমূহ নির্মিত হইয়াছে, বড় বড় জাহাজ প্রস্তুত হয় এখানে। ইহার বর্তমান লোকসংখ্যা ৭০,০০০,। শহরে এখন একটি মার্কেট হল, একটি মিউজিক হল, একটি ফ্রী লাইব্রেরি, একটি আর্ট স্কুল এবং একটি বড় পার্ক রহিয়াছে। লিভারপুল ও বার্কেনহেডের মধ্যে অবিরাম ফেরি স্টীমার যাতায়াত করে। আমরা অবশ্য সাম্প্রতিক নদীর নিম্নভাগ দিয়া নির্মিত টানেল পথে রেলগাড়িতে গিয়াছিলাম। আমার স্বদেশবাসী অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি টেমস নদীর সুরঙ্গ পথ দেখিয়াছি কি না। পূর্বের দিনে ইহা লণ্ডনের অবশ্যই একটি দর্শনীয় জিনিস ছিল, কিন্তু এখন আর

তাহা নাই, কারণ এখন ইহা অপেক্ষা অনেক বড় টানেল অধিকতর এঞ্জিনিয়ারিং নৈপুণ্যে গঠিত হইয়াছে। মারসি নদীর টানেল কত দীর্ঘ তাহা ঠিক বলিতে পারিব না, কিন্তু পার হইতে যতটা সময় লাগিয়াছিল তাহাতে মনে হয় এটি তিন হইতে চারি মাইল দীর্ঘ। নদীটি এইখানে খুব গভীর বলিয়া বোধ হয়, কারণ যেখানে রেল পাতা হইয়াছে, সেই স্তরে পৌঁছতে আমাদের লিফটা কয়েক শত ফুট নিচে নামিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যদি টানেল নির্মাণের অধিকার পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেটি অন্য সব টানেলের গৌরব ম্লান করিতে পারিত। এখান হইতে পুনরায় লিভারপুলে, তাহার পর চেস্টার, সেখানে ডিউক অভ ওয়েস্টমিনস্টারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।

আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থান—ব্রিস্টল, বাথ এবং ওয়েল্‌স। ব্রিস্টল লণ্ডন হইতে ১১৮ মাইল দূরে এবং রেলপথে মাত্র তিন ঘণ্টায় পৌঁছান যায়। আমরা ১৮৮৬ সনের ৮ই জুন ব্রিস্টলে আসিলাম। মেয়ার এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অপরাহ্নে মার্চ্যান্টস হল-এ লাঞ্চ। নিমন্ত্রণকারী—মার্চ্যান্ট ভেনচারার্স। এই সমিতি মধ্যযুগের বণিক সমিতিগুলির অন্যতম। এগুলি এককালে ব্রিস্টলে স্থাপিত হইয়াছিল। কখন হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু যে সব রেকর্ড আছে তাহা হইতে দেখা যায় ১৪৬৭ সনে এই সমিতিটি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং ১৫০০ সনে ইহার কার্যধারা ও পরিচালনা বিধি রচিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ধনসম্পদ বৃদ্ধির মূলে এই সব সমিতি। কারণ ইহারাই সব কিছু হারাইবার ঝুঁকি লইয়া বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্য চালাইয়াছিল। এবং সেই জন্যই ইহারা "ভেনচারার্স"। আমাদের দেশের সঙ্গেও ইহাদের পরিচয় আছে, কারণ তাহারা পূর্ব দেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য আসিয়াছিল। ব্রিস্টলের "মার্চ্যান্ট ভেনচারার্স"ও নিষ্ক্রিয় ছিল না। দলিল হইতে জানা যায়, ইহারা অবিরাম বানিজ্য উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করিয়াছে। ইহারা ভার্জিনিয়া এবং নিউ ইংল্যাণ্ডে উপনিবেশ গড়িয়াছে। এই সমিতিই উত্তর পশ্চিম পথে ভারতে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রিস্টলের বন্দরগুলি ইহারাই স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের জনক। অতিথিদের আপ্যায়ন করা হইল ম্যানসন হল্‌-এ। ব্রিস্টলের মেয়ার-পত্নী ক্লিফটনের "ভিকটোরিয়া রুম্‌স"-এ বল-নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন। ম্যাড্রিগ্যাল কনসার্টেই আমরা খুব বেশি আনন্দ পাইয়াছিলাম। ইহা ব্রিস্টল ম্যাড্রিগ্যাল সোসাইটি কর্তৃক ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ম্যাড্রিগ্যালের অর্থ প্রেমসঙ্গীত। ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র ইহার খ্যাতি আছে। লণ্ডন ম্যাড্রিগ্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ১৮৪৩ সনে বলিয়াছিলেন, "If you want to know what a madrigal is, go to Bristol." ইহার পর নানা স্থান পরিদর্শন করিলাম, তন্মধ্যে উইলিস কম্পানির তামাকের কারখানা উল্লেখযোগ্য। সবই কলে হইতেছে তামাক কাটা সিগারেট তৈয়ারি—সব। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে পাতা আনিয়া ইহারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লয়। দেখিয়া দুঃখ হইল যে ইহারা ভারতবর্ষ হইতে কোনো তামাক পাতা লয় না।

প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেদিন সেই ১৮৮৬ সনের ৭ই সেপটেম্বর, আমি সেই সমাধির পাদদেশে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা জানাইলাম—ঈশ্বর আমাদিগকে সত্যের পথ দেখাও, এবং আমি যাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া আছি, তিনি জীবনে যেরূপ করিয়াছেন, তেমনি আমাদিগকে শক্তি দাও, মনের বল দাও যাহাতে তাঁহার ন্যায় সমস্ত জীবন সত্য পথে চলিতে পারি।" আমি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইলাম, "যেন আমি কখনও ভীরু না হই।" আরও আমার মনে তখন যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিব না, আমার স্বদেশবাসীগণ তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। আমি যখন এই ভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম। সেই সময় আমার নিকট এক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, তিনি

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন—রামমোহন রায়ের মৃত্যু বিষয়ে যাবতীয় দলিল তিনি আমাকে দেখাইবেন। বর্তমান সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ লইয়া আসিবার বিবরণও তাহাতে দেখা যাইবে। আমি সে সব দেখিলাম। কিন্তু সেগুলির বিবরণ দেওয়া এখানে অনাবশ্যক, কারণ তাহা বাংলা বা ইংরেজী অনেক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম; শুধু বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলাম, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর আমরা আমাদের সমাজের বহু আবর্জনা দূর করিতে কতটুকু চেষ্টা করিয়াছি।

ব্রিস্টলে দুইজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—তাঁহাদের নাম মিস্টার আর সি দত্ত এবং মিস্টার বি এল গুপ্ত। তাঁহারা সম্প্রতি নরওয়ে ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহারা নরওয়েতে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সেখানে দীর্ঘকাল অস্তহীন সূর্য দেখিয়াছেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কৃষক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে আপ্যায়ন করিয়াছেন; আতিথেয়তা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সে কথা সপ্রশংস ভাষায় বর্ণনা করিলেন।

একমাত্র ব্রিস্টলের অভ্যর্থনাতেই আমরা বাঙালী দেখিতে পাইলাম, অন্যত্র দেখি নাই। সরকারী গন্ধ যাহাতে আছে, অথবা রক্ষণশীলতার স্পর্শ আছে এমন অনুষ্ঠানাদি হইতে তাঁহারা দূরে থাকেন। নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান ক্লাবেও তাঁহাদের ভিড় করিতে দেখি নাই। অথচ ইহা ইংল্যাণ্ড প্রবাসী ভারতীয় এবং যাঁহারা পূর্বে ভারতে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য স্থাপিত। ইংল্যাণ্ডের বাঙালীরা উদারপন্থীদের ক্লাবে যোগ দিয়া থাকেন। ইঁহারা উদারপন্থীদের দিকে ঝুঁকিয়াছেন কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। বাঙালী পাশ্চাত্য জীবনধারা ও নীতি মোটামুটি আত্মস্থ করিয়াছে, সেজন্য শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য তাহার কাছে অরুচিকর। অতএব যাহারা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহার সুবিধাগুলি ভোগ করিতে চাহে, তাহাদের সে এড়াইয়া চলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু সমাজের যে উচ্চ বর্ণকে সে পূজা করিয়াছে, তাহাকে সে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, তাহার স্থলে অন্য পূজনীয়কে বসাইবার গরজও তাহার নাই। তাহার জিজ্ঞাসা "ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রজারূপে জন্ম-স্বাধীন কি না? ব্রিটিশ নাগরিকের ন্যায় তাহাদের সমস্ত বিষয়ে অধিকার আছে কি না?" এ জন্য তাহাকে কেহ পছন্দ করে না। তাহাকে নিন্দা করা হয় এ কারণে যে, সে তাহার স্বাধীনতা ও মাসিক ৮ টাকা উপার্জনের বিনিময়ে কেন মাসিক ৭ টাকা বেতনে বাহিরে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনা হইতে চাহে না? আরও অনেক সত্য মিথ্যা এবং অধিকাংশই মিথ্যা কারণে সে নিন্দিত হয়, ইহাতে ব্রিটিশদের সুনাম আমাদের দেশে নষ্ট হইয়া থাকে। তাহার অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই, এবং সে দোষ ভারতীয় চরিত্রের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে; এবং এ দোষ অন্য নানা কারণে এবং পরিবেশের জন্য সমূলে দূর করা সম্ভব নহে। তথাপি বাঙালীকে ভারতের স্কটসম্যান বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাহাকে প্রশংসাই করা হয়। এ বিশেষণ তাহার নহে, কারণ স্কটসম্যান যাহা করিবে ভাবে, তাহা সে করে। বাঙালী তাহার মত স্থিরবুদ্ধি এবং সকল কাজে দৃঢ়সঙ্কল্প নহে। স্কটসম্যান চিন্তায় গুরুত্ব অর্পণ করে, কাজে গুরুত্ব অর্পণ করে। বাঙালী অনেক সময়েই গুরু চিন্তা করে, কিন্তু কাজ করে লঘু ভাবে। সে আবেগ-সর্বস্ব এবং খেয়ালি। সে ভারতের শিশু ফ্রেঞ্চম্যান। সে সতর্ক নহে, বিচক্ষণ নহে। কিন্তু সমস্ত দোষ সত্ত্বেও, ভারতে, উদার নীতি ও বাঙালীর সমার্থক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সে ইংল্যাণ্ডে যায় এই উদ্দেশ্যে যে, সেখানে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমর্থক পাইবে। সেইজন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়া এক দলের সঙ্গে মেশে, অন্য দলকে খুশি রাখিবার চেষ্টা করে না।

ক্রমশঃ

বৃত্ত

অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

বাস্ থেকে নামতেই চারপাশ থেকে ছোপ্ ছোপ্ ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার অমলকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরে। কোলকাতা শহরে এমন অন্ধকার কেন ভাবাই যায় না। ছোট্ট টর্চের ক্ষীণ আলোটুকু অন্ধকারে ভীরু মনে হয়।

মনটা খিঁচিয়ে ওঠে অমলের। যত সব......। কেন রে বাপু যুদ্ধ? যুদ্ধ-টুদ্ধ মানেই ব্ল্যাক্‌আউট আর পয়রানির একশেষ। কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ। যুদ্ধ না করলে কারও রাতে ঘুম হয় না। আর যুদ্ধের তাণ্ডবে অমলের মতন ছাপোষা মানুষের মরণ আর কি? বেবিফুড্ রাতারাতি উধাও। বাগ্‌ড়ি মার্কেটে লাইন দিয়ে কিনতে গেলে অফিস কামাই হয়। তবু ভাগ্যিস টর্চটা আগে কেনা ছিল। নইলে এই ব্ল্যাক্-আউটের বাজারে সেলামি দিয়ে হয়তো ডবল দামে কিনতে হ'তো। এই তো খবরের কাগজের ওপর সারচার্জ বসেছে। পোস্টাল-ষ্ট্যাম্পে বাড়তি পয়সা গুনতে হচ্ছে। ধুস্.........আমাদের কথা কেউ ভাবে না।

ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকে বাইরের অন্ধকারটা গা থেকে কেচে ফেলে অমল। ঘরে ঢুকেই মনটা দ্বিগুণ খিঁচিয়ে ওঠে বিছানায় চোখ যেতে। টুক্‌লু শুয়ে। কপালে ওর ভিজে ন্যাকড়া। পাখা হাতে মাথার কাছে বসে গোপালের মা।

—টুক্‌লুর কি জ্বর হয়েছে? অমল জিগ্যেস করে।

—হুঁ......দুপুরে ভাত খাওয়ার পর গা গরম হ'য়ে—

—হুঁ—বুঝেছি। ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলে?

—আমি একলা কি ক'রে যাই বলো দিকিনি?

গোপালের মা'র কথাটা যেন চাবুক মারতে থাকে অমলকে। ইচ্ছে হয় ঠাস্ ক'রে এক চড় কষিয়ে দেয় ওর গালে। তোমার টাকা দেওয়া হয় কি মুখ দেখতে? টাকা তো গাছের গোটা নয়। রোজগার করতে মেহনত লাগে। একলা জেনেই তো কাজ ক'রতে এসেচো। মাস গেলে গোটা কয়েক কড়্‌কড়ে নোটও পাচ্ছো।

কিন্তু না, নিজেকে সামলে নেয় অমল। কিছু বলে না গোপালের মাকে। সত্যিই তো, ওরই বা দোষ কি? টাকার বিনিময়ে ও তো খুবই ক'রছে। ওর কাছে এর বেশী আশা করাও অন্যায়। বেশি টাকা নিয়েও আর কেউ তো রাজি হয়নি টুক্‌লুকে সারাদিন রাখতে। আর সুলতা......? সুলতা তো টুক্‌লুর মা। সুলতা কতটুকু ক'রছে নিজের ছেলের জন্যে? হ্যাঁ—টাকা পয়সা রোজগার ক'রছে সুলতা। ভালো জামা-কাপড় আর খাবার দাবার যোগাচ্ছে ছেলের জন্যে। কিন্তু মায়ের কাছে শিশু-সন্তানের এইই কি সব?

মনটা বিষিয়ে ওঠে অমলের সুলতার ওপর। অফিস থেকে এখনো ফেরেনি সুলতা। কখন ফিরবে কে জানে।

বিশেষ ক'রে টুক্‌লু হবার পর সুলতাকে কতবার বলেছে অমল, এবার না হয় চাকরিটা ছেড়েই দাও। অন্ততঃ টুক্‌লুর দিকে চেয়ে।

সুলতা রাজি হয়নি।

বলেছে, সে তোমায় ভাবতে হবে না। সারাদিনের একটা লোক রেখে নেবো। আর......একটু বড় হ'লে ওকে কন্‌ভেন্টে দিয়ে দেবো।

বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে বলতে থাকে অমল, নাও লোক রাখো এবার। কন্‌ভেন্টে দিয়ে দাও। যত্তো সব......।

গোপালের মাকে বললো, তুমি বাড়ি যাও গোপালের মা।

গোপালের মা চলে যায়। সার্সির ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায় অমল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা আর কেবল গুটিপাকানো অন্ধকার। কোনও ফাঁক-ফুকর দিয়ে এক ঝলক আলোও বাইরে আসছে না কোথাও। কৃষ্ণ পক্ষের কালো আকাশে কেবল অসংখ্য তারা মিট্-মিট্ ক'রে হাসছে। ওঃ...যুদ্ধ...ব্ল্যাক্-আউট...কৃষ্ণপক্ষ সবই যেন সময় বুঝে এসেছে।

অমলদের কাছাকাছি কোনও ডাক্তার নেই। দূরের ডাক্তারকে কল্ দিলেও এখন আসবে না। সন্ধ্যের পর অন্ধকারে এদিকে রিক্শাও বেরোয় না। ওরাও তো মানুষ? অথচ রিক্শা ছাড়া টুক্লুকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। টুক্লুর কপালে হাত রাখে অমল। কপালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বগলে থার্মোমিটার লাগায় অমল।

সুলতা ঘরে ঢোকে।

সুলতাই জিগ্যেস ক'রে, কি হ'লো? টুক্লুর কি জ্বর হ'য়েছে?

—হুঁ......।

—কখন হ'লো?

—দুপুরে খাওয়ার পর।

—ডাক্তার দেখিয়েছে?

—না।

—সে কি! গোপালের মা কই?

—চলে গেছে। আমি যেতে বলেছি।

—আশ্চর্য......! আচ্ছা, বলতে পারো ওকে এক-কাঁড়ি টাকা দিয়ে রেখেছি কি জন্যে?

—জানি। কিন্তু... ..ও-ই বা একলা কি ক'রবে?

—মানে?

—মানে টাকার বিনিময়ে ও তো খুবই ক'রছে।

—খুব না ছাই। ও না পারে ছেড়ে দিক। আমি কালই অন্য লোক ঠিক ক'রবো। খই ছিটোলে আবার কাকের অভাব।

—জানি অনেক সময় কাকের অভাব হয় না। কিন্তু গত এক বছরে কটা লোক এলো আর গেলো তার হিসেব ক'রেছো কি? মাঝে যে ক'মাস লোক ছিল না তখন তো টুক্লুকে দেখার জন্যে বাড়িতে থেকে তোমার আমার ছুটিও প্রায় শেষ হ'য়েছে।

অমলের কথায় কোন উত্তর দেয় না সুলতা।

অমলই বলে আবার, ভুলে যেয়ো না সুলতা টাকায় দুনিয়ায় সবকিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া টুক্লু তোমার ছেলে, আমার ছেলে।

সুলতার মেজাজটা তিরক্ষিথ হ'য়ে ওঠে অমলের কথায়।

সুলতাই বলে, অমল......লেবু বেশি চটকালে টক হয়। তোমার ওই খোঁচা আমার ভাল লাগে না। আমার চাকরিটাই কি তোমার চক্ষুশূল—

তুমি ভুল করেছো সুলতা। চাকরির প্রশ্নটা এখানে বড় নয়।

—না অমল, ভুল আমি কোনদিন করিনি। আজও নয়। যখন আমরা আলাদা হ'য়ে এখানে চলে এলাম তখন কেন এসব তলিয়ে ভাবোনি?

—ভেবেছিলাম। বলতে পারি বেশ ভালো মনেই ভেবেছিলাম। আর এও ভেবেছিলাম যে সুলতার ব্যক্তিস্বাধীনতাটুকু নষ্ট করা আমার উচিত নয়।

—তবে আজ হঠাৎ এমন খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠেছো কেন? রোগ কি মানুষের হয় না?

—হ্যাঁ স্বীকার করি। শরীর থাকলে রোগ আসবেই। কিন্তু...ওয়েস্টার্ন্ কান্ট্রির ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে একেবারে যে জানো না তা তো নয়। বাবা-মা চাকরি করার ফলে ওরা কারও ক্লোজ্ এ্যাফেকশন তেমন পায় না। তাই ওদের জীবনে আসে হতাশা। বিশেষ করে আমেরিকানদের মধ্যে, যার পরিণতি চরম উচ্ছৃঙ্খলতা।

—এও তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল অমল। আমি চাকরি পাবার পর একদিনও তো তোমায় এসব বলতে শুনিনি? সেদিন টাকার অঙ্ক আর সচ্ছলতাকেই বড় করে দেখেছিলে?

—কি বলছ তুমি, সুলতা? রাগলে তোমার মুখে কিছু আটকায় না।

—আমি ঠিকই বলছি। রাগটা পুরুষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তবু সেটা যদি অন্যায় না হ'তো। তুমি যদি—

—থাক। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে বা সাহস আমার নেই। তবে একটা জিনিস সব সময় মনে রেখো সুলতা, টাকা দিয়ে মানুষের স্নেহ কেনা যায় না।

—জানি। চাকরি ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—আর কোনদিন আমি তোমায় চাকরি ছাড়তে বলবো না সুলতা। সত্যিই তো আজকের দিনে একটা চাকরি লটারির সামিল, সেখানে তুমি কেন আমার কথায় তা ছেড়ে দেবে ?

খুব স্বাভাবিক গলায় বললো অমল। কিন্তু বুঝলোনা ওর কথাগুলো সুলতা শুনলে কি না। কারণ সুলতা হাতের ব্যাগটাকে ড্রেসিং-টেবিলে ছুঁড়ে সবেগে বাথরুমে ঢুকে পড়েছে। খটাস্ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। এমনিতেই মেয়েদের বাথরুমে সময় লাগে বেশি। সুলতার তো আরও বেশি। আজ আবার কতক্ষণ লাগবে জানে না অমল।

দেওয়ালে সুলতা-অমলের বিয়ের ছবিটার দিকে চেয়েই সুলতার কথা ভাবে অমল। আর সুলতাকে ঘিরে নিজের অতীতটা। হ'তে পারে সুলতা নিজের স্ত্রী, কিন্তু একেক সময় সত্যিই ভেবে পায় না অমনি মেয়েদের মনটা কি দিয়ে তৈরী। কবিরা মেয়েদের সর্বংসহা বলে যত উপমাই দিক না কেন, অমল ভেবে পায় না অন্ততঃ সুলতার মতন শিক্ষিতা মেয়েরাও কেন মুহূর্তের মধ্যে সহ্যের পাঁচিল ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে পারে। অন্য মেয়ের সম্পর্কে ধারণা নেই অমলের। কেননা মেয়েদের সঙ্গটা বরাবর বাঁচিয়ে চলেছে অমল। তাই সুলতাকে দিয়েই আর পাঁচটা মেয়ের বিচার ক'রতে চায়। এও অমল অনেকদিন ভেবেছে যদি মন নামক জিনিসটা এ্যাবষ্ট্রাক্ট্ না হ'তো তবে হয়তো ও নিজেই একদিন গবেষণা করতো, বিশ্লেষণ করে দেখতো।

ওদের বিয়ের দু'বছর পর টুকলুর জন্ম। টুকলু হবার পরেই গোলমালের শুরু। একদিকে সুলতার চাকরি......আরেকদিকে টুকলুর দেখাশোনা কেমন যেন তালগোল পাকাতে থাকে। বাড়িতে বৌদিদের প্রত্যেকের কোলে একজন বা দুজন। একমালী লোক কাকে কখন রাখে। মা তো ঠাকুর ঘর নিয়েই ব্যস্ত। অমলের হাত পড়ার আগেই ভাঙনের ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে তখন।

সেদিন রাতে বালিশ আঁকড়ে ধরে সুলতা বললো, টুকলুকে দেখাশোনা করার জন্যে একজন লোক ঠিক ক'রতে হবে।

একটু আশ্চর্য্য হয় অমল।

—তুমি কি ঠাট্টা করছো সুলতা ?

—না না না। ঠাট্টার বয়েস আমার নেই। যা বলছি তাই করো। আমি তো কারো কথা শুনতে রাজি নই।

—তুমি কি বলতে চাইছো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সুলতা।

এক ঝটকায় বালিশটা ঠেলে দিয়ে বিস্রস্ত সুলতা কুপিতা সর্পিনীর মতন অমলের মুখের কাছে মুখ এনে এনে বলে, তা বুঝবে কেন ? ন্যাকা পুরুষ আমার। তুমি যে বধির, তোমর চোখ যে অন্ধ। তাই কিছু শুনতে পাও না, দেখেও দেখতে পাও না।

বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকে সুলতা। অমল ভাবতে থাকে সুলতার কথা। এক সময় সবই জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যায় অমলের কাছে।

অমলই বলে, আমি বধির নই, কানা নই সুলতা। সবই বুঝি কিন্তু......একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে গেলে এক আধটু কথা শুনতে হয় বৈকি। সেজন্য কিছু মনে করলে তো চলে না। সুলতা তেমনিই ফোঁপাতে থাকে।

অমলই বলে আবার, এমনি করেই মানুষ হয়েছি সুলতা, কোলে আমাদের নেবার কেউ ছিল না।

তাছাড়া বেশি যত্নে শিশুদের ন্যাচারাল গ্রোথ্ নষ্ট হয়ে যায়।

সুলতা ফোঁস করে বলে ওঠে, তোমার ইচ্ছে হয় এখানে থাকো, আমি তো কারও অধীন নই। আমি টুকলুকে নিয়ে অন্য কোথাও—

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সুলতা।

হিটারে চায়ের কেটলি চাপাল। অমল নীরবে সুলতাকে দেখে। দুশ্চিন্তার রেখামাত্র নেই সুলতার মুখে অথচ এখনই টুকলুকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যাওয়া দরকার। সুলতাকে কিছু বলতে সাহস হয় না অমলের। সুলতাও সারাদিন খেটেখুটে ফিরেছে, কিছু বলতে গেলে আবার হয়তো পাঁচকথা শুনিয়ে দেবে। অমলের নিজেরও আজ খুব খাটুনি গেছে। হোক না ছোট কোম্পানী। কিন্তু বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে জমা হিসেব-নিকেসের পাহাড় দেখলে গায়ে জ্বর আসে। বেশির ভাগই দেখতে হয় অমলকে কিনা? আজও সারাদিন দম ফেলার ফুরসৎ পায়নি। শরীর ক্লান্ত। মাথাটাও ভার হ'য়ে রয়েছে। এখন একটু বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু না। উঠে পড়ে অমল। বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল ঠাসে। বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চিরুনি বুলিয়ে এলোমেলো চুলগুলো ভদ্রস্থ করে। ব্যাগ থেকে কয়েকটা টাকা বের করে পকেটে পোরে।

সুলতা এতক্ষণ চুপচাপ অমলকে লক্ষ্য করছিল।

একবার জিগ্যেস করলো, চললে কোথায়?

—কোথায় আবার? ডাক্তারখানায়।

—চায়ের জল চাপিয়েছি দেখতে পাওনি?

অমলের নিজেরও চায়ের নেশায় মনটা উস্‌খুস্ করছিল। তবু নিজেকে চেপে বললো, হুঁ...পেয়েছি। কিন্তু চায়ের চাইতে টুকলুর মেডিসিনের ইম্‌পরট্যান্স্ এখন অনেক বেশি।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে সুলতা।

—বলতে পারো তুমি পুরুষ হয়ে জন্মেছিলে কেন? আশ্চর্য...আজকের দিনে এমন ভীতু আর নার্ভাস্ পুরুষ আমি দেখিনি।

অমল কথা বলে না। অমলের নীরবতা সুলতাকে আরও খিঁচিয়ে তোলে।

—একেক সময় মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটাই জীবনের একটা বিরাট ভুল।

সুলতার কথায় বোমার মতন ফেটে পড়ে অমল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ...আমারও তাই মনে হয়। কেন, পথ তো খোলাই রয়েছে। ভুলটা যদি ভাঙতে পারো—

—মা, একটু জল...?

টুকলু জল চায়। সুলতার মনের আগুনটা যেন হঠাৎ নিবে যায় টুকলুর কথায়।

টুকলুকে জল দিতে দিতে অমলকে বলে সুলতা, মিনিট দশেকের মধ্যেই চা হয়ে যাবে। খেয়েই যাওয়া যাবে। দশ মিনিটে এমন কি আর হবে?

সুলতার কথায় আগের সেই ঝাঁঝ্ নেই। তবু অমল কোনও কথা বলে না। সার্সির ভেতর দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে। সূচিভেদ্য অন্ধকার বাইরে। প্রাণের স্পন্দনও যেন স্তব্ধ। অন্ধকার আকাশে কেবল মিট্‌মিটে তারাগুলো যেন অমলকে ব্যঙ্গ করছে।

চা খাওয়া হ'লো। ইচ্ছে না থাকলেও অমলকে খেতে হ'লো। চা তো নয়। যেন সুলতার বিষ মেশানো গরম কথাগুলো অমলকে পুড়িয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

টুকলুকে তুলতে যাচ্ছিল অমল।

সুলতা বললে, ওকে আমার কাছে দাও। ভালো করে গরম কাপড় জড়িয়ে দাও। যা শীত পড়েছে। অমল বললো, দুজন গিয়ে লাভ কি সুলতা? তুমি না হয় বাড়িতেই থাকো। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে...

সুলতার মুখের দিকে চেয়ে অমল কথা শেষ করার সাহস পায় না। সুলতার মুখটা পাথরের মতন শক্ত। চোখদুটো থেকে যেন আগুনের ফুল্‌কি ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। টুকলুকে সুলতার কোলে তুলে দেয় অমল। টর্চটা নিয়ে সুলতার পেছন পেছন বেরিয়ে আসে।

বাইরে বেরুতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার মুহূর্তে ওদেরকে গিলে নেয়।

গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই কেঁপে কেঁপে সাইরেন বেজে ওঠে। থমকে দাঁড়ায় ওরা। সাইরেনের আওয়াজে গলা মিলিয়ে আল গলি থেকে গোটাকয়েক কুকুরও চেঁচিয়ে চলেছে।

—প্লেন্-এ্যাটাকিং সিগ্ন্যাল।

অস্ফুটে বললো সুলতা।

—হুঁ...।

মেজাজটা অমলের আবার তিরিক্‌খি হ'য়ে ওঠে। প্লেন্-এ্যাটাকও খুব সময় বুঝেই এসেছে। বিপদ যখন আসে চারদিক থেকেই যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরে। ওঃ...এও যেন অমলের জীবনের এক চরম পরীক্ষা।

—কি করবো, ফিরে যাবো কি?

সুলতা জিগ্যেস করলো।

—না। বেরিয়ে যখন পড়েছি, যাবোই। কপালে মরণ থাকলে হবে।

পা বাড়ায় অমল। পেছন পেছন ছেলে কোলে সুলতা।

টর্চের আলোটা নিচের দিকে ফেলছে অমল। ছোট্ট টর্চের ক্ষীণ গোলাকার আলোটুকু চারপাশের সর্বগ্রাসী অন্ধকারে স্তিমিত বলয় তৈরী করছে। অমল দেখতে পাচ্ছে ওই বলয়ের মধ্যে একটা কচি মুখ ডাগর দুটি চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। আর বলয়ের পরিধি ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে সুলতা আর অমল।

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বোম্বাইতে বিশেষ অধিবেশন করার অক্ষমতা জানালেন। তখন তসদ্দক শেরওয়ানী দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আসফ আলীর পক্ষ থেকে দিল্লীতে বিশেষ অধিবেশনের জন্য কংগ্রেসকে আহ্বান করলেন।

এই সময় নাগপুরে জাতীয় পতাকা আন্দোলন খুব জোরে চলছিল।

এই সময়েই আবার উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ মিরাট, সাহারানপুর, আজমীঢ়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে গেল।

ইতিমধ্যে নাগপুর পতাকা আন্দোলন দমন করতে গভর্ণমেণ্টের দণ্ডনীতির উগ্ররূপ প্রকাশে যে গুরুতর পরিস্থিতি উপস্থিত হল—তা আলোচনার জন্য নাগপুরে জরুরি অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের জন্য বল্লভভাই প্যাটেল ৬ই আগষ্ট অধিবেশনের দিন স্থির করে জানালে বিশাখাপত্তনম্ থেকে দেশভক্ত বেঙ্কটাপ্পায়া, রাজাগোপালাচারী ও দেশপাণ্ডে নাগপুর যেতে ৪ঠা তারিখে কলিকাতা রওনা হলেন।

৬ই আগষ্ট নাগপুরে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করে যথোচিত উপায় অবলম্বন করল।

অন্যদিকে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের জন্য ৮ই আগষ্ট তারিখে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল এবং তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে ডাঃ আনসারী ও আসফ আলী।

দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজ্য পার্টি ও নো চেঞ্জারদের ভাগ্য পরীক্ষা হবে সুতরাং উভয় পক্ষই কংগ্রেসে তাদের পক্ষের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

স্বরাজ্য পার্টির সভাপতি যদিও দেশবন্ধু দাশ কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী তখন নো-চেঞ্জারদের কব্জায়, উক্ত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সুতরাং প্রাদেশিক কমিটী তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নিতে না পারলে বাংলা থেকে স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর সম্ভাবনা নেই, অতএব নো-চেঞ্জারদের অপসারিত করে নিজদিগের লোকদ্বারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্যে স্বরাজ্য পার্টির কয়েকজন সদস্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বিশেষ সভা আহ্বান করার জন্য সেক্রেটারী ডঃ ঘোষের নিকট একটি রিকুইজিশন পাঠালেন, ঐ রিকুইজিশন ডঃ ঘোষের নিকট ১৬ই জুলাই তারিখে পৌঁছায়, কমিটীর বিধানানুসারে ৩০শে আগষ্ট তারিখে সভা আহ্বান করার কথা এবং তার ৭ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৩শে আগষ্ট সভার নোটিস দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ডঃ ঘোষ তা না করে ৩১শে জুলাই তারিখে নোটিস দিয়ে ১৫ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বেলা ৩টার সময় সভা আহ্বান করলেন।

আইনানুসারে সময় মত সভা আহ্বান না করায় রিকুইজিশন-কারীদের উপর সভা আহ্বানের অধিকার বর্তমান। তারা এ সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করে ভারত সভা হলে কমিটীর সভা আহ্বান করার জন্য নোটীস দিল এবং ১১ই আগষ্ট সভার তারিখ ঠিক করল। নির্দিষ্ট তারিখে অখিলচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন হল। সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদকের পদ শূন্য বলে গণ্য করা হল এবং তৎস্থলে মৌলানা আক্রাম খাঁ ও ভূপতি মজুমদারকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত করা হল। আর একটি প্রস্তাব দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে, কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং অর্ডার জারি করা হয়েছে সেগুলি সংশোধন করার ক্ষমতা কমিটীর কার্য্যনির্বাহক সমিতিকে দেওয়া হল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভ্য নির্বাচন বা তা রদ করা অথবা স্থগিত রাখার ক্ষমতাও এক্‌জিকিউটিভ কাউনসিলকে দেওয়া হল। সময়ের অল্পতা হেতু কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন সম্বন্ধীয় আইন স্থগিত রেখে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতাও উক্ত কাউনসিলকে দেওয়া হল।

এর পর ভূপতি মজুমদার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক হিসাবে ১৫ই আগষ্ট বেলা ৩টার সময় ভারতসভা গৃহে কমিটীর সভা আহ্বান করলেন। প্রকাশ থাকে যে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও ঠিক ঐ তারিখে ও ঐ সময় উক্ত গৃহে রিকুইজিশন সভা আহ্বান করেছেন।

১৫ই আগষ্ট নির্দিষ্ট সময় ৩টার বহু পূর্বেই উভয় দলের সদস্য দ্বারা ভারত সভা গৃহ পূর্ণ হয়ে গেল। হলের মধ্যস্থলে একটি টেবিলে মৌলানা আক্রাম খাঁ ভূপতি মজুমদারকে পাশে রেখে বসলেন। তার নিকটেই আর একটি টেবিলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ডঃ ঘোষের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন।

৩টা বাজা মাত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর নির্দেশে গত ৩০শে জুন তারিখের কমিটীর মিটিংয়ের মিনিট ডঃ ঘোষ পড়তে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৌলানা সাহেবের নির্দেশে ভূপতি মজুমদার ১১ই আগষ্ট তারিখের সভার মিনিট পড়তে সুরু করলেন। তখন প্রচণ্ড হৈ চৈ ও গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেল। কোলাহলের মধ্যে কারো কথাই শোনা গেল না। উভয় দলের সভ্যদের মধ্যে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হল। নো-চেঞ্জারদের

দলের মাখনলাল সেনকে আমি একটা কথা বলতে উদ্যত হতেই তিনি সজোরে আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। গণ্ডগোলের মধ্যে ১১ই আগষ্টের সভা বৈধ বলে গণ্য করা হল এবং কাঁকিনাড়া কংগ্রেসের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলীর নাম সুপারিস করা হল। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হরদয়াল নাগ, শরৎ কুমার ঘোষ, মুজিবর রহমন প্রভৃতি নো-চেঞ্জার নেতাগণ সভা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। সভায় স্বরাজ্য দলের সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, পুরুষোত্তম রায় ও আমেদ আলী সভায় অংশ গ্রহণ করে খুব হৈ চৈ করেছিলেন।

তার পরদিনই ১নং এন্টনীবাগান লেনে শ্রীমতী মোহিনী দেবীর বাড়ীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্বাহক সমিতির (একজিকিউটিভ কাউনসিল) অধিবেশন হয়। সভায় সাতকড়িপতি রায়, মহম্মদআবদুল করিম, মৃণালকান্তি ঘোষ, গিরিজামোহন সান্যাল, কিরণশঙ্কর রায় এবং পদাধিকার বলে সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ ও সম্পাদক ভূপতি মজুমদারকে নিয়ে একটি নির্বাচনী কমিটী গঠিত হয় এবং কমিটীর আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয় গিরিজামোহন সান্যালকে। এই কমিটীর উপর দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার অর্পিত হল।

১০ই আগষ্টের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের সভার পর বাংলা দেশে দুটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী দেখা দিল। উভয় কমিটীই নিজকে বৈধ কমিটী বলে প্রচার করতে লাগল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কমিটীর সম্পাদকের নামে সভাসমিতি আহ্বান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে নোটীস যেতে লাগল।

বাংলার উভয় কংগ্রেস কমিটীর মধ্যে একটা আপোষ করার জন্য অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী সচেষ্ট হল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটীর বৈধতার প্রশ্ন বিচার করার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের উপর ভারার্পণ করা হল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল অশ্বিনীকুমার ঘোষ সহ নো-চেঞ্জারদের পক্ষে এবং দেশবন্ধু দাশ স্বরাজ্যপার্টীর পক্ষে মালব্যজীর সম্মুখে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষের মতামত শুনে মালবীয়জী রিকুইজিশনকারীদের সভা বৈধ সাব্যস্ত করলেন কিন্তু তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে একটি আপোষের উপর জোর দিলেন। আপোষ না হলে এক পক্ষের দিল্লী কংগ্রেসের জন্য নির্বাচিত ৯৮৬ জন প্রতিনিধি অবৈধ বলে গণ্য হবে।

এই রকম সময়ে লালা লাজপত রায়, ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু, মৌলানা হসরত মোহানী ও মৌলানা মহম্মদ আলী কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে সাহারানপুরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হল।

স্বরাজ্যপার্টীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটীর অফিস তখন বৌবাজার ষ্ট্রীট (বর্তমানে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট) ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের গৃহের দোতলায় অবস্থিত ছিল। সেখানে দেশবন্ধু দাশ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, ভূপতি মজুমদার, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাগণ প্রায় সব সময়েই থাকতেন। আমিও সেখানে প্রতিদিন যেতাম। আমাদের দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, এমন সময় একদিন সন্ধ্যার দিকে দেশবন্ধু বললেন যে আমাকে পরদিনই ঐ তালিকা নিয়ে দিল্লী রওনা হতে হবে। নির্দিষ্ট ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে প্রতিনিধিদের তালিকা দিল্লী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট না পৌছুলে সেই তালিকা কোন মতেই গ্রহণ করা হবে না এই মর্মে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক আসফ আলী নোটীস দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন। ডাকে পাঠালে তালিকা সময়মত না পৌছুতে পারে। পৌছালেও যে প্রাপ্তিস্বীকার পাওয়া যাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। এই সকল কারণে আমাকে দিল্লী গিয়ে আসফ আলীর হাতে তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেশবন্ধু আমাকে দিলেন। তাছাড়া পূর্বে গিয়ে আমাদের দলের প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা করায় ভারও আমার উপর অর্পিত হল। আমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় দিল্লীর পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সান্যালের একমাত্র পুত্র তখন

কলকাতাতেই ছিলেন। দিল্লীর তাঁর বিরাট বাসভবন খালি পড়ে ছিল, সেই বাড়ী প্রতিনিধিদের জন্য ছেড়ে দিতে তাঁকে অনুরোধ করা মাত্র তিনি সম্মত হয়ে দিল্লীর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে এক পত্র দিলেন।

দিল্লীতে পৌঁছে চাঁদনী চকে ফোয়ারার সন্নিকটে পরলোকগত প্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের পুত্র রাসবিহারী সেনের গৃহে অতিথি হলাম। রাসবিহারী অতি অমায়িক লোক। দিল্লীতে তিনি আহুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। যেদিন দিল্লী পৌঁছলাম সেই দিনই সন্ধ্যার সময় অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে গিয়ে আসফ আলীর হাতে প্রতিনিধির তালিকা দিলাম।

(৩)

পরদিন প্রাতঃকালে অভ্যর্থনা সমিতি বাংলার প্রতিনিধিদের থাকবার জন্য একটি কলেজগৃহ ঠিক করে রেখেছিলেন তা দেখতে গেলাম এবং রেল লাইনের উত্তরে অবস্থিত স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সান্যালের গৃহে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে দেখা করে ঐ বাড়ীতেও প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করে এলাম। তারপরঅভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারীর সঙ্গে দেখা করে জানলাম যে তাঁর বাসভবনের সামনে দরিয়াগঞ্জে একটি দ্বিতল গৃহে দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতাগণের থাকবার স্থান ঠিক করা হয়েছে।

এরপর আমার কাজ হল দৈনিক ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে বাংলার প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করে তাঁদের বাসায় পৌঁছে দেওয়া। এবারে সকলে একসঙ্গে এলেন না। কংগ্রেস অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছিল ২১শে সেপ্টেম্বর। ১২ই।১৩ই তারিখ থেকেই প্রতিনিধিরা আসতে লাগলেন।

দেশবন্ধু দাশ তাঁর ভৃত্যসহ পৌঁছুলে তাঁকে দরিয়াগঞ্জের বাসায় নিয়ে গেলাম।

একদিন সংবাদ পেলাম রাত্রের ট্রেনে কথাশিল্পী শরৎ চট্টোপাধ্যায় আসবেন। তাঁর জন্য আমার সঙ্গে আহু-বাবুর বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করলাম। দিল্লী ষ্টেশনে ট্রেন প্রায় রাত ১১টার সময় পৌঁছুলো। ট্রেন থেকে শরৎবাবু দেশবন্ধুর ভগ্নী উর্মিলা দেবী সহ নামলেন। এক-জন স্বেচ্ছাসেবককে দেশবন্ধুর বাসস্থানে উর্মিলা দেবীকে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়ে আমি শরৎবাবুকে নিয়ে একটি টাঙ্গায় আহুবাবুর বাড়ীতে পৌঁছুলাম। তখন রাত অনেক হয়েছে। সমস্ত সহর সুষুপ্তিমগ্ন। আমরা যখন আহুবাবুর বাড়ীর নিকট পৌঁছুলাম তখন দেখি যে গেট বন্ধ। শরৎবাবু গাড়ীতে বসে থাকলেন। আমি নেমে গেটের দরজার কড়া নাড়লাম। কেউ দরজা খুলল না। তখন আমি জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম। তবুও কোন সাড়া নেই। টাঙ্গার উপর শরৎবাবু অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "গিরিজা, আমাকে কেমন স্থানে তুমি নিয়ে এসেছ। চলো, চলো, কোন একটা হোটেলে নিয়ে চলো।" শরৎবাবু অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। তাঁর মত লোক যে গৃহে অতিথি হতে যাচ্ছেন সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কেউ জেগে নেই এতে তাঁর ক্ষুব্ধ হওয়ারই কথা। যাইহোক এত রাত্রে হোটেল খোলা পাওয়া সম্ভব নয়, জানিয়ে বললাম যে, বাড়ীর মালিক অতি সজ্জন, খুব ভাল লোক। সারাদিন তিনি কংগ্রেসের কাজে খেটে পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বাড়ীর ভৃত্য গেট খুলে দিল। তাকে জিনিষপত্র উপরে তোলার নির্দেশ দিয়ে, টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে, শরৎবাবুকে নিয়ে দোতলায় আমার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করলাম।

তখন বাড়ীর ঠাকুর চাকর সবাই উঠেছে। ঠাকুর শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করল তিনি লুচি খাবেন, না ভাত খাবেন। দু রকম বন্দোবস্তই করা আছে। শরৎবাবু লুচি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের মেঝেয় খেতে বসলেন। ঐ ঘরের সম্মুখে একটি বারান্দা ছিল। শরৎবাবু সবে খাওয়া আরম্ভ করেছেন এমন সময় সম্মুখবর্তী বারান্দায় একটি শীর্ণকায় লোমহীন কুকুরের দর্শন পাওয়া গেল। শরৎবাবু ঐ কুকুরকে দেখে আমাকে বললেন, "তুমি না ভদ্রলোককে খুব ভাল লোক

বলেছিলে? দেখ কেমন ভাল লোক। কুকুরটাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলার উপক্রম করেছে।" এই বলে তিনি তাঁর থালা থেকে একখানা লুচি তুলে কুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কুকুর সেই লুচি লুফে নিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর তিনি পরপর আরও কয়েকখানা লুচি কুকুরকে খেতে দিলেন। আমি বললাম, কুকুরের ত লোম নেই। যে ক'টা আছে তাও এই লুচি খেয়ে উঠে যাবে। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সে রাত্রের মত শয্যার আশ্রয় নিলাম। এই বাড়ীতে শরৎবাবু দিন তিনেক ছিলেন। পরে উত্তর পশ্চিম রেলের কোয়ার্টারে তাঁর এক ভাইপোর বাসায় উঠে গেলেন। যে কয়দিন আমার সঙ্গে ছিলেন তাঁকে ঘন ঘন তামাক ও চা খেতে দেখেছি এবং প্রত্যহ বার-দুয়েক আফিম খেতে দেখেছি।

এরপর একদিন সন্ধ্যার পর সুভাষচন্দ্র বসুকে অভ্যর্থনা করতে ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম। সুভাষবাবু যখন ট্রেণ থেকে নামলেন তখন রাত্রি ৮টা ৯টা হবে। সুভাষ বাবুকে একটি টাঙ্গায় বসিয়ে দেশবন্ধুর বাসগৃহে নিয়ে গেলাম। আমরা যখন দোতলায় পৌঁছুলাম তখন দেখলাম যে দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং বিঠলভাই প্যাটেল ডিনার খেতে বসেছেন। পণ্ডিতজী সুভাষবাবুকে বললেন, সুভাষ, তুমিও খেতে বসে যাও। তাঁর কথামত সুভাষবাবু টেবিলে বসলেন। দেশবন্ধুর প্রিয় ভৃত্য (নামটি এখন মনে পড়ছে না) খাবার সাজিয়ে টেবিলে দিয়ে গেল। তারপর খাদ্যের একটি বিশেষ পদ সুভাষবাবুকে দেওয়ার জন্য পণ্ডিতজী চাকরকে ডাকলেন। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হয়ত বিশেষ খাদ্যবস্তুটির অভাব হয়েছিল, যাই হোক, প্রথম দুবারের ডাকে ভৃত্যটি এল না, তারপর আসতেই পণ্ডিতজী ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং কড়া সুরে চাকরকে ধমকে দিয়ে বললেন—'বেয়াদব, তোম কাহে নেহি আয়া? তোমহারা শির জুতিসেচুর চুর কর্ ডালেঙ্গে। ভৃত্যটি কোন জবাব না দিয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল। তারপর পণ্ডিতজীর ক্রোধ গিয়ে পড়ল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর। তাঁকেও একহাত নিলেন, বললেন, এরকম বেয়াদব চাকর কেন রেখেছ? দেশবন্ধু নীরবে নতশিরে বসে থাকলেন। একটি কথাও বললেন না।

দিল্লীতে আমার উপস্থিতির সুযোগে আমার মা বিধবা সেজদিদি ও মেজ ভগ্নীপতি সহ উত্তর ভারতের তীর্থ পরিদর্শন মানসে দিল্লী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা ডাঃ হেমচন্দ্র সান্যালের বাড়ীর দোতলায় করলাম এবং আমিও আদুবাবুর বাড়ী ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর দেশবন্ধু দাশ আমাকে তাঁর দরিয়াগঞ্জের বাসগৃহে ডেকে পাঠালেন। আমি যখন গেলাম তখন তিনি শয্যায় বিশ্রাম করছেন। আলীগড়ের কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ব্যারিষ্টার তসদ্দক শেরওয়ানীর সঙ্গে দেখা করে যুক্ত প্রদেশ থেকে স্বরাজ্য দলের বহু সংখ্যক প্রতিনিধি যাতে দিল্লীর কংগ্রেসে উপস্থিত হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করতে আমাকে অবিলম্বে আলীগড় যেতে বললেন। আমি তারপর দিনই প্রাতঃকালের এক ট্রেনে আলীগড় রওনা হলাম। আমি মধ্যম শ্রেণীতে যে কামরায় উঠেছিলাম সেই কামরায় একজন কোট-প্যান্টলুন-ধারী বাঙ্গালী ভদ্রলোকও আলীগড় যাচ্ছিলেন। তিনিও শেরওয়ানী সাহেবের বাড়ী যাবেন বল্লেন। এতে আমার বেশ সুবিধাই হোল। পরিচয়ে জানলাম যে তাঁর নাম ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায়। রংপুরে তাঁর নিবাস ছিল। তখন তিনি গাজিয়াবাদে বাসা করে সপরিবারে বাস করছেন এবং দিল্লীতে জুম্মা মসজিদের নিকটে একটি ডিসপেনসারী খুলে ডাক্তারি করছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গেও তিনি জড়িত। তসদ্দক শেরওয়ানীর একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একটি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। সেই সুত্রেই তিনি আলীগড় যাচ্ছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। পরে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। আলীগড়ে ১০টা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম এবং একটি টাঙ্গা করে শেরোয়ানী সাহেবের গৃহে উপস্থিত হলাম।

শেরোয়ানী সাহেব অতি সমাদরে আমাদের গ্রহণ করলেন। আমরা দ্বিপ্রহরিক আহারের পরে পৌঁছলে

সুতরাং তিনি আমাদের আহারের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি সবিনয়ে জানালাম যে আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে না, আমি বাজার থেকে কিছু মিষ্টি কিনে খেয়ে নেব। তিনি জানালেন যে, তাঁদের বাড়ীতে গত ৩০ বৎসর যাবৎ গোমাংস ব্যবহার হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন যে এই জন্যই বোধ হয় আমার খেতে আপত্তি। তাতেও আমি সম্মত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন যে তিনি মনে করেছিলেন যে, বাংলা দেশ থেকে এটি উঠে গেছে (This thing has disappeared from Bengal)। সেই সময় তাঁর মাতুল উপস্থিত ছিলেন, তিনি তখন আলীগড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। গৌরবর্ণ বৃদ্ধের অতি সৌম্য চেহারা। তাঁর গায়ের রং গোলাপ ফুলের মত। তিনি মন্তব্য করলেন যে, কিছু দিন এখানে বাস করলে বাজারের নিকৃষ্ট খাবারের ফলে আমাকে তাঁদের সঙ্গে খেতে বাধ্য হতে হত। তিনি জানালেন যে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক সেখানকার বাজারের খাবারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে মাংস পর্য্যন্ত খেয়েছেন। যাই হোক, আমার জন্য বাজার থেকে খাবার আনানো হল।

ডিনারের সময় শেরওয়ানী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সুরেশ বাবু টেবিলে খেতে বসলেন। আমি একটু দূরে একটি চেয়ারে বসে কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। দেখলাম টেবিলে একটি প্রকাণ্ড জামবাটীতে মাংস রাখা হল এবং প্রত্যেকের সম্মুখে পৃথক পৃথক থালায় রুটী দেওয়া হল। প্রত্যেকেই রুটী নিয়ে সেই মাংসের বাটীতে চুবিয়ে খাচ্ছেন। এতে আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। ভাবলাম যে, এভাবে আমি কোনমতেই খেতে পারতাম না।

শেরোওয়ানী সাহেব বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য বিশেষ চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আহারাদির পর শেরোওয়ানী সাহেবের কনিষ্ঠ এক ভ্রাতার সহিত আলীগড়ের প্রসিদ্ধ কলেজ দেখতে গেলাম। ছাত্রদের থাকার বোর্ডিংগুলি অতি সুন্দর। যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের ধনী মুসলমান পরিবারের সন্তানেরাই বেশীর ভাগ এখান থেকে পড়াশোনা করে। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি বসবার ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি শোবার ঘর। ঘরগুলি মহার্ঘ আসবাবপত্রে সজ্জিত ও মেজে পুরু গালিচায় আবৃত। ঘরের বাসিন্দারাও অতি সুপুরুষ। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। ঘুরে ঘুরে একটি বাঙালী ছাত্র দেখতে না পেয়ে একজন বোর্ডারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কোন বাঙালী ছাত্র আছে কি না। সে অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল যে তারা কাচ্চী ঘরমে হ্যায়। দরিদ্র বাঙালী মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে এত বিলাসিতার খরচ জোগান সম্ভব নয়, সুতরাং তাদের কাচ্চী ঘর ছাড়া উপায় কি? ঐ কাচ্চী ঘরগুলি প্রধান বোর্ডিং ঘরগুলি থেকে দূরে থাকায় এবং দিল্লী ফেরার জন্য ট্রেনের সময় হওয়ায় আর বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আলীগড় শহরও দেখা হল না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে দিল্লী ফিরে গেলাম। তারপর ডাঃ রায় আমার মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র বসু ও কিরনশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সুরেশবাবু একদিন নিমন্ত্রণ করে সুভাষ বাবু কিরণশঙ্কর রায় ও আমাকে সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করলেন। গাজিয়বাদের বাসায় তখন তাঁর অতিথি ছিলেন আমার বন্ধু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। আহারের সময় কথা প্রসঙ্গে অশ্বিনীকুমার ঘোষের কথা উঠল। অশ্বিনী ঘোষ তখন মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিরণশঙ্করবাবু কেদারবাবুকে অশ্বিনী বাবুকে মডার্ণ রিভিউর সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। অশ্বিনী বাবুর অপরাধ তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নো-চেঞ্জার দলের পক্ষে ওকালতি করতে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিরণ-বাবুর এই রকম মনোভাব দেখে বিস্মিত হলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ১৩৭৯ জন্ম স্মরণে

সংগ্রাম সিংহ তালুকদার

ঋষি আত্মা, সর্ব্ব-বহা অর্থাৎ তাঁরা সব কিছু সহ্য করে সর্ব্বস্তরে প্রবাহিত থাকেন। তাঁরা আপামর সকলের। সকলের আপন ও সকলে তাঁকে আপন ভাবে। কেমন করে তিনি সকলের আপন হন? যে আত্মা ব্রহ্মস্তরে সর্ব্বদা বাস করেন তাঁর নিত্য প্রবাহিত জীবন সর্ব্ব মানবাত্মার সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকেন। আমরা এমন একটি আত্মার পরিচয় পাই বর্তমান কালে। যিনি সকলের। কেউ তাঁকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে না—কারণ তিনি যে সকলের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নিজের চিন্তা ভাবনা এক ক'রে নিজেকে সর্ব্বস্তরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্র আত্মা। ভাস্কর যেমন তার প্রভাব প্রকৃতির উপর প্রতিফলিত ক'রে আপনার অনন্য-সাধারণ প্রতিষ্ঠার পরিচয় রেখে যায়—রবীন্দ্র আত্মা তেমনি মানুষ জাতির প্রাণস্পন্দনকে নিত্য নব ভাবে, নব মাধুর্যে ও নবীন প্রেরণায় জাগ্রত করে রেখেছেন। মনে হয় মানব ইতিহাসে এ একটি বিস্ময়। জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের। কবি ত অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। বিশ্বকবিও আমরা পেয়েছি পূর্ব্বে। কিন্তু এমন আপন জন কি আমরা এর আগে দেখেছি? আমার জীবনের সকল সুখে, দুঃখে তাঁর আগমন। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন এমন এক অনির্ব্বচনীয় দরদিয়া দয়িতের কাছে যেখানে আমার সকল অভাব ও সকল দুঃখের চির শান্তি, সকল সমস্যার সমাধান। যুক্ত করে যে প্রার্থনা তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হ'য়েছে সে যে আমারই জন্য তার প্রাণের আকৃতি—বিশ্বের দেবতার কাছে। এমন মুক্ত মন না হ'লে কি এমন মুক্তির আস্বাদন দিতে পারে সকল মানবকে।

Professor Young এক জায়গায় বলেছেন "There is no morality without freedom" স্বাধীনতা বা প্রকৃত মুক্তি ছাড়া ধর্ম্মবোধ থাকেনা। পরা শান্তি। আমরা এমন একটি জীবনের সাক্ষাৎ পাই যে জীবন প্রবাহিত হ'য়েছে অনন্ত মুক্তির প্রোজ্জ্বল আলোকের প্লাবনের রস ধারায়। যিনি রস স্বরূপ হ'য়ে পরম রসস্বরূপকে—দুঃখ, দৈন্যে ভরা মানব জীবনের প্রতি রন্ধ্রে, রন্ধ্রে ভ'রে দিয়েছেন সে অবদান যে বিস্ময়কর। আজ প্রাচ্য তার জীবনের অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য্য লাভ করেই প্রকৃত সুখ বা শান্তি যাকে বলে সেটার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়েছে। আমার মনে হয় রবীন্দ্র-রস-দর্শনই একমাত্র অবলম্বন যার দ্বারা তাঁরা প্রকৃত শান্তি জীবনে লাভ করতে পারবেন। আমরা প্রার্থনা করেছি :—

> "সর্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু,
> সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
> সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু,
> মা কশ্চিদ্ দুঃখ............।"

"সকলেই সুখী হোক। সকলেই স্বাস্থ্যবান হোক। সকলের ভগবৎ দর্শন লাভ হোক্। কেহ যেন দুঃখ কষ্ট ভোগ না করে।"

এই প্রার্থনাই রবীন্দ্র জীবনের পরম আদর্শ। তিনি দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু দুঃখহারীকে সকলের চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রার্থনা করেছেন। দুঃখ আছে, বিরহ আছে, শোক আছে কিন্তু তার মধ্যে পরা শান্তি বিরাজ করছে, যা মানব জীবনের পরম-শ্রেয়। এই শ্রেয়কেই তিনি জীবনে সর্ব্ব অবস্থায় চেয়েছেন ও সকলকে সেই প্রেম সিন্ধু সুধার কণা বিলিয়ে দিয়েছেন।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সেই পলাশপুর তাকে ডাকছে। অভয় কি আর স্থির থাকতে পারে? ছোট্ট একটা বিছানা নিয়ে, অভয় যখন নিজেদের রেল ষ্টেশনে নামল, তখন বেলা বারটা। পূর্ব্বে কোনও খবর দিতে পারেনি, মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। মালদহের সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র কেটে অভয় বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে জেঠাইমাকে প্রণাম করতে গেল অভয়। আশালতা শুয়েছিলেন, উঠে বসে বললেন, কি করব বল বাবা। উনি থাকলে তোমার এতটা উপায় হ'ত অবিশ্যি কিন্তু বর্ত্তমানে তার উপায় নেই। যাক্, পৌছে একটা চিঠি দিও।

—হাঁ দেব। আশালতা বললেন, একটু দাঁড়াও অভয়। ট্রেণ কটায়, সেই তিনটেয় তো। তা কি বলছিলাম—দাঁড়াও। আশালতা উঠে বিছানার তলা থেকে, একটা দশটাকার নোট এনে হাতে দিলেন।

আশালতা বললেন, মুটে ঠিক্ হয়েছে তো। তা ওদের সঙ্গে ত তোমার দেখা হ'ল না, ওরা সব এখন স্কুলে—

অভয় আর একবার প্রণাম করে চলে এল। আশালতা আর কিছু বললেন না—আর বলার আছেই বা কি? অন্তরে যেখানে বন্ধন নেই, সেখানে স্নেহ, দয়া, মায়া থাকার তো কথাই নেই।

আসন্ন বিদায় মুহূর্ত্তে, অভয় ফিরে ফিরে নিজের ঘরটির দিকে ফিরে চাইল। এই ঘরটিতে অনেকদিন কাটিয়েছে, একটা মায়া জন্মে গিয়েছে। অভয় আবার নূতন করে শোক পেল। এই ঘরটি তাকে বার বার যেন শত সহস্র বাহু দিয়ে টানতে থাকে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। একটা অব্যক্ত ব্যথায় অভয়ের তরুণ মন কেঁদে উঠল। তার ওই কয় বৎসরের জীবনের সঙ্গে এই ঘরটির বহু স্মৃতি যে জড়িত। কতদিন ঘুম ভাঙ্গা রাতে এই ঘরটির স্বল্পালোকিত শয্যায় শুয়ে শুয়ে কত কি সে ভেবেছে। স্নেহময়ী মায়ের মত এই ঘরটির নির্ব্বাক কণ্ঠ যেন মুখর হয়ে উঠেছে—যেন বলেছে ভয় কি? সে ভালবেসে ফেলেছিল, এই ক্ষুদ্র আশ্রয়স্থলকে। মৃতা মায়ের জন্য ছোট ভাইবোনের জন্য কতদিন একা একা হু হু করে কেঁদেছে—তা কেউ দেখেনি। শুধু সাক্ষী থেকেছে এই ঘরটি। জেঠাইমার অনাদর উপেক্ষায় যখন সে ভেঙ্গে পড়েছে, চোখ দিয়ে হু হু করে জল পড়েছে তখন সকলের অলক্ষ্যে নিজের মুখ লুকিয়েছে এই ঘরটিতে। এই ঘরের অন্ধকার দেহের মাঝে আশ্রয় নিয়ে সে পেয়েছে সান্ত্বনা, সে পেয়েছে আনন্দ আর শান্তি। এই ঘরটির শীতল কোলে শুয়ে তার দুই চোখে নেমে এসেছে শ্রান্তিহরা, দুঃখহরা গভীর ঘুম।

আর একজনের কথা মনে পড়ল সে মিনতি। যাবার আগে একবার দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা হবার নয়। মিনতি স্কুল থেকে ফিরে শুনবে সে চলে গেছে। হয়তো সাময়িক ভাবে একটু দুঃখ পাবে। কিন্তু সে সাময়িক। হয়তো সামান্য আশ্চর্য্য হবে। আজ যে সে যাবে, একথা কাউকে বলেনি অভয়। বলে লাভ কি? একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ওর সারা মন ভরে গেছে। এ যে কি—বা কেন এমন হল, এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেও

দিতে পারবে না। মনে হয়, একটা বিরাট শূন্যতায় তার সমস্ত জীবন ভরে গেছে। আশাহত জীবনের চারদিকে যেন বিরাট শূন্যতা, কোথাও কোনও আশা নেই, বা নেই উজ্জ্বল জীবনের চিহ্ন।

ষ্টেশনে লোকজনের ওঠানামা শেষ হতেই গাড়ী চলতে লাগল। প্লাটফর্মের যাত্রীরা নিজনিজ যাত্রাপথে চলে গেল। দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বাতাস, সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। ধারে কাছে কোন লোক নেই। ষ্টেশন মাষ্টার এবার দরজায় তালা দিয়ে নিজ নিজ কোয়াটারের উদ্দেশে চলে গেছেন। অভয় দেখল, কোন লোক নেই, একটা কুলীও নেই। অগত্যা বিছানাটা বগলদাবা করে, টিনের সুটকেসটা হাতে করে চলতে লাগল। যেতে হবে অনেকটা। লাইনের পাশ দিয়ে সরু একচিলতে রাস্তা ধরে, অন্ততঃ দেড় মাইল চলে, শেষে মাঠের রাস্তা ধরে তাকে হাঁটতে হবে। একটা লোক হলে খুব ভাল হ'ত। কারণ, মালপত্র যতই কম হোক্ তবুও, এই দুপুরের রোদ আর গরমে, এই যৎ-সামান্য জিনিষগুলিই অতিশয় ভারী হয়ে উঠবে। কিন্তু উপায় কি? অভয় হাঁটা শুরু করল। অনেকদিন পরে দেশে ফিরেছে। একটা অ-হেতুক আনন্দে মন ভরে উঠেছে। তবুও সবচেয়ে মনে পড়ে যায়, মা নেই। সেই আনন্দের ঘর আজ নিরানন্দে ভরে আছে। দ্বি-প্রহরের এই চমৃচমে রোদের মাঝে চলতে চলতে অভয়ের বার বার মনে হতে লাগল, তার মায়ের কথা। অভয়ের মনে হ'ল, দ্বিপ্রহরের এই রৌদ্রতপ্ত নীলাকাশের অনন্ত বিস্তৃতির মাঝে, কোথাও যেন, তার মা অলক্ষ্যে তার গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন। নীলাকাশের মাঝে মাঝে সাদা সাদা মেঘ, পেঁজা তুলোর মত ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছে, দিনকর মধ্যগগনে-বসে, তপ্ত কিরণে সারা বিশ্ব চরাচরকে প্লাবিত করে দিচ্ছেন। নীচে এই পৃথিবী, গাছ পালা ক্ষেত খামার ঘর বাড়ী, কত প্রাণী, কত ফল ফুল, আর এরই মাঝে, কত আশা নিরাশা সুখ দুঃখ বেদনা যন্ত্রণার মাঝে, তারই মত কত শত লোক ক্ষণে ক্ষণে দোল খাচ্ছে। নিষ্করুণ উদাস প্রকৃতি আপন মনে আপন ছন্দে অনন্তকাল হতে বয়ে যাচ্ছে।

অভয় হাত বদল করে। কখনও বিছানাটা নেয় ডান হাতে, কখনও সুটকেস নেয় বাঁ হাতে। এখনও অনেকদূর। এই মাঠ পেরিয়ে, বাঁ-হাতি তালগাছের সার পার হয়ে, তারপর বাবলা বন, তারপর আবার মাঠ। ওদিকে শুরু হয়েছে গ্রাম। নূরপুর, হৃদয়পুর, সিনেপলশা, কুতুবপুর, একডালা এমনি আরও গ্রাম। কিন্তু তার পথ ঐদিকে নয়। ওই গাঁগুলোকে পিছনে ফেলে, তাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে পূব মুখো। ক্ষেতের আলে আলে তাঁকে হাঁটতে হবে। অভয় হাঁটে। মাঝে মাঝে, একটা বাবলা গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায় অভয়। দূরে দু-একটা মাঠে চাষীরা মাথায় টোকা দিয়ে চাষ করছে, কোথাও গরুর পাল চরছে, কোথাও বা রাখাল ছেলেরা তৃণ শয্যায় বসে ঘুমুচ্ছে। অভয়ের হঠাৎ চমক ভেঙ্গে যায়। সুটকেস আর বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। তার মনে হয়, নীল আকাশের এক প্রান্ত থেকে কে যেন ডাকছে—খোকা, ও খোকা—। না কেউ কোথাও নেই।—এ কি ভুল। তার শোনার ভুল' দূরের তালগাছের পাতা-গুলো, তপ্ত বাতাসে শুধু শব্দ করছে সাঁই-সাঁই। কিন্তু অভয়ের মনে হয়, না এ ভুল নয়। এ সত্যিই। অভয় এদিক ওদিকে তাকায়। কিন্তু কিছু দেখা যায় না। শুধু তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। তার মনে হয়, ঠিক মেঘের ঐ প্রান্ত সীমায়, পেঁজা তুলোর মত, সাদা মেঘখানির পাশে, তার মায়ের সেই মুখখানি। তেমনি শীর্ণ তেমনি স্নেহ সুষমা মাখা, আর দুটী চোখ যেন উদ্বেগ ব্যাকুল। মুখের দুইপাশে ঈষৎ লালচে লালচে তৈলহীন রুক্ষ চুল উড়ছে। আর মাথার ওপর দিয়ে রয়েছে, সেই লালপেড়ে সাড়ীর ঈষৎ ঘোমটা। অভয় তাকিয়ে থাকে। কিন্তু না—কোথাও কেউ নেই। নির্জ্জন রৌদ্রতপ্ত মাঠে দূরে দূরে খেজুর, বাবলা, তাল-গাছের সারি। মাঠের এক প্রান্ত হতে মাঝে মাঝে তপ্ত বাতাস বয়ে আসছে। একটানা সাঁই সাঁই শব্দ।

তবুও অভয়ের মনে হয়, মা যেন তাকে দেখছেন ওই মহা শূন্য থেকে। অভয় দুই হাত জোড় করে মাকে প্রণাম করে। মনে মনে বলে, মা, তোমায় চোখে দেখতে না পেলেও মন দিয়ে বুঝছি, তুমি আছ আর আমায় তুমি দেখছ। তুমি তোমার অভয়কে ভুলতে পারনি মা। আজ আমি ফিরে এলাম মা। আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এলাম মা। তোমার সেই দেহ নেই জানি তবুও বিশ্বাস করি, তোমার অস্তিত্ব মুছে যায় নি। এই আকাশ বাতাস, এই মর্ত্ত্য জগতের মাঝে তুমি ছড়িয়ে রয়েছ। তোমায় কি ভুলতে পারি মা। অভয় হাঁটতে থাকে। তার মনে হয়, কোন্ সে নাস্তিক প্রচার করেছে যে, মৃত্যুর পরই সমস্তই শেষ। এই দেহ ধ্বংস হলেই এর আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। চোখে যা দেখা যায় না তাই বলে কি তার কোন অস্তিত্বই নেই? না তার প্রাণ নেই? চোখে তো আমরা বহু জিনিষ দেখতে পাই না। এক বিন্দু জলের মাঝে, কত যে জীবন্ত প্রাণী রয়েছে, তাই কি আমরা জানি, না দেখেছি। তা বলে কি তারা নেই? চোখ দিয়েই কি সব জিনিষ দেখা যায়? কান দিয়েই কি সব জিনিষ শোনা যায়? ইট, কাঠ, পাথর এরা তো সাদা চোখে প্রাণহীন। কিন্তু এদের ভেতর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুকণাগুলির বিদ্যুৎসম প্রাণচাঞ্চল্য রয়েছে, তা কি মিথ্যে? এই দৃশ্যমান জগতের পারে, স্তরে স্তরে যে অদৃশ্য জগৎ নিত্য বিরাজমান, সেই অদৃশ্য জগতের প্রাণচাঞ্চল্য, তার অস্তিত্ব বোঝা তো আমাদের এই চক্ষুকর্ণের ক্ষমতার অতীত।

আর বেশী পথ নেই। মাঠ ছাড়িয়ে, হাবুল ঘোষের আমবাগানের পাশ দিয়ে, অভয় সদর রাস্তায় পড়ল। একটু বাঁহাতি বেঁকে, ঝোপঝাড়, লেবু বাগান ছাড়িয়ে, এসে পড়ল সেই চেনা রাস্তায়। ঐ দেখা যাচ্ছে সেই অশ্বত্থ গাছটি। কোন্ যুগ থেকে ও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত জিনিষই না দেখছে। কত সুখ দুঃখ কত মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কত আনন্দের ঘটনার ঐ একমাত্র সুপ্রাচীন সাক্ষী। নব বধূ নিয়ে বর যখন কত সুখ ভরা মনে, কত আনন্দে গ্রামে ঢোকে, তখন ওরই তলায় বরকনের পাল্কী নামিয়ে, ওরই সুশীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার চলে যায়। নীরব মূক অশ্বত্থ গাছ তার সাক্ষী থাকে। আবার ওরই তলায় এসে নামায় কোন মৃতদেহ। কোন গৃহ সংসারকে অন্ধকার করে, কোন সতীলক্ষ্মী পরপারে যখন যায়, তখনও সাক্ষী থাকে ওই বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ। ও দেখেছে, সদ্য পতিহারা রমণীর করুণ কান্না। পিতৃহীন অনাথ বালকদের বুক ভাঙ্গা করুণ বিলাপ। সে সব দেখেছে। সে দেখেছে আর নীরবে চোখের জল ফেলেছে। আবার আনন্দের দিনে ও সকলের সঙ্গে হেসেছে। কিন্তু তাও কেউ দেখেনি। অভয় এসে থমকে দাঁড়াল গাছের ছায়ায়, তার মনে হ'ল, বৃদ্ধ পিতামহ অশ্বত্থ গাছটি যেন তাকে বলছে, কি রে অভয়, এলি? বেশ ভাল তো—ভাল আছিস্ তো? শীতল ঝিরঝিরে বাতাস সর্ব্বাঙ্গকে শীতল করে দিল। অভয় আবার চলতে লাগল। রাস্তার আশে পাশের বাড়ীঘরের দরজা বন্ধ। রাস্তার ওপর গরু আর কুকুর শুয়ে রয়েছে। মতি গোয়ালিনী ঠিক আগের মতই ভাঙ্গা ঝুড়ি হাতে পথে পথে গোবর কুড়ুচ্ছে, আর আপন মনে বোধ করি স্বয়ং ঈশ্বরকেই গাল পাড়ছে। অভয় এবার রাস্তার বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেল, তাদের বাড়ীর সদর দরজা। সেই অতি পরিচিত দরজা। চারিদিকে বেড়া দেওয়া,—এখানে ওখানে জবা আর টগর ফুলের গাছ। সব একই আছে। বাবার ছোট্ট দোকান ঘরটির এখন ঝাঁপ বন্ধ। দোকানের সম্মুখে লোকজনের বসার জন্য বাঁশের তৈরী বসবার আসন এখন শূন্য। বৈকাল থেকে রাত নটা পর্য্যন্ত ঐ জায়গা পূর্ণ হয়ে যাবে। লোকে চাষ আবাদের গল্প করবে ;কেউ তামাক খাবে। খদ্দের দু চার পয়সার জিনিষ কিনবে—গল্প করবে—

এখন ভেতর থেকে বাঁশের ঝাঁপ বন্ধ।

দড়ির গিঁট খুলে অভয় আস্তে আস্তে ঢুকল। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই ভেতর হতে শব্দ এল—কে? কে রে?

—বাবা। আমি অভয়—

—অভয়? ধড়মড় করে উঠে পড়লেন গোপেশ্বর। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে হাঁকলেন—ওরে গীতু, খোকন আয়। তোদের দাদা এসেছে—। বোধ করি ওরা এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল। চোখ মুছতে মুছতে হাজির।

—দাদা—। দুই-জনকে কাছে টানতেই ব্যস্ত হয়ে গোপেশ্বর বললেন, এই রোদের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছিস্ বাবা। একটা পন্তর দিতে হয়। মা গীতু দাদাকে পাখা দে। খোকা একটু বাতাস করুক। তারপর ঠাণ্ডা হলে চান করে ফেল্ বাবা। গীতা মা—উনুনে আগুন দিয়ে দুটো ভাত চড়িয়ে দে মা। এখন সরোজিনী নেই। এখন সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হয় গীতা খোকনকে।

গোপেশ্বর বললেন, বেলা তো আর নেই। যা হোক; ভাতের মধ্যে আলু, পটল ফেলে দাও। ঘরে দুধ আছে—ঘিও আছে। গোপেশ্বর হুঁকো টানতে লাগলেন।

বাড়ীর পোষা কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে আসতেই খোকন বলল, দাদা, এর নাম রেখেছি টমি। কেমন নাম বলত? ভাল নয় কি?

অভয় হেসে বলল—খুব ভাল নাম। হঠাৎ এই নামটা কি করে তোর মাথায় এল।

গীতা ভাতের হাঁড়ীতে চাল দিয়ে বলল, ওদের স্কুলের একটা ছেলে, সেই নামটা দিয়েছে। দাদা, এবার চান্ করে এস। দেখতে দেখতে ভাত হয়ে যাবে।

উঠানের পেয়ারাগাছটি তেমনি আছে। সারা গাছে অজস্র ফল ধরেছে। এটা তার মায়ের হাতে বসান। মস্তবড় উঠানের একপাশে সেই তুলসীমঞ্চ আর ছোট্ট ফুলের বাগান। তার মায়ের ছিল ফুলের ভীষণ সখ। তা ছাড়া সরোজিনী বলতেন, গেরস্থর বাড়ী, পূজো আচ্চা আছে, কার দুয়োরে দুটো ফুলের জন্য, তুলসী পাতার জন্যে যাব। তাই সরোজিনী নানা রকম ফুলের গাছ বসিয়েছিলেন। শুধু কি কেবল ফুলের গাছ? কত শাক সবজী, ফলের গাছও বসিয়েছিলেন সরোজিনী। এখনও রয়েছে, মায়ের হাতে লাগান লাউ মাচা, আর বেগুনের গাছ। ওদিকে রয়েছে কুমড়োর মাচা আর উচ্ছের মাচা। সবই আগের মতনই রয়েছে। বাগানে একটি ঘাসও রাখতেন না। সব সময় ছোট নিড়ানিটী দিয়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার করতেন। দুহাত দিয়ে যাবতীয় ঘাস উপড়ে ফেলে দিতেন। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে সমস্তই দেখে। তার মায়ের হাতের কাজ চারদিকে। সেই কল্যাণময়ীর হাতের স্পর্শ আজও অম্লান। চিরকাল ছেঁড়া সেলাই করে, জোড়াতালি দিয়ে যেমন কাপড় পরেছেন, তেমনি বুক দিয়ে রেখেছিলেন এই দরিদ্র সংসারকে।

কত আচার, বড়ি করতেন। আমের সময়, আমেরই কত আচার কত আমসত্ত্ব করতেন। কুলের সময় কুলের, পাকা তেঁতুলের আচার, নেবুর আচার, এমনি কত কি। কোন জিনিষই তিনি ফেলতেন না, সে বস্তু যতই অকিঞ্চিৎকর হোক। একটু ছেঁড়া কাগজ এক টুকরো দড়ি। ভাঙ্গা কাঁচ, পেরেক, কাঠ, এ সমস্তই সঞ্চয় করে রেখে দিতেন। বলতেন—ও রে এখন তো সংসার করিসনে। বড় হলে বুঝবি, সব জিনিষই কাজে লাগে। যা রাখবে, তাই কাজে লাগবে—

অভয়ের বুকের ভেতরটা একটা বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে। একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দুই চক্ষু নিজের অজান্তেই কোন সময় সজল হয়ে ওঠে।

গীতা বলে, দাদা, যাও, চান্ করে নাও। গোপেশ্বর এসে বললেন, ওরে গীতু, দাদাকে খেতে দে। গুড়, দুধ দিবি। আর দেখ, কলা তো বেশ পেকেছে। আজই খোকন বলছিল, বাবা, কত কলা পেকেছে। শুধু দাদা খেতে পেল না। মজা ছাখ্। আজই খোকন বলছিল—

গোপেশ্বর বললেন—গোয়ালঘর পরিষ্কারই আছে। আমি দোকানঘর খুলছি। ঘর ঝাঁট দিয়ে, জিনিষপত্র গোছগাছ করিগে। কাল হাটবার তো। স্থাপলা গরু বাছুর চরাতে নিয়ে গেছে, ও এলে গরু বাছুর বাঁধবে। খড়, খোল, ফ্যান্ দেবে—। খোকন এখন

যেন খেলা করতে বেরিও না। দাদার কাছে থাক। দাদা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিক্—

রান্নাঘরে অভয় খেতে বসে। গীতা পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে। খোকন একটা পিঁড়ি পেতে বসে। অভয়ের মনে পড়ে, মায়ের কথা। মা বসতেন ওই জায়গায়। মায়ের সেই খুরো উঁচু পিঁড়ে রয়েছে। মায়ের হাতে টাঙ্গান সেই রঙিন শিকে, সেই সবই রয়েছে, শুধু নেই সেই মানুষ।

অনেকক্ষণ ঘুমোবার পর, অভয় যখন জাগল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে সান্ধ্য প্রদীপ। ভেসে আসছে শুভ শাঁখের শব্দ। অভয় মুখ চোখ ধুয়ে, উঠোনে এসে দাঁড়াল। পাতলা জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরে গেছে। তুলসী তলায় মাটির প্রদীপ তার ভীরু আলোটুকু নিয়ে টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। অভয় তাকিয়ে দেখে রান্নাঘরেও আলো জ্বলছে। গীতা আর খোকন তুলসী তলায় প্রণাম করে ধুনো দেখাল। এঘর ওঘরে ধুনো দেখিয়ে আবার ধুনুচি এনে রাখল তুলসী তলায়। গীতা বলল, দাদা চায়ের জল চাপাব। তুমি এইখানে বস। মাদুর পেতে দিই—এখানে খোকন বসে পড়া করুক।

ন্যাপলা এতক্ষণ গোয়ালঘরের কাজ শেষ করে এসে এক পাশে দাঁড়াল।

—কত্তাবাবু বললেন, দাদাবাবু এসেছে। একটা পাশ দিয়েছ না দাদাবাবু—

অভয় বলল—বস্‌রে ব। তা তোর নাম কি?

—ন্যাপলা। হুই ছিরু বাউড়ীর ছেলে আমি গো। বাবা যে গাঁয়ের চৌকিদার হয়েছে। আত্তির কালে লণ্ঠন হাতে করে, লাঠি নিয়ে পাহারায় বেরোয়। কিছুক্ষণ গল্প করার পর ন্যাপলা চলে গেল। গোপেশ্বর এখন দোকানে। গাঁয়ের লোক সন্ধ্যাবেলায় আসে। সামনের বাঁশের ধরাটে বসে সবাই গল্প করে। তাদের বেশীর ভাগ গল্প চাষ আবাদ আর বৃষ্টি নিয়ে।

বৃষ্টি না হলে সকলের মুখে ফুটে ওঠে ভয়ের কালো ছায়া।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে। লোকজন ক্রমশঃ চলে যায়।

গোপেশ্বরও দোকানের দরজা বন্ধ করেন।

ক্রমশঃ

শিশুদের সহিত জন্মদিন অনুষ্ঠানের আনন্দোৎসব

প্রতিরক্ষার জন্য অলংকার প্রাপ্তি—হিমাচল প্রদেশ হইতে পাওয়া

মাউন্টব্যাটেন ব্যবস্থার আলোচনা-
দক্ষিণে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিন্না

রম্য রচনায় পৌরাণিক উপাখ্যান—

অবীক্ষিত ও বৈশালিনী

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

বীর্যচন্দ্রদুহিতা সুভ্রূ ও সুব্রতা বীরা স্বয়ম্বরেই পরিগ্রহ করেছিলেন মহারাজ করন্ধমকে। তাঁদেরই সকল কল্পনাকে দোহন ক'রে মর্ত্যের মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিলেন অবীক্ষিত। তাঁর জন্মকালে তাঁর ভাগ্যে বারংবার বিভিন্ন গ্রহমাঙ্গল্যের অবৈকল্যসূচক সৌভাগ্য-লিপি পাঠ করেছিলেন অনেকানেক রাজদৈবজ্ঞ, তাই হর্ষাতিশয্যে তাঁর ঐ নামকরণই করেছিলেন স্বয়ং করন্ধম। দৈবজ্ঞরা নাকি জানিয়েছিলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যাচার্য শুক্র উভয়েই সপ্তম স্থান অধিকার ক'রে বিরাজিত ছিলেন এই নবজাতকের জাতপত্রিকায়। চতুর্থ স্থানাধিকারে ছিলেন নাকি সোম, আর তার উপান্তে ছিলেন নাকি স্বয়ং বুধ। সবচেয়ে মঙ্গলের কথা, তিনি নাকি সূর্য, ভোম ও শনৈশ্চরের কু-দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক ভাগ্যকে সঙ্গী করেই দর্শন করেছিলেন জাগতিক আলোক। সুতরাং কোন ভাবেই সর্ববিধ কল্যাণসমৃদ্ধিলাভে বিন্দুমাত্রও অসামর্থতা দেখা দিতে পারে না এই সৌভাগ্যবান্ নবজাতকের জীবনে।

বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী হয়ে কণ্বতনয়ের শস্ত্রশিষ্যরূপে বহুখ্যাতি লাভ করেছিলেন প্রাপ্তযৌবন অবীক্ষিত। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, বুদ্ধিতে বাচস্পতিকে, কান্তিতে চন্দ্রকে, তেজে সূর্যকে, ধৈর্যে সাগরকে এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীকে অতিক্রম করে অরাতিহৃদয়ের সকল বীর্যকে পরিহৃত করেছিলেন আপন আজানুলম্বিত বাহুযুগের সহায়তায়। স্বয়ম্বরে আমোদিনী হয়ে তাঁকে জীবনদয়িতারূপে অভিনন্দিত করতে দুরাভিলাষবতী হয়েছিলেন হেমধর্মাত্মজা বরা, সুদেবতনয়া গৌরী, বলিপুত্রী সুভদ্রা, বীরসুতা লীলাবতী, বীরভদ্রদুহিতা নিভা, ভীমাত্মজা মান্যবতী এবং দম্ভকন্যা কুমুদ্বতী প্রমুখা অনেকানেক রাজকুলোদ্ভবা রূপ-গুণোত্তমা। কিন্তু বিবাহিত-জীবনের অনুদ্বেগ অলস কালক্ষেপণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য খুঁজে পেতেন না অবীক্ষিত। তাই বারংবার তাঁর সকল চেষ্টা শুধু বৈরিকুলের নিরাকরণেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। কখনও কোন পরাজয়ের গ্লানিকে বরণ করতে হয়নি তাঁকে।

রণভূমে তাঁর গুণশ্লাঘা না ক'রে পারতেন না নিখিল বীরবৃন্দ। ন্যায়যুদ্ধে শত্রুযোধ-সংহারক সর্বাধিক বলে বলীয়ান্ থাকতেন তিনি সর্বক্ষণ।

কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল অসীমতারও যেমন অন্ত থাকে, তেমনই রাজকুমার অবীক্ষিতেরও ছেদহীন বিজয় গৌরব একদিন ম্লান হলো আচম্বিতে।

বিপুল বীর্যবত্তার সে এক বিরাট বিপর্যয়।

দূতমুখেই শুধু শোনেননি, আমন্ত্রিতও হয়েছিলেন তিনি বৈদিশাধিপতি বিশালের আত্মজা সুদতী বৈশালিনীর স্বয়ম্বর সভায়। কিন্তু আপন দুর্দম ইচ্ছার বশীভূত হয়েই সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন তিনি। কিন্তু তখনও জানতেন না অবীক্ষিত, কী বিভীষণ ধ্বংসের পরিণতি সূচিত হচ্ছিল তাঁর অজ্ঞাতে।

অবীক্ষিতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানকে তাঁর দুর্বলতা-রূপে প্রচার করেছিলেন তাঁর অরাতিবর্গ! আর, তাতেই বায়ুসহযোগে অগ্নির মতোই রুদ্রামর্ষে আপূরিত হয়ে উঠেছিল অবীক্ষিতের চিত্ত। বলগর্বে গর্বিত

করদ্রুমতনয় সমগ্র রাজমণ্ডলীর কাছে তাঁর আপন বলা-বলের পরীক্ষা দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন অকস্মাৎ। তাঁর সেই রণলিপ্সু আবির্ভাবে চমকিত হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ম্বর-সভাগত যত নরপতি।

অস্ফুটপ্রায় স্বরে পতিম্বরা নায়িকার কর্ণে আগন্তুক রাজন্যবৃন্দের পরিচয় জ্ঞাপন করছিলেন বাক্‌পটিয়সী পরিচয়-সঞ্চারিকা। বায়ুবশে সঞ্চালিত তরঙ্গমালায় প্রভাসিত মানসসরসীবাসিনী রাজহংসীর সুবর্ণময় পদ্ম হ'তে পদ্মান্তরে বিচরণের মতো এক নৃপতির সম্মুখ হতে অপরের দিকে মরালছন্দে অগ্রবর্তিনী হচ্ছিলেন রত্নাধিকা বৈশালিনী। অমানিশায় সঞ্চারিণী দীপশিখা যেমন পশ্চাতে এক তিমিরজাল বিরচিত ক'রে উত্ত-রোত্তরে আলোকরেশ সঞ্চারিত ক'রে যায়, তেমনই স্বয়ম্বরা নৃপনন্দিনীর এই গতিতে একদিকে অভাবিত বিষাদের অসিত আবরণে যেমন আচ্ছাদিত হচ্ছিল অতিক্রান্ত ভূপতির মুখমণ্ডল, তেমনই অনুরাগ-লাভা-তিশয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছিল পুরোবর্তী রাজন্যের বদনশ্রী, তিনি যেন রঘুনন্দনের বরণান্বেষণে স্বয়ম্বর-সমাগতা স্বয়ং ভোজরাজজা ইন্দুমতী।

এমনই ভাবে ভাববিলাসময়ীরূপে এক পরম আত্ম-প্রেরণাবশে চলতে চলতেই সহসা স্বহস্ত-বিরচিত পুষ্প-মালিকা হাতে নিয়েই নির্বাক বিস্ময়ে চিত্রার্পিতার মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সুকুমারী বিশালাত্মজা। আপন চিত্তের প্রমোদনে এইরকমই এক উৎসবময় মুহূর্তে যাঁকে বরণ ক'রে নিতে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলেন তিনি, তাঁরই এ অভাবিত আবির্ভাবে কিছুটা যেন বিহ্বলই হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রমোদাতিশয্যে ভঙ্গুরিত দুই ভ্রূধনু যেন তাঁর গতিভঙ্গের সঙ্গেই স্থিরবিদ্ধ হলো একটি লক্ষ্যে।

বহুকাল আগে থেকেই, কিশোরীমনের সেই ধূসর মানসপটে আত্মতৃপ্তির সপ্তবর্ণ বিরাজিত হবার মুহূর্ত থেকেই, মহৎকুলপ্রদীপ এই দীপ্তানলতুল্য-তেজস্বী করদ্রুম-তনয়েরই বীরত্বের খ্যাতিতে বিমুগ্ধ হতো তাঁর চিত্ত। যৌবনারম্ভের সেই পঞ্চশরবিদ্ধ অস্থির মুহূর্তগুলিকে এই বিখ্যাত-পৌরুষ অদৃষ্টপূর্ব সুদর্শনের কল্পনা দিয়েই সান্ত্বনা দিতেন ভামিনী। এঁকে পাবারই আকুলতা ছিল তাঁর অসংখ্য উন্নিদ্ররজনীর প্রলেপাধার চিন্তা, এঁরই বামাঙ্করূপিণীরূপে নিজেকে কল্পনাই ছিল তাঁর বিগত প্রতিটি মুহূর্তের একমাত্র পানযোগ্য মদিরা। জানতেন বিশালনন্দিনী, এই দেবোপম অপূর্বদর্শন অদ্বিতীয়কে মনে মনে এমনভাবে সব কিছু সমর্পণ করেছিলেন তিনি, যাঁকে বাস্তবজীবনে সঙ্গীরূপে না পেলে শুধু রিক্তই থেকে যাবে না তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবনে অন্য দেবার্চনার অর্ঘ, পরন্তু নিজেরই কাছে নিজত্বহীন অস্তিত্বে অবশিষ্ট জীবনব্যাপী এক রূপাজীবা রমণীর পরিচিতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাঁকে।

স্বয়ম্বরসভায় তাঁর পারিজাতপল্লবসদৃশ পাণিপীড়নের প্রণিধি নিয়ে তাঁরই পরিণয়মালিকা গ্রহণের আশায় এতদিন এঁকেই অপেক্ষমান হয়ে থাকতে দেখার আকা-ঙ্ক্ষাই পোষণ ক'রে এসেছিলেন নৃপাত্মজা। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনেছিলেন, তাঁর পিতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁর নারীত্বের সকল আকাঙ্ক্ষাকে চরম নির্যাতিত করেছেন সেই নিষ্ঠুর, সেইদিনই আপন মৃত্যুকে আহ্বান করেছিলেন তিনি; আজকের এই স্বয়ম্বরসভায় তাই যে কোন রাজতনয়ের কণ্ঠে নির্বিচারে বরণমালিকা পরিয়ে দিয়ে জীবনের সেই মৃত্যুকেই বরণ করতে প্রতিজ্ঞাত ছিল তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়।

এই তো প্রত্যাখ্যানের প্রত্যাঘাতের লগ্ন! কিন্তু তবু যেন কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে বিবশ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর চেতনা। তিমিরবক্ষে ক্ষণযাপনকারিণী মহোৎপলার জীবনে দিবশক্তির আবির্ভাবজাত আত্ম-বিহ্বলতার মতো আত্মসংযমে অধীরা হয়ে উঠতে চাই-ছিলেন রাজনন্দিনী। চরম সুযোগ পেয়েও নিজেরই জীবনের পরম প্রতিশোধস্পৃহাকে আর জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন না তিনি একটুও। নিজেরই ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া কী এতই অনায়াসসাধ্য!

বরং কর্ণশেখরের নীলপদ্মসদৃশ দুই নয়নে এক অভিভূত দৃষ্টির দর্শন নিয়ে যেন সেই আপন আকাঙ্ক্ষারই একাগ্র পূজনে রতা হয়ে রইলেন রাজকন্যা। ললাটের

রঙ্গস্থলে অলসলীলায় লাস্য নর্তকীর মতোই নৃত্যপর হয়ে ওঠে বঙ্কিম ভ্রূ-লতা। কণ্টকিত হয়ে উঠতে থাকে রক্তকপোলের রেখা। প্রণয় ও লজ্জা, সমর্পণ ও সংবরণ, প্রার্থনা ও গ্রহণভীতির অন্তরালপথে বিচরণ করতে করতে কখন যে আপনারই আনন্দিত অশ্রুধারায় আর্দ্র হয়ে গেল স্তনতটের চন্দন, টেরও পেলেন না রাজকন্যা।

একসময়ে সমবেত রাজমণ্ডলীর উদ্দেশে ধ্বনিত হয়ে ওঠা অবীক্ষিতের বজ্রনির্ঘোষে চমকিত হয়ে উঠলেন বিমুগ্ধা রাজদুহিতাও।

—বীর্যশুল্কা এই বৈশালিনীকে আপন ভুজবল-গৌরবেই গ্রহণ করলাম আমি, করন্ধমাত্মজ অবীক্ষিত। যদি সমশক্তির গর্বে গর্বান্বিত হয়ে থাক তোমরা কেউ, যুদ্ধ দান করো। এই নারীতে আসক্ত নই আমি, তবু আপন দুর্বলতার কলঙ্ক মোচনের অভিলাষেই তোমাদের ঐ ক্ষত্রিয়গৌরবে অম্বিত মুখমণ্ডলেই পরাজয়ের কালিমা লেপন ক'রে আমি নিয়ে যাচ্ছি একে।

আচম্বিতে তার সুকোমল মণিবন্ধে সেই বহু-প্রার্থিত কঠিন প্রতলের স্পর্শানুভবে পুলকোদ্গমে আপূরিত হয়ে গেল সেই বরতনু। অনাস্বাদিতপূর্ব এক প্রশ্রয়ের প্রশ্নাতীত মোহাচ্ছন্নতায় আত্মহারিণী সেই কুমারীমনের নিভৃতাঞ্চল যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসবের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল।

কণ্ঠে নয়, আপন বিবশতার বশে অবীক্ষিতের সেই সুকঠিন বক্ষদেশেই আপন বরমাল্যের বরণ-স্বীকৃতি জড়িয়ে দিলেন নৃপাত্মজা।

তারপর বিস্ময়বিমূঢ় ক্ষত্রিয়পুঞ্জের সম্মুখ দিয়েই সেই হস্তাকর্ষণের আবেগের চেয়েও আপন আত্মবেগে তাঁরই সাথে পিতৃপুরী পরিত্যাগ ক'রে গেলেন হৃষ্টমনা বিশালনন্দিনী।

তাঁদের দুজনকে বহন ক'রে তীরবেগে সকলের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম ক'রে গেল অবীক্ষিতের সুশিক্ষিত তুরঙ্গম।

রাজকুলতিলক অনেকানেক শৌর্যবানের অমর্ষনিঃশ্বাসের দোলায় প্রেঙ্খোলিত হয়ে উঠল বিশালরাজদুহিতার স্বয়ম্বরসভা। সহসা যেন জলদমন্দ্রে আপূরিত হয়ে গেল ক্ষান্তবর্ষণ গগন সদৃশ সেই বিশাল কক্ষের বক্ষ।

বলগর্বে গর্বান্বিত অবীক্ষিতের কাছে বারংবার নিরাকৃত হয়ে নির্বেদগ্রস্ত হৃদয়ে এতক্ষণ শুধু অবস্থানই করছিলেন পরিভূত রাজমণ্ডলী। এবার আকুল হৃদয়ে প্রত্যেকেই প্রবৃত্ত হলেন সরব আত্মধিক্কারে:

—ধিক্ আমাদের রাজজন্মে। ধিক্ আমাদের আত্মগর্বে। ধিক্ আমাদের শস্ত্রবৃত্তিতে। ধিক্ আমাদের শৌর্যের পরিচিতি। যেখানে একাকী এক রাজধুরন্ধর আমাদের সহস্র চক্ষুর সম্মুখ দিয়ে অনায়াসে এক অপরিগৃহীতা ললনাকে গ্রহণ ক'রে অগৌরবের কালিমা লেপন ক'রে দিয়ে গেল আমাদের ক্ষাত্রিয়ত্বে, সেখানে আর কোন্ মর্যাদার দাবী নিয়ে বাঁচব আমরা আর? আমরা কি মেদমাংসশোণিতে বিগঠিতদেহী এই মর্ত্যের মানব, অথবা শুধু বিরাজনের অস্তিত্ব নিয়ে চলৎশক্তিহীন কোন বিরাটকায় মহীরুহের রাশি? অন্ত দিগন্তের বৃথাই সমুদ্‌ঘোষিত আমাদের রাজ-শব্দের লাঞ্ছিত অহংকার। ধিক্, ধিক্, ধিক্।

ধীরে ধীরে আপনাপন অন্তর্ক্লেশের সাময়িক বিহ্বলতা অপসারিত ক'রে করন্ধমতনয়ের প্রতি অতিমাত্র বিস্ফারিত অমর্ষে পরিপূরিত হয়ে উঠলেন সকল নরাধিপ্। যেন দুর্দম শোণিতপিপাসায় সদ্য জাগরিত হয়ে উঠল প্রসুপ্ত শার্দূলদল।

কেউ স্পর্শ করলেন আপন কটিবন্ধধৃত শেষবদ্ধ বক্তৎসরুর সৃষ্টি। কেউ টঙ্কার দিলেন আপন কোদণ্ডে। কেউ বা তুলে নিলেন আপন ভিন্দিপাল। আবার কেউ বা আপন পরিধাতনে দেহভার অর্পিত রেখেই উঠে দাঁড়ালেন সহসা। তারপর শরব্যবক্ষভেদপ্রয়াসী বেগোন্মত্ত আশুগের মতোই সভামণ্ডপ পরিত্যাগ ক'রে অবীক্ষিতের অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিজালের মধ্যেই একে একে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলেন তাঁরা তখনই।

দিকে দিকে বাদিত হলো ভেরী ও মৃদঙ্গ, পণব ও ঢকা, এবং গোমুখ। যেন মুহূর্ত মধ্যে আত্যন্তিক প্রলয়ের সম্মুখীনা হলেন গিরিগহনবতী বসুমতী।

দুই কবিকার কেন্দ্রবিভাগে উপবেশিতা সেই প্রারূঢ়-যৌবনা রূপমাধুর্যময়ী, যার সৌকুমার্যের কাছে লজ্জায় অবনতা হয়ে আসে নবমালিকার মঞ্জরী,—তাকে নিয়ে আস্কালিত বেগেই অতি-বিষম আটব-বিটপাকীর্ণ অরণ্য-পথ উল্লঙ্ঘন ক'রে আপন তুরঙ্গমকে ছুটিয়ে চলেন অবীক্ষিত। মাঝে মাঝে থরে থরে তাঁর বক্ষস্পর্শ করছিল সম্মুখস্থিতা সেই রাজদুহিতার আলোল অলকের কুটিল নীলিমা, কিন্তু তবু রোমাঞ্চকর্কশ কোন অনুভূতিতে চঞ্চল হচ্ছিলেন না রাজতনয়। পথপার্শ্বস্থ অটবীর বীথিতে বীথিতে শালফুলের শ্বেতমঞ্জরী, অথবা রাশি রাশি রক্তিম পলাশের সর্ববর্ণম্লানকারী বিরাজন,—বক্ষোলগ্না সিতবেশা অথবা রক্তিমাম্বরা, সুবর্ণসদৃশ সমুজ্জলগাত্রী কিংবা নবোদিত সূর্যসদৃশ রক্তিম দেহপ্রভা-শালিনী স্বয়ম্বরা,—কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না অবীক্ষিত। কত বৈদগ্ধির আকরা সেই বহুরত্নবিভূষিতা প্রমদোত্তমা, তার অনুমাত্র অনুমানেও সক্ষম হচ্ছিলেন না রসোদাসীন রাজতনয়। দুর্লভা রাজকন্যাকে নয়, তাঁরই হাতের ঐ বরমাল্যের যে দ্বন্দ্বাহ্বান তিনি দিয়ে এসেছেন সকল যুদ্ধার্তিথি ভূ-বল্লভের সম্মুখে, তিনি জানেন তার দায়িত্ব কতখানি; জানেন, সম্মিলিতা রাজ-শক্তির আহতা আক্কারণা কী বিভীষণী! যুদ্ধে ভীত নন অত্যম্ভুতদীপ্তবীর্য করন্ধমতনয়, শুধু যুদ্ধরত অবস্থায় অসতর্কতায় হস্তগত বরমালিকার চ্যুতিতেই তাঁর সকল আশঙ্কা,—তাঁর সকল অহঙ্কারের পরাভব। তাই সম্মুখাসীনা রূপোত্তমাকে কিংবা পারিপার্শ্বিক চলমান দৃশ্যাদৃশ্যকে দেখবার অবসর পাননি অবীক্ষিত; তাঁর প্রয়োজনও ছিল না কিছু। জানেন শুধু তিনি, ভুজপরাক্রমে দুর্লভ নেই কিছু ধরণীতে; যে কোন পরিবেশে যে কোন আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকরূপে রূপায়িত করা যায় শুধু আপনারই বীর্যবত্তায়। জানেন অবীক্ষিত, যে ভুজ-পরিঘে অগণিত বীরপুঞ্জ শাসিত হয় একটি মুহূর্তে, তার প্রদানশক্তির অসীমতা ব'লে নেই কিছু আর। জানেন অবীক্ষিত, বীরভোগ্যা বসুধার মতোই জগতের সকল নারীই বীর্যশুল্কা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশেষে গহনারণ্যে পুষ্পশ্রীবেষ্টিত এক সুরম্য প্রদেশে এসে অশ্বগতি রুদ্ধ করেন অবীক্ষিত। নিরাপদে সেই ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অভিলাষেই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে বৈশালিনীকেও নামিয়ে এনে ধাতুচিত্রিত এক কমনীয় শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হলেন দু'জনায়।

তাঁদের আশে-পাশে বিচরিত হলো সারিকা ও ময়ূর, চকোর ও মত্তোৎকট, শুক ও ভৃঙ্গরাজ, এবং অনেকানেক নয়নরম্য বিহঙ্গম। জীবঞ্জীবক ও হেমক, মত্তকোকিল ও বন্ধু, সুগ্রীব ও কাঞ্চন, এবং কলবিঙ্কের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠল সর্বস্থান। শ্রুত হলো মত্তোৎকট মধুকরকুলের মধুর ঝঙ্কার, যেন বহুদূরবিহারী মদালসগতি অসংখ্য কিন্নরকণ্ঠেই উপগীত সেই বনভূমি।

এবার মন্দমারুতে আন্দোলিত, সতত পুষ্পবর্ষণরত ও চারুপল্লবে সুশোভিত তরুনিচয়ের দিকে তাকালেন অবীক্ষিত। দেখলেন, কোন্ সে পরমানন্দের প্রতীক-রূপে বায়ুহিল্লোলে সততই সুচঞ্চল হয়ে উঠেছে তাদের আতাম্র কিশলয়, মঞ্জরীপুঞ্জ ও পুষ্পস্তবক। তাকালেন প্রস্ফুটিত কমল, তরুণতপনসন্নিভ পুণ্ডরীক ও মহাপত্র-শালী উৎপলে সুশোভিত সুরস ও সুবিমল তোয়াশয়ের দিকে।

আর, এইভাবে কখন যে তাঁর সেই আত্মবিমুগ্ধ দৃষ্টির দর্শন পার্শ্ববর্তিনী এক ত্রিভুবনদুর্লভা রম্যরূপময়ীর আবেগাপ্লুত মুখশ্রীতে বিলগ্ন হয়ে গেছে, তা জানতেও পারেননি করন্ধমতনয়।

যা কখনও ভাবতে পারেন নি অবীক্ষিত, এবার তা-ই ভাবতে শুরু করেন। যেন তাঁর সকল দর্শনা-ভিলাষকেও অতিপ্রাপ্তির বিহ্বলতায় আকুল ক'রে দিয়ে তাঁর পার্শ্বে-ই সম্ভাবিত হয়েছে সেই রূপাতিশালিনীর অসম্ভাব্য বিরাজন; তাই, যেন যা কখনও দেখেননি অবীক্ষিত, এবার সেই দিকেই ফিরিয়েছেন তাঁর আকর্ণ-বিশ্রান্ত দুই নয়নের নিরীক্ষণ।

মনে হলো অবীক্ষিতের, যেন তাঁর চিরবন্ধনহীন মনমৃগ সেই অপরূপ রূপের আনায়ে বন্দী হলো মুহূর্তে। যেন তাঁর চিত্তশালার ধৈর্যরূপ সংযমিত বারণ সেই

অপরূপারই মন্মথরঙ্গতরঙ্গিত কটাক্ষাঙ্কুশে ক্ষিপ্ত হয়ে দম্ভের শিকল ছিন্ন করতে উদ্যত হলো মুহূর্তে। বুঝি মুহূর্তে এক অনীতাশ্রয়েই জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতিকে ধ্বস্ত করতে হবে তাঁকে।

কত যে সম্মোহিত মুহূর্ত সেই সুরভি-শীতল পরিবেশে ধ্বস্ত হয়েছিল, তা বুঝতেও পারেন নি তাঁরা।

সহসা ক্রমধাবমান বহু অশ্বক্ষুরধ্বনিতে যেন বিভঙ্গ হয়ে গেল নিভৃত বনকুঞ্জে সেই সম্ভ্রমসৃষ্ট স্বপ্নাবেশ। এক অভাবিত উপচক্রে মুহূর্তে বৈশালিনীর স্ফটিকস্বচ্ছ বাহুবল্লরীর বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন অবীক্ষিত। তারপর চকিতে আপন ভূপাতিত কার্মুকটিকে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন তিনি আসন্ন অজ্ঞাত আপদের নিষ্পত্তিসাধন মানসে।

ততক্ষণে অনতিদূরবর্তী সরোবরের অপর প্রান্তে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছেন যুদ্ধদুর্মদ অগণিত রাজপুরুষ। তাঁদের রোষকষায়িত দৃষ্টিতে যেন শত অবীক্ষিতের নিঃশেষ দম্ভের ইঙ্গিত।

মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় সে এক মহাপ্রলয়ঙ্কর দুর্ঘটনা,—কৃতাস্ত্র ও বলশ্রেষ্ঠ একাকী অবীক্ষিতের সাথে অগণিত রণদুর্মদ রাজপুরুষের নিদারুণ সংগ্রাম। শত শত প্রচণ্ড শরে ধীরে ধীরে বিদ্ধ হ'তে লাগলেন ক্ষত্রিয়দল, সুশাণিত শরনিকর প্রহারে বিদীর্ণ হ'তে লাগলেন অবীক্ষিতও।

ক্রমে ক্রমে রণদুর্জয় এক বিভীষণ মূর্তিতে রূপান্তরিত হ'তে লাগলেন অবীক্ষিত। দেখতে দেখতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এক সর্বজয়প্রয়াসী উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন তিনি। যেন ক্ষত্রিয়কুলস্বরূপ খাণ্ডবদহনে আবির্ভূত স্বয়ং অবীক্ষিতরূপী তাঁরই উত্তরসুরজ গাণ্ডীবধন্বা মহেন্দ্রাত্মজ। তাঁর ক্রোধাবজৃম্ভিত মুহুর্মুহু অট্টহাসে যেন চমকিত হয়ে ওঠে স্থাবর-জঙ্গম। তাঁর স্বেদবিন্দু-নিচিত ঈষদ্ঘূর্ণিত দুই নয়নে যেন ত্রিলোক-দগ্ধোদ্যত করাল কৃশানুর তেজোদীপ্তি।

অবীক্ষিতের ঠিক পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দিক হ'তে তাঁর প্রতি প্রতিটি আক্রমণে তাঁকে অবহিত করতে লাগলেন বিশালদুহিতা সুদতী বৈশালিনী।

অবীক্ষিতের নিশিত শরপুঞ্জে ছেদিত হলো কারো বা শিরোধরা; বিদ্ধ হলো কারো বা হৃদয়, আঘাতে বিভগ্ন হলো কারো বা বক্ষঃস্থল। অনেকের হস্তীকর ও অশ্বশির ছেদন ক'রে, অনেকের রথাশ্বকে কিংবা সারথিকে সংহার করে সম্মুখ সমাগত সকল শরকেই শরপরম্পরার সাহায্যে অর্ধপথেই দ্বিখণ্ডিত ক'রে যেন আপন হস্তলাঘবপ্রদর্শনের জন্যই কারো বা ধনু এবং কারো বা খড়্গও ছেদন ক'রে দিতে লাগলেন অবীক্ষিত। তাঁর শরে ছেদিতবর্ম হয়ে বিনষ্টিপ্রাপ্ত লেন অনেকানেক নৃপনন্দন; মৃগেন্দ্র-সমরে মৃগযূথের মত রণ-পরিত্যাগে পলায়নতৎপরও হলেন বহু পদাতি।

আকুলীকৃত ও নির্জিত প্রতিযোদ্ধাদের পশ্চাতে রক্তলোভাতুর জিঘাংসু কেশরীর মতো প্রধাবিত হ'তে লাগলেন অবীক্ষিত। বৈশালিনীর পার্শ্বস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তিনি বুঝতে পারলেন না, কী প্রচণ্ড পরিণতিকে পশ্চাতে রেখে এইভাবে অগ্রসর হলেন তিনি এইবার।

সহসা রীতিহীন পন্থায় তাঁকে সব দিক থেকে বলয়িত ক'রে ফেললেন পাদপান্তরালাশ্রয়ী সপ্তশত বীর, যাঁরা আপনাপন কৌলিন্য, বয়স ও শৌর্যের বিচারে ম্রিয়মাণ হয়ে চরম সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন এতক্ষণ। এঁরা লজ্জাভরে মৃত্যুকেও উপেক্ষা ক'রে অবস্থিত করছিলেন, কিন্তু এবার সকল লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে অরাজধার্মিকরূপেই রাজদম্ভের প্রতিশোধস্পৃহাকে চরিতার্থ করলেন।

সর্বদিকে বৈরিবেষ্টিত অবীক্ষিত এ হেন অসুবিধাকর পরিস্থিতির সম্মুখে কখনও পড়েন নি আর। দক্ষিণে দৃষ্টিক্ষেপণ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন্ বামপার্শ্বে। পশ্চাতে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে শরাঘাতে তাড়িত হয় পৃষ্ঠদেশ। এই মুহূর্তে স্বল্পক্ষণের পাওয়া বৈশালিনীর সান্নিধ্যাভাব এক অভিনব উপলব্ধিতেই বুঝতে পারলেন অবীক্ষিত। জীবনের এই মৃত্যুঞ্জয়প্রয়াসী মুহূর্তে তাঁরই মতো এক আপনানুকূল সহায়তার আত্যন্তিক প্রয়োজনকে

অস্বীকার করতে পারেন না তিনি কিছুতেই। কিন্তু কোথায় বৈশালিনী ?

তথাপি আপন দুর্দম রণদক্ষতায় বেষ্টনকারী মহাবল নরেন্দ্রতনয়দের অস্ত্র-কবচাদি বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন অবীক্ষিত। কিন্তু এক সময় এক পার্শ্বের অতর্কিত আক্রমণে ছিন্ন হয়ে গেল তাঁরই কার্মুক।

সরোষে আপন অসিচর্ম গ্রহণ ক'রেই অগ্রসর হলেন ছিন্নধন্বা অবীক্ষিত। কিন্তু তা-ও ছিন্ন হয়ে গেল মুহূর্তে।

জালাবৃত মৃগেন্দ্রের মতো আপন পরিণতিতে প্রমাদ গনলেন চিরাপ্রমাদিত করন্ধমতনয়। বাধ্য হয়ে পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত অপর কোন ধীরের গদা সংগৃহীত করলেন গদাযুদ্ধকুশল অবীক্ষিত। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে লঘুহস্ত একাধিক বীর-বৈরির ক্ষুরপ্র বাণরাশিতে ছেদিত হয়ে গেল তা-ও।

প্রবল প্রভঞ্জনের দুরন্ত তাণ্ডবের মাঝে দাণ্ডায়মান স্থিরমৃত্যু নিরুপায় বনস্পতির মতো ধর্মযুদ্ধ-পরাঙ্মুখ অগণিত রাজমণ্ডলীর যুগপৎ আক্রমণের মাঝখানে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে পড়েন উপায়বিমূঢ় অবীক্ষিত।

আর অবধারিত পরিণতিকে সার্থক করেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মাতঙ্গাক্রান্ত বেদনার্ত কেশরীর মতো ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন শরক্ষতসর্বাঙ্গ করন্ধমতনয়।

মহোল্লাসে তূর্যধ্বনিসহ তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে এলেন রাজন্যবর্গ। কিন্তু সহসা চমকিত বিস্ময়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা।

তাঁদের সকলের দৃষ্টির অন্তরালপথেই কখন অবীক্ষিতের পার্শ্বে এসে আহত আবেগে লুটিয়ে পড়েছেন তাঁতেই অভিসংশ্রিতা রাজনন্দিনী বৈশালিনী, —যেন মূলোৎপাটিত মহীরুহের পার্শ্বে কম্পিতকায়া এক এক বাতসঞ্চালিতা কুসুমিতা মাধবীর লতিকা।

মুহুর্মুহু তরঙ্গবিষম তাঁর সেই সমাব্যক্ত ক্রন্দন-রেশ শুনতে পাচ্ছিলেন পররক্তপ্রহর্তা রাজন্যবর্গ। মাঝে একবার তাঁদের দিকে যেন সঘৃণ অহঙ্কারে তাকিয়েছিলেন রাজনন্দিনী,এবং তাতেই মুহূর্তের জন্য আপনাপন রীতিহীন যুদ্ধনীতিকে ধিক্কার দিতে উদ্যত হয়েও পারলেন তাঁরা। কারণ বক্রনালযুক্ত বর্ষাজালক্লিন্ন তড়াগস্থিত পদ্মের মতো সেই স্নাধ্যযৌবনার সমগ্র মুখমণ্ডলে যে কী দুরন্ত অভিশাপের ছায়া দেখেছিলেন তাঁরা, সেই মুহূর্তে তা বিচারণার অবসরও ছিল না তাঁদের একটুও।

দুষ্কৃতিপরায়ণের চিরাচরিত চিত্তধর্মের বিকারে অন্বিত তখন তাঁদের মন। একটি অন্যায়কে আবরণ প্রয়াসী আর এক অন্যায়ের অবতারণা। অপরাধের ক্ষীণতম অংশটুকুকেও অপরাধ দিয়েই পূরণরূপ আত্মহননের উদ্‌যোগ।

মুহূর্তের মধ্যে অশ্বরজ্জু উন্মোচিত ক'রে তাই দিয়ে একই সঙ্গে অচেতন অবীক্ষিতকে ও বৈদিশপুরদুহিতা বৈশালিনীকে বন্ধন ক'রে হৃষ্ট ও আহ্লাদিত অন্তরে রাজন্যসত্তম বিশালের রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁরা।

প্রথম আবির্ভাবে অবীক্ষিতকে চিনতে পারেননি বিশাল, কিন্তু এখন পারলেন। বুঝলেন, রণদুর্জয় করন্ধমের রুদ্ররোষ হ'তে মুক্তির উপায় নেই তাঁরও। বুঝলেন, স্বয়ম্বর-ন্যাস্তা কন্যা থেকে মৃত্যুমুখে ন্যস্ত হয়েছেন তিনি নিজেও।

তবু, তাঁরও প্রত্যাবর্তনের উপায় ছিল না আর। অবীক্ষিতকে বন্ধনমুক্ত ক'রে শুশ্রূষাগারে প্রেরণ ক'রে সমবেত রাজগণমধ্যে আপন অভিলাষানুযায়ী যে কোন একজনকে অচিরে পতিরূপে বরণ করবার আদেশ দিলেন তিনি অজ্ঞাতপরিণয়া আপন কন্যাকে। কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে বনমৃগীর মতোই দ্রুতপদসঞ্চারে রাজান্তঃপুরে অদৃশ্যা হয়ে গেলেন বৈশালিনী।

নিরুপায় বিশাল এবার আহ্বান করলেন বিদিতাখিলবিজ্ঞান সকল দৈবজ্ঞকে।

রাজাজ্ঞায় বিচিন্তিতচিত্ত দৈবজ্ঞবর্গ মুহূর্তে বিজ্ঞাতবৃত্তান্ত হয়ে দুঃখান্বিত অন্তরে মহীপতির সমীপে বিগ্নোৎপাদক এই যুদ্ধ সংঘটের দিবসটিকে পরিহার ক'রে অপর কোন প্রশস্ত লগ্নযুক্ত শুভ দিবসের প্রতীক্ষায়

থাকবার নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন শুধু। অগত্যা তাতেই সম্মত হলেন দুশ্চিন্তাপীড়িত বিশাল।

দুর্বার্তা বাতাসের চেয়েও গতিময়,—বিশেষতঃ জনক-জননীর কর্ণকুহরে অপত্যের সবিঘ্ন-সমাচার। শ্রুতিরন্ধ্রে সে দুঃসংবাদ আসার আগেই হৃদয়কেন্দ্রে অনুভূত হয় অকল্যাণী সন্ত্রাস। দেহজাতের চিরাবাঙ্খিত স্রষ্টা-স্রষ্ট্রীর অন্তরলোকে।

অজ্ঞাত-কারণে উদ্বিগ্নচিত্তে রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকতে চেষ্টিত ছিলেন সিংহাসনাসীন সিংহবিক্রম খনিনেত্রাত্মজ করন্ধম। তাঁর পার্শ্বে যেন জলদাবলী-সমাচ্ছন্ন চন্দ্রিকার মতো অবেদ্য-শোকে ম্রিয়মাণা হয়ে উপবিষ্টা ছিলেন শুভব্রতা বীর্যচন্দ্রদুহিতা।

সহসা বৈবধিকের মুখেই সেই অবৈধ সমাচার বিঘোষিত হলো সভাস্থলে। আচম্বিতে অবীক্ষিতের বন্ধন-বিসংবাদে শম্পাস্পৃষ্টের মতো মুহূর্তের জন্য একবার চমকিত হয়ে উঠলেন রাজা ও রাজমহিষী। অবিলম্বে রাজতনয়ের এ হেন বিপর্যয়ের প্রতিশোধ-স্পৃহায় আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন করন্ধম-সভাস্থিত সকল সামন্ত-ভূপতি।

মুহূর্তের মধ্যেই আত্মস্থ হলেন অভাবিত ধৈর্যধর রাজর্ষি করন্ধম। বীরপত্নী বীরপ্রসূ বীরার দুটি চক্ষে যেন দেবারিবিধ্বংসিনী চণ্ডিকার চণ্ডদৃষ্টির জ্বালা, তবু অটল স্থৈর্যে আপন আসনেই উপবিষ্টা তিনি।

রাজাজ্ঞায় আপনাপন আসনে পুনরায় উপবিষ্ট হলেন ক্রোধোন্মত্ত সামন্তরাজের দল। তারপর শুরু হলো আশু কর্তব্যের আলোচনা।

কেউ বললেন :

—যারা বহুজন-সমবেত হয়ে একমাত্র বীরকে অধর্ম সমরে বন্ধ করেছে, তারা সকলেই বধ্য। আদেশ করুন ভূজনাধিপ করন্ধম, তাদের স্কন্ধচ্যুত মুণ্ডগুলি আপনার বিটঙ্কবেদিকার নিম্নে উপহার দিয়ে ধন্য হই আমরা অচিরে।

কেউ জানালেন :

—নিশ্চিন্তে চিন্তার অবসর নেই, মহারাজ আদেশ করুন, যেন সেই সুদুরস্পর্ধী দুরাত্মাবর্গের রুধির ধারনে অচিরে তৃপ্ত করতে পারি ধরণীর পাপরক্তপিপাসু চিত্তদেশ।

রাজরোষে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে নিবেদন করলেন কোন বা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত :

কিন্তু রাজকুলতিলক অবীক্ষিতই কী অনভিলাষিণী কন্যাকে অন্যায়রূপে আপন বলগর্বে গর্বান্বিত হয়েই গ্রহণ করেননি? স্বয়ম্বর-সভায় অগণিত ক্ষত্রিয়বক্ষে বৈরিতার অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে তিনি নিজেই কি এই পরিণতিকে আহ্বান করেননি?

সহসা বিশুষ্ক বনভূমে ধূমায়িত অগ্নির আচম্বিতে সহস্রশিখায় পরিব্যাপ্তির মতো সগর্ব উগ্রতায় উঠে দাঁড়ালেন মহারাজ্ঞী বীরা :

—হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বৃন্দ! সমগ্র মহীপতিকে পরাজিত ক'রে আমার কল্যাণাস্পদ পুত্র যে বলপ্রয়োগে কন্যাকে গ্রহণ করেছে, তা তার সর্বোত্তম বীর্যবত্তাকেই সূচিত করে। আর, সেই কারণেই আপনাপন বীরধর্মকে লাঞ্ছিত ক'রে অসূয়াপরবশচিত্ত ন্যায়রণে বিক্রবচেতা অবিবেকী নরাধম নরাধিপবৃন্দ একাকী সেই মহাবীর বীরাতনয়ের সাথে অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; পাদপান্তরালে আপনাপন কলুষিত তনুকে লুক্কায়িত রেখে আত্মরক্ষার কোন সুযোগ না দিয়েই ক্ষুরপ্রবাণে তাকে প্রহারিত করেছে; সর্বোপরি, অশেষ অপৌরুষে অশ্বরজ্জু উন্মোচিত ক'রে তার অচৈতন্য দেহকে বন্ধন করেছে। তথাপি আমি আমার পুত্রের হানিকারক কিছুই দেখি না। শৌণ্ডীরবৃন্দ! জিঘাংসু কেশরীর মতো নীতিজ্ঞান-হীনতার দৈন্যে আপীড়িত পাপীয়ান্ সেই ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গারবর্গের দুষ্কীর্তিকে মেনে না নিয়ে অচেতন-দেহে আমার পুত্রের সেই বন্ধন, তার অপরিসীম পুরুষকারেরই নিদর্শন। কোন্ যুক্তিবলে তার সেই স্বয়ম্বর-ভ্রষ্টা কন্যা গ্রহণের কৃতিত্বকে নিন্দা করা যায়? ক্ষত্রিয়কুলজাত কোন্ মহাবীর্য আপন বীরধর্মকে লাঞ্ছিত ক'রে হীনজনসেবিত যাচ্ঞার মধ্যে ব্যর্থ হয়ে যেতে চায়? অতএব বলিজন-সমক্ষে শৌণ্ডীর্যপ্রকাশ পূর্বক পরিমুগ্ধা আপন আকাঙ্ক্ষিতার পাণিগ্রহণ ক'রে

যে ক্ষাত্রয়কুলোচিত কর্মই সাধন করেছে অবীক্ষিত, সে বিষয়ে দৌর্মনস্য অবলম্বনের কিছুই থাকতে পারে না। আর অবীক্ষিতের বন্ধন যেমন শ্লাঘার বিষয় তেমনিই শ্লাঘনীয় আপনাদের মস্তকে অস্ত্রাঘাত। সুতরাং হে মনুকুল-হিতকামী বান্ধববৃন্দ, বিবস্বানের দিগন্তব্যাপ্ত তমোরাশি বিনাশনের মতোই ভুবনব্যাপী অবীক্ষিতের বৈরিকুল বিধ্বংসে সম্প্রস্তুত হন্ আপনারা। আর, আপনাদের অসীম শৌর্যবত্তার পশ্চাতে অখণ্ড শক্তির যোগান হয়ে ধাবিত হবে তার মাতৃ-অন্তরের পূতাশীস।

পুনরায় রণলিপ্সু প্রচণ্ডতায় আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন উদীর্ণমনা সমুত্তেজিত প্রহর্তাবৃন্দ। যেন অবাতবিক্ষোভিত মীনাক্রান্তিরহিত সরোবররূপ সেই রাজসভার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষাত্রিয়ের তেজোপ্ররূপী মদোন্মত্ত বারণ। সকল-কণ্ঠ-বধিরকারী জলালোড়নের মতো নিরন্তর নিরবে মুহূর্তে আপূরিত হয়ে গেল সভাগৃহ।

বীরবাক্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ভুজবীর্যমদে চিরোদ্ধত করন্ধমও। পুত্রশত্রুদের বিনাশের কামনায় সৈন্যসজ্জার অনুজ্ঞা বিঘোষিত করলেন তিনি তখনই।

অচিরেই বিশালনগরীর দিকে এগিয়ে চললেন বারবাণ পরিহিত অনেকানেক পত্তিসংহতি, অগণেয় আয়ুধিক, সংখ্যাতিত কুন্তমুখ, অদভ্র শক্তিহেতিক, পরোলক্ষ নৈস্ত্রিংশিক, এবং অত্যায়ত প্রাসিকবাহিনী। বৃংহিতে ও অশ্বহ্রেষায়, পটহে ও বিস্ফারে, অসিঝঙ্কার ও যোধসংরাবে সমুখর সেই সর্বাভিসার-বাহিনীর প্রচক্রে যেন বিদীর্ণা হয়ে যায় দীনা পৃথিবীর বক্ষ। দুন্দুভি ও ভেরী, কম্বু ও দামামার নাদে প্রতিশ্রুমুখর হয়ে যায় সুদূর অম্বরের নিস্তব্ধ গভীরতা। তিনটি অভিশপ্ত দিবস ও যামিনীব্যাপী সেই নিদারুণ শোণিতক্ষয়ী প্রবিদারণে যেন আপন বক্ষে শূরশূন্যতার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করলেন অধীরা ধরণী।

পুত্রস্নেহাতুরা জননীকণ্ঠের উত্তেজে তেজোময়ী করন্ধমপক্ষের সেই অনেকানীকিনী অচিরেই বীরাশংসনে পরিণত ক'রে ফেললেন সেই রণভূমি। বৃংহের চতুর্দিকে শুধু বিতায়িত হয়ে থাকে বিশালরাজানুগামী পরঃসহস্র ভূপমণ্ডলীর শব আর শব।

অদূরে রাজকীয় স্কন্ধাবারে অবরুদ্ধ নিশ্বাসে যুদ্ধ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন করন্ধম। লক্ষ করছিলেন অচিরে স্বভুজাবিজিতপ্রায় অদূরবর্তী, বিশাল-নগরীর দিকেও।

সহসা শত শত শ্বেতকেতন উড্ডীন ক'রে এক রাজকীয় বাহিনী সন্ধির প্রার্থনা নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন তাঁর স্কন্ধবারের দিকে। বাহিনীর পুরোভাগে করন্ধমের উপাসনার্থে অর্ঘ্যহস্ত স্বয়ং বিশাল। তাঁর এক পার্শ্বে নতশির অবীক্ষিত, অপরপার্শ্বে জঙ্গম কাঞ্চনবল্লীসদৃশা অজাতপরিণয়া রাজদুহিতা।

বিশালের অর্চনায় তুষ্ট হলেন করন্ধম। বিগ্রহও যানের সাথে, আসন ও দ্বৈধের সাথে আশ্রয় ও সন্ধিতেও আপন গুণ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন তিনি। পুত্রের বন্ধন মোচনাবসানের সাথে সাথেই ক্ষমা করলেন তিনি বিশালকে।

বিশাল সাগ্রহেই বিজয়ী করন্ধমতনয়ের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব নিবেদিত করলেন করন্ধমের সকাশে।

যেন বিশালের প্রস্তাবের প্রতিবাদেই কিছু বলতে উদ্যত হলেন অবীক্ষিত। কিন্তু মহাবীর্য করন্ধমের সহর্ষ উচ্চহাস্যের কাছে অস্ফুট রয়ে গেল তাঁর প্রতিবাদ।

বিশাল বা অপর নৃপতিবর্গেরও দৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে গেল বাকেচ্ছু অবীক্ষিতের ব্যাকুলতা।

লক্ষ্য করেছিলেন শুধু বিশালদুহিতা বৈশালিনী। কিন্তু কি যে বলতে চেয়েছিলেন অবীক্ষিত, তা-ও বোঝা হলো না তাঁর।

পরদিন প্রভাতেই উদ্বাহের সুপ্রশস্ত লগ্ন বিচার করলেন গ্রহবেত্তা রাজ-পুরোহিতবৃন্দ। মহানন্দেই সম্মতিজ্ঞাপন করলেন দুই আশু-বৈবাহিক।

এক অনিবার অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বায়িত হয়ে উঠেছিল অবীক্ষিতের চিত্তদেশ। যেন সর্বালোকৌজ্জ্বল্য পরিম্লান-

প্রয়াসী এক দুর্ভেদ্য তমিস্রায় আবরিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর বিগতকালের সালোকিত বিবেক-পট।

কোথায় যেন অবলুপ্ত ঘটেছিল তাঁর সেই মহীয়সী ধীশক্তির। কোথায় যেন তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর অবিচালিত উৎসাহ। সেই স্থিরতম অধ্যবসায়ের আচম্বিত অন্তর্ধানে কোন কিছুই আর নতুন ক'রে মেনে নেবার আগ্রহকে হারিয়ে ফেলেছিলেন অবীক্ষিত।

যে দুর্জয় রিপুবর্গকে একদিন আত্মবশে রাখতেন অবীক্ষিত, তারাই বা গিয়েছিলেন কোথায়? কোথায়ই বা গিয়েছিলেন তাঁর সেই কিছুতেই ব্যসনা না হবার অহঙ্কার?

জীবনে প্রথম এই অভাবিত রণপরাজয়ে প্রকৃতই যে কি অনির্বাচ্য এক রূপান্তর ঘটেছিল অবীক্ষিতের মনে, তা একমাত্র অবীক্ষিতই অনুভব করতে পারছিলেন।

বস্তুতঃ, তাঁর আপন অস্তিত্বেই তিনি অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। অতীতের সকল আত্মপৌরুষের গৌরবের পরিবর্তে চরম গ্লানিতেই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর নিরুৎসাহিত সত্তা। দুর্বল শুধু চিত্তই নয়, যেন তাঁর অঙ্গের প্রতিটি অংশে অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল শক্তিহীনতার অণুরাশি। যেন বীর্যাধীশ কোন পুরুষ নন্ তিনি,—যেন পুরুষদেহে এক অবলা দুহিতা।

চিন্তাভাবে আত্মহারা হয়ে যাননি অবীক্ষিত; শুধু নিজেরই পরাহত অস্তিত্বে আরও বেশি ক'রে আত্মসচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তিনি নতুন ক'রে।

মহাপ্রীতিতে আপ্লুত অন্তরে পরপ্রভাতের অপেক্ষায় বিশালপুরীতেই একটি রজনী অতিবাহিত করলেন রাজর্ষি করন্ধম।

পরদিন প্রভাতেই আপন কন্যাকে অবীক্ষিতের হাতে সমর্পণ করতে সমুপস্থিত হলেন বিশাল। মাঙ্গলিক মন্ত্রে ও সহর্ষ মন্দ্রে পরিপূর্ণ তখন বিশালপুরীর প্রতিটি চত্বর।

ইন্দ্রনীলবদ্ধ প্রাসাদতলে মেঘোদয়ভ্রমে সানন্দে নৃত্যপরায়ণ হলো ময়ূর। প্রবাল মাণিক্যময় ভবনোত্থিত মরীচিনিচয় সুন্দর চূতাঙ্কুর শঙ্কায় ভোগরত হলো যত ভব্যবাহী বিহঙ্গম। স্ফটিকগৃহোত্থিত আজকের সানন্দ প্রভাপুঞ্জে মিশ্রিত হয়ে মন্দরোদভ্রান্ত সফেন অর্ণবের মতো প্রতিভাত হ'তে লাগল বিশালপুরী। পূর্ণসান্ধ্য-চন্দ্রাননা যত অন্তরবাসিতা আজকের বিভাত আনন্দালোকের অবস্থান নিয়েই বিবাহবাসরে এসে সমুপস্থিতা হলেন একে একে। রাজপুরীর বাতায়নপথ হতে ধূপ-ধূমপুঞ্জের নির্গমনে বিশালাকাশমণ্ডলে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমশোভার বিস্তৃতি ঘটল ক্রমে ক্রমে। ক্রমে ক্রমে সেই উৎসবাসরের চতুর্মণ্ডল হ'তে বিনির্গত প্রভাপটলে সমস্ত নভোমণ্ডল যেন ইন্দ্রায়ুধে পরিকীর্ণ হয়ে উন্নত স্বর্ণমেঘবৎ প্রতিভাত হ'তে থাকে।

পুত্র অবীক্ষিতের বাহু ধারণ ক'রে লাজকম্প্রতনু অবনতশিরা বিশালাত্মজার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিলেন প্রহর্ষান্বিতান্তর পিতা করন্ধম।

সহসা বাক্‌স্ফুট হলো দীর্ঘমৌনী অবীক্ষিতের। যেন তখনও অপনোদিত হয়নি তাঁর দীর্ঘকালপূর্বে পাওয়া শরাঘাতের যন্ত্রণা। এক অব্যক্ত অন্তর্জ্বালাই ব্যক্ত হয়ে ওঠে তাঁর করুণ অথচ প্রতিজ্ঞাদৃপ্ত কণ্ঠস্বরে:

—পিতা, যে কন্যার সমক্ষে শত্রুকর্তৃক পরাজিত হয়েছি আমি, তাকে কখনই জীবনদায়িতারূপে গ্রহণ ক'রে এক হীনবীর্য পুরুষসঙ্গিনীত্বের অভিশাপ দিতে পারি না আর। শত্রুর কাছে চিরাপরাজেয় চিরমান্য কোন অর্থাওত-যশোবীর্য ব্যক্তিকেই যেন সম্প্রদত্তা হয় এই কন্যা, আপনি সেইমতো নির্দেশই দান করুন এখানে। বিশালাধিপ বিশাল, কাতরা ও হৃতশ্রীবিত্তা অবলার মতো শত্রুনির্জিত এই অবীক্ষিতে ও পরাধীনা এই কন্যকায় যে পার্থক্য নেই কিছুই, তা কি আপনি বুঝতে অপারগ? আপনার যে কন্যার সম্মুখে পুরুষের চিরায়ত্ত স্বাধীনতা হারিয়েছি আমি শত্রুর কাছে, কোন্ নির্লজ্জ দুঃসাহসে তার কাছে আমার এই পূর্বদৃষ্ট বদন প্রদর্শন করব আমি আর?

নির্বাক হয়ে রইলেন করন্ধম। শত্রুবিজয়ী এক পিতা শত্রুবিজিত আপন পুত্রের এ হেন বীর্যব্যঞ্জক

প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে বাক্‌শক্তিহারা। কখনও পরাভূত না হলেও অভিভবের অনপনোদিত গ্লানিকে অনুভব করতে পারেন তিনি আপন অখণ্ড শূরসত্তায়।

বিশালের সমীপে আপন নিরুপায় বিবেকের বার্তা কোনমতে বিজ্ঞাপিত করলেন করন্ধম :

—বান্ধব বিশাল, অভিনব হলেও পুত্রের অকাঠ্য যুক্তির বিরোধিতা করতে অপারগ আমি আজ। আপনি বরং অন্যত্র আপনার কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করুন।

নিরুপায় বিশালও। বারংবার কন্যার বিবাহ বিভ্রাটে মর্মান্তিক বেদনাভারে জর্জরিতচিত্তে অপহৃষ্টবদনে অনিলবিকম্পিত কল্পদ্রুমের মতো কম্পিতকায়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি করন্ধমেরই অনুজ্ঞার। অতঃপর কন্যার উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন তিনি :

—কল্যাণি। মনুকুলতিলক মহাত্মা রাজনন্দনের বজ্রাদপি সুকঠোর প্রতিজ্ঞাবাণী কি শ্রবণ করেছ তুমি? যদি ইচ্ছা হয়, তবে স্বয়ং অন্য কাকেও পতিত্বে বরণ করো, অথবা তোমার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশতঃ আমাদেরই নির্বাচিত একজনের পত্নীত্ব গ্রহণের স্বীকৃতি দান করো।

পিতৃআজ্ঞায় এবার আর অসৌজন্য প্রকাশ ক'রে সভাকক্ষ পরিত্যাগ ক'রে গেলেন না মৃগপ্রেক্ষণী বৈশালিনী। ধীরে ধীরে তাঁর রোদনারক্তিম পলাশ নয়নদু'টি বিস্ফারিত ক'রে ঋজু ভাবেই তাকাইলেন তিনি পিতার মুখাবয়বে। তারপর বীণাতন্ত্রে যেন ঝঙ্কৃত হলো তাঁর স্বর ঝঙ্কার :

—হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ। রাজতনয় ধর্মমার্গানুসারী হয়ে অগণিত অন্যায়যোধী পাপাত্মার সাথে সংগ্রামরত থেকেও জ্ঞাতসারে যশোবীর্যহানিকারক সেই পরাজয়কে বরণ করেননি একটুও। ইনি ন্যায়মতে অবস্থিত থেকে নিখিল নৃপতিমণ্ডলীকেই পরাজিত করেছেন বারংবার। শৌর্য ও বিক্রমের সার্থক-প্রতীক ধর্মযুদ্ধপারঙ্গম এই কুমারকে অধম ব্যবহারে বন্দী ক'রে বহুসংখ্যক নৃপতিবৃন্দই লজ্জাস্পদ হয়েছেন। হে পিতঃ। আপনার দুহিতা কেবলমাত্র এঁর অপরূপ রূপের জন্যই যে এঁতে অভিলাষিণী, তা নয়; প্রত্যুত তাঁর শৌর্য, বিক্রম ও ধৈর্যই হরণ করেছে তার মন। শুধু তাই নয়, ন্যায়াধীশরূপে যে রাজদণ্ড আপনারা গ্রহণ করেছেন, একবার পাণিগৃহীতা কন্যাকে পুনরায় অন্যের হাতে সমর্পণ করবার বিধানকে মেনে নিয়ে, তারই অবমাননা করবেন না কি আপনারা? বরং মহানুভব রাজনন্দনকেই অনুরোধ করুন, তিনি একবার যে অনুর্বাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রে তাকে জীবনদায়িত্বারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন, পুনরায় তাকে অগ্রহণের কপোলকল্পনাপ্রসূত প্রতিজ্ঞায় সন্মার্গবিভ্রষ্টত্বের কলুষে যেন আপ্লুত না হন্ কখনও।

নিশ্চুপ সভামণ্ডলে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে নিঃশোষিত-বায়ু আপন বক্ষে পুনরায় আবেগ সঞ্চারিত ক'রে পিত্রোদ্দেশে নিবেদিত হয় তাঁর মুখারবিন্দবিগলিত সুধার্দ্র বাগ্‌ধারা। অখণ্ডিত যুক্তিনিপুণা রমাভাষা ভঙ্গার মতো শোনাল তাঁর সেই বাণী :

—পরম তপোস্বরূপ হে জনক। আপনার এ দুহিতার দেহমন একবার নিবেদিত হয়েছে যখন, পুনরায় নিবেদনের অবশিষ্ট নেই আর কিছুই। নতুন ক'রে বিবাহ-মাঙ্গল্যের প্রয়োজনীয়তাই বা আর কোথায়, এই কুমারের অনাহত অবস্থায় যখন তার সাথেই বিবাহিতা আমি?

বন্দ্যান্বিতচিত্তে কন্যার বাণী বিচার ক'রে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজন্যসত্তম বিশাল। কোন যুক্তিতেই তার এই আত্মিক আকুতিকে খণ্ডিত করতে পারলেন না তিনি। অগত্যা রাজনন্দন অবীক্ষিতের উদ্দেশ্যেই ধ্বনিত হয়ে উঠল তাঁর অনুরোধ :

—অপ্রতিহত-শৌর্য হে প্রভূত পরাক্রমি। আমার এ কন্যা একবার আপনারই পরিগৃহীতা। একে চিরসঙ্গিনীরূপে স্বীকৃতি দিয়ে আমার কুলপবিত্রতাকে অক্ষয় অনুগ্রহে অন্বিত করুন।

নতমুখে প্রত্যুত্তর জানালেন করন্ধমতনয় :

—শ্রীময়াশ্বিতান্তর আমি আপনার কন্যা বা অপর

কোন কামিনীকেই স্ত্রীরূপে বরণ করতে অপারগ। হে মনুজেশ্বর! নারী কখনও নারীর ভর্তা হ'তে পারে না। আপনি এমন এক দুরদৃষ্ট হ'তে আমাকে রক্ষা করুন।

আকুলান্তরা বৈশালিনীর আকুতিতে ব্যাকুলীকৃত হয়ে উঠেছিল করন্ধমেরও অন্তর। পুত্রের উদ্দেশ্যে তিনিও অনুরাধ বাণী উচ্চারিত না ক'রে পারেন না :

—পুত্র অবীক্ষিত! এই সুভ্রূ বিশালাত্মজা তোমাতে প্রগাঢ় অনুরাগবতী। সুতরাং একে পরিত্যাগে দূষিত হবে না কি তোমার মহিমা? একে তুমি গ্রহণ করলে সুখী হবে আমার অন্তর।

পিতৃ অনুরোধেও আপন প্রতিজ্ঞায় অবিচল হয়ে থাকেন অবীক্ষিত। যেন আপন বক্ষোদগীরিত বাষ্প-রাশিকে বহু আয়াসে সংযমিত রেখে ব'লে ওঠেন তিনি :

—হে প্রভো! ইতিপূর্বে কখনই আপনার আজ্ঞাকে অপালিত রাখিনি আমি। এখনও আমায় আপনি তেমনই আদেশ দান করুন, যা প্রতিপালনে সমর্থ হবো আমি। আর, একান্তই যদি আমাতে পরিগৃহীতা হতেই হয় এই বরবর্ণিনীকে, তবে তাঁকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যেন কোনদিন কোন মুহূর্তে কোন আসক্তির আবেগে আমাকে রভসসঙ্গীরূপে পাবার আগ্রহে অন্বিত না হন তিনি। এক নারীর লীলাসহচরীরূপেই নিয়োজিত হবে আমার পুরুষত্বহীন সত্তা, তাতে আসক্তির লেশমাত্র সংযোগ থাকবে না কিছুতেই।

—আর্য নৃপাত্মজ!

যেন অভ্রহীন গগন হ'তে বিচ্যুত এক আচম্বিত কুলিশ পতনের অনিবার্য অচেতনতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবার আগে একবার নিদারুণ আর্তস্বর উৎসারিত ক'রে উঠলেন সুদতী বিশালাত্মজা।

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসারিণী হয়ে এসে পিতা বিশাল ও রাজর্ষি করন্ধমের চরণে প্রণামার্ঘ্য নিবেদিত ক'রে জলকণালিপ্ত ছিন্ননাল কমলের মতো অশ্রুসিক্ত দুই নয়নের আচ্ছন্নপ্রায় দৃষ্টি নিয়ে সভাকক্ষ হ'তে বিনিষ্ক্রান্তা হয়ে গেলেন তিনি।

নতমস্তকে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন অবীক্ষিত।

জৈব

শ্রীনীহার রঞ্জন সেনগুপ্ত

দিন পনেরো বাদে মুমিনিসিপাল্ ইলেকশান্, যশোদাদুলালবাবু যেন ক্ষেপে উঠ্লেন নিজের নাম ও কাজ ঢাকে ঢোলে প্রচারে।

বরাবরের মত এবারও তিনি দাঁড়াচ্ছেন কাউন্সিলর পদের জন্য।

প্রতিবারই তিনি কোন পার্টি বা দলের পক্ষপুটে থেকেছেন। এবার আর কোন দল নয়,—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট! হাঁ স্বাধীনভাবে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা আছে তাঁর। নিজে তিনি ধান ও পাটের ব্যবসায়ী, কিছু পিতৃদত্ত ধনও রয়েছে তার উপর। এই পৈতৃক বসতবাটির মূল্যই ত এখন মফঃস্বল শহরে দু'লাখের চেয়ে বেশী।

যশোদাদুলালবাবু বিপত্নীক।

প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে একটি কন্যা প্রসব করার বছর খানেকের মধ্যে টাইফয়েড মারা যান ঘরের লক্ষীস্বরূপা পত্নী ব্রজবালা।

তারপর আর বিয়ে করেন নি। আর সময়ও ঘটেনি।

নিজের ব্যবসা আর পৈতৃকধনের সিন্দুক সামলাতে তাঁকে বিব্রত থাকতে হয়েছে সর্বক্ষণ। নিজের বিধবা মা অবশ্য দার পরিগ্রহের জন্যে পুনঃপুনঃ তাঁর কানের কাছে অহোরাত্র আবেদন নিবেদন করেছেন এমনকি কাশীবাসী হবার ভয়ও দেখিয়েছেন, উত্তরে যশোদাদুলালবাবু ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে শুধু বলেছেন: দাঁড়াও মা, একটু দাঁড়াও। পাটের কাজ কারবার বেশ মন্দা যাচ্ছে, মোড় ঘুর্লেই ব্যস্, তোমার কথা রক্ষা কর্বো। কোন চিন্তা করো না।'

মা ও তৎক্ষণাৎ বলেছেন: 'তা'হলে ভালবংশের মেয়ে আগে থেকে দেখেশুনে রাখি, কি বলিস্। ছেলের জবাব: তুমিও যেমন মা,...বাংলাদেশে কি ভালবংশের মেয়ের অভাব? একদিনেই হাজার মেয়ে জোটে।...তা নয় মা, আমি ঠিক সময়েই তোমাকে জানাবো—'

এই জানাবো জানাবো বলে আর ঠিক সময়ে মাকে জানানো আর ঘট্লো না যশোদাদুলালবাবুর। ব্যবসা আর পৈতৃকধন সামলানো ছাড়াও প্রতিবছরই কোন-না-কোন একটা ইলেকশানের খেলা নিয়ে মেতে থাকতেন তিনি।

এই সময় রাতের কয়েকঘণ্টা ঘুম আর বিশ্রাম ছাড়া সময়ই থাক্তো না হাতে।

সহরের কয়েকটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন নানাভাবে। সুতরাং ইচ্ছা থাক্লেও যশোদাদুলালবাবু সাঁতে-পাকে আর বাঁধ্তে পার্লেন না নিজেকে।

মা বাদে এ'ব্যাপারে অজস্র বন্ধুবান্ধবরাও কম বিরক্ত করেনি তাকে।

তাদের দৃষ্টি অবশ্য ছিল বিশেষ কোন বিরাট ভোজ ও ফলারের দিকে,...যশোদাদুলালবাবু নিজে বুঝতেন কিন্তু সত্যি তাঁর সময় কোথায়?...

এমনি করেই বছর গড়িয়ে কখন তিনি চল্লিশের ধাক্কায় পৌঁছে গেলেন।

কোলের একমাত্র শিশু মেয়েটির বয়সও পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় দাঁড়ালো।

যশোদাদুলালবাবু সুপাত্র দেখে ঘটা করে তার বিয়ে

দিলেন। বছর ঘুরুতে তার একটি বাচ্চাও হলো। বাচ্চাটি কিছু বড় হ'তে যশোদাদুলালবাবু তাকে নিজের কাছে এনে রাখ্‌লেন।

নিজে যখন বিয়ে করে পোষ্য বাড়াতে পারলেন না, —বিরাট বাড়ীর বিরাট শূন্যতা পুরণ করতে পারলেন না, —সেই হেতু, একমাত্র মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে, তারই পরিপুরক হিসেবে নাতিটিকে নিয়ে এসে ঘরের বিরাট শূন্যতা আংশিক পূরণ করলেন মাত্র।

বিধবা মায়ের এখন ষাট পেরিয়ে গেছে।

ছেলের আবার বিয়ে নিয়ে তিনি এখন আর আগের মত বায়নাক্কা করেন না,—ছেলের কাজকর্ম দেখে নিজেও কিছু বুঝতে পারেন এখন। এখন শুধু একমাত্র নাত্‌নীর ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা খোঁজেন।...

এবারকার ম্যুনিসিপাল-ইলেকশানে কাজের কিছু রুটিন বেঁধে নিয়েছিলেন যশোদাদুলালবাবু। একটু বেলা করেই সচরাচর ওঠেন তিনি।

উঠেই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে 'ব্রেকফাস্ট' খেয়ে নিতে-নিতে সাড়ে আট-নটা বেজে যায়। তারপর দোতালায় চলে কোঠায় গিয়ে আধঘণ্টা বসেন।

এখানে তিনটি ছেলে বসে পোস্টার লেখে। 'ভোট্ দিন,' 'ভোট দিন,' আপনাদের শ্রীচরণের দাস,... অথবা বহুবছরের অভিজ্ঞ সমাজকল্যাণসেবক, কিম্বা আপনাদের প্রিয়জন বন্ধু বা জনসমাজের উৎসর্গিত প্রাণ...যশোদাদুলাল সিংহরায়ের পক্ষে ভোট দিয়া দেশ তথা জাতির সেবার সর্বতোভাবে সমর্থন জানান।'

প্রায় দিন পনরো যাবৎ ছেলে তিনটি এ'সব লিখে চলেছে।

মাথাপিছু দুটাকা দিন। তাবাদে চা-জলখাবার ফ্রি'। ঐ পোস্টারগুলো দেয়ালে-দেয়ালে বা কোথাও ঝুলিয়ে দেবার জন্যে আলাদা লোক আছে। তাদেরও পকেটে কিছু গুঁজে দিতে হয়।

পোস্টার লেখা 'চেক' করে তিনি রাস্তায় গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন,—সঙ্গে থাকে জনচারেক মো-সাহেব যারা প্রায় সবসময়ই যশোদাদুলালবাবুর বাইরে বৈঠক-খানায় আস্তানা গেড়ে নানাভাবে প্রচারকার্যে সহায়তা করে চলেছেন।

রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে খুঁটে-খুঁটে দেখেন পোস্টারগুলো ঠিকমত লাগানো হ'য়েছে কিনা।

কোথাও গোলমাল বোধ হলে পকেট-ডায়েরীতে চট্ করে টুকে নেন্।...পোস্টার চেকিংএর শেষে ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে পদধূলি দেবার পালা।

ইলেকশানে নাম্‌বার কয়েকদিন আগে থেকেই এ'কাজ আরম্ভ করেছেন তিনি। অবশ্য তার সীমিত এলাকার মধ্যেই তার যাতায়াত। দিনে দু'টি বাড়ীর বেশী তিনি যেতে পারেন না।

দু'দণ্ড বসে বাড়ীর কর্তাগোছের ব্যক্তিদের সঙ্গে হেসে আলাপ করেন, তাদের সুখসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করেন অথবা শুনে থাকেন। বাড়ীর কর্তা খুসী হন্, যশোদাদুলালবাবুর মনও ভরে যায়।

বেলা একটার মধ্যে ঘরে ফেরেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গায়ে খাঁটি সরষের তেল মাখেন প্রায় একছটাকের মত। চাকর বনমালীই এ'কাজ করে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে সর্বাঙ্গে দলাই মলাই।

তারপর স্নান।

বাড়ীর পূর্বভাগে পৈতৃকআমলের এজমালী একটি পুকুর,—পরিস্কার কাকচক্ষুর মত টলটলে জল, সেখানে আধঘণ্টা ধরে অবগাহন স্নান করেন। মাঝে মাঝে দেরীও হয়। ঘাটে যদি কোন মেয়েরা থাকেন, যশোদাদুলালবাবু সহসা সেখানে যেতে পারেন না। কেমন সংকোচ বোধ হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। মেয়েরা চলে গেলে, তবে তিনি গিয়ে ঘাটে নামেন।

স্নান সেরে খেতে যখন বসেন, দুটো বেজে যায়।

খাবার সময় প্রায়ই মা সাম্‌নে এসে বসেন।

যশোদাদুলালবাবু ভোজনবিলাসী। মাছ মাংসটা খেতে খুবই ভালবাসেন। আর খেয়েও থাকেন প্রতি-দিন। ...তাতে বৃদ্ধা মায়ের আবদার ও জেদ। সুতরাং প্রায়ই গুরুভোজন হ'য়ে পড়ে।

খাওয়ার পর সাধারণতঃ কিছুক্ষণ বিশ্রামে যশোদাদুলালবাবু অভ্যস্ত, কিন্তু ভোটরঙ্গের ব্যাপার আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এটি আর হ'চ্ছে না বলা চলে। বাইরের ঘরে সারাক্ষণ অধিষ্ঠানরত মোসাহেবদের কাছে এসে বস্‌তে হয়। তাদের সঙ্গে কর্মপদ্ধতির আলোচনা করতে হয় বিস্তৃতভাবে।

এমনি আলোচনা কালে দু'তিনবার চা' এসে যায় বনমালীর হাতে।

...বিকেল পাঁচটা বেজে যায়।

ধোপধস্ত সপারিষদ যশোদাদুলালবাবু বেরিয়ে পড়েন আবার। কিছুক্ষণ আড়তে গিয়ে বসেন। আয়-ব্যয়ের হিসেব নিকেশ করেন।

ম্যানেজার তথা হিসেব রক্ষক গনেশহালদার মশাই-এর বাঁধানো খেরো খাতায় সহি দিতে হয়। তাকে অযাচিত কিছু উপদেশ দিয়ে উঠে পড়েন আবার যশোদাদুলালবাবু।

এমনি করে সন্ধ্যা বয়ে যায়।...

ঘরে-বাইরে মু্যনিসিপাল তথা ইলেকট্রিক কোম্পানীর বদৌলতে আলো জ্বলে উঠে।

মাঠবহুল অশ্বত্থ গাছের ডালে পাতায় ঘরে ফেরা পোকপাকালীর অবিশ্রান্ত কলকাকলিতে ভরে যায়। বাজারের একধারে অবস্থিত বারোয়ারী গোপীনাথের মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁশি ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ আকাশকে মুখরিত করে মুহূর্তে।

যশোদাদুলালবাবু সদলে গোপীনাথের মন্দিরে গিয়ে এই সময় সভক্তি প্রণাম নিবেদন করে আসেন। পূজারী রাখালঠাকুর স-পুষ্প বিল্বপত্র আশীর্বাদ করেন যশোদাদুলালবাবুর মাথায়। প্রতিদিনের মত আট আনা পয়সা রাখালঠাকুরের পায়ে প্রণামী রেখে উঠে পড়েন যশোদাদুলালবাবু।

তারপর এখান থেকেই সোজা চলে যান কোন ক্লাব বা সমিতিতে।

কোন মিটিঙ্ থাকলে মিটিঙে বসেন, নয়তো ম্যাগাজিন পড়েন। বাংলা-ইংরাজী-হিন্দি যা পান্, পড়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন।

মোসাহেবরা তখনো তাকে ছাড়ে না, তাদের সঙ্গে অধীত সংবাদ বিচিত্রা নিয়ে তর্ক বা আলোচনা করেন। কোন-কোন রাজনৈতিক দল বা পার্টির মুণ্ডুপাত করেন এই সময়। সুবিধা এই যে, বর্তমানে তিনি কোন দলভুক্ত নন্।

রাত সাড়ে-নটা-দশটার মধ্যেই ঘরে ফিরে আসেন তিনি।

কিন্তু ক্লাব বা সমিতি-ফেরত দু'একটি অন্তরঙ্গের বাড়ী না যেয়ে পারেন না।

এক সুললিত হাজরা, অপর কানুপ্রিয় চৌধুরী।

এরা কেউ অবস্থাপন্ন নয়। জনশ্রুতি, গোপনে এদের নাকি যশোদাদুলালবাবু আর্থিক সাহায্য করে থাকেন।

এমনি সাহায্য নাকি বয়োবৃদ্ধ সুললিত হাজরা বা প্রৌঢ় কানুপ্রিয় চৌধুরীর মুখ দেখে নয়,—নিন্দুকেরা বলে, সেটা নাকি হাজরার বিধবা সুন্দরী কন্যা তথা বর্তমানে মু্যনিসিপাল স্কুলের মিস্ট্রেস্ শ্রীমতী মালবিকা অপর কানুপ্রিয় চৌধুরীর বিশ বছরের শিক্ষিতা শ্যালিকা কুমারী নন্দিতার রূপযৌবনের প্রবল আকর্ষণেই।

আরো জোর গুজব, এদের কোন একজনকেই নাকি যশোদাদুলালবাবু বিয়ে করবেন একদিন।

সবই যশোদাদুলালবাবুর কানে পৌঁছেছে কিন্তু তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

লোকে কি-না ভাবে, কি-না বলে? আবার বিয়ে করবেন তিনি এই বয়সে? তার দরকারই বা কি? ...একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তারও ছেলে হয়েছে; আর সেই ছেলেকে কাছে রেখেই ত এখন নিজের হৃদয়ের শূন্যতাকে পূরণ করে চলেছেন তিনি। আবার বিয়ে করে নূতন করে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে কি লাভ হবে?...

ঘরে ফিরে সোজা নাতিটির খোঁজ করেন। নাম রেখেছেন 'দীপালোক।' সংক্ষেপে আহ্লাদ করে ডাকেন, 'দীপু'।

কোনদিন দেখেন দীপু আজিমার কোলে অকাতরে ঘুমুচ্ছে,...নয়তো কোনদিন বনমালী তাকে খেলা দিচ্ছে নানাভাবে।

দেখে যশোদাদুলালবাবু খুসি হন্। নাতিকে কাছে টানার চেষ্টা করেন। কিছু খেলনা, নয়তো কিছু পয়সা হাতে গুঁজে দেন। ফুলোফুলো গালে ছোট্ট কয়েকটি চুমু এঁকে দেন সশব্দে।

সাড়ে দশটায় খেতে বসেন তিনি।

এবার গুরুপাকের কিছু নয়। শুধু মাছের ঝোলভাত আর দুধ। ভাজাভূজি-ও কিছু নয়।...

হাতমুখ ধুয়ে এবার নিজের শোবার ঘরে প্রবেশ করেন যশোদাদুলালবাবু।

তাঁর ঘরে সচরাচর কারো প্রবেশ নিষেধ। কুলুপ লাগানো থাকে সর্বক্ষণ। বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ থাকে বলেই।

ঘরের তালা খুলে একশো পাওয়ার আলোটি জ্বালিয়ে দেন।

চৌকিতে গিয়ে বস্বার আগে জানলা দুটো খুলে দেন্‌। ফুরফুরে দক্ষিণের হাওয়া ঘরে ঢুকতে থাকে।

দুধের মত সাদা ধব্‌ধবে বিছানা পাতাই থাকে পরিপাটি।

দরজা বন্ধ করেন না কিছুক্ষণ। কারণ, এই সময় বনমালী এসে এক গ্লাস খাবার জল রেখে যায়। সে চলে যেতে, দরজায় হুড়কা এঁটে দেন যশোদাদুলালবাবু।

তারপর সোজা শুয়ে পড়েন বিছানায়। রাত তখন এগারো। দূরের থানার ঘড়িতে সময় সংকেত করে। শোবার পরেই প্রকৃতই ক্লান্তিবোধ করেন তিনি। দেহের ক্লান্তি, মনের ক্লান্তি।...কিন্তু তিনি এই নির্জন একক ঘরে যাকে বলে স্বাধীন,...ইন্‌ডিপেনডেন্ট্। যা খুশি তাই কর্‌তে পারেন।

সুতরাং এই ক্লান্তি পরিহারের জন্যে যদি তিনি দু'পেগ পান্ করেন, তাতে কেউ বলারও নেই, প্রত্যক্ষ করারও নেই। ব্যাপারটা ঠিক ওষুধ খাবার মতই।

কাজেই, যশোদাদুলালবাবু উঠে আলমারীর গুপ্তস্থান থেকে দুটো বোতল বের করেন। একটিতে খাঁটি 'স্কচ্', অপরটিতে সোডার জল। সুন্দর কাঁচের গ্লাসে বস্তুটিকে পরিমাণ মত করে ঢালেন, তারপর নিঃশব্দ চুমুকে সবটাই একেবারে শেষ করেন। মুহূর্ত পরেই তিনি বেশ সুস্থ বোধ করেন,...মরে যাওয়া স্নায়ুতন্ত্রে ধীরে ধীরে রক্ত-সঞ্চার হ'তে থাকে।

তারপর শ' পাওয়ারের আলো নিবিয়ে দিয়ে মাথার পাশে ছোট টিপয়ে রক্ষিত টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দেন,—মুহূর্তে নীলালোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে। আগামী দিনের কর্মজগতে প্রবেশের মুখে অদৃশ্য কোন শক্তি বা এনার্জি সঞ্চয় করা তিনি বিশেষ বিবেচনা বোধ করেন। আর তাই করতে যদি তারই কোন ফটোগ্রাফার বন্ধুর দেওয়া কয়েকটি ছবি তিনি গোপনে দেখে থাকেন, তবে কি অন্যায় হ'তে পারে?

যশোদাদুলালবাবু তাই করেন।

স্কচপানে উত্তেজিত স্নায়ু আরো একধাপ উত্তেজিত হবার মুখেই আলোটা নিবিয়ে দেন যশোদাদুলালবাবু দপ্ করে।

তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শূন্যতার মাঝে ডুবে যান অবলীলায়।

সেকাল আর একাল কলিযুগ—সত্যযুগ

যতীন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী

(দুইবার কৈলাশ দর্শণ ও অন্যান্য পুস্তক প্রনেতা)

"এখন ঘোর কলি, আর ত সত্যযুগ নেই, এ রকম ত হবেই।"

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন, কি হল।"

"এই দেখছেন না চারিদিকে অন্যায়, অধর্ম্ম, পাপাচার।"

ভদ্রলোকটি নতুন কিছু বললেন না, সকলেই এ রকম বলেন যখনি তাঁহারা দেখেন বা শোনেন এমন কিছু যাহা তাঁহারা পছন্দ করেন না, সমর্থন করেন না, বা যাহা তাঁহাদের ইচ্ছার, উদ্দেশ্যের বা স্বার্থের বিপরীত বা বিঘ্নকর হয়।

তাঁকে বললাম "কিন্তু এই সব যা বলছেন তা কি আগে যাকে সত্যযুগ বলে শুনেছেন, তখন ছিল না? তখনও এ রকম হত, বরং হয়ত আরও বেশীই হত। এখন সামাজিক নিয়ম, কানুন, আচরণ আগের চেয়ে ভালই হয়েছে যাহার দরুণ লোকের আচরণ কিছু সংযত হয়েছে। অবশ্য মানুষের প্রকৃতি যে বদলেছে তা বলা যায় না, কোন জীবের প্রকৃতিই বদলায় না, তবে সমাজ ও আইন শাসনে কতকটা অন্ততঃ আগের চেয়ে আটকের মধ্যে এসেছে।"

আমার কথা শুনে তিনি কেবল অবাক্ নয় যেন কিছু বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। বিরক্ত ও উত্তেজিত হবারই কথা, কারণ এ রকম কথা কখন নিশ্চয় শোনেন নি। শুনে এসেছেন এবং অন্ধ ধর্ম্মসংস্কারে বিশ্বাস করে এসেছেন যে সত্যযুগে ধর্ম্ম ছিল চার পায় অধিষ্ঠিত। সে যুগে অন্যায়, অধর্ম্ম বলে কিছু ছিল না। এ রকম অন্ধ বিশ্বাস সংস্কার এমনি সর্ব্বব্যাপী এবং এমনি সকলকে অভিভূত করে রেখেছে যে ও বিষয় কোনরূপ প্রশ্ন, সন্দেহ লোকের মনে ওঠে না। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে সন্দেহ, প্রশ্নের অনেক অবকাশ আছে। সত্য যুগেরই যে-সব কাহিনী আছে তাতে এমন এমন অন্যায় অধর্ম্মের উল্লেখ আছে যাহা এ যুগে আমরা নিন্দনীয় মনে করি। এখানে আর একটা কথা বলা যায় এই যে আজকাল যাহারা অন্যায় অধর্ম্ম করে তাহারা লোকের নিকট, সমাজের নিকট, নিন্দনীয়, কিন্তু সেকালে যাঁহারা প্রবঞ্চনা, অন্যায়, অধর্ম্ম করেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই কেবল শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদাই দেওয়া হয়নি, তাঁহারা ঋষি, দেবতা ও এমনকি অবতার বলিয়াও গণ্য হইয়াছেন।

বলি রাজাকে রাজ্য ও ক্ষমতা চ্যুত করিতে বামন অবতার এলেন ও চাতুর্য্য প্রবঞ্চনার দ্বারা তাঁহার সব নিয়ে নেবার পর তাঁহাকে পাতালে আটক করিয়া রাখিলেন। কলিযুগে এ রকম প্রতারণা লোকে সমর্থন করে না, তীব্র নিন্দা করে, কিন্তু সত্যযুগে যিনি এরকম করিলেন তাঁহাকে অবতার বলা হল।

সুর অসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করলেন, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত অমৃতও বাহির হল। দেবতারা কিন্তু চাইলেন যে অমৃত সব তাঁহারাই আত্মসাৎ করেন, অসুরদের

বঞ্চিত করে। অমৃত খেয়ে অসুররা বলবান্ হবে, দেবতারা যদি তাদের প্রতিযোগিতায়, যুদ্ধে না পারেন সেই ভয়ে তাঁহারা বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। বিষ্ণু এলেন, কিন্তু দেবতাদের বললেন না যে এ কি কথা, তোমরা দুপক্ষ মিলে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পেলে, কিন্তু এখন অসুরদের না দিয়ে অমৃত সবটা তোমরাই নেবে? এ রকম বলা কেবল উচিত নয়, যাহার একটু বিবেকবুদ্ধি আছে সেই এ রকম বলিবে। কিন্তু দেবতাদের বেলা ও রকম বিচার করা চলে না। তাঁহাদের বিবেক, তাঁহাদের ন্যায় ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল elastic, ইচ্ছামত, সুবিধামত তাহা তাঁহারা বেঁকাতে মোচড়াতে পারতেন। তাতে কোন দোষ ছিল না, কারণ তাঁহারা ছিলেন দেবতা, সত্যযুগের মহামানব।

বিষ্ণু বলিলেন—বেশ, তোমরা সুর অসুর দুই সারিতে বোস। বলে তিনি মনমুগ্ধকারী মোহিনীরূপ নিলেন ও অমৃত ভাণ্ড নিয়ে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। অবশ্য পরিবেশন আরম্ভ হল দেবতাদের দিক থেকে। দেবতাদের পরিবেশনের পর যাহা বাকি রহিল এক চুমুকে তাহা তিনি খেয়ে ফেললেন। এক অসুর দেবতাদের মধ্যে বসে গিয়েছিল। বিষ্ণুর ও দেবতাদের চোখে পড়েনি, এখন পড়িল। অমনি বিষ্ণু নিজের চক্র দিয়ে সে বেচারাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন।

কলিযুগে এ রকম কাণ্ড কোন সমাজেই সমর্থিত হয় না। কিন্তু সত্যযুগে যাঁহারা এ রকম অন্যায় করিলেন তাঁহারা হলেন পূজনীয় দেবতা এবং তাঁহাদের প্রধান যিনি মোহিনীরূপ ধরে এই উপায় দেবতাদের দেখাইলেন তিনি হলেন দেবতাদের শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু।

এই রকম কত কাহিনী নিয়ে সত্যযুগের ইতিহাস। আর সে ইতিহাসে আছে কেবল রাজ্য নিয়ে মারামারি কাটাকাটি। যে রাজা শক্তিশালী হলেন তিনি আরম্ভ করলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ, যে যজ্ঞ করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। যজ্ঞটা আর কিছু নয়, একটা ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া, আর ঘোড়ার পিছনে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে পুণ্যাকাঙ্ক্ষী রাজার গমন এই ঘোষণা করিতে করিতে যে যদি কাহারও ক্ষমতা ও সাহস থাকে ত অশ্বকে ধর নচেৎ বশ্যতা স্বিকার কর ও কর দাও। যাঁহারা অবতার বলে পূজিত তাঁহারাও এই যজ্ঞ করে পুণ্যলাভ করেছেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এই অশ্বমেধ করে পুণ্য অর্জন করেন।

যে অতীত যুগের আমরা বাখান করি ও যাহার উল্লেখ সগৌরবে করি সে যুগের মানুষের চরিত্র, আচরণ দেখিলে সে যুগকে গৌরবময় ধর্ম্মযুগ বলা যায় না। সে যুগের সাধনা, ধ্যান, তপস্যার কথাও আমরা বলে থাকি, কিন্তু ভেবে এ বিচার করে দেখি না যে এই সব সাধনা তপস্যা কি নিয়ে হয়েছে এবং তার ফল কি হয়েছে। তপস্যার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ ছিল কোন আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাশা, লোভ, কামনা চরিতার্থ করা। অথচ কামনা, বাসনা, উচ্চাশা জয় করাই ধর্ম্মের উপদেশ। কোন তপস্বী চেয়েছেন অমর হতে, কেহ চেয়েছেন ত্রিভুবন জয় করার ক্ষমতা, কেহ চেয়েছেন যার মস্তকে তিনি হাত রাখবেন সে যেন ভস্ম হয়ে যায়, কেহ চেয়েছেন অর্থ, কেহ চেয়েছেন পুত্র, কেহ চেয়েছেন ধন-সম্পত্তি, কেহ চেয়েছেন শত্রুর বিনাশ, কেহ চেয়েছেন যোগসিদ্ধি ইত্যাদি।

এই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে যে তপস্যা সে তপস্যা, আর সে তপস্বীকে ভাল বলা যায় কি? কিন্তু এই তপস্যা আর তপস্বীকে আমরা বড় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত দেখি। যাই হোক, তপস্যার লক্ষ্য ভাল না হইলেও সংযমের সহিত একাগ্র, একনিষ্ঠ হয়ে বেশ কিছুদিন একান্তে থাকিলে মন থেকে মন্দ আকাঙ্ক্ষা সরে যাওয়া উচিত যদি তপস্যার সংযমের কিছু গুণ থাকে, কিন্তু তাহা কোথাও দেখা যায় না। তপস্যান্তে বর পাইলে পূর্ব্বের মন্দ অভিপ্রায় আরও উত্তেজিত হইয়াছে। তপস্বী তপস্যা ছেড়ে উন্মত্ত হয়ে বাসনা চরিতার্থ করতে ছুটেছেন। যিনি বর পাইলেন যে আচ্ছা তিনি যার মাথায় হাত ছোঁয়াবেন সে তখনি ভস্ম হয়ে যাবে তিনি বর পেয়েই প্রথমে চাইলেন বরদাতা শিবের মাথায় হাত রাখতে।

এই রকম প্রায় সব বরপ্রাপ্তরাই করেছেন। যে সব মুনিঋষিরা যাগযজ্ঞ ও তপস্যা করেছেন তাঁদের

আচরণ, ব্যবহার, অসংযম দেখিলেও মনে প্রশ্ন ওঠে তপস্যা করিলে কি কিছু হয়? তপস্যা করিয়া উঁহাদের রিপু দমন হয় নি। বড় বড় নামকরা ঋষিদের চারিত্রিক অসংযম বিস্ময়কর। স্ত্রীলোক দেখিলে তাঁহারা কিরূপ উন্মত্ত হয়েছেন, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন, পরাশর, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি নানা মুনির আচরণে তাহা লক্ষিত হয়। ক্রোধেও তাঁহারা আত্মহারা হয়েছেন। কথায় কথায় লোকেদের ভস্ম করেছেন।

গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রম। একদিন মুনি ধ্যানস্থ আছেন এমন সময় সগর রাজার পুত্রেরা তাদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের সন্ধানে আসে এবং অশ্বকে মুনির আশ্রমে দেখতে পায়। সে কারণে তাহারা তাহাদের যৌবনসুলভ উত্তেজনায় মুনির প্রতি কিছু অনুচিত ব্যবহার করে। মুনি ক্রোধে তাহাদের সকলকে ভস্ম করিলেন। ঋষিদের এ রকম আচরণকে নিশ্চয় খুব ভাল বলা যায় না, আর তাঁহার রিপুদমনের প্রমাণও ইহাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে বিচার করে কে? মুনিঋষিরা যাহা করেছেন তাহাই মহৎ, এই সংস্কারে, বিশ্বাসে আমরা জড়িত। তাই যেখানে এইরূপ ক্রোধের তাণ্ডব লীলা হল সেই গঙ্গাসাগর হয়ে গেল মহা তীর্থস্থান, যেখানে চারিদিক হতে বৎসরে লাখে লাখে পুণ্যাকাঙ্ক্ষী যাত্রী আসে।

অতীত হইতে ভাল মন্দ অনেক রকম শিক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের অতীতে সব ভাল ছিল, সে এক মহা ধর্মযুগ ছিল, তখন সত্য ছাড়া কিছুই ছিল না, তখনকার ব্যক্তি অতি মহৎ, সর্ব্বজ্ঞানী ছিলেন, সর্ব্ব মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন, পাপ, অন্যায়, অধর্ম, তাঁহাদের স্পর্শ করিত না—এইরকম বিশ্বাসে অতীতকে পূজা করায় লাভ ত হয়ই না, বরং ঐ দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকায় আর এই বলে গৌরব করায় যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি মহৎ ছিলেন; অবনতিই হয়,সামনের আলো চোখে পড়ে না, অগ্রগতি বন্ধ হয়, যেমনটি হয়েছে। হিন্দু ঘোর অন্ধ সংস্কারের আর অন্ধ বিশ্বাসের পঙ্কে পড়ে গিয়েছে যেখান থেকে সে বের হতে পাচ্ছে না। আর বের হবার আশা সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

নবম অধ্যায়

জয়ন্তী বোম্বে পৌঁছতে যোসেফ ও মহুয়া এয়ারপোর্ট থেকে তাকে বাসায় নিয়ে এল। মহুয়ার মিষ্টভাষী শিশুপুত্র ও কন্যা দৌড়ে এসে জয়ন্তীকে আলিঙ্গন করল। মহুয়া গৃহস্থালীর কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও চিত্রকরের জগৎ থেকে বিশেষ দূরে সরে যায় নি। যদিও তার বাড়ীতে অতিথি সমাগমের কোলাহল বিশেষ নেই—তবু বন্ধুর অভাবও ছিল না। ছেলেমেয়ের সঙ্গে মহুয়া গল্প করে খেলা করে, তাদের স্বভাবও অতি সুন্দর। যোসেফ একটি বড় আর্ট স্কুলের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকাতে নানান দায়িত্ব নিতে হয় তার। মহুয়ার ছাত্রছাত্রীরা তার বাড়ীতেই ছবি আঁকা শিখতে আসে। যোসেফ ও মহুয়ার জীবনে শৃঙ্খলতার ও আনন্দের প্রাচুর্য অতি সহজেই লক্ষিত হয়। জয়ন্তী মহুয়ার বাড়ীতে এসে বেশ শান্তি পেলো।

মহুয়া একদিন বলল—

'এতো অল্প বয়সে তোমার স্বামী এভাবে চলে গেলেন, তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়েছিল। যে বিরাট শিক্ষায়তন করে গেলেন, সে বিষয় বিস্তৃতভাবে সব জানলাম—ইচ্ছা আছে একদিন দেখতে যাব। প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করা এখন তোমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। ঐ শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতি তোমারই ওপর নির্ভর করছে। কোথায় আলাপ হ'ল তোমার সঙ্গে মুকুটের? তোমার বিয়ের খবর কিছুই পাইনি, তুমি কি আমাদেরও ভুলে গিয়েছিলে?'

'মহুয়া, বিয়ে হবার পর কোন দিকেই মন দিতে পারতাম না। মুকুটের এত রকমের লোক নিয়ে কারবার ছিল আর এত দায়িত্ব একার ওপর নিয়েছিল সে, আমি যেন তার সঙ্গে তাল রেখে চলতেই পারতাম না। শুধু চিত্রকলার জন্যই যেন আমাদের সংসার পাতা। দু'বছর শিল্প জগতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, দেখছো তো একটি সন্তানও হয় নি আমার—সময় ছিল না সে কথা ভাববার।'

মনের ভিতরকার জ্বালা যেন কিছুতেই সে নেবাতে পারছিল না—বাবার কাছে যদি সব কথা খুলে না বলতো তাহলে বন্ধুদের কাছে কত যে অপ্রিয় কথা বলে ফেলতো কে জানে। সর্বদাই যেন একটা পীড়িত মনের সঙ্গে সে যুঝে চলেছে—তার নিজস্ব শক্তির পরাজয় যেন তাকে কেমন অস্বাভাবিক করে ফেলেছিল। জয়ন্তী মহুয়ার হাত দুখানা ধরে বলল—

'মহুয়া, মুকুটের কাছে সব শিক্ষাই পেয়েছিলাম, তার কাছে আমি সত্যিই ঋণী। তোমরা যদি 'দিগন্তে' আসতে বড় খুশী হতাম। দুজনে একসঙ্গে কত কাজ যে করেছি—নইলে অতবড় দায়িত্ব নেবার সাধ্য আমার হ'ত না।'

কিন্তু সে যে ঐ আবেষ্টন থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে এ কথা জয়ন্তী প্রকাশ করতে পারল না। অপরের কাছে সে অন্তরের বিভীষিকার কথা জানাতে চায় কিন্তু পারে না—মুকুটও তাদের কাছে অপরিচিত। কী কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে সে জীবন কাটিয়েছে কে

বা জেনেছে? সে যে নবজন্মের জন্য অন্তরে কেঁদে মরছে, আশার বাণী সে এক বাবার কাছেই শুনেছে—সত্য ঘটনাগুলি আর কাউকে বলবার তার প্রবৃত্তি নেই, অধিকারও নেই। শত সহস্র ভুল বোঝার মধ্যে তার যে দিন কেটেছে এত কথা সে আর বলতে চায় না। অথচ সেই চিন্তাগুলি তাকে পাগলের মত ঘুরিয়ে মারছে। রাতের পর রাত সে ঘুমুতে পারে না।

তবু কিছুতেই যেন সে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিল না। বোম্বে আসতেই শীলার চিঠি পেলো। বাদলকে নিয়ে শীলা বিলেত যাবে স্থির করেছে—জয়তীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়—অলোকের সাহায্যে সকলে কন্টিনেন্টে ঘুরতে পারবে।

যোসেফ ও মনুয়াকে পরামর্শ করতে ওরা দুজনেই খুব উৎসাহ দিল। বহু বছর জয়তী দেশের বাইরে যায় নি। ওদিকে অলোক প্রায় প্রবাসীর মতই হয়ে গেছে। ছোটদার বিয়েতে সে আসেনি—অনেকদিনের কথা মনে পড়ল। বিলেত থেকে ফিরে এসে সে আর অলোককে দেখেনি—কত বাল্যস্মৃতি তার মনের মধ্যে আলোড়ন শুরু করে দেয়, সে নানা কথা ভাবে কিন্তু বলে না।

শীলা, বাদল ও জয়তী বোম্বে থেকেই লণ্ডন রওনা দেবে স্থির করল। জয়তীর অতি পুরাতন বন্ধু 'ভীরা' লণ্ডনে তার কাছে থাকতে অনুরোধ করেছিল। বাদল ও শীলা অলোকের কাছেই গিয়ে উঠবে।

অলোক টেলিগ্রাফ পেয়ে মহাখুশী। জয়তীর বিষয় অলোক কিছু উল্লেখ করল না চিঠিতে, সে অতীত প্রেমের কাহিনী সম্পূর্ণ ভুলে যেতেই চেয়েছিল। এখন সে বেশ শান্তিতে আছে। এয়ারপোর্টে সে ঠিক সময়েই উপস্থিত ছিল শীলা ও বাদলকে নিজের ফ্লাটে নিয়ে যাবে, ভীরা জয়তীকে তার বাসায় নিয়ে ওঠালো। অলোকের আনন্দের সীমা নেই। বাদল আর শীলাকে বহু বছর পরে কাছে পেয়ে সে রীতিমত ছোটাছুটি শুরু করে দিল—। তাদের ঘরখানা দেখিয়ে বিশ্রাম করতে বলল। পাশের বাড়ীর দুটি ছেলে বাদলকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়—তারা অলোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। চা খাওয়া হলে তিনজনে মিলে বেরিয়ে পড়ল। বাদল সঙ্গী পেয়ে খুব খুশী।

শীলা অলোকের দিকে তাকিয়ে বলল—'এ কি অলোক? তোমার মাথায় পাকা চুল? তুমি তো সংসারী হওনি, তোমার এত চিন্তা কিসের? হেমেন এখনও এ'ভাবেই কলের মত কাজ করেন—আমি আমার স্বামীকে কোনমতেই আর বদলাতে পারলাম না। তবে পরিশ্রম করতে ওঁর আপত্তিও নেই আর একঘেঁয়ে জীবন তাঁর মন্দও লাগে না।'

অলোক যৌবনের সিঁড়ি অনেকদিনই পেরিয়েছে—দেহের কৃশকায় গড়ন ভারী হয়ে গেছে—মাথায় কাঁচাপাকা চুল। সৌম্য মুখশ্রী তার, কোথাও চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার ছাপ নেই। পড়ার ঘরখানি সে সযত্নে সাজিয়েছে, বিভিন্ন ধরণের রাশীকৃত পুস্তক আলমারিতে ও তাকে। অলোকের রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

শীলা কুসানের ওপর ভর দিয়ে বসেছে—দরজায় কে নাড়া দিল, আওয়াজ শুনতে পেয়ে সে পিছন ফিরে তাকালো। দেখল দরজা খুলে জয়তী ঘরে ঢুকছে—অলোক উঠে দাঁড়ালো। জয়তীর মুখখানা আজ নিতান্তই ম্লান—ও দীপ্তিহীন, কিন্তু তার করুণ মুখশ্রী লাবণ্যে পরিপূর্ণ। অলোক, জয়তী ও শীলা কলকাতার বাড়ীর নানান ঘটনা আলোচনা করছিল, জয়তীর বাল্যকালের দুরন্তপনার গল্প শুনে তিনজনেই হেসে উঠল। উগোস্লাভিয়ায় যাবার একান্তই ইচ্ছা তার—অলোক বিশেষ উৎসাহ দিতে দ্বিধা করল না। জয়তীর বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধে অলোক কিছুই জানতো না, দীর্ঘকাল জয়তীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি, সে খানিক উদাসীন হয়ে গেছে। জয়তী আশা করেছিল অলোক কৌতূহল ভরে অনেক কিছু প্রশ্ন করবে—সে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল—অলোক একেবারেই কিছু বলল না এ বিষয়।

'কালই স্থির করে ফেলব উগোস্লাভিয়াতে যেতেই হবে। কতদিন কত অনুরোধ করেছে—তার

কাছেই যাব। লণ্ডনে থাকবার আকর্ষণ কিছু নেই—বন্ধুরা কেউ নেই দেখছি এখানে। ভীরা খুব ভাল মানুষ।' কথাগুলি জয়তী এক নিঃশ্বাসে বলে শেষ করল।

অলোক জয়তীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখল, সে আগের মত আর সজীব নেই, নিরানন্দময় একটি ভাব তার সমস্ত মুখখানা যেন ঢেকে দিয়েছে—অন্তরে একটা অস্বাভাবিক অধীরতা তাকে পীড়ন করছে। অলোক ভাল করে কিছুই বুঝল না। জয়তী একটু পরেই উঠে পড়ল। বাদল তার বন্ধুদের সঙ্গে কিছুদূর ঘুরে আসতে চাইতে অবশেষে শীলা অলোকের সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ পেল।

'দেখ অলোক, জয়তী এখনও সুস্থ ও স্বাভাবিক হয় নি, তার কাজে সে ফিরে যেতে পারছে না—বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত মনের অবস্থা ওর, তুমি যে ওকে কেন বিয়ে করলে না—এ বিষয় তোমার জোর করা উচিত ছিল। এখন একমাত্র বাবার কাছেই সে নিঃসঙ্কোচ হতে পারে। জয়তী মুকুটকে বিয়ে করে অবধি নানান পরীক্ষার মধ্যে দিন কাটিয়েছে।'

'শীলা।"—অলোক যেন চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ' এক কথা ছাড়া তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোন বিষয় কি কথা বলতে পার না? জয়তীর সঙ্গে কবেকার কোন সম্পর্ক ছিল আমার, বার বার সেই কথা টেনে আনো কেন? জয়তী কোন কারণে বিশেষ মনঃকষ্ট পেয়েছে—মনে হয়, তার মুখে বিশেষ গ্লানির ছাপ দেখতে পাই—খুব দুঃখ হয়, কিন্তু আমি কি করব? কেন আমায় অপ্রস্তুত কর তুমি ঐ কথা তুলে? এ বাড়ীতে আর এ বিষয় কথা তুলো না শীলা।' অলোক আজ বিব্রত হয়ে কথাগুলি না বলে পারল না।

পরদিন সকালে জয়তী উগোস্লাভিয়ায় রওনা দিল। কেন জানি প্লেনে সমস্তক্ষণ অলোকের গলার স্বর তার কানে আসতে লাগল।

'আমি তোমার জন্য নিশ্চয় অপেক্ষা করব'—সে বলেছিল কি? কই সে তো আর বিয়ে করল না—কিন্তু আমার সঙ্গে ভাল করে তো কথাই বলল না।

অলোকের বিষয় তার কেমন জানি কৌতূহল হ'ল। এতদিন কোন সম্পর্ক ছিল না কিন্তু জয়তীর মনে আজ পুরাতন ঘটনাগুলি যেন নিতান্তই সুন্দর হয়ে ফুটে উঠলো। অলোক যে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এ কথা সে মেনে নিতে চাইছে না—শীলার প্রতি অলোকের অনুরাগ দেখেও তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। শীলা তার নিজের জীবনে কোথায় যে তাল মেলাতে পারেনি আর কখন যে অলোক তাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিল—জয়তী কিছুই জানে না।

কর্ডিয়া জয়তীকে কাছে পেয়ে রীতিমত উৎফুল্ল। সে বিয়ে করেনি কিন্তু সে তার ভাবী বরের প্রেমে নিতান্তই বিভোর। প্রত্যহ দুজনে একত্রে গান করে—বেড়ায়, এই রোমাঞ্চকর দিনগুলি তার জীবনে অতি মূল্যবান্‌। কর্ডিয়ার চিত্রকর ভাই-এর সঙ্গে জয়তীর আলাপ হ'ল। মুকুটের মৃত্যুর সংবাদ সকলেই জেনেছিল এবং তারা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করল। দেশে ফিরে আসবার জন্য তার ব্যগ্রতা কিন্তু জয়তী 'দিগন্তে' ফিরতে চায় না। নিজেকে সে ধিক্কার দিল বহুবার, কিন্তু কেন যে সে উপস্থিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারছিল না তাই ভাবছিল। বড় অসহায় অবস্থা—আত্মগ্লানিতে জর্জরিত। দিগন্তর তালা খুলে আবার ঘরগুলিকে সজীব করতে হবে? যে জন-কোলাহল আর সহ্য করতে পারছিল না—তাই আবার আহ্বান করতে হবে?—সামাজিক লীলাখেলার নিত্যনূতন মুখোস পরা অভিনেত্রী ও নায়কদের অভ্যর্থনা করতে হবে? জয়তী যেন নিজেকেই বলে উঠল—

'আমি পারব না—না কিছুতেই না।' সার্কাসের ক্ষীণ রজ্জুর উপর অভিনেত্রীকে সন্তর্পণে হাঁটতে হয়। আশঙ্কার বাহু তাকে কখনও কখনও গ্রাস করে ফেলে, দর্শক তার মনোভাব কিছুই জানতে পারে না। জয়তীকে কি সেই ভীতি ও সন্ত্রাস গ্রাস করতে চায়? শিল্প জগতে সফলতার কথা স্মরণ করে জয়তী বিশ্বাস করতে চেষ্টা করল সে শিল্পীদের মাঝখানে সুনাম

করেছিল, আড়ম্বর করে সংসার করেছিল—সামাজিক আনন্দ লহরীতে সেও ভেসেছিল— সে তো বেশী দিন নয়। আর ভাবতে পারলো না। কাগজ ও কলম হাতে নিয়ে বসল। বাবাকে সে আবার এক কথাই লিখতে চায় সে, দিগন্তে ফিরতে পারছে না। কুহেলিকা আবৃত পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য দেখে জয়ন্তীর যেন মনটা উদাস হয়ে গেল। কাগজ আর কলম উঠিয়ে নিল আবার, কিন্তু কিছু লেখার আগেই কর্ডিয়া ঘরে ঢুকে এল। হাতে একখানা চিঠি। জয়ন্তীকে উদ্দেশ করে বলল—

'তোমার বাবা বড়ই একা পড়েছেন—তোমায় রোজই মনে করছেন বোধ হয়। কেমন আছেন? চিঠি পড়ে আমায় বলো পরে।' চিঠি হাতে দিয়ে কর্ডিয়া ঘরের বাইরে চলে গেল।

'হ্যাঁ? বাবার চিঠি?' জয়ন্তী চিঠিখানা পড়তে শুরু করে দিল।

আহমেদাবাদ

'প্রিয় জয়ন্তী,

তোমার উপস্থিত ঠিকানা তোমার বাবার কাছ থেকে আনিয়েছি, আশা করি রওনা দেবার পূর্বেই এ চিঠি পাবে। অল্পদিন হ'ল আমার মা স্বর্গারোহণ করেছেন, আমি তাই দিল্লী ছেড়ে চলে এসেছি, ঠিকানা দেখে বুঝবে আমি আহমেদাবাদে। আমার ছোট বোন তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানেই আছে। আমি এ বাড়ীর একমাত্র ছেলে কাজেই পারিবারিক দায়িত্ব এড়ানো আর সম্ভব নয়। আমার বোনের সাহায্য নিয়ে এই বাড়ীখানা ভাল করে গুছিয়ে নিয়েছি। আহ্‌মেদাবাদ সহরটি সব দিক দিয়ে এখন সজীব হয়ে উঠেছে। কাজে মন দিয়েছি এবং অল্পদিনের মধ্যে আমার বেশ কয়েকটি মূর্তি করে দিতে হ'ল। ছাত্রাবস্থায় এই সহরে ছিলাম এক সময় মনে পড়ে? একটি খবর দিই। যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছিল তার কয়েকমাস আগে একটি সৎপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। মনে হয় আমার মত অলস পাত্রের হাতে কন্যাকে দান করতে পিতামাতার সাহস হয়নি। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত। ভাবী বৌকে কিছুই জানতাম না, তার বিয়ে হয়ে গেছে জেনে সুখীই হলাম। আমার মা শেষ কয়েকদিন বিশেষ অসুস্থ ছিলেন, আমার সান্ত্বনা এই যে শেষ ক'দিন তাঁর কাছেই ছিলাম। এ চিঠিতে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি। ফিরতি পথে তুমি আমাদের কাছে কদিন থেকে যাবে অনুরোধ করছি। বাড়ীখানা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে—আমার বোনই এখন গৃহিণী, সেই তোমায় দেখাশোনা করবে। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকের অভাব নেই, তারা শিল্পীদের উৎসাহ দেয় কাজেই শিল্পীদের কাজের অভাব নেই। অনিতা 'এয়ার ট্র্যাভেল' এ কাজ করছে—আমার সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ নেই। ভয় পেয়ো না—সে এখানে আসবে না। তুমি যদি আসতে পার খুশী হব।

অবিনাশ

মহা ঝঞ্ঝা ও প্লাবন ধারার পর যেন সূর্যের আলো দেখা দিল। জয়ন্তী উগোস্লাভিয়াতে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা একটি ভূতের বোঝার মত হয়ে উঠেছিল, সেই ভার বহন করতে করতে তার দেহমন যেন অবশ হয়ে পড়েছিল। অবিনাশের সহজ সরল চিঠিখানা পড়ে জয়ন্তীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। গভীর প্রীতির উপলব্ধি তাকে স্পর্শ করল, মনে হল আজ যেন সে মনের একটি শিকল ছিঁড়তে পেরেছে।

'কর্ডিয়া—শুনে যাও' জয়ন্তী উচ্চস্বরে ডাকল।

'চিঠিখানা বাবার কাছ থেকে আসেনি—একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আহমেদাবাদ থেকে লিখেছে সেখানে কদিনের জন্য যেতে। একত্রে মুকুটের কাছে কাজ করেছি আমরা। এই বন্ধুটি যেমন সুদক্ষ ভাস্কর, তেমনি রসিক। তোমার সঙ্গে নিশ্চয় কোনদিন এর আলাপ হবে। সে দিল্লী ছেড়ে চলে গেছে এই আমার দুঃখ। আমি একবার আহমেদাবাদ যাব ভাবছি—নেমন্তন্ন করেছে চিঠিতে।'

কর্ডিয়া বিস্মিত হয়ে জয়ন্তীর দিকে তাকালো—জয়ন্তীর মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল সে যেন একটা

সুখবর পেয়েছে। এতদিনের বিষন্নতা ক্ষণেকের জন্য দূর হ'ল। কে সে বন্ধু?

জয়তীকে সঙ্গে নিয়ে কডিয়া সুদীর্ঘ পথ হাঁটতে বেরুলো। দুজনে বেশ কয়েক ঘন্টা স্বাভাবিক ভাবে গল্প করছিল। তাই কার্ডিয়া ভাবল—কই এতটা উৎফুল্ল হয়ে তো জয়তী একদিনও কথা বলেনি। কডিয়া কথা দিল সে নিশ্চয় ভারতবর্ষে আসবে এবং জয়তীর কাছে থাকবে। দুজনে যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন জয়তী চিঠিখানা দ্বিতীয় বার পড়বার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

'আজ আমি তাড়াতাড়ি যদি শুতে চলে চাই তুমি কিছু মনে করবে না তো কডিয়া?' জয়তী প্রশ্ন করল।

'চিঠি লিখবে?' কডিয়া হাসল—গালে চুম্বন দিয়ে ঘর থেকে সরে পড়ল। 'আজ ভাল করে ঘুমুবে তো?'

বিছানায় বসে জয়তী লিখতে শুরু করল—

'প্রিয় অবিনাশ, উগোন্ডাভিয়া

গত কয়েক মাস যেন বিভীষিকার মধ্যে বাস করছিলাম। 'দিগন্তে' ফিরে যেতে পারছি না কিছুতেই। ঐ বাড়ীর কথা ভাবলেই আবার নানান স্মৃতির কথা মনে এসে যায়, দুঃখের দিনের কথা আর আর ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছা করে না। তুমি জান নিশ্চয় কারুর কাছে আমি নিজের কথা কখনও বলিনি। আমার দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে এই আশায় প্রায় দুবছর কেবলি ঘুরছি। যাকে 'দিগন্ত'র ভার দিয়ে এসেছিলাম সে ছ মাসের মধ্যে ছুটি চায়—সে এত বড় দায়িত্ব নিয়ে আর থাকতে রাজী নয়। এখানে কডিয়া ও তার আত্মীয়স্বজন সকলেই বড় সরল প্রীতির বন্ধনে আমায় জড়িয়েছে তবু আমি আমার বিষাদপূর্ণ দৈত্যপুরী থেকে যেন মুক্ত হতে পারছি না। এমন হাল্কা সাদা মেঘ আকাশের গায়ে, নিচে সুনীল সাগর, অদূরে অপূর্ব গিরিমালা নিত্য নূতন পটে যেন কেউ বিভিন্ন ধরণের ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছে আর বলছে—শুধু দেখো, উপভোগ কর। এত হাস্যকৌতুকভরা সাদা মন এদের। আমি শুধু তাদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য আনন্দে যোগ দিচ্ছি। অন্তরের বোধ শক্তি যেন লোপ পেয়েছে—নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছি। তোমার আন্তরিক নিমন্ত্রণ সব চেয়ে বড় উপহার—তোমাকে দেখবার জন্য আমিও উৎসুক হয়ে আছি। আমার লণ্ডনে থাকতে ইচ্ছা করল না—তাই শীঘ্রই ফিরে যাচ্ছি। আহ্‌মেদাবাদের দিকে রওনা দিচ্ছি—অল্পদিনের মধ্যেই যাব। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও।

জয়তী—

কডিয়া আভাস পেলো জয়তী শীঘ্র ফিরে যাবে—অবিনাশের সঙ্গে দেখা করার তার প্রবল আগ্রহ। শীলাকে জয়তী তখনি লিখল সে অবিনাশের চিঠি পেয়েছে এবং তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আহ্‌মেদাবাদ হয়ে কলকাতা ফিরবে। লণ্ডনে সে আর ফিরবে না। এদিকে শীলা প্রায় ছ মাস ধরে বাদল ও অলোকের সঙ্গে নানাস্থান ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক ঘেঁয়ে জীবনের পর নূতন আবেষ্টনে আসতে পেরে সে অশেষ তৃপ্তি লাভ করল। বাদল কলেজে ভর্তি হ'ল। শীলাকে এইবার ফিরতে হবে।

'এই ক'দিনের আনন্দের স্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে'—শীলা অলোককে উদ্দেশ করেই বলল।

'বাদলের জন্য তুমি দুশ্চিন্তা করবে না মনে রেখো।' অলোক উত্তর দিল।

শীলা আবার নূতন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ল—কিন্তু সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েই এসেছিল সে অলোককে দুর্বল হতে দেবে না। হেমেনের প্রত্যাখ্যান তাকে আর দুঃখ দেয় না—অলোকও তার জীবন থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। এখন সে কোন দিক থেকেই কিছু আশা করে না। জয়তীর জীবনের ব্যর্থতা, ও মানসিক উদ্বিগ্নতা শীলাকে পীড়া দেয়, সে চায় জয়তীকে সান্ত্বনা দিতে। বাদলকে ছেড়ে যেতে শীলার বুক ভেঙে যাচ্ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ সংযত হয়েই সে বিদায় নেবে সেটুকু মনের প্রস্তুতি ছিল তার। অলোক বাদলকে দেখাশোনা করবে জেনে অনেকখানি ভরসা পেলো—একাই লণ্ডন থেকে রওনা হল।

দেশে ফিরে শীলা আবার সংসারের ভার নিতেই দেখল দেবাশিস জয়তীর জন্ত খানিক চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

'জয়ন্তী জানিয়েছিল তো যে আহ্‌মেদাবাদে অবিনাশ ও তার বোনের কাছে কদিন থেকে আসবে?' শীলার প্রশ্ন শুনে দেবাশিস বলল—

'জয়তী ওদের কাছে গেলে হয়তো একটু প্রফুল্ল হয়ে ফিরে আসবে—অবিনাশকে আমিই জয়তীর ঠিকানা দিয়েছিলাম—আমায় লিখেছিল সে। ভালই হয় যদি কদিন ঘুরে আসে।' দেবাশিস অবিনাশকে বহুদিন দেখেনি, ছাত্রাবস্থায় আসতে দেখেছে কেবল।

মাদল তার মাকে কাছে পেয়ে বড় খুশী। দাদার কথা জানবার জন্ত সে উৎসুক হয়েছিল। শীলার সঙ্গে দেখা হতেই হেমেন বলল—

'তুমি ফেরার জন্ত এত ব্যস্ত হচ্ছিলে কেন? এখানে আমরা ভালই ছিলাম তবে মাদল রোজ একটি করে চিঠি লিখে রাখছিল। চিঠিগুলি সব ডাকে দেওয়া হয়নি, জমিয়ে রেখেছি, এই নাও।' কথাগুলি বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে চেম্বারের দিকে যাচ্ছিল, শীলা ধীরে ধীরে তার পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

'তুমি যখন একটু সময় পাবে তখন আমাদের বিদেশ ভ্রমণের গল্প শুনো।' শীলার অবশ্য সন্দেহ ছিল হেমেন কোনদিন সময় পাবে না।

'নিশ্চয় নিশ্চয়', বলে হেমেন চেয়ারটা টেনে নিয়ে বই খুলে বসল। শীলা ফিরে যাচ্ছিল—আবার থেমে গিয়ে দরজার ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, হেমেনের দিকে চেয়ে বলল—

'বাদলের কলেজের কথা জানতেও কি তোমার সময় নেই?'

'আছে বৈকি।' হেমেন উত্তর দিল। চোখও বই থেকে ভাল করে তুলল না—শীলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমেন তার দিকে তাকাতে বাধ্য হ'ল কিন্তু শীলার মনে হ'ল সে যেন হেমেনের অতিরিক্ত সময় নষ্ট করেছে, সে দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ

জাতিকে তাঁহার শেষ দান—চিতাভস্ম

দুইজন মহান নেতা
আমেরিকার শহিদ রাষ্ট্রপতি কেনেডি ও পণ্ডিত নেহেরু

বুলগানিন ও খ্রুসচেভের সহিত ভারত-রুশ
মৈত্রী বন্ধন জোরালো করা হইতেছে

শেষ যাত্রা—শাস্তিঘাটের পথে

পণ

শ্রীবিমলজ্যোতি দাস

১
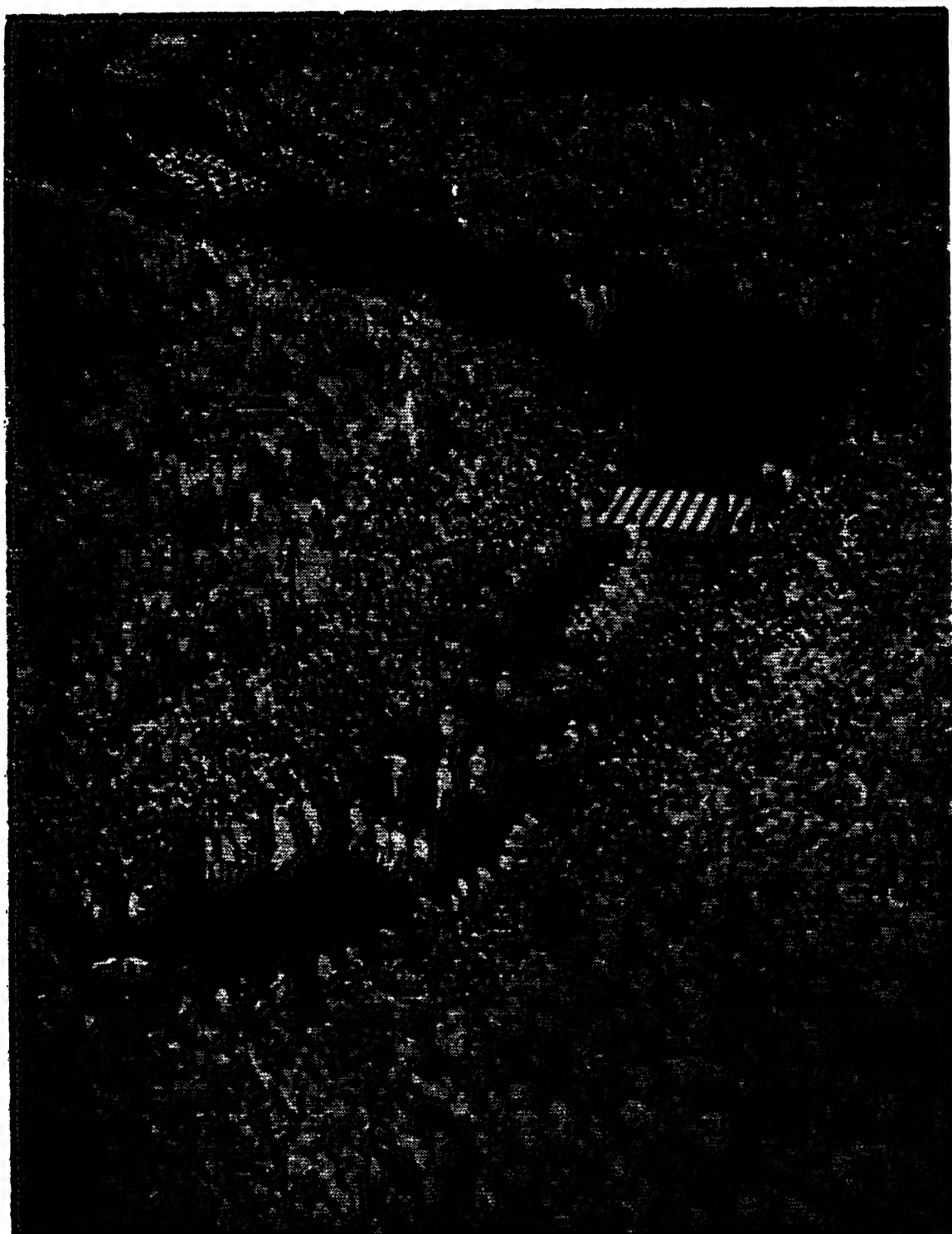
কোর্ট থেকে ফিরে তপনকুমার প্রাত্যাহিক নিয়মমত উপরে উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ সিঁড়ির পাশে অবস্থিত এক তলার বৈঠকখানার ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বর তার পিতা কালিদাসবাবুর। তিনি কিঞ্চিৎ পরুষকণ্ঠে বলছিলেন—না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। 'আজ নয় কাল' করে আপনি ছ'মাস কাটিয়ে দিলেন। বিয়ের রাত্রেই আপনার টাকা দেবার কথা। তা যখন দিলেন না, তখনই আমি বিয়ে বন্ধ করে দিতে পারতাম। কেবল একটা গণ্ডগোল হৈ চৈ হবে বলেই দিলাম না। এখন দেখছি তাই করাই উচিত ছিল। নেহাৎ আপনি একঘরে হয়ে পড়বেন বলেই আমি বিয়েটা হতে দিলাম। ভেবেছিলাম আপনি টাকাটা শীঘ্রই শোধ করে দেবেন। তা আপনার ত দেবার কোন গা-ই দেখছি না। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন না, আপনার লজ্জা করে না?

মিনিট দুই সব নিস্তব্ধ। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এল—আর কিছুদিন দয়া করে সবুর করুন বেহাই মশাই। টাকা আপনার আমি যেমন করে পারি শোধ দেব। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। যদি অন্য সব চেষ্টা বিফল হয়, ত শেষে বাড়ি-খানা বাঁধা রেখেই টাকার যোগাড় করব।

কণ্ঠ তপনের শ্বশুর উমেশবাবুর। শেষের দিকে তাঁর গলাটা যেন দুঃখে ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের তীব্র স্বর তপনের কানে এল—এখন বাড়ি বাঁধা-টাঁধা এ সব কথা বললে চলবে কেন? সে সব বিয়ের আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল। যদি পারবেনই না, তবে এখানে সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন কেন? তবু ত আমি অনেক খাতির করে মাত্র চার হাজার টাকা নগদে রাজি হয়েছিলাম। নইলে আমার ছেলের জন্য বারো চোদ্দ হাজার টাকা দেবার মত লোক ছিল।

দীনভাবে উমেশ উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই। তবে কি না বিয়ের সময় গহনার চার হাজার টাকার বেশী আর যোগাড় করে উঠতে পারলাম না। তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করছি না। যদি আর কিছু দিন দয়া করে—

কালিদাস ঝেঁকে উঠলেন—আর কিছু দিন, আর কিছু দিন ত করছেন। বলি, কতদিন সবুর করতে হবে? দশ বছর, না বিশ বছর? ভারি চার হাজার টাকার গহনা দিয়েছেন, তা আবার শোনান হচ্ছে। জানেন, উত্তর পাড়ার রেবতীবাবু ছ হাজার টাকা নগদ আর ছ হাজার টাকার গহনা দিতে চেয়েছিল? আমারই ভুল হয়েছিল আপনার ওখানে সম্বন্ধ করতে যাওয়া। তার ফল আজ ভোগ করছি।

কিন্তু ভুল তাঁর হয় নি। তিনি অবস্থাপন্ন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র তপন শিক্ষিত, চরিত্রবান্ ও সুপুরুষ বলে অনেকগুলি কন্যার পিতা তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দরিদ্র উমেশবাবুর কন্যা অপরাজিতা তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলে কালিদাস তাকেই বধূরূপে নির্বাচন করলেন। কিন্তু তাই বলে অপরাজিতার রূপের জ্যোতি তাঁর বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিতে পারে নি। সেইজন্য তিনি অনেক কষা মাজার

পর চার হাজার টাকার অলঙ্কার এবং চার হাজার টাকা নগদ, সর্বসাকুল্যে এই আট হাজার টাকার বিনিময়ে উমেশকে কন্যাদায়ের বৈতরণী পার করাতে রাজি হয়েছিলেন।

কন্যা আজীবন সুখে থাকবে এই আশায় উমেশ সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয়ে তপনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে যখন মনস্থ করলেন, তখন তাঁর পত্নী দেববালা আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—হ্যাঁ গা, এখানে যে সম্বন্ধ করছ, ছেলে ভাল এবং ঘর বড় বুঝলুম, কিন্তু আট হাজার টাকা তুমি যোগাড় করবে কি করে?

উত্তরে উমেশ বলেছিলেন—সে তুমি ভেবো না। গহনার চার হাজার টাকা আমার যোগাড় আছে, নগদ চার হাজার বিয়ের পর আস্তে আস্তে দেওয়া যাবে।

দেববালা কিন্তু এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারেন নি। ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন, বহু ক্ষেত্রে এই পণের টাকা নিয়ে দুই বৈবাহিকের মধ্যেকার মধুর সম্পর্ক দ্রুত তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং পিতার আর্থিক অক্ষমতার কৃষ্ণছায়া রাহুর মত কন্যার জীবনের সুখশশী গ্রাস করে ফেলেছে। তাই তিনি বারংবার স্বামীকে অনুনয় করেছিলেন, এর চেয়ে অল্প খরচে তাঁর ক্ষমতার মধ্যে একটি চলনসই পাত্র যোগাড় করতে। কিন্তু অদূরদর্শী উমেশ তা করেন নি। তিনি শেষ পর্যন্ত এই বিবাহই ঘটালেন। তপনের জীবন-সরোবরে অপরাজিতা নলিনীর মত ফুটে উঠল।

কিন্তু বিবাহ চুকে যাবার পর থেকেই পত্নীর পরামর্শের সারবত্তা উমেশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলেন। স্বার্থপর অর্থগৃধ্নু কালিদাসের ব্যবহার থেকে সৌজন্য বলে জিনিষটা কর্পূরের মত উবে গেল এবং তাঁর কঠোর ভাষা ও তীক্ষ্ণ পত্র তীরের মত উমেশের হৃদয়ে এসে বিঁধতে লাগল। অবশেষে তিনি স্থির করলেন যে বসতবাটি বিক্রয় করে অথবা বন্ধক রেখে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করে কালিদাসের ঋণ শোধ করবেন। সেই বিষয়ে কথাবার্তা ঠিক করে আজ তিনি বৈবাহিকের গৃহে এসেছেন কন্যাকে এই সংবাদ দেবার জন্য। বৃদ্ধ-পঞ্জরে কুসুমের মত যে গৃহে একদিন অপরাজিতার জন্ম হয়েছিল, সেই গৃহ যে আজ তারই অর্থ-পিশাচ শ্বশুরের জবরদস্তিতে হস্তান্তরিত হতে চলেছে, এই কথাটা আগে মেয়েকে জানিয়ে তবে উমেশ বন্ধক-নামায় স্বাক্ষর করবেন।

কিন্তু এসে অবধি সঙ্কোচবশতঃ মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা তিনি উত্থাপন করতে পারেন নি। এদিকে কালিদাসের উত্তপ্ত বাক্যের তাপে ঘরের আবাহাওয়া ক্রমশঃ এত গরম হয়ে উঠেছে যে, আর বসে থাকা অনুচিত ভেবে উমেশ মৃদুস্বরে বললেন—আচ্ছা, তাহলে আমি উঠি বেহাই মশাই। যাবার আগে মাকে একবার দয়া করে ডেকে দিন, একটা কথা বলে যাই।

শুনে কালিদাস সপ্তমসুরে জবাব দিলেন—আর কথা টথার দরকার নেই, আবার কথা কিসের? বৌমা এখন ব্যস্ত আছে, এখন দেখা টেখা হবে না।

ব্যথা ও নৈরাশ্য জড়িত স্বরে উমেশ বললেন—হবে না? আচ্ছা তাহলে আমি চলি। নমস্কার। ভগবান!—বলে ক্ষুব্ধচিত্তে জীর্ণ চটিজোড়া পায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি বেরিয়ে আসবেন বুঝতে পেরে তপন লঘু দ্রুতপদে সিঁড়ির মোড় ঘুরে দাঁড়াল, যাতে উমেশ তাকে দেখতে না পান। তিনি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল, এবং একটু পরে কালিদাসও উপরে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তিনি বা উমেশ কেউই জানতে পারলেন না যে, তপন নেপথ্যে দাঁড়িয়ে উভয় বৈবাহিকের মধ্যে এই ক্ষুদ্র করুণ-রসাত্মক খণ্ড-নাট্যের নীরব শ্রোতা হয়ে রইল।

(২)

উমেশের প্রতি কালিদাসের আজকের ব্যবহারে তপন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। পিতার চরিত্রে কোনও বিশেষ উদারতার পরিচয় সে পূর্বে কোনও দিন পায়নি বটে, কিন্তু তিনি যে এত সঙ্কীর্ণচেতা এটা সে ভাবতে পারেনি। যে লোভ এতদিন তাঁর হৃদয়-বিবরে লুক্কায়িত ছিল, তা আজ অকস্মাৎ বিষধর ভুজঙ্গের মত বেরিয়ে এসে এমন গরল ঢেলে দিল যে, তপনের

সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিল। বিবাহের রাত্রে উমেশ বাবু পণের টাকা দিতে না পারায় একটা গণ্ডগোল উঠেছিল বটে, কিন্তু তা মিটমাট হয়ে বিয়ে যখন হয়ে গেল, তখন তপন ভেবেছিল ব্যাপারটা বোধ হয় চুকে গেছে। কালিদাস যে গোপনে উমেশকে তাগাদারূপ অঙ্কুশের আঘাত করছেন তা সে জানত না। তাই আজ অর্থ-সামর্থ্যহীন নিরুপায় বৃদ্ধ উমেশের প্রতি নিজের পিতার নির্মম কটূক্তিগুলি তার মনকে বিষিয়ে তুলল। আজ একটা ভাল সংবাদ পিতাকে দেবার ছিল। বিবাহের কিছুদিন পূর্বে সে ওকালতি পাশ করে কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছিল। এতদিন আয়ের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নি। সম্প্রতি সে একটা বড় কেসে সহকারী উকিল নিযুক্ত হয়েছিল। বারোদিন ধরে মোকদ্দমার শুনানী হয়ে আজ শেষ হয়েছে। তার পক্ষের প্রধান উকিল প্রথম শুনানীর দিনই হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পাঠিয়ে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আজ পর্যন্ত কাজে আসেন নি। কাজেই বাধ্য হয়ে তপনকে এতবড় মামলা একাকী পরিচালনা করতে হয়েছে, এবং অদৃষ্টের জোরে সে আশাতীত ভালভাবে তা করেছে। আজ হাকিমের রায়ে তার পক্ষের জয় ঘোষিত হয়েছে। এতে সে সকলের কাছে প্রচুর অভিনন্দন এবং তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে মোটা পারিশ্রমিক লাভ করেছে। সকলেই বলেছে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—এই মামলায় কৃতকার্যতা তার উত্তর জীবনের সৌভাগ্যের অরুণোদয়।

এই সংবাদ পিতাকে দেবার জন্য আগ্রহভরে বাড়ি এসে সে এইমাত্র যা শুনল তাতে পিতার কাছে এ কথা গোপন রাখল এবং মনে মনে সঙ্কল্প করল তারই হস্তে কন্যাদান করে বিপদের সম্মুখীন শ্বশুর মহাশয়কে সে সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করবে। একটা পরিকল্পনাও সে চট্‌পট্ স্থির করে ফেলল এবং পত্নীর কাছে সকল কথা ব্যক্ত করল। পণের টাকা শোধ করতে পিতার অক্ষমতার দরুণ একটা নিদারুণ লজ্জা অপরাজিতা রুগ্ন শিশুর মত নিজ বক্ষের নিভৃতে ঢেকে রেখেছে, এটা সে জানত। তাই স্ত্রীকে সকল কথা খুলে বলে বাড়ির কারও কাছে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করল, এবং পরের রবিবার কালিদাসের কাছে 'কলকাতায় কাজ আছে' বলে বেরিয়ে একেবারে উমেশবাবুর গৃহে এসে উপস্থিত হল।

বিস্মিত উমেশকে দু কথায় আশ্বস্ত করে তপন একেবারে কাজের কথা পাড়ল। বলল—বাবা, আপনাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি। পণের চার হাজার টাকা আমি আপনাকে গোপনে দিয়ে যাব, আপনি নিয়ে গিয়ে আমার বাবাকে দেবেন। টাকাটা আমি আমার নিজের উপার্জন থেকে দেব, কাজেই এ সম্বন্ধে কারও কিছু বলবার নেই। আমার হাতে এখন দু হাজার টাকা আছে, এবং আমি সেটা নিয়েই এসেছি। আপনি এটা নিন, এবং দু-তিন দিনের মধ্যে গিয়ে আমার বাবাকে দিয়ে আসুন। আমার টাকা আমারই থাকবে, অথচ আপনি ঋণমুক্ত হবেন।—বলে পকেট থেকে টাকা বার করে উমেশের সামনে রাখল।

জামাতার মহানুভবতায় উমেশের চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু প্রথমেই তিনি টাকা নিলেন না। ইতস্ততঃ করে বললেন—আশীর্বাদ করচি তুমি চিরজীবী হও, বাবা! তোমার মত এমন মহত্ত্ব কজন দেখাতে পারে? কিন্তু এ টাকা আমি কেমন করে নেব বাবা? তাতে কি প্রতারণা করা হবে না?

—আজ্ঞে না। কেন প্রতারণা করা হবে? আমার টাকা আমি স্বেচ্ছায় সদুদ্দেশ্যে আপনাকে দিচ্ছি। আপনি ত চান নি। তাই প্রতারণার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমার বাবা এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারবেন না। টাকা আমার একাউন্টে ব্যাঙ্কে জমা ছিল, বাবা এর বিষয় জানেন না। আপনি রাজি হোন, বাবা। আপনার দুশ্চিন্তা আর অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। আপনি আমাকে চার হাজার টাকা দিলে আমি যত খুশি হতাম, আপনাকে ঋণমুক্ত ও প্রফুল্ল দেখলে তার থেকে ঢের ঢের বেশি খুশি হব।—বলে ব্যগ্রভাবে শ্বশুরের হাত দুটি চেপে ধরল।

আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধ উমেশ কেঁদে

ফেললেন। জামাতাকে বক্ষে ধারণ করে বললেন—জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাবা। তোমার মত এমন দেবতুল্য জামাই পেয়েছি, এ আমার পরম ভাগ্য।

এই ব্যবস্থামত কাজ হল। তপনের বদান্যতায় উমেশের পৈতৃক ভিটাখানি আসন্ন বন্ধকের প্রলয়গ্রাস থেকে অব্যাহতি পেল। দু দিন পরে উমেশ কালিদাসের বাড়ি গিয়ে দু হাজার টাকা দিলেন। কালিদাস জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ি বন্ধক দিয়েছেন?

উত্তরে উমেশ একটু সলজ্জ হেসে বললেন—আজ্ঞে না, আপাততঃ দিতে হল না। পাঁচ যায়গায় চেষ্টা করতে করতে যোগাড় হয়ে গেল আপনার আশীর্বাদে।—কালিদাস আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে টাকাগুলি গুনে পকেটস্থ করলেন। তিনি টাকাই চান। কি করে যোগাড় হল তা জানবার আগ্রহ তাঁর নেই। উমেশ বিদায় নেবার সময় তাঁকে বাকী দু হাজার শীঘ্র সংগ্রহ করবার তাগিদ দিতে কালিদাস ছাড়লেন না। 'যে আজ্ঞে' বলে উমেশ বেরিয়ে গেলেন।

এর মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যায় অবশিষ্ট দু হাজার টাকা নিয়ে উমেশ কালিদাসের বৈঠকখানায় পদার্পণ করলেন। টাকা সম্পূর্ণ শোধ হওয়াতে কালিদাসের লুপ্ত সৌজন্য হঠাৎ ফিরে এল। এই প্রথম তিনি দরিদ্র উমেশকে 'বৈবাহিক' বলে সম্বোধন করলেন এবং মিষ্ট কথা বললেন—তারপর বেহাই মশাই, বাড়ির খবর-টবর সব ভাল ত? বেয়ান ঠাকরুণ ভাল আছেন?

উমেশ পূর্বের মতই নম্রস্বরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহলে এবার উঠি?

ব্যস্তভাবে কালিদাস বললেন—সে কি, এখুনি যাবেন। বৌমাকে ডেকে দি, বৌমার সঙ্গে দুটো কথা করে যান।

বিনীতকণ্ঠে উমেশ বললেন—আজ্ঞে, আজ আর হয়ে উঠবে না। আজ অন্য জায়গায় একটা জরুরি কাজ আছে।

কালিদাস—ওঃ, আচ্ছা তবে আজ থাক। শিগগিরই আর এক দিন এসে দেখে যাবেন কিন্তু।

—যে আজ্ঞে।—বলে উমেশ ধীরপদে নিক্রান্ত হলেন।

উমেশ যে আজ আসবেন, এ কথা আগে থেকেই তপনের জানা ছিল। তিনি উপস্থিত হবার মিনিট পাঁচেক পরে সে-ও এসে প্রথম দিনের মত সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিল। উমেশ বিদায় নেবার পর আপনমনে খুব একচোট হেসে তপন সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে গেল এবং স্ত্রীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলল—জানো অপরাজিতা, আজ তোমার টাকা সম্পূর্ণ শোধ হল।

একটু পরে তাকে ছেড়ে দিতেই দেখল, অপরাজিতার দুই চক্ষু থেকে দুই বিন্দু অশ্রু শুভ্র কপালের উপর গড়িয়ে পড়েছে। কোমল কণ্ঠে বলল—এ কি, তুমি কাঁদছ?

নত হয়ে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে অপরাজিতা বলল—তুমি দেবতা, আশীর্বাদ কর যেন তোমার যোগ্য হতে পারি।

পত্নীর চিবুকে তর্জনী স্পর্শ করে তপন বলল—নিশ্চয়। প্রথমে মনে করেছিলাম তোমার বাবার প্রতিশ্রুতি তাঁর দারিদ্র্যের কাছে বুঝি বা পরাজিত হয়। তারপর দেখি, কার সাধ্য তাঁকে পরাজিত করে? কেন না, তাঁর কন্যা তুমি যে অ-পরাজিতা। তাই শেষ পর্যন্ত তোমাদের জয় হল।

প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্ত্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগীয় মন্ত্রী মোল্লা জালালুদ্দীন আহ্‌মেদ

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের অন্তর্গত বরফা গ্রামে ১৯২৩ সালে মোল্লা জালালুদ্দিন আহ্‌মেদ সাহেবের জন্ম। তাঁর স্বর্গত পিতা হাতেম মোল্লা সাহেব ছিলেন স্থানীয় জননেতা এবং সুদীর্ঘ বিশ বছরের —ও অধিককাল তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উদার মনোভাবাপন্ন হিসাবে তাঁর ছিল যথেষ্ট খ্যাতি। পিতৃচরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত জালাল সাহেব জনসেবা-মূলক রাজনীতি জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

গোপালগঞ্জ এম্. এন্. ইন্‌ষ্টিটিউশন থেকে ১৯৪১ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৩ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে এম. এ. এবং আইন পরীক্ষায় উপাধি প্রাপ্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অতঃপর তিনি ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগ দেন।

বাল্য জীবনে প্রিয় সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন তিনি আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে যিনি ছিলেন জালাল সাহেবের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথনির্দেশক। ১৯৪১ সালে মিঃ আমেদ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং এই বছরই তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা ছাত্র লীগের সভাপতি ও ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সংগঠন সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। Post-partition ছাত্র লীগের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত সংস্থার আহ্বায়ক ছিলেন স্বর্গত নাইমুদ্দীন আমেদ এবং মিঃ জালালুদ্দীন ছিলেন অফিস সেক্রেটারী। ১৯৪৯ সালে তিনি এই সংস্থার প্রথম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পরে অস্থায়ী সভাপতির পদ লাভ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং শুরু থেকেই তিনি কার্য্যকরী সমিতির একজন সদস্য।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান মুসলীম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও আয়ুব মন্ত্রীসভার প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ ওয়াহিদ-উজ্-জামানকে পরাজিত করে জালাল সাহেব জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন গোপালগঞ্জ-কোটালিপাড়া NE—99 কেন্দ্র থেকে।

কুখ্যাত পাক সরকার কর্ত্তৃক পাশবিক পীড়ন তাঁকে যথেষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এবং রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ করা হ'য়েছে। এতসব করেও সন্তুষ্ট হতে না পারায় পাক্-সরকার ১৯৪৮ সালে তাঁর এম. এ. ডিগ্রী বাতিল করে দেয়। ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগের প্রবল আন্দোলনকালে মিঃ আমেদ লীগের অন্যতম আহ্বায়ক হিসাবে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অপরাধে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তাঁর আঠারো মাস কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর জালাল সাহেব ১৯৬৯ সালে আয়ুব সরকারের পতন ও বঙ্গবন্ধু শেখ্ মুজিবর রহমানের কারামুক্তি সংক্রান্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তথাকথিত কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মিঃ জালালুদ্দীন আমেদ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে অনারারী কাউন্সেল হিসেবে দাঁড়ান।

১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডি গোল টেবিল বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং অতি যত্ন সহকারে উক্ত বৈঠকের জন্য মূল্যবান প্রতিবেদন রচনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত হিসাবে আরব রাষ্ট্রসমূহে সফর করেন। কায়রোতে অনুষ্ঠিত এ্যাফ্রো-এশিয় সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে যোগদান করে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

একজন চৌকশ ক্রীড়াবিদ্ জালাল সাহেব ছিলেন তাঁর কলেজের ক্রীড়া সম্পাদক।

মমতাময়ী স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্রকে নিয়ে জালাল সাহেবের সুখের সংসার।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ আব্দুল মালেক উকীল

১৯২৪ সালের ১লা অক্টোবর নোয়াখালি জেলায় রাজপুরে আব্দুল মালেক উকীলের জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর ১৯৫০ সালে এম. এ. পাঠক্রম শেষ করেন। পরের বছর ১৯৫১ সালে আইনের স্নাতক হয়ে ১৯৫২ সালে নোয়াখালি বার-এ যোগদেন এবং ১৯৬৪ সালে ঢাকা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট তালিকাভুক্ত হন।

পাক্-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রীহট্ট গণভোট, ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি কার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার অপরাধে প্রথমবার তিনি কারাবরণ করেন ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ। ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয়বার তিনি কারাবরণ করেন এবং ঐ জুন মাসে তাঁকে "পূর্ববঙ্গ জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স" বলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একটি ডিগ্রী কলেজ সহ কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

মিঃ আব্দুল মালেক উকীল শেখ্ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে বাংলাদেশের সব রকম প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত গোল টেবিলে বৈঠকেও তিনি যোগদান করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি মহকুমা আওয়ামী-লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত হন...নোয়াখালি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আওয়ামীলীগ কার্য্যকরী কমিটির সদস্য, যে পদে তিনি অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত। ১৯৬৯ সালে নয়জন সদস্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগপরিষদীয় বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন মিঃ উকীল। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সারা পাকিস্তান বৈঠকে' তাঁরই সভাপতিত্বে শেখ মুজিবুর রহমান কর্ত্তৃক ছয় দফা কর্ম্মসূচী ঘোষিত হয়।

নোয়াখালি জেলা যুক্ত-ফ্রন্ট আফিসের প্রধানরূপে তিনি ১৯৫৪ সালে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করেন। মিঃ মালেক ১৯৬৪ সালে সর্বসম্মতিক্রমে নোয়াখালি জেলা সংযুক্ত বিরোধী দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ সময়েই তিনি আয়ুব খানের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানে মিস ফতিমা জিন্নাহ্‌র পক্ষে নোয়াখালি জেলায় রেকর্ড সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করেন। কিছু কালের জন্য তিনি ত্রিশ জন সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান কমিটির "সদস্য ছিলেন এবং ১৯৭১ সালে নোয়াখালির পাঁচজন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেলা সংগ্রাম কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। তৎপূর্বে ১৯৬৮ সালে আয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত জেলা গণতান্ত্রিক কর্ম্মসমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে পুনরায় তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরই তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামীলীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালেও পূর্বোক্ত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয় এবং ঐ বছর 'সংযুক্ত বিরোধী মোর্চার নেতা ছিলেন তিনিই।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে 'জাতীয় পরিষদে' সদস্য নির্বাচিত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি ১৯৬৫-৬৯ সাল-এর জন্য কমনওয়েলথ পার্লিয়ামেন্টারী এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৯

সাল পর্য্যন্ত তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম কালে তিনি জনমত সংগঠন মানসে আওয়ামীলীগ পার্লিয়ামেন্টারী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে নেপাল পরিভ্রমণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি আগরতলা ও অন্যান্য স্থানে মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণ, অভ্যর্থনা শিবির, যুব শিবির, সেনা নিবাস প্রভৃতি সংগঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি নোয়াখালি জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে কর্ম্মরত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক গবেষণা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী

১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে বগুড়া জেলার জয়পুরহাট থানার অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ী গ্রামে ডঃ চৌধুরীর জন্ম। ১৯৭২ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

মেধাবী ছাত্র ডঃ চৌধুরী বগুড়া জিলা স্কুল থেকে স্টার মার্ক পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস্. সি. পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম্. এস্. সি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লেহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলিক গবেষণা কার্য্যের জন্য ১৯৪৯ সালে পি. এইচ্. ডি. উপাধি অর্জন করেন।

সর্বোৎকৃষ্ট গবেষণা কার্য্যের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিক ১৯৪৩ সালের 'কুপার' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন ডঃ চৌধুরী রাসায়নিক ইনষ্টিটিউট্ কর্তৃক এবং পরে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এ্যাকাডেমীর সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে বিশিষ্ট মার্কিন সংস্থা "Sigma" তাঁকে সভ্যপদ প্রদান করে। ১৯৪১ থেকে ৫৩ সাল পর্য্যন্ত ডঃ চৌধুরী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে সরকারী পদ পরিত্যাগ করে শিল্প ব্যবসার উদ্যোগ কার্য্যে ব্রতী হন এবং ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও বৃহৎ "Gest Engineering Factory.'

১৯৫৬ সালে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত সিয়াটো অর্থ-নৈতিক বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন ডঃ চৌধুরী এবং ১৯৬৩ সালে সিওলে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এসিয়ান প্রোডাক্টিভিটি সংস্থার অন্যতম প্রতিনিধিও ছিলেন তিনি।

ডাঃ মফিজ চৌধুরী তৎকালীন "PITAC" শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ, মানক সংস্থা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সারা বাংলা মুস্লিম ছাত্র সংঘের প্রথম কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রখ্যাত ছাত্র নেতা স্বর্গত আব্দুল ওয়াসেক্-এর নেতৃত্বে "হল্‌ওয়েল্ স্মৃতিস্তম্ভ" অপসারণ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি "শের-এ-বেঙ্গল" মিঃ এ. কে. ফজলুল হক্ এর সংস্পর্শে আসেন।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিচারপতি আবু সৈয়দ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংঘে যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছিল, ডাঃ চৌধুরী সেই দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সাহিত্যরসমণ্ডিত বেশ কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে কোরিয়ার কবিতা, বাত্যালয়, ঝড় ও সোনালী পাহাড় উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য পত্রিকা 'স্বদেশ'-এর প্রথম সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন ডঃ মফিজ চৌধুরী।

মিঃ আব্দুর রব সার্নেয়াবত ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার (ভূমি-রাজস্ব সমন্বিত) দপ্তরের মন্ত্রী

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত সরাইল গ্রামে বাংলা ১৩২১ সালে মিঃ আব্দুর রব জন্মগ্রহণ

করেন। স্থানীয় গৈলা উচ্চ ইংরজী বিত্তালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৪১ সালে স্নাতক হন। কলিকাতার রিপন কলেজে আইন পড়া শুরু করেন এবং ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিত্তালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি বরিশাল বারে যোগদান করেন।

১৯৫৭ সালে মিঃ আব্দুর রব ছিলেন "ন্যাপ"-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা 'গণতন্ত্রী দলের' সাধারণ সম্পাদক। সর্ব্ববিধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় সহযোগী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছে। ১৯৬২ সালে তিনি ছিলেন অন্তরীণ।

ছয় দফা কর্ম্মসূচীর অন্যতম প্রবক্তা মিঃ আব্দুর রব ১৯৬৮-৬৯ সালে আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছিল তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা।

মিঃ সার্নেয়াবত বরাবরই সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং বরিশাল জেলা জার্নালিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভাপতি। তদ্ভিন্ন বহু সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের টিকেটে তিনি বরিশালের গৌরনদী কেন্দ্র থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী

১৯৩১ সালে মিঃ এম্. আর. চৌধুরীর জন্ম। ইণ্টার-মিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়েছেন চাঁদপুরে এবং ১৯৫২ সালে ফেনী কলেজ থেকে স্নাতক হন। ফেনী কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর সাহেব পরে সমাজসেবীরূপে পরিচিতি পান।

১৯৫৯ সালে তিনি চাঁদপুর পৌর সংস্থার উপ-পৌর প্রধান নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সদস্য হিসাবে তিনি জাতীয় পরিষদে আসন লাভ করেন ১৯৬২ সালে। ১৯৬৪ সালে 'জন নিরাপত্তা আইন' বলে কারারুদ্ধ থাকা-কালীন পুনরায় তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হন।

১৯৬৬ সালে তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক এবং লীগের অন্যতম নেতা হিসাবে ঐতিহাসিক "ছয় দফা দাবী" আন্দোলন পরিচালনা করবার অপরাধে, জুন মাসে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৬৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে তিনি কারামুক্ত হন। সংযুক্ত বিরোধী দলের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন তিনি ১৯৪৮ সালে।

১৯৬৪ সাল থেকে আওয়ামী লীগের সংগঠন সম্পাদক মিজানুর সাহেব বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসাবে সীমান্তের অপর পার থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

কর্ণেল কে. এম্. সফিউল্লা, পি. এস্. সি বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সৈনাধ্যক্ষ

ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ গ্রামের স্বর্গত কাজী আব্দুল হামিদের দ্বিতীয় পুত্র কর্ণেল সফিউল্লা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৫ সালে। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে তিনি পাকিস্থান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন, ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান মিলিটারী এ্যাকাডেমী থেকে কমিশন প্রাপ্ত হন। সেনাবাহিনীতে থাকা কালীন প্রথম দু বছর তিনি ছিলেন ১৫নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টে এবং পরে তাঁকে বদলী করা হয় পূর্ববঙ্গ রেজিমেণ্টে।

১৯৫৭ সাল থেকে তিনি পূর্ববঙ্গ রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ানে সৈন্য ও স্টাফ্ কম্যান্ডাররূপে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদের কার্য্যভার পরিচালনা করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্য্যন্ত মিলিটারী সেক্রেটারিয়েট ব্রাঞ্চের রাওয়ালপিণ্ডি জেনারেল হেড্ কোয়ার্টারে স্টাফ্ অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৫ সালে কোয়েটার কম্যাণ্ড এ্যাণ্ড স্টাফ্ কলেজের স্নাতক উপাধি প্রাপ্তির পর, স্কুল অব্ ইনফ্যান্ট্রী এণ্ড ট্যাক্‌টিকস্-এর ট্যাকটিক্যাল উইংএর উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

ক্যাডেট জীবনে কর্ণেল সফিউল্লার প্রিয় খেলা মুষ্টিযুদ্ধ ও বন্দুক চালনা। তৎকালীন একাডেমীর তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মুষ্টিক এবং পাকিস্তান আর্মি রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনেও তাঁর ছিল দক্ষ বন্দুকবাজের স্বীকৃতি। যখন বর্বর পাক-বাহিনী ঢাকায় নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে, তিনি ছিলেন তখন ইষ্ট্ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ানের দ্বিতীয় কম্যাণ্ডার। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে উক্ত ব্যাটালিয়ান ঢাকার জয়দেবপুরে মোতায়েন ছিল এবং ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ৭১ পর্য্যন্ত কর্ণেল সফিউল্লা লড়াই করেছেন পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী নৌ সৈন্যাধক্ষ মিঃ নুরুল হক্

ঢাকা শহরে স্বর্গত আব্দুল খালেকের কনিষ্ঠ পুত্র নুরুল হক্ সাহেবের জন্ম ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা আর্মানীটোলা গভর্ণমেন্ট হাই-স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, আই, এস্. সি. পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫২ সালে। তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়ে তিনি পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে ভর্ত্তি হয়ে ১৯৫৩ সালের মে মাসে কোয়েটার জয়েন্ট সার্ভিসেস্ প্রিক্যাডেট্ ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন।

কোয়েটা এবং করাচির পাক নৌ-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে যুক্ত-রাজ্যের ডারট্মাউথস্থিত ব্রিটেনিয়া রয়্যাল নেভী কলেজে যোগদান করেন। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীতে সফল প্রশিক্ষণের পর ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে "মিড্শিপ্ম্যান"এর পদে উন্নীত করা হয়। বিমানবাহী রণপোত সীগ্ল এ 'মিড্শিপ্ম্যান' হিসেবে প্রশিক্ষণের পর, ১৯৬৮ সালে প্লাইমাউথের রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ থেকে স্নাতক হন।

১৯৬৪ সালের আগষ্ট মাস থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত তিনি রয়্যাল নেভীর পক্ষে যুক্ত ছিলেন প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রবিদ্যা, স্নাতক প্রশিক্ষণ ও সামুদ্রিক যন্ত্রবিদ্যা, বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে। প্রাক্তন পাক-নৌ-বহরের একজন লেফ্টেন্যান্ট্ হিসাবে জল ও স্থল উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উপর প্রভূত দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল। কম্যান্ডার নুরুল হক্ ছিলেন পাক্-নৌ-বহরের ডেষ্ট্রয়ার "সাজাহান" ও ডক্ ইয়ার্ডের ইঞ্জিনিয়ার অফিসার এবং নেভী ইঞ্জিনিয়ারীং কোর-এর উপদেষ্টা। ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি চট্টগ্রামে বেস্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসার এবং টহলদারী নৌ-বহরেরও স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার-এর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তাঁকে নৌবহরের একমাত্র "ক্রুজার" পি. এন্. এস্. "বাবর"-এর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অফিসার এবং পরে করাচীর ন্যেভেল হেডকোয়ার্টারে স্টাফ্ অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়। প্রচুর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি একখানি ক্ষুদ্র মৎস্য-ধরা নৌকায় সপরিবারে সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিমানাধ্যক্ষ মিঃ আব্দুল করিম খোন্দকার

বাংলাদেশে যুদ্ধরত বাহিনীর অভিজ্ঞতম অফিসার খোন্দকার সাহেব জন্মগ্রহণ করেন রংপুরে ১৯৩৫ সালে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবস্থায় ১৯৫১ সালে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন।

পাক্ বিমান বহরের সবকটি উড্ডিয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি উপদেষ্টা হিসাবে কার্যপরিচালনা করেছেন এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল পাক্-বিমান বহরের বৃহত্তম "জেট্ ফাইটার ট্রেনিং স্কোয়াড্রনের" কম্যান্ডার-এর পদাধিকারী ছিলেন। প্রতিকূল আবাহাওয়ায় জেট্ বিমান উড্ডিয়নকালে পাইলটদের কম্যাণ্ড পরীক্ষক ছিলেন তিনি।

পাকিস্তান স্টাফ্ কলেজের স্নাতক কমোডোর খোন্দকার ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাক-বিমান বহরের প্ল্যানিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানস্থিত পাক্-বিমান বহরের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় কম্যানডার। মুজিবনগর স্থিত বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে "আক্রমণ ও প্রশিক্ষণ" কার্য্যের দায়িত্ব ছিল তাঁর। এতদ্ভিন্ন মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীও গঠন করেন তিনি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কন্‌স্টিট্যুএন্ট্ এ্যাসেম্বলীর স্পীকার—মিঃ মহম্মদ উল্লা

নোয়াখালি জেলার রায়পুর থানায় অন্তর্গত সইচা গ্রামে ১৯২১ সালে জন্ম। ঐ জেলার লক্ষ্মীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ তিনি স্নাতক হন ১৯৪৩ সালে তিনি আইনের উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯৫১ সালে তিনি আওয়ামী লীগ-এ যোগ দেন এবং ১৯৫২ সাল থেকে ভূতপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তান (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদকের পদাধিকারী ছিলেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ঢাকা জেলা বারে যোগদান করেন এবং হাইকোর্টে যোগ দেন ১৯৬৩ সালে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নোয়াখালির রায়পুর-লক্ষ্মীপুর কেন্দ্র থেকে তিনি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হতে তিনি উহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং মে মাসের প্রথমদিকে তিনি ফরিদপুর এবং যশোহরের মধ্য দিয়ে মুজিব নগরে আসতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি তৎকালীন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরামর্শদাতা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদকের কঠিন দায়ীত্ব সঠিকভাবে পালন করেন।

বাংলাদেশের বিবিধ মিশন সদস্যস্বরূপ মিঃ মহম্মদ উল্লা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সফর করেন এবং পাক্ জঙ্গী শাহীর পতনের পর ১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তিন পুত্র ও দুই কন্যার জনক মহম্মদ উল্লা সাহেবের অবসর বিনোদনের প্রিয় পন্থা কবিগুরু বা নজরুলের কবিতা আবৃত্তি অথবা দাবা খেলা।

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

সুবিমল সিংহ

(১)

"মানুষ শস্ত্র-কার জীব (Man is a tool-making animal)"—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

মানুষের ক্রম-বিকাশে "শ্রম"এর ভূমিকা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে "শ্রম হইতে মানুষের উদ্ভব (Labour created man himself)," এঙ্গেলস-এর এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইলে "শ্রম" শব্দটিকে আমাদের গৃহীত অর্থশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অপেক্ষা একটু ব্যাপকতর অর্থে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে "শ্রম"-এর অর্থকে "জীবন ধারণার্থে অথবা উন্নততর জীবন যাপনার্থে পূর্ব্বকল্পিত সচেতন এবং সার্থক প্রয়াস" এর মধ্যে সীমিত রাখিলে চলিবে না। "চেতনা" এবং "কল্পনা-শক্তির বিকাশের পূর্ব্বাবস্থায় অর্দ্ধচেতন অথবা অব-চেতন, এমন কি সহজাত বৃত্তি এবং অতি প্রাথমিক পর্য্যায়ের সচেতন বুদ্ধির মাঝখানে ভেদ-রেখা টানা প্রায় অসম্ভব।

আবার "শ্রম"কে বেশী ব্যাপক অর্থে দেখিলেও চলিবে না। কারণ "শ্রম" অর্থে যদি আমরা শুধু বাঁচিয়া থাকার প্রয়াস মাত্র ধরিয়া লই, তাহা হইলে শ্রম হইতে একমাত্র মানুষেরই নয়, সমস্ত প্রাণীরই উদ্ভব। কারণ, আমরা জানি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের মানাইয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকার সহজাত বৃত্তি সুলভ প্রয়াস হইতেই বিভিন্ন প্রাণীর উদ্ভব, অর্থাৎ আদিতে একই প্রাণীর বিভিন্ন প্রাণীতে রূপান্তর।

তেমনি এক্ষেত্রে "মানুষ" কথাটিকেও আমাদের গৃহীত সংজ্ঞানুযায়ী "শস্ত্রকার জীব (tool-making animal)", এই অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না একটু ব্যাপক অর্থে দেখিতে হইবে।

আদি মানুষের অস্ত্র বলিতে আমরা সাধারণতঃ "প্রস্তরাস্ত্র"ই বুঝিয়া থাকি। এবং নৃ-তাত্ত্বিকেরাও মানুষের ক্রম-বিকাশের গবেষণায় বিশেষভাবেপ্রস্তরাস্ত্রের উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হ'ন। কারণ, আদিমানুষের অস্ত্রাদির মধ্যে একমাত্র প্রস্তরাস্ত্রই কালজয়ী সাক্ষ্যরূপে মূক ভাষায় মানুষের অতীত ইতিহাস একটু আধটু বলিতে চেষ্টা করে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত, বিভিন্ন কালে ব্যবহৃত, প্রস্তরাস্ত্রের নির্ম্মাণ কৌশল-এর ক্রমবিকাশ অনুযায়ী মানুষের লক্ষ লক্ষ বৎসরের অতীতকে আদি-প্রস্তর (Palaeo-lithic), মধ্য-প্রস্তর (Meso-lithic), নব্য-প্রস্তর (Neo-lithic) ইত্যাদি যুগে ভাগ করা হইয়া থাকে। আবার প্রস্তরাস্ত্র নির্ম্মাণের বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধারা হইতে বিভিন্ন কৃষ্টি (culture), তাহাদের প্রসার, অথবা সমন্বয়, এবং ক্রম-বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। অতএব নৃ-বিজ্ঞানীরা অতি আদিম স্তরের মনুষ্য-রূপী প্রাণীদের ভূগর্ভে প্রোথিত জীবাশ্মের (fossil) সান্নিধ্যে কোন তীক্ষ্ণাগ্রিত প্রস্তরের সন্ধান পাইলে, তাহা কৃত্রিম ভাবে অস্ত্ররূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, অথবা কোন নৈসর্গিক কারণেই তীক্ষ্ণাগ্রিত হইয়াছিল, এই প্রশ্নের মীমাংসায় গলদঘর্ম হইয়া থাকেন। কারণ এই মীমাংসার উপরই ঐ সব প্রাণীকে "শস্ত্রকার জীব"-এর পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় কি না তাহা নির্ভর করে।

কিন্তু প্রস্তরাস্ত্রের পাশাপাশি, কিম্বা অনেক পূর্ব্বাবধিই, মনুষ্যরূপী প্রাণীরা বৃক্ষশাখাদি প্রকৃতিতে

সহজলভ্য বিচিত্র ধরণের নশ্বর বস্তুকে অস্ত্ররূপে সমধিক ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এরূপ অনুমান অবশ্যই অলীক নহে। যদিও ঐ সব অনিত্য বস্তু কালের চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। যেমন দেখিয়াছি যে অতি প্রাথমিক স্তরের বুদ্ধি বিকাশ ঘটিলেই একটি বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখার আঘাতে হস্তের অনধিগম্য ফলও হস্তগত করা যায়। আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই বৃক্ষশাখাটিই আদি মানুষের প্রথম অস্ত্র। কারণ আদিতে মনুষ্য-রূপী প্রাণীরা ফল-মূলহারী ছিলেন এবং বৃক্ষই তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ছিল। একটি বৃক্ষশাখাকে আন্দোলিত করিলে যেমন লক্ষ্য করা যায় যে তৎসংশ্লিষ্ট সুপক্ক ফল ভূপাতিত হইতেছে, তেমনি প্রতিক্রম হস্ত দ্বারা একটি বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখা ক্রীড়াচ্ছলে ইতস্ততঃ সঞ্চালনের ফলে দৈবাৎ আহত হতভাগ্য অপরিণত ফলের ভূ-লুণ্ঠনও লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখারূপ যষ্টির সঞ্চালনের ফলে অপরিপক্ক ফলের উপর ইহার আঘাত, এবং সেই আঘাতের ফলে বৃক্ষশাখারূপ অবলম্বন হইতে ইহার বিচ্যুতি, এই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগী ন্যূনতম বুদ্ধির বিকাশ না ঘটিলে কোনরূপ কৃত্রিম অস্ত্র ব্যবহারই সম্ভব নয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে এই বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখাটিকে "কৃত্রিম" অস্ত্র বলা যায় কি না। কারণ ইহা ত প্রকৃতিতে সহজলভ্য। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মহাভারতের ভীমসেনের কথা মনে পড়ে। তিনি বড় একটা অস্ত্রাদির তোয়াক্কা করিতেন না। প্রহরণের প্রয়োজন হইলে এবং গত্যন্তর না দেখিলে একটা শালবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া ইহাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে ভীমসেনের অখণ্ড শালবৃক্ষ অথবা তাঁহার অপেক্ষাকৃত কমজোর প্রপিতামহদের বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখা কোনটাই অকৃত্রিম নহে। অস্ত্ররূপে ব্যবহার্য্য শালবৃক্ষকে ভূমি হইতে উৎপাটিত করিতে হয়, বৃক্ষশাখাকে বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। ইহা অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞানুসারে "উৎপাদন"-এর পর্য্যায়ে পড়ে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লব্ধ বস্তুকে মানুষের প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তরিত অথবা বিকৃত অর্থাৎ অন্যথাকৃত করাকে অর্থশাস্ত্রে "উৎপাদন" আখ্যা দেওয়া হয়। তবে ঝড়-ঝঞ্চাদি নৈসর্গিক উৎপাতে, মত্ত হস্তীর "হস্তে", অথবা যুধ্যমান মহিষ-গণ্ডারাদি বৃহৎকায় প্রাণীর সংঘাতে বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে, বৃক্ষশাখা ভাঙিতে পারে, এবং অতঃপর ইহারা সেইরূপ "বিকৃত" অবস্থায় মানুষের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে ইহাদিগকে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত অর্থাৎ "অকৃত্রিম"ই বলা যায়।

অতএব আদিতে যেমন সহজাত বৃত্তি এবং অতি প্রাথমিক স্তরের সচেতন বুদ্ধির, অথবা নিরস্ত্র জীবন সংগ্রাম এবং সশস্ত্র জীবন সংগ্রামের, পার্থক্য অতি ক্ষীণ, তেমনি প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার এবং ঐ সব বস্তুকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তরিত অথবা বিকৃত করিয়া অস্ত্ররূপে ব্যবহার, এই দুই-এর পার্থক্যও অতীব ক্ষীণ। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ ব্যাপার এই যে অন্যান্য প্রাণী অস্ত্রের নির্ম্মাণ কৌশল না জানিলেও তাঁহাদের অনেকেই অস্ত্রের ব্যবহার কৌশল জানেন। অর্থাৎ মানুষকে "অস্ত্রকার" জীব না বলিয়া যদি "অস্ত্র-ব্যবহর্ত্তা" জীব বলিতে যাই তবে তদ্দ্বারা অন্যান্য প্রাণী হইতে মানুষকে বিশেষায়িত করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক প্রাণীই মানুষকে অনেকদূর অতিক্রম করিয়া যান। এবং প্রকৃতিতে সহজলভ্য বস্তুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের প্রশ্ন হইলে তাঁহাদের কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিতে হয়। কারণ তাঁহাদের অস্ত্রাবলীকে "সহজলভ্য" বলিলে কিছুই বলা হয় না। ইহারা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই "সহজ" অর্থাৎ সহজাত, অথবা প্রকৃতিদত্ত। সিংহ-ব্যাঘ্রাদির তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত, হস্তী-বরাহাদির দীর্ঘ যুগল দন্ত, মেষ বৃষ-মহিষ গণ্ডারাদি জন্তুর অথবা কোন কোন মৎস্যের (যথা "শৃঙ্গী" ওরফে "শিঙ্গী" মাছ-এর) শৃঙ্গ, পক্ষীর চঞ্চু এবং নখর, সর্পের বিষদন্ত, মধুমক্ষিকার হুল, মশক মৎকুণাদি বিচিত্র কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধরণের দংশনাস্ত্র

অথবা বেধনাস্ত্র, ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি যেন গোটা প্রাণী জগৎটাকেই রণসাজে সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। এমন কি উদ্ভিদেরও কণ্টকাদি বিভিন্ন রকমের "অস্ত্র" দেখা যায়, যদিও ইহারা আক্রমণাত্মক (offensive) নহে, আত্মরক্ষামূলক (defensive)। এবং তাহা আক্ষরিক অর্থেই; শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী আধুনিক মানব গোষ্ঠীর পারমাণবিক অস্ত্র যে অর্থে আত্মরক্ষামূলক, সেই অর্থে নহে।

আদিতে প্রকৃতিতে সহজলভ্য বস্তুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার এবং কৃত্রিম অস্ত্রের ব্যবহার, এই দুই-এর পার্থক্য যদি এত ক্ষীণ হয় এবং স্বাভাবিক অস্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ অপেক্ষা অন্যান্য প্রাণী যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তবে তাহাদের উপর মানুষের আধিপত্যের মূল কোথায়? মানুষের প্রাধান্যের মূল এই যে অন্যান্য প্রাণীর অস্ত্র সম্পূর্ণরূপেই অস্ত্রাধিকারীর অঙ্গীভূত প্রত্যঙ্গমাত্র, মানুষের অস্ত্র তাহার অঙ্গ-বহির্ভূত "প্রত্যঙ্গ", অর্থাৎ উপকরণ। অঙ্গের বহির্ভূত বস্তুকে সচেতন ভাবে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের এই শক্তিতেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছে। অঙ্গীভূত অস্ত্র এবং অঙ্গ-বহির্ভূত অস্ত্র এই দুই-এর পার্থক্য কতকটা প্রতীয়মান হইতে পারে যদি আমরা রামায়ণে বর্ণিত শ্যেনরাজ জটায়ুর সহিত সীতাপহারী রাবণের সংঘর্ষের কথা স্মরণ করি। পক্ষ-চঞ্চু-নখরাঘাতে চূর্ণিতরথ কর্ত্তিত-মাংস ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত-প্রায় বিংশ-বাহু দশানন অবশেষে কোনক্রমে একটি হস্তে ধৃত অসির দ্বারা শ্যেনরাজের পক্ষ এবং নখর ছেদন পূর্ব্বক সে যাত্রা রক্ষা পান। এই অসিটি না থাকিলে রামায়ণের ব্যাপারটা সম্ভবতঃ বেশীদূর গড়াইত না। কিন্তু অসি তথা ধাতব অস্ত্রের আবির্ভাব মাত্র সেদিনকার ঘটনা; বড়জোর তিন চার হাজার বৎসর আগেকার হইবে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তিন চার লক্ষ বৎসর অথবা ততোধিক আগেকারও হইতে পারে।

দেহান্তর্গত অস্ত্রের (corporeal weapons) এবং দেহ-বহির্ভূত অস্ত্রের (extra-corporeal weapons) মৌলিক পার্থক্য এই যে প্রথমোক্তটি অস্ত্রাধিকারীর দেহের সহিত অবিচ্ছেদ্য বিধায় ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্রও সম্পূর্ণ ভাবে সীমাবদ্ধ, অপরটির তাহা নহে। দেহান্তর্গত অস্ত্র অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ইহার অভিযোজন (adaptation) অসম্ভব। পক্ষান্তরে দেহাতিরিক্ত অস্ত্র বহুরূপী, অর্থাৎ অবস্থাভেদে যে কোন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। আদি মানুষ প্রকৃতিতে সহজলভ্য বিভিন্ন বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থায়, অথবা তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ এবং সাধ্যানুরূপ রূপান্তরিত অথবা বিকৃত করিয়া অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে ত পারিতেনই; উপরন্তু মৃত-সিংহ ব্যাঘ্রাদির তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত, পক্ষীর চঞ্চু অথবা নখর, হস্তী-বরাহাদির দীর্ঘ দন্ত, মেষ বৃষ-মহিষাদির শৃঙ্গ ইত্যাদি প্রাণী জগতের যাবতীয় প্রকৃতিদত্ত আয়ুধও ইচ্ছামত পরিগ্রহ করিতে পারিতেন।

আমরা "tool making" কথাটিকে "শস্ত্রকার" বলিয়াছি, "যন্ত্রকার" বলি নাই। কারণ আদি মানুষের জীবনে দেহ বহির্ভূত "অস্ত্র" এবং "যন্ত্রের" পার্থক্য বিধান দুরূহ। বৃক্ষ-শাখারূপ যষ্টি দ্বারা ফল পাড়িলে তাহা "যন্ত্র", সাপ মারিলে তাহা "অস্ত্র"। আবার প্রাণী জগতেও যেমন সহজাত অথবা প্রকৃতিজ "অস্ত্র" আছে, তেমনই "যন্ত্র"ও আছে। অনেক ক্ষেত্রে একই প্রত্যঙ্গ দ্ব্যর্থ-সাধক, অর্থাৎ অস্ত্র এবং যন্ত্র এই উভয়ের উদ্দেশ্যই সাধন করে। পশু পক্ষীর দন্ত নখর চঞ্চু ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ কখনও বা অস্ত্রবৎ কখনও বা যন্ত্রবৎ হনন বেধন ছেদন কর্ত্তন চর্ব্বণ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে। মশকের অতি সূক্ষ্ম সূচি-সদৃশ শোণিত-শোষক বেধনিকাটি শল্য-চিকিৎসকের (Surgeon), "সীরিঞ্জ" (Syringe) তুল্য একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র-বিশেষ। আমাদের প্রতিবেশী মূষিকের দন্তের মতই মেরুবৃত্ত সমীপস্থ হিম অঞ্চল নিবাসী বাঁধ এবং বিবরাবাস নির্ম্মাণ-কুশল মহা-মূল্য-পশম-কঞ্চুক বীবর (beaver) নামা উভচর প্রাণীটির দন্তও একটি কোদালীবৎ খননাস্ত্র বিশেষ। তেমনি পক্ষীর পক্ষ, মীনের পুচ্ছ, মৃগাদির চরণ প্রকৃতপক্ষে

উড্ডয়ন সন্তরণ ধাবন, অর্থাৎ ব্যোম জল অথবা স্থল পথে "পরিবহন" যন্ত্র বিশেষ। জীবজগতের এইসব দেহান্তর্গত প্রত্যঙ্গের কৃতিত্ব বিস্ময়কর হইলেও ইহারা আসলে সমগ্র বহুর্থ-সাধক (multipurpose) দেহ-যন্ত্রটির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক যন্ত্রাংশ মাত্র। পক্ষান্তরে মানুষের দেহ-বহির্ভূত প্রত্যঙ্গগুলি (extra-corporeal implements) স্বাভাবিক জৈব প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনেও সমর্থ।

অন্যান্য প্রাণীর দেহান্তর্গত সহজাত অথবা প্রকৃতিজ, আদি মানুষের দেহ-বহির্ভূত স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম, এমন কি স্বজাতির উপর প্রযোজ্য মারণাস্ত্র বাদ দিলে আধুনিক মানুষেরও যাবতীয় উন্নত এবং কৃত্রিম, "অস্ত্র" এবং "যন্ত্রের" মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের মূল উদ্দেশ্য একই। তাহা হইল জীবন ধারণে অথবা উন্নততর জীবন যাপনে সহায়তা। অন্যান্য প্রাণীর অস্ত্র অথবা যন্ত্র তাহাদের প্রত্যঙ্গীভূত বলিয়া, এবং ফলে ইহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত বলিয়া, ইহারা বড়-জোর জীবন ধারণেরই সহায়ক। এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অভিযোজিত (adapted) না হইলে সেই সহায়তাও অপ্রতুল। কিন্তু মানুষের দেহাতিরিক্ত "অস্ত্র" অথবা "যন্ত্র" শুধু জীবন ধারণেই, অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতেই, সহায়ক নহে। সেই প্রয়োজন মিটাইয়া উন্নততর জীবন যাপনেও সহায়ক।

আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে "অস্ত্র" এবং "যন্ত্র" সমার্থবোধক হইলেও একথা উল্লেখ্য যে ইংরাজী "tool" অথবা "implement" শব্দের প্রকৃত অভিধেয় "অস্ত্র"ও নহে, "যন্ত্র"ও নহে, "হাতিয়ার" হইলেও হইতে পারে। হস্তে ধৃত যে বস্তু দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করা হয় তাহাকেই "tool", "implement", অথবা "হাতিয়ার" বলা যায়। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন "tool" শব্দ দ্বারা এবং পরবর্ত্তী কালে কার্ল মার্কস "শ্রমসাধক যন্ত্রাদি (instruments of labour)" দ্বারা এই "হাতিয়ার" অথবা "যন্ত্রপাতি"ই বুঝাইয়াছেন। হাতিয়ার-এর মর্ম এই যে ইহা হাতের জোরকে অনেকখানি বাড়াইয়া দেয়। প্রসঙ্গতঃ শিশুপাঠ্য পুস্তকের "যাঁতা (যন্ত্র) ঘোরে হাতের জোরে" এই ছড়াটি এবং তৎসংলগ্ন চিত্রটি স্মরণীয়। ইহাতে হাতের জোর এবং হাতিয়ার এই দুই-এর সম্পর্ক সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। হাতের জোর ব্যতীত হাতিয়ার অচল, হাতিয়ার-বিহীন হাতের জোর অপ্রতুল। কার্ল মার্কস-এর মতে হাতের জোর এবং হাতিয়ার এই দুই এর মালিকানা যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তখনই সমাজে শ্রম-সর্ব্বস্ব (proletariate) "শ্রমিক" এবং ধন-সর্ব্বস্ব (capitalist) "মালিক" এই দুইটি প্রতিপক্ষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু সে অনেক পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। আপাততঃ আমরা আদি মানুষের কথা ভাবিতেছি।

রামমোহন
(দ্বি-শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য)

শান্তশীল দাশ

সে দিন কী অন্ধকার এ প্রাচীর বুকে ;
নানা কুসংস্কারে ঘেরা স্থবির জীবন ;
চলে না, আবদ্ধ সদা কূপের ভিতর;
গতিহীন সে-জীবন যেন কারাগার ।

সেই অন্ধ কারাগার ভেঙে দিয়ে তুমি
নিয়ে এলে কী আলোক ! হে রামমোহন,
(সর্ব সংস্কার মুক্ত প্রসন্ন উদার)
ও বিদ্রোহী করস্পর্শে হল অপগত
সুদীর্ঘ দিনের যত গ্লানির কালিমা ;
নিমেষে নিঃশেষ হল আবর্জনা রাশি ।

পঙ্কিল পল্বল মাঝে নবজীবনের
স্রোতোধারা এনে দিলে—সে কথা স্মরণ
করে জাগে কী বিস্ময় ! মহাশক্তিমান্
যুগন্ধর হে মানব, তোমায় প্রণাম ।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মদোদ্ধত মধুঋতু সাথে নহে তুলনা তোমার ।
স্তব্ধ হয় অর্ধপথে ফাল্গুনের ফুলের জোয়ার—
সহস্র কুসুমশোভা সর্ব অঙ্গে নিয়ে আসো তুমি
যবে মোর পাশে । রক্তকুরুবক তব পদ চুমি'
পরিহরি' রূপগর্ব নতশিরে মাগে পরাজয় ;
প্রগলভ প্রলাপ ত্যজি' গোলাপ কাতরে কেঁদে কয়
"ধন্য তুমি !" স্ফুটাম্বুজ শরতের স্বর্ণাভ সুষমা,—
তারো সাথে মায়াবিনী, নহে কভু তোমার উপমা ।

লাস্যময়ী বরষার মতো অয়ি নর্মনৃত্যপরা,
তুমি চিরহাস্যময়ী ললিত উচ্ছল কলস্বরা
কেলিকলাবিলাসিনী । লীলায়িত পুলক-প্রবাহ,
তাই দিয়ে সহনীয় করিয়াছ অস্তিত্বের দাহ
দুর্বিষহ । সুশীতল ধারা-নীরে পরিসিক্ত করি',
তুলিয়াছ উজ্জীবিয়া ম্রিয়মাণ এ চিত্ত-বল্লরী ।

ডাক ও সাড়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমাকে জানি না, দেখিনি নয়নে,
তবুও চেয়েছি শরণ চরণে।
বেয়েছি তরণী বরিয়া আঁধারে
তোমারি তারকা অকূল পাথারে।
উঠেছি চমকি' নিশীথে বেদনে—
গাহিলে প্রভাতী মুরলী স্বননে :

"কহিলি কেমনে : 'তোমাকে জানি নি ?—
গানে যে গেয়েছে আমারি রাগিণী।
ভালো যে বেসেছে সোনালি হরষে
পুলকে উছসে আমার পরশে।
আমারি প্রসাদে প্রণয়-চুমনে
অধরা-দুরাশা জাগে যে চেতনে।

"আমারি লালিমা অরুণে উছলে,
আমারি সুষমা বিছালো কমলে।
ধরণী শিহরে আমারি মলয়ে,
নীলিমা উজলে আমারি অভয়ে।
আমারি করুণা—জাগরে স্বপনে,
বিরহে মিলনে জীবনে মরণে।"

———

অকাল ফাল্গুন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দোল এলো, আমাদের অকাল ফাল্গুন,
রাঙিল না কুঞ্জবন দাড়িম্বে পলাশে,
দুলিল না এ হৃদয়, বসন্ত-বাতাসে,
শূন্য হয়ে গেছে আজ অনঙ্গের তূণ।

দূর হতে তবু শুনি কোকিলের গান,
কি যেন হারিয়ে গেছে ফিরিবে না আর,
ফুলগন্ধ ভেসে আসে, আনে স্মৃতিভার,
—কত হাসি, কত অশ্রু, মান অভিমান।

প্রাণ ভরে কে ছড়াবে আবীর কুঙ্কুম,
রক্তে রক্তে কোথা সেই পুলক-উচ্ছ্বাস ?
বিবশ, বিবর্ণ মন বিষন্ন উদাস,
চোখে নাই সেই নেশা, ওষ্ঠে নাহি চুম্।
আঁখি-আগে নাহি ভাসে নিত্যবৃন্দাবন,
দেখেছিনু একদিন অলীক স্বপন।

একুশ শতকের পৃথিবী

শ্রীসন্তোষ কুমার দে

জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে কত পরিবর্তন আসছে, পুরাতনের স্থান নতুন অধিকার করছে। অনাগত দিনে যে পরিবর্তন আসবে সে কি-রূপ নিয়ে আসবে, তা আমরা সাধারণ মানুষ জানতে পারি নে; কারণ জানবার মত মনীষা ও দিব্য দৃষ্টি আমাদের নেই। ২০ শতকে যে সব অত্যাশ্চর্য ও চমকপ্রদ আবিষ্কার হয়েছে, যে সব যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে, যে সব অজানাকে জানা গেছে, যে সব অধরা ধরা দিয়েছে; ১৯ শতকের লোক তার কল্পনাও করতে পারে নি, বা কল্পনা করবার চেষ্টাও করে নি। কিন্তু আজ ২০ শতকের লোক আগামী ২১ শতকে যে সব ঘটনা ঘটতে পারে, যেসব নতুন আবিষ্কার মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে, তার কল্পনা করবার, হদিস পাবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের এইসব ভবিষ্যদ্বাণী ষোল আনা সফল হয়ত নাও হতে পারে, তবু তার একটা রূপরেখা তাঁরা স্থির করেছেন। একুশ শতকে, অর্থাৎ ২০০০ থেকে ২০৯৯ সালে পৃথিবীর অবস্থা কিরকম হবে, মানুষের সুখ-দুঃখ, আরাম ঐশ্বর্য কতটা বাড়বে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ কতটা ভেল্কি দেখাবে, এখন থেকেই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, অর্থ-নীতি-ও রাজনীতিবিদ্ এবং সমাজ-তাত্ত্বিকেরা তার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার কিছুটা আভাষ এখানে দেওয়া হচ্ছে। এইসব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরা আমাদের দেশের দৈবজ্ঞের মত ভৃগু-সংহিতার সঙ্গে মিলিয়ে বা গ্রহনক্ষত্র বিচার করে করেন নি। এই শতকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা কোন্ পথে চলেছে, তার পরিণতি কি হতে পারে, তাই বিবেচনা করে, বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে করেছেন; অর্থাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো হল তথ্য-ভিত্তিক।

তাঁরা একুশ শতকে ঘটবে বলে যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৬৫ সালে করেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো এই শতকেই ঘটে গিয়েছে। এ-গুলির ইঙ্গিত তাঁরা কিছু কিছু পেয়েছিলেন; কিন্তু এত শীগগির যে এগুলো সাফল্যমণ্ডিত হবে তা ভাবতে পারেন নি। দু'একটির নাম এখানে করা যেতে পারে।

(১) তাঁরা বলেছিলেন কৃত্রিম প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য একুশ শতকে বার হবে। এরকম খাদ্য ইতিমধ্যেই কয়েকটা বেরিয়ে গিয়েছে। যেমন "ফাফা"—পায়রা মটরে প্রোটিনযুক্ত করে এই খাদ্যটি তৈরি হয়েছে। এটি ইথিওপিয়ায় প্রচুর বিক্রি হয়; "আরলক"—আর একটি কৃত্রিম প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। বাদাম ও সরতোলা দুধে ৪২% প্রোটিন যোগ করে এই খাদ্যটি তৈরী হয়েছে। এটি নাইজিরিয়ায় প্রচুর বিক্রি হয়; 'L-Aubbina' এই রকম আরও একটি কৃত্রিম প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। সমুদ্রের শেওলা থেকে কৃত্রিম উপায় দুধ তৈরি হচ্ছে, সয়াবিন থেকেও দুধ তৈরী হচ্ছে। আমাদের দেশে যে গুঁড়ো দুধ আমেরিকা থেকে আসছে সে সবই সমুদ্র শৈবালজাত কৃত্রিম দুধ। পেট্রলের মত অখাদ্য থেকে এখনও খাদ্য দ্রব্য তৈরী হয় নি, তবে চেষ্টা চলছে।

(২) বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন একুশ শতকে মানুষ মঙ্গলে অবতরণ করবে। এটি এখনও সম্ভব হয়নি বটে; তবে এ বিষয়ে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা বেশ খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছেন। মঙ্গলে মনুষ্যবিহীন মহাকাশ-যান কয়েকবার গিয়েছে এবং সেখান থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোকচিত্র ও বহু অজানা তথ্য পৃথিবীতে এসে পৌঁছিয়েছে। শীগগির সেখানে লুনা খোদের মত রথযান অবতরণ করে আরও নির্ভুল তথ্য পৃথিবীকে

উপহার দেবে। আর মানুষের স-শরীরে মঙ্গলে অবতরণ এই শতাব্দীতেই সফল হবে বলে মনে হয়।

(৩) পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে মনুষ্যহীন গবেষণাগার স্থাপন হবে বলেছিলেন একুশ শতকে। এই বছরেই মে মাসে পৃথিবীর কক্ষপথে কসমোড্রোম বা মহাকাশ ভবন নামে এক সোভিয়েট বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। এই গবেষণাগারটিকে পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে বার করে ইচ্ছেমত ওঠা-নামা করানোর এবং সেখান থেকে মানুষের গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থাও সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত। এ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এ যুগেই ঘটে গিয়েছে।

একদল বিজ্ঞানী বলছেন, একুশ শতকের মানুষ হবে ষোলআনা যন্ত্র-নির্ভরশীল; ক্লেশ স্বীকার করতে তারা চাইবে না, স্বীকার করতেও হবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা এক মনোরম স্বপ্ন জগতের সৃষ্টি করবে। মানুষ পাবে অফুরন্ত অবকাশ, আরাম, বিলাস-সামগ্রী আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। জীবন উপভোগের চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। সারা বিশ্বে থাকবে না একজনও অক্ষর-পরিচয়হীন, অভুক্ত ও আশ্রয়হীন। জগৎটা হবে বোতাম-টেপা জগৎ; বোতাম টিপলেই সব পাওয়া যাবে হাতের কাছে। অর্থাৎ একুশ শতকের পৃথিবী হবে ডিজনিকল্পিত এক স্বপ্নজগৎ (Disney Land)।

আর একদল বিজ্ঞানী বলেছেন, হ্যাঁ, জগৎটা বোতাম টেপা জগৎ হবে বটে তবে সে-জগতের দুপ্রান্তে দুজনে বোতামে হাত দিয়ে বসে থাকবেন, যে কোন মুহূর্তে বোতাম টিপে দুটি মহাদেশকে পরমাণু বোমার আঘাতে নিমেষে নিঃশেষ করে দিতে পারবেন। আর সেটা যদি নাই হয়, তাহলে আর একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীর জল ও বাতাস প্রতিদিন যেরকম বিপজ্জনক ভাবে দূষিত হয়ে উঠছে, তাতে একুশ শতকের শেষের দিকেই (যদি উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা না হয়) মানব জাতির বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা ৫০% কমে যাবে। একথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিষয়কর্মের পরামর্শদাতা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দানিয়েল জি মীনহাম। আর একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছেন বায়ুমণ্ডল যেভাবে দূষিত হচ্ছে তাতে মনে হয়, বাইশ শতকের পরে পৃথিবী দগ্ধ মহাজাগতিক অঙ্গার-ভস্মের গোলকে পরিণত হয়ে নিষ্প্রাণভাবে আপন অক্ষে আবর্তিত হতে থাকবে; অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীকে হত্যা করে (cosmicide) নিজেও নিহত হবে। হয়ত এটা একটা নিছক অতিশয়োক্তি, তাহলেও সত্য এর মধ্যে কিছুটা আছে অবশ্য।

এই দুই চরম মতের মাঝামাঝি আর একটা রূপ বিজ্ঞানীরা মানস চক্ষে দেখতে পেয়েছেন। সেই রূপটি এখানে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছি। এ কথা সত্য যে, আগামী একশত বছরে জ্ঞানবিজ্ঞানে, বিশেষ করে প্রযুক্তি বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, রসায়ন ও শারীরবৃত্তে পৃথিবী অভূতপূর্ব উন্নতি করবে। কত অজানাকে জানবে আর তার ফলে মানুষের দুঃখকষ্ট অনেকটা প্রশমিত হবে। মানুষ দেবতা বা অদৃষ্টকে ভর্ৎসনা না করে আপন ভাগ্যজয় করবার অধিকার পাবে। "বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা" হবে।

মানুষ এখন যে-কাজ যন্ত্র সাহায্যে ৪।৫ ঘণ্টায় করছে একুশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সেই কাজ এক ঘণ্টা বা তারও কমে করতে পারবে। ফলে শ্রমিকদের কলকারখানায় খাটুনির সময় অনেক কমে যাবে; অথচ পারিশ্রমিক কমবে না। বছরে ১৬০০-১৭০০ ঘণ্টার বেশী কাজ আর কাউকেই করতে হবে না; অর্থাৎ সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করে ৫ দিন কাজ করবে কিংবা ৬ ঘণ্টা করে ৩দিন কাজ করবে—আর ছুটি পাবে সপ্তাহে ৪ দিন। এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন হাড্‌সন ইনস্‌টিটিউটের অধিকর্তা পদার্থ বিদ্‌ ডাঃ হারমান কন। অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্রই এরকম অবস্থা হবে না। রাশিয়া, আমেরিকা ও য়ুরোপের অনেক দেশে এবং এশিয়ায় জাপানে, যেখানে বিজ্ঞান সাধনায় মানুষ সিদ্ধিলাভ করবে সবচেয়ে বেশী, সেইসব দেশেই এইরকম অবস্থা হবে। আমেরিকা ভারতের

মত ছুটি-পাগল দেশ; হয়ত বা তাই এই প্রচুর অবসর সেখানে প্রচুর অশান্তি ডেকে আনবে।

ডাঃ কান একুশ শতকের আমেরিকার এক মনোরম চিত্র এঁকেছেন। বলেছেন, এই শতকে আমেরিকার বেশীর ভাগ লোক ১০ কামরাযুক্ত বাড়িতে বাস করবে। তাদের গ্যারেজে থাকবে তিনটা মোটর আর উঠানে থাকবে একটা হেলিকপটার। পাঁচ থেকে দশ শতাংশ লোকের আয়কর বাদে বার্ষিক আয় হবে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ডলারের মধ্যে। কিন্তু এ সুখ সৌভাগ্য থেকে দেশের ৯০%-৯৫% লোক বঞ্চিত হওয়ায়, তাদের মধ্যে জাগবে প্রবল অসন্তোষ। তা ছাড়া প্রচুর অবসর শ্রমিকদের জীবনে আনবে এক অবসাদ। তখন অপর্য্যাপ্ত অবসর কিভাবে কাটানো যাবে তাই নিয়ে হবে ভাবনা। গুণ হয়ে দোষ হবে বিস্তার বিস্তায়। এই অপরিমেয় অবসর শ্রমিকরা কাটাবে কি করে? এর জন্যে নতুন নতুন বড় বড় কমপোজিট ষ্টেডিয়ম গড়ে উঠবে খেলা দেখার জন্যে, সিনেমা, থিয়েটার সঙ্গীতগৃহ, গল্‌ফ্‌ ও বেস্‌বল খেলার মাঠও তৈরি হবে অনেক; কিন্তু সবারই ত একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে গেলে আর নতুন করে খেলার মাঠ, ষ্টেডিয়ম, প্রভৃতি তৈরি হবে না। তখন শ্রমিকরা অবসর বিনোদনের জন্যে প্রচুর পরিমাণে মেথাড্রিণ, মারিজুয়ানা, হেরোয়িন, এল. এস. ডি. (Lysergic acid diathalomide) প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে তুরীয়ানন্দ উপভোগ করবে; অনেকে আবার বিটনিক, হিপি, মড ও রকারদের দলে ভিড়বে। শ্রমিক ভুলে যাবে, "বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ, এক সাথে গাঁথা, নয়নের অঙ্গ যেন নয়নের পাতা।"

এই শতাব্দীতে মানুষের দৈহিক ও ঐহিক সুখ ও আরাম অনেক বেড়ে যাবে আর তার জন্যে মানুষকে কষ্ট স্বীকার খুব অল্পই করতে হবে। হাতের কাছে বোতাম টিপলেই অনেক আরামের ব্যবস্থা আপনা থেকেই হবে। এই বোতাম-টেপা আরাম অবশ্য য়ুরোপ আমেরিকায় এখনি অনেকটা দেখা দিয়েছে। সেখানে ফোকরে পয়সা ফেললেই গরম চা, কফি এবং অন্যান্য পানীয় আপনি এসে পড়ে, পছন্দমত ব্রেকফাষ্ট, ডিনারও ফোকরে পয়সা ফেললেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। বর্তমানের এই ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে। স্নানের ঘরে বোতাম টিপলেই ঠাণ্ডা বা গরম জলের স্প্রে সর্বাঙ্গ ধুয়ে দেবে, টেলিফোন শাওয়ার ঘুরালে সাবানের স্প্রে সর্বাঙ্গ পরিষ্কার করে দেবে, ঘষাঘষি আর করতে হবে না। তারপর কষ্ট করে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে হবে না, গরম বাতাস এসে গা ও মাথার চুল পরিপাটি করে শুকিয়ে দেবে এবং দরকার হলে পাউডার ও সেণ্টও মাখিয়ে দেবে।

এই শতাব্দীতে লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা অনেক বেড়ে যাবে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে পারিশ্রমিকের হারও বাড়বে; ফলে ঝি, চাকর, বেয়ারাকে মাইনে দিয়ে পুষবার ক্ষমতা বেশীর ভাগ লোকেরই থাকবে না। ভারতবর্ষ সমেত সমস্ত উন্নতিশীল দেশেও উচ্চ-মধ্যবিত্ত লোকদের চাকর, চাকরাণী রাখা সম্ভব হবে না। তা বলে গৃহস্থালীর কাজ ত উঠে যাবে না? তাই ঘরের গৃহিণীকে কাজকর্মে সাহায্য করবে কলের ঝি (Robot maid)। এই কলের চাকরাণীর চেহারা হবে একটা বাক্সের মত; তার ওপর দিকে থাকবে একটা চোখ, (ম্যাজিক আই) আর চার পাশে থাকবে অনেক-গুলো হাত। সেই হাতগুলো দিয়ে কলের ঝি ঘর দুয়োর পরিষ্কার করবে, বাসন মাজা, ঝাড়া-পোঁছা সব কাজ করবে।

আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ার ফলে মেয়েরা হয়ে পড়বে অত্যন্ত বিলাসী ও সৌখিন। নিত্যনতুন বসনভূষণ ও সাজসজ্জা নিয়ে তারা মেতে থাকবে। ফ্যাশনদুরস্ত মেয়েরা জ্যান্ত জোনাকী পোকা দিয়ে খোঁপা সাজাবে। এক বিশেষ ধরণের তেল দিয়ে খোঁপা বাঁধবে, আর তার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে জোনাকীগুলো খোঁপায় আশ্রয় নিয়ে জলতে নিভতে থাকবে। এ হবে এক সহজ দৃষ্টি-আকর্ষক ফ্যাশন।

এযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানের

(বায়োকেমিস্ট্রি) প্রভূত উন্নতি হবে। তার ফলে শরীরের নানা খুঁত সারিয়ে নেওয়া যাবে। বয়সের প্রভাবে মুখের চামড়া কুঁচকে গেলে, কপালে রেখা পড়লে, বাচ্চাদের রং ময়লা হলে ডাক্তারখানায় গেলেই, ডাক্তারবাবু মুখের চামড়া টানটান করে দেবেন, খাঁজগুলো সিলিকন-অণু দিয়ে ভরাট করে দেবেন, কালোকে ফর্সা করে দেবেন; তা ছাড়া খাঁদা নাককে টিকলো, কুলোর মত কানকে কেটে ছোটো, আর চোখ দুটোকে একটু টানাটানা আর ভাসাভাসা করে দিতেও পারবেন। শরীরের অনাবশ্যক মেদ কমিয়ে স্লিম ফিগার করা, সে আর এমন কি শক্ত কাজ!

বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি হবে। ফলে তখন কারও হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, পিত্তকোষ, মূত্রাশয় প্রভৃতি দেহের অতি প্রয়োজনীয় কোন প্রত্যঙ্গ রোগদুষ্ট বা জীর্ণ হলে, প্লাসটিকের ঐ সব দেহযন্ত্র লাগিয়ে দিয়ে ঘড়ি মেরামত করার মত মানুষকে সুস্থ ও সবল করে তোলা যাবে।

নিখুঁত কৃত্রিম Enzyme (বিভিন্ন জীবধর্মী ছত্রাকের দেহকোষ থেকে নিঃসৃত জৈব পদার্থ বিশেষ) বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করতে পারবেন। দেহকোষে এই কৃত্রিম এনজাইম প্রবেশ করিয়ে মানুষ যাতে চট করে জরার হাতে ধরা না পড়ে অর্থাৎ বার্ধক্য বিলম্বিত করে বুড়োদের যৌবন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে। বার্ধক্যে কর্মক্ষমতা কমে যায় কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। এই ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করা হবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ক্রমশ ছোট হতে আরম্ভ করে—জীবকোষের সংখ্যা কমতে থাকে। মস্তিষ্কের আকার ও ওজনও কমতে থাকে। ৭৫ বছর বয়সে আদিম মস্তিষ্কের ওজন শতকরা ৫৬ ভাগ অবশিষ্ট থাকে। মানুষ দু ভাবে বৃদ্ধ হয়। প্রাইমারি এজিং (বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বার্ধক্য আসে) এবং সেকেণ্ডারি এজিং (অসুখ-বিসুখের ফলে যে অকাল বার্ধক্য এসে উপস্থিত হয়)। প্রাইমারি এজিং একুশ শতকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হবে। আর সেকেণ্ডারি এজিং কুড়ি শতকের শেষেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

হাতের কি পায়ের দু-একটা আঙুল যদি কেটে যায় বা না জন্মায়, কান যদি ছুটোর বদলে একটা হয়, দাঁত পড়ে গেলে, কর্ণপটাহ কেটে গেলে এই প্রত্যঙ্গগুলো নতুন করে জন্মানোর ব্যবস্থা করা হবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা ২০০৭ সালেই সম্ভব হবে। ২০১২ সালের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তি বাড়াবার ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। ২০২০ সালে মানুষের মস্তিষ্কে কমপিউটার সংযুক্ত করে বুদ্ধিশক্তি আরও বাড়ানোর ব্যবস্থা হবে।

শত শত বৎসরে মানুষের প্রজনন পরিবর্তন অতি অল্প মাত্রায় দেখা দেয়, কাজেই এরকম কোন পরিবর্তন একুশ শতকে ত দেখা যাবেই না, তার পরেও কয়েক শতাব্দীতে বোধ হয় দেখা যাবে না। (James F. Crow—Mechanism and Trends in Human Evolution দ্রষ্টব্য।)

একুশ শতক D N A যুগে রূপান্তরিত হবে। ভারত-গৌরব ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানা হলেন এই বিশ্লেষণমূলক নব জীববিজ্ঞানের উদ্গাতা। বংশধারার মূল উৎপাদন জীন (Gene) ডি. এন. এ. (ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড) ও আর. এন. এ. (রিবোনিউক্লিক এসিড) এই দুই অণুর সমন্বয়। ডি. এন. এ.-র মধ্যে থাকে দেহ গঠনের সংকেত এবং আর. এন. এ. যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। ডাঃ খোরানার নেতৃত্বে উইসকিনসন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের পরমাণু থেকে কৃত্রিম উপায়ে জীন সৃষ্টি করেছেন। এই যুগান্তকারী সৃষ্টির ফলে, মানুষের জৈবিক গঠনের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। জন্ম সংকেতের (জেনেটিক কোড) সঠিক পাঠোদ্ধার হবে; হাঁপানি, ক্ষয়রোগ, বর্ণান্ধতা, মাথায় টাক প্রভৃতি বংশগত ব্যাধি, প্রজননগত ভুল বা বিকলাঙ্গতা দূর করা সম্ভব হবে এবং জন্মসূত্রও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে। গবেষণাগারে মানবীয় জীন এখনও তৈরি করা যায় নি—একুশ শতকে তা সম্ভব হবে।

ডিম্ব ও শুক্র নিয়ে বিজ্ঞানীরা টেস্ট্‌টিউবে তাদের মিলন সাধন করতে পেরেছেন, কিন্তু এখনও নিষি-

(fertilize) করতে পারছেন না—একুশ শতকে তা সম্ভব হবে এবং তার ফলে সত্যিকারের টেস্ট্‌টিউব বেবি তৈরি হবে; তবে কৃত্রিম ডিম্ব ও শুক্র তৈরি করা সম্ভব হবে কি না তা এখনও জানা যাচ্ছে না।

একুশ শতকের পৃথিবীতে অনেক সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেবে। য়ুরোপ আমেরিকায় মধ্য-যুগের ভারতবর্ষের মত বাল্যবিবাহ প্রচলিত হবে। আমেরিকায় এখন আমাদের দেশের চেয়ে কম বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ আরম্ভ হয়েছে। সব দেশেই বিবাহ বিলম্বিত হয় দারিদ্র্যের জন্যে। দেশে আর্থিক সচ্ছলতা এলে বিবাহ তাড়াতাড়ি হয়। ঘর-গৃহস্থালীর কাজে আগামী যুগে য়ুরোপ আমেরিকায় স্বামীরা স্ত্রীদের অধিকতরভাবে সাহায্য করবে। শিশুকে খাওয়ানো, ধোয়ানো ও তাদের দেখাশুনার ভার স্বামীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের হাতে তুলে নেবে।

মানুষের মন অধিকতর যুক্তিবাদী হয়ে উঠবে। তাই আগামী শতকে আমাদের দেশেও ঠিকুজি-কুষ্ঠির বদলে পাত্র-পাত্রীর রক্ত, শরীরাণু (ক্রোমোসোম) পরীক্ষা করে অভিভাবকেরা বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। তবে ব্যতিক্রম যে থাকবে না, তা নয়। প্রেমের দুর্বার শক্তির কাছে মাথা নিচু করে, বাধা নিষেধ না মেনে যারা বিবাহ করে সন্তান-সুখে বঞ্চিত হবে তাদের জন্যে এ-যুগের ব্লাড ব্যাংকের মত শুক্র ও ডিম্বের ব্যাংক (স্পার্ম এণ্ড এগ্‌ ব্যাংক) স্থাপিত হবে। সেখান থেকে সন্তানকামীরা শুক্র বা ডিম্ব কিনে এনে সন্তানের মুখ দেখবেন।

বিবাহে জাতি-ধর্ম ও বর্ণ-বৈষম্য লোপ পাবে। আমাদের দেশেও অসবর্ণ বিবাহটাই হবে নিয়ম, সবর্ণ বিবাহ ব্যতিক্রম। আন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

নব জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জননীর মৃত্যু হলে তাকে স্তন্যদানে লালন করা খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে, তাই তার জন্যে স্তন্যদায়িনী ধাত্রী (ওয়েট নার্স) রাখতে হয়। একুশ শতকে এ অসুবিধে দূর হবে। কৃত্রিম স্তন্যদান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে।

ধনী ও সুন্দরী গৃহিণীরা নিজেরা গর্ভধারণের ঝামেলা না নিয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণকে পরিচারিকার গর্ভে স্থানান্তরিত করে সন্তানের মা হবেন; অর্থাৎ বিজ্ঞানী J. B. S. Haldane যে Ectogenetic child-এর কল্পনা করেছিলেন, তা সফল হবে। এটাই এ যুগের স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে উঠবে।

ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তান প্রজননের প্রচেষ্টা সফল হবে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে,Y-chromosome (শরীরাণু) নিষিক্ত ডিম্বকে (ovum) পুত্র সন্তানে পরিণত করে, আর এর অভাব হলে (অর্থাৎ X-chromosome থাকলে) কন্যা সন্তান হয়। এ-যুগে মানুষ ইচ্ছামত X-বা Y-ক্রোমোসোম নিষিক্ত ডিম্বের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভ করবে। যদি Y-ক্রোমোসোমের নিতান্তই অভাব হয়, তা হলে গর্ভবতী স্ত্রীলোককে "androgen" ইনজেকশন করে কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানে পরিবর্তিত করবার চেষ্টা হবে। এই এণ্ড্রজেন পুরুষের অণ্ডকোষ থেকে নির্গত হয়ে ভ্রূণের অন্তঃ-পুরুষাঙ্গ বিকাশে সহায়তা করে এবং পরে বহিঃ-পুরুষাঙ্গকে পূর্ণ প্রকাশ করে। এ প্রচেষ্টা primates অর্থাৎ বানর, লেমুর প্রভৃতি প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে খানিকটা সফল হওয়া গেলেও, মানুষের বেলায় এখনও পর্যন্ত সফল হওয়া সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীরা আশা করেন একুশ শতকে এটা সম্ভব হবে। (Hormones in the Development of Sex Differences by William Young, Robert Goy and Charles Phoenix in Science, 143 (1964), 212-218 দ্রষ্টব্য।)

হরেক রকমের ফলপ্রসূ গর্ভনিরোধক বটিকা আবিষ্কৃত হবে এবং তার ব্যবহারও হবে ব্যাপকভাবে। কুমারীরা চায়ের সঙ্গে নিয়মিত দুবেলা এই বটিকা সেবন করে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে রক্ষা পাবে—আর তাদের গাইতে হবে না, "তোমার আকাশে এসেছিনু হায় আমি কলঙ্কী চাঁদ।"

জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ও বিস্ময়কর পদক্ষেপ

দেখা দেবে এ যুগে। ডাঃ ড্যানিয়েল্লী বলেছেন: দরজির দোকানে ইচ্ছামত মাপ ও আকৃতির পোশাক তৈরির মত একুশ শতকে মানুষ নির্দিষ্ট নকশা অনুযায়ী তদুপায়ী জীব সৃষ্টি করতে পারবে।

মানুষের আয়ু এখন থেকেই বাড়তে আরম্ভ করেছে। আমেরিকায় ১৮৪০ সালে মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল ৪০ বছর; ১৯০০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৭ বছর। তারপর ১৯৩০ সালে হঠাৎ একেবারে হল ৬০ বছর; ১৯৫০ সালে আরও বেড়ে গিয়ে হল ৬৮ বছর। ১৯৭০ সালে মনে হয় আরও কিছু বেড়েছে। ১৯৫০ সালে আমেরিকায় ৬৫ বছরের বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল এক কোটি; আর ১৯৬০ সালে ৭৫ বছরের বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ। মানুষের আয়ুর ক্রমবর্দ্ধমান উর্ধ্বগতি দেখে মনে হয়, আগামী শতকে গড়পড়তা আয়ু আরও বেড়ে যাবে; কাজেই তখন বৃদ্ধের সংখ্যা হবে অনেক বেশী। এই বুড়োদের নিয়ে তখন হবে সমস্যা। তাদের কাজ করবার সামর্থ্য নেই, রুজিরোজগার নেই; কিন্তু মাথা গুঁজবার ঠাঁই, আর পেট চালানোর ভাবনা থেকেই যাবে। যারা পেনশন পায়, বা কিছু জমাতে পেরেছে তাদের জন্য য়ুরোপ-আমেরিকায় আছে ওল্ড-এজ হাউস এবং গোলডেন এজ ক্লাব। বুড়োরা ওদেশে-অবহেলিত। ওল্ড-এজ হাউসে তারা আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত অবস্থায় নিরাসক্ত জীবন যাপন করে, নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে থাকে নাতি-নাতনীদের আগমনের প্রতীক্ষায়। ন'মাসে ছ'মাসে হয়ত ছেলে নাতি-নাতনীরা একবার খোঁজ নিতে আসে। হয়ত আসে না; কাজেই অতীত দিনের স্মৃতির রোমন্থন করে দিন কাটাতে হয়। অনেকে তাই বন্ধুত্বের প্রয়োজনে বুড়ো বয়সে নতুন করে বিয়ে করে। আধুনিক জাপানেও বৃদ্ধ জনক-জননীরা আর বড় পাত্তা পান না। আমাদের দেশেও একুশ শতকে এইরকম অবস্থা হবে। যৌথ পরিবার এদেশে অনেক কাল আগেই ভেঙ্গে গিয়েছে; কিন্তু এখনও ছেলেরা বাপ-মা নিয়ে একত্রে বাস করছে। আগামী শতকে অবস্থা আর এমনটি থাকবে না। তখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বেড়ে যাবে অনেক, ছেলেমেয়ের ওপর বাপ-মার কোন কর্তৃত্বই খাটবে না। ছেলেরা রোজগার করতে শিখলেই আলাদা হয়ে যাবে, আর বাপ-মা চলে যাবে ওল্ড-এজ হাউসে। যে বাপ-মায়ের হাউসের খরচ যোগাড় করা সম্ভব হবে না, তাদের নির্ভর করতে হবে সাধারণের দয়ার ওপর। আমাদের যুগে তরুণদের নিয়ে যেমন সমস্যা হয়েছে, আগামী যুগে তেমনি হবে বুড়োদের নিয়ে।

একুশ শতকের পৃথিবীতে রাজনৈতিক রূপেরও অনেক পরিবর্তন হবে। আজ যাঁরা মহাশক্তিধর দেশ, আগামী শতকে তাঁরা সকলেই সেরকম নাও থাকতে পারেন এবং তাঁদের শূন্যস্থান আজকের দিনের অনেক নগণ্য শক্তি পূর্ণ করতে পারেন।

বিশ শতকে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকা, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ, যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণী, স্পেন, ইটালি প্রভৃতি দেশের প্রভাব ক্ষুন্ন করে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ (সুপার পাওয়ার) হয়ে উঠেছে—সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, ললিত কলায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব বিষয়ে সে অগ্রণী। প্রাচীন এথেন্সের মত "ঊর্ধ্বে তুলি বৈজয়ন্তী উন্নত রাখি শির" কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যমণি হয়েছে আমেরিকা। তাই তাবৎ পৃথিবীর মেধাবী ছাত্রেরা, গুণী ও জ্ঞানীজনেরা সেখানে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন। যে সুযোগ, সুবিধে ও সম্মান তাঁরা পাচ্ছেন, তা ছেড়ে তাঁদের আর স্বদেশে ফিরে আসা সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকায় এই প্রভাব ও প্রতিপত্তি একুশ শতকে আর থাকবে বলে মনে হয় না। তার এই স্থান এশিয়ায় চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকায় ব্রেজিল আর পূর্ব-য়ুরোপের সোভিয়েট রাশিয়া অধিকার করে বসবে। অল্প সময়ের মধ্যে মহাচীন যে অর্থ-নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করেছে তা শুধু পরি-সংখ্যানের দিক দিয়ে বিস্ময়কর নয়, কৃতিত্বের দিক থেকেও অভাবনীয়। (Samuel P. Huntington—Changing Patterns of Military Politics দ্রষ্টব্য।)

চীন ও আমেরিকার মধ্যে সম্বন্ধ তীব্র বিরোধ অথবা নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারে। শেষোক্ত পরি-

পত্তিটাই বেশী সম্ভব বলে মনে হয়। চতুর চীন মনে হয়, ভবিষ্যতে তার অগণিত নরনারীর বুভুক্ষা নিরসনের জন্যে আমেরিকার কাছে খাদ্য ও আর্থিক সাহায্যের আশায় আপন উগ্র মতবাদ ও জেহাদি জিগিরকে কিছুটা প্রশমিত করবে। আর একটা কারণ হল, প্রতিবেশী মহাশক্তিধর সোভিয়েট রাশিয়ার হাত থেকে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে; তাই আমেরিকার দিকে ঢলে পড়া ছাড়া উপায় নেই। আমেরিকার কাছে শক্তিশালী রাশিয়ার চেয়ে শক্তিশালী চীন কম ভয়ের কারণ। চীন শক্তিশালী হলে সারা এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে; কিন্তু রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হলে, তার প্রভাব সমস্ত য়ুরোপের ওপর এসে পড়তে বাধ্য—ফলে শক্তিসাম্য নষ্ট হয়ে আমেরিকার প্রভাব যাবে কমে।

একুশ শতকের গোড়ার দিকে বিশাল চীন ভূখণ্ডের একাংশে দীর্ঘকাল ব্যাপী দুর্ভিক্ষ চলতে থাকবে। তার ফলে দেশে অশান্তি, অসন্তোষ, বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে, কিছু কিছু হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটবে ও অরাজকতা দেখা দেবে। সেই সুযোগে সোভিয়েট রাশিয়া চীন সীমান্তের কিছু অংশ, বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ অধিকার করে নেবে; কিন্তু তা বেশী দিন দখলে রাখা সম্ভব হবে না। মাঞ্চুরিয়ার ওপর রাশিয়ার বজ্রমুষ্টি কিছুটা শিথিল হয়ে পড়বে; কিন্তু চীনেরও এই প্রদেশ পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না; ফলে মাঞ্চুরিয়া এক আধা-স্বাধীন প্রদেশ বলে গণ্য হবে এবং চীন ও রাশিয়া উভয়েরই এর ওপর খানিকটা কর্তৃত্ব করবে।

ব্রেজিল ও মেক্সিকো প্রতাপশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠবে এবং হয় ব্রেজিল নয় মেক্সিকো ল্যাটিন আমেরিকার নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। এই শতকে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় দুটি নতুন অঙ্গ-রাজ্য সংযুক্ত হবে। ৫১তম রাষ্ট্রটি হবে পিউরিটোরিকো, আর ৫২তম অঙ্গ-রাজ্যটি হবে প্রশান্ত সাগরের কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে।

সমাজে শ্রমিক-কৃষক, সৈন্যদল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ত্রিমুখী বিবাদ প্রায় সব সময় চলতে দেখা যায়। শ্রমিক ও কৃষকদের ভোট আছে, সৈন্যদলের অস্ত্র আছে আর মধ্যবিত্তের আছে বুদ্ধি। এদের মধ্যে যে কোন দুয়ের সঙ্গে মিতালি করে দেশের সরকার কিছু দিনের জন্যে চালানো যায়; কিন্তু চিরদিনের সরকার চালাতে হলে, শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে আপোষ করতেই হবে। তাই মনে হয় একুশ শতকে এবং তার পরেও পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আর থাকবে না, পূর্ণ-গণতন্ত্র স্থাপিত হবে। য়ুরোপ ও এশিয়াতেও কোথাও আর রাজতন্ত্র দেখা যাবে না।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আসবে কিছু কিছু অর্থ-নৈতিক পরিবর্তন। পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেড়ে যাবে; ফলে মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে বাড়িঘর মেরামত করে ওঠা সম্ভব হবে না—নতুন করে বাড়িঘর তৈরী করা ত দূরস্থান। শ্রমিকদের অর্থ-নৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে; কিন্তু তবু তারা সন্তুষ্ট থাকবে না, আরও পারিশ্রমিক বাড়ানোর জন্যে আন্দোলন করতে থাকবে। ষ্ট্রাইক, বন্ধ, ঘেরাও, ধরণা, নিয়ম মাফিক কাজ, প্রতিবাদ, অভিযান, মহতী-সভা ঐগুলোর কোনটাই কমবে না, বরং বেড়ে যাবে। ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে পার্থক্য এখনকার মতই বাড়তে থাকবে; অর্থাৎ ধনী আরও ধনী হবে, তবে দরিদ্রের অবস্থার অনেক উন্নতি হলেও, ধনীর অনেক পিছনেই তাকে থাকতে হবে।

আর্থিক দিক দিয়ে একুশ শতকের পৃথিবীর চেহারা হবে যেন এক বৃহৎ সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির দ্বীপ, আর তাকে ঘিরে থাকবে অভাব, অনটন ও দারিদ্র্য। তবু সামগ্রিকভাবে বিশ শতকের দরিদ্র দেশগুলোর চেয়ে একুশ শতকের দরিদ্র দেশগুলোর জীবনযাত্রার মান হবে অনেকটা উন্নত ধরণের; অনেক সুখ, সুবিধে ও স্বাচ্ছন্দ্য তারা ভোগ করবে যা বিশ শতকের দরিদ্রেরা কল্পনাও করতে পারবে না।

সম্পত্তি কর ও মৃত্যু কর ৮০%—৯০% হবে যার ফলে দেয় কর বাদ দিয়ে উত্তরাধিকারীদের হাতে খুব বেশী

টাকা আসবে না। করের বোঝা বড়লোকেরই ওপর বেশী চাপবে।

জনসাধারণ এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বাস করতে চাইবে না; রুজিরোজগারের জন্যে তাদের শহর থেকে শহরান্তরে ছোটাছুটি করতে হবে। ৮০%—৯০% গ্রাম ও শহরতলীর লোকেদের শহরে এসে বাস করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দেবে; যদিও সে-যুগে শহরতলী ও গ্রামে পৌর ব্যবস্থা অনেক ভাল হবে, আরাম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ অভাব হবে না, তবু জনাকীর্ণ শহরে ঠাসাঠাসি করে থাকতে অর্থাৎ শহরে হওয়ার ইচ্ছেটা মানুষের খুব বেড়ে যাবে। তাই ইচ্ছে পূরণের জন্য একুশ শতকের গোড়ার দিকেই আমেরিকায় তিনটি বিপুলায়তন মহানগরী স্থাপিত হবে।

প্রথম মহানগরীটি বর্তমানের ওয়াশিংটন থেকে বোষ্টন পর্যন্ত বিস্তারিত হবে এবং সেখানে বাস করবে ৮ কোটি লোক। দ্বিতীয় শহরটি বর্তমানের শিকাগো থেকে পিটসবার্গ পর্যন্ত প্রসারিত হবে, পরে এই শহরটি আরও বিস্তৃতিলাভ করবে। বুঁজে যাওয়া লেক ঈরি ও আবর্জনাপূর্ণ লেক মিশিগান ও লেক অনটারিও ভরাট করে শহরটি কানাডা পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এখানকার লোকসংখ্যা হবে ৪ কোটি। আর তৃতীয় শহরটি হবে অপেক্ষাকৃত ছোট। এটি সান্তা বারবারাস থেকে সান-ডিগো পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এখানকার লোকসংখ্যা হবে ২ কোটি। এই সব বিপুলায়তন শহরগুলোতে বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পৌর সুখ সুবিধা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। শহরে বাস করার প্রবৃত্তিটা বেড়ে যাওয়ার ফলে, কম খরচায় এবং তাড়াতাড়ি তৈরি করা যায় এমন বাড়ির (Pre-fabricated) সংখ্যা বেড়ে যাবে, আর বাড়বে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি। উলওয়ার্থ, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মতন অট্টালিকায় য়ুরোপ আমেরিকা ছেয়ে যাবে (The Next Thirty Years: A Framework for Speculation দ্রষ্টব্য।)

বিশ শতকে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যেরকম বিস্তৃতি লাভ করেছে, বিগত তিন চার হাজার বছরের কোন শতকে তেমনটি দেখা যায় নি। এই শতকে মানুষ মনে করেছিল, আকাশে ও ভূতলে যা কিছু অজানা ছিল, সব জেনে ফেলেছে, আর কিছু জানবার নেই; কিন্তু না, বিজ্ঞানীরা বলছেন, একুশ শতকে তাঁরা আরও নতুন নতুন আবিষ্কারের পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। তাঁরা বলছেন, কম পক্ষে একশ'টি চমকপ্রদ নতুন আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর লোক জানতে পারবে। এই একশ'টি নতুন আবিষ্কারের মধ্যে থেকে বেছে বেছে গুটি কতক নতুন আবিষ্কারের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

১) এ-যুগের টেরিলিনের মত একুশ শতকে কাগজের জামা কাপড়ের বিশেষ প্রচলন হবে।

২) পরিবহন রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষ ও মালপত্র পাঠাবার ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ নিরাপদ করে ফেলা হবে। আটলান্টিক পারাপারে এখন শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী আকাশযানে সময় লাগে ২।৩ ঘন্টা; তখন লাগবে ২০।৩০ মিনিট। বৃহদাকারের হেলিকপটার এক এক বারে একশ' থেকে দেড়শ' যাত্রী নিয়ে যেতে পারবে; আর হাজার থেকে দু হাজার যাত্রীবাহী জেট বিমানও তৈরি হবে।

৩) জ্বালানীর ক্ষুধা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফলে উন্নত দেশগুলিতে কয়লা ও তেলের পরিবর্তে পরমানবিক জ্বালানী প্রবর্তিত হবে; আর তার ফলে বাতাসে কারবন ডায়অক্সাইডের পরিমাণ কিছুটা কমবে।

৪) এখনকার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরশীল এবং অনেক দিন আগে থেকে (ছ মাস) আব-হাওয়ার পূর্বাভাষ নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হবে।

৫) সামরিক সুবিধের জন্যে কৃত্রিম ঝড়, বন্যা ও বৃষ্টিপাত করা সম্ভব হবে।

৬) আকাশ, বাতাস ও পৃথিবীর জলাধারগুলির মালিন্য মুক্ত করবার ও ধোঁয়াসা দূর করবার প্রয়াস অনেকটা সাফল্য মণ্ডিত হবে। আঞ্চলিক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতকটা সফল হবে।

৭) ক্লান্তি, অবসাদ, ক্রোধ, শোক ও দুঃখ দূর করবার মত কার্যকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। শ্রম লাঘবের জন্যে নানা যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে।

৮) মানুষের নিদ্রা কাজের চাপে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, অথচ নিদ্রার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই নিদ্রাকর্ষণের জন্যে নির্দোষ ওষুধ ও বিদ্যুত চালিত শয্যা তৈরি হবে। শয্যার মৃদু কম্পনে চোখে "আবেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে" যাবে। তা ছাড়াও সাপ ও বেঙের মত দরকার হলে মানুষ যাতে অনেক দিন ঘুমন্ত অবস্থায় (হিবারনেশন) থাকতে পারে তার উপায় বার হবে। বিশেষ বিশেষ রোগে এর প্রয়োজন আছে।

৯) বিষাক্ত জীবাণুবাহিত ও স্পর্শক্রামক অনেক রোগের অব্যর্থ প্রতিসেধক বার হবে—যার ফলে এই সব রোগবিস্তার প্রতিরুদ্ধ হবে। মানুষের স্বাস্থ্য এ-যুগে মোটামুটি ভাল থাকবে।

১০) ক্ষুধা-তৃষ্ণা সংবরণ করার ওষুধও বার হবে। এই ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণী বটিকা সেবনে মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত বাহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারবে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময় এই সব ওষুধের চাহিদা খুব বেড়ে যাবে।

১১) চন্দ্রগ্রহকে সমস্ত রকমে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা হবে। ঘর-বাড়ি বানিয়ে অনেকে সেখানে বাস করবে। মহাকাশযানে হাজারে হাজারে মানুষ পাঠানো সম্ভব নয়। তাই অভিজ্ঞ জীববিজ্ঞানীর সঙ্গে মানুষ ও গরু, ভেড়া, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির নিষিক্ত, অপরিণত ভ্রূণ পাঠিয়ে দিয়ে কম খরচে এবং অল্প সময়ে অসংখ্য মানুষ ও পশুপক্ষীর প্রজনন সম্ভব হবে। এতে মহাকাশযানে স্থান ও ভারের সাশ্রয় হবে। (১৯৬৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর "লাইফ" পত্রিকায় প্রকাশিত Control of Life নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

১২) কৃত্রিম কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট তৈরির চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রলিয়ম, এমন কি পাথুরে কয়লা থেকে এক-কোষী জৈব পদার্থ (yeast) চাষ করে, তা থেকে জৈব প্রোটিন আবিষ্কারের চেষ্টা হবে। এ-চেষ্টা সফল হলে খাদ্যের অনেকটা সুরাহা হবে; কারণ পেট্রল, গ্যাস এবং কয়লা আগামী কয়েক শত বছর অপর্য্যাপ্ত হারে পাওয়া যাবে।

১৩) মানুষের গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ ব্যবস্থা সুগম ও নিরাপদ হবে কাজেই তখন বড়লোকেরা বড় দিন কি পূজার ছুটিতে চাঁদে গিয়ে দিন কতক কাটিয়ে আসতে পারবেন—দার্জিলিং, সিমলা, উটি তখন আর তাঁদের মনে ধরবে না।

১৪) কম খরচায় ব্যাটারিচালিত টেলিভিশন সেট তৈরি হবে; এখনই এ-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আজকাল যেমন ঘরে ঘরে, ক্ষেতে খামারে, দোকান, হাট, ট্রামে, বাসে সর্বত্র ট্রানজিসটার রেডিওর চলন হয়েছে, তেমনি এ যুগে ট্র্যানজিসটার টেলিভিশনের চলন হবে।

১৫) মহাকাশ গবেষণার যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে একুশ শতকে তা পূর্ণতা লাভ করবে। দূরদূরান্তের গ্রহ থেকে আবাহাওয়া সংক্রান্ত নানা সংবাদ আসতে থাকবে, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাতের অনেক সংকেত অনেক আগে থেকেই পাওয়া যাবে।

১৬) নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে যেতে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগবে, কাজেই তখন অনেক ছাত্র ও শিক্ষক প্রতিদিন লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক বা নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে পড়াশুনা করতে বা কাজকর্ম করতে ডেলি প্যাসেঞ্জারী আরম্ভ করবেন।

১৭) ট্রাংক টেলিফোনের খরচ কমে যাবে। য়ুরোপ থেকে এশিয়ার যে কোন স্থানে টেলিফোন করতে হলে এক থেকে দুডলারের বেশী খরচা পড়বে না। উপগ্রহ মারফত সোজাসুজি বার্তা পাঠানো এখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

১৮) বড় বড় শহরে অন্ধকার দূর করবার জন্যে কৃত্রিম চাঁদের সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি Laser নামে এক অতি শক্তিশালী আলোক রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছে। একশ কোটি সূর্য রশ্মির চেয়ে (সূর্যের সমগ্র রশ্মির অতি ক্ষুদ্রতম অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়) এর আলো উজ্জল। এই লেসার আলোর বম্ব দু-এক হাজার ফুট উঁচুতে ঝুলিয়ে দিলে, বেশ একটা ছোট চাঁদের মত এক বিরাট এলাকা আলোকিত করবে।

১৯) একুশ শতকে মহাকাশের মত সমুদ্রও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়, তার বিরাট ব্যবস্থা করবেন। সমুদ্র থেকে খনিজ বস্তু আহরণ করা ছাড়াও তাকে চাষের কাজে লাগাবার ব্যবস্থাও হবে। সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ করা হবে; তাছাড়া সমুদ্রতলে গৃহ নির্মাণ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে ওষুধ ও নানান রকমের প্রোটিনযুক্ত খাদ্য তৈরির চেষ্টা হবে। সমুদ্রতলে শস্য-সংরক্ষণাগার এবং তৈলাধার প্রস্তুতের ব্যবস্থাও হবে। সমুদ্রতলে তৈল রাখার সুবিধা ও নিরাপত্তা দুই বেশী। এ ছাড়াও সমুদ্রতলে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির চেষ্টাও হবে। একুশ শতকে আবহাওয়া দূষিত হওয়ার ফলে সুপেয় জলের অভাব দেখা দিতে পারে; সেই জন্যে সমুদ্র জলকে লবণমুক্ত করে পানের ও চাষের উপযোগী করবার চেষ্টা সার্থক হবে। পারমাণবিক জ্বালানি শক্তি চালিত প্রকল্পের (নিউক্লিয়ার ফুয়েল্‌ড পাওয়ার প্ল্যান্ট) সাহায্যে এ কাজ সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য হবে।

আমাদের দেশে সমুদ্রকে বলা হয় রত্নাকর—অশেষ রত্নের আকর যে সমুদ্র তা বোধ হয় প্রাচীনকালে সব জাতিরই জানা ছিল। বাইবেলে Isaiah 60 : 5 উল্লেখ আছে, "The abundance of the sea shall be converted unto thee"। সমুদ্রে যে কি পরিমাণে রত্নের আকর The Dow Chemical Company তার একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন :—

১) এক ঘন মাইল সমুদ্রজলে আছে ১৭৫ মিলিয়ন-টন গলিত রাসায়নিক পদার্থ, যার মূল্য কম করে ধরলেও হবে ৫০০ কোটি ডলার।

২) প্রতি ঘন মাইল সমুদ্রজলে আছে ৯৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা আর সাড়ে আট মিলিয়ন ডলার মূল্যের রূপা।

৩) প্রতি ঘন মাইলে পাওয়া যাবে ৭ টন ইউরেনিয়ম।

৪) পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে যেসব মূল্যবান্ পদার্থ আছে তার আনুমানিক মূল্য হবে এক কুইনটিলিয়ন পাঁচশ কোয়াড্রিলিয়ন ডলার। (এক কোয়াড্রিলিয়ন ডলার মানে এক হাজার ট্রিলিয়ন ডলার; ট্রিলিয়ন হল আবার এক হাজার বিলিয়ন—বিলিয়ন হল এক হাজার মিলিয়ন, আর মিলিয়ন হল দশ লক্ষ। তাহলে এক কুইনটিলিয়ন হল—এক হাজার কোয়াড্রিলিয়ন। ভাবলেও মাথা ঘুরতে থাকে।)

এসব তথ্য অবশ্য এই শতকের বিজ্ঞানীরা সকলেই জানেন। তাঁরা চেষ্টাও কিছু কিছু করেছেন; কিন্তু রত্নাকরের গর্ভ থেকে রত্ন আহরণ করতে যে পরিমাণ অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, তাতে খরচা পোষায় না বলেই এদিকে চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়েছেন। আগামী শতকে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অপরিমেয় উন্নতি, আর তার ফলে এই প্রচেষ্টা হবে সাফল্যমণ্ডিত।

২০) মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারকেরা বিদ্যুৎ চালিত বা পেট্রল-ও-বিদ্যুৎ সাহায্যে চালিত মোটর ইনজিন তৈরি করবেন। ধূমহীন বিস্ফোরক—নাইট্রো-গ্লিসারিণের সাহায্যে ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা হবে।

২০) পরমাণবিক জ্বালানি চালিত হাওয়াই জাহাজ তৈরি হবে।

২২) মঙ্গলগ্রহে অভিযান বিশ শতকেই সাফল্য-মণ্ডিত হবে। আগামী দশ পনের বছরের মধ্যেই মানুষ সশরীরে মঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হবে। সূর্যকে কেন্দ্র করে যে ন'টি গ্রহ আপন কক্ষে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে তার মধ্যে বুধ প্রভৃতি কয়েকটি গ্রহে একুশ শতকে মানুষের পৌঁছাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মনে হয় মহাকাশের সমস্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্য মানুষের কাছে উন্মোচিত হবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন,—

"খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-পরে

শ্রাবণের সায়াহ্ন যূথিকা—

যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা ॥"

২৩) কোবাল্ট বোমা আবিষ্কৃত হবে এ যুগে। এই বোমা হবে হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে বেশী বিধ্বংসী; কিন্তু সে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি করবে না। ঘরবাড়ি, কল কারখানা, যানবাহন সবই অক্ষত থাকবে—থাকবে না শুধু জীবন্ত প্রাণী। এর প্রচণ্ড আঘাতে জীবন্ত প্রাণী সমেত সমস্ত গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাবে—মাটির এক ফুট নিচেও কেঁচো, পিঁপড়ে, সাপ, বেঙ কেউ জীবিত থাকবে না। একটি ফুৎকারে প্রাণের প্রদীপ যাবে নিভে—নেমে আসবে আদিম পৃথিবীর নিস্তব্ধতা।

২৪) থর, গোবি, সাহারা প্রভৃতি মরুভূমিতে প্রথমে মনসা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করে খানিকটা চাষের যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা হবে। ইজরাইল এ-বিষয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। মরুভূমিতে চাষের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল বৃষ্টির অভাব। অনেক মরুভূমিতে, যেমন সাহারায়, সারা বছরে এক ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়; আবার অনেক মরুভূমিতে সারা বছরে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। এসব জায়গায় চাষ আবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ। পূর্ণ মরুভূমি ছাড়াও পৃথিবীতে অর্ধ মরুভূমি আছে এবং তাদের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়—ভূপৃষ্ঠের ৭৪ শতাংশ এইরকম অর্ধ মরুভূমি এবং সেখানে সারা বছরে ১০-২০ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এইসব জায়গায় চাষ আবাদ খানিকটা সফল হবে। আর সে চেষ্টা সফল করতে হলে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন করতে হবে। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যে যে সব পরিকল্পের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন, সেগুলো আমাদের কাছে আজগুবি বলে মনে হয়। একটা পরিকল্পনার কথা ধরা যাক। তাঁরা বলছেন, সুমেরু বৃত্তে পাঁচ মাইল-পুরু বরফের মেঘ সৃষ্টি করতে পারলে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন করা সম্ভব। এই রকম মেঘ সৃষ্টি করতে হলে সুমেরু সাগরে জলের তলে দশটি বড় আকারের হাইড্রোজিন বোমা বিস্ফোরণ করলে, যে উষ্ণ মেঘ আকাশে জমবে, তাই কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নেমে এসে সুমেরু সাগরের চারদিকে বৃষ্টিপাত ঘটাবে এবং তারই ফলে আরো মরুভূমি অঞ্চল চাষের উপযোগী হয়ে উঠবে। আর একটা উপায় স্থির করেছেন। সেটি হল Sierra Nevada পর্বতমালার মধ্যে বড় আকারের সুড়ঙ্গ পথ কাটতে পারলে, ঐ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আর্দ্র প্রশান্ত সাগরীয় আবহাওয়া এসে অনুর্বর নেভাদা মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করে তুলতে পারবে।

এই পরিকল্পনাগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত হলে, বিশ শতকে যেখানে ছিল শুধু ধূ ধূ শুষ্ক বালুরাশি, একুশ শতকে সেখানে খানিকটা সবুজের ছোঁয়া লাগবে।

গোপনীয়তা

একুশ শতকে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে ব্যক্তিগত জীবনে তথা রাষ্ট্র জীবনে গোপন বলে বড় কিছু থাকবে না—কোন কিছু লুকিয়ে রাখা হবে শক্ত। আড়ি পেতে শোনা ও পরের গোপন তথ্য উদ্ধার করার নতুন নতুন উপায় আবিষ্কৃত হবে। এখনই মানুষ 'লেসারের' আলোক রশ্মির সাহায্যে বহু দূর থেকে আলোক চিত্র নিতে পারে, টাই-পিন বা সিগারেট লাইটারের মধ্যে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখতে পারে, closed-circuit television সাহায্যে লুকানো জিনিস ঠিক ঠিক দেখতে পায়, টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে অপরের গোপন কথাবার্তা সহজেই শুনতে পারে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাশের ঘরের গোপন মন্ত্রণারত লোকের সমস্ত কথা শুনতে পেতে পারে, খাম না খুলেই ভিতরের চিঠির মর্মার্থ জানতে পারে। এ ছাড়া আছে স্পাইস্যাটেলাইট, তার সাহায্যে গোপন তথ্য আলোক চিত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়। এই ভাবে গোপন তথ্য উদ্ধার করবার নানা নতুন নতুন উপায় এ-যুগেই বার হয়েছে। এইসব উপায় আগামী যুগে আরও নিখুঁত ও উন্নত ধরণের হবে এবং সেগুলো বেশ ভালভাবেই কাজ করবে। মালিক, শ্রমিকরা কাজের

সময় ঠিকভাবে কাজ করছে, না কাজে ফাঁকি দিচ্ছে জানতে পারবেন; ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপন তথ্য, গোপন আদান-প্রদান, উৎকোচ প্রদান, জীবনবিমার পর বিমাকারীর আঘাত, দৈহিক ক্ষতি ইচ্ছাকৃত না সত্যসত্যই আকস্মিক, বিবাহ-বিচ্ছেদকামী স্বামী বা স্ত্রী গোপনে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে ব্যবস্থা করছেন কি না ইত্যাদি বহু বিষয় জানবার জন্যে নতুন নতুন উপায় আবিষ্কৃত হবে। ফলে মানুষের জীবনে গোপনীয় বলে কিছুই থাকবে না। ইচ্ছে করলেই একে অপরের গোপন কথা জানতে পারবে।

অনেক নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠবে, যেমন যানবাহন জটলা নিবারণী সংস্থা, আকাশ-বাতাস বিশুদ্ধ রক্ষণী সমিতি। এদের কাজ হবে, রাস্তায় যাতে যানবাহন জটলা পাকিয়ে অবরোধ সৃষ্টি না করে তা দেখা, আকাশ-বাতাস যাতে দূষিত না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা।

লোকসংখ্যা সীমিত রাখবার যত চেষ্টাই হোক, আর গর্ভনিরোধের যতই নতুন নতুন ওষুধ বার হোক না কেন, "মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের প্রবাহ।" একুশ শতকে লোকসংখ্যা যে সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু কত বাড়বে সে নিয়ে আছে মত-বিরোধ। ড্যানিয়েল বেল বলছেন একুশ শতকের শেষ দশকে সারা বিশ্বে লোকসংখ্যা হবে ৫০১ কোটি; অর্থাৎ ১৯৬০ সালের চেয়ে ৬৫% বেশী। আবার কেও কেও বলছেন ৮০০ কোটি। আর একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অনেক হিসেব করে বলেছেন, সঠিক সংখ্যা হবে ৭০২ কোটি। সঠিক সংখ্যা যাই হোক সেটা জন-বিস্ফোরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন, ২০০১ সালে শুধু চীনের লোক সংখ্যা হবে একশ কোটি। শহরে পার্ক, খেলাধুলা করবার মত খোলামেলা জায়গা আর থাকবে না। মোটরের সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে সুপার হাই-ওয়ে করেও কূল কিনারা মিলবে না। রাস্তায় জ্যাম লেগেই থাকবে। শুধু রাস্তা কেন আকাশেও ঐ একই অবস্থার সৃষ্টি হবে।

আমেরিকায় নিগ্রোদের সংখ্যা বর্তমানে ১০% আগামী শতকে তাদের সংখ্যা হবে ১১%-১২%, ফলে আমেরিকায় বর্ণ-বিদ্বেষ ও জাতি-বিদ্বেষ বেড়ে যাবে মাঝে মাঝে সাদায় কালোয় মারামারি, হানাহানি প্রবল হয়ে দেখা দেবে। দেশের শান্তি বিঘ্নিত হবে। পূর্ব-বঙ্গে যেমন সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞ চলছে, ওদেশেও সে রকম কালা আদমি নিধনে শ্বেতকায়রা মেতে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না।

আমাদের পশ্চিম বঙ্গেও মুসলমানের সংখ্যা হবে ৫১% আর হিন্দুর সংখ্যা ৪৯%, ফলে এখানেও সাম্প্র-দায়িক অশান্তি দেখা দিতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি দেখা দিলে, তার ছায়া পড়বে ভারতের সর্বত্র—ফলে এই উপ-মহাদেশের উন্নতি ব্যাহত হতে পারে।

যাই হোক বিপুল, সংখ্যক মানুষ থাকবে কোথায় সেই নিয়ে হবে একুশ শতকে সকলের মস্ত বড় মাথা ব্যথা। ভূ-পৃষ্ঠে মাত্র ১৫% জমি মানুষের বাসোপযোগী সীমিত পৃথিবীতে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি করেও তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই দেওয়া হবে শক্ত। বিল-বাদাড় ভর্তি করে ঘরবাড়ি করেও কূলকিনারা পাওয়া যাবে না তখন মানুষকে সমুদ্রের তলে এবং মাটির নিচে বাড়ি করে ইঁদুরের মত বিবরের বসবাসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। জাপান ত ইতিমধ্যেই মাটির নিচে ঘরবাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছে। জনাকীর্ণ টোকিও শহরের ৭৪৮ বর্গ মাইলের মধ্যে ৬ শতাংশ স্থানে মাটির নিচে বাড়ি তৈরী হয়েছে; কোন কোন বাড়ি তিন থেকে চার তলা পর্যন্ত হয়েছে। বৃহদায়তন বিদ্যুৎ-চালিত পাখা চালিয়ে ভেতরের আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। মাটির নিচের দূষিত বায়ু টেনে বার করবার জন্যে বড় বড় ventilator flue আছে।

দুই মেরু প্রদেশও মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলবার চেষ্টা হবে এবং কিছুটা সাফল্য দেখা দেবে।

থাকবার ব্যবস্থা যদি বা কোন রকমে হয়, খাওয়ার ব্যবস্থা কি করে হবে? পৃথিবীতে ১৪% হল মরুভূমি

আর এক ১৪% অর্ধ মরুভূমি, মাত্র ১০% জমি হল আবাদযোগ্য। যতই নিবিড় চাষ ও উন্নত ধরণের বীজ বপন করা হোক না কেন, এতগুলো মুখকে খাওয়ানোর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তাই জমিতে যেমন চাষবাস হয় সমুদ্রেও তেমনিভাবে চাষবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ সমুদ্রে মাছ, হাঙ্গর, কুমীর, শুশুক প্রভৃতি যত প্রাণী আছে সবই মানুষকে খেতে হবে। তাতেও কুলোবে না; তাই সমুদ্রের (শেওলা সমুদ্রের শেওলা থেকে এখনই কৃত্রিম গুঁড়ো দুধ তৈরি হচ্ছে এবং আমেরিকা থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে তা চালান যাচ্ছে) ও সমুদ্রতলের নানা উদ্ভিদ থেকে খাদ্য তৈরি হবে। কিন্তু তাতেও হয়ত সকলের খাদ্য জুটবে না; তখন সমদর্শী প্রকৃতি নির্মম হাতে তার প্রতিবিধান করবেন।

তাই এই শতকে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। আর এই মহাযুদ্ধ হবে পারমাণবিক যুদ্ধ; ফলে ২০।২৫ কোটি লোক হবে নিহত; আর যুদ্ধ শেষে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আরও ১০-১৫ কোটি লোক হবে নিঃশেষ। এইভাবে বিরাট প্রাণবন্যায় খানিকটা ভাঁটা পড়বে, প্রকৃতি ভারসাম্য রক্ষা করবেন। তারপর পৃথিবীতে আবার আসবে শান্তি। (American Academy's Commission on the year 2000 দ্রষ্টব্য।)

য়ুরোপ-আমেরিকায়, বিশেষ করে আমেরিকায় যে হারে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার হচ্ছে তাতে বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আজকাল আমেরিকানরা রান্না থেকে দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ান, সব কাজ বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রের সাহায্যে করছেন; ফলে শুধু তাঁরাই বছরে ১৮ ট্রিলিয়ন কিলওয়াট ঘণ্টা (১৮,০০০,০০০,-০০০,০০০) বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করছেন। এছাড়া আছে সারা দুনিয়া। সারা বিশ্বের এই অন্তহীন বিদ্যুৎ ক্ষুধা মেটাতে হয় কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ তেল জালিয়ে। যদিও পৃথিবীতে যে পরিমাণ কয়লা আছে তা আগামী ৭০০ বছর অনায়াসে চলে যাবে; আর তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, তার পরিমাণ অপরিমেয়; তবু আমেরিকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে বিরাট পরিমাণ কয়লা (বছরে একশ বিলিয়ন টন) খরচ হচ্ছে, তাতে বিজ্ঞানীদের খুব আপত্তি। তার কারণ কয়লার ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস ভয়ঙ্করভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় পরমাণবিক শক্তি ব্যবহারে; কিন্তু তারও পরিণাম ভয়াবহ। কাজেই বিজ্ঞানীরা পড়েছেন মহা সমস্যায়। তাঁরা বলছেন, এ হল সভ্যতার সঙ্কট— মানুষ আজ নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে আটকে পড়েছে। এর থেকে মুক্তি মেলা শক্ত (Next Hundred Years, by Harrison Brown, James Bonner and John Weir দ্রষ্টব্য।)

একুশ শতকে শিল্পোন্নত দেশে কলকারখানা থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বার হওয়ায় এবং সেখানকার দূষিত পদার্থ সব শোধন না করে নদী বা সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার ফলে আকাশ, বাতাস ও জল অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়বে। বিশুদ্ধ বায়ু আর নির্মল জল হয়ে উঠবে প্রায় দুষ্প্রাপ্য এবং তা পেতে হলে মানুষকে বেশ উচ্চ মূল্য দিতে হবে। আকাশ বাতাস নির্মল রাখবার জন্যে ছোট ছোট কোম্পানি গড়ে উঠবে। বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ একুশ শতকের প্রথম দিকেই প্রায় পঁচিশ শতাংশ বেড়ে যাবে। লোকে কন্‌জাংকটি-ভাইটিস, অপথেলমিয়া, গ্লকোমা ট্র্যাকোমা, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসে ক্যানসার প্রভৃতি শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটিত নানা রোগে এবং অবসাদ, নৈরাশ্য ও নানা মানসিক রোগে ভুগতে থাকবে। এ ছাড়াও ৪%-৫% নবজাতক বোবা, কালা বা জন্মান্ধ হবে; অনেক শিশু বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ক্যানসার রোগ নিয়েই জন্মাবে। মাতৃস্তন্যে সীসক বিষ দেখা দেবে। তখন সাধু-সন্তেরা হয়ত বলতে থাকবেন,— "হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর, ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর। হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম-দংশন-জর্জর স্থাবর জঙ্গম।"

সমাজ এত জটিল এবং কর্মজগৎ এত বিশাল ও বহুমুখী হয়ে পড়বে যে তখন কমপিউটার ছাড়া মানুষের গত্যন্তর থাকবে না। এখন কমপিউটারের ওপর যে

বিরাগ ও বিতৃষ্ণা দেখা যাচ্ছে সেটা দূর হয়ে গিয়ে একুশ শতকে মানুষ হয়ে পড়বে কমপিউটার-নির্ভরশীল। ছাত্রদের পরীক্ষায় খাতাপত্র দেখে মান নির্ণীত হবে কমপিউটার যন্ত্রের সাহায্যে। স্কুল কলেজে কমপিউটার ও টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুল রেকর্ড রাখা হবে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। গৃহশিক্ষকের কাছে ছাত্রছাত্রীরা যেমন ব্যক্তিগত মনোযোগ পায়, কমপিউটারও তেমনি ব্যক্তিগত মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা দিতে ও তাদের দুরূহ সমস্যাগুলোর সমাধানে রত থাকবে।

সমস্ত দেশে প্রতিটি ছেলেমেয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে। উন্নত দেশগুলোতে, বিশেষ করে য়ুরোপ-আমেরিকায় স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষা আর উন্নতশীল দেশগুলোতে স্নাতক-পূর্ব শিক্ষা হবে শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার সর্বনিম্ন মান। শিক্ষাব্যবস্থায় জীবিকা অর্জনের উপায় শিক্ষা দেওয়া হবে কিন্তু জীবনচর্যা শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। মানুষ হয়ে উঠবে আরও ভোগসুখ-ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ।

সমস্ত উন্নত দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে। আমেরিকায় এখনি প্রতি তিনটে বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণত হয়। অবৈধ সন্তানের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। আমেরিকায় প্রতি বছর তিন লক্ষের অধিক (গর্ভনিরোধ ও অস্ত্রোপচারের সবরকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও) অবৈধ সন্তান জন্মাচ্ছে। এই সংখ্যা হল পরিসংখ্যান তথ্য অনুযায়ী—পরিসংখ্যান বহির্ভূত কত অবৈধ সন্তান জন্মায়, তা কেও বলতে পারে না। জাপানেও ঐ একই রকম অবস্থা হবে। এই সব অবৈধ সন্তান সমাজে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হবে।

অন্যান্য আবিষ্কার

আগামী শতাব্দীতে য়ুরোপ-আমেরিকায় রতিজ রোগ (ভেনিরিয়াল ডিজিজ) মহামারী আকারে দেখা দেবে। এখনই আমেরিকায় এই রোগের সংখ্যা হল প্রতিদিন ৫,৫০০ অর্থাৎ প্রতি ১৬ সেকেণ্ডে একটি। যে পেনিসিলিন এতদিন কার্যকর হচ্ছিল তাতে এখন আর বিশেষ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন শতাব্দীতে এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হবে।

আগেই বলা হয়েছে য়ুরোপ আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। তাই দেখে সমাজবিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, একুশ শতকে সাময়িক বিবাহ (marriage of convenience) প্রচলিত হবে। চিরায়ত বিবাহরীতি চিরজীবন-ব্যাপী ভালবাসায় লোক ক্রমশঃ অসমর্থ হয়ে আসবে। তাই আমৃত্যু বিবাহবন্ধনের পরিবর্তে জনসাধারণ ক্রমশ সাময়িক বিবাহের দিকে ঝুঁকবেন। প্রথম থেকেই একথা জেনেই প্রেমিক প্রেমিকা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। যতদিন অসুবিধে না হবে, এ বন্ধন মেনে নেবেন। তারপর আবার মুক্ত—আবার যুক্ত। আবার ....। অর্থাৎ মানুষ ফিরে যেতে চাইবে মানব সভ্যতার সেই উদয় মুহূর্তে—যখন সভ্যকারের সামাজিক বন্ধন, দায়দায়িত্ব ছিল না (Brown, Harrison—The Challenge of Man's Future দ্রষ্টব্য) এর প্রভাব আমাদের দেশেও খানিকটা এসে পড়বে—এটা সুনিশ্চিত।

এই শতকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দেখে সমাজের বেশীর ভাগ লোক জড়বাদী ও ভোগসুখবাদী হয়ে উঠবে। ভাগ্য ও ভগবানে আস্থা হারিয়ে মানুষ ঘোর নাস্তিক হয়ে পড়বে। চার্চ, মন্দির, মসজিদ, মঠে লোক আর ভিড় করবে না, অধিকাংশ স্থানে এগুলোতে ঝাঁপতালা ঝুলিয়ে দিতে হবে, নয়ত সেগুলো মিউজিয়ম, পুস্তকালয় বা ছাত্রনিবাসে পরিণত হবে। পাদরি, পুরোহিত, মোল্লা লামাদের দাপট সমাজ থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে যাবে।

একুশ শতকে জন্মনিরোধ বটিকার পরিবর্তে জন্মনিরোধক খাদ্য আবিষ্কৃত হবে বলে কেও কেও বলছেন। ভারত পারমাণবিক কমিশনের অধিকর্তা

ডাঃ হোমি ভাবা জন্মনিরোধক ওষুধ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করবার সুপারিশ করেছিলেন। সেই মত নতুন শতাব্দীতে জন্মনিরোধক ওষুধ মিশ্রিত লবণ, শর্করা, চাল, রুটি এবং কিছু কিছু পানীয় বিশেষ বিশেষ দোকানে বিক্রির ব্যবস্থা হবে। এইসব খাদ্যের একটা গুণ হবে যে, বর্তমান কালের এই জাতীয় বটিকা সেবনে যে-সব কুফল দেখা যায়, এইসব খাদ্যে সে-সব কুফল দেখা দেবে না।

আগে যে বলা হয়েছিল মানুষের নাক, কান কি আঙুল কেটে গেলে, সে সব আবার গজাবার জন্যে ওষুধ আবিষ্কৃত হবে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, চিংড়ি মাছের দাঁড়া ভেঙে গেলে আবার গজায়, টিকটিকির লেজ কেটে দিলে নতুন লেজ, গোধিকার চোখ ও অপ্‌টিক নার্ভ নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো আবার গজায়; এসব তাঁরা চিংড়ি, টিকটিকি, গোধিকা প্রভৃতির ভ্রূণরস (embryonic fluild), তাদের দেহস্থ ফলার (টিশু) সার বা হরমোনের সাহায্যে ওষুধ তৈরি করে এই সব বহিরঙ্গ ও উপাঙ্গগুলো আবার গজিয়ে তুলবার ব্যবস্থা করবেন। এটা সফল হলে কৃত্রিম হাত-পা, দাঁত আর ব্যবহার করতে হবে না। অনেক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে এখন থেকেই গবেষণায় রত হয়েছেন। তাঁদের এ চেষ্টা সফল হলে, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের এবং কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অশেষ কল্যাণ সাধন হবে।

পৃথিবীতে আজকাল যেসব শিশু জন্ম গ্রহণ করছে তাদের মধ্যে ৪% শতাংশ জন্মগত (জেনেটিক ডিজিজ্‌) কোন না কোনো রোগে ভুগছে। আজকাল নিশ্চিত-ভাবে জানা গেছে; Mongolism, Phenyl Ketonuria (P K U), Schizophrenia, Hemophilia প্রভৃতি কয়েকটি রোগ জন্মগত এবং শরীরাণুর ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে ঘটে থাকে। জিনের (gene) মধ্যস্থ শরীরাণু-বাহিত এইসব রোগের জীবাণু লেসার আলোক রশ্মি ও রেডিএশনের সাহায্যে মাইক্রোসার্জারি করে শিশুকে সবল, সুস্থ ও নিরোগ করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও ইচ্ছামত Y-chromosome-এর সম্মিলন ছাড়াই (যা অত্যন্ত দুরূহ) দম্পতি যাতে ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ করতে পারে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষা ১৯৭০ সালেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এটা আরও জোরদার হবে আগামী শতকে। এখনই ভ্রূণের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের আলোক সম্পাত করে হাঁস-মুরগীর গর্ভে স্ত্রী শাবককে পুং শাবকে পরিণত করা আংশিকভাবে সফল হয়েছে। উচ্চতর স্তন্যপায়ী জীবের ওপর এ-পরীক্ষা এখনও করা হয় নি। একুশ শতকে এই পরীক্ষা মানুষের ওপর করা সম্ভব হবে এবং এই লিঙ্গ পরিবর্তনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক গুণের কোন পরিবর্তন হয় কি না, অর্থাৎ পরিবর্তিত পুরুষ সন্তানটি মেয়েলী ভাবাপন্ন আর কন্যা সন্তানটি পুরুষালী ভাব পায় কি না সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করা হবে।

Dr. Augustus B. Kinzel বলেছেন, "মানুষের বার্দ্ধক্যকে এমন আমোঘ আঘাত হানব যে দুর্ঘটনা ছাড়া মানুষের মৃত্যু সাধারণত হবে না।" (The Second Genesis পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য।) হাড় ভেঙে গেলে ধাতু নির্মিত হাড়, ডেক্রনের তৈরি ধমনী, ইলেকট্রনিক পেশীও তৈরী করা হবে। এর ফলে মানুষের ২০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। (Gordon Taylor —The Biological Time Bomb দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞানীরা ১৯৬৫ সালে বলেছিলেন, একুশ শতকের আগে টেস্টটিউবে বেবি তৈরি করা সম্ভব হবে না। এটা কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে ইটালির এক বিজ্ঞানী, Donicle Petrucci একটি স্ত্রী-ডিম্ব এমোনাইট দ্রাবকে চুবিয়ে শোধন করে নিয়ে একটি শুক্রকীটের সঙ্গে মিলন সাধন করে একটি ভ্রূণের সৃষ্টি করেন। ভ্রূণটি ২০ দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। একুশ শতকে এই পদ্ধতির আরও উন্নতি হবে। তখন নারীদের আর গর্ভযন্ত্রণা, শারীরিক অসোয়াস্তি সহ্য করতে হবে না, অথচ প্রয়োজনমত সন্তান পাবেন (Wolstenholme Gordon—Man and his Futur দ্রষ্টব্য) এই প্রসঙ্গে একজন লেখক যে ব্যঙ্গোক্তি

করেছেন, সেটাও এখানে উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। তিনি বলেছেন, তা হলে ত একুশ শতকে পুত্র কন্যা উৎপাদনের জন্যে বড় বড় কারখানা বানাতে হবে, আর তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য দোকানে থাকে থাকে সাজানো থাকবে। নিঃসন্তান দম্পতিরা সেখানে গিয়ে পুতুল কেনার মত পছন্দমত নানা ধরণের নবজাতক কিনতে পারবেন। আর কারখানা থাকলেই ধর্মঘট লক আউট প্রভৃতি হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে ধর্মঘট হলে মালিক ও শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—জনসাধারণ নয়।

কর্ণওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফ্রেডারিক ষ্টিউওয়াড´ পরাগের সাহায্য ছাড়াই গাজর ও তামাক গাছ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাঁর প্রক্রিয়াটি হল এই রকম: একটা পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে একটা কোষ (cell) নিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধিত করে তা থেকে গোটা তামাক বা গাজর গাছ তৈরী করেছেন। এই গাছে বীজ ফলানো সম্ভব হয়েছে এবং সেই বীজ থেকে আবার নতুন গাছও জন্মানো সম্ভব হয়েছে। এই রকম পরাগ ও গর্ভকেশরের আশ্রয় না নিয়ে নতুন গাছের সৃজন পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় cloning বলা হয়।

পূর্ণবয়স্ক জীবজন্তুর প্রতি কোষের কেন্দ্রীন (নিউক্লিয়াস) ও পরীরাণুর (ক্রোমোসোম) মধ্যে জীবের ক্রমাভিব্যক্তির সমস্ত সংবাদ মেলে। তাই জানতে পেরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জে. বি. গর্ডন মাইক্রোপিপেটের সাহায্যে আফ্রিকা দেশীয় একটি ব্যাঙের একটি অ-নিষিক্ত (un-fertilized) ডিম্ব বার করে নিয়ে বিকিরণের (রেডিএশন) সাহায্যে তার কেন্দ্রীনটি নষ্ট করে ফেলেন। তারপর অপর একটি ব্যাঙের দেহকোষ নিয়ে তার কেন্দ্রীনটাও ছোট্ট একটি যন্ত্রের সাহায্যে বার করে নিয়ে সেটি পূর্বোক্ত ডিম্বকোষে রোপণ করেন। তার ফলে যে নতুন কোষ সম্মিলনের (cell combination) সৃষ্টি হল, সেটি স্বাভাবিক দেহ-কোষের মতই বৃদ্ধি পেয়ে বিভক্ত হতে লাগল এবং তার ফলে ব্যাঙাচির সৃষ্টি হল। এই প্রক্রিয়ায় যৌন সংসর্গ ছাড়াই অসংখ্য একই রকমের ব্যাঙ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রক্রিয়া উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীব নিয়ে এখনও পরীক্ষা করা হয় নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০১০ সালে হাঁস-মুরগী, শূকর ও গবাদি পশুর উপর এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চেষ্টা করা হবে এবং সে চেষ্টা সার্থক হলে, অসংখ্য হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু অল্প সময়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে আর তার ফলে মাংস, ডিম ও দুধের পরিমাণ ৫০% --১০০% শতাংশ বেড়ে যাবে।

মানুষ নিয়ে কি এই পরীক্ষা চলবে? হ্যাঁ, ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানুষ সৃষ্টি করবার চেষ্টা হতে পারে। ইলিনইস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়লজির অধ্যাপক কিম্বেল এটউড এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডাঃ যশুয়া লেডারবার্গ বলছেন, ২০২০ সালে মানুষ মানব-দেহ-কোষের কেন্দ্রীন থেকে অযোনিসম্ভব (asexual) অসংখ্য মানব-মানবী সৃষ্টি করতে পারবে এবং সেগুলো কার্বন কপির মত দেখতে একই রকমের হবে মনে হবে যেন সবাই যমজ সন্তান। কাজটা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন বলে তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন (Rosenfield—The Second Genesis, পৃঃ-১৩৮ দ্রষ্টব্য) তবে যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এর আর প্রয়োজন হবে না; শুধু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষণার জন্যেই এবং মানুষ যে সৃষ্টিকর্তার চেয়ে কিছু কম নয়, শুধু সেটাই প্রমাণের জন্যে বিজ্ঞানীরা এর পরীক্ষা চালাবেন। আলবার্ট রোজেনফিল্ড এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "When this kind of biological sophistication has been attained, when man can write out detailed genetic messages of his own, his powers become truely godlike." (The Second Genesis—পৃঃ ১৪০ দ্রষ্টব্য।) এক কথায় মানুষ ভগবান ভগবান খেলা আরম্ভ করে দেবে।

এই প্রক্রিয়ার একটা অসুবিধা হল, এর ফলে এক সঙ্গে শত শত চেঙ্গিজ খাঁ, নাদির শাহ, ইয়াহিয়া খান সৃষ্টি হতে পারে, আবার শত শত আইনষ্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, চৈতন্যদেবও সৃষ্টি হতে পারে।

আজ যে মানুষ "ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে" ভিক্ষা না চেয়ে আপন হাতে আপন ভাগ্য রচনা করতে চলেছে, তাতে অনেক নীতিবাগীশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Leroy G. Augenstein প্রশ্ন তুলেছেন, "বিজ্ঞান ভয়ঙ্কর দ্রুত-গতিতে এগিয়ে চলেছে কিন্তু বিজ্ঞানের দান, সেই নব-লব্ধ শক্তিকে আমরা অনেক সময় ঠিকমত ব্যবহার করতে পারছি নে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রতিদিন যে রকম অসম্ভব উন্নতি হচ্ছে তাতে অনেক সময় নীতি ও ধর্মবিষয়ক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে—যে সঙ্কটের সমাধান শুধুমাত্র বাস্তবতা দিয়ে করা যায় না।

একুশ শতকের পৃথিবীতে বিজ্ঞানের এই অবিশ্বাস্য জয়যাত্রা, এই দুর্বার গতির কথা যা আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা তারস্বরে ঘোষণা করছেন, তাই শুনে অনেক অবিশ্বাসী হয়ত বলবেন, এ ত বিজ্ঞানের কথা নয়, এ হল কল্প-বিজ্ঞানের (সায়েন্স ফিক্‌শনের) কথা। এ কথা বলবার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, জুল ভার্ণ, হাক্সলি, ওয়েল্‌স্, আর্থার ক্লার্ক প্রভৃতি যেসব মনীষী কল্প-বিজ্ঞান বিষয়ে লিখেছেন, সেগুলো সবই আজকের দিনের বিজ্ঞানের অগ্রদূত, একথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। আজ যা কল্প-বিজ্ঞান, আগামী যুগে সেটাই হবে সত্যিকারের বিজ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা......মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে ব্যক্তে পরিণত করে মানুষ সৃষ্টি করে চলবে অনন্ত কাল ধরে। সে কোনদিনই বলবে না, "আমার কাজ হয়েছে সারা/এখন প্রাণে বাঁশী বাজায় সন্ধ্যা তারা।/ দেবার মত যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে।"

উপসংহারে বলি, একুশ শতকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অভাবনীয় উন্নতি হবে, অনেক অসম্ভব সম্ভব হবে; তবে মানব চরিত্রের কোন মৌল পরিবর্তন হবে না। এখনকারই মত সুখ দুঃখ দুটি ভাই আগামী শতকেও হাত ধরাধরি করে চলতে থাকবে। আলো-ছায়ার সম্মিলিত অভিযাত্রাই জীবনের পথের রূপ বিচিত্র করে তুলবে, হাসি-কান্না হীরে-পান্না এখনকারই মত জীবনকে মধুময় করবে।

সাবিত্রীর ঋষি কবি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

(দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার" সুরে গেয়)

পায় না আভাস মন যে-জ্যোতির সে ছিল তোমার চরণদাস,
এসেছিলে তুমি সে-অমিতাভায় করিতে গহনে সুপ্রকাশ।
নীরদ নিলীন যে-মণিমৌলি অসীন ছিলে সে-ধ্যানচূড়ায়,
তাই আনন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, আমরা প্রণাম করি তোমায়।

গেয়েছিলে তুমি : "পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তণে,
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে।

"মৃন্ময় দেহে শিব চিন্ময় বিগ্রহ তাঁর উজ্জ্বলি'
আসেন বেদনা-অশ্রু মুছাতে কোমল করুণা উচ্ছলি'।
জীব অমৃতের সন্তান, তাই শিবসালোক্য চাহিবে সে
জন্মাধিকার করি' দাবি মাতৃ মন্ত্র মহিমা গাহিবে সে।"
গেয়েছিলে তুমি : "পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তণে,
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে।"

"তাঁরি নিশ্বাসে উল্লাসে প্রাণী নিশ্বাস লয় আলোছায়ায়,
তাঁরি দৃষ্টির বরে দেখে শোনে তাঁরি বাঁশি মধুমূর্ছনায়।
ভগবানে চায় যে হয় বন্দী শরণানন্দ-নিগড়ে তাঁর,
প্রেমের পতাকাবাহী তরে তাঁর জ্ঞান মন্দির খোলে দুয়ার।"
গেয়েছিলে তুমি : "পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তণে ,
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে।

"জড়বিজ্ঞানকীর্তিসৌধে মিলে না মুক্তিদিশা ধরায়,
অপারে পারানি পায় জীব শুধু পারীর মহিমময়ী কৃপায়।
মানব জীবন নয় শুধু এক ক্ষণভাঙা সুখফেনমাতন,
পৃথিবী ঝুলনা বালগোপালের—বীরবৃন্দের রণাঙ্গন।"

গেয়েছিলে তুমি : "পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তণে,
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে।

"সুখসঙ্কট পাপপুণ্যের সোপানবাহিনী সৃষ্টি তাঁর,
দৈবী সুষমা-বিকাশের পথে সাধনার চিরদুরভিসার।
প্রতি তনু অণু মজ্জার এক অমরাশক্তি বরে মহান্,
চিন্তামণির চিন্তাপুলক-অভিযান ধ্রুব, নিরবসান।"

গেয়েছিলে তুমি : "পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তণে,
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে।"

৬৭২ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

যথাশীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ নিবৃত্তি চেষ্টা করিয়া এই রাষ্ট্র নিজ শান্তিপ্রিয়তা প্রমাণ করিয়াছে। একথা যদিও সর্ব্বজনবিদিত যে ভারতে এখনও শতকরা ৫০ জন বালক বালিকা শিক্ষালাভ না করিয়াই দিন কাটাইতেছে, তাহা হইলেও সেই শিক্ষার অভাব যে-সকল কারণে উপস্থিত হইয়াছে তাহার মূলে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই যে শাসকদিগের অবহেলা বর্ত্তমান আছে তাহা বলা যায় না। সকল ব্যবস্থা ও চেষ্টা থাকিলেও অনেক স্থলে বালক-বালিকাগণ শিক্ষা লাভ করিতে যায় না! ইহার জন্য তাহাদিগের পিতামাতারাই অধিক ভাবে দায়ী। দূর দূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক না থাকায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই। বাঁধান রাস্তা নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া যাইলে ও শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে পরে শিক্ষার ব্যবস্থা শীঘ্র শীঘ্র প্রসার লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। কারখানাবাদ প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করিয়া সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হয় নাই। ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব্ব করিয়া সেই অধিকার রাষ্ট্রকবলিত করিয়াও ৫৫ কোটি মানুষের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয় নাই। হইতেও পারে না। এই সকল সত্য বিলম্বে উপলব্ধি করিলেও জাতীয় অর্থনীতি ও শাসনরীতি ঐ উপলব্ধির ফলে কোন না কোন সময় সফলতার পথে চলিতে আরম্ভ করিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

স্বাধীনতা লাভের সময় আমরা ভাবিয়াছিলাম যে অতঃপর জাতির চরিত্র ক্রমশঃ আরও উন্নত হইবে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য আহরণের আগ্রহে জাতির বহু ব্যক্তি দুর্নীতির পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শাসক গোষ্ঠীকেও বলা যায় যে তাঁহারা যে জুয়া খেলা (লটারি), মদ্যপান প্রভৃতির প্রশ্রয় দিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহা প্রশংসনীয় নহে এবং তাঁহাদের উচিত ঐ পথ ছাড়িয়া উন্নততর আদর্শের পথেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করা। কারণ আমরা যদি জাতিগত ভাবে সুনীতি ও ধর্ম্মের পথেই থাকি তাহা হইলে আমাদের কারখানাবাদ ও সামরিক শক্তি আহরণের দিকে ততটা ঝুঁকিবার প্রয়োজন থাকিবে না। অথবা যদি আমরা পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই চলিতে চাহি তাহা হইলে আমাদের উচিত হইবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে সকল দিক হইতে অগ্রসর হওয়া ও অহিংসনীতি সম্বন্ধে কোন গভীর আগ্রহ পোষণ না করা। পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংমিশ্রণ কোন সময়েই রাষ্ট্রীয় উন্নতির পন্থা হইতে পারে না। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের এই সত্য ঐকান্তিক ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ফরক্কা (২)

মুদ্রনকার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে জানা গেল যে ফরক্কা সম্বন্ধে শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শাসকদিগের সহিত যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে ফরক্কা হইতে যে খাল দিয়া ভাগীরথীতে জলস্রোত বৃদ্ধি করা হইবে সেই পথে খাল কাটা শেষ হইলে পরে প্রথম পাঁচ বৎসর প্রয়োজন মত ৪০০০০ কিউসেক জল আনিবার আয়োজন করা হইবে। পরে দুই বৎসর জলস্রোত প্রয়োজন মত বাড়ান কমান চলিবে এবং সেই প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। অনুসন্ধান চলিবে যে পাঁচ বৎসর ৪০০০০ কিউসেক জল ছাড়া হইবে সেই পাঁচ বৎসর ধরিয়া। উপস্থিত কালে যে বন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল মনে হয় তাহার একটা নিষ্পত্তির সম্ভবনা দেখা যাইতেছে এবং কয়েক বৎসর সময় পাইলে অপরাপর উপায় সৃষ্টি হইবে যাহা দ্বারা কলিকাতা বন্দরের পরমায়ু বৃদ্ধি যথাযথভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। সিদ্ধার্থ শঙ্কর সক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

তাজ্জব কাহিনী

বহুদিন আগের কথা—তখন প্রত্যেক রাজার সভায় একটি করে নবরত্ন মণ্ডল দেখা যেত, এমন কি নবাবজাদাদের মহলেও এরকম মণ্ডল প্রায়ই দেখা যেত। কান্দাহারের নবাবজাদা আমানুল্লা খাঁয়ের দরবারে বহু বিজ্ঞ ও অদ্ভুত লোক দেখা যেত এবং খাঁ সাহেব নিজেও খুবই সৌখিন ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও আদবকায়দায় সকলেই মুগ্ধ হতো। তবে তাঁর সভায় আর কারো সৌখিনতার বা বিজ্ঞতার তারিফ তিনি করতে দিতেন না, বরং তাঁকেই সব বিষয় সকলকে তারিফ করতে হতো। নিজ গুণ নিয়ে তিনি খুবই তন্ময় থাকতেন কারণ তিনি মনে করতেন যে ধনে-মানে-যশে ও খ্যাতিতে দুনিয়ায় তাঁর তুল্য কেউ ছিল না। —কিন্তু এমন দিন শেষে এলো যখন খাঁ সাহেবকে অন্য লোকের কাছে হার মানতে হলো, আর সেও কি না এক বিদেশীর কাছে।—

একদিন দরবারে সব বিখ্যাত যোদ্ধারা একসঙ্গে বসে খাচ্ছেন এমন সময় বাইরের দরজায় মহা সোরগোল শোনা গেল ও অল্পক্ষণ পরে সকলে দেখলেন যে একটি আগন্তুক কাল ঘোড়ায় চড়ে দরজার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। খাঁ সাহেব তাঁকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করে নিজের পাশে বসালেন ও তাঁর নাম পরিচয় জানতে চাইলেন।

আগন্তুক বল্লেন, "আমার নাম তাজ্জব খাঁ। আপনার দেশের বহু আশ্চর্য্য কথা শুনে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।—কে না জানে আমানুল্লা খাঁ সাহেবের নাম? আমার দেশ হিন্দুস্থান—সেখানের লোকেরাও আপনার কথা শুনেছে।"

এই সব শুনে খাঁ সাহেব খুব খুশী হলেন। অতিথিকে নানা ভাবে যত্ন করতে লাগলেন। সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আরাম করে গল্প করতে বসলেন। রাত্রি গভীর হতে লাগল, সকলের মেজাজও সেই সঙ্গে খুশী হতে লাগল, আর গলার শব্দের মাত্রাও চড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে খাঁ সাহেবের গলার স্বরই আর সকলের উপরে শোনা যেতে লাগল। কেবল আগন্তুক চুপ করে এদের সব কথা শুনতে লাগলেন। দেখা গেল যে এদের গল্পের মূলে আছে কিছু না কিছু সম্পত্তি নিয়ে গর্ব্ব করা, আর খাঁ সাহেব সকলের চেয়ে বেশি এই রকম গল্প বলে চলেছেন।

ভোর রাত্রে সভা ভাঙবার মুখে খাঁ সাহেব বিদেশীকে বল্লেন, "কি হে আগন্তুক, তোমার গলার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম না একবারও। তোমার কি কিছুই বলবার নেই? তুমি কি এতই গরীব যে কোন সম্পত্তি উল্লেখ করে গর্ব্ব করতেও পার না?"

তাজ্জব খাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লো, "খাঁ সাহেব, ভাবছিলাম। আপনারা এত ছোট জিনিস নিয়ে এত বড় গল্প ফাঁদছেন যে আপনাদের সামনে আমার মুখ খুলতে লজ্জা করছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমার বহু সম্পত্তি, আপনার থেকে হাজার গুণ বেশি। এই ধরুন, আপনার বেগম সাহেবা আমার মায়ের ঝিয়ের মত পোশাক পরেছেন। আর ওই গহনাগুলি কোন আমিরের ঘরের মেয়েদের উপযুক্ত নয় আমাদের দেশে। এই সব কারণে আমি চুপ করে আছি।"

তাজ্জব খাঁর কথা শুনে খাঁ সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বাকি সকলে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে আরম্ভ করল। কেউ বল্লো, "এ কি রকমের আদব-কায়দা? বেগম সাহেবকে অপমান করছে।" অন্যরা বল্লো, "খাঁ সাহেবকে নিচু নজরে দেখছে!"

তাজ্জব খাঁ বল্লো, "বন্ধুগণ, রাগ করছ কেন? আমি তো সত্যি কথাই বলছি। তোমাদের এই শুকনো পাহাড়ে দেশ আর আমাদের হিন্দুস্থানের অনেক তফাৎ। আমাদের কুঁড়েঘরগুলিরও এখানের বাড়ীর থেকে শ্রী আছে বেশি। এখানের রাস্তা পাথর ভর্তি, ঘোড়া ঠিক মতন চলতে পারে না। আর আমাদের রাস্তার হলুদ রংএর বালুর উপর সমানভাবে পশমের গলিচা দিয়ে ঢাকা। এখানের খাবার পুষ্টিকর, কিন্তু আমাদের খাবারের মত সুস্বাদু নয়, এখানের সাজ-পোশাকে শীত আটকায় বটে কিন্তু আমাদের পোশাকের মত সেগুলির চটক ও জাঁকজমক নেই। এখানের ধনী লোকেরা আমাদের তুলনায় গরিব, এমন কি আমার একটি সিন্দুকে যা ধনরত্ন আছে তা ভাল করে হিসেব করলে আপনার এই কান্দাহারকে কিনে নেওয়া যায়!"

এত বড় কথা শুনে সকলে বাক্যহীন হলো। খাঁ সাহেব তারপর বল্লেন, "বটে, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার যে আমার সঙ্গে তুমি টেক্কা দিতে চাও? বেশ, এই ৫০,০০০ মোহর বাজি রাখা যাক্। তুমি এক বছর বাস করবে এই কান্দাহারে আর প্রত্যেক দিন আমরা দু'জনে নূতন সাজপোশাক পরে রাস্তার জনসাধারণের সামনে ঘুরব। তারা রায় দেবে কে বেশি ধনী ও সৌখিন। এক বছর শেষ হলে, যে জিতবে সে মোহরগুলি পাবে।"

বাকি লোকেরা সকলেই এতে রাজি হলো। বিদেশী তখন একটি চিঠি লিখে তার কাল ঘোড়াটির লাগামে সেটি বেঁধে তাকে—"কাল, ছুটো। মার কাছে গিয়ে আমার সব পোষাক নিয়ে এসো।" ঘোড়া তীর বেগে ছুটে চল্লো এবার আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তার বাড়ী পৌঁছে গেল।

তাজ্জব খাঁর মা বিখ্যাত যাদুকর। তিনি ছেলেকে কিছু কিছু বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। ছেলের চিঠি পেয়ে ঘরের ভিতর থেকে দু'টি ছোট তোরঙ্গ বার করে ঘোড়ার পিঠে সেগুলি বাঁধলেন। তারপর ঘোড়াকে বল্লেন, "কাল, এতে তিন শ নূতন পোশাক আর অনেক হীরা জহরৎ আছে। আমার ছেলের কাছে এগুলি পৌঁছে দাও।" ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে তীর বেগে কান্দাহারের রাস্তায় এগিয়ে চল্লো ও অল্পক্ষণের মধ্যে খাঁ সাহেবের রাজ্যে এসে পৌঁছল।

রাজবাড়ীর সামনে আমানুল্লা খাঁ তাঁর সঙ্গীসাথী নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাজ্জব খাঁর দেশের জিনিষপত্তর দেখবার জন্য। ঘোড়ার পিঠে দুটি ছোট তোরঙ্গ দেখে সকলে গড়িয়ে গড়িয়ে হাস্‌তে লাগল। হা, হা, হা, তাজ্জব সাহেব, এই বাক্সে এক বছরের পোশাক আছে তোমার? আর কোথায় তোমার সেই ধনরত্ন যা দিয়ে তুমি কান্দাহার কিন্‌ছিলে?" মোহরগুলি বোধ হয় কান্দাহারেই রইল।

কিন্তু পরদিন সকালে যখন খাঁ সাহেব নূতন পোশাক পরে ঘোড়ায় চেপে এসে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল যে তাজ্জবও চমৎকার পোশাক পরে কাল ঘোড়ার পিঠে চলেছে। উপরন্তু কালর গলায় খাঁ সাহেবের বেগমের মত গহনা ঝুল্‌ছে। ওই ছোট তোরঙ্গ থেকে সকলের চোখের সামনে দু'শ নিরানব্বই নূতন পোশাক তাজ্জব খাঁ বের করে পরল। দু'ইজনের সাজ পোশাক দেখে জনসাধারণ হতভম্ব—হার জিৎ কি হবে এ'কথা নিয়ে সকলেই আলোচনা শুরু করেছে।

শেষের দিন সহরের লোক সকলেই এই রাস্তার দু ধার জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমে আমানুল্লা খাঁ এলেন। তাঁর গায়ে সোনালি রংয়ের কিংখাবের পোশাক যার প্রত্যেকটি বোতাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মূর্ত্তির মত খোদাই করা। যুবকবৃন্দ বাঁশি বাজাচ্ছে আর যুবতীরা সরবৎ খাচ্ছে ও মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে নাচ্‌ছে। খাঁ সাহেবের পায়ে সবুজ জুতো জরির কাজে ভরা, জহরৎ বসান টুপি ও গায়ে অমূল্য শাল-দোশালা জড়ান। যেই না খাঁ সাহেব বোতামগুলি ছুঁয়েছেন অমনি যুবকদল বাঁশি বাজাতে শুরু করল ও মেয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সভার সকলে "সাবাস সাবাস" বলে চিৎকার আরম্ভ করল।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তারা তাজ্জব খাঁকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে চুপ করে গেল। তার পরণেও কিংখাবের পোশাক, পায়ে জরির নাগরাই জুতো, মাথায় মণিমুক্তা বসান টুপি ও একটি সোনার পাতের তৈরি আলোয়ান সর্বাঙ্গে জড়ান।

তার বোতামগুলি ছোট ছোট পাখি ও সাপের মত খোদাই করা। যে মুহূর্ত্তে সে বোতামগুলিতে হাত দিল তখুনি পাখিগুলি উড়ে ঘুরতে লাগল। তাদের সুমিষ্ট গানে সভা ভরপুর। সাপগুলি ফণা ধরে ফোঁস ফোঁস করে দুলতে লাগল। হঠাৎ তারা মাথা বাড়িয়ে এগিয়ে এসে খাঁ সাহেবের বোতামগুলিকে সব গিলে ফেল্লো।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। তখন খাঁ সাহেব নিজে এগিয়ে এসে তাজ্জবখাঁকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "সাবাস্—আপনারই জিত হলো। চলুন, মোহরগুলি আপনাকে দি।"

কিন্তু তাজ্জব খাঁ বল্লো, "খাঁ সাহেব, এ কয়টি মোহর আমার কাছে কিছুই নয়। বাজিতে জিত হয়েছে তাই যথেষ্ট।" এই বলে জনসাধারণকে মোহরগুলি সব দান করে দিল। বিস্মিত সভামণ্ডলী এই দৃশ্য দেখতে লাগল। এমন সময় একটা ঘোর ধূলার ঝড় উঠল। সকলে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ তারপর হাওয়ার বেগ কেটে যেতে চোখ খুলল। চেয়ে দেখল তারা যে, বহুদূরে সেই ঝড়ের মধ্যে তাজ্জব খাঁ কাল ঘোড়াটির পিঠে চড়ে দ্রুতবেগে উধাও হয়ে গেল।

সাময়িকী

রামমোহন

"Rammohan stands in history as the living bridge over which India marches from her unmeasured past to her incalculable future."

এত অল্প কথায় এত বেশী করে রামমোহনের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। নিরর্থক আচার অনুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে নির্বাপিত করে দিয়েছিল, রামমোহন সেই অসারতা, সেই আবর্জনা থেকে প্রাচীন ধর্মকে পরিস্রুত করে তাকে, প্রাচীন কাল থেকে নবীন কালের মধ্য দিয়ে যে চিরন্তনের ধারা চলছে তার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। যে গতিবেগের মধ্য দিয়ে প্রাচীনতা নিরন্তর নবীনতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, সেই গতিবেগ দেশের জীবনে তিনি সঞ্চারিত করে দিলেন। আজ দুশো বছর পরেও আমরা দেখি, সেই যে প্রেরণায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, প্রতিবাদের মধ্যে, বিরুদ্ধতার মধ্যে তার স্রোত বিচিত্রভাবে, সংঘাতের আবর্তে প্রবল ভাবে আজো বহে চলেছে। আমি এক ব্যক্তিকে, যিনি কোনো বিশেষ ডিগ্রীতে, বা খেতাবে বা পদমর্য্যাদায় চিহ্নিত নন, যিনি জনসাধারণেরই একজন, তাঁকে তিন-চার দিন আগে প্রশ্ন করেছিলাম—এই যে রাজা রামমোহনের কথা আজকাল শুনতে পাচ্ছি, তিনি কে? উত্তর পেলাম, আপনি বা আমি আজ যা হয়েছি, তা তিনি ছিলেন বলেই হয়েছি। এত তাৎপর্য্যপূর্ণ কথা আমি খুব কমই পড়েছি বা শুনেছি।

রামমোহন তাঁর জীবিত কালে দুটি জিনিষের সমাপ্তি দেখে যেতে পেরেছেন—এদেশে সতীদাহ প্রথা রোধ ও ইংল্যাণ্ডে Reform Bill পাস হওয়া। এই দ্বিতীয় বিষয়ে রামমোহনের যে কতখানি আগ্রহ ছিল ও প্রথমটির জন্য তিনি কি ভাবে যুঝেছিলেন সে বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে এবং আমি আশা করি অন্য অনেকেই এসকল কথার বিশদভাবে আলোচনা করবেন। কিন্তু এই দুটি কাজ ছাড়াও আরও বহুদিকে তাঁর কর্মতৎপরতা বিস্তৃত ছিল; তার অনেক কাজ তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু তার মধ্যে এমন প্রাণাবেগ তিনি সংক্রামিত করে দিয়েছিলেন যে তাঁর জীবনাবসানের পরেও সেই সব কর্মের গতিবেগ স্তিমিত ত হয়ই নি, নানাদিক থেকে শক্তি সংগৃহীত হয়েছিল ও তারা পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল। শুধু তাই নয়, তারা নানা দিকে শাখায়িত হয়ে রূপায়িত হয়েছে ও হচ্ছে বহুবিধ পরিকল্পনার মধ্যে। কেবল ভাঙা বা রক্তপাত বিপ্লব নয়—একটা উচ্চতর বৃহত্তর আদর্শকে স্থাপিত করার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিকূলতার মধ্যে যে পরিবর্তন আনতে হয় সেটাই বিপ্লব। মানসিক বিপ্লব আসে আগে। তাকে অনুসরণ করে বিপ্লবের অন্য যা কিছু আনুষঙ্গিক। আধুনিক যুগে, আমাদের দেশে এই বিপ্লবের আগের উচ্ছ্বাস উৎসারিত করেছেন রামমোহন সর্বপ্রথমে। বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে প্রকৃত (সাচ্চা) বিপ্লবীদের তিনি প্রধান পুরোধা। একাকী রামমোহন যা শুরু করে গিয়েছিলেন, যে যে পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—ধর্মে, শিক্ষায়, সমাজ সংস্কারে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, মানবিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সাধনায়, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায়, রায়ত ও জমিদারের সম্বন্ধ সম্পর্কে (যাকে আজ আমরা শ্রেণীগত পার্থক্য বলে অভিহিত করি)—আজ দুশো বছর পরেও সেই

সব কাজের ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, একজন মানুষের জীবনের ইতিহাসে এই ধারাবাহিকতা এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। আমি এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মাত্র।

আরেকটা জিনিষ আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করে, সেটা হচ্ছে তাঁর একান্ত নিজের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্যের বা উপাদানের স্বল্পতা। জনসাধারণের জন্ম তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর ক্রিয়াকলাপের সাময়িক বহু সাক্ষ্য রয়ে গেছে; রয়েছে তাঁর বই, ফার্সীতে, ইংরেজীতে, বাঙলায়; রয়েছে তাঁর চিঠিপত্র বিশেষ করে ইংরেজীতে, রয়েছে তাঁর সংবাদপত্রসমূহ, রয়েছে তাঁর শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্ক, হিন্দু পণ্ডিতদের ও ক্রিশ্চান মিশনারীদের সঙ্গে, রয়েছে তাঁর প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, রয়েছে তাঁর স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও অপরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজে সাহায্যের কথা, রয়েছে লেখা মারফত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের Select Committeeর কাছে তিনি যে সব মতামত পেশ করেছিলেন। এই সব কর্মের বর্ণনা, তাঁর এই সব কীর্ত্তি প্রোথিত রয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পথে পথে, এরা তার স্মৃতি-সৌধরূপে শুধু স্থাবর ভাবে পড়ে আছে তাই নয়, এদের মর্মবাণী আজো ধ্বনিত হচ্ছে অনেক সুরে অনেক ছন্দে, বৃদ্ধি পেয়েছে তারা, পরিণতির পথে প্রসারিত হয়েছে।

কিন্তু নেই সমসাময়িক কালে দেশী ভাষায় দেশবাসীর দ্বারা রচিত তাঁর জীবনী। এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বলে মনে হয়। অন্তদিকে তাঁর কীর্ত্তির যদি কোনো দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত বাস্তব প্রমাণ না থাকত তবে কোনো অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এতদিনে অতিসূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগ করে প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে রামমোহন বলে কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন না। সমস্ত ব্যাপারটাই এক পক্ষপাতদুষ্ট সম্প্রদায়ের, দেশী ও বিদেশীদের কল্পনাপ্রসূত রূপকথা, অলীক কাহিনী। এমন কি তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

এদেশের তখনকার কালের প্রচলিত ভাষায়, সংস্কৃতে, ফার্সীতে, আরবীতে, হিন্দুস্থানীতে বা বাঙলায় সমসাময়িক কালে লেখা তাঁর কোনো জীবনী নেই। কারণ আর যাই হোক—উপাদানের অভাব নয়। একটা কারণ হতে পারে—তিনি একাকী অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁর ধ্যান ধারণা সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করে দূর ভবিষ্যের দিকে এত ছড়িয়ে পড়েছিল, যে এদেশে তখন এমন কোনো লোক বা দল ছিল না, যিনি বা যাঁরা তাঁর সার্বভৌমিক ও সর্বাঙ্গীণ ভাবধারার সম্ভাবনা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন।

রামমোহনের সমসাময়িক কালে জীবনী লেখার জন্ম আমরা বিশেষভাবে ঋণী দুজন ইংরেজ মহিলার কাছে। তাঁদের নাম, মিস্ সোফিয়া ডেব্‌সন কলেট ও মিস্ মেরী কার্পেন্টার।

রামমোহন নিজেও কোনো আত্মজীবনী লিখে যান নি। Athenæum পত্রিকায় ৫ই অক্টোবর ১৮৩৩ এর সংখ্যায়, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রামমোহনের লেখা একটি পত্র ছাপা হয়, যাঁকে আমরা Autobiographical sketch বলে অভিহিত করতে পারি। এটা খুবই ছোট চিঠি, কিন্তু দলিল হিসাবে এর মূল্য খুবই বেশী। কিছুদিন আগে (শনিবার ২০শে মে, ১৯৭২) একটি বিদগ্ধ সভায় রামমোহনের বিষয় আলোচনা হচ্ছিল—আমি শ্রোতা হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় কয়েকজন বললেন, যে রামমোহন যে তিব্বত গিয়েছিলেন এই প্রচলিত ধারণাটা খুব সম্ভবত ভ্রান্ত। তার কোনো প্রমাণ নেই। তবে যখন তিনি East India Company-তে চাকরী করতেন তখন তিনি ভূটান ভ্রমণ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে।

এই বিষয়ে আমি একটা প্রশ্ন তুলতে চাই। যে biographical sketch-এর কথা আমি আগেই বলেছি, সেখানে রামমোহন স্বয়ং লিখছেন—"When about the age of sixteen...I proceeded on my travels, and passed through different countries,

chiefly within but some beyond the bounds of Hindusthan...

ভারতবর্ষের বাইরে কিছু কিছু জায়গায় ভ্রমণের এই যে উল্লেখ রয়েছে সেটা কি হতে পারে? সেটা যে তিব্বত হতে পারে, এই ধারণা কি কেবল সুদূরপরাহত কল্পনা?

ডঃ ল্যান্ট কার্পেন্টার, ১৮৩৩ সালেই লিখছেন রামমোহন প্রসঙ্গে—"and he at last determined, at the early age of fifteen, to leave the paternal home and sojourn for a time in the Thibet, that he might see another form of religious faith." ডঃ কার্পেন্টার বলেন, রামমোহন যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন তাঁর কাছ থেকেই শুনেছেন। এখানেও আমরা তাঁর তিব্বত ভ্রমণের উল্লেখ পাই। সাক্ষ্য হিসাবে এটা কি অগ্রাহ্য?

যিনি আরবী ফার্সীতে কোরাণ পড়েছেন, সংস্কৃতে বেদ উপনিষদ্ পড়েছেন, ও পরবর্তীকালে Hebrew ভাষায় Bible পড়েছেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করবার জন্য তিব্বত যাওয়ার সম্ভাবনাটাই যেন বেশী করে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

আর একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। চারিত্রিক সামঞ্জস্যের কথার উল্লেখ আমি করেছি। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল যা থেকে তিনি এমন অমিত শক্তি লাভ করেছিলেন যা তাঁর প্রতিভাকে অতীত কাল থেকে সুদূর ভাবীকাল পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান করে রেখেছে?

তিনি মানুষ ছিলেন, বিষয়-সম্পত্তির পরিচালনাতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁর মনুষ্যত্বকে তিনি কোনোদিন অস্বীকার করেন নি, কোনোদিন কোনো অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় নেন নি, কোনোদিন তিনি নিজেকে দেবতার পদে বসান নি, বা বসাতে দেন নি, নিজেকে ভগবানের অংশ বলে প্রচার করেন নি বা করান নি। তবু যে তেজস্বিতা, যে মনীষিতা, যে স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি, যে শাশ্বত মানবিকতা, যে উদার ভগবদ্ প্রত্যয় তাঁর চরিত্রকে দ্যুতিময় করেছিল এবং আজো যে দীপ্তিচ্ছটা অম্লান অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার উৎপত্তি কোথায়?

তাঁর কর্মের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য্য ও বহুমুখীনতাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নানাদিকে তাঁর কর্মধারা বিস্তারিত। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এদের দূরবিসর্পী তাৎপর্য্য যথার্থভাবে বুঝতে গেলে প্রত্যেক বিষয়টিতে আলাদা আলাদা ভাবে অনুসন্ধান চালাতে হবে। আগেই বলেছি, অনেক ক্ষেত্রেই যে যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, তা পরিণতি পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে—অনেক জটিলতা অতিক্রম করে। আবার এমনও আছে যার ইঙ্গিত চকিত বিদ্যুতের মত জলে উঠেছিল তাঁর মানসসত্তায়—যা রূপ গ্রহণ করেছে পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বহু মনীষীর বহু প্রয়াসের ফলে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরাসীদেশের বহির্বিষয়ক মন্ত্রীকে তিনি যে চিঠি দেন তারমধ্যে নিহিত রয়েছে সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত যা কলেবর গ্রহণ করেছিল League of Nations-এ United Nations এ, এবং পূর্ণভাবে কবে সেই আদর্শ কার্য্যকর হবে তার আশায় প্রতীক্ষা করে রয়েছে সমগ্র মানব সমাজ। তিনি লিখছেন—

"By such a Congress, all matters of difference, whether political or commercial affecting the natives of any two civilized countries... might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generatio n."

এই চিঠির আর এক জায়গায় তিনি লিখছেন—

"It is now generally admitted that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes exesting are only various branches. Hence enlightened men in all

countries feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

এই যে সমগ্র-মানব সমাজ-বোধ—বিশ্বমানবতা—মানবের ঐক্যতত্ত্বে এই বিশ্বাস, এটা তিনি পেয়েছিলেন কোথা থেকে? সেই যুগে, উনবিংশ শতকের প্রথম পদক্ষেপে, কি দেশে, কি বিদেশে, কোথাও আমরা এই ধারণার বিকাশ ত দেখতেই পাই না, কোথাও তার কোনো স্ফুরণও দেখতে পাই না। এই ভাবধারার, যে ভাবধারা রামমোহনকে এক অভিনব মহিমায় মণ্ডিত করেছে, সেই ভাবধারার উৎসের সন্ধান যদি আমরা করি তবেই আমরা তাঁর জীবনের মূল মর্ম বুঝতে পারব।

কোন্ কৈশোরে কোথা থেকে এই বীজ তাঁর চিত্তে উড়ে এসে পড়েছিল, তার সন্ধান আমরা জানি না, এই বীজই অঙ্কুরিত হয়েছিল Tuhfut-ul-Muwahhidin-এ ১৮০৩ সালে বোধকরি, এবং শাখান্বিত হয়েছিল ১১ই মাঘ ১৮৩০ সালে Trust Deed রচনায়। সেই শাখায় তাঁর জীবদ্দশায় ফুল ফোটেনি, ফল ধরেনি:

এই Trust Deed-এর একটু অংশ আমি উদ্ধৃত করছি—

"Shall at all times permit the said building...to be used...as and for a place of Public Meeting of all sorts and descriptions of people without distinction for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title...And that no sermon preaching discourse, prayer or hymn be delivered in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe or to the promotion of charity morality...and the strengthening of the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds."

এই যে অদ্বিতীয় দেবতা,—রামমোহন সেই এককে, সেই অবিনাশী বিশ্ববিধাতাকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সমস্ত আবরণ মোচন করে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌কে তিনি নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ই তাঁর চিত্তকে যুক্ত করেছিল বিশ্বসত্যের সঙ্গে, তাঁর চিত্তকে অনুপ্রাণিত করেছিলো সমগ্র মানবের ঐক্যবোধে, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের কল্যাণে। এই পটভূমিকাতে যখনই আমরা রামমোহনকে দেখি, তখনই তাঁর চরিত্রের, সাধনার, কর্মের পূর্ণ রূপ সমুজ্জ্বল ভাবে ফুটে ওঠে। Botanyর মধ্যে যেমন ফুলের সৌন্দর্য ধরা দেয় না, তেমনি dialectics-এর মধ্যেও রামমোহনের স্বরূপ খুঁজে পাব না।

আমি শেষ করছি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (দুটি কথার সময়োপযোগী পরিবর্তন করে):—

"তাঁর জন্মের (মৃত্যুর) আজ দুইশত (একশত) বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে; কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতই আধুনিক কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্যদিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত।...রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন, যে কাল...অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।"

—মৃণালিকা

মোটর-সাইকেল্ রিকশ

মোটর-সাইকেল্ রিকশ চালাইতে দিলে প্রথমত চালকদিগকে কঠিন পরিশ্রম না করিয়া অর্থোপার্জ্জন সক্ষম হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় ও দ্বিতীয়ত শিক্ষিত বেকার যুবকগণ ঐ অটোরিকশ চালাইয়া সুখে দিন গুজরান করিতে পারেন। আমরা এই জাতীয় যন্ত্র রিকশ প্রবর্ত্তন করিলে কলিকাতা ও অন্যান্য বঙ্গদেশীয় সহরে অনেক যুবকের বেকারত্ব দূর হইতে পারে মনে করি ও কর্তৃপক্ষকে ঐ ধরণের রিকশ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি। কাছাড়ে সম্প্রতি এই ব্যবস্থা করার আয়োজন সম্বন্ধে "যুগশক্তি" পত্রিকায় প্রকাশ :—

কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার জেলার শিক্ষিত বেকার তরুণদের জন্য ৫৪টি নতুন অটোরিক্সার পারমিট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ৫৪টি অটোর মধ্যে ২০টি আসবে করিমগঞ্জে, ২৪টি যাবে শিলচরে এবং ১০টি যাবে হাইলাকান্দিতে। করিমগঞ্জে খুব শিগগিরই অটো প্রচলন করার জন্য শিক্ষিত বেকার সংস্থা চেষ্টা করছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে অনাবৃষ্টি

"ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে উক্ত রাজ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী অনাবৃষ্টির যে বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় ঐ অঞ্চলের মানুষের কি প্রকার ক্ষতি হইয়াছে। আমরা ঐ বর্ণনা অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

১১ই জুলাই শাসকদলের জনৈক সদস্য (খুব সম্ভব অসহ্য গরমকে পুঁজি করিয়া) খরা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিরোধী পক্ষও ইহাতে সায় দেন। কিন্তু কোন সদস্যই তাঁহার স্বীয় এলাকা সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা, খরার দরুণ জুম, বোরো, আউস ও পাট জমি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেনগুপ্ত খরার তথ্যাদি বিধান সভায় পরিবেশন করিতে না পারিয়া পর পর দুইটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকিয়াছিলেন। প্রথম বৈঠক ১৪ই এবং দ্বিতীয় বৈঠক ১৭ই জুলাই। তথ্যের মধ্যে আছে, মোট ৮ লক্ষ ৬২ হাজার লোক খরার কবলে পড়িয়াছে উহার মধ্যে জুমিয়ার সংখ্যাই অধিক; ২ লক্ষ ২৩ হাজার। জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে, বোরো প্রায় তের হাজার একর; আউস ১ লক্ষ ৫৩ হাজার এবং জুম ২৭ হাজার একর। সর্বমোট ক্ষয় ও ক্ষতির পরিমাণ ধার্য্য হইয়াছে ৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রের নিকট আপাততঃ ত্রাণ কার্য্য চালাইবার জন্য ৩ কোটি টাকা সাহায্য চাওয়া হইয়াছে।

বাঙালীর সর্ব্বনাশ—ষড়যন্ত্রের কথা

যুগবাণী সাপ্তাহিকে প্রকাশ :—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বার্থ দেখবে এটাই আমরা আশা করি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যেমন তার কর্তব্য নয় সারা ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বাঙালীর উপকার করতে বসবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার, এ রকম আশাও আমরা পোষণ করি না। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মতো অহর্নিশ কেন্দ্রবিরোধী জিগীর তুলুক পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার এ কামনাও আমাদের নাই। কিন্তু বাঙালীকে পিষ্ট করে, বাঙালীকে রিক্ত, বঞ্চিত, সর্বস্বান্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের রথের চাকা যদি এগিয়ে যেতে চায় তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার দায়িত্ব বাঙালীর সরকারকেই নিতে হবে। গত সপ্তাহে বিধান সভায় দুটি ঘটনায় আমরা এ সম্পর্কে বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছি। পশ্চিম বাংলার বর্তমান সরকার

বাঙালীর স্বার্থকে, বাঙালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাহবা পাবার জন্ম লালায়িত বলে এখন প্রতীত হচ্ছে।

বার্ণপুরের ইস্কো কারখানার ম্যানেজমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন, সেজন্ম মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিধান সভায় প্রস্তাব এনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা পরিচালনায় সরকার যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, কয়েক শত কোটি টাকা যেভাবে খোলামকুচির মতো নষ্ট করেছেন, তারপর ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী ভালো চলছে না বলে পরিচালনাভার নিজের হাতে নিয়ে নেবার মতো যুক্তি থাকতে পারে না। বাঙালী পরিচালিত এটি ছিল বৃহত্তম শিল্প কারখানা; বামপন্থী জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নের উচ্ছৃঙ্খলতার নীতির ফলে ইতিপূর্বেই এই কারখানাটি অচল হয়ে এসেছিল, এখন কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে কারখানাটি নিয়ে নিলেন। বাঙালী পরিচালনা শিল্পক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় এটা প্রমাণিত করার সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়েননি;—কিন্তু যদি তা প্রমাণিত হয়েও থাকে তবে তাতে আমাদের দুঃখবোধ করাই উচিত, আনন্দ ও গর্ব নয়। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আনন্দ ও গর্ব সামলাতে না পেরে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাবই এনে ফেলেছেন বিধানসভায়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাকা লুটে নিয়ে দাবড়িওয়ালা হরিয়ানায় একটি ব্যক্তিগত মালিকানায় ইস্পাত কারখানা খুলেছেন, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তো সেখানে দেখা যায় না?

শিল্পক্ষেত্রে বাঙালীর এই পরাজয়ের পর গত সপ্তাহে বিধানসভায় কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার, কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী চাষীকে সর্বস্বান্ত করার চক্রান্ত সম্পর্কে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার একটি পাট কর্পোরেশন গঠন করেছেন, অতি সযত্নে যা থেকে বাঙালীকে বর্জন করা হয়েছে, যদিও পাট প্রধানত বাংলার সম্পদ। পাট কর্পোরেশনে কোন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার খুশিমতো কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিয়েছেন কুইন্টাল প্রতি ১১৫ টাকা। পাটশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী বহুদিন আগেই উঠেছে। আমরা সে দাবী সমর্থন করি। আমরা বারবার একথাও প্রমাণ করেছি যে পাটকল মালিকরা কোটি কোটি টাকা কালো টাকা উপার্জন করছে, রাষ্ট্রকে তার প্রাপ্য কর ফাঁকি দিচ্ছে এবং পাটশিল্পকেও ধ্বংস করে আনছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার ইস্কোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারল, সে সরকার বাজোরিয়া প্রমুখদের পাটকলগুলির দিকে ফিরেও তাকায় না—অথচ শিল্পপতি হিসাবে শ্রীর বীরেন মুখার্জির চেয়ে বাজোরিয়ারা সৎ ও দক্ষ একথা কেউ বলবে কি?

রাজ্য কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, এক কুইন্টাল পাটচাষের খরচ ১২৭ টাকা; তাই এক কুইন্টাল কাঁচা পাটের বিক্রয় মূল্য ন্যূনপক্ষে ১৫৩ টাকা হওয়া উচিত। কৃষিমন্ত্রী পাটচাষের খরচ কমিয়ে বলেছেন, তিনি চাষীর নিজের ও তার পরিবারের লোকদের শ্রমকে অবৈতনিক ধরে নিয়েছেন। বস্তুত একমণ পাটের দাম কমপক্ষে ৮০ টাকা হওয়া উচিত—যদিও ১০০ টাকা হলেই ন্যায়সঙ্গত দাম হয়। সেই হিসাবে এক কুইন্টাল কাঁচা পাটের দাম হওয়া উচিত কমপক্ষে ২০০ টাকা; ২৫০ টাকা হওয়াই অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

বাংলার চাষীকে তার ন্যায্য প্রাপ্য না মিটিয়ে পাট চাষ করতে বলার অধিকার কারও নেই। ন্যায্য দাম না পেলে সে পাট চাষ ছেড়ে ধান চাষ করবে। ১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ ২৭ হাজার বেল (প্রতি বেল ২০০ কেজি ওজনের—দুই কুইন্টালের সমান) পাট উৎপন্ন হয়েছিল। সেবার পাটের দাম ছিল মণপ্রতি ৮০ টাকা। পরের বছর চাষী উৎসাহিত হয়ে বেশী জমিতে পাটচাষ করে—ফলে এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়েছিল ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল। কিন্তু সে বছর পাটের দাম কমে যায়। ফলে ১৯৭০-৭১ সালে চাষী কম জমিতে পাট চাষ করে ও উৎপাদন নেমে যায় ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার বেলে। কেন্দ্রীয় সরকার এখন পাটের যে সর্বনিম্ন দাম স্থির করেছেন তার ফলে বাংলার চাষী আর পাট চাষে প্রবৃত্ত হবে না। এর চেয়ে তার জমিতে ধান চাষ করলে সে লাভবান হবে, পশ্চিমবঙ্গেরও খাদ্যাভাব ঘুচবে।

দেশ-বিদেশের কথা

লিন পিয়াওএর আসনচ্যুতি

শেষ পর্য্যন্ত পিকিং মানিতে বাধ্য হইলেন যে মাওৎসেতুঙ্গের পরে যিনি চীনের চেয়ারম্যানের পদে অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া স্থির ছিল সেই শক্তিমান্ নেতা লিন পিয়াও আজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত নাই। তিনি বিমান যোগে মঙ্গোলীয়া যাত্রাকালে বিমান বিনষ্ট হওয়ায় প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি মঙ্গোলীয়া যাইতেছিলেন এই কারণে যে তাঁহার যে আকস্মিক আক্রমণ করিয়া রাজশক্তি হস্তগত করার চেষ্টা তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। যে সকল গুপ্ত দলিল পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে লিন নানান ষড়যন্ত্রের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইহার ফলে পিকিংএ যে সকল কথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে চীনের রাজনীতি নেতাদিগের পরস্পর বিরোধী গুপ্ত অভিসন্ধি মুক্ত নহে; এবং রাশিয়ার দ্বারা নিযুক্ত গুপ্তচরদিগের কার্য্য কলাপ ও চীনের বিরুদ্ধে সজোরে চালিত হইতেছে। ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে চীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে অন্ততঃ চারবার রাজশক্তি আহরণ চেষ্টার দ্বন্দ্ব সক্রিয় হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল উপলক্ষে মাওৎসেতুঙ্গ যখন শত্রুদমন হেতু নানান নেতাকে অপসৃত করিয়াছিলেন সেই সকল নেতার অনেকেই কোন না কোন সময় মস্কোর সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া দেখা যায়। লিন পিয়াও স্বয়ং রুশিয়াতে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত ছিলেন এবং স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিন চেয়ারম্যান মাওকে শত্রু নিপাতে সাহায্য করিয়া একটা কথা বুঝিয়াছিলেন যে নানান ব্যক্তিকে যেমন করিয়া সরান হইয়াছে তাঁহাকে নিজেকেও সেই ভাবেই অপসৃত করা হইতে পারে। তাঁহার স্থিতি কিছুমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত নহে এবং তিনি যে চেয়ারম্যান মাওকে বি-৫২ বোমারু বিমানের নামে আখ্যাত করিতেন তাহার মূলে কিছু সত্যও ছিল। এই জাতীয় একটি বর্ণনায় দেখা যায় লিন পিয়াও বলিতেছেন :—

"বি-৫২ কোন সময়েই সকলকে পরস্পরের সহিত লড়াইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। আজ তিনি যাহার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ব্যবস্থা করেন কাল আবার তাহারই সমর্থনে অন্য কাহারও ধর্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। আজ তাঁহার কথায় মধু ঝরিতে দেখা যাইলেও কাল তিনি যে তোমাকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিবেন না, ইহার কোন নিশ্চয়তা লক্ষিত হয় না। অতীতে কত কেহই যে তাঁহার হস্তে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে আবার তাঁহার হস্তেই নিপাত গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত। কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিই তাঁহার সহিত একত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে নাই। তাঁহার সহকর্মী ছিলেন যাঁহারা তাঁহারা প্রায় সকলেই আজ নিহত, নয়ত কারারুদ্ধ। তাঁহার নিজের পুত্রও তাঁহার উৎপীড়নে অর্দ্ধউন্মত্ত। তিনি একটি সন্দেহ-পাগল রক্তলোলুপ বিকৃত-মনোভাব-পুষ্ট অস্বাভাবিক চরিত্র ব্যক্তি।"

কাহারও কাহারও মতে ১৯৭০ হইতেই মাওৎসেতুঙ্গ লিন পিয়াওকে আর নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিতেন না। অন্য মতে তিনি ১৯৬৯ হইতেই এই

বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই উসুরীর নদীর আশেপাশে রুশিয়া-চীনের সংঘর্ষণ আরম্ভ হয়। ইহা হয় মার্চ মাসে এবং ইহার পরে জুন জুলাই মাসে আরও ঘোরতর যুদ্ধের সুচনা হয়। পিকিং বিমান বন্দরে চু-এন-লাই ও কসিগিনের দ্বন্দ্বও ঐ বৎসরের ঘটনা। কিন্তু সেপ্টেম্বরে চীনাদিগের কসিগিনের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনা ইহার পরেও হইতে বাধিল না ও তাহার কারণ অনুসন্ধান এখনও অনুমানের ক্ষেত্রেই রহিয়া গিয়াছে। যে সকল কথা চিন্তা করা হয় তাহার মূলে আছে মাওৎসেতুঙ্গের লিন প্রীতির অবসানের কথা। সীমান্তের যুদ্ধ সাজাইয়া দেখাইয়া চেয়ারম্যান মাও রুশিয়ার সহিত লিনের সংযোগ ও চীনের অভ্যন্তরে দলগত ষড়যন্ত্রের প্রাদুর্ভাব মুক্ত প্রাঙ্গনে আনিয়া প্রকাশ্যে দেখাইবার চেষ্টা করেন। রুশিয়াও মাও এর সহিত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা ও লিনের ষড়যন্ত্রের সাফল্য এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটিকেই অবলম্বন করা বুদ্ধির কার্য্য মনে করিয়া চীনের সহিত বিবাদ বৃদ্ধি না করাই স্থিরকরেন।

মস্কো যে লিনকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন তাহার মূলে ছিল লিনের মাওকে শক্তিহীন করিবার প্রতিজ্ঞায় রুশিয়ার বিশ্বাস না থাকিলেও সেইরূপ হইলে রুশিয়ার সুবিধার সম্ভাবনা। এই কারণে রুশিয়ার নেতাগণ জানিতেন যে মাও যদি অপসৃত হ'ন তাহা হইলে রুশিয়ার নানাদিক হইতে লাভ হইবে। ইহা ব্যতীত চীন-আমেরিকার নবজাত বন্ধুত্বও এইরূপ ঘটিলে আর সুগঠিত হইতে পারিবে না। কিন্তু রুশিয়ান নেতাগণ খোলাখুলি ভাবে লিনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না কারণ তাহাতে লিনের কোন সুবিধা হইত না। গুপ্তভাবে সাহায্য প্রাপ্তিই স্থির হইল এবং পিকিং-এর সহিত সখ্যের পথও খোলা রহিল।

মস্কো রেডিও ২৭ এপ্রিল ১৯৬৯ একটি সংবাদ রাষ্ট্র করেন যাহাতে বলা হয় যে লিন পিয়াও-এর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কথা স্থির হইবার পরেই দুই সপ্তাহের মধ্যেই লিন পিয়াও এর নানা প্রকার বিপদের আরম্ভ হয়। আরও বলা হয় যে মাওৎসেতুঙ্গ যখনই দেখেন যে সামরিক বাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট তিনি তখনই সকল দোষ সৈন্যদিগের উপরেই চাপাইবার চেষ্টা করেন। যদিও দোষটা অনেক সময়েই বিপ্লবী সংঘগুলিরই একান্তভাবে নিজস্ব দেখা যায়। এই সকল কথাই সর্ব্বজনস্বীকৃত। সেপ্টেম্বর ১৯৬৯-এর শেষের দিকে মস্কো হইতে একটা মাও বিরুদ্ধ পুস্তিকা বাহির হয় যাহার ভাষা ও মত প্রকাশের ভঙ্গীতে অনেকটা লিন-এর প্রচারের সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এ সময় চাউ-কিসিগিন দেখাশোনাও হইয়া যায়। সেই কারণে পুস্তিকাটি বাজার হইতে টানিয়া লওয়া হয়। ১৪ই অক্টোবর ১৯৬৯ হইতে ২০শে মে ১৯৭০ অবধি মাও কোন প্রকাশ্য স্থলে দেখা দেন নাই। তিনি এই সময় সম্ভবতঃ তাঁহার ভক্তদিগকে শিক্ষা দিয়া বিরুদ্ধবাদীদিগকে হটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে সোভিয়েট শক্তি লিন পিয়াও-এর সমর্থনে ততটা জোরালভাবে আসিবে না। কিন্তু তিনি নিজের শক্তি অক্ষুন্ন রাখিতেও পারেন নাই। বিরুদ্ধ দলকে দাবাইতে তাঁহার পূর্ণ এক বৎসর লাগিয়াছিল।

লিন পিয়াও যখন ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১এ মঙ্গোলীয়া যাত্রা করিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন যে রুশিয়ানরা তাঁহাকে খুবই বন্ধুভাবে সমর্থন দান করিবে। লিন যদিও মাও-এর হস্তে পরাজিত তথাপি তাঁহার সহায়তা রুশিয়াকে শক্তি দান করিবে। তিনি যদি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা রুশিয়ার মাও-বিরোধের কার্য্য নানা ভাবে শক্তিলাভ করিত। লিনের মৃত্যু রুশিয়ার পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর হইয়াছে। অতঃপর মাও কাহার উপর তলোয়ার টানিয়া অগ্রসর হইবেন? সম্ভবতঃ চাউ-এন-লাই-এর উপরেই ইহা হইবে। কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে চাউ-এন-লাই মাওৎসেতুঙ্গকে তাঁহারই শিক্ষিত বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া চীনের ইতিহাসকে আর এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করাইবেন।

বন্দর উন্নয়নে চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় হইবে

যুগবাণীতে প্রকাশ ভারত সরকার বন্দর উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় ধার্য্য করিয়াছেন :

বম্বে বন্দরের জন্য—	৪৮·১৪	কোটি	টাকা
বিশাখাপত্তনমের জন্য—	৫১·৪৫	,,	,,
মাদ্রাজের জন্য—	২০·৮৪	,,	,,
কোচিন বন্দরের জন্য—	১৭·৮৯	,,	,,
পারাদ্বীপ বন্দরের জন্য—	১৪·০০	,,	,,
কলিকাতার জন্য—	৫·৮৬	,,	,,

খাদ্যবস্তু উৎপাদনে ঘাটতি

সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) কথাটি ব্যবহার করা হয় চাষের ফসল উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে। কিন্তু ভারতের অপরাপর বিপ্লবের মতই এই সবুজ বিপ্লবও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ জুন ১৯৭২এ যে বারমাস শেষ হইল তাহাতে খাদ্যবস্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ত হয়ই নাই পরন্তু উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই অনুমান করা যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে খাদ্যবস্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন ১১১।১১৩ নিযুত টন না হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১০৬ নিযুত টনে। অথচ এই সময়ে বৃষ্টিপাতও স্বাভাবিকই হইয়াছিল। তাহা হইলে ফসল পরিকল্পনা-অনুযায়ী হইল না কেন? যাহারা ফসল উৎপাদনের হিসাব করেন তাঁহারাই বা হিসাবে ভুল করিলেন কি করিয়া? উৎপাদন বৃদ্ধিই বা হইল না কেন? সেচ, সার, বীজ বা অপর কোন কিছু লইয়া কি গোলমাল হইল? নয়ত উৎপাদন পরিকল্পনা-অনুযায়ী হইল না কেন?
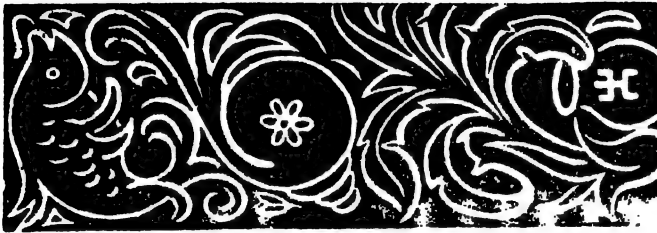
ঋষি অরবিন্দ—(ডঃ) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ,
সবিতা প্রকাশন। ২৪ এ, ব্লক জে, নিউ আলিপুর
কলিকাতা-৫৩। মূল্য-৫·০০।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের লেখা "ঋষি অরবিন্দ" শ্রীঅরবিন্দের জীবন কথা। শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখা এই বইখানি পড়তে আরম্ভ করলেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে ডাঃ ঘোষের সংযত ভাষা ও সদা জাগ্রত বিচার-বুদ্ধি। উচ্ছ্বাসের আধিক্যে কোথাও অতিরঞ্জন হয়নি, ভাষাও ফেনিল হয়নি।

চারটি অধ্যায়ে ডাঃ ঘোষ এই মহাজীবন পরিক্রমা শেষ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে জন্ম, বংশ, বাল্য ও ছাত্রজীবনের কথা লিখেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সাড়ে তের বছর বরোদাবাসের ও চার বছর বাংলাবাসের কথা লিখেছেন। এই সাড়ে সতরো বছরকে ডাঃ ঘোষ অরবিন্দ জীবনের পরিবর্তনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন এবং তার ক্রমিক ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। পড়লেই বোঝা যায় তথ্যবহুল অধ্যায় দুটি ডাঃ ঘোষের গভীর মনন ও পরিশ্রমের ফল। শেষের অধ্যায়ে আছে পণ্ডিচেরী জীবনের কথা, অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও তাঁর প্রচারিত বিশেষ তত্ত্ব অনেকেই বুঝতে পারে না, কারণ শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি প্রবন্ধাবলী ও তাদের বঙ্গানুবাদ সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। ডাঃ ঘোষ এই বাধা দূর করে সর্বস্তরের পাঠকের উপযোগী করে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও তত্ত্ব সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

বইখানির আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখার সঙ্গে পরিচিত নন। বইটিতে ডাঃ ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখা কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছেন। পাঠক তা পড়ে আনন্দ পাবেন।

সবশেষে রবীন্দ্রনাথের "চারিত্রপূজা" থেকে কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি—"পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি কেবল যে বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য সেইগুলিই রক্ষা করিব, তবে শতবৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।" ঋষি অরবিন্দ "চিরদিন পড়বার যোগ্য" বই এবং তা সঞ্চয় করলে কোনদিনই দুর্বহ হয়ে উঠবে না। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅরবিন্দ

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অলিম্পিকে নির্মম হত্যাকাণ্ড

এই বৎসর মিউনিখে যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত এই কারণে যে ঐ প্রতি-যোগিতাকালে নানান ক্রীড়ায় বিশ্বের পূর্বের শ্রেষ্ঠমান যাহা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া নতুন উন্নততর মান সৃজন করা হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ সে কথা মনে রাখিবার, বিচার করিবার পূর্বেই মিউনিখে এমন একটা নৃশংস অমানুষিক পাশব বর্বরতার অভিব্যক্তি হইল যে তাহার পঙ্কিলতা ও ঘৃণিত জঘন্যতার আবর্তে অন্য সকল প্রসঙ্গ এক চরম বিভীষিকার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া মানব মন হইতে লয় প্রাপ্ত হইল। মিউনিখে অলিম্পিক গ্রামে বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রায় ৮,০০০ খেলোয়াড়, বিচারক, শিক্ষক, সংবাদদাতা ও অন্য লোক একত্র হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে যে কখন কোন ছদ্মবেশে অনেকগুলি আরবদেশীয় গুপ্তঘাতক অলিম্পিক গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল সে কথা অন্ততঃ পশ্চিম জার্মানীর নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ বুঝিতে পারেন নাই। মঙ্গলবার ৫ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা ঐ আরব গুপ্তঘাতক দল যন্ত্রবন্দুক, হাতবোমা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া ইসরায়েলের খেলোয়াড় ও তাহাদের সঙ্গের লোকদের বাসগৃহে প্রবেশ করে। তখন ভোর চারটা ২০ মিনিট। টেলিফোন মেরামতকারী দুই ব্যক্তি দেখে যে ৬।। ফুট তার টপকাইয়া কিছু লোক একটি বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু তাহারা ধরিয়া লয় যে ঐ সকল ব্যক্তি রাত্রে আনন্দ উল্লাস করিয়া লুকাইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। এইরূপ ভাবে রাত্রি যাপন করিয়া অনেক সময়েই খেলোয়াড়গণ তার টপকাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। তাহা নূতন কিছু ছিল না। অতঃপর ঐ আরববাহিনীর লোকেরা মুখে কালি লাগাইয়া আত্মগোপন ব্যবস্থা করিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিয়া লইয়া ইসরায়েলের খেলোয়াড়দিগের নিবাস গৃহে প্রবেশ করে। কোন ঘরে ইসরায়েলীগণ আছে না জানায় আরবগণ একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় ও জার্মান ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, "এইখানে কি ইসরায়েলের খেলার দল আছে?" কুস্তি শিক্ষক মোসে ভাইনবার্গ দরজা খুলিয়া ঐ সকল সশস্ত্র মানুষ দেখিয়া

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের অন্যান্য লোকদের চিৎকার করিয়া পলাইতে বলেন। দরজা ভেদ করিয়া এক ঝাপটা যন্ত্রবন্দুকের গুলি বৃষ্টি হইলে ভাইনবার্গ তাহার ফলে চরমভাবে আহত হইলেন। মুষ্টিযোদ্ধা গাড জাভারি একটা জানলা ভাঙ্গিয়া গৃহের বাহিরে পলাইলেন। তাঁহার পিছনেও গুলি বর্ষণ প্রবল বেগে চলিল কিন্তু তিনি আহত হইলেন না। অন্য আর একটি ঘরেও ঐ ভাবে আরবগণ গিয়া আক্রমণ করে ও কুস্তিগীর ইয়োসেফ রোমানো কিছুকাল তাহাদের ঠেকাইয়া রাখেন। তিনিও শীঘ্রই এমনভাবে গুলি খাইলেন যে তাঁহার তাহাতেই মৃত্যু হয়। আর একজন কুস্তির বিচারক, ৬ফুট ১ইঃ, ২৫০ পাউণ্ড ইয়োসেফ গটফ্রয়েডও দরজা চাপিয়া রাখিয়া অপর লোকেদের পলাইতে সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে অকাল মৃত্যু বরণ করেন। সর্বসমেত ইসরায়েলের জনা ১৮ খেলোয়াড় ও তাহাদের সহায়ক কর্ম্মীগণ গুপ্তঘাতকদিগের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন; দুইজন প্রথম আক্রমণেই মারা যান ও নয়জনকে আরবগণ ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে, তাহাদের মুক্তির সর্ত্ত করিয়া ইসরায়েল সরকারকে ২০০ আরব কয়েদীকে খালাস করিতে বাধ্য করবার জন্য। এই দর করার অবশ্য কোনও ফল হয় নাই এবং আরব ঘাতকগণ এখন যেরূপ ভয় দেখাইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল ও তাহা মূলতঃ এইরূপই হইল যে একটা সময় অতিক্রান্ত হইলেও যদি আরবদিগের দাবী অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহা হইলে এক এক করিয়া সকল বন্দী ইসরায়েলীকে হত্যা করা হইবে। ১৮ ঘণ্টা ধরিয়া কথাই চলিতে লাগিল ও শেষ পর্যন্ত আরবদিগকে বোঝান হইল যে তাহারা নিজেদের বন্দীদিগকে লইয়া কোন আরব রাষ্ট্রে গিয়া দর কষাকষি চালাইতে পারে।

৫ তারিখ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০ টার সময় একটা জার্মান সামরিক যাত্রী যানে আরবগণ তাহাদের বন্দীদিগকে হাত পা বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া অলিম্পিক গ্রামের গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রথমে গিয়া দুইটি হেলিকপ্টারে উঠিল ও পরে হেলিকপ্টার যোগে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী ফ্যুরষ্টেনফেল্ডব্রুক বিমান বন্দরে গমন করিল। সেইখানে তাহারা দেখিল একটা বৃহৎ বিমান তাহাদিগের জন্য উপস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা সাবধানী ছিল ও কোন সময়েই নিজেদের একত্রে পৃথকভাবে কোথাও মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইতে বা চলিতে দেয় নাই। জার্মান পুলিসের যে সকল সুদক্ষ বন্দুক চালক বিমান বন্দর ঘিরিয়া উপস্থিত ছিল তাহারা কোনভাবেই সকল আরবদিগকে দূর হইতে গুলি করিয়া মারিতে পারিত না।

ইহার পরে কে কাহাকে কখন গুলি চালাইয়া প্রথমে মারিবার চেষ্টা করিল তাহা অনুমানের বিষয়। সম্ভবতঃ কোন জার্মানই গুলি চালনা আরম্ভ করে ও আরবগণ প্রত্যুত্তরে গুলি ও বোমা বর্ষণ সুরু করে। ফলে ইসরায়েলী বন্দীদিগের নয় ব্যক্তিই গুলির আঘাতে বা বোমা বিস্ফোরণের ফলে প্রাণ হারান। আরব ঘাতকগণেরও পাঁচজন নিহত ও তিনজন বন্দী হয়।

বিশ্ব মৈত্রীর কেন্দ্রস্থল অলিম্পিকের ক্রীড়াভূমি এইভাবে নির্দোষ খেলোয়াড়দিগের রক্তে সিঞ্চিত হওয়াতে বিশ্বের সকল মানুষেরই মন দুঃখে-শোকে আচ্ছন্ন হইল। ভারতের মন্ত্রীসভা হইতে এই নির্মম হত্যালীলার তীব্র সমালোচনা করা হইল। এমন কি মিশরও ইহার নিন্দা করিলেন। যাহার সহিত যাহারই শত্রুতা থাকুক না কেন; নির্দোষ তৃতীয় পক্ষকে হত্যা করিয়া যুদ্ধ চালনার সমর্থন কেহ করিতে পারে না। গুপ্তহত্যা কখনই রাষ্ট্রক্ষেত্রে উত্তম পন্থা নহে। যেখানে সেই গুপ্ত হত্যা নির্দোষ অল্পবয়স্ক খেলোয়াড়দিগের উপর গিয়া পড়ে সেখানে বিষয়টা আরও ঘৃণ্য ও কাপুরুষতাক্লিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। জার্মান পুলিশের দোষে ইসরায়েলীগণ মারা গিয়াছে বলিয়া সিরিয়া ও লেবানন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ৫ তারিখে ভোরবেলা যখন ভাইনবার্গ ও গটফ্রয়েডকে গুলি করিয়া মারা হয় তখন জার্মান পুলিশ কোথায় ছিল? সুতরাং আরব ঘাতকদিগের

দোষক্ষালন চেষ্টার কোনও অর্থ হয় না। আরবদিগের মধ্যে বিমান বন্দরে পাঁচজন নিহত হইয়াছিল ও তিনজন আত্মসমর্পন করে। এইসকল ব্যক্তি ও তাহাদের প্ররোচকদিগের নাম মানব-কলঙ্কের ইতিহাসে মহাপাপী ও অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হইবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান একশত দশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়া অমরধামে গমণ করিয়াছেন। তিনি যে সকল মহাসঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্রষ্টা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি নিজের চেষ্টা, প্রেরণা, প্রতিভা ও সাধনা দ্বারা আলাউদ্দিন ঘরাণা সৃজন করিয়া গিয়াছেন ও শরদ ও সেতার বাদ্যে তাঁহার প্রেরণা শত শত সাধকের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে ও বহুকালাবধি হইতে থাকিবে। তিনি বাল্যকালে ও যৌবনে কোন ঘরাণার সাহায্যে নিজপথ বাছিয়া লইতে পারেন নাই। নিজ চেষ্টা ও সাধনাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল। মাইহার রাজ তাঁহার সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন নিঃসন্দেহে; কিন্তু তাহা যথাযথভাবে তাঁহার জীবনে কার্য্যকর হইবার পূর্ব্বেই তিনি বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইয়া নানাভাবে আঘাত সহ্য করিয়া অটুট সাহসে পদে পদে অগ্রগমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি শরদ ও সেতার বাদ্যে নব নব সুর, তান ও চাল সৃজন করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি যদিও সুদীর্ঘকাল আমাদের সঙ্গীত-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন তাহা হইলেও তাঁহার অভাব কোনও মতে কেহ দূর করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গরত্ন আলাউদ্দিন বাংলা মায়ের সুসন্তান ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যু বহু বঙ্গবাসীকে গভীর শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে।

দিল্লীতে হরিজন বালিকার মৃত্যু

নূতন দিল্লীর কস্তুরবা বালিকা বিদ্যালয়ে সম্প্রতি জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান হয় ও ইহার দুই-তিন দিনের মধ্যে ঐ বিদ্যালয়ের একটি কূপে একটি বালিকার মৃতদেহ পাওয়া যায়। বালিকাটির নাম প্রেমলতা ও সে জাতিতে হরিজন শ্রেণীর ছিল। তাহার পরিবারের লোকেরা অভিযোগ করেন যে প্রেমলতা ও আরও কোন কোন বালিকা জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের পরে ভোগ বিতরণ করেন ও তাহা লইয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের উচ্চজাতির কোন কোন নারী বিশেষ বিক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। কারণ হরিজন বালিকার স্পর্শ দুষ্ট খাদ্যবস্তু উচ্চজাতির মহিলা-দিগকে কেন দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগে আরও বলা হয় যে প্রেমলতাকে প্রথমতঃ দুইদিন একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হয় ও তাহাকে কোন কিছু খাইতে দেওয়া হয় নাই। দুইদিন অনাহারে রাখিয়া উচ্চজাতির ব্যক্তিরা প্রেমলতাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন ও ফলে প্রেমলতার মৃত্যু হয়। তখন তাহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া নিকটস্থ ঐ কূপে নিক্ষেপ করা হয়। অভিযোক্তাগণ এই হত্যা কার্য্যের সহিত কস্তুরবা বালিকা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সংযোগ ছিল বলেন, ও ঐ শিক্ষয়িত্রীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও পরে জামিনে ছাড়িয়া দেয়। দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে এই ঘটনা লইয়া বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে ও পুলিশের সহিত সংঘর্ষণ হইয়াছে কয়েকবার। ইহাতে মনে হয় যে প্রেমলতাকে যদি সত্যসত্যই না খাইতে দিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া প্রহার করিয়া হত্যা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অপরাধী বা অপরাধীদিগের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমানকালে যে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে ইহা আমাদিগের ধারণার বাহিরে। তাহাও আবার ঘটিয়াছে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে এবং কস্তুরবার নামে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে।

বেকার সমস্যার সমাধান

পশ্চিম বাংলার নূতন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর হইতেই একটা কথা জোর গলায় অনেকেই বলিতেছেন, তাহা হইল বেকার সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় বলেন যে শুধু হলদিয়াতেই তিনি এক লক্ষ ব্যক্তিকে চাকুরী দিবার

ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় দিল্লী হইতে আসিয়া বলেন যে স্বাস্থ্য বিভাগেই আশি হাজার মানুষ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে। শুনা যায় পশ্চিম বাংলায় বেকারদিগের সংখ্যা বহু লক্ষ এবং যদি হলদিয়া ও স্বাস্থ্য বিভাগে এক লক্ষ আশি হাজার বেকারের সংস্থান হইয়া যায় তাহা হইলেও অনেক লক্ষ বেকার কাজ না পাইয়া বসিয়াই থাকিবে। সুতরাং হলদিয়াতে লক্ষ লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করিবার পরেও শ্রীসিদ্ধার্থ রায় আরও বহুস্থানে চাকুরী সৃষ্টি করিতে পারিলে তবেই সমস্যাটার আংশিক সমাধান সম্ভব হইবে। শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় সরকারী বিভাগে আর কতই চাকুরী সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন? খুব অধিক নিশ্চয়ই নহে। সুতরাং তাঁহার প্রতিশ্রুতি দ্বারা অধিক লোকের সাহায্য হইবে না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে মানুষের শ্রমশক্তি সাক্ষাৎভাবে ভোগ্য বস্তু উৎপাদনে নিয়োগ করিতে পারিলে তবেই বেকার সমস্যার সমাধান সরল পথে সম্ভব হইতে পারে। সরকারী বিভাগে চাকুরী সৃষ্টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যবস্থা মাত্র। ইহাতে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে না; হইবে শুধু রাজকরের পরিমাণ বৃদ্ধি। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ তামাসা করিয়া লিখিয়াছিলেন একটি দেশের কথা যে দেশের মানুষ শুধু পরস্পরের কাপড় ধুইয়া দিন গুজরান করে। আমরাও যদি পরস্পরকে চাকুরীতে নিয়োগ করি এবং উৎপাদনহীন কার্য্যের জন্য, তাহা হইলে ফল অনেকটা একই প্রকারের হইবে। কারণ বহু দ্রব্যের বহুল পরিমাণে উৎপাদন না করিলে বহু ব্যক্তির সকল কার্য্যে নিয়োগ সম্ভব হইতে পারে না এবং সেইরূপ ব্যবস্থা না হইলে কোন জাতির অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অথবা শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় যদি উৎপাদনকার্য্যহীন চাকুরী সৃষ্টি করিয়া বেকার সমস্যা সমাধান চেষ্টা করেন তাহাতে যাহারা উৎপাদন করে তাহাদের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে যাহাদের সঞ্চিত অর্থ আছে তাহাদের অর্থ নানাভাবে সরকারী তহবিলে যাইবে ও ব্যয় হইয়া কোন না কোন সময় শেষ হইয়া যাইবে। এবং জাতীয় অর্থনীতি পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমবর্দ্ধনশীলভাবে অচল হইয়া দাঁড়াইবে। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রায়ই বলেন যে তিনি শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রা আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দদায়ক করিয়া গঠন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যাহারা বেকার নহে এবং বেতন উপার্জ্জন করিতেছে তাহারাও যথেষ্ট অর্থ পাইতেছে না। যাহারা নানান কারখানায় কাজ করে তাহারা অনায়াসেই মাসে ২॥০ শত হইতে ৫ শত টাকা রোজগার করে। অর্থাৎ এক পরিবারে একজন উপার্জ্জক ও তাহার পত্নী ও দুইটি শিশুকে ঐ রোজগারে প্রতিপালিত ধরিলে দেখা যায় যে ৪ জনের খোরপোষ চলে ৩০০০।৬০০০ টাকা বাৎসরিক উপার্জ্জনের উপর। তাহা মাথা পিছু ভাগ করিলে দাঁড়ায় বাৎসরিক ৭॥০ শত হইতে ১৫০০ শত টাকা। ভারতবর্ষের মাথা পিছু আয় হইল বাৎসরিক ৩০০ শত টাকা। তাহা হইলে কারখানার নিম্নতম রোজগারও জাতীয় মোট হিসাবের তুলনায় দ্বিগুণ হয় দেখা যায়। ঐ হারে সকল মানুষ যদি উপার্জ্জন সক্ষম হয় তাহা হইলে জাতীয় মোট আয় ও উৎপাদনও মোটামুটি দ্বিগুণ করিতে হইবে। তাহার চেষ্টা না করিয়া খুচরা ভাবে এখানে কয়েকটি ও সেখানে কয়েকটি চাকুরীর ব্যবস্থা করিলে জাতীয় জীবন যাত্রার মান উন্নত হইবে না। শ্রমিকদিগকে ছুটির সময় স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়াইতে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও কোন সুবিধা হইবে না। প্রয়োজন, সকল মানুষের একটা অতি আবশ্যক জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করার এবং সেই মান অনুসরণ করিলে সকলের যত পরিমাণ যে ভোগ্য বস্তু, শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি সেবার আবশ্যক তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা। জাতীয় জীবনকে সুস্থ সবল ও সুগঠিত করিতে হইলে যত্রতত্র বক্তৃতা দিয়া লোকের মনে আশার সঞ্চার করিলে অথবা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়া দুই চারিটি চাকুরীর সৃষ্টি দ্বারা যে কার্য্য সাধিত

হইতে পারে না। প্রতিশ্রুতিতে মানুষের পেট ভরে না। উৎপাদনী কার্য্য করিয়াই তাহা সম্ভব হয়। অন্য উপায় কোনও নাই।

পশ্চিমবঙ্গ হইতে কারবার অপসারণ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলিয়াছেন তিনি ধনিক গোষ্ঠিকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কোন কারখানা তুলিয়া দিয়া তাহা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে লইয়া যাইতে দিবেন না। ইহা দ্বারা তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বেকার সমস্যা যাহাতে আরও প্রকট না হইয়া উঠে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন। কিন্তু শুধু কারখানা সরাইয়াই যে বেকারী বৃদ্ধি হয় এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। রেলওয়ে অথবা পোষ্ট-টেলিগ্রামের আঞ্চলিক কর্ম্ম কেন্দ্রগুলি যদি পশ্চিমবঙ্গ হইতে উঠাইয়া লইয়া কটক, নাগপুর অথবা গোরক্ষপুরে লইয়া যাওয়া হয় তাহাতেও বেকার সমস্যা আরও জটিলরূপ ধারণ করে। এইরূপ ব্যবস্থা ধনিক গোষ্ঠির উপর নির্ভর করে না, করে সরকার বাহাদুরের উপর এবং শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঐরূপ কিছু ঘটিলে কি করিবেন তাহা বলিলে এই দেশের জনসাধারণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। বেকারী বৃদ্ধির আর একটা কারণ হইল গভর্ণমেন্টের কারখানা স্থাপনের অনুমতি দান ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগে যথেষ্ট অনুমতি পত্র না বাহির হওয়া। সরকারী ও ব্যক্তিগত উভয় প্রকার কারখানা স্থাপনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাইসেন্স পারমিটের উপর নির্ভর করে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ভাগবাটের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা আমলাদিগের অভিমত স্বীকার করিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করিয়া অপর প্রদেশগুলিকে অধিক করিয়া নূতন নূতন কারখানা স্থাপনের অনুমতি পত্র দিয়া ফেলেন তাহা হইলে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে উহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনী শক্তি অব্যবহৃত থাকিয়া যায়—অর্থাৎ বেকারী বৃদ্ধি হয়। আমাদের যতটা জানা আছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষ দরাজ হস্তে পশ্চিমবঙ্গকে অনুমতি পত্র দিয়া থাকেন এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না। কিছুকাল পূর্ব্বেই সংবাদপত্রে প্রকাশ হয় যে দুর্গাপুরের অ্যালয় ষ্টীল কারখানা শ্রীমোহনকুমার মঙ্গলম দক্ষিণ ভারতে সালেমে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দুইটি স্টীল কারখানার পারিপার্শ্বিক হইতে উঠাইয়া এই কারখানাটি দক্ষিণ ভারত লইয়া যাইবার এমন কি প্রয়োজন ঘটিতে পারে যাহার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইতেছে? আরও শুনা গিয়াছে যে দুর্গাপুরের আর একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান নিজেদের বয়লার নির্ম্মাণ কারখানা উত্তর প্রদেশে খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। এই অবস্থায় শুধু কোনও একটি ধনিক গোষ্ঠিকে হুমকি দিলেই পশ্চিমবঙ্গ বেকারীর হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায় না। ইহা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যে বোঝেন না তাহা মনে হয় না।

গঙ্গা-কাবেরী খাল

ডাঃ কে. এল. রাও কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাকাবেরী খালের কথা উঠাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ফরাক্কা হইতে ৪০০০০ কিউসেক জল ভাগীরথী হুগলি জলপথে ছাড়া সম্ভব (প্রয়োজন) হইবে না এই আলোচনাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কেন না তিনি উত্তর প্রদেশ ও বিহারে দুই শতটি খাল গঙ্গা হইতে কাটিয়া ক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইহার মধ্যেই তিনি গঙ্গা কাবেরী খাল কাটার ব্যবস্থাও করিতেছিলেন কেন না দক্ষিণাপথে জলাভাব হইতেছে ও গঙ্গা হইতে জল না লইলে ঐ অঞ্চলে জল সরবরাহের অন্য সহজ উপায় না কি নাই। নদীর জল অপেক্ষা ভূগর্ভস্থিত জল চাষের পক্ষে অধিক উপকারী, ইহা সকলেই জানেন। নদীর জল ব্যবহার না করিয়া কূপ খনন করিয়া জল লইলে তাহাতে জমির ফসল উৎপাদন উৎকৃষ্টতর হয় এবং সেই জন্য কূপ খননই উত্তম পন্থা। আর একটা কথাও আছে, তাহা হইল ভূগর্ভের জল কাটিয়া বাহির করিয়া লইলে তাহার একটা ব্যবহার হয়। পানের জলও ইহাতে ভালভাবেই পাওয়া যায়। খালের জল পান সকল সময় নিরাপদ নহে। সুতরাং ডঃ কে. এল. রাও খাল

কাটাইয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিয়া কাহারও উপকার করিতেছিলেন না। ক্ষতি করিতেছিলেন কলিকাতা বন্দরের। এখন যদিও তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে কলিকাতা বন্দরের জন্য ৪০০০০ কিউসেক জল ফরাক্কা হইতে দেওয়া হইবে তথাপি তিনি নানাভাবে এই সম্বন্ধে তাঁহার বৈপরীত্য জ্ঞাপন করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। গঙ্গা-কাবেরী খালের পরিকল্পনা এই মনোভাবের অপর অভিব্যক্তি। খালের জল চাষের পক্ষে ততটা ভাল নহে যেমন ভাল কূপের জল। সুতরাং কূপের ব্যবস্থা না করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গঙ্গার জল কাবেরীতে লইয়া যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। ইহাতে গঙ্গার জল উত্তর প্রদেশ ও বিহারে হ্রাস পাইবে এবং ঐ দুই প্রদেশে ২০০ শত সেচন খালে জল দিয়া তৎপরে গঙ্গার কতটা জল ফরাকায় পৌঁছাইবে তাহা সঠিক বলা এখন সম্ভব নহে। গঙ্গা-কাবেরী খাল এই কারণে এখন না কাটিয়া পাঁচ বৎসর পরে অবস্থা বুঝিয়া কাটিবার কথা বিচার করা কর্ত্তব্য।

নূতন কংগ্রেস সরকারের শাসন কার্য্যে সক্ষমতা

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁহার পরিচালিত শাসক সংঘের কর্ম্মক্ষমতার কোনও সমালোচনা হইলে তাহাতে প্রীত হ'ন না এবং ধরিয়া ল'ন যে সকল সমালোচনাই কংগ্রেস বিরুদ্ধতাজাত। এই জাতীয় মনোভাব রাজকার্য্যে সক্ষমতা আনয়ন করে না। সমালোচনা সংস্কার সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। সমালোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া স্বৈরাচার ও 'জোর যার মুলুক তার' নীতি প্রতিষ্ঠার প্রধান অস্ত্র। এবং শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিশ্চয়ই গায়ের জোরে রাজ্য শাসনে বিশ্বাস করেন না। তাঁহার শাসন-কালে দেশের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অবনতির পথে যাইতেছে একথা কেহ বলিতেছেন না। ইহার কারণ পূর্ব্বের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। আরও অধিক মারপিট, খুন খারাপি, অত্যাচার উৎপীড়ন তখন চলিত। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা কিছুটা উন্নত হইয়া থাকিলেই প্রমাণ হয় না যে সিদ্ধার্থ-সরকার সর্ব্বদোষ মুক্ত। প্রথমতঃ কোনও শাসন পদ্ধতিই কখন সর্বদোষ মুক্ত হয় না এবং এই কারণেই সকল সাধারণতন্ত্রে বিরোধের-দল থাকে ও থাকা আবশ্যক। যাহারাই প্রতিষ্ঠিত শাসকদের সমালোচনা করিবে তাহাদেরই যদি জোর করিয়া ঐরূপ সমালোচনা করা হইতে নিবৃত্ত করা হয় তাহা হইলে সাধারণতন্ত্র এবং জনস্বাধীনতা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল কারণে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সমালোচকদিগকে দেশ শত্রু বিবেচনা না করিয়া রাজনীতির একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া বিচার করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। যাহারা সকল শাসন পদ্ধতিকেই উল্টাইয়া বিদেশীদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজনে নিযুক্ত তাহাদিগকে অবশ্য এই সমালোচক-দিগের মধ্যে গণনা করা হইবে না। কিন্তু বাজারে মূল্য বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয় লইয়া যাহারা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সমালোচনা করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই রুশিয়া বা চীনের সহিত মানসিকভাবে জড়িত নয়।

ক্রীড়া বিশ্বপ্রতিযোগিতার কেন্দ্র

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মিউনিখে ভারতীয় খেলোয়াড়-দিগের প্রায় সকল খেলাতেই হারিয়া যাওয়াতে বলিয়াছেন যে ঐরূপ অক্ষমতা বড়ই লজ্জার বিষয়। ভারতবর্ষ শুধু একটা "ব্রঞ্জ" পদক পাইয়া পদক অর্জ্জনের তালিকার শেষের দিকে নামটা ঢুকাইতে পারিয়াছে মাত্র। ইহা যে বৃহৎ দেশের পক্ষে লজ্জার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর মনে রাখা উচিত যে ক্রীড়া আজকাল একটা বিশ্ব-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ও বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই নানাভাবে চেষ্টা করেন যাহাতে তাঁহাদের খেলোয়াড়গণ ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইতে পারেন। খেলার মাঠ, শিক্ষার আয়োজন, খাওয়া, থাকিবার ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ে বহু রাষ্ট্রই অকৃপণ হস্তে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। অর্থব্যয় যে ভারতীয় সরকার করেন না ক্রীড়ার জন্য এমন কথা বলা যায় না;

কিন্তু সেই অর্থ ব্যয় করা হয় এমনভাবে যাহাতে সকলেরই খেলার আয়োজন করা সম্বন্ধে উৎসাহ চলিয়া যায়। ইহাও আবার করা হয় শুধু বড় বড় প্রতিযোগিতার জন্য। ক্রীড়াবিদ্‌দিগের জন্মস্থান যে স্কুল-পাঠশালায় ও গ্রামের খেলার মাঠে,সরকারী অর্থসাহায্য সেখানে পৌঁছায় না। ইহা ব্যতীত দেখা যায় যে অল্পবয়স্কদিগকে খেলা শিখাইবার কোনও যথাযথ ব্যবস্থাই প্রায় ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র সহরে কোথাও নাই। গ্রামের কথা ছাড়িয়া দিলেই হয়। এই দেশের শতকরা ৭০ জনের অধিক লোক গ্রামে বাস করেন। তাঁহারা "স্পোর্টস্‌" ও "গেম্‌স্‌" কাহাকে বলে তাহা প্রায় জানেনই না। কেহ কেহ হয়ত আনাড়ীভাবে ফুটবলে লাথি লাগাইয়াছেন কিন্তু তাহাকে খেলা শিক্ষা বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ গ্রামে খেলার মাঠই নাই এবং অধিকাংশ সহরেও দৌড়, উল্লম্ফন, হকি খেলা, মুষ্টি যুদ্ধ প্রভৃতি কেহই প্রায় অভ্যাস করে না। দুই-একটি অতি বৃহৎ সহরে সন্তরণের প্রতিযোগিতার উপযুক্ত সন্তরণ-কেন্দ্র আছে। অপর সকল স্থানেই পুরাতন পন্থায় সাঁতার কাটা হইয়া থাকে কিন্তু আধুনিক প্রতিযোগিতার রীতি-নীতি সে সকল স্থানে অজ্ঞাত। ভারতবর্ষের খেলার ক্ষেত্রে অনগ্রসর অবস্থার জন্য দায়ী প্রধানতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি। সকল স্কুলে যদি ব্যবস্থা করিয়া জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌, দৌড়, উল্লম্ফন, দীর্ঘলম্ফন, ডিসকাস ছোঁড়া, লৌহগোলক নিক্ষেপ, বর্শা চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি শিখান হইত তাহা হইলে আমাদের উপযুক্ত বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় নামিবার মত খেলোয়াড়ের অভাব হইত না। আমাদের দেশে প্রথমতঃ শিক্ষার ব্যবস্থাই যথোপযুক্ত নহে। তাহার উপর ক্রীড়া শিক্ষার ব্যবস্থা আরই সুবিধাজনক নহে। শ্রীমতী গান্ধী অলিম্পিকে ভারতের কোন কিছুতেই জয়লাভ করিতে না পারাকে লজ্জাস্কর বলিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ "গুড় দিলেই মিষ্টি হয়" এই প্রবাদ বাক্যটি শুনেন নাই। তাঁহাকে বলা আবশ্যক যে তাঁহার শাসক মহলের পরিচালকগণ যথেষ্ট খেলার মাঠ, খেলা শিক্ষক, খেলার সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে অদূর ভবিষ্যতে তাহার সুফল অবশ্যই ফলিবে। শুধু শীর্ষস্থলে একটা জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান বসাইয়া দিলেই জাতির বালক-বালিকারা খেলা-ধুলায় খ্যাতি অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিবে এই ধারণা একেবারেই ভুল। প্রদেশে প্রদেশে ঐরূপ এক-একটি স্পোর্টস্‌ কাউনসিল গঠন করিলেও কিছু হইবে না যদি না এমন অর্থের ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে ক্রীড়ার আগ্রহ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে। সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে এই উদ্দেশ্যে অন্ততঃ কয়েক কোটি মুদ্রা বাৎসরিক খরচ হওয়া প্রয়োজন। ইহা কি করা হইবে? শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ভারতের সর্বত্র ক্রীড়া ব্যবস্থা যথোপযুক্তরূপ করা সম্ভব হইতে পারে। তাহার ফল নিশ্চয়ই ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অলিম্পিকে পাওয়া যাইবে। সে ব্যবস্থা করিতে হইলে যে টাকা লাগিবে তাহাও হিসাব করিয়া সহজেই জানা যাইতে পারে।

ঠাকুরবাড়ীর চার শিল্পীর চিত্রকলা

প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের চারজন খ্যাতনামা শিল্পীর চিত্রকলা সম্প্রতি বিড়লা মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চারজন চিত্রকর হইলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় চিত্রকলার সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের প্রায় সকলেই অবনীন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের সহিত অনেকেরই পরিচয় নাই। তাঁহারা এই প্রদর্শনীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাচিত্রগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "মেজদাদা" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীত-সাহিত্যে প্রেরণা ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার আধার ছিলেন ইহা বাংলার বিদগ্ধজনের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তিনি যে চিত্রাঙ্কনেও সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন না। এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের মনে জ্যোতিরিন্দ্র প্রতিভার স্বরূপ আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় এক অপরূপ অপার্থিব

অন্তর্মুখী অনুভূতির প্রকাশ। তাঁহার মনে যে ভাব বর্ণে ও রেখায় রূপ গ্রহণ করিয়া বিকশিত হইয়াছিল তিনি তাহাই নিজস্ব কৌশলে বাস্তবে প্রতিবিম্বিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিত্র কোন রীতি বা পদ্ধতি অনুসরণে অঙ্কিত নহে। কলা-কৌশল ও প্রেরণার অভিব্যক্তি তাঁহার নিজ অন্তরের নির্দেশ অনুগামী; পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোনও আদর্শ অনুসরণে রচিত নহে। গগনেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে যশ অর্জ্জন করেন। সামাজিক রীতি-নীতি কুসংস্কারাদি লইয়া বিদ্রুপাত্মক চিত্রাঙ্কণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত 'কারটুন' চিত্রগুলি পরিহাসের রঙে রঙীণ হইলেও সেগুলির ভিতরে সমালোচনার শাণিত তীক্ষ্ণধার সহজেই বোধগম্য হয়। পরে তিনি ব্যঙ্গরসের আসর ছাড়িয়া সুন্দরের পূজারী হইয়া বর্ণে ও রেখায় মনের গভীরের অদৃশ্যলোকের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি বহির্জগতে প্রকাশিত করিয়া ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। অপরের পক্ষে তাঁহার অনুকরণ সহজ হয় নাই। তিনি যে পথে চলিয়াছিলেন সে পথে অন্যে চলিবার চেষ্টা করিলে সহজেই পথভ্রষ্ট হইয়া নিরুদ্দেশের অন্ধকারে গিয়া পড়িতেন। গগনেন্দ্র-নাথের প্রেরণার বিকাশ পূর্ণতরভাবে তাঁহার পরবর্তী চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধিত রূপ ধারণ করে নাই বলিয়াই তিনি ভারতীয় চিত্র কলাক্ষেত্রে এক অনন্য-সাধারণ কলাকৌশলের অধিকারী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে যে সকল রীতি পদ্ধতি ও ভাবের বিকাশ দেখা যায় তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল অজন্তা গুহার চিত্রাবলীর অঙ্কনপদ্ধতি বা রচনাশৈলী। তৎপরে যাহার ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষজ্ঞগণ দিয়া থাকেন তাহা হইল মোগল রাজপুত ধরণের চিত্রাঙ্কণ প্রথা। ইহার মধ্যে পারস্য-দেশের চিত্রাঙ্কন প্রেরণা বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং প্রথমদিকের মোগল চিত্রের অনেকগুলিই পারস্য দেশীয় চিত্রকরদিগের দ্বারা অঙ্কিত। ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার সহিত অঙ্কন পদ্ধতি ও ভাবধারার সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চিত্রাঙ্কনক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলা ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন তাহা কৃষ্টির ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। তিনি যে শুধু কোন একটা চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি বা প্রথাকে পুনর্জীবন দান করিয়া গিয়াছেন একথা বলা ঠিক হয় না। তিনি মোগল, রাজপুত ও অজন্তার প্রেরণাকে পুনর্জাগ্রত করিয়া নব-বিকশিত করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গেই নিজ অভাবনীয় সৃজন-শক্তির ব্যবহারে চীন, জাপান ও অপরাপর ক্ষেত্রের শিল্প-রচনাকৌশল সমন্বিত করিয়া নূতনভাবে সৌন্দর্য্যের আলোক বিকিরণ চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। চিত্রকলা ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ অমর হইয়া থাকিবেন ও তাঁহার প্রেরণা বারবার নবরূপ ধারণ করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির মালঞ্চে ফুটিয়া উঠিবে।

চালানী ভক্তি

ভারতবর্ষে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সময় একটা বড় কথা হইয়াছিল বিদেশী বস্ত্র ও অপরাপর পণ্য ভারতবর্ষে বিক্রয় ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইয়োরোপীয়গণ নানান দুষ্কর্ম করিয়া ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প ও অন্যান্য কাজ কারবারের সর্ব্বনাশ সাধন করে ও অনেক কাল অবধি ভারতীয় কর্ম্মীগণ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হারাইয়া সর্ব্বহারার দলে যোগদান করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে এবং অর্থ-নৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার আগ্রহে ভারতের কর্ম্মীগণ পুনরায় নিজেদের শিল্পগুলিকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিয়া বিদেশীদিগকে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার কার্য্যে একাধিপত্যের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে। কিন্তু দুই শত বৎসরের শোষণের ফলে আমরা যে দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়া চরম নিগ্রহ সহ্য করিয়া অসীম কষ্টে অর্থনীতির পুনর্গঠন ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলাম সেই কষ্টভোগের মূলে ছিল বিদেশীর সাম্রাজ্য গঠন চেষ্টা। এই কারণে আমরা জাতীয়ভাবে সকল ক্ষেত্রেই বিদেশীর অনুপ্রবেশ

পরবর্তী অংশ ৮২২ পৃষ্ঠায়

বাংলায় বিপ্লব সংগঠন ও যতীন্দ্রনাথ দাস

সন্তোষকুমার অধিকারী

বাংলাদেশেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের ভারত-জয়ের প্রথম ঘাঁটি, বাঙালীই ইংরাজ শাসন ব্যবস্থা, ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী ভাবাদর্শের সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ করে। আর এই বাংলাদেশেই (অবিভক্ত বঙ্গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সুবদ্ধ ও সুস্পষ্ট সংগঠনের ধারা লক্ষ্য করা গেল। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের বাণী সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বিপ্লবকে একটি আদর্শবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার কাজ প্রথম বাঙালীই করেছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আনন্দমঠ ও ঋষির উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সমগ্র জাতির কাছে দেশাত্মবোধের সঞ্জীবনী মন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হ'য়েও দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়কে ডাক দিলেন দেশের জন্যে আত্মনিবেদন ও আত্মোৎসর্গে ব্রতী হতে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দর উদাত্ত আহ্বানকে জাতির প্রাণে পৌঁছিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানগুলিতে। শ্রীঅরবিন্দ আরও সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেন এই আদর্শের রূপকে। বললেন, দেশমাতৃকা আজ বলি চায়; "Suffer so that she may rejoice."

বিপ্লবসংগঠনের কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যেও মতান্তর ছিল বইকি; কিন্তু মতের পার্থক্য বৈরিতার সৃষ্টি করেনি। তাঁদের লক্ষ্য একই—দেশ-জননীর শৃঙ্খল মোচন; যদিও পথের বিভিন্নতা অর্থাৎ সার্থক means সম্বন্ধে তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। দেশ-জননীর রূপ তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেই মতান্তর কোনওদিন মনান্তরে পৌঁছায়নি। আদর্শ তাঁদের স্বদেশের মৃত্তিকা থেকে গ্রহণ করা। রাজনীতির জন্য লক্ষ্য থেকে সরে আসা শুধু অচিন্তনীয় নয়, অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। দেশের জন্যে সমস্ত মতবিরোধ বিসর্জন দিয়ে আপন জীবনকে ফুলের মত অর্ঘ দিতে তাঁরা মিলিত হ'তে পেরেছিলেন।

সেদিনের বিপ্লবসংগঠন গড়ে' উঠেছিল শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ মধ্যবিত্ত যুবকদের হাতে। শিক্ষা তাঁদের সচেতন করেছিল দেশাত্মবোধে, আদর্শের অনুভব তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল আত্মত্যাগে। তাই ১৯০৮ থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়টুকু রক্তাক্ত আত্মদানের ধারাস্রোত মাত্র। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই যুবক বিপ্লবী নিজেকে ফুলের মত নিবেদন করেছে মৃত্যুরূপা মাতার পায়ে।

১৯২৩ থেকে ১৯৩০ বিপ্লবেতিহাসের এই আট বছর এইচ আর এ-র কর্মধারায় বিধৃত। শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল আদর্শ নায়কের মত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি দলের জন্য শ্বেতপত্র রচনা করে দলের আদর্শ, নিয়মকানুনের বিস্তৃত খসড়া তৈরী করেন। এইচ আর এ-র সভ্যবৃন্দই সেদিন ইংরাজ সরকারকে ব্যস্ত করে তুলেছিল। দেশের জন্যে অম্লান ফুলের মত তাজা যুবকপ্রাণ উৎসর্গ করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ বিসমিল রোশন সিং, আসফাকউল্লা, শচীন বক্সী, রাজেন লাহিড়ী, এবং চন্দ্রশেখর আজাদ-এর নাম বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। এইচ আর এ তার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে নাম বদলিয়ে হয় এইচ এস আর এ বা হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান আর্মি। ১৯২৮-৩০ সালে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে গিয়ে যাঁরা আত্মদান করেন তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সূর্য সেন এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতী চরণ ভোরা ও বাংলার দধিচী যতীন্দ্রনাথ দাস বিপ্লবের ইতিহাসকে নতুন করে গড়ে দিয়ে গেছেন।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েসন-এর উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী সম্বলিত একটি ছাপা পুস্তিকা প্রদর্শিত হয়। এই পুস্তিকায় এইচ আর এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে—

"এই সংঘের উদ্দেশ্য হবে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতরাষ্ট্রের স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

এই প্রজাতন্ত্রের স্থায়ী কনষ্টিটিউশন সৃষ্টি করবে সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা; অবশ্য যখন তাদের মতামতকে সুস্পষ্ট করে বলবার সময় আসবে।

"এই প্রজাতন্ত্রের মূল নীতি হবে সকলের ভোটাধিকার সৃষ্টি করা এবং মানুষের শোষণমূলক সকল কাজের অবসান ঘটানো।"

সংঘের কর্মসূচীর মধ্যে মজুর ও কৃষক সংগঠনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রদেশে প্রদেশে সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করে স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করার কথা বলা হয়। পুস্তিকা ও ইস্তাহার ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার প্রসার করার কথাও বলা হয়। এ ছাড়া দেশের সর্বত্র সংঘের শাখা সৃষ্টি করা, অর্থ সংগ্রহ করা এবং সামরিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য বিদেশে কর্মী পাঠানো; বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করার ব্যবস্থা ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা করাও কর্মসূচিতে প্রাধান্য পায়।

এইচ আর এ'র সংগঠনের জন্য শচীন্দ্রনাথ সান্যাল দক্ষিণ কলিকাতায় একটি ঘর ভাড়া নিলেন। কাশী থেকে কলকাতায় চলে আসার আর একটি কারণ ছিল। কাশীতে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। দক্ষিণ কলকাতায় থাকার সময়েই তিনি কয়েকটি শক্তিমান্ তরুণকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। "Jatin Das was the most remarkable among them."

(Joges Chatterjee in "In Search of Freedom", pp. 211)

শচীন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা সান্যাল যতীন দাস প্রসঙ্গে লিখেছেন—"গোরাই যতীনকে আমার স্বামীর কাছে প্রথম নিয়ে আসে। গোরার আসল নাম বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়; বাড়ী দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে। যতীন তখন রবীন নামেই পরিচিত। তাকে প্রথম দেখে আমি মোটেই আশ্বস্ত হইনি। মনে হয়েছিল নেহাতই ছেলেমানুষ। স্বামীর কাছে আমার সন্দেহ জানালে তিনি বলেছিলেন, সময় এলেই দেখা যাবে ও'র মধ্যে কি ধাতু রয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, রবীন তার শক্তির পরিচয় এর মধ্যেই দিয়েছে। ও'র নিঃস্বার্থ মনের পরিচয়ও একদিন সকলে পাবে। আমার স্বামী উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উত্তর প্রদেশ থেকে পালিয়ে এসে আমরা কলকাতায় লুকোতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাংলার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে—নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে—আলোচনার পর স্থির হয় যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের এই গোপন জীবনযাত্রা প্রথম দিকে অত্যন্ত কঠোর ছিল। আমাদের না ছিল টাকাকড়ি, না কোন আশ্রয়। এই সময় এল রবীন সে শুধু যে বৈপ্লবিক সংস্থার প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠ্‌ল তাই নয়, আমাদের কাছেও অপরিহার্য হ'য়ে দেখা দিল। সে নিরাপদ ও গোপন আশ্রয়ে আমার স্বামীকে রাখল; যেখান থেকে তিনি দলের কাজ নিশ্চিন্ত হয়ে দেখা শোনা করতে পারতেন। আস্তে আস্তে কলকাতার কেন্দ্রটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠল, আর বেশীর ভাগ দায়িত্বই এসে পড়ল রবীনের ঘাড়ে। রবীন তার দু-চারটি বন্ধুর সঙ্গে দলের জন্যে গোপন প্রচারপত্র ও ইস্তাহার রচনা করে 'আনন্দ প্রেস' থেকে গোপনে

ছাপাত। এইভাবেই সে আমার স্বামীর লেখা "দেশবাসীর প্রতি নিবেদন" এবং "বিপ্লবী" (The Revolutionary) ইত্যাদি ইস্তাহারগুলি ছাপায়। রবীনের কাজ নিখুঁত ছিল। সে এই ইস্তাহার ও পুস্তিকাগুলি পোষ্টে রেল পার্শেলে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। রবীন দুঃসাহসী ছিল, তাকে দেখে মনে হত বিপদের পথে পা বাড়াতে সর্বদাই প্রস্তুত।"

১৯০৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর তারিখে শিকদার-বাগানে এক-এর বি গজেন্দ্র মিত্র লেনে মামার বাড়ীতে যতীন্দ্রনাথের জন্ম। বাবার নাম বঙ্কিমবিহারী দাস, মা সুহাসিনী দেবী। পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম এ্যাটর্নি; মামা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকও বিখ্যাত লোক। তিনি তাঁর সম্পত্তি জনহিতকর কার্যে দান করেছিলেন। দাদামশায় পরেশনাথ ঘোষের আদুরে নাতি ছিল যতীন। শিশুবয়স থেকেই সে পেটুক। খেতে ভীষণ ভালবাসত। পেটুক স্বভাবের জন্যে মামার বাড়ীতে সবাই ক্যাংলা বলে ডাকত যতীনকে। সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে ওই ক্যাংলা ছেলেই একদিন ক্ষুধাজয়ের অমর মন্ত্রে জীবনকে নিবেদন করবে।

যতীনের বয়স যখন চার তখন কিশোর ক্ষুদিরাম ফাঁসিকাঠে আত্মদান করে শহীদ হলেন। সমস্ত বাংলাদেশের পথে পথে গেয়ে বেড়াল বাউল—"একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।" ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ অর্থাৎ তার সমস্ত শৈশব জুড়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত বিপ্লবের দামামা, কিশোর যতীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শুনেছিল বারীন, উল্লাসকর ও হেমচন্দ্র দাসের বোমা তৈরী করার কাহিনী। ১৯২৩তে দিল্লীর প্রকাণ্ড রাজপথে বড়লাটের ওপর বোমা ফেলে যে কাহিনী রচনা করেছিলেন বসন্ত বিশ্বাস, তার রোমাঞ্চও সেদিনের বালকজীবনে কম নয়। ১৯১৩ তে রাজাবাজারে বোমার কারখানা আবিষ্কার করল পুলিশ। এই কারখানা থেকে অমৃতলাল ওরফে শশাঙ্ক হাজরা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে বোমা পাঠাতেন। শশাঙ্ক হাজরাকে আসামী করে রাজাবাজার বোমার মামলা চারিদিকে প্রচণ্ড আলোড়ণ তুলল। এই কারখানায় তৈরী বোমার সম্বন্ধে সিডিশন কমিটির মন্তব্য—"The trial showed the manner in which the revolutionaries were secretly manufacturing bombs of a very dangerous type..." ১৯১৫ সালে উড়িষ্যার বুড়িবালামের তীরে যতীন মুখার্জী তাঁর চারজন সহকর্মীকে নিয়ে দেড়হাজার সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, তার উল্লেখে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এগারো বছরের বালক যতীন দাস যতীন মুখার্জীর এই নির্ভীক আত্মদানে যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই প্রেরণাই তাঁকে মৃত্যুঞ্জয়ের মন্ত্র শিখিয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতের যুবমানস যে প্রবল ঘৃণা অনুভব করেছিল, তার কারণ গদর বিপ্লবের নায়কদের নির্বিচারে হত্যা এবং ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। যুবসমাজের শরিক হিসেবে সেই নিবিড়তম ঘৃণা যতীন দাসের রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব হয়েছে এক অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্বের। ১৯২১ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ষোল বছরের কিশোর যতীন যেদিন রাজপথের ওপরে এসে দাঁড়াল, সেদিন সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে। কিশোর যতীন বড়বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হ'লেন। ছাড়া পেলেন অল্পদিনের মধ্যেই।

পিতা বঙ্কিমবিহারী তখন ভবানীপুরে গিরিশ মুখার্জী রোডের একটি বাড়ীতে বাস করেন। কাছেই চক্রবেড়ে রোডে থাকতেন দেবেন বোস, যাঁর বাড়ীতে

অনেক বিশিষ্ট লোকের যাওয়া-আসা ছিল। কিছু বিপ্লবী নেতাও দেবেন বোসের বাড়ীতে আসতেন। যতীন ও তার ছোট ভাই কিরণও এ বাড়ীতে আড্ডা জমাতেন। সম্ভবতঃ এই বাড়ীতেই তিনি পরিচিত হন বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যতীন কিন্তু কাজ থেকে সরে গেল না। দেশবন্ধুর প্রভাবে সে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিল। ষোল বছরের ছেলে কলেজ ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেবে এটা পিতা বঙ্কিম বিহারী সহ্য করতে পারছিলেন না। ছেলেকে তিনি তিরস্কার করে পড়াশোনায় মন দিতে বললেন। কিন্তু দেশের সমস্ত ছেলের কানে তখন ধ্বনিত হ'চ্ছে গান্ধীজীর বাণী "Education can wait, but swaraj cannot." সেই গান্ধীজীই যখন পরের বছর হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন, তখন সকলের মত যতীনও প্রচণ্ড আঘাত পেল মনে।

বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে যতীন বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এল। ১৯২২ সালে সে দক্ষিণ কলিকাতা কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) আই এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল।

এই সময় সে ইউনিভারসিটি টেরিটোরিয়াল কোরেও যোগ দিল। এই কলেজ থেকে আই এ পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে এসে বি এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল।

১৯২৩ সালে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগে ঘটে। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের পক্ষে নির্বাচনে কাজ করতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয়। পরবর্তীকালে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল। এবং সুভাষচন্দ্র যতীন্দ্রনাথের কর্মশক্তিতে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর আত্মদানের মহনীয়তায় তেমনি অভিভূত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র যতীন্দ্রনাথ নিয়মিত কুস্তির আড্ডায় ও ব্যায়ামাগারে যেতেন। তখন অনুশীলন সমিতির সভ্যরা সমস্ত দেশেই ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠা করছে। অনুশীলনের সভাপতি ব্যারিষ্টার পি মিত্রর মতে শরীর চর্চা, লাঠি, ছুরি ও তরোয়াল খেলা যুবকদের একান্ত কর্তব্য। শরীর চর্চা করার প্রেরণা বাঙালী যুবকদের মধ্যে যিনি এনে দিয়েছিলেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর ভাষায়—"প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে। শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়াই তরুণ বাঙালীর প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর সাধনা এমন কি ভগ্‌বদগীতা পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ।" যে নির্ভীক আত্মদানের পথে বাঙালী যুবকেরা সেদিন অগ্রসর হয়েছিল তার মূলে ছিল বিবেকানন্দর বজ্রগম্ভীর বাণী :—"হায় ভারত। তুমি কি কেবল এই পাথেয় সম্বল করিয়াই সভ্যতা ও মহত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই আয়ত্ত করিতে পারে সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীরুতা দ্বারা লাভ করিতে পারিবে?"

বিবেকানন্দর বাণী যতীন্দ্রনাথকে যে উদ্দীপ্ত করেছিল তার প্রমাণ তাঁর নির্ভয় প্রাণোৎসর্গ।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশ্য রাজপথে এক তরুণ যুবক আর্নেষ্ট ডে নামের এক ইংরাজ ভদ্রলোককে গুলি করে হত্যা করলেন। ধরা পড়ার পর এই তরুণ যুবক আদালতে বিবৃতি দিয়ে বললেন যে, তিনি চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। টেগার্ট তাঁর হাতে নিহত হ'লেন না এ জন্য তিনি দুঃখিত। তাঁর এই ভুলের জন্যে (টেগার্ট ভ্রমে অন্য অন্য একজনকে হত্যা করার জন্যে) তিনি দুঃখিত। কিন্তু তাঁর আশা, আর একজন দেশপ্রেমিক যুবক দেশের শত্রু টেগার্টকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে।

এই নির্ভীক যুবকের নাম গোপীনাথ সাহা। তাঁকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল, তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—আমার রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে বিপ্লবের বীজ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।

হাসিমুখে ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথ। মৃত্যুকে যেন 'অমৃত সমান' মনে ক'রে আলিঙ্গন করলেন। সেদিনও সারা বাংলাদেশে এক অদ্ভুত বেদনাদীপ্ত উদ্দীপনা। সুভাষচন্দ্র নিজে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জেলের গেটে। সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধু

গোপীনাথ সাহার কাজকে সমর্থন না করেও তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও স্বদেশপ্রেমের গভীরতার প্রশংসা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে সেই প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হ'তে পারে নি। কারণ বিরোধিতা করেছিলেন গান্ধীজী।

১৯২৪ সালে যতীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়ে বিপ্লবের পথে পুরোপুরি পা বাড়িয়ে দিলেন। বিপ্লবী দলে যতীন্দ্রনাথের নাম হল রবীন। শ্রীমতী প্রতিভা সান্ন্যাল লিখেছেন:

"With the set up of a strong unit of the party in Bengal more responsibilities were shouldered by Jatin."

যতীন প্রথমতঃ ভার নিয়েছিলেন দলের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের, দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র সংগ্রহ করে দলের সভ্যদের কাছে পৌছে দেওয়ার। অস্ত্র অর্থে বোঝায় পিস্তল এবং বোমা। পিস্তলের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন মূল্যে পাওয়া চাই। তার জন্যে যতীন খিদিরপুরের ডকে খালাসী ও নাবিকদের সঙ্গে আলাপ জমালেন। বন্ধুদের নিয়ে ডক এলাকার কাছাকাছি চায়ের দোকানও খুললেন। উদ্দেশ্য, নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। একবার সন্ধান এল দুটি রিভলবার পাওয়া গেছে কিন্তু দাম দিতে হবে প্রায় দুশো টাকার মত। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

অর্থসংগ্রহের জন্য বিপ্লবীরা ডাকাতির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আগেই বলেছি, স্বয়ং অরবিন্দও সমর্থন করেছিলেন এ'পথ। যতীন ও তার বন্ধু প্রেমরঞ্জন সেন, ওরফে কাপ্তেন, ডাকাতি করেই টাকাটা সংগ্রহ করবার ভার নিল।(১)

কেওড়াতলা থেকে টালিগঞ্জ রোড ধরে দক্ষিণে কিছুটা এগিয়ে গেলে ইন্দো বার্মা পেট্রোলিয়ামের পেট্রল ষ্টেশন। শনি রবি ও সোম তিনদিনের ক্যাশ সোমবার সকাল এগারোটায় জমা দিতে যাবে দারোয়ান। খবর দিল পেট্রল ষ্টেশনের কেরাণী ফণীনাথ।

তখন রাস্তা জুড়ে লোক গিজগিজ করছে। একটা ব্যাগের মধ্যে টাকা নিয়ে দারোয়ান চলেছে। সঙ্গে লোকটার হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। এ রাস্তায় ভয়ের কোন কারণই নেই।

দুটি অল্পবয়সের ছেলে তার একটু আগেই সাইকেলে এসে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেরই পাজামা পাঞ্জাবী গায়ে, মাথায় রুমাল বাঁধা। ঠোঁট পানের ছোপে লাল। সাইকেল দুটো একটা বাড়ীর দেওয়ালে হেলান দিয়ে তারা বিড়ি ধরাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই লাঠি ঠকঠক করতে করতে সেই পশ্চিমা দারোয়ান দুটি টাকার ব্যাগ হাতে নিয়ে হাজির হল।

হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে ছেলে দুটি পলকে এগিয়ে গেল। কেউ কিছু ভাববার আগেই তাদের একজন (যতীন) একমুঠো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল দারোয়ানের চোখের ওপর। দুই পশ্চিমী পুঙ্গব 'মর গিয়া' ডাক ছেড়ে চোখ চেপে ধরলো। মুহুর্তের মধ্যে একটা হ্যাঁচকা টানে যতীন ছিনিয়ে নিল টাকার ব্যাগ।

সঙ্গী প্রেমরঞ্জন তার পিস্তল বার করে দুটো ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করল। ভয়ে রাস্তার লোক পেছিয়ে গেল। যতীন ও প্রেমরঞ্জন সেই অবসরে সাইকেলে উঠে পাশের গলি দিয়ে রসা রোডের দিকে ছুটল।

এ গলি থেকে সে গলি। ভবানীপুর থেকে পার্ক সার্কাস। তারপর ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেন। সেখানে তারা বদলে নিল কাপড় জামা। হাতের অস্ত্রগুলো জমা রাখল এক বন্ধুর বাড়ী। টাকা জমা হ'ল কলেজ ষ্ট্রীটের একটা দোকানে তারপর দুই বন্ধু যথারীতি কলেজে।

কিন্তু শুধু পিস্তল বা রিভলবার যথেষ্ট নয়। চাই বোমা। বোমার উপযোগিতা সন্দেহাতীত। একটা বোমা ফাটালে শব্দে লোকে ভয় পেয়ে পালায়। ধোঁয়ার আড়াল দিয়ে বিপ্লবীরাও আত্মগোপন করতে পারে। বিপ্লবীরা তাই শিখতে চেয়েছিলেন বোমা তৈরী করার কৌশল।

সর্বস্ব বিক্রী করে তরুণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস প্যারিসে গিয়েছিলেন সে কৌশলকে আয়ত্ত করতে। হেমচন্দ্র দাস, বি এম বাপাত ও মির্জা আব্বাস্ রাশিয়ান্

নিহিলিষ্টদের কাছে তালিম নিলেন। তাঁদের এ ব্যাপারে যিনি সাহায্য করেছিলেন, সেই মহীয়সী মহিলার নাম মাদাম ভিকোজী কামা।

রাজাবাজারে শশাঙ্কশেখর হাজরা যে বোমা তৈরী করেছিলেন তার উৎকর্ষ সরকার পক্ষকে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন করেছিল। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (মাষ্টারমশাই) তাঁর দলের মধ্যেও বোমা তৈরীর কাজকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মাষ্টার মশাইয়ের দলের হরিনারায়ণ চন্দ্র এ ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সান্যালের অনুরোধে তিনি রাজী হলেন এইচ আর এ-র সভ্যদেরকে বোমা তৈরীর কৌশল শেখাতে। হরিনারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে দেওঘরে বোমা তৈরী শিখতে গেলেন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুপেশ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যয় ও যতীন্দ্রনাথ দাস। এঁদের মধ্যে যতীনই (ওরফে রবীন) বোমা তৈরীর প্রণালী সঠিক আয়ত্ত করেন। প্রতিভা সান্যাল লিখেছেন—"Though Rabin had acted as a guard he was intelligent enough to learn the art."(২)

শচীন সান্যালের নেতৃত্বে সারাভারতে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্যে যতীন কাজ করছিলেন। তাঁর সহযোগী বন্ধু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (ওরফে গোরা) যতীন সম্পর্কে বলেন—"যতীন বড় বেপরোয়া ছিল কিন্তু তার কাজ নিখুঁত ছিল। যতীন খেতে বড় ভালবাসত। অনেক সময় কাজে বেরিয়েও সে রেষ্টুরেন্টে ঢুকে পড়তো। যতীনকে সামলাবার ভার আমাকেই নিতে হ'ত।"(৩)

পরবর্তীকালে কাকোরি মামলায় পুলিশের গোপন রিপোর্ট—"Sachin has two lieutenants in Bengal, by name Rabin and Gora. It was known that after Sachin's arrest his lieutenants communicated two addresses at Calcutta to Sachin's brother Jiten for receiving letters from U. P and the Punjab......Rabin has been traced as Jatindranath Das."

আগেই বলা হয়েছে যে যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে। ১৯২৩ সালে নির্বাচনে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির সমর্থনে কাজ করায় সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে আসেন। ১৯২৪ সালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে কানপুরে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনের কর্মীদের একটি গোপন সভা ডাকা হ'ল। এই সভায় বিপ্লবীরা সারাভারতে বিপ্লব আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে কাজে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ্যাকসন কমিটির অধিনায়ক হ'লেন সাহজাহানপুরের রামপ্রসাদ বিসমিল।

২৫শে অক্টোবর তারিখে সুভাষচন্দ্র বসুকে আটক করা হ'লো তিন আইনের ধারায়।

এই সময় শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে শুধু প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ মাত্র নন; তাঁর দুরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ও সংগঠনশীলতা তাঁকে সর্বভারতীয় নেতার পদে বৃত করেছিল। উপরন্তু বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভয়াবহ করে তুলেছিল।

বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের ধারাকে নষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালের ২৪শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এবং এই অর্ডিন্যান্স-এর ধারায় সকল জায়গাতেই নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা সুরু হয়। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই অর্ডিন্যান্সটিকে আইনের রূপ দেওয়ার জন্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দি বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেন্ট্ বিল (১৯২৫) উপস্থাপিত করা হয়। দেশবন্ধু তখন অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁকে মরফিয়া ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থাতেও বিলটির প্রতিরোধ করার জন্য তিনি ষ্ট্রেচারে শুয়ে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর উপস্থিতিতে যেন যাদুমন্ত্রের মত কাজ হ'ল। সরকার পক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে বিল

পাশ করাতে পারলেন না। শেষে গভর্নর তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে বিলটিকে আইনে পরিণত করেন।

বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স-এর ধারায় বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জীকে ধরা হয় এবং পুলিশ তাঁর কাছ থেকে এইচ আর এ'র দুটি ইস্তাহার উদ্ধার করে। এই ইস্তাহার দুটির শিরোনামা 'বিপ্লবী' ও 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন।' হোম মেম্বার হিউ ষ্টিভেনসন এই ইস্তাহারের লেখক হিসেবে শচীন সান্যালের নামের উল্লেখ করেন এবং 'বিপ্লবী'র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বলেন—"এই দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আনার প্রয়াসী।"

১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে শচীন সান্যালকে গ্রেপ্তার করে দু বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে উত্তরপ্রদেশে রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে এইচ আর এ তখন সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। ১৯২৪-এর ডিসেম্বরে পিলভিত জেলায় তারা প্রথম একটি ডাকাতির অভিযানে নামে। বৈপ্লবিক সংগঠনের জন্য অর্থসংগ্রহে বিসমিল আরও কয়েকটি ডাকাতির চেষ্টা করেন। সংগঠনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে টাকার প্রয়োজন এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে এ'ছাড়া আর উপায় ছিল না। দলের অনেকে, বিশেষ করে আসফাক উল্লা ডাকাতি করে টাকা তোলার বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক রামপ্রসাদের সামনে এই একটাই মাত্র পথ খোলা ছিল।

দলের দুঃসাহসিক অভিযান হল কাকোরি ষ্টেশনের কাছে ট্রেন ডাকাতি।

১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট। একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন (৮নং ডাউন) উত্তরপ্রদেশের সাহারাণপুর থেকে লক্ষ্ণৌর দিকে এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যার সামান্য পরে ট্রেনটি কাকোরি ষ্টেশন ছাড়ল। পরের ষ্টেশন আলমনগর। কিন্তু প্লাটফরম পার হয়ে একটু এগোতে না এগোতে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়লো। কে যেন অ্যালার্ম চেন টেনেছে।

গার্ড তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখেন সামনে কয়েকজন যুবক রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে। তারা হাতের রিভলভার থেকে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে হতচকিত করে দিল সকলকে। যুবকদের নির্দেশে গার্ড এবং ড্রাইভার মুখ নিচু করে মাটিতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল। যাত্রীদের তারা নিষেধ করল গাড়ীর বাইরে আসতে বা মুখ বাড়িয়ে তাকাতে। তা সত্ত্বেও একজন নেমে এসেছিল নিচে। যুবকদের গুলিতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এবার যুবকের দল এগিয়ে গেল ব্রেকভ্যানের দিকে। তাদের লক্ষ্য ব্রেকভ্যানের লোহার সিন্দুকটি। ঐ সিন্দুকে বিভিন্ন ষ্টেশন থেকে সংগ্রহ করা টিকিট বিক্রীর টাকা। তারা সিন্দুকটি ভেঙ্গে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকার মত অর্থ ব্যাগে নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল।

ঠিক ওই সময়ে উলটো দিক থেকে চুন এক্সপ্রেস এসে বেরিয়ে গেল। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী ভয়ে বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। কেউ অনুমান করতেও পারলনা, কি ঘটে গেল।

দলটিতে মোট দশজন যুবক ছিলেন। রামপ্রসাদ বিসমিল ও রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দলটিকে পরিচালনা করবার ভার নিয়েছিলেন। যে রকম শৃঙ্খলার সঙ্গে অথচ নিঃশব্দে কাজ সেরে তাঁরা সরে পড়েছিলেন, তাতে পুলিশ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। কাকোরি ট্রেন ডাকাতির মূল নায়ক রামপ্রসাদ ও রাজেন লাহিড়ী হ'লেও যতীন দাসও যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। এই সময়ে তাঁর ছদ্ম নাম ছিল কালীবাবু। বস্তুতঃ যতীন দাসই কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে সংগ্রহ করা রিভলবার নিয়ে এলাহাবাদে ও লক্ষ্ণৌতে দলের লোকের হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

কাকোরি ডাকাতি ভারত সরকারকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। মিঃ হর্টন নামের এক উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা-অফিসারের হাতে ভার দেওয়া হল তদন্তের। আর হর্টন আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে আবিষ্কার করল এইচ আর এ'র পুরো দলের ইতিহাস ও রামপ্রসাদ বিসমিলের ভূমিকা।

পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন সাজাহানপুরের

এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। উনিশবছর বয়সে (১৯১৬ সালে) তিনি বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন। মৈনপুরী ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে জেলে গেলেও ১৯২০ সালে শাসনসংস্কার আইন প্রয়োগের সময় অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২৩ সালে শচীন সান্যাল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত করেন। রামপ্রসাদ বিসমিল একজন সুলেখক ছিলেন এবং অনেকগুলি ভাষা জানতেন।

সাজাহানপুরে পুলিশ হঠাৎ তিনখানি কারেন্সি নোট পেল, যেগুলি ট্রেন থেকে লুট করা টাকার অংশ। হর্টন তখনই সাজাহানপুরের দিকে দৃষ্টি ফেরালো এবং সন্দেহজনক লোকগুলি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। হর্টন জানতে পারলেন যে ৯ই ও ১০ই আগষ্ট তারিখে রামপ্রসাদ বিসমিল শহরে ছিলেন না। খুঁজতে খুঁজতে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক খাঁসাহেব ইদ্রিস আহমেদ-এর কাছে জানতে পারলেন হর্টন যে, স্কুলেরই একটি ছাত্র ইন্দুভূষণ মিত্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এবং ইন্দুভূষণের নামে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক অনেক চিঠিপত্র আসে। এই সূত্র ধরে' এবং প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রটির চিঠিগুলি গোপনে পরীক্ষা করে হর্টন দলের অস্তিত্ব ও বিবরণ জেনে ফেললেন।

রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী বা বিপ্লবী-দলের অন্য কেউই এই গোপন পুলিশী তৎপরতার খবর পান নি। তাই হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা (১৯২৫) সেপ্টেম্বর ১৩ ও ১৪ তারিখে যখন কানপুরের গোপন সভায় মিলিত হলেন, তখনও তাঁরা ভাবতে পারে নি যে পুলিশ এই সভার খবর জেনেছে এবং গোপনে নজর রাখছে। এই কানপুরের সভাতেই যতীন্দ্রনাথ দাস আসেন এবং রামপ্রসাদের সঙ্গে বোমা তৈরীর ব্যাপার নিয়ে গোপন আলোচনা করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র হঠাৎ তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ বহু লোককে গ্রেপ্তার করল। সাজাহানপুরের সেই ছাত্রটি—যার নাম ইন্দুভূষণ মিত্র—তার কাছ থেকেই পুলিশ অনেকগুলি ঠিকানা পেয়েছিল। তারা কাশীতে হিন্দু ইউনিভারসিটির ছাত্র রাজকুমারকে গ্রেপ্তার করল এবং তার ঘর থেকে রাইফেল সমেত অনেক কাগজপত্র উদ্ধার করল। এই সময়ে 'দি রেভোলিউশনারি' পুস্তিকার কতকগুলি পার্শেলও তারা হাতে পেল।

পুলিশ প্রায় সবসুদ্ধ চল্লিশজন লোককে গ্রেপ্তার করল, তার মধ্যে ছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং, হরগোবিন্দ, বানারসীলাল, বনওয়ারিলাল, মন্মথনাথ গুপ্ত প্রমুখ। ইন্দুভূষণ মিত্র ও বানারসীলালই রাজসাক্ষী হয়ে গেল এবং এইচ আর এ ও কাকোরি ডাকাতির সমস্ত খবর পুলিশকে জানিয়ে দিল।

কাকোরির অন্যতম নায়ক রাজেন লাহিড়ী তখন কলকাতায়। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে কানপুরের সভায় বোমা তৈরী করার প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। রামপ্রসাদ বিসমিল নিজে শিখতে চান এবং তাঁর অনুরোধে রাজেন লাহিড়ী যতীন দাসকে ব্যবস্থা করার জন্যে অনুরোধ জানান। এই সময়েই দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ায় একটা ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে বোমা তৈরীর কারখানা। এই কারখানা থেকে বোমা তৈরী হয়ে যাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। বোমা তৈরীর প্রণালী শেখাচ্ছেন হরিনারায়ণ চন্দ্র। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায়, অনন্তহরি মিত্র, প্রফুল্ল বসু, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ বিসমিল শেষ পর্য্যন্ত আসতে না পারায় রাজেন লাহিড়ী নিজেই এসেছিলেন বোমা তৈরী শিখতে। যতীন্দ্রনাথ দাস তাঁকে বাচস্পতিপাড়ার সেই ভাঙ্গা বাড়ীতেই রাখেন।

হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল চট্টগ্রাম বিপ্লবের মহানায়ক সূর্য সেনের। সূর্য সেন-এর আস্তানা তখন শোভাবাজারের ৪নং বাড়ীতে। শোভাবাজার চিৎপুরের মোড়ে একদিন দুপুরে পুলিশের এক টিকটিকি দেখল, অনন্তহরি মিত্র

আর দুজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে উত্তর দিকে একটা ট্যাক্সি করে চলে গেল। গোয়েন্দাটি অনন্তহরিকে চিনতে পেরেছিল। সে ওই ট্যাক্সির নম্বর দেখে পরে খোঁজ করে করে বাচস্পতিপাড়ার আড্ডার খোঁজ পায়।

১০ই নভেম্বর (১৯২৫) ভোর রাত্রে পুলিশ দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতিপাড়ার সেই বাড়ীটি ঘিরে ফেলল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন রাজেন লাহিড়ী, ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায়, অনন্তহরি মিত্র, হরিনারায়ণ চন্দ্র ও আরও অনেকে। যতীন দাস দৈবক্রমে রক্ষা পেলেন। কারণ সেই রাত্রে তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন।

পুলিশ সেইদিনই হানা দিল শোভাবাজারের বাড়ীতে। ধরা পড়লেন প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্ত কুমার চক্রবর্তী। কিন্তু পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে গেলেন সূর্য সেন।

১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় অন্যতম আসামী রাজেন লাহিড়ীকে দেওয়া হল দশ বছর কারাদণ্ড। কিন্তু জেলে না পাঠিয়ে তাঁকে পাঠানো হ'ল লক্ষ্ণৌতে—কারণ কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলারও তিনি প্রধান আসামী।

এই রাজেন লাহিড়ী ছিলেন পাবনা জেলার বিখ্যাত জনসেবক ক্ষিতিমোহন লাহিড়ীর পুত্র। কাশীতে বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির যখন ছাত্র তখনই তিনি বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সংস্পর্শে আসেন। শচীন্দ্রনাথই তাঁকে এইচ আর এ-র সদস্য করেন এবং কাশীতে দলের কাজ দেখার ভার দেন।

পুলিশী তদন্তে প্রমাণিত হয় যে শচীন্দ্রনাথ সান্যালই এইচ আর এ'র কর্ণধার। এইচ আর এ'র সংগঠনের নিয়মাবলী ও অন্যান্য কাগজপত্রও পুলিশ হাতে পায়। শচীন্দ্রনাথকেও তারা কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে আসে।

কাকোরি ডাকাতি সম্পর্কিত মামলায় পুলিশ বিপ্লবীদলের সংগঠন সম্পর্কে যে নোট দেয়, তাতে বলা হয়—

"বাংলাদেশে শচীনের দুজন সহযোগী রয়েছে—তাদের নাম রবীন ও গোরা। জানা গেছে যে শচীন ধরা পড়ার পর তার সহকর্মীরা শচীনের ভাই জিতেনকে (সান্যাল) চিঠিপত্রের জন্য দুটি ঠিকানা দেয়। এর মধ্যে একটি ভবানীপুরে ৪৮ নম্বর শাঁখারীপাড়া রোডের কে. সি. গুহর ঠিকানা। এই ঠিকানার কতকগুলি চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে, রবীন হচ্ছে আসলে যতীন্দ্রনাথ দাস।"

ঐ একই নোটে বলা হয়—"দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা ধরা পড়ার পরই যতীন দাস আত্মগোপন করে। সেপ্টেম্বর মাসে মীরাটের এক গোপন সভায় সে হাজির ছিল। এই সভাতে রামপ্রসাদ বিসমিলও ছিল। উপরে উল্লিখিত চিঠিগুলিতে এক কালীবাবুর৪ নাম আছে যাকে শাড়ি ও বইপত্র নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।

"গত সেপ্টেম্বর মাসে রবীন (ওরফে যতীন দাস) ইউরোপীয় পোশাকে অস্ত্র নিয়ে আসে এবং সেই অস্ত্রই কাকোরি ডাকাতিতে ব্যবহার করা হয়। সংগঠনের কাজের জন্য রামপ্রসাদ রবীনকে পাঁচশো টাকা দেয়।"

কাকোরি ডাকাতির মামলায় মূল আসামীদের—রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং, আসফাকউল্লা রাজেন লাহিড়ী,—ফাঁসী দেওয়া হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন্দ্রনাথ বক্সী, গোবিন্দচরণ কর প্রমুখের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিশ ধরতে পারেনি। আর যতীন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে না পারায় তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ধারায় বন্দী করা হয়।

১। এই ঘটনার বিবরণ আমি শ্রীপ্রেমরঞ্জন সেনের মুখেই শুনেছি।

২। অবিস্মরণীয়—পৃঃ ১৮ (গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র)

৩। প্রবন্ধ লেখকের কাছে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য।

৪। যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী (এম. পি.) তাঁর বইয়ে ("In Search of Freedom", পৃঃ ৩৬১) লিখেছেন, কালীবাবু আসলে যতীন দাসেরই আর একটি ছদ্মনাম।

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে তাঁর সোনার বাংলার কথা

গৌরীদাস মল্লিক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য বিশ্বের সুধীজনের কাছে বিশেষ সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর নানা বিষয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনা, তাঁর ভাবসমৃদ্ধ কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতি রচনা, তাঁর মানবতার মহৎ আদর্শ তাঁদের অন্তরকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর এইসব কীর্তির মাঝেও ছিল তাঁর এক আবেগময় কর্মময় জীবন, যে জীবনে তিনি কায়মনোবাক্যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম তাঁর স্বদেশবাসীকে যেমন মুগ্ধ করেছিল তেমনি তাদের তা স্বদেশ সাধনায় উদ্বোধিতও করে তুলেছিল। তাঁর অন্যান্য চিন্তার মধ্যেও তাঁর স্বদেশচিন্তা অব্যাহত ছিল, স্বদেশপ্রেম ও বাংলাদেশপ্রীতি তাঁর অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। (স্বদেশপ্রেমের আবেগে তিনি তাঁর স্বদেশকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারততীর্থ', যার গৌরবময় অবস্থানের পরিচয় দিয়েছিলেন—'মহামানবের সাগরতীরে'। আর তাঁর জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে আখ্যা দিয়েছিলেন—'সোনার বাংলা', যাকে তিনি আদর করে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" তিনি 'ভারততীর্থ'-ক্ষেত্রের মানবতার পূজারী হয়ে কখনও থাকতেন বিশ্বচিন্তায় মগ্ন, কখনও স্বদেশভক্ত হয়ে স্বদেশ-সাধনায় ব্রতী। আবার, ঐ 'ভারততীর্থ'-ক্ষেত্রের পূর্বাঞ্চলে তাঁর জন্মভূমি যে 'সোনার বাংলা', সেখানে তিনি বাংলাদেশপ্রেমী বাঙালী, দেশাত্মবোধক বাণীর প্রচারক হিসাবে চারণ-কবি এবং বাংলার কল্যাণকামী কর্মযোগী।)

বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত ভালবেসেছিলেন সমগ্রভাবে। তার আকাশ, তার বাতাস, ছায়াভরা তার পল্লীর নদীতট, তার ধানভরা ক্ষেতের শ্যামলিমা—এ সবই যেন তাঁর চোখে এক মায়ার অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল, বঙ্গজননীর স্নেহকোমল স্পর্শ তিনি যেন তাঁর অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, তাই তার প্রতি তাঁর আত্ম-নিবেদনের প্রকাশ—'সোনার বাংলা'।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

— — — — — — —

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে,
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে,
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।"

এইরূপে তিনি মাতৃজ্ঞানে বাংলাদেশের স্তুতিগান করলেন। এইসঙ্গে তাঁর 'সোনার বাংলা'র পল্লীপ্রকৃতির প্রতি তিনি যেমন তাঁর গভীর অনুরাগ ও মমত্ববোধ প্রকাশ করলেন, তেমনি বাংলামায়ের প্রকৃতির কোলে যেসব রাখাল-চাষী, যাদের 'ধেনু-চরা' মাঠে, 'পারে যাবার খেয়াঘাটে', 'ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে' আর 'ধানে ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে'—সেইসব পল্লীবাসীদেরও তিনি তাঁর ভালবাসা জানালেন এই বলে—"ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষী।" তাঁর এই সঙ্গীতে হয়তো কবিসুলভ ভাবালুতার প্রকাশ আছে। কিন্তু তা-ই সব নয়, এই সঙ্গীতের মর্মে তাঁর আন্তরিকতার পরিচয়ও আছে।

বাংলার পল্লীপ্রকৃতি, তার আকাশ, তার বাতাস-মৃত্তিকা-জল-বন-শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি যেসব উপকরণ নিয়ে অগঠিত, সেইসব উপকরণগুলিকে নিছক প্রাকৃতিক বস্তুবিশেষজ্ঞানে উপেক্ষা না করে তিনি সেইসব

উপকরণগুলিকে কল্যাণকর ও প্রীতিপ্রদ সত্য পদার্থের মতোই বিবেচনা করতেন। এ-কথা তাঁর এক ভাষণের মধ্যে প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন "এই যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে,—যাহা আমাদের পিতৃপিতামহগণকে বহু যুগ হইতে লালন করিয়া আসিয়াছে, যাহা আমাদের অনাগত সন্ততিদিগকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে,......।"

বাংলাদেশের প্রকৃতির সর্বদিকে, সর্বস্থানে যেন তিনি অনুভব করেছিলেন বাংলামায়ের স্নেহাঞ্চলের মাতৃস্পর্শ। তাই তাঁর কাছে বাংলাদেশ সোনার বাংলা, তাই সেই সোনার বাংলাকে মাতৃজ্ঞানে নিবেদন করলেন তাঁর অন্তরের ভালবাসা। এই ভালবাসা জানানো শুধু সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নয়, ভাবরস-সম্ভোগের মধ্যেও তা নিবদ্ধ নয়, তা যে ছিল কত আন্তরিক, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপরোক্ত ভাষণের পরবর্তী অংশের এই কথায়— '......যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্তি অমৃতবাণী আমাদের জন্য বহন করিয়া চলিয়াছে আমরা তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতোই সর্বতোভাবে ভালবাসিতে পারি—কেবলমাত্র ভাবরসসম্ভোগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষ করিয়া না দি।"

বাংলাদেশকে কেমন করে যে সর্বতোভাবে ভালবাসা জানাতে হয়, তারও একটি সুপরিকল্পিত গঠনমূলক কার্য্যাবলীর নির্দেশ দিয়ে তিনি বলে গেলেন—"আমরা যেন ভালবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বর করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফল-পুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি। যাহাকে এমনি সত্যরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালবাসি তাহাকে আমরা সকল দিক্ দিয়া এমনি করিয়া সাজাই, সকল দিক্ হইতে এমনি করিয়া সেবা করি, এবং সেই আমাদের সেবার সামগ্রী প্রাণের ধনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই না।"

বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে ভালবাসার অর্থ যে এত গভীর, এত ব্যাপক, তা শুধু বাংলার কল্যাণকামী রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আসা সম্ভব। তিনি যেন বাঙালীদের বুঝিয়ে দিলেন যে, বাংলাদেশকে ভালবাসা নিছক ভাবরসসম্ভোগ নয়, তা শুধু বাংলাদেশকে নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমিত নয়, তা আরও গভীরে, তা আরও ব্যাপক। বাংলার জল বাংলার বায়ুকে নির্মল ও রোগজীবাণুমুক্ত করে, তার মাটিকে উর্বর করে তাকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করে তাকে সুসজ্জিত করে তোলা, আর বাংলার নরনারীদের শিক্ষায় দীক্ষায় প্রকৃত মানুষ করে তোলাই হলো, রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলাদেশকে ভালবাসা। দেশকে সর্বতোভাবে গড়ে তোলাই হলো দেশকে ভালবাসার সার্থকতা, যেমন সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলাই হলো বাপ-মায়ের সন্তানবাৎসল্যের সার্থকতা, এই ভাব নিয়ে তিনি বঙ্গজননীকে ভালবাসা জানিয়ে বললেন, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি", তেমনি আবার বাংলার সর্ববিধ সংগঠনমূলক কার্য্যের সিদ্ধির জন্যও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন,

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান॥"

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশপ্রেমী, আবার কবিও বটে। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দুইটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি বাংলার প্রকৃতিজগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন তা দেখে, ফলে তার প্রতি তাঁর অন্তরে যে প্রীতিভাবের সঞ্চার হয়েছিল, তা তিনি ছন্দায়িত কবিতায় ও সঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। আবার, স্বভাবগুণে তাঁর অন্তর অধ্যাত্মচেতনায় ছিল সদাজাগ্রত। সেই অধ্যাত্মচেতনার প্রভাবে তিনি বাংলার অন্তরাত্মার মধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন দেশমাতৃকা বঙ্গজননীর পদধ্বনি। বাংলার প্রতি তাঁর প্রীতি-অনুরাগ-মমত্ববোধ—এইসব যেন ভক্তি-প্রেমের অর্ঘ্যরূপে তিনি বঙ্গজননীর উদ্দেশে নিবেদন

করেছেন। ভাবাবেশে একদিন তিনি করলেন তাঁর বন্দনা—

"তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশ হাস্যমুখে।......"

তিনি এখানে তাঁর ভাবজগতের বঙ্গজননীকে দেবত্বে অধিষ্ঠিত রেখে নিছক দেবীরূপে তাঁকে বন্দনা করছেন না। তিনি তাঁর মধ্যে দেখেছেন সংসারে সদাকর্মব্যস্ত জননীর সত্তাকে। তাই, তিনি তাঁর বন্দনায় আরও জানালেন—

"নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটায়েছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ,.................."

বঙ্গজননীর পূজারী তিনি। বাংলার প্রকৃতিজগতের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজননীও যেন তাঁর ভাবজগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হন।

শরৎকালের এক প্রভাতে বাংলার পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবিমনে উদয় হয়েছিল এক ভাবাবেশ। সেই ভাবাবেশে তিনি দেখলেন—সেই মনোমুগ্ধকর শারদ্ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উপকরণে সজ্জিতা হয়ে প্রকৃতিসভায় অপরূপ বেশে দণ্ডায়মানা বঙ্গমাতা। এই সুন্দর পরিবেশে কবি বঙ্গমাতাকে জানালেন তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস—

"আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
... ...
মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

বাংলামায়ের ভক্ত কবি এইভাবে তাঁর ভাবরাজ্যে দেখলেন তাঁর সৌন্দর্যময়ী বঙ্গজননীকে, যিনি দাঁড়িয়ে আছেন 'কুসুমভূষণজড়িতচরণে' এক মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে, যে পরিবেশে (কবির বর্ণনায়)—

"পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে।"

কবি দেখছেন, তাঁর ধ্যানের এই সৌন্দর্যময়ী বঙ্গজননী শুধু নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেননি, তিনি কর্মব্যস্ত হয়ে আছেন। কারণ তাঁর "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর"। আর তাঁর ধান্য-ভাণ্ডারে "আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার।" এই ধান্যভাণ্ডারের পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান যোগান দিতে হবে দেশ-বিদেশে, তা জানিয়ে দিতে হবে সর্বত্র। তাই বঙ্গজননীকে কবি বলছেন—

"জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিলভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।"

তাই কবি জানাচ্ছেন—"অবসর আর নাহিক তোমার—"। কবিও যেন বাংলাদেশের ধানের প্রাচুর্যে উৎফুল্ল হয়ে দেশের সকলকে আহ্বান জানিয়ে বললেন:

"আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া—
ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।"

সর্বস্তরের দেশবাসীকে আহ্বান করে তিনি বলে চলেছেন—"ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,/ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে—।" শুধু ধনী-মধ্যবিত্তদের তিনি বঙ্গজননীর অন্ন-ভাণ্ডারের ভাগ নিতে আহ্বান জানান নি, যে-সব দরিদ্র অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত, তাদের

তিনি ডাক দিলেন—"কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়/আয় তোরা সবে জুটিয়া।"

বঙ্গপ্রেমী কবি বাংলার শারদ-সৌন্দর্য বর্ণনাচ্ছলে বঙ্গজননীকে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর উপকরণে সাজিয়ে ঐ প্রকৃতিরই বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দৃশ্যপটে সুন্দরভাবে মূর্ত করে তুললেন। শুধু তাই নয়, সেই জননীকে অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণারূপে ঘোষণাও করলেন। যে প্রিয় তাকে কল্পিত সজ্জায় মনোমত করে সাজানো ও তার উচ্ছ্বসিত গুণ-গানে তাকে মহিমান্বিত করে তোলা তার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচায়ক। অবশ্য বাস্তবের দিক্ দিয়ে দেখলে এর মধ্যে হয়তো দেখতে পাওয়া যেতে পারে ভাবাবেগজনিত কিছু অতিশয়োক্তি। যাই হোক, উপরোক্ত কবিতায় এমনি করেই বঙ্গপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ভাব-ভাষা-ছন্দের মাধ্যমে বঙ্গজননীকে ভালবাসা জানিয়েছেন। আরও, তিনি তাঁকে আদর্শ মাতা বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে সাদরে জানিয়েছিলেন:

"হে নিত্য-কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশ হাস্যমুখে।"

তাই, তিনি তাঁর সেই আদর্শ দেশজননীর চরণে আত্মনিবেদন করে গেয়েছেন—

"ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধুলো, সে যে আমার মাথার
মানিক হবে।
ও মা গরীবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ
ব'লে গলার ফাঁসি।"

উপরোক্ত সংগীতাংশে শুধু বাংলামায়ের প্রতি আত্মনিবেদনের কথা নেই, এর সঙ্গে পরোক্ষভাবে আরও জড়িয়ে আছে এই সংগীত রচনাকালীন বিলাতী দ্রব্য বর্জনের সংকল্পের কথাও।

উক্ত সঙ্গীতাংশটি রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক 'সোনার বাংলা' সঙ্গীতের শেষ অংশ। তিনি এই সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বাঙালী দমনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকের নির্দেশে বাংলাদেশকে দুই অংশে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে বাঙালীরা 'বঙ্গভঙ্গ'-আন্দোলনে তথা স্বদেশী আন্দোলনে সারা বাংলাদেশকে আলোড়িত করে তুলেছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট কার্যসূচী ছিল বৃটিশদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটানো। বাঙালী দমনে বৃটিশের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নীতিতে রবীন্দ্রনাথও তখন বিলাতি বর্জনের সংকল্প করেছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর এই কথায় 'পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।'

বাংলাদেশের হৃদয় হতে অমন যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশী আন্দোলন প্রকাশ পেয়েছিল, সেই আন্দোলনে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে বিক্ষুব্ধ বাঙালীদের মনে বৃটিশ শাসকের প্রতি বৈরূপ্য ও জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রতি প্রীতি জাগানোর উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছিলেন পূর্বোক্ত 'সোনার বাংলা' গানের সঙ্গে আরও অনেক দেশাত্মবোধক গান, যে গান গেয়ে গেয়ে তখনকার ও পরবর্তীকালেও বাংলাদেশের স্বদেশভক্ত সেচ্ছাসেবকরা বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে স্বদেশপ্রীতির এক আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ চেতনার উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে শুধু দেশাত্মবোধক গান-কবিতা রচনা করে বাংলা প্রীতির পরিচয় দেন নি, তিনি কায়মনোবাক্যে বাংলাদেশের উন্নতি ও বাংলার স্বার্থসংরক্ষণের ব্যাপারেও সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বাংলাদেশের স্বার্থের অন্তরায়, কারণ বাংলাদেশকে দুই অংশে বিচ্ছিন্ন করে বাঙালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই, রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ সরকারের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রচেষ্টাকে ধিক্কার দিয়ে-ছিলেন। আর ঐ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের যুবশক্তিকে সংহত করে যুবকদের মনে আত্মশক্তি, ঐক্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার এবং বাংলাদেশের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করার কাজে তাদের প্রেরণা দেবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই, সেই সময়ে একদিন তিনি বাংলার

যুবকদের আহ্বান করে তাদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,—"হে বঙ্গের নবীন যুবক,......বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা—এই মহৎ সৃষ্টি কার্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে...... নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন।......ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুই টুকরা করিতে গবর্ণমেণ্ট পারেন ?......আমরা সমস্ত বাঙালী তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না ?......আমাদের কয়েকজনের চেষ্টাতেই সেই বৃহৎ ঐক্য মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই মর্মগ্রাহী কথায় বোঝা যায় যে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হলেও তিনি বঙ্গ-ভঙ্গকারী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে ক্রোধ প্রকাশ না করে বিচ্ছিন্ন বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যশক্তি জাগ্রত করার উপরই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, তিনি তখন বুঝেছিলেন যে, বাংলার জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যবোধ জাগানো ব্যাপারে তৎকালীন রাজনীতির নেতারা কিছুই করে নি। তাদের অবজ্ঞা করে স্বদেশী কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কেবলমাত্র বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অন্যায় শাসনবিধির সমালোচনা করে ও কিছু কিছু স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা লাভের জন্যে আবেদন-নিবেদন করে (তাঁর কথায়) "ইংরেজী ভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া রেজোল্যুশন পাশ" করলেই যে 'জন-সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যবোধের উদ্রেক" হবে তা তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন নি। তাই, তিনি বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যশক্তি জাগানোর সংকল্প নিয়ে তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন—"বাংলার মাঝখানে যে রাজা যতগুলি রেখাই টানিয়া দিক্, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে,—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে।"

বাঙালী যদি প্রেমে ও মনের জোরে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে বাঙালীদের এই ঐক্যশক্তি রাজার আইনসম্মত বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। বাংলাদেশ পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুই অংশে খণ্ডিত হয়ে যাবার কথাও তিনি ভাবতে পারেন নি। তিনি সমগ্র বাংলার কল্যাণ-কামী। তাই বাংলার অখণ্ডতা সম্বন্ধে তাঁর গভীর আবেগে ভরা এবং নিজস্ব মতবাদ ছিল। তা ব্যক্ত করে তিনি একদিন বলেছিলেন—"বাংলার পূর্ব পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন; একই পূর্ব-পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের সমস্ত শিরা-উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।"

এইরূপ যে তাঁর ধ্যানের স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশমাতৃকা বাংলাদেশ, তাকে বিখণ্ডিত করবার প্রচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করবার জন্য তখনকার স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী জিনিস বর্জন করবার যে সংকল্প সারা দেশ গ্রহণ করেছিল, রবীন্দ্রনাথও সে সংকল্পকে স্বাগত জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই সংকল্প ক্ষণিক আন্দোলনের উত্তেজনাজনিত নয়। তাহা যে এক আবেগময় আন্তরিক স্বাদেশীয়তাজনিত, তা বেশ বোঝা যায় তাঁর এই উক্তিতে—"আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি, সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে।.........ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান্ সংকল্পের নিকট আত্মনিবেদন।"

সেই সময়ে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে যে স্বদেশী

আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা তার পূর্বকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো শুধু 'গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকের' মধ্যে সীমিত ছিল না ও শুধু বৃটিশ সরকারের নিকট 'আবেদন-নিবেদন'-সর্বস্ব ছিল না, তা ছিল জন-জাগরণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, তা ছিল রাজার বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সেদিন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমগ্র বাংলার দেশপ্রেমী জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির নানারূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেছিল, যার ফলে তারা বহু ত্যাগ স্বীকার করে, বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করে তাদের স্বদেশী-আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। সেদিনকার বাঙালীদের এরূপ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের উদ্যমকে বাঙালীর অভূতপূর্ব সংগ্রাম-শক্তির পরিচায়ক হিসাবে গণ্য করে তিনি তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু বৎসর পূর্বে এক প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রশংসার স্থলে বলেছিলেন—"বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনে। বঙ্গ কলেবর বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভবপর কি-না এ নিয়ে সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি, কেবলই সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।"

রাজশক্তির বাংলাদেশকে বিখণ্ডিত করবার অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করবার উদ্দেশ্যে বাঙালীরা তখন যে মনোবল দেখিয়েছিল, তার প্রশংসা করে এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তার জীবনসায়াহ্নে সেই সব বাঙালীদের মর্য্যাদা দিলেন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে কেমন করে যে সম্ভব হলো স্বদেশ চেতনার উন্মেষ, বাংলাদেশের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখায় প্রবল ইচ্ছার উদ্রেক, আর সেই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ বাঙালীদের রাজশক্তির বিরুদ্ধে সেই জাগ্রত ইচ্ছার প্রবল শক্তির প্রয়োগ—তা তখনকার রাজশক্তির কাছে আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগে ছিল বিস্ময়ের বিষয়। রবীন্দ্রনাথও এই প্রসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করে তখন বলেছিলেন—"বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক। বাঙালী কখন যে বাঙালীর এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন বাংলার সকল অঙ্গকে এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে, তাহার পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।"

কিন্তু বাঙালীদের অন্তরে কেমন করে সম্ভবপর হলো এইরূপ ঐক্য চেতনার জাগরণ, কেমন করে সম্ভবপর হলো বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছামূর্তির প্রকাশ—তার একটা ভাবধর্মী তত্ত্বগত কারণও বুঝিয়ে বলেছেন বঙ্গজননীর পূজারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক অভিভাষণে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—"বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটি উপলক্ষ স্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালীর হৃদয়ে এক আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম বহু কোটি সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে।......সেই জন্যই আমাদের সদ্যো-জাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদৃষ্টি পাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালী বাঙালীর এত কাছে আসিয়া পড়িল—আমাদের সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ, মান-অপমান যে সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে, এ-কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।"

বাংলাদেশের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগজনিত তাঁর কবিমনের এইরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা তিনি শোনালেন। তাঁর বিশ্বাস -দেশাত্মবোধহীন বাঙালিদের হৃদয়ে স্বদেশচেতনা ও বিবেক জাগ্রত হয়েছিল বৃটিশ সরকারের বঙ্গব্যবচ্ছেদরূপ কশাঘাতে, যার ফলে তারা অন্তরে অনুভব করেছিল বাংলাদেশের

অন্তরাত্মা যে দেশমাতৃকা তাঁর আবির্ভাব, আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বঙ্গব্যবচ্ছেদ-অভিপ্রায়কে প্রতিহত করার জন্ত তাঁর অনুপ্রেরণা।

অধ্যাত্মচেতনায় সদা জাগ্রত ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তর তাই, বাংলাদেশের ঐরূপ জনজাগরণের মূলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঐশী শক্তির প্রভাব। তিনি বিশ্বের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন যেমন বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বদেবতাকে, নিজের জীবনের অন্তরালে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর জীবনের সকল কাজের পরিচালক তাঁর জীবনদেবতাকে, তেমনি তিনি বাংলাদেশের অন্তরাত্মায় উপলব্ধি করেছিলেন স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতাকে। তাঁর এইরূপ স্বদেশ-দেবতার উপলব্ধির কথা তিনি ঐ একই সময়ে জানিয়েছিলেন—"যিনি আমাদের দেশের দেবতা...যিনি জাতিনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের সেই অন্তর্যামী সেই দেবতাকে আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই।...আজ এই একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি।"

এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতাকেই তিনি অন্যত্র বঙ্গজননী বলে সম্বোধন করেছেন। বাংলাদেশের সংকটময় সেই রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণে একদিন তিনি ভাবাবেশে দেখতে পেলেন স্বদেশের সেই অন্তর্যামী দেবতা অপরূপ রূপ ধারণ করে মহীয়সী স্বদেশ-জননীরূপে তাঁর মানসপটে আবির্ভূতা। বাংলাদেশ-প্রেমী বঙ্গজননীর পূজারী কবি তখন গাইলেন তাঁর স্তবগান—

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।"

রবীন্দ্রনাথের কবিমন বহুরূপে বহুভাবে বঙ্গজননীর অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিবেশে বঙ্গজননীর ভাবমূর্তিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে তাঁর কল্পনাপ্রবণ চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রিয় 'সোনার বাংলা'র প্রাণ-জুড়ানো আকাশ-বাতাস প্রভৃতি প্রকৃতির শোভার অন্তরালে তিনি দেখেছেন—বাংলা দেশের স্নেহ-মমতা-ভরা হাস্যময়ী সৌন্দর্যশালিনী মাতৃরূপ, অঘ্রানে তাঁর ভরা ক্ষেতে তিনি দেখেছেন তাঁর অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা-মাতার রূপ, আর দেখেছেন বাংলার মাঠের মাঝে, নদীতীরে, সহস্র কুটিরে, গোষ্ঠে, দ্বাদশ দেউলে সর্বক্ষণ অজস্র কার্যেরত 'নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী' রূপিণী বঙ্গজননীকে। রবীন্দ্রকল্পনায় দেবালয়তুল্য বাংলার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপরোক্ত ভাবমূর্তি উদয় হয়েছিল সুখের দিনে। কিন্তু বঙ্গব্যবচ্ছেদরূপ সংকটের দিনে তাঁর মনে বাংলার যে কিরূপ ভাবমূর্তি উদয় হয়েছিল, তা উল্লেখ করা যাক্ তাঁরই কথায়—"আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে সেই আলোকে—আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেই জন্যই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিনে নহে, সংকটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল।...ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে।"

কবির চিত্তে উদ্ভাসিত বঙ্গজননীর এই ভাবমূর্তি এখন প্রকৃতির মঞ্চে 'কুসুমভূষণ জড়িত চরণে' আর দাঁড়িয়ে নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গিমায় এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না—'স্নিগ্ধ আঁখিদুয় ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়'। এখন সেই ভাবমূর্তি বাঙালির ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত সুশোভন মন্দিরে ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়ারূপে বিরাজিত। বাংলার সংকটের দিনে যেন তাঁর এই অপরূপ রূপ। তাঁর সাজসজ্জায় ও দৃষ্টিভঙ্গিমায় এখন একদিকে দেখা যায় কু-শাসনে পীড়িত বঙ্গসন্তানদের প্রতি তার অভয়বার্তার ইঙ্গিত, আর একদিকে বোঝা যায় কু-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম করার ইঙ্গিত

কবি তাঁর স্তুতিগানে দিলেন এই ভাবমূর্তির বর্ণনা—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ও গো মা,
তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে!
তোমার আজি দুয়ার খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥"

রবীন্দ্রনাথের ধ্যানলোকের এই ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়ারূপিণী বঙ্গজননী যেন বঙ্গব্যবচ্ছেদকে প্রতিহত করবার জন্যে অনুপ্রেরণা দিয়ে বাঙালিদের অন্তরে ঐক্যচেতনা জাগিয়েছেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতার উদ্রেক করেছিলেন—এই ছিল তাঁর উপলব্ধ অভিজ্ঞতা। তাই, একদিন ঐ প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন,—"......অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—বহুকোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে।...আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালি বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল।"

বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন-যুগেই দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ ঝরে পড়েছে তাঁর চিন্তা, কল্পনা ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে। আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বাংলাদেশকে ভক্তিভরে দেখেছেন শক্তিময়ীদেবী-জননীরূপে আর করেছেন তাঁর স্তবগান; কাব্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবমাধুর্য দিয়ে তিনি তাকে সুন্দর ও মহৎ করে রূপায়িত করেছেন অন্নদাত্রীরূপে, নিত্য-কল্যাণীলক্ষ্মীরূপে; আর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কায়মনোবাক্যে কামনা করেছেন বাংলাদেশের কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্যবিধানের উন্নতি ও জনসাধারণ বাঙালিদের ঐক্য, মর্যাদা ও সুখসম্পদ।

বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' বলে তিনি প্রীতি-ভালবাসা জানিয়েছেন কবিতা, সংগীত ও ভাষণের মধ্য দিয়ে—একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। তেমনি বাংলার সন্তান যে বাঙালি তাদেরও তিনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে আশীর্বাদ জানিয়েছেন ও স্বদেশ সেবার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। আজও মনে পড়ে সেই স্বদেশী যুগে তিনি এক অভিভাষণে বাঙালিদের কল্যাণ কামনা করে বলেছিলেন—"তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্'-গীতধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

....

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ,
বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত
ভাই-বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান॥"

তিনি ছিলেন বাঙালির কল্যাণকামী। তাই, প্রাক্-স্বদেশী-আন্দোলনযুগে যেমন তিনি বাঙালিদের গৃহসুখবিলাসিতা দেখতে পেলেন, তখন তিনি যে কিরূপ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সেই কালে রচিত 'বঙ্গমাতা'-কবিতায়। এখানকার বাঙালিদের ঐরূপ দুর্বলতার জন্যে যেন বঙ্গমাতাকেই দায়ী করে তিনি তাঁকে জানালেন—

"সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।"

তাঁর বিবেচনায় যে পথে বাঙালিদের প্রকৃত মানুষ করে তোলা যায়, সেই পথের নির্দেশ উল্লেখ করে তিনি 'বঙ্গমাতা'কে করলেন আবেদন—

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দ সাথে।"

সৌভাগ্যের কথা, এর ঠিক পরবর্তীকালেই বঙ্গভঙ্গ রোধ-আন্দোলনযুগে ও অগ্নিযুগে স্বদেশ সাধনায় সত্যই প্রাণ দিয়ে দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে সংগ্রাম করবার প্রবল ইচ্ছা বাঙালিদের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল। বঙ্গমাতা যেন কবির ঐ আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে নানাভাবের রাজনৈতিক পরিবেশ

সৃষ্টি করে বাঙালিদের সংগ্রামশীল করে তুলতে লাগলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে 'শীর্ণ, শান্ত সাধু' বাঙালিদের 'চিরশিশু'-স্বভাবের জন্যে রবীন্দ্রনাথের মনে যে হতাশার সঞ্চার হয়েছিল, তা যেন পরবর্তীকালে ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে আসছিল—একথা বেশ বোঝা যায় তাঁর এই স্বীকৃতিসূচক বাণীতে—"বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করছিল এই ইচ্ছা।......... বহু বলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালি সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল... ।" এই একই প্রসঙ্গে এর পরবর্তী কালে অগ্নিযুগের বাংলার তরুণদের বীরহৃদয়ের মহিমা কীর্তন করতে করতে তিনি বলে চললেন—"তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলাদেশের তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল...তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে।"

তারপর তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বললেন বাঙালি স্বভাবের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণাবলীর কথা—"বাঙালির স্বভাবের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি......।" বাঙালির এই সব মনোবৃত্তির গুণের কথা উল্লেখ করে তিনি তা কর্মে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—"এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে।"

কিন্তু বাঙালিদের যে কত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা বলা বাহুল্য। ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার কিছু কিছু উল্লেখ করতে ভুললেন না। এ সম্বন্ধে তিনি একটা কথা জানালেন—"বাঙালি নৈয়ায়িক—বাঙালি অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা-বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্র সন্ধানের ভাঙন-লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য।" তাঁর এই মন্তব্য যে অতি সত্য তা বলা বাহুল্য।

তিনি বাঙালিদের এইরূপ নিষ্কর্মা বুদ্ধি ও নিষ্ফল শৌখিন তার্কিকতাকে ভাল চোখে দেখেন নি। বাংলা দেশের তৎকালীন নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন—"আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বতঃউদ্যত ইচ্ছার।" বাংলার কল্যাণের জন্যই তাঁকে এইভাবে সমালোচনা করতে হয়েছে।

১৯৩৯ সালে, তার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক রূপে শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা জানাবার সময় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে বাঙালিদের সম্বন্ধে উপরোক্ত তাঁর কথাগুলি। এই উপলক্ষে তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন—"বাঙালি অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না—এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার বাংলাকে ভালবেসেছেন আবেগভরে, আন্তরিকভাবে, আর সেই বাংলার পল্লী-সহর নির্বিশেষে সকল স্থানের বাঙালিকেও দেখেছেন মর্যাদার সঙ্গে প্রীতির চোখে। তিনি পূর্বোক্ত ভাষণের মধ্যে বাঙালি-প্রীতির পরিচয় দিয়ে এই কামনা জানিয়েছিলেন—"বাঙালির পরস্পর বিরোধের সমাধান হোক···, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক···, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা ধিকৃকৃত হোক ··।" আর এই সঙ্গে অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত বাঙালিদের মনে আশা জাগাবার জন্য তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন "সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালি মারের উপরে মাথা তুলবে।" ধর্মে কর্মে চরিত্রে বাঙালিরা উন্নত হোক—এই ছিল তাঁর আকৃতি। জীবনসায়াহ্নেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন (রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে) "সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান্ হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে।" বাঙালিকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বপূর্ণ উন্নত স্বভাববিশিষ্ট কর্মীরূপে যাতে সে

সর্বভারতীয় কর্মক্ষেত্রে কর্মের দ্বারা, আচরণের দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করতে পারে। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে মহাজাতি সদনে তিনি বাঙালিদের অন্তরে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের জাগরণের কামনা করে বলেছিলেন—"বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।"

এই বাণী দিয়ে তিনি এই শিক্ষা দিলেন যে, বাংলা ভারতেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালির শক্তি-সাধনা, কৃষ্টি-সাধনা বাংলাকে যেমন গৌরবান্বিত করবে ভারতকেও তেমনি বলশালী ও প্রতিভাশালী করবে।

রবীন্দ্রনাথ সহর নগর অপেক্ষা গ্রামবাংলার পল্লীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পল্লীবাসীদের সম্বন্ধে তিনি গভীর ও আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছেন। সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন, তাদের অভাব অভিযোগ সবিস্তারে জেনে নিয়েছেন, তাদের আত্মশক্তির অভাব অনুভব করে তা উদ্বোধিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণও হয়েছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে জমিদারির কাজে তাঁর 'জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে কেটেছে।' সেই সময়ে পল্লীর দুরবস্থার সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা ব্যক্ত করে তিনি এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে।"

একদিন পল্লীগ্রামে নৌকা-ভ্রমণকালে পল্লীর অভাব অভিযোগের নানারূপ করুণ চিত্র তাঁর চিত্তকে যে কিরূপ বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল তার কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁর এই বর্ণনায়—"নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলে তখন দুধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব অভিযোগ! সে শুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছিল।"

তিনি পল্লীর প্রতি সহানুভূতিশীল। পল্লীর ঐরূপ মর্মান্তিক 'অভাব অভিযোগের করুণ চিত্রের' উদাসীন দর্শকের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন নি, বা তা নিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগপূর্ণ বাক্যবিন্যাস দ্বারা বক্তৃতা করে তাঁর সেই বেদনায় ব্যথিত চিত্তের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্য আগ্রহও দেখান নি। তার পরিবর্তে, সেই ঘটনাকালেই তাঁর বিক্ষুব্ধ মনে জেগে উঠেছিল এক সংকল্পের কথা। তিনি সেই কথা প্রকাশ করে বললেন, "সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল ; যত বড় দায়িত্ব হোক না কেন, তাই গ্রহণ করব—এই আনন্দেই বিভোর হয়েছিলাম··· ।"

তিনি শুধু চিন্তার মধ্যে সেই দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে রাখেন নি, কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি তা পালনও করেছেন যথাসাধ্য। কত অগণিত অন্নহীন স্বাস্থ্যহীন অশিক্ষিত অসহায় অবহেলিত গ্রামবাসীরা অভাব অভিযোগ নিয়ে দুঃখে দিন কাটাচ্ছে! এই সব দেখে তাদের অভাব অভিযোগ যাতে নিবারিত হয় তার জন্য তিনিও যেমন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পরিকল্পনা করলেন, তেমনি দেশের যুবকদের পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা-অজ্ঞানতার প্রতি অবহিত হতে বলে তাদেরও পরামর্শও দিলেন - "যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কখনো ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ-সংসারে অবজ্ঞার অধিকারী নহে।...তাহাকে অন্যায় হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো।"

এ কথা তিনি বলেছিলেন ১৯০৭ সালে। সে সময়ে কোনো রাষ্ট্রনেতাই পল্লী-উন্নয়নকর্মকে দেশের কাজ বলে গণ্য করেন নি, রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের প্রস্তাবকে আমলই দেন নি। এর কয়েক বৎসর পরে তিনি ঐ

উদ্দেশ্যে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তাঁর সম্বল, ক্ষমতা ছিল সীমিত। তাই, ঐ অনুষ্ঠানকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে তাঁকে যে কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তা তিনি শান্তিনিকেতনের এক সাহিত্যিকদের সভায় প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আমি ধনী নই, আমার সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্যে তা দিয়েছি।... একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি।"

তাঁর ঐ মহাব্রতের অনুষ্ঠানটি হলো শ্রীনিকেতনের পল্লীউন্নয়ন বিভাগ।

বাংলাদেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে দেখেন নাই তার পল্লীকে বাদ দিয়ে, বাংলাদেশকে ভালবাসেন নি হতভাগ্য পল্লীর রাখাল—চাষীদের না ভালবেসে। পল্লীর দরদী তিনি। তাই তিনি সহানুভূতি দেখিয়ে গেয়েছিলেন—"ও-মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, তোমার রাখাল তোমার চাষী।" আর তাঁর মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়ার এক জনসভায় তাঁর অভিভাষণে পল্লীর প্রতি তাঁর দরদের কথাও ব্যক্ত করেছিলেন—

"আমার যে নিরন্তর ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ (১৯৩৯ মার্চ) বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন ...সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।"

যে রসবোধের চোখে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে দেখেছেন, ঠিক সেই রসবোধ নিয়ে আর কেউ বাংলাদেশকে দেখেন নি। তিনি এইরূপ রসবোধের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশকে সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, পর্যালোচনা করেছেন। ফলে, তাঁর হয়েছে নানা ভাবগত উপলব্ধি, নানা সমস্যাগত অভিজ্ঞতা। আর তাঁর এই সব উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার কথা নানাভাবে নানা উদ্দেশ্যে তিনি উল্লেখ করে গেছেন ছন্দায়িত কবিতায়, ভাবরসে সমৃদ্ধ সুমধুর সংগীতে, মর্মস্পর্শী ভাষণে, আর তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধে। তাঁর এই সব কথার মূলে রয়ে গেছে—সমগ্রভাবে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা, যে ভালবাসার আবেগ একদিন তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বহির্গত হয়েছিল সংগীতের সুরে—'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, মহাকালের আবর্তনে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক খড়্গের আঘাতে তাঁর মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁর সোনার বাংলা দুই অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এতে পরলোকে তাঁর আত্মার শান্তি নিশ্চিত বিঘ্নিত হয়েছে। তবে, সৌভাগ্যের কথা—তাঁর সোনার বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্বাঞ্চলের যে বাংলাদেশ সেখানে তিনি আজ সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। ঐ অঞ্চলের বাঙালিরা তাঁকে তো উপেক্ষা করেই নি, বরং তাঁর 'সোনার বাংলা'-গানকে তাদের জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকৃতি দিয়ে, তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিকে মর্যাদা দিয়ে তারা তাঁকে গরীয়ান্ করে রেখেছে। আরও সুখের বিষয়, এ-পার বাংলা আর ও-পার বাংলা মিলে যে তাঁর সোনার বাংলা, এখনও তা এক হয়ে আছে এক বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতির বন্ধনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-সায়াহ্নে একদিন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"আজ (১৯৩৪ ফেব্রুয়ারী) বাঙালি যতদূরে যেখানেই থাক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।"

তাঁর এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে যদি উভয় বাংলার বাঙালিরা একই বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বন্ধনে এ-পার বাংলা আর ও-পার বাংলার সঙ্গে চিরকাল যুক্ত থাকে, তবে বাংলাদেশ-প্রেমী ও সমগ্র বাঙালির কল্যাণ-কামী রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক বাংলা-প্রীতিকে মর্যাদা দেওয়া হবে ও তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

আজ গীতা চা তৈরী করে, দাদাকে চা দিয়ে বাবাকে চা দিয়ে এল। সদর দরজা বন্ধ আছে কি'না দেখে, গোয়ালঘরটা দেখল। গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। বাছুর ক'টি একপাশে এর ওর গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। কুকুরটা শুয়ে আছে পেয়ারা গাছটার তলায়। আকাশ নির্ম্মল, অনন্ত আকাশে অজস্র নক্ষত্ররাশি ঝিক্‌মিক্ করছে। গাছ-পালার ওপর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে, সব ঝক্‌মক্ করছে। মাঝে মাঝে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। দূরে কারা যেন খোল করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন গান করছে। তারই রেশ ভেসে আসছে বাতাসে। কোথায় যেন একটা ফুল ফুটেছে। বেড়ার গায়ে হাসনু-হানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ সারা বাড়ীকে সুরভিত করে তুলেছে। অভয়ের বেশ ভাল লাগে। অভয় ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে। মায়ের শূন্যস্থান এখন গীতাই নিয়েছে। রান্নাবান্না করা, ঘরসংসার দেখা,—এই সবই কেমন সুন্দর ভাবেই না করছে। অথচ কতই আর বয়স। বোধ করি তের বছরেরও কম। খোকন এক পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তো কিছু আগে, আপনমনে কত কথাই না বলছিল। একহাতে পেন্‌সিলটা ধরা আছে, বইখানা আছে বুকের ওপর। অভয় স্নেহভরে খোকনকে সন্তর্পণে কাৎ করে শুইয়ে দিল।

গীতা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। অন্যদিন আমার কাছে, রান্না ঘরে বসে পড়ে। কিন্তু পড়তে চায় না—খালি খেলে বেড়াবে—

অভয় হেসে, স্নেহভরে ভাইয়ের কপালে হাত বুলোয়, মাথার চুলগুলো সরিয়ে দেয়।

দুদিন কেটে গেল। অভয় ঘুরে ঘুরে সারা গ্রাম দেখে। এর মধ্যে দু-একজন মরে গেছে, কেউ বা বিদেশে চলে গেছে। মোনাদার বাবা যুগল কাকাও বেঁচে নেই। আর মন্মথর খবর কেউ ঠিক ঠিক দিতে পারল না। তারা বলল, ওর জেল হয়েছিল মদের দোকানে আর বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে। তারপর কি হ'ল আর কেউ জানে না। ওদের বাড়ী এখন তালা বন্ধ। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, সেই দোকান ঘর আজ ভগ্ন—মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সব।

গাঁয়ের লোক চাষ আবাদ করে, অর্দ্ধেকদিন ম্যালেরিয়া রোগে ভোগে,—কেউ বা জর গায়ে দূরের ডাক্তারবাড়ী থেকে একশিশি কুইনিন্ মিকশ্চার নিয়ে আসে। এখানে রাস্তাঘাট নেই, খবরের কাগজ বা স্কুল, পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। এরা শুধু মাত্র অদৃষ্ট আর ভগবানের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আনন্দ-হীন জীবন—পেটপুরে একবেলাও সব খেতে পায় না। যদি বৃষ্টি হয়, তবেই যৎসামান্য ধান ঘরে আসে। কিন্তু মহাজন আর জমিদারবাবুর অত্যাচারে জীবনে শান্তি সুখ নেই। এরা যেন ক্রীতদাস। অভয় ভাবে—এই পরিবেশের মধ্যে সে, কতদিন থাকতে পারবে। এখন সেটাই প্রশ্ন। এই ভাবে তো ভাইবোন-দুটো মানুষ হবে না—কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি? অভয় ঘাড় হেঁট করে চলতে থাকে। একটা এমন কোন লোক নেই যে, তার সঙ্গে দু দণ্ড কথা বলে। একদিন মোনাদা ছিল। নিজের সকল সুখদুঃখের কথা, অভাব-অভিযোগের কথা, একমাত্র মোনাদাই ভাল বুঝত। অভয় ভাবে—বোধ হয় আর কোনদিনই মোনাদার সঙ্গে দেখা

হ'বে না। একে একে বহু কথা মনে হয়। তার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে ছাপিয়ে, বার বার মনে হয়, বাবার এই সামান্য দোকান, আর যৎসামান্য বিঘে কয় জমিতে এই সংসার তো চলতে পারে না। এখন সমস্ত কিছু নির্ভর করছে—তার ওপর। একটা জগদ্দল পাথর যেন তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। নৈরাশ্যের কালো ছায়া তাকে ঘিরে ধরে।

গোপেশ্বর বলেন, তাই তো বাবা, এমন আমাদের অদৃষ্ট যে দাদাও মারা গেলেন। দাদা যদি থাকতেন, তবে তোর যাহোক একটা ব্যবস্থা করতেন। ভেবেছিলাম দোকানটা বড় করব। গীতা খোকনের পড়াশোনার ব্যবস্থা করব। কিন্তু ভগবান সব দিক দিয়েই বাদ সাধলেন। নিস্তব্ধ ঘরে গোপেশ্বর আস্তে আস্তে তামাক টানেন। গীতা, খোকন ওরা ঘুমুচ্ছে—বাইরেও কোনও শব্দ নেই—সমস্ত গ্রাম এখন নিদ্রামগ্ন।

সাদা জ্যোৎস্নায় চরাচর ভাসছে। উঠানের পেয়ারা গাছের পাতা থেকে টুপ্‌ টাপ্‌ করে শিশির করে পড়ছে, —এক-একবার দু-একটা বাদুড় এসে ঝুপ্‌ করে ডালে বসে পাকা পেয়ারার খোঁজ করছে।

অভয় বলল, বাবা, একটা কিছু আমার করতেই হবে। এইভাবে, এখানে বসে থাকলে, কোন কিছুই হবে না। কিন্তু কি করব—কোথায় যে যাব তাই ভাবছি।

হঠাৎ গোপেশ্বর বলেন, হাঁ রে, তোর জেঠাইমাকে এক খানা পত্তর লিখেছিস্‌ তো। হাঁ, পৌঁছান সংবাদ দিয়ে একখানা চিঠি দিও। একেবারে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিলে তো চলবে না বাবা। ওঁরা বড়লোক, গরীবদের সঙ্গে ওঁদের তফাৎ অনেক। তবে দাদা বেঁচে থাকলে, সে ছিল আলাদা কথা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

অভয় দেখে, তার বাবা যেন আরও বুড়ো হয়েছেন, অথচ এই বয়সের লোক, কেমন সুস্থ, সবল—কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তাদের। অভয়ের মনে হয়, তার বাবার দেহের ভেতর একটা দুশ্চিন্তার পোকা, যেন অহর্নিশ ওঁকে কুরে কুরে খেয়ে সমস্ত দেহ ফাঁপা ও ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। নিদারুণ দারিদ্র্য, অর্থাভাব—দুশ্চিন্তা, আর সর্বোপরি এই দুই শিশু পুত্রকন্যার জন্য তার বাবার মন অতি মাত্রায় ব্যাকুল। অভয় সব বোঝে—গীতা, খোকনের সকল দায় দায়িত্ব এখন তার ওপর। তার মনে হয় অলক্ষে থেকে মা যেন অতি আগ্রহে পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মা যেন বলছেন—ওরে খোকা, ও দুটোকে দেখিস্‌ বাবা। ওরা যে নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমি যে দিনরাত—তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি বাবা—

অভয় আর থাকতে পারে না। অস্ফুট কণ্ঠে বলে, মা—মা—। গোপেশ্বরের চমক্‌ ভেঙে যায়, তিনি বলেন, কিছু বলছিস্‌ বাবা—

—না—কই—না তো।

ছেলের দিকে তাকিয়ে, গোপেশ্বর বলেন, বাবা অত ভাবিস্‌নে। ভগবান আছেন মাথার ওপর। যা হোক্‌ একটা ব্যবস্থা—তিনি করবেনই। এ বিশ্বাস আমার আছে বাবা। মনে প্রাণে ডাকলে, তিনি অবশ্যই সাড়া দেবেন।

অভয়ের মনে পড়ে গেল, একটা কবিতার কথা। স্কুলপাঠ্য বইয়ে একটা কবিতা পড়েছিল—নদী ও সময়। সমস্ত কবিতাই এখনও বেশ মনে আছে।

সত্যই তাই। নদীর স্রোত আর সময়, এদের তো কেউ ধরে বেঁধে রাখতে পারে না। এরা তো বয়ে যাবেই—এদের গতি বন্ধ হবে না। কিন্তু সময়ের সদ্‌-ব্যবহার করলে, সময়কে ধরে রাখা যায়। অভয় মনে মনে ভাবে, সে সত্যি কিছু চেষ্টা করেছে কি? সময়কে ধরে রাখতে—সময়কে বাঁধতে, সে কতখানি পরিশ্রম করেছে—কতখানি উত্তম দেখিয়েছে? নিজেকে প্রশ্ন করে অভয়। না—কিছুই করেনি। শুধু গতানুগতিক ভাবে, সেও অন্যের মত সময়ের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে, আর অদৃষ্টকে শুধু ধিক্কার দিয়েছে বসে বসে।

কানে ভেসে আসে মাষ্টার মশাই, তীর্থপতিবাবুর কথা—এগিয়ে যেতে হবে—শুধু এগিয়ে যেতে হ'বে—।

বহুদিন আগে শোনা, তীর্থপতি মাষ্টারের কথা আজ বুঝতে পারে অভয়। সেদিন তাঁর কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন পারছে। হঠাৎ অভয়ের মনে হয়, আচ্ছা, তীর্থপতিবাবু এখন কোথায়? না—তাঁর কোন চিহ্নই নেই। বহুকাল আগে তিনি গত হয়েছেন। কিন্তু তিনি মৃত হলেও, তাঁর সেই প্রদীপ্ত কণ্ঠের সুর কানে এখনও ঠিক নূতনের মত বাজছে—এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও সব—। শুধুমাত্র অদৃষ্টের ওপর—নির্ভর করে চুপচাপ বসে থাকলে কোনদিন উন্নতি তো দূরের কথা, দুটো ভাতও জুটবে না। শুধুমাত্র অদৃষ্ট আর কপালের ওপর নির্ভর করে আর নিজের কপালকে ধিকার দিয়ে লাভ কি? তবে—হাত, পা, চোখ, কান এই সবের কোনও দরকারই ছিল না। ঈশ্বর তবে, মাত্র একটা মাংসপিণ্ড করে সৃষ্টি করলেই তো পারতেন। অভয় মনস্থির করে ফেলে। তার মনে হয়, কে যেন তাকে ডাকছে। বার বার হাতছানি দিয়ে বলছে—ওরে, আয়, আয়। তোকে এগিয়ে যেতে হবে। পথের দুঃখকষ্টের কথা ভাবলে চলবে না। পথে নানা কষ্ট আছে—নানা দুঃখ আছে। আছে দুর্য্যোগ নানা বিপদ-অনটন-অভাব। সেই সবকে জয় করে, তোকে এগিয়ে যেতে হবে। আয়, আয়, আর দেরী করিস নে। অভয় যেন শুনতে পায়, তার অন্তঃকরণে যে দেবতা রয়েছেন, তিনিই গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিচ্ছেন, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়। আমার ওপর ভরসা করে, শুধু বেরিয়ে পড় একবার। তারপর পথ আপনিই দেখতে পাবি। একদিকে এই বিরাট প্রকৃতি, অন্যদিকে সেই মহাকাল। এই দুই মিলিয়ে মিশিয়ে এই সংসার। এই দুই মিলিয়ে জীবন, এই দুই মিলিয়ে ছুটে চলছে জগৎ সংসার—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রলয়। যা, এগিয়ে যা। অভয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

সকাল বেলায় অভয় বলে, বাবা কাল আমি বাইরে যাচ্ছি—

স্তিমিত চোখে গোপেশ্বর তাকিয়ে থাকেন। আশ্চর্য্য হয়ে বলেন—কোথায় যাবি বলছিস্ বাবা? কোথায়—

"ঠিক নেই বাবা। হয়ত কলকাতা যাব। কিন্তু কোথায় যাব আর কোথায় উঠব, কিছু ঠিক নেই। কিন্তু আমায় যেতেই হবে—

—যেতেই হবে। হাঁ রে খোকা, কোথায় যাবি, কোথায় থাকবি, টাকা পয়সা কোথায় পাবি?

অভয় বলে—বাবা, আমি একবার চেষ্টা করব। এমনি করে, এখানে বসে থাকতে পারব না। গীতা খোকন ওদের ভবিষ্যৎ ভাবছি। শুধু তুমি ওদের দেখবে। আমার জন্যে ভেবো না বাবা। আমি ঠিক সময়েই খবর দেব। শুধু ওদের আগলে থেকো।

গোপেশ্বর বলেন—খোকা, আমি এই বয়সে তোকে ছেড়ে থাকব কি করে বাবা। আমার কিছু দরকার নেই, শুধু তুই এ বাড়ীতে থাক্। ভগবান চালিয়ে দেবেন—

অভয় হাসে—না, তা হয় না বাবা। ভগবান চালাবেন কোন দুঃখে। তাঁর কাছে, কোন মুখে দাবী করব, কোন মুখে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব বাবা—। সুস্থ, সবল দেহ নিয়ে, তাঁর কাছে ভিখিরির মত দাঁড়িয়ে কি ভিক্ষা করব। তিনি তো সবই দিয়েছেন। হাত, পা, চোখ, বুদ্ধি, বিবেচনা—এ সবই তো দিয়েছেন। এ সব থেকেও, কোন লজ্জায় তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব। বিনা পরিশ্রমে, কোন্ মুখে বলব, আমায় দয়া কর, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর। আমি অত কিছু জানিনে বাবা। কিন্তু আমি ভাবছি, এ সংসার যে বড় কঠিন। বিনা পয়সায় তো কেউ খেতে দেয় না।

কলকাতায় কোথায় থাকবি কোথায় উঠবি? আর কখনো তো তুই কলকাতা যাসনি। তাই পথঘাটই বা চিনবি কি করে। আমি যে ঘরে শুয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি পাব না। মুখে যে ভাত উঠবে না। বৃদ্ধ গোপেশ্বরের চোখ জলে ভরে যায়।

অভয় বলে, কিছু ভেবো না বাবা। তার একটা ব্যবস্থা করবই। তুমি বিন্দুমাত্র ভেবো না বাবা। শুধু গীতা-খোকনকে দেখো—।

নিঃশ্বাস ফেলে গোপেশ্বর বলেন, যা ভাল মনে করিস তাই কর। তোর মা যে সেই মরণকালে যার

যায় শুধু তোকে ডেকেছে। এমনি কপাল, শেষ দেখাও হ'ল না। এ কি কম দুঃখের কথা বাবা। তাঁর যখন সব শেষ হয়ে আসছে, নিঃশ্বেস বন্ধ হয়-হয়, তবুও গুঁইয়ে গুঁইয়ে শুধু বলেছে—আমার খোকা, আমার অভয়—।

অভয় শূন্য নয়নে তাকিয়ে থাকে। ওর দুই চোখ জলে ভরে যায়। তার মা। তার অভাগিনী জননী, সারা জীবন কত কষ্ট পেয়েই না মারা গেছেন। অভয় বার বার চারদিকে তাকিয়ে দেখে। ঘরসংসারে চারদিকেই মায়ের হাতের চিহ্ন। সেই শিউলি ফুলের গাছ। তাঁর হাতের পোঁতা পেয়ারা আর আম কাঁঠাল গাছ। এই সংসারে সর্ব্বত্র মায়ের স্মৃতিচিহ্ন জল জল করছে। শুধু নেই সেই মানুষটি। মহাকালের বুকে কোথায় যে হারিয়ে গেছেন, তা কে জানে। কোথাও সেই দেহের আর চিহ্ন নেই। তবুও তার মনে হয়, এই মাত্র তার মা যেন, দুই স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন বলছেন, খোকা ও খোকা। বাবা—অভয়, ভয় কি? এই যে, এই যে আমি বাবা—

শেষ কথা

জীবনের কি শেষ আছে? ঘটনারও শেষ নেই। মহাকালের বুকে, জীবনধারা বয়ে চলছে ঠিক নদীর মত। কোথাও সোজা কোথাও এঁকে বেঁকে বন, পাহাড় ডিঙিয়ে ছুটছে। কোথাও সে ক্ষীণ প্রাণ বা ক্ষীণকায়। আবার কোথাও তার গতি প্রচণ্ড প্রাণবান্। তার শেষ নেই বিশ্রাম নেই। জীবনও তাই। জীবনের প্রচণ্ড গতিবেগ, মত্ততা, এ সবেরও বিশ্রাম নেই, এরও শেষ নেই। এই জীবন এক আধার থেকে অন্য আধারে ভিন্নরূপে প্রবাহিত।

এই পৃথিবীর বুকে একদিন আমরা অকস্মাৎ যেমন জন্মগ্রহণ করেছিলাম, ঠিক তেমনি আবার এমনি অকস্মাৎই আমাদের বিদায় নিতে হবে। জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট সুখ আনন্দ, অজস্র রোমাঞ্চকর উন্মাদনা আর কত সুখানুভূতির একদিন চির অবসান ঘটবে। শুধুমাত্র জাগ্রত থাকবে, নিজ নিজ প্রিয়জনের অন্তরে এক সুখস্মৃতি। কিন্তু কালপ্রবাহে, সেই স্মৃতিও ম্লান হয়ে যাবে, অবশেষে সব মুছে যাবে।

দৃষ্টির অন্তরালে বোধ করি সবই লুপ্ত হয়ে যায়। বুঝি সবই নিঃশেষ হয়ে যায়, আর কেহই স্মরণ করে না। মহাকালের বুকে স্থায়ী চিহ্নই বা কয়জনে রেখে যায়? চির উজ্জ্বল, চির সুন্দর, চির জাগরূক স্মৃতি কয়জনের ভাগ্যে জোটে? না—জোটে না।

যাঁদের ভাগ্যে সেই গৌরবটুকু দেখা যায়, তাঁরা মহা-মনীষী, মহা-ঋষি। জ্ঞানে প্রজ্ঞায় তাঁরা এই বিশ্বে চির স্মরণীয় হয়ে থাকেন। কিন্তু জনতার এই বিচিত্র বিপুল স্রোতের মাঝে, বিপুল প্রাণের এই সমারোহে এদের মূল্য কতটুকু? অপরের অতি পরিচিত পদচিহ্নের সঙ্গে—অপরের ছায়াতে ছায়া মিশিয়ে, আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিচয় কোথায়?

না—না—কিছু নেই।

অভয়ের জীবন, বা জীবনের ঘটনাপ্রবাহ কোথায়, কোনদিকে গেছে—তার খোঁজ নেবার প্রয়োজন কি?

মহাকালের নিষ্ঠুর খেলায়—দয়াহীন মায়াহীন, জীবনযন্ত্রণার মাঝে, এমন শত শত অভয় নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। তাদের সন্ধান কে রাখে? তাই অভয়ের খোঁজ রাখার কোনও অর্থ হয় না। তার আনন্দ, শান্তি, দুঃখ বেদনা, ছোট খাট ঘটনা নিয়ে, সে নিজেকে নিয়ে থাকুক—বা নিজেকে গড়ে নিক্। তার ইতিহাস জানা, বা তার ভাগ্যের পরিণতি কোথায়, কোন পথ ধরল। তা জানা অবান্তর। যদি সে শান্তি বা আনন্দ পায়, তবে আমরা সুখী। দুঃখ যদি পায়,—মানুষের কাছে যদি আঘাত পায়,—মানুষের বঞ্চনায় যদি তার বুকে আঘাত লাগে, তবে সে দুঃখে আমিও অংশীদার হব। তার সমস্ত দুঃখ, সুখ, আনন্দকে, নিরাসক্ত মনে মেনে নেব। বোধ করি এই ভাল। মানুষকে আমি মানুষই দেখি। দেবতা বলে পূজো করতে চাইনে—আর পশু বলে ঘৃণাও করতে চাইনে। অভয়ের জীবন-ইতিহাস লেখা আমার কাম্য নয়। কারণ শেষ করার পরও কিছু অবশিষ্ট সব সময় থেকে যায়। কথার কখনও শেষ হয় না—আর ঘটনাও তাই।

গল্প বলছি

(গল্প)

দুর্গাপদ দাস

অসীমবাবু অনেক দিন তুমি দিদির বাড়ী আস নি। তোমাকে কয়েকটা কথা বলবার দরকার ছিল। ঠিকানা জানলে আগেই লিখতাম। তোমার দিদির কাছে ঠিকানা চাওয়ার সাহস হয়নি। তাতে ঠিকানার বদলে বরাতে জুটত এক কিস্তি দাঁতের মার, অর্থাৎ গালমন্দ। তাঁর অজান্তে তোমার ভাগ্নীকে কিছুটা আচার ঘুষ দিয়ে ঠিকানা যোগাড় করে লিখতে বসেছি।

হাতে সময় খুব বেশী নেই। হয়ত দু'তিন ঘন্টা। এর মাঝেই যা বলবার বলে বিদায় নিচ্ছি। তোমাকে ছাড়া ব্যর্থ জীবনের কথা আর কাকেই বা লিখব? তুমি হয়ত আমার বেদনা বুঝবে। আর, না বুঝলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছুবার অনেক, অনেক আগেই সংসারের সকল ভালো মন্দ, সাদা কালোর সীমানা পেরিয়ে আমি চলে যাব।

আমাকে গড়বার বেলা বিধাতা ভীষণ ভুল করেছিলেন নিশ্চয়ই। জন্মাবধি তাই আমি নিঃসঙ্গ একা ঘরে এবং বাহিরে। সকলের মাঝে থেকেও একঘরে। মা বাপের বোঝা এবং দুশ্চিন্তা। বিধাতা আমাকে রূপ দেন নি।

শৈশবে আমার খেলার সাথী কেউ ছিল না। সবাই এড়িয়ে চলত আমাকে। দেখলেই দূর থেকে চিৎকার করত, ঐ যে কালো পেত্নী, শ্যাওড়া গাছ, ইত্যাদি। নিজের ভাইবোনেরাও যে আমাকে সুনজরে দেখত, এমন নয়। কথায় বার্তায় আকারে ইঙ্গিতে তাদের মনোভাব প্রকাশ পেত। কোনও আত্মীয় বাড়ীতে বা গ্রামের মেলায় তারা কেউ আমাকে সঙ্গে নিত না। কারণ, আমার চেহারা সুন্দর নয়।

যতদিন ছোট ছিলাম, এসবের কিছুই বুঝতাম না। বুঝবার বয়স যখন হলো তখন একা একা কাঁদতাম। কাঁদতাম অঝোর ধারায়, একা থাকলেই কান্না নামত, সে কী কান্না। যদি জমিয়ে রাখার মতন হত, তাহলে হয়ত আমার চোখের জলে একটা সাগরই ভরে যেত। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। নানা অছিলায়, নানান কাজের মাঝে। তবুও কান্না থামাতে পারতাম না।

মা অবশ্য মেয়ের মনের ব্যথা বুঝতেন। কিন্তু তিনিও নিতান্ত নিরুপায়। কুশ্রী মেয়ের করুণ ভবিষ্যতের এত ছবি সব সময়ই তাঁর চোখের উপরে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা ছিল না তাঁর। বুকের জ্বালায় নিজেই জ্বলে পুড়ে খাঁক হতেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, কি যে এমন করে কাঁদছিস যে? জবাব দিতাম, কিছু না।

এ যেন কোনও মহাসাগরের বুকে পরস্পরের নিকটের দুটি দ্বীপ, নিকটে থেকেও দূরে। ছুঁই ছুঁই করেও যারা কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না। শুধু নীরবে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বলা অথবা না বলা। ঘরেও বাইরের একটানা এই ছিঃ ছিঃর ভিতর দিয়েই লালিত হয়েছে আমার কুড়ি বৎসরের জীবন।

কেন জানি না, দিদির বাড়ী এলে তুমি যেচে আমার সঙ্গে কথা বলতে, এড়িয়ে থাকার সুযোগ দিতে

মা, আমাকে এটা ওটা নিয়ে খুনসুটিও চালাতে। সেই শিশু মনেই ভাবতাম, আমি একেবারে একা নই। এমন মানুষও সংসারে আছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে যার বাধে না। আবার তুমি কবে আসবে তার দিন গুনতাম।

শৈশবের সেই না-বুঝা দিনগুলি কেটে গেল। মনে জাগল নতুন চেতনা, নতুন অনুভূতি, বুঝতে শিখলাম ক'মণ ধানে ক'মণ চাল ফুটে। বিধাতা আমাকে রূপ না দিলেও জড় করেন নি। আর পাঁচ-জনের মতন আমাকেও আনন্দ বেদনার অনুভূতিতে সাজিয়ে দিতে তাঁর কার্পণ্য ছিল না কদাপি। শৈশবের উন্মেষেই বুঝতে পারি জগতে আমি অবাঞ্ছিত, মা বাপের গলার কাঁটা।

এ সময়ে একদিন তুমি আমাদের বাড়ীতে এলে। বাল্যের ঠাট্টা-তামাসার দিন উৎরে গেছে। তোমার সেদিনের পরিহাস ছিল যৌবনের পরশে রাঙা। একথা সেকথার পর বেশ রসিয়ে বললে, এবার আমার বিয়ের আয়োজনের সময় এসেছে।

কুশ্রী বিশ্রীকে ঠাঁই দেবার মতন উদার কেউ নেই, বলেছিলাম আমি।

আমাকে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি কবিতা শুনিয়েছিলে।

তুমি কলেজে পড়। মন তোমার আকাশে উড়ে বেড়ায়, আর আমি ; আমি ধুসর পৃথিবীর কঠোর হাতের মার খাওয়া। নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

বলেছিলাম, কবিতা আর সংসার এক নয়। যতদিন ছোট ছিলাম, আমাদের মেলামেশাতে তোমার দিদিরও আপত্তি ছিল না। তিনি আমাকে বেশ মায়াই করতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই দিদির আচরণেও বদল হতে থাকে। তুমি এলে যখন তাঁর বাড়ী যেতাম, বুঝতাম, তোমাকে দিদি সব সময়ই চোখে চোখে রাখেন। আমাদের বাড়ী আসতে তোমাকে তিনি নিষেধ করেছিলেন, এমন কথাও রটেছিল। দিদির হয়ত ভয় ছিল, তাঁর সোনার চাঁদ ভাই আমার খপ্পরে পড়ে যাবে।

দিদিকে দোষ দেই না। মেয়েলোক একে অন্যের ঈর্ষা-কাতর। মা, মেয়ে, শাশুড়ী, বউ ও বোনেদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন তফাৎ নেই। এ জায়গায় তারা সবাই এক।

তবুও শেষ সময়ে তোমাকে নিজের কথাটি বলে যাওয়া ভালো। দিদির ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। নিজের সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। পুরুষকে কাছে টানবার মতন কোনও যোগ্যতা আমার নেই।

তোমার কাছে কেন যেতাম? যেতাম কিছুটা কথাবার্তা বলে মনের একাকিত্ব থেকে সাময়িক রেহাই পাবার আশায়। এর পেছনে আর কোনও বাসনা ছিল না। আমার সৌভাগ্য, কোনদিন রিক্ত হস্তে ফেরত আসি নি। বুঝেই হউক অথবা না বুঝেই হউক, আমার সমস্ত রিক্ততা, নিঃস্বতা, শূন্যতা, তুমি কানায় কানায় ভরে দিতে। ভিক্ষুকের মতন, কাঙালের মতন দু হাতের অঞ্জলি ভরে ঘরে ফিরতাম, বয়ে বেড়াতাম। মূল্যহীনারে সোনা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখ তুমি। তোমার চোখের মায়ার কাজল ধুইয়ে মুছিয়ে আমার সমস্ত দৈন্য দূর করে দিত।

ঘর-সংসার যে আমার কপালে নেই একথা শুধু যে আমিই জানতাম এমন নয়, মা বাবার অজানা ছিল না। তবুও শুরু হয় সম্বন্ধ খোঁজা। কারণ শাস্ত্রে নাকি বলে যে, সব দানের শ্রেষ্ঠ দান কন্যা দান। এ না হলে পিতার হাত শুদ্ধ হয় না। এবং অপরের মেয়ে ঘরে আনার ঋণও শোধ হয় না। এছাড়া, আমার বেলা আরো একটা বড়ো কারণও ছিল। যেভাবেই হোক না কেন, অপরের হাতে গছিয়ে দিয়ে গলার কাঁটা দূর করা, দায়মুক্ত হওয়া। যদিও সবাই জানতেন, নিষ্ফল প্রয়াস।

বিয়ের আলাপের প্রথম ও প্রধান শর্ত ত কনে দেখা বা যাচাই করা। সে পর্য্যায়ও শুরু হয় যথারীতি। প্রথম দিকে এতে যে নিজের মনেও অজানার সাড়া জাগত না এমন নয়। কিছুটা স্বপ্নও দেখতাম নিশ্চয়ই,

কিন্তু বিধি বাম। দেঁতো হাসির আড়ালে নিজেদের মনোভাব লুকিয়ে সবাই বিদায় নেন, 'পরে জানাব' বলে। অর্থাৎ, এ মেয়ে বাজারে অচল, অপ্রিয় সত্য সামনা-সামনি বলতে সৌজন্যে বাধে। তাই এ অছিলা। সে খবর কখনো আসে না।

ধীরে ধীরে নিজের কাছেও এর মাধুর্য্য, অভিনবত্ব লোপ পায়। মনে হয়, সব কিছুই যেন এক রকমের অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একের পর এক ব্যর্থতার পরেও আবার যাচাই করার পালা আসে। কলের পুতুলের মতনই সাক্ষাৎকারে হাজিরা দেই। আর দুরাশা হলেও প্রতিবারেই মনে আশা জাগে, এভাবে হয়ত কোন সদাশয়ের করুণা লাভ করব কিন্তু প্রতিবারেই সেই একঘেয়েমি। গতানুগতিকতার জাবর কাটা, পাশের নম্বর আর মেলে না।

ফিসফিসানি চলে কখনো বা আড়ালে আবডালে, কখনো সামনে। মায়ের চোখে মুখে ক্লান্তির রেখা ভাসে দুশ্চিন্তারও।

মরণ কামনা করি। নিজের জন্যই শুধু নয়। মা বাবার যন্ত্রণার অবসানের জন্যও।

এমনি করেই পাশের নম্বর ছাড়া সাতবার গেল। এবারে অষ্টম বারের প্রদর্শনী এবং আমার বিদায়ের সানাই।

আগের ক'বারের 'পরে জানাব' বলাতে তবুও সৌজন্যের প্রলেপ ছিল। এবারে তার লেশমাত্র নাই। বরের বাবা কিছু না বলেই গম্ভীর মুখে বিদায় নেন। তাঁর চোখ মুখের কুঞ্চনই আভাস দেয় শূন্য ফলের।

আমার অনুমানই সত্য হয়। ক'দিন পর এক মলিন সন্ধ্যায় বাবা বাড়ি এসে মাকে ডাকেন। এত জোরে মাকে ডাকতে তাঁকে কখনো শুনিনি। বাবার চেহারা বড়ো করুণ, বড়ো কাতর। বলেন, আমারই কপাল মন্দ। এবারেও নিষ্ফল যাত্রা। তাঁকে যেন হিষ্টিরিয়া চেপেছে। হাত পা নেড়ে বলে চলেন। আগের গুলোর তবু ভদ্রতার বালাই ছিল। এ ব্যাটা হদ্দ পাজী, চোখের চশম নেই; মেয়ে নেওয়া না-নেওয়া তোর ইচ্ছা। তাই বলে এভাবে চিঠি লিখে অপমান করা? এ কি কোন ভদ্রলোকে করে? এমনি অনেক কিছু।

মা থামাতে যান। বলেন, মেয়ে যে পাশের ঘরে। কী মনে করবে? মা'র কথাতেও উপচে পড়া কান্নার সুর। যেন এ অবস্থার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। কেননা তিনি জননী।

এই গ্লানি, এই লাঞ্ছনা দুঃসহ। আর চলতে দেওয়া যায় না। অনেক স্নেহলতার গল্প শুনেছি। গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিস্নানে যারা পিতার দায় মোচন করেছে।

এবারে নিজের পথের ডাক পেলাম। তাই বলেছিলাম, অষ্টম বারের কনে দেখা আমার বিদায় বেলার সানাই।

সামনে আমার মুক্তি। মরণ-মধুর মুক্তি। মুক্তি শুধু আমারই নয়, মা বাবারও নয়।

যাদের উপেক্ষা বিদ্রূপ আমাকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছে, তাদেরও।

একটা কর্ত্তব্য বাকী ছিল, তোমাকে খবর দেওয়া। পাঠশালার ডাকবাক্সে এই চিঠিটা দিয়ে দিলেই এ কর্ত্তব্যও হয়ে যাবে।

যারা বারে বারে আমার ভাগ্যের দুয়ারে পরিহাসের দূত হয়ে এল আর গেল। খেলার পুতুলের মতন, দোকানের পশরার মতন নানাভাবে নেড়ে চেড়ে পরখ করল, যাচাই করল আমাকে এবং জানিয়ে দিতে কসুর করল না আমি পছন্দসই নই, আমি বাজারে অচল। তারা ত আমার বাইরেটাই দেখল শুধু। বুঝতে চাইল না আমার অন্তর, যে অন্তঃপুরে আমি নারী, আমি মহীয়সী। দেখতে পেল না যে, আমারও মন বলে একটা অস্তিত্ব থাকতে পারে। যেখানে প্রসুপ্ত নারী জীবনের মহা অভীপ্সা। স্বামী সন্তান ঘরসংসারের স্বপ্ন। তাদের নিষ্ঠুর প্রত্যাখান আমাকে জানিয়ে দিল, সংসারে আমি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, অসহ্য, অতিরিক্ত ছাড়া আর কিছু নই। একথাটুকু তারা অস্বীকার করল যে, বিধাতার রূপের ভাণ্ডে আমার কোন অধিকার না

থাকলেও তাঁর বর্ণবহুময় সংসারের জীবনের পাত্রে ত সম্পূর্ণ অধিকার ছিল আমার।

অজানার কূলে পাড়ি দেওয়ার মুহূর্তে তোমাকে প্রণাম জানাই, অসীমবাবু আমার শেষ প্রণাম। তোমার দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় কুরূপা হয়েছিলাম অপরূপা। কুদর্শনা হয়েছিলাম সুদর্শনা। ক্ষণিকের জন্ত হলেও কালো পেত্নী খাওড়া গাছকে তুমি কাছে টেনে নিয়েছিলে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলে। হাসি মশকরাতেও তোমার বাধেনি। হয়ত এটা তোমার খেয়ালই ছিল, মনের কোনও যোগ ছিল না এতে। তবুও তুমিই আমার জীবনের একতম পুরুষ যে এই ব্যর্থ, বঞ্চিত নারীজন্মকে ধন্য করেছে। পূরবীতে তার কানে গেয়েছে তোমের আগমনী। ইহাই আমার চাওয়া ও পাওয়ার পরম, ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও সান্ত্বনা। তোমাকে শতকোটি প্রণাম।

ইতি, অনিলা।

স্নেহের খোকা! ঘোষেদের মেয়ে অনিলা আজ তিন দিন হয় ডুবে আত্মহত্যা করেছে। সম্ভবতঃ আগের রাতে পুকুরে ডুবেছিল। কদিন ধরে তোর কথা খুব বলত। তোর আসার খবর নিত। আমরা খুব একটা আমল দিতাম না।

জীবনে ত হতভাগিনীর শান্তি মেলেনি। মরণে যেন সে শান্তি পায়। সামনের ছুটিতে আমাদের দেখে গেলে সুখী হব।

ইতি আশী: দিদি

সংগ্রামী যোগেশদা : একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

যোগেশচন্দ্র বাগল আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সমস্ত জীবন ব্যাপী তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল —বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এক বিরাট্ ভাণ্ডার তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের জীবন যেন এক চ্যালেঞ্জ। দুঃখ দারিদ্র্য ও ব্যাধির বিরুদ্ধে, সমস্ত জীবন ব্যাপী তাঁর সংগ্রাম, এবং এ সংগ্রামের তিনি অক্লান্ত সৈনিক। অপরাজেয়।

ইতিহাস ও সাহিত্যের অক্লান্ত পাঠক, প্রবন্ধকার, রাশভারী এই বিদগ্ধ সুপণ্ডিত মানুষটির সংস্পর্শে এসেছিলাম, সেই ১৯৫৫ সালে। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে, ব্যারাকপুরের 'উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন' বিভাগে চাকরী করি। সারা সপ্তাহ চাকরীর পর, প্রতি শনিবার, অফিস ছুটির পর 'শনিবারের চিঠির' অফিসে যেতাম। সেখানে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ চৌধুরীর ও অন্যান্য সুধীজনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হ'ত, চা' পান হ'ত আর হ'ত সাহিত্যের আড্ডা। কোন কোন দিন পরম শ্রদ্ধেয় সজনীকান্ত দাসও আসতেন। কুশলাদি প্রশ্ন করতেন, লেখার উৎসাহ দিতেন, তারপর কাজের কথাগুলি সেরে আবার ওপরে চলে যেতেন। 'শনিবারের চিঠি'তে ঐ সময় কিছু কিছু লিখেছিলাম। এবং ঐখানেই পরিচয় হয়েছিল পরম শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগলের সঙ্গে। আমার নাম শুনে, এক মিনিট চুপ করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, তুমি কি স্বর্গত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের কেউ হও?

—আজ্ঞে তিনি আমার পিতামহ।

—সেই কথা বল।

আরও বিস্তারিত পারিবারিক পরিচয় জেনে নিয়ে আমার কর্মজীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। 'উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন' বিভাগে 'জুনিয়ার অফিসারের' চাকরী করি শুনে বললেন, কাজ কেমন লাগছে?

বললাম, অনেকটা মিশনারী কাজের মত। তবে মাঝে মাঝে মানুষের কান্না আর দারিদ্র্য দেখে ক্লান্ত লাগে।

—যত পারো ওদের জন্যে করবে। ওরা অমাদের স্বাধীনতার বলি। কথাটা বলে যোগেশচন্দ্র বাগল কেমন উদাসীন হয়ে গেলেন। এক মিনিট পর বললেন, তা শনিবারের চিঠিতে এসেছ, নারায়ণবাবুর কাছে বসে আছ, লেখা টেখার অভ্যাস আছে না-কি?

—আজ্ঞে সামান্য লিখি।

—কি লেখ?

—কিছু গল্প, কিছু প্রবন্ধ, বা 'ফিচার'।

—তা ভাল। তোমার রক্তে ত' সাহিত্য সেবার নেশা থাকবেই। ভাল করে লেখ। এই উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখ। ওদের নিয়ে তেমন কিছু এখনও লেখা হয় নি। অথচ আমাদের স্বাধীনতার জন্য ওদের সব কিছু হারানো, তার কথা লিখতেই হবে। তা প্রবাসীতে যেও। লেখা নিয়ে যেও। আমি নলিনীবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। যোগেশচন্দ্র বাগল উঠে গেলেন। আমি সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এলাম। আমার বুকের ভেতর মৃদঙ্গ বাজতে লাগল।

এই মানুষটি, যার বই, বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ও বাংলার রেনেসাঁস সংক্রান্ত অসংখ্য বই ও লেখা, স্কুল-কলেজ জীবনে পড়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি, আজ আমার সামনে বসে আমাকে উৎসাহিত করে গেলেন। আমি খুব অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলাম। এবং উদ্বাস্তু জীবনের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমত্ব বোধ আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

পরের সপ্তাহে 'শনিবারের চিঠি'তে যাইনি— গিয়েছিলাম প্রবাসী অফিসে। আমি সোজা যোগেশবাবুর ঘরে ঢুকে পরিচয় দিলাম। নাম শুনেই বললেন, ব'স লেখা এনেছ?

লেখা একটা নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি তা গ্রহণ করে বললেন, ভাল হলে ছাপব। আমি সম্মত হলাম।

মাস খানেক পর চিঠি পেলাম, গল্পটি মনোনীত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যায় পত্রস্থ হবে। এই প্রবাসীতেই, আমার 'পিনকল্', 'সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা' ও অন্যান্য ভাল গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়েই যোগেশদার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়, এবং কবে কখন কোন ফাঁকে 'যোগেশদা' ডেকে ফেলেছি তা আর আজ মনে নেই। আমার মত কত তরুণ লেখককেই ত' তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন—বাঙ্গলা সাহিত্যে তার হিসাব কোথায়?

শ্রদ্ধেয় গৌতম সেনের সঙ্গেও পরিচয় হয় এই সময়েই। যোগেশদা, বলেছিলেন, 'গৌতমবাবু কথা সাহিত্য ভাল বোঝেন—তুমি ওঁর সঙ্গে লেখা নিয়ে আলোচনা কর'। আরেকদিন যোগেশদা বলেছিলেন, অনেকেই তোমার লেখার প্রশংসা করছে, ফাঁকি দিয়ো না। পরিশ্রম করে লেখ। পড়াশুনা বাড়াও।

বছর খানেক পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোন এক সভা শেষে (সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম) যোগেশদা আমাকে বললেন, আমাকে প্রবাসী পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। রাস্তায় কোথায় পড়ে যাব। আমি রিকসা বা ট্যাক্সিতে যাওয়ার প্রস্তাব করতেই বললেন, না না, হেঁটে যাব। এবং সাহিত্য পরিষদ অফিস থেকে প্রবাসী অফিস পর্য্যন্ত আমার হাত ধরে হেঁটে এসেছিলেন। এই সময় তাঁর দৃষ্টিতে হানি পড়েছিল। কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু সাহিত্য চর্চা বন্ধ করেন নি। শুধু তখন কেন, সারা জীবন ধরেই ত' দুঃখ আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। চোখের হানি পরবর্তীকালে অপারেশন করিয়েছিলেন।

১৯৫৭/৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্বাবিত্তালয়ে শরৎ স্মৃতি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। আমিও অফিস থেকে দু দিন ছুটি নিয়ে ঐ সভায় উপস্থিত হয়েছিলাম। প্রতিদিনই বক্তৃতার খুঁটি-নাটি নিয়ে প্রশ্ন করতেন। আমি আগ্রহ নিয়ে শুনেছি দেখে সুখী হতেন।

ইতিমধ্যে যোগেশদা নবব্যারাকপুরে বাড়ী করেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, তুমি 'উদ্বাস্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন' বিভাগে চাকরী করে অনেক কলোনীতে ঘুরেছ, অনেক বাড়ী দেখেছ। আমার বাড়ীটাও দেখে এসো। একদিন যেও।

কিন্তু আমার আর যাওয়া হয় নি। কারণ এরপর, ১৯৬১ সালে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরী ছেড়ে চলে আসি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায়। স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল ক্রমে ক্রমে।

ইস্পাত কারখানার বিচিত্র জীবন, এবং সংসারের নানা সমস্যায় ক্লান্ত দিনের ফাঁকে ফাঁকে, যোগেশদার সান্নিধ্যের সেই সব দিনগুলি, আজও স্মৃতি-তে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার উদ্দীপ্ত তারুণ্যের সেই সব দিনে, যোগেশদার উপদেশ। এবং উৎসাহে সাহিত্যের জন্ত নতুন করে প্রেরণা পাই। নতুন করে পড়া, নতুন করে ভাবা এবং নতুন করে লেখার এক-একটি উন্মাদনা ভরা দিন।

তিনটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ কন্টকিত একটি দশক ইতি-মধ্যেই অতিক্রান্ত আজ ১৯৭২-এর জানুয়ারী। এ উপমহাদেশের জন-জীবনে নতুন দিগন্ত বিকশিত। শান্তি, স্বাধীনতা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের জন্ত আজ আমরা লড়াই করছি। ওপার বাংলার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে এপার বাংলার মানুষ যখন মগ্ন হয়ে আছে, ঠিক তখনি, হঠাৎ কাগজে দেখলাম, যোগেশদা অসুস্থ এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত। কাগজে আরও দেখলাম, রাজ্যপাল এই সংগ্রামী সাহিত্যিকের জন্ত সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে চেয়েছেন। শুনে সুখী হয়েছি। কারণ যেগেশদার এই বয়সে এবং অসুস্থ অবস্থায় আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। কয়েকদিন পর বজ্রাঘাত। যোগেশদা আর নেই। বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠেছে। যোগেশদা নেই—তাঁকে আর কোনদিন দেখব না।

কলকাতা থেকে দূরে বসে সেই সব স্মৃতিই আজ মনে পড়ছে। সেই পরম জ্ঞানী, তপস্বী ও সংগ্রামী যোগেশদা, যিনি সারা জীবন ধরে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জাগরণ, রেনেসাঁস নিয়ে ধ্যান করেছেন, রূপ দিয়েছেন অসংখ্য লেখায়, তিনি এই উপমহাদেশে নতুন এক বাঙালী রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের ইতিহাস লিখবার আর সময় পেলেন না — যে ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর শৌর্য, বীর্য্য, পৌরুষ আর সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায় হিসাবে সংযোজিত হত, এই উপমহাদেশের নতুন ইতিহাসে।

আদর্শবাদ ও ধর্ম্মমত

আদর্শবাদ ও ধর্ম্মমত

পৃথিবীর মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম্মমত ও ও আদর্শবাদ লইয়া জীবনের ধারা নির্ণয় করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মমত অথবা আদর্শবাদ কাহাকে বলে তাহা লইয়া দার্শনিক মহলে বহু তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ধর্ম্মমত, অর্থে বুঝিতে হইবে কোন না কোন ভগবানে কিম্বা দেবতা-গোষ্ঠীতে বিশ্বাস। কিন্তু যখন দেখা যায় যে বৌদ্ধ জৈন অথবা কনফুশিয়ান ধর্ম্মমতে ভগবানে বা দেবতায় বিশ্বাস প্রয়োজন হয় নাই তখন ধর্ম্মমতের ঐ অর্থ মানিয়া লওয়া চলিতে পারে না। অপর দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মমত সুনীতি ও মানব মঙ্গলের আদর্শের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, ধর্ম্মমত অবলম্বনে নরবলি, সতীদাহ, গলায় ফাঁস লাগাইয়া নরহত্যা শিশুদিগকে নদীর জলে নিক্ষেপ করা ও অন্যান্য বহু অমঙ্গল সূচক বর্ব্বরতা সমর্থিত হইয়াছে, তখন ধর্ম্মমতের দ্বিতীয় অর্থও গ্রাহ্য হইতে পারে নাই। আরো অপর দার্শনিক ও তার্কিকগণ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মমত ও আদর্শবাদ সর্ব্বদাই মানবহিতের কোন না কোন চেষ্টার সহিত জড়িত থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ধর্ম্ম ও আদর্শের নামে বহু যুদ্ধ, পরদেশ দখল ও লুণ্ঠন, মানুষকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, নির্ব্বাসন, কারাগারে নিক্ষেপ করা, পুড়াইয়া মারা কিম্বা হিংস্রজন্তুর দ্বারা ভক্ষণ করান হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে ধর্ম্মমত অথবা আদর্শবাদ গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে মানবহিতের সহিত জড়িত নহে; পরন্তু বহুস্থলেই ধর্ম্ম ও আদর্শ অনুসরণ মানুষের ঘোর অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে ধর্ম্মমত ও আদর্শবাদ কাহাকে বলে ইহার সঠিক অর্থ নির্দ্ধারণ সহজ নহে। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, ধর্ম্ম ও আদর্শ মানুষের বিশ্বাসের কথা। অনেক লোক যদি এক প্রকার কোন কিছুতে বিশ্বাস করে তাহা হইলে সেই বিশ্বাসকে ধর্ম্মমত বা আদর্শবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করিলেই তাহা বিশ্ববাসীর মঙ্গলকর হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে না। বরঞ্চ মানবমন সর্ব্বদাই স্বার্থবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া ধর্ম্মমত ও আদর্শবাদও কোন সময়েই বিশ্বমানবের হিত ও উন্নতি বিচার করিয়া গঠিত হয় না। কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী অথবা জাতি বা সম্প্রদায়ের সুবিধা ও লাভের কথা দিয়াই ধর্ম্মমত ও আদর্শবাদ গড়িয়া উঠে। যদি বা কখনও সর্ব্বমানবের কথা ধর্ম্ম ও আদর্শ গঠনে সংযুক্ত হয়, তাহা অধিক কাল সেইভাবে থাকে না। অতি শীঘ্রই ঐ ধর্ম্ম বা আদর্শ সাক্ষাৎ ভাবে যাহাদের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে তাহাদেরই সীমিত স্বার্থের দ্বারা পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে। পরিবর্ত্তন ধর্ম্ম ও আদর্শের এক প্রকার স্বভাবজাত এবং পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা কলহ-বিবাদের কারণ হইলেও সর্ব্বদাই ঘটিতে থাকে। ব্যবসা যেরূপ শুধু ব্যবসা বিশেষের আগ্রহ মাত্র এবং কোন ব্যবসা শুধু সেই ব্যবসার লাভ ও উন্নতিই চেষ্টা করে, বিশ্বের সকল অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টার লাভ ও উন্নতির কথা ভাবে না; ধর্ম্মমত ও আদর্শবাদও তেমনি নিজ নিজ বিশ্বাসী ভক্তদিগের সুবিধা বিচার করিয়াই চলে; তদপেক্ষা ব্যাপক কোন উদ্দেশ্য তাহার থাকে না।

ধর্ম্ম ও আদর্শ তাহা হইলে মতের ক্ষেত্রে তাহাই যাহা অবলম্বন করিয়া কোন এক বা একাধিক মানবগোষ্ঠী নিজেদের ঐ আদর্শে বা ধর্ম্মে বিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করে। ধর্ম্ম বা আদর্শ বিশেষের কোন রীতি নীতি বা জীবনযাত্রা পদ্ধতি থাকিলে মানব-গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ ধর্ম্ম বা আদর্শ অনুযায়ী রীতিনীতি

বা পদ্ধতি অনুসরণে জীবনযাত্রা নির্দ্ধারণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইভাবে কোন মানব সম্প্রদায় কোন এক প্রকার খাদ্য বর্জ্জন করিয়া চলে অথবা কোন বিশেষ প্রকারের বস্ত্র পরিধান করে। কেশবিন্যাস চন্দন বা সিন্দুর লেপন, নদী বা সঙ্গম বিশেষে অবগাহন, তীর্থ, স্থান বিশেষের পবিত্রতায় বিশ্বাস, ইত্যাদি নানা কথা ধর্ম্ম সম্পর্কে মানুষের জীবনে উত্থিত হয়। আদর্শের ক্ষেত্রে মত, পুস্তক, গুরুবাদ, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূল্য বিচার, প্রভৃতি কথা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা প্রচারের উদ্ভব দেখা যায়। একটা জিনিষ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বযুগে দেখা যায়। তাহা হইল ধর্ম্মমত ও আদর্শবাদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। কোথাও কোন এক মত বা এক আদর্শ থাকিলেও তাহা শীঘ্রই নানা রূপ ধারণ করে ও ধর্ম্মমতবাদ ও আদর্শবাদ সহজেই ধর্ম্ম-মতবিবাদ ও আদর্শবিবাদে পর্য্যবসিত হয়।

মানুষ যেরূপ সম্পত্তি লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে, মত ও বিশ্বাস লইয়াও সেইরূপ কলহবিবাদ হইয়া থাকে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ধন, সম্পত্তি লইয়া পৃথিবীতে যত ঝগড়া হইয়াছে ধর্ম্ম ও আদর্শ লইয়া তাহা হইতে কম হয় নাই। ধর্ম্ম ও মতবাদ হইতে তাহা হইলে মানব জাতির উন্নতি ও লাভ কতটা হইয়াছে এবং অবনতি বা ক্ষতিই কতটা হইয়াছে তাহার হিসাব সুদীর্ঘ হইবে। শেষ অবধি লাভ লোকসানের হিসাব কি দাঁড়াইবে তাহা স্থির ভাবে বলা যায় না, তবে বিশ্বমানবের মিলন ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবননির্ব্বাহই যদি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, ধর্ম্ম ও মত-বিভেদ হইতে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় নাই। একথা অবশ্য মানিতেই হইবে যে, ধর্ম্ম ও আদর্শ এমনও আছে যাহা মানুষকে বিবাদ-কলহের পথ ছাড়িয়া মানবহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দেয়। বর্ত্তমান যুগে টলষ্টয় বা রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ বিশ্ব-মানবীয় বলিয়া সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ লইয়া অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে দলাদলির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে দেখা যায়, যদিও মূলতঃ তাঁহার মতবাদ টলষ্টয় ও রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত পথেই অবস্থিত বলা যায়। ধর্ম্ম ও মতবাদের মধ্যে যদি রাষ্ট্রীয় বা অর্থ-নৈতিক কথা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে কলহের সম্ভাবনা বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই কারণে উচ্চ আদর্শ বা নীতির কথার সহিত রাজ্যাধিকার অথবা আর্থিক কথা সংযুক্ত হইতে দেওয়া কখনও উচিত নহে।

কোন অধিকার লইয়াও যদি মানুষ কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহ করিতে সুযোগ পায় তাহা হইলে সেই কলহ যুগান্তব্যাপী হইতে বাধ্য, সুতরাং মানুষকে সকল অবস্থায় সকল বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ বর্জ্জন করিয়া চলিতে বাধ্য না করিলে বিশ্বমানবের হিত কখনও হইতে পারে না। ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে মানব জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গল হইয়াছে ধর্ম্ম ও আদর্শ অথবা রাজ্যাধিকার সম্পর্কিত কলহ-বিবাদ হইতে। এই কারণে যে সকল ধর্ম্ম বা আদর্শ মানুষকে সামরিক শক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করে সেই সকল ধর্ম্ম ও আদর্শ মানবহিত-বিরুদ্ধ। সুবুদ্ধি সুযুক্তি সুবিবেচনা ও শান্তিপূর্ণ ভাবে বিচারই হইল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অস্ত্র ব্যবহারে কোন লোকক্ষয়কর অমঙ্গলের সূচনার সম্ভাবনা থাকে না। সামরিক শক্তি ব্যবহার—বা যে কোনও ভাবে গায়ের জোরে ও বলপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর বিরাট অমঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। ঐ অমঙ্গলের বীজকে অঙ্কুরিত হইতে দিলেই অমঙ্গল অজস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠে ও মানব-হিতের সকল আশা বিনষ্ট হয়।

ভালো জাত

নিত্যানন্দ

আমাদের একটি কুকুর আছে। সকলেই জানেন যে কুকুরদের মধ্যে যে রকম জাতিভেদ আছে সে রকম জাতি নিয়ে ইতরবিশেষ করা মানব সমাজে কোথাও দেখা যায় না। আকারে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, স্থূলতায় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনা মূলক পার্থক্যে; সব কিছুতেই কুকুরদের জাতি, বংশগৌরব, কৌলীন্য, আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের জাতি বিচার করবার বহু ব্যবস্থা পৃথিবীর সব দেশেই আছে। কেহ জাতি কিম্বা শ্রেণীর পার্থক্য ও মূল্য স্বীকার করে, কেহ বা করে না কিন্তু আসলে মেনে চলে। কুল, পরিচয় নিয়ে লম্বা লম্বা আলোচনা শুধু ভারতবর্ষেই হয় না। ইয়োরোপেও কার রক্ত কতটা "নীল" তাই নিয়ে ডেব্রেট ও আলমানাক গু গোতা জাতীয় বড় বড় বই নিয়মিত প্রকাশিত হ'তো। কে কার থেকে উঁচু জাতের, বড় ঘর, ছোট ঘর, সাদা, কালো, পার্টিকলে, হলদে গয়ের রংএর সেমেটিক, হ্যামেটিক,নর্ডিক বা অ্যালপাইন, ল্যাটিন কিম্বা মেডিটেরেনিয়ান; তাতার, বারবারি, নিগ্রো কিম্বা পলিনেসিয়ান—কত রকম জাতই যে আছে। ভারতবর্ষে জাত মেলান চিরকালই একটা বড় ব্যবসা ব'লে চলে এসেছে।

কিন্তু কুকুরের জগতেও অসংখ্য জাত আছে। প্রায় ৩৭০ জাতের কুকুর পৃথিবীতে নিজের বংশ আর জাত দেখিয়ে সমঝদার লোকেদের বাড়ীতে পোষ্য হিসেবে জায়গা পেয়েছে। এর মধ্যে ১০০র বেশী জাত কেনেল ক্লাব গ্রাহ্য এবং তাদের কুলশীলের বিচার নিয়ে বছরে বছরে বহু সহরে বহু দেশে কুকুর দেখানর মেলা হয়ে থাকে। সে সব মেলাতে যে কুকুরগুলি জয়লাভ করে তাদের বাচ্চা উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। কুকুরের জাত বিচার কুকুরের কেনা-বেচার একটা বিশেষ অঙ্গ আর তাই নিয়ে যাঁরা দেশে দেশে নাম করেছেন তাঁরা কুকুরের ব্যবসাতে বেশ পয়সা রোজগার করে থাকেন বলে শোনা যায়।

কুকুরের আভিজাত্য এরকম একটা বৃহৎ ব্যাপার হলেও যে সব কুকুর মহা সমাদরে ঘরে ঘরে বিরাজ করে তাদের মধ্যে উচ্চ আর মিশালহীন বংশ পরিচয় বেশীর ভাগেরই নেই। অনেক সময়ই দেখা যায় দোআঁশলা কুকুর মহাসুখে বড় লোকের বাড়ীতে রাজসম্মানে বিরাজ করছে। দোআঁশলা কথাটা শুধু কথার কথা। আসলে কোন্ কুকুর কয় আঁশলা তার হিসাব করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব।

আমাদের পরম প্রিয় সারমেয়টি, তিনি খোস-মেজাজে ও বহাল তবিয়তে সব জাতি আর শ্রেণীর বিচার উড়িয়ে দিয়ে আরামে পোষ্য অধিকার ভোগ দখলে বিশেষ করে কায়েম রয়েছেন; তাঁর জন্ম ও জাতি বৃত্তান্ত হিসাব করলে দেখা যায় যে তিনি জাতিতে লীগ অফ নেশনস্। কুকুর জগতে এমন রক্ত নাই যা তাঁর দেহে কিছুটা অন্ততঃ পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভারত স্বাধীন হ'বার পরে জন্ম হওয়ার ফলে কেউ বলতে সাহস পায়নি যে কুকুরটি দেশী। সবাই বলত ওর গোঁফের রং দেখলে মনে হয় যে ওর কোন পূর্ব পুরুষ অতীতকালে আয়রল্যাণ্ডে

শেয়াল তাড়িয়ে বেড়াত। পুচ্ছের ঊর্ধ্বগামী বক্রতাতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের কুকুর জাতির বৈশিষ্ট্যই দেখা যেত, সেই লাঙ্গুল-ভঙ্গীকে বিদেশের আমদানী দেহলক্ষণ বলে কেউই বলতে পারত না। কানের দৈর্ঘ্যে স্প্যানিয়েলের আর শরীরের উচ্চতায় ডাকসহুণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মনে করিয়ে দিত। আর বর্ণ একেবারেই খাকি অর্থাৎ স্বদেশী কুকুরের একচেটিয়া রং। আমরা অনেক সময়েই আমাদের কুকুরটির সম্মান রক্ষার জন্যে নানা লোককে অপ্রিয় কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, সব ক্ষেত্রেই স্বদেশীর ইজ্জত সবাই মানে; শুধু কুকুরের বেলাই যত গোলমাল, বিদেশী দোআঁশলা, দশআঁশলা হ'লেও যায় আসে না কিন্তু স্বদেশের অমিশ্রিত পবিত্র রক্তধারা ধমনীতে বহমান থাকলে দিশী কুকুরের তাতে কোন মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় না। নিজেদের যত রকম মূর্খতা, অসভ্যতা-ভব্যতাবিরুদ্ধতা স্বদেশী ভাব বলে চলে যায়; শুধু কুকুরের স্বদেশী চাল-চলন দেখলেই অসুবিধা। "এ তো দেশী হ্যায়" বলে স্মিত হাস্য করে যখন হিন্দুস্থানী ভৃত্যরাও কুকুরকে অসম্মান দেখায় তখন তা সহ্য করা শক্ত হয়ে ওঠে। বলতে বাধ্য হ'তে হয় যে ঐ ভৃত্যের সকল পুরুষের সকল ব্যক্তিই "দেশী হ্যায়"। এবং তাছাড়া তার দেশনেতারা, দেশের মন্ত্রীরা সকলেই দেশী, কেউই বিলাইতি নয়।

জাতে দিশী হলেও জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আমাদের হালু একেবারেই সাহেব। ইংরেজী ছাড়া কথা বোঝে না। গোস্ত ছাড়া আর কিছু খায় না। শীতকালে গায়ে বিলাইতি কোট পরে; গলায় সব সময়েই বিলিতি কলার। তা ছাড়া আছে কনডিশন ট্যাবলেট বা পাউডার, ঈষ্টের গুলি আর নানা রকম ভিটামিন। গায়ে পাউডার লাগিয়ে বুরুশ করা, বিশেষ কুকুরের গায়ে মাখবার সাবান দিয়ে স্নান, ক্লাপ দিয়ে নখ কাটা ও কখন কখন চুল ছাঁটা। একেবারেই সাহেবিয়ানার চূড়ান্ত। গায়ের রং বা ল্যাজের ভঙ্গী যেমনই হোক না কেন।

হালুর সাহেবী ধরণধারণের নজির আমাদের দেশে কালো সাহেবদের মধ্যে প্রায় দুই শ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে। তার পূর্ব্বে আরও অনেক শ বছর আমরা আধ্যাত্মিক জাতের আরব অথবা অন্য ধরণের বিদেশী মানুষ এ দেশের মাটিতে গজিয়েছি আর তারা পুরুষানুক্রমিকভাবে নিজেদের বিদেশীত্ব সবলে প্রতিষ্ঠিত রেখেই চলতে পেরেছিল। তাই হালু যখন মানসিক ভাবে আইরিশ হয়ে চলতে লাগল আমরা তার সে গৌরব প্রতিষ্ঠিত রাখতে কোন কার্পণ্য করতে চেষ্টা করতাম না। একবার ভেবেছিলাম ওর নামটা বদলে মোতার কিম্বা টোবি দেওয়া হ'লে বিলিতি রূপটা আরও ফুটে ওঠে কিন্তু হালুকে বদলে অন্য নাম দেওয়া সম্ভব হ'ল না। বাৎসরিক কর্পোরেশনী লাইসেন্সে লিখিয়ে নেওয়া হ'ল ও জাতে আইরিশ টেরিয়র; কিন্তু তাতেও ওর দেশীত্ব ঘুচল না। সবাই বলত বউবাজারের আইরিশম্যান। গরমকালে সেবার ওকে চেঞ্জে পাঠাবার কথা উঠল। সাহেবরা গরম সহ্য করতে পারে না সবাই জানে; তাই হালুকেও দার্জ্জিলিং পাঠাবার ব্যবস্থা হতে লাগল। একটা গরম কোট তৈরী হয়ে এল আর আমাদের জানাশোনা একজনরা দার্জ্জিলিং-এর চাঁদমারি পাড়ায় থাকেন, তাঁদের ওখানেই একজন চাকর ওকে নিয়ে গিয়ে একমাস থাকবে সেই ব্যবস্থা করা হ'ল। ভৃত্য কুকুরের দৌলতে পাহাড়ে বেড়িয়ে আসবে জেনে খুশীই হয়েছিল। হালুর বিছানা, বিশেষ খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে সে কিছুদিন পরে একদল জানা লোকের সঙ্গে দার্জ্জিলিং চলে গেল। আমরা ভাবলাম যে এর পরে হালু ঠিক সেন্ট বারণার্ড, আফগান হাউণ্ড কিম্বা নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড জাতের কুকুরের সমান সমান সম্মানার্হ হয়ে যাবে। তার জন্যে তাই আরও চার বাক্স ডগ বিস্কুট পাঠান হ'ল। ঐ জিনিসটি হাড়ের গুঁড়া, মাংসের ছিবড়ে ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হয় এবং খুবই শক্ত বলে ঐ বিস্কুট চিবিয়ে খেলে কুকুরের দাঁত ঠিক থাকে। ভৃত্যকে চিঠি লিখে লাভ নেই জেনে আমরা গৃহস্বামীকে একটা চিঠি লিখলাম। তিনি ছিলেন, আমার এক মাসতুত বোনের সম্পর্কে ভাসুর। কয়েক দিন পরে উত্তর এল,

"বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আপনার পাঠান বিস্কুটগুলি পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। একটু শক্ত হলেও তারা খেতে পেরেছে। শুধু বড় বৌদি খেতে পারেন নি। আমিও খেয়ে দেখেছি। বেশ উপাদেয় লেগেছে। আপনার হালু এখানে এসে খুব ডাল ভাত মাছ চচ্চড়ি ইত্যাদি খাচ্ছে। আপনাদের চাকর ওকে যতই মাংস খাওয়াবার চেষ্টা করে ও ততই নিরামিষ খাবার জন্যে এগিয়ে চলে। দু একখানা লুচি পেলে আর কিছুই চায় না। বেগুন ভাজা কি পোড়া আর ঝিঙে পত্ত খুবই পছন্দ। মাছের ঝোল ভাত মহা তৃপ্তি করে খায়........."

চিঠিখানা পড়ে আমাদের চক্ষুস্থির। সাহেব কুকুরের এ কি দুর্ম্মতি। এতকাল ধরে এত কষ্ট আর খরচা করে যাকে বিলিতি ধরণে হাঁটা চলা ডাকা শেখান হ'ল সে শেষকালে ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে আরম্ভ করল। আমার এক দিদি বল্লেন, "জাত ভুললে চলবে কি করে? ওর চোদ্দ পুরুষ লাউচিংড়ি খেয়ে দিন কাটিয়েছে আর তোমরা ওকে দার্জ্জিলিং পাঠিয়ে ভাবলে ওর খাস বিলিতি খানদান হয়ে যাবে? হায় কপাল।" আর এক বন্ধু সব ঘটনা শুনে বল্লেন, "ও ত দিশী তা দিশীই থেকে গেল। আর ওদিকে যে একদল ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা কুকুরের বিস্কুট খেয়ে দাঁত শক্ত করেছে, তার কি হবে? এমন কি এক বুড়াও চেষ্টা করে দেখেছেন খাওয়া যায় কি না। এ রকম ব্যাপার প্রায় দেখা যায় না।"

আমি বল্লাম, "দেখ, মানুষের বিস্কুট যদি কুকুরে খেতে পারে ত মানুষ কুকুরের বিস্কুট খেতে পারবে না কেন? আর ওতে ত আর বিষ নেই? খেতে পারলে বেশ হজম হয়ে যাবে। এখন মানে মানে ঐ হালুটাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে পারলে বাঁচা যায়। ও যদি জানতে পারে যে আইরিশরা আলু খেয়ে দিন গুজরান করে তাহালে আর রক্ষা নেই। ও তাহলে শুধু আলুই খাওয়া শুরু করে দেবে।"

আমার ছোট মেয়ে বললে, "আমি একদিন দেখেছি হালু বাসন মাজার জায়গায় ডেল আর লঙ্কা বাটা পড়ে ছিল তাই চেটে খেয়ে নিচ্ছিল। তাছাড়া ও কাঁচা লঙ্কা পেলেও খেয়ে নেয়।"

এই সব কথা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি তাই বিষয় পরিবর্ত্তন করবার জন্যে বল্লাম, "ও দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে আসুক, ওকে ভাল করে ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিতে হবে যে কোন অসুখ আছে কি না। ভালো জাতের কুকুর কখনও ত ঐ রকম হয় না।"

দিদি বল্লেন, "ভালো জাত।"

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রিষ্টল হইতে আমরা বাথ নামক শহরে পৌঁছিলাম। খুব প্রাচীন ঐতিহ্য ও কাহিনী রচিত হইয়াছে ইহাকে ঘিরিয়া। অবশ্য ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে কোনও দেবতার নাম যুক্ত হয় নাই, এবং স্বর্গের কোনও স্থপতিও আসিয়া নির্মাণ করিয়া যায় নাই, কারণ স্বর্গের স্থপতি বিশেষ অনুগ্রহভাজনের প্রতি কৃপাবশতঃ পৃথিবীতেও অনেক নগর নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। একটি রাজপুত্র—নাম তাহার ব্লেডাড—কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়া দুঃখে হতাশায় নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়া পড়ে, এবং স্থানীয় এক কৃষিজীবীর শূকর পালনের কাজে নিযুক্ত হয়। শূকরদলও রাজপুত্রের নিকট হইতে এই মারাত্মক ব্যাধির স্পর্শ পায় এবং কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মালিকের ক্রোধের ভয়ে রাজপুত্র শূকরপালকে একটি সুন্দর উপত্যকায় চরাইতে লইয়া যায়। এখানে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জলাভূমি দেখিয়া শূকরপাল তাহার ঈষদুষ্ণ জলে গিয়া গড়াইতে লাগিল। এবং রাজপুত্র সবিস্ময়ে দেখিল—শূকরদের কুষ্ঠ অল্পদিনের মধ্যেই মিলাইয়া গিয়াছে। রাজপুত্র আথেন্স শহরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল, অতএব তাহার মন ছিল যুক্তিপ্রিয়। সে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল, এই উষ্ণ প্রস্রবণের জল যদি শূকরের পক্ষে উপকারী হয়, তবে তাহা মানুষের পক্ষেও উপকারী হইবে। তাহার ভুল হয় নাই, কারণ সেও ইহাতে আরোগ্য লাভ করিল, এবং দেশে ফিরিয়া গেল। যথাসময়ে সে তাহার পিতার সিংহাসন লাভ করিল। পিতা ছিলেন ব্রিটেনের নৃপতি। রাজা হইয়া সে ঐ স্থানের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ সেইখানে একটি নগর নির্মাণ করিল। এই স্থানের অনেকগুলি বাথ বা স্নানাগারের মধ্যে কিংস বাথ কিং ব্লেডাড নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজার একটি মূর্তিও সেখানে আছে, তাহার সঙ্গে একটি লিপি খোদিত আছে—তাহাতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮৬৩ বৎসর পূর্বে এই সকল স্নানাগার ঐ রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল রোম্যানগণ ও এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনেকগুলি মূল্যবান বাথ নির্মাণ করিয়াছিল। আমাদের ঐখানে যাইবার কিছু পূর্বে ৫৬ফুট × ৫৫ ফুট আকারের একটি বাথ সমেত বৃহৎ হল খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে বাথ একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল। এখন ধনীসম্প্রদায় ইউরোপের মিনারাল ওয়াটার খনিজ লবণ পূর্ণ জলের প্রতি অধিক অকৃষ্ট। বাথের উষ্ণ প্রস্রবণ বর্তমানে টাউন কর্পোরেশনের সম্পত্তি, এই কর্পোরেশন একটি "গ্র্যাণ্ড পাম্প রুম" নির্মাণ করিয়াছে, খরচ হইয়াছে ১০,০০০ পাউণ্ড। এখানকার প্রস্রবণগুলি দৈনিক ৩৮৫০০০ গ্যালন জল দিয়া থকে তাপমাত্রা ১০৭° হইতে ১২০° ফারেনহাইট। এই জল গাউট রিউম্যাটিজম সায়াটিকা, নিউর‍্যালজিয়া, প্যারালিসিস, স্নায়ুদুর্বলতা ও চর্মরোগের পক্ষে উপকারী। এই জল বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় ১১,০০০,০০ ভাগে ক্যালসিয়াম ৩৭৭, ম্যাগনেসিয়াম ৪৭.৪, পটাসিয়াম ৩৯.৫, সোডিয়াম ১২৯, লিথিয়াম নামমাত্র, আয়র্ণ ৫.১ সালফিউরিক অ্যাসিড

৮৬৯, কারবনিক অ্যাসিড (যুক্ত ভাবে) ৮৬, ক্লোরিন ২৮০, সিলিকা ৩০, ট্রনাশিয়াম নামমাত্র, অ্যালকালাইন সালফাইডস নামমাত্র, কারবনিক অ্যাসিড গ্যাস স্বাভাবিক তাপ ও চাপে—(প্রতি লিটারে কিউবিক সেণ্টিমিটার) ৬৫·৩। মোট কঠিন পদার্থ একলক্ষে ১৮৬৪ ভাগ। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১·০০১৫। আমি এতটা বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি এই উদ্দেশ্যে যে, যদি আমাদের দেশের কেহ ভারতীয় উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে জনপ্রিয় স্বাস্থ্যনিবাসের স্থানরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাহা হইলে এই তথ্যগুলি তাঁহার কাজে লাগিতে পারে। কারণ বাথের প্রস্রবণে প্রতি স্নানের জন্য ৬ পেনি হইতে ৩ শিলিং পর্যন্ত মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে। পানীয় রূপে ঐ জল প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি ১ শিলিং ৯ পেনি বিক্রয় করা হয়।

১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে আমি স্কটল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। গিয়াছিলাম সমুদ্রপথে, ফিরিলাম রেলপথে। লণ্ডন হইতে এডিনবরা ৩৯৭ মাইল দূরে অবস্থিত, রেলপথে নয় ঘণ্টা সময় লাগে। ২৫শে আগষ্ট সেণ্ট ক্যাথারিন নামক জাহাজঘাট হইতে 'পেংগুইন' জাহাজ ছাড়িয়া টেমস নদীর ঘোলা জল হইতে নর্থ সীর নীল জলে গা ভাসাইল। সেখান হইতে সোজা লীথ অভিমুখে চলিল। বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা স্থলভাগ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শাদা রঙের খাড়া পাহাড়গুলি ঢেউ-এর অবিশ্রান্ত আঘাতে আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে, কোথাও মসৃণ হইয়াছে, কোথাও দূর হইতে সবুজ ক্ষেত নামিয়া সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে, গ্রাম ও শহর তাহাদের বাড়িঘরের উপরিভাগ ও গীর্জার চূড়াগুলি সমেত ছবির মত দেখাইতেছে। তরঙ্গিত ক্ষেতের উচ্চভূমি সমূহে শ্বেত বিন্দুবৎ গবাদি পশু চরিতেছে। সূর্যালোক উজ্জ্বল থাকাতে এসব দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই রৌদ্র ঢেউএর সঙ্গে খেলা করিতেছিল ও জাহাজের চালকযন্ত্রে অবিরাম শীকর উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহার উপর রৌদ্রালোক পড়িয়া রামধনুর পর রামধনু গড়িয়া চলিতেছিল। চন্দ্রালোক শোভিত রাত্রি পার হইয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা ফার্থ অভ ফোর্থ অর্থাৎ ফোর্থ নদীর মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। নর্থ বেরউইকের কয়েকটি পাহাড়ী দ্বীপ অতিক্রম করিয়া গেলাম। একটি দ্বীপে পূর্বে এক সন্ন্যাসীর বাস ছিল। সে যুগে স্কটল্যাণ্ডে সন্ন্যাসীদের দেখা মিলিত। দ্বীপটির সবখানিই পাথর। এখানে শস্য জন্মাইবার উপায় নাই, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সন্ন্যাসীর আহার কি ছিল? প্রশ্নটি অবশ্যই অবান্তর, কারণ ধর্মীয় লোকেরা কি না করিতে পারে। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা পাতা খাইয়া এবং গায়ে ভস্ম মাখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, শরশয্যায় আরামে নিদ্রা যান। সম্ভবতঃ স্কটল্যাণ্ডের এই সন্ন্যাসীটি সঙ্গে এক-জোড়া ছাগল আনিয়াছিলেন। লীথে যখন পৌঁছিলাম তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। স্থানটি এডিনবরা হইতে দুই মাইল দূরে। লীথ এডিনবরার বন্দর, এক্ষণে শহরের অংশ।

স্কটল্যাণ্ডবাসীদের পক্ষে এডিনবরা শহর বিষয়ে গর্বিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকগুলি শিলাময় পাহাড়ের সমন্বয় দিয়া আরম্ভ—

"Whose ridgy back heaves to the sky
Piled deep and massy, close and high"—

ক্রমে ঢালু হইতে হইতে উদ্ভিদপূর্ণ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া ফোর্থ নদীর মুখে নীল জলের সঙ্গে মিলিয়াছে, ইহাতে এডিনবরা শহরটি মানুষের হাতে গড়া শ্রেষ্ঠ চিত্রবৎ শহরগুলির অন্যতম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কাস্‌ল পাহাড় অথবা সলিসবেরির খাড়া পাহাড় অথবা কাল্‌টন পাহাড়—যেখান হইতে দেখা যাউক না কেন, ইহার এমন একটি মোহময় সৌন্দর্য চোখে পড়িবে যা জীবনে ভুলিবার নহে। এডিনবরার অধিকাংশ দ্রষ্টব্য স্থান আমি দেখিলাম। প্রিন্সেস স্ট্রীটের আগাগোড়া ঘুরিলাম, প্রিন্সেস স্ট্রীট গার্ডেনস্-এর চারিপাশেও ঘুরিলাম। কাস্‌ল-এ ফিরিবার পথে সেণ্ট জাইল্‌সের গথিক ক্যাথিড্রালটি দেখিলাম।

নিকটেই কাউন্টি রুমার, সেখানে পেভমেন্টের উপর পাথর বসাইয়া একটি চিত্রের হৃৎপিণ্ডের চেহারা দেওয়া হইয়াছে, সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে "হার্ট অভ মিডলোথিয়ান।" কাসল-এর ভিতরে আমাকে কুইন মেরির কক্ষ দেখান হইল, সেইখানে জেম্স-৪ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইখান্ হইতে শিশু পুত্রটিকে ঝুড়িতে করিয়া খাড়া নিচে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল স্টার্লিং-এ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে। ক্রাউন রুমে রাজচিহ্ন সমূহ রক্ষিত আছে। একটি প্রাচীন কামান আছে কাসল-এ, উহার নাম মন্স মেগ, ৪৮৬ সনে ঢালাই করা। এইখান হইতে হাই স্ট্রীটের পথে হোলিরুডে আসিয়া পৌঁছিলাম।

রাজা ডেভিড-১ কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হোলিরুড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভাগ্যহীনা কুইন মেরির জীবনের ঘটনার সঙ্গে ইহা সম্পর্কিত বলিয়া ইহার পৃথক একটি মূল্য আছে। ১৫৬১ সনে ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া তিনি এখানে বাস করিয়াছিলেন। লর্ড ডার্ণলির সঙ্গে এইখানে তাঁহার বিবাহ হয়। এইখানে ইটালীর রিৎসিও আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার গাউন চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। কুখ্যাত বথওয়েলের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের পর এইখানে উৎসব পালিত হয়। এবং এইখানে তিনি তাঁহার নিজের প্রজাগণ কর্তৃক লকলেভেন কাসল-এ নীত হইবার পূর্বে বন্দী হন। সেই সব কক্ষ দেখিলাম যেখানে ডার্ণলি কুইন মেরিকে কাঁদাইয়াছিলেন, যেখানে রুথভেন রিৎসিওকে ছোরা মারিয়াছিলেন, এবং গাইড আমাকে এই স্থানে রক্তের চিহ্ন আছে তাহা দেখিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টিশক্তি অবশ্য অতটা তীক্ষ্ণ ছিল না, তাই তিনশত বৎসর পূর্বেকার রক্তচিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। ঐ সব রক্তাক্ত দিনের কথা শুনিতে শুনিতে মন অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমার স্বদেশবাসীগণ ইউরোপীয়দের পাশবিকতা ও রক্তক্ষুধার নিন্দা করে। সন্দেহ নাই ন্যায় বিষয়ে বোধ ভারতীয়দের মনে বেশি আছে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার, বিজয়ক্ষুধা যে জাতির আছে, তাহাদের রক্তক্ষুধাও আছে। আমাদের মনের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রশংসনীয় হইত যদি তাহার সঙ্গে আমাদের চরিত্রের অন্য দিকের মারাত্মক হীনতা না থাকিত। আমাদের মনের ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি আমাদের দৈহিক দুর্বলতা প্রসূত। এবং মনের উচ্চ ভাবের জন্য দৈহিক দুর্বলতা ঘটে নাই। পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহ ও মন একই সঙ্গে পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। তাহার হিংস্র বা অত্যাচারী হইবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকা চাই। এবং অন্যকে রক্ষা করারও ক্ষমতা থাকা চাই। পৃথিবীতে সকলেই সৎ নহে। একজন বড় মানবতার শিক্ষক পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ গণ্ডদেশে কেহ আঘাত করিলে তাহার দিকে বাম গণ্ডদেশটি ফিরাইবে। আমাদের শাস্ত্রেও ক্ষমা সকল ধর্মে সার বলিয়াছেন। এ সব উক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তবু সবিনয়ে আমার স্বদেশবাসীকে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে বলি, যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদের মনের সকল স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ চূর্ণ করিয়াছে, সমস্ত আত্মসম্মান বোধ চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রত্যেকটি আঘাত যেন প্রত্যাঘাতের সাহায্যে তাহাদিগকে দেয়, উচ্চবর্ণের হাতের কোনও আঘাত যেন তাহারা নীরবে সহ্য না করে। এবং সে প্রত্যাঘাত দুর্বল হইলেও যেন দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম গুরুতর হইলেও যেন দেওয়া হয়। বর্তমান পৃথিবীর যে অবস্থা তাহাতে পূর্ণ ক্ষমার নীতি অচল। ইহা পাপ, বিশেষ করিয়া ইহা যখন অন্যায়কারীর লোভ আরও বাড়াইয়া দেয়, এবং তাহাতে সমস্ত মানবতার ক্ষতি হয়। অতএব যাহাকে ইউরোপের পশুশক্তি বলা হয়, তাহা পৃথিবীর সুশাসনের জন্য যে গুণ আবশ্যক তাহারই একটি উন্মত্ত বিস্ফোরণ মাত্র। এই উন্মত্ত বিস্ফোরণ যখনই এবং যেখানেই ঘটুক তাহা দুঃখজনক, কিন্তু ইহার মূলে যে গুণ নিহিত আছে তাহা দুঃখজনক নহে।

হোলিরুডে মেরি কুইন অভ স্কটস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাবতীয় দর্শনীয় জিনিস ও কক্ষ সমূহ

দেখিলাম। এডিনবরাতে যে সব জিনিস দেখিলাম তাহার মধ্যে সার ওয়ালটার স্কটের সম্মানে নির্মিত মনুমেন্টটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এডিনবরা হইতে আমি পার্থ-এ পৌঁছিলাম। রেলস্টেশনে ডক্টর ওয়াটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে আরও দুইজন স্থানীয় ভদ্রলোক ছিলেন—মিস্টার ডান্‌সমোর ও মিস্টার হানি। মিস্টার ডান্‌সমোরের অতিথি হইয়া থাকিব এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। খুব খাতির যত্ন পাইলাম, ডান্‌সমোরের মাতা অন্য বাড়িতে থাকেন, তিনি আমাকে পৃথকভাবে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি আগে কখনও ভারতীয় দেখেন নাই। আমাদের মতই ব্যবহার, কারণ তাঁহার ওখানে কিছু না খাইয়া তিনি আমাকে আসিতে দিলেন না। স্কচেরা বেশ মিশুক, সহজে অপরকে আত্মীয় করিয়া লইতে পারে।

পরদিন পূর্বে উল্লেখিত তিনজন ভদ্রলোক আমাকে লচ লেভেনে লইয়া গেলেন। পার্থ হইতে কয়েক মাইল দূরে স্থানটি। সেখানে যাইবার উদ্দেশ্য মাছ ধরা, ট্রাউট মাছ। পরে মিষ্টার ডান্‌সমোর নানা রকমের ছোট ছোট ঘটনার কথা শুনাইলেন। একটি উচ্চ ভূমির শীর্ষ দেশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, যখন তিনি আট দশ বৎসরের বালক, ঐ পাহাড়ের মাথায় একজন বিরাট পুরুষ বাস করিতেন, তাঁহার মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, পাঞ্জাব যুদ্ধের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তিনি। ঐ উচ্চস্থানে তিনি তাঁহার ঘর বাঁধিয়াছিলেন। সেটি একটি প্রশস্ত বাংলো। চারি পাশের পাহাড় ও ছোট্ট নদীসমূহের তিনিই মালিক বলিয়া দাবি করিতেন। একদিন মিষ্টার ডান্‌স্‌মোর এবং এক বন্ধু,—বন্ধুটি তাঁহার সমবয়সী,—সেই পাঞ্জাবের অফিসারের দাবি করা স্থানের একটি ছোট্ট নদীতে স্যামন মাছ ধরিবার জন্য গিয়াছিলেন। মাছ ধরায় মন দিয়াছেন এমন সময় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "পাজি ছোকরারা, এইবার তোমাদের ধরিয়াছি, এবারে তোমাদের পুলিসের হাতে সমর্পণ করিব।" তিনি এই ধ্বনি শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখেন আল্‌প্‌ পর্বত এলাকায় যেমন বিরাট তুষার স্তূপ খসিয়া পড়ে, তেমনি প্রবল বেগে এক প্রকাণ্ড পাগড়ি পরা দৈত্য ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন, এবং কি করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বন্ধু কিছু দূরে বসিয়াছিলেন, তিনি চকিতে সব বুঝিতে পারিয়া ছিপ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, "কি ব্যাপার, বব? লোকটি তোমাকে কি বলে?" বলিতে বলিতে আরও কাছে আসিয়া কোট খুলিয়া ফেলিল এবং আস্তিন গুটাইয়া বিশাল লোকটিকে লড়াই করিবার জন্য আহ্বান জানাইল। প্রবীণ ভদ্রলোক ইহাতে খুব কৌতুক অনুভব করিলেন, এবং অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন। তাহার পর দুটি লিলিপুশিয়ানকে বলিলেন, তোমাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছি, তোমরা এখন যাইতে পার। আমরা আমাদের দেশে এমন দুষ্টামি করি না, কারণ আমরা সুবোধ বালক। প্যারীচরণ সরকার, তাঁহার একখানি ছোটদের জন্য লেখা বইতে (Second Book of Reading) বলিয়াছেন, "A good boy never fights,"—ভাল ছেলে কখনও লড়াই করে না। তাহার সঙ্গে আমি কি এই কথাটি যোগ করিতে পারি—"but sneaks away when a bad boy beats him?"—"এবং মন্দ ছেলে প্রহার করিলে কাপুরুষের মত পলাইয়া যায়।"

এই ভাবে আমরা স্কুলের ছেলের মত চলিতে লাগিলাম। প্রশস্ত পথ, আমরা, একখানি বোট লইয়া পাহাড় ডিঙাইয়া হ্রদের ধারে গিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে আমরা একখানি বোট লইয়া হ্রদের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যন্ত ট্রাউট মাছের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। লম্বা সূতার ছিপ ধরিয়া থাকা খুব সহজ ছিল না। মাছ ধরিবার অনেকগুলি কৌশল আছে, তাহা জানা ছিল না, অতএব আমি শান্তভাবে নৌকায় বসিয়া সঙ্গীর মাছ ধরা দেখিতে লাগিলাম। এবং ঐ সঙ্গে চপল লহরীর খেলা। ছোট ছোট তরঙ্গের প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট একটি করিয়া

সূর্য প্রতিবিম্বিত। নীল জলের বুকে সে দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর। আমরা অবশেষে কয়েকটি ট্রাউট লইয়া ফিরিলাম। কুইন মেরি যে দ্বীপে বন্দী ছিলেন, তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল।

পরদিন রবিবার। মিষ্টার ডান্‌দমোর আমাকে একা ফেলিয়া না রাখিয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে গীর্জায় লইয়া গেলেন। পথে একটি ছোট্ট প্রাচীন অট্টালিকা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, ঐখানে "ফেয়ার মেইড অভ পার্থ্‌" বাস করিত। চার্চ হইতে ফিরিবার পথে আমরা কিন্‌নৌল পাহাড়ে গেলাম এবং যাইবার পথে ব্ল্যাকবেরি পাড়িতে পাড়িতে গেলাম। 'উইক্‌স অভ বেইগলি' নামক একটি স্থান হইতে পার্থ্‌ সুন্দর দেখায়। একটি লোক-প্রবাদ—পার্থ্‌ শহর দুই ইঞ্চির মাঝখানে অবস্থিত। ইহার অর্থ—টে নদীর সংলগ্ন পার্থের দুটি ধারে নর্থ ইঞ্চ ও সাউথ ইঞ্চ নামক দুইটি ছুটি উপভোগের স্থান আছে। নর্থ ইঞ্চ নামক স্থানটিই স্কটের 'ফেয়ার মেইড অভ পার্থ্‌' নামক উপন্যাসে বর্ণিত বিখ্যাত যুদ্ধের স্থান।

পার্থ্‌ হইতে পিটলক্রিতে পৌঁছিলাম, হাইল্যাণ্ড রেলওয়ের একটি ছোট স্টেশন। এখান হইতে বিখ্যাত কিলি-ক্র্যাংকি নামক গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ব্লেয়ার অ্যাঠোল-এ গেলাম পদব্রজে, পর পর বহু বহু সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, অরণ্য, গভীর গিরিখাত, নদী পার হইয়া যাইতে হইল। পর্বত-দৃশ্যকে এই সব জিনিস এক অপূর্ব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

ব্লেয়ার অ্যাঠোলে তিনজন ভদ্রলোক গ্লেন টিল্‌টের পারে পদব্রজে ভ্রমণে লইয়া যাইবেন অনুরোধ জানাইলেন। আমি তাঁহাদের এই অনুরোধ ধন্যবাদের সহিত পালন করিলাম। কয়েক মাইল পথ গাড়ি চলার উপযুক্ত, আমরা এ পথের সুযোগ গ্রহণ করিলাম। পথের মাঝখানে দুইদিকে দুই পর্বতশ্রেণী, তাহার মধ্যবর্তী একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় টিল্‌ট নদী। ও দেশে এটিকে 'গ্লেন' বলা হয়। নদীর পাশ বরাবর একটি পায়ে চলার পথ আছে। পথের এই অংশটি প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ, আমরা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিলাম। আবহাওয়া অনুকূল ছিল আমি যতদিন স্কটল্যাণ্ডে ছিলাম, আকাশ মেঘহীন ছিল। মাত্র এই দিনটিতে মেঘ ছিল, যদিও বৃষ্টি হয় নাই। আমরা স্ফূর্তির সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। পর্বত-গাত্রে ভারতীয় কারপেটের মতো মৃদু বর্ণে বিছান গুল্মরাজি হইতে সুগন্ধ উত্থিত হইয়া আমাদের আনন্দ আরও বাড়াইয়া দিতেছিল। আর তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল টিল্‌ট নদীর মর্মর ধ্বনি। মাঝে মাঝে প্রস্তরখণ্ডের ধাক্কা খাইয়া স্রোত গর্জন করিয়া উঠিতেছিল। ক্লান্ত বোধ করিলে আমরা কোনও একটা পাথরের উপর বসিয়া সঙ্গে আনীত আহার্যের সদ্ব্যবহার করিতেছিলাম। টিল্‌ট নদীর নির্মল শীতল জল পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত বোধ করিয়াছিলাম। যে অঞ্চল দিয়া চলিতেছিলাম, তাহা প্রায় বসতিহীন। পূর্বে যে হাইল্যাণ্ডবাসীরা ছিল তাহারা সবাই অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। দুর্দান্ত সাহসী সম্প্রদায় ছিল ইহারা। স্কটল্যাণ্ডের ওয়ালটার স্কট ইহাদের বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পাহাড়ের গভীর খাদ-প্রবাহিত ডী নদীর স্রোতের ধ্বনি আমরা শুনিতে পাইলাম। ডীর সেতুর উপর দাঁড়াইবার সময় গোধূলি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দিক দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। এইখানে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া দুই পাশের পাহাড়ের পাথর নদীটিকে দুই পাশ হইতে চাপিয়া ধরিয়াছে, এবং তাহারা পরস্পর এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে যে একটি ছোট ছেলেও একলাফে তাহা পার হইয়া যাইতে পারে। অবশেষে প্রস্তরের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিম্নে পাথরের খোলা বুকের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এবং যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সেখানে এমন একটি গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে যাহা পাতাল পথের অন্ধকারের মতই কালো। এইখানে কবি বায়রণ প্রায় মারা যাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীতে মুরে বলিয়াছেন—"ঢালু পথে তিনি (বায়রণ) কোন রকমে নিচের দিকে নামিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গুল্মজাতীয়

হীদারে তাঁহার খোঁড়া পা আটকাইয়া যায়, এবং তিনি সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে গড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে যথাসময়ে ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া দেন।" এইখানে আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়িতে আমরা ব্রিমারে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে হোটেলে আমাদের জায়গা হইল না, সব হোটেলেই স্থানাভাব আমাদের দুইজনকে হাইল্যাণ্ড কুটিরে আশ্রয় লইতে হইল। পরদিন সকালে আমি যখন কুটিরের বাইরে পাহাড়ের ধারে, একটি ছোট ছেলে সেখানে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে। বলিলাম, আমি ইণ্ডিয়া হইতে আসিয়াছি। সে বলিল, "আমার বাবাও ইণ্ডিয়ান।" "তোমার বাবার নাম কি?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল "স্মাইটন।" "তাঁহার নাম কি ডক্টর ডী. স্মাইটন? এবং তিনি কি বর্মায় আছেন?" এ কথায় সে দৌড়াইয়া বাড়ি চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমার অনুমান ঠিক। তাহা হইলে এই বালক আরথার সত্যই ভারতীয়। ইউরোপে থাকিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মাত্রকেই ভারতীয় মনে হইত। ছেলেটি আমার আশে পাশে খেলিয়া বেড়াইল, এবং চলিয়া আসিবার সময় তাহার নিকট হইতে স্নেহপূর্ণ বিদায় গ্রহণ করিলাম। ব্রিমারে স্থানীয় প্রধানগণ, আর্ল অভ ফাইফ এবং কর্ণেল ফার্কুহারসন প্রতি বৎসর তাঁহাদের প্রজাবর্গকে লইয়া একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এটি হয় সম্পূর্ণ হাইল্যাণ্ড ভঙ্গিতে। এক-একটি গোষ্ঠী তাহাদের মোড়লকে পুরোভাগে রাখিয়া মার্চ করিতে থাকে। পরিধানে হাইল্যাণ্ডারদের বিশেষ পোষাক, হাতে ক্লেমোর তরবারি অথবা লক্ এবার কুঠার,—দুইই তাহাদের নিজস্ব অস্ত্র, তৎসহ পতাকা ও ব্যাগ পাইপ। সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স অভ ওয়েলস এই হাইল্যাণ্ড গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু গেলিক ভাষা ও হাইল্যাণ্ড কিল্ট ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

ব্রিমারে আমার বন্ধুদের রাখিয়া আমি একা ব্যালাটার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের কোচ প্রায় দুই মাইল যাইবার পর এক সহযাত্রী আমাকে বিশেষ কয়েকটি স্থান চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রথমে সম্রাজ্ঞীর হাইল্যাণ্ড নিবাস ব্যালমোরাল দেখিলাম। তাহার পর ফার্কুহারসনের পারিবারিক বাসস্থান ইন[illegible] ভারকল্ড দেখিলাম। তাহার পর প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর অ্যাবারগেলডি এস্টেট দেখিলাম। তাহার পর বায়রণ কর্তৃক খ্যাতি প্রাপ্ত তুষারাবৃত লকনেগারের চূড়া দেখিলাম। আমার নূতন বন্ধু মিস্টার নিউল্যাণ্ড আমাকে ব্যালাটার ছাড়িবার আগে আশে পাশের পাহাড়গুলি না দেখাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি একটি সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য গ্রীষ্মকালে হাইল্যাণ্ডে যে-সব যাত্রী পায়ে চলা পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সব পথ জমির মালিকেরা যাহাতে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দখল করিয়া না লইতে পারে তাহা পর্যবেক্ষণ করা। এইসব পথ কোথায় কি পরিমাণ আছে তাহার হিসাব লইবার জন্য মিস্টার নিউল্যাণ্ড প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্বে এই জাতীয় যেসব পথ বন্ধ করা হইয়াছিল তাহা পুনরায় ছাড়িয়া দিতে জমিদারদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে। পল্লীর সবার ব্যবহার্য স্থান বা পথ যদি জমিদার দখল করিয়া লয় তাহা হইলে সে জমিদার যত ক্ষমতাশালী হউক না কেন সবাই মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া স্বত্ব নিষ্পত্তি করা হয়।] ক্রমশঃ

বাংলা দেশের যুদ্ধের তিন রূপ

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের যুদ্ধ তিনটি রূপে প্রতিভাত। প্রথম দুইটি অতি স্পষ্ট ও সমাপ্ত; তৃতীয়টি তিরস্কৃত ও অসমাপ্ত।

আমরা সবাই জানি পাকিস্থান ও বাংলা দেশের মধ্যে তখনই যুদ্ধ লাগিয়া গেল যখন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া ভোটে বিজয়ী মুজিবরের হাতে শাসনভার হস্তান্তরিত করিতে অনিচ্ছুক হইল। বাংলাদেশের বুকে বর্বর সেনাবাহিনী নিয়োগ ও গণহত্যা, ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া নারীনির্য্যাতনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ভিতরে যে মানসিকতার পরিচয় পরিব্যাপ্ত তাহা উপরিউক্ত মনোভাবেরই বহিঃস্ফুরণ। বাংলাদেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, সমধর্মিতা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিছুই ইহাহিয়ার চোখে পড়িল না। তার দৃষ্টিতে একটি মাত্র লক্ষ্যই ছিল এবং তাহা হইল, সে একমাত্র বলপ্রয়োগেই বাংলাদেশকে পদানত রাখিবে।

বাংলাদেশের সহায়হীন অবস্থাও ইয়াহিয়াকে এই সংকল্পে প্ররোচিত করিয়াছিল। বাংলাদেশ দুর্বল, অস্ত্রহীন। পার্শ্ববর্তী ভারতবর্ষ তার সাহায্যে আসিবার কথা নয়; কারণ পঞ্চাশের হিন্দু-বিতাড়নে ভারতবর্ষ কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; পাকিস্থানের উপদ্রব নীরবে মানিয়াই নিয়াছিল। কাশ্মীর সীমান্তের উপদ্রবেও ভারত নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে। আজাদ কাশ্মীর সম্বন্ধে মুখে দাবি করিলেও যুদ্ধের সাহায্য লইয়া আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক নয়। সর্বোপরি ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক মুসলমান থাকাতে তাদের বিরাগভাজন হইয়া বাংলা-দেশের সাহায্যে আগাইয়া আসিবার কথা নয়।

ভারতবর্ষকে আরও বিব্রত ও বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পাকিস্থান বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রথম কিস্তিতেই এক কোটি লোককে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই জনস্রোতকে পাকিস্থান বাধা দেয় নাই। বরং বর্ডার অরক্ষিত রাখিয়া রেফুজিদের ভারতে প্রবেশের পথ সুগম করিয়াই রাখিয়া-ছিল। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দিকে দিকে প্রেরিত হইল, বিশ্বের দরবারে তারা বৃথাই ধর্ণা দিল, কোন রাষ্ট্রই ভারতের পক্ষে দাঁড়াইল না। এদিকে আর্থনীতিক চাপে ভারত উদ্‌ভ্রান্ত, কি-করি কি-করি ভাব চোখে মুখে। হয়ত বিব্রতা শ্রীমতী গান্ধী দেয়ালে টাঙানো রাষ্ট্রপিতা গান্ধি ও রাষ্ট্রপতি পিতার দিকে তাকাইয়া মুহুর্মুহ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভাবিতেন, লোক-বিনিময় না করিয়া কি বিপদেই না আমাকে ফেলিয়া গিয়াছ। ভারতবর্ষ যখন নানা চিন্তায় বিব্রত ও বিষন্ন তখন পাকিস্থানী বর্বর সৈন্যদল মহা উল্লাসে বাংলাদেশে গণহত্যা, নারীনির্য্যাতন ঘরবাড়ী গ্রাম পোড়াইয়া এক বীভৎস উন্মাদনায় উন্মত্ত। বাংলাদেশে তৎকালীন অবস্থা অবর্ণনীয়। দেশের নেতা শত্রুহস্তে বন্দী, যুবক সম্প্রদায় বিভ্রান্ত, বিমূঢ়; রক্ষীবাহিনী প্রায় নির্মূল। এমন যখন দেশের অবস্থা তখন পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবারই কথা; কিন্তু এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল। যুবক সম্প্রদায় মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, তবু তারা রুখিয়া দাঁড়াইল পাকিস্থানী বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে। হাতের কাছে যাহা পাইল,—দা

কুড়াল খন্তা, তাহা লইয়াই শত্রুর সম্মুখীন হইল। তাদের যে এক মহান্ অস্ত্র সম্বল ছিল তাহা হইল দুর্বার মনোবল ও দুর্দম দেশপ্রেম। তার সাহায্যেই তারা বিতাড়িত করিতে লাগিল শত্রুসৈন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, থানা থেকে অন্য থানায়। ফলে সহরের দুরবর্তী অঞ্চল গ্রাম ও থানা তাদের হাতে আসিতে লাগিল। সংবাদ-পত্রে সেই সব খবর প্রকাশিত হইতে লাগিল; কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না।

এর পর মুক্তিবাহিনীর উদ্ভব। এ এক অলৌকিক ব্যাপার। শূন্য থেকে অঙ্কে পৌঁছানোর ইতিবৃত্ত। অশিক্ষিত লোক যে অবস্থার চাপে সুশিক্ষিত দক্ষ সৈনিক হিসাবে রূপান্তরিত হইতে সক্ষম, সেই অসম্ভাব্য অভিনব ইতিহাস। ভগবান যেন অত্যাচার ও বর্বরতা থেকে রক্ষা করিবার জন্যই মানুষের মস্তিষ্কে বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই মূলধনকে সুদে আসলে খাটাইয়া অত্যাচারিত মানুষ অত্যাচারী মানুষের সম্মুখীন হইবার কৌশল আয়ত্ত করে। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই ইহার ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। খাদ্যের উৎপাদন' আবরণের উদ্ভাবন ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রের আবিষ্কারে মানুষের মস্তিষ্ক সর্বক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। সেই একই ক্রিয়া মুক্তিবাহিনী সংগঠনে পরিব্যক্ত।

'টাইগার' সিদ্দিকির মত বহু দক্ষ সৈনিকের উদ্ভবেই এই সত্য প্রতিভাত ও স্বীকৃত। ইহার পর মুক্তিবাহিনী ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে, নিহত ও আহত শত্রুর কবল হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, থানা লুঠ করিয়া এবং অন্য উপায়ে। বাংলাদেশের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পরম অবদান হইল পাকিস্তানী সৈন্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে আবির্ভাবে। তাদের দুর্জয় সাহসিকতা ও রণ-কৌশল হতচেতন জাতির প্রাণে ক্ষীণ হইলেও আশার আলোক সঞ্চারিত করিল। এইখানেই বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত।

এই সময় গভীর চিন্তিত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান পঞ্চাশ কোটি ভারতবর্ষের মানুষ। মুসলমানদের আমি ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিলাম। বাংলাদেশের যুদ্ধে এদেশীয় মুসলমানদের কোন ভূমিকাই নাই। তারা খেলার মাঠে দর্শকদের মত তামাশাই দেখিয়াছে। তাদের কোন সাহায্যকারী সংঘ গড়িয়া উঠে নাই, সাহায্য ভাণ্ডারও তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে প্রেরিত হয় নাই, এমনকি একটা মিটিং করিয়াও কেহ পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাই। আল-আকসা মসজিদ ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখিয়াছি; কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে তারা ছিল প্রথমাবধি নীরব ও নিশ্চুপ। পৃথিবীর মুসলমান রাষ্ট্রগুলিও ছিল সমান নীরব ও নিশ্চুপ। মুসলমান শাস্ত্র আমার অপঠিত কিন্তু তাহাতে কি নির্য্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখাইবার কোন নির্দ্দেশই নাই? পাকিস্থানী কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া শেখ মুজিবর বিশ্বের যে-সব রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন তার মধ্যে মুসলমানদের নামগন্ধও নাই। বস্তুত বাংলাদেশের যুদ্ধে অবাঙালী মুসলমানের আচরণ দুষ্ট, দুষ্ট ও দুর্নীত।

সবাই যখন নীরব ও নিষ্ক্রিয় তখন কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু আত্মা স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। জনগণের একমাত্র বুলি ধ্বনিত হইল—আর দ্বিধা করিও না, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও, তাদের যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায় নামিয়া পড়। এমন যে কমিউন্যাল বলিয়া ধিকৃত 'জনসংঘ' সেও বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ব্যাপারে সোচ্চার হইল।

বাংলাদেশের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পক্ষে দুইটি কারণও ছিল অতি প্রবল—মানবিকতার প্রশ্ন ও শরণার্থীর প্রশ্ন। সাংবাদিক 'নায়ার' Statesman-এ অঙ্ক করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, যুদ্ধে লিপ্ত হইবার স্ব-পক্ষে ক্ষুরধার যুক্তি।

কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পক্ষে প্রবল যুক্তি থাকিলেও যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায় না। কারণ ভারত non-alignment নীতি গ্রহণের ফলে বিশ্বে বন্ধুহীন, বান্ধবহীন। পাকিস্থানকে শায়েস্তা করিবার পক্ষে ভারত একক হিসাবেও সক্ষম ছিল। কিন্তু পাকিস্থান তো নিঃসঙ্গ নয়, তার পক্ষে আছে আমেরিকা ও চীন। তাই

ভারতকে ছুটিতে হইল মস্কো। এবং একদিন হঠাৎ আকস্মিক ভাবে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে সমগ্র বিশ্ব বিস্মিত ও হতচকিত। ইংলণ্ড ক্ষুব্ধ হইল সত্য কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল আমেরিকার।

বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রথম হইতেই ভারতে প্রতিটি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার ব্যাপারে নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন বিদূরিত হইল।

নিকসন ভারত-সোভিয়েট চুক্তির জন্য মনে মনে ক্ষিপ্ত হইলেও মুখে তার কোন কথা বাহির হইল না, সে নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। পাকিস্থানের যুদ্ধ ঘোষণার ছয় দিন পূর্বেও করাচীতে বিপুল রণসম্ভার আমেরিকা পাঠাইল। ইহার পরেই নিশ্চিন্ত উৎফুল্ল ইয়াহিয়ার মুখে হুঙ্কার ধ্বনিত হইল—In case of war Pakistan will not fight alone। অর্থাৎ two (America and China) are more than one (Russia)—এই কথাটাই মুরুব্বিরা প্রচারের সাহায্যে ভারতের কানে পৌঁছাইয়া দিল। এবং উন্মাদের উন্মত্ততায় ভারতের কতকগুলি বিমান ক্ষেত্রে ৩রা ডিসেম্বরে বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল।

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পরদিনই ভারত সসৈন্যে বাংলাদেশ আক্রমণ করিল এবং অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে (মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে) বাংলাদেশের পাকিস্থানী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করিল। এইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমাপ্ত হইল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হইবার পথে জয়যাত্রা করিল। বাংলাদেশের যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ এইভাবে পরিসমাপ্ত হইল।

পরিশেষে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধাত্মক বিরোধিতার কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রথম হইতেই আমেরিকা ভারত-বিরোধী মনোভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিল। মনে হয় আমেরিকার প্ররোচনাতেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হইয়াছে। ইয়াহিয়া কাঠের পুতুলের মত নিকসনের নির্দেশ পালন করিয়াছে মাত্র। ইয়াহিয়ার নিশ্চিন্ততা ও কর্মতৎপরতার অভাবই আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য করিয়াছে। যে সৈন্যদল বাংলাদেশে প্রেরিত হইয়াছিল তারা নারীধর্ষণে যতটা তৎপর ও দক্ষ, যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া সংগ্রাম করিতে ততটা উৎসুক ছিল না। বিমান বাহিনীর শক্তিও নগণ্য ছিল। তাই যদি বলি, এই যুদ্ধে ইয়াহিয়ার বিশেষ সম্মতি ছিল না তবে কথাটা অবিশ্বাস্য হইবে কি? এবং যুদ্ধটা নিকসনের অনুরোধেই চালিত হইয়াছিল এইরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক হইবে না। হয় নিকসন বলিয়াছিল, এই যুদ্ধ জিতিলেও জিৎ, হারিলেও জিৎ, কারণ তোমার বিপদে আমি cease fire প্রস্তাব আনিয়া তোমাকে রক্ষা করিব।

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপোষণচ্ছলে কতকগুলি আচরণের উল্লেখ করিতে চাই। বাংলাদেশের বুকে পাকিস্থানী বর্বরতার বিরুদ্ধে আমেরিকা একটি কথাও বলে নাই। এক কোটি শরণার্থী সম্বন্ধেও সমান নীরবতা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে। এগুলি হইল আমেরিকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। আমেরিকা সক্রিয় হইতেও পারে। আমেরিকা সক্রিয় হইল তখনই যখন ঢাকার যায়-যায় অবস্থা। তখন সাত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারতকে আক্রমণকারী আখ্যায় অভিহিত করিয়া ইউ এন ও-তে cease fire প্রস্তাব আনিল, অর্থাৎ চেষ্টা হইল ঢাকার পতন হইবার পূর্বে একটা জোড়াতালি দিয়া যুদ্ধটাকে থামাইয়া দেওয়া। কিন্তু নিকসনের অপচেষ্টা ব্যর্থ হইল রাশিয়ার ভিটোর ফলে। আমেরিকার দুরভিসন্ধি যে রাশিয়ার পূর্ণ অধিগম্য তাহা তার উক্তিতে প্রমাণিত—The time for cease fire is not yet come.

নিকসন পাকিস্থানী বিপর্য্যয়ের কারণ যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। শক্তিমান্ আমেরিকা ও চীন যে পাকিস্থানের পক্ষে এবং সীমাতীত রণসম্ভার যে পাকিস্থানে মজুত, সেই পাকিস্থানের বিপর্য্যয় সত্যই কল্পনাতীত। এক লক্ষ সৈন্য মজুত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্থানের আত্মসমর্পণ ব্যাপার সত্যই অবিশ্বাস্য। তেমনি সমান অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত যশোর ক্যান্টনমেন্টের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। সেখানে অন্তত পক্ষে ২৫ হাজার সৈন্য থাকিবার কথা—কিন্তু দেখা গেল সব ভোঁ ভাঁ—একজন সৈন্যও সেখানে পাওয়া যায় নাই। সৈন্যগুলি গেল কোথায়? তবে সবই কি কচুকাটা হইয়াছে? এবং তাদের সবংশে নিধন ব্যাপারই কি ঢাকায় আত্মসমর্পণের সংকল্পে তিরস্কৃত? এই প্রশ্নের সদুত্তর হয়ত কোনদিনই মিলিবে না। পাকিস্থান অভিমানের খাতিরে কোনদিনই এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবে না। আর ভারত কোন বিষয়েই কথা বলে নাই, এই বিষয়ে সে নীরবই থাকিবে।

নবাব মির্জাফরের শাসনের শেষ অধ্যায়ের পরিচয় দিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—বৃদ্ধ আফিং খায় ও ঝিমায়; আর ইংরাজ ডেসপ্যাচ লেখে। বাংলা দেশের শেষ অধ্যায়ে ইয়াহিয়া আফিং খাইত বলিয়া মনে হয় না; তবে চিরদিনের জন্যে নীরব ও নিশ্চুপ হইয়া গেল। হয়ত 'এলাই' আমেরিকা ও চীনের নিষ্ক্রিয়তা ইয়াহিয়াকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রদূত কিটিং-এর সব ডেস্প্যাচই ব্যর্থ হইয়া গেল, তার একটি সতর্কবাণীও প্রেসিডেন্ট নিকসন কানে তোলে নাই। কিটিং-এর সতর্ক বাণী কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে—Pakistan is probably finished.

ভারত-আমেরিকার দ্বন্দ্বের অধ্যায়টি এখনও অসমাপ্ত। এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিতে আরও কিছু সময় লাগিবে মনে হয়।

মাছ কুটলে মুড়ো দোব

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

গণ্ডগ্রাম। চাষী মজুরের আয় সামান্য, সাক্ষর উচ্চবর্ণ পুরুষ, প্রায় নিরক্ষর দুঃখী দীন নরনারী। পাঠশালা আছে, স্কুল নেই। কিন্তু রেডিও আছে। মহাপ্রচার যন্ত্র। যাতে সকালে চাষীভাইদের ডেকে বিলিতী ওষুধের সারের বিদেশী নামে সার ও পরিমাণ বলা হয়। তারা নাম মুখস্থ করে। দাম মুখস্থ করে। 'একরের' অনুবাদ করে মনে মনে বিঘায় কাঠায়।

প্রায় দুপুর। বড় মেজ ছোট চাষী মজুরের দল মাঠে মাঠে আগেভাগে পাটের ধানের বীজ বপন রোপনের ব্যবস্থা করেছে। এবারে অবসর।

কবে কোন্ এক .র্ব পুণ্যশীলা নারী রায়গৃহিণী একটা অশ্বত্থ গাছ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অনেক দূর অবধি তার ছায়াময় ঝুরি নেমেছে।

তারা সেখানে এসে বসল। তার কাছাকাছি রয়েছে এক প্রকাণ্ড দীঘি। সেটাও ঐ পুণ্যশীলার নির্দেশে দিদিশাশুড়ী প্রতিষ্ঠা করেন স্বামীর নামে। রায় পুকুর বা রায়দীঘি নাম। গ্রামের জলাভাব ঘোচানোর জন্য।

তা' জল আছে। মাছও আছে। তারা সেখানে হাতে পায়ে মুখে জল দিল, মুখ মুছে গামছা দিয়ে বাতাস খেতে লাগল। চকচকে দেহ একদঙ্গল চেলা চুনো

সরলপুঁটি ঘাটের ধারে খেলা করছে দেখতে পেল। তাদের ভাতের পাতের মাছের কথাও ভাবল একবার বোধহয়।

এবারে মায়েরা স্ত্রীকন্যারা কাঁসি করে গামছা ঢাকা ভাত নিয়ে আসবে। মাছ? ডাল? তরকারী? সে আমরা জানি না কি কি।

মোড়ল-স্থানীয় এক বৃদ্ধ বসে। আশে পাশে ছোট বড় চাষীর দল। হঠাৎ এক চাষা জিজ্ঞাসা করলে, ভাই, এবারে ভোটে কারা জিতল?

২য়। গাইবাছুর?

৩য়। কাস্তে হাতুড়ী?

প্রথম জন। গাইবাছুর জিতেছে এবার।

সন্ধ্যেবেলা। মোড়লের বাড়ী রেডিও খুলেছে। অনেকেই জড় হয়েছে। পৈতৃক চটাওঠা এনামেলের গ্লাসে ভাঙা কাপে চা নিয়ে, কোঁচড়ে কাছের ভুমুঠো মুড়িও আছে,—খবর শোনার দল সব।

মন্ত্রীর ভাষণ। মোড়লের ব্যাখ্যা।

"এই ১৯৮০ সালে চালের আর অভাব থাকবে না দেশে। সরু মোটা সিদ্ধ চাল পাওয়া যাবে। কাঁকর ধান ক্ষুদ থাকবে না তাতে। ১৯২৫ সালে দেশের শতকরা ৫০ জন লেখাপড়া শিখবে। আর চাকরী পাবে সবাই। বেকার আর থাকবে না। ততদিনে আমরা চাঁদে উঠতে পারব। পরমাণু বোমা তৈরী করতে পারব।..."

জনতা খুসী। মোড়লের ব্যাখ্যাও চলে। শুধু মোড়ল জানে, ততদিনে এঁরা—এই মন্ত্রিত্ব আর থাকবে না। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতিও 'অচল টাকা' হয়ে যাবে।

তবু প্রশ্ন করে একজন,—তা' সে ক' কুড়ি বছর হবে দাদা—মাছ ধান চাল সস্তা হতে? চালের খড় সস্তা হবে? গরুর খড়?

—তা হবে দেড় কুড়ি। এক কুড়ি। ?ওার কথার জবাব এলো না।

রেডিওতে লোক সঙ্গীত সুরু। "পান খাইয়া যাও রে বন্ধু। পান খাইয়া যাও।" সকলেই সহাস্ত বদন। বন্ধুর আহ্বানে।

ওপাশে আঙিনায় মোড়লকন্যা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

'চাঁদের কপালে চাঁদ'কে—লোভ দেখিয়ে ডেকে।

'এই মাছ কুটলে মুড়ো দোব—'

(আর)—ধান ভানলে কুঁড়ো দোব।

'কুঁড়ো'? মোড়ল ভাবে।

(বলদ)—গরুর দুধ দোব। কন্যার মুখে কৌতুকের হাসি। এবারে মোড়ল ভাবে, 'বলদ' গাইয়ের দুধ?

ঘুম পাড়ানো ছড়া? শেষ হল? সবাই শুনছে।

'মুড়ো'? তার সঙ্গে মিশিয়ে 'কুঁড়ো'? আর 'বলদ' গাইয়ের দুধ?

এবারে মোড়ল হাসে, ও। সবটাই ইয়ারকি?

পুণা আশ্রমে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(উপসংহার)

অঘটনের কথা যখন তুলেইছি তখন আর একটু বললামই বা। অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস করবেন—অবধারিত। তবে ক্ষতিপূরণ মিলবে বিশ্বাসীদের বরণ-মালায়—যাঁরা বিশ্বাস করেন বাইবেলের নিশ্চয়োক্তি—"We walk by faith, not by sight." ইন্দিরার যে কতরকম দর্শন হ'ত—আমরা যতই দেখতাম ততই বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থাকতাম। (আমার এক কম্যুনিষ্ট বন্ধু ৺নীরেন রায় অবিশ্বাসী হ'য়েও এসব বিশ্বাস করত ও সব শুনে ওকে হেসে ডাকত ভীষণা দেবী ব'লে।) ধ্যানে দেখত সে কতরকম যোগী সাধক মহাপুরুষ। দক্ষিণেশ্বরে দেখেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে। একবার দেখেছিল রামন মহর্ষিকে—একা আছেন এক পাহাড়ে—পনেরো বোলো বৎসরের ছেলে। একদা—৮. ৭. ১৯৫৮—দেখেছিল ঠাকুর নাচছেন ঘুরে ফিরে। ও তাঁর পা ছুঁতেই ওর দেহে সুগন্ধ জেগে উঠল। এ-অঘটন বহুবারই ঘটেছে ও বহুলোক ওর হাতে পায়ে চন্দনগন্ধ পেয়েছে। এ সুগন্ধ শুর চুনিলাল ও আমাদের প্রতিবেশী খান্না পরিবারের সবাই (স্বামী স্ত্রী ও দুই মেয়ে) পেয়েছিল। কলকাতায় আমাদের বন্ধু মিলন সেনের ১/এ, এলগিন রোডের বাড়িতেও একাধিকবার এ অঘটন ঘটেছে—সময়ে সময়ে এ-দর্শন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা ভাবমুখে নৃত্য করত। দু-একবার শুর চুনিলালের হাত ধ'রে তাঁকেও নাচিয়ে তবে ছেড়েছিল। তিনি মুগ্ধ হ'তেন ওর ভাবাবস্থায় নৃত্যে। ওর এই ভাবমুখে নৃত্যের কয়েকটি ফটো আমাদের অ্যালবামে আছে। ওর সে নাচের সৌন্দর্য্য ভুলবার নয়—বহু ধর্মার্থী সে আনন্দের শরিক হ'ত। আমেরিকায় ওর এ-ভাবমুখে নৃত্য দেখেছিল আমাদের দুটি প্রিয় বন্ধু—ডেভিড হার্ণ্টার ও মড ওকস (Oaks) যাদের "কথা দেশে দেশে চলি উড়ে"-তে লিখেছি। তাদের একদা লিখেছিলাম অভিনন্দনে:

> Whose hearts, with ours in unison,
> Acclaim what few regard as true :
> That the deep is born in the droplet wan
> And clouds storm but to flaunt the blue.

ওর হাঁপানি ক্রমশ ওর নৃত্যকে নিরস্ত করলেও যারা ওর ভাবমুখে নৃত্য দেখেছে তারা ভুলতে পারবে না, আরো এইজন্যে যে, ও স্বভাবে উচ্ছ্বাসিনী ছিল না ব'লে নাচতে চাইত না যার তার সামনে। কিন্তু ঠাকুর যাকে নাচান তার না নেচে উপায় কী?

ওর আর একরকম দর্শন হ'ত যাকে বলে দূরদর্শন—clairvoyance। শুধু যে যোগবিভূতির প্রসাদেই এ-দর্শন হয় তা নয়, অনেকের মধ্যে এ-শক্তি যোগ না ক'রেও জেগে ওঠে। ওর যখন তখন এ-দূরদর্শন হ'ত—পরে খোঁজ নিতাম, মিলে যেত। বলেছি আমার NO REASON CAN EXPLAIN পাণ্ডুলিপিতে আমি প্রথম প্রথম ওর দূরদর্শন-দূরশ্রবণ-বর্গীয় নানা অঘটন খুঁটিয়ে লিখে রাখতাম পণ্ডিচেরিতেই। তারপরে এরকম অঘটন এত ঘন ঘন ঘটতে লাগল যে রেকর্ড রাখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

১) আমাদের প্রিয় বন্ধু শেঠ রণজিৎ সিং-এর কথা লিখেছি। পণ্ডিচেরীতে ১৬. ১০. ৫১ তারিখে ইন্দিরা দেখল—তিনি পায়ে পটি বেঁধে শয্যাশায়ী। তাঁকে

টেলিগ্রাম করব করব ভেবেও গড়িমসি করার ফলে দেরী হ'য়ে গেল। ৬. ১০. ৫১ তারিখে তাঁর চিঠি পেলাম: তিনি তিন সপ্তাহ শয্যা নিয়েছিলেন পায়ের একটি হাড় ভেঙে যাওয়ার দরুণ।

২) সুরেন্দর লালের কথা একটু আগে লিখেছি। ১৮. ৯. ৫১ তারিখে ইন্দিরা তার ডায়রিতে লিখল: ধ্যানে লালের দেখা। সে গোর্কির সঙ্গে আলোচনা করছে—আমাকে অনুরোধ করবে কি না ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তার নামে একটি পরিচয় পত্র দিতে। ২৩-এ সেপ্টেম্বর আমি লালের কাছ থেকে এক দীর্ঘ পত্র পেলাম। তার শেষে ছিল: "ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই কমিটির সদস্য। আপনি যদি আমাকে তাঁর কাছে একটি পরিচয় পত্র দেন তবে আমি বাধিত হব..." ইত্যাদি।

৩) ইন্দিরা কোনো খাম ছুঁয়ে ব'লে দিতে পারত চিঠিতে কী লেখা আছে। ২৪. ১২. ৫১ তারিখে আমি একটি চিঠি পাই, পোষ্টমার্ক—বীডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইন্দিরা চিঠিটি আশ্রম থেকে এনেছিল। বলল: "খামটি হাতে নিতেই দেখলাম তোমার এক ডাক্তার বন্ধু লিখছেন নলিনীদার (নলিনীকান্ত সরকার) ডান চোখে হানি পড়েছে কিন্তু এখনো পাকে নি—তাই ছমাস অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়..."ইত্যাদি। খামটির মধ্যে চিঠিটিতে ঠিক এইসব কথাই লেখা ছিল।

৪) ১. ৮. ৫১ তারিখে আমি এক মোটা খাম পেলাম। ইন্দিরা সকালে আশ্রমে গিয়ে আমার চিঠিপত্র নিয়ে আসত। আমার হাতে সুপুষ্ট খামটি দিয়ে বলল: "এটি লালের কাছ থেকে এসেছে—ঠিকানা তার হাতের লেখা। কিন্তু খোলো, খুলো না।" ব'লে তার ডায়রি এনে দেখালো: "ধ্যানে দেখলাম লাল দাদাকে চিঠি লিখছে এমন সময় বিজি (লালের মা) তার হাতে একটি ছোট্ট ফুলের মালা দিয়ে বলল মালাটি দাদাকে পাঠাতে।"

খামটি খুলে আমি তো অবাক! মস্ত খাম, ভিতরে একটি সুন্দর বকুল ফুলের মালা—মালা না ব'লে হাতের বালা বলাই ভালো। লাল লিখছে: "মালাটি মা গেঁথেছেন দাদার জন্যে।" এ-ছোট্ট মালাটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

৫) ১৯৫০ সালে নলিনীদা (নলিনীকান্ত সরকার) বম্বেতে শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অতিথি হয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে ডিসেম্বরে আমাদের বম্বে যাওয়া স্থির—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্যে গান গেয়ে কিছু টাকা তুলব—ইন্দিরার নাচও প্রোগ্রামে দিল। নলিনীদা যাবেন তবলা সঙ্গত করতে। তাই সে নভেম্বরের মাঝ বরাবর নির্মলবাবুকে লেখে প্রোগ্রাম জানিয়ে। উত্তর আসে সেই বাড়ীর আর এক বাসিন্দা শ্রীসুবোধ সরকারের কাছ থেকে। তিনি লিখেছিলেন, নির্মলবাবু অসুস্থ, তাই নলিনীদা তাঁর (সুবোধবাবুর) আতিথ্য স্বীকার করেন যেন। যেদিন এ চিঠিটি এল ইন্দিরা ধ্যানে দেখল—নির্মলবাবু কয়েকদিন আগে ট্রেনে ষ্টোভ ধরাতে গিয়ে অসাবধানে পা পুড়িয়ে ফেলেছেন। নলিনীদা সুবোধবাবুকে ফের চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি লিখলেন যে, ইন্দিরা দেবীর ধ্যান দর্শন সত্য—ট্রেনে ষ্টোভ ধরাতে গিয়ে নির্মলবাবুর কাপড়ে আগুন লেগে যায়—ফলে দুটি পা-ই জখম হয়েছে।

৬) পুণায় একদিন ইন্দিরা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে আমাকে বলল: "দেখলাম বম্বেতে স্যর চুনিলাল শয্যাশায়ী—কবজিতে পটি, খোঁজ নাও তার ক'রে।" কিন্তু তার করার আগেই স্যর চুনিলালের চিঠি এল: তিনি রিজ রোডে পদব্রজে যাচ্ছিলেন Hanging Garden-এ বেড়াতে—এমন সময়ে এক মোটরের আঘাতে প'ড়ে গিয়ে কবজির হাড় ভেঙে গেছে।

ইন্দিরার আর একটি দর্শন হ'ত যাকে বলা যেতে পারে অতীত-চারণ। কাউকে কাউকে কখনো কখনো দেখবামাত্র ওর চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠত কবে কোথায় সে কীভাবে ছিল। আমার ক্ষেত্রেও দেখতে পেত—"অমুক দিনে অমুক মোটরে অমুক জায়গায় যাচ্ছিলে তুমি।"

একবার দেখেছিল—এক বন্ধুর আত্মহত্যার পর—

তাঁর কোনো নিকটাত্মীয়া তাঁকে কী বলাতে তাঁর মন ভেঙে যায়। খবর নিয়ে পরে জেনেছিলাম দর্শন হবহু সত্য।

বিদেহী নানা আত্মার দর্শনও পেত ইন্দিরা নানা সময়ে। কিন্তু সে সব কাহিনী আমি নাম বদলে আমার নানা রমন্যাসে লিখেছি। তাই কেবল তিনটি দৃষ্টান্ত দেব।

১) নরসিংহ দাস সানির কথা বলেছি। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাই নি। একদিন তাঁর বিদেহী রূপ ওর স্বপ্নে মূর্তি ধ'রে ওর কাছে এল লোকান্তর থেকে। খবর নিয়ে জানলাম—তার দেহান্ত হয়েছিল কয়েক মাস আগে।

২) আমাদের এক প্রিয় বন্ধু যশোদা নারায়ণ ঘোষ একদা ধনী ছিলেন। অতি সজ্জন, সুকুমার ও বদান্য।* মাদ্রাজে তাঁর রম্যানলয়ে আমি ইন্দিরাকে নিয়ে উঠেছিলাম ১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সে জব্বলপুর থেকে এসে প্রথম পাণ্ডিচেরী যায়। যশোদার ওখানে পরে কৃষ্ণপ্রেমও ছিল। সবাই তাকে ভালোবাসত তার মধুর স্বভাব ও ঔদার্যের জন্যে। একদা সে ধনী ছিল কিন্তু সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করত ব'লে বার বার ঘা খেত। শুধু ঘা খাওয়া নয়—ঠকতও বার বার, যার ফলে সে ক্রমশ প্রায় দেউলে হবার কোঠায় পৌঁছেছিল। এই সময়ে সে একটি ব্যবসা করতে যা কিছু মূলধন অবশিষ্ট ছিল খাটায়। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে দুশ্চিন্তায় তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আমাকে লেখে সব জানিয়ে। আমি তাকে পর পর তিনবার কিছু সাহায্য করি। ফলে ব্যবসার সঙ্কট কাটে কতকটা। কিন্তু বিপদ যখন আসে একা আসে না—এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ওকে দুমাস শয্যা নিতে হয়। আমি কলকাতায় লিখি আমার এক ডাক্তার মামাতো ভাইকে। সে পরীক্ষা ক'রে পায়—তলপেটে কর্কটরোগ—ক্যানসার। আমার অনুরোধে সে যশোদাকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে অপারেশনের জন্যে পাঠায়। ৯ই জুলাই ১৯৬৬ সালে তার অপারেশন হওয়ার পরে যশোদা আমাকে তার করে: "Operation successful but extremely weak." (শল্য চিকিৎসা সফল, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল) তারপরে ব্যস্—আর কোনো খবর নেই। চিঠি লিখি ওর স্ত্রীকে—জবাব নেই। ভাবছি কী করা যায় এমন সময় একদিন—১১এ জুলাই—ইন্দিরা হঠাৎ আমার কাছে এসে বলল স্নানাগারে ঢুকতেই সামনের দেওয়ালের কাছে যশোদা নমস্কার করল—সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার পিছনের দেয়ালে একটি ক্যালেণ্ডারে শুধু ১১ তারিখ জ্বলে উঠল। তারপরেই যশোদার ভৌতিক মূর্তির অন্তর্ধান। আমি তৎক্ষণাৎ, ১১এ জুলাই, আমাদের প্রিয় শিষ্য শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার করলাম যশোদার খবর নিতে। পরদিন শঙ্করের তার এলো—যশোদা ১১ই জুলাই মারা গেছে।

এ-শোকাবহ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি পরের বৎসর ওর বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরের জন্য লেখা একটি কবিতা (তর্পণ) উদ্ধৃত করে;

ছিল ধন, শুধু ছিল না তোমার ধনে আসক্তি ভবে।
জনে জনে দিতে দান—না জানিয়া ফল হবে কি না হবে?

অকৃপণ মন বন্ধু, তোমার চাহিত না বিকিকিনি,
যেথা যেতে তরই সুহৃদেরে ভাই, নিতে সহজেই চিনি।
নীতিবাদী তুমি ছিলে না তো, তাই অকুণ্ঠে দিতে মান
সমাজে যাদের নাই ঠাঁই—ছিল সরল তোমার প্রাণ।
তাই তুমি যাঁয় শ্রীঅরবিন্দে হৃদয়ের গুরু মানি'
দীক্ষা তাঁহার পেয়েছিলে—তাঁরে পারাপারে পারী জানি'।

গুরুভাই-বোনে কী আনন্দেই করিতে বরণ স্নেহে।
যারাই আসিত—দিতে আতিথ্য উদার তোমার গেহে।
যোগী জ্ঞানী মুনি শিল্পী গুণীরে দিতে মালা আলো হেসে:
সবারেই ভালোবাসতে—তাদের কাছে ডেকে ভালোবেসে।

---

*১১. ৭. ৬৭ তারিখে তাঁর শ্রাদ্ধ বৎসরের জন্যে আমি একটি তর্পণ লিখেছিলাম কবিতায়, আমার "মধু মুরলী"—১১২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

নিষ্ঠা বাঁধিয়া সঙ্কীর্ণতা করেছিলে বর্জন।
গুরুবন্দনা তোমার তাই তো হয় নাই বন্ধন।
যাহারা তোমার বাহিরের ত্রুটি দেখেছে কেবল চাহি'—
জানে না—ঠাকুর নন বিচারক, তিনি যে ভাবগ্রাহী।
স্নিগ্ধ কান্তি তবে ফলে আজো কত মনোদর্পণে।
স্মৃতি তর্পণে গাই আজ তাই জননীর আবাহনে:

(স্তবগান—লঘুগুরু ছাদ, স্রগ্ধরা)

এসো প্রেমপ্রসাদে, উছলি'—হররমা। অন্তরে
দীপ্তবাণী।
আলো আলো বিষাদে, বিদলি' ঘন অমা, প্রাণদা
শান্তিরাণী।
এসো তারা! কটাক্ষে ঝলকি' চিরনিশা ক্রন্দিতা
সান্দ্রছায়ায়।
সিংহাসীনা! সুহাস্যে উজল কর' নিশা, নন্দিতা!
বন্দি মা পায়।

৩) ইস্রানির বয়স তখন বোধহয় ৫৫।৫৬—যখন সে আমাদের কাছে প্রথম আসে। সে ইন্দিরার "শ্রুতাঞ্জলি"-র মীরাভজন প'ড়ে লিখেছিল যে, সে অবাল্য মীরার ভক্ত, মীরা তাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন ইন্দিরার কাছে আসতে। প্রত্যাদেশের কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম, বলাই বাহুল্য। সে প্রথমে ৪০।৫০ কপি "শ্রুতাঞ্জলি" কিনে উপহার দেয় বন্ধু-বান্ধবকে। পরে ৪০।৫০ কপি প্রেমাঞ্জলি ও সুধাঞ্জলিও কিনে বিলি করে ঐ একই উদ্দেশ্যে—মীরার প্রচার।

এহেন দরদীকে আমরা সানন্দেই নিমন্ত্রণ করেছিলাম, বলাই বাহুল্য। সে একাধিকবার এসে আমাদের কাছে ছিল আমাদের মন্দির গ'ড়ে ওঠার পরে। এমন শিশুর ম'ত সরল মানুষ সংসারে বেশি দেখা যায় না। মীরার সে দর্শন পেয়েছিল হয়ত এই সরল বিশ্বাসের বলেই। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরাই ইন্দিরার alter ego—গূঢ় আত্মা। তাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত—বিশেষ ক'রে তার অদ্ভুত ইংরাজি উচ্চারণ শুনে। যথা, pauper তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল পাপর—সবাই হেসে তাকে ডাকত—পাঁপর। শুনে সে-ও হাসত সমানে।

এহেন ইস্রানি তার তোশক বালিশ রেখে "ফিরে আসছি" ব'লে চ'লে গেল দিল্লি। তারপর অনেকদিন তার কোনো খবর নেই। হঠাৎ একদিন ইন্দিরা ধ্যানে তার ছায়ামূর্তি দেখল। সে বলল সে লোকান্তরে। তার স্ত্রী-পুত্র থাকত কানপুরে। উদ্বিগ্ন হয়ে সেখানে লিখতে উত্তর এল—ইস্রানি হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেছে। তার হার্টের কোনো অসুখ ছিল কি না জানি না। জানি শুধু এইটুকু যে, সে ইন্দিরাকে মীরার মূর্ত প্রতিমা মনে করত।

নানা বইয়েই পড়েছিলাম ভবিষ্যৎ-দর্শনের (prophetic vision বা precognition) কথা; অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী হবে জানতে পারা। যথা, শ্রীমতী জীন ডিক্সনের বিখ্যাত বই A Gift of Prophecy : শ্রীমতীর নানা দর্শন হ'ত খ্যাতনামা মনীষীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।* এসব বই চমকপ্রদ হ'লেও কেমন যেন একটা খটকা মন থেকেই যায়। কিন্তু ইন্দিরার নানা ভাবিষ্যৎ-দর্শন এমন হুবহু মিলত (যার অনেক সাক্ষী আছে) যে, সংশয়ী হওয়া সম্ভব হয় নি আমাদের—যারা কাছ থেকে তাকে দেখেছি, জেনেছি। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

পুণায় আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমেলারাম খান্নার ছোটমেয়ে চিত্রা ওরফে মন্দিরার বিবাহের কথা হচ্ছিল এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বড়ছেলের সঙ্গে। যুবকটি ছিল বৈমানিক। ইন্দিরা হঠাৎ দেখল ধ্যানে যে সে আকাশে বিমান থেকে পড়ছে। খান্না পরিবার ইন্দিরাকে গভীর ভক্তি করত, তাই এ সম্বন্ধ ভেঙে গেল। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি রাগ করেছিলেন, বলাই বাহুল্য—কারণ এর পরে তাঁরা আর আমাদের ছায়াও মাড়াতেন না। ইন্দিরা দুঃখিত হ'ল বৈকি তাঁদের বিরাগের কথা ভেবে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ মিলল—মন্দিরার ফাঁড়া কেটে গেল ব'লে। বিবাহ দিলে তো সে বিধবা হ'ত।

কিছুদিন বাদে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বেলগাঁও থেকে ছুটে এলেন। বললেন চোখের জলে যে, তাঁর

---

* A GIFT OF PROPHECY......by Jeane Dixon...Bantan Books.

ছেলেটি মারা গেছে বিমান থেকে প'ড়ে, তাঁর স্ত্রী শোকে পাগলের মতন কান্নাকাটি করছেন—আমরা যদি যাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে তবে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন... ইত্যাদি। আমরা গেলাম বেলগাঁও।

অতঃপর কিছুদিন বাদে যুবকটির বিদেহী আত্মা ইন্দিরার ধ্যানে এসে বলল, "আমার বড় ভাবনা হয়েছে আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে।"

সে-ও বিমান চালায়। আমরা পাঞ্জাবী দম্পতিকে জানালাম একথা। কিন্তু তাঁরা কোন্ মুখে ছোট ছেলেকে চাকরি ছেড়ে আসতে বলেন? "After all a vision is only a vision"—এই ভাব আর কি।

কিছুদিন বাদে সে বিমান চালাতে গিয়ে বিমান শুদ্ধ প'ড়ে যায় সমুদ্রে। তিন-চারটি পাঁজর ভেঙে যায়, কিন্তু এক জেলে ডিঙি তাকে তুলে নিয়ে তীরে আনে।

অতঃপর চার-পাঁচমাস নার্সিং হোম-এ কাটিয়ে সেরে উঠে সে আমাদের প্রণাম করতে এসেছিল—কিন্তু কোন্ তারিখে মনে নাই।

আরো তিন-চারটি বিদেহী আত্মার আবির্ভাব হয়েছিল ইন্দিরার ধ্যানে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে—থামি এবার, "enough is enough" ব'লে।

বিদেহী আত্মা নানা লোককে দেখা দেয় এ-ঘটনা নিছক জনশ্রুতি নয়, বা য়ুরোপের সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির নানা সাক্ষীর এজাহারই এ-ঘটনার একমাত্র ভিৎ নয়—নানা মনীষীর জীবনী ও রচনায়ই এ-সত্যের স্বাক্ষর মেলে। মহামনীষী স্বামী অভেদানন্দ তাঁর প্রখ্যাত LIFE BEYOND DEATH-এর চতুর্দশ অধ্যায়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন নিউ ইয়র্কের একটি ভূত-চক্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলরাম বসুর অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়ের কথা। স্বামীজী লিখছেন: "My eyes were dazzled to look at his brilliant figure with flowing beard......He put his right hand on my head and silently blessed me." এ-রকম বিদেহী অভ্যুদয় কখনো কখনো স্বপ্নেও হয় কখনো বা খোলা চোখের সামনে ছবির মতন, যেমন ঘটেছিল ইন্দিরার ক্ষেত্রে। আমার নিজের মনে হয়—যশোদা ইন্দিরার কাছে এসেছিল শুধু ক্যালেণ্ডারের অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি পেশ করতেই নয়, এজন্যেও বটে যে সে জানাতে চেয়েছিল তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া আরো পাঁচ-ছয়টি ক্ষেত্রে ইন্দিরার কাছে এমনিই অপ্রত্যাশিত ভাবে নানা লোকান্তরিত আত্মা অভ্যুদিত হয়েছিল যার বাহ্য সমর্থন (verification) পরে মিলেছিল অভাবনীয় রূপে—হয়ত আমার সদাসংশয়ী মনের সংশয়কে নিরস্ত করতেই। তাই আরো কয়েকটি উদাহরণ দিলামই বা—যদিও জানি, এ-ধরণের অঘটন অনেকেই বিশ্বাস করতে না পেরে মাথা নাড়বেন—এমন কি যাঁরা আমাকে সত্যনিষ্ঠ ব'লে চিনেছেন তাঁদের মধ্যেও হয়ত কারুর মনে খটকা থেকে যাবেই শেষ পর্যন্ত—বলবেন তাঁরা: "এজাহারগুলি চমকপ্রদ বটে, কিন্তু খতিয়ে inconclusive"—অর্থাৎ হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। কিন্তু এ হ'ল তাঁদের (জজসাহেবের) তরফের কথা, আমার (সাক্ষীর বা পরিবেষকের) তরফের কথা হচ্ছে: "যে দেখেছে, জেনেছে, চেখেছে তার কাছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই চরম প্রমাণ, তাই সে সংশয়ীর অবিশ্বাস বা হাসিঠাট্টাকেও গায়ে না মেখে পাল্টা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, এবং দিয়েও থাকে এই ব'লে যে, সত্য নির্ণয়ের দাঁড়িপাল্লায় দেখার এজাহারের ওজন না-দেখার ওজনের চেয়ে বেশি ভারি।' যে-দৃষ্টান্তগুলি দিতে যাচ্ছি তারাই এ-উক্তির শ্রেষ্ঠ ভাষ্য, তাই ওকালতি ছেড়ে জবানবন্দির সুভদ্র কাঠগড়ায় নামি।

অনেকদিন আগেকার একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত দিই—দৃষ্টান্তটি আমার তরুণ মনে দাগ কেটেছিল ব'লে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যেদিন দার্জ্জিলিং-এ মারা যান সেদিন পাটনায় তাঁর ভাই খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি আর দাশ দাদার বিদেহী আত্মা দেখে মূর্ছা গিয়েছিলেন—এ-সত্য (fact) অবিসংবাদিত। জর্মানিতে আমি যে-বিদুষী মহিলার কাছে জর্মন ও

ইতালিয়ান ভাষায় তালিম নিতাম—যাঁর কথা অন্যত্র লিখেছি—তিনিও আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর এক মেয়ে প্যারিসে (না কোথায়) যেদিন মারা যান সেদিন রাতে তিনি তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন খোলা চোখে বার্লিনে। সাইকিক রিসার্চ সোসাইটিতে এ-শ্রেণীর বিদেহী অভ্যুদয়ের বহু দৃষ্টান্ত নানা সাক্ষীসাবুদ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে।

কিন্তু আমার এ-বিষয়ে কোনো গভীর ঔৎসুক্য ছিল না ইন্দিরা পণ্ডিচেরি আসবার আগে। আমার মন সায় দিত পরমহংসদেবের কথায় যে, জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হ'ল ভগবানের খবর পাওয়া—বাকি সব খবর হ'ল এহ বাহ্য—অর্থাৎ পাও বা না পাও প্রায় সমান কথা। তাই যখন খ্যাতনামা লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কলকাতায় সোৎসাহে বলতেন যে, বিদেহী আত্মার দর্শন পাওয়া যায় একথা অকাট্য সত্য, তিনি প্রমাণ পেয়েছেন, তখন আমি তাঁর উৎসাহে মন খুলে সায় দিতে পারিনি। আমার মনে জাগত কেবলই হ্যামলেটের কথা: "The undiscovered country from whose bourn no traveller returns:

> চির-অনাবিষ্কৃত সে-মহাদেশ যার কোল হ'তে আসে না কখনো ফিরে কোনো পান্থ আমাদের দেশে।

"ঠিক কথা," বলত আমার মন, "কাজেই কী হবে এ ধরণের ভৌতিক খবরে? আমার সব শক্তি নিয়োগ করা চাই ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের সাধনায়—যাতে ক'রে আমি তাঁর সঙ্গে পরমমিলনে ধন্য হ'য়ে তার পরে (যদি তিনি চান) তাঁর হাতের যন্ত্র হ'য়ে তাঁর কর্ম করতে পারি তাঁর 'মৎকর্মপরমোভব' আদেশ মেনে। সব অধ্যাত্মসাধনার শেষ কথা যে এই-ই এ-বিষয়ে আমার মনে সংশয় ছিল না কোনোদিনই—আজ তো নেই-ই।

কিন্তু মানুষের মনের নানা মেজাজ। তাই আমার লক্ষ্য ভগবান্ একথা মেনেও পরলোকের সম্বন্ধে যে গহন মনে আরো কোনো কৌতূহল ছিল না একথা বললে সত্যের মর্যাদা রাখা হবে না। যখন বুকের বীণার তার নিচু সুরে বাঁধা হ'ত (সব সময়েই তো উঁচু সুরে বাঁধা যায় না) তখন মনে হ'ত: "মন্দ কি—এসব টুকিটাকি খবর পাওয়ারও কিছুটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, নৈলে দেশে দেশে আবহমান কাল মানুষ কেন পরলোকের খবর পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে?—কেন নচিকেতার মতন অসামান্য 'প্রষ্টা'-ও যমকে বলেছিলেন, তিনি পারলৌকিক খবর চান সব আগে—কী হবে ইহলৌকিক ভোগবাদে যে-ভোগ ভঙ্গুর, অধ্রুব, অতৃপ্তিসম্বল?" তাছাড়া রকমারি ভৌতিক আবির্ভাব যখন যুগে যুগে মানুষের কাছে না-চাইতেও ধরা দিয়েছে, তখন এ-সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, এসব খবর পেয়ে আমরা কিছুটা অন্ততঃ লাভবান্ হ'তে পারি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "দিব্যজীবন"-এ লিখেছেন "There are four main lines which Nature has followed in her attempt to open up the inner being: religion, occultism, spiritual thought and an inner spiritual realisation and experience: the three first are approaches, the last is the decisive avenue of entry." Chapter 24, Life Divine.

মানুষের জীবন পূর্ণ কৃতকৃত্য হয় চারটি জিজ্ঞাসার সমন্বয়ে: ধর্ম, নেপথ্যতত্ত্ব, অধ্যাত্মচিন্তা ওরফে ফিলসফি ও আন্তর অভিজ্ঞতা ওরফে আত্মবোধ। এদের মধ্যে—লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দ—প্রথম তিনটি আমাদের এগিয়ে দেয়, শেষেরটিই আমাদের পৌঁছে দেয় বোধিলোকে। তাই যদিও আমি শেষেরটির উপরে জোর দিয়ে ভুল করিনি (শ্রীরামকৃষ্ণও এই নির্দেশই দিয়েছিলেন) তবু আমাদের এই-যে নেপথ্য লোকের খবর নিতে চাওয়া, এ-ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার কোঠায়ই পড়ে। তাই হয়ত ঠাকুর ইন্দিরার মাধ্যমে আমাকে এই খবর দিতে চেয়েছিলেন—কৌতূহলী নেপথ্যতত্ত্ববিৎ বনতে নয়, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে। তাই আর আগুপাছু না ক'রে বলেই ফেলি এই নেপথ্য তত্ত্বের কিছু

খবর কীভাবে প্রথম আসে বিদেহী আত্মার আবির্ভাবে।

শ্রীঅরবিন্দের প্রিয়বন্ধু মনস্বী শ্রীচারুচন্দ্র দত্তই সব প্রথম মৃত্যুর পরে ইন্দিরাকে সম্ভাষণ করেন "অনাবিষ্কৃত দেশ থেকে। তাঁর কথা বলবার ম'ত—আরো এই জন্মে যে, তিনি শুধু বুদ্ধিমান্ ছিলেন না, কথালাপেও ছিলেন প্রতিভাবান্। তাঁর "পুরোনো কথা" স্মৃতিচারণ সে-সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি নাম কিনেছিলেন "কথক"।

চারুবাবু বিলেত থেকে আই সি এস পাশ ক'রে এসে পণ্ডিচেরিতে সস্ত্রীক কায়েম হন একটি বাড়ি কিনে। তিনি প্রায়ই আমার ওখানে আসতেন আসর জমাতে। সবার সঙ্গেই তিনি মিতালি করতেন তেমনি সহজে, যেমন সহজে ফুল মিতালি করে পাতার সঙ্গে। এমন রসিক খুব কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পরিশেষে"-তে চারুবাবুকে তারিফ ক'রে লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ কবিতা, তার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি:

প্রিয়বরেষু,

> তুমি গল্প জমাতে পার।
> বোস তোমার কেদারায়,
> উছলে ওঠে আলাপ তোমার ভিতর থেকে...
> গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,
> এই তোমার বাহাদুরি।
> তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও,
> জীবলীলার মানুষকে।
> একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,
> সব কিছুর কাছে থাকা।

"কথক" উপাধিটি চারুবাবুর কপালে যেন তিলকের ম'তই জলজল করত। এত রকমের গল্প তিনি পরিবেশন করতেন তাঁর অট্টহাস্যের মশলা মিশিয়ে যে, শ্রোতাদের মধ্যে দেখতে দেখতে তাঁর হাসির ছোঁয়াচ লেগে যেত—এমনি ছিল তাঁর রসিকতার বাহার। তাঁর রসিকতার একটি নমুনা দেই। তাঁর জবানিতেই বলি, তাতে সুফল ফলবে বেশি।

চারুবাবু বললেন: "কলকাতার এক মস্ত ব্যারিস্টার একদা আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করেন—'অমুক আমাকে এসে বলল চারু, যে তার ভাইবোনেরা তাদের বিষয়-আশয় সব শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে দিয়ে দিয়েছে। একি ব্যাপার হে? আরো অনেকে শুনি পণ্ডিচেরি গিয়ে এইভাবে ফকির হয়েছে। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—পণ্ডিচেরি গেলে কি মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়?' উত্তরে আমি হেসে বললাম: 'না ভাই, সত্যি হ'ল এর উল্টোটা—converse proposition: অর্থাৎ, যাদের মাথা খারাপ হয়েছে তারাই পণ্ডিচেরি যায়—হা-হা-হা।'"

চারুবাবুর আর একটি গৌরবময় পরিচয়—তিনি বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের সহকারী ছিলেন, গোপনে নানা বিপ্লবীকে পরামর্শ দিতেন, অর্থসাহায্যও করতেন। শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে নানা কথাই বলতেন গভীর ভক্তি-ভরে। একদা আমি চারুবাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে যা শুনেছিলাম লিখে গুরুদেবকে পাঠিয়েছিলাম। উত্তরে গুরুদেব আমাকে লিখেছিলেন:

"Yes. I saw little of him, for physically our way lay far apart, but that little was very intimate, one of the kind of man whom I used most to appreciate and felt as if they had been my friends and comrades and fellow-warriors in the battle of the ages and would be for ages more. But, curiously enough, my physical contact with men of his type—there were two or three others—was always brief, because I had something else to do this time......Sri Aurobindo 28/9/36."

(ভাবার্থ: চারুবাবুর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের দেখা সাক্ষাৎ খুব কম হ'লেও তাঁরা ছিলেন যুগে যুগে পরস্পরের আত্মার আত্মীয়—ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বন্ধু সতীর্থ তথা সহযোদ্ধা।)

আমরা অনেকেই তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম তাঁর জীবনস্মৃতি শুনতে, বিশেষ ক'রে বিপ্লবী যুগে তিনি (ও খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি. মিত্র) কী ভাবে বিপ্লবীদের গোপনে সাহায্য করতেন ও কী ভাবে কয়েকবার ধরা পড়তে পড়তে বগ ঘেঁসে বেঁচে গিয়েছিলেন শুনতে শুনতে আমাদের সত্যিই রোমাঞ্চ হ'ত। এছাড়া তাঁর আর একটি গুণ ছিল—তিনি ছিলেন, সঙ্গীতবেত্তা না হোক, সঙ্গীতরসিক—যাঁর কাছে গান গেয়ে আমি গভীর তৃপ্তি পেতাম।

ইন্দিরা পণ্ডিচেরিতে প্রথম আসে ২০এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯—প্রস্থান করে ১৫ই মার্চ। দ্বিতীয়বার আসে ২০ জুলাই, প্রস্থান—১৬ই আগষ্ট। তৃতীয় বার আসে ১০ই মার্চ, ১৯৫০, প্রস্থান—১লা জুলাই। তার পরে আসে ৫ই ডিসেম্বর গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের দিনে। অতঃপর আমরা উভয়ে বম্বে যাই ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৫১, পণ্ডিচেরিতে ফিরি ২০-এ ডিসেম্বর ১৯৫১ ও ইন্দিরা পণ্ডিচেরিতে আমার কাছেই থাকে একাদিক্রমে প্রায় ন'মাস। এ-অঘটনটি ঘটে আমার জন্মদিনে ১৯৫২ সালে ২২-শে জানুয়ারী রাত্রে।

যা ঘটেছিল, পরদিনই লিখে রেখেছিলাম আমার NO REASON CAN EXPLAIN-এ টাইপ ক'রে। এখানে তার অনুবাদ দেই :

ভূমিকায় ব'লে রাখা ভালো যে ইন্দিরা এ-সময়ে প্রায় সর্বদাই অন্তর্মুখী থাকত—এমন কি গানের সময়ও একটু শুনতে না শুনতে সমাধি, পরে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হ'য়ে আক্ষেপ করত গান শোনা হ'ল না ব'লে। তাই ভাব চাপতে অনেক সময়েই নিজের মাথায় চাপড় দিত। এখনো দেয় মাঝে মাঝে।)

"রাত এগারোটা। ইন্দিরা ধ্যানে বসতে না বসতে নিশ্চল সমাধি। সমাধি ভাঙার পর আমাকে কিছুই বলে নি। পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে বলল : 'কাল রাতে যখন ধ্যানে বসেছিলাম না?—হঠাৎ দেখি তোমার প্রিয় বন্ধু চারুবাবু। আমাকে বললেন—তিনি দেহমুক্ত হয়েছেন।'

"আমি চমকে উঠে বললাম : 'চারুবাবু? মারা গেছেন! কখন?'

"ইন্দিরা বলল : 'আমি জিজ্ঞাসা করায় বলছিলেন —রাত ন-টায়।'

"আমি তৎক্ষণাৎ চা খাওয়া রেখে ইন্দিরাকে নিয়ে গেলাম সোজা চারুবাবুর আনন্দালয়ে। কাছেই, তিন-চার মিনিটের পথ।

"চারুবাবুর বৃদ্ধা স্ত্রী আমাকে দেখে চোখে আঁচল দিলেন : 'আর কী বাবা! সব শেষ। চ'লে গেলেন—হঠাৎ।'

'হঠাৎ? কী ব্যাপার, মাসিমা?'

"কী জানি বাবা। সন্ধ্যাবেলা তো বেশ সুস্থই ছিলেন—রোজকার মতই হাসিগল্পে মশগুল। সবাই চ'লে গেলে পর বললেন—বুকে অসহ্য ব্যথা। বলতে বলতে নেতিয়ে পড়লেন। দশ মিনিটে সব ফুরিয়ে গেল।' ব'লে ফের চোখ মুছলেন।

আমি : ঠিক কটা তখন?

মাসিমা : রাত ন-টা।

আমার NO REASON CAN EXPLAIN থেকে ইন্দিরার যোগবিভূতি-দর্শনাদি আরো কয়েকটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেই :—

"২৯এ এপ্রিল (১৯৫১) তারিখে এক স্থূলকায় সাধক চারু ভট্টাচার্য আমার ফ্লাটে এসে এক মুসলমানের পাসপোর্ট দেখালো তার ফটো শুদ্ধ। চারু বলল 'এ-লোকটি বলছে কাল রাতে তার যথাসর্বস্ব চোরে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে—সে একেবারে নিঃস্ব, কিছু টাকা চায়। বলছে অবিশ্যি যে শোধ দেবে অবিলম্বে।' ইন্দিরা ফটোটি দেখেই বলল 'দুর্বৃত্ত, ওর কথা সব মিথ্যে।' চারু চ'লে গেলে ইন্দিরা আমাকে বলল : 'আমার মনে উঠল—স্মাগলার।' খনিক পরে চারু ফিরে এসে জিভ কেটে বলল : 'কী সর্বনাশ! এখানকার একটি জজ, যিনি আমাকে সকালবেলা দেখেছিলেন পথে এর সঙ্গে—বললেন আমাকে : খুব সাবধান, এ-স্মাগলারটিকে মাসকয়েক আগে তিনি জেলে দিয়েছিলেন—সবে জেল থেকে বেরিয়েছে। উঃ, দিলীপদা, বড় রগ ঘেঁষে বেঁচে গেছি'!

সময়ে সময়ে বিদেশের নানা ঘটনাও ইন্দিরা দেখতে পেত দূর দর্শনে। একবার ওর এক জর্মন বন্ধুর সম্বন্ধে দেখেছিল (ওর ডায়রিতে লিখে রেখেছিল) : "দেখলাম—Franz রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে তুষারাবৃত মাঠে। কিন্তু কোথায় জানি না।" [Franz অস্ট্রিয়াবাসী—ইন্দিরার মহাভক্ত হয়ে উঠেছিল যখন ইন্দিরা সাভয় হোটেলে থাকত ওর পিতৃদেবের কাছে। ইন্দিরা আমাকে বলেছিল, Franz নাম করেছিল মনোবিকলন গবেষণায় (psychiatrist)]

এক বৎসর পরে বম্বেতে ইন্দিরার কাছে এসেছিলেন Franz-এর এক বোন—আমিও ছিলাম সেসময়ে বম্বেতে। মহিলাটি বলেছিলেন আমাদের যে, একদা ওঁরা সবাই শীতে বরফের উপর দিয়ে skiing অভিযানে বেরিয়েছিলেন। Franz হু হু করে এগিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায়—অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ আবিষ্কার করা গেল এক তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে।

অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবঙ্গ(?)

শ্রীসুশীতল দত্ত

তিলে তিলে মৃত্যুর যাতনা দিয়ে আজকের জীবন-যন্ত্রণা প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে। বিধ্বস্ত মানুষের মন নৈরাশ্যে নিকষকাল অন্ধকার জনজীবনের সম্মুখের বাকী পথ জুড়ে শান্তিলোভী মানুষের মন আজ নিরালম্ব। প্রতিকারহীন দুর্নীতির রক্তচক্ষু আস্ফালনে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা সব ভেঙ্গে পড়ার মুখে। অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পুরাতনকে স্বীকার করার মূল্যবোধ—দয়া, মমতা, মনুষ্যত্ব; বিবেক আজ বুঝি শয়তানের শাসনপাশে আবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আজ তাই দেখতে পাচ্ছি জীবনের সর্বক্ষেত্রে রিক্ত—অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বহারা, রাজনৈতিক রাজ্যে দেউলিয়া। সমাজের যা কিছু সত্য-সুন্দর-শিব সবই আজ ভেসে যাচ্ছে নৈরাজ্যের খর-স্রোতে কোন এক ভয়ঙ্কর পরিণামবাহী অন্তহীন অন্ধকারে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আজ মৃত্যুর প্রহর গননায় রত। দিকে দিকে অবক্ষয়ের ছড়াছড়ি, এইটাই হয়তো অলঙ্ঘ্য বিধাতার বিধানে অলিখিত স্বাভাবিক পরিণতি।

বিভিন্ন রঙ্গীন মতাদর্শে বিভক্ত রাজনৈতিক জগৎ আজ উচ্চকণ্ঠ। প্রত্যেকেই অতি সচেতন আপন আপন স্বার্থ আর অধিকারের লোভে। সমাজের কাছে তাঁদের দাবি অনন্ত, অপরিমিত। কিন্তু দিতে পারেন না তাঁরা কিছুই সমাজকে, অন্ততঃ দিতে পারেনি আজ পর্য্যন্ত—তাঁরা চান জনজীবনও গণদেবতাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হউক "সমাজতন্ত্র"। কিন্তু তাঁদের বোধহয় জানবার প্রয়োজন নেই কোন সমাজতত্ত্বকে, বোঝবার প্রয়োজন নেই গণদেবতার মন। তাইতো দেশবাসী আজ দেখতে পাচ্ছে নৈরাজ্যের অতলে ডুবে চলেছে মানব গোষ্ঠী, বশের করে যবশক্তি। আর ঠিক সেই কারণে দিক-ভ্রান্ত (!) তারুণ্য সবকিছুকেই গুঁড়িয়ে জালিয়ে ধ্বংস করবার জন্য কালাপাহাড়ীব্রত ধারণ করে সমাজের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, শিরায়-উপশিরায় জাগিয়ে তুলেছে ভীতি প্লাবন। অপরাধ-প্রবণতা হিংসা-হত্যার তরঙ্গে টল টলায়মান সমাজ অর্ণবপোত। অথচ মিছিল চলেছে শ্লোগান ধর্মী রাজনীতির (নীতিকর্ম বিপরীতমুখী), জন-জীবনের জন্য স্বতঃ উচ্চারিত হচ্ছে গালভরা প্রতিশ্রুতি উচ্চ কণ্ঠে, আর যবনিকার অন্তরাল থেকে চলেছে একে অন্যের প্রতি কলঙ্ক লেপনের প্রতিযোগিতা আর কুৎসিত মন্তব্য হয়তো এই রাজ্যলোভী কিস্তিমাতের একমাত্র পথ দেখেছেন এঁরা নইলে নেতাদের প্রতি আজ তেমন আর জনসাধারণের আস্থা নেই কেন দেখতে পাওয়া যায়। কারণ জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে তাদের কল্যাণের নামে এঁরা সবাই আজ মুখর কিন্তু আদর্শ-বাদের কচ্‌-কচানিতে আর নিজ নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধিতেই এঁরা সবাই ব্যস্ত—দেশ-জনজীবন উপলক্ষ মাত্র।

---

* এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নির্মল চিন্তা ও অনন্ত নেতৃত্বের অধিকারিনী ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে বাংলাদেশের দেশাত্মবোধ ও মরণজয়ী সংকল্পের সঙ্গে ভারতীয় জোয়ানদের শৌর্য্য বীর্য একত্র হয়ে পীড়িত মানবের উদ্ধারের কাজ শেষ করেছে—গড়ে উঠেছে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ আর এর ফলে এই কোটি মানুষের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এ এমন ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার তুলনা নেই। এর জন্য আজ আমরা খুশী, আমরা আনন্দিত, আমরা গর্বিত।

জনসাধারণ বলতে তাঁরা বুঝেছেন শুধু বোধহয় সরকারী কর্মচারী, শিল্প-শ্রমিক; আর বাকী দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যা সাধারণ মানুষ যাঁরা এই গোষ্ঠীভুক্ত নন তাদের কথা হয়তো ভাবা অন্যায়। নইলে আজ শুধু সরকারী কর্মচারী শ্রমিকদেরই রাজনৈতিক মিছিল দেখতে পাই শহরের রাজপথ জুড়ে। হয়তো তাঁদের অভাব আছে, সমস্যা আছে; বাকী বৃহত্তম জনসাধারণের জীবন বুঝি গড্ডলিকা। এটা তো স্বতঃই স্পষ্ট জনজীবনও বুঝেছেন তাঁরাও সচক্ষে দেখছেন—স্বদেশ আর সমাজের কোন গঠনমূলক ভাল কাজ কিছুই তাঁরা করে উঠতে পারছেন না আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্বসাধারণের জন্যে। আর হয়তো পারবার দিনও তাঁদের অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এক কথায় কার্য্যত সবার চোখে এই সব রাজনৈতিক নেতারা বর্ত্তমান সমাজের যে কোন সমস্যা সমাধানে অসমর্থ—মোদ্দা কথা ব্যর্থ।

ব্যর্থ কিন্তু দেশের এবং দশের এই অবস্থার জন্য দায়ী :ক এবং কারা? আজকের এই অশান্তির জন্য দায়ী কি শু্ তরুণরাই?—না। রাজনৈতিক দলনেতারা যাঁরা রাজনীতির বাতাবরণে জনগণকল্যাণের নামে জনসাধারণকে নিয়ে যাচ্ছেন এক অতল অধোগতির দিকে। এহেন সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দা.ী কার্য্য ও কারণগুলির আজ বিশ্লেষণ করা এবং প্র. •কারের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ এই ৭১-এর বিভ্রান্ত চিন্তা এবং প্রচেষ্টার অন্তেই তো নেমে এসেছে বঙ্গ-বিভাগের অভিশপ্ত পরিণাম।

অন্য কোন সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ধর্ম্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল একদিন—১৯৪৭ইং আগষ্ট মাসে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সেটাই নাকি ছিল তখনকার নেতাদের কাছে একমাত্র বাস্তব সমাধান (!) অথচ বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছিলেন—"এ অবাস্তব ব্যবস্থা টিকতে পারে না, আগামী বিশ কি বাইশ বৎসরের মধ্যেই এর অবলুপ্তি ঘটতে বাধ্য।" ঠিক এমনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ভারত-আত্মা শ্রীঅরবিন্দ। এই মনীষী ঐতিহাসিক আর সত্যদ্রষ্টা বিপ্লবী মহাসাধকের ভবিষ্যৎ বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে চলেছে, তারই তো প্রমাণ স্বরূপ দেখছি সীমান্তের অপর পারে চলমান জীবনক্ষয়ী অনির্দ্দিষ্টকালের সংগ্রাম অর্থাৎ যাকে নাম দেওয়া হয়েছে "মুক্তিযুদ্ধ"। সেখানে আজ বাঙালী জাতীয়তাবাদ তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে মুক্ত করে শোষণহীন রসপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় জীবন আহুতি দিচ্ছে কাতারে কাতারে......মরছে হাজারে হাজারে তরুণ, শত্রুর বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ লড়াই করে। অসহায় নিরস্ত্র বাঙালী মরছে পাকিস্থানী বর্ব্বর কসাইদের হাতে নির্ম্মম এবং করুণভাবে। বুদ্ধিজীবীদের পাক পিশাচেরা হত্যা করছে ঠাণ্ডা মেজাজে আর বিশেষ স্বার্থে প্রণোদিত বিবেকহীন (!) কয়েকটি রাষ্ট্র এদের ইন্ধন জোগাচ্ছেন প্রকাশ্যে বা গোপনে অস্ত্রে আর অর্থে; অথচ স্বাধীনতার জন্যে মানবতাবাদের জন্য শোষনহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে দিবারাত্র এদের কতই না কুম্ভীরাশ্রুপাত...।

আজ পর্য্যন্ত যে খবর এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যায় প্রায় দশ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে। বঙ্গবিভাগের পর থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু আপন আপন সম্পদ ও সম্পত্তির আশা পশ্চাতে ফেলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের আশায়, আজকের বাংলাদেশ থেকে ইতিমধ্যেই এখানে পৌঁছেছেন নব্বই লক্ষের উপরে বৃদ্ধ, শিশু, নারীর দলসহ। ১৯৪৭-এর দেশত্যাগের কারণ ছিল বুঝতে পারি উগ্র সঙ্কীর্ণ রাজনীতি পরিচালিত সাম্প্রদায়িকতা আর আজ দেশত্যাগ হচ্ছে কেন? কারণ স্বধর্মীয় শত্রু সৈন্যের অমানুষিক অত্যাচার ও অকারণ গণহত্যার খেলা। ওদেরই হিসাবমত নিহত হয়েছে দেখি দশ লক্ষেরও বেশী, আরও হয়ত হবেন কতো— তার মধ্যে হিন্দু কত সে হিসাব অবশ্য আজ আর করতে বসব না। কিন্তু ক্ষয় হয়েছে সমগ্র বাঙালী জাতিরই। আজ সীমান্ত পার হয়ে এসেছেন প্রাণের ভয়ে বহুসংখ্যক বাঙালী যাঁরা ধর্ম্মে মুসলমান—এঁরা বিতাড়িত না উদ্বাস্তু সে বিচারের সময় নেই, কিন্তু

তাঁরা এসেছেন এটাই সত্য এবং এদের অপরাধ এরা নিরন্ন অসহায় দরিদ্র শোষিত এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমর্থক। এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময় এই বিতাড়িত সর্বহারা ভাগ্যহীন মানুষের সংখ্যা হয়তো এক কোটিকে ছাড়িয়ে যাবে।

......এদের কতজন ফিরে যাবেন স্বাধীন বাংলার বুকে তা আজ বলা খুবই শক্ত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে তাদের সুখদুঃখের অংশীদার করে অতিথি ভগবানের সম্মান দিয়ে তাদের পর্ণকুটিরে আশ্রয় দিয়ে রাখতে হবে। আজ এঁরা আছেন ক্যাম্পে দয়ার অন্নে পেট অর্ধপূর্ণ করে—কারণ পশ্চিমবঙ্গ নিজেই অর্দ্ধাহারী।

অতিরিক্ত এক কোটি মানুষের জীবনযাত্রার ভারে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের আর্থিক আর সামাজিক কাঠামোয় ভীষণ চাপ পড়েছে—আর এর প্রতিক্রিয়া এবং পরিণাম ঘোরতর হতে বাধ্য। কিন্তু বড়ই লজ্জার এবং পরিতাপের কথা, এই মানবিক দুর্যোগপূর্ণ সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধানের পথ আজ পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

কেন্দ্রীয় রাজপুরুষেরা আজ রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন বটে কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক, এটা অনেকটা হচ্ছে ভাবের ঘরে চুরি করতে বলা আর কি। অর্থাৎ চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকার উপদেশ দেওয়া। কিন্তু এই দু'মুখো নীতি কোনদিনই কোন শুভ পরিণতির ফল প্রসব করেনি, তাই আজ তাঁদের কর্ত্তব্য, সত্যই যদি তাঁরা দেশের দরদী এবং জনসাধারণের একনিষ্ঠ সেবক হন, তবে আজ এই কঠিন সত্যের সম্মুখীন হয়ে প্রজ্ঞা আর সাহসের সঙ্গে বুক বেঁধে এই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন তবেই দেশের সঙ্গতি ও সুস্থির জীবন প্রতিষ্ঠার আশা দেখি, নইলে জাতীয় অস্তিত্ব অচিরে বিপদাপন্ন হয়ে হয়তো বিরাটভাবে আঘাত হানবে সর্বভারতীয় জন সমাজে এবং মনোমানসে। তখন কেন্দ্রীয় রাজপুরুষেরা, নেতারা কোন্ মায়ের আঁচলের নীচে আশ্রয় নিবেন?

ইংরাজী ১৯৪৭এর পর পশ্চিমবঙ্গে সরকারী হিসাবেই এসেছেন ৪২ লক্ষ উদ্বাস্ত কিন্তু বেসরকারী হিসাবে তার দ্বিগুণ। ঐসব ছিন্নমূল বাস্তত্যাগীদের বেশীর ভাগই হিন্দু এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে, কিছু গিয়েছেন আসামে আর কিছু উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, আন্দামান আর দণ্ডকারণ্যে। এদের পুনর্বাসন হয়েছে সত্য কিন্তু এঁরা ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন বাঙালী সমাজের কাছে যোগসূত্রের ব্যবস্থা না থাকায়। তাই বাঙালীর মেরুদণ্ড হয়তো ভেঙে পড়তে চাইছে। কিন্তু সাধক-বিপ্লবী-জ্ঞানতপস্বী-দার্শনিকের প্রসবভূমি বাংলা আপন তেজে তেজীয়ান আপন মন্ত্রে দীক্ষিত মহাপরাক্রমশালী দিক্‌দর্শক নেতা—তার ভেঙে পড়লে চলবে কি করে? তাকে উন্নত মস্তকে প্রতিষ্ঠাবান্ রাখবে এই অগ্নিগর্ভ বাংলার আগন্তুক যুবশক্তি......একথা আমরা কখনও কি তলিয়ে দেখেছি—আমরা মানে চিন্তাশীল অভিভাবকরা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নেতা যে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বসবাস করতে রয়ে গেছেন এদের পুনর্বাসনের সঠিক চেহারাখানাই একবার চোখ বোলাবার দরকার।

উদ্বাস্ত উপনগরী সব গড়ে উঠেছে অসংখ্য। ক্ষুদ্র-পরিসর ভূমিতে ঘর বেঁধেছে তাঁরা, সহরতলীর অনাবাদী ভূমি দখল করে পরিকল্পনাহীন ভাবে সব ঘর বাঁধা, অনেকে আবার আরো সংকীর্ণ পরিসরে খোলার ঘরে সহরের বস্তীতে বাস করছেন, সংসার পেতেছেন কত্তই না আশায় বুক বেঁধে—ঠাঁই নেই পাঁচ জনের কিন্তু আসর কাটাতে হয়—রাত কাটাতে হয় সেই পরিমাণ জায়গায় পনের জনের। কি অস্বাস্থ্যকর ক্লেদাক্ত পরিবেশ—বেশীর ভাগ মানুষই অপ্রতিষ্ঠিত-প্রতারিত-শোষিত-বঞ্চিত। এহেন পটভূমিকায় ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমাজজীবন আজ অশান্ত। স্বাভাবিক জীবন আজ মানুষের কাছে একেবারেই অলীক কল্পনা, এমনি করেই সামাজিক বিপ্লবের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র আজ প্রস্তুত। জনসাধারণ এই বিভীষিকাময় নর্ক থেকে এই সমাজ ব্যবস্থার বঞ্চনা থেকে প্রতারণা থেকে, শোষণ থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু সেই উন্নত সুস্থ সুখী জীবনের প্রকৃত সন্ধান কি দিতে পারছেন বা

পারবেন আমাদের জনগণমন-পূজ্য দেশপ্রাণ জননেতারা ?

সমস্যার অক্টোপাসে আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের বেকার তরুণ সমাজ। তারুণ্যের হচ্ছে ক্ষমাহীন-সীমাহীন অপচয় ; কিন্তু কেন ? কি ভাবে—এর পিছনেও হয়তো ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা যাবে ভালভাবে অবধারণ করলে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কলকাতার প্রাধান্য কমে গেছে আর যাচ্ছে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে বেকারীর সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিমান গতিতে বেড়ে চলেছে, কর্ম্মসংস্থানের পরিকল্পনাও রূপায়ণ একসঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারছে না। কারণ কর্ম্ম-বিনিয়োগ ব্যবস্থা কোন অলক্ষ্য কারণে হয়েছে সঙ্কুচিত এবং ব্যক্তি-নির্দ্দিষ্ট। তাই বাঙালী তরুণরা আজ কর্মক্ষেত্রে নিতান্তই অবাঞ্ছিত—এ এক মর্মান্তিক অবস্থা। এই অশালীন পরিবেশে কর্মহীন তারুণ্য যখনই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে তখনই তার চোখে একটি শুধু অচ্ছেদ্য অন্ধকারের কালো যবনিকা ছাড়া কিছুই ভেসে উঠছে না। কর্ম্মের প্রেরণা-শক্তি যে বয়সে সর্বাধিক সেই বয়সেই এঁরা ধর্মহীন, প্রাণপাত করেও কর্ম্মসংস্থান করতে পারছেন না, তাই এরা হয়ে উঠেছে অস্থির, দামাল, বহ্নিত্রাসী এক-একটি সংহারশক্তি ; আর এঁরা সমাজ ব্যবস্থার উপর হয়ে পড়েছেন আস্থাহীন,ব তস্পৃহ। এই অবস্থাই ক্রমে ক্রমে করে দিয়েছে উদ্দাম-উদ্ধত। এই পরিবেশ এই গণ্ডি থেকে এঁরা আজ বেরিয়ে আসতে চান—এঁরা আজ নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যাশী, তাই এঁরা বর্ত্তমান সমাজকে মানতে চাইছে না। এহেন অবস্থায় নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ওঁরা বাঁচার জন্য হয়ে উঠেছেন সমাজত্রাস, প্রচলিত নিয়মকানুন বা সামাজিক ব্যবস্থা এঁদের কাছে আজ অর্থহীন প্রলাপ, তাই ধ্বংসের নেশায় মত্ত ভ্রাতৃরক্ত স্রোতে করছেন এঁরা রক্ত-তর্পন। সুস্থির নেতৃত্ব আর সুষ্ঠু চিন্তার অভাবে এঁরা দিক্‌ভ্রান্ত আর লক্ষ্যভ্রষ্ট।

যে সমাজের তারুণ্যশক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেই সমাজের সব ব্যবস্থাই কি ভুল-ত্রুটী, বিচ্যুতি যুক্ত ? না ! যথেষ্টই গলদ রয়েছে যা কোনমতেই অস্বীকার করার কোন পথ নেই। যত তাড়াতাড়ি এর সংশোধন সম্ভব হয় ততই মঙ্গল। বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ঠিকভাবে এগিয়ে চলাই হচ্ছে যুগোপযোগী প্রগতিশীল কাজ এবং একমাত্র পথ।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় এখন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে—দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আজ নাগালের বাইরে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অপ্রতিহতগতিতে বেড়ে চলেছে ভোগ্য এবং ভোগ্য দ্রব্যের মূল্য। মাসোহারা, মাহিনা, পারিশ্রমিক বাড়ে নেতাদের কল্যাণে মুষ্টিমেয় সরকারী কর্মচারী, বণিক কর্মচারী, শ্রমিক শিল্পের কিন্তু অশেষ মূল্য দিতে হয় অন্যান্য সাধারণ জনসাধারণের। দৈনন্দিন জীবন যাপন আজ এক বিষময় যন্ত্রণা। দেখে মনে হয় সরকার নেই প্রশাসন নেই, কিন্তু সবই আছেন জনসাধারণকে শোষণ এবং পেষণ করবার জন্যে, নইলে প্রশাসনকে কেন দেখতে পাই নীরব দর্শকের ভূমিকায় ? তারা কি অসহায় ? না তাও তো নয়, যখন দেখি সিংহের মত তাদের কণ্ঠে গর্জ্জন, কিন্তু শক্ত হাতে লাগাম ধরার শক্তি কই ? অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের লোভ-লিপ্সা বাড়িয়ে চলেছেন সমাজের রক্ত শুষে নিচ্ছেন নিশ্চিন্ত মনে। ক্রেতা সাধারণ বাধা দিচ্ছেন না অসহায়-সাহস নেই বলে, প্রশাসন এখানে মৃত সোনকের ভূমিকা গ্রহণ করে সমাজের শোভা বর্দ্ধন করছেন। সাধারণ মানুষ হয়ে গেছেন সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলনেতারা দলবাজী করে সমাজজীবনকে এই দুর্দ্দশায় এনে ফেলেছেন, নষ্ট হয়েছে স্বাভাবিক জীবন, পঙ্গু হয়েছে আজ শিক্ষা-ব্যবস্থা, সভ্যতা, শালীনতা বোধ আর সংস্কৃতির হচ্ছে অবক্ষয়। তাই এই নেতাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। কারণ এঁরা সমাজকে করেছেন রাজনীতি সর্বস্ব। দলে দলে বিভক্ত সমাজ বিচিত্র মতবাদের ছিন্ন জালে, এদের কর্ম করেছে ব্যক্তি সর্বস্ব পারস্পরিক আস্থাহীন শৃঙ্খলাহীন রেষারেষি।

উন্মত্ত হানা-হানি, খুনো-খুনী, প্রমত্ত হিংসার শিকার কিন্তু এরা শেখাননি কোন শৃঙ্খলতাবোধ, করেননি চরিত্র গঠনে কোন সাহায্য, জাগাননি সমাজ চেতনা বোধ, করেননি তরুণদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ।

অন্যদিকে ব্যর্থ প্রশাসনের উপর ভরসা করে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারছেন না বলেই মানুষের জীবন পর্য্যন্ত আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। হিংসার বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়াতে পারছেন না—সুবিচারের আশা নেই বলে, তাই সদা আতঙ্কগ্রস্ত—সদা সন্ত্রস্ত সমাজ জীবন। পৌরুষ হয়েছে অবলুপ্ত, সমাজের অবক্ষয় শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই কিন্তু এই সাংঘাতিক অধোগতি চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে গেছে গত তিন সাড়ে তিন বছরের মধ্যে। অসমর্থ নেতৃত্ব ও ব্যর্থ প্রশাসনের জন্য মানুষের এই অবস্থা, সমাজের এই দুর্দ্দশা, শিক্ষা আর সংস্কৃতির এই অধোগতি। মোদ্দা কথা হলো পশ্চিমবঙ্গে আজ আর সমাজ নেই—আইনের শাসন নেই। সর্ব্বত্র এক প্রাণান্তকর অব্যবস্থা বিরাজ করছে। আশাহত সমাজ সুস্থ নেতৃত্বের অভাবে হয়েছে বিপথগামী হিংসার রাজনীতিতে হয়েছে প্রমত্ত আর বিপ্লবের বিপথগামী তরী যাত্রা শুরু করেছে অশান্ত সাগরে, যে তরীর তীরে পৌছুবার আগেই হবে ভরাডুবি। সমাজ পরিবর্ত্তন যেখানে সমবেত চেষ্টায় করা ছিল সহজ যেখানে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বহুমতবাদে আর বিচিত্র চিন্তায় কর্ম্মে যে শুধু বিঘ্নিত ও ব্যাহত হচ্ছে তাই নয়, সব কিছুই যেন আজ জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। বুদ্ধির হয়েছে কঠিন বন্ধন, চিন্তা হয়েছে জরাগ্রস্ত, ধ্বংস হচ্ছে সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা আর সংস্কৃতি।

এই অবস্থার জন্য কে বা কারা দায়ী সে বিচারের সময় আর নেই—আগুন লেগেছে সমাজে, এ আগুন নেভাতে হবে, দেশকে বাঁচাবার পথ বাঁচার পথ খুঁজে বের করতে হবেই আজ। আর এর জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির সমবেত এবং সর্ব্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা।

আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গে এখনই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সামরিক শাসনের মত এমন কো: প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা গণতন্ত্রবিরোধী নয় এই সঙ্গে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্ত করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান ব্যবস্থার বহুবিধ গলদ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থারই ফল। কর্ম্মচারীদে মধ্যে কিছু দলগতভাবে পৃথক সত্তায় বিভক্ত। কেহ কেহ সরকারী কাজকে ফাঁকি দিয়ে দলীয় রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। পরিকল্পনার কাজে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এঁরা বিলম্ব করেন, পাকিয়ে তুলেন জট। ভিন্ন কাজে সময়ের করেন অপব্যবহার। সর্ব্বস্তরের কথা না বলাই ভাল। এই সমস্ত কাজের ফলে মানুষের মনে আসে সংশয়, অবিশ্বাস। তাই মানুষ আজ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ মানুষ দেখছে সর্ব্বস্তরে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলতা।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যে চাই কর্ম্মে নিষ্ঠা, চিন্তায় সমাজ-চেতনাবোধ আচরণে সততা আর ক্রিয়ায় ক্ষিপ্রতা। বঞ্চিত আর বিতাড়িত মানুষের প্রতি সামাজিক বিচারের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে সুস্থির জীবন লাভের জন্য। তবেই মানুষের মনে আস্থার ভাব ফিরে আসবে। এই আস্থাহীনতা শ্রদ্ধাহীনতার ভয়াবহ অবস্থার হাত থেকে মানুষকে পুনর্ব্বাসিত ক'রে সুস্থ জীবন-বোধের অনুপ্রেরণা জাগাতে হবে।

সমাজক্ষয়ী ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর বিরুদ্ধে করতে হবে জরুরী সংগ্রাম। কারণ বহু লক্ষের উপর শিক্ষিত বেকার জীবন সমাজের একটি বিরাট অভিশপ্ত ক্ষয়রোগ বিশেষ। এর শীঘ্র প্রতিকার না হলে—এদের কর্ম্মের সংস্থান না করতে পারলে এ: বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না। এর সমাধানের কাজে ফাঁক ও ফাঁকি দিয়ে চলবে না—এর কোন সহজ পথ নেই। শুধু দফায় দফায় পরিকল্পনা করে ঢাক বাজালেই চলবে না। কাগজে কলমে তো পরিকল্পনা হয়েছে অনেক, এতে হয়েছে জনসাধারণের অর্থের অপচয়—কর্ম্মের ভরাডুবি, যুব-মনে নৈরাশ্য। তাই এখন চাই হাতে কলমে কাজ শুরু হোক। এখনই বিপদ এড়াতে হলে যুব সমাজকে হতাশার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

কল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বহু শতের উপর, তার মধ্যে ছোট-বড়-মাঝারি সবই আছে। বন্ধ হয়ে আছে নূতন শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস। অর্থ লগ্নীর ক্ষেত্র হয়েছে সঙ্কুচিত—সীমিত। এছাড়া আবার সরকারী টাকাও পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে কমই জোটে। তারও নাকি সঠিক লগ্নী হয় না। বেসরকারী লগ্নীর টাকা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে গেছে আর যাচ্ছে। এ শুধু অবাঙ্গালীর নয়, বাঙ্গালীরও। আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭১টি কারখানার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে স্থানান্তরের জন্য আবেদন পড়েছে। তার মধ্যে ইত্যবসরে ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়েছেন। বাকীরা আছেন পাবার আশায় অর্থাৎ Waiting listএ। এ কাজগুলি কি ধরণের? বাঙ্গালার অর্থ-নৈতিক পুনর্ব্বাসনের সুস্থ জীবন প্রতিষ্ঠার কি এই নমুনা? তা হলে দিনরাত এই কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের প্রয়োজনই বা কি, আর কেন? একদল লোক বলছে—শ্রমিক আন্দোলনের ফলেই কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে। আর একদল লোক বলছেন—ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অসাধু লোভ শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে - ন্যায়সঙ্গত দাবী মানছে না বলেই এই অশান্তি। আপাত দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের বক্তব্যই ঠিক। তাহলে সমাধানের উপায় কি? এর পিছনে যে আরো গভীর ও মৌল কারণ আছে আমরা তা অনুধাবন করি না বা করতে চাই না। দেশ বিভাগের পর সমগ্র দেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত পরিকল্পনা হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়—কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপনের অনুমতি নিয়েও পরে অন্য কোন কারণে কারখানা স্থাপন করেন নি। এঁদের মধ্যে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলেই আছেন। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে কলিকাতা তথা বঙ্গদেশের স্থান শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধান ছিল এবং সমগ্র-ভারতের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবসা এখানেই ছিল। দেশ বিভাগের ফলে বাজার বিশেষভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কলিকাতার প্রাধান্য কমে যাওয়ার দিকে মোড় ফিরেছে। দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী একটি বৃহৎ শিল্প নগরীতে পরিণত হয়ে কর্ম্মসংস্থানের পরিসরকে বড় করেছে। কল্যাণী, হাবড়া, শক্তিগড়, সর্ব্বোপরি হলদিয়া প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্পনগর গড়ে উঠছে—তরুণদের কাজের সুযোগ হয়েছে—সুযোগ বাড়বে আরো শিল্প সম্প্রসারিত হলে, এবং হবে। কিছু বাঙ্গালী যুবক কাজ পেয়েছেন, আরো পাবেন আশা করি—না, আশা নয়, দাবী করছি। কিন্তু শুনছি—দেখছি বাঙ্গালী ছেলেরা সর্ব্বত্র সুযোগ পায় না এই বাংলাদেশেই। আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিল্পসংস্থায়, সমস্ত কর্ম্মে শুধুমাত্র বাঙ্গালী ছেলেদেরই কাজ পাওয়া দরকার আগামী কয়েক বৎসর ধরে। এটা হওয়া দরকার শুধু পশ্চিম-বঙ্গের জন্য নয়—প্রয়োজন সমস্ত ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য।

নগর পরিকল্পনা ও শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকেই যোজনা প্রণয়নকারী সার্ব্বিক পরিকল্পনা বলে গ্রহণ করেছেন প্রচার করেছেন—অথচ কৃষি-প্রধান দেশের কৃষিকে করেছেন অবহেলা—নদীমাতৃক দেশের নদীকে করেছেন অবহেলা, পরিণামে খাদ্য ব্যাপারে ঘটেছে মর্ম্মান্তিক অভাব। ওঁরা গ্রামজীবনকে করেছেন অবজ্ঞা, এর ফলে গ্রামের ছেলেরা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে কাজের সন্ধানে। গ্রাম হয়েছে অবহেলিত কৃষিপণ্যের হয়েছে প্রাণান্তকর অভাব। দারিদ্র—বেকারী—ব্যারাম হয়েছে লোকের নিত্য সহচর। জীবন হয়েছে বঞ্চিত। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ভুল বা ত্রুটী বার বার দেখা গেছে—এঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি বলেই এঁদের ডেকে নেওয়া হয়েছে। তাহলে এই ভুল-ত্রুটীগুলি কি স্বেচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? হবেও বা। আমাদের ধারণা দেশাত্মবোধ ও সমাজচেতনার অভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণের কর্তাব্যক্তিদের সততা ও কর্ম্মনিষ্ঠার অভাব দেখা দিয়েছে। তার ফলে কোথাও পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হয়ে ওঠেনি। সকলে মিলেমিশেই যেন সরকারী অর্থ—জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছেন বছরের পর বছর। আর ঐ সার্ব্বিক ক্ষতি পরিবেশে দেশের সম্পদের উপর কঠোর আঘাত হানে আর হানছে।

পরিণামে মানুষের আশাভঙ্গ হয়, মনে নৈরাশ্য আসে। তাই মানুষের আস্থার ভাবকে ফিরিয়ে আনার জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবানুগ রূপায়ণ মিতব্যয়িতা আর নিষ্ঠা সর্ব্বোপরি সমাজ কল্যাণ বোধ। মুদ্রামূল্য হ্রাস করার ফলেই জাতীয় আর্থিক অবস্থা আজ এইত ভয়াবহ।

এই নিদারুণ অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে এলোপাতাড়ি ভাবে বন্ধ কল-কারখানা খুললেই চলবে না। এতে আপাততঃ বেকার লোকদের বা কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের কর্ম্মসংস্থান হবে বটে কিন্তু পরিশেষে দেখা যাবে বহুক্ষেত্রেই হয়েছে অর্থের অপচয়। কারণ ঐ সমস্ত কল-কারখানার বেশীর ভাগই অতি পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে গড়া—উৎপাদনের মান বহুনিম্নে—অনেকদিন যাবৎ লোকসানেই চলছে। কোথায়ও অসাধু পরিচালনা—কোথায়ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চাৎঅপসারণ। কাজেই ঐগুলি খোলার আয়োজন করার আগে, অর্থ দাদনের পূর্ব্বে পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থা ভালভাবে বিচার করে দেখতে হবে এবং সেখানে অর্থলগ্নী হলে বাঙ্গালী ছেলেদের চাকুরী হবে আর উৎপাদন ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষে দাঁড়াতে পারবে শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গাতেই অর্থ বিনিয়োগ করা বিধেয়।

এই বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। শ্রম নিবিড় নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা শুরু করা প্রয়োজন। এই সর্ব্বনাশের হাত থেকে মুক্তির জন্য কিছু কিছু স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা এখনই হাতে নিতে পারলে কিছু তরুণ কাজ পেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে হাজা-মজা বিল, জলাশয়, নদী-নালা ও পুকুরগুলির সংস্কার সাধন করে মাছের নিবিড় চাষ করা যেতে পারে এবং তাকে ঘিরে Poultry ইত্যাদি অন্যান্য সহযোগী আরো কুটিরশিল্প সৃষ্টি হতে পারে ও কয়েক লক্ষ বেকার বিশেষত গ্রাম্য বেকারের স্থায়ী কর্ম্মলাভ হতে পারে ও দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এসমস্ত কাজে বুদ্ধি ও নিষ্ঠার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানের অনুর্ব্বর জমিতে গভীর নলকূপ বসিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলে দুর্ভিক্ষপীড়িত ঐ এলাকাগুলির লোকেদের কাজের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে ও খাদ্য উৎপাদনের অবস্থা বেশ কিছু উন্নত হতে পারে। এমনি করে বহু জায়গাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের ব্যবস্থা করে উপযুক্ত জলসেচের জলের জোগান দিয়ে কৃষিপণ্যের ফলন ও জোগান বাড়ানো যাবে। হ্যাঁ—কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার অনেক অনেক কিছু করেছেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু চাষীর চাহিদা মেটাতে পারেননি—পারেননি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে, উৎপাদন বাড়াতে। আবাদযোগ্য জমির অভাব, লোকসংখ্যার চাপে ও নূতন কল-কারখানার প্রয়োজনে জমি আরো কমেছে। যেটুকু আছে তার বেশীর ভাগই নষ্ট হয় খরায় বা বন্যায়। কিন্তু সরকার নদী শাসনের ব্যবস্থা করেন নি। বাঁধ যা বেঁধেছেন তাও নাকি কোন এক অজ্ঞাত কারণে লোকের দুর্গতি বাড়াচ্ছে। অথচ এসব ব্যবস্থাই তো হয়েছে জনসাধারণের সুবিধার জন্য? লোক সরকারকে অভিশাপ দিচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট এই বন্যার জন্য। কি লজ্জার কথা, পরিতাপের কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো—শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন ও মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের দায়িত্ব কিছুমাত্র কম নয়। কারণ আমাদের ধারণা-অশান্তির মূলে এদের বিপথগামী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্য্যাবলী। কারণ এরা রাজ-নৈতিক-সর্ব্বস্ব-লোক-দলের সক্রিয় নেতা। আমাদের মতে Trade Union আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এঁরা শ্রমিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেন আর শ্রমিকেরা মূল স্বার্থকে বাদ দিয়ে কোন দলস্বার্থে নিজেদের সঙ্ঘশক্তিকে ক্ষয় করে। আর শ্রমিক স্বার্থকে করে ব্যর্থ। তার প্রতিকার হিসাবে আমরা চাই কারখানা-ভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়ন আর শিল্পভিত্তিক

কেন্দ্রিয় ইউনিয়ন। শ্রমিকদের মধ্য থেকেই ইউনিয়নের কর্মকর্তা নিয়োগ প্রয়োজন এবং এঁরা যাতে কোন রাজনৈতিক দলের খপ্পরে না পড়ে তার জন্ত সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্ত চাই শ্রমিকদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা।

আরেকটি কথা পরে বললেও জেনে রাখা ভাল যে, মালিকপক্ষের মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—তার দিনও সমাগত। এঁরা যদি সমাজ প্রয়োজনে দৃষ্টি দিতে প্রস্তুত হন এবং যুক্তিনিষ্ঠ ও ইতিহাস-সচেতন হয়ে নিজেদের মানসিকতা গঠন করে শিল্প তথা বিনিয়োগ ও উৎপাদন খাতে এঁদের অভিজ্ঞতা ব্যয় করতে প্রস্তুত হন তবে শিল্পে শান্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বন্ধ হতে সহায়তা করবে। জনসাধারণের হতাশা আর অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে দূর হবে। নিজেদের লাভ লিপ্সাকে সীমিত করে উৎপাদনভিত্তিক একটা স্বষ্ঠু সুস্থ ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের জন্ত প্রস্তুত হবে। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে অসন্তোষ চলছে আর দিন দিন বাড়ছে তার জন্ত সরকারী শিল্প-আইন ও তার আইন প্রয়োগকারী কর্মচারীরাও দায়ী। আইনে যেটুকু বিধান আছে তাও যথাযথভাবে পালিত হয় না। তার ফলে শ্রমিকেরা মনে করেন যে, আইন মালিকের পক্ষে, আর সরকারও মালিকের পক্ষে। এরকম ধারণার অবসান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আসল কথা সর্বসময়েই উৎপাদনবৃদ্ধির সমবেত প্রচেষ্টা থাকা উচিত। তাই একটা সুস্থ পরিবেশ স্থাপনের জন্ত শ্রমিক-নেতা—মালিকপক্ষ ও সরকারকে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। উৎপাদন-সীমা-সাপেক্ষ শ্রম আইনকে প্রয়োজনভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করতে হবে। আইন প্রয়োগকালে সৎ ও সতর্ক থাকতে হবে। সরকারকে হতে হবে ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ। শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বিবদমান অবস্থায় উৎপাদন ব্যাহত হয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ে ও দেশের অর্থকোষে অনটন ঘটে। শ্রমিক আর মালিক দুইয়েরই ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। মালিক পক্ষ যদি মনে করেন যে তাঁদের লগ্নীর জন্তই শ্রমিকেরা মজুরী রোজগার করছে আর শ্রমিকেরা যদি ভাবেন যে শুধু এদের শ্রমের জন্তই মালিক লাভ করছে তাহলে এদের উভয়েই ভ্রান্ত। একথা উভয়েরই উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, উৎপাদনে তিনটি শক্তি—অর্থ, প্রায়োগিক জ্ঞান ও শ্রম একত্রে ও এক তারে বাঁধা সুরের মত কাজ করে। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মতিতে ও সহযোগিতার ফলে যেমন সৃষ্টি হয় মানুষের, তেমনি আবার একে অপরের সহযোগিতা ও অসমর্থ ও নিরুৎসুক হলে সমাজের আজ কি অবস্থা হতো? তেমনি করে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধবোধ, মানসিক সাম্য ও সমঝোতার ভাব গড়ে উঠলে উৎপাদন বাড়বে—জনসাধারণের যন্ত্রণার লাঘব হবে। এখানে আরেকটি কথা বললে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আজকাল ঘন ঘন হরতাল ও বন্ধ্ জনসাধারণের কাছে বিষতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ হরতালে দিন-মজুরের দুর্গতির উপশম হয় না বরং জনসাধারণের দুর্গতি বাড়ে। নেতারা হয়তো নিজেদের প্রভাব দেখাবার জন্ত হরতাল ডাকেন—এতে এদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত কতটা সফল হয় জানি না তবে দৈনন্দিন কেনা কাটার ব্যাপারে ও আহারে জনসাধারণের যে অশেষ অসুবিধা ও কষ্ট হয় তা আমরা বুঝি। এখানে সংযমবোধের প্রয়োজন। এগুলি ভাববার কথা। একদিনের বন্ধে বা হরতালে প্রায় দশ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। আর ক্ষতির অংশীদার দেশের শোষিত জনসাধারণ। যে জনসাধারণের কল্যাণের নামে আমাদের নেতাদের বুক ফাটে। তখন দিনমজুর ও সাধারণ মানুষ অনশন, অর্দ্ধ-অনশন বা সধবার একাদশী করে দিন কাটান—অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে দ্রব্য-মূল্য বাড়িয়ে ক্রেতা-সাধারণের পকেট থেকে টাকা নিয়ে নিজেদের পকেট ভর্তি করে—তখন লাভ হয় কার? একথা আমরা ভাবব কি?

আজ শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অচিন্তনীয় সঙ্কট চলছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কোন ক্ষেত্রেই শান্তি নেই।

পড়াশুনা বন্ধ, উড়ন্ত মেজাজে ভর করে চলেছে ছেলেরা, উন্মত্তপ্রায় এদের মানসিকতা। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী পুড়ছে, মূল্যবান্ ল্যাবোরেটরী ভাঙছে, স্কন্ধচ্যুত হচ্ছে জ্ঞানী মনীষীদের মাথা। পরীক্ষা বন্ধ, পড়াশুনা উঠেছে শিকেয়—এর নাম নাকি সাংস্কৃতিক বিপ্লব। কিন্তু একাজের সঙ্গী কি সমগ্র ছাত্রসমাজ?—নিশ্চয়ই নয়। তবে এগুলি বন্ধ হয় না কেন? আগামী দিনের দুইটা যুগ নষ্ট হয়ে গেছে। এই নষ্ট হওয়া—শক্তির অপচয় আর মানবিকতার অপব্যবহার ভবিষ্যৎ সমাজের কোন্ ইঙ্গিত বহন করছে? একথা ভাবছেন কি সমাজ-দরদী নেতারা? আমাদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ছাত্র এসব কাজের সমর্থক নন। এঁরা নিরুপায় দর্শক হয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের দিনগুলি গুনছেন। যুব সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ, এঁরা এসেছে স্কুল, কলেজ থেকে এসেছে বস্তী জীবন থেকে। আজ এরা সমাজ বিদ্রোহী হয়ে গেছে—নৈতিক চরিত্রের হয়েছে বিপথগতি। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার নীরব দর্শক। আজকের ছাত্র কালকের সমাজনেতা, এমনি করেই ভবিষ্যৎ হারিয়ে বসেছেন। এ কি এক মর্মান্তিক মনোবেদনা, দারুণ যন্ত্রণা—ভুক্তভোগীরা এটা ভাল করেই উপলব্ধি করছেন।

আজকের এই ছাত্র-অসন্তোষ থেকে বাঁচতে হলে দেশের চিন্তাবিদ্‌দের ভাবতে হবে, রাস্তা খুঁজে সমাধানের পথ দেখাতে হবে। প্রকৃতির নিয়মে সমাজ বদলায়—বদলায় মানুষের মন, মেজাজ, তার ধ্যান ধারণা। তবে সে পরিবর্তনের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সঠিক পথে চালনা করে নেবার দায়িত্ব চিন্তাবিদ্ সমাজনেতাদের। সভ্যতার ও সংস্কৃতির পথ সরল নয়—সর্পিল, তবু কিন্তু ধ্যান ধারণার মৃত্যু হয় না। ধ্যান ধারণা সঞ্চিত হয়ে থাকে বিশ্বজনীন সচেতনতার মধ্যে, মূল্যবোধ বদলে যায় ধারণা অনুসারে।

আজ সব চাইতে বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের জাতীয় চরিত্রের পুনর্গঠন। তারজন্য চাই শিক্ষা—দেশের সর্বস্তরে, দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে ধনীর সংহর্ম্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে জ্ঞানের আলোক। "Without knowledge the workers are defenceless, with knowledge they are a force"—বলেছেন মহামতি লেনিন, সর্বহারার সমাজতন্ত্রের পরমপুরুষ।

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা—করার বিশেষ প্রয়োজন পাঠ্য ও পরীক্ষার নিয়মে। পাঠ্যক্রম যুগ-প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া চাই—যা ছেলেদের জীবনে কাজে লাগবে। যে শিক্ষা দেবে ছেলেদের জীবন-পথের সঠিক ইশারা। শিক্ষা হবে জীবনভিত্তিক, কিন্তু রাজনীতি-নিরপেক্ষ অথচ দেশপ্রীতি আর সমাজ-চেতনায় ভরপুর।

কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের আগে কয়েকটি কথা ভাববার আছে। কিছু ছেলে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে, অপরের পড়ায়, পরীক্ষায় বাধা দিচ্ছে। কারণ ওরা বলছে এ বুর্জোয়া শিক্ষায় কিছু হবে না। কাজেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেও, মুছে ফেল সভ্যতা আর সংস্কৃতির সব কিছু চিহ্ন। এঁরা ভেবে দেখবেন কি যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় পড়াশুনা করেই উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা দেশকে সমৃদ্ধ করেছিলেন উন্নত আর গৌরবান্বিত শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, অর্থে ও ধর্মে। করেছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহ্নি প্রজ্বলিত জনমানসের মনে—আর উচ্চারিত হয়েছিল "বন্দে মাতরম্"-এর মহামন্ত্র ডেপুটি বঙ্কিমের কণ্ঠে। পড়াশুনা না করলে জ্ঞানার্জন না হলে অজ্ঞতা দূর না হলে নিজেকে সমাজকে দেশকে না চিনলে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে সমাজকে এঁরা বাঁচাবেন কি করে? দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় গভীর করে দিতে হবে। যে যোগসূত্র আজ এঁরা হারিয়ে ফেলেছে—এদের সামনে ধরে রাখতে হবে দেশাত্মবোধের প্রেরণা, শিক্ষার মাধ্যমে দিতে হবে সমাজ-চেতনাবোধ। শিক্ষার নীতি নির্দ্ধারণ করবেন শিক্ষাবিদ্‌রা, রাজনৈতিক দলের নেতারা নন। অবশ্য দেশকে সমাজকে জানবার যে প্রেরণা তা আসবে বড়দের কাছ থেকে—অভিভাবকদের কাছ থেকে—আদর্শ শিক্ষকের

কাছ থেকে; আদর্শ সাহিত্যিক, কবি, দেশনেতাদের কাছ থেকে। আজ দেখতে হবে ত্রুটী কোথায়—শিক্ষায়? মানসিকতায়? সমাজব্যবস্থায়? নেতাদের কর্ম্মে? না কি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়? তখন ছিল তরুণদের মধ্যে আদর্শের প্রেরণা, দৃঢ় প্রত্যয়বোধ, সমাজ-চেতনা আর জাতীয় চরিত্র। আজ আমরা বড়রা হারিয়ে বসে আছি সেই চরিত্র, শ্রদ্ধা আর সেই প্রত্যয়বোধ, আর ছাত্ররা তরুণরা করছে আমাদের সেই বিপথগামিতার অনুসরণ।

আজ আমার সেই বিপ্লব পথের যাত্রী ছাত্রবন্ধুরা সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সব কিছুকে ধূয়ে মুছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা পত্তনের মরণপণ লড়াই-এ নেমেছেন, তাঁদের আমন্ত্রণ করছি—আসুন, এ ব্যাপারে মহাবিপ্লবী মার্কসীয় দর্শনের মহাসাধক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্বন্ধে কি বলেছেন একবার দেখি—লেনিন বলেছেন,—

"You can become a communist only when you enrich your mind with a knowledge of all Treasures Created by mankind. Culture is not clutched out of thin air, it is not an invention of those who call themselves experts in Proletarian Culture. That is all nonsense. Proletarian Culture must be the logical developement of the store of knowledge mankind has accumulated under the yoke of Capitaliss, Landowners and Bureaucratic Society".—

একথা স্মরণ রেখে আসুন ছাত্রবন্ধুরা, করুন আত্মহননের, হিংসা-বিদ্বেষের পথ ছেড়ে আত্ম-বিসর্জ্জনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও পরমসহিষ্ণুতার মাধ্যমে যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম; প্রতিষ্ঠিত করুন শোষণহীন মানবিক সমাজ—সকলকে প্রতিষ্ঠিত করুন মানবিক অধিকারে। সে সংগ্রামের সাথে আমরাও আছি।

দারিদ্র, বেকারী, অন্যায়, অবিচার আর শোষনের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি জাগাতে হবে বাঙ্গালীর জীবনে তরুণ সমাজকে জানাতে হবে অতীতের এবং উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের কথা, শেখাতে হবে ইতিহাস। কারণ যে জাতির অতীত নেই তার বর্ত্তমানও নেই আর ভবিষ্যতের কথা তো কোন দূর অস্ত্।

আমাদের দৃঢ় ধারণা, আমাদের বড়দের দল যদি সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম্মে শক্তি নিয়োগ করি; আচরণে, বাক্যে, আর কর্ম্মে যদি সৎ হতে পারি তা হলে আমাদের তরুণরাও আমাদের অনুসরণ করবে।

সংপ্রশাসনের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সৎ সমাজের সৎ ও সুস্থ সমাজবোধ গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য চাই একটি স্বাধীন, শিক্ষিত, নিরপেক্ষ ও ধীসম্পন্ন সমাজ। যে সমাজ গঠনের দায়িত্ব আজ যুবসমাজের। এত দারিদ্র, অত্যাচার ও অন্যায়ে পিষ্ট হয়েও বাঙ্গালার প্রাণ সত্তার অবলুপ্তি ঘটেনি। সীমান্তের ওপারে তারই আজ প্রতিধ্বনি শুনছি সত্য, নির্ভীক স্পন্দনের।

তাই আশা করছি—রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, ৺রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপধ্যায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সর্ব্বশেষ শেখ মুজিবর রহমান যে দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশের তারুণ্য শক্তি সমাজের সব অন্ধকার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সর্ব্ব শক্তি দিয়ে। আমরা বিশ্বাস করি এই তারুণ্যের মধ্যে থেকেই দেশাত্মবোধে প্রোজ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে উজ্বল, নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ তারুণ্যের প্রাণশক্তির অধিকারী এমন এক সৃজনশীল নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, যে-নেতৃত্ব শৈবশক্তির আলোকে সমগ্র দেশকে তথা সমাজকে এই চরম অবক্ষয়ের হাত থেকে উন্নত করবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি করবে। সেই অনাগত নেতৃত্বকে প্রণাম করে তার আগমন প্রতীক্ষায় আজ বসে আছি।

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এবারকার কংগ্রেসে দুর্নীতির যে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছে। কলিকাতা থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধিকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার খরচ প্রচুর। এই খরচ লাঘবের জন্য দাশ মশায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাগণ দিল্লীর সন্নিকটবর্তী সহরগুলি থেকে প্রবাসী বাঙালী সংগ্রহ করে তাদের স্বরাজ্য পার্টীর দলভুক্ত বঙ্গদেশের প্রতিনিধি বলে চালিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। প্রতিনিধি সংগ্রহের জন্য পারিতোষিক দিয়ে কয়েকজন দালাল নিযুক্ত করা হল।

একদিন সন্ধ্যার পর ডাঃ হেমচন্দ্র সান্যালের গৃহে দেখি, কাশী থেকে কতকগুলি গুণ্ডা শ্রেণীর যুবককে বিকল্প প্রতিনিধি হিসাবে আনা হয়েছে এবং তাদের স্থান দেওয়া হয়েছে ঐ গৃহের নিম্নতলায়। প্রাতঃকালে উঠে দেখা গেল বাড়ীর ছাদ মলমূত্রে পরিপূর্ণ। তথা-কথিত প্রতিনিধিরা এই দুষ্কার্য করেছে, এ সম্বন্ধে অভিযোগ করতেই তারা সমস্বরে বলে উঠল যে, এই রকম রীতিই তারা শুনে এসেছে সুতরাং অন্যায় কিছু করা হয় নি। যাই হোক, পয়সা খরচ করে ঝাড়ুদার আনিয়ে সমস্ত পরিষ্কার করা হল।

একদিন কলকাতা থেকে প্রতিনিধিদের একটা বড় দল এল, তাঁদের বাসস্থান দেওয়া হল পূর্বোল্লিখিত কলেজ হোষ্টেলে। মুসলমান প্রতিনিধিরা কেউ সেখানে গেলেন না, তাঁরা বললেন সেখানে তাঁদের খাওয়া দাওয়া এবং কথাবার্তা বলার খুব অসুবিধা হবে।

এই কলেজে প্রতিনিধিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখার জন্য যে কয়জন স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কর্মিৎকর্মা বাঙালী যুবক জনৈক মুখার্জিও ছিলেন। অতি উৎসাহী যুবক, চোস্ত উর্দ্দু বলতে পারতেন। একদিন সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী ও শামসুদ্দিন আমেদ তাঁকে বললেন—আরা উর্দ্দুমে বাতচিত করেঙ্গা, তারপর উর্দ্দুতে কথাবার্তা চলতে লাগল। মুখার্জির চোস্ত অনর্গল উর্দ্দুর সঙ্গে আমাদের বাঙালী মুসলমান ভাইরা আর পেরে উঠলেন না। অগত্যা আবার বাংলাতেই কথাবার্তা হতে লাগল।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বদিন কলেজের উঠানে বসে সুভাষচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় প্রতিনিধির তালিকা নিয়ে কি সব আলোচনা করছিলেন। আমি কাছে যেতেই সুভাষবাবু বললেন—আপনি এখানে আসবেন না। You are too good for such things.

নির্বাচিত সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, যতদূর মনে পড়ে, ১০ই তারিখে সন্ধ্যার সময় দিল্লী পৌঁছান। কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসে অনুপস্থিতির জন্য সভাপতির শোভাযাত্রা বাতিল করে দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করে বিনা আড়ম্বরে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঐ দিনই প্রাতঃকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, কোণ্ডা ভেঙ্কাটাপ্পায়া, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দিল্লীতে পৌঁছান।

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের

নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত করে তুলেছিল। সুতরাং কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্নের অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রশ্ন অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১১ই তারিখে নেতারা এক সভায় মিলিত হলেন। এই সভায় রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ অংশ গ্রহণ করলেন না, প্রধানতঃ উলেমাদের ও হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরাই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভিযোগ উত্থাপন করলেন। মৌলানা মহম্মদ আলী বললেন যে, সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন অথবা বর্তমান সময়ের একমাত্র প্রশ্নই হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের উপায় বের করা। এর জন্য চাই চিত্তশুদ্ধি, কোন প্রকার চুক্তিপত্র নয়।

তারপর উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হলেন। মৌলানা কফিতুল্লার গৃহে উলেমাদের সভা হল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঐ সভায় যোগ দিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সহ হিন্দু মহাসভার সদস্যগণ মিলিত হলেন লালা শিবনারায়ণের বাংলোয়।

লালা শিবনারায়ণের বাংলোয় একটি ঘরোয়া বৈঠকে লালাজীর সঙ্গে দেশবন্ধু দাশ সহ বাংলার কয়েকজন প্রতিনিধি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে লালাজী বললেন যে, হাকিম আজমল খাঁ বা ডাঃ আনসারী কেউই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব থেকে মুক্ত নন। তিনি বললেন মিরাট দিল্লী থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ, সাহারাণপুর মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। এঁরা সেখানে গিয়ে অনায়াসে দাঙ্গা থামাতে পারতেন তা না করে তাঁরা উভয়েই দিল্লীর বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে চিকিৎসার জন্য 'কল' আসার ওজুহাতে দিল্লীর বাইরে চলে গেলেন।

যাই হোক ১১ই তারিখে অপরাহ্ণে একটি কনফারেন্সে সকল দেশের প্রধানগণ মিলিত হলেন। সভায় উলেমা কনফারেন্সের সেক্রেটারী মৌলানা আমেদ সৈয়দ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করলেন। স্বামীজী এর প্রত্যুত্তরে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন।

পরদিন ১২ই তারিখে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হল। এদিনকার সভায় পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় চোস্ত উর্দ্দুতে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। মালবীয়জীর হিন্দী ও ইংরাজী বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এবার তাঁর উর্দ্দু বক্তৃতার মনহারিত্য উপলব্ধি করলাম।

১৩ই তারিখে অপরাহ্ণ ৩ টার অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের সময় ধার্য্য হল। এই কমিটীর সভায় আলোচ্য বিষয় বাংলা দেশের প্রতিনিধিদের বৈধতা সম্বন্ধে আলোচনা। সুতরাং প্রত্যেকটি ভোট মূল্যবান্। শরৎচন্দ্রও এই কমিটির একজন সদস্য সুতরাং তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে ধরে না আনলে নিজ থেকে তিনি আসবেন না। অতএব তাঁকে সভায় হাজির করতে দেশবন্ধু আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি একটি টাঙ্গা করে রেলের কলোনীতে শরৎবাবুর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন আরাম করে তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁকে নড়ানো দুরূহ ব্যাপার। সভার সময় আর বেশী নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে আমি তাঁকে তাগিদ দিতে লাগলাম। তিনি বললেন, অতো ব্যস্ত কেন? চা খাও, তারপর যাওয়া যাবে। অগত্যা চা পানের পর বহু খোসামোদ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সভায় উপস্থিত হলাম।

তিন টার সময় সভা আরম্ভ হলে বাংলার নো-চেঞ্জার-দের পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ বাগ্মী অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের প্রস্তাব অবৈধ বলে বাতিল করার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দীর্ঘকাল আলোচনার পর সভা মৌলানা মহম্মদ আলী, কোণ্ডা ভেঙ্কাটাপ্লায়া, ডাঃ আনসারী ও হাকিম আজমল খাঁকে নিয়ে একটি সাব কমিটী গঠন করে তার উপর এই বিষয়ে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পরদিন অর্থাৎ ১৪ই তারিখে বেলা ১০ টার সময় রিপোর্ট দাখিল করার দায়িত্ব দেওয়া হল।

এদিকে একটা ঘরোয়া বৈঠকে নো-চেঞ্জরাদের বিশিষ্ট নেতারা মিলিত হয়ে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী, বল্লভভাই প্যাটেল। ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং কোণ্ডা ভেঙ্কাটাপ্পায়া। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও তসদ্দক শেরওয়ানী উপস্থিত ছিলেন। দুঘণ্টা আলোচনার পর তাঁরা কাউনসিলে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁদের বিরুদ্ধ মতে অচল রইলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শেরওয়ানী সাহেব আপোষের কথা তুলেছিলেন তা গ্রাহ্য হল না।

ওদিকে স্বরাজ্য দলের নেতারাও নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন না। তাঁরা এক পৃথক সভায় মিলিত হলেন এবং নো-চেঞ্জাররা আপোষের প্রস্তাবে রাজি হন নি জেনে তাঁরাও তাঁদের মতে দৃঢ় রইলেন।

নির্দ্ধারিত ১৪ই তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বৈধতা সম্বন্ধে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক নিযুক্ত সাব-কমিটী স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বৈধ সাব্যস্ত করে নো-চেঞ্জারদের কমিটী বাতিল করে দিল। ফলে নো-চেঞ্জারদের নির্বাচিত, প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি, যাঁরা দিল্লীতে কংগ্রেসে যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন।

৪

২১শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩টার সময় কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদের সম্মুখস্থ মাঠে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্বাচিত করা হয়েছিল। সাধারণ অধিবেশনের জন্য যে রকম বৃহৎ প্যাণ্ডেল নির্মিত হয় এবারকার প্যাণ্ডেল তদপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল। প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল দু হাজারের কিছু উপর। দর্শকের সংখ্যাও তিন হাজারের বেশী নয়।

প্যাণ্ডেলের শোভাবর্দ্ধনের জন্য এবার কোন নেতার প্রতিকৃতি সভামণ্ডপে রাখা হয় নি। কতকগুলি পোষ্টার টাঙ্গানো ছিল তাতে এই সকল "মটো" লিখিত ছিল, "স্বাধীনতা", "মহাত্মা গান্ধীর কারা মোচন—তোমাদের কর্ত্তব্য", "আত্মোৎসর্গই স্বরাজের মূল্য।"

নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই সভামণ্ডপ পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু বাংলার প্রতিনিধিদের বৈধতা সম্বন্ধে কমিটীর রায় তখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় সভার কাজ আরম্ভ হতে দেরী হল। ২-৩০টা পর্য্যন্ত বাংলার প্রতিনিধিদের রকখানি পড়ে ছিল। অল-ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্দ্ধারিত কমিটী পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের রায় সমর্থন করার পর স্বরাজ্য পার্টীর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। বিফলমনোরথ প্রায় এক হাজার নো-চেঞ্জারদের প্রতিনিধি, প্যাণ্ডেলের বাইরেই থেকে গেলেন।

অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে প্যাণ্ডেলের বাইরে একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। ডাঃ হেমচন্দ্র সান্যালের গৃহে কাশীর যে সকল বিকল্প প্রতিনিধিদের স্থান দেওয়া হয়েছিল তাদের সংগ্রহকারক একজন দালালকে ঘিরে তারা বাদানুবাদ করছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে ব্যাপারটা কি জানতে তাদের নিকটে গিয়ে শুনলাম যে, দালাল মশায় কাশীর যুবকদের বোঝাচ্ছেন যে, প্যাণ্ডেলের ভিতরে গিয়ে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। তিনি মাত্র ২।৩ খানা টিকিট কিনেছিলেন। তিনি বললেন যে, তোমারা কয়জন ভিতরে গিয়ে দেখে এস। পরে ঐ টিকিটের বলে ক্রমে ক্রমে তোমরা সকলেই কংগ্রেস দেখতে পারবে। স্বরাজ্য দলের স্বপক্ষে রায় প্রকাশ হওয়ায় আর ভোটাভুটির বেশী গুরুত্ব নেই ভেবে এই সুযোগে

লালাল মশায় প্রতিনিধিদের কি বাবদ কিছু টাকা হজম করার চেষ্টায় ছিলেন।

২-৩০টার সময় নির্বাচিত সভাপতি মশায় শোভা-যাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ডায়াসে তাঁর আসনে উপবেশন করলেন। ডাঃ আনসারী, মোলানা মহম্মদ আলী, শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধী প্রবেশকালে বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হলেন।

সেঠ যমনালাল বাজাজ ও বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে একদল নাগপুর সত্যাগ্রহী জাতীয় পতকা সহ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে যখন প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করল তখন সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী তাদের বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করল। কিছু দেরীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রবেশ করলে তাঁকেও অনুরূপভাবে অভ্যর্থনা করা হল।

এবারকার কংগ্রেসে অনুপস্থিতকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গয়া কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক মিঃ রাজাগোপালাচারী এবং প্রবীণ দেশপ্রেমিক নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি বিজয়রাঘবাচারিয়া।

যথারীতি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারী উর্দ্দুতে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ভাষণে এতই আরবী ও পারসী শব্দ ছিল যে অধিকাংশ প্রতিনিধি তার এক বর্ণও বুঝতে পারেন নি। অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করার পরেই মাদ্রাজ, উৎকল, বার্মা (তখন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল) প্রভৃতি ব্লক থেকে "ইংলিশ", "ইংলিশ" ধ্বনি উঠতে লাগল। তা ছাড়া ডাঃ আনসারীর কণ্ঠস্বরও দুর্ব্বল। দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল না।

ডাঃ আনসারী তাঁর অভিভাষণে প্রথমে সভাপতি মশায়ের গুণাবলী কীর্তন করে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং নাগপুর সত্যাগ্রহীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলেন। তারপর তিনি অন্যান্য কথার পর বললেন যে খিলাফতের দাবি আংশিক ভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং লুসান চুক্তিপত্রে এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিন্তু এখনও জাজিরাত-উল-আর বিদেশীর অধীনে আছে। এই সকল অন্যায়ে প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বরাজ অর্জন।

অতঃপর তিনি হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ, শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন, মালাবার ও মোপলাদের কার্য্যাবলী এবং দেশের ঐক্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন।

তারপর তিনি কাউনসিল প্রবেশের প্রশ্নে কংগ্রেসে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার উল্লেখ করে বললেন যে বিবাদমান উভয় পক্ষের মধ্যে মিলনের জন্য একটা সমাধান করতেই হবে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক বিরোধ দিল্লীর এই কংগ্রেসে কবর দেওয়া হবে।

পরিশেষে তিনি কেনিয়ায় ভারতবাসীদের সমস্যার উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন যে, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কেনিয়ায় ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা দেখে মর্মাহত হয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে ভারতের দুর্দ্দশার প্রতিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্বারা হবে না।

ডাঃ আনসারী আসন গ্রহণ করার পর, সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ভাষণ দিতে উঠলেন। এঁর ভাষণ ডাঃ আনসারীর ভাষণ অপেক্ষাও দুর্ব্বোধ্য। তিনি এত বেশী আরবী ও পারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যে তা অধিকাংশ প্রতিনিধির পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি, বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও হিন্দীভাষী মধ্য প্রদেশের প্রতিনিধিরাও সভাপতি মশায়ের বক্তৃতা বুঝতে পারলেন না। অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের ত কথাই নেই।

যাই হোক, অন্যান্য কথার পর সভাপতি মশায় বললেন যে, তিন বৎসর সংশোধিত নূতন কাউনসিলে কাজ করার পরও লবণের উপর ট্যাক্স রদ না করায় এবং সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগের প্রতিশ্রুতি পালন না করায় এবং সর্বশেষে কেনিয়া সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তে মডারেটগণ মোহমুক্ত হয়েছেন এতে তিনি আনন্দিত।

সভাপতি মশায় তারপর তুরস্কের সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের উল্লেখ করলেন। তিনি জানালেন, ভারতের সাহায্যের জন্য কায়রো ও ইস্তাম্বুলে (কনষ্ট্যাণ্টিনোপোল) মহাত্মা গান্ধীর নাম সাংকেতিক চিহ্ন (watch word) হিসাবে গণ্য হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে খিলাফৎ আন্দোলনে সাহায্য মহাত্মা গান্ধীর ভারতে সব চেয়ে বড় কাজ এবং তুরস্কের বাইরে তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য যদি কেউ ধন্যবাদের পাত্র বলে গণ্য হন তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে মহাত্মা গান্ধী।

সভাপতি মশায় তারপর পৃথিবীর নানা স্থানের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তারিত বললেন।

তারপর তিনি জাতীয় সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনের গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

সভাপতি মশায় এরপর কাউনসিল প্রবেশের প্রশ্নে মতদ্বৈধের বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, কাউনসিল প্রবেশের প্রশ্নে এত শক্তি নষ্ট হয়েছে, যেন এর উপরেই জাতীয় সংগ্রামের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, যদি গয়া কংগ্রেসের পর তাঁরা একতাবদ্ধ থাকতেন এবং বর্তমান বৎসর কাউনসিল প্রবেশের প্রশ্নে নষ্ট না করতেন তা হলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে ফাটল দেখা দিত না।

এরপর তিনি আইন অমান্য সম্বন্ধে বললেন যে, মহাত্মা গান্ধী ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতা একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বেই অর্জন করা যাবে। আইন অমান্য একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যাপার। যদিও আপাততঃ তাঁরা আইন অমান্য না করেন, তাঁদের আত্মরক্ষার্থ আইন অমান্যের উপর বিশ্বাস রাখা কর্তব্য এবং সময় উপস্থিত হলে ঐ আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

তিনি কাউনসিলে প্রবেশ সম্বন্ধে বললেন যে, যদি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কাউনসিল প্রবেশের বিরুদ্ধে হয় তা হলে তা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে, কারণ প্রশ্নটা এমন শ্রেণীর নয় যার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করাও সঙ্গত হবে।

উলেমাদের সম্বন্ধে তিনি আশ্বাস দিলেন যে, যদি কংগ্রেস কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হলে তাদের কোন আপত্তির কারণ থাকবে না।

সভাপতি মশায় তারপর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করলেন যে, যখন ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন, যখন সমস্ত জগৎ তাঁদের স্বাধীনতার কাহিনী শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে, ভারত তখন দাসমনোভাব জনিত নির্লজ্জতা এবং দাঙ্গার কাহিনী রচনা করছে। স্বরাজ ও খিলাফতের পরিবর্তে এক এক জিগীর শোনা যাচ্ছে—"মুসলমানের হাত থেকে হিন্দুকে বাঁচাও" এবং "হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানকে বাঁচাও।" তিনি সকলের নিকট ভগবানের নামে প্রার্থনা করলেন যাতে তাঁরা এখন এখানেই স্থির করেন,—ভারত তার স্বাধীনতার আশা আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করবে, না সেই আকাঙ্ক্ষাকে সাহারানপুর আগ্রার রক্তরঞ্জিত মৃত্তিকায় কবরস্থ করবে।

তিনি বর্তমান সময়ে হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।

সভাপতি মশায় তারপর মূলতানে মুসলমানদের অমানুষিক কর্মের তীব্র নিন্দা করলেন এবং অবিলম্বে জাতীয় কল্যাণ এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি ন্যাশনাল প্যাক্ট (জাতীয় চুক্তি) করতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, উভয় সম্প্রদায় থেকে সদস্য নির্বাচন করে আগামী কংগ্রেসে দাখিল করার জন্য একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে একটি সিলেক্ট কমিটি নির্বাচন করা কর্তব্য।

পরিশেষে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের নিকট একযোগে কাজ করার জন্য আবেদন জানিয়ে তাঁর অভিভাষণ সমাপ্ত করলেন।

তারপর সভাপতির নির্দেশে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গোপালকৃষ্ণ যাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিতে অসমর্থ হয়ে শুভেচ্ছামূলক বার্তা প্রেরণ করেছেন তাঁদের নাম পড়ে শোনালেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—বিজয়রাঘবাচারিয়া, শেষাদ্রি আয়ার, শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট, রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্বাস্ত শঙ্করণ নায়ার, জি এম, ভুরগুরি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শেঠ ছোটানী।

একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সেদিনের মত অধিবেশনের কার্য্য শেষ হল।

নাট্যরীতি

ধীরেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, রূপসজ্জা, ইন্দ্রজাল, আলো, কৃত্রিম শব্দ, বক্তৃতা, এই সমস্ত কলা-কৌশল মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চাভিনয়। একত্রে এত কলার সমন্বয় আছে বলেই মঞ্চাভিনয় চিত্তাকর্ষক। স্থির সীমায় পূর্ণ একটি ঘটনা দেখাতে হয়, অথচ দর্শককে বোঝাতে হয় সীমাহীন স্থান ও কাল। তাঁদের মোট আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অবধি এই ধাঁধায় অভিভূত ক'রে রাখতে হয়। ঘটনাটিকে এমন ভাবে পরিবেশন করতে হয়, যেন তা বাস্তব সর্ব্বদিক দিয়ে।

অভিনয়ের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে লোকশিক্ষা। কি জাতীয়তাবোধে—কি সমাজ চরিত্রগঠনে। মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে—পরোপচিকীর্ষা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সত্যানুরাগ, সতী ধর্ম্ম, সৌহার্দ্য, পিতৃভক্তি, ভগবৎভক্তি, অভিনয়ের ভিতর দিয়ে গণমনে সংক্রামিত করাতে হয়। আবার এ্যাও দেখা যায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অভিনয়ের দ্বারা বর্ণজ্ঞান না থাকলেও গণমনে ধর্ম্ম ও ইতিহাসের জ্ঞান সহজেই সঞ্চার করা সম্ভব। সেই হেতু অভিনয়ের বইতে যে কোন দিক দিয়ে অন্ততঃ একটা আদর্শ থাকতেই হবে। অবশ্য বই-এর বিষয়বস্তু নির্বাচন ক'রতে হব দর্শকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে। দর্শকের রুচি যেমন অতি নিম্নস্তরের অভিনয়ের বই দেখিয়ে নিম্নগামী হ'তে উৎসাহিত করা সমীচীন নয়—তেমনি সমীচীন নয় ভারী বা অতি উচ্চস্তরের অভিনয়ের বই দেখিয়ে রুচিকে জোর করে উর্ধ্বগামী করাবার প্রচেষ্টা। যুগোপযোগী অভিনয়ের বই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অভিনীত হ'চ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবেও।

নামকরা পুরোনো লেখকের লেখা অভিনয়ের বই এমন অনেক আছে যেগুলি বর্ত্তমানে অচল আবার এমন পুরোনো লেখকের লেখা বইও আছে যেটা সর্ব্ব কালের। পাশ্চাত্য ভাষায় যেমন—সেক্সপীয়ার, মেটারলিঙ্ক, গেটে, চেকভ, পুশকিন, গোর্কী; বাংলা ভাষায় তেমনি—মাইকেল, গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বকালের।

অতীতে বাংলাদেশের প্রতিটি রঙ্গমঞ্চে দক্ষ অভিনেতার ও অভিনেত্রীর প্রাচুর্য্য ছিল। অধিকাংশ অভিনয়ের বই ঐ সমস্ত দক্ষ অভিনেতার প্রতি দৃষ্টি রেখে লেখা হ'ত, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের দক্ষতায় অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলতেন। আবহ সঙ্গীত, প্রতীক শব্দ, স্খলিত ঝঙ্কার, আলো, ইন্দ্রজাল, দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদির প্রাচুর্যকে মনে ক'রতেন অপ্রয়োজনীয়। ঐ সবের প্রাচুর্য্যে দর্শক কি ক'রে তাঁর দৃষ্টি অভিনেতার ওপর স্থির রাখবেন? এইটিই বোধহয় কারণ ছিল ও-সবের স্বল্প ব্যবহারের।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে যে সমস্ত যুগোপযোগী অভিনয়ের বই লেখা হচ্ছে তার বেশীর ভাগের ভিতর দেখা যায়, সবার পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। অভিনয় আর অতীতের মত শুধু গুটি তিন-চার দক্ষ অভিনেতার ওপর নির্ভর করে না। এই সহযোগিতা কেবলমাত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়, সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, সবার সহযোগিতা ছাড়া

কোন কার্য্যই সুসমাধা হয় না। এইটিই যুগধর্ম। আজকালকার অভিনয়ে শুধু অভিনয়ের বই, অভিনেতা, দৃশ্যসজ্জা, কণ্ঠসঙ্গীত এবং স্থির আলো দিয়ে চলে না। অভিনয়ের সাথে আবহ সঙ্গীত, প্রীতক শব্দ, স্খলিত ঝঙ্কার, আলোর খেলা, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিরও প্রয়োজন। সব কিছু মিলে সৃষ্টি করাতে হয় সাম্প্রতিক কালের একটি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চাভিনয়।

আবার পাশ্চাত্যদেশে আজকাল বহুস্থানে চেষ্টা চলেছে অভিনয়ের বাহ্যিক আড়ম্বর কমিয়ে আনবার। তাঁরা অভিনয়ের বই এবং অভিনেতার ওপর প্রাধান্য দিতে চাচ্ছেন বেশী। এর পেছনেও একটা যুক্তি আছে। এছাড়া আমাদের দেশেও সখের অভিনেতাদের প্রায়ই দেখা যায়, স্থানীয় লেখকের লেখা অভিনয়ের বইয়ের প্রতি অনুরাগ।

ইদানীংকালে পৃথিবী জুড়ে প্রচেষ্টা চ'লেছে অভিনয়কে আকর্ষণীয় ক'রে তোলবার এই ধরণের নানা পরীক্ষা আর নিরীক্ষা। চ'লেছে অভিনয়েতে বিভিন্ন রকমের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংযোজন। আমাদের বাংলাদেশও সে সবে পিছিয়ে নেই। কেউ চাচ্ছেন অভিনয়ে আঙ্গিকের প্রাচুর্য্য, কেউ বা চাচ্ছেন তার সবটুকুরই বিলুপ্তি। আবার বইএর অভাবই আকর্ষক না হবার মূল কারণ মনে ক'রে হ'চ্ছে বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও অনুকরণ, সৃষ্টি হ'চ্ছে ভাবপ্রধান নাটকের, পরীক্ষামূলক নাটকের আর রহস্যাভিনয়ের। কিন্তু দক্ষ অভিনেতা ছাড়া কোন পরীক্ষাতেই কি সফল হওয়া সম্ভব? আজ বাঙলায় রঙ্গমঞ্চে এঁদের অভাবটাই যেন হ'য়ে উঠেছে প্রকট। কাজেই সবার প্রথমে সু-অভিনেতা সৃষ্টি করবার পরীক্ষাতে প্রয়াসী হওয়াই উচিত।

অভিনেতাদের সম্বন্ধে অনেককিছুই বলবার বা ভাববার আছে। অপেশাদারদের থেকে পেশাদার যাঁরা তাঁদের কাছে থেকেই অভিনয় ভাল ভাবে দেখবার আশা সবাই ক'রে থাকেন। কারণ তাঁরা ভাল অভিনয় করবার চেষ্টা ক'রে থাকেন, যেহেতু বিনিময়ে তাঁরা অর্থ পান এবং এইটিই তাঁদের পেশা। অপেশাদারের কাছে যেটা মার্জ্জনীয়, পেশাদারের কাছে সেটা অমার্জ্জনীয়। কিন্তু পেশাদার ও অপেশাদার উভয়েরই অভিনয়কে চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলবার পদ্ধতিগুলিতে সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকাটাও প্রয়োজন।

মঞ্চাভিনয়কে চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে কেবল অভিনয়ের বই, দৃশ্যপট, কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি, স্খলিতঝঙ্কার ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে সু-অভিনয়ের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রক্ষা করা আবশ্যক। সু-অভিনয় সৃষ্টি ক'রতে সু-অভিনেতার প্রয়োজন। সুঅভিনেতা হ'তে গেলে অনেক কিছুই জানবার আছে, যেমন,

(১) শৃঙ্খলা।
(২) অভিনয়ের বই ও চরিত্র জ্ঞান।
(৩) মহড়া।
(৪) কণ্ঠস্বর।
(৫) ভাব।
(৬) প্রথম অভিনয় রজনী।
(৮) অভিনয়ের আইন।

নব্য অভিনেতাদের এগুলিকে মেনে চলতেই হ'বে, তাছাড়া আরও কিছু জানবার আছে। প্রথমেই অভিনেতা সাজতে যাওয়া সমীচীন নয়। ধাপে ধাপে শিক্ষা ক'রে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ ক'রতে হয়। নানা রকমের অভিনয় ও অভিনয় সম্বন্ধীয় দেশী বিদেশী বই পড়তে হয়। এই অভ্যাস জীবনে কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। তারপর নানা রকম কবিতার আবৃত্তি অভ্যাস ক'রতে হবে। এতে—তাল, সুর, গলার কাজ শিক্ষা হবে। দর্শকের রুচি এবং নিজেদের দক্ষতা বুঝে, ভাল বই অভিনয় করবার জন্য বেছে নিতে হবে। সবাই সুনাম চায়। বিশেষ ক'রে শখের নব্য অভিনেতারা। শখের অভিনেতাদের সেইজন্য সে রকমের বই, যার ভাষা ও সংলাপ কাঁচা, ঘটনার বাঁধন নেই, কোন কিছু দেখাবার বা শিখবার নেই, সেই বই অভিনয় করতে গেলে ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক।

অভিনয় শুরু ক'রতে নব্য অভিনেতাদের কর্ত্তব্য

প্রথমে গীতিনাট্য। পরে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অভিনয়। তারপর প্রহসন ও রহস্যাভিনয়। সামাজিক সবার শেষে শিখতে হয়। আবার সামাজিক ভালমত রপ্ত হ'য়ে গেলে সাহস করে ধরতে হবে বিশেষ চরিত্রকে নিয়ে লেখা অভিনয়। যেমন সেকালের বা একালের কোন দেশনেতার (সমাজসেবী, রাজনৈতিক, ধর্ম্মীয় বা শিক্ষাবিদের) চরিত্র নিয়ে লেখা বই। নিজের চরিত্রের প্রতি কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, অভিনয়ের ও মঞ্চের প্রতিটি বিষয়ের এবং কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে,—বুঝতে হবে, সবার সাথে আলোচনা ক'রতে হবে। মোট কথা মঞ্চে মেরে দেবার বাসনা যেন মনে কখনই না জাগে।

দুচারটি অভিনয় ক'রে পরিচালক হ'তে যাওয়া খুব ভুল। কারণ পরিচালক তিনিই হবেন যাঁর অভিনয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে। দৃশ্যসজ্জা, রূপ-সজ্জা, আলো, সঙ্গীত, কৃত্রিম শব্দ, অভিনয়, অভিনয়ের আইন ইত্যাদি বিষয়ে সাম্যক জ্ঞান যাঁর আছে তিনিই পরিচালনা করবার সাহস ক'রতে পারেন, অপরে নন।

"অভিনয়ের আইন ও মঞ্চের ভৌগোলিক পরিচিতি"

অভিনয়ের আইনঃ—

প্রতিটি কার্য্যেরই এক-একটি বিশেষ ধরণের প্রয়োগ পদ্ধতি বা আইন থাকে। আইনটা কি? অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বিচার-বিবেচনা ক'রে যে কার্য্যপদ্ধতি শ্রেয়ঃ ব'লে নিরূপিত হ'য়েছে, যেগুলিকে সবাই অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা ব'লে বিনা প্রশ্নে মেনে চলেন, সেইগুলিকেই সবাই ধ'রে নেন আইন বা নিয়ম ব'লে। দেখা গেছে মানলে সুফল, না মানলে কুফল। প্রশ্ন না ক'রে সেই ভাবে চ'লতে শিখলে বোঝা যাবে এর কার্য্যকারিতা। যে স্থানের নিয়ম বা আইন নিয়ে প্রশ্ন, সেই স্থানের—ভৌগোলিক পরিচিতি, আচার ব্যবহার, সবকিছু না জানা থাকলে নিজে সেখানে খাপ খাওয়াতে পারা যাবে না। অভিনয়ে স্থান, অভিনয়ের মঞ্চ। সেই মঞ্চের ভূগোল ও মানচি পূর্ব্বেই জেনে রাখতে হয়। কোন্ স্থানের কি নাম—কি জন্য বিখ্যাত—রাস্তা কোথা দিয়ে কোথায় গে—কি ভাবে হাঁটতে হবে, ব'লতে হবে ইত্যাদি পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা দেখেছি এ সমস্তই লেখ থাকে। কিন্তু মঞ্চে এগুলি কিছুই লেখা থাকে না—অথচ আছে সবই। কাল্পনিক এই সমস্ত রাস্তা ও স্থা সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান না থাকলে, আইন বা নিয়ম মে চলা অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। মহড়াকক্ষের মেঝেতে এ মানচিত্র রং দিয়ে অঙ্কন ক'রে নিলে খুব ভাল হয়।

মহড়াকক্ষের মেঝেতে আঁকা মঞ্চে কাল্পনিক রাস্তাঘাট, স্থান, সবকিছু দেখে মে গেঁথে রাখবার সুবিধা হয়। পরে কক্ষের মেঝে দাঁড়িয়ে মঞ্চের কাল্পনিক রাস্তা, স্থান, কোনটি কোথায় সবকিছু দেখে এবং মনে মনে চিন্তা ক'রে চলবার অভ্যা হ'য়ে যায়। তারপর মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেঝে দেখতে হবে না, কল্পনাতেই কাল্পনিক রাস্তাঘাট ও দাঁড়াবার কক্ষ এব কেন্দ্র বুঝে চ'লতে পারা যাবে। দেখা যাবে মহড় কক্ষের মেঝেতে যে ভাবে চলাফেরা ক'রেছেন, ঠি সেইরকম ভাবেই চ'লছেন সবাই, কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অন্ধকার ঘরে, ঘরের সবকিছু যে জানে সে স্বাভাবিক ভাবেই চলে—ভুল হয় না। কিন্তু যে জানে না কিছুই ঘরের আগে থেকে, তার চলা স্বাভাবিক হ'তে পারে না কেবল ভুল আর ভুল। কেবল চেয়ার টেবিলের সাথে আঘাত লাগছে, দরজা জানালা ঠিক পাচ্ছে না কোথায় তাই সে চ'লছে ধীরে ধীরে, অস্বাভাবিক ভাবে হাতড়াতে হাতড়াতে। বোঝা যাবে এ কক্ষে তার এই প্রথম প্রবেশ।

কতকগুলি বিষয়ের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা ক'রে চ'লতে হয়, মঞ্চের ও অভিনয়ের নিয়ম বা আইন মেনে চ'লতে। যেমন :—

(ক) মঞ্চের ভৌগোলিক পরিচিতি। Geography of stage.

(খ) ৪৫ অক্ষ। (45 Axis.)

(গ) প্রবেশ ও প্রস্থান। (Entrance and Exit.)

(ঘ) বিরাম। (Pause.)

(ঙ) দৃষ্টির ব্যাঘাত। (ঢেকে ফেলা)-Covering.)

(চ) বিন্যাস (Grouping) ও সমন্বয়। (Adjustment.)

(ছ) চলন বা গতিভঙ্গি। (Movement.)

(জ) গতির দৈর্ঘ্য। (Length of movement.) এবং কাটা গতি। (Cross.)

(ঝ) পদ ক্ষেপন (Foot work) ও আবর্তন (Turning.)

(ঞ) অঙ্গভঙ্গি। (Gesture.)

(ট) অভিনেতার সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়। (Common knowledge of an actor.)

মঞ্চের ভৌগোলিক পরিচিতি:—

অভিনয়ের মঞ্চ সাধারণতঃ তিন প্রকার:—স্থির, শকট ও ঘূর্ণায়মান। মঞ্চের মেঝেতে কাঠের তক্তা পাতা। দু'পাশে ইঁটের দেয়াল দেওয়া। দেয়াল থেকে তক্তা পর্যন্ত স্থানকে বলে—মঞ্চের "পক্ষ" (wing)। কারণ মঞ্চে ব্যবহারোপযোগী সব কিছু সবাই এই স্থানে ঢেকে রাখতে হয় প্রয়োজনীয় দৃশ্যপট দিয়ে। সামনে দর্শক ও মঞ্চের মধ্যে খোলা। দু'পাশ, ওপরে ও নীচে, ইঁটের দেয়াল বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দেওয়া। দু'দিকে দুই সাম্রাজ্য—প্রেক্ষাগার ও রঙ্গমঞ্চ। শুধুমাত্র দৃষ্টিবিনিময় চলে এপারে ওপারে—পায়ে চলাচল আইনতঃ নিষিদ্ধ। একে বলে মঞ্চের সীমান্ত (Proscenium)। পেছনে ইঁটের দেয়াল। এর ভিতরের দিকটা ধূসর ও নীল রং করা। ইচ্ছে ক'রলে আকাশ রূপে ব্যবহার করা যায় ব'লে। সীমান্তের পরই আছে পর্দা। তার পেছনে দুপাশে দুটো কাঠামো—মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং রং করা। যাতে ভিতরের আলো বাইরে যেতে না পারে। মেঝের সাথে আটকান এই কাঠামোকে বলে "পীড়ক কাঠামো" (Tormentor)। দর্শকের চোখে দৃশ্য দেখবার ব্যাঘাত ও বিরক্তিকর ব'লে—"পীড়ক"। এর সাথে ভিতরের দিকে কব্জা দিয়ে আটকান আরেকটি পীড়ক কাঠামো আছে। এই স্থান থেকে দৃশ্যসজ্জা শুরু ক'রতে হয়। এর ওপর দিকটাতে আবার একটি মোটা কাপড়ে ঢাকা রং করা কাঠামো ঝোলানো আছে—দৃশ্যপটের মাথা ঢাকবার জন্য। প্রতি দৃশ্যেই এটিকে ওঠানো নামানো করা চলে। সেইজন্য একে বলে মঞ্চের "শীর্ষ গুণ্ঠন" (Teaser)।

দর্শকের নিকটের দিকের মঞ্চের অংশকে "নীচমঞ্চ" (Down stage) এবং দূরের দিকের অংশকে "উপর মঞ্চ" (Up stage) বলে। কোন বস্তু বা অভিনেতার সামনে কেউ দাঁড়ালে, তাকে সেই বস্তু বা চরিত্রের "নীচে" (Below) এবং পেছনে থাকলে বলে "উপরে" (Above)। বাইরের দিকে থাকলে বলে—"বাহির মঞ্চ"। অভিনেতার বাঁ দিকের মঞ্চকে—"বাম মঞ্চ" এবং ডানদিকের মঞ্চকে—"দক্ষিণ মঞ্চ" বলে।

এক পীড়ক কাঠামো থেকে অপর পীড়ক কাঠামো পর্যন্ত সরলরেখাকে বলে "পীড়নরেখা" (Tormentor-line)। "পীড়নরেখা" এইজন্য যে বারে বারে পর্দা এই স্থান দিয়ে চলে দর্শকের মনকে এবং দৃষ্টিকে পীড়া দেয় ব'লে। পীড়নরেখার সমান্তরালে সীমান্ত বরাবর মঞ্চের সামনের রেখাকে বলে—"পাদপ্রদীপ"। সারিবদ্ধ আলো এই রেখার ওপর দিয়ে থাকে ব'লে—"পাদপ্রদীপ"। মঞ্চের পশ্চাৎরেখাও পীড়নরেখার সমান্তরালে। পীড়নরেখার মধ্যবিন্দু থেকে পশ্চাৎরেখার ওপর খাড়ালম্বকে বলে—"মধ্যরেখা"। মঞ্চের মধ্যস্থানকে বলে—"মঞ্চের ওপর" (On stage)।" পীড়নরেখা থেকে পশ্চাৎ রেখা পর্যন্ত মঞ্চের অংশ—অভিনেতার ডান ও বাঁকে মঞ্চের ডান ও বাম ধরা হ'য়েছে। লেখাও সেইভাবে। মঞ্চের কাল্পনিক রেখাগুলিকে (Axes) "অক্ষ" বলে। পীড়ন রেখা, মধ্যরেখা, পূর্ব্বেই জেনেছি। পশ্চাৎ রেখা, পশ্চাৎ দেয়ালের বা

দৃশ্যপটের হ'তে পারে। মঞ্চে পীড়নরেখার ওপর তিনটি চিহ্ন ক'রে রাখা ভাল। অভিনেতা বুঝতে পারেন, কোথায় মধ্যরেখা, কোথাদিয়ে খাড়া অক্ষ চ'লে গিয়েছে।

কতকগুলি কাল্পনিক রেখা দিয়ে মঞ্চকে ছয়টি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে । পীড়ন রেখার উভয়পার্শ্ব থেকে পীড়নরেখার মধ্যবিন্দু পর্য্যন্ত রেখাকে আবার সম দুইভাগে বিভক্ত ক'রে মধ্যরেখার সমান্তরালে কতকগুলি রেখা দৃশ্যপটের বা পশ্চাৎ দেয়ালের পশ্চাৎ রেখার ওপর টেনে দেওয়া আছে। এগুলিকে বলে—"খাড়া অক্ষ" (Direct Axes)। প্রধান দুটা খাড়া অক্ষ কিন্তু সৃষ্টি ক'রেছে পীড়নরেখার উভয় পার্শ্ব থেকে খাড়া অক্ষ এবং এক খাড়া অক্ষ থেকে অপর খাড়া অক্ষ সম ভাগ। মধ্যরেখার মধ্যবিন্দুতে মঞ্চের আড়াআড়িতে পীড়নরেখার সমান্তরালে একটি রেখা আছে। একে বলে—"আড়াআড়ি অক্ষ" (Transverse Axis)। এইরূপ অনেকগুলি আড়াআড়ি অক্ষ এবং খাড়া অক্ষ সমস্ত মঞ্চের ওপর আছে। প্রধানতঃ দেখা যাচ্ছে দুটি খাড়া অক্ষ, একটি আড় অক্ষ, এবং পীড়নরেখা ও পশ্চাৎরেখা মিলে মঞ্চকে ছয়টি কক্ষে (খোপে) বিভক্ত ক'রেছে। মনে রাখতে হবে পশ্চাৎ রেখা শুধু পশ্চাৎ দেয়ালেরই নয়, দৃশ্যসজ্জারও পশ্চাৎরেখা বোঝায়। সেই জন্য খোপাগুলি দৃশ্যসজ্জাতে ছোটবড় হ'তে পারে।

প্রধান আড় অক্ষ মধ্যরেখার যে বিন্দুতে ছেদ ক'রেছে তাকে বলে—মধ্যবিন্দু বা "ম" এবং প্রধান দুই খাড়া অক্ষকে যে বিন্দু দুটিতে ছেদ ক'রেছে, সেই বিন্দু দুটির মধ্যে ডাইনের টিকে—"দক্ষিণ মধ্যবিন্দু" এবং বাঁদিকেরটিকে "বাম মধ্যবিন্দু" বলে। মঞ্চে এই আড় অক্ষের দুই প্রান্তে পক্ষের ভিতর দিকে মেঝের ওপর দুটি নীল আলো রাখলে অভিনেতা বুঝতে পারেন কোথায় আড় কক্ষ। একে বলে—"মেঝে প্রদীপ" (Floor Lamp)।

এই সমস্ত স্থানের বিশেষত্ব খুব ভাল ক'রে মনে রাখতে হবে। অভিনয়কে বাস্তব ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে এগুলি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। অভিনেতার চরিত্র অনুসারে এবং ঘটনার তাৎপর্য্য অনুসারে এই সমস্ত স্থান নির্বাচন ক'রতে যেন কখনই ভুল না হয়। পূর্ব্বেই জেনেছি মঞ্চের কক্ষগুলির (খোপ) সৃষ্টি হ'য়েছে দুটি খাড়া অক্ষ, একটি আড়াআড়ি অক্ষ এবং পীড়নরেখা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছয়টি খোপ হ'য়েছে। অভিনেতার ডান ও বাঁকে ধ'রে খোপের নাম। মোটামুটি খোপগুলির অবস্থান ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা গেল :—

মঞ্চের কক্ষ ও বিভিন্ন স্থানের সংক্ষেপ নাম খুব ভাল ক'রে অভিনেতার মনে রাখতে হবে। কারণ এগুলি অভিনেতার ভূমিকাপত্রে লেখবার যেমন সুবিধা তেমনি সুবিধা পরিচালকেরও, অল্প কথায় বোঝাতে।
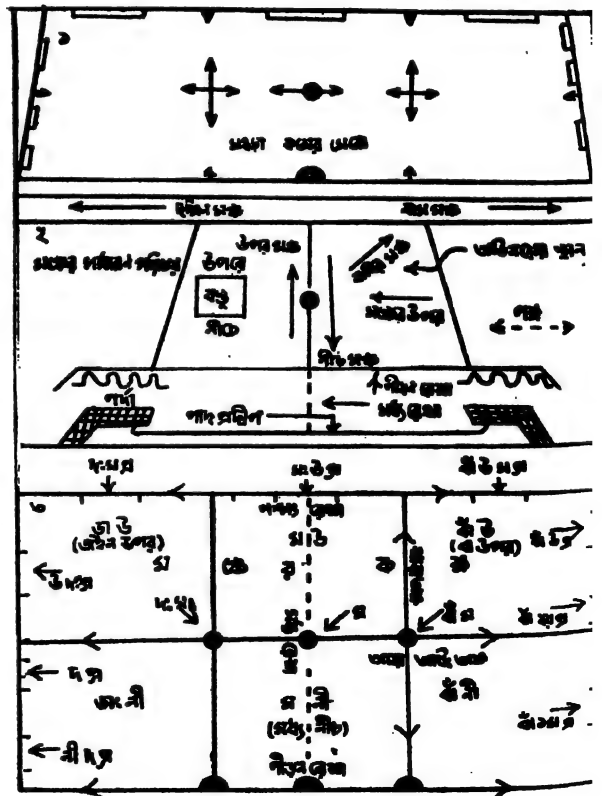
বাম উপর মঞ্চ।—এই স্থান দর্শক থেকে দূরে। কোমল (বাঁ, উ) কিন্তু দুর্ব্বল। সাধারণতঃ কম উল্লেখ-যোগ্য দৃশ্য এই স্থানে হয়। কোন ভয়াবহ, ঐশ্বরিক, অপার্থিব ভাব প্রকাশের স্থান।

ডাইন উপর মঞ্চ।—প্রায় বাঁ, উর মত। তবে শক্তিশালী (ডা, উ) স্থান। কিন্তু বাঁ, উর মত ভয়াবহ বা ভৌতিক নয়। সাধারণ দৃশ্য এখানে চলে।

ডাইন নীচ মঞ্চ।—উত্তেজক, শক্তিশালী এবং চট্ ক'রে (ডা, নী) দৃষ্টি পড়বার মত স্থান। গভীর প্রেম, মনুষ্যত্ব ও দরদ পূর্ণ ভাব প্রকাশের উপযুক্ত স্থান।

বাম নীচ মঞ্চ।—ডা, নীর মতই, তবে দুর্ব্বল ও নরম (বাঁ নী) বেশী। সাধারণ প্রেমের স্থান। কিন্তু বিশেষ ক'রে এই স্থানে চলে—অপ প্রচার, পরনিন্দা, হিংসা ও ষড়যন্ত্র।

মধ্য উপর মঞ্চ।—দূরে, কোমল, কিন্তু শক্তিশালী। (ম, উ) যে দৃশ্য শেষ হবে দর্শকের সামনে তার শুরু এইস্থান থেকে ক'রতে হয়।

মধ্য নীচ মঞ্চ।—শক্তিশালী, কোমল, উদার (উদ্দেশ্য (ম, নী) পূর্ণ বাক্যে বা ঘটনায়)। যে দৃশ্যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চরমসীমায়, কেবলমাত্র সেই চরম সীমার মুহূর্ত্তের জন্য এইস্থান একান্ত ভাবে সংরক্ষিত। ভা-- অভিনেতারা অনেকসময়ই এইস্থান ব্যবহার ক'রতে চান—খুব ভুল সেটা। সেই দৃশ্যেই ঐ স্থান থেকে সরে এসে পুনরায় অভিনয়ের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে যাওয়াও দুষ্কর, আবার সরে যেতেই উপর মঞ্চে আবর্ত্তন নিতে হয়। তখনই পূর্ব্বে ঐ স্থানে যাবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

আমরা লেখাপড়া করি বাঁদিক থেকে ডান দিকে। মন ও চোখ সেইভাবে বুঝতে ও দেখতে শিখেছে। তাই দর্শক তাঁর বাঁদিকটা যত ভাল ক'রে মন দিয়ে দেখেন, ডানদিকটা তত নয়। মোটামুটি খোপগুলি সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রাখা ভাল যে—অভিনেতার ডান এবং দর্শকের বাঁ, অভিনেতার বাঁ এবং দর্শকের ডানদিকের থেকে অনেকবেশী শক্তিশালী।

রজনীকান্তের কল্যাণী

শৈলেনকুমার দত্ত

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) বাংলা সাহিত্যে একটি বিস্মৃত-প্রায় নাম। তাঁর মোট আটখানি কাব্য-গ্রন্থের অজস্র কবিতা এবং গানের মধ্যে মাত্র দু তিনটি গান—'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে', 'সেথা আমি কি গাহিব গান?', বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' প্রভৃতি এবং কয়েকটি নীতিকবিতা 'সার্থকতা' (মহাবীর শিখ এক পথ বাহে যায়), 'বৃথাদর্প' (নর কহে ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে) ও 'স্বাধীনতার সুখ' (বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই)—এই কটি রচনা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নীতি ও গীতি কবিতাই প্রায় বিস্মৃতির অতলে। অথচ রজনীকান্ত একজন সার্থক গীতিকবি ছিলেন। তাঁর গান এক সময়ে বাঙালীর বিশেষ প্রিয় ছিল। জন্মশত-বার্ষিকীর দোহাই দিয়ে গত কয়েক বছরে তাঁর কাব্য-গ্রন্থের কিছু বিক্রি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাহিত্য আলোচনা এবং কাব্য মূল্যায়নে কোন হের-ফের হয়নি।

রজনীকান্ত আজ তাঁর যথোচিত সমাদর থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাণী' (১৯০২) ও 'কল্যাণী' (১৯০৫) একসময়ে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। বাণী গ্রন্থের গীতি কবিতাগুলি তাঁকে যেমন পরিচিতি দিয়েছে, কল্যাণী গ্রন্থের কবিতাগুলি তেমনি তাঁকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক সময়ে বাণী-কল্যাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা রজনীকান্তের নামও প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ত।

কাব্যমূল্যের বিচারে বাণী উৎকৃষ্ট হলেও 'কল্যাণী' রজনীকান্তের অপেক্ষাকৃত পরিণত সৃষ্টি। সে কারণে কল্যাণীর গীতগুলি ভগবৎ-প্রেমের আত্মসমর্পণ চিন্তায় স্থিরনিষ্ঠ। প্রায় প্রৌঢ় বয়সের একটা ম্লান ধূসর আত্মিক চিন্তা কবিকে যেন নিবিড় ঐশ্বরিক প্রেমে বেঁধে রেখেছে।

কবি হিসেবে রজনীকান্তের দুটি পৃথক সত্তা ছিল—একটি প্রেমিকের, অপরটি রসিকের। আর অনিবার্য-ভাবে প্রেমিক সত্তায় যেমন রবীন্দ্রনাথের ছাপ দেখা যায়, রসিক সত্তায় তেমনি ছাপ দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের। কিন্তু সমসাময়িক দুই কবির প্রভাব থাকলেও রজনী-কান্তের কাব্যাবলীর স্বকীয়তা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

কল্যাণী কাব্যের কবিতাগুলি ভক্তি ও রজরসে সিঞ্চিত হলেও এ কাব্যের প্রতিটি গীতই কবির আত্মিক অনুভূতি এবং সুমধুর পদ-ব্যঞ্জনায় উৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে।

কল্যাণী কাব্যের ভক্তিরসের প্রতিটি গীত ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের আর্তিতে বেদনামধুর। এই মরজগতের বহু উর্ধ্বে যিনি এই বিশ্বচরাচরকে চালনা করছেন, যিনি সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, বেদনা-সুখানুভূতির সত্যিকারের নিয়ন্তা—সেই ঈশ্বরকেই তো তিনি প্রার্থনা করেছেন। তাঁর কাছেই তো কবির আত্মনিবেদন। তিনি যে সর্বব্যাপী, তাই তাঁর প্রেম কবি সর্বব্যাপ্ত দেখতে পেয়েছেন। তিনি যে বিচিত্ররূপী

সর্বত্রবিরাজী সেটি উপলব্ধি করতে পেরে কবি বলেছেন—

কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে!
মত্ত এ চিত্ত তবু, তর্ক বিচারে।
নিত্য নিয়তি বলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্যাম-বিটপী দলে, সুরসাল ফুল ফলে।

(অস্তি)

তিনি সর্বত্রবিরাজী বলেই তো তিনি বিচিত্ররূপী, বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন রূপ নেন ; অথচ সব রূপের ওপরে তাঁর সেই প্রেমময় রূপই উদ্ভাসিত—

সাধুর চিত্তে তুমি আনন্দরূপে রাজ,
ভীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে ;
প্রেমরূপে জাগ সতীর হিয়ামাঝে,
স্নেহরূপে জাগ জননী-নয়ানে।
প্রীতিরূপে থাক প্রেমিক-প্রাণে সখা,
যোগি-চিত্তে চির উজল-আলোক ;
অনুতপ্ত প্রাণে ভরসারূপে জাগ,
সান্ত্বনারূপে এস যথা দুখশোক।

(ভুল)

এই প্রেমময় মূর্তিই হল কবির আরাধ্য দেবতা। পত্রে-পুষ্পে, হৃদয়ে-অনুভূতিতে তিনি একাকার হয়ে আছেন। অথচ তিনি অসীম, অনন্ত, বিরাট। তাঁর স্বরূপ নেই বলেই তো তিনি অপরূপ, আর এই আপামর জগৎই হল তাঁর বিশ্বরূপের প্রকাশ—

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন, মনোরঞ্জন, দুঃখহারী ;
চিত্ত-নন্দন, জগবন্দন, ভব-বন্ধন-বারি ;
সর্বমূরতি আকৃতিহীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন ;
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু, চিত্তবিহারী।

(আমার দেবতা)

এই চিত্ত-বিহারীই হলেন কবির উপাস্য দেবতা। তাঁর এই বিরাটত্ব কবি যেমন দেখতে পেয়েছেন—

তুমি অন্তহীন, বিরাট এ নিখিলব্যাপী
অচ্যুত-অক্ষর।

(তুমি ও আমি)

তেমনি অনুভব করতে পেরেছেন তুলনামূলকভাবে নিজের ক্ষুদ্রত্ব। তাই উপাসনা করতে গিয়ে, হৃদয়ের সঙ্গীত নিবেদনের চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর সংশয় জেগেছে—

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার ?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?

(ভক্তিধারা

কিন্তু পরমুহূর্তে তাঁর মন কঠিন হয়েছে। তিনি তো চিত্ত-বিহারী, তবে কেন কবির এ ডাক তি[illegible] শুনতে পাবেন না। নিশ্চয়ই পাবেন। কবির অন্ত[illegible] তাই বিশ্বাস জেগেছে—

আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আমি হৃদে বাঁধি হে ;
তাই ব'লে ডাকি, প্রান যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়োয়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভরে যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে।

(বিশ্বাস

হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র চিন্তায় সঙ্গীতগুলি একটি মধুর গীতি-কবিতার ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কল্যাণী কাব্যে কবি যেন নিজেকে সেই বিশ্বরূপের পদতলে নিবেদন করে অনুভব করতে পেরেছেন যে, পরম শান্তি এই আত্ম-নিবেদনই। কেন না তাঁর প্রেমরসেই তো এ মরজগৎ সঞ্চরণশীল ; কবি তাই স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছেন—

নিজ বলে বলী হয়া, বিফল কেবলি,
তব বলে বলী হ'লে তবে বলি বলী ;
আমি ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে, ফিরেছি তোমারি
দিকে,
(মোরে) কাঁদাইয়া, ধুয়ে লহ নয়ন-জলে।

(শরণাগত)

বাংলা গীতি-কবিতার ভাণ্ডারে রজনীকান্তের এসব ছত্রগুলি অমূল্য সম্পদ্। একটি নিটোল অশ্রুবিন্দুর মত জমাট হয়ে আছে। কল্যাণী কাব্যের কবিতাগুলি

সৌদিক থেকে যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি সাবলীল ব্যঞ্জনায় সুমধুর।

ভক্তিমূলক গানে রজনীকান্তের সমধিক প্রসিদ্ধি হলেও, প্রথম জীবনেই তিনি হাস্যরসাত্মক রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমরা ও তোমরা' হাস্যরসাত্মক কবিতার প্রভাবে রজনীকান্ত প্রথম যে হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করেন, সেটি হল 'তোমরা ও আমরা'। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব রজনীকান্তকে কিরূপ প্রভাবিত করে, তা তাঁর এই পর্যায়ের কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত কবিতা 'বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই' রজনীকান্তকে এত প্রভাবিত করে যে, কান্তকবি এই একটি কবিতার অনুসরণে ছ'টি কবিতা রচনা করেন। তার মধ্যে চারটি কবিতা কল্যাণী কাব্যের অন্তর্গত। ছন্দ এবং বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব থাকলেও চিন্তাধারা এবং সুষ্ঠু বর্ণনায় যে এই কবিতাগুলি স্বতন্ত্র, সে কথা বলাই বাহুল্য।

রজনীকান্তের এই হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলিতে কোথাও কোন বিদ্বেষ বা আক্রমণ নেই। নির্মল হাস্যরসের কবিতা এগুলি। হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনায় যে বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী—সেটি কান্তকবির আয়ত্তে ছিল। দু'-একটি ছত্র তুলে ধরা যেতে পারে—

এক ভূতপূর্বী বিগত-যৌবন পুরুষ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> ছিল, দেহের বাহার কি।
> সোনার কার্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি;
> এখন, হাড়ের উপর চাম্‌ড়া আছে, মাংস গেছে উড়ে।
>
> (অসময়)

অন্যত্রও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে রচিত চরিত্রচিত্রগুলি যেমন নিখুঁত, স্বাভাবিক, তেমনি হাস্যরসাত্মক। উদাহরণ স্বরূপ—

> (ক) আমাদের রুজি, এ পৈতেগাছি,
> রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
> আর, তালতলা চটি পেন্‌সন দিয়ে,
> ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।
>
> (পুরোহিত)
>
> (খ) আমাদের, মানা কারো সনে মিশতে,
> আমরা, দক্ষ কলম পিষতে
> ঐ এগারটা থেকে ছ'টা ব'সে লিখি,
> কাগজ দিস্তে দিস্তে।
>
> (দেওয়ানী হাকিম)
>
> (গ) আর ঐ মফঃস্বলে গেলে,
> বেশ বড় বড় ডালা মেলে,
> আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
> ডেপুটিটা ঘুষ খেলে।
>
> (ডেপুটী)
>
> (ঘ) আমরা, বাদীকেও বলি "হ্যালো,
> তোমার, মামলা তো অতি ভালো।"
> আবার প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেখো,
> কত টাকা দেবে, ক্যালো।"
>
> (উকিল)

রজনীকান্তের হাস্যরসাত্মক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাব বিস্তার করেছেন শুধু বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গীতে; বস্তু-চিন্তায় রজনীকান্ত স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন সর্বত্র।

রঙ্গরসে রজনীকান্ত যে রসিক ছিলেন তার প্রমাণ কল্যাণী কাব্যে বেশ কয়েকটি কাহিনী-আশ্রিত কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' কবিতায় স্বামী ও দ্বিতীয়া পত্নীর কথোপকথন, 'বুড়ো বাঙ্গাল' কবিতায় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি উক্তি, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর' কবিতায় উভয়ের কথাবার্তা বিশুদ্ধ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত। এ-ছাড়া তাঁর বাঙ্গাল পর্যায়ের কবিতাগুলি (বাঙ্গালের শ্যামা-সঙ্গীত, বাঙ্গালের বৈরাগ্য) 'ঔদরিক', খিচুড়ী' প্রভৃতি কবিতাও বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক এবং রসোত্তীর্ণ।

কান্তকবির হাস্যরসাশ্রিত কবিতাগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে উল্লেখনীয়, সেটি হল নিখুঁত চিত্রণ। কাজ নেই অথচ সময় কাটানো চাই—কিন্তু কি করে সময়

কাটানো যায়। কবি একটা পথ বাতলেছেন। সময় কাটানো আর বিতাগর্ন একই সঙ্গে সম্ভব। তাই মস্তিষ্ককে ব্যস্ত করা চাই—

আকবর শাহা কাছা দিত কিনা,
নুরজাহানের কটা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,

(পুরাতত্ত্ববিৎ)

এই সমস্ত প্রশ্নের চিন্তায়।

কবি তাঁর চিত্তবিনোদনের স্বাভাবিক রাস্তাটি বড় চমৎকার বলেছেন 'তামাক' কবিতায়। তামাকে যখন কবির মন মজে তখন 'ভুবন হয় সুধাময়'। তাঁর সার্থক বর্ণনায় বিশুদ্ধ হাস্যরসের নজীর আছে—

বুদ্ধির গোড়ায়, তোমার ধোঁয়া না পৌঁছিলে,
বেরোয় নাক' মুসোবিদ্দা, কি মুস্কিল এ।
Idiom না জাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালী Problem-এর উদ্ধার শক্ত হয়।

(তামাক)

সামাজিক অব্যবস্থা এবং চারিত্রিক ভীরুতা দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় কান্তকবিকেও ব্যথা দিয়েছিল। কাগজে যুদ্ধের সংবাদ-পাঠে ভীত পুরুষের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি যেন কিছুটা বেদনার অশ্রুপাতও করেছেন—

শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে,
বহুত মিলে যাবে, প্রাণটা বেঁচে গেলে।

(বুয়ার যুদ্ধ)

কিংবা নব্য বাঙালী তরুণের বাহ্যিক আড়ম্বরের আতিশয্যে তিনি যেন ক্রন্দন করেছেন—

এমন, বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে?
এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চস্‌মা ধরেছে;
আর, টেরি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া
আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না যাদুর খাওয়া।

(মৌতাত)

এ বর্ণনায় কোথাও বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই, আছে অনাবিল হাস্যরসের মোড়কে বেদনার অশ্রুধারা।

ভক্তি এবং রঙ্গরসের এমন আশ্চর্য-সার্থক কবি হয়েও রজনীকান্ত আজ বিস্মৃত-প্রায়। এটা যে আমাদেরই অবহেলার ফল—অপ্রিয় হলেও, সত্যভাষণের দোহাই দিয়েই সে-কথা বলতে হয়।

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জয়ন্তী দেশে ফেরবার জন্য ব্যস্ত।

আহ্‌মেদাবাদে পৌঁছতেই সে নোটবুক থেকে অবিনাশের বাড়ীর ঠিকানা দেখে নিলো। কোন সঠিক খবর না দিয়েই সে এসেছে,—ঘুরতে ঘুরতে ঠিক রাস্তাতেই এসে দাঁড়ালো। রাস্তার শেষ প্রান্তে অতি মনোরম একটি সাদা দোতলা বাড়ী দেখতে পেলো। ছোট, কিন্তু ভারী সুন্দর। বাগানের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দেখল বাড়ীখানা সবেমাত্র রঙ্ করা হয়েছে। পর্দাগুলিও একেবারে নূতন। একটি অল্প বয়স্ক মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সম্ভাষণ জানালো।

'তুমি নিশ্চয় জয়ন্তী? এসো।'

'বাড়ী খুঁজে নিলাম—কোন অসুবিধা হয়নি। তুমিই তো অবিনাশের ছোট বোন?'

'হ্যাঁ আমার নাম আশা। তোমার জন্য কদিন ধরেই অপেক্ষা করছি।' প্রীতির সহিত জয়ন্তীর হাত ধরে আশা তাকে উপরে নিয়ে গেল। বাড়ীখানা ছোটর মধ্যে অতি শ্রী ও স্নিগ্ধ। দু'টি তিনটি শিশু এদিক ওদিক থেকে উঁকি দিচ্ছিল—আশা জয়ন্তীকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাল। জানালা খুলে দিতেই সবরমতী নদী দেখা যায়। ঢেউগুলি যেন তাল রেখে রেখে আসছে আর যাচ্ছে, জয়ন্তীর এ দৃশ্য বড় ভাল লাগল। মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে শীলা গান গাইত—

'মুগ্ধ অলসে গণি একা বসে
পলাতকা যত ঢেউ
যারা চলে যায় ফেরে না তো হায়
পিছু পানে আর কেউ।
মনে জানি কারও নাগাল পাব না
তবু যদি মোর উদাসী ভাবনা…'

জয়ন্তীর পীড়িত মনের আজ অদ্ভুত পরিবর্তন হ'ল—কী এক অপূর্ব স্মৃতি তার বুকে চিরে বেরিয়ে এল—ছোট বেলার কথা মনে পড়তে লাগল কেবল। আহা এতদিন যদি এই মন নিয়ে ঘুরতে পারতো। বিশাল পাথরের বোঝা এতদিন কেন এইভাবে নেমে যায় নি? কোন্ দুরন্ত পিশাচের অত্যাচারে তার হৃদয় মন তিক্ত হয়েছিল? আরোগ্য লাভ করবে কি সে? প্রীতি ভালবাসার প্রতিমূর্তি সে ছিল না কি কোনদিন? তার শৈশব ও যৌবনের উচ্ছ্বাস ও আবেগের মধ্যে যে মধুর স্বাদ সে পেয়েছিল তা এমন বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল কেমন করে? ঐ ভীষণ নির্মম শত্রুকে সে চিনতে পেরেছে, তাকে সে আজ বিনাশ করতে পারবে। নিজের মনের মধ্যেই সে কারাগারের সৃষ্টি করেছিল, করেছিল, শুধু বিদ্বেষ, দর্প, অবসাদ পুষে পুষে রেখেছিল—যেন এক একটি হিংস্র পশু। কারাগারের দরজা আজ ভেঙে গেছে—এখন শুধু ভয়কে তাড়াতে হবে। বাস্তবকে লাভ করতে হলে জগতের সত্য মিথ্যা উভয়কেই জয়

করতে হয়—সেই বিশ্বাস আজ সত্য হল কি ? কত কালের সুখের স্মৃতিগুলি এক এক করে সম্মুখে এসে পড়ল—নদীর ঢেউ-এর মৃদু গতির দিকে চেয়ে এক মনে জয়তী বসে ছিল। প্রায় বেলা ১২টায় আশা উপরে উঠে এল। জয়তীর সঙ্গে বসে সে নানান গল্প করে—ছেলেমেয়েরা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমুতে গেলে—আশা অবসর পায়।

অবিনাশ গেট্ খুলে বাগানে ঢুকছে। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতেই সামনে কাউকেই দেখতে পেলো না—অন্যদিন আশা নিচেই থাকে। তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল—

'বাড়ীতে কেউ নেই নাকি ?' দুপুর রোদে মেজাজ তার চড়ে গিয়েছে। ক্লান্ত অবস্থায় অবিনাশ সিঁড়ি উঠে আসতেই আশার গলার স্বর শুনতে পেলো। কোণার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার বলল—

'এত নিরিবিলি চারিদিক, ব্যাপার কি ?' কয়েক পা যেতেই দেখলো কোণার ঘরের দরজা খোলা—জয়তী ও আশা বসে আছে।

'না জানিয়েই এসেছি দেখো, ভেবেছিলাম একটু চমকে দেব।' বলে জয়তী এগিয়ে এল।

আশার ছেলে নিচের ঘরে ভীষণ কান্না জুড়ে দিতে আশার আর কিছু বলা হ'ল না—সে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গেল। অবিনাশ মুহূর্তের জন্য সবই ভুলে গিয়ে জয়তীকে ধরে বসাল। জয়তী নিজেকে মুক্ত করে নিতে অবিনাশ বলল—

'জয়তী, সত্যি এলে তাহলে ? আজ তোমায় একটা কথা বলতে দাও—এই বাড়ীতে তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম—এই ভাবেই, হঠাৎই।'

অবিনাশের মুখে জয়তী কদাচিৎ আবেগের ভাষা শুনেছে—সে কি রকম যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল—কিন্তু বিশ্বাস করল, সে গভীর আবেগের বশেই কথাগুলি বলছে।

'আমি তোমায় দেখবার জন্য আকুল হয়েছিলাম অবিনাশ।' জয়তীর চোখে জল এলো। এগিয়ে গিয়ে অবিনাশের হাতে নিজের হাতটি রাখল। অবিনাশ বলল—

'জয়তী, আজ স্পষ্ট করে বলতে চাই, তোমায় চিরদিনের জন্যই চাই—তুমি কি বুঝতে পারনি এত দূর পথে নিয়ে এসেছি কেন তোমায় ? তোমায় চিরদিন ভালবেসেছি—কিন্তু তোমায় এইভাবে কখনও পাইনি। বোস খানিকক্ষণ, কিসের বাধা তোমার ?' অবিনাশ এখন আর দায়িত্বহীন যুবক নয়, সে রীতিমত বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। অবিনাশের পরিবর্তন লক্ষ্য করল জয়তী। চেয়ারের একটি কোণে জয়তী নির্বাক আসামীর মত বসে রইল—যেন আর একটুও নড়তে পারল না। অবিনাশের হাতে আপিসের চামড়ার ব্যাগ ছিল, সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জয়তীকে আরও কাছে বসাল। জয়তীর দুই চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে চলল। অনেক কথা সে বলতে চেয়েছিল কিন্তু একটিও কথা বলা হ'ল না।

'এত চোখের জল কেন জয়তী ? এখন আমারই যেন ভয় করছে।' অবিনাশের মনে দ্বিধা হ'ল।

'না, না, কিছু নয়—তুমি আমায় এমনভাবে চেয়েছ আমি ভাবতেই পারিনি'—জয়তী উত্তর দিল।

'জয়তী, কোনদিন তুমিও আমায় বলনি তো কিছু ?'

'আমি কি বলব বল ? নিজেকে কি চিনতে পেরেছিলাম কোনদিন ?'

'বল বাড়ীটা কেমন লাগছে ? আশা কত হাঙ্গামা করে প্রত্যেকটি ঘর সাজিয়েছে দুজনে মিলে যা পেরেছি তা করেছি।'

'আশা—আশা' অবিনাশ ডাক দিল।

'এই যে দাদা—বাচ্চারা এতক্ষণে ঘুমুতে গেল—খেতে এসো।' আশা উপরে উঠে গেল। সিঁড়ি নামতে নামতে আশা জয়তীকে বলল—

'মা বাবা যাবার পর দাদা এই বাড়ীর সবই বদলিয়েছে। আবার নতুন করে সব রঙ করা, পর্দা লাগানো, ইত্যাদি...আমি এসে দেখি বিশেষ কিছু কাজ বাকি নেই।' জয়তী হাসল—

'অবিনাশ আমায় বলল, আশা সব সাজিয়েছে—তাই বোন দুজনেই সুদক্ষ শিল্পী দেখছি।' আশা হেসে উঠল—

'দাদার কথা বিশ্বাস করলে তুমি? গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সারাদিন সে এই বাড়ীর পেছনে লেগেছিল। আওয়াজের চোটে তো আমরা অস্থির। এখন বুঝতে পারছি, তোমার কাছে সুখ্যাতি পাবার জন্যই এত কাণ্ড। আমরা দুজনেই কিন্তু তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম।'

আশা দু-একদিনের মধ্যেই জয়তীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল—ছোট বোন অবিনাশের বিশেষ প্রিয়—অবিনাশের বন্ধু আসছে শুনেই সে খুশী। দাদার জন্য সে সব করতে পারে। আহারের পর সকলে জয়তীর ঘরে গিয়ে বসল। ছেলেমেয়েরা ঘুম থেকে উঠে পড়তে আশা আবার তাদের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হ'ল।

অবিনাশ বলল—'তোমার বাবার কাছে যাব। বলতে চাই তোমায় বিয়ে করবো।'

'কি যে বল? আমি কি কোনদিন মা-বাবার কথা শুনেছি?'

'শোনা উচিত ছিল'—অবিনাশ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল।

'আমি তাঁকে বলতে চাই, তোমায় বিয়ে করবার অনুমতি চাইছি।'

'কি যে বলছো? আমায় একটু ভাবতে দাও—কাউকে কিছু ব'লো না অবিনাশ। আমার ভাবা এখনও শেষ হয়নি।'

'না, সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই, আজই দুপুরের মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে কথা চাই।' অবিনাশ কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেছে—তার কথার মধ্যে এমন দৃঢ়তার সুর ছিল না তো কোনদিন? জয়তী আশ্চর্য্য হয়ে গেল—আকৃষ্টও যে হ'ল না তা নয়। অবিনাশকে জয়তী কতবার তিরস্কার করেছে, উপদেশ দিয়েছে, এখন কি অবিনাশেরই মতে তাকে মত দিতে হবে? জয়তী আপত্তি করতে পারল না কিন্তু কি বলবে তাও বুঝতে পারলো না।

'কি তোমার ভাবনা?' অবিনাশ দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করলো।

'না কিছু না—এখন কিছু বলতে পারছি না। আমায় ভাবতে সময় দাও।' জয়তী অনুরোধ করলো।

'তুমি কি আমার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত না তোমার পরাজয়ের জন্য লজ্জিত? সত্যি কথা বল তো জয়তী? আমি তোমার সঙ্গে দিল্লী যেতে পারি, 'দিগন্ত'র একটা সুব্যবস্থা করে তারপর তোমায় এখানে নিয়ে আসবো।'

জয়তীর মনে এখনও দ্বিধা। অবিনাশ অধৈর্য্য হয়ে বলল—

'তোমায় মত দিতেই হবে। তোমায় যে ভালবাসি এ কথা তোমার বাবাকে বলতে পারবো না? তিনি আমায় ভুল বুঝবেন না—তোমার চেয়ে তিনি আমায় ভাল বুঝবেন।'

না, অবিনাশ, আমি একা যাই আগে। যাঁর কাছে সব খুলে বলি, তাই ভাল।'

'তুমি তৈরি হও, আমি নিচে যাই', বলে অবিনাশ নেমে গেল।

অবিনাশ আশাকে ডেকে বলল তার ছেলেমেয়েদের ওর ঘরে পাঠিয়ে দিতে। ছেলের বয়স পাঁচ, আর যমজ মেয়ে দুটি আরও ছোট। তারা অবিনাশের ঘরে এসে দৌরাত্ম্য খুবই করে, নিয়োমিত জিনিসপত্র উল্টে পাল্টে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। বালিশ ছুঁড়ে ভীষণ খেলা তারপর কুস্তি। মামার পেটের উপর বসে উদ্দাম নৃত্য। অবিনাশ এমনই মেতে ছেলেটির সঙ্গে কুস্তি করতে লাগল—ফলে নিজের চশমা জোড়া মেজেতে পড়ে গেল। জামার শার্টের বোতামগুলি একটি বাদে সবই ছিঁড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ট অনেক নিচে নেমে গেল। আশার মেয়ে দুটি বিস্ফারিত নেত্রে মারামারি দেখছিল—অবিনাশ হঠাৎ বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে তাদের গাল টিপে দিতে ওরা যেন একটু সাহস পেলো। তারপর তিনটিকে একত্র করে চাকরের সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত। বাড়ী নিস্তব্ধ হতে জয়তী

নিচে নেমে এলে চায়ের টেবিলে বসল। আশা তার স্বামী বিজয়ের চিঠি খুলে পড়ছে—শীঘ্রই তাকে ফিরে যেতে হবে। বিজয় ছুটি পেলেই রওনা দেবে। অবিনাশ বলল—

'জয়ন্তী, তোমায় সহরটা একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি চল। আমার স্টুডিও ভাল করে দেখবে তো? নিজেই করেছি। বাড়ীর পিছনে একটি আধ ঢাকা বারান্দায় খোদাই করা মূর্তিগুলি রাখা আছে—কতগুলি একত্রে সাজানো। কিছু ব্রঞ্জের, কিছু প্রস্তরের ও কিছু টেরাকোটা। কোন কোনটি রীতিমত বড়। ছোটছোট সুক্ষ্ম কাজও আছে কিছু। ভাস্কর্যের দক্ষতা বিশেষ লক্ষ্য হবে কি না জানি না।'

জয়ন্তী লক্ষ্য করল অবিনাশ নূতন ধরণের কাজও কিছু করেছে, খুব উৎসাহের সহিত সে কাজ করেছে অনুমান করা গেল। আশা প্রতিবেশীর বাড়ী খবর দিতে গেল সে শীঘ্র শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবে। ইতিমধ্যে মশগুল হয়ে গল্প জুড়ে দিতে তার ফিরতে দেরী হ'ল। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বলল—

'আমার নূতন সমস্যার মধ্যে ফেলেছ তুমি, আমার মনে হয় আমি বোধ হয় সংসার করবার উপযুক্ত নই। অবিনাশ, তোমার স্বপ্ন তোমার আকাঙ্ক্ষা সবই ভিন্ন—তোমার নতুন জীবন পথে আমি কি সঙ্গী হবার উপযুক্ত?'

'তর্ক রাখো জয়ন্তী—তোমার সমস্যার সমাধান আমিই করব—তুমি শুধু মত দাও—রাজী হও।'

'আমি তো বললাম তোমায়, আমি কোনদিন স্বাভাবিক হতে পারব না—এইভাবেই জীবন কেটে যাবে। হয়তো প্রচণ্ড কাজের চাপে পড়লে কোনদিন মনকে ঠিক করতে পারব।'

'কোনদিন তুমি স্বাভাবিক ছিলে কি জয়ন্তী? তুমি জিদ্ করছো কেবল, তুমি অলোককেও বলেছিলে যে তুমি বিবাহ সম্বন্ধে উদাসীন, বিবাহিত জীবন তোমার স্বাধীনতা কেড়ে নেবে ইত্যাদি। সেই সব আবার চাও তো? বেচারাকে তো দেশছাড়া করে দিলে। তোমার একগুঁয়েমি আমার ভাল লাগে না—আমায় কি চিনলে না এখনও? তোমায় পরাধীন করে রাখব বলে কি এত ভয় তোমার? কী স্বাধীনতা চাও তুমি?'

'না, না, শুধুই স্বাধীনতা চাই না অর্থাৎ একেবারে একা হতে চাই না—তাতে সুখ নেই অবিনাশ।'

'বিবাহিত জীবনের কতগুলি সমস্যা তো থাকবেই, আমি তোমায় সুখী করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবো জয়ন্তী, এখন আমার নিজের ওপর সে বিশ্বাস আছে।'

জয়ন্তীর মুখ নিমেষের মধ্যে আবার গম্ভীর হয়ে গেল—চুপ করে বসে কী যেন ভাবছিল।

'ভাবতে দাও অবিনাশ, আমি যেন নিজের ওপর সব বিশ্বাস হারিয়েছি, জীবনের অপ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না—ভুল ভ্রান্তি যেন আমার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমার সবেতেই শুধু দ্বিধা।'

'কাল তুমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছো জয়ন্তী, আজ তুমি আমায় কথা দাও। যদি তুমি দিল্লী ফিরে গিয়ে একার জীবন যাপন করতে চাও তবু তোমার মঙ্গল কামনাই করবো।'

'আমি দিল্লী এখনই যাচ্ছি না অবিনাশ—যদি যাই, তুমি কি যাবে সঙ্গে?'

'যদি কথা দাও এ বিয়েতে তুমি রাজী আছ তবেই। আমি অলোক নই। চিরকুমার সভার সভাপতি হ'ব না এ কথা স্পষ্ট জেনো।' অবিনাশ তার ঘরে চলে গেল।

জয়ন্তী স্তম্ভিত হয়ে গেল। অবিনাশ তার জন্য প্রতীক্ষা করবে না?—সে নিশ্চয় বিবাহ করবে এবং অন্য মেয়েকে সুখী করবে। ঈর্ষার অগ্নি তার অন্তর যেন বিদীর্ণ করে দিল—তার মনের প্রসন্নতা, আনন্দ সব মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। নিজের ঘরে বসে সে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। একটি সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অবিনাশ কথা চায়। কিসের পশ্চাতে সে ছুটছে? স্বাধীন জীবন? শিল্প জগতের সুখ্যাতি

সেখানেও সে একা। বাবার কাছে গিয়ে থাকবে? তিনি তো অমর নন। ভবিষ্যতের উন্নতি? কাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ? প্রশ্নগুলি একের পর এক এসে পড়ল, 'উত্তর দাও' বলছে চতুর্দিকে যেন কোলাহল করে তাগাদা দিচ্ছে 'উত্তর দাও'।

জয়তী একদণ্ড স্থির হতে পারল না। সমস্ত জিনিস গুছিয়ে নিয়ে একত্র করে রেখে, তারপর বিছানায় বসে কি যেন ভাবতে লাগল। ঘুম আর আসে না—ক্রমাগত ত্রাস, দুর্ভাবনা, সংশয়।

একতলার ঘরে অবিনাশ ছট্‌ফট্‌ করছে, তার মনেও আজ শান্তি নেই।

'জয়তীকে বিয়ের কথা বললে সে ভীত হয়ে ওঠে, সে কি বোঝে না একার জীবন কত দুঃখের? শিল্পীর জীবনেও সঙ্গীর প্রয়োজন, ভবঘুরে হয়ে সারা জীবন কেই বা থাকতে পারে?'

ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বালিশের ওপর ভর দিয়ে অবিনাশ শুয়ে পড়ল—চোখে তারও ঘুম নেই। জয়তীর মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। পরদিন ভোরে জয়তী রওনা দেবে—তার মতামত জানতে না পারায় অবিনাশ অধীর হয়ে উঠল।

'জয়তীর কাছ থেকে কথা চাই'—মনে মনে অবিনাশ কথাগুলি জপতে লাগল। আর ধৈর্য রাখতে পারল না। উঠে দরজার কাছে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল এক নিশ্বাসে—বারান্দা থেকে দেখতে পেলো জয়তীর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে—দরজাও খোলা রয়েছে। সে টেবিলের কাছে বসে চিঠি লিখছিল, টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তার চিন্তিত মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'কাকে চিঠি লিখছ? তুমিও ঘুমোও নি জয়তী?'

'এসো অবিনাশ—বিশ্বাস কর এই দেখো তোমায় চিঠি দিয়ে যাচ্ছিলাম কাল ভোরেই তো যেতে হবে তাই। চিঠি রেখে যাব ভাবছিলাম।'

চিঠিতে যা লিখেছ তাই এখন বল।' অবিনাশের মনে কেমন যেন সন্দেহ হ'ল।

'ভেবেছিলাম লিখতে পারব ভাল করে, বলতে পারব না। দেখা হয়ে গেল এখন সবই খুলে বলতে পারি।' কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে জয়তীর মুখে একটা সরল সুন্দর হাসি ফুটে উঠল—অবিনাশ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। আজ জয়তী তার সব ভার যেন অবিনাশের হাতে তুলে দিতে পারে—আশঙ্কা তার কিছু নেই, ভাবনাও কেটে গেছে। বহুদিনের আবেগ ও উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত হয়ে মায়া-মুগ্ধ জয়তীতে এসে থামল। হৃদয় তরঙ্গের মধু গুঞ্জন শুধু দুজনেই শুনতে পেলো। জয়তীর বিদীর্ণ হৃদয়ের দৈন্য জ্বালা ও ব্যর্থতা ক্রমশঃ লুপ্ত হ'ল। অবিনাশ তার বাহুর আবেষ্টনে জয়তীকে বন্দিনী করে রেখেছিল কিন্তু জয়তী এইভাবে হার মানতেই চাইল।

'স্বীকার কর তোমার মনে কোনো রকম দ্বিধা, ভয়, গ্লানি নেই?' অবিনাশ প্রশ্ন করল।

'আমার কোন দুঃখ নেই অবিনাশ তুমি যা চাও তাই দেব, এতদিন দিতেও জানতাম না, নিতেও জানতাম না। কলকাতায় চল, সেখানে আমাদের বিয়ে হবে। আর আমার ভয় নেই অবিনাশ।'

জয়তীর কাছে কথা নিয়ে অবিনাশ নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরে নেমে চলে গেল। সেদিন রাতে অবিনাশ এক ঘুমে রাত কাটাল। ভোরের আলো উঁকি দিতেই চঞ্চল পাখীগুলো কেবল জানালার কাঁচে টোকা মেরে গেল। অবিনাশ উঠে আশার কাছে গেল।

'আশা জয়তী আজ কলকাতা যাবে না—এখন যা ঠিক হয়েছে তোমায় সব বলি, এখানে বোস।' আশাকে হাত ধরে কাছে বসিয়ে অবিনাশ বলল—

'আমি জয়তীকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছি আশা, সে আমায় বিয়ে করতে রাজী হয়েছে—তুমিও সঙ্গে চল।'

'আমার তো তাই বলবার ইচ্ছা খুবই ছিল—জয়তীর সঙ্গে তোমার বিয়ে আগে হয়নি কেন তাই ভাবছিলাম—প্রথমদিন থেকেই তো জয়তীকে আপন করে নিতে পেরেছি।'

জয়তী নিপুণভাবে চুল বেঁধে একখানা বাসন্তী

রঙের শাড়ী পরে নেমে এল—তার মুখে সুনির্মল দীপ্তির আভা। আশা পরে কলকাতায় যাবে ঠিক হ'ল। অবিনাশ ও জয়ন্তী কলকাতার প্লেনে উঠল। সারাপথ প্লেন কতভাবে উঠল, নামল, বেঁকলো, অবিনাশ ও জয়ন্তী কিছুই লক্ষ্য করল না। উষার কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত। অবিনাশের নিটোল মুখের ওপর সোনালি আলোর আভা পড়াতে তার শান্ত মুখমণ্ডল অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

জয়ন্তী চোখ খুলতেই দেখল প্লেন কলকাতায় এসে পৌঁচেছে। মাদল ও শীলা জয়ন্তীকে বাড়ী নিয়ে গেল। অবিনাশ তার একটি বন্ধুর বাড়ী গিয়ে উঠল। জিনিসপত্র সেখানে রেখে সে দেবাশিষের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

শীলা জয়ন্তীকে জড়িয়ে ধরে বলল—'অবিনাশের চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে—তাকে একা দেখলে চিনতে পারতাম না হয়তো। তোমার 'তার' পেয়ে আমার সন্দেহ হয়েছিল হয়তো অবিনাশও সঙ্গে আসছে। তাড়াতাড়ি বাবার কাছে যাও।'

দেবাশিস তার ঘরে গিয়ে বসতে জয়ন্তীও গিয়ে বসল।

'বাবা অবিনাশের বিষয় বিস্তৃতভাবে কিছু জানাবার সুযোগ পাইনি, সে তোমায় যা বলতে চাইছিল, আমিই তোমায় বলব তাকে বলেছি।'

শান্তার অবর্তমানে দেবাশিস একাধারে মা ও বাবার কর্তব্য করে চলছে। জয়ন্তীর জীবনে বহু বাসনাই যে অপূর্ণ রয়ে গেছে এ কথা সে ভাল করেই জানতো। জয়ন্তী কিছুদিন স্বাধীনভাবে শিল্প চর্চা করেছিল এবং তাতে খানিক তৃপ্তি পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনে অনেক কিছুই সে পায়নি। কন্যার মাথায় হাত রেখে দেবাশিস বলল—

'অবিনাশের সঙ্গে বহুদিনের যোগাযোগ তোমার—তাকে তুমি ভাল করেই জানো, সুখী করতে পারবে তো? আমার তো বড় ভাল লেগেছে ওকে।'

'বাবা আমি তাকে বলেছি ভাল করে ভেবে দেখতে। আমার মতামত সে শ্রদ্ধা করবে বলে মনে হয়, তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। অতি স্নেহপরায়ণ মন—কোমল স্বভাব তার, আর কী চাইব বাবা? দাবী আমার আর কিছু নেই। উচ্চাভিলাষ, ধনস্পৃহা, যশোলিপ্সা ও তীব্র বাসনার তাড়নায় মানুষকে যে কি উদ্বিগ্ন অবস্থায় দিন কাটাতে হয় সে আমার জানা আছে, আমি সে সব কিছু চাই না—তবে কোলাহলহীন শান্তিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা এখনও আমার মেটেনি—তুমি আশীর্বাদ কর বাবা যেন এটুকু পাই। এই আমার ঐশ্বর্য হোক।'

'আমিও চাই জীবনের অবসানে তোমায় সুখী দেখে যাই। আমি তো চিরকাল তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো না মা, অবিনাশকে বিয়ে করে তুমি সুখী হও।'

'বাবা, আড়ম্বর কিছু ক'রো না, শুধু বাড়ীর কজন উপস্থিত থাকলেই ভাল। বিয়ে এ বাড়ীতে তোমার কাছে হবে।' জয়ন্তীর কথায় বিশেষ অভিভূত হ'ল দেবাশিস, তার সিক্ত চোখ দুটো মুছে নিল গোপনে,—সামান্য কথাই বলতে পারল।

'সোমেন আর মালা এসে পড়লেই হয়—তারাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে। নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারই হবে কথা দিচ্ছি তোমায়।'

দেবাশিস ও অবিনাশ গল্প গুজবে সারাদিন ব্যস্ত ছিল। কদাচিৎ হেমেনের সঙ্গ পায়—সোমেনও বহুদিন বাড়ীর বাইরে। অবিনাশকে নিকটে পেয়ে সে বড় আনন্দ পেলো, একটি পুরুষের সঙ্গে মন খুলে কথা বলে তার খানিক আরাম হ'ল। অবিনাশের স্বভাবের বিশেষ গুণগুলি সকলেরই চোখে পড়ে। সে নানা প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে, স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে—সহজেই সকলের আপন হয়ে যায়। দেবাশিসের আহ্‌মেদাবাদের সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল, অবিনাশ অনেক খবর দিল।

'আমার বোন আশা, তার স্বামী পুত্র পরিবার সহ বিয়েতে আসবে, আমার একটিই বোন'—অবিনাশ বলল।

দেবাশিস টেবিলের ওপর এক বাক্সো সিগারেট ও একটি দেশলায়ের বাক্সো রাখল—অবিনাশকে ইঙ্গিত করল নিতে। তারপর একটু হেসে বলল—

'অল্প বয়সে আমার সিগারেটের যেমন নেশা ছিল, তেমনি চুরুটেরও। শান্তার খুব ভাবনা ছিল এত ধোঁওয়া টানলে আয়ুক্ষয় হবে। কিন্তু দেখছি সেই আগে চলে গেল। তার স্মৃতি এই বাড়ীতে আমায় জাগিয়ে রাখে—তাই ঘুরে ঘুরে যেন তার কাজগুলি করছি বলে মনে হয়। দুঃখ হয় সে আজ উপস্থিত নেই—তোমায় চিনলো না ভাল করে। জয়তী আমার বড় আদরের মেয়ে জানো তো অবিনাশ?'

পরদিন সকালে সোমেন ও মালা ছেলেমেয়েদের নিয়ে উপস্থিত হল। মালার ছেলেমেয়েরা যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি দুরন্ত। মালা এত কাজের মধ্যেও অতি প্রফুল্ল ও সরস রয়ে গেছে, তার মুখে হাসি লেগেই আছে। ছেলেমেয়েগুলি একবার খেতে খেতে আর একবারের খাওয়ার তালিকা দিতে থাকে, শীলা ও মালা অস্থির হয়ে পড়ল।

জয়তীর সঙ্গে মালার বহু বছর পর দেখা। হেমেন একবার দু মিনিটের জন্য সকলের কাছে মুখ দেখিয়ে আবার অন্তর্ধান হয়ে গেল। সে যেন সর্বদাই সতর্ক থাকে কোন আলোচনা বা তর্কের মধ্যে যেন না জড়িয়ে পড়ে, তার মতামত দিতেও উৎসাহ নেই, জানতেও কৌতূহল নেই। নিতান্ত নির্লিপ্ত হয়ে চিরকাল থেকেছে। স্বভাবটি সে এরকম নিয়ে জন্মেছিল, না এইভাবে চলা অভ্যাস করেছে বলা শক্ত। আবেগ বা আন্তরিকতা তার ছিলই কি না কোনদিন কেউ বুঝলো না। তার মাথায় অল্প টাক পড়েছে। সোমেনের বেশ একটু ওজন বেড়েছে। বহুকাল পর পরিবারের সকলে আবার একত্র হল। পারিবারিক আবেষ্টনের মাধুর্য আজ জয়তীর বড়ই মধুর লাগল—তার ভাবতে অবাক লাগল যে এক সময় সে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল। ক্রমশ:

রামমোহন ও নবজাগরণ

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় শ্রীরাধাগোবিন্দ কর লিখিয়াছেন:—

সমন্বয়-সাধনাদর্শকে কেন্দ্র করেই রামমোহন ভারতে জাগরণের আলোক প্রজ্বলিত করলেন। এই নবজাগরণে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নূতন মূল্যায়ণের চেষ্টা যেমন ছিল, তেমনি ছিল তার মধ্যে বিশ্ববোধ জাগানোর চেষ্টা। এতে নূতন নূতন সৃষ্টির প্রেরণা যেমন ছিল, আর ছিল সব ব্যাপারে—ব্যবহারিক জীবনে, চিন্তা-জগতে, আচার-বিচারে ও ধর্মে—প্রতি পদক্ষেপে এক পরিপূর্ণ সংহতি স্থাপনের অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা। বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা বা মানবধর্মিতা—এই উন্মেষের মূলসূত্ররূপে অলক্ষ্য-বহুমুখীচেতনার সঙ্গে গ্রথিত হয়েছিল। তারই ঝঙ্কার বেজে উঠেছে প্রতিটি পদক্ষেপে, নানা চেষ্টায়, কর্মে ও গানে। ভারতীয় সাধনা আর সংকীর্ণ নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ রইলনা, যুক্ত হল বিশ্বসাধনার সঙ্গে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সাধনা মুক্তপাখায় বিচরণ করার সুযোগ পেয়ে হয়ে উঠল বিশ্বমুখীন। ফলে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের মিলন পথ হয়ে উঠেছে সহজ ও সাবলীল। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসেতু এইখানেই নূতন করে রচনা হল। পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠেছে একপরিবারভুক্ত অভিন্ন মানবজাতি।

ইউরোপীয় নবজাগরণের দুটি পর্যায় আছে। অটোমান্ তুর্কীদের-কনস্ট্যান্টিনোপল্ অভিযান ও বিজয় নবজাগরণের আদিতম কারণ, কিন্তু ইতালি-জার্মাণীতে তার প্রথম স্পষ্টরূপ প্রত্যক্ষীভূত হল, সেই হিসাবে বলা হয় ইতালি এবং জার্মাণীতেই নবজাগরণের সূচনা। তেমনি বাংলায় নবজাগরণের প্রথম হেতু হিসাবে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের ভারতে আগমনকেই ধরা উচিত। কেননা তারই ফলে আদর্শের সংঘাত, সামাজিক ও ধর্ম-বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি, রাজনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদির মাধ্যমে তারই প্রস্তুতি চলছিল। আর রাজা রামমোহন রায়ের হাতে বাংলা-দেশে কলকাতায় তার প্রথম ফল দেখা গেল। তাই বাংলাদেশের রেণেসাঁসে রামমোহন রায়কেই প্রথম সূচনা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তবিক এই দুই সূচনাতে কোন পারম্পরিক সংঘাত নেই, বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক। আমরা তাই ইউরোপীয় আগমন থেকেই শুরু করছি। এ দেশেই ইউরোপীয় স্বার্থ ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কিন্তু তা যখন ক্রমে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বার্থদ্বন্দ্বের আলোড়নে স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন কেউ ভাবেনি তার ফল এমন বৈপ্লবিক হয়ে উঠবে। সে অষ্টাদশ শতকের কথা। এর ফল যখন ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলা-দেশের মানুষের জীবনে ও চিন্তায় প্রত্যক্ষীভূত হল তখন এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে দেশের সংস্কৃত-পণ্ডিতগণ বিব্রত হলেও নির্বাক ও নিরুৎসাহ রইলেন। খ্রীষ্টধর্মমত খণ্ডন করে নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হিন্দুশাস্ত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য কিন্তু এ কাজ সহজ নয়। ধর্ম ও সমাজ যে দুটা পৃথক সংস্থা এবং তারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়েও যে আলাদা তা ভাল করে এবার হিন্দুদের বোঝানো দরকার। হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব ও তার সর্বজনীন ভাব আবিষ্কার করে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে একটি নির্বিরোধ সমন্বয়ক্ষেত্র তৈরী করার দায়িত্ব কে নেবেন? কিন্তু সেদিনের নিষ্প্রভ ও বিপন্ন বাংলায় যিনি জাগরণের প্রদীপ জেলে আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি হলেন

দেশবরেণ্য ও বিশ্বপথিক রামমোহন। আর এই আন্দোলনে সহযোগিতা করে তাকে সার্থকতার দিকে আগিয়ে নিয়ে গেলেন সে যুগের কয়েকজন প্রগতিবাদী সংস্কারপন্থী মনীষী।

ইউরোপীয় রেনাসাঁসের ফল হল 'রিফরমেশন' বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন। বাংলাদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ সুরু হয় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে ধর্মকে কেন্দ্র করে এবং তা আস্তে আস্তে ব্যাপ্ত হয়ে যায় জীবনের সবক্ষেত্রে। তাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আগে এল রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে 'রিফর-মেশন মুভমেন্ট' বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেখা দিল রেনেসাঁসের প্রকৃতরূপ। এর ব্যাপক বিরাট রূপ দেখা যায় ধর্ম-সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির সংস্কার, সৃজন ও উৎকর্ষের অভিমুখে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় সমাজে মানবধর্মী চিন্তাধারার বিকাশে ও মানবসেবার ক্ষেত্রে 'লোকশ্রেয়' প্রভৃতি আদর্শ রূপায়ণের মাধ্যমে। জাগরণের ফল জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকর্ষ। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বহু দিনের লালিত সংকীর্ণতা ও দীনতা পরিত্যাগ করে দীপ্ত সাহস ও শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক কথায়—বুদ্ধির মুক্তি হল; আর সেই মুক্তবুদ্ধি দেখিয়ে দিল ভারতীয়দের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আলোক-উৎস ও পথ। এখন থেকে সংস্কারকদের প্রধানতম অস্ত্র যুক্তিবাদ। বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির আঘাতে দেশের পুরোনো ধর্ম-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, দর্শন ও শিল্প-সাহিত্যবোধ ভেঙ্গে ফেলে নূতন করে গড়ে তুলতে হলো। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষেত্র আলোকদীপ্ত হয়ে উঠল; আর আঁধারে হাত বাড়িয়ে নেবার কিছুই রইল না। অখণ্ড-মনুষ্যত্ব সাধনার যে বীজ রোপন করা হল, তা কালে কালে সিঞ্চিত হয়ে ফুলে ফলে পল্লবিত হওয়াতে বাঙ্গালী মনীষা ও প্রতিভার এক আশ্চর্য উল্লাস দেখা দিল উনবিংশ শতাব্দীতে। তাকে তাঁরা সার্থক করে তুললেন তাঁদের জীবন-সাধনা দিয়ে, নিজেদের উৎসর্গ করলেন প্রাচীনের উৎকর্ষ সাধনে ও নূতন সৃষ্টির আনন্দে। আর বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নবযুগের ধারাকে বহন করে নিয়ে চললেন সমুখের দিকে প্রগতির অভিমুখে।

ভারতে নবযুগের মহাবাণী এই মানবতা এবং মিলনের অগ্রদূত রামমোহন বললেন পৃথিবীর সব মানুষই একই জাতি। সাদা চামড়া আর কালো চামড়ায় কোন ভেদ নাই। যে ভেদ আপাতঃদৃষ্টিতে দেখা যায় তা কৃত্রিম ও বানানো। যদি নবযুগকে আহ্বান জানাতে হয়, তবে দেশী বা বিদেশী, স্বধর্মী বা বিধর্মী কাউকে উপেক্ষাভরে সরিয়ে দিলে চলবে কেন? মঙ্গলঘট ভরবার জন্যে, তাকে পবিত্র করে তোলার জন্যে সবার স্পর্শ যে একান্ত দরকার! আর সেই সঙ্গে দরকার আমাদের মনগুলিকে শুচি করে সবার হাত ধরার, সবার হাতে হাত মেলাবার। কিন্তু ইউরোপীয়দের অনেকেরই ধারণা ছিল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন অসম্ভব কিন্তু নবযুগের ভারতীয় মনীষীরা ভাবছিলেন এর ঠিক উলটো। ইউরোপ যখন মিলনের ভার বহনে ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম ও নারাজ, তখন ভারত কিন্তু চুপ করে বসে রইল না। নবযুগের অগ্রদূত ও পথিকৃত রামমোহন তাই অন্য সবার আগে ইংরেজদেরও আহ্বান জানিয়ে ছিলেন কিন্তু তাদের স্বৈরাচারিতা বা স্বেচ্ছাচারিতাকে আহ্বান জানান নি। এই মিলন-বাণীই ভারতপথ, শক্তের কাছে দুর্বলের নতি নয়, বন্ধুর সংগে বন্ধুর মিলন, —এই পথই নির্দেশ করেছেন ভারতের প্রাচীন মনীষীরা, রামমোহন সেই পথেরই প্রধান পথিক। এই ভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেও প্রতিভাত হয়েছেন।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মনীষীরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করে নিয়ে চললেন। তাঁরা ডাক দিলেন সারা ভারতকে। ভারত যখন সে ডাকে সাড়া দিল তখন দেশের আনাচে-কানাচে নবযুগের আলোক করেছে স্পর্শ, সে আলো গাঢ় রঙের তুলি বুলিয়ে চলেছে মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। দেশ আপনি আপনার দিকে বিস্ফারিতনেত্রে রইল তাকিয়ে, মুগ্ধ হয়ে গেল সে তার আপন সুপ্তশক্তির

বিকাশে, এবং নমস্কার জানাল আত্মশক্তিকে। ধন্য হল দেশ, পুণ্য হল গৃহ-পরিবার।

ভারতীয় ব্রহ্ম-সাধনা ও ঐতিহ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হল যুগন্ধর রামমোহনের যাদুস্পর্শে, যুক্ত হলো বিশ্বসাধনার সংগে। রামমোহন প্রাচীন ভারতীয় শাশ্বত সত্য ও ঐতিহ্যের নির্যাসটুকু গ্রহণ করলেন, তার সংগে মিশিয়ে দিলেন বিশ্বের বিভিন্ন সাধনার মূল তত্ত্বগুলি। প্রাচীনের নির্বিচার প্রতিষ্ঠা নয়—বিদেশের অন্ধ অনুকরণ নয়—রেনেসাঁস মানেই ঐতিহ্যের সংগে দেশবিদেশের প্রাণ-প্রবাহের সংযোজন। ভারতবর্ষে এটিই রামমোহনের দান।

রামমোহনের নূতন সাধনায় মিশল বুদ্ধির সংগে শক্তি, প্রেমের সংগে যুক্তি ও জ্ঞান, নীরস আধ্যাত্মিকতার সংগে যুক্ত হলো মানবধর্মিতা ও লোকশ্রেয়। রামমোহনের 'হিউম্যানিজম্' আধ্যাত্মিকতাযুক্ত। সমগ্র মানবাত্মার মুক্তি কামনায় নিজেকে নিয়োজিত করেও মানুষ তার নিজ ব্যক্তিত্বকে অব্যাহত রাখার উপায় খুঁজে পেল। রামমোহনের সাধনা ভারতীয় শাশ্বত সত্যের ও ঐতিহ্যের উপরে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিশ্চয়ই। আর এটি করে তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি জানতেন ভারতীয় শাশ্বত সত্যকে বাদ দিয়ে এদেশে অন্য কোন সাধনা সফল হতে পারে না। ভারতের ঋষি-বাণীর মধ্যেই বিশ্বমিলন-সাধনার মন্ত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। সেজন্যে তিনি সহজে হতে পেরেছিলেন বিদেশীদের কাছেও নিকট আত্মীয়।

আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন রামমোহন। তাঁর এমন একদেশব্যাপী যুগাতিক্রমীক আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল, যেহেতু সমসাময়িক সমাজের প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী মনীষীদের সহায়তা ও সমর্থন তাঁর পিছনে ছিল।

রামমোহন তাঁর মুক্তচিন্তা, ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনে সহযোগীরূপে আত্মীয়সভার বন্ধুদের পেয়ে রীতিমত বিপ্লব সুরু ক'রে দিলেন। এঁরা রামমোহনের ধর্মমত,—'ব্রহ্মবাদ', নিরাকার উপাসনা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনে বিশেষভাবে তাঁর সহায়তা করেন। অবশ্য এঁরা দেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বাধীন বিচার বুদ্ধি ও উদার চিন্তার অনেক পরিচয় রেখে গেলেও, বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন রামমোহনের সঙ্গে এবং সমসাময়িক লোকশ্রেয় বা জনহিতকর কাজে। রামমোহন যে যুগোপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন তাকে তাঁর বন্ধুরা অভিনন্দন জানালেন। এ ব্যাপারে সকলেই অবশ্য সমান উৎসাহী ছিলেন এমন নয়—তবে তাঁর ডাকে যারা প্রথম সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কালীনাথ মুন্সী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীরা অগ্রগণ্য, এঁরা রামমোহনের মৃত্যুর পরেও তাঁর আদর্শ আঁকড়ে ধরে নিজেদের কর্তব্য সাধন করে গেছেন।

৭৩৫ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি; কারণ বিদেশী কখনই ভারতবাসীর সুবিধার জন্য কোনও কিছু করে না, করিবেও না। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় যখন প্রথমে বিদেশীগণ আসিয়া দেখা দেয় তখন তাহারা আমাদের সহিত ব্যবসায় করিবে বলিয়াই বাদশাহের দরবারকে বুঝাইয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যবসায় হইতে অল্প দিনই আমাদিগের কোনও লাভ হইয়াছিল। পরে সেই ব্যবসায় ক্রমশঃ শোষণের পথে চালিত হইয়া অবশেষে বয়ন শিল্পীর অঙ্গুষ্ঠ ছেদন, নীলকরের অত্যাচার ও বিদেশীর গরীব কর্ম্মীকে দুই পয়সা বেতন দিয়া নিজের তরফে দুই টাকা লাভের ব্যবস্থায় পর্য্যবসিত হয়। এই সকল কথার অবতারণা প্রয়োজন হইতেছে জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ সংরক্ষণ ও জাতীয়তার স্বরূপ নিজ গৌরবে অক্ষুন্ন রাখিবার আবশ্যকতার স্বীকৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে সজাগ করিবার জন্য। কারণ আমরা স্বাধীনতা লাভের পরে বিশ্বের সংঘটে সকল বিষয়ে জাতীয়ভাবে আত্মজাহির করিতে অশেষ তৎপরতাপ্রদর্শন করিয়াছি। ফলে আমরা সহজেই অপরাপর জাতির সহিত নানান সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধে, জড়িত হইয়া পড়ি। আমাদের বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাগুলির সূত্রে আমরা যে সহস্র সহস্র কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছি তাহার ফলেও আমরা অপর অনেক বিদেশী জাতির নিকট অধমর্ণরূপে উপস্থিত হইয়া থাকি ও তাহাতে আন্তর্জাতিক আসরে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠা মহাসম্মানের হইতে পারে নাই। ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে অধিক করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে। ইহার ফলে ঐ রাষ্ট্র আমাদের শুধু যে অসম্মানের চক্ষে দেখে তাহা নহে; তাহারা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধতা করিয়া এবং আমাদের শত্রুপক্ষকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করিয়াও কোনও লজ্জা অনুভব করে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানান ক্ষেত্রে ভারতে লোক পাঠাইয়া অনুপ্রবেশ চেষ্টা করিয়া থাকে ও প্রথমে তাহারা যেরূপ ভেকই দেখাক না কেন, পরে যে তাহারা ভারত বিরুদ্ধতা করিয়া ভারতে আমেরিকার প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা করিবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং সম্প্রতি যে ভারতে বহু সংখ্যক মুণ্ডিত মস্তক শিখাধারী কৃষ্ণভক্ত শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের আবির্ভাব হইতেছে তাহাও আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি। যদিও ভারতের মানুষের অনেকে দুইশত বৎসরের শ্বেতাঙ্গ পূজার ফলে আমেরিকানদিগের কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ ও বিহ্বল আবেগে তাহাদিগের পশ্চাতে দৌড়াইতে সুরু করিয়াছেন। হরিজনদিগকে যাহারা চরম অভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও কখন কখন চরম নির্য্যাতনও করিতে দ্বিধা করেন না, তাঁহারাই যদি আবার শ্বেতাঙ্গ সকল জাতি বহির্ভূত "ম্লেচ্ছ"দিগকে ভক্তির আসরে উচ্চাসনে বসাইয়া আনন্দ বোধ করেন, তাহা হইলে অনেক স্বাধীনতা কামী, স্বজাতি গৌরবের সংরক্ষণকাঙ্ক্ষী ভারতবাসী সেই দৃশ্য দেখিয়া স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন। বিদেশীর পক্ষে নিজ আচার ব্যবহার পরিধান বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ভারতীয় রূপ পরিগ্রহণ খুবই অস্বাভাবিক। বলা যাইতে পারে ইহা একপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ। অন্তরে ভক্তি জাগ্রত হইলে কোনও কোনও মানুষ ঐরূপভাবে নিজ বেশ ও আকৃতি ছাড়িয়া অন্যভাবে ঘুরিতে ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে শিখাইয়া পড়াইয়া ভক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকান চালানী মনোভাব এই দেশের বক্ষে প্রোথিত করিয়া তাহাতে ফল ফলাইবার চেষ্টা করা হয়, সেইরূপ প্রচেষ্টা সততই সন্দেহের সৃষ্টি করিবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের সাংবাদিকগণও এই সকল চালানী ভক্তির ব্যাপারীদিগকে আত্ম প্রচারের সুযোগ দান করিয়া জনসাধারণকে ভ্রান্ত ধারণার পথে চালাইতে সাহায্য করিতেছেন।

শেখ আবদুল্লার পুনরাবির্ভাব

শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরে আবার জনসমক্ষে উপস্থিত

হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা সম্ভবতঃ ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবার। সেই জন্য তিনি মিউ-নিসিপ্যালিটির পথে জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়াছেন ও সকলকে জানাইতেছেন যে তাঁহার কোন রাষ্ট্রীয় মতলব নাই। অনাহুতভাবেই বলিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ইউ. এন.কে দিয়া গঙ্গা-কাবেরী খালের সাফাই গাওয়ানো

ডাঃ কে. এল. রাও খুবই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তিনি গঙ্গার জল নানাভাবে ব্যবহার করাইয়া যাহাতে আর ফরাক্কা বাঁধের (ও কলিকাতার) জলাধিক্যমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে তাহার ব্যবস্থা বিশেষ তৎপরতার সহিত করিয়া চলিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বাংলাদেশকে কতটা জল দেওয়া আবশ্যক তাহা লইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের কথা উঠাইয়া কলিকাতা বন্দরের জলের ব্যবস্থা খর্ব করা। পরে তিনি উত্তর প্রদেশ ও বিহারের চাষের সুবিধার জন্য ২০০ শতাধিক খাল কাটিয়া সেচ ব্যবস্থা করাতে মনোনিবেশ করেন। ঐ সঙ্গে আসে গঙ্গা হইতে জল লইয়া কাবেরীর জলস্রোতের সহিত মিলাইয়া দক্ষিণ ভারতের জলকষ্ট দূর করিবার পরিকল্পনা। এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের যাহাতে কোন তীব্র সমালোচনা না হয় সেইজন্য ডাঃ রাও গঙ্গা-কাবেরী পরিকল্পনাটি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পেশ করান। ডাঃ রাও কিন্তু কলিকাতা বন্দরের জল শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। গঙ্গা-কাবেরীর কথা আবার তাঁহার মনে বিদেশীদিগের মতে বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিল। ডাঃ রাও ঐ ইউ. এন.-এর বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শদাতা হিসাবেও এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিবেন। সমস্ত ব্যাপারটা হইল একটা সাজাইয়া-গুছাইয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার মত চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ইউ. এন. হইতে যাহারা আসিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে ২০০০ খৃঃ অব্দে ভারতের এত জলাভাব হইবে যে ভারতকে একটা অতি বৃহৎ জলের আড়ত খাড়া করিতে হইবে। অতঃপরে ভূমধ্যস্থ জল যে অগাধ পরিমাণে উপরে তুলিয়া ব্যবহার করা হইবে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত জল লবণমুক্ত করিয়া ব্যবহারের আয়োজনও হইবে সে কথা ডাঃ রাও ও ইউ. এন.-এর মহারথীগণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কেন? গঙ্গা-কাবেরী খাল কখনও হওয়া উচিত হইবে না। ডাঃ কে. এল. রাও-এর পদত্যাগও প্রার্থনীয়। গঙ্গা হইতে কাবেরী এক হাজার মাইলেরও দূরে অবস্থিত। মধ্যে আছে বহু বৃহৎ বৃহৎ নদী ও উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলের বাধা। গঙ্গার জল তুলিয়া পাহাড় পার করিয়া দাক্ষিণাপথে বহাইবার পরি-কল্পনা কষ্টকল্পিত ও বহু ব্যয়সাধ্য। এইরূপ জটিল উপায়ে একটা সহজ কার্য্যসাধন চেষ্টাকে চলিত ভাষায় নাসিকা বেষ্টন বলা হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্যে ডাঃ রাও আত্মনিয়োগ করিয়া স্বদেশে-বিদেশে অঘটন ঘটাইবার জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে জাতির জনসাধারণকে জড়াইয়া ফেলিয়া ট্যাক্সের দায়ে বাসন বিক্রয় করিতে বাধ্য করার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এই সকল কারণেই আমরা মনে করি যে ডাঃ কে. এল. রাও মন্ত্রী হিসাবে নিজ কর্ত্তব্য যথাযথ-ভাবে করিতে সক্ষমতা দেখাইতেছেন না।

শ্রীঅরবিন্দঃ শতাব্দী অর্ঘ্য

শান্তশীল দাশ
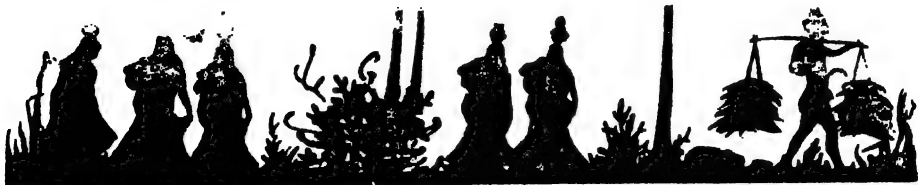
মহতী তপস্যা এক তোমার জীবন!
মানব মঙ্গল ব্রত, চিত্ত ঊর্ধ্বমুখী,
দেবত্বের উত্তরণ চাই ধরণীতে।
এক পৃথিবীর বুকে একই সে-মানুষ
থাকবে সহজ সুখে, সর্বগ্লানিহীন
জীবনের মহৈশ্বর্য্য ভোগ ক'রে—সেই
তপস্যা তোমার পূত সারাটি জীবন!
আপন কক্ষের মাঝে দীর্ঘ রাত্রিদিন
লোকচক্ষু অন্তরালে নিঃশব্দে একাকী
কাটালে দুশ্চর সেই মহাসাধনায়।
তারপর সিদ্ধকাম, দিব্য জীবনের
বাণী দিলে বিশ্বজনে। বিমুগ্ধ জগৎ
তোমার চরণপ্রান্তে রাখে নম্রনত
প্রণামের অর্ঘ্যখানি শ্রদ্ধায় গৌরবে।

একত্বমনুপশ্যতঃ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সকলেই সুখী হোক্, হোক্ নিরাময়;
কেহ যেন দুঃখ নাহি পায় এ সংসারে।
কার নিন্দা করো তুমি? জ্বলিছে অক্ষয়
বিশুদ্ধ আত্মার শিখা আধারে, আধারে।
উলঙ্গ আত্মার কাছে কোথা দেশ, কাল?
বাঁধিবারে চাও তারে বন্ধনে সীমার?
লঙ্ঘিয়া পর্ব্বতমালা, সমুদ্র বিশাল
শাশ্বত, চূড়ান্ত সত্যোপলব্ধি আত্মার
সর্ব্বমানবের চিত্ত দিব্য চেতনায়
উদ্ভাসিয়া তোলে নিত্য। জ্যোতির নির্ঝর
নিয়ে আসে অজ্ঞানের মহাতমসায়।
নগ্ন আত্মা—বিশ্বে তার কোথা নাই ঘর?
ঐক্যের এ অনুভূতি সম্পদ যাঁহার—
কোথা শোক? কোথা মোহ? কোথা দুঃখ তার?

ছেলেদের পাততাড়ি

কুঁজোর কাহিনী

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

হারু মাঝি, তার বউ পার্ব্বতী আর তাদের তিনটি ছেলে, বাঙ্গাপাড়া গ্রামে বাস করত। হারু অতি গরীব, নিজের ক'টি ঘটি-বাটি ছাড়া আর কিছুই তার ছিল না। জমিদারের ক্ষেতগুলি চাষ করে বছরের ধানটা কোনমতে জোটাত আর এই জমিটুকু ও কুঁড়ে ঘরটির জন্যও তাকে খাজনা দিতে হোত। প্রথম কয়েক বছর হারুর অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তারপর তার দুর্দিন আরম্ভ হোল— একে একে তার হাঁস-পায়রাগুলি সব রোগের ধাক্কায় শেষ হলো; তারপর ক্ষেতের ধানগুলিও জলের অভাবে শুকিয়ে গেল। শেষে মাত্র একটি গাই তার বাকি রইল। তিনটে ছেলে আধপেটা খেয়ে আছে আর জমিদারের খাজনাও বাকি, কাজেই হারু মহা ভাবনায় পড়ল।

"এখন আমরা কি করি বল ত?" সে পার্ব্বতীকে রোজ জিজ্ঞেস করতে লাগল।

তার বউ বললো, "তুই এক কাজ কর—কালকেই গরুটাকে হাটে বেচে দে, তারপর যাহোক করে খাজনাটা দিয়ে দে।"

পাশের গ্রামের হাটে পরদিন গরুটা বেচা হবে ঠিক করে তারা শুতে গেল।

ভোরবেলা হারু গরুটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গরুর পেছন পেছন হেঁটে চলেছে হারু মাঝি, গরমে ক্রমে গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। কোথাও একটি পুকুরও দেখা যায় না। কাজেই অতি কষ্টে শুকনো গলায় সে হেঁটে চলতে লাগল। দুপুরবেলা একটি বড় আমবাগানের পাশে এসে পৌছল। চারিদিকে বড় বড় গাছ, তাতে আম ফলে রয়েছে আর মাঝখানে একটি সুন্দর পুকুর। হারুর এ-সব দেখে চোখ জুড়াল। সে গরুটাকে একটা গাছে বেঁধে সোজা পুকুরে নেমে মনের আনন্দে হাতে-মুখে জল দিল ও খেল। এরপর গাছতলায় বিশ্রাম করবে বলে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর তার নাসিকাধ্বনি চারিদিক মাতিয়ে তুলল।

হঠাৎ কানের কাছে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কে যেন চিৎকার করে উঠল, "হারু, ও হারু, ওঠো ওঠো—" হারু চমকে গিয়ে চট্ করে উঠে বসে দেখল যে, তার পাশে একটি ছোট্ট বামন বেঁটে লোক, দাঁড়িয়ে আছে। তার পরণে পায়জামা, কামিজ গায়ে, পায়ে নাগরাই জুতো ও মাথায় একটি ছোট্ট জরির কাজ করা টুপি।

হারু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি মিঞা তুমি কি আমায় ডাকছিলে?"

মিঞা বললো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ছাড়া এখানে আর কে আছে তোমাকে ডাকবার? তা তুমি গরুটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ বল ত?"

হারু বললো, "এটাকে পাশের গ্রামের হাটে বিক্রি করতে যাচ্ছি।"

"—তা অতদূর না গিয়ে ওটাকে আমাকে বিক্রি করে দাও না?"

হারু বললো, "তুমি কত দেবে?"

লোকটা হাতের নিচের থেকে একটি ছোট মোরাদাবাদি কাজ করা পিতলের কুঁজো বার করে বললো, "আমি তোমাকে এই কুঁজোটা দেব।"

হারু সেটা দেখে 'হা হা' করে হাসতে শুরু করল। "আরে মিঞা, আমি কি এতই বোকা যে একটা পিতলের কুঁজো নিয়ে তোমাকে এত দামী গরুটা দেব?"

লোকটা ভীষণ রেগে, চেঁচিয়ে উঠে বললো, "নাও বলছি, ভাল হবে না আমার কথা না শুনলে। বাড়ি গিয়ে মেঝেতে একটা সাদা কাপড় পেতে তার উপর কুঁজোটা রাখবে। তারপর বলবে 'কুঁজো তোমার কাজ করো'—তখন দেখবে কিরকম জিনিস তোমাকে দিচ্ছি।"

হারু হাঁ করে জিজ্ঞেস করল, "তবে এটা কি যাদু-খেলা দেখাবে?"

মিঞা বললো, "হ্যাঁ, তাই একরকম বলতে পার। নিয়েই যাও না বাড়ি, তোমার যদি কোন লাভ না হয় তো আমাকে এটা এখানেই ফিরিয়ে দিয়ে যেও।"

হারু তখন গরুটা তাকে দিয়ে কুঁজোটা তুলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ভয়ে ভয়ে বাড়িতে ঢুকবে এমন সময় পার্ব্বতী কোথা থেকে এসে হাজির হোল। "কি গো, গরুটা বেচে কত পেলে? ঐ কুঁজোটাই বা কে দিল?"

হারু ঢোক গিলে বললো, "আরে ওটা দিয়েই তো মিঞা আমাদের গরুটা কিনল।"

তার বউ হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল; পরে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁটাটা তুলে এনে তাকে বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলো—"হতভাগা আপদ কোথাকার। এত দামী গরুটা দিয়ে এই বাজে কুঁজোটা নিলে? এখন আমরা খাজনা দেব কি করে? আর ছেলেপিলের মুখেই বা কি দেব?"

হারু বললো, "আরে বাবা, অত রাগ করছ কেন? দেখিই না এটাতে যাদু আছে কি না, তারপর চেঁচিও।"

আর কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে পার্ব্বতী কিছুটা শান্ত হলো। কুঁজোটা এরপর বার করে হারু মেঝেতে চাদর পেতে তার উপর রাখল। কি আশ্চর্য্য, "কুঁজো কাজ দেখাও" বলতে না বলতে দু'টি ছোট্ট মানুষ তার থেকে বেরিয়ে এলো। নিমেষের মধ্যে তাদের কুঁড়ে ঘরটি নানা রকমের দামী জিনিসে ভরে গেল; সোনা-রূপার রেকাব ও থালার উপর মূল্যবান্ পোশাক, মুখরোচক খাবার, মোহর ও গয়না চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। লোকদুটি এরপর কুঁজোর ভিতর ঢুকে পড়ল।

হারু ও তার বউ হাঁ করে এইসব ব্যাপার দেখতে লাগল। তারপর ছেলেপিলে নিয়ে মহা আনন্দে তারা হাপুস্-হুপুস্ করে সেইসব খাবার খেতে লাগল। এরপর হারুর কপাল ফিরল। এক-একটি থালা বিক্রি করে তারা মাস-ছয়েক করে আরামে খাওয়া-দাওয়া করল, লোকজন রেখে চাষ-বাস ঠিক হলো, ও শেষে জমিদারকে তার খাজনা যা পাওনা ছিল সব শোধ করে দিল। গ্রামের সকলে বললো, "হারু মাঝির কপাল ফিরেছে।"

জমিদারবাবুর কিন্তু কৌতূহলে মন ভরা, "হারু বেটা রাতারাতি কি করে বড়লোক হলো?" সে রোজ হারুর বাড়ি যাওয়া-আসা করতে লাগল আর তাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। শেষে একদিন হারু কুঁজোর কথাটা তাকে বলেই ফেললো। জমিদারের মন হিংসায় ও লোভে ভরে উঠল; শেষকালে কিনা বেটা হারুর কাছে এই অমূল্য ধন রইল? জমিদার ঠিক করল, যেমন করেই হোক এই কুঁজোটা তাকে পেতেই হবে।

ছলে-বলে-কৌশলে তখন সে কুঁজোটা নেবার চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে রোজ জমিদারবাবু হারুর বাড়ি গিয়ে গিয়ে তাকে কুঁজোটা বিক্রি করতে রাজি করাল। হারু বললো, "বাবু, আমাকে পাঁচ'শ টাকা যদি দাও তো কুঁজোটা দি।"

জমিদারবাবু সঙ্গে সঙ্গে টাকা বার করে হারুকে দিলেন ও কুঁজোটা নিয়ে মহা আনন্দে বাড়ি ফিরে গেলেন। হারুও খুব খুসি হয়ে টাকাগুলো পার্ব্বতীকে

দিয়ে বললো—"আমাদের আর জীবনভোর কোনও অভাব থাকবে না,বুঝলি পাৰ্ব্বতী—এ-টাকার বেশি তো আর গরুটা বেচে পেতাম না। তা এখন ঘরে সোনা-রূপোও এসেছে, আর এই টাকাটাও পাওয়া গেল।"

কিন্তু কিছুদিন পরেই হারুর অবস্থা আবার যেমন ছিল তেমনই হোল। বেশি বৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেতের ফসল সব ভেসে গেল, বাড়ি-ঘরের ছাদ ঝড়ে উড়িয়ে দিল, আর শেষ পর্য্যন্ত আবার হারুকে খাজনা দিতে হবে বলে নতুন গরুটা বেচবার ব্যবস্থা করতে হোল। আবার সেই পথ দিয়ে চলেছে হারু মাঝি, গরুটাকে ঠেলতে ঠেলতে। মনটা তার খুবই খারাপ, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে যাচ্ছে এমন সময় সেই ছোট্ট মিঞা সামনে এসে দাঁড়াল।

"কি হারু, আবার গরু নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"আর কি বলব মিঞা, আবার আমার সব্বো গেছে। সোনাদানাগুলো তো চোরে নিল আর ঝড়জলে বাড়ি-ঘর চাষ-বাস সব গেল। এই দেখ না, আবার গরুটা বেচতে যাচ্ছি হাটে।"

"কেন, কুঁজোটা তোমায় কি হোল?" মিঞা বললো।

হারু বললো, "আর বল কেন মিঞা, নিজের দোষেই সেটাও গেল। জমিদারবাবু পাঁচ'শ টাকা দিয়ে সেটা কিনে নিলে।"

মিঞা বললো, "হারু, সত্যি তুই বড় বোকা। যা হয়েছে তা নিয়ে আর মন খারাপ করিস্ না, এই নে আর একটা কুঁজো—এটা ওই প্রথমটার মত ব্যবহার করবি বাড়ি গিয়ে।"

হারু কুঁজোটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল। "পাৰ্ব্বতী, ও পাৰ্ব্বতী, শোন্ শোন্—আমাদের আবার কপাল ফিরেছে।"

পার্ব্বতী দৌড়ে এসে দেখে হারুর হাতে আর একটি কুঁজো। দু'জনে মনের আনন্দে মেঝেতে চাদর পেতে কুঁজোটা তার উপর রেখে বললো, "কুঁজো, তোমার কাজ করো।"

নিমেষের মধ্যে দুটো ছোট্ট লোক বেরিয়ে এলো কুঁজোর ভেতর থেকে। তাদের পরণে কোপ্‌নি, হাতে গদা, আর বেরোবামাত্র দমাদম করে গদা চালিয়ে তারা হারুকে পিটতে শুরু করল।

"বাবা রে—মা রে,—গেলুম—গেলুম" বলতে বলতে হারু পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু লোকদুটো বেশ কিছু প্রহার দেবার পর নিজেরাই কুঁজোর ভেতর ঢুকে গেল। হারু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, তারপর বললো, "পাৰ্ব্বতী, এ তো আরো বিপদ হলো দেখছি—এখন কি করা যায়?"

পাৰ্ব্বতী বললো, "দূর বোকা, এই কুঁজোটাও বাবুর বাড়ি নিয়ে যা। তারপর যতক্ষণ না আমাদের সেই ভাল কুঁজোটা ফেরত দেয় ততক্ষণ এরা বাবুকে মারতে থাকবে। যা, শীগ্‌গির যা এটা নিয়ে।"

হারু কুঁজোটা নিয়ে দৌড়ে বাবুর বাড়ি গেল। সেটা দেখেই জমিদার ভাবলেন 'ভাই তো, দুটো কুঁজো পাওয়া গেলে দ্বিগুণ বড়লোক হওয়া যাবে।' হারুকে তাই তাড়াতাড়ি আরো পাঁচ'শ টাকা বার করে দিয়ে কুঁজোটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "কুঁজো, তোমার কাজ করো।" সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটো লোক গদা হাতে লাফিয়ে বেরুল, আর জমিদারবাবুকে ধরে এত জোরে মারতে লাগল যে সে "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে চিৎকার শুরু করল।

হারু তখন বললো, "বাবু, আগে আমাকে সেই কুঁজোটা ফেরত দাও তারপর এদের থামতে বলব।"

বাবু বললেন, "শীগ্‌গির তোর দুটো কুঁজো নিয়ে এখান থেকে দূর হ।"

হারু তাড়াতাড়ি আগের কুঁজোটা তাকের উপর থেকে তুলে নিলে—পরে অন্যটার ভিতর পালোয়ান দুটো ঢুকে পড়বার পর, সেটাকেও নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

তারপর হারু মাঝির অনেক ধন-সম্পদ্ হলো আর তাদের পরিবারের সকলের বরাবরের মত কোনও অভাব রইল না।

দীন দরদি গীতিকার অতুলপ্রসাদ

শ্রীভাগবতদাস বরাট

বঙ্গবানীর সাহিত্য ও সঙ্গীত ভাণ্ডারে যে সব গুণী-গুণীর দান অবিস্মরণীয়, অতুলপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। তাই বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ একটি স্মরণীয় নাম। সঙ্গীতপিপাসু জনগণের মানস পটেও তিনি সম্মানীয়। বিশেষ করে বর্ত্তমান বৎসর তাঁর জন্ম শতবর্ষ পূর্ত্তির কাল। দিকে দিকে স্মরণ সভার আয়োজন। এবং আলোচনার মাধ্যমে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। এই আলোচনার উদ্দেশ্যও ঠিক তাই।

যাঁকে চোখে দেখি নি, নাম শুনে যাঁর ধামের ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছি, যে মহাপুরুষ সিংহের সঙ্গীত স্রোতে বাংলার আকাশ বাতাস আজও মুখরিত,—তাঁর বিষয়ে কিছু বলা আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু আমি তো আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি, সে রকম দুঃসাহস আমার নেই। আমি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। এবং তা দোষাবহ নয়। যদি এই লেখায় কোন সুরের সৃষ্টি হয়, তা হলে সেই সুরের রেশটুকুই গীতিকার ও সুরকার অতুলপ্রসাদের চরণ স্পর্শ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এ যেন তুলসী পাতায় তুলসীর পূজা।

অতুল প্রসাদের সাহিত্য বলতে তাঁর সঙ্গীতকেই বুঝায়। কারণ তিনি তাঁর অনবদ্য সঙ্গীত লহরীর মধ্যে স্মরণীয় আছেন। উপন্যাস নয়, গল্প নয়, কবিতা নাটক, এমন কি প্রবন্ধ পর্যন্ত নয়,—শুধু মাত্র গান লিখে অর্থাৎ গানের কথারূপ রচনা করে স্বদেশবাসীর স্মৃতিলোকে একটি অতুলনীয় নামরূপে যিনি আজও জাগরূক তিনিই অতুলপ্রসাদ। সার্থক কবি রাম-প্রসাদ ছাড়া এমন সিদ্ধি লাভ আর কার ভাগ্যে ঘটেছে?

নদীর স্রোতের মতই কালের গতি। প্রভাব অপ্রতিহত। কাল স্রোতের ঢেউ-এর হিসাব রাখার প্রয়োজন বোধ ইতিহাস করে। স্রোতের জলে ভেসে আসে নানা খড় কুটো ও আবর্জনা সেই সঙ্গে কিছু ফুলও ভেসে আসে। অতুলপ্রসাদ তেমনি স্রোতের জলে ভেসে আসা একটি সুবাসিত ফুল। যে কালে সেই ফুলটি ভেসে এসেছিল সেই কাল গত হয়েও জাগরূক। দেশবাসী শতবর্ষ পরেও তাঁকে স্মরণ করছে। কাল তাই কাল প্রসবিনী। ফুলটি আজ কালের আর এক ঠেলায় ভেসে গেছে। কিন্তু তার সুবাস আজও বাংলার বাতাসে ছড়িয়ে আছে। আর থাকবেও চিরকাল।

অতুল প্রসাদ প্রায় আড়াই শ'র মত গান লিখেছেন। সেই সব গান তাঁর গীতিগুঞ্জ, কাকলি এবং কয়েকটি নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ। কিছু সংখ্যক গানের স্বরলিপি তাঁর কাকলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত। তবে তাঁর গান শুধুমাত্র স্বরলিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বরলিপির বাইরেও সেই সব গানের অনেকখানি কলাকৌশল রয়েছে। আর সেই সব কলাকৌশল প্রয়োগ করা সব শিল্পীদের দ্বারা সম্ভবও নয়। হিন্দুস্থানী ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুশীলনে যে সব শিল্পীদের প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে, শুধুমাত্র তাঁরাই পারবেন তাঁর গানে কলাকৌশল প্রয়োগ করতে। কারণ, অতুলপ্রসাদের সুর সৃষ্টিতে রয়েছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

সুরের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অতুল প্রসাদের সমগ্র গীতি সম্ভার মুখ্যতঃ দুটি ধারায় প্রবাহিত। প্রথম ধারাটি হল বাউল সঙ্গীতের ধারা এবং দ্বিতীয় ধারাটি হিন্দুস্থানী সুরের ঢঙ বাংলা গানে অনুপ্রবেশ। এই দুই ধারাতেই অতুলপ্রসাদের অতুলনীয় সিদ্ধিলাভ। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন বাংলার মানুষ। ঢাকায় তাঁর জন্ম। কিন্তু কর্মজীবন ও সাধন জীবনের সেরা সময় কেটেছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান লখ্‌নউ শহরে। লখ্‌নউতে থাকাকালীন তিনি সেখানকার হিন্দুস্থানী ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংস্পর্শে আসেন। বড় বড় ওস্তাদ ও বাঈজীরা তখন লক্ষ্ণৌতে আসতেন। বড় বড় জলসা হত। অতুল প্রসাদ সেই সব সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রায় যোগ দিতেন এবং আকণ্ঠ সঙ্গীত সুধা পান করতেন। এই ভাবে তাঁর মধ্যে দানা বাঁধে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বনিয়াদ। তাঁর সাধন জীবনের নেপথ্যে জন্মগত পরিবেশ ও কর্মজীবন গত পরিবেশ—উভয় পরিবেশের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু সুরের দিক থেকে যাই হোক, তাঁর গানের মূল ভাব হচ্ছে 'প্রেম' এবং 'ভাগবত প্রেম'। যে প্রেম কখনো দেবতা, কখনো প্রকৃতি, কখনো স্বদেশ, কখনো মানব এবং কখনো বা বিবিধ বিষয়কে আশ্রয় করে গুঞ্জরিত হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গীত সাগরে নিমজ্জিত হয়েও অতুলপ্রসাদ তাঁর মনকে বেঁধে রাখতে পারেন নি। তাঁর মন সব সময় আর্ত্ত ও দুঃস্থ জনগণের ব্যথায় কাঁদত। এবং তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করতে উদারচেতা অতুল-প্রসাদ অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করতেন না। তাঁর কাছে গিয়ে কেউ শূন্য হাতে কোন দিনই ফিরে আসে নি। তাঁর কাছে যেমন প্রার্থীর শেষ ছিল না, তেমনি লক্ষ্ণৌতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাঁর দানে পুষ্ট না হয়েছে। তাঁর স্ত্রী হেমকুসুমও দানশীলা ছিলেন। স্থানীয় এমন কোন মহিলা সংস্থা ছিল না যা তাঁর দানে উপকৃত হয় নি। লক্ষ্ণৌতে ব্যারিষ্টারী করে তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন, তেমনি তার সদ্ ব্যবহারও করেছেন দীন দুঃখীদের সাহায্য করে। বাংলা সঙ্গীত ও সাহিত্যের জন্যও তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করে গেছেন। লাহোরে থাকা কালীন তিনি প্রতিদিন একটি কেসের জন্য হাজার টাকা ফি নিতেন। কিন্তু সেই টাকায় পাঁচ শ' টাকার জামা, কাপড়, চাদর ও কম্বল কিনে তিনি দরিদ্রদের বিলিয়ে দিতেন। কেউ এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে বিরত হতে উপদেশ দিলে তিনি বলতেন,—"যে দেশে থেকে আমি দুহাতে অর্থ উপার্জন করছি, সে দেশের লোকদের জন্য কিছু ব্যয় না করলে কি হয়?" যে কয়দিন তিনি লাহোরে ছিলেন সেই কয়দিন এইরূপ বিতরণ পর্ব চলেছিল। নলিনী হালদারকে তিনি প্রায়ই কথায় কথায় বলতেন,—'নলিনী বাবু, ভগবান করুন আমি যেন এই ভাবে দিতে দিতেই যাই।'

অতুলপ্রসাদের বিরাট সংখ্যক কৃপা প্রার্থীদের মধ্যে যেমন অসংখ্য বিধবা রমনী ছিলেন, তেমনি ছিল বহু সংখ্যক দুস্থ ছাত্র। প্রায় পঞ্চাশ জন দুস্থ ও দরিদ্র ছাত্রকে নিজের খরচায় লেখাপড়ার সব ব্যবস্থাই তিনি করে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু দান করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না বা কর্তব্য শেষ হল ভাবতেন না। তিনি চেষ্টা করতেন কিভাবে প্রার্থীদের স্বাবলম্বী করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তৎকালে গড়ে ওঠে "গোখলে ষ্টুডেন্ট সোসাইটি"। প্রফেসার উপেন্দ্রনাথ বল্লের, চেষ্টায় ক্যানিং কলেজের বোর্ডারদের নিয়ে ঐ সংস্থা গড়ে ওঠে। সংস্থার জন্মকাল ১৯১৩-১৪ সালে। অতুল-বাবু এই সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত রাজনারায়ণ শুক্লা, পণ্ডিত নারায়ণ মিশ্র, সুরেন্দ্র বিক্রম সিং, কৃপাশঙ্কর নিগম, এস এন রায়, হরগোবিন্দ দয়াল, শ্রীবাস্তব, বসন্তকুমার ঘোষাল প্রভৃতি। সংস্থার প্রধান কাজ ছিল নিরক্ষর-দের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং গরীব দুস্থ ছাত্রদের সাহায্য দিয়ে পড়ানো। অতুলবাবুর প্রেরণায় ছাত্রদের মধ্যে এতখানি উৎসাহ দেখা গিয়েছিল যে তাঁরা তাঁদের চাকর-ঠাকুরদের জোর পূর্বক ধরে নিয়ে

গিয়ে পড়াতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুইল স্কুলে নিরক্ষরদের পড়ানো হত।

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট চারাগাছ দেখে আকাশের পরিধি সংকীর্ণ। কিন্তু বড় হয়ে সেই চারাগাছ শাখা-প্রশাখায় যখন আকাশ দেখে তখন তার কাছে আকাশের অসীমতা ধরা পড়ে। আমিও তেমনি ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকে অতুলপ্রসাদের কবিতা পড়ে এবং অর্থপুস্তকে তাঁর জীবনী পাঠে বিশেষ কিছু জানতাম না। পরে নানা জনের নানা কথামালায় ও আলোচনাদিতে আর একটু যেন বেশী জানলাম। তাই ভাবি দু'একটা টাকা পকেট থেকে পড়ে গেলে কিম্বা কেউ ছিনিয়ে নিলে মনে কাঁটা ফুটে। কেউ হাত পেতে চেয়েও কিছু পায় না। কারণ মোহবদ্ধ চোখ আমাদের। টাকাকে মাটির মত তুচ্ছ ভাবতে পারি নি। অথচ উঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই টাকার মোহে আবদ্ধ হন নি। জনমানবকে ভাল বেসেছেন বলেই প্রাণ কেঁদেছে। এই সব চিন্তা করলে তাঁরা যে কত উদার ও নির্লিপ্ত তা সহজেই বোঝা যায়।

সঙ্গীতের 'স' জানি না। 'গা' নিয়েও সাদাসাধি করি নি। ওর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যও লাভ করি নি। তাই অপরের তুলা ফুল চেয়ে নিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করলাম। বাহাবা লাভের আকাঙ্খায় নয়, মনের স্বতঃস্ফুর্ত্ত আবেগে। জানি না আমার এই পুষ্পাঞ্জলী তাঁর চরণ স্পর্শ করবে কি না। তাঁর ভাবাতেই বলি—"আর কেহ যদি না পারে সহিতে
তুমি তো বন্ধু সহিবে।"

দেশ-বিদেশের কথা

ইউগ্যাণ্ডার কাণ্ডকারখানা-1

ইউগ্যাণ্ডার বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি ইদি আমিন প্রথম জীবনে বৃটিশ সামরিক বাহিনীতে যোদ্ধা ছিলেন ও সেই সময় ব্রহ্মদেশে জাপানীদের ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া লড়াই করিয়াছিলেন। ইদি আমিন ইহার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বৃটিশ সামরিক শক্তি যখন মাউ মাউ বিপ্লবীদিগের দমন চেষ্টায় বিশেষভাবে নিযুক্ত হয় তখন বৃটিশদিগের সহায়তায় পূর্ণ উদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন। মাউ মাউ দমন কার্য্যে তিনি এতই সক্ষমতা প্রদর্শন করেন যে তাঁহার বৃটিশ উপরওয়ালারা তাঁহাকে সামরিক কর্মচারীর পদে উন্নত করিয়া দেন। ইউগ্যাণ্ডা তখনও স্বাধীন হয় নাই। অতঃপর যখন ইউগ্যাণ্ডা স্বাধীন হইল ও ইদি আমিন সেদেশে একজন কেওকেটা হইয়া দাঁড়াইলেন তখন প্রারম্ভকালে বৃটিশ শক্তিকে নিজেদের পূর্ব্বযুগের সহায়কের সমর্থনে নিযুক্ত হইতে দেখা যাইত। কিন্তু পরে বৃটিশদিগের এই বন্ধুভাব আর থাকিল না; কারণ ইদি আমিন আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ চেষ্টায় অনেক সময় বৃটিশ বিরোধীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে দ্বিধা করিতেন না। আমিন স্বাধীন ইউগ্যাণ্ডার প্রথম প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্রক্ষেত্রে নানা প্রকার অখ্যাতিও হইয়াছিল। যথা সকলে বলিত যে কঙ্গোর স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সংগৃহীত যে অর্থ জমা হইয়াছিল, ইদি আমিন সেই অর্থ

নিজ কার্য্যে খরচ করিয়াছিলেন এবং ওবোটে তাঁহার এই দুষ্কার্য্যের কথা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবেন আশঙ্কায় ইদি আমিন ওবোটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাষ্ট্র ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিবার আয়োজন করেন। এই ষড়যন্ত্রে তিনি সক্ষমও হইয়াছিলেন।

এ হেন যে ইদি আমিন ইঁহার নিকট হইতে কোন সুনীতি কেহ আশা করিতে পারে না। ইউগ্যাণ্ডাতে ৯০০০ ইয়োরোপীয় নরনারী বাস করেন এবং ৮৮০০০ এশিয়াবাসীরও ঐদেশে নিবাস। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে ডাক্তার, যন্ত্রবিদ্, হিসাব লেখনে বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি বহুলোক আছেন এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আছেন ব্যবসাদার। ইদি আমিন, যে কোন কারণেই হউক, ঐ সকল এশিয়াবাসীদিগকে ইউগ্যাণ্ডা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন ও তাঁহারা সেই আদেশ অনুসারে নানা দেশে চলিয়া যাইতেছেন। এশিয়াবাসী লোকেদের মধ্যে বৃটিশ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক যাতায়াতের অনুমতি পত্র (পাসপোর্ট) আছে প্রায় ৬০০০০এর অধিক ব্যক্তির। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ইউগ্যাণ্ডা ছাড়িয়া বৃটেনে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। বৃটেন কিন্তু এই পরিণতি সুবিধাজনক মনে করিতেছেন না। কারণ বৃটেনে বহু রাষ্ট্রনেতা আছেন যাঁহারা কৃষ্ণাঙ্গদিগের বৃটেনে আগমন পছন্দ করেন না। তাঁহারা বৃটেনকে শ্বেতাঙ্গদিগের নিবাস ভূমি হিসাবেই রাখিতে চাহেন। এই সকল নেতাদিগের মধ্যে প্রধান ইনখ পাওয়েল। তিনি শ্বেত-বৃটেন আদর্শের জন্য যথাসাধ্য কৃষ্ণাঙ্গ বিরুদ্ধ প্রচার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইউগ্যাণ্ডা হইতে যাঁহারা বৃটেনে আসিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন ২০০ শত ডাক্তার, ৩০০ যন্ত্র-বিশারদ, ৭০ ইঞ্জিনিয়ার, ১০০ হিসাবকার্য্য বিশেষজ্ঞ, ২০ অস্ত্র চিকিৎসক ও ৪০০০ ব্যবসায়ী। অনেকের মতে ইঁহারা বৃটেনে আসিলে বৃটিশ জাতির লাভই হইবে, ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নাই। ক্যানাডা বলিয়াছেন তাঁহারা ৮০০০/১০০০০ ইউগ্যাণ্ডাবাসী এশীয় নরনারীকে ক্যানাডায় আসিয়া থাকিতে দিতে প্রস্তুত আছেন। অষ্ট্রেলিয়াও কিছু কিছু লোক লইবার জন্য প্রস্তুত। কিছু কিছু লোক ভারতেও চলিয়া আসিতে চাহেন। শেষ অবধি ঐ সকল মানুষ নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িবেন বলিয়াই মনে হয়।

বৃটেন ইদি আমিনের কার্য্যে সন্তুষ্ট নহেন এবং ইউগ্যাণ্ডাকে বৃটেন যে এক কোটি পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন সেই সাহায্য এখন দেওয়া হইবে না, জানান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যে সকল বৃটিশ কর্ম্ম-কৌশলী ব্যক্তি ইউগ্যাণ্ডাতে আছেন তাঁহারা ঐ দেশ হইতে চলিয়া আসিবেন বলা হইয়াছে। অদ্যাবধি বৃটেন ইউগ্যাণ্ডাকে চার কোটি পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং ঐ সাহায্য বন্ধ হইলে ইউগ্যাণ্ডা বিশেষ অসুবিধায় পড়িবেন বলিয়া মনে হয়। ইদি আমিন কিন্তু জোর গলায় "ইহাকে তাড়াইব", "উহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইব" ইত্যাদি বলিয়া চলিয়াছেন। ইয়োরোপীয়দিগের যাহা ব্যবসা বাণিজ্য আছে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে বলা হইয়াছে। বৃটেন ইউ, এন, কাউন্সিলে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু তাহার কি ফল হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ইদি আমিন কথায় যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ তিনি শ্বেতাঙ্গদিগকে ততটা ঘাঁটাইতেছেন না। যথা বিদেশীদের সম্পত্তি কাহার কি আছে বলিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, শুধু ইউরোপীয়দিগকে সেই নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। আমিন বলিয়াছেন বৃটেন অর্থ সাহায্য না দিলেও আরও একশত দেশ আছে যাহারা অর্থ দিবার জন্য প্রস্তুত আছে। কিন্তু বিশ্ববাসী মনে করেন না যে ইদি আমিনের মত মানুষ রাষ্ট্র অধিনায়ক থাকিলে কেহ অকাতরে টাকা দিবার জন্য ইউগ্যাণ্ডার দিকে হস্ত প্রসারিত করিবেন।

ভারত-পাকিস্থান হকি খেলা

হকি খেলাতে ভারত বহুকাল পৃথিবীতে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছু কাল হইল ভারতের সেই শ্রেষ্ঠত্ব আর নাই। অনেকে মনে

করিতেছেন যে, ভারত পূর্ব্বে যে সকল দেশের সহিত হকি প্রতিযোগিতা করিতেন, বর্ত্তমানে সেই সকল দেশ খেলায় এত উন্নতি করিয়াছে যে ভারত আর সেই সেই দেশের খেলোয়াড়দিগকে পরাজিত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বস্তুতঃ সেই হইয়াছে কি? ভারত কি পূর্ব্বের স্থায় হকি খেলায় সক্ষমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছেন? যদি পারিতেন তাহা হইলে সম্প্রতি যে পাকিস্থান ভারতকে পরাজিত করিল সেই খেলাতে পাকিস্থান প্রথম ১৬ মিনিটে ভারতকে দুই গোল দেওয়ার পরে ভারত এক ঘণ্টার অধিককাল পাকিস্থানের গোলের নিকটে মহাতেজে ছোটাছুটি ও ঘোরাফেরা করিয়াও কোনমতে একটাও গোল দিতে পারিলেন না কেন? বহুবার ভারত পাকিস্থানের গোলের সম্মুখে গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বলটিকে যত্রতত্র মারিয়া পাঠাইয়া গোল দেওয়াতে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বযুগে ভারতের খেলোয়াড়গণ খোলা গোল পাইয়াও গোল দিতে পারিলেন না এরূপ অবস্থায় প্রায় কখনও পড়িতেন না। দুই-একবার এইরূপ হইলে তাহাকে অবস্থা-বিপর্যয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু দশ-বিশবার ঐরূপ ঘটিলে তখন বলিতেই হয় যে বিষয়টা খেলোয়াড়দিগের অক্ষমতা প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং ভারতকে হকি খেলার দিকে নজর দিয়া উৎকৃষ্টতর খেলোয়াড় জোগাড় করিতে হইবে। শিক্ষা, সাধনা, পরিশ্রম, রীতিপদ্ধতি পরিবর্ত্তন, সকল দিকেই দেখিতে হইবে কি করিয়া হকি ক্ষেত্রে ভারতের হারান গৌরব পুনরাবির্ভূত হইতে পারে। পাকিস্থানের খেলোয়াড়গণ ভারতীয়দিগের সমজাতীয় বলিলে কোনও ভুল হয় না; কারণ পাকিস্থান বিগত পঁচিশ বৎসর ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বদাই ভারতের অঙ্গ ছিল। ক্রীড়া ক্ষেত্রের ঐতিহ্য বহুভাবেই ঐ দুই রাষ্ট্রের একই। পাকিস্থান অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতকে পরাজিত করিলেও পরে পশ্চিম জার্ম্মানীর নিকট হার মানিতে বাধ্য হ'ন। হারিয়া তাঁহারা যতটা অখ্যাতি অর্জ্জন করেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসভ্যতা করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বদনামের ভাগী হইয়াছেন। পাকিস্থানের পরাজয়ও তাঁহাদের হকি খেলায় পারদর্শিতা হানি হইতেই উদ্ভূত। বিশ্ব হকি ক্ষেত্রে এই প্রথম ভারত ও পাকিস্থান পরাজিত হইয়া ইয়োরোপের হস্তে ঐ ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠত্ব তুলিয়া দিলেন। ইহার কারণ কিছুটা ইয়োরোপীয় হকি খেলোয়াড়দিগের হকিতে উন্নতি করার মধ্যে নিহিত; কিন্তু অধিকন্তঃ ইহার জন্য দায়ী ভারত ও পাকিস্থানের হকি খেলায় অবনতি। পাকিস্থান ইহার জন্য কি ব্যবস্থা করিবে তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতকে হকি ক্ষেত্রে উন্নততর শিক্ষা ও অভ্যাসের আয়োজন করিতে হইবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারতীয় হকিদল বাছাই করার কাজ যাঁহারা করিতেন, তাঁহারা সেই কাজ এখন অধিক কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগের সাহায্যে করাইবার জন্য নিজেরা ঐ কার্য্যে ইস্তফা দিয়া সরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু শুধু তাহা করিলেই চলিবে না। ভারতের সর্ব্বত্র খেলার মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্কুল-কলেজে খেলা বাধ্যতামূলক করা অবিলম্বে আবশ্যক। ক্রীড়া বিশেষজ্ঞগণ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল ক্রীড়ার উন্নতি সাধন চেষ্টা করিবেন; সে ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশে চীনের ভিটো

পাকিস্থান হইতে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হইলে পরে পৃথিবীর প্রায় একশতটি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। অতঃপর বাংলাদেশ পৃথকভাবে বিশ্ব জাতিসংঘের সদস্য হইবার জন্য উক্ত সংঘের নিকট নিজ আর্জ্জি পেশ করেন। কিন্তু ২৫শে আগষ্ট ঐ প্রস্তাব উত্থিত হইলে পরে চীন দেশ তাহাতে নিজ ভিটো বা আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশ নাকচ করিয়া দেন। চীনের এই আপত্তির মূলে আছে পাকিস্থানের প্রেরণা। পাকিস্থান এখনও মনে আশা পোষণ করেন যে বাংলাদেশ আবার পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইবে। এবং চীনকে সেইরূপ বুঝাইয়া পাকিস্থান তাহাকে দিয়া ভিটো দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে

বাংলাদেশ আর কখনও পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইবে না এবং তাহার জাতীয়তা পৃথক ও নিজস্ব। সুতরাং চীনের ভিটো দিবার কোন সার্থকতা নাই। ইহাতে বিষয়টা বিলম্বে স্থির হইবে এবং সেই বিলম্ব কোন ভাবেই পাকিস্থানের কোন লাভের কারণ হইবে না। পাকিস্থান যখন বাংলাদেশ ধর্ষণে মাতিয়া ছিল, চীন তখন পাকিস্থানকে নানাভাবে তাহার পাপকার্য্যে সাহায্য করিয়াছে। এক সময় লোক পাঠাইয়া সাক্ষাৎ-ভাবে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করিতেও চীন দ্বিধা করে নাই। কিন্তু কোন কিছুতেই বাংলাদেশ আর পাকিস্থানে সংযুক্ত থাকে নাই। তেমনি চীন যতই ভিটো দিক না কেন, বাংলাদেশের তাহাতে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না একথা একান্তভাবে সত্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া ধর্ত্তব্য।

বাঙ্গালীর অবস্থা

বৃটিশ আমলে বাঙ্গালীরা বৃটিশের চাকুরী ও বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া দিন কাটাইত। সেই কারণে বৃটিশ শাসকগণ একাধারে বাঙ্গালীদিগের সহায়তা লাভ ও দমন চেষ্টা করিয়া, এক ভাইকে বেতন দিয়া নিজকার্য্যে নিয়োগ আর এক ভাইকে হাতকড়া দিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিত। আজ বাঙ্গালী স্বাধীন দেশের অংশীদার স্বাধীন নাগরিক। কিন্তু তাহার অবস্থা বৃটিশ যুগ হইতে মূলতঃ কোনভাবে উন্নত বা স্বাধীনতার আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসা ক্ষেত্রে পূর্ব্বে যেখানে বৃটিশ জাতীয় ব্যবসাদারগণ তাহার উপর প্রভুত্ব করিত এখন সেই স্থলে অপর কোন অবাঙালী হুকুম চালাইয়া থাকে। খাদ্য তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কারণ তাহার প্রধান খাদ্যবস্তুগুলি অন্য প্রদেশ হইতে আনা হয় বলিয়া তাহা আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাই। বস্ত্রও তাহার অন্য প্রদেশের কারখানায় প্রস্তুত ও ঔষধাদিরও সেই অবস্থা। বাঙ্গালী পূর্ব্বে যেমন একটি কক্ষে তিন জন বাস করিত এখনও তাহার সেই অবস্থা। এবং বাড়ীর মালিক অনেক স্থলেই অবাঙ্গালী। বাঙ্গালীর নির্ভর চাকুরীর উপর কিন্তু চাকুরী নাই অথবা অবাঙ্গালীর প্রতিযোগিতায় পরহস্তগত। এই অবস্থায় স্বাধীন বঙ্গদেশের জনসাধারণ যাহাদের নেতৃস্থানীয় বলিয়া অনুসরণ করিতেছে তাহারা অবাঙ্গালীর দ্বারা প্ররোচিত, প্রবঞ্চিত ও শাসিত। ফলে এই দেশের মানুষের কোনও সত্যকার স্বাধীনতা নাই। সে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অপরের প্রভুত্বাক্রিষ্ট ও অপরের দ্বারা শোষিত।

সাময়িকী

মৎস্যের অভাবে ভেক

বাঙ্গালী জাতিকে অনেকে ভারতবর্ষের ফরাসী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, বাঙ্গালী জাতি ঠিক ফরাসীদিগের মতই রসপিপাসু ও ভোজনবিলাসী। ফরাসীদিগের যেরূপ সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, ও "আড্ডা"তে পরম আগ্রহ; বাঙ্গালীরাও ঠিক তেমনিই কৃষ্টিক্ষেত্রের বিভিন্ন রসের সমঝদার। ফরাসীদিগের সহিত বাঙ্গালীদিগের পার্থক্যও ছিল অনেক। যথা ফরাসীগণ মহাযোদ্ধা জাতি, বাঙ্গালীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেরণায় প্রেম-ধর্ম্ম অনুগামী। বিগত ৫০।৬০ বৎসর কিছু বঙ্গবাসী খোল করতাল ছাড়িয়া বোমা ও বন্দুক ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেও সেই পরিবর্ত্তন ঠিক জাতিগত হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাহা হইলেও একটা আশা দেখা দিয়াছে যে, প্রয়োজনের তাড়নায় বাঙ্গালী অস্ত্রধারণ করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে দ্বিধা করিবে না।

ফরাসীদিগের মত্ত-প্রস্তুত কার্য্যে খ্যাতিও পৃথিবীতে অতুলনীয়। বাঙ্গালী মত্ত-প্রস্তুত কার্য্য জানে না কিন্তু তাহার রসগোল্লা ও সন্দেশ বিশ্ববিখ্যাত। ফরাসীদিগের রন্ধনে মৎস্তের ব্যবহার নাই বলিলে চলে। বিভিন্ন চতুষ্পদ ও পক্ষী মাংসই অধিক ব্যবহৃত। বাঙ্গালীর মৎস্ত রন্ধন পৃথিবীর কোন দেশের তুলনায়ই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে না। ফরাসীদিগের আর-একটা খ্যাতির ক্ষেত্র হইল মহিলাদিগের সাজ-পোশাকে। প্যারীর ফ্যাশন দুনিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালীর রেশম ও তুলার সুতায় বোনা শাড়ী সর্ব্বত্র আদৃত। বাঁকুড়া বীরভূমের তসর গরদ প্রভৃতির বিদেশেও প্রচুর চাহিদা। একটা বিষয়ে ফরাসীরা জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহা হইল ভেক-মাংস ভক্ষণে। ইয়োরোপীয় অপরাপর মাংসভূক্‌দিগের মধ্যে ভেক-মাংসের প্রচলন নাই। শুধু ফরাসীদিগের মধ্যেই উহা চলে। বাঙ্গালীরাও ভেক-মাংস কোথাও কোথাও ভোজন করিত বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু তাহার ব্যাপক ব্যবহার ছিল না। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে মৎস্তের অভাবে বাজারে ভেক বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ অধিক করিয়া ভেক-মাংস ভক্ষণ করিতেছে। ইহা হইলে বাঙ্গালীর ও ফরাসীর কৃষ্টি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতির সাদৃশ্য আরও বর্দ্ধিত হইবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে। তাহার নাম ছিল "বেঙ্গল গেজেট"। প্রকাশক জেমস অগাষ্টাস হিকি। রাজা রামমোহন রায় ১৮২১ খৃঃ অব্দে "সংবাদ কৌমুদী" প্রকাশ করেন ও ঐ পত্রিকাকে প্রথম ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ধরিলে আমাদের সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাসের বয়স ১৫১ বৎসর হয়। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ইতিহাস এই দেশে ইংরেজী সাবাদপত্রগুলির সহিত জড়িত থাকায় সংবাদ কৌমুদী প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশের পরে ইংরেজদিগের দ্বারা প্রকাশিত "ইণ্ডিয়া গেজেট", "ক্যালকাটা গেজেট" ও "বেঙ্গল হরকরা" ভারতবর্ষের সংবাদপত্র জগতে দেখা দেয়। ইহা হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বৎসরে। ঐ সময় ইয়োরোপে বিপ্লবের আবহাওয়া প্রবলভাবে বহমান ছিল। ফরাসী বিপ্লব তখন বিশ্বের জনমনে এমন একটা অস্থিরতা জাগ্রত করিয়াছিল যে, তাহার ফলে কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। ঐ দেশে পরে নেপোলিয়নের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাহাতে বিপ্লবী চিন্তাধারায় নানাভাবে বাধা দিবার চেষ্টা পাশ্চাত্যের সকল দেশেই আরম্ভ হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ঢেউ ভারতবর্ষ অবধি আসিয়া যায় এবং লর্ড ওয়েলেসলির শাসন যুগে সংবাদপত্রগুলিতে যাহাতে শাসকদিগের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব জাগাইবার চেষ্টা না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উইলিয়াম ডুয়েন ছিলেন "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড" পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহাকে ঐ সময় গ্রেপ্তার করিয়া ইংলণ্ডে চালান করিয়া দেওয়া হয়। লর্ড ওয়েলেসলি নিজের চীফ সেক্রেটারীর মারফত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও দমন কার্য্য চালাইতেন। তাঁহার বিধি নিয়ম-আইনের রূপ গ্রহণ করে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে। এই আইন অনুসারে সকল সংবাদপত্রকে যাহা ছাপিবে তাহা চীফ সেক্রেটারীকে দেখাইয়া লইতে বাধ্য করা হইল। সংবাদপত্রগুলিকে লাইসেন্স লইতে হইল এবং তাহারা শাসকদিগকে খুশী রাখিতে না পারিলে তাহাদের লাইসেন্স খারিজ করার ব্যবস্থা হইল। এই সকল নিয়ম প্রায় কুড়ি বৎসর মোতায়েন ছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে এই সকল নিয়মের কড়াকড়ি হ্রাস হইলে সিল্ক বাকিংহামের "ক্যালকাটা জার্ণাল" ও ও রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী" এবং "মিরাৎ-উল-আখ্‌বার" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কিন্তু জন্ অ্যাডাম যখন অল্পদিনের জন্য বড়লাট হইলেন তখন তিনি সিল্ক বাকিংহামকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদের অভিব্যক্তি আরম্ভ করিলেন। "ক্যালকাটা জার্ণালের" সহঃ সম্পাদক স্যাণ্ডফোর্ডকেও গ্রেপ্তার করিয়া স্বদেশে

পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরে স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট রাজা রামমোহন রায়ের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ১৮২৩ হইতে লাইসেন্স বিধি আবার জারি করা হইল। এই নিয়মের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সুপ্রীম কোর্টে একটি স্মারকপত্র দাখিল করেন। তাহাতে যাহা লেখা হয় তাহা অংশত উদ্ধৃতঃ করা হইল :

Every good ruler, who is convinced of the imperfection of human nature and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire ; and therefore he will be anxious to afford to every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained liberty of publication is the only effectual means that can be employed.

অর্থাৎ, যে সকল শাসক বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করেন, তাঁহারা যদি মানবচরিত্রের দোষ ও অক্ষমতা স্বীকার করেন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাহা হইলে যাহাতে সকল ব্যক্তি সহজে তাঁহাদিগের নিকট শাসন-পদ্ধতির দোষ ও অভাবের কথা উত্থাপিত করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা অটুট রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থার অতি সহজ ও সরল উপায় হইল সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করা।

সুপ্রীম কোর্ট এই স্মারকপত্র অগ্রাহ্য করেন। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রতিবাদে "মিরাৎ-উল-আখবার" প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রায় ১৫০ বৎসর কাল এই দেশে প্রয়োজন হইলেই চালিত হইয়াছে। ইহার সহিত বিদেশীর সাম্রাজ্যবাদের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ লক্ষিত হয়, কারণ স্বাধীন দেশে সচরাচর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ অথবা দমন চেষ্টা শুধু তখনই হয় যখন শাসক-গোষ্ঠী স্বৈরাচারে প্রমত্ত হইয়া মানব স্বাধীনতার আদর্শগুলি ভুলিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডির অন্যায় শক্তি প্রতিষ্ঠার দিকেই আত্মনিয়োগ করেন। এই কার্য্য যে শুধু আইন করিয়াই করা হয় এমন কোনও কথা নাই। অনেক সময় অন্য উপায়েও সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা হয়। সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া না দেওয়া একটা বড় উপায় বলিয়া ব্যবহার করা হয় শুনা যায়। যাহারা নিজেদের সংবাদপত্রে শাসকদিগকে সমর্থন করিয়া অথবা তাঁহাদের দোষ না দেখাইয়া সংবাদাদি প্রকাশ করেন, তাঁহারা যথেষ্ট সরকারী বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকেন। যাঁহারা সমালোচক তাঁহারা সেই আর্থিক সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। তৎপরে আছে শাসক-সমর্থক শক্তিধারী ব্যক্তিদিগের দ্বারা চালিত উৎপীড়নের কথা। যথা, অনেক সময় যদি কেনে সংবাদপত্র শাসকদিগের কঠিন সমালোচনা করেন, তাহার বিক্রয় ও প্রচারে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। সেইরূপ হইলে স্বাধীনতা-প্রয়াসী সকল ব্যক্তিই তাহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারেন ও হওয়া উচিত। মত-বিরোধ থাকিলেই জোর করিয়া মত প্রকাশে বাধা দেওয়া হইবে, এই রীতির সমর্থন করা যায় না।

বহুরূপী কালোবাজার

কালোবাজার ও সাদা বাজার বলিয়া দুইটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দ্রব্য কেনাবেচার প্রতিষ্ঠান নাই। যেখানে আইনতঃ পাওয়া দ্রব্যাদি আইন অনুযায়ীভাবে বিক্রয় করা হয়, সেখানেই অনেক সময় বেআইনীভাবে পাওয়া বস্তুনিচয় বেআইনীভাবে বিক্রয় করা হয়। আইন গ্রাহ্য উপায়ে সংগৃহীত দ্রব্যাদিও অনেক সময় বেআইনীভাবে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য, রাজকর ফাঁকি দেওয়া; অর্থাৎ ব্যবসার লাভ পুরাপুরি না দেখাইয়া রাজকরের পরিমাণ হ্রাস চেষ্টা করা। ইহা ঠিক কালো বাজারের ব্যবসা নয়, রাজকর ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা মাত্র। ইহা ব্যতীত অনেক সময় ন্যায়তঃ যে-সকল মাল দোকানদারের হস্তে আসিয়া থাকে তাহাও অংশতঃ ন্যায্য মূল্যে যাহাদিগের প্রাপ্য তাহারা না

লইলে, অধিক মূল্যে যাহাদিগের প্রাপ্য নহে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হয়। ইহা এক প্রকার অর্দ্ধ-কালো বাজার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুরাপুরি কালো বাজার হইল, যে বাজারে বেআইনীভাবে লব্ধ বস্তু বেয়ানীভাবে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এই সকল বিক্রয় সামগ্রী নানা পথে দোকানদারের নিকটে আসিয়া থাকে। চোরাই মাল, মাশুল ফাঁকি দিয়া আমদানি করা বিদেশী মাল, আবগারী শুল্ক না দিয়া উৎপন্ন বস্তু গোপনে আনিয়া বিক্রয়ের মাল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই বাজারের দ্রব্য সরবরাহ হয় বহু পথে। খাদ্যবস্তু সরকারী আড়তে না দিয়া গোপনে বিক্রয় এই বাজারের বৃহত্তম ব্যবসায়। পাঁচ কিলো দশ কিলো হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সহস্র কুইনটাল পর্য্যন্ত এইভাবে বিক্রয় হয়। গ্রামের দরিদ্র স্ত্রীলোকগণও এই ব্যবসায় করে ও তৎসঙ্গে এই কার্য্য করে বহু ক্রোরপতি বিরাট বিরাট আড়তের মালিকগণ।

কর্ম্মীদিগকে বোনাস বা অতিরিক্ত অর্থ দিবার ব্যবস্থা

পূজা-পার্ব্বণের সময় বহুকাল হইতেই একটা রীতি প্রচলিত আছে যে, যাহারা কাজকর্ম্ম করে তাহাদিগকে জামা কাপড় মিষ্টান্নাদি বিতরণ একটা কর্ত্তব্য কার্য্য। এই দিবার ব্যবস্থায় যে অর্থব্যয় করা হয়, তাহার সহিত, যাহারা পায় তাহাদিগের বেতনের কোন তুলনা করিয়া কেহ কখনও শতকরা কত অংশ তাহা হিসাব করে নাই। তবে বলা যায় যে, অবস্থা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ভৃত্যদিগকে বৎসরে কাপড় জামা মিষ্টান্নাদি যাহা দিয়া থাকেন তাহার মূল্য অর্দ্ধ হইতে এক মাসের বেতনের সমান নিশ্চয়ই হয়। এই রীতি কতকালের পুরাতন রীতি তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা যে বহু শতাব্দী হইতেই চলিয়া আসিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারখানা ও বৃহৎ আকারের কারবার স্থাপন হইবার পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মী নিয়োগ-কারী মালিকগণ ছিলেন তাঁহারাও মনে হয় নিজেদের নিযুক্ত কর্ম্মীদিগকে পূজা-পার্ব্বণের সময় এই প্রকার দান করিতেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পূজা-পার্ব্বণের সময় কিছু পাইবার আশা যাহারা শ্রমজীবী তাহারা করিয়াই থাকে এবং ঐরূপ আশা করার একটা সামাজিক ঐতিহ্যও আছে। কারখানা কারবার স্থাপিত হইবার পরে পূজার সময় অথবা বৎসরে এক বার কিছু বেতনাতিরিক্ত অর্থ লাভ চেষ্টা কর্ম্মীগণ করিয়াই থাকে এবং ঐরূপ অর্থ দেওয়ারও একটা রীতির প্রচলনও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইন করিয়া কারখানার শ্রমিকদিগকে বাৎসরিক বেতনের শতকরা ৪ ভাগ বোনাস হিসাবে দেওয়ার রীতিও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে করা হইয়াছিল। এখন ঐ ৪ ভাগকে বাড়াইয়া ৮-১।৩ ভাগ করার চেষ্টা চলিতেছে, অর্থাৎ বাৎসরিক এক মাসের বেতন অতিরিক্ত যাহাতে শ্রমিকগণ পায় সেইরূপ ব্যবস্থা। ইহাতে অনেকে বলিতেছেন যে, বহু ব্যবসায়ে কোনও লাভ হয় না এবং সেই সকল ব্যবসায় ১২ মাসে ১০ মাসের মাহিনা দিতে সক্ষম নাও হইতে পারে। শ্রমিকগণ বলিতেছেন, লাভ হউক বা নাই হউক ঐ বোনাস সকলকেই দিতে হইবে নিয়ম করা হউক। কেহ কেহ বলিতেছেন লাভ হইলে দিতে হইবে এবং না হইলে দিবার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, এই রীতিই ন্যায়সঙ্গত। একটা কথা সহজবোধ্য। তাহা হইল এই যে, শ্রমিক মালিক সম্বন্ধ বিচারে তাহাই ন্যায্য যাহা উভয় পক্ষ মানিয়া লয়। জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ব্যয়ের হিসাব করিয়া অথবা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান দেখিয়া বেতনাদি নির্দ্ধারণ কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না যদি না উভয় পক্ষ একমত হইয়া সেই বেতন বোনাস বা অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন। সুতরাং বর্ত্তমান বোনাসের হার নির্দ্ধারণের বিষয়েও ঐ নিয়মই প্রয়োগ করা কার্য্যকর হইবে। অঙ্ক কষিয়া বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিপুরায় স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী

ত্রিপুরা সাপ্তাহিকে প্রকাশ :

১৪ই আগষ্টের অন্তিম মুহূর্ত। ১৫ই আগষ্টের অভ্যুদয় লগ্ন। আমাদের তখন মধ্যরাত্রি। সাধারণতঃ যে সময়টায় নগর বিশ্রাম গ্রহণ করে, পুরবাসীরা আশ্রয় নেয় সুষুপ্তির কোলে, কর্মচঞ্চল নাগরিক জীবনে বিরাজ করে স্তব্ধতা—এই দিন সেই সময়টায় রাজধানী আগরতলার বিরাম ছিল না; কর্মচঞ্চলতা যেন বাড়িয়াই গিয়াছিল। চোখে ঘুম আসিবে কি! আলো ঝলমল প্রাসাদ মালা। প্রাকারে প্রাকারে বর্ণাঢ্য দীপাবলী দেওয়ালী উৎসবের অভিনব সংস্করণ। হাওয়ার গাড়ীর অবিরাম ভোঁৎ ভাৎ হর্ণ আর চাকার ঘড়ঘড়ানি আর ছুৎ ছ্যাৎ ধ্বনি নৈশ স্তব্ধতাকে নির্বাসনে পাঠাইয়া উৎসবমত্ততার আগমনী বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল।

আবাহনী মন্ত্র সংগীত বাজিতেছিল ত্রিপুরা বিধান সভার অলিন্দে। প্রবেশদ্বারে প্রহরার পরিবর্ত্তে অভ্যর্থনার সমারোহ। বিধানসভা কক্ষ জমজমাট। অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী. বিধান সভার সদস্যগণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব আসনে সমাসীন। প্রেস গ্যালারীতে স্থানাভাব। দর্শকের গ্যালারীতে অর্দ্ধশতাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ একদিকে, অন্যদিকে সব পদস্থ আমলাবর্গ। বিচিত্র সভা। মহতী অধিবেশন-আয়োজন বিরোধী সদস্যগণের (দুইজন সি, পি, এম সমর্থক নির্দল সদস্য সহ সি, পি, এম, এর ১৭ জন সদস্যের) অনুপস্থিতিতে কলঙ্কিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-স্মারক-অধিবেশনের শুভ সূচনা করিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত। প্রথমে প্রণতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন অমর শহীদগণের উদ্দেশে; সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইলেন সমাগত মুক্তি সংগ্রামীদের। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলেন স্বাধীনতার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সংকল্পের ক্রমবিবর্ত্তনী ধারা। অতীতকে অবলম্বন করিয়াই আবির্ভূত হয় বর্ত্তমান এবং এই বর্ত্তমানই উৎস বা ভিত্তি হয় ভবিষ্যতের। স্বাধীনতার পাঁচশ বছর পূর্ত্তি দিবসে অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতার গ্লানিটাকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং ঐ গ্লানি মুছিবার সংকল্পই ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার ভাষণে। বর্ষকাল ব্যাপী স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী উৎসব পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনগুপ্ত বলেন যে, "উৎসবের মাধ্যমে আমরা মহতী কল্যাণব্রত সাধনের সংকল্প গ্রহণ করিতেছি; এই ব্রত উৎযাপনে যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের সমান অধিকার সেই হেতু সমদায়িত্ব পালনেও জনগণকে আগাইয়া আসার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।"

"এ উৎসব আনুষ্ঠানিক উৎসব নহে, বর্ষকাল ব্যাপী কল্যাণ ব্রত মহতী উৎসব হবে।" বিধান সভার বিশেষ স্মারক অধিবেশনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিমুখী অভিযানের (অহিংস ও সহিংস) ক্রমবিকাশের ধারা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং শহীদগণের প্রতি নিবেদন করেন গভীর শ্রদ্ধা। শ্রীভৌমিক তাঁহার ভাষণে ভারতের এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

রাত্রি ১১টা ৫৮ মিনিটে ভাষণ সমাপ্ত। অধ্যক্ষের প্রস্তাবানুসারে সমাগতগণ শহীদগণের স্মৃতি পূজায় দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটায়, জাতীয় সঙ্গীতের সুর-সঙ্গীত দ্বারা রাজ্য বিধানসভার বিশেষ এই স্বাধীনতা স্মারক অধিবেশনের সমাপ্তি।

অধিবেশনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রুত হয় উৎসব আরম্ভের তূর্য্যনাদ। পরপর পঁচিশটি তোপ নিনাদে আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করা হয় ১৯১২ সালের ১৫ই

অত্যাচারের নামান্তর বলে গণ্য হবে। টেলিফোন গ্রহীতাদের এখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়েছে।

গণতন্ত্রে দায়িত্ব নিতে হয়, কৈফিয়ৎ দিতে হয়। পয়সা খরচ করে ফোন রাখা, অথচ wrong call বা wrong connection-এর জন্য অযথা পয়সা দিতে হবে; ১৯৯ নং-এ ডায়াল করে উত্তর পাওয়া যাবে না; খেয়ালখুশি মতো বিল আসবে; অথচ পত্র দিলে তার জবাব মিলবে না; খোঁজ নিতে গেলে অভদ্র আচরণ করা হবে—এই পরিস্থিতিটা সহ্য করা সম্ভব নয়। জেনারাল ম্যানেজার সহ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও দুঃসাধ্য। কোনো ব্যাপারেই কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না।

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যদি এই অবস্থার প্রতিবিধান করতে ব্যর্থ হন তবে এই সিদ্ধান্তে আসা ভিন্ন উপায় থাকবে না যে, এ রোগের বড় অপারেশন প্রয়োজন। টেলিফোনের ব্যবসায়ে সরকারী মনোপলি ঘুচিয়ে দিতে হবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ বন্ধ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি, কষ্টভোগ ও অসুবিধা হইয়াছিল ও তাহার জের এখন অবধি চলিতেছে। আগষ্ট মাসের শেষার্দ্ধে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে সকল চেক জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা সেপ্টেম্বরের ১০।১১ তারিখ অবধি আদায় হয় নাই ও যাঁহাদিগের টাকা তাঁহারা শূন্য হস্তে জনবিক্ষোভের অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনিয়াই নিজেদের অর্থকষ্ট সহ্য করিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছেন। এই বিষয়ে "যুগবাণী" বলিয়াছেন:

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এক পক্ষেরও বেশি কাল যাবৎ কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। ঐ ব্যাঙ্কের একটি বিভাগে একটি রেকর্ড সাপ্লায়ের পদের আর কোনো প্রয়োজন না থাকায় ঐ পদটির বিলোপ ঘটাতে চাওয়া হয়েছে। ঐ চতুর্থ শ্রেণীর পদটিতে যে নিযুক্ত আছে তার চাকরি যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তার বেতন হ্রাসও ঘটবে না, এমনকি তাকে আর একটি বিভাগে রেকর্ড সাপ্লায়ের পদে যোগ দিতে বলাও হয়েছে। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ইউনিয়ন এই সামান্য অদল বদল ঘটাবার প্রস্তাবে এতদূর ক্ষুব্ধ হয়েছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম তারা অচল করে দিয়েছে। তাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত নয়—কারণ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নতুন পদ সৃষ্টি করা বা একটি বর্তমান পদের বিলোপ ঘটানোর অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে;—পদাধিকারীর কোনো বৈষয়িক ক্ষতি করা না হলে এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির অজুহাত থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত যদি কর্তৃপক্ষের আচরণ অন্যায় ও অসঙ্গতও হয় সেক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিবাদ ও দাবী জানাবার বহু উপায় আছে, আদালতেও বিচার প্রার্থনা করা চলে। কিন্তু সেসব কোনো পথেই না গিয়ে, বৈধ সমস্ত পথে চেষ্টা না করেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার একান্ত অসঙ্গত ও জুলুমবাজির পথ ইউনিয়ন বেছে নিয়েছে। ঐ ইউনিয়নের পিছনে যে পার্টিরই মদত থাকুক না কেন, কোনোমতেই আমরা এই তাণ্ডব সৃষ্টিকে সমর্থন করতে পারি না। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের নামে কিংবা বিপ্লবের নামেও এই দায়িত্ববোধহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে সমর্থন করা চলে না।

মাত্র একজন চতুর্থশ্রেণীভুক্ত কর্মচারীর ব্যক্তিগত অভিমানকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে গোটা পূর্ব ভারতের অর্থ-নৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলে অর্থ-নৈতিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। গত পনেরো দিনে শতাধিক কোটি টাকার লেনদেন বন্ধ হয়ে রয়েছে। সরকারী কাজকর্ম চালানোও মুস্কিল হয়ে পড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প ও ছোট ব্যবসাদার চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। ঐখান অর্থ-নৈতিক ধমনীগুলি এসে সম্মিলিত হয়েছে; ঐখানে থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয় দেশের অর্থ-নৈতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। একটি মাত্র ব্যক্তির ঠুনকো মর্যাদায় ঈষৎ আঘাত লেগেছে বলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সর্বভারতের, অর্থনীতিতে রক্তপ্রবাহ স্তব্ধ করে দেওয়া

হয়েছে। একটি লোকের একই বিল্ডিংয়ে এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে বদলি হবার আদেশের ফলে জাতির জীবনে দুর্বিপাক ডেকে আনা হয়েছে।

এই ঔদ্ধত্য, এই দুঃসাহস ঐ ব্যক্তিটি কিংবা তার ইউনিয়ন কোথা থেকে পায়? কংগ্রেস নেতারা, মন্ত্রীরা, বিশেষত যুব নেতারা বারবার বলছেন যে তাঁরা চান উৎপাদন বাড়ুক, বিশৃঙ্খলা বন্ধ হোক, ট্রেড ইউনিয়ন দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করুক, অর্থনীতিকে ধ্বংস করার পথ থেকে সরে দাঁড়াক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে তাণ্ডব চলছে তাতে কি কংগ্রেস নেতাদের কামনা সফল হবে? তবে তাঁরা আজ নীরব কেন? কেন রাজ্য সরকার অত্যন্ত মিষ্ট বুলির আশ্রয় নিয়েছেন? রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতাকে কে বা কারা প্রশ্রয় দিচ্ছে?

যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কর্মীরা সরকারী অফিসে অফিসে চেয়ার দখলের আন্দোলন করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দিনের পর দিন অন্যায় ও গর্হিত আচরণ করে চললেও তার পাল্টা আন্দোলন করার কথা কি একবারও মনে পড়ছে না যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের নেতাদের? তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেবার যে প্রয়াস হয়েছিল ভিন্ন রূপে, ভিন্ন পন্থায় সেই একই প্রয়াস আবারও যেন না চলে। অঙ্কুরেই সর্বনাশের সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলা ভালো। কয়েকটি সঙ্ঘবদ্ধ লোকের হুঙ্কারের কাছে দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে যেন না দেওয়া হয়।

জ্যোতি বসুর বিদেশ ভ্রমণ

শ্রীজ্যোতি বসুর লণ্ডন গমন লইয়া নানা প্রকার অপপ্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই বিষয়ে "যুগজ্যোতি" পত্রিকা বলেন:

সি পি এম্ নেতা জ্যোতি বসু কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে গিয়াছেন এবং সেখানে কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতাও করিয়াছেন। তিনি কি বলিয়াছেন তাহার কোন রিপোর্ট ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে বাহির হয় নাই। তবে যতদূর লোকপরম্পরায় শোনা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় পশ্চিম বঙ্গের "আধা-ফ্যাসিষ্ট বিভীষিকা, নির্বাচনী জালিয়াতি ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি" প্রভৃতিই ছিল তাঁহার ভাষণের মুখ্য বিষয়বস্তু। এই ভাষণের ফলে লণ্ডনে ভারতীয়দের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে ঠিক জানি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মহলে যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যরা প্রশ্নের বন্যা বহাইয়া দিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে—জ্যোতি বসুকে কেন লণ্ডনে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল, কেন তাঁহার বিদেশ যাত্রার পাশপোর্ট মঞ্জুর করা হইল, কে তাঁহাকে টাকা দিল, পার্কষ্ট্রীটের কোন হোটেলের মালিক তাঁহাকে টাকা দিয়াছে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যোতি বসু স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিক। তিনি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহাকে বিদেশ যাইবার অনুমতি না দিবার কোন কারণই নাই এবং এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠা বিশেষ ভাবেই আশ্চর্য্যজনক। গণ্ডায় গণ্ডায় সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার সদস্যরা যখন তখন বিদেশ সফরে যাইতেছেন কৈ তাঁহাদের বেলায় অনুমতি না দিবার প্রশ্ন তো কোনদিনই ওঠে না।

জ্যোতি বসু গ্রেট বৃটেনে ভারতীয়দের সর্বাধিক বৃহৎ সংগঠন "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েসন অফ গ্রেট বৃটেন" (Indian Workers, Association of Great Britain) নামক সংস্থার আমন্ত্রণে লণ্ডনে গিয়াছেন। তাই তাঁহার পাশপোর্ট মঞ্জুর না করিবার কোন অজুহাতই থাকিতে পারে না। টাকা কে দিয়াছে অবশ্য জানি না, তবে যাহারা আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাদেরই এই অর্থ যোগান স্বাভাবিক। পার্ক-ষ্ট্রীটের একটি হোটেলের মালিকের অর্থ দিবার যে কথা উঠিয়াছে তাহা অনর্থক জল ঘোলা করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ ভারতীয় মুদ্রায় এই ভ্রমণের

ব্যয় নির্বাহের কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহার জন্য প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতি অবশ্যই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একথা সঠিক ভাবে না জানা থাকিবার কথা নয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের "জনস্বার্থ" এর কথা বার বার বলিয়া অনর্থক ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, খবরটি সত্য না মিথ্যা তাহা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিলেই হইত। আর যদি কেহ কাহাকেও টাকা দিয়াই থাকে, তাহাই বা গোপন করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? বন্ধু-বান্ধব বা শ্রদ্ধেয় নেতাদের ব্যক্তিগত ভাবে স্বোপার্জিত অর্থদান করায় কোন বাধা নাই এবং ইহা অপরাধও নয়। শুধুমাত্র যদি ইহা "গিফট ট্যাক্স"-এর আওতায় আসে, তাহা হইলে ঐ ট্যাক্স দিতে হয়। অবশ্য এই পার্ক-ষ্ট্রীটের হোটেলটির কথা তুলিবার পশ্চাতে কংগ্রেস দলের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। দীর্ঘদিন ধরিয়াই প্রচার চালান হইতেছে যে জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকিবার কালে অবৈধ ভাবে ঐ হোটেলটি খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার বিনিময়ে তিনি ও তাঁহার দল প্রচুর লাভবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে যে যদি সত্যই মন্ত্রী থাকা কালীন জ্যোতি বসু অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন তো বর্তমান মন্ত্রীসভা তাহা তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করিতেছে না কেন। অন্য কয়েকটি রাজ্যে প্রাক্তন মন্ত্রীদের অবৈধ আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইয়াছে এবং ঐ কমিশনের রিপোর্টও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে জ্যোতি বসুর ব্যাপারেই বা তদন্ত করিতে বাধা কি ছিল? কোন নেতা অন্যায় বা অবৈধ কাজ করিয়া থাকিলে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে সমর্থন করিবেন না কিন্তু প্রকাশ্যে অভিযোগ না তুলিয়া কানাকানি ও ইসারা ইঙ্গিতে পরোক্ষ ভাবে কোন নেতার চরিত্র হননের চেষ্টা শুধুমাত্র অন্যায় নয়, হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত বিধান

ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকগণ ঐ দুই দেশে যাতায়াত করিতে হইলে যেরূপ অনুমতি-পত্র ব্যবহার করিবেন তাহার বর্ণনা "ত্রিপুরা" সাপ্তাহিক হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে:

আগরতলা, ২৬শে আগষ্ট॥ ভারত ও বাংলাদেশ সরকার উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হতে পাশপোর্ট ভিসা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সম্মত হয়েছে। এ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণের জন্য পারমিট প্রদান পদ্ধতি উঠে যাবে। ত্রিপুরার ভারত বাংলাদেশ পাশপোর্ট পলিটিকেল ডিপার্টমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী ইস্যু করবেন। উপরোক্ত কর্তৃপক্ষ ভারত বাংলাদেশ পাশপোর্ট রিনিউও করবেন। কোন ব্যক্তি একাধিক ভারতীয় পাশপোর্ট রাখতে পারবেন না, যথা বাংলাদেশ পাশপোর্ট, ভারত আন্তর্জাতিক পাশপোর্ট অথবা ভারত সিংহল পাশপোর্ট প্রভৃতি।

ভারত বাংলাদেশ পাশপোর্ট করতে খরচ পড়বে দশ টাকা। তিন বছর পর্য্যন্ত এ পাশপোর্টটি বৈধ থাকবে। এ 'পাশপোর্ট' পুনরায় তিন বছরের জন্য বলবৎ করা যায় এবং সেজন্য খরচ পড়বে পাঁচ টাকা (অথবা প্রতি বছর বা তার কোন সময়ের জন্য দুই টাকা)।

ভারতীয় নাগরিকগণ নির্দ্ধারিত ফরমে দশ টাকার চালান এবং নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটের অ্যাটেষ্টেড কপি সহ জমা দিতে হবে। পাশপোর্ট পেতে ইচ্ছুক সরকারী কর্মচারীদিগকে নির্দ্ধারিত ফর্মের সাথে স্ব স্ব বিভাগের প্রধানদের নিকট হতে আপত্তি নাই এমন একটি সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। জেলাশাসকের অফিসে এবং পলিটিকেল ডিপার্টমেন্টে দরখাস্ত ফরম পাওয়া যাবে।

১৫ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের পিতামাতা যে কোন জনের পাসপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যে সমস্ত ছেলে-মেয়ের বয়স ১৫ বছরের বেশী এবং যারা মাতাপিতার সাথে ভ্রমণ করবে না তাদেরকে পৃথক পাশপোর্ট করতে হবে। ১৯৭২

সালের ১লা আগষ্টের পর ভারত বাংলাদেশের যে সব নাগরিক অপরদেশ ভ্রমণ করতে যাবেন তাঁদেরকে ভিসা করতে হবে। বাংলাদেশের যে সব নাগরিক ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে ভারতে থাকবেন এবং ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরও ভারত থাকতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে "ভারতীয় মিশন এণ্ড পোষ্ট এবং রাজ্যসরকার ভিসা প্রদান করবেন। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা বিনা খরচায় দেওয়া হবে। বাংলাদেশের নাগরিকদিগকে প্রদত্ত সকল শ্রেণীর ভিসা সংরক্ষিত সীমাবদ্ধ এবং নিষিদ্ধ এলাকা ছাড়া ভারতের যে কোন অংশে ভ্রমণ এবং অবস্থান সম্পর্কে বৈধ থাকবে। বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক বৈধ ভিসায় ভারতে আসবেন এবং একাধারে ছয় মাসের বেশী ভারতে অবস্থান করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে" ফরেনার্স রেজিষ্ট্রেশান অফিস/পুলিশকর্তৃপক্ষের নিকট নামরেজিষ্ট্রী করতে হবে এবং রেসিডেনশিয়েল পারমিট নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী নিগ্রহ

নিজবাসভূমে পরবাসী হ'লে কবিতায় বলা হইয়াছে বহুযুগ পূর্ব্বে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঐ কথার অভিব্যক্তি শুনা যায় ২৫ বৎসর কাল হইতে বৃদ্ধ হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে বহুস্থলে সংখ্যা লঘিষ্ঠদিগের উপর যেরূপ উৎপীড়ন সজোরে পরিচালিত আছে দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে স্বাধীন মানুষের মানবীয় অধিকার প্রাপ্তি ভারতের বহু মানবের এখনও পূর্ণরূপে হয় নাই এবং কখন হইবে তাহাও অনুমান করা এখনও সম্ভব হইতেছে না। বিহার প্রদেশের সহিত যে সকল বাঙ্গালী ভাষাভাষীদিগের ভিটামাটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা বা পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চল, সেই সকল স্থানের বাঙ্গালী দিগকে জোর করিয়া হিন্দী ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহার করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টার কথা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে কোনও বিশেষ লাভ হয় নাই কারণ হিন্দী রাষ্ট্রভাষা করিবার অর্থ ইহাই হইয়া দাড়াইয়াছে যে হিন্দীভাষাভাষী প্রদেশগুলিতে যে সকল অ-হিন্দী-ভাষাভাষী সংখ্যা লঘিষ্ঠ ব্যক্তিরা বাস করেন তাঁহাদের নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দীকে মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

সে যাহাই হউক, এখন সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে, কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠেও বাঙ্গালী-দিগের নিজস্ব কোনও অধিকার থাকা সম্ভব হইতেছে না। ব্যারাকপুরের নিকটেও হিন্দী ভাষাভাষীগণ দল গঠন করিয়া বলিতেছে যে চাকুরীর অধিকার বাঙ্গালীর থাকিবে না, শুধু হিন্দী ভাষাভাষী গণই চাকুরী ক্ষেত্রে একাধিপত্য লাভ করিবে। টিটাগড়ের "মহাবীর ক্লাব" অবাঙ্গালীদিগের আখড়া ও ঐ ক্লাবের দলপতি শ্রীকৃষ্ণ শুক্লা। তিনি নাকি বাঙ্গালীদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়া ঐ অঞ্চলের সকল কারখানা যাহাতে শুধু অবাঙ্গালীদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার কোনও প্রতিকার ব্যবস্থা কেহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন না বলিয়া এই সকল ব্যক্তির বাঙ্গালী-নিগ্রহ চেষ্টা কোনও বাধা পাইতেছে না।

ভোগ্য বস্তুর মুল্য বৃদ্ধি

"লিংক" পত্রিকা বলিতেছেন যে, বিগত দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে ভারত সরকারের খাদ্য সংক্রান্ত কথাবার্ত্তাতে সুর বদলাইবার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ "খাদ্যবস্তু যথেষ্ট আছে, সকল প্রদেশের চাহিদা মিটান হইবে" ইত্যাদি কথা বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলা হইত; সম্প্রতি তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া একটা সন্দেহ ও অবস্থা তেমন সুবিধার নহে ভাব সরকারী বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে। এখন বলা হইতেছে, "সকল প্রদেশের চাহিদা যথা-সম্ভব মিটান হইবে—অবশ্য অপর সকল প্রদেশের চাহিদা বিচার করিয়া।" এখন মনে হইতেছে যে নব্বই লক্ষ টন খাদ্যবস্তু জমা করা হইলেই তাহাতে খাদ্যাবস্থা ঠিক করা হইয়া যাইবে না। পাইকারী দর বাড়িয়াই চলিতেছে। সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও পূর্ণ উদ্যম লক্ষিত হইতেছে না। খাদ্য সরবরাহ যথাযথভাবে চলিবে বলিয়া মনে হয় না।

আলোছায়া জানালায়—বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মডেল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১২/দাম পাঁচ টাকা।

কবি হিসাবেই বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা ইতিপূর্বে তাঁর কবিতা পাঠ করে যেমন তৃপ্তি পেয়েছি, তেমনই আনন্দ পেয়েছি 'বীরবাহু' ছদ্মনামে লেখা নিবন্ধগুলি পড়ে। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর আলোচনা গ্রন্থটিও সুধীমহলে সমাদৃত। সম্প্রতি তাঁর উনিশটি ছোটগল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন মডেল পাবলিশিং হাউস।

গল্পগুলির মধ্যে বীরেন্দ্র বাবুর কবিচিত্তের অনুভব একটি নিবিড় সহৃদয়তায় প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের সহজাত বেদনাবোধ সরল ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে উদ্ভাসিত, অন্যদিকে তাঁর সরল কৌতুকবোধ জীবনের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনায় উচ্ছ্বাসিত। জীবনকে তিনি বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে দেখেছেন তাঁর রসোপলব্ধির গভীরতায়। এবং তাঁর সেই উপলব্ধির রসকে প্রতিভাত করেছেন পাঠকের সামনে। 'বন্দিনী' 'সুমিতার জন্য' 'শিবসুন্দর' 'এই আবরণ' 'তমুনীড়ের ডায়েরী' প্রভৃতি গল্পে লেখকের সহজ কুশলতার প্রকাশ।

'আলোছায়া জানালায়' একটি সার্থক গল্পগ্রন্থ ; পাঠক সমাজে সমাদর পাবে বলেই আশা করি।

—সন্তোষ কুমার অধিকারী

নির্ণয়—১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ। সম্পাদক: জয়ন্ত চৌধুরী। ১৮।৩২বি বালীগঞ্জ প্লেস ঈস্ট হইতে শ্রীমতী শেফালী বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

আলোচ্য পত্রিকাটি দ্বিভাষিক এবং দ্বিমাসিক। এই ধরনের দ্বিভাষিক পত্র পত্রিকা অধুনাকালে প্রকাশিত হচ্ছে, এটা খুবই আশার কথা। দুটি ভাষায় যে পাঠক-সমাজের কাছে পৌছানো যায় তা নিশ্চয়ই একটি ভাষার মাধ্যমে পাওয়া পাঠক-সমাজের থেকে বিস্তৃততর, এর মানে পত্রিকার বক্তব্য, তার আবেদন বৃহত্তর পাঠকসমাজকে প্রভাবিত করে। পত্রিকার বক্তব্য স্বাস্থ্যকর হলে তা সমাজের অবশ্যই কল্যাণ করবে। 'নির্ণয়' পত্রিকাটিতে একটি সহজ স্বাস্থ্যের, মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবেশ লক্ষ্য করে উৎসাহবোধ করেছি। বাংলা ভাষায় লেখা কবিতাগুলির মধ্যে ভাল লেগেছে শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা, কমল গুপ্ত, দীপক চক্রবর্তী, ভবানী দত্ত, নির্মল ভৌমিক ও ফিলিপ পার্কিনের কবিতা। শ্রীবিজয় দেবের অনূদিত লিওপোল্ড সেঙ্ঘোর লেখা 'আফ্রিকান কাব্যজগৎ' একটি সুখপাঠ্য তথ্যবহুল প্রবন্ধ। শ্রীনির্মল ভৌমিকের ইংরেজী ভাষায় লেখা 'A Note on Samar Sen' প্রবন্ধটি মৌলিক মূল্যায়নের দাবী রাখে। নির্মল বাবু সমর সেনের তিনটি কবিতারও অনুবাদ করেছেন। তবে যাঁরা মূল কবিতাগুলি পড়েছেন তাঁরা এই অনুবাদ তিনটি পড়ে খুব খুশী হতে পারবেন না বলেই মনে হয়। ইংরেজী ভাষায় দখল বেশ পাকা করে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে বোধ হয় এই ধরণের অনুবাদ কর্মে হাত না দেওয়াই ভালো। 'Red oleanders palpitate' 'hazy looming evening' 'impalpable wailing in the wind' প্রমুখ শব্দবিন্যাস জানি না পাঠকের মনে কী ধরণের চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়? আদৌ কোন কিছু ব্যঞ্জিত হয় কী না সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

—ডক্টর সুধীর নন্দী